দুঃসময়ের কথাচিত্র

সরাসরি

মাহ্‌বুব উল্লাহ্ ▪ আফতাব আহমাদ

ড. আফতাব আহমাদ
এম, এ (ঢাকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান) পিএইচডি (লন্ডন)

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক; মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা; প্রথম বিরোধী জাতীয় পত্রিকা 'গণকণ্ঠ' এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী সম্পাদক; ১৯৭৪-এ গঠিত Civil Liberty and Legal Aid Committee র অন্যতম সংগঠক; ১৯৭৪ এ গঠিত জাতীয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির অন্যতম সদস্য।

আফতাব আহমাদ ১৯৭৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে তাঁর যোগদানে বাধাদান করা হয়। পরবর্তীতে বাতিল করা হয় এই নিয়োগাদেশ। ১৯৭৫-এ তিনি শেখ কামাল কর্তৃক অপহৃত হয়ে স্পেশাল ব্রাঞ্চে হস্তান্তরিত হন এবং পরবর্তীতে কারারুদ্ধ হন। প্রায় এক বছর কারাবাসের পর ১৯৭৬-এর মার্চে রীট মামলার ফলে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের নির্দেশে মুক্তি লাভ এবং ১৯৭৭-এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৪-এ গঠিত Council of Editors এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য; ১৯৭৮-এ Commonwealth Scholar হিসেবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষনাক্রমে যোগদান করেন। তিনি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত Development Studies বিভাগের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর অন্যান্য পরিচিতি : প্রাক্তন চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৬-৮৯); প্রাক্তন সভাপতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২-৯৫); প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি; প্রাক্তন সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ও সিন্ডিকেট; ১৯৯৫ থেকে প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি। আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালসমূহের নিয়মিত Contributor আফতাব আহমাদ আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্সে অসংখ্যবার যোগদান করেছেন।

তাঁর Areas of Interests and Specialization : Constitutional Development; Development Studies; Environmental Security; Sociology of Politics and Development; International Affairs; Political Economy of Regional Co-operation; Public Policy, Political Ecology, Human Settlement, Displacement and Population Migration, US Political System and China Studies. তিনি Centre for Democratic Awareness এর অন্যতম Director.

www.pathagar.com

একটি দৈনিক ইনকিলাব উদ্যোগ

দু:সময়ের কথাচিত্র

সরাসরি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দু:সময়ের কথাচিত্র

সরাসরি

মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌ ❑ আফতাব আহমাদ

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ❑ ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ▮ একুশে বইমেলা ২০০২

প্রকাশক ▮ মোঃ শিহাব উদ্দিন বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১১৯৯৩ কম্পিউটার সেটিং ▮ বাড কম্প্রিন্ট, ৫০ বাংলাবাজার মুদ্রণে ▮ মেরাজ প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা

প্রচ্ছদ ▮ মোবারক হোসেন লিটন গ্রন্থস্বত্ব ▮ লেখক

মূল্য ▮ ৬৫০.০০ টাকা মাত্র US $ 20

ISBN-984-839-019-07

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

বাংলাদেশের রৌমারীর বড়াইবাড়ী সীমান্তে ভারতীয় হানাদারদের
থাবা চূর্ণ করে দিতে বিডিআরের যে তিন জওয়ান সংক্ষিপ্ত
জনযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, যাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে
জাতীয় পতাকা অর্ধ-নমিত হয়নি, যাঁদের
বীরত্ব-গৌরবকে স্বীকৃতি দিয়ে আজও
রাষ্ট্রীয়ভাবে বীরশ্রেষ্ঠ পদক
প্রদান করা হয়নি, তাঁদের
অম্লান স্মৃতির
উদ্দেশে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক

দু:সময়ের কথাচিত্র- সরাসরি গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দবোধ করছি। গ্রন্থটি ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ থেকে ১১ অক্টোবর ২০০১, দৈনিক ইনকিলাবে দেশ, জাতি ও সমাজ সম্পর্কে প্রতি সপ্তাহে *সরাসরি* শিরোনামে গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে আমাদের যে কথোপকথন প্রকাশিত হয়েছে তারই কিঞ্চিত পরিমার্জিতরূপ। ধারাবাহিকভাবে একটি দৈনিক পত্রিকায় পৃষ্ঠা জুড়ে সমকালীন বিষয়ে কথোপকথন প্রকাশের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল দৈনিক ইনকিলাব।

যে অবয়বে দৈনিক ইনকিলাব আমাদের কথোপকথন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয় তার একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। সে এক দু:সময়। একদিকে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেবার দেশদ্রোহী অপপ্রয়াস, অন্যদিকে সেই অপপ্রয়াসকে অবাধ রাখতে দেশপ্রেমিক জনগণের উপর নেমে এসেছিলো নির্যাতন নিপীড়নের চণ্ড-তাণ্ডব। দেশবাসী দিশেহারা। তারা চাচ্ছিল বুদ্ধিদীপ্ত পথ নির্দেশ। যার বড় অভাব আমাদের রাজনীতিতে। এরকম পরিস্থিতে, ১৯৯৯-এর মাঝামাঝি সময়ে দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক জনাব এ এম এম বাহাউদ্দীন অনুভব করলেন তৎকালীন সরকারের ফ্যাসিবাদী ও জাতিঘাতী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দেশব্যাপী প্রখর ও শাণিত চেতনা সৃষ্টি করা চলমান গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। দেশপ্রেমিক জনগণ একটি সঠিক দিক নির্দেশনা পেতে আগ্রহী। এই দিক নির্দেশনার পেছনে থাকবে তত্ত্ব ও তথ্যের শক্তিশালী ভিত্তি। ইনকিলাব সম্পাদক প্রস্তাব করলেন আমাদেরকেই এই দায়িত্বটি পালন করতে হবে। আমাদের প্রতিক্রিয়া ছিলো যদি আমাদের বক্তব্য অবিকৃতভাবে ছাপানো হয় তা হলে আমরা এ দায়িত্ব পালনে সম্মত আছি। ইনকিলাব আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। এজন্য আমাদের প্রিয় ছাত্র এ এম এম বাহাউদ্দীনের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

www.pathagar.com

ইনকিলাবের পাতায় আমাদের কথোপকথন প্রকাশে উদ্যোগীর ভূমিকা পালন করেছেন অনুজপ্রতিম কবি আবদুল হাই শিকদার। আতিক হেলাল ও অন্যান্যদের বিপুল শ্রম ছাড়া *সরাসরি* প্রকাশ সম্ভব ছিলো না। আমরা তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞ।

আমরা দাবী করব না আমরা যা বলেছি সেটাই সঠিক। আমাদের বিশ্লেষণে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই সে দাবীও আমরা করব না। পাঠক সমাজ যদি আমাদের আলোচনা থেকে দেশ ও জাতি সম্পর্কে গভীরভাবে ভাববার প্রেরণা পান, তাহলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

পাঠকের দাবী মেটানোর তাড়া থেকে, গ্রন্থাকারে দ্রুততার সাথে প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ভুল ত্রুটি রয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাঠক সমাজে সমাদৃত হলে দ্বিতীয় মুদ্রণে সেসব ভুলত্রুটি শুধরে নেবার ইচ্ছা রাখি। এই বিশাল গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স-এর স্বত্বাধিকারী জনাব মোহাম্মদ শিহাব উদ্দীন আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌
আফতাব আহমাদ

ফেব্রুয়ারি, ২০০২

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

আদালত ও সংবাদপত্র সম্পর্কে শেখ হাসিনার মন্তব্য প্রসঙ্গে / ১৩
বাংলাদেশে ভারতীয় পুলিশের অনুপ্রবেশ / ২৭
হাসিনা সরকারের রাজনৈতিক চরিত্র / ৩৯
জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের অন্বেষায় / ৫১
অপরাধ জগৎ, আইনের প্রয়োগ ও পুলিশ / ৬৩
মিলোসেভিচের পতনের তাৎপর্য / ৭২
সামাজিক মূল্যবোধ / ৭৭
আওয়ামী শাসন ও বোমা রহস্য / ৮৭
সিভিল সোসাইটি, এনজিও এবং রাষ্ট্র / ৯৬
পরিবেশ ভাবনা / ১০৬
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট / ১১৪
প্রয়োজন ব্যাপক জাতীয় ঐক্য / ১২৩
মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী স্মরণে / ১৩৭
সমাজ সরকার ও দুর্নীতি / ১৪৭
চার নেতার শীর্ষ বৈঠক / ১৫৩
বাংলাদেশের জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী অপরিহার্য / ১৬৪
একবিংশ শতাব্দী হবে এশিয়ার শতাব্দী / ১৭৪
সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রদায় ভাবনা / ১৮৭
অপরাধ প্রবণতা এবং ক্ষমতার চর্চা / ২০০
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় / ২০৯
ক্ষমতার স্বরূপ ও প্রয়োগ / ২১৮
১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান / ২২৭
সরকার বিরোধী অর্থবহ ঐক্য চাই / ২৩৮
বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র / ২৪৯
সংঘাত নয়, চাই জাতীয় ঐক্য / ২৫৭
ক্লিনটনের আসন্ন সফর ও বাংলাদেশের রাজনীতি / ২৬৭
সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি / ২৭৬
দলীয়করণের আবর্তে ক্লিনটনের সফর / ২৮৪
হুমায়ুন আহমদের অনশন রাজনীতি / ২৯৪
মুজিব বাহিনীওয়ালাদের সাম্প্রতিক তৎপরতা / ৩০৪
সমাজের সুস্থতা ও সুস্থ মানুষের সমাজ / ৩১৪
বিচারপতিগণ ব্ল্যাকমেইলিং এর শিকার / ৩২৩

www.pathagar.com

দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান সংকট / ৩৩০
বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক সম্ভাবনা / ৩৩৮
বাংলাদেশের প্রাক্তন ও বর্তমান পররাষ্ট্র সচিবদের মানসলোক / ৩৪৭
আরেকটি ৩০ মে ঘটানোর হুংকার / ৩৫৮
বাংলাদেশে জাফনা নাটক মঞ্চস্থের পাঁয়তারা / ৩৬৪
বাংলাদেশী মন ও বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ / ৩৭১
কলুষিত রাজনীতির বিবরে শিক্ষা ব্যবস্থা / ৩৮১
দুর্গের ভেতর থেকে দুর্গ দখল / ৩৮৯
নেতা ও জনতা / ৩৯৯
সেক্যুলারিজম ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য / ৪১০
দেশ প্রেমের চেতনা / ৪২০
দেহ ও মনের স্বদেশ / ৪২৭
সন্ত্রাস, সুশাসন ও রাষ্ট্র / ৪৩৬
ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব ও সরকারের দায়িত্ববোধ / ৪৪৫
এখন গ্রহণের কাল / ৪৫৩
বিপন্ন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব / ৪৬১
বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের অপেক্ষায় / ৪৬৯
আওয়ামী ফ্যাসিবাদের স্বরূপ / ৪৮০
মানুষ যখন অমানুষ / ৪৮৬
শেখ হাসিনার দেশদ্রোহিতা? / ৪৯২
নতুন শতাব্দীর জন্য প্রস্তুতি / ৪৯৮
অকৃতজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের কথা / ৫০৫
বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা / ৫১১
বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ ও জাতীয় নিরাপত্তা / ৫১৯
চাঁদাবাজির রকমফের ও রাষ্ট্রের খন্ডিকরণ / ৫২৮
১৫ই আগস্ট থেকে ৭ই নভেম্বর, ১৯৭৫ / ৫৩৩
আমলাতন্ত্র, দুর্নীতি ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন / ৫৩৮
বাঙালি জাত্যাভিমান ও রাষ্ট্রীয় সংহতি / ৫৪৪
বিচার বিভাগের বিপন্ন স্বাধীনতা / ৫৫১
আক্রান্ত ইনকিলাব / ৫৫৭
স্বৈরতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি / ৫৬৩
বাজপেয়ির মুখোশ উন্মোচন / ৫৬৮
জ্ঞানভিত্তিক নয়া অর্থনীতি ও রাজনীতি / ৫৭৪
ভুঁইফোড় মধ্যবিত্ত ও সামাজিক অবক্ষয় / ৫৮০
ঢাকার নগরজীবন / ৫৮৬
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও প্রতারিত জনগণ / ৫৯৩

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের অর্থনীতি ও বাংলাদেশের 'সংসদীয় গণতন্ত্র' / ৬০১
ওরা ভয় দেখিয়ে করছে শাসন / ৬০৮
আওয়ামী বিরোধী হলেই স্বাধীনতা বিরোধী? / ৬১৫
প্রকৃতিতে শূণ্যতা থাকে না / ৬২২
নিহত মানবাধিকার নিহত গণতন্ত্র / ৬২৯
শেখ হাসিনার নাটকীয় উক্তি / ৬৩৪
দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ-বোধ জাতীয় বিপর্যয়ের শামিল / ৬৩৯
ধসে পড়া শিক্ষার মান / ৬৪৬
রাজনীতিতে আমলা ও আমলাদের রাজনীতি / ৬৫১
শেখ হাসিনার রক্তাক্ত প্রস্থানের প্রস্তুতির মুখে 'গবাই' কৌশল / ৬৫৬
স্বাদেশিকতার সংস্কৃতি বর্জিত রাজনীতির পরিণতি বিডিআরের তিন শহীদের
আত্ম-ত্যাগের প্রতি অবহেলা / ৬৬১
বিডিআর জওয়ানদের বীরত্ব ও সরকারের নতজানু সমর্পণবাদ / ৬৬৭
ভারত তোষণ ও ক্ষমতার মসনদ / ৬৭৩
রাজনীতিতে গ্রেশামের সূত্র / ৬৮০
নেপালের রাজপ্রাসাদে মর্মন্তুদ হত্যাযজ্ঞের নেপথ্যে / ৬৮৫
রাজনীতিতে ব্যবসায়ী শ্রেণীর জাতিদ্রোহী মানসিকতা / ৬৯১
বেগম খালেদা জিয়ার সফর কাফেলার ওপর হামলা / ৬৯৭
প্রেসিডেন্ট ও পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্তব্য / ৭০৩
দৈত্যরূপী ভারতের পাগুলো কাদামাটির / ৭১০
তত্ত্বাবধায়ক সরকারও একটি সরকার / ৭১৫
বিচারপতি লতিফুর রহমান ব্যর্থতা পরিহারে যত্নবান হবেন / ৭২০
কোন অন্যায় চাপের প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নতি স্বীকার করা চলবে না / ৭২৫
সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সেনাবাহিনীর উপস্থিতি চাই / ৭৩২
কার্টারের নিকট দুই নেত্রীর অঙ্গীকার / ৭৩৮
কোটি কোটি টাকার নির্বাচনী মহোৎসব / ৭৪৪
রাজনৈতিক ছত্রছায়া. সন্ত্রাসের গডফাদার ও সুষ্ঠু নির্বাচন / ৭৪৯
আমাদের সকল সীমান্তে আগ্রাসন / ৭৫৬
নির্বাচন ও সন্ত্রাসের সহ সম্পর্ক / ৭৬৩
এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ও শিক্ষা ব্যবস্থার সিস্টেম লস / ৭৬৯
আফগানিস্তান জিন্দাবাদ! আমেরিকা দীর্ঘজীবী হউক! / ৭৭৫
সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা করতে হবে / ৭৮১
নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শক্তির বিজয় এবং তারপর / ৭৮৬
বিভ্রান্তি প্রচারের মুখে ঐক্য অটুট রাখতে হবে / ৭৯৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

আদালত ও সংবাদপত্র সম্পর্কে শেখ হাসিনার মন্তব্য প্রসঙ্গে

মাহবুব উল্লাহ :

সম্প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের কাছে একটা উদ্দেশ্যমূলক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা প্রয়োজন। সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা প্রয়োজন। তাঁর এই মন্তব্যের ফলে সমগ্র জাতি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কারণ, আজকে দেশের যে পরিস্থিতি, তাতে আমরা লক্ষ্য করছি জাতীয় জীবনের বা সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে যাঁরা রাজনীতি করেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা নানাভাবে নিপীড়িত, নির্যাতিত হচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা হচ্ছে। তাদেরকে হত্যা, জখমের শিকার করা হচ্ছে এবং এর ফলে তাঁরা নির্বিবাদে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারছেন না। প্রায়শই দেখা যায় যে, তাদের বিরুদ্ধে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময়ে পুলিশের ঔপনিবেশিক ক্ষমতা অর্থাৎ সেই ৫৪ ধারায় সন্দেহমূলকভাবে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারের পর তারা নিম্ন আদালত থেকে সাধারণত কোনরকম প্রতিকার পান না। ফলে তাদেরকে বাধ্য হয়েই উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হতে হয় জামিনের জন্য এবং প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, হাইকোর্টে তাঁরা রিলিফ পান। তাঁরা জামিন পান এবং আপনি এও জানেন যে, কিছুদিন আগে আদালত সম্পর্কে একটা মন্তব্য করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট প্রধানমন্ত্রীকে কিছুটা তিরস্কৃত করেছে। সম্ভবত এই কারণে প্রধানমন্ত্রী উচ্চ আদালতের ওপরে কিছুটা বিরক্ত হয়েছেন। সে কারণেই তিনি হয়ত এই মন্তব্যটা করেছেন যে, আদালত বা উচ্চ আদালতেরও জবাবদিহিতা প্রয়োজন আছে। আপনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক, সেই হিসেবে আমাদের সংবিধান সম্পর্কে আপনার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। এই সংবিধানে আদালতকে কিভাবে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা রয়েছে, সে সম্পর্কে একটু আলোকপাত করুন।

আফতাব আহমাদ :

আমাদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছেন, সেটা আমি বলব শুধু উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার জন্যই দেয়নি, এটি একটি অশনি সংকেতও বটে। আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে একটা বিষয় বোধ হয় স্পষ্টভাবে আমাদের এখানে আলোচনা করা দরকার। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা বলা যেতে পারে অনেকটা বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার আদলে, তবে সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার মতো নয়, সেরকম করে এটা গড়ে তোলা হয়েছে। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা এটা পেয়েছি। বিচার ব্যবস্থার জবাবদিহিতার কথা যখন প্রধানমন্ত্রী বলেন, তখন স্বাভাবিকভাবে ভাবতে হয় যে, এই জবাবদিহিতার প্রশ্ন কেন তিনি উত্থাপন করছেন। বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি, আমাদের শাসকগোষ্ঠী বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব একটা উঁচু ধারণা পোষণ করতেন না এবং করতেন না বলেই ১৯৭৫-এ যখন চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এ দেশে একদলীয় স্বৈরশাসন প্রবর্তন করা হয়, তখন বিধান করা হয় যে, সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে সকল বিচারপতির নিয়োগ প্রেসিডেন্টের খেয়ালখুশি মত হবে। তাদের চাকরির কোনো নিরাপত্তা পর্যন্ত বিধান করা হয়নি। চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয়েছিল. প্রেসিডেন্ট যখন খুশি, যাকে ইচ্ছা তাকে বরখাস্ত করতে

www.pathagar.com

পারবেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ইটালীর মুসোলিনী যখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেন তখন বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে সংবাদপত্র এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সবকিছুর ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানও চতুর্থ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে সেই ধরনের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিচার বিভাগের ওপর। সে পথ ধরে সংবাদপত্রের ওপর। আপনার স্মরণে আছে, ১৯৭৩-এ আমরা যখন নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছিলাম সেই সময় সেদিনের কুখ্যাত জাতীয় রক্ষী বাহিনী ঢাকা শহরের গুলিস্তানের মোড় থেকে শাহজাহান নামে একজন তরুণকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে গুম করে হত্যা করে, তখন ১৯৭৪-এর গোড়ার দিকে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি ঐতিহাসিক মামলা রুজু করা হয়। যেই মামলায় লড়েছিলেন আমাদের প্রতিষ্ঠিত সিভিল লিবার্টিজ অ্যাণ্ড লিগাল এইড কমিটির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। সেই মামলার রায়ে রক্ষী বাহিনী যে নিয়ন্ত্রণহীন বেআইনী কাজ করে বেড়াচ্ছে, স্পষ্টভাবে হাইকোর্ট ডিভিশন তিরস্কার করে সরকারকে সেই ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিল। সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বিচার বিভাগের ওপরে। বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেননি। একইভাবে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনাও বিচার বিভাগের ওপর রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারছেন না। নিপীড়নের উদ্দেশ্যে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার একের পর এক মিথ্যা মামলা রুজু করে চলেছে। হাইকোর্ট ডিভিশন এ ধরনের বহু মামলায় বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের অনেককেই জামিন দিয়েছিলেন। এ ঘটনাটিকেই অতিরঞ্জিত করে শেখ হাসিনা আদালত সম্পর্কে কতগুলো কটুক্তি করেছিলেন। আদালত অবমাননার দায়ে আদালত যখন শেখ হাসিনাকে জবাব দেয়ার জন্য তলব করল, তখন যেভাবে এবং যে পদ্ধতিতে শেখ হাসিনা তার লিখিত বক্তব্য আদালতে পেশ করেছিলেন, এটিও অত্যন্ত আপত্তিজনক ছিল।

মাহবুব উল্লাহ :

এখানে আমার একটা মন্তব্য আছে। সেটা হচ্ছে যে, শেখ হাসিনা বিদেশ থেকে ফেরার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্যটা করেছিলেন। মন্তব্যের সূত্র হিসেবে তিনি কিছু সংবাদপত্রের কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, যেখানে প্রায় তিনশ'টির মত জামিন দেয়া হয়েছিল, সেখানে দু'তিনটি কাগজে বলা হয়েছিল যে, প্রায় ১১শ' বা ১২শ' মামলায় জামিন দেয়া হয়েছে। এখানে সঙ্গতভাবে এ প্রশ্নটাও ওঠে যে সংবাদপত্রে এ ধরনের ভুল রিপোর্টিং অনেক সময়ে রাজনৈতিক নেতাদেরকে কিছু র‍্যাশ অ্যাকশান বা র‍্যাশ কমেন্টস করতে প্রলুব্ধ করে। সেইক্ষেত্রে সংবাদপত্রের একটা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা দরকার। এখন তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমাদের সংবাদপত্রগুলো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে না কোন কোন ক্ষেত্রে। যেহেতু তারা একটা ফ্রি লাইসেন্স এনজয় করছে তার ফলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা থাকা উচিত। অবশ্য কোর্টের বিষয়টি আগে আলোচনা করে তার পর সংবাদপত্রের বিষয়টি আলোচনা করলে আমার মনে হয় বিষয় দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা নির্ধারণ করতে পারব।

আফতাব আহমাদ :

আপনি যথার্থই বলেছেন। সংবাদপত্র প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি। তবে যেহেতু আপনি এই জায়গায় উল্লেখ করলেন যে, দু'একটি পত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল যে, হাইকোর্ট ডিভিশন একদিনে প্রায় ১২শ' জামিন মঞ্জুর করেছে; সেহেতু সে প্রসঙ্গে সংক্ষেপে দুইটা কথা আগে সেরে নিতে চাই। কয়েকটি পত্রিকা এ ধরনের সংবাদ ছেপেছে– একথা নিঃসন্দেহে সত্য। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ ইত্তেফাকের

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট কয়েকটি সংখ্যা প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এই হিয়ারিং-এ নিয়ে এসেছিল। সংবাদপত্র এক্ষেত্রে যা করেছে সে সম্পর্কে মন্তব্যটা আমি পরে করি। একজন প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র সংবাদপত্রে কী ছাপা হল. তার ভিত্তিতে বিচার বিভাগে সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য কোন অবস্থাতেই করতে পারেন না। কারণ. প্রধানমন্ত্রীকে নির্ভর করতে হয় রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য যে অঙ্গ সংস্থা রয়েছে সেসবের রিপোর্টের ওপর। এছাড়াও বিভিন্ন মেকানিজমের মাধ্যমে রাষ্ট্র নানা ধরনের ইনফরমেশন গ্যাদার করে. যার ওপর প্রধানমন্ত্রীকে নির্ভর করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা সে ধরনের কোনো সংস্থা বা মেকানিজমের আহরিত ইনফরমেশনের ভিত্তিতে এই মন্তব্যটি করেননি। হাসিনা এটি ইচ্ছে করেই করেছেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই কথাগুলো বলেছেন। এর অবশ্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। যেই নির্দিষ্ট বিচারকের আদালতে এই কথিত ১২শ' জামিনের বিষয় নিয়ে হাসিনা হৈ-চৈ করে মাতামাতি শুরু করলেন সেই বিচারপতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী এবং যুগপৎভাবে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থক বলে যারা মোটামুটি পরিচিত, এ ধরনের বেশ কয়েকিট কাগজ এ ধরনের সংবাদ পরিবেশন করার পর প্রধানমন্ত্রী নিজে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে সেই বিচারপতির অপসারণ দাবী করেন। তিনি এও হুমকি দিলেন এবং পত্রিকার সংবাদ প্রতিবেদনে এ মর্মে আমরা জানতে পারলাম যে, তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে সেই বিচারপতির বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। সবচেয়ে হাস্যকর বিষয়টা হচ্ছে এই যে, প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে হাসিনা সংবিধান সংরক্ষণ এবং প্রতিপালনে শপথ নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে সংবিধানটি পাঠ করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রাষ্ট্রপতিকে করতে হয় না। সংবিধানেই বিধান করা আছে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের প্রকৃতি প্রধান বিচারপতি এবং বরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পরবর্তী যে দু'জন বরিষ্ঠ বিচারক আপীল বিভাগে বসেন, এই তিন জনের সমন্বয়েই গঠিত হয় সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬(৩) ও ৯৬(৪)-এ সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়ে বিধান করা আছে। অথচ এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান না রেখেই হাসিনা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে দাবী করে বসলেন সত্বর সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে ঐ বিচারপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। এ থেকে বোঝা যায় যে, ক্রোধ এবং আক্রোশের বশবর্তী হয়ে হাসিনা কিভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। যখন যুক্তিসঙ্গত, সুচিন্তিত কোন ধরনের মতামত ক্ষমতালিপ্সু কোনো ব্যক্তি ক্ষমতার মদমত্ততায় শুনতে না চেয়ে ক্ষেপে যান তখন তার কাণ্ডজ্ঞানও যে লোপ পাবে– তা তো স্বাভাবিক।

আমাদের দেশে মুনসেফ কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, জেলা জজ.কোর্ট এবং তাদের ওপরে আছে সুপ্রীম কোর্ট। আমাদের সংবিধান বিচার ব্যবস্থার যে কাঠামো আমাদেরকে দিয়েছে, তাতে প্রত্যেক পর্যায়ে ঊর্ধ্বতন আদালত অধঃস্তন আদালতের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এবং অধঃস্তন আদালত থেকে যখন ঊর্ধ্বতন আদালতে কোন মামলা যায়, তারা প্রত্যেকটি কাগজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্ক্রুটিনি করে। কোনো ত্রুটি যদি লক্ষ্য করা যায় বা মিসক্যারেজ অব জাস্টিজ যদি হয়, উর্ধ্বতন আদালত সেটাকে সংশোধন করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে অধঃস্তন আদালতের দায়-দায়িত্ব যাদের ওপর বর্তায় তারা যদি নিয়ম-নীতি এবং বিচার ব্যবস্থার যে সমস্ত স্বীকৃত Principles রয়েছে সেগুলো যদি ভায়োলেট করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিধানও আমাদের রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধানকে অধঃস্তন আদালতগুলোকে নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা দেয়া ছিল যখন সংবিধান প্রণীত হয়। এই ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয় চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে। তারপরও পরবর্তী পর্যায়ে যে সংশোধনীগুলো এসেছে, সেগুলোর মধ্যদিয়ে আদালতকে অনেক সুযোগ না দিয়ে এবং নির্বাহী বিভাগকে পরিপূর্ণভাবে পৃথক না করে অধঃস্তন আদালতগুলোকে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে দিয়েছে। যদিও সংবিধানে বলা আছে যে রাষ্ট্র নির্বাহী অঙ্গসমূহ থেকে

www.pathagar.com

বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করবে। আজকে প্রধানমন্ত্রী একদিকে যেমন উচ্চতর আদালতকে লক্ষ্য করে বিচার বিভাগকে ধমকাচ্ছেন, অপরদিকে বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগকে পৃথক করার জন্য '৯৬ নির্বাচনের সময়ে তাদের যে অঙ্গীকার ছিল, সেটাকে পরিপূরণ করার জন্য কোন কার্যকরি পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করছেন না। এখন প্রশ্নটা হল, যেখানে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আছে, যদি কোনো বিচারক তার নিয়ম-নীতি লংঘন করে, জুডিশিয়ারীর স্ট্যাবলিশড প্রিন্সিপলসগুলো লংঘন করে ব্যক্তিগত রাগ, ক্ষোভ, অভিমান-এর বশবর্তী হয়ে কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার যেখানে বিধান আছে, সেগুলোর ওপর কোনো গুরুত্বারোপ না করে বিচারকের জবাবদিহিতার দাবী করার অর্থ কী? অর্থটা হচ্ছে রাজনৈতিক আনুগত্য দাবী করা। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, মুজিব হত্যা মামলা চলাকালীন সময়েও নানা ধরনের উক্তি করে বিচার ব্যবস্থা এবং বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আজকে যে আশংকা সকলের মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠছে, তা হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রদেহের যতগুলো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় সর্বত্রই ক্ষমতাসীন দলের এক ধরনের পক্ষপাতমূলক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। শুধু একটি জায়গা, যেখানে ক্ষমতাসীনরা সরাসরি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, সেটি হচ্ছে আমাদের বিচার বিভাগের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান সুপ্রীম কোর্ট। সে কারণেই বিচার বিভাগের ওপর প্রধানমন্ত্রী ক্ষেপে উঠলেন।

মাহবুব উল্লাহ :

এ প্রসঙ্গে আমার একটা প্রশ্ন আছে। সেটা হচ্ছে, সাধারণত বলা হয় যে, কোনো সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে উচ্চতম আদালতের রায়কে প্রশ্ন করা বা সমালোচনা করার অধিকার নাগরিকদের আছে। যদিও আদালতের রায় শিরোধার্য, কিন্তু তার পাশাপাশি আদালতের রায়ের যে সাবস্টান্স, সেটাকে কোশ্চেন করা বা সমালোচনা করার অধিকার নাগরিকদের আছে। বিভিন্ন সভ্য রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা যদি পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখবো বিচারের ধারা ও রায়ের যে প্রবণতা, তার মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন এসেছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা আমরা বলতে পারি। সেখানে ১৯৫৩ সন পর্যন্ত সেখানকার সুপ্রীম কোর্ট যে সমস্ত জাজমেন্ট দিয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, মামলাগুলো যদি একদিকে কৃষ্ণাঙ্গ এবং অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হয়, সেখানে অধিকাংশ মামলার রায় শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে মার্কিন সমাজে একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন সিভিল রাইটস মুভমেন্টস সেই দেশে ডেভেলপ করে। যে কারণে দেখা যায় যে, পঞ্চাশের দশকের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের রায়েও একটা গুণগত পরিবর্তন আসে এবং যেখানে সাদা এবং কালো সকলকে তাদের বর্ণগত পরিচয় নির্বিশেষে সুবিচারের সুযোগ দেয়া হয়। আমাদের দেশ রাষ্ট্র বা সমাজটা বলা চলে একটা ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে চলছে। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলো পাকাপোক্ত হয়নি। আপনি একটু আগে যে কথাটি উল্লেখ করলেন যে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রের বিশেষ করে প্রশাসনের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে রাজনৈতিকভাবে দলীয়করণের একটা প্রচেষ্টা চলছে, এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিকভাবে যারা অনুগত, যারা সরকারকে সমর্থন করে, সেই ধরনের লোকদেরকে বেছে বেছে বিভিন্ন সেন্সিটিভ পোস্টিংয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলে মানুষ সুবিচার পাচ্ছে না। গণতন্ত্রের যে মূল কথা গুড গভর্নেন্স, সেটা নিশ্চিত হতে পারছে না। যেহেতু বিচার ব্যবস্থার নিম্নপর্যায়ে প্রশাসনই হচ্ছে বিচারের জন্য, ইনভেস্টিগেশনের জন্য দায়ী–বিশেষ করে পুলিশ, সেখানে দেখা যায় অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট ইনভেস্টিগেশন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য থাকে প্রতিপক্ষকে দলন-পীড়ন করা। আমার মনে হয়, এটা আমাদের দেশের

www.pathagar.com

জন্য একটা গুরুতর সমস্যা এবং এই সমস্যা থেকে যদি আমরা পরিত্রান না পাই, তাহলে দল-নির্বিশেষে যে কোনা সরকারের আমলেই আমাদের দেশের নাগরিকদের অধিকার বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তার সঙ্গে বোধ হয় যোগ করা দরকার, আমাদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে যারা নিয়োগ পান, তারা ছাত্রজীবনে কোনো না কোনো ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকেন। ফলে ছাত্রজীবনে যে ধরনের মতাদর্শ তারা লালন করেন, দেখা যায়, তাদের কর্মজীবনেও সেই মতাদর্শের একটা ছাপ থেকে যায়। এর ফলে আমরা লক্ষ্য করি যে, তারা যখন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন, তখন তারা সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ হতে পারেন না। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশে ইলেকশন কমিশন যথার্থভাবে ইলেকশন কনডাক্ট করে, সেই আস্থার অভাব থেকেই কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী উঠেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য এটা একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যবস্থা। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরাই বলছে যে তারা দেশে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পারে না। অথচ দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব তাদেরই। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজেদের উপর অনাস্থা পোষণ করছে। অর্থাৎ আমরা লক্ষ্য করছি, রাজনৈতিক দলগুলোর নিজের ওপর আস্থা নেই যে, সে সুবিচার করতে পারে। ন্যায়বিচার করতে পারে এবং আইনানুযায়ী তার ভূমিকা পালন করতে পারে। তাহলে এখানে অনেকগুলো জটিল প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। একটা হচ্ছে নৈতিক প্রশ্ন যে, আদালতের রায় সম্পর্কে মত প্রকাশের অধিকার আমার আছে কি-না এর পাশাপাশি আমাদেরকে দেখতে হবে, সেই মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা বিদ্বেষপ্রসূত কোনো মন্তব্য করছি কি-না, এবং জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছি কি-না। তার পাশাপাশি আমাদের দেশে বিদ্যমান ক্লেদাক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডল থেকে আমরা কিভাবে মুক্ত হতে পারি এটা আমার মনে হয় জনগণের একটা বিরাট অংশের অন্যতম প্রশ্ন। এখানে বোধ হয় আরেকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে এসে যায়। আজকে এই প্রশ্নগুলো কেন উত্থাপিত হচ্ছে? সেই বৃটিশ আমল থেকে যারা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে অপরাধীকে বিচারের কাছে সোপর্দ করবে, তারাই কিন্তু অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করে। এই তদন্তকারী এবং অপরাধের জন্য বিচারের সোপর্দকারী কর্তৃপক্ষ একই ব্যক্তি হওয়ার ফলে আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের অনাস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। তার মানে আমাদের সমগ্র বিচার ব্যবস্থার একটা আমূল সংস্কারের প্রয়োজন আছে। আপনার কী মনে হয়?

আফতাব আহমাদ :

বিচার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আপনি যে বক্তব্যটা আনলেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার মনে হয় তাৎক্ষণিকভাবে বা স্বল্পমেয়াদী কোনো পরিকল্পনা নিয়ে বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি এবং ঘাটতিগুলো দূর করা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি সম্পর্কে মতামত তৈরী করার আগে বা একটা সমাধানে পৌঁছবার আগে আমার মনে হয়, আরো গভীরভাবে বিষয়টা আমাদের পর্যালোচনা করা দরকার এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করা উচিত। প্রথমত আপনি যে কথাটা বললেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে, যে একটা সময় ছিল যখন মার্কিন বিচার ব্যবস্থায়ও বিচারকরা নানাভাবে প্রভাবিত হতেন। সমাজে শক্তিমান যে প্রভুত্বকারী চিন্তা বা যে প্রধান মত বিরাজ করতো যেমন, যখন কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃত ছিল না মার্কিন সমাজে, শ্বেতাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি বা শ্বেতাঙ্গের প্রতি পক্ষপাতমুলক আচার-আচরণ ইত্যাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারকদের অনেকটা প্রভাবান্বিত করেছিল নিঃসন্দেহ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হলো আমি যদি ধরে নিই যে মার্কিন সমাজ যে সময় কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ এই দুই পক্ষে বিভক্ত ছিল—দেখার বিষয় হচ্ছে, একটি অপরাধ একজন কৃষ্ণাঙ্গ যদি কৃষ্ণাঙ্গের ওপর করে থাকে বা একটি অপরাধ একজন শ্বেতাঙ্গ যদি শ্বেতাঙ্গের ওপর করে থাকে, ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিচারকরা কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন? আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, সমাজের বিরাজমান যে

www.pathagar.com

মূল্যবোধ তা থেকে মুক্ত থাকা সামাজিক জীব হিসেবে কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের যে প্রক্রিয়ায় সামাজিকায়ন বা সোশালাইজেশন হয় সেটা থেকে মুক্ত হয়ে তার পক্ষে সিদ্ধান্তে আসা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। তারপরও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র মানুষকে একটি শিক্ষা দিয়েছে, যেখান থেকে আমাদেরকে শিখতে হবে। সেটা হচ্ছে, রাষ্ট্রদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নেয়া। একটা ইমপার্সোনাল এবং আনবায়াসড- আনবায়াসড এই অর্থে যে আমি প্রথমেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে সেই সিদ্ধান্তকে সিদ্ধ করার জন্য কৌশল অবলম্বন করবো, তা নয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা দৃষ্টান্ত দেই আপনাকে। ১৯৭৮-৭৯-এর কথা। তখন আমি নিজে গ্রেট বৃটেনে ছিলাম। একটি বিখ্যাত মামলা বৃটিশ হাইকোর্টে গিয়ে লর্ড ডেনিংয়ের এজলাসে উত্থাপিত হলো। মামলাটি ছিল একটি শিখ স্কুলগামী ছাত্রকে কন্দ্রে করে। আপনি জানেন যে, শিখরা পাগড়ি পরে এবং সাথে কৃপাণ বহন করে। স্কুলের হেডমাস্টার বললেন, না, আমার স্কুলে কোনো ছাত্র আলাদাভাবে পাগড়ি পরে এবং কৃপাণ কোমরে গুঁজে আসতে পারবে না। কারণ, এটা একটা সোশাল ডিসক্রিমিনেশন-এর জন্ম দেয় এবং স্কুলের কোমলমতি বালক-বালিকার মধ্যে সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক চেতনার জন্ম দিতে পারে, এ কারণে হেডমাস্টার আপত্তি তুললেন এবং অভিভাবককে ডেকে বললেন, হয় আপনি আপনার সন্তানকে এ থেকে নিবৃত্ত করবেন, তা না হলে আপনি আপনার সন্তানকে আমার স্কুল থেকে নিয়ে চলে যান। এটি ফান্ডামেন্টাল রাইটসের চরম ভায়োলেশন বলে সেই ছাত্রের বাবা মামলা করলেন। লর্ড ডেনিংয়ের এজলাসে যখন এই মামলাটি উঠলো তখন এটা নিয়ে চারিদিকে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেলো। কারণ, লর্ড ডেনিং বৃটিশ জুডিশিয়াল হিস্ট্রিতে কিংবদন্তী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন ততো দিনে। তিনি বহু কন্ট্রোভার্শিয়াল জাজমেন্ট দিয়েছেন, যেগুলোর সঙ্গে অনেকের পক্ষেই একমত পোষণ করা কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু তারপরও এগুলো বৃটিশ সমাজ গ্রহণ করছে। বৃটিশ লিগ্যাল এবং জুডিশিয়াল সিস্টেমে তার অনেক রায় এখন ইন্টেগরাল পার্ট হয়ে গেছে।

লর্ডডেনিং দীর্ঘ শুনানির পর রায় দিলেন যে, ঐ ছাত্র ঐ স্কুলে পাগড়ি পরে এবং কৃপাণ নিয়ে যেতে পারবে না। তাঁর এ রায়ের পর বটিশ পত্র-পত্রিকাগুলো বিশেষ করে ডেইলি মিরর এবং লেবার দলের সমর্থক পত্র-পত্রিকা রায় সম্পর্কে কিছুনা বলে লর্ড ডেনিং সম্পর্কে মন্তব্য করলো 'হি ইজ এ রেসিস্ট'। লর্ড ডেনিংয়ের এ রায়ের বিরুদ্ধে ল' লর্ডসদের কাছে আপীল করা হলো। সেই আপীলে অবশ্য সেই শিখ অভিভাবক জয়ী হয়েছিলেন। লর্ড ডেনিংয়ের রায়টা অনুমোদিত হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, লর্ড ডেনিং এই রায় দেয়ার কারণে বৃটিশ নির্বাহী বিভাগের পক্ষ থেকে এবং ঐ সময়ে বৃটিশ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লেবার দলের পক্ষ থেকে হুমকি তো দূরের কথা তিরস্কারমূলক কোনো লেখা পর্যন্ত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়নি। পত্র-পত্রিকায় যে প্রতিক্রিয়া এসেছে, তা সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে। আপনি যে প্রশ্নটা এখানে উত্থাপন করেছেন, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে যে কোনো ধরনের বিদ্বেষ প্রচার না করে কাউকে হেয়প্রতিপন্ন না করে একজন বিচারক যে রায় দিয়েছেন, সেই রায় মেনে নিয়েও তার সমালোচনা করা যায়। নাগরিকদের সেই অধিকার আছে। সকল সভ্য দেশেই এটি একটি স্বীকৃত ও অনুমোদিত ব্যবস্থা। আমাদের দেশে কথায় কথায় অনেকে বলেন যে, আদালতের কোনো রায় সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাবে না। এ কথাটি ঠিক নয়। আদালতের রায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাবে না মানে কী? এটার অর্থ হচ্ছে, আদালত যে রায় দেবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সে রায় অবশ্যই কার্যকর হবে। কিন্তু সে রায়ের তাৎপর্য সম্পর্কে বা সে রায় কি ধরনের হয়েছে, সে সম্পর্কে মতামত দেয়ার অধিকার নিশ্চয়ই সকলের আছে। একজন বিচারক আজকে যে রায় দিচ্ছেন, দশ বছর পরে তাকে যদি ঐ একই মামলার নথিপত্র দেয়া হয় তিনি হয়তো ভিন্ন একটা দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করবেন। আপনার মূল প্রশ্ন যেটা ছিল– সে অবক্ষয়টা এসেছে

www.pathagar.com

আমাদের বিচারক ব্যবস্থায় বলুন বা রাষ্ট্রদেহের অন্যান্য অঙ্গে বলুন, এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাদের সকলকে যেমন সচেষ্ট হতে হবে, তেমনি আগবাড়িয়ে আজকে যেমন আমরা বলছি যে, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগের পরিপূর্ণ পৃথকীকরণ চাই– বাস্তবটা হচ্ছে এই, আমরা যদি সকলে একমত হয়ে চাইও, এই মুহূর্তে এটি কার্যকর করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এই জন্য যে, আমরা এর জন্য এখনো পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হইনি। এখানে আমরা এখন পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র পৃথক জুডিশিয়াল সার্ভিস প্রবর্তন করতে পারিনি। ফুল ফ্লেজেড জুডিশিয়াল সার্ভিস বলতে যেটা বুঝায় এ ধরনের ব্যবস্থার জন্য যে ধরনের যোগ্য ব্যক্তিকে দক্ষ ও বিচক্ষণ করে তুলতে হয়, তার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ম্যানপাওয়ার ও রিসোর্স নেই। সেই সিস্টেম আমরা গড়ে তুলিনি। আপনি লক্ষ্য করবেন, আমাদের অধঃস্তন আদালতগুলোতে যারা কাজ করেন, তাদের কিন্তু নিয়ন্ত্রণ নির্বাহী বিভাগের দুটি জায়গায়– একটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, আরেকটি আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়। এর ওপর রয়েছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং এখানে যে নির্বাহী বিভাগ থেকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করা হয় না, তা নয়। এতদসত্ত্বেও আমাদের জনসাধারণের অধঃস্তন আদালত সম্পর্কে জমিজমা সংক্রান্ত মামলা ছাড়া খুব একটা বড় কমপ্লেইন নেই। এর কারণ হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমরা মোটামুটি বৃটিশ কলোনিয়াল পিরিয়ডের রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিউরের প্রিন্সিপালগুলো ফলো করে আসছি। কিন্তু '৭২ থেকে ক্রমান্বয়ে আমরা এগুলো একের পর এক ভেঙ্গে চলেছি এবং লংঘন করে আসছি, সমানে ভাঙছি। কিন্তু উন্নতর কোন নীতি-পদ্ধতি বা মূল্যবোধ প্রতিস্থাপন করে এগুলো ভাঙছি না আমরা। এ জায়গায় কী করছি আমরা? সরাসরি দলীয়করণের একটা প্রক্রিয়া আমরা চালু করার চেষ্টা করছি। আপনি লক্ষ্য করবেন, এই যে পাবলিক প্রসিকিউটর যাদের নিয়োগ করা হয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তারা রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখবে, না দলের স্বার্থ দেখবে– দলীয় ভিত্তিতে এমন সব ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়, অনেক ক্ষেত্রে যারা আইনের ব্যাপারটাই সুষ্ঠুভাবে বোঝেন না। সেই সব জায়গায় যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো মনে রেখে আমাদের অধঃস্তন আদালতকে যদি আরও অর্থবহ, কার্যবহ করতে হয়, নিয়ন্ত্রণ ভারটা ছেড়ে দিতে হবে সর্বোচ্চ আদালতের ওপরে এবং যদি আমাদের সুপ্রীম কোর্টের ওপর আমাদের সর্বনিম্ন মুন্সেফ কোর্টকে শুধু নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানই নয়, রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং প্রসেসে পরিপূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয় এবং যুগপৎভাবে যদি আমরা পৃথক কম্পিউটিটিভ পরীক্ষার ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র জুডিশিয়াল সার্ভিস প্রবর্তন করতে পারি তাহলে চিত্রটা কিন্তু পাল্টে যাবে এবং ঐ কাজটি যদি আমরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা যেটাকে বলি ক্লীয়ার সেপারেশন অব দি জুডিশিয়ারী এন্ড এক্সিকিউটিভ তা করা সম্ভব। তার আগে যদি আমরা ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা করি তাহলে সেই ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে না। সর্বোপরি নানা জায়গায় এখন যে ক্লেদ জমে আছে সেই ক্লেদটাও দূর করার আশু পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

মাহবুব উল্লাহ :

ড. আফতাব রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী ব্যক্তির পক্ষ থেকে যখন উচ্চতর আদালত সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, তখন এটাকে আপনি বলছেন একটা অশনিসংকেত। বাংলাদেশের একটা বড় দুর্ভাগ্য এই যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর থেকে আমরা কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান গড়ার দিকে মনোযোগ দেইনি। বরং যে সকল ইনস্টিটিউশন ছিল, তার সবগুলোর মধ্যেই আমরা একটা বিপর্যয় ডেকে এনেছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে নজর দিলে আমরা দেখব যে সেগুলোও আজ বিপর্যস্ত। সেখানে যে শুধু লেখাপড়ার পরিবেশ ও সুষ্ঠু প্রশাসন নেই তা নয় বরং একটা উচ্চতর প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেটাকে গড়ে তোলার জন্য উন্নত ও সভ্য বিশ্বের সাথে প্রতিযোগী করে গড়ে তোলার জন্য যা যা করার দরকার, সেটা করা হচ্ছে না। আমাদের আমলাতন্ত্র বিপর্যস্ত। পুলিশ বিভাগ বিপর্যস্ত। সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ প্রবণতা

www.pathagar.com

দিন দিন বাড়ছে। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন লক্ষ্য করি যে উচ্চতর আদালতের ওপরও একটা হস্তক্ষেপ চালানোর অশুভ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, যে আদালতগুলো এখন পর্যন্ত তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে এবং বিভিন্ন সময় জনগণের অধিকার সংরক্ষণে যখন আর কোন সুযোগ থাকে না তখন তারা নাগরিকদেরকে সহায়তা দিচ্ছে তাদের ওপরও যখন হস্তক্ষেপ করার উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন মনে হয়, বাংলাদেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকেই ধ্বংস করে ফেলার একটা উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের নানারকম প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা আছে এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে একটা বিরাট যজ্ঞ চলছে, বিরাট আয়োজন চলছে এই রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে, বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করে সর্বশেষে এই রাষ্ট্রের অস্তিত্বটাকে প্রশ্ন সাপেক্ষ করে তোলা এবং রাষ্ট্রকে একটা ডিজোলিউশনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমাদের হাইকোর্ট বিভাগ তথা সুপ্রীম কোর্টের ওপর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করা হয়, তখন কি আমরা এই প্রশ্ন তুলতে পারি না যে, এটা আসলে বাংলাদেশে যা কিছু ভাল এখনো আছে সেটাকেও ধ্বংস করে ফেলার একটা উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে?

আফতাব আহমাদ :

নিঃসন্দেহে। বাংলাদেশের যা কিছু ভাল যা কিছুর গৌরবের, আমাদের যা কিছু অর্জন, যা কিছু সম্ভাবনা, তাকে ধ্বংস করাই হচ্ছে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এবং ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রঘাতী দলটির অন্যতম লক্ষ্য। এ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি এ প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই, সাংবাদিকদের সাথে যে ঘরোয়া বৈঠকে কলিকাতা থেকে ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রী হাইকোর্ট ডিভিশনের একজন বিচারপতি সম্পর্কে গর্হিত ও দুঃখজনক মন্তব্য করেছিলেন, সেখানে আরেকটি প্রসঙ্গের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি। আপনার মনে আছে, কলিকাতা বই মেলায় জ্যোতিবসুর উপস্থিতিতে বারংবার শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলে সম্বোধন করা হয়েছিল। একটি স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী সম্বোধন করা হচ্ছিল। এর তাঁর সাথে যে বিশাল ডেলিগেশন সেই বইমেলায় গিয়েছিল তাদের কারো পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ পর্যন্ত সে সময় উচ্চারিত হয়নি। শেখ হাসিনার যদি আত্মমর্যাদা-জ্ঞান থাকত, তিনি অন্তত তাঁর ভাষণে বলতে পারতেন, 'আমি কোন প্রদেশ বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নই, একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজকের এই বইমেলায় আমি এসেছি।' এই কথাটি পর্যন্ত তিনি সেখানে উচ্চারণ করতে সাহস করেননি 'ওরা বারবার আমাকে মুখ্যমন্ত্রী সম্বোধন করছিল। আমি যতবার শুনেছি, আমার হাসি পাচ্ছিল। আসলে ওদের রাজনীতিতে তো এই শব্দটা চালু আছে। সেজন্যই হয়তো ওভাবে বলছিল'। লক্ষ্য করুন, কিভাবে হাসিনা সাফাই গেয়ে ভারতীয়দের এ ধরনের একটি অপমানজনক আচরণকে শুদ্ধ করার অপকৌশল অবলম্বন করলেন। ভারতীয়দের রাজনৈতিক ভ্যোকাবুলারিতে যদি মুখ্যমন্ত্রী শব্দটি থেকে থাকে 'প্রধানমন্ত্রী' শব্দটিও তো তাদের ভ্যোকাবুলারিতে রয়েছে। একথা কি কেউ ভুলতে পারেন। অর্থাৎ ভারতকে তুষ্ট করার জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত এবং কোন কিছুতেই তার আপত্তি নেই, এমনকি যদি তা বাংলাদেশকে হেয় বা অপমান করার জন্যও করা হয়।

আমাদের সংবিধানে বলা আছে, সকল নির্বাহী আদেশ রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত এবং কার্যকর করা হয়। আমাদের রাষ্ট্রপতি একজন সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে সমাজের সর্বস্তরের লোকের কাছে পরিচিত ও স্বীকৃত। যে কোন ব্যক্তিরই কোন না কোন সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের তেমন সীমাবদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক– তথাপি সাহাবুদ্দীন আহমদ যে একজন সজ্জন ব্যক্তি একথা দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ একবাক্যে

www.pathagar.com

স্বীকার করবেন। এবং মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, তাঁর এই সর্বজনগ্রাহ্যতা ও মান্যতাকে পুঁজি করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য বেছে নেন তখন তিনি বাহবা কুড়াবার আশাতেই এ কাজটি করে ছিলেন। যেমনটি তাঁর পিতা যখন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করার সময়ে বাহবা কুড়াবার চেষ্টা করেছিলেন এ কারণে যে, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন এবং একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গিয়ে তিনি বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করে বিশ্বময় জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল সেই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথেও শেখ মুজিবুর রহমান সৌহার্দপূর্ণভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ চালিয়ে যেতে পারেননি। সংবিধানে যেখানে সাধারণ ক্ষমার পরিপূর্ণ অধিকার রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত রয়েছে সেখানে শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংবিধান লংঘন করে তিন তিনবার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন তার নিজের নামে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এ বিষয়ে ঘোরতর ঘরোয়া আপত্তি তুলেছিলেন। এ ঘটনা এক পর্যায়ে তাদের উভয়ের সম্পর্কটি এমন শীতল স্তরে নিয়ে যায় যে, শেষ পর্যন্ত আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে সরে যেতে বাধ্য হন। সে সময়ে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পত্র-পত্রিকাগুলো বিশেষ করে 'গণকণ্ঠ' এই চাঞ্চল্যকর বিষয়টি নিয়ে যখন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর অনুকূলে ব্যাপক জনমত তৈরী কয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল তখন শেখ মুজিবুর রহমানের ধমকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিশ্বে ঘুরে বেড়াবার দায়িত্ব নিতে বাধ্য হন।

মাহবুব উল্লাহ :

আবু সাঈদ চৌধুরীর মত ব্যক্তিত্ব, যিনি ইন্তেকাল করেছেন তাঁর সম্পর্কে অবশ্য মন্তব্য করতে আমাদের যথেষ্ট সাবধান হতে হবে এবং তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য যতটা না করা যায় ততটাই ভাল– আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমাদের দেশের এটা কি একটা দুর্ভাগ্য নয় যে, খুব বড় মাপের মানুষ হিসেবে আমরা যাদেরকে দেখি, যাদের প্রতি আমাদের একটা প্রত্যাশা থাকে, শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাদের সেই বড় পরিচয়টা ধারণ করে রাখতে পারেন না?

আফতাব আহমাদ :

আমার মনে হয় আবু সাঈদ চৌধরী সম্পর্কে কথাটা এভাবে না বলে আমি বলব যে, আবু সাঈদ চৌধুরী উদার হৃদয়ের অত্যন্ত সংবেদনশীল একজন মানুষ ছিলেন, আপনিও তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে, ব্যক্তিগভাবে জানেন, আমিও তেমনভাবে জানতাম। বঙ্গভবনে বহুবার তাঁর সাথে একান্তে আলাপ করার আমার সুযোগ হয়েছিল, যতদিন তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন। পরিস্থিতিটা এমন ছিল আপনি জানেন যে, ঐ সময়ে পত্র-পত্রিকা শিরোনাম দিয়ে বলেছে– আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা বিভিন্ন সমাবেশের উক্তি 'বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে টু শব্দটি করলেন জিভ টেনে ছিঁড়ে কুকুরকে খাওয়ানো হবে'। দেশময় একদিকে রক্ষী বাহিনীর অত্যাচারেব বিভীষিকা অন্যদিকে যে দলীয় ঠ্যাঙ্গাড়ে ও ঝটিকা বাহিনীসমূহের দ্বারা যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল তাতে আবু সাঈদ চৌধুরী যে পারিবারিক ও কালচারাল পরিবেশে বড় হয়েছেন, তার সামনে সাময়িকভাবে চুপ করে যাওয়া ছাড়া বোধ হয় আর কোন উপায়ও ছিল না। আমি প্রসঙ্গটা ইচ্ছে করেই আজকে এখানে টেনে আনলাম এই জন্য যে, আজকে ঠিক অনুরূপ আরেকজন বিচারপতি যিনি আমাদের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং যাঁর তত্ত্বাবধানে '৯১-এ এদেশের প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সাহাবুদ্দীন আহমদকে কিন্তু আজকে ক্ষমতাসীন দল আর সহ্য করতে পারছে না। সজ্জন ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করে যে বাহবা প্রধানমন্ত্রী কুড়াতে চেয়েছিলেন, সেটি এখন বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

কারণ আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ জাতির বিবেক হিসেবে নানা ধরনের উক্তি নানা সময়ে করছেন, যারা বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। তাঁর বহু উক্তিতে ক্ষমতাসীন দল বিব্রতবোধ করছে। আমরা যে সমস্ত তথ্য ক্ষমতাসীন মহল থেকে ইতোমধ্যে পেয়েছি, তাতে আমরা দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, তারা সাহাবুদ্দীন সাহেবকে প্রেসিডেন্ট পদে আর দেখতে চান না। এর আরেকটি বড় প্রমাণ হচ্ছে সম্প্রতি এদেশের একটি পত্রিকা বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে নানা ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এমনকি শিষ্টাচার বহির্ভূত ভাষায় আক্রমণ করে প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনাম ছেপে হেয়পতিপন্ন করার চেষ্টা করছে। একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে একটি পত্রিকায় যখন পার্সোনাল অ্যাটাক করা হয় এবং যখন কুশ্রী ভাষায় গালাগাল করা হয়, তখন প্রজাতন্ত্র কিছু করছে না। প্রজাতন্ত্রের এটর্নী জেনারেলের অফিস কিছুই করছে না। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কিছু করছে না। এ থেকে কি বোঝা যায় না যে, এই পত্রিকায় যা কিছু লেখা হচ্ছে সেটি ক্ষমতাসীনদের ইশারায় হচ্ছে? আজকে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনের মানমর্যাদা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে কে? এগিয়ে এসেছে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্ট ঐ পত্রিকার ওপর সুয়োমেটো ইনজাংশন জারি করেছে। প্রধানমন্ত্রীর এটিও পছন্দ হয়নি। হয়নি বলেই প্রধানমন্ত্রী সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার পর যেমন ক্ষুব্ধ হয়েছেন তেমনি সাহাবুদ্দীন সাহেবকে আক্রমণ করার পর সুপ্রীম কোর্ট সুয়োমেটো কেইস করায় প্রধানমন্ত্রী আরও ক্ষিপ্ত হয়েছেন। সে কারণেই বিচারকদের জবাবদিহিতা চাওয়ার নামে আজকে বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে তাঁর এই ক্রোধ।

মাহবুব উল্লাহ :

এখানে সংবাদপত্রের প্রসঙ্গটা এসে গেল। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে কেন্দ্র করে একটি পত্রিকা যে ধরনের কুৎসিৎ রিপোর্টিং করছে, সেই সম্পর্কে আপনি মন্তব্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলো এখন যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করছে তাদের রিপোর্টিং, এডিউরিয়াল বা বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপানোর ক্ষেত্রে। আমরা এটাও লক্ষ্য করছি, সরকারের যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্য থাকে এবং সরকার যদি তাদের কোন অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম গ্রহণ করতে চায়, সেটার আগে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলোতে এক ধরনের সিন্ডিকেটেড রিপোর্টিং করা হয়। আমরা এখন অনেক ধরনের সন্ত্রাসের কথা বলি, তার মধ্যে ইনফরমেশন টেররিজমও এক ধরনের সন্ত্রাসের পর্যায়ে পড়ে। সত্যিকার অর্থে জনগণের স্বার্থের অনুকূলে যে সব জিনিস যাবে সেটা সম্পর্কে পূর্বাহ্নে এমন একটা ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে কিছু কিছু সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে, যার ফলে দেশে গণতন্ত্রের চর্চার ক্ষেত্র বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি, বর্তমান সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে সংবাদপত্রের মধ্যদিয়ে তার পক্ষে একটা জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা দরকার, সেটা যে তিনি তাঁর নিজস্ব অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্য থেকেই বলছেন, সেটা অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু তার সাথে এটাও তো স্পষ্ট যে, আমাদের দেশে এখন বিচিত্র রঙের বিচিত্র সাইজের শত শত দৈনিক, সাপ্তাহিক বেরুচ্ছে। এগুলো যে সব জাতীয় স্বার্থে, রাষ্ট্রের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে কাজ করছে তা বলা যাবে না। সেই প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্রের এক ধরনের যে জবাবদিহিতা দরকার সেটা কিন্তু আমার মনে হয় খুব উড়িয়ে দেয়া যায় না। যারা সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তারা একটা কথা বলেন যে, সাংবাদিকদের জবাবদিহিতা হবে পাঠকের কাছে এবং পাঠকই সংবাদপত্রকে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় নিয়ে আসবে। আমাদের দেশের পাঠক কতটা শক্তিশালী, কতটা এই সমস্ত সংবাদপত্রকে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে পারেন, সেটাও বোধ হয়

www.pathagar.com

মূল্যায়ন হওয়া দরকার। আমি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্র সম্পর্কে কি ধরনের নীতিমালা বা বিধি ব্যবস্থা রয়েছে, সে সম্পর্কে খুব বেশী অবগত নই। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। গতকাল কি পরশু একটি রিপোর্ট বেরিয়েছিল যে, বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো একমত, যদিও দেশের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য প্রশ্নের ব্যাপারে তাদের মধ্যে দ্বিমত লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যের বিষয় হল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারেও সংবাদপত্র বিভিন্ন মতে বিভক্ত। বিশেষ করে দুটো প্রধান মতে বিভক্ত। তো এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রকে কিভাবে আমরা জনগণের পক্ষে আচরণ করার জন্য আরও দায়িত্বশীল করে তুলতে পারি সে ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

আফতাব আহমাদ :

আসলে সংবাদপত্র সম্পর্কে যে মতামতটা আপনি ব্যক্ত করেছেন, এটাকে পুরো বিবেচনায় নিয়ে আমি প্রাথমিকভাবে একটা মন্তব্য করতে চাই। সংবাদপত্র, Media in general যেকোন দেশে বাই নেচার এন্টি এস্টাবলিশমেন্ট। সংবাদপত্রের কাজই হচ্ছে তথ্য অনুসন্ধান করে, উদঘাটন করে সত্যের আরও গভীরে যাওয়া। বাংলাদেশ একটা অনন্য কেইস। দু'টি দিক থেকে বাংলাদেশ অনন্য। ইউনিক। একটা হচ্ছে, এই প্রথম একটি দেশের সংবাদপত্রের সিংহভাগ প্রো-এস্টাবলিশমেন্ট। এটি আর কোন দেশে লক্ষ্য করা যায় না।

মাহবুব উল্লাহ :

কিন্তু আপনি আমাদের সংবাদপত্রকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রোএস্টাবলিশমেন্ট যেমন বলছেন, তখন এবে ঠিক প্রো-স্টেট বলা যাবে কিনা।

আফতাব আহমাদ :

প্রো-স্টেট বলা যাবে কিনা সে প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি। আমাদের প্রিন্ট মিডিয়ার সিংহভাগ পত্রিকাগুলো প্রো-এস্টাবলিশমেন্ট এই অর্থে যে, বর্তমান সরকার বা আওয়ামী লীগ যা কিছু করছে এক শ্রেণীর পত্রিকা বিনা প্রশ্নে তা সমর্থন করছে। এমনকি সরকারের এবং ক্ষমতাসীন দলের অপকর্মের পক্ষে জনমত গঠনেও সচেষ্ট। সরকার যাতে কোন অবস্থাতেই বিব্রত না হয়, সেই দায়িত্বটা নিয়ে বসে আছে এই সংবাদপত্রগুলো। এর মধ্যে হাতে গোনা দু'চারটে কাগজ এই ক্যাটাগরিতে পড়বে না। আরেকটি জিনিস আপনি লক্ষ্য করবেন, বিশ্বের তাবৎ দেশে বিজ্ঞজনরা বাই নেচার এন্টি-এস্টাবলিশমেন্ট এন্ড এন্টি গভর্নমেন্ট। আর বিশেষ করে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হওয়ার কারণে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের যে সাইকোলজি একটা বৃহৎ প্রতিবেশী পাশে থাকার কারণে সৃষ্টি হয়, সেখানে আপনি দেখবেন যে, বিজ্ঞজনেরা প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎ এবং লাভালাভ– এগুলো নিয়ে খুব বিচলিত ও চিন্তিত থাকেন। বাংলাদেশ এর একমাত্র ব্যতিক্রম। এখানে বিজ্ঞজনদের মধ্যে যারা সামাজিকভাবে একটু পরিচিতি লাভ করেছেন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কারণে এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সিংহভাগের কারনে, তারা কতটুকু বিদ্বান বা তাদের প্রজ্ঞা কতটুকু আছে, সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু পাবলিসেটির তোড়ে, প্রচারযন্ত্রের তোড়ে তারা একেকজন 'মহীরুহ' সম। এরা সবাই সমস্বরে প্রো-এস্টাবলিশমেন্ট এবং প্রো-গভর্নমেন্ট এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তাজনিত কোন বিষয়েই এরা চিন্তিত বা উৎকণ্ঠিত নন। বরং যেসব প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে যেসব পদক্ষেপ নিলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হয়, সেসব প্রতিষ্ঠান এবং সেসব পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে সমানে তারা কলম চালাচ্ছেন। এই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হল, এর একটা পটভূমি আছে। আপনার তো জানা আছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারা অহর্নিশ কাজ করে চলেছে এবং বাংলাদেশ

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের বিলুপ্তি যে সভ্যতা ও মানবতাবিরোধী ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের লালিত একটি বিশেষ মহল কামনা করে, এ সম্পর্কে তো আমাদের কোন সন্দেহ নেই। আজকে সরাসরিভাবে, এই মুহূর্তে আপনি যে বলছেন, ডিজোলিউশনের কথা সেদিকে যদি বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়া নাও যায়, এই সাড়ে ১২ কোটি লোকের দেশটিকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের বৃহৎ ও অসৎ প্রতিবেশী ভারত যাতে তার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করতে পারে, তার জন্য দু'টি বিষয়ের ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত অনেক আগেই ওরা গ্রহণ করে রেখেছে তা আমরা জানি। প্রথমত প্রতিরক্ষা, দ্বিতীয় পররাষ্ট্রনীতি। এই দুটো জিনিসকে তারা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সরাসরি অঙ্গীভূত করার আগে। যেটাকে আমি ইতোমধ্যে নানা সময়ে ভূটানীকরণ বলে অভিহিত করেছি। বাংলাদেশের এই ভূটানীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম কাজ হচ্ছে, প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে নিজেদের অবস্থানটাকে সুদৃঢ় করা এবং রাষ্ট্রঘাতী ভূমিকায় অবতীর্ণ করানো। দেশের স্বার্থের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ভারত পক্ষে ওকালতি এবং নিবিড়তর দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নামে ভারতের সব রকমের কনসেশন দেয়ার ওকালতি করানো হচ্ছে এ পত্রিকাগুলোর প্রধানতম কাজ। আমাদের পত্র-পত্রিকাগুলো মানুষের স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়েই অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু নিত্যদিনের যে সংকট মানুষ মোকাবিলা করছে, সেগুলো নিয়ে তারা খুব একটা বিচলিত নয়। আপনার মনে আছে, চিরকাল যিনি ক্ষমতার কৃপায় পুষ্ট হয়ে এসেছেন, সেই কবি, আমাদের দেশের একজন কবি, তার নাম শামসুর রহমান। তার বাসায় একটা ঘটনা ঘটেছে তার পুত্রবধূকে কেন্দ্র করে। সেটাকে আমাদের পত্রিকাগুলো এমনভাবে প্রচার দিল যে, মনে হল, এখানে কোত্থেকে আফগান তালেবানরা এসে পড়েছে। লাদেন বুঝি বাংলাদেশে বসেই আফগান যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই বোধ হয় বাংলাদেশ তালেবানদের দখল হয়ে যায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের বহু খবর অতীতেও আপনি লক্ষ্য করেছেন, ছাপানো হয়েছে। এর লক্ষ্য একটাই– সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটা অন্যদিকে পরিচালিত করা। আপনি জানেন যে, ইয়াসমিন নামে একটি মেয়ে পুলিশী হেফাজতে ধর্ষিত ও নির্যাতিত হয়ে নিহত হয়েছিল। সেটাকে কেন্দ্র করে কী তুলকালাম কাণ্ড আমাদের পত্রিকাগুলো করলো। কিন্তু এই সেদিন সীমা চৌধুরী পুলিশের কাস্টডিতে যেভাবে নিহত হল, ধর্ষিত হল, তার ব্যাপারে কোন ধরনের শোরগোল সংবাদপত্রগুলো করলো না। তুহিন নামে একজন তরুন থানা-হাজতে জুতোর ফিতা দিয়ে গলায় ফাঁস পরে আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ কাস্টডিয়াল কিলিং-এর অভিযোগ থেকে বাঁচতে চায় তখন এই পত্রিকাগুলো নীরব। এটা নিয়ে কোন হৈ চৈ নেই। কয়দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে জনৈক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির একটা অভিযোগ আনা হল, তারপর এই পত্রিকাগুলোর ভূমিকা আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। এর পাশাপাশি কিছু নষ্ট প্রকৃতির এনজিও যারা আছে, তাদের শিরোমনিদের অন্যতম ছিল গণসাহায্য সংস্থা। এই গণসাহায্য সংস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সে সময়ে যেভাবে নেমেছিল এবং যে পত্রিকাগুলোর কথা আমরা আজকে আলোচনা করছি– ঐ পত্রিকাগুলো গণসাহায্য সংস্থাকে যেভাবে কাভারেজ দিয়েছিল, আজকে গণসাহায্য সংস্থার প্রধান নির্বাহী ফ র ম হাসান নিজে যখন যৌন কেলেংকারির অভিযোগ অভিযুক্ত, নারী নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত, তার ব্যাপারে এই পত্রিকাগুলো সেই অবস্থানটা নিচ্ছে না। অর্থাৎ সমাজের নানা স্তরে নানা পর্যায়ে যারা বাংলাদেশকে লিকুইডেট করার অনুকূলে কাজ করে তাদেরকে পাহারা দেয়াই এই পত্রিকাগুলোর একটি দায়িত্ব। তাদের ভাবমূর্তি গড়ে তোলাই এই পত্রিকাগুলোর কাজ। এই পত্রিকাগুলোকে তাই কোন অবস্থাতেই প্রো-স্টেট বলা যায় না। আর বাংলাদেশকে যারা সংরক্ষণ করতে চায় এবং আওয়ামী ঘরানার ভারতপন্থী রাষ্ট্রঘাতী চিন্তার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে যারা দেশ, জাতি ও জনগণের কথা বলতে চায় তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী বা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী বলে চিহ্নিত করে এসব

www.pathagar.com

পত্রিকাগুলো প্রচার চালাবার একটা অপকৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। আপনি জানেন, ইনকিলাব গত মে মাসে জাতীয় নিরাপত্তার উপরে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। যে বৈঠকে বাম জোটের তিনজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন ও হায়দার আকবার খান রনো এবং জাসদের হাসানুল হক ইনু। তারা তাদের সুচিন্তিত মতামত স্বাধীনভাবে সেই গোলটেবিলে উপস্থাপন করেছিলেন। এটি হয়ে গেল তাদের বড় অপরাধ। কেন তারা ইনকিলাবের গোলটেবিলে গেলেন।

ইনকিলাবের গোলটেবিলে এসে রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো– তারাতো ইনকিলাবের বক্তব্য বলেননি। তারা তাদের নিজেদের বক্তব্য বলেছেন। কিন্তু কেন তারা এসেছেন মতবিনিময় করতে, কেন তারা গোলটিবিলে অংশগ্রহণ করেছেন, এজন্য অন্যান্য পত্রপত্রিকা সমানে তাদের তিরস্কার করে তাদেরকে নব্য রাজাকার বলে গালাগালি দিয়ে লিখে যাচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, রাশেদ খান মেনন বা হায়দার আকবর খান রনো যে বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যের সমালোচনা যে কেউ করার অধিকার রাখে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট গোলটেবিল বৈঠকে কেন গেল, ঐ যাওয়াটাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে যখন তাদেরকে আক্রমণ করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, এর একটা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি আছে এবং এই দুরভিসন্ধিটা বোঝার জন্য আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। আপনি জানেন যে, পাশ্চাত্য দেশেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা কেউ যখন বলে বা সংবাদপত্রের বস্তুনিষ্ঠতার কথা যখন কেউ বলে, তখন মনে রাখতে হয় যে, সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে দু'টি মাত্রার বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। একটি হচ্ছে সংবাদপত্রের মালিকের মাত্রাটি আরেকটি হচ্ছে সাংবাদিকরা যে দায়িত্ব পালন করেন সেই মাত্রাটি। মালিকের নানা ধরনের কনট্যাক্টস থাকে, লিংকেজেস থাকে, সেন্টারস অব পাওয়ার্সগুলোর সাথে তাকে নানাভাবে ইন্টার অ্যাক্ট ও কোঅর্ডিনেট করতে হয়– সেজন্য মালিকের অবস্থানকে ভিন্নভাবে পরিমাপ করতে হবে। কিন্তু অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে সাংবাদিকরা যে আপেক্ষিক স্বাধীনতা ভোগ করেন তাকে বিবেচনা নেয়ার আগে যে বৈরী ও প্রতিকূল পরিবেশে তাদেরকে যে দায়িত্ব সম্পাদন করতে হয় তা বিস্মৃত হলে চলবে না। সাংবাদিকদেরকে অনেকটা গভীর সমুদ্রে হাঙ্গর ও কুমিরের মাঝখান দিয়ে সাঁতার কেটে পার হওয়ার মত দক্ষতা অর্জন করে দায়িত্ব সম্পাদন করতে হয়। সাংবাদিকদের সংগে তাই এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে আসেন বিদ্বৎজনরা। সমাজে এই গুরুদায়িত্ব পালন করে বিদ্বৎজনা। আমাদের দেশে আমাদের বিদ্বৎজনরা এখন যেভাবে, যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তাতে এটা স্পষ্ট যে, একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতের পক্ষে বলতে হবে। এর বিরুদ্ধে যদি আপনি যান, তাহলেই আপনি রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত হবেন। আজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংজ্ঞা হচ্ছে আওয়ামী লীগের বন্দনা, মুজিবের নামে স্তোত্র পাঠ এবং ভারতের প্রশংসাভজন করা। এই যে আওয়ামী পৌত্তলিকতা এর মর্মকথা হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে ভারত তোষণ ও ভজননীতি অনুসরণ করে চলা, ভারত সম্পর্কে কোন ধরনের সন্দেহ পোষণ বা কটূক্তি করা যাবে না। পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যে রাষ্ট্র এইভাবে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে তার ওপর সবকিছু ছেড়ে দেয়। বাংলাদেশে বর্তমান রাষ্ট্রঘাতী চক্র ক্ষমতায় এসে একটি কথাই প্রমাণ করতে চাইছে– বাংলাদেশের স্বার্থ বাংলাদেশের মানুষ যতটা বেশী না দ্যাখে তার চেয়ে বেশী দ্যাখে ভারতীয়রা।

এই রকম পরিস্থিতিতে আপনি সংবাদপত্রের জবাবদিহিতার যে ইস্যুটা আনলেন, তা গভীর তাৎপর্য বহন করে। আমাদের জনগণ বোকা নয়। সংবাদপত্রগুলোর চরিত্র তাদের কাছে ইতোমধ্যেই ধরা পড়ে গেছে। তাই আমি এই ক্ষেত্রে বলব যে, এটি সংবাদপত্রের ওপরই ছেড়ে দেয়া উচিত, আমরা যদি গণতন্ত্র চর্চা করতে চাই। কারণ, স্বীকার করতেই হবে সিংহভাগ সংবাদপত্র যদিও ভারতপন্থী মনোভাব গ্রহণ করে বসে আছে তাতে কিছু আসে যায় না। সংখ্যালঘু যে সংবাদপত্রগুলো ভারতবিরোধী ভূমিকা নিচ্ছে বা মতামত ব্যক্ত

www.pathagar.com

করছে, যদি তারা সেই মতামত ব্যক্ত করতে পারে, তাই যথেষ্ট। আজকে দেখা গেছে যে, প্রিন্ট মিডিয়ার একটা বিপুল অংশ বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে কথা না বলা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় দু'চারটি কাগজ যে কথা বলছে, এটিই প্রধানমন্ত্রীর শিরপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন ধরুন ট্রানজিট সম্পর্কে বা যেমন ধরুন, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে ফেলতে এই সরকার অশোক লেল্যাণ্ড সামরিক যান বা মিগ টোয়েনটিনাইন ক্রয়ের মধ্য দিয়ে নিতে যাচ্ছে, এগুলো সম্পর্কে যে দু'চারটি পত্রিকা তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে বা করে যাচ্ছে এর ফলে কিন্তু একটা বিরাট জনমত তৈরী হয়েছে। যে জনমতকে এই সরকার উপেক্ষা করতে পারছে না। এই জনমতকে সরকার ভয় পাচ্ছে।

মাহবুব উল্লাহ :

১৯৪৭ এর পরে সব সময়েই দেখা গেছে, সরকারসমর্থক সংবাদপত্রের সংখ্যা অনেক বেশী। সরকারের বিপক্ষে একটি বা দু'টি। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময়ে মাত্র একটি পত্রিকা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছিল। এমনকি যখন বাংলাদেশ আন্দোলন যখন গড়ে উঠছে তখনও খুব বেশী সংখ্যক সংবাদপত্র এই বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগণের যেটা আকাঙক্ষা, সেটা বিজয়ী হয়েছিল। আমার নিজের ধারণা, আজকে যারা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে, জাতীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ও ভারতের পক্ষে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দুঃখজনক, ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করছে, তাদের সেসব চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, শেষ বিচারে জনগণই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিচারক এবং জনগণের আদালতে রায় সবচেয়ে বড় রায়। সে রায়ে এই সমস্ত বিদেশী রাষ্ট্রের অনুগত সেবাদাসদের পরাজয় অনিবার্য।

আফতাব আহমাদ :

আপনি ঠিকই বলেছেন। মুজিব আমলের আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধেও একটি মাত্র পত্রিকা 'গণকণ্ঠ' সোচ্চার ছিল। গণকণ্ঠে কণ্ঠরোধ করেও কিন্তু আওয়ামী রাজত্বকে চিরন্তন করা সম্ভব হয়নি। এখানে আমি প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলতে চাই। সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমরা জানি যে, ক্ষমতাসীনরা দলীয়করণের ব্যাপারে কোন বাছবিচার করছে না। সংবাদপত্রের জবাবদিহিতার অন্যতম একটা ফোরাম কিন্তু প্রেস কাউন্সিলকে পর্যন্ত দলীয়করণের ব্যাপারে তাদের কোন অনীহা নেই। করেছেও তারা। প্রেস কাউন্সিল বিদ্যমান এবং আদালতের দ্বারও উন্মুক্ত। যে কোন নাগরিক সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারে। এতদসত্ত্বেও আজকে যখন প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তুলছেন সংবাদপত্রের জবাবদিহিতার, তখন বুঝতে হবে তিনি চাচ্ছেন একটি অনুগত, গৃহপালিত ও পদলেহী প্রিন্ট মিডিয়া বা মুদ্রণ মাধ্যম। তার এই উচ্চারণে বাকশালী প্রেতাত্মার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মাত্র। ইলেকট্রনিক মিডিয়াতো তিনি দখল করে বসেই আছেন, তার দল আর তার পরিবারের প্রচার ছাড়া অন্য কিছুই ঠাঁই পাচ্ছে না। এখন তিনি চান, যারা ভিন্ন মতাবলম্বী অর্থাৎ, তার সাথে যারা একমত নন, এ ধরনের যে দু'টি, তিনটি বা চারটি পত্রিকা আছে– এই পত্রিকাগুলোকে বন্ধ করে দিতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এদেশের মানুষ তা হতে দেবে না এবং ঐ ধরনের পরিস্থিতি মেনে নেবে না। 'গণকণ্ঠ'কে বন্ধ করে '৭২-৭৫-এর আওয়ামী দুঃশাসনকে যেমন টিকিয়ে রাখা যায়নি, আজকে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছে যেসব পত্রিকা– সেই পত্রিকাগুলোকে দলন করেও এদের রাষ্ট্রঘাতী তৎপরতায় জয়ী হবে না।

www.pathagar.com

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

বাংলাদেশে ভারতীয় পুলিশের অনুপ্রবেশ

মাহবুব উল্লাহ :

গত ২৬ আগস্ট, ১৯৯৯ বিবিসির সান্ধ্য অধিবেশনে একটি খবর প্রচার করা হয়। এই খবরটি যে কোন শ্রোতারই বিশেষ করে সেই শ্রোতা যদি বাংলাদেশী হন এবং বাংলাদেশকে ভালবাসেন, বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চান-তার কাছে অত্যন্ত ভয়াবহ মনে হবে। খবরটি ছিল এই যে, অসম পুলিশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পশ্চিম বঙ্গ পুলিশের সহায়তায় অভিযান চালিয়ে ৩০ কেজি আর ডি এক্স বিস্ফোরক উদ্ধার করে এবং অসম পুলিশের এই সাফল্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল মহান্ত অত্যন্ত গর্বের সাথে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেছেন, অসম পুলিশের এই অভিযানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছে। খবরে আরও বলা হয়, ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রফুল্ল মহান্তের এই সাংবাদিক সম্মেলনের কথা শোনার পর কিছুটা বিরক্ত হয় এবং এতে যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে– একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করে তারা বলেন যে, প্রফুল্ল মহান্তের এই ধরনের মন্তব্য করা সঠিক হয়নি। বস্তুত এই ঘটনাটি ভারতও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সম্পর্ককে যতখানি প্রভাবিত করেছে, অন্য কোন ঘটনা ততখানি করেনি। বাংলাদেশের জনগণের দৃষ্টিতে এর চাইতে বড় ঘটনা সাম্প্রতিকালে আর ঘটেছে কী-না সন্দেহ আছে। আমরা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম যে, বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ অনভিপ্রেত ও আনপ্রভোক্‌ড হামলা চালাচ্ছে। এসব ঘটনা ঘটেছে কুষ্টিয়ায়, পঞ্চগড় সীমান্তে, ফেনীর মুহুরীর চরে। গত দু'চারদিনে আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে, ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া রাজশাহী সীমান্তেও অনুরূপ সংঘর্ষের খবর প্রচার করেছে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলো খবরটা এড়িয়ে গেছে অথবা খবরটা তাদের দৃষ্টিতে আসেনি। পরবর্তীকালে জানা গেলো যে, অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছিল ১৩ অগাস্ট, ১৯৯৯ এবং এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে ১৭ অগাস্ট। এর এক সপ্তাহ পরে ভারতীয় হাইকমিশনারকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয় পরিস্থিতি ব্যাখ্যার করার জন্য। প্রশ্ন হচ্ছে, অনুপ্রবেশের ঘটনাটা ঘটল ১৩ অগাস্ট, বিবিসি এ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রচার করলো ২৬ অগাস্ট এবং 'আনন্দবাজার' এই নিয়ে একটা বিশাল সম্পাদকীয় ফেঁদে বসেছিল ১৭ অগাস্ট। অথচ ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করা হল ২৮ অগাস্ট।১৭ অগাস্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় খুব স্পষ্ট অক্ষরে যখন বর্ণনা করা হল কিভাবে অসম পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এই অভিযান পরিচালনা করেছে, তারপরেও বাংলাদেশ সরকারের ঘুম ভাঙেনি। সকলেরই জানা এবং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের জনগণের করের পয়সায় বিদেশে বিভিন্ন মিশন ও দূতাবাসগুলো চালিয়ে থাকে এবং এই মিশন ও দূতাবাসগুলোর দায়িত্ব হল সরকারকে ঐসব দেশে কী সব ঘটনা ঘটছে, সেসব দেশের পত্র-পত্রিকায় কী ধরনের খবর প্রকাশিত হচ্ছে, বাংলাদেশ সম্পর্কে তারা কী মন্তব্য করছে–সে সম্পর্কে অবহিত করা। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় আমাদের দূতাবাস, বিশেষ করে কলকাতায় আমাদের ডেপুটি হাইকমিশনার কী কাজ করছেন?

সম্প্রতি আরও অভিযোগ উঠেছে যে, বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের ভারতঘেঁষা নীতির ফলে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বিশেষ করে যেসব বিষয় ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর সম্পর্কের সৃষ্টি করবে, সেসব ব্যাপারে তারা আগ্রহী বা

www.pathagar.com

উদ্যোগী হয়ে কোন রিপোর্ট তৈরী করা বা সরকারকে কোন পদক্ষেপ নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারে খুব একটা ভরসা পান না এবং এই অভিযোগ বাংলাদেশেরই বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি এটাও প্রকাশিত হয়েছে যে, যেসব দেশপ্রেমিক অফিসার কিছুটা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এ ব্যাপারে তাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে চান, সরকারের নীতিনির্ধারকদের দিকনির্দেশনার জন্য তথ্য এবং উপাত্ত হাজির করার চেষ্টা করেন, তাদের বাঁকা দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং এদের অনেককেই ভিকটিমাইজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয় তাঁরা ভিন্ন দলের লোক, সেই জন্য তারা এই ধরনের মনগড়া রিপোর্ট হাজির করছেন। সুতরাং সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক।

আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় বের হয়েছে তার ভাষা অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ওপর একটা বিশাল আঘাত। আমরা কেউ যদি মনে করি যে, এই ধরনের সম্পাদকীয় একটা বিশেষ পত্রিকার মত, তাহলে ভুল করা হবে। আনন্দবাজার পত্রিকার সাথে ভারতীয় শাসক মহলের মনোভাবের যে বেশ মিল আছে, এটা বোধহয় অস্বীকার করা যাবে না। আনন্দবাজার যে শুধু এবারই বাংলাদেশের সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেছে তা নয়। বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে অসম পুলিশের অভিযানকে তারা যে শুধু সাধুবাদ জানিয়েছে, তাই নয়–যেটা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপের শামিল–এর আগেও তাদের পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকায় তারা বাংলাদেশ সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করেছে। তাদের 'দেশ' পত্রিকা এর আগে বাংলাদেশকে 'তথাকথিত বাংলাদেশ' বলে মন্তব্য করেছিলো। যে কারণে তৎকালীন বাংলাদেশের বিএনপি সরকার 'দেশ' পত্রিকাটি সাময়িকভাবে বাংলাদেশে আনা নিষিদ্ধ করেছিল। এছাড়া ১৯৯১-এ যখন এদেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয়ে গেল, সারা দেশবাসী যখন এই গণতন্ত্রের বিজয়ে উদ্বেল, সেই সময়ে 'আনন্দবাজার' ওকালতি করেছিল এই বলে যে, এখন বাংলাদেশবাসীর উচিত হবে ভারতের সাথে একীভূত হয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসা। সুতরাং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 'আনন্দবাজার' পত্রিকার একটা কনসিসটেন্ট পলিসি হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে আঘাত করা এবং এবারকার সম্পাদকীয়তে নির্লজ্জভাবে তারা যেসব বক্তব্য হাজির করেছে, তাতে মনে হয় না যে, তারা বাংলাদেশকে একটা পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মনে করে। এর বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে প্রচণ্ড জনমত সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ এর নিন্দা করেছেন। দেশের বুদ্ধিজীবী মহল এ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এই ধরনের মন্তব্য যে দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে যখন দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নানা ধরনের উত্তেজনা বিরাজ করছে। দু'দেশের মধ্যকার অমীমাংসিত সমস্যাগুলো যখন মানুষের মনকে এজিটেড করছে, ঠিক সেই মূহূর্তে এই সম্পাদকীয় প্রকাশ অত্যন্ত সিগনিফিকেন্ট এবং এটার উদ্দেশ্য, গভীরতা এবং পরিণতি কী হতে পারে এবং কিভাবে বাংলাদেশের মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে, সেই ব্যাপারে এখন অত্যন্ত যত্ন সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করার সময় এসেছে বলে আমার মনে হয়।

আফতাব আহ্মাদ :

'আনন্দবাজার' যে কর্মটি ১৭ অগাস্ট সম্পাদকীয় রচনা করে সম্পাদন করেছে, এটি কোন নতুন ব্যাপার নয়। বাংলাদেশের প্রতি আনন্দবাজারের দৃষ্টিভঙ্গি এদেশের দেশপ্রেমিক নাগরিকদের জানা আছে। ১৯৭২-এ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যে রূপ পরিগ্রহ করছিল, সেটি এদেশের প্রত্যেক আত্মমর্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন স্বাধীনচেতা, মুক্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক মানুষকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল। তাদের সেদিনকার সেই উৎকণ্ঠা, সেই শঙ্কা, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর গতিশীল গৌরবোজ্জ্বল নেতৃত্বর মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল এবং সকলের মনে আছে, সেই সময়ে 'আনন্দবাজার' প্রথম পৃষ্ঠায় মওলানা

www.pathagar.com

ভাসানীকে অর্ধ নগ্ন অবস্থায় দেখিয়ে একটি কার্টুনের মাধ্যমে ব্যাঙ্গ করার চেষ্টা করেছিল। তখনকার সর্বাধিক প্রচারিত বিরোধী দলীয় পত্রিকা 'গণকণ্ঠ'-এ আমরা এর কড়া প্রতিবাদ করি। সরকারের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ আসেনি এবং গণকণ্ঠে এই প্রতিবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদরা এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলো-এর বিরোধিতা করেছিল। আমার এখনও মনে পড়ে, আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সংক্রান্ত একটি সংবাদ 'আনন্দবাজার' কীভাবে ছেপেছিলো। তখন তাঁর পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছিল বাংলাদেশের 'রাজ্যপাল' এবং 'আনন্দবাজারের' এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে 'গণকণ্ঠ'-এ সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। ভারতীয় শাসক গোষ্ঠির কাঙ্খিত বিশাল ভারত বা বিরাট ভারত বা গান্ধীর স্বপ্নের রামরাজ্য ভারত বা নেহরুর স্বপ্নের অখিল ভারত যাকে ব্রাক্ষণবাদীরা ভারতীয় রামরাজ্য বা অখণ্ড ভারত নামে কামনা করে এসেছে, সেই ভারতের স্বপ্নে 'আনন্দবাজার'সহ একাধিপত্য অভিলাষী ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা এখন পর্যন্ত দৃঢ়চিত্তে অবস্থান করে আছে। আনন্দ বাজারের কাছ থেকে আমরা ভিন্নতর কিছু আশা করতে পারি না। প্রণিধান করার বিষয় হচ্ছে যে, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিটা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। অবশ্য ভারত তার অন্যান্য ছোট ছোট প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও এই নীতি অবলম্বন করছে। ভারত সম্পর্ক গড়ে তোলে ভারতীয় রাষ্ট্রের অনুগত এবং কৃপাপুষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এবং প্রয়োজনে এই রাজনৈতিক দলকে বিব্রত করতেও সে পিছপা হয় না।

১৭ অগাস্টের আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে ভারতীয় শাসক চক্র এবং ভারতের এস্টাবলিশমেন্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, ভারতের নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লেষ আছে–এমনটি মনে হলে প্রয়োজনে প্রতিবেশীর অভ্যন্তরে সরাসরি হস্তক্ষেপ চালানো যেতে পারে। এমনকি সামরিক অভিযানও চালানো যুক্তিসঙ্গত এবং আনন্দ বাজার ইনফ্যাক্ট এ কথাটিই জোরালোভাবে তার সম্পাদকীয়তে বলার চেষ্টা করেছে যে, প্রয়োজনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যদি সামরিক অভিযান চালাতে হয় ভারতের নিরাপত্তার জন্য তাই করা উচিত। এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই যে, আজকে বাংলাদেশের ভেতরে রাষ্ট্রকে দুর্বল করা রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গকে দুর্বল করা, রাষ্ট্রের প্রতি আস্থাহীনতা সৃষ্টি করা এবং সীমান্তের ওপারের অনুগ্রহপুষ্ট থেকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল যে অবস্থান গ্রহণ করেছে তা আতঙ্কের বিষয় এবং খুবই বিপজ্জনক। আজকের ক্ষমতাসীন দল যেদিন ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, তার পরদিন থেকে বারবার ভারতকে শুধু তুষ্ট করা নয়, আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিপদজ্জনক হতে পারে, আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন সব বিষয় নিয়ে জনসমক্ষে এসে হাজির হয়েছে। যেমন, বাংলাদেশ যেচে গিয়ে বলা শুরু করল যে, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহীদেরকে বাংলাদেশে আশ্রয়-প্রশয় দেয়া হত। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই প্রকাশ্য ঘোষণা দিল, এখন থেকে আমরা আর এই আশ্রয় দেব না। আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করছি, এই যে ভারতের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ এবং আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় রাজশাহীর একটি মসজিদে অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যে যৌথ অভিযান চালিয়েছে তা নিঃসন্দেহে আমাদের ভাবিয়ে তুলছে। এ অঞ্চলের রাষ্ট্র-রাষ্ট্র সম্পর্কের ভবিষ্যৎ বিন্যাস কী হতে পারে তারও ইঙ্গিত এখানে পরিদৃষ্ট। ভারতীয় তথ্য অনুযায়ী অভিযানের ঘটনাটি ঘটে ১৩ অগাস্ট। আনন্দবাজার সম্পাদকীয় লিখেছে ১৭ অগাস্ট। আমাদের দেশের একটি পত্রিকা 'সংবাদ'-এর ১৫ অগাস্ট সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় 'বাংলা-ভারত সীমান্ত জুড়ে সশস্ত্র মৌলবাদী গোষ্ঠি ৫০ শিবির গড়ে তুলেছে' শিরোনামের তিন কলামব্যাপী প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী ও ভারতের স্থায়ী শত্রু একটি রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তে অস্থিরতা সৃষ্টির নতুন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। 'সংবাদ'-এর ২৩ অগাস্ট সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার ফার্স্ট টপের শিরোনাম ছিল 'কেন্দ্রের প্রতি

www.pathagar.com

পশ্চিমবঙ্গ-আইএসআই রুখতে বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন— বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য'। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। খবরটার বিষয়বস্তু হচ্ছে যে, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে আইএসআই ঘাঁটি গেঁড়ে বসে আছে এবং সেখান থেকে ভারতের অভ্যন্তরে গিয়ে নাশকতামূলক কাজ সম্পাদন করে আবার ঘাঁটিতে ফিরে আসে। অতএব, আজকে ভারত সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ঐ ঘাঁটিগুলো নির্মূল করে ফেলা। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলাদেশে আইএসআই'র ঘাঁটি আছে, এটি বাংলদেশের সরকারের জানা নেই এবং হাসিনা সরকারও স্বীকার করে না। দেশের সেনাবাহিনীর কমান্ডও স্বীকার করে না। পররাষ্ট্র সচিবও বলেন যে, আইএসআই'র ঘাঁটি নেই। আবার প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে কথোপকথনে বলেন ঃ 'সিলেট সীমান্তের দিকে ওদের তৎপরতা আছে, শুনতে পাই।' লক্ষ্য করে দেখবেন যে, স্ট্রাটেজিক্যালি খুব ইম্পরট্যান্ট এরিয়াগুলোকে Soften করার জন্য এবং সম্ভাব্য ভারতীয় হস্তক্ষেপকে যুক্তিসিদ্ধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভেতর থেকে পঞ্চম বাহিনী যে ধরনের কাজ করে থাকে, সে ধরনের কাজ আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি। তা না হলে কোন অবস্থাতেই একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং স্বাধীন সরকার যেখানে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতার উপস্থিতি সম্পর্কে কোন প্রমাণ তো নেই-ই, এর অস্তিত্বই এখানে নেই, সেখানে কী করে ভারতকে তুষ্ট করার জন্য এ ধরনের পদলেহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়? বিষয়টি আরও প্রাঞ্জল হবে যদি গত পরশুদিন প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় একটা খবর পাঠ করি। বাংলাদেশ সরকার এবং ভারত সরকার আইএসআই তৎপরতা কীভাবে রোধ করা যায় এবং নির্মূল করা যায় তার জন্য বৈঠকে বসবে। প্রণিধান করার বিষয় হচ্ছে, ভারত থেকে প্রচারিত যে সংবাদ এবং ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, তাতে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, উত্তর-পূর্ব ভারতে আইএসআই তৎপরতা রোধ করার জন্য বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রচেষ্টা কিভাবে নেয়া যায় সে বিষয়টি তারা আলাপ করবেন। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী? বাংলাদেশের ভেতরে আইএসআই'র কোন তৎপরতা নেই। কল্পিত আইএসআই'র তৎপরতা তারা চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে উত্তর-পূর্ব ভারতে। যে উত্তর-পূর্ব ভারতে মুক্তিকামী মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। এটা ভারতের ভেতরকার ব্যাপার। ভারতী কী করে সেটা সামাল দেবে ভারত নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে বিষয়ে। কিন্তু বাংলাদেশকে শুধু ভারতের এই সামরিক অভিযানের সাথে যুক্ত করে ভারত যে তার নিজের শক্তিবৃদ্ধি করছে, তা নয়। যে অখণ্ড সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ রয়েছে সেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে কম্প্রোমাইজ করে কিভাবে ভারতের পক্ষপুটে নেয়া যায়, এটি তারই একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র এবং তারই একটি উদ্যোগ। আনন্দবাজার পত্রিকা যেটাকে আদভানি ডকট্রিন বলছে, এর আগে বলা হত গুজরাল ডকট্রিন, তার আগে ইন্দিরা ডকট্রিন, নেহরু ডকট্রিন– একই জিনিসকে নানা নামে নানা সময়ে পরিবেশন করা হয়েছে। মূলত এর ইসেন্সটা হচ্ছে এককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে মনরো ডকট্রিন ছিল তারই একটি ভারতীয় সংস্করণ-একে আমি বলি প্রভুত্ব ডকট্রিন। প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য কখন কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া দরকার সে অনুযায়ী নীতি কৌশল অবলম্বন করাটাই এই ডকট্রিনের মূল উদ্দেশ্য। আজকে আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে এবং জাতীয় অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। সচেতন হওয়ার জন্য ইতিহাসের দিকে আমাদের একটু নজর দেয়া দরকার। আমরা জানি হিটলার যখন সিদ্ধান্ত নিলেন, ভার্সাই চুক্তি ছিন্নভিন্ন করে ইউরোপে জার্মানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবেন, তখন তিনি ভাবলেন, প্রথমে পাশ্ববর্তী দেশটি গ্রাস করা দরকার। পোল্যান্ডকে গ্রাস করতে হবে এবং এজন্য হিটলার একটা ছুঁতো খুঁজছিলেন। যেদিন পোল্যান্ড আক্রান্ত হয়, সেদিন জার্মানীর পত্র-পত্রিকায় ছাপা হল যে, পোল্যান্ড জার্মানীকে আক্রমণ করেছে এবং সে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জার্মান সৈন্যবাহিনী পোল্যান্ডে অভিযান চালিয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে হিটলারের

www.pathagar.com

নির্দেশে জার্মান কারাগার থেকে কিছু ক্রিমিনালকে পোলিশ সৈন্যদের পোশাক পরিয়ে গুলি করে হত্যা করে পোলিশ সীমান্ত বরাবর জার্মান ভূখণ্ডের দিকে ফেলে রাখা হয়েছিল এবং দেখানো হলো যে, পোল্যান্ড আক্রমণ করেছে, কিন্তু পোলিশ সৈন্যরা জার্মান 'বীর সৈনিকদের' গুলিতে নিহত হয়েছে। ঐ ধরনের একটি কাণ্ড ঘটাবার জন্যই বাংলাদেশকে আজ তৈরি করা হচ্ছে। বাংলাদেশে আইএসআই'র তৎপরতা আছে এবং এই তৎপরতা বাংলাদেশের নিরাপত্তাকেও বিপন্ন করছে এই অজুহাতে আইএসআইকে নির্মূল করার জন্য এবং দু'প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সখ্যভাব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যৌথ অভিযান চালাবার নীল নকশা রচনা করা হচ্ছে। এক কথায়, আমরা যেটা আশঙ্কা করছি, আগাগোড়া ভারতকে তুষ্ট করা শুধু নয়, ভারতের হাতে বাংলাদেশকে সোপর্দ করে দেয়ার যে নীল-নকশা এই রাষ্ট্রঘাতী চক্র দীর্ঘদিন থেকে লালন করে আসছে, তা বাস্তবায়নেরই একটি পদক্ষেপ আজকে নেয়া হচ্ছে মাত্র এই পদক্ষেপকে আমাদের এখনই রুখতে হবে। আজকে ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্টের নামে যা চালু করা হচ্ছে, এটি মূলত হচ্ছে মিলিটারী করিডোর। আইএসআই'র তৎপরতা রহিত করার নামে দু'পক্ষ সামনে যে বৈঠকে বসতে যাচ্ছে, তার মেইন এসেন্স হচ্ছে মিলিটারী কো-অপারেশন এবং জয়েন্ট মিলিটারী অ্যাকশান। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যদি ভারতের হাতের বড়ে হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, তা বলাই বাহুল্য। এ অবস্থা নিশ্চয়ই কোন স্বাধীনতা প্রিয় দেশপ্রেমিক সমর্থন করতে পারে না। এর বিরুদ্ধে জনমত যেমন তৈরি করতে হবে, তেমনি এই ধরনের তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যও আমাদের সকলের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে।

মাহবুব উল্লাহ :

দেখুন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ঐ সম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল 'আডবানীর পথে বুদ্ধদেব'। আদভানী হচ্ছেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই সম্পাদকীয়ের কিছু কিছু জায়গা থেকে উদ্ধৃতি দিলে পাঠকের পক্ষে জিনিসটা যে কতো ভয়াবহ এবং মারাত্মক, সেটা বুঝতে সুবিধা হবে।

আফতাব আহমাদ :

এখানে উল্লেখ করা দরকার, আদভানী হচ্ছেন হিন্দুত্ববাদী বিজেপের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হচ্ছেন কমিনিউনিস্ট পরিচয়ধারী সিপিএমের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যাঁকে জ্যোতিবসুর সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী বলে মনে করা হয়।

মাহবুব উল্লাহ :

সেই সম্পাদকীয়তে বলা হচ্ছে "রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও কি তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রীর মতবাদকে শিরোধার্য করিয়া লইলেন? প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আশ্রয়, প্রশ্রয় ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলায় এল কে আডবানীর দাওয়াই ছিল, যদি সন্ত্রাবসাদীরা ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীদের তাড়া খাইয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় আত্মগোপন করিতে চায়, তবে তাহাদের পশ্চাদধাবন করিয়া ভারতীয় রক্ষীরা প্রয়োজনে সেই রাষ্ট্রের সীমান্ত অতিক্রম করিবে এবং সেখান হইতে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরিয়া আনিবে। তাহার এই দাওয়াইকে 'আডবানী ডকট্রিন' নামেও ডাকা হইয়া থাকে।" তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোন অজুহাতে, যে কোন ছুঁতায় ভারতীয় সামরিক আধাসামরিক বাহিনী বাংলাদেশের সীমান্ত লংঘন করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যে কোন সময়ে তথাকথিত দুষ্কৃতকারীদের ধরার নাম করে ঢুকে পড়তে পারবে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে পারবে। ভারতের এই আচরণ কোন অভিনব

www.pathagar.com

আচরণ নয়। ইতিহাসে এর একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। যেমন– ধরুন, বছর তিনেক আগে নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডুতে প্রবেশ করে ভারতীয় পুলিশ সেখান থেকে ডজন ছয়েক লোককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এনিয়ে নেপালের রাজনীতিতে বিরাট হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল, বিরাট প্রতিবাদ উঠেছিল এবং এমন একটা ঘটনা কোন একটা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে ঘটতে পারে, অন্য রাষ্ট্রের পুলিশবাহিনীর দ্বারা –এটা কল্পনা করাও কঠিন। আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, দিল্লীতে যখন আমি ছিলাম ১৯৮৮ সালে আমার নিজস্ব গবেষণা কাজের উপলক্ষে, তখন বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি রেহমান সোবহান দিল্লীতে একটি সংক্ষিপ্ত সফরে যান। সেখানে তিনি জওহর লাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভাত পাটনায়েকের সাথে একটি সন্ধ্যা যাপন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমি তখন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিলাম। সেই সময়ে ইন্ডিয়ান পীসকীপিং ফোর্স— আইপিকেএফ যেটাকে বলা হয়, তারা রাজীব গান্ধীর নির্দেশে শ্রীলংকার প্রবেশ করেছিল তামিল বিদ্রোহীদের দমন করার নামে। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস, যে তামিল বিদ্রোহীদের ভারতীয়রা দুধকলা খাইয়ে পুষে বড় করেছিল, সেদিন তাদেরকে দমন করার জন্যই ভারতীয় বাহিনী সেখানে প্রবেশ করেছিল। তাদের ওপর ও তামিলদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার ভারতীয়রা চালিয়েছিল, সেসব কাহিনী ভারতের 'Economic and Political Weekly' পত্রিকায় বিশদভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সান্ধ্য আড্ডায় রেহমান সোবহান বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে, কী করে ভারতীয় বাহিনী একদল মুক্তিযোদ্ধাকে দমন করার জন্য সেখানে যেতে পারল। তিনি আরও প্রশ্ন করলেন, এটা কি এরকম ঘটনা নয় যে, ১৯৭১ সালে আমরা যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার জন্য মুক্তির জন্য লড়াই করছিলাম, তখন যদি ভারতীয় বাহিনী এসে আমাদেরকে এ রকম দমন করার চেষ্টা করত, তাহলে ঘটনাটা কি একটা প্যারালাল ঘটনা হত কিনা? তার জবাবে সেখানে উপস্থিত ভারতীয় প্রগতিশীল পণ্ডিতদের অনেকেই বিশেষ করে প্রফেসর প্রভাত পাটনায়েক, যাঁর বাসায় এই অনুষ্ঠানটি ছিল, যিনি নিজেও ভারতীয় সিপিএম অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসিস্টের সাথে সংশ্লিষ্ট তিনিও এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারতীয় বাহিনী যদি শ্রীলংকায় না যায়, তাহলে সেখানে অন্য কোন দেশের বাহিনী গিয়ে প্রবেশ করত।

বিশেষ করে তারা ইসরাইলের কথা উল্লেখ করলেন। তারা এটাও উল্লেখ করলেন যে, মার্কিনীরা হয় তো সেখানে যেতে পারত। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে তারা বললেন, ভারত সেখানে গিয়ে তার নিজের নিরাপত্তাকে রক্ষা করেছে এবং শ্রীলংকাবাসীকেও সাহায্য করেছে। এটাই হচ্ছে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ভারতের হস্তক্ষেপ চালানোর ব্যাপারে তাদের যুক্তি। তাদের আরেকটা যুক্তি হচ্ছে সমগ্র ভারত মহাসাগর ভারতের It's an Indian lake এবং এই ইন্ডিয়ান লেক অর্থাৎ ভারতের এই সরোবরে কারও প্রবেশাধিকার নেই। সেজন্য তারা আন্তর্জাতিক কুটনৈতিক মহলে একটা প্রস্তাব প্রায়ই উল্লেখ করে যে, It's an exclusively Indian zone এবং এখানে অন্য কোন দেশের নৌবাহিনী আসাটা তারা বরদাশত করবে না। সেই জন্য তারা এটাকে Lake of Peace হিসেবে ঘোষণা করার দাবী জানায়। আমাদের যারা পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ বা নিরূপণ করেন, ভারতের এ সমস্ত অভিসন্ধি সম্পর্কে তাদের সজাগ হতে হবে। আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়–মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট গাইয়ুমের বিরুদ্ধে একটা অভ্যুত্থান হয়েছিল, যেটা দমন করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ভারতীয় ছত্রীবাহিনী সেখানে গিয়েছিল। এসব অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের যেটা শিক্ষণীয়, সেটা হল এই যে, আজকে যখন সারা বাংলাদেশ ভারতের হস্তক্ষেপ, ভারতের অবন্ধুসুলভ নীতি, বিভিন্ন ধরনের খবরদারি এবং বাংলাদেশকে প্রায় ইজারা নেয়ার মত একটা পাঁয়তারা হচ্ছে– তার বিরুদ্ধে যখন এদেশের দেশপ্রেমিক নাগরিকরা গর্জে উঠছেন, তখন তাদের বিরুদ্ধে বা তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

আজ ভারত পুলিশী অ্যাকশান নিতে পারে বলে আমরা যদি কেউ সন্দেহ করি, সেটাকে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। ড. আফতাব মনরো ডকট্রিনের কথা বলেছেন। মনরো ডকট্রিনটা হচ্ছে আমেরিকার একটা পলিসি। ১৮২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো মার্কিন কংগ্রেসকে যে বাণী প্রদান করেছিলেন, সেই বাণীকে ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল এই মনরো ডকট্রিন। এর মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, পশ্চিম গোলার্ধ পূর্ব গোলার্ধ থেকে আলাদা এবং পশ্চিম গোলার্ধ ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে যেহেতু ইউরোপের চাইতে পৃথক–সুতরাং ইউরোপের কোন দেশের অধিকার নেই পশ্চিম গোলার্ধে নাক গলানোর। এই যে পশ্চিম গোলার্ধ, যেটাকে নতুন বিশ্ব আর পূর্ব গোলার্ধ যেটাকে পুরাতন বিশ্ব বলা হয়, এই দুয়ের মধ্যে যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক পার্থক্য, সেটাকে ভিত্তি করেই এই মনরো ডকট্রিনের যৌক্তিকতা পেশ করা হয়েছিল। এটা যখন পেশ করা হয় তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া, ফ্রান্স এবং স্পেনের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা করত এবং আশঙ্কা করত বলেই তারা এই ধরনের একটা রাজনৈতিক দর্শন প্রচার করেছে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করত যে, পশ্চিম গোলার্ধে যদি ইউরোপের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে, তাহলে সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পীস অ্যান্ড সিকিউরিটির জন্য একটা থ্রেট বা অবন্ধুসুলভ কাজ হবে। সে সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। আমেরিকা তখন বলতে শুরু করল যে, তারা পাল্টাপাল্টি ইউরোপের ওপর ঐ ধরনের কোন হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করবে না। তখন ইউরোপ দাবী করেছিলো যে, এই ধরনের একটা ঘোষণা একতরফা না হয়ে একটা যৌথ ঘোষণার আকারে প্রবেশ করা হোক। এটাই হচ্ছে কুটনীতির মারপ্যাঁচ। কিন্তু আমেরিকা সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। এমনকি ল্যাটিন আমেরিকারও সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনরো ডকট্রিন তেমন কার্যকর হয়নি। কারণ আমেরিকা সেই সময় সামরিকভাবে দুর্বল ছিল এবং তাদের অনেক ঘরোয়া সমস্যা ছিল।

আমেরিকা ১৮৬৪-তে তাদের সিভিলওয়ার নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সেই সময়ে আমেরিকার ঘরের ভেতর যখন এ রকম একটা অবস্থা চলছে, তার পক্ষে অন্য জায়গায় তার মনরো ডকট্রিন, বিশেষ করে, আশপাশের দেশগুলোতে কার্যকরী করা খুব কঠিন ছিল। কিন্তু যখন আমেরিকা শক্তি অর্জন করল, তখন সে তার মনরো ডকট্রিনটাকে আরও সম্প্রসারিত করল। যে কোন জায়গায়, তারা যেটাকে বলল রং ডুইং অ্যান্ড ইম্পার্টিনেন্স সে জন্য তারা প্রয়োজন হলে ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ ফোর্সের ভূমিকা পালন করবে এবং এই মনরো ডকট্রিনের এক্সটেনশন হয়েছিল প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্টের আমলে ১৯০৪ সালে। পরবর্তী পরবর্তী ২৫ বছর ধরে রুজভেল্ট এই মনরো ডকট্রিনকে ইনভোক করে ইউরোপ যে সমস্ত হস্তক্ষেপ করেছিল,সেগুলোকে বানচাল করে দেয়। আমেরিকা বিশেষ করে তার এই নীতির ব্যাপারে খুব বেশী সেনসিটিভ ছিল ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশগুলোর ব্যাপারে। তার কারণটা হচ্ছে পানামা ক্যানেল। এই পানামা ক্যানেলকে জুড়ে আমেরিকার একটা বিশেষ স্বার্থ ছিল। এটা একটা বাণিজ্য ট্রানজিট রুট এবং এই রুটটাকে প্রটেক্ট করার জন্যই আমেরিকা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তার মনরো ডকট্রিনের পলিসিটা কার্যকর করে। আজকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারত করিডোর চাইছে উত্তরপূর্ব ভারতে যাওয়ার জন্য। আমার মনে হয়, তারা এই করিডার পায়, তাহলে তাদের জন্য এই ধরনের একটি মনরো ডকট্রিনের খুব বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়বে এবং এই ডকট্রিনটাকে আমরা বলতে পারব 'ইন্ডিয়াজ মনরো ডকট্রিন'। যেটা তারা নেপাল, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে, এখন সেটা তারা বাংলাদেশর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টা করছে। আমেরিকার সেই মনরো ডকট্রিনের শিকার হয়েছে কিছু দেশ–এরকম বেশ কিছু ঘটনা আমরা লক্ষ্য করছি। যেমন এই মনরো ডকট্রিনের বলেই ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালা সরকারকে উৎখাত করা হয়েছিল। এরই বলে ১৯৬১ সালে

www.pathagar.com

কিউবাতে বে অব পিগস্-এ অপারেশন চালান হয়েছিল, ১৯৬৫ সালে ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রে অভিযান চালান হয়েছিল। স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে নিকিতা ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন, যেহেতু রাশিয়া অবস্থান করছে, সুতরাং মনরো ডকট্রিন মৃত হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সময়ে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছিল, This principle is as valid today as it were in 1823. সুতরাং আমরা লক্ষ্য করেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই মনরো ডকট্রিন শুধু পশ্চিম গোলার্ধে প্রয়োগ করে তাই নয়, আজকে পূর্ব গোলার্ধের অনেক দেশেও সেটা তারা প্রয়োগ করছে এবং এটা প্রয়োগ করে তারা ইসলাইলকে মদদ দিয়েছিল অ্যান্টিবি বিমানবন্দরে হামলা করার জন্য। সম্প্রতি ওসামা বিন লাদেনকে ধ্বংস করার জন্য তারা আফগানিস্তানে এই ধরনের অভিযান চালিয়েছে। ঠিক এরই সুরে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে লেখা হচ্ছে, "ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দিবার অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার একাধিক বিমানহামলা চালায়নি? ভারতের প্রতিবেশীদেরকেও আজ না হোক, কাল উপলব্ধি করিতে হইবে" ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার শত্রুদের আশ্রয় দিলে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।' এই বক্তব্য যে কত ন্যক্কারজনক, কত নিন্দনীয়, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। অর্থাৎ ভারত এখন হুমকি দিচ্ছে বাংলাদেশের ওপর আমেরিকার অনুসরণে বিমান হামলা চালাবে। তাহলে আমাদের সার্বভৌমত্বের অবস্থা কী হবে, সেটা নিশ্চয়ই পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন।

আফতাব আহমাদ :

ভারত যদি বিমান হামলা চালায়, তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে সেটা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, আমরা যখন আমাদের বিমান বাহিনীকে মিগ-২৯ দ্বারা সজ্জিত করছি। মিগ-২৯ বর্তমানে রাশিয়ার অবসলিট টেকনোলজির একটি অংশ এবং রাশিয়া এগুলোকে জঞ্জাল মনে করে বিক্রয়ের মাধ্যমে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়। অপরদিকে ভারতে মিগ-২৯ সহ অন্যান্য রুশ এয়ারক্রাফটের প্লান্ট আছে। ভবিষ্যতে এগুলোকে চালু রাখতে স্পেয়ার্সের জন্য ভারত আমাদেরকে ডিপেন্ডেন্ট করতে চায়। কাজেই আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে ভারতনির্ভর করে তুলে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাকে কীভাবে নিশ্চিত করছি তা সহজেই অনুমেয়। অশোক লেল্যান্ডের মত অসামরিক যান আমাদের সেনাবাহিনীতে আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। আর মিগ-২৯ তো আমরা ক্রয় করছি রাশিয়ার কাছ থেকে তাদের কমার্স মিনিস্ট্রির মাধ্যমে, এখানে রাশান ডিফেন্স মিনিস্ট্রি ইনভলবড নয়। এই সব ডীলে উৎকোচ ও ঘুষসহ বহু ধরনের দুর্নীতি জড়িত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য আরও দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন আছে, আমি সেটাতে যাচ্ছি না এখন। এতক্ষণ মনরো ডকট্রিন প্রসঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে তার সূত্র ধরেই আমি একটু সংযোজন করতে চাই। রেগ্যানের সময়ে সকলের নিশ্চয়ই মনে আছে, ছোট্ট ক্যারিবীয় দ্বীপ গ্রেনাডায় সামরিক অভিযান চালিয়ে সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান মরিস বিশপকে হত্যা করে সেখানে একটি ক্রীড়নক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ্রীলংকায় ভারতে যে পীস কীপিং ফোর্সের কথা বললেন, এ সম্পর্কে অবশ্য দুটো মত আছে। অফিসিয়ালি ইন্ডিয়ান স্ট্যাবলিশমেন্ট থেকে বলা হয় যে, তামিল বিদ্রোহ দমন করার জন্য সেখানে এই ফোর্স গেছে। আসলে আমি নিজে যতটুকু বুঝেছি এবং তথ্যপঞ্জি দেখে যতটুকু উপলব্ধি করেছি, সেখানে কিন্তু তামিল বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইন্ডিয়ান পীস কীপিং ফোর্স যায়নি। মূলত গেছে সিনহালী জাতিগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ন আরও কঠোরভাবে চালানোর জন্য শ্রীলংকা সরকারকে ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে কাজ করতে বাধ্য করার জন্য। ড. মাহবুব উল্লাহ, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, তখন শ্রীলংকার রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন জুনিয়াস জয়বর্ধনে। তিনি কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও সাহায্য চেয়েছিলেন। প্রকাশ্যে সাহায্য চেয়েছিলেন তামিল বিদ্রোহ দমনের জন্য

www.pathagar.com

যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতা করে। কিন্তু ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে যে সম্পর্ক ও সমঝোতা ছিল, তার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসার আগ্রহ দেখায়নি এবং ভারতীয় পণ্ডিত মহলের যে কথাটা বললেন যে শ্রীলংকায় ভারত না গেলে হয়তো আমেরিকা চলে যেত–ঐ আশংকা তো তাদের মধ্যে ছিলই। ইনফ্যাক্ট ইন্টারন্যালনাল পুলিসিংয়ের যে দায়িত্ব মনরো ডকট্রিনের সুবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট তার বলয়ে পালন করার চেষ্টা করেছে, ভারত ঠিক সেই কাজটি এই অঞ্চলে করার চেষ্টা করছে। একেক সময়ে তাদের একেক সরকার প্রধানের নামে এই ডকট্রিনের মোদ্দা কথা হচ্ছে, ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর ভেতরেও যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, সেই সমস্যার সমাধানকল্পে বাইরের কাউকে আমন্ত্রণ করা যাবে না, আমন্ত্রণ করার আগে ভারতের কাছে সাহায্য চাইতে হবে। ভারতের সম্মতি নিয়েই সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

মাহবুব উল্লাহ :

এখানে আমি একটু যোগ করতে চাই। কিছুদিন আগে মার্কিন সরকার বাংলাদেশের সাথে সোফা (Status of the Forces Agreement) স্বাক্ষর করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়নি। তার মূল কারণটা হচ্ছে, ভারতের পক্ষ থেকে একটা প্রচণ্ড চাপ এসেছিল। ভারত পরিষ্কার বলে দিয়েছিল, ১৯৭১ সালে আমরা তোমাদের এ কারণে সাহায্য করিনি যে, যেখানে আমাদের সৈনিকদের যাওয়ার কথা, তার পরিবর্তে অন্য দেশের সৈনিকরা যাবে। অর্থাৎ মোদ্দা কথা, ভারতীয় চাপের কারণে তখন সোফা সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। আরেকটি ঘটনাও বলা দরকার। কম্বোডিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি প্রিন্স নরোদম সিহানুক কম্বোডিয়ার একজন নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি আমেরিকার পক্ষে যাননি, চীন বা রাশিয়ার পক্ষেও যাননি। ভিয়েতনামের যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, ভিয়েতনামী গেরিলারা যখন আমেরিকান সৈন্যদের তাড়া খেয়ে এসে কম্বোডিয়ার একটি জায়গায় আশ্রয় নিত, সেই অজুহাতে কম্বোডিয়ার ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে মার্কিনীরা। পরিণতিতে কী হয়েছিল, ইতিহাসে তা লেখা আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মত একটি পরাক্রমশালী গোষ্ঠী এই সাধারণ এশীয় নিরন্ন, অভূক্ত যোদ্ধাদের কাছে পরাস্ত হয়েছিল।

আফতাব আহমাদ :

হ্যাঁ, ক্যাম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে মার্কিনীরা আরও যেটা চেয়েছিল, তাহলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্য মেনে নিয়ে মার্কিন সেনা অভিযানে ক্যাম্পোডিয়াও যেন Collaborate করে। কিন্তু প্রিন্স নরোদম সিহানুক তার নিরপেক্ষতা ত্যাগ করতে রাজী ছিলেন না। তাই প্রিন্স নরোদম সিহানুককে তারা উৎখাত করেছিল এবং জেনারেল লনলনের নেতৃত্বে একটি পুতুল সরকার তারা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আপনি ঠিকই ধরেছেন। ভারত সুস্পষ্টভাবে সোফা স্বাক্ষরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কারণে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই তাঁর প্রথম বিদেশ সফরে যখন বেইজিং যান তখন আনন্দবাজার তার এই সফরের সমালোচনা করে সম্পাদকীয় লিখে বলল যে, বেইজিংয়ে কেন আগে? তার সাথে তারা এও উল্লেখ করল যে, চীনদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সামরিক সহযোগিতা আছে তা অনাকাঙ্ক্ষিত। বাংলাদেশের সামরিক সরঞ্জাম বা রসদ যদি প্রয়োজন হয়, ভারত তা অতি সহজেই সরবরাহ করতে পারে এবং বাংলাদেশের উচিত হবে ভারতের কাছ থেকে তা ক্রয় করা। অর্থাৎ ভারতীয়রা যাকে সমর্থন করে, যাকে পোষে, যে দলের সঙ্গে সরাসরিভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পর্ক রাখতে সবসময়ে উদগ্রীব, সে দলকেও তারা বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চায়, 'তোমাদেরকে আমাদের কৃপাপুষ্ট হয়েই ক্ষমতায় থাকতে হবে'।

www.pathagar.com

মাহবুব উল্লাহ :

হ্যাঁ, আপনার এই বক্তব্য প্রসঙ্গে আমি আবারও প্রলুব্ধ হচ্ছি, আনন্দবাজারের সেই সম্পাদকীয় থেকে একটু কোট করার জন্য। আনন্দবাজার লিখেছে, "বাংলাদেশ সরকার এই ঘটনা সম্পর্কে তড়িঘড়ি কোন প্রতিক্রিয়া জানাইবে না। হয় নীরব থাকিবে নতুবা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিবে। তাহার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাই এইরূপ। প্রবল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ খালেদা জিয়া গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি হইতে শুরু করিয়া কলিকাতা-ঢাকা বাস চলাচল চুক্তিকেও দিল্লীর সাথে ঢাকার সার্বভৌমত্ব জলাঞ্জলি দেওয়ার তুল্য বলিয়া উগ্র প্রচার করিতেছেন। আলফা জঙ্গীদের স্বাধীনতা যোদ্ধা আখ্যা দিয়া তিনি বাংলাদেশের মাটি হইতে তাহাদের ঘাঁটি উৎখাত করার প্রকাশ্য বিরোধিতা করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদকে তাই সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়, পাছে ভারতের প্রতি তাহার সরকারের যে কোন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণকে বিরোধীরা ভারতের দালালী বলিয়া অভিহিত করে।" সম্ভবত এটাই হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের কম্পালশন, যে কারণে, আজকে বাংলাদেশ সরকার যখন ভারতের একটি রাজ্যের পুলিশ বাহিনী নির্লজ্জভাবে,বলতে গেলে জোর করে করিডোর প্রতিষ্ঠার মতো একটি ব্যবস্থা করে বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে বলে দাবী করে-তখন মনে হচ্ছে, তাদের সেই উলঙ্গ-নির্লজ্জ কার্যকলাপের প্রতি হাসিনা সরকার প্রকারান্তরে সম্মতিই জানিয়েছে।

আফতাব আহমাদ :

হ্যাঁ, অবশ্যই সম্মতি জানিয়েছে। আমি এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর দু'টি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। একটা হল-আপনি জানেন যে, ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতয় আসার পরপরই ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে ৩০ বছর মেয়াদী একটি পানি চুক্তি সই করেছে ভারতের সাথে। এই চুক্তিতে পানি পাওয়া তো দূরের কথা, লোয়ার রাইপেরিয়ানের যে রাইটস সেগুলোকে যেখানে ডিনাই করা হয়েছে এবং একটা ইন্টারন্যানাল রিভারকে ইন্ডিয়ান রিভারে পরিণত করা হয়েছে, সেই চুক্তির পর গুজরাল সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভবানী সেনগুপ্ত, যাকে 'গুজরাল ডকট্রিনে'র উদগাতা বলা হয়, তিনি শ্রীলংকার কলম্বোতে ১৯৯৭-এর সেপ্টেম্বরে একটি কানফারেন্স একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পেপার প্রেজেন্ট করেন। পেপারের শিরোনাম ছিল-South Asia and Dimensions of Gujral Doctrine. সেখানে তিনি বলছেন, "গুজরাল ডিকট্রিনের সুফল এত চমৎকার যে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের সাথে একটা পানি চুক্তি করা হয়েছে, তেমনি পানি চুক্তির বিনিময়ে ভারত ইতোমধ্যেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ট্রনজিট সুবিধা পেয়ে গেছে।" আমি এই প্রবন্ধ পড়ে তো হতবাক। অবশ্য, পরে আমার ছাত্র-ছাত্রী-যারা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করে, তাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, সিলেট ও রংপুরসহ অন্যান্য সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রচুর ভারতীয় ট্রাক যাওয়া-আসা করছে নিয়মিতভাবে। যদিও ফরমালি সরকারের তরফ থেকে ট্রানজিট বা এ ধরনের কোন সুবিধা ভারতকে দেয়া হয়েছে , স্বীকার করা হয় না। এখানে আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার, যেটা আমার দ্বিতীয় বক্তব্য। ১৯৭২-এর মার্চ মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের ভূমি ত্যাগ করার পরও ভারতীয় বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে মোতায়েন ছিল এবং সেই সময়ে ভারতীয় বাহিনীর সাথে সরাসরি ভারতীয় হেলিকপ্টার গানশীপগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল মিজো, নাগা এবং অন্যান্য মুক্তিকামী জনগোষ্ঠিকে ফ্লাশ আউট করার নামে। অতিসম্প্রতি জেএন ডিক্সিট যে গ্রন্থটি লিখেছেন ঃ Liberation and Beyond সেই গ্রন্থে তিনি অবশ্য ঘুরিয়ে বলেছেন যে, স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমানই চেয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনী এই অঞ্চলে স্বল্পকালের জন্য হলেও যেন থাকে। আমি আমার নিজের ও অন্যান্য পণ্ডিতদের গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে মিলিটারী অপারেশন দীর্ঘদিন ধরে

www.pathagar.com

ভারতীয়রা চালিয়েছিলো এবং আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে, এই সমস্যার জন্ম কিন্তু এই ভারতীয় মিলিটারী অপারেশন্স এর ফলে। একথাগুলো আজকে ক্ষমতাসীনরা স্বীকার করছে না। ১৯৭৪-এর মাঝামাঝি সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার থেকে সব ইন্ডিয়ান কনটিজেন্ট উইথড্র করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরও '৭৪ থেকে' ৭৫-এর আগস্ট পর্যন্ত প্রাইভেট চ্যানেলে বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে অভিযোগ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এগুলোর প্রতি আমরা কি চোখ বন্ধ করে নীরবে হজম করে যাব, না একটা বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চিন্তা-ভাবনা করবো? আমার মনে হয় যে, আজকে দ্বিপাক্ষিকতার যুগ ফুরিয়ে গেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, আজকাল ক্ষমতাসীন দলসহ সবাই গ্লোবালাইজেশনের কথা বলে বেড়ায়। বলা হচ্ছে, আজকে আর দ্বিপাক্ষিকতার যুগ নেই বা একা একা চলার যুগ নেই। আজকে সারাবিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। বিশ্বের সকল দেশের সাথে সহযোগিতা করে চলতে হবে। অথচ নানামাত্রিক যেসব সমস্যা আছে, সেইসব সমস্যাকে বহুমাত্রিকতা বা বিশ্বকাঠামো এবং ইন্টারন্যাশনাল নর্মস বা রুলস-এর মধ্যে ফেলে কিভাবে সমাধান করা যায়, সেই দৃষ্টিভঙ্গি অন্তত ক্ষমতাসীন দল নিতে নারাজ। আমার মনে হয়, আজকে দেশের সকল বোদ্ধা নাগরিক, সকল রাজনীবিদ, রাজনৈতিক দলকে এই বহুপাক্ষিকতার বিষয়টিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্ব দিয়ে হাজির করতে হবে। বিশেষ করে, নিরাপত্তাজনিত বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো ভারতের মত বৃহৎ রাষ্ট্রের দাম্ভিকতার সামনে তাদের নিরাপত্তাকে কিভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে সেটা ভাবতে হবে। সার্ক কাঠামোর মধ্যে নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনার সুযোগ রাখা হয়নি সার্ক সনদে। কিন্তু সেখানে ড্রাগ ট্রাফিকিঙসহ অন্যান্য অপরাধের জন্য ক্রস বর্ডার কো-অপারেশন্স কীভাবে গড়ে উঠবে–এসব বিষয়-আশয় আছে। এই সার্ক গঠনের প্রশ্নেও ভারত যখন মোটামুটি সম্মত হয়, তখন এই চিন্তা থেকে সম্মত হয় যে যে, এখানে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ভারতীয় কুটকৌশল হল দক্ষিণ এশিয়াকে ইন্দো-সেন্ট্রিক ইন্ডিয়া ডমিনেটেড রিজিয়নে পরিণত করে SAARC কে multilateral framework- এর benefits নেয়ার কোন সুযোগ না দেয়া। ইন্দো সেন্ট্রিক পলিসির হাতিয়ার ইন্ডিয়া বেইজড বাইল্যাটারলিজমকে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে এবং প্রয়োজনে ডাইভারশনারি মেজার্স নেয়া দরকার; আঞ্চলিক অন্যান্য গ্রুপিংগুলোর সঙ্গে আমাদের কোলাবরেশন এ্যান্ড কোঅপারেশন ডেভলাপ করা দরকার। আমরা 'APEC'-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারি। ভারত ASEAN- এর অন্যতম ডায়ালগ পার্টনার এবং অচিরেই তারা পূর্ণ সদস্যপদ পেতে যাচ্ছে। সেখানে আমার মনে হয়, বাংলাদেশের আর পিছিয়ে থাকার কোন কারণ নেই। বাংলাদেশের এখনই ASEAN ও 'APEC' সহ আরো ব্যাপকতর অর্থবহ কী ধরনের আঞ্চলিক গ্রুপিং গড়ে তোলা সম্ভব, সেদিকে নজর দেয়া উচিত। আমাদেরকে বৃহত্তর Southern Asia'এর কথা ভাবতে হবে এবং সে লক্ষ্যে নতুন জোট গঠন করা উচিত।

মাহবুব উল্লাহ :

হ্যাঁ, আপনি গ্লোবালাইজেশনের প্রসঙ্গটা উথাপন করে ভাল করেছেন। এই গ্লোবালাইজেশনের সম্পর্কে একটা কথা বলা হয় যে, আজকের দিনে Politics is national and economics is international অর্থাৎ এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে কোন রাষ্ট্র তার জাতীয় পরিচয়, জাতীয় অস্তিত্ব, সার্বভৌমত্ব এগুলো বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক এক্সচেঞ্জ বা International division of labour-এর মধ্যে অংশগ্রহণ করবে-এটা ভাবা যায় না। গ্লোবালাইজেশন সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা আজকে হচ্ছে, সেখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, একদিকে যেমন প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে,

www.pathagar.com

পুঁজি ও শিল্প বিকাশের কারণে আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপ করার ফলে যেভাবে ট্রেড বিকশিত হচ্ছে, তার পাশাপাশি বিভিন্ন জাতিসত্তার জাতীয় আকুতি ও জাতীয় আকাংক্ষা তীব্র হচ্ছে। যার ফলে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কোল্ড ওয়ারের অবসানের পরও পৃথিবীতে বেশ কিছু জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে যদি আমরা গ্লোবালাইজেশনের কথা বলি, তাহলে আমার মনে হয় সেটা সঠিক বলা হবে না। এই জন্য যে, ভারতের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ের। ভারতের চাইতে অনেক বেশী গুণে যাদের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক ও লেনদেন রয়েছে অথবা যারা আমাদের উন্নয়ন সহযোগী তাদের কাছ থেকে কীভাবে গ্লোগালাইজেশনের সুবিধা অর্জন করা যায়, তা আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। বলা হচ্ছে যে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক রচনা করবো একটা আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। সেই উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনীতি অত্যন্ত অবিকশিত একটা অর্থনীতি এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের পার ক্যাপিটা-ইনকাম ভারতের যে কোন অঞ্চলের চেয়ে অনেক কম। কারো কারো মতে এটা একশ ডলারের বেশী নয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনীতি একটা সাবসিস্টেন্স ওরিয়েন্টেড অর্থনীতি। এই ধরনের অর্থনীতির সঙ্গের যোগাযোগ গ্লোবালাইজেশনের পারপাজ সার্ব করবে, এই যুক্তিটি অত্যন্ত হাস্যকর। এই যুক্তি কিছুতেই ধোপে টেকো না। বরং বাংলাদেশ যাদের সঙ্গে গভীর ও ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্পর্ক রচনা করে তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বৃদ্ধি করতে পারে, বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারে অথবা অন্য দেশের শ্রমের বাজারে প্রবেশ করতে পারে তার চেষ্টা চালাতে হবে। আমাদেরকে ASEAN-সহ পৃথিবীর অন্যান্য জোটগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তার মাধ্যমেই আমরা আমাদের অর্থনীতিকে বিকশিত করতে সক্ষম হব। আর অন্যথায় শুধু দ্বিপাক্ষিক বা দ্বিমাত্রিক ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করতে গেলে বাংলাদেশের যা কিছু শিল্প-কারখানা ও যেটুকু বিদেশী বিনিয়োগ আছে, সেটাও শেষ হয়ে যাবে এবং বাংলাদেশ-ভারতের একটা পশ্চাদভূমিতে পরিণত হবে। আমাদের শাসক গোষ্ঠি, যারা সব সময় কেবল ভারত আর ভারত ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারেন না, তাদের কাছে এই বক্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, জানি না। তবে দেশবাসীর কাছে যে এটা অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য, এ সম্পর্কে আমার অন্তত সন্দেহ নেই। আর গ্লোবালাইজেশন সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে, এ সম্পর্কে স্টাডি করতে হবে, কীভাবে আমরা গ্লোবালাইজেশনে আমাদের পার্টিসিপেশন বাড়াতে পারি। গ্লোবালাইজেশন যে কেবল ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক তা নয়, সমগ্র বিশ্বব্যাপী এর পরিমণ্ডল। বিশেষ করে গ্লোবালাইজেশনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর স্ব-স্ব অধিকার নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক চলছে কীভাবে তারা তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করতে পারে। এইসব প্রসঙ্গগুলো যদি আমরা চিন্তা না করি, তাহলে আমরা আমাদের দেশের জন্য মঙ্গলজনক কিছু করতে পারব না। বরং দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবো।

www.pathagar.com

২৬ শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

হাসিনা সরকারের রাজনৈতিক চরিত্র

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশে ১৯৯৬-এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর ৩ বছরেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এই নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। এই তিন বছরের শাসনামলে তাদের চরিত্র কী, তারা কীভাবে তাদের শাসন ক্ষমতাকে ধরে রাখছে এবং ভবিষ্যতে কীভাবে ধরে রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে ও পাশাপাশি কীভাবে তাদের শাসন ক্ষমতাকে বৈধতা দিচ্ছে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা সাদামাটা কথায় জানি যে, একটা নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার ক্ষমতায় আসে সেই সরকারের চরিত্র সাধারণত গণতান্ত্রিক হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা এটাও জানি, ইতিহাসে বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর অনেক সরকার সম্পূর্ণভাবে স্বৈরাচারী হয়ে গেছে, ফ্যাসিস্ট হয়ে গেছে। জার্মানীতে হিটলার নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর হিটলার জার্মান সমাজ, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা এবং জার্মান জনগণের মন মানসিকতার ওপর যেভাবে সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব বিস্তার করে এবং তার ফলেই জার্মানীতে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়। এই ফ্যাসিবাদ কায়েম করার জন্য হিটলার কিছু ষড়যন্ত্রেরও আশ্রয় নিয়েছিল। জার্মান র‍্যেইখস্ট্যাগ-এ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে তার দায়-দায়িত্ব কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর অর্পণ করেছিল হিটলার, এবং কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিল। আমরা আমাদের দেশে বর্তমান যে সরকারটি দেখছি, সেই সরকারকে ঠিক হিটলারের সাথে তুলনা করা যাবে না। কারণ, হিটলার উগ্র জাত্যাভিমানের আশ্রয় নিয়েছিল। বিশেষ করে, হিটলারের রাজনীতিতে উত্থানের পেছনে ছিল ভার্সাই সন্ধির কাহিনী। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মান জাতি অপমানিত বোধ করেছিল এবং অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই জার্মান জাতিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত করেছিল হিটলার। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা একটা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অবস্থা লক্ষ্য করছি। বর্তমান সরকার বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলে, কিন্তু সত্যিকার জাতিরাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য যেসব দায়িত্ব পালন করা উচিত, তা পালন না করে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের সেবাদাসের ভূমিকা তারা পালন করছে এবং বিভিন্ন ধরনের চুক্তি করছে। এইসব চুক্তি করে তারা একের পর এক জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিচ্ছে। এর পাশাপাশি সে সমস্ত অবৈধ জাতিবিরোধী অন্যায় চুক্তিগুলোকে লেজিটিমাইজ করার জন্য তারা তাদের প্রোপাগাণ্ডা মেশিনকে ব্যবহার করছে। এর পাশাপাশি আমরা এটাও লক্ষ্য করছি, যাতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত হতে না পারে, সেই জন্য তারা সমস্ত রাষ্ট্রটাকে একটা টোটালিটারিয়ান ফর্মে ঢালাই করতে চাচ্ছে। যেমন, আমাদের শাসনতন্ত্রে পরিষ্কারভাবে বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা আছে। বহুমত, বহু দলের কথা আছে। বহু সংগঠনের মধ্যে প্রতিযোগিতার কথা আছে। সংসদে যেহেতু তাদের সেই পরিমাণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, সেজন্য তারা আমাদের শাসনতন্ত্রটাকে একেবারে টোটালিটারিয়ান ফর্মে পরিবর্তিত করতে পারছে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও শাসনপ্রণালীর অন্তর্বস্তু বা সারবস্তুকে তারা এমনভাবে গড়ে তুলছে যাতে আসলে রাষ্ট্রটা একটা টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রই হয়ে যায়। সে কারণে তারা যে ইন্সট্রুমেন্টটা ব্যবহার করছে, সেটা হচ্ছে জাতীয় জীবন, সমাজ জীবন ও প্রশাসন যন্ত্রের সর্বস্তরে দলীয় আধিপত্যকে একচেটিয়াভাবে প্রতিষ্ঠা করা। ইতোমধ্যে এই ধরনের শাসন ও সরকার ব্যবস্থা

www.pathagar.com

এবং নির্লজ্জ দলীয়করণের বিরুদ্ধে জনগণ যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এক কথায় বলা যায়, বর্তমান সরকার দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

কিন্তু তারপরও আমরা লক্ষ্য করছি যে, এর বিরুদ্ধে প্রবল কোন আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত করা যাচ্ছে না। এর জন্য অনেক সময় আমরা বিরোধী দলকে দায়ী করি। তাদের সংগঠনহীনতাকে দায়ী করি। তাদের কমিটমেন্ট ও নিষ্ঠার অভাবকে দায়ী করি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেশবাসী একটা উত্তরণের আশা করে। সাথে সাথে এদেশের জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ মনে করে যে, একটা শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে এই সরকার থেকে আরেকটি সরকারে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব নয়। যখন একটা দেশে নিয়মতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে একটা সরকারকে পরিবর্তন করা যায় না, তখন সেই সরকারের পরিবর্তন নানাভাবে হতে পারে। সেই পরিবর্তন হয়তো গণতন্ত্রসম্মত হবে না। হয়তো জনগণের একটা অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে হবে। অন্য কোনভাবেও হতে পারে। এই পরিস্থিতিটা জাতির জন্য খুব মঙ্গলজনক নয়। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে আমরা আশা করতে পারি যে, বাংলাদেশের এই ভঙ্গুর গণতন্ত্র, যে গণতন্ত্রকে ইতোমধ্যেই ইললিবারেল ডেমোক্রেসি বলে আন্তর্জাতিক মহলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই গণতন্ত্র থেকে আমরা রক্ষা পাব। তদুপরি আমরা এটাও লক্ষ্য করছি যে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আজ চরম নৈরাজ্য চলছে। দেশে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। দেশের নাগরিকরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এই পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে এই মুহূর্তে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কীভাবে আসবে, এই পরিবর্তনের রূপ কী হবে, এই পরিবর্তনের ফলে নতুন যে সরকার আসবে, তারা জনগণকে কতটা তাদের কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা, সুখ-শান্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে পারবে- সে সম্পর্কেও জনগণের খুব স্পষ্ট ধারণা নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ড. আফতাব আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা হল একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে শেখ হাসিনার সরকারকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন? সরকারের অনেক রকম চরিত্র হতে পারে- ফ্যাসিস্ট, গণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী বা টোটালিটেরিয়ান টাইপ হতে পারে। সামরিক আমলাতান্ত্রিক ধরনের স্বৈরাচারী সরকার হতে পারে বা একটা মোবিলাইজেশনাল রেজিম ধরনের হতে পারে বা পার্সোনাল রুলারশীপ হতে পারে। এরকম বহু ধরনের শাসন পদ্ধতির সাথে আমরা পরিচিত। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর, জনগণের জীবন-জীবিকার অবস্থা, একটা ছোট ভূখণ্ডের উপর বিশাল জনগোষ্ঠীর চাপ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কীভাবে সরকার তার কর্তৃত্বটাকে লেজিটিমাইজ করছে, এটা যদি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি, আমার মনে হয়, তাহলে এই সরকারের চরিত্র উপলব্ধি করার ব্যাপারে আমরা অনেকখানি অগ্রসর হতে পারব।

আফতাব আহমাদ :

বর্তমান সরকারকে যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে এই সরকারের যে রাজনৈতিক দর্শন, এই সরকারের যে মূল লক্ষ্য- এ সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং এই সরকার যে প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেই প্রক্রিয়াটিকেও আমাদের অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। আপনি প্রসঙ্গক্রমে টোটালিটেরিয়ানিজমের কথা বলেছেন। টোটালিটেরিয়ানিজমকে আমরা যদি বাংলায় ভাষান্তর করি, তাহলে সর্বায়তিকতা বলা যেতে পারে এবং এই সর্বায়তিকতার নানা রূপ, নানা মাত্রা বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করা যাবে। কোথাও এর পরিচয় ফ্যাসিজম, কোথাও নাৎসীজম আবার bureaucratic collectivism বা আমলাতান্ত্রিক যৌথবাদ। সর্বায়তিকতার জন্ম বলতে গেলে ইটালীতে। সামাজিক বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক চরম মন্দার সুযোগে মুসোলিনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালীতে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক অঙ্গনে একচ্ছত্র প্রাধান্য অর্জন করেন। বলে রাখা ভাল যে, মুসোলিনী এক সময়ে সাংবাদিকতা

www.pathagar.com

করতেন এবং "আভান্তি' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। যে পত্রিকা পরবর্তীকালে তার রাজনৈতিক প্রকল্পকে জনসমর্থন, মতাদর্শিক সমর্থন ও ধ্যান-ধারণার যোগান দিয়েছিল। ১৯২২-এ মুসোলিনী যখন রোমের ওপর মার্চ করলেন, তখন থেকেই তাঁর নিরংকুশ রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার অভিযাত্রা শুরু। ফ্যাসিস্ট অভিযাত্রা শুরু। 'ফ্যাসিস্ট' শব্দটি ইটালীয়ান শব্দ। Facio মানে হচ্ছে বান্ডিল, গুচ্ছ বা খোকা-এর নিহিত ভাবের সম্প্রসারণ করলে অর্থ দাঁড়ায় গোষ্ঠী বা দল। ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রতীক ছিল এক বান্ডিল লোহার রড এবং আড়াআড়িভাবে স্থাপিত একটি কুড়াল। ফ্যাসিজমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ট্রটস্কি বলেছেন, "fascism is the expression of a profound structural crisis of late capitalism and results from the tendency of monopoly capitalism to organize the whole of social life in a totalitarian fashion." ১৯২৫-এর ২২ জুন ইটালীর পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে মুসোলিনী বললেন, 'লা নসত্রা ফেরোসে ভলান্ট্রা তোতালেতারিয়া'। অর্থাৎ, আওয়ার ফিয়ার্স টোটালিটারিয়ান উইল। এই উইল দ্বারা তিনি কিন্তু সর্বসাধারণের উইলকে বোঝাননি। তাঁর দলের তাত্ত্বিক জিউভানিজেনটাইল একে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, এ হচ্ছে total conception of life-*to stato totalitario.* অর্থাৎ 'টোটাল বা টোটালিটারিয়ান স্টেট।' এই টোটালিটারিয়ান বা সর্বায়তিক রাষ্ট্রের চরিত্র ইটালীতে এক ধরনের। জার্মানীতে কিন্তু ভিন্ন ধরনের। ফ্যাসিজম এবং নাৎসীজম এক জিনিস নয়। নাৎসীজমে অতিরিক্ত যে উপাদানটি ছিল, সেটি হল বর্ণবাদ, রেসিজম। এই বর্ণবাদী নীতি প্রধানত ইহুদী নিধনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে, বোধহয় সর্বায়তিক রাষ্ট্রের অবসান হয়েছে। কিন্তু যেটি গভীর তাৎপর্যের সাথে আমাদের অনুধাবন করতে হবে সেটি হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের উপনিবেশগুলোকে যখন কাগুজে স্বাধীনতা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তখন ঐ উপনিবেশগুলোতে লক্ষ্য করা গেছে, সুসংহত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন ছিল না, সুসংহত সামাজিক প্রতিষ্ঠানও তেমন ছিল না, যে প্রতিষ্ঠান উদার গণতন্ত্রকে লালন ও সৃজন করবে। বরং কাগুজে স্বাধীনতা দেয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো প্রধানত নয়া উপনিবেশ হিসেবে থেকে যায় এবং যে রাজনৈতিক বিকৃতি এই দেশগুলোতে লক্ষ্য করা গেছে, সেই বিকৃতিকে পরবর্তী পর্যায়ে সর্বায়তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৯৫৩-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টোটালিটেরিয়ানিজম এর উপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল, সেই সম্মেলনে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং পণ্ডিত কার্ল ফ্রিডরিক টোটালিটেরিয়ানিজম বা সর্বায়তিকতা সম্পর্কে একটি সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সেই সংজ্ঞাটি ছিল এ রকম যে, প্রথমত, একটি সরকারী মতাদর্শ থাকতে হবে, যে মতাদর্শ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত নীতির ব্যাখ্যা করবে এবং ধরে নেয়া হবে, রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সেই মতাদর্শকে বিনাবাক্যে, বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়ত, একটি একক গণসংগঠন এমনভাবে গড়ে তোলা হবে, যা মূলত এক ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন ও অধীনস্থ থাকবে এবং এক ব্যক্তির নির্দেশে পরিচালিত হবে। পরাৎক্রমিকভাবে (hierarchically) সংগঠিত এই গণ সংগঠন হয় অত্যুন্নত হবে, না হয় যুগপৎভাবে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের সঙ্গে একটি গভীর সংযোগ থাকবে। তৃতীয়ত, ঐ গণসংগঠন কৃৎকৌশলগত দিক থেকে প্রাগসর অবস্থানে থেকে সশস্ত্র লড়াইয়ের হাতিয়ার সামগ্রীর ওপর এক ধরনের প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। আমলাতন্ত্র পদানত ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের আজ্ঞাবহ থাকবে। চতুর্থত, গণমাধ্যমসমূহের উপর প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আধিপত্য প্রযুক্ত হবে। আর রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ, একক গণসংগঠনের আধিপত্য, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের অধীনতা এবং দলের প্রতি আনুগত্য এই সব কিছুকে যারা মেনে নিতে চাইবে না, তাদের ওপর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বা সরাসরি শারীরিক সন্ত্রাস সঞ্চার করা। যেটাকে আমরা বলি, থট টেররিজম এবং থট পুলিসিং-এর একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এইসব কিছুর দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে আমরা বুঝতে

www.pathagar.com

পারি, সর্বায়তিক রাষ্ট্রে শুধুমাত্র ক্ষমতার চর্চাই করে না, তারা এমন একটি মতাদর্শকে তুলে ধরে, যেই মতাদর্শ সব ধরনের সৃজনী প্রতিভাকে অস্বীকার করে। স্বাধীন কিংবা মুক্তভাবে চিন্তা করার সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়।

আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত একটি উক্তি 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' এর দ্বারা ক্ষমতাসীন দল কী বোঝে আজ পর্যন্ত তার কোন সর্বজনগ্রাহ্য সহজ ব্যাখ্যা তারা হাজির করতে পারেনি। কিন্তু, যে জিনিসটি উপস্থাপন করা হয়েছে জনসাধারণের কাছে, সেটি হল– একটি বিশেষ দল এই মতাদর্শের ধারক, এই মতাদর্শের রক্ষক, এই মতাদর্শের উদগাতা। ঐ দলভুক্ত হলেই সকলে হয়ে পড়বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভুক্ত। এই ধরনের একটি সরল সমীকরণের মধ্যদিয়ে গোটা দেশকে, দেশের মানুষকে বিভক্ত করে ফেলা হচ্ছে এবং এক নেতা, এক দেশ, এক আদর্শের ভিত্তিতেই ১৯৭২ এর পর আওয়ামী লীগ দেশ চালাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এর সুফল জনসাধারণের মধ্যে ভোগ করার কেউ ছিল না। তার কারণ, এই ধরনের মতাদর্শ ইউরোপে প্রধানত এসেছিল পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটের মধ্যদিয়ে। সংকট থেকে উত্তরণের জন্য রেজিমেন্টেশনের প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রচুর লোক বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে ডিক্লাসড্ ও বেকার হয়ে পড়েছিল এবং তারা নানা ধরনের ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া ও গণতন্ত্রবিরোধী বিভিন্ন শক্তির সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। নিম্নমধ্যবিত্ত ও কৃষকরা বলতে গেলে গণতান্ত্রিক দলগুলোর সাথে কোন সম্পর্কই রাখে নি। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে শিল্পপতি ও পুঁজিবাদীরা মুনাফা খোয়াতে বসেছিল। তাদের মুনাফা পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার জন্য শোষণের মাত্রাটা যাতে আরো বৃদ্ধি করা যায়। সেজন্য রাষ্ট্রকে তারা ব্যবহার করতে চেয়েছিল, ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট এবং পেজেন্ট অর্গানাইজেশনগুলোকে যাতে ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়া যায়। এক কথায় তখন তাদের যে কমান্ড ইকনমির প্রয়োজন দেখা দেয়, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদের অগ্রযাত্রাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, একটি পুজিপতি শ্রেণী বা এন্টারপ্রেনার ক্লাস সেখানে অলরেডি ছিল। তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশের মতো বাংলাদেশে এখন সুসংহত অর্থবহ কোন এন্টারপ্রেনার ক্লাস গড়ে ওঠেনি। তৃতীয় বিশ্বের যে বৈশিষ্ট্য আমরা জানি, সেটি হল, রাষ্ট্রযন্ত্রকে কব্জা করে, ব্যবহার করে, রিসোর্সেস প্লান্ডার করে এক ধরনের বিকৃত উন্নয়ন বা লঝ্ঝড় উন্নয়ন অর্থাৎ lumpen development সাধন করা, বা একটি কিম্ভূতকিমাকার শ্রেণীতে বিকশিত হবার চেষ্টা করা। এখানে দেখা গেছে কোন নির্দিষ্ট ক্লাসের প্রতি কোন কমিটমেন্ট যেহেতু কারও নেই, সেহেতু পার্সোনালিস্টিক বা ডাইনেস্টিক বা পেট্রিমোনিয়াল সিস্টেম লালন করার জন্য এক ধরনের উদগ্র বাসনা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শেখ মুজিবুর রহমান যেমন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই প্রথম ঘোষণা দিলেন, 'তিন বছর কাউকে কিছু দিতে পারব না। তোমরা ধৈর্য ধরো।' সাধারণ মানুষ কিন্তু ধৈর্য ধরেছিল। কিন্তু তারা চরম হতাশার সাথে লক্ষ্য করল 'তিন বছর কিছু দিতে পারব না' বলা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ অকল্পনীয় লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ল, রাষ্ট্রীয়করণের নামে স্টেট রিসোর্সেস নির্মমভাবে প্লান্ডার শুরু করে। বাইরে থেকে ঋণ, সাহায্য ও অনুদান যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্নির্মাণ করার জন্য বিপুল পরিমাণে আসল, সেগুলো রীতিমতো তসরুফ করা শুরু হল। যে কারণে ঐ সময়ে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এটি হচ্ছে লুটপাট সমিতি, এবং বিদেশী গণমাধ্যমসমূহ আওয়ামী লীগের ইংরেজী সংক্ষেপ AL এর ব্যাখ্যা দিয়েছিল Association of Looters বলে। এই লুটপাটের মধ্যদিয়ে দেখা গেছে, একটি বিশেষ শ্রেণী গড়ে উঠেছে একটি দল এবং দলনেতার নিকটাত্মীয় ও কুটুম্বদের নিয়ে। এদের কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বিকাশ- এটা আমরা শুধু যে বাংলাদেশে তা নয়, এশিয়ার আরও অনেক দেশেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ইন্দোনেশিয়াতে ঘটেছে, ফিলিপাইনে তো মার্কোস এন্ড হিজ ক্রোনিজ পুরো ফিলিপাইনের অর্থনীতিকে ফোকলা করে ফেলেছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে আজকে পুনরায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে এবং এই ক্ষমতায় আসার আগে ১৯৭২-৭৫ এ তাদের শাসনকালে জনগণের ওপর চরম নিপীড়ন ও অত্যাচার করে, অর্থনীতিকে ধ্বংস করে লুটপাটের যে রাজত্ব তারা কায়েম করেছিল সেজন্য তারা লোক দেখানো ক্ষমা প্রার্থনা করে। আজকে আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তারা যে কাজটি করেছে, সেটাকে আবার বলা যেতে পারে '৭২-'৭৫ এরই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু, এবার '৭২-'৭৫ থেকে পরিস্থিতি একটু ভিন্নতর। ভিন্নতর এই অর্থে যে, হাসিনার মুজিবের মত ক্যারিজমা নেই। আওয়ামী লীগ '৭২-এ দাবী করতে পারত যে, তারা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে যদিও ঐতিহাসিকভাবে এটি পরিপূর্ণভাবে সত্য নয়। মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সমগ্র জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিল। বলা যেতে পারে, এদেশের শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র এবং সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরাই প্রধানত মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরকে বলা হত 'ফূর্তিফৌজ' যারা কলকাতা, আগরতলা কিংবা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের ফূর্তি করে বেড়িয়েছে। আছে মুক্তিবাহিনীর প্রথম দিককার নাম ছিল মুক্তিফৌজ, তার সঙ্গে মিল রেখে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে বলতো 'ফূর্তিফৌজ'। তারপরও তারা মুক্তিযুদ্ধের একটা লিগ্যাসিও ক্লেইম করতে পারত। কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের এই লিগ্যাসি তেমন ক্লেইম করতে পারে না।

মাহবুব উল্লাহ :

এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয়। সেটা হচ্ছে, শেখ হাসিনা '৯৬ সালে যখন নির্বাচন করেন, সে নির্বাচনের সময়ে দেখা গেছে, তার দলে বেশকিছু সংখ্যক নতুন রিক্রুটস এসেছে। সেই রিক্রুটসদের মধ্যে সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন অফিসাররা আছেন, নামকরা আমলা ও ব্যবসায়ীরা আছেন। আমার মনে হয় ১৯৭২-এ শেখ মুজিব যেভাবে তার শাসনটা শুরু করেছিলেন, সেটাকে তিনি একচুয়ালি ১৯৭৫-এ বাকশাল কায়েম করার পর বাকশালের ছত্রছায়ায় সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল সবকিছুকে এক জায়গায় জড়ো করে একটা একক সংগঠনের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। যেহেতু ১৯৯৬-তে শাসনতান্ত্রিকভাবে এই কাজটা করা সম্ভব ছিল না, সেই জন্য বিভিন্ন ইন্টারেস্ট গ্রুপকে জড়ো করার উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা সমাজের বিভিন্ন স্তরকে নানারকম আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি ও নানা রকম ফললাভের প্রত্যাশায় আশ্বস্ত করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করেন। আপনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেছেন। একটা সময় ছিল, যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বললে ধর্মের কথা বলা বা ধর্মানুরাগিতা, পরিত্যাজ্য ছিল। কিন্তু '৯৬-এর নির্বাচনে অদ্ভুতভাবে শেখ হাসিনা তার সমস্ত স্ট্রাটেজি পরিবর্তন করেন। আমরা লক্ষ্য করলাম, নির্বাচনের কয়েকদিন আগে শেখ হাসিনা মোনাজাতরত অবস্থায় রয়েছেন, এরকম একটা ছবি দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে প্রচার করা হল। এমনকি তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে আসেন, তখন তাকে তসবীহ টিপতে দেখা গেল। এর মাঝখানে বেশ কয়েকবার তিনি হজ্বব্রত বা ওমরাহ পালন করলেন। এভাবে ইসলামী দুনিয়ার কাছে এবং দেশের ভেতরে ধর্মপ্রাণ মুসলমান মানুষের কাছে আওয়ামী লীগের একটা ভিন্ন ভাবমূর্তি তারা উত্থাপন করার চেষ্টা করলেন এবং এই ভাবমূর্তিতে তৈরির জন্য দেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু প্রতিবাদ করল না। যদিও ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই পছন্দ করেন না এই ধরনের কৌশল। আসলে শেখ হাসিনা তার মূল নীতিতে অটুট রয়েছেন, সুতরাং তাকেই সমর্থন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এর মধ্যে এক ধরনের গোত্রবাদ বা ট্রাইবালিজম কাজ করে। গোত্রবাদে যেমন এক গোত্র অন্য গোত্রকে সাধারণত কোন রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে চায় না এবং অন্য গোত্রের কাছ থেকে সকল রকম সুযোগ-সুবিধা হয় যুদ্ধ করে, না হয় সংগ্রাম করে কেড়ে নিতে চায়, আওয়ামী লীগও অনেকটা অনুরূপভাবে সেই বাহাত্তর-পঁচাত্তরে দেশের সম্পদ কুক্ষীগত করেছিল তাদের ট্রাইবালিজমের মাধ্যমে। আমরা এটাকে আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে ক্ল্যানিশ বলতে পারি। সেই সময়ে আওয়ামী লীগের মত ক্ল্যানের হাতে বেশ কিছু পুঁজি সঞ্চিত হয়েছে।

www.pathagar.com

মার্কস যেটাকে আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন বা প্রিমিটিভ ক্যাপিটাল একুমুলেশন বলেছেন। অনেকটা সেভাবেই বাংলাদেশে আদিম পুঁজি সঞ্চয়নের ঘটনা ঘটেছে। এখানে আমি একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলতে পারি। ১৯৬৯ সালে ১১ দফার গণঅভ্যুত্থানের সময়ে (যেটি ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন আসার পরে থেমে যায়) প্রফেসর রেহমান সোবহান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'এখন যদি কোনভাবে ইস্ট পাকিস্তানকে ওয়েস্ট পাকিস্তান থেকে আলাদা করা যায়, তাহলে আমরা রাতারাতি এখানে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারব।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কিভাবে সম্ভব হবে?' তিনি জানালেন, 'তুমিতো জান যে,, পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব বা সিন্ধু প্রদেশের মত বড় জমিদার শ্রেণী নেই বা আদমজী-দাউদের মত পুঁজিপতি শ্রেণীও নেই। সুতরাং এখানে একটা রাষ্ট্রীয় নির্দেশের দ্বারাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হব।' আমি তখন বলেছিলাম, 'লেনিনের একটা উক্তি আছে, পুঁজি এমন একটা জিনিস, যেটা রক্তবীজের মত সঞ্চারিত হয়। প্রতিদিনে, প্রতিপলে, প্রতিমুহূর্তে সেটা বিকশিত হয় এবং সেটা তার বিকাশের নিজস্ব পথ খুঁজে নেয়।' বাস্তবেও দেখা গেল, যখন পাকিস্তানীরা তাদের মিল-কারখানাগুলো ফেলে গেল, তখন সেগুলোতে যাদেরকে এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে বসান হল, তারা আওয়ামী লীগেরই লোক। তারা আসার পর সেইসব কলকারখানার কোন ইনভেনট্রি করা হল না এবং সেসব কল-কারখানায় যেসব কাঁচামাল ছিল, সেগুলো পাচার করা হল; রাতের অন্ধকারে বিক্রি করা হল। এমনকি মেশিনারিজ পর্যন্ত খুলে খুলে বিক্রি করা হল। রাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ নেয়া হল এবং সেই ঋণের টাকাও তারা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করল। এছাড়া এসব কলকারখানার অন্যান্য সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যা ছিল, সেগুলোও যথেচ্ছভাবে লুণ্ঠন করে তারা ফুলে-ফেঁপে উঠল। যার পরিণতিতে আমরা দেখলাম, প্রথম দিকে যেখানে বলা হয়েছিল যে, ২৫ হাজার টাকার বেশী কেউ ব্যক্তিগতভাবে লগ্নি করতে পারবে না, সেখানে সেই আওয়ামী লীগ শাসনের শেষের দিকে এসে তৎকালীন শিল্প মন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম ইনভেস্টমেন্ট সিলিং ৩ লাখ টাকায় বাড়িয়ে দিলেন এবং পরবর্তীকালে সেটা ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের মধ্যেই অতিদ্রুত অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটছিল। একটা নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছিল। একটা নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম হচ্ছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রার্থমিকভাবে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয় লুণ্ঠনের ফলে। লুণ্ঠনই হচ্ছে পুঁজির উৎস এবং লুণ্ঠনের সেই পুঁজিই একদিন না একদিন উৎপাদনের দিকে যায়। পরিবর্ধিত পুনরুৎপাদনের পথে যায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে পুঁজি সেই পথে যায়নি। যতই আমরা উৎপাদন-উন্নয়নের রাজনীতির কথা বলি না কেন, সত্যিকার অর্থে সেটা সেভাবে গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে ইদানীংকালে ব্যাংক ঋণ ডিফল্টার হওয়ার যে কালচার দেশে গড়ে উঠেছে, এটাও এক ধরনের তস্করবৃত্তি, লুণ্ঠনবৃত্তি। গণতন্ত্রের ভীত একটা শক্তিশালী পুঁজিপতি শ্রেণী বা পুঁজিপতিদের প্রতিযোগিতা না থাকলে যে গড়ে উঠতে পারে না, সেরকম একটা সামাজিক অবস্থা বাংলাদেশে য়ে গেছে। যে কারণে আমরা লক্ষ্য করি, আমাদের শাসকদের একটা প্রবণতা আছে স্বৈরতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার। আওয়ামী লীগের একটা বিশেষ ধরনের কালচার ও মতাদর্শ আছে এবং জন্মলগ্ন থেকেই তারা একটা ক্ল্যানিশ মেন্টালিটিতে ভুগছে, সে কারণে আমরা লক্ষ্য করি আওয়ামী লীগ শাসনামলে এই প্রবণতাগুলো এক মারাত্মক আকার ধারণ করে। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে দেশে গণতন্ত্র আশা করি, তাহলে আমাদের ভাবতে হবে কীভাবে বিদ্যমান অর্থনীতির সামাজিক ভিত্তিটাকে পরিবর্তিত করে এটাকে উৎপাদনমুখী করে তুলতে পারি। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। আমাদের গণতন্ত্রের জন্য একটা বিরাট বিপদ রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে সর্বত্র চাঁদাবাজি, রেন্ট সিকিংয়ের কর্মকাণ্ড। এ ধরনের অপতৎপরতা বন্ধ করে যদি আমরা হেলথি মেকানিজমের মাধ্যমে মার্কেট ফের্সোসকে অপারেট করতে দিয়ে জেনুইন প্রফিট সিকিংয়ের দিকে ধাবিত না করতে পারি, তাহলে আমরা কখনই কিছু করতে পারব না।

www.pathagar.com

বর্তমান সরকারের আমলে আমরা লক্ষ্য করছি, হাট বা ব্রিজের ইজারা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কন্সট্রাকশন ওয়ার্ক সকল কিছু দলীয় লোকজনদের দেয়া হচ্ছে অত্যন্ত নিম্নমূল্যে। আমি কয়েক দিন আগে একটি বিশাল প্রকল্পের কথা শুনেছি, যেটির খরচ ছিল ৮৯ কোটি টাকা। প্রকল্পটি ড্যানিশ গর্ভনমেন্টের এসিস্ট্যান্সে আমাদের কোস্টাল এরিয়াতে কিছু সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের। লক্ষ্য করা গেল, বিচিত্র সব অজুহাতে একটিও সাইক্লোন শেল্টার তৈরী না করে সমস্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে এবং প্রতিটি অডিট একাউন্টিং পর্যায়ে বলা হয়েছে, ঝড় এসে সব মুছে নিয়ে গেছে, কিংবা মাটি ধসে গেছে। এইসব বলে বলে পুরো ৮৯ কোটি টাকা গায়েব করে ফেলা হয়েছে। এই যদি পরিস্থিতি হয়, তাহলে বলতে হবে দুর্নীতির সাথে একেবারে শাসনযন্ত্রের উচ্চ থেকে নিম্ন মহল পর্যন্ত অনেক লোকজনই জড়িত। এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতি, রেন্ট সিকিং, চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাস এগুলো সব একত্রিত হয়েছে। এর ফলে সুস্থ, গণতান্ত্রিক রাজনীতি এখানে গড়ে উঠতে পারছে না। আর আমাদের দেশের বিজনেস লবি, যারা বেশীর ভাগ ট্রেডিং-এর সাথে যুক্ত, তারাও ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যে ধরনের অমিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে দেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলো সিক হয়ে গেছে। অবশ্য, তাদের ওপর নানা রকম আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতাও আছে। সুতরাং; এ দেশে গণতন্ত্রের চর্চা করা কঠিন। তার পাশাপাশি এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটাও আজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম অত্যন্ত দম্ভোক্তি করে বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগতো এখনও কিছু শুরুই করেনি। শুরু করলে বুঝতে পারবেন যে, আওয়ামী লীগ কি জিনিস।’ মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মহল থেকেও বারবার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে। এরপরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে, এখনও তারা শুরুই করেননি। আমি তাকে অন্তত একটা ধন্যবাদ দেব এই জন্য যে, তিনি তার বক্তব্যের ব্যাপারে কোন রাখঢাক করেননি। তিনি তার ইচ্ছাকে গোপন রাখেননি। তিনি যা করতে চান, যা করার ইচ্ছা, সেটা তিনি সরাসরি প্রকাশ করেছেন। এই রকম পরিবেশে সকল মহলের মধ্যেই একটা আশঙ্কা যে, আগামীতে যে নির্বাচন হবে তাকে একেবারে স্টর্ম ট্রুপারস বা ঝটিকা বাহিনী দিয়ে একটি বিশেষ দলের পক্ষে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেজন্য আটঘাট বেঁধে সর্বক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি পয়েন্টে, প্রত্যেকটি স্পটে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এটা যদি করা হয়, তাহলে আমরা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতোটুকু আশাবাদী হতে পারি? এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখন নতুন করে আবার সন্ত্রাস দমনের নামে Public Safety Actও প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আপনি যেটা বললেন, একটা পার্সোনালিস্টিক রুলকে চিরস্থায়ী করার জন্য নানাদিক থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এটার আইডোলজিক্যাল প্রস্তুতি তাদের যেমন আছে, এটার জন্য প্রচার মাধ্যমের ওপর যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব তাদের আছে, প্রশাসনজন্ত্রের ওপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ তাদের আছে। এমন কি মানি এবং মাসল পাওয়ারের ওপর যতখানি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার, সেটাও তাদের আছে।

অন্যদিকে এই সরকার অনেক জাতি বিরোধী ও রাষ্ট্রঘাতী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ট্রানজিট দেয়ার কথা বলছে, তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করেছে। গঙ্গার পানি চুক্তি করেছে এবং প্রত্যেকটি চুক্তিই জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করেছে। সেই দিক থেকে তারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। শুধুমাত্র একটা সংগঠিত শক্তির বলে এবং ভয় দেখিয়ে তারা তাদের শাসনটাকে অব্যাহত রাখতে চাইছে। আমার কাছে যেটা মনে হয়, বাংলাদেশে এখন যে শাসন চলছে, এটাকে হিটলার-মুসোলিনীর শাসনের মডেলের সাথেও হয়ত তুলনা করা যাবে না। এমন কি তৃতীয় বিশ্বের যে সমস্ত উপনিবেশ-উত্তর দেশে একদলীয় শাসন ছিল, যেমন ইজিপ্টের নাসেরের অধীনে এরাব সোসালিস্ট ইউনিয়ন ছিল বা ইন্দোনেশিয়ার সোকার্নুর শাসন ব্যবস্থার সাথেও তুলনা করা যায় না। এটা একটা বিকৃত বিকাশ ও উন্নয়নের প্রতি বিমুখ একটা সমাজের সমস্যা। এই ধরনের সমাজের যদি উত্তরণ ঘটাতে হয়, তাহলে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। যারা মানুষের চিন্তার জগতটাকে নাড়া দিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই

www.pathagar.com

তাদের মস্তিষ্কটা বন্ধক দিয়ে বসে আছে। এই মস্তিষ্ক বন্ধক দেয়ার ঘটনাটা অতি সহজেই ঘটানো সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, আমাদের পাশে একটি বিশাল দেশ আছে, যে দেশটি তার স্ট্রাটেজি ও স্বীয় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণে সব সময় আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে চায় এবং এটাও একটা বড় উপাদান, যার ফলে আমাদের দেশে এই ধরনের একটি সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারছে। আমরা যদি এ থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, তাহলে সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের কি ভূমিকা পালন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

আফতাব আহ্‌মাদ :

আমাদের আসলে একটা জিনিস বুঝতে হবে সেটি হল, বাংলাদেশ বর্তমানে একটা ক্রসরোডের মধ্যে আছে। যেটাকে আমরা বলতে পারি Historical Crossroad বা Juncture এবং এটিই আজকের সঙ্কটের মূল বলে আমি মনে মনে করি। বাংলাদেশে যতই আমরা বলি যে, এন্টারপ্রেনার ক্লাস নেই, যতই আমরা বলি যে, জাতীয় পুঁজি সুসংগঠিত বা বিকশিত নয়, তৎসত্ত্বেও বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্যভাবে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সাথে সংগ্রথিত এবং পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক নিয়মগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর প্রযোজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রভাব এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিয়ন্ত্রণকে বাংলাদেশ উপেক্ষা বা অস্বীকার করতে পারে না। আজ সে কারণেই অধঃপতিত উৎপাদন বিমুখ যে অর্থনীতি এখানে দোর্দণ্ড প্রতাপে বিরাজ করছে, এটাকে ধরেই নিতে হবে এক ধরনের পুজিবাদ এবং এই ধরনের পুঁজিবাদী সমাজ শুধু বাংলাদেশেই নয়, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই বিরাজ করছে। এসব দেশের বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে Poulantzas একে Social fascism বা সামাজিক ফ্যাসিবাদ বলে অভিহিত করেছেন। এর মূল কথা হচ্ছে রাষ্ট্র এমন এক ধরনের বিকৃত উৎপাদনবিমুখ পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায় ও লালন করে যার অধঃপতিত রূপ হচ্ছে Structural distortion, increased dependency এবং Capital এর rapid outward flowএর Conveyor belt হিসেবে কাজ করা। এসব কিছুকে নিশ্চিত করার জন্য গণতন্ত্রকে বুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সকল নাগরিক অধিকারকে বিধ্বস্ত করে ফেলা হয়। যুগপৎভাবে এই ধরনের Social fascism আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারের হেডকোয়ার্টার্সের সাথে গভীর সংযোগ স্থাপন করে। আরোপিত শর্তাদি মেনে বহির্মুখী রসদ যোগানোর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উৎপাদনকে সম্পূর্ণভাবে তারা বিপর্যস্ত করে ফেলে। এই পরিস্থিতিতে রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে কেবলমাত্র নেতৃত্ব বা লিডারশিপ। এ ধরনের পরিস্থিতিতে লিডারশিপের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে।

যুগের দাবী বা সময়ে নির্দিষ্ট একটি সমাজ পরিগঠনের চাহিদা পূরণের জন্য Personification of aspirations vary করে। ১৮৫০ এ ফরাসী সমাজে আমরা বোনাপার্টিজমের উত্থান প্রত্যক্ষ করি। অর্থাৎ সমাজ পরিগঠন যখন অত্যন্ত দুর্বল এবং বিপ্রযুক্তির উপাদান বা শক্তিসমূহকে শাসন করতে পারে এমন একটি শাসকশ্রেণী যখন অনুপস্থিত থাকে তখন রাষ্ট্র যন্ত্রকে ব্যবহার করে কীভাবে স্থিতি ও ভারসাম্য আনয়নের জন্য একটি শাসক শ্রেণীর বিকাশ ঘটানো যায় তাই বোনাপার্টিস্ট মডেলের লক্ষ্য। আজকাল তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে বোনাপার্টিস্ট মডেলকে খুব একটা অপারেট করতে আমরা দেখি না। এখানে আমাদের পরিপ্রেক্ষিতটি বুঝতে হবে। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক শিবির বলে কোন শিবিরের আর অস্তিত্ব নেই এবং সভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর, স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পরে গ্লোবালাইজেশনের নামে আজকে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ যে মারমুখী ভূমিকাটা নিয়েছে, অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের বাজারগুলোকে ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপিটালিজমের ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটের নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসার যে আয়োজন চলছে সেই পরিপ্রেক্ষিতটা আমাদের বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো। এর মধ্যে সবচেয়ে ইমপর্টেন্ট হচ্ছে ওয়ার্ল্ডব্যাংক এবং আইএমএফ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বিষয়টি ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে ও বিচার করতে হবে। আগামী শতক হচ্ছে পূর্ব এশিয়ার শতক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ এখান থেকেই আসবে। ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাই বর্তমানের unipolar world-এর hegemonical chain-এ বাংলাদেশ হচ্ছে weakest link, একই সঙ্গে East Asian Economy-এর সঙ্গে metropolitan Capital-এর সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ bridge-head হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদনের অবস্থানে রয়েছে। কাজেই geo-strategic ও geo-economic reason-এ বাংলাদেশ অত্যন্ত advantageous position -এ রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে আঞ্চলিক Hegemon-এর অনুগ্রহ পুষ্ট একটি ক্রীড়নক সরকার। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে চীনদেশের অপ্রতিরোধ্য উত্থান এবং ভূমণ্ডলীয় রাজনীতিতে ভবিষ্যতে তার নেতৃত্ব দানকারী যে সম্ভাব্য অবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা আঞ্চলিক Hegemon ভারতসহ পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত দেশগুলোকে ভাবিয়ে তুলেছে। এখানেই ক্ষেত্র বিশেষে ভারতীয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের আপেক্ষিক Convergence হচ্ছে। geo-strategic এবং geo-economic considerations-এর কারণে Unipolar World-এর বিভিন্ন Lobby-তে ভারতের এত কদর। অবশ্য পাশ্চাত্যে দ্বিতীয় চিন্তাটিও কিন্তু বেশ স্পষ্ট– ভারত শেষ বিশ্লেষণে একটা Viable state enterprise হিসেবে টিকে না থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে– এটি অনেক Western thinker -কে যেমন বিচলিত করছে তেমনি অনেকে redrawing বা restructuring of South Asian state system-এর কথাও advocate করছেন এবং thinking টা ভারতের অনুকূলে নয়। সে যাই হোক, ভারতের বর্তমান সুবিধাটা হচ্ছে যে, সে তার বেশ কয়েকটি ছোট প্রতিবেশী দেশে তার অনুগ্রহপুষ্ট দলকে ক্ষমতায় বসাতে পেরেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে তার সাফল্য সবচেয়ে প্রশংসনীয়। ভারত কোন অবস্থাতেই চাইবে না যে, বাংলাদেশে একটি আত্মনির্ভরশীল প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি গড়ে উঠুক।

ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাই আমাদের এখানে একটি দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী যারা মূলত লুটপাটে বিশ্বাসী এবং উৎপাদন বিমুখ সেই লুম্পেন শ্রেণী আওয়ামী লীগের ছাত্রছায়ায় বর্তমানে সুসংগঠিত– আপনি যেমন বললেন, আওয়ামী লীগ বিভিন্ন ইন্টারেস্ট গ্রুপকে একত্রিত করে '৯৬-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। মিলিটারী লবি, ব্যুরোক্রেটিক লবি, এমনকি বিজনেস লবির যে অংশটা এক সময় আওয়ামী লীগের প্রতি বিমুখ ছিল সে অংশটাকেও উইনওভার করার জন্য আওয়ামী লীগ নানা ধরনের কায়দা-কানুন অবলম্বন করেছে। এখানে যা অনুধাবন করার বিষয় তা হল আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করার পরিবর্তে ক্ল্যানিশ ইন্টারেস্টে ডোনার এজেন্সিগুলোকে যতটুকু প্রতিশ্রুতি দেয়ার, ভারতকে যা যা প্রতিশ্রুতি দেয়ার– সবাইকে সব ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জনতুষ্টিবাদী প্রতিশ্রুতি দিয়ে সকলকে তুষ্ট করে ক্ষমতায় আসার পথটা খোলাসা করার চেষ্টা করেছে এবং নানা ধরনের যোগসাজশ ও কৌশলে তারা '৯৬-এর নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। বড় সঙ্কট হচ্ছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমাজ বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিগুলোর প্রোগামকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে internally যে পরিমাণ distortion-এর জন্ম দিচ্ছি আমরা, তা ক্রমাগতভাবে রাষ্ট্রের ইনস্টিটিউশনগুলোকে ইনইফেকটিভ করে তুলছে এবং স্টেট ক্যাপাবিলিটিকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে ফেলছে। অন্যদিকে জিওস্ট্রাটেজিক ও জিওইকোনমিক ইন্টারেস্টে ভারত বাংলাদেশকে গ্রেটার ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে ইনকর্পোরেট করতে চায়। আরেক দিকে স্বল্প মেয়াদে বাংলাদেশকে একটি প্রতিবন্ধী রাষ্ট্র হিসেবে রেখে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানের একটা কম্পোন্যান্ট হিসেবে বাংলাদেশকে ইনকরপোরেট করতে চায়। সে কারণেই বাংলাদেশের ইনডিপেনডেন্ট ডেভেলপমেন্টকে তারা কোনভাবেই উৎসাহিত করতে পারে না। এর সাথে গ্লোবালাইজেশনের নামে যুক্ত হয়েছে আমাদের দেশের একশ্রেণীর বণিক গোষ্ঠী। এরা

www.pathagar.com

ইন্টারনালি প্রোডাকটিভ ফোর্সকে ডেভেলপ করার পরিবর্তে, ইনভেস্টমেন্টকে এনকারেজ করার পরিবর্তে, ভারতীয় পণ্যের কমিশন এজেন্ট হতেই বেশী পছন্দ করে এবং সে কারণেই তারা আঞ্চলিক সহযোগিতার নামে ভারতীয়দের কমিশন এজেন্ট হওয়ার জন্য রাজনীতিটাকে একটি অধঃপতিত ও বিকৃত রূপ দিতে বদ্ধপরিকর। সর্বগ্রাসী Lumpen politics আজ আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম ব্যাধি। Trading house-গুলোর আর্থিক নির্ভরশীলতা এই Lumpen politics-কে আরো বিকৃত করে চলেছে। কিন্তু এই Lumpen politics-এর বিরুদ্ধে এখন রুখে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ কিন্তু এই রাজনীতির স্বরূপটা মোটামুটি বুঝে ফেলেছে এবং বুঝে ফেলার কারণেই তারা রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর তাদের নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। সেই চাপের কারণে রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরিভাবে ইন্ডিয়ান ডিজাইন বা ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলোর ডিজাইনের সঙ্গে একমত না হয়ে আজকে একটা ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। আজ প্রণিধান করার বিষয় যে, ট্রানজিটের পক্ষে কত কুযুক্তিই না হাজির করা হল, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হল না এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সারাদেশে উত্থিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তি কিংবা ৩০ বছরের পানি চুক্তি– এসব চুক্তি সম্পাদন করে ক্ষমতাসীন দল প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, তারা একটি উদ্দেশ্যমূলক বৃহত্তর আঞ্চলিক সহযোগিতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মূলত এই পুরো অঞ্চলটাকে ভারতের জিও-ইকোনমিক এবং জিও-স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের মধ্যে নিয়ে আসার কাজটিই তারা সম্পাদন করছে। এটি সাধারণ মানুষের কাছে আজ অত্যন্ত স্পষ্ট। এই সূত্রে বিদ্বৎজনদের ভূমিকা আলোচনা করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হবে।

আমাদের এখানে সমাজ বিকাশ যেহেতু একটি বিকৃত রূপ ধারণ করেছে, সে কারণে আমাদের এখানে Intellectually যাদেরকে আমরা ডমিনেন্ট ইনডিভিজুয়ালস মনে করি, এদের অতীত যদি আমরা একটু ঘেঁটে দেখি, তাহলে দেখব, এরা সব সময়ই এখানকার রাষ্ট্রযন্ত্রের ধারক-বাহকদের উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়িয়েছে। এ ছাড়া এদের আর অন্য কোন ভূমিকা ছিল না এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছ থেকে খুঁদকুঁড়ো যোগাড় করে এরা সব সময় রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে আত্মা এবং বিবেক সঁপে দিয়েছে এবং এরাই পরোক্ষভাবে এক ধরনের জনসমর্থন তৈরী করার চেষ্টা করে। যে সমর্থন রাষ্ট্রযন্ত্রে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে এক ধরনের জনমতের সমর্থন বলে প্রতিভাত হয়ে এসেছে। বস্তুত এটি একটি নতুন Phenomenon এবং এই Phenomenon-কে বলা যায় a new form of totalitarianism-সর্বায়তিকতার একটা নতুন ধরন। যেটাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, Participatory despotism. Despotism-এর nature টা এমন যে, এখানে চরম স্বৈরতন্ত্র কাজ করবে, কিন্তু বাহ্যত দেখাবে যে, এই স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে জনসাধারণ সমর্থন যোগাচ্ছে, পার্টিসিপেশন অব সিটিজেন্স এখানে আছে। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে, তৃতীয় বিশ্বে এখন সবচেয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালী ফান্ডেড এনজিওগুলো। রাজনৈতিক দলের চাইতেও অনেক সময় দেখা যায়, এরা অনেক ক্ষমতাবান এবং আমাদের দেশে এনজিওজীবীরা– যেসব বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পরিবর্তে এনজিওদের ফরমায়েশে চলেন, তারাই হচ্ছেন এনজিওজীবী–এ একটি নতুন প্রপঞ্চ– এনজিওগুলোর মাধ্যমে এমপাওয়ারমেন্ট ও ডেমোক্রেটাইজেশনের নামে State tyranny-কে জায়েজ করছেন। নাগরিকদের নামে এবং নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার নামে একটি একক দলের প্রাধান্যে যেসব সংগঠন বা সমিতিকে contrive বা sponsor করে একটি mono-ideology [pseudo বা real] সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়, তা দুর্নীতি এবং চোরা অর্থনীতিকে পরিরক্ষণ ও লালন করে।

অবৈধতার এ উত্থান ও শাসনকে নিরঙ্কুশ করার জন্য inofrmation terrorism এবং thought policing অত্যাবশক। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য অংশ আজ এনজিওজীবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। যুক্তি এবং বিবেক দ্বারা পরিচালিত বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা

www.pathagar.com

যেমন কম, তেমনি বৈরী মুদ্রণ ও তড়িতনিক মাধ্যম তাদের প্রায় একঘরে করে ফেলেছে। উপরন্তু রয়েছে সামাজিক শক্তিসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা ও ছত্রছায়ার অভাব। এ পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যক্তিনেতৃত্ব। সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদার ব্যক্তিকরণ যাঁর বা যাঁদের মাধ্যমে যথার্থভাবে ঘটবে, তিনি বা তাঁরাই এ নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করবেন। রাজনীতিটা হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচারের ব্যাপার এবং অর্থনীতিটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের- কিন্তু ইতিহাসে অনেক সময় দেখা গেছে যে, সুপার স্ট্রাকচারাল লেবেলের পরিবর্তন ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল লেবেলকে এ্যাফেক্ট করে এবং এক ধরনের ইনভার্স চেঞ্জ সাধন করে। তৃতীয় বিশ্বের successs story থেকে এখানে আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের কথা উল্লেখ করতে পারি। মালয়েশিয়াতে আজকে মাহাথিরের মত যে নেতৃত্ব আমরা লক্ষ্য করছি, কিংবা সিঙ্গাপুরের লীকুয়ান ইউ'র মত যে নেতৃত্ব আমরা দেখেছিলাম তার সারমর্ম অনুধাবন করলে, সদগুণসম্পন্ন নেতৃত্বের গুরুত্ব আজ কত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। কীভাবে একটি পশ্চাৎপদ অর্থনীতি ক্রমে burgeoning capitalist economy থেকে আজ বিশ্বের লীডিং ইকনমিতে পরিণত হয়েছে, তা গভীর মনোযোগ দাবী করে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য যে মডেলটির কথা বারবার বলা হয় তা নিয়ে কিন্তু একটা সংশয় রয়েছে। সংশয় এ অর্থে যে, এ মডেলটি প্রথমে লালন করেছিল ফ্যাসিস্টরা। এই মডেলটিকে বলা হয়, কর্পোরেটিস্ট মডেল। এই corporatist model সম্পর্কে বিশিষ্ট পণ্ডিত Schimitter বলেছেন যে এটি হচ্ছে "a system of interest representation in which the constituent units are organized into a limited number of singular, compulsory, non-competitive, hierarchically ordered and functionally differentiated categories, recognized or licensed (if not created) by the state and granted a deliberate representational monopoly within their respective categories for observing certain controls on their selection of leaders and articulation of demands and supports." এই মডেলের দু'টো আসপেক্ট আছে। একটি স্টেট কর্পোরেটিজম, অন্যটি সোসাইটাল কর্পোরেটিজম। সোসাইটাল কর্পোরেটিজমকে সোসাইটির বিভিন্ন সোশাল ফোর্সেস-এর ডাইনামিক্সের মধ্যে দিয়ে নীচে থেকে prop up করে। আর স্টেট কর্পোরেটজিমের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রটা দখল করে ওপর থেকে একটি পরগাছা, পরজীবী শ্রেণী তা আরোপ করে এবং এই কর্পোরেটিস্ট মডেলে যদি কেউ যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে ফ্যাসিজমের যেমন একটা ঝোঁক থাকে তেমনি অন্যদিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃজনে একটি কর্তৃত্ববাদী সমাজকে বিকশিত হতেও আমরা দেখতে পাই। শেষোক্ত এই মডেলকে কেউ authoritarian বা disciplined democracy'র মডেল আবার কেউ contrived democracy'র মডেল হিসেবেও অভিহিত করেছেন। এ মডেলটির effective বাস্তবায়ন আমরা কোরিয়াতে দেখেছি, তাইওয়ান, শ্রীলঙ্কায় দেখেছি। কিন্তু তার বিপরীত চিত্রটা আমরা লক্ষ্য করি তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে, যেখান কর্পোরেটিস্ট মডেলটি ডেভেলপতো করেইনি, বরং একটি রুথলেস সোশাল ফ্যাসিস্ট ফর্ম ডেভেলপ করেছে। ম্যাক্স ভেবারের ভাষায় এটিকে আমরা এক্সট্রিম ফর্ম অব পেট্রিমোনিয়ালিজম হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি- এই ফর্মটিকে ম্যাক্সভেবার বলেছেন, sultanistic মডেল। আমি একে বাংলায় সর্বেশ্বরবাদ হিসেবে অভিহিত করি। সর্বেশ্বরবাদী মডেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, শাসনের বিষয়টি ট্র্যাডিশন বা আইডিয়ালিজম বা সেন্স অব মিশন কিংবা একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থাকে একটি ক্যারিজমানির্ভর আবেদনের কারণে রক্ষা করাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শাসক কীভাবে বেনিফিটেড হচ্ছে, তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও তাদের ক্রোনিগণ- তাদের পদলেহী স্তাবকগোষ্ঠী এবং তাদের সাথে বিভিন্ন যেসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী রয়েছে, এদের সকলের বেনিফিট নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রকে এমনভাবে ব্যবহার করা যেন এটি শাসক গোষ্ঠীর মৌরসি পাট্টা বা ব্যক্তিগত তালুক। শাসকের সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদকে

www.pathagar.com

একাকার করে ফেলা হয় এই মডেলে। গিফট্স এবং পে-অফ ছাড়া ব্যবসাপাতি এ মডেলে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আনুগত্য এবং পদলেহন সাফল্য ও উপরে ওঠার একমাত্র চাবিকাঠি। অফিসার বা আমলা বা যে কোন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাকে এই ক্ষুদ্র চক্রের কাছে আত্মসমর্পণ করে টিকে থাকতে হয়। ক্ষমতার যেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিকায়ন ঘটে না, তেমনি সমাজের কোন মহত্তর যৌথ লক্ষ্য অর্জনের জন্যও ক্ষমতার চর্চা হয় না। এমনকি, শ্রেণী অবস্থানও নির্ভর করে শাসক ও তার এই দুষ্ট চক্রের সংঙ্গে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের ওপর। চাঁদাবাজি, তোলাবাজি, চোরাপনবাজি এবং সন্ত্রাস নিত্যদিনের সামাজিক কার্যকলাপের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। বাংলাদেশে হাসিনার আওয়ামী শাসন এমনি সর্বেশ্বরবাদ বা sultanistic মডেলেরই শাসন। এ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে সত্যিকার অর্থে এমন এক নেতৃত্ব, যে নেতৃত্ব বর্তমানে বাংলাদেশ যে ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে, সেই অবস্থা উপলব্ধি করে- এ থেকে কীভাবে বিযুক্ত হওয়া যায়- তার যথোচিত রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করবে।

মাহবুব উল্লাহ :

আমি আপনার বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার চরিত্রটা হচ্ছে, সুলতানিস্টিক মডেলের মত। সুলতানিস্টিক মডেলের বৈশিষ্ট্যগুলো আপনি আলোচনা করেছেন। তবে আগামী দিনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সামনে যেটা কঠিন প্রশ্ন, যেটা কঠিন চ্যালেঞ্জ, সেটা হচ্ছে- বাংলাদেশের ইকোনমির অবস্থা। এখানে দেখা যাবে, স্মাগলিং, ইল্লিগাল ট্রেড, ড্রাগ ট্র্যাফিকিং, ব্ল্যাক মার্কেটিং, চাঁদাবাজি, তোলাবাজি, ঘুষ- এগুলোর অংক যদি হিসাব করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, আমাদের জিডিপি'র একটা বিরাট অংশ এখন এর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে কিন্তু দেশে কখনোই একটা সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরে আসবে না। এ ধরনের অবৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সুলতানিস্টিক মডেলের শাসকের নিকটজন, তার দলের লোক, ক্ল্যানের লোকগুলোই এই সমস্ত কাজে প্রশ্রয় পাবে এবং এর ফলে অর্থনীতির এই অবৈধ খাত আরো ফুলে ফেঁপে উঠবে। আমি আগামীদিনের নেতৃত্বের কাছে যা আশা করবো, সেটা হচ্ছে এই যে, এমন কিছু ইকোনমিক পলিসি ও স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেট করা এবং এই অবৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উৎসগুলো খুঁজে বের করা এবং সেগুলোকে একেবারে গোড়া থেকে কর্তন করার জন্য কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই কাজটা যদি আগামীদিনের নেতৃত্ব করতে না পারে, তাহলে বাংলাদেশের মানুষ যে তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই থেকে যাবে এবং গণতন্ত্রের জন্য আমাদের যে একটা বিরাট প্রত্যাশা, সেটা পূরণ হবার নয়। সে জন্য দল গঠনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে সে দিকে মনোযোগী হতে হবে, যাতে সুযোগসন্ধানী ও আদর্শবিবর্জিত ব্যক্তিরা প্রাধান্য বিস্তার না করতে পারে।

আফতাব আহমাদ :

হ্যাঁ, আপনি যথার্থই বলেছেন। আমি এই বলে শেষ করতে পারি- বিখ্যাত চেক নাট্যকার Vaclav Havel, যিনি পরবর্তীতে চেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, তিনি এই সর্বায়তিকতা এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি চমৎকার উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন "technological imperative, bureaucratization, the ungovernability of modern society, techniques of manipulation and persuasion, consumerism and conformism" এগুলো ভবিষ্যতে সর্বায়তিকতা সৃজনের সম্ভাব্য বীজ। অতএব কৃৎ কৌশলের অভাবনীয় অগ্রযাত্রা ও সমন্বয়কে মনে রেখে এবং একবিংশ শতাব্দীর দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজে গণতন্ত্রের নীতিমালা আমরা কীভাবে চর্চা করতে পারবো, সেই প্রণোদনা আমরা কীভাবে সঞ্চার করতে পারবো- সেই দিকেই বোধ হয় আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকা উচিত।

www.pathagar.com

৩ অক্টোবর ১৯৯৯

জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের অন্বেষায়

মাহবুব উল্লাহ :

বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের কলেজ, হাই স্কুল, প্রাইমারী স্কুলগুলোর পাঠ্যক্রম ও পাঠদানের মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। প্রতিবছর আমরা যেসব ছাত্রকে ডিগ্রী দিচ্ছি, তারা এই সব ডিগ্রীর জন্য কতোটুকু উপযুক্ত তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। সর্বোপরি আমরা যারা পাঠদানের সাথে জড়িত– আমরা নিজেরাও কতটা এই শতাব্দী কিংবা সমাগত নতুন শতাব্দীর জন্য একটা দক্ষ, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারি, সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে। আমরা জানি, যে পৃথিবীতে যত ধরনের সম্পদ আছে সব সম্পদই অর্থনীতির সূত্র অনুসারে ল অব ডিমিনিশিং রিটার্নের শিকার। কিন্তু একমাত্র সম্পদ 'নলেজ'-এর কোন ডিমিনিশিং রিটার্ন নেই। নলেজ হচ্ছে এমন এক ধরনের অ্যাসেট, যেটা অনেক সময় যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমেও ধ্বংস করা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির সমস্ত শিল্প এবং অন্যান্য সকল অবকাঠামো সমূলে ধ্বংস হয়েছিল। জাপানেরও অবকাঠামোগত অনেক ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু জার্মানি ও জাপানের বিজ্ঞানীরা, বিদ্বৎসমাজ শিক্ষার সাথে যারা সম্পর্কযুক্ত তাঁরা জীবিত ছিলেন, সেহেতু আমরা লক্ষ্য করেছি, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে জার্মানী ও জাপান মাত্র ১০ থেকে ১৫ বছরের ব্যবধানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আজকের পৃথিবীতে প্রযুক্তির দিক থেকে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্র হচ্ছে জার্মানি ও জাপান। এছাড়া এটাও বলা হয় যে, একবিংশ শতাব্দী হবে জ্ঞানের সমাজ, জ্ঞানের পৃথিবী, Knowledge based society. অথচ আমরা বাংলাদেশে এমন একটা আত্মধ্বংসী, আত্মঘাতী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছি, যেখানে মনে হয় যে, জ্ঞানের কোন স্থান নেই, জ্ঞানের কোন মান নেই, জ্ঞানী মানুষের কোন প্রয়োজন নেই এবং জ্ঞানচর্চার কোন অবকাশ নেই। আমরা অর্থের পেছনে ছুটছি। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সৌকর্য অর্জন করতে হয় তা মানছি না। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসকবলিত। বছরের অধিকাংশ সময় সন্ত্রাসের কারণে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। পরীক্ষা পিছিয়ে যায় এবং ছাত্রদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। এই ধরনের সন্ত্রাসকবলিত পরিবেশে সত্যিকার সুষ্ঠু পাঠদান সম্ভব বলে কেউ মনে করেন না। সুতরাং আমার মনে হয়, একটা সরকারের যদি সত্যিকার অর্থে দেশের উন্নয়নের প্রতি কোন অঙ্গীকার থাকে, তাহলে সর্বাগ্রে সেটা থাকা উচিত শিক্ষার প্রতি।

বেশ ক' বছর আগে আমি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম তখন প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বলেছিলেন, রাষ্ট্র তার অন্য সব বিষয় বাদ দিয়ে যদি একটি কাজে মনোযোগ দেয় তাহলে জাতি গঠন কাজের পনের আনাই সম্পন্ন হয়েছে ভাবা যেতে পারে সেটা হচ্ছে– সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা এবং উন্নত, প্রাগ্রসর একটা জ্ঞানের পরিবেশ তৈরী করা। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে এটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে ঐ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বা শিক্ষিত মানব সম্পদ ও তাদের মেধা, যোগ্যতা ও সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সেটা করতে সক্ষম হবে। এইভাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তি যখন তার নিজের আত্মোন্নয়নের পথ বেছে নেবে, সেটা এডাম স্মিথের ভাষায়, সবশেষে সমগ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন বা ওয়েলফেয়ারের পথে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

কিছুদিন আগে 'এশিয়া উইক' নামে একটি সাময়িকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান দিয়েছে। তাতে দেখা যায়, এশিয়ার ৫০টি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান ৪৩-এ উঠে এসেছে। কীভাবে এটা সম্ভব হল, সেটা আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। একটা বিশ্ববিদ্যালের মান নির্ভর করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর, শিক্ষকদের গবেষণার মানের ওপর এবং সেই সব গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে কতটা সমাদৃত হয়েছে, বিদ্বৎসমাজ তাদের সেই গবেষণার ফলাফলকে কতটা গ্রহণ করেছে তার ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো কতখানি উন্নত তার ওপর। অর্থাৎ সেখানে লাইব্রেরীর সুবিধা বা কম্পিউটার সুবিধা, বিজ্ঞান গবেষণাগারের সুবিধা কতটা আছে, কতটা উন্নতমানের– ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এছাড়া একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কী ধরনের গবেষণা-থিসিস প্রতিবছর তৈরী হয় সেটার ওপরও একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মান নির্ণয়ে একটা সূচক ব্যবহার করা হয়। যে সূচকের মাধ্যমে প্রতিবছর একটি বিশ্ববিদ্যালয় কোন স্তরে আছে, সেটা নির্ণীত হয়। আমি এখানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাটার ওপর একটু জোর দিচ্ছি এজন্য যে, আমরা দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সাথে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটছে, তা আমাদের প্রতিনিয়ত ব্যথিত ও চিন্তিত করে, উদ্বিগ্ন করে এবং নিজেরাও যথেষ্ট মনোকষ্ট ও যাতনায় ভুগি। সেই জন্য আমরা যথেষ্ট Concerned feel করি এবং ভাবি কীভাবে এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আমরা আরও অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রদের উচিত শুধামাত্র সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক পাঠ করা বা কিছু নোট গলাধঃকরণ করাই নয়, তার সাথে সাথে তার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব বই প্রতিনিয়ত বিশ্বের বাজারে প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলোর সাথেও পরিচিত হওয়া, সেখানে আমাদের ছাত্ররা দু'চারজনকে বাদে– বাংলা ভাষার বাইরে অন্য কোন ভাষায় রচিত বই পড়তে সক্ষম হয় না এবং পড়ে না বলেই আধুনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসব অগ্রগতি, তার সাথে তাদের মোটেও পরিচয় ঘটে না। কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে একটি সেমিনার হয়েছিল উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে। সেই সেমিনারে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক অকপটে স্বীকার করলেন, 'আমি নিজে ইংরেজী ভাষা জানি না, ইংরেজী ভাষা পড়ে বুঝতে পারি না, সুতরাং আমাকে বাংলা ভাষাতেই কথা বলতে হবে।' ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন এবং তিনি সত্য কথাটাই উচ্চারণ করেছেন। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের এই অবস্থা, সেখানে ছাত্রদের যে কী অবস্থা, সেটা সহজেই চিন্তা করা যায়।

এর সাথে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস, সমাজ জীবনের ইতিহাসের দিকেও একটু লক্ষ্য করা দরকার। ইংরেজ শাসন যখন এই দেশে আসে তখন এই দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী ফার্সী ভাষায় লেখাপড়া করত। ফার্সী ছিল রাজদরবারের ভাষা, আদালত ও প্রশাসনের ভাষা। মুসলিম জনগোষ্ঠী সেই ভাষার সাথেই বেশী পরিচিতি ছিল। সেই ভাষারই চর্চা করত। কিন্তু বিদেশী শাসকরা আসার ফলে তারা বিদেশীদের ভাষা ইংরেজীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এই মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ফলে মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে বহু পেছনে পড়ে যায়। এর ফলে মুসলমানদের সামাজিক অবস্থানও নাজুক হয়ে পড়ে। হান্টার মুসলমানদের অবস্থান সম্পর্কে তার গ্রন্থে যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে– ১৮৭২ সালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যকলাপে মুসলমানদের অবস্থান একেবারেই যেটাকে বলা যায় মাইক্রোস্কপিক। এর ফলে মুসলিম সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি এবং আধুনিক ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিতির ক্ষেত্রে অনেক পিছনে পড়ে যায়। তারই আরেক ধরনের পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ্য করলাম, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হল। এটা সত্য, মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধের কারণে, মাতৃভাষার প্রতি আমাদের আবেগের কারণে আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করেছিলাম এবং এই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা হবে,

www.pathagar.com

লেনদেনের ভাষা বাংলা হবে– এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কথা তো ছিল না যে, আমরা সর্বতোভাবে আন্তর্জাতিক মাধ্যমগুলো, বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা পরিত্যাগ করব– কিন্তু আমাদের দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী, একটা অদ্ভুত ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে এই কথা বলতে শুরু করলেন যে, সর্বস্তরে পাঠদানের মাধ্যম হওয়া উচিত বাংলা এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, বাংলাদেশের সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের মাধ্যম হিসেবে বাংলাই চালু হয়ে গেছে। এমনকি যারা ইংরেজী ভাষায় খুব সুন্দরভাবে কথা বলতে পারতেন, নিজের ভাববিনিময় করতে পারতেন; তারাও দীর্ঘদিন ছাত্রদের বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়াতে গিয়ে ইংরেজী ভুলতে শুরু করেছেন। এর ফলে একটা বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে। এই একপেশে বুদ্ধিজীবীরা কথায় কথায় বলেন যে, বাংলা একাডেমীর উচিত পৃথিবীর নামকরা গ্রন্থগুলোর বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা। অনুবাদের প্রয়োজন আছে, এটা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এটাও তো সত্য কথা যে, আজকে প্রকাশনার জগতে, পাবলিকেশন্সের মার্কেটে একটা ভূমিকম্প, একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে। প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ওপর হাজার হাজার প্রবন্ধ, গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলোর প্রতিটি অনুবাদ করা এবং এগুলো থেকে তথ্য আহরণ করে সেটাকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা খুবই কঠিন, সময়সাধ্য এবং অত্যন্ত ব্যয়সাধ্যও বটে। তার চাইতে অনেক সহজ হবে ইংরেজী ভাষা রপ্ত করে সেই ভাষার মাধ্যমে সেসমস্ত গ্রন্থাবলীর প্রবন্ধ ও গবেষণাগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যখন জীবিত ছিলেন, তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা আমার শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি ৩৩টি ভাষা জানতেন। এর মধ্যে অনেকগুলো ছিল এই উপমহাদেশের ভাষা। কিন্তু এছাড়াও তিনি জার্মান, ইংলিশ, ফরাসী, আরবী– এসব ভাষাও জানতেন। তিনি একটা কথা বলতেন, একেকটি ভাষা হচ্ছে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার চাবি। জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করার চাবির সাথে একটি ভাষাকে তুলনা করা যায়। এখন, আমরা যে আত্মঘাতী কাজটা করেছি, তার মধ্যদিয়ে সেই চাবিটাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অথবা সেই চাবিটার ব্যবহার আমরা ভুলে গেছি। এর ফলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা সংকট দেখা দিয়েছে। আমরা কথায় কথায় বলি, একবিংশ শতাব্দীর জন্য আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, সেই প্রস্তুতি থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি।

দেশের মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে অনেকেই বিদেশের মাটিতে পা বাড়াচ্ছে এবং বিদেশে কাজকর্মের সুবিধার জন্য তাদেরকে কিছু কিছু ইংরেজী ভাষাও রপ্ত করতে হচ্ছে এবং বাজারে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, কত সহজে ইংরেজী ভাষা শেখা যায় সে সংক্রান্ত কিছু বই-পত্রও প্রকাশিত হচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টর, বিশেষ করে কিছু কোচিং সেন্টারের মাধ্যমেও অদ্ভুত সব এডভার্টাইজমেন্ট লক্ষ্য করা যায়। এসব বিজ্ঞাপনে বলা হয় যে, ছয় ঘন্টার মধ্যে আপনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইংরেজী শিখতে পারবেন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ এক তীব্র সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে। উপর স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস নামার ফলে নিম্নস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ধস নেমেছে। কারণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা শিক্ষক হন, মাধ্যমিক বা কলেজ পর্যায়ে যারা শিক্ষক হন, তাঁরা কিন্তু অনেকেই এখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ, এমএ ডিগ্রী নিয়ে এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। তাঁদের বিদ্যার দৌড় যেরকম, তাঁরা সেরকমই শিক্ষা দেন এবং এর একটা vicious সার্কেল দেশে গড়ে উঠেছে। এ থেকে দেশকে এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি মুক্ত করা না যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার। বিশেষ করে এটা কম্পিউটারের যুগ এবং কম্পিউটার ইংরেজী ভাষা বোঝে। অন্য ভাষা তেমন বোঝে না। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি রাষ্ট্রের যে এক ধরনের অবহেলা, সেটাকে আমি বলব, এক ধরনের ক্রিমিনাল ইনডিফারেন্স এবং সরকার নির্বিশেষে এই ইনডিফারেন্সটা লক্ষ্য করা যায়। বাজেট পেশ করার সময়ে অর্থমন্ত্রীরা বলেন, আমরা শিক্ষার জন্য সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ দিয়েছি। কিন্তু এই 'সর্বাধিক' বরাদ্দের মধ্যে

www.pathagar.com

ইট-কাঠ, বালু, সিমেন্ট অর্থাৎ দালানকোঠা নির্মাণের জন্য কতটা দেয়া হয় আর সত্যিকার মানসম্পন্ন, গুণসম্পন্ন প্রজ্ঞা ও মেধাসম্পন্ন শিক্ষক ও ছাত্র তৈরী করার জন্য কতটা দেয়া হয়– সে সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। শিক্ষার জন্য যে সম্পদ আমরা এলট করছি, তার এফিশিয়েন্সির দিকটাও কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে। আগেকার দিনে, এক সময়ে যখন মক্তবের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন বেঞ্চ বা ভাল বসার ব্যবস্থা ছিল না, সেখানেও কিন্তু দেখা গেছে, অনেক ছাত্র-ছাত্রী অন্তত থ্রি আরের সঙ্গে– রিডিং, রাইটিং ও এরিথমেটিক্ এর সঙ্গে চমৎকারভাবে পরিচিত হয়েছে। আজকে কিন্তু সেটা হচ্ছে না। তার পাশাপাশি আরেকটি বিরাট সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটি হচ্ছে, দেশের বহু ছাত্র, বিশেষ করে যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, যারা ভাল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে– তারা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা বা ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভব না হলেও তারা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজগুলোতে যাচ্ছে। এর ফলে আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এটা জাতির জন্য কতটা কাম্য, সেটাও আজ বিচারের প্রশ্ন। কারণ, শিক্ষা যে শুধু তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তাই নয়– শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে। শিক্ষা মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। আজকে বিদেশে প্রশিক্ষণ, জ্ঞান অর্জন ও এর পাশাপাশি এটাও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, দেশের মাটিতে যাতে একটা সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যার ফলে দেশে থেকে, দেশের অর্থনীতিতে, দেশের রাজনীতিতে, দেশের সামাজিক জীবনে, দেশের শিল্পায়নে অবদান রাখা যায়। এরকম একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে এবং আমি এটাও মনে করি যে, সমস্যা হিসেবে এটা আমাদের একটা রাজনৈতিক সমস্যা। আমাদের রাজনীতিবিদরা, বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, তাদের চিন্তা-ভাবনায় কী প্রায়োরিটি দেন; কী অগ্রাধিকার নির্ণয় করেন– এটা তার সাথে সম্পর্কিত। তবে যে নতুন শতাব্দী আসছে, তখন আমরা যদি এই জ্ঞানের ক্ষেত্রটাকে অবহেলা করি, তা অত্যন্ত সর্বনাশা ব্যাপার হবে। সাম্প্রতিককালে প্রেসিডেন্ট নিজে উচ্চশিক্ষা, শিক্ষার মান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে নানা বক্তব্য ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সে পর্যন্তই। কেননা, প্রেসিডেন্টের এখানে তেমন একটা কিছু করণীয় নেই।

উন্নত জ্ঞানার্জনের জন্য কী করে দ্রুত বিদেশী ভাষা, বিশেষ করে ইংরেজী– যেটি সবচেয়ে বেশী প্রচলিত আন্তর্জাতিক ভাষা– সেই ভাষা শেখার জন্য কী ধরনের অবকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা বা সহজসাধ্য অবস্থা আমরা সৃষ্টি করতে পারি, সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা দরকার। শুধু পরীক্ষায় ডিগ্রী নেওয়া যেটাকে অর্থনীতিবিদরা বলছেন ডিপ্লোমা ক্রেইজ বা ডিপ্লোমা ডিজিজ– তা থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকার জ্ঞান চর্চার প্রতি মনোযোগী ছাত্রদের মধ্যে প্রণোদনা যাতে সৃষ্টি করা যায়– সে ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি– সেটাও আমাদের চিন্তা করা দরকার। আমাদের যে ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম আছে, যে পরীক্ষা পদ্ধতি আছে, সে সম্পর্কেও আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, একেক সরকারের আমলে একেকটি কমিশনের বেশ ঢাকঢোল পেটানো হয় এবং বর্তমান সরকার কুদরত-ই খুদা কমিশনের আধুনিকায়নের নামে আরেকটি কমিশন নিয়োগ করে এবং সেই কমিশনে তাদের অনুগত লোকদের দিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে চা-নাশতা খাওয়ার মধ্যদিয়ে কয়েকশ' মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেছে এবং একটা রিপোর্ট পেশ করেছে। এই রিপোর্টটাকে একটা লন্ড্রিলিস্ট যদি বলা হয়, তাহলে সেটা সেই ধরনেরই একটা রিপোর্ট। "ইহা করিতে হইবে, উহা করিতে হইবে," কিন্তু কীভাবে করা যায়, বা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী, এর জন্য কী ধরনের সম্পদ প্রয়োজন হবে, কী ধরনের শিক্ষক এবং সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন হবে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে সেটা কতটুকু করা সম্ভব; বেসরকারী পর্যায়ে কতটুকু সম্ভব সেটা চিন্তা করা হয়নি। অন্যদিকে যারা ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলোতে পড়ছে এবং বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে তারা একটা নতুন শ্রেণী সমাজে সৃষ্টি করছে। তার ফলে সামাজিক বৈষম্যও সৃষ্টি হচ্ছে। চাকরির

www.pathagar.com

বাজারে, কাজের বাজারে তারাই প্রাধান্য পাচ্ছে। ভাল ভাল প্রতিষ্ঠানে তারা নিয়োজিত হচ্ছে। অন্যদিকে গ্রামের ছেলেরা অনেক পিছিয়ে পড়ছে। এক সময় গ্রামের স্কুলগুলো থেকে এসএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথমদিকে অনেকেই থাকত। কিন্তু আজ একটি গ্রামের স্কুলের নাম করা যাবে না– যেখান থেকে মেধা তালিকায় কেউ থাকছে। অর্থাৎ গুণগতভাবে উন্নত শিক্ষাটা শহরকেন্দ্রিক, বিত্তকেন্দ্রিক, এলিটকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। কাজেই শিক্ষা সমস্যার বহু ডাইমেনশন আছে। আমরা যদি এই সমস্যাগুলোর কিছু সমাধান চিহ্নিত করতে পারি, কিছু দিকনির্দেশনা দিতে পারি তাহলে, জাতি কিছুটা উপকৃত হবে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও কিছু দিকনির্দেশনা পেতে পারে। আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আমার ব্যক্তিগত কিছু চিন্তা-ভাবনা আছে। সারাদেশে নকলপ্রবণতা মহামারীর মত ছেয়ে গেছে। এ অবস্থা থেকে কীভাবে আমরা মুক্ত হতে পারে, সে সম্পর্কেও আমরা একটা চিন্তা-ভাবনা করতে পারি।

আফতাব আহ্মাদ :

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার অবস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিরাজমান পরিবেশ নিয়ে আজ আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। শুধু চিন্তা করলেই চলবে না, আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং শুধু সিদ্ধান্ত নিলেই চলবে না– সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নও করতে হবে। আর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমরা যদি নিজেদের সুশিক্ষিত এবং যথোচিতভাবে প্রশিক্ষিত করে না তুলি তাহলে আমরা শুধু পিছিয়েই পড়বো না, অন্যের গোলামেও পরিণত হবো। অতএব শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব ও প্রাধান্য আরোপ করে আমাদেরকে অবশ্যই সুশিক্ষার মধ্য দিয়ে দক্ষ ও যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। Frederick Harbison এবং Charles Myers যথার্থই বলেছেন যে "education is the key that unlocks the door to mordenization". Economic Growth and Investment in Education সংক্রান্ত Policy Conference এ OECD ১৯৬১-তে যে report পেশ করে তাতে বলা হয় যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা (Deeper understanding of the forces affecting long-term economic and social progress in leading to recognition of the fact that investment in education is an indispensable prerequisite of future economic growth) একই সঙ্গে এখানে বলা দরকার যে, যে কোন অর্থবহ রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে ন্যূনতম শর্ত প্রয়োজন তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অপরিহার্যতার সঙ্গে যুক্ত। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং এ্যারিস্টটল বলেছেন, "as is the state, so is the school" অর্থাৎ যেমন রাষ্ট্র, তেমনি তার বিদ্যায়তন। শিক্ষা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শর্ত না হলেও তা যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তা আজ আর কেউই অস্বীকার করেন না। James Mill থেকে শুরু করে John Dewey, Seymour Lipset, David Lerner, James Conant প্রমুখ পন্ডিতগণের মতে রাষ্ট্রের Political capacity and capability র efficiency increase করতে হলে এবং effective করতে হলে আধুনিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। "What you want in the state, you must put into the school" রাষ্ট্রের কাছ থেকে যা চান তার সমমূল্যের খরচ বিদ্যায়তনে করতে হবে। কিন্তু এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের বিদ্যায়তনগুলো আজ সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত। একটি উন্নত আত্মনির্ভরশীল জাতি গড়ে তুলতে হলে বিদ্যায়তনের মান ও গুণগত উৎকর্ষকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বিদ্যায়তনে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানকে বিকশিত করা হয়, পরিশীলিত করা হয় এবং পরিস্ফুট করা হয়।

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার সময়ে যদি একটি বিষয়ে আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহলে অত্যন্ত প্রাঞ্জল হয়ে যাবে সমগ্র বিষয়টি। বাংলাদেশের

www.pathagar.com

অভ্যুদয়ের মধ্যদিয়ে আমরা যেমন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র অর্জন করেছি, তার সাথে আমরা যে জিনিসটি হারিয়েছি সেটি হচ্ছে একটি উন্নত মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ। যে সামাজিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়ে একটি অধঃপতিত বিকৃত মূল্যবোধ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক কেন্দ্রিকতা না থাকার কারণে এর মধ্যে প্রবিষ্ট brutalization process মানুষকে dehumanized person এ রূপান্তরিত করে। এর সাথেই খুন, হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানির মাত্রা ঘন ও তীব্র রূপ লাভ করে। যুগপৎভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটি সাংঘাতিক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি। এই ব্যাধিকে আমি বলি জনতুষ্টিবাদের ব্যধি বা পপুলিজমের ব্যাধি। যা বললে হাততালি পাওয়া যাবে, বাহবা পাওয়া যাবে বা মারহাবা ধ্বনি উচ্চারিত হবে তাই বলতে হবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখবো, যে দল সমাজতন্ত্র কী জিনিস বোঝা তো দূরের কথা, সাধারণ শোষিত মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে একটি সৎ রাজনীতি পর্যন্ত কোন দিন চর্চা করেনি, সেই দল সমাজতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং লুটপাটের একটি অর্থনীতি প্রবর্তন করে। ঠিক তেমনি শিক্ষাঙ্গণের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব– সেখানে বিরাজ করছে ভয়াবহ এক অরাজকতা। এককালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা অ্যাকাডেমিক ফ্রীডম বা বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতাকে ভ্রম করে স্বায়ত্তশাসনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হবে– এই ধ্বনিই আমাদের মুখ্য দাবী হয়ে ওঠে। এই দাবীর ফলে ৪টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে আইন প্রণীত হয়েছে সেই আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে পাঠদান কার্যক্রমের চেয়ে শিক্ষক রাজনীতির দিকে প্ররোচিত করেছে অনেক বেশী। আমি মনে করি, এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে আইন প্রণীত হয়েছে সে আইন মূলত পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের নকল এবং এ আইনের মূল লক্ষ্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করা বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে আপনি যেটা বলেছেন, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা প্রবর্তিত হয়েছে, বাংলাদেশ হওয়ার পরে এটা খুব একটা খারাপ সিদ্ধান্ত ছিল না। যদি এটাকে আমরা সততা ও নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করতাম। কিন্তু এর সাথে আরেকটি মাত্রা যোগ করা হলো। সেটি হল– কোন অবস্থাতেই ইংরেজী ভাষা চর্চা করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজী বিভাগ ছাড়া আর কোথাও ইংরেজী ভাষা চর্চা করা যাবে না। আমরা সবাই জানি যে, দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ করে ম্যাকলে সাহেব যখন এই শিক্ষা ব্যবস্থা বৃটিশ-ভারতে প্রবর্তন করেন তখন থেকেই ইংরেজী ভাষাটা স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু জনতুষ্টিবাদের শিকার হয়ে এবং জনতুষ্টিবাদকে লালন করতে গিয়ে আমরা সর্বস্তর থেকে ইংরেজী বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে উচ্ছেদ করে দিলাম। এমনকি ডিগ্রী পর্যায়ে ইংরেজীকে বাতিল করে দেয়া হল। আমরা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে এগুলোর বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু জনতুষ্টিবাদের কাছে আমাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে এবং সর্বত্র ইংরেজী ভাষাকে নির্বাসনে দেয়া হয়েছে।

আমাদের এই অঞ্চলে ভারতীয় আধিপত্যবাদীদের কূট চক্রান্ত সম্পর্কে যারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল তাদের সকলেরই জানা আছে যে, ভারতীয় আধিপত্যবাদীদের সেবাদাসেরা, নিয়োগীরা এবং ভাড়াটে কুচক্রীরা কোন অবস্থাতেই চাইবে না আমাদের এখানে জ্ঞান ও মেধার বিকাশ হোক। সে কারণে তারা আমাদের বিদ্বৎজনদের মধ্যেও এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। কলকাঠি নেড়ে চমৎকার একটা কথা বাজারে ছেড়ে দিল। কী সেটা? ইংরেজী ভাষা চর্চার দরকার নেই। মাতৃভাষায় সবকিছু করা যাবে। আপনি যে কথা বললেন, ইংরেজ শাসন বা ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর বাংলাদেশের মুসলমানরা যেমন ইংরেজী ভাষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, বাংলাদেশ হওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষ ইংরেজী ভাষা

www.pathagar.com

থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ শাসনে যেমন বাংলাদেশের মুসলমানরা বঞ্চিত হয়েছে এবং পশ্চাদপদ থেকেছে, অধঃপতিত হয়েছে, আজকে ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। একটা জিনিস এখানে আমাদের বোঝা দরকার। আমাদের এখানে ভাষা আন্দোলন হয়েছে। এই আন্দোলনটি ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং তাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়ার। বাংলা ভাষার মর্যাদা অর্জন বা রক্ষার অর্থ এই নয়, ভিন্ন ভাষাকে তাড়ানো বা অপদস্ত করা। পাশ্চাত্যে আজকে যে নতুন নতুন উদ্ভাবনা, নতুন নতুন চিন্তা ও ধারণার জন্ম হচ্ছে, তার সঙ্গে খুব সহজেই যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু ইংরেজী ভাষাকে বিদায় দিয়ে আমাদেরকে কূপমণ্ডূকতার দিকে ঠেলে দেয়ারই একটি নীলনকশা প্রণীত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

গ্রীক দার্শনিক, প্রখ্যাত পণ্ডিত সক্রেটিস বলেছেন Virtue is Knowledge এবং আমরা এও জানি, আরেক জ্ঞান তাপস Francis Becon বলেছেন– Knowledge is itself power. এই নলেজ যত বেশী সংকুচিত করা যায়, আমাদের প্রতিপক্ষ, আমাদেরকে যারা অবদমিত অবস্থায় দেখতে চায়, তাদের সাফল্য তত বেশী হবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যদি আমরা পিছিয়ে থাকি, আমাদের কী করুণ পরিণতি হতে পারে– আমরা যদি অন্যসব ক্ষেত্রেও হাইপোথেটিকালি ধরে নেই, বিপুল শক্তির অধিকারী হতে পারি, তারপরও আমরা বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। ইতিহাস আমাদের একটা জিনিস শিক্ষা দিয়েছে। রোমানরা যখন গ্রীস দখল করে নেয় তখন সভ্যতার ইতিহাস সাক্ষ্যদেয় যে, "গ্রীস ওয়াজ কনকারড বাই রোম। বাট রোম ওয়াজ কনকারড ইনটার্ন বাই দ্য গ্রীক্স"। কারণ গ্রীক সভ্যতা এত উন্নত ছিল, তাদের জ্ঞান এত উঁচুমানের ছিল যে, সামরিক ক্ষমতায় শক্তিশালী রোমক সাম্রাজ্য গ্রীসকে পদানত করা সত্ত্বেও রোম গ্রীস দ্বারা বিজিত হয়েছিল। Culturally তারা এত Advanced ছিল।

আজকে আমাদের দেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি কেন, আমরা যদি স্কুল-কলেজের দিকে তাকাই সেখানেও পপুলিজম বা জনতুষ্টিবাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। যে কথা বললে ছাত্ররা খুশি হবে, শিক্ষকদের সে কথা বলতে হবে। যে ধরনের প্রশ্ন করলে ছাত্ররা খুশি হবে, সে ধরনের প্রশ্ন করতে হবে। এর কারণ, আবারও আমাদের ফিরে যেতে হবে দু'টি প্রসঙ্গে। একটি হচ্ছে রাজনীতিবিদরা এবং রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে যে দল রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেই দল শিক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে দেখছে সে প্রসঙ্গে এবং শিক্ষাব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত শিক্ষাদান ও পাঠদান অর্থাৎ আমরা শিক্ষকরা এ বিষয়টাকে কীভাবে দেখছি সে প্রসঙ্গে। একটা সময় ছিল, যখন কষ্ট করে বইপত্র পড়তে হত। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীরা কষ্ট করে নোট তৈরী করত বইপত্র পড়ে। আমাদের এখানে দেখুন বিজ্ঞান এবং কৃৎকৌশলের কী অধঃপতিত এবং বিকৃত ব্যবহার। এখন ছেলেমেয়েরা বইপত্র পড়ে নোট তৈরী করার পরিবর্তে, তাদের পূর্বতন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নোটটা সংগ্রহ করে রাখে। পরীক্ষার দু'দিন আগে ফটোকপিইং মেশিন দিয়ে একটা কপি বের করে নিয়ে সেটা কণ্ঠস্থ করে ফেলে। অর্থাৎ, মূল বইয়ের দিকে নজর দেয়ার সময় তাদের হাতে নেই। অন্যদিকে তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে অস্ত্র, মাদক এবং অধঃপতিত একটি রাজনীতি। অধঃপতিত রাজনীতিটা কী? রাজনীতিটা হচ্ছে টেন্ডারবাজি। রাজনীতিটা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করতে হলে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের ওপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করা যাবে, রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের সাথে ঠিকাদারদের যে সংযোগ– এ বিষয়গুলো আজ আমাদের ভাববার বিষয়। সেজন্য আমি মনে করি না, যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেটা খুব সহজে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে হলে আমাদের প্রথমেই পরিহার করতে হবে জনতুষ্টিবাদী বা পপুলিস্ট কথাবার্তাগুলো। যেমন ধরুন শিক্ষা হল সকলের অধিকার। এটি যত সহজভাবে বলা যায় বাস্তবে তা নয়। শিক্ষা যেমন এক অর্থে সকলের

www.pathagar.com

অধিকার আবার অন্য অর্থে নয়। এটা কী অর্থে আমরা বলবো? যে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে তাকে সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

কিন্তু যে উচ্চতর জ্ঞানলাভের উপযুক্ত নয়– উচ্চতর জ্ঞান লাভের মেধা যার নেই, তাকে আর সুযোগ দেয়া যায় না। আমি জোর করে যখন কাউকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকাবো, বা ঢোকাতে চাইব, তখন কী দাঁড়ায়? আমরা পাকিস্তানী আমলে একটি জনতুষ্টিবাদী কথা বলতাম— শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি চলবে না। এর দ্বারা আমরা কী বুঝতাম এবং ব্যাখ্যা করতাম তা কিন্তু আজকে অনেকেই স্মরণ করতে পারে না। একটি ছাত্র বা ছাত্রীর যদি মেধা থাকে, তাকে উচ্চতর জ্ঞান লাভের সুযোগ দিতে হবে। এটি হচ্ছে, তার স্পিরিট। কিন্তু আমরা দাঁড় করালাম কী? আমি একটি ধাপ শেষ করেছি অর্থাৎ আমি এসএসসি পাস করেছি, আমাকে এইচএসসি পড়তে দিতেই হবে। আমি এইচএসসি পাস করেছি, আমাকে অনার্স পড়তে দিতেই হবে। আমি অনার্স পাস করেছি, আমাকে মাস্টার্স পড়তে দিতেই হবে। ঐ জ্ঞান আহরণ করার যোগ্যতা আমার আছে কী নেই, সেটা পরিমাপ করার কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে কর্মবাজারের কোন সম্পর্ক নেই। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পাস করে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে চাকরি করতে হয়। বাংলা ভাষায় পাস করে ব্যাকিং-এ চাকরি করে। অর্থাৎ যে বিদ্যাটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন ছাত্র বা ছাত্রী অর্জন করল, তার সাথে তার পেশাগত জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। তদুপরি অন্যদিকে দেখা যায় যে মেধার অভাবে বিদ্যার ঐসব ক্ষেত্রে মৌলিক জ্ঞান সৃজনের ক্ষমতা অর্জনেও ছাত্রছাত্রীরা ব্যর্থ। তাহলে বুঝতে হবে শুধু ডিগ্রীর জন্য ডিগ্রী অর্জন করার নামে মূলত আমরা চিন্তার দৈন্যকেই প্রসারিত করছি এবং প্রকটতর করে তুলছি। সর্বত্র মুর্খতার চাষ ও ছড়াছড়িকেই উৎসাহিত করছি। আজকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা যে পর্যায়ে নিয়ে এসেছি, সেখানে মনে হয় না, আমরা জাতির প্রতি সুবিচার করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, সেশনজট, নকলের প্রবণতা, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সমাজের আরেকটি অংশে একটা ভিন্নতর চিত্র আমরা লক্ষ্য করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব অর্থবান বিত্তবানদের সন্তান ভর্তি হতে পারে না, কিন্তু মেধা নেই, যোগ্যতা নেই– তারা অর্থবলে হয় প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনগুলোতে যাচ্ছে, নতুবা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা অন্যত্র কোনরকমে ভর্তি হয়ে একটি ডিগ্রী জোগাড় করে আনছে। এও কিন্তু সমাজের জন্য এক ধরনের উৎপাত। এরা এসে সোশ্যাল সিস্টেমটার ওপর নানা ধরনের প্রেসার ক্রিয়েট করে। আমি সাম্প্রতিক একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে পারেনি বা ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করেছে এমন সব ছেলেরা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের কতগুলো প্রতিষ্ঠান থেকে অনার্স ডিগ্রী নিয়ে আসে। তাদের মধ্যে ফার্স্টক্লাস পাওয়া ছেলেও আছে। তারা এসে এখানে দাবী করল যে, তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সে ভর্তি করতে হবে। আমাদের বিভাগে আমরা তাদের একটি ভর্তি পরীক্ষা নিলাম। ফার্স্টক্লাস পাওয়া ছেলেটি ভর্তি পরীক্ষায় নাম্বার পেল এক্'শ'র মধ্যে মাত্র ১০। শুধু ফেল করেনি, ফেলের চাইতেও খারাপ। আর পঁচিশ জনের মধ্যে অধিকাংশই পেয়েছে শূন্য। এই হচ্ছে মান। তাহলে এটার যে একটা ইমপ্যাক্ট সোসাইটির ওপর পড়বে সেটাত স্বাভাবিক। কিন্তু এর আরেকটি দিক হচ্ছে– যারা সন্ত্রাস বা সেশনজটের কারণে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করছে না, তাদের একটা বিরাট অংশ কিন্তু পাশ্চাত্যের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে আসছে মেধার জোরে। এরা জ্ঞানের দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত ও অগ্রসর এবং সমাজকে এদের দেয়ার অনেক কিছু আছে। আমি মনে করি, এরা আমাদের জন্য ন্যাশনাল অ্যাসেট। এই দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকে বলার চেষ্টা করেন যে, এক ধরনের বৈষম্য সমাজে সৃষ্টি করছে। এই ছেলে-মেয়েগুলো, যারা পাশ্চাত্য থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে আসছে, তাদেরকে আমি এলিটকেন্দ্রিকতার দোহাই দিয়ে ডিসক্রিমেনিটারি

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চাই না। কারণ, আমাদেরকে একটি কথা মনে রাখতে হবে- প্রশাসন, রাষ্ট্র, এমনকি ব্যবসা চালাতে যদি আমার ন্যূনতম জ্ঞান না থাকে, যদি এফিসিয়েন্সি না থাকে এবং আমি লেটেস্ট টেকনোলজিকাল নো হাউ বা ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে যদি কনভার্সেন্ট না হই, তাহলে কোন অবস্থাতেই আমি ম্যানেজ করতে পারব না। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরাও আমাকে জায়গা করে দেবে না। টিকে থাকতে দেবে না। আমাকে বিপর্যস্ত অবস্থায় ঠেলে দেবে। আজকে যদি আমরা আমাদের সিভিল সার্ভিসের দিকে তাকাই- বিসিএস পরীক্ষায় দু'একটা ভাইভাতে থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল- আমি তাদের পারফরমেন্স দেখে এত দুঃখ এবং ব্যাথা পেয়েছি যে, তা বলার মত নয়। ঢাকা বশ্ববিদ্যালয়ে এখনও quality student আমরা নিচ্ছি, কিন্তু আমরা quality teaching impart করতে পারছি না। না পারার কারণটা হল, বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার্স রিক্রুটমেন্ট পলিসি। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে আইনটা আছে, সেই আইনের স্পিল ইফেক্টে এটা ঘটছে। কেননা, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার রিক্রুট করার পরিবর্তে আমরা রিক্রুট করি পোটেনশিয়াল ভোটার, যে ভোটার বিশ্ববিদ্যালয়ের চীফ এক্সিকিউটিভকে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ অর্গান সিন্ডিকেটকে কন্ট্রোল করবে। আর এটাকে নিশ্চিত করার জন্য আমরা এখানে এক ধরনের দলীয় রাজনীতির সূত্রপাত ঘটিয়েছি। যার ফলে আমরা দেখতে পাই, দলবাজির নামে একমাত্র শিক্ষাটাই হচ্ছে বড় ক্যাদুয়ালটি এবং শিক্ষার মানটা হচ্ছে তার চেয়ে বড় ক্যাজুয়ালটি।

মাহবুব উল্লাহ :

এখানে একটা খুব প্রাসঙ্গিক বিষয় এসে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে, পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গিয়ে আমাদের দেশের ছাত্ররা অনেকেই খুব ভাল ফল করছে। তাদের Grade Point Average অর্থাৎ GPA-র মান অত্যন্ত উন্নত। তারা পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে প্রতিযোগিতা করে খুব ভাল ফল করছে। কিন্তু এদের একটা বিরাট অংশ দেশের বাইরে থেকে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে যে ভিসা পলিসি চালু করেছে, তার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যারা প্রমিজিং স্টুডেন্টস যারা TOFEL এবং GRE-তে ভালো স্কোর করে, তাদের খুব সহজে তারা ভিসা দেয় এবং এইভাবে তৃতীয় বিশ্বের কাছ থেকে মেধা সংগ্রহ করার একটা প্রচেষ্টা তারা করছে। তারা জানে যে এইসব ছেলেমেয়েদের যদি তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন সায়েন্টিফিক এস্ট্যাবলিশমেন্টে মার্কিন নাগরিকদের চেয়ে কম বেতন দিয়ে ভালো ফল তারা পাবে। শুধুমাত্র স্বদেশপ্রেমের কথা বলে কিন্তু সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনা যাবে না। এজন্য তাদের উপযুক্ত ইনসেনটিভ দিতে হবে। আমার মনে হয, আমাদের এই দুষ্টচক্র বা বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশে অন্তত একটা বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক, যেখানে আইনানুযায়ী সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, সেশনজট বা অসুস্থ কোনো রাজনীতির অবকাশ থাকবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা সেন্টার অব একসিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এর যারা শিক্ষক হবেন, বিদেশ থেকে যাদের নিয়ে আসা হবে, তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা দিয়ে ধরে রাখতে হবে। তাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে এবং এখান থেকেই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য আদর্শ ও যোগ্যতর শিক্ষক তৈরীর একটা পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এটাকে দেশ ও জাতির জন্য একটা প্রেস্টিজ প্রজেক্ট হিসেবে মনে করে যে কোনো সরকার এ ধরনের একটা উদ্যোগ নিতে পারে বলে আমি মনে করি।

আফতাব আহমাদ :

হ্যাঁ, আপনি এটা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমি আবার বলবো যে, ঐ ধরনের সেন্টার অব একসিলেন্স গড়ে তোলার আগে জনতুষ্টিবাদটা আমাদের পরিহার করতে হবে। আপনি জানেন যে, এই ধরনের ধ্যানধারণা থেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আপনি নিজে

www.pathagar.com

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন ৪ বছরের জন্য। আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন, এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে গোড়াতে যেভাবে ভাবা হয়েছিল, আর আজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা কী হয়েছে? এখানে এখন কলেজগুলোর শিক্ষাদানের মান ও শিক্ষকদের মান উন্নত না করে শুধুমাত্র ঢালাওভাবে পরীক্ষা নেয়া, বিভিন্ন কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খুলে দেয়া ইত্যাদি করে এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সম্মানী কীভাবে আরো ব্যাপকভাবে বন্টন করা যায় কলেজ শিক্ষকদের মাঝে এই দিকেই আমরা ছুটে চলেছি। যার ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মূল লক্ষ্য- কলেজ টিচারদের quality improve করা- তাদের এডভান্সড ডিগ্রী দেয়া, এডভান্স নলেজ ইমপার্ট করা- সে কাজটা হ্যামপারড্ হচ্ছে এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের আমলে আমরা লক্ষ্য করছি যে, পুরো একটা দলীয় বৃত্তের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনটিকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেখানে শিক্ষার বিষয়-আশয় হচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্যাজুয়ালটি এবং একই অবস্থা দাঁড়িয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা দলীয় দায়িত্ব পালন করছে এবং দলীয় আখড়ায় পরিণত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডগুলো যে ধরনের দায়িত্ব পালন করছে এবং যেভাবে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ও অনেকটা সে ধরনের পরিণতি লাভ করেছে। আমি এই প্রসঙ্গগুলো আজকে এখানে আর না এনে জনতুষ্টিবাদের একটি দিক এখানে উল্লেখ করতে চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ধরুন। এখানে আমাদের একটি ইনস্টিটিউট আছে- Institute of Business Administration- IBA. এখানে সেমিস্টার সিস্টেমে পড়াশোনা হয়, পাকিস্তান আমল থেকে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেও কিন্তু এই সিস্টেম একবারের জন্যও বাতিল হয়নি এবং IBA'র ছাত্রছাত্রীরা কখনোই সেশনজটে ভোগে না। তারা নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং জব মার্কেটে তাদের চাহিদা প্রচণ্ড রকমের। পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে সেমিস্টার সিস্টেম নেই এবং আমরা যখনই এটি প্রবর্তনের চেষ্টা করি এবং বলি পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার সিস্টেম আনো, দেখা যাবে এ ব্যাপারে ছাত্র সংগঠন থেকে শুরু করে শিক্ষকদের একটা বিরাট অংশ এবং বাইরের কতিপয় রাজনৈতিক মহল সবাই এক বাক্যে বলবে, 'না- এটা করা মানে হলো শিক্ষা সংকোচন করা।' আমি এটার কোনো অর্থ খুঁজে পাই না। এই যে, জনতুষ্টিবাদী অ্যাপ্রোচ, এটা পরিহার করতে হবে। ছাত্র-রাজনীতির নামে আজকে যা কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাঙ্গনে হচ্ছে, এটা ছাত্র-রাজনীতির কলঙ্ক। আমি মনে করি, ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার আছে। তার মানে এই নয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং পাঠদান বিপর্যস্ত করে রাজনীতি করা। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে যদি মুক্ত করতে হয়, তাহলে কমপক্ষে আগামী ২৫ বছরের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। ছাত্রদের বলে দেয়া উচিত যে, রাজনীতি যদি করতে হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে গিয়ে মিছিল, জনসভা এবং যে কোনো মতামত ব্যক্ত করার অধিকার তাদের আছে। কিন্তু পাঠ্যক্রম বিঘ্নিত করে, সেশন নষ্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পরিবেশ বিনষ্ট করে যে রাজনীতি, সে রাজনীতিটা মূলত হচ্ছে টেন্ডারবাজিকে রক্ষা করার রাজনীতি, সন্ত্রাসকে লালনের রাজনীতি। এই রাজনীতিকে কোনোভাবেই মানুষ সমর্থন করবে না এবং এই সমাজ এই রাজনীতিকে লালন করতে রাজি নয়। সে কারণে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, '৬৯ পর্যন্ত এমনকি '৭২-'৭৪-এও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আহত হলে, নিহত হলে, আমাদের সমাজ কতো ব্যাকুল হয়ে উঠতো, সারা শহর নিথর হয়ে যেতো। আর এখন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে কোনো ছাত্র গুলীবিদ্ধ বা নিহত হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া হয় না। বরং দেখা যায়, এখানে সেখানে আলাপ হচ্ছে, 'ও দুইটা মারা গেলো, আর কয়টা কমলো না কেন?' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় 'একটা দুর্বৃত্তের গ্রাম'। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখান দিয়ে সাধারণ কোনো

www.pathagar.com

মানুষ যাতায়াত করতে পারে না, রাহাজানি, ছিনতাইয়ের শিকার হয়। এইতো সেদিন পত্রিকায় বেরুলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ধরে নিয়ে গিয়ে লোকজনের কাছ থেকে টাকা দাবী করা হচ্ছে। যারা এটা করছে, এরাতো ছাত্র নামের কলঙ্ক, ছাত্র-রাজনীতির কলঙ্ক। এই ছাত্র-রাজনীতি কি আমরা চাই? কাজেই এটাকে যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে এ জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আজকে ধ্বংস করার একটাই পথ– এই কলুষিত ছাত্র-রাজনীতিকে বহাল রাখা। এ কেমন ছাত্র-রাজনীতি যে ছাত্র রাজনীতি ছাত্রী ধর্ষণের অপরাধকে কলঙ্কের পরিবর্তে গৌরবের মনে করে? ধর্ষণকারীদের রক্ষা করার জন্য উপাচার্যের কি প্রানান্তকর চেষ্টা। ফি বাড়ানো যাবেনা -দুদশ গজ হাঁটা যাবে না– ক্যাম্পাসে সার্বক্ষণিক বাস চাই-এ জাতি এ বিকৃত ও অধঃপতিত ছাত্র-রাজনীতি আর দেখতে প্রস্তুত নয়। এটাকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে যদি ছাত্রছাত্রীদের পাঠ গ্রহণে আগ্রহী ও মনোযোগী করে তোলার জন্য বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ নিতে হবে। আপনি যে কথা বলছিলেন, ইভ্যালুয়েশন প্রসেস– সে সম্পর্কে আজকে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমি আবারও বলবো যে, সেমিস্টার সিস্টেম প্রবর্তন করা অত্যন্ত জরুরী।

মাহবুব উল্লাহ :

হ্যাঁ, সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে নানা ধরনের ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম বা মডেল রয়েছে আমাদের দেশে যখন একটা শিক্ষা কমিশন হয়, সেখানে বিন্দুমাত্র অনুসন্ধান না করে, কোনো রকম এমপেরিকাল স্টাডি না করে চট করে এক ধরনের পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়া হয়। সেটা দেশের কাজে আসবে কিনা, দেশে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা, সেদিকে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। আমার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভাগীয় পর্যায়ে বা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল পর্যায়ে উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন রকমের মডেল টেস্ট ছাত্রদের মধ্যে কন্ডাক্ট করে দেখা যেতে পারে। এর কী রেজাল্ট পাওয়া গেলো। অর্থাৎ ছাত্ররা আশানুরূপ শিক্ষা অর্জন করতে পারছে কি-না, বা কোন মডেলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে, সেই মডেলটা Introduce করার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন, এখন ডিগ্রী পরীক্ষা থেকে স্কুল পর্যায়ের এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক নকল হয়। প্রচুর ম্যাজিস্ট্রেট বা ইনভিজিলেটর দিয়ে এই নকল প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। এটা যথেষ্ট জটিল ও ব্যয়সাধ্যও বটে এবং এর পরিবর্তে যদি আমরা ওপেন বুক সিস্টেমের ব্যবস্থা করি, সেই সাথে প্রশ্নপত্র যদি আমরা ঐভাবে করতে পারি, যে প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে গেলে ছাত্রদের পক্ষে গোটা সিলেবাস সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণ ধারণা করা ছাড়া পরীক্ষায় পাস করা সম্ভব হবে না– সেরকম ক্রিয়েটিভ ব্যবস্থা যদি চালু করা যায়, তাহলে হয়তো অবস্থার কিছু পরিবর্তন হতে পারে। আমার মনে হয় দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে চলে আসছিলো, আজকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে দেশের মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে, আপনি যেটা বললেন যে, জনতুষ্টিবাদের প্রভাবের ফলে সকলকে একটা ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিতে হবে এবং এই সার্টিফিকেট দিয়ে সে সমাজে প্রোডাকটিভ কিছু করতে পারুক বা না পারুক, সমাজে বিএ, এমএ পাসের মর্যাদা নিয়ে অন্তত ম্যারেজ মার্কেটে একটা গুরুত্ব পাবে, এই রকম অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এরজন্য প্রচুর প্রচারণা, প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা হওয়া উচিত যাতে মানুষের ধ্যান-ধারণার একটা পরিবর্তন ঘটে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত সেকেলে, বিশেষ করে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। সাধারণত কতগুলো ধরাবাঁধা প্রশ্নের উত্তর ছাত্রদের দিতে হয়। এমনকি আমি নিজেও লক্ষ্য করেছি, যে সমস্ত শিক্ষক ছাত্রদের অতিরিক্ত বই পড়ার জন্য রেফারেন্স দেন, তারা সাধারণত ছাত্রদের কাছে Unpopular হন। কিন্তু আবার এটাও লক্ষ্য করেছি, পাস করে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঐ একই ছেলে যখন বিসিএস পরীক্ষায় ভাল করে, তখন বলে; 'স্যার, আপনি যে পড়িয়েছেন,

www.pathagar.com

সেটা আমার খুব কাজে লেগেছে।' যে সমস্ত শিক্ষক খুব সহজে পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার সুযোগ করে দেন, তাদের ব্যাপারে কিন্তু তাদের চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ও মনোযোগী ছিলেন যেসব শিক্ষক, তাদের প্রতি বেশ শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে তারা। আপনি যেটা বলেছেন আইবিএ'র লেখাপড়ার সাথে কর্মবাজারের একটা সরাসরি সংযোগ থাকাতে সেখানে একটা তাড়না কাজ করে যে, কতো তাড়াতাড়ি পাস করে গিয়ে কর্মবাজারে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অতো প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় বলে সেই তাড়নাটা সেভাবে অনুভব করা যায় না। বরং যে কয়দিন লেখাপড়ার নামে, পিতামাতার ওপর নির্ভর করে হোস্টেলে বা হলে থাকা যায় সেটাকেই অনেকে শ্রেয় মনে করে। কিন্তু এটা একটা huge national wastage, wastage of time, wastage of money, wastage of resources, wastage of manpower, everything. সুতরাং এই wastage যদি আমরা কমিয়ে আনতে পারি তাহলে হয়তো জাতীয় উন্নয়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা কিছু বর্ধিত সম্পদ যোগ করতে পারবো।

আফতাব আহ্‌মাদ :

আমি উপসংহারে বলতে চাই, এই সবকিছুর পাশাপাশি আমাদের শিক্ষকদের ব্যাপারে একটু মনোযোগ দেয়া দরকার। শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজের আর সব ব্যবস্থার মতো এখন দোর্দন্ড প্রতাপের সাথে গ্রেশামস ল' অপারেট করছে— bad money drives good money out of circulation. এর ফলে অজ্ঞানতা প্রসার লাভ করছে। আপনি নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের যে কথা বললেন, যারা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের অনেক বেশী জ্ঞানমুখী, প্রজ্ঞাবান এবং বিদ্বান হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী– সেসব শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কমে যাচ্ছে। কমে যাওয়ার কারণ হলো রিক্রুটমেন্ট পলিসি– যেখানে মেধার পরিবর্তে আমরা ভোটার সংগ্রহ করছি। আমরা ভুলে যেতে বসেছি যে শিক্ষা হচ্ছে এমন এক "Culture which each generation purposely gives to those who are to be its successors in order to qualify that for at least keeping up and if possible for raising the level of improvement which has been maintained" (James and John Stuart Mill : On Education) তাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যেসব শিক্ষক আছেন, এদের এক ধরনের ওরিয়েন্টেশন দরকার। রিফ্রেশার্স কোর্স ও ওরিয়েন্টেশন কোর্সের বাইরে এদের একটা কালচারাল মোটিভেশনও দরকার এবং এতে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা যে, পাশ্চাত্যে বা উন্নত দেশসমূহের উন্নতমানের গ্রন্থাদি তারা নিজেরাও যেন পাঠ করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের যেন পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

মাহবুব উল্লাহ :

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার একটা শেষ আবেদন, আমাদের শিক্ষক সমাজ এইসব উন্নত গ্রন্থাবলী পাঠ করার সাথে সাথে এ ধরনের একটা Motto যেন গ্রহণ করেন যে দৈনিক অন্তত ১০ পৃষ্ঠা নতুন কিছু পড়বো। তাহলে কিন্তু বছরে ৩ হাজার ৬৫০ পৃষ্ঠা পড়া যায়। এর ফলে একটা বিরাট গুণগত পরিবর্তন আসতে পারে। আমরা এই ধরনের একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অপেক্ষায় আছি।

www.pathagar.com

১০ অক্টোবর ১৯৯৯

অপরাধ জগৎ, আইনের প্রয়োগ ও পুলিশ

মাহবুব উল্লাহ :

একটি রাষ্ট্রের সরকার কত ভালভাবে শাসন করছে বা কতটা সুশাসন নিশ্চিত করছে, তা অনেকাংশে নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর। অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথের কথা আমরা জানি। তিনি invisible hands of market অর্থাৎ বাজারের অদৃশ্য হাতের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, সরকার রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না, তা ব্যক্তির অভিরুচি ও ব্যক্তির স্বাধীন চয়েস অনুযায়ী পরিচালিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের মধ্যে তার সর্বোচ্চ কল্যাণ অর্জনের জন্য যে কাজ করে সেটাই সামষ্টিক পর্যায়ে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করবে। এটা শেষ বিচারে রাষ্ট্রেরও সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করবে। তবে, তিনি একথাও বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এ ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যাতে একজন ব্যবসায়ী নিরাপদে ব্যবসা করতে পারেন, একজন নাগরিক তার ধনসম্পদ নিয়ে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যেতে পারেন, তার ব্যক্তিগত সম্পদকে সে রক্ষা করতে পারে, এটা নিশ্চিত করা। এটা যদি নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে সেই রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব হবে না। এডাম স্মিথ এই বিশেষ দিকটির ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন। তাছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ, প্রশ্ন হচ্ছে, ট্রানজেকশন বা লেনদেন। অর্থাৎ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে দেখা যায় সবসময় দু'পক্ষ কিংবা দুয়ের অধিক পক্ষ এক সাথে লেনদেনে আবদ্ধ থাকে। তারা এই লেনদেনে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, সেটি তারা অনুসরণ করবে, মেনে চলবে। এর ওপরেই ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সাফল্য নিশ্চিত হয়। কিন্তু যখনই এই চুক্তির ব্যত্যয় ঘটে, তখনই ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড– তা শিল্প ক্ষেত্রেই হোক, কৃষি ক্ষেত্রেই হোক, কিংবা সাধারণ দৈনন্দিন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রেই হোক, একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। সেখানেও রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হয় যে, লেনদেনগুলো কার্যকরী হবে, লেনদেনের শর্তগুলো পালিত হবে এবং কোন পক্ষের অধিকারই ভঙ্গ হবে না।

কিন্তু বাংলাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর থেকেই এই বিষয়টিতে আমাদের সরকারগুলো অসম্ভব ব্যর্থ হয়েছে। এখানে আইন-শৃঙ্খলার মান অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ের। হত্যাকাণ্ড, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, টোলবাজি এবং আমলাতন্ত্র ও পুলিশের দুর্নীতি প্রভৃতি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে প্রায় অচল করে দিচ্ছে। এই কিছুদিন আগে Institute of Democratic Rights থেকে বলা হয়েছে, ১৯৯৮ সালে ১৯৯২ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং এর প্রায় সবগুলো হত্যাকাণ্ডই ঘটেছে প্রধানত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে। এছাড়া যে জিনিসটি খুব মারাত্মক, তা হচ্ছে, শাসকগোষ্ঠী তার ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন মাফিয়া চক্রের সাথে হাত মেলাচ্ছে। সরকারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রতিবাদ বা সমালোচনা হয়, তাকে স্তব্ধ করে রাখার জন্য এইসব মাফিয়া চক্রকে ব্যবহার করা হয়। শুধু তাই নয়, আরও মারাত্মক অভিযোগ হচ্ছে, পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসিকে এই সব গডফাদার গ্যাংকে সহায়তা করার জন্য পরোক্ষ নির্দেশও দেয়া হয়। ক্রিমিনাল কর্মকাণ্ডগুলি প্রচণ্ডভাবে দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। আমরা সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে দেখতে পাই যে, অমুক টপটেররকে গ্রেফতার করা হয়েছে বা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এটা বলতে গেলে টিপ অব দি আইস বার্গের মত। অর্থাৎ দেশে যে একটা সরকার আছে,এটা দেখানোর জন্যই মাঝে মাঝে এই ধরনের পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, বিচারের দীর্ঘসূত্রতায় পড়ে এইসব ঘটনায় মূল

www.pathagar.com

অপরাধীদের শাস্তি কতটা নিশ্চিত হয়েছে- সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না। রুবেলের মতো একজন নিরীহ ছাত্রকে ডিবি পুলিশ ধরে এনে হত্যা করল। কিন্তু সেই বিচারের কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে, সেটা আমরা জানি না এবং সম্ভবত ধরতে গেলে বিষয়টি অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। ডিবি অফিসের ছাদে মানুষের লাশ পাওয়া গেল পানির ট্যাংকের মধ্যে- সেই মামলাটিও কত দূর অগ্রসর হয়েছে, জনগণ তা প্রায় ভুলতে বসেছে।

ইদানীং খবরের কাগজে এরশাদ শিকদারের কাহিনী প্রচণ্ড ঝড় তুলেছে। এটা ভাবতে অবাক লাগে, একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এরকম একজন লোক দোর্দণ্ড প্রতাপে খুব সামান্য অবস্থা থেকে শুধু বিশাল অর্থবিত্তের মালিকই হয়নি, সরকারী সম্পদ ও জমি দখল করে তার ওপরে বেআইনী স্থাপনা নির্মাণ করেছে। এমনকি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে, সে অসংখ্য লোককে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তাদের লাশ নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছে বা বিভিন্ন উপায়ে গুম করেছে এবং এসব কিছুই ঘটেছে প্রশাসনের নাকের ডগায়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আমি কিছুদিন আগে একটি ঘটনা শুনেছি। আমারই এক বন্ধু ঢাকার একটি অঞ্চলে বাড়ী তৈরি করেছে। সে যে খুব ধনী লোক তা নয়। তারা ৫ ভাই-বোন মিলে ঢাকার একটা সাধারণ এলাকায় একটা বাড়ী নির্মাণের কাজ হাতে দিয়েছে। এলাকার চাঁদাবাজরা এসে বলল, আপনারা বাড়ী বানাচ্ছেন, আমাদেরকে কিছু না দিলেতো চলবে না। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তারা যোগাযোগ করলেন এলাকার এমপির সঙ্গে। এমপি সাহেব বললেন, এলাকায় আমার অনেক বেকার ছেলেপেলে রয়েছে। এদেরতো কিছু করতে হবে। এদেরকেতো বেঁচে থাকতে হবে। আপনারা কি তাদেরকে কিছুই দেবেন না? এর পরে শেষ পর্যন্ত একটা রফা হলো এবং ২০ হাজার টাকা দেয়ার পরে এই চাঁদাবাজদের হাত থেকে তারা রেহাই পেল। তবে রেহাই পেল, সেটা বলা যাবে না। কেননা চাঁদাবাজদের অন্য গ্রুপগুলোও হয়তো একইভাবে চাঁদা দাবী করেছে। আরও একটা মারাত্মক ঘটনা গত বন্যার সময়ে হয়েছিল। বন্যায় ঢাকার যেসব এলাকা প্লাবিত হয়েছিল, সেখানে এলাকাবাসীর উদ্যোগে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই বাঁশের সাঁকো পার হওয়ার জন্য প্রত্যেককে দুই টাকা করে চাঁদা দিতে হতো। এই টাকাটা কারা পেত, কোথায় যেত কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না।

গত বছর আজকের কাগজ পত্রিকায় একটা ভয়াবহ রিপোর্ট বেরিয়েছিল। উত্তরবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের থানাগুলো নাকি নিলামে ওঠে। এই নিলামের ডাক ওঠে আড়াই লাখ থেকে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত। থানা নিলামে ওঠে এটা ভাবতেও অবাক লাগে। আমরা মার্কেট ইকনমির কথা বলছি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আজকে দেশের প্রশাসনিক অঞ্চলগুলো নিলামে উঠছে। সেটা হচ্ছে এই রকম যে, যারা নিলাম নেবে, তারা সেই এলাকায় যাবতীয় চাঁদাবাজি বা সেই এলাকা থেকে যেসব অবৈধ, চোরাচালানীর মালামাল পারাপার হয় তার ওপর থেকে কমিশন আদায় করবে। ট্রাক বা অন্যান্য যানবাহন থেকেও চাঁদা আদায় করবে নির্বিচারে এবং যেসব থানায় এই ধরনের কর্মকাণ্ড বেশি, সেখানকার নিলাম মূল্যও অনেক বেশী হয় এবং পুরো টাকাটাই পুলিশ হস্তগত করে বলে অভিযোগ আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে এসব বেআইনী কর্মকাণ্ড, মানবতাবিরোধী অপরাধ প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে। এর ফলে আমরা যতই অর্থনৈতিক উন্নতি বা জিডিপি প্রবৃদ্ধির কথা বলি না কেন, আমার মনে হয়, সেগুলো আজকে হারিয়ে যেতে বসেছে। এখনও পর্যন্ত কোন অর্থনীতিবিদ হিসাব করে দেখাতে পারেননি যে, বাংলাদেশে সংঘটিত অবৈধ কর্মকাণ্ড সেটা চোরাচালানী, মাদকদ্রব্য ও ফেনসিডিলের ব্যবসাই হোক, দেহ ব্যবসা, ঘুষ, দুর্নীতি, কর ফাঁকি, ঋণখেলাপি বা অন্য যে কোন অবৈধ কর্মকাণ্ডই হোক, এর বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা কত। এ যদি টাকার অংকে হিসাব করা যায় তাহলে সেটি সাধারণ জিডিপি'র কত অংশ হবে এবং সেটি হিসাব-নিকাশের জন্য কোন কমিশন বা কোন বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে অর্থনীতিকে আমরা সেক্টরওয়াইজ ভাগ করি। যেমন এগ্রিকালচারাল সেক্টর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর, সার্ভিস সেক্টর,

www.pathagar.com

ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ইত্যাদি। আমার মনে হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবৈধ কর্মকাণ্ড এখন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেখানে আমাদের নতুনভাবে সেক্টর ভাগ করে দেখা উচিত। একটা হল অবৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সেক্টর, দুর্নীতির সেক্টর, ক্রিমিনালিটির সেক্টর আর অন্যগুলো হলো নিয়মতান্ত্রিক সেক্টর। এখন এই দুই সেক্টরের পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চিয়ই খুব ভয়াবহ হবে এবং এই অবৈধ সেক্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে প্রচুর সম্পদ। চিন্তা করে দেখুন, যদি এই সম্পদকে আমরা বৈধ পথে প্রবাহিত করতে পারি, তা একদিকে দেশের জনগণের জন্য কতটা কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক হতে পারে এবং আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তা কতটা ইতিবাচক হতে পারে তা ভেবে দেখার বিষয়। অবৈধ কর্মকাণ্ড যত বেশী হবে তত সরকারেরও ক্ষতি হবে। কারণ, বৈধ কর্মকাণ্ড থেকেই সরকার সাধারণত ট্যাক্স, শুল্ক, লেভি এগুলো আদায় করতে পারে। কিন্তু অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে সরকার অফিসিয়ালি কিছুই পায় না। ফলে রাষ্ট্রেরও একটা ফিসকাল ও ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস সৃষ্টি হয়। কিছুদিন আগে পত্রিকায় বেরিয়েছে, এই আর্থিক বছরের ফার্স্ট কোয়ার্টারে রাজস্ব আদায়ে প্রায় ৪শ' কোটি টাকা ঘাটতি। এই ঘাটতির অংক দেখেও আমরা কিন্তু একটা বিষয় পরিমাপ করতে পারি। সেটি হচ্ছে এই যে, ক্রমান্বয়ে নিয়ম বা নিয়মসম্মত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মার খাচ্ছে এবং বিধিবহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো জোরদার হচ্ছে। যে কারণে সরকারের রাজস্ব আদায় দুর্বল হয়ে পড়ছে। অনেকে অবশ্য বলেছেন যে, আমাদের রাজস্ব আইনে অনেক দুর্বলতা আছে, রাজস্ব কর্মচারীদের অনেক গাফিলতি আছে, দুর্নীতি আছে। সে কারণে সরকারের রাজস্ব আদায় যথাযথভাবে হচ্ছে না। এটা যেমন সত্য, পাশাপাশি এটাও সত্য যে, অর্থনীতির চাকা এমনভাবে চলছে যার জন্য এই বিশাল আয় থেকে আমরা রাষ্ট্রকে বঞ্চিত হতে দেখি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তারপরে দেখুন, আজকে নারীদের অবস্থাটা কি? কিছুদিন আগে একটা রিপোর্ট বের করেছিল আইন ও সালিস কেন্দ্র। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন সময়ে নারীদের বিরুদ্ধে যেসব ভায়োলেন্স হয়েছে, তাতে দেখা যায়, ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত আত্মহত্যা ১১০টি, কিডন্যাপের প্রচেষ্টা ৯টি, কিডন্যাপ ৯৫টি, টেরোরিস্টদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ৩৫টি, দেহব্যবসায় বাধ্য করা হয়েছে এমন ঘটনা ঘটেছে ৩টি এবং ৬২টি মহিলা হত্যাকাণ্ডের কারণই জানা যায়নি। আইন ও সালিস-কেন্দ্র এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে। এতে দেখা যাচ্ছে, এ বছর প্রথম ৬ মাসে ৩২৫টি নারী সম্পর্কিত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং এর প্রত্যেকটি খুব মারাত্মক অপরাধ। কিছুদিন আগে একটি স্টাডি রিপোর্ট বেরিয়েছিল দক্ষিণ এশিয়ার হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের ওপরে। সেটি ঢাকাতে রিলিজ করা হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসের ১৯ তারিখে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ধর্ষণের ঘটনা হচ্ছে সর্বাধিক। এখানে প্রতি ১ লাখ জনের মধ্যে ১০ জন ধর্ষণের শিকার হচ্ছে এবং এই ধর্ষণগুলো ঘটছে ক্ষমতাশালী বিত্তবানদের হাতে। বিশেষ করে পুলিশের হাতে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে আর কতদিন আমাদের দেশে এই অবস্থা চলতে থাকবে? এই অবস্থা থেকে আমাদের পরিত্রাণ পেতে হবে। এইসব অপরাধের সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত ও প্রশাসনিক কারণ বিশ্লেষণ করে সামগ্রিকভাবে যদি অ্যাড্রেস করা না হয় তাহলে এ থেকে আমরা কখনোই মুক্তি পাব না। এই ব্যাপারে মানুষের নজর সর্বাগ্রে পুলিশের ওপর যায়। কেননা পুলিশই হচ্ছে দেশে আইনের শাসন বজায় রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। পুলিশের এই ব্যর্থতা আমরা কীভাবে মূল্যায়ন করতে পারি?

আফতাব আহ্মাদ :

আমরা যদি সাধারণভাবে বলি যে পুলিশ ব্যর্থ, তাহলে আমার মনে হয়, এটি অতিরঞ্জন হবে। কারণ, আমাদের পুলিশ যে ধরনের ঐতিহ্যের অধিকারী তাতে অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে পুলিশের যোগ্যতার অভাব আছে– এটা মানা খুবই কষ্টকর। বাংলাদেশের পুলিশের গর্ব করার

www.pathagar.com

মতো একটি ঐতিহ্য রয়েছে। বিশেষ করে যে পুলিশ ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং যে পুলিশের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্মমভাবে হামলা চালিয়েছিল ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ। আমরা সবাই জানি, রাজারবাগ পুলিশলাইনের ছোট ছোট ব্যারাকগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং পুলিশ লাইন এলাকা জুড়ে কামানের গোলাবর্ষণ করা হয়েছিল। ঢাকা শহরে পাকিস্তানী গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধে পুলিশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কাজেই পুলিশের অহংকার করার মতো গৌরব মহিমান্বিত এক অতীত আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশ পাকিস্তানী দখলমুক্ত হওয়ার পরে পুলিশ প্রশাসনকে বৈজ্ঞানিকভাবে ঢেলে সাজাবার অত্যাবশ্যক কাজটি সম্পন্ন করা হয়নি। বরং উল্টো পুলিশকে দলীয় কাজে ব্যবহারের তীব্র প্রবণতা ক্ষমতাসীনদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। ফলে পুলিশের মধ্যে Partisan spirit কাজ করেছে, যা পরিণতিতে পুলিশকে পক্ষপাতমূলক করে তোলে এবং দলীয় রাজনীতির বাহক ও রক্ষকের ভূমিকায় দেখা যায়। দলীয়করণের এ প্রবণতা পুলিশের শৃঙ্খলাকে চরমভাবে ব্যাহত করেছে।

আমাদের পুলিশ মূলত তৈরী হয়েছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এবং তাদেরকে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো, তাতে দলবাজি করার সুযোগ খুব কম ছিল। বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র অর্জিত হবার পরে বিশেষ করে পুলিশের রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে দলীয়করণের ফলে পুলিশের মরাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পুলিশ দলীয় ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুজিব আমলে ঢাকা শহরের সেই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এসপি মাহবুবের কথা কে না জানেন? আজও ভুক্তভোগীরা এসপি মাহবুবের নাম শুনলেও আতঙ্কে শিউরে ওঠে। অপরাধ দমন করার চাইতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ক্ষেত্রে মাহবুবের কোন জুড়ি ছিল না। ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং ক্ষমতাসীন দলের হোমরা চোমরাদের স্বার্থে মাহবুব পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করেছে। পুলিশের বিষয়টি যদি আমাদের বুঝতে হয় তাহলে আমাদের দেখতে হবে, আদিতে যখন ব্রিটেনে পুলিশ গঠিত হয়, তখন বিষয়টিকে কীভাবে দেখা হয়েছিলো। নাগরিকদের জীবন যাতে আইন-শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধানে থাকে ও শান্তিতে কাটে, সে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের ওপরে। ১৭৪৮-এ লন্ডনের বও স্ট্রীটে হেনরী ফিলডিং নামে একজনকে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। তিনি প্রথম চেষ্টা করলেন, কীভাবে একটি সুসংগঠিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গঠন করা যায়– যে বাহিনীর মূল দায়িত্ব হবে দ্রুত এবং নিশ্চিতভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুত তাঁরই উদ্যোগে বও স্ট্রীটে টহল দেয়ার জন্য একটি Watch Force বা পাহারাদার বাহিনী দাঁড় করানো হয় প্রথম। এই পাহারাদার বাহিনীর একমাত্র দায়িত্ব ছিল মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা এবং তার সম্পত্তি যাতে অন্য কেউ আত্মসাৎ করে না নেয়, তা নিশ্চিত করা। এ থেকেই পুলিশ বাহিনীর যাত্রা শুরু। পরবর্তী পর্যায়ে ক্রাইম কীভাবে ঠেকানো যায় পাহারাদার বাহিনী সে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। পুলিশ বাহিনী গঠন করার জন্য রবার্ট পীল ১৮২৯-এ House of Commons-এর মাধ্যমে একটি আইন পাস করেন। Metropolitan Police Act of 1829. সে সময়ে অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন যে,এটি নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি হুমকি হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু পীল চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন যে, স্বাধীনতার বুলি কপচানো অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে কারণ তাঁর তথ্যানুযায়ী ট্যুইকেনহ্যাম ও ব্রেন্টফোর্ডের পাড়ার বাসিন্দাদের বিপুল অংশই নিত্য আশঙ্কা করছেন যে, তাঁদের জীবন ও সম্পত্তি যে কোন সময় আক্রান্ত হতে পারে। তাই পীল্ মনে করেন যে, নাগরিকদের এই আশঙ্কা বা উদ্বেগ অপনোদনের জন্য আইন সভার কর্তব্য হচ্ছে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুলিশ প্রশাসনকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করানোর জন্য তিনি এই আইনটি প্রণয়ন করেন।

এই আইনের বলে ওয়েস্ট মিনিস্টারে একটি নতুন পুলিশ দপ্তর খোলা হয়। এই আইনকে কার্যকর করার জন্য দু'জন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এই দুই ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হয় সকল পাড়ার জন্য পাহারাদার বাহিনীর পরিবর্তে একটি একক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার।

www.pathagar.com

একজনের নাম চার্লস রওয়ান এবং অন্যজনের নাম রিচার্ড মেইন। চার্লস রওয়ান পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, পরবর্তী পর্যায়ে নানা ধরনের সংস্কারের মধ্যদিয়ে এখন পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন মোটামুটি সেই আদলেই রয়ে গেছে। রওয়ান পুলিশ বাহিনীকে সামরিক সংগঠনের যে কাঠামো, শৃঙ্খলা ও বাছাই নীতি তার ভিত্তিতে গঠন করার সুপারিশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, পুলিশের দায়িত্ব হবে নাগরিকদের প্রতি সজাগ থাকা, নাগরিকদের প্রয়োজন সম্পর্কে প্রস্তুত থাকা। অপ্রয়োজনে নাগরিকদের ব্যক্তি জীবনে হস্তক্ষেপ না করা। একই সাথে এলাকায়, মহল্লায়, পাড়ায় যাতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং কোন ধরনের অপরাধ যাতে সংঘটিত হতে না পারে, সে ব্যাপারেও সজাগ থাকা। রওয়ান প্রস্তাব করেছিলেন যে, পুলিশ প্রশাসনকে ম্যাজিস্টেরিয়াল প্রশাসন থেকে পৃথক করা দরকার এবং প্রত্যেক এলাকায় একটি পুলিশ স্টেশন স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। সেই সাথে তিনি এও বিধান করেছিলেন যে, কোন অবস্থাতেই পুলিশ যেন অস্ত্র বহন না করে। তার বিধান মোতাবেক পুলিশের সঙ্গে থাকবে হয় একটি লাঠি, বেটন বা ট্রাঞ্চ্যন র‍্যাটল কিংবা এমন সরঞ্জাম, যার দ্বারা নাগরিকদের সতর্ক করে দেয়া যায় বা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগে অপরাধীদেরকে সতর্ক করে দেয়া যায়। এ ভাবেই Metropolitan Police Administration ব্রিটেনে প্রবর্তিত হয়েছে। এর ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি হয়েছিল এবং পুলিশকে সাধারণ মানুষ তাদের নিকটের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিল। আজ পর্যন্ত শিল্পোন্নত সভ্য দেশগুলোতে পুলিশকে মনে করা হয় নাগরিকদের বন্ধু। অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের দেশেই নয়, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে পুলিশ প্রশাসনকে নানাভাবে ক্ষমতাসীনরা প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। এর ফলে পুলিশের effectiveness সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়। এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্য পুলিশকে আরো কার্যক্ষম ও দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে পাশ্চাত্যে একাধিক Study হয়েছে। Leonhard Fuld, Raymond Fosdick, Elma Graper, Bruce Smith এবং O. W. Wilson সহ আরও অনেকে গভীর পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার দ্বারা একটি অর্থবহ কার্যক্ষম পুলিশ বাহিনী কীভাবে গড়ে তোলা সম্ভব তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Leonhard Fuld-এর নাম আমি উল্লেখ করতে পারি। ১৯০৯-এ Police Administration নামে তার একটি দীর্ঘ স্টাডি পাবলিশড হয়। সেই স্টাডির অন্যতম সুপারিশ ছিল এই যে, পুলিশ প্রশাসনে কোন ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব যাতে কাজ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, পুলিশে যারা চাকরি নেবে, তাদের এক ধরনের বিশেষ দক্ষতা এবং Specialization থাকতে হবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে তার কর্তব্য তাকে জানিয়ে দিতে হবে। একই সাথে এ কথাও Fuld বলেছেন যে, পুলিশের দায়িত্বে পড়ে না, এ ধরনের কাজ যেন পুলিশের উপর চাপানো না হয়। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিতণ্ডার মধ্যে পুলিশকে যেন জড়ানো না হয়। পুলিশ যেখানে social control-এর একটি instrument হিসাবে পরিগণিত সেখানে মনে রাখতে হবে যে, একটি কার্যবহ ও অর্থবহ সুশৃঙ্খল পুলিশ বাহিনীর জন্য অত্যাবশ্যক ঃ তত্ত্বাবধান এবং কার্যসম্পাদন সম্পর্কের মধ্যে সুসাম্য নিশ্চিত করা, বাহিনীর বিভিন্ন অংশ বা একাংশের মধ্যে সুসমন্বয় নিশ্চিত করা এবং সমগ্র কাঠামোটিকে তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নৈর্ব্যক্তিক ও পক্ষপাতহীন মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দেখা গেছে, পুলিশ ঠিকএর বিপরীত ভূমিকাটিই পালন করছে। আমাদের দেশে আজকে পুলিশের যে দূরাবস্থা, তার জন্য মূলত দায়ী বিভিন্ন সময়ের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী। জনগণের ওপর এসব গোষ্ঠীর কখনও আস্থা ছিল না, জনগণ থেকে এরা সব সময় বিচ্ছিন্ন থেকেছে এবং জনগণের উপর প্রভূত্ব করার জন্যই এসব গোষ্ঠী রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আসছে।

এরাই পুলিশের নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ী। আজকে বাংলাদেশের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করবো যে পুলিশের সামনে অস্ত্রধারীরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কীভাবে আক্রমণ করে এবং পুলিশ নীরবতা পালন করছে। অস্ত্রধারীদের ছবি

www.pathagar.com

পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, পুলিশ তাকে ধরতে পারছে না বা তার বিরুদ্ধে কোন মামলাও রুজু করতে পারছে না। এই তো মাত্র সেদিন মতিঝিলের মতো একটি ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকায় একটি ব্যাংকের Board of Directors-এর রুমে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা আখতারুজ্জামান বাবু পুলিশকে নিয়ে সশস্ত্র হামলা চালালেন এবং ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে মারধর করে তাঁর কাছ থেকে পদত্যাগপত্র আদায় করে নিয়ে নিজেকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করলেন। পরবর্তী পর্যায়ে যখন এই ঘটনা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় ঝড় উঠল, তখন পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, আখতারুজ্জামান বাবুকে গ্রেফতার করার জন্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ থেকেই বোঝা যায় যে, পুলিশকে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল কীভাবে ব্যবহার করছে। আজকে তাই আমাদের সমাজে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যেভাবে অবণতি ঘটছে, অপরাধপ্রবণতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এরশাদ শিকদারের মতো অন্ধকারের ঘৃণ্য প্রাণী এবং এধরনের আরও অন্যান্য গডফাদাররা বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে নানা ধরনের ত্রাস, নির্যাতন ও অপরাধ করে চলেছে সে সম্পর্কে আমাদের আজকে যদি নতুন করে ভাবতে হয়, তাহলে প্রথমে পুলিশকে রাজনীতিমুক্ত করা, দলীয়করণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। অবশ্য এই ঢেলে সাজাবার কাজটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এই কাজ করতে হলে আমাদের দেশের পুলিশের প্রশাসনিক কাঠামোরও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন এবং তার জন্য একটি নতুন পুলিশ কমিশন গঠন করে বাংলাদেশের সমাজের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাগুলো কীভাবে জন্ম নিচ্ছে, সেগুলোকে চিহ্নিত এবং পুলিশ রিক্রুটমেন্টের ক্রাইটেরিয়াকে নতুন করে নির্ণয় করতে হবে। পাশ্চাত্যে একটি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে যত্ন নেয়া হয়। সেটি হলো, যারাই পুলিশে রিক্রুটেড হবেন, তাদের ন্যূনতম যেমন শিক্ষা থাকতে হবে, তেমনি আইন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকতে হবে। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নপর্যায়ে বিশেষ করে পুলিশ কনস্টেবল পর্যায়ে যাদেরকে রিক্রুট করা হয়, শিক্ষা ও আইন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কতটুকু রয়েছে সে বিষয়ে কোন ধরনের নজর দেয়া হয় না এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুলিশ প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তা, যাঁরা রাজনীতির সাথে নানা লেনদেনের মধ্যদিয়ে যুক্ত হয়ে পড়েন, তাঁরা এই ধরনের অধঃস্তন কর্মচারী ও কনস্টেবলদেরকে তাদের অসদুদ্দেশ্য ব্যবহার করতে পারেন। যে কারণে আমরা লক্ষ্য করেছি, থানায় যখন একজনকে ধরে নিয়ে আসা হয়, তার ওপরে অকথ্য নির্যাতন ও মারধার শুরু হয়ে যায়। আমাদের ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোডে এই ধরনের সন্দেহভাজন, এমন কি অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত কোন ব্যক্তিকেও থানায় এনে এভাবে বেআইনী মারধর করা যায় না। অথচ এমনটিই করা হয়। এর ফলে আমরা দেখেছি, তুহিন নামে একজন তরুণকে থানায় এনে চরম নির্যাতন ও প্রচণ্ড মারধর করা হয়। পরবর্তীতে এক হাস্যকর গল্পের অবতারণা করা হয়। বলা হলো তুহিন জুতোর ফিতে দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন এমন হয়েছে যে, থানায় এনে মেয়েদেরকে তারা ধর্ষণ করছে এবং এর কাহিনী যখন ফাঁস হয়ে যায় পত্রিকায়, তখন ধর্ষিতাকে তারা খুন করে তার লাশ পর্যন্ত গুম করে ফেলে। সীমা চৌধুরীর Caseটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিমানের নূরুজ্জামান শরীফ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে পুলিশ তাকে ধরে এনে পিটিয়ে মেরে ফেলে। মেধাবী ছাত্র রুবেলকে হত্যা করেই পুলিশ ক্ষান্ত হয়নি তার পরিবার আজ চরম হয়রানির শিকার। এই পরিস্থিতিতে আজকে পুলিশ প্রশাসনকে যদি আমাদের ঢেলে সাজাতে হয়, রাজনৈতিক সহমত তো প্রয়োজন অবশ্যই এবং এর বাইরে নাগরিকদের মধ্যে একটা সচেতনতারও প্রয়োজন রয়েছে। আমার মনে হয় যে, নাগরিকদের উদ্যোগে যদি মানবাধিকার কমিশনের পাশাপাশি একটি পুলিশ কমিশন গঠন করে আমাদের পুলিশের প্রশাসনিক কাঠামো কেমন হওয়া দরকার বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তারা কী ধরনের দায়িত্ব পালন করবে, তাদের জবাবদিহিতা কী ধরনের হবে, এটি যদি নির্ণয় করা না হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সাথে একদল ক্ষমতা থেকে বিদায় হবার পর যেভাবে

www.pathagar.com

পুলিশকে রাজনৈতিকভাবে দলীয়করণ করেছিল, পরবর্তী দল চেষ্টা করবে পুলিশকে সেভাবেই আবার দলীয়করণ বা রাজনৈতিকভাবে ভিকটিমাইজ করার। এর ফলে পুলিশের মরাল স্পিরিটটাই Suffer করবে। সে কারণে সেদিকে আমাদের নজর দেয়া দরকার এবং যত্নবান হওয়া দরকার। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য একতরফাভাবে যদি শুধু আমরা বলি যে, পুলিশ প্রশাসনকে উন্নত করলেই হবে, সেটাও ঠিক নয় এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ে আমাদের নজর দেয়া দরকার। সেটি হলো আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। রাজনৈতিক দলগুলো যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, এবং বিচার বিভাগের কাজে যদি হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা কমে, তাহলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও উন্নতি আশা করা যেতে পারে। সকলেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন যে, বর্তমান ক্ষমতাসীন দল চমৎকার একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। সেটি হচ্ছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিরপরাধ লোককে গ্রেফতার করে এনে পুলিশকে বলা হয় তার বিরুদ্ধে ভুয়া মামলা দায়ের করার জন্য এবং পরবর্তী পর্যায়ে যখন আদালতে এদেরকে সোপর্দ করা হয়, তখন পুলিশ ভুয়া মামলার পক্ষে কোন যুক্তি যখন হাজির করতে পারে না, বিচারক তখন বাধ্য হন সেই ব্যক্তিকে জামিন দিতে। আর তখনই দেখা যায় ক্ষমতাসীন দলের মধ্য থেকে বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে। এভাবে বিচার বিভাগকে যদি আমরা জনসমক্ষে হেয় করে দেই এবং বিচার বিভাগ সম্পর্কে যদি একটা অনাস্থা সৃষ্টি করি, তাহলে পুলিশের মধ্যে যে দুর্বৃত্তায়নের প্রক্রিয়া চলছে তা আরও বেশী উৎসাহ পাবে। কাজেই আমার মনে হয় যে, বিচার বিভাগ সম্পর্কে যখন তখন কটূক্তির বিরুদ্ধে বিচার বিভাগকেও যেমন আরো বেশী পরিমাণে সুয়োমোটো মামলা করে এর বিহিত করা দরকার, নাগরিকদের মধ্য থেকেও আজকে সোচ্চার প্রতিবাদ উচ্চারিত হওয়া দরকার।

মাহবুব উল্লাহ :

আমার মনে হয়, এর সঙ্গে আরেকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় আছে। আর তা হচ্ছে ক্রাইম সম্পর্কিত ইকনমিক পলিসি। অর্থনীতি শাস্ত্রের এখনকার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে, Economics of crime অর্থনৈতিক পলিসির মাধ্যমে অবৈধ কর্মকাণ্ডের ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারলে, অবৈধ কর্মকাণ্ড দমনে পুলিশের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে পারলে এবং সর্বোপরি অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে দক্ষ করে তুলতে পারলে সমস্যার প্রকটতা হ্রাস করা সম্ভব। এই বিষয়টি বোঝার জন্য তিনটি ব্যাপার আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। প্রথমেই বুঝতে হবে, আইন প্রয়োগের বাজারটা কীভাবে কাজ করছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, আইন প্রয়োগের আবার বাজার কী? বাজারটি হচ্ছে এই যে, কিছু লোক আইনের সেবা ক্রয় করে আর কিছু লোক বিক্রি করে– এই বাজার আজকে বাংলাদেশে কীভাবে চলছে– সেটি আমাদেরকে বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত আইন প্রয়োগের গুণগত মান নিশ্চিত করার ব্যাপারে আইনের কার্যকারিতা। তৃতীয়ত আইন প্রয়োগের উন্নয়ন।

আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত বাজার কীভাবে কাজ করে? অপরাধ বহু রকমের আছে। কিছু অপরাধ আছে, যা নিজের ক্ষতি করে, কিন্তু অন্যের হয়তো তেমন ক্ষতি করে না। যেমন– একজন মাদকসেবী মাদক সেবন করে সে নিজেই শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু আশপাশের লোক হয়তো ঠিক অতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সেখানে কি ধরনের আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা হবে, সেটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। তেমনি আজকাল দেখা যায় যে, পুলিশে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য বা বদলির জন্য অনেক সময়ে থানার ওসিদের লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে পোস্টিং নিতে হয়। আমরা যদি এই প্রবণতা বন্ধ করতে চাই, তাহলে সেখানে আমরা হয়তো Piece rate-এর একটা ব্যবস্থা করতে পারব। এতে প্রতিটি অপরাধ চিহ্নিত করা, সনাক্ত করা এবং বিচারে সোপর্দ করার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যরা একটা নির্দিষ্ট হারে পারিতোষিক পাবে এবং এই পারিতোষিকের পরিমাণ কত হবে, সেটাও আবার অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিশ্লেষণ

www.pathagar.com

করতে হবে। অর্থাৎ সংঘটিত অপরাধের সোশ্যাল কস্ট্ কী হচ্ছে এবং পুলিশকে এ কাজে পারিতোষিক দেয়ার জন্য কত ব্যয় হচ্ছে। যদি দেখা যায়, ব্যয়টা সমাজের লাভের চাইতে কম, সেক্ষেত্রে আমরা বলব যে,এটি একটি সফল কাজ। এডাম স্মিথের যুগে বলা হতো রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা।

কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, যেভাবে সভ্যতার জটিলতা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে আইন প্রয়োগের ব্যাপারটাতে বেসরকারী মাধ্যমকেও আমরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি, সে সম্পর্কেও আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এবং প্রাইভেট পুলিসিংয়ের সিস্টেম রয়েছে। সেই ব্যবস্থায় সেখানে বেশ সাফল্যও অর্জন করা গেছে। এতে রাষ্ট্রীয় খাতের সঙ্গে বেসরকারী খাতের একটা প্রতিযোগিতাও গড়ে ওঠে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতাও এর ফলে সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়। আমলারা, পুলিশ কর্মকর্তারা এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিরা কী করছে– এ প্রতিটি ব্যাপারই যদি আমরা জনসমক্ষে নিয়ে আসতে পারি, এসব ব্যাপারে জনগণকে ইনফর্ম করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে অপরাধ প্রবণতা অনেক হ্রাস পেয়েছে এবং এজন্য আমাদের পার্লামেন্টারী ইনস্টিটিউশনগুলোকে কার্যকরী করা দরকার। পার্লামেন্টারী কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করা দরকার। আরেকটি পদ্ধতির কথা আমরা চিন্তা করতে পারি, সেটি হচ্ছে ক্রাইমের ক্ষেত্রে Victim enforcement পদ্ধতি। অর্থাৎ এই পদ্ধতির অধীনে Legal coverage থাকলে Victim নিজেই Law enforcement-এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া community policing-এর কথাও আজকাল বলা হয়। এরকম কমিউনিটি বা এলাকাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানও যদি গড়ে তোলা যায়, তাহলেও কিন্তু তা থেকে একটা সুফল পাওয়া যেতে পারে। এজন্য সমাজের প্রতিটি স্তরের বিভিন্ন পেশার লোকদেরও সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। অবশ্য সংগঠিত হওয়ার কাজটা খুব সহজ নয়। এরও কিন্তু একটা অর্থনৈতিক ব্যয় আছে। কারণ, যারা সংগঠনের কাজ করবেন তাদেরকে অন্য কাজ ফেলে এই কাজে মনোযোগ দিতে হবে।

আফতাব আহমাদ :

আপনি খুব চমৎকার একটি প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। আপনি জানেন যে, চীনদেশে যাঁরা প্রবীণ নাগরিক অর্থাৎ যাঁরা কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় নন, অবসর গ্রহণ করেছেন– তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় ঐ কম্যুনিটি পুলিসিংয়ের দায়িত্বটা পালন করে থাকেন। আমাদের এখানেও এটি প্রবর্তন করা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এখন পুলিশ যে অবস্থানে আছে, তাকে শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার জন্য আমাদের কিছু আশু পদক্ষেপ নেয়া দরকার। আপনি যে পার্লামেন্টারী কমিটি ব্যবস্থার কথা বললেন সে বিষয়ে আমি সর্ম্পূণ একমত। আমার মনে হয়, এখানে Parliamentary Standing Committee on Police Affairs একটি শক্তিশালী সংসদীয় কমিটি হিসাবে কাজ করতে পারে এবং এই কমিটির public hearing-এর ব্যবস্থা যদি থাকে, তাহলে তা অনেক ফলপ্রসূ হবে। একই সাথে আমি বলতে চাই যে, পুলিশ প্রশাসনকে একটি স্বতন্ত্র Service-এর নিয়ন্ত্রণে নেয়া জরুরী। এখন যেমন পরীক্ষার মাধ্যমে পুলিশ সার্ভিসের লোকজন রিক্রুট করা হয় তা রহিত করে স্বতন্ত্র পুলিশ সার্ভিস প্রবর্তন করে সম্পূর্ণ পৃথক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে পুলিশে রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থা করা দরকার। পুলিশ প্রশাসনকে পুনর্বিন্যাস করা দরকার এবং Police Administration-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখার জন্য পুলিশের জন্য পৃথক ওমবাডসম্যান-এর দপ্তর হওয়া দরকার। এর জন্য প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে ইমপরট্যান্ট বিষয়টি হচ্ছে আজকাল রাজনৈতিক কারণে পুলিশের মধ্যে অনেকগুলো জঘণ্য কাজের প্রবণতা জন্ম নিচ্ছে। অতি সম্প্রতি আমরা বিরোধী দলীয় হরতালগুলোর সময়ে লক্ষ্য করেছি, Eagle Force নামে একটি বেআইনী সংগঠন উর্দি ছাড়া অস্ত্রসমেত রাস্তায় নামছে প্রতিপক্ষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করার জন্য।

www.pathagar.com

এই যে কোন চার্টার বা ম্যান্ডেট ছাড়া একটি সশস্ত্র গ্রুপ পুলিশ বাহিনীর ভিতর থেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে, একে যদি রোধ করতে হয় তাহলে পুলিশের ওপর একটা ওমবাডসম্যান বা পুলিশের ওপর পার্লামেন্টারী কমিটি গঠন করে Public hearing-এর মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। এভাবে সমস্যার সমাধান হয়তো অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে উঠবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, পুলিশের প্রধান যিনি নিযুক্ত হবেন, পুলিশ প্রধান নিযুক্ত হওয়ার সময় এই স্ট্যান্ডিং কমিটির সামনে যদি তাঁর হিয়ারিং হয়– আমেরিকাতে যেমন সিনেট কমিটির সামনে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তির আগে হিয়ারিং হয়, এই ধরনের হিয়ারিং যদি আমাদের এখানে প্রবর্তন করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় যে, রাজনৈতিক কনসিডারেশনে কাউকে যেভাবে পুলিশ প্রধান নিয়োগ করা হয়, সেই প্রবণতাটা দূর হবে। আমার মতে আমাদের দেশে অতি সত্ত্বর এটি প্রবর্তন করা জরুরী। তা না হলে পুলিশ জনগণের আস্থা হারাবে এবং আজকে দেশের যে অবস্থা, যে কোন সময়ে মানুষ পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। সাধারণ মানুষ যেখানে পুলিশকে বন্ধু হিসেবে ভাববে– সেখানে আজকাল অনেক সময়ে অনেকে ঠাট্টাছলে বলে যে, পুলিশ মানে হচ্ছে প-এ পাজি, ল-এ লুচ্চা, শ-এ শয়তান। এটি খুব প্রীতিকর বা সুখকর কথা নয় এবং এটি পুলিশের গৌরবও বৃদ্ধি করে না। আমরা এও জানি যে, পুলিশের মধ্যে নিবেদিত প্রাণ, দেশপ্রেমিক, নাগরিকদের ভালবাসেন, আইনকে শ্রদ্ধা করেন– এ ধরনের নিষ্ঠাবান অনেক সদস্যও আছেন যাঁরা কোণঠাসা হয়ে আছেন রাজনৈতিক চাপের কারণে এবং রাজনৈতিক কারণে নিয়োগপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ অফিসারদের দাপটে। কাজেই সেসব নিবেদিতপ্রাণ পুলিশ সদস্যদেরকে যদি আমরা সত্যিকার অর্থে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সঠিক দায়িত্ব পালন করতে দিতে চাই, তাহলে আমার মনে হয় পুলিশের থরো স্ক্রিনিং জরুরী হয়ে পড়েছে এবং পুলিশ স্ট্রাকচারটিকে পরিপূর্ণভাবে ঢেলে সাজানো দরকার।

মাহবুব উল্লাহ :

আমি শেষ করার আগে বলতে চাই যে, আমাদের দেশে আইন-শৃঙ্খলার যে মারাত্মক অবণতি হয়েছে, এখানে পুলিশের, আইনের এবং আইন প্রয়োগ পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন এবং আমরা '৯১ সাল থেকে বলেছি যে, আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের একটা নতুন ফেইজ-গণতন্ত্রের একটা নতুন স্তর শুরু করেছি। এখন যেটা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে গণতন্ত্রেরও গণতন্ত্রায়ণ। অর্থাৎ একদিকে আমরা স্বচ্ছতার কথা বলবো, জবাবদিহিতার কথা বলবো, আবার অন্যদিকে সবকিছু জনগণের চোখের আড়াল করে রাখবো– এটা হতে পারে না। কাজেই সর্ব বিষয়ে এই যে আপনি বললেন, পার্লামেন্টারী কমিটির হিয়ারিং-এর ব্যবস্থা সেটা অত্যন্ত চুলচেরা ও নির্মম হিয়ারিং হওয়া দরকার। ওপেন পাবলিক হিয়ারিং হওয়া দরকার। ভারতের সাবেক চীফ জাস্টিস যেটা বলেছিলেন 'কোন ব্যাপারে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে হলে কারও কাছে যেতে হবে না। সরাসরি আমাকে শুধু একটা চিঠি দিয়ে জানালেই আমি সেটা বিবেচনায় আনবো।' এ রকম একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অর্থাৎ চীফ জাস্টিস জানেন যে, অনেক দরিদ্র লোক অর্থাভাবে আইনের আশ্রয় নিতে পারছে না, আইনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না– তখন তিনি নিজেই এই ব্যবস্থাটা করলেন এবং এর জন্য তিনি বেশ প্রশংসিতও হয়েছিলেন। আমাদের হাইকোর্ট তথা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরাও যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন, তাহলে প্রচলিত আইনের মধ্যেও হয়তো এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক কিছু একটা সম্ভব হবে। অন্তত থানায় যাতে ভুক্তভোগীদের মামলাটা গ্রহণ করা হয়, সেই ব্যবস্থাটাও নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

www.pathagar.com

১৪ অক্টোবর ১৯৯৯

মিলোসেভিচের পতনের তাৎপর্য

মাহবুব উল্লাহ :

যুগোশ্লাভিয়ায় একটা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেল। কিন্তু এই পরিবর্তনকে বুঝতে হলে একটু পেছনের দিকে তাকাতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সভিয়েত সেনাবাহিনী ও যুগোশ্লাভ কমিউনিস্টদের পার্টিজান বাহিনী ১৯৪৪-এর অক্টোবরে সার্বিয়া দখল করে নেয়। মার্শাল টিটোর ক্ষমতারোহণের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯৪৫-এ গৃহীত সংবিধান অনুযায়ী কমিউনিস্ট যুগোশ্লাভিয়া একটি ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যদিও কমিউনিস্টরা শুরুর দিকে বিভিন্ন অঞ্চলকে সীমিত পরিমাণ স্বশাসনের অধিকার দিয়েছিল, তৎসত্ত্বেও সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, ম্যাসিডোনিয়া, মন্টেনিগ্রো, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাসহ ৬টি রিপাবলিকের উদ্ভব হয়। সার্বিয়ার ভেতরে দুটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। এগুলো হল– ভয়ভদিনা এবং কসোভো। কেন্দ্রীভূত শাসনের কাঠামোটি পরিবর্তিত হলেও কেন্দ্রের শক্তিশালী নিয়ন্ত্রন তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪৮-এ যুগোশ্লাভিয়া কমিনফর্ম (কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম) থেকে বহিষ্কৃত হয়। টিটোর সঙ্গে স্ট্যালিনের বনাবনি হচ্ছিল না। টিটো ছিলেন সভিয়েত কর্তৃত্বের প্রতি নতজানু হবার বিরোধী। তাছাড়া টিটো যুগোশ্লাভিয়ার জন্য নিজস্ব ধাঁচের সামজতন্ত্র বিনির্মাণ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এর মধ্যে শ্রমিক কাউন্সিল ও স্বব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিকেন্দ্রায়িত পদ্ধতিতে কলকারখানা পরিচালনার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬২-তে যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এর একদিকে ছিলেন এডভার্দ কার্দেলি আর অন্যদিকে আলেকসান্দার রাঙ্কোবিচ। কার্দেলি ছিলেন সংস্কারপন্থী আর রাঙ্কোবিচ ছিলেন গোঁড়াপন্থী। টিটো সংস্কারপন্থীদের পক্ষে দাঁড়ালেন। ফলে বিকেন্দ্রীকরণের একটা নতুন জোয়ার দেখা দিল। রাঙ্কোবিচের ক্ষমতা ১৯৬৬-তে কেড়ে নেয়া হয় এবং টিটো প্রজাতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশগুলোতে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদান করলেন। ১৯৭৪-এর সাংবিধানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে একটা আইনী রূপ দেয়া হল। এই সংবিধান অনুযায়ী ভয়ভদিনা ও কসোভা কার্যত প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা পেল এবং ফেডারেল সরকারে প্রজাতন্ত্রগুলো নিরঙ্কুশ সংখ্যাসাম্য অর্জন করল। এই সাংবিধানিক পরিবর্তনের দুটো দুর্বলতা ছিল। এক. কমিউনিস্ট পার্টির শাসনই ফেডারেল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিশ্চিত করবে। দুই. এই সংবিধান চূড়ান্ত ঐকমত্যের ভিত্তিতেই কেবল পরিবর্তন করা যাবে। ১৯৮০-তে টিটোর মৃত্যুর পর সার্বিয়ান কমিউনিস্টরা এই সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালাতে শুরু করে। কসোভা সার্বিয়ান কমিউনিস্টদেরকে এ ধরনের রাজনৈতিক প্রচারাভিযানে নামার জন্য একটা অজুহাত হিসেবে দাঁড়াল। কসোভার আলবেনীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠরা প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত– এই অজুহাত তুলে কসোভার স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা বিলুপ্ত করার দাবী তোলা হল।

স্লোবোদান মিলোসেভিচ সার্বীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সালে সার্বীয় সেনাবাহিনী, অর্থডক্স চার্চ, বুদ্ধিজীবী এবং পার্টিযন্ত্রকে একটি কোয়ালিশনে সংঘবদ্ধ করে সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন এবং এই চাপের মাধ্যমে কসোভা, ভয়ভদিনা ও মন্টোনিগ্রোর নেতৃত্বে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। ফেডারেল যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর পকেটে ছিল ৪টি ভোট এবং যুগোশ্লাভ সেনাবাহিনী ছিল তার পক্ষে। এভাবেই তিনি অবশিষ্ট প্রজাতন্ত্রগুলো– যথাক্রমে স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া,

www.pathagar.com

বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও ম্যাসিডোনিয়ার প্রভাব খর্ব করতে সক্ষম হন। এই রিপাবলিকসমূহের কমিউনিস্টরা মিলোসেভিচের অপতৎপরতাকে রোধ করতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের ভীরুতা ও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের ফলে ১৯৯০-এর জানুয়ারীতে ফেডারেল কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে যায়। পার্টির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অংশগুলো স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও ম্যাসিডোনিয়ার ক্ষমতা হারায়। সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোতে ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে জাতীয়তাবাদী চরিত্র অর্জনকারী কমিউনিস্টরা জয়লাভ করে। ক্রোয়েশিয়ার নেতা ফ্রানিয়ো তুজমান যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে একটা কনফেডারেশন গঠনের প্রচেষ্টা নিলেন। মিলোসেভিচ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব একটি কনফেডারেল বা স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জের কাঠামোর মধ্যে তখনই সম্ভব হবে যখন এগুলোর মানচিত্রে পরিবর্তন এনে সার্ব সংখ্যালঘুদেরকে যারা এককেন্দ্রিক যুগোশ্লাভ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প মানতে রাজি নয়, তাদেরকে মানিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। এটা মিলোসেভিচের জন্য বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। মিলোসেভিচ ক্রোয়েশীয় সার্বদের মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে মদদ যোগালেন। আর অন্যদিকে ক্রোয়েশিয়ার সরকারও সার্বদের সঙ্গে আপসরফায় ব্যর্থ হল।

১৯৯০-এ প্রথম বহুদলীয় নির্বাচনে মিলোসেভিচ সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হন। ১৯৯১-এ রাজধানী বেলগ্রেডে প্রথমবারের মত মিলোসেভিচ-বিরোধী প্রচণ্ড দাঙ্গা হয়। ১৯৯১-এর জুনে স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যুগোশ্লাভ সেনাবাহিনী স্লোভেনিয়া আক্রমণ করে। ১৯৯১-এর জুলাইয়ে স্লোভেনিয়া থেকে যুগোশ্লাভ সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা। তবে ক্রোয়েশিয়ার সার্ব-ক্রোয়েট সহিংসতা অব্যাহত থাকে এবং এই সহিংসতা জাতিগত ক্রোয়েট ও বিদ্রোহী সার্বদের মধ্যে যুদ্ধে রূপ নেয়। যুগোশ্লাভ বাহিনী সার্ব বিদ্রোহীদের সমর্থন দেয়। ১৯৯১-এর ডিসেম্বর ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়াকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯২-এর ফেব্রুয়ারীতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ক্রোয়েশিয়ায় ১৪ হাজার সৈন্যের একটি শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে। বসনিয়া-হার্জেগোভিনা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বসনীয় সার্বরা বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মধ্যে নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে। ১৯৯২-এর এপ্রিলে বসনীয় সার্বরা ব্যাপক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুসলিম অধ্যুষিত বসনিয়া-হার্জেগোভিনার রাজধানী সারায়েভো অবরোধ করতে শুরু করে। ইউরোপীয় সম্প্রদায় ও যুক্তরাষ্ট্র বসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বসনিয়ার লড়াই তীব্রতর রূপ নেয়। জাতিসংঘ নতুন করে যুগোশ্লাভিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেশন ভাঙতে ভাঙতে সার্বিয়া ও মন্টিনেগ্রো প্রজাতন্ত্রে সীমিত হয়ে পড়ে। মিলোসেভিচ '৯৫-এর ২১ নভেম্বর ডেটন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমে বসনিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটে। '৯৬-এর শেষ দিকে ও '৯৭-এর প্রথমদিকে মিলোসেভিচ বিরোধী বিক্ষোভ হয়। কিন্তু ক্ষমতায় টিকে থাকতে সক্ষম হন। ১৯৯৭ সালে মিলোসেভিচ নতুন করে যুগোশ্লাভ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এর পরপরই কসোভোয় মুসলিম নিধন শুরু হয়। পশ্চিমা বিশ্ব অনেক দিন এই বিয়োগান্তক ঘটনা অবলোকন করে ও অনেক কালক্ষেপণ করে ন্যাটো জোটকে যুগোশ্লাভিয়ার ওপর বিমান হামলার নির্দেশ দেয়। এর পরিণতিতে যুগোশ্লাভ ও পশ্চিমা জেনারেলরা একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এবং বোমাবর্ষণ বন্ধ করা হয়। কসোভার শান্তি পরিকল্পনার পথ পরিষ্কার হয়। কসোভা থেকে যুগোশ্লাভ সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় এবং মুসলিম উদ্বাস্তুদের কসোভায় নিজ ঘরবাড়ীতে ফেরার অনুমতি দেয়া হয়। ন্যাটোর নেতৃত্বাধীন শান্তিরক্ষী বাহিনী কসোভোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। কিন্তু কসোভো স্বাধীনতা অর্জন করতে পারল না। যুগোশ্লাভিয়ার যে সমস্যা, সে সমস্যাটি একদিকে সার্বিয় জাতিগত সমস্যা, ফেডারেল রাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সহমত প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার সমস্যা। আবার অন্যদিকে, পাশ্চাত্য

www.pathagar.com

বিশেষ করে আমেরিকান আধিপত্যবাদের সমস্যা। যুগোশ্লাভিয়ার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে এক প্রবল গণভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসকের অভিধাপ্রাপ্ত মিলোসেভিচের ক্ষমতা থেকে উৎখাতকে তাই যথাযথভাবে ব্যবচ্ছেদ করতে হবে এবং সাংবিধানিকভাবে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশকেও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

আফতাব আহমাদ :

গত কিছুদিন ধরে যুগোশ্লাভিয়ায় বিশেষ করে বেলগ্রেডে আপাত দৃষ্টিতে যে অভূতপূর্ব গণজোয়ার লক্ষ্য করা গেছে, তা দেখে বহু দেশের গণতন্ত্র বঞ্চিত মানুষ হয়তো আশার সন্ধান পেয়ে থাকবেন। কিন্তু খোলা চোখে যাই আমরা দেখি না কেন, তা যথার্থভাবে প্রত্যক্ষ করি কিনা, এ বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। ঘটনার আড়ালে ঘটনা এবং প্রচার যন্ত্রের মহিমা-কীর্তনে তিল তাল হয়ে যায়, রাত দিন হয়ে যায়। পলেস্তরা খসে পড়া ভঙ্গুর দেয়ালকে কঠিন প্রাচীর বলে ভ্রম হতে পারে। বেলগ্রেডের তথাকথিত গণঅভ্যুত্থানের নামে যে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে, তা আমাদেরকে ফিলিপাইনে মার্কোসবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, দুটি ঘটনাতেই ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণ ছিল। অংশত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর অংশত ঘটনা পরম্পরায় সাজানো নাটক আকারে। মার্কোসের বিদায়ের পর ফিলিপাইনের কোরাজন আকিনোর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদান্তে ক্ষমতা মার্কোসের যুগে যেখানে ছিল জেনারেল রামোসের মাধ্যমে, সেখানেই পুনঃস্থাপিত হয়েছে।

যুগোশ্লাভিয়া ইউরোপের এমন একটি নাজুক ও স্পর্শকাতর অঞ্চলে অবস্থিত, যার বৃহত্তর নাম বলকান এলাকা। এই বলকান এলাকায় যুগোশ্লাভিয়া ছাড়াও বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, তুরস্কের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং গ্রীসের উত্তরাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত। একদা এ অঞ্চলটি বিশাল অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেই সুবাদে তুর্কী জাতিগোষ্ঠীর ব্যাপক ছড়াছড়ি এই অঞ্চলে লক্ষ্য করা গেছে। শুধু তাই নয়, তুর্কী কৃষ্টি ও ঐতিহ্য এবং ক্ষমতাকাঠামো এই অঞ্চলে জাতি গঠন ও রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় বিরাট অবদান রেখেছে। ইউরোপের বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতায় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর বলকান নীতি অত্যন্ত গুরুত্ববাহী ছিল। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, গোটা বলকান অঞ্চল জুড়ে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর দিক থেকে শ্লাভ জাতিকতার একাধিপত্য কখনোই ক্ষুণ্ন হয়নি। শ্লাভদের এক বিরাট অংশ হোয়াইট রাশিয়ান নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত। পিটার দি গ্রেট এবং জারিনা ক্যাথরিনের সময়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতির বর্শাফলকে বলকান এলাকাকেই লক্ষ্য করেই ধারণ করা হয়েছিল। ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে জার শাসিত রাশিয়া থেকে কমিউনিস্ট শাসিত রাশিয়া এবং কমিউনিস্ট শাসন-উত্তর রাশিয়া সর্বক্ষেত্রেই বলকান রুশ পররাষ্ট্র নীতি ও রণনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। এ কারণেই পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তার ঢেউ যখন যুগোশ্লাভিয়ার ওপরও এসে পড়ে, কমিউনিস্ট শাসিত দেশ না হয়েও রাশিয়া যুগোশ্লাভিয়ার ঘটনাপ্রবাহকে নিজস্ব জাতীয় ও রাষ্ট্রস্বার্থের অনুকূলে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশান রেড আর্মি ও ট্যাংকে চড়ে পূর্ব ইউরোপে যে বিপ্লব ঘটে, তা থেকে যে তিনটি ব্যতিক্রমধর্মী দেশ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিল, যুগোশ্লাভিয়া তার অন্যতম। অপর দুটি দেশ হচ্ছে রোমানিয়া এবং আলবেনিয়া। গোটা স্নায়ুযুদ্ধকালে এই তিনটি দেশকে দেখা গেছে, সভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে উপেক্ষা করে নিজস্ব নীতিতে অটল থেকে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের ও অর্থনৈতিক বিকাশের পন্থা বেছে নেয়।

যুগোশ্লাভিয়ায় সভিয়েত ডিকটেশনকে অস্বীকার করে টিটোর নেতৃত্বে যে ওয়ার্কার্স সেলফ ম্যানেজমেন্ট বা শ্রমিকদের স্বায়ত্ত ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়, তা পাশ্চাত্য জগতে বেশ

www.pathagar.com

কৌতূহলের সৃষ্টি করে এবং অনেক পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যে বিষয়টি অনেকের অলক্ষ্যে এখানে বিবেচনায় আসেনি, তা হচ্ছে ব্যক্তি এবং রেজিমেন্টেড পার্টির (যুগোশ্লাভিয়ার ক্ষেত্রে লীগ অব কমিউনিস্ট) নেতৃত্বে যে কর্তৃত্ববাদী শাসন গড়ে উঠেছিল, সেখানে সবচেয়ে বড় ক্যাজুয়ালটি ছিল গণতন্ত্র এবং সহিষ্ণুতা। তবে যুগোশ্লাভিয়ার ক্ষেত্রে টিটোর ক্যারিজমা তার নেতৃত্বের কর্তৃত্ববাদী চরিত্রকে আড়াল করে রেখেছিল এবং টিটোর শাসনামলের প্রথম দিকে জনসাধারণ একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে গভীর দেশপ্রেম দিয়ে গড়ে তোলার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু ক্রমাগত ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও দলীয়করণের ফলে খোদ লীগ অব কমিউনিস্টদের মধ্যেই মতপার্থক্য ও বিভেদ দেখা দেয়। এ সময়ে টিটোর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ও যুগোশ্লাভ কমিউনিজমের জাতীয়তাবাদী সংস্করণের অন্যতম প্রবক্তা মিলোভান জিলাসের সঙ্গে বিরাট মতবিরোধ দেখা দেয় এবং জিলাস যুগোশ্লাভ সমাজের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে যে তত্ত্ব হাজির করেন, তা বিশ্বে ঝড় তোলে। জিলাসের এই তত্ত্ব ছিল কমিউনিস্ট শাসিত দেশে কমিউনিজমের আলখেল্লাধারীরা নব্য শোষক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে ক্যারিজমা একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলে ব্যক্তির বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তার উপযোগিতা হারিয়ে যায়। সমাজতাত্ত্বিকরা তাই ব্যক্তি ক্যারিজমাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যুগোশ্লাভিয়ায় ক্যারিজমার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণতো দূরের কথা, মতাদর্শিক ঐক্য এবং স্বচ্ছতাও গড়ে উঠেছে কিনা সন্দেহ। কমিউনিজম যেখানে জাতিগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে আন্তর্জাতিক সংহতির মহিমার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে, সেখানে যুগোশ্লাভিয়ায় দেখা গেছে, সার্বদের উগ্র জাতীয়তাবাদ কমিউনিজমের আড়ালে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের শক্তির প্রবল উৎস ছিল। টিটোর মৃত্যুর পর নেতৃত্ব ও আদর্শগত শূন্যতার কারণে উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও ভিন্ন জাতিসত্তার প্রতি ঘৃণা এমন প্রচণ্ডবেগে বিস্ফোরিত হয় যে, সেখানে মানবতা, গণতন্ত্র, নীতিবোধসহ সকল শ্রেয়বোধের অপমৃত্যু ঘটে।

পাশ্চাত্য দেশগুলো তুরস্কের নেতৃত্বাধীন অটোমান শাসন কিংবা স্পেনে মুসলমান মূরদের শাসন কখনোই স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়নি এবং পাশ্চাত্য শাসকগোষ্ঠী বিশেষ করে ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্বে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অসহনীয় পীড়াদায়ক। আর তাই বসনিয়ায় সার্বদের 'এথনিক ক্লিনসিং' অপারেশনে গোটা স্লাভনিক জাতি-গোষ্ঠীসহ ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন না কোনভাবে মিলোসেভিচকে মদদ যুগিয়েছে। বসনিয়ার ওপর দিয়ে বিমান চলাচল এবং বসনিয়াকে অস্ত্র সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা আরোপ বসনীয় মুসলিম নিধনকে অনিবার্য করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক চাপ, জনমত এবং খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতি ও মুসলিম লবির কারণে শেষ পর্যন্ত বসনিয়া-হার্জেগোভিনা খর্বাকৃতির রাষ্ট্রীয় অবয়ব লাভ করলেও কসোভোর মুসলমানরা সেই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি। মিলোসেভিচের সঙ্গে পাশ্চাত্যের আপেক্ষিক দ্বন্দ্বের কারণে তাঁর পরিবর্তে কস্তুনিৎসাকে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করতে গিয়ে গোটা পাশ্চাত্য দুনিয়া যে প্রহসন ও ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়েছে, তা আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। কী করে একটি 'গণঅভ্যুত্থানের' মুখে মিলোসেভিচের সঙ্গে কস্তুনিৎসার ঘণ্টাধিককালব্যাপী একান্ত বৈঠক হতে পারে এবং মিলোসেভিচ কীভাবে টেলিভিশনে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে পারেন, তা তলিয়ে ও খতিয়ে দেখার বিষয়। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর গণহত্যার মুখে যখন বাঁচার তাগিদে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে, সেই যুদ্ধে আধিপত্যকামী, সম্প্রাসরণবাদী ভারত মিত্রের বেশে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে যেভাবে আমাদের বিজয়ের গৌরব ছিনতাই করেছে, পাশ্চাত্য কারসাজিতে বেলগ্রেডের রাজপথে কি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে? আমাদের আজকের যত দুঃখ-বেদনা এবং রাষ্ট্রের প্রতিবন্ধী অবস্থার জন্য মূলত দায়ী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ। এই হস্তক্ষেপের বিশদ পর্যালোচনা যুগোশ্লাভ ঘটনাটিকে বুঝতে সাহায্য করবে।

www.pathagar.com

মাহবুব উল্লাহ :

ডঃ আফতাব যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা কিছুটা খোলাসা করে বলার দরকার। যুগোশ্লাভিয়ার জনগণ মিলোসেভিচের স্বৈরশাসনে ত্যক্ত বিরক্ত ছিল। সম্প্রতি যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের প্রাক্কালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘোষণা দিল, যদি যুগোশ্লাভিয়ার জনগণ মিলোসেভিচকে নির্বাচনে পরাস্ত করে, তাহলে যুগোশ্লাভিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে এবং যুগোশ্লাভিয়ার অর্থনীতিকে পুনর্বাসিত করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে। একটি দেশের জাতীয় নির্বাচনকে বৈদেশিক শক্তিগুলো যদি এমন নগ্নভাবে প্রভাবান্বিত করে, তাহলে জাতীয় সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ কী হবে? এছাড়া, মার্কিন নেতৃত্বাধীন ইউনিপোলার বিশ্বে মার্কিনীরা সুকৌশলে পৃথিবীর অঞ্চলে অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাইছে। এই প্রথমবারের মত মার্কিনীরা দেখিয়ে দিল স্থল সৈন্য ব্যবহার না করেও শুধুমাত্র বিমান আক্রমণের কৌশল ব্যবহার করে একটি রাষ্ট্রকে নতজানু করা যায়। অন্যদিকে, নির্যাতিত জাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর অশ্রু ও রক্তকে পুঁজি করে সেই জাতির ওপর জাতিসংঘের পতাকা ব্যবহার করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং সেই দেশ বা অঞ্চলে নিজস্ব স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ অর্জন করা সম্ভব। মুসলিম প্রধান কসোভোর জনগণের ভাগ্যে সেই ঘটনাটিই ঘটেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় কাশ্মীর সঙ্কটে আমেরিকার মনষ্কামনা হল, কাশ্মীরের মত একটি স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকার ওপর সময় বুঝে শান্তি স্থাপনের নামে জাতিসংঘের পতাকাকে ব্যবহার করে নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। মনে রাখতে হবে, কাশ্মীর ভারত-পাকিস্তান, চীন, আফগানিস্তান ও রাশিয়ার সীমান্ত সন্নিবিষ্ট। এমন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা শেষ বিচারে আমেরিকা ভারত কিংবা পাকিস্তানের হাতে ছেড়ে দিতে চাইবে, তা না ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ। অতি সম্প্রতি ভারত-মার্কিন সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ বলেই মনে হয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বিবিসি'র ভাষ্যমতে, হোয়াইট হাউসে এক অভূতপূব জাকঁজমকপূর্ণ এবং নৈশভোজে আপ্যায়িত হয়েছেন। বাজপেয়ী আমেরিকানদের বোঝাতে চেয়েছেন, কাশ্মীর সঙ্কটের মূল কারণ পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদ। অন্যদিকে বাজপেয়ী চীনা কার্ডও ব্যবহার করতে চেয়েছেন। বৃহৎ শক্তি হিসেবে চীনের প্রতি মার্কিনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন বাজপেয়ী। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দিল্লীর গুরুত্ব এখন আপাত দৃষ্টিতে অতীতের চেয়ে অনেক বেশী মনে হয়। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে চীনা প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও রুশ প্রেসিডেন্ট পুটিন দিল্লী সফর করে গেছেন। এরই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা আরো অনেক বেশি নতজানু হয়ে পড়বেন, সেদিকেও দেশবাসীকে নজর রাখতে হবে। এছাড়া, পাশ্চাত্য শক্তি যেভাবে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ শুরু করেছে, সে ব্যাপারেও জনগণকে সজাগ থাকতে হবে। আমি অবাক হব না, যদি কোনদিন পাশ্চাত্য গোষ্ঠী বাংলাদেশের কিছু কিছু স্পর্শকাতর এলাকায় যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম ও গারো পাহাড় অঞ্চলে চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতাবাদ উস্কে দেয়। কোন কোন দাতাগোষ্ঠীকে বলতে শোনা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাংলা ভাষাভাষীদের সমতল অঞ্চলে নিয়ে আসার কাজে তারা অর্থ বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। অবশ্য, কূটনীতির প্রয়োজনে তারা বলেন, "যদি সরকার চায়'– এসব বোলচাল কিসের আলামত, সেটাও আমাদের বুঝতে হবে। সুতরাং ক্ষণিক বিজয়ের ভ্রান্ত আতিশয্যে আমাদের মূল বিষয়ের প্রতি এবং গভীর ষড়যন্ত্রগুলোর প্রতি অমনোযোগী হওয়া চলবে না।

www.pathagar.com

১৭ অক্টোবর ১৯৯৯

সামাজিক মূল্যবোধ

মাহবুব উল্লাহ :

গত সপ্তাহে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধ প্রবণতা, পুলিশের ভূমিকা, সমাজের ওপর এর প্রভাব এবং এ থেকে আমরা কী করে বেরিয়ে আসতে পারি, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। সমাজের এই যে অবণতি, অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবণতি, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি, দুর্নীতির প্রসার এর কারণ হিসাবে আমাদের সমাজ সম্পর্কে যারা চিন্তা করেন, তারা অনেকেই বলেন যে, আমাদের মূল্যবোধগুলো একের পর এক ধসে পড়ছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে এবং এটা রোধ করতে না পারলে সমাজকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। আমরা জানি, মানুষ যখন সমাজবদ্ধ প্রাণী হিসাবে তার জীবন শুরু করেছে, তখন থেকেই সে সমাজে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে, তার পাশাপাশি কতোগুলো আচরণ এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারে কতোগুলো নিয়ম অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবেই চালু করেছে। অথচ সেটাকে কার্যকরী করার জন্য তেমন কোন চাপ বা বল প্রয়োগ করতে হয় না। মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবেই সেটাকে সঠিক মনে করে এবং সেভাবেই পরিচালিত হয়। ছোটবেলায় আমরা পড়তাম, সদা সত্য কথা বলিবে। কদাচ মিথ্যা বলিও না। এই যে 'সত্য কথা বলিবে' বা সত্য ভাষণ– এটা কিন্তু একটা চিরন্তন মূল্যবোধ। সমাজের যতই পরিবর্তন হোক এবং দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সমাজে যত পার্থক্যই থাকুক, সত্য ভাষণ একটা নীতি হিসেবে সব সমাজই মেনে নেয়। 'পরস্বহরণ করিও না' এটাও একটা নীতি বাক্য, আমরা ছোটবেলায় অনেকেই পড়েছি। কিন্তু যারা পরস্বহরণ করে, মিথ্যা কথা বলে তাদের সম্পর্কে অপরাপর মানুষের এক ধরনের ঘৃনা থাকে। তাদের কাছ থেকে তারা দূরে সরে থাকতে বা তাদেরকে এড়িয়ে চলতে চায়। এভাবেই সমাজে একটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কতগুলো নীতিবোধ, কতগুলো শ্রেয়বোধ কার্যকরী হয় এবং এগুলোর কিছু কিছু আবার চিরন্তন। পৃথিবী যতদিন থাকবে, সমাজ নির্বিশেষে সবাই তা গ্রহণ করবে। সবাই মেনে চলার চেষ্টা করবে। তা না হলে সমাজের ফ্যাব্রিক বা বুনন বলতে যা বোঝায়, সেটা টিকে থাকবে না। আবার অন্যদিকে কিছু কিছু মূল্যবোধ আছে, যেটা দেশে দেশে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে ভিন্নতর হয়ে থাকে। 'শিক্ষককে এবং গুরুজনকে শ্রদ্ধা করবে' এই মূল্যবোধ যেমন আমরা আমাদের সমাজে গ্রহণ করি এবং সবাই এক বাক্যে এর গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করি, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ বা পাশ্চাত্যের যে কোন দেশের ছাত্রছাত্রীরাও তাদের শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে আমাদের দেশে আমরা শিক্ষককে আদব-কায়দা বা শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে তাঁদেরকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করি। কিন্তু পাশ্চত্যের দেশগুলোতে এভাবে শিক্ষককে 'স্যার' বলে সম্বোধন করা হয় না। সেখানে তারা তাদের শিক্ষককে নাম ধরেই বিশেষ করে ফার্স্ট নেম ধরে সম্বোধন করে থাকে। এতে কী সেই সমাজে শিক্ষকের মান বা মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? এই প্রশ্নগুলো ওঠা কিন্তু স্বাভাবিক। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের সমাজে কতগুলো আদব-কায়দার নিয়ম চালু আছে। যেমন– গুরুজন, শিক্ষক, মা-বাবার সামনে ধুমপান না করা। কিন্তু আবার এই একই বাংলাদেশে দেখা যায় মা-বাবা ছেলে-মেয়ে একই সাথে বসে চা পান করছে বা অন্য যে কোন খাবার খাচ্ছে। তাতে কিন্তু একে অপরের প্রতি অশ্রদ্ধা হচ্ছে না। এ কারণে মূল্যবোধের কতগুলো আপেক্ষিক দিকও আছে।

www.pathagar.com

একটা কথা আছে, 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও'। অর্থাৎ তুমি নিজে যেটাকে ভাল মনে কর না, সেটা তুমি যেমন অপরের কাছ থেকে আশা করবে না, তুমি নিজেও সেটা করবে না। আমার পিতা এক সময়ে স্কুল শিক্ষক ছিলেন। একদিন স্কুলের বারান্দায় একটি ছেলে ধূমপান করছিল। এর জন্য তিনি তাকে প্রচণ্ড শাস্তি দিয়েছিলেন। বেত্রাঘাত করেছিলেন। স্কুল থেকে ঘরে ফেরার পর রাতে আমার পিতা ভাবলেন 'আমিতো প্রচণ্ড ধূমপাণ করি। অথচ এই ধূমপান করার জন্য আমার এই ছাত্রটিকে আমি এভাবে প্রহার করলাম। এটা কি ঠিক হয়েছে? সেইদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে জীবনে আর কখনও তিনি ধূমপান করবেন না। ঐ যে তিনি ধূমপান ছেড়েছিলেন সেই ১৯৩০-এর দশকে, তারপরে আর কখনও ধূমপান করেননি। এটাই হচ্ছে মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ সমাজে স্থিতাবস্থা বাজায় রাখার জন্য, স্থিতি, সৌহার্দ্য বাজায় রাখার জন্য খুবই প্রয়োজন। বাংলাদেশে আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে, মূল্যবোধগুলো ধসে পড়ছে। সেই পুরনো শ্রদ্ধাবোধ, নীতিবোধ, শ্রেয়বোধ নেই। সমাজ যেন একটা বিশৃঙ্খলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি কারণ থাকতে পারে। আজকে যে আমরা বিশ্বায়নের কথা বলছি, দেশকে উন্মুক্ত করে দেয়ার কথা বলছি, অন্য দেশের সাথে যোগাযোগের কথা বলছি, এসব কারণেও হতে পারে। আমার মনে হয়, এই বিষয়টি সম্পর্কে একটু গভীর আলোচনা করা দরকার। কোন্ মূল্যবোধগুলোকে আমরা ধরে রাখার চেষ্টা করব এবং কোন্ মূল্যবোধগুলোর পরিবর্তন হলেও সেটাকে আমরা খুব বিপজ্জনক মনে করব না এবং হয়তো সেই পরিবর্তনটা সমাজের অন্যান্য পরিবর্তন যেমন অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে স্বাভাবিক বলে মেনে নেবো– এটা আমাদের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

আফতাব আহমাদ :

আসলে একটি সমাজের বা মানব জীবনের বস্তুনিষ্ঠরূপ বুঝতে হলে সেই সমাজের মূল্যবোধকে আগে বুঝতে হবে। কারণ মূল্যবোধই মানুষের সমাজ জীবনের স্বরূপ নির্ণয় করে। সমাজের মূল্য উদ্দেশ্য এবং শেষ লক্ষ্য মূল্যবোধ দ্বারাই নিরূপিত হয়। মূল্যবোধকে expressions এর মতো preference হিসেবে দেখা যেতে পারে যার সুনির্দিষ্ট overtone রয়েছে। এটি সরাসরি কথায় প্রকাশ করা যায় আবার একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষের actual আচার থেকেও তা বুঝা যায়। এই মূল্যবোধকে আমরা বিচার যখন করবো, তখন মনে রাখতে হবে যে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মূল্যবোধ কিন্তু জেনেটিকালি ট্রান্সমিটেড হয় না। এটি শিক্ষণ, পঠন এবং শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই transmitted হয়। এই শিক্ষণ, পঠন বা শিক্ষাদান প্রক্রিয়া কিন্তু সমাজের কৃষ্টিক কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত ও বিন্যস্ত হয়। আমরা সব সময়ে বলে থাকি যে, মূল্যবোধের একটি শাশ্বত রূপ আছে, আবার বলি যে আজকাল সমাজে মূল্যবোধের একটা প্রচণ্ড অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই শাশ্বত রূপ এবং অবক্ষয়ী রূপকে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে বোঝা উচিত– আমরা মূল্যবোধ কাকে বলি। আসলে মানুষের জীবনের preferenceগুলোকে আমরা নানাভাবে, নানা intonation-এ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি এবং একটি কখনো কথার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, কখনো মানুষের বাস্তবিক আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এই মূল্যবোধের একটি কৃষ্টিক মাত্রা যেমন আছে, তার সঙ্গে যুগপৎভাবে এর একটি রাজনৈতিক মাত্রাও আছে। এর আবার একটি রাজনৈতিক-প্রশাসনিক মাত্রাও রয়েছে। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই একটি রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই সামাজিক সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপকেই আমরা রাষ্ট্র বলে অভিহিত করি। মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রাষ্ট্র নামের এই সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠনের জন্ম দিয়েছে মানুষ। রাষ্ট্রের জন্মের গোড়ার কথায়

www.pathagar.com

যদি আমরা ফিরে যাই, তাহলে আদিতে যে চুক্তি মানুষ দাঁড় করিয়েছিল রাষ্ট্র গঠনের জন্য, সেটি হচ্ছে এরকম যে, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা, মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোকে সংরক্ষণ করা, মানুষের নিহিত গুণাবলীর সর্বোচ্চ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনা করা এবং এর সাথে যুগপৎভাবে মানুষের জীবিকা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ কারণেই রাষ্ট্রের প্রশাসনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কর্মকাণ্ডগুলোর সমষ্টিকে আমরা রাজনীতি বলি। এই রাজনীতির মানদণ্ডে আমরা দেখি যে, দু'ধরনের মূল্যবোধ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটিকে আমরা বলি terminal values. আর একটিকে বলি instrumental values. সমাজবিজ্ঞানীরা terminal values ঐ মূল্যবোধগুলোকেই বলেন, যেগুলো সমাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং যার মধ্যদিয়ে সমাজের কাঙ্ক্ষিত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠতে পারে। যেমন, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করা, সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা, মানবিক মর্যাদা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। এর পাশাপাশি এই লক্ষ্যগুলোকে অর্জন করা বা এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যে পন্থা মানুষ নির্ণয় করে, তার সমষ্টিগুলোকে বলা হয় instrumental values। যেমন মানুষ তার সমাজটি গণতান্ত্রিক হবে এটি প্রত্যাশা করে। সকল মানুষ আইনের সামনে সমান হিসেবে বিবেচিত হবে এটি একটি instrumental values. Instrumenatal values এবং terminal values-এর equilibrium এবং compatibility social system টিকে sustain করে রাখে বা টিকিয়ে রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই overarching values এবং cultural symbol সমূহের প্রতি সমাজের মানুষেরা allegiance বা আনুগত্য বজায় রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত social system-এর stability অক্ষুণ্ন থাকবে এবং তার অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈধতাও প্রশ্নাতীত থাকবে। কিন্তু এই Instrumental Values এবং Terminal Values-এর মধ্যে অনেক সময়ে আমরা দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি, এই দ্বন্দ্বের মূল কারণ হচ্ছে মানুষের বিশ্বাসজাত কিছু আচরণ। বিশ্বাস আমরা কাকে বলবো? সামাজিক, ভৌত বা supra-empirical বিশ্ব সম্পর্কিত মানুষের যে অস্তিত্ববাদী ধারণা, বা existential concept রয়েছে তাকেই সাদামাটাভাবে সমাজ বিজ্ঞানীরা belief বা বিশ্বাস বলেন। এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করে কতিপয় interrelated সেট তৈরী হয় মানুষের। যেটাকে আমরা বলি মতাদর্শ। যে মতাদর্শ মানুষের সামাজিক অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে কিংবা সামাজিক পরিস্থিতিকে বা তার পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজনের যৌক্তিকতা হিসাবে দাঁড়া করানো হয়। এদিক থেকে যদি আমরা গভীর অভিনিবেশ সহকারে নজর দেই তাহলে একটি জিনিস আমাদের কাছে খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে, আর তা হচ্ছে মানুষ যেমন সামাজিক জীব, তেমনি মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থেকে একটি বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এক ধরনের inertia তে ভোগে। Fear এর মত Change বা পরিবর্তনের ভীতি তাকে তাড়া করে বেড়ায়। যাকে বলে Uncertain future, যার জন্য মানুষ সাধারণত প্রস্তুত থাকে না। বর্তমানটা যতো অপ্রিয় unpleasent বা কষ্টকর হোক না কেন, এর সাথে মানুষ নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সভেবার বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে চিরন্তন traditionalism কাজ করে। যা প্রধানত কৃষক সমাজ কিংবা প্রাকশিল্প সমাজে প্রত্যক্ষ করা গেছে তাই পরিবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। Traditionalismএর কারণে সমাজে যে পরিবর্তন দ্রুতগতিতে আনা প্রয়োজন ক্ষেত্র বিশেষে, তা মন্থর হয়ে পড়ে। এর কারণ হলো মানুষ একটি অস্তিমান সমাজ কাঠামোতে যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, মোটামুটি তার সম্বন্ধে তার একটি পূর্ব ধারণা সামাজিকায়নের মধ্য দিয়ে তার মধ্যে সৃষ্টি হয়। সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, একটি given social structure-এ তার কী কী সুযোগ-সুবিধা আছে। এই structure যদি পরিবর্তিত হয়, তাহলে পরিবর্তিত structure এ তার পূর্বের যে advantage সে ভোগ করতো তা

www.pathagar.com

ভোগ করতে পারবে কী না সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের জন্ম হয়। নতুন প্রতিস্থাপিত সেই structure আদৌ স্থিতিশীল হতে পারবে কীনা সে সম্পর্কেও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। এসব অনিশ্চয়তার কারণে মানুষ তখন পরিবর্তনবিমুখ ও পরিবর্তন বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়।

এর পাশাপাশি আরেকটি প্রসঙ্গের ওপর আমাদের নজর দেয়া দরকার। আপনি যেসব সুবচনের কথা উল্লেখ করলেন, যে সব শ্রেয় নীতি বা শ্রেয় বোধের কথা বললেন, এগুলো বহুকাল ধরে আমাদের সমাজে যেমন বিরাজমান ছিল তেমনি ঐ যে শিক্ষণ, পঠন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কথা বলেছি এই সামগ্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং পাশাপাশি একই সঙ্গে সমাজ কাঠামোর প্রাথমিক স্তরে যে primary unit অর্থাৎ পরিবার রয়েছে তা মূল্যবোধ পরিগঠনে ও পরিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবারের মধ্য দিয়ে সামাজিকায়ন প্রক্রিয়ায় একটি শিশু শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের ভেতর দিয়েই বার্ধক্যে উপনীত হয়– যাপিত এ জীবন তার মধ্যে নানা ধরনের মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে, যে মূল্যবোধের ভিত্তিতে সে নিজেকে প্রস্তুত করে তার জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রের জন্য।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, পরিবারের বাইরে যে সামাজিক পরিবেশ, যে সামাজিক সমীকরণ এবং তার যে ভারসাম্য কিংবা স্থিতাবস্থা এগুলো যখন বাইরের কোন আনফোরসীন্ ভেরিয়েবল দ্বারা বিনষ্ট হয়, তখন একজন ইনডিভিজুয়াল ট্রমাটাজড্ হয়ে যেতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে আমি আমাদের সুমহান মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাটি টেনে আনতে চাই।

মুক্তিযুদ্ধে একদিকে যেমন একটি মহৎ লক্ষ্য অর্জনের প্রণোদনা কাজ করেছিলো– দেশের মানুষ মুক্ত হবে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে, সমাজ ন্যায়ানুগভাবে পুনর্গঠিত হবে– এটি যেমন একদিকে ছিল, এর পাশাপাশি আরেকটি প্রবণতাও ছিল– অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং মতাদর্শগত দীক্ষা ছাড়া অস্ত্র চালনা, অস্ত্র একজন ব্যক্তিকে যে কী পরিমাণ ক্ষমতা প্রদান করতে পারে, তা একজন ট্রিগারহ্যাপী অস্ত্রধারীকে দেখলে সহজেই বুঝা যায়। দর্শন নৈতিকতা, বিশ্বাস বা মূল্যবোধ সবকিছুকেই মনোজগতের কৃত্রিম একটি construct মনে হয়। ক্ষমতার চর্চা সব rationale হারিয়ে ফেলে। ক্ষমতা সম্পর্কে যখন ভারসাম্যহীন এমনি একটি ধারণা জন্মায়, তখন মানুষের আচার-আচরণেও তার প্রতিফলন ঘটে। আমরা জানি যে, যুদ্ধ-মুক্তিযুদ্ধ কিংবা গৃহযুদ্ধ বা যে কোন ধরনের সামাজিক কনভালশনে একটি নেতিবাচক দিক প্রবল হয়ে দেখা দেয়। একে আমরা বলি ডিহিউম্যানাইজেশন প্রসেস বা ব্রুটালাইজেশন প্রসেস। এই দুটো প্রসেসে মানুষের মানবিক গুণাবলী ও মানুষের শ্রেয়বোধগুলো অনেক সময় লোপ পায়। এর পাশাপাশি যা প্রয়োজন, এ ধরনের একটি মহৎ সংগ্রামে মহত্তর রাজনৈতিক আদর্শ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়, তার মাঝখানে এসে নতুন কিছু উন্নততর মূল্যবোধ প্রতিস্থাপন করার কাজটি যদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা না হয় তখন মানুষ নৈরাজ্য ও এক ধরনের ক্যাওটিক সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে তার ইমপালস দ্বারা পরিচালিত হয়। যদিও প্রায় পৌনে এক শতাব্দী পূর্বে বিশিষ্ট মার্কিন পণ্ডিত John Dewey বলেছিলেন, Man is a creature of habit, not of reason, not yet of impulse-এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চাননি যে, মানুষ Rational Being নয়। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামো বা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে মানুষ যেসব অভ্যাস দ্বারা পরিচালিত হয়, যেসব অভ্যাসের অধীনস্থ হয়ে পড়ে, সেই অভ্যাসগুলো যুক্তির চাইতে অনেক বেশী কার্যকর। যেমন ধরুন, আমরা যখন দুটি ভিন্নধর্মী মানুষকে পরস্পরের মধ্যে কুশলাদি বিনিময় করতে দেখি, তখন কুশল বিনিময়ের কথা শিখিয়ে দিতে হয় না। আমাদের বাংলাদেশের সমাজে একজন মুসলমান যখন একজন হিন্দুকে দ্যাখেন, কুশলাদি বিনিময় করার সময় সচরাচর বলে থাকেন, আদাব, কেমন আছেন। অনেক সময় আমাদের সমাজে দেখি অনেক হিন্দু ভদ্রলোকও মুসলমান ভদ্রলোককে দেখে বলেন, 'আস্সালামু আলাইকুম'। তিনি ধর্মীয়

www.pathagar.com

তাৎপর্যের দিকে নজর দেন না বা ওটাকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেন না। তিনি একটি সামাজিক রীতির ভিত্তিতে পরস্পরের সাথে কুশলাদি বিনিময় করার যে রেওয়াজ, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজে চালু আছে সেই রেওয়াজের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অভ্যাসের কারণেই তিনি এই কাজটি করেন। অথচ আমরা যদি একজন ধার্মিক ব্যক্তির কাছে যাই, তিনি হয়তো যুক্তি দিয়ে বলবেন যে, বিধর্মীদের জন্য সম্বোধন এক ধরনের হবে, স্বধর্মীর জন্য সম্বোধন আরেক ধরনের হবে। মোদ্দাকথা, মানুষ স্বাভাবিকভাবে যে আচরণটি করে, সেটি তার দীর্ঘদিনের অনুশীলিত অভ্যাস, দীর্ঘদিনের লালিত বিশ্বাস, মূল্যবোধের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং এই আচার-আচরণ ও এই সামাজিক লেনদেনের মধ্যে যদি একটি পরিবর্তন আনতে হয়, সে ক্ষেত্রে খুবই ধীরে স্থিরে, চিন্তা ভাবনা না করে যদি সেটি করা হয় তাহলে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হতেই পারে।

মাহবুব উল্লাহ :

আপনি ভারসাম্যহীনতার কথা বলছেন– এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায়, সেটা হচ্ছে রাশিয়ায় জন্মগ্রহণকারী কিন্তু এখন ব্রিটেনে অধ্যাপনা করছেন, প্রফেসর টিউডর শ্যানিন রুশ সমাজের, বিশেষ করে রুশ কৃষক সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তাঁর 'অক্যোয়ার্ড ক্লাস' নামক গ্রন্থে। সেই বইটির মুখবন্ধে তিনি বলেছেন, সমাজ বিজ্ঞানীরা সমাজ কীভাবে পরিবর্তিত হয়, তা নিয়ে অনেক তত্ত্ব দেন, অনেক গবেষণা করেন, অনেক চিন্তাভাবনা করেন, কিন্তু সমাজে কীভাবে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে, সে ব্যাপারেও আমাদের চিন্তাভাবনা করা দরকার এবং সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কথায় কথায় বলি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কিন্তু সমাজে যখন মূল্যবোধ কাজ করে না বা প্রচলিত মূল্যবোধগুলো যখন ভেঙ্গে যায়, তখন ভারসাম্য বা স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে যায়। চীনের মতো বিপ্লবী দেশে, যেখানে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে এবং তারা কিছুদিন আগে তাদের বিপ্লবের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব পালন করেছে তারাও এই সামাজিক স্থিতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় এবং গুরুত্ব দেয় বলেই তারা তাদের পলিটিক্যাল লিবারাইজেশন প্রসেস একটু আঁটসাঁট বেঁধে করার চেষ্টা করে এবং সেটাকে খুব সহজে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেয় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে অর্থনৈতিক লেনদেন করি সেখানেও মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ব্যাপারটা আছে। আমাদের দেশে এখন প্রায়শই আমরা শুনি, যে সন্তান সম্ভবা নারীর স্বাভাবিক সন্তান প্রসব হওয়ার কথা, তার উপর সিজারিয়ান অপারেশন চালিয়ে দেয়া হয় এবং এর জন্য সেই রোগিণীর প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এর কারণটা হচ্ছে, রোগিণীর স্বাস্থ্যগত বা শারীরিক অবস্থা কোন পর্যায়ে আছে সেটা সিজারিয়ান অপারেশন ছাড়া স্বাভাবিক নিয়মে করা সম্ভব কিনা, এটা একটা বিশেষায়িত জ্ঞান যা রুগিণীর অভিভাবকের নেই, কিন্তু ডাক্তারের আছে। ইনফর্মেশন ও নলেজের এসিমেট্রির কারণে ডাক্তারদের পক্ষে অনেক সময়ে নৈতিকতাবিরোধী আচরণ করতে দেখা যায়। ডাক্তারদের বিরুদ্ধে আমরা অনেক সময়ে অভিযোগ শুনি, রোগীর সমস্যা, কষ্ট সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে না জেনেই তারা দ্রুত প্রেসক্রিপশন লেখেন। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক রোগী দেখে তারা প্রচুর পয়সা কামাতে চান। পুঁজিবাদী সমাজে এই ধরনের লেনদেনের মাধ্যমে যে নীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপ হয়, সেটাকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিও বলেছে মরাল হ্যাজার্ড। একটা পুঁজিবাদী দেশে যেখানে গোটা অর্থনীতিটা বিনিময় ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত আর তার পাশাপাশি একটা কৃষক সমাজ যেটা আত্মপোষণশীল অর্থনীতি একটা subsistence economy যেখানে নিজের উৎপাদিত পণ্যের ওপরই নিজেরা নির্ভর করে, এই দুই ধরনের সমাজ কাঠামোর মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে। আর পার্থক্য থাকার ফলেই বিনিময়ভিত্তিক সমাজে বিনিময়ের লেনদেনের মরাল হ্যাজার্ডগুলো এভয়েড করার জন্য রাষ্ট্রের কিছু রেগুলেশনের প্রচলন রয়েছে।

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন ডাক্তার কোনো চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবহেলা করলে তাকে শুধু তার পেশা থেকেই বিতাড়িত করা হয় না, তাকে বিশাল অঙ্কের জরিমানাও দিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের সে ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মরালিটি বা নৈতিকতার কিছু কিছু বিষয় রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের পর্যায়ে চলে গেছে। এর কারণ হচ্ছে ঐ সাবসিস্টেনস সিচুয়েশন থেকে যখন ক্রমান্বয়ে বিনিময় ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর এবং ব্যাপকতর আকার ধারণ করছে তখন রাষ্ট্রকেই রেগুলেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে। এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে যে, একটা সাবসিসটেন্স সোসাইটিতেও কি মূল্যবোধ কাজ করে না? কাজ করে। যেমন আমাদের দেশে জেলে সম্প্রদায়, তাঁতী সম্প্রদায়, কৃষক সম্প্রদায় আছে, তাদের পেশাগত জীবনে কতোগুলো মূল্যবোধ কাজ করে। সত্যিকার খাঁটি জেলে কখনো মাছের পোনা ধ্বংস করতে পারে না। কারণ, সে জানে এই পোনা বড় হয়ে তার জন্য ভালো আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। সেজন্য বাংলাদেশ নামের আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশে বিভিন্ন সিজনে বিভিন্ন মাছ ধরার জন্য প্রায় ৩০০ ধরনের ফাঁদ ও জালের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু ইদানীংকালে এই মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা ক্যাপিটাল কনজাম্পশন করছি। যেটাকে বলা হচ্ছে অরিজিনাল ফান্ড অব কনজাম্পশন। মাছের পোনাটাই হচ্ছে জেলের জন্য তার খেয়ে-পরে বাঁচার মূল সম্পদের উৎস। সেটাকে সে বিনষ্ট করতে পারে না, যদি সে তার পেশায় টিকে থাকতে চায়। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে, নির্বিচারে মাছের পোনা ধ্বংস করা হচ্ছে। এর কারণটা হচ্ছে এই যে, অর্থনৈতিকভাবে সমাজে যে মেরুকরণ হচ্ছে, তাতে কৃষকরা ভূমিহীন হচ্ছে, ভূমিহীন হয়ে কেউ কেউ জেলে হচ্ছে, এরপর জেলে পেশার নৈতিকতাটা সে সেভাবে গ্রহণ করতে পারছে না এবং পারছে না বলেই সে মনে করছে 'আজই সব মাছ আমি ধরে ফেলবো, ভবিষ্যতের জন্য কিছু রাখবো না' এবং এর ফলে সে এই ধরনের আচরণ করছে। আমাদের সমাজে মূল্যবোধের যে একটা বিরাট পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তার একটা বিরাট কারণ হচ্ছে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে জীবনযাত্রা, পেশা ও জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড রকমের Mobility বা সচলতা সূচিত হয়েছে। এক পেশা থেকে মানুষ অন্য পেশায় যাচ্ছে, এমনকি অনেকে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালা হয়তো ক্ষুদে ব্যবসায়ী হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে। কারণ, এখন আর শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করে কারো পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

আমি একটু আগে চিকিৎসকের কথা বলেছিলাম। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে medical ethics বলে philosophy'র একটি ব্রাঞ্চ তৈরী হয়েছে। সেটাতে ডাক্তারদের প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা আছে। একজন ডাক্তারের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেমন সমাজের বিধিবিধান আছে, তেমিন তার আচরণ ধর্ম ও নীতিবোধ শিক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাখারও ব্যবস্থা আছে। এছাড়া মূল্যবোধ পরিবর্তনের আরো অনেক কারণ আছে। যেমন– patron-client-relationship, এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিজয় জগন্নাথন নামে ভারতের একজন অর্থনীতিবিদ যিনি ইন্ডিয়ান আইএএস সার্ভিসে ছিলেন– তিনি Food for works Programme এ দুর্নীতি তদন্ত করার জন্য একটি গ্রামে গিয়েছিলেন। দেখা গেল, তদন্তকালে যারা কৃষক, বিশেষ করে যারা ভূমিহীন মজুর তারা সেই দুর্নীতির ব্যাপারে তথ্য দিতে রাজী নয়। ফলে সত্যিকার অপরাধীকে শাস্তি দেয়া গেল না। এর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এই যে, ঐ এলাকার Food for Works-এর কাজ যারা পরিচালনা করে তারা হচ্ছে ঐ এলাকার জোতদার বা জমির মালিক। ঋণের জন্য, জমিতে কাজ করার জন্য এবং সামাজিক বিচার-সালিশের জন্য এদের ওপরেই ঐ গরীব মানুষগুলোকে নির্ভর করতে হয়। ফলে গরীব মানুষটি চিন্তা করে দেখলো, 'আমি যদি আজকে সরকারের সামান্য কর্মসংস্থানের কোনো তথ্য ফাঁস করতে গিয়ে সারা বছরের কাজকর্ম, লেনদেনের সুযোগ-সুবিধা হারাই তাহলে সেটা আমার জন্য খুব ক্ষতির কারণ হবে।' এই চিন্তা করে অনেকেই সত্য ভাষণে

www.pathagar.com

বিরত হয়। আমরা বলি যে, যত বড় ক্ষতি বা বিপর্যয়ই আসুক না কেন যিনি সত্য কথাটি বলেন, আমরা তার প্রশংসা করব। কিন্তু সব সময়ে সত্য কথা বলা, দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া সম্ভব হয় না।

এছাড়া, আমাদের সমাজের মূল্যবোধ ধসে পড়ার পেছনে আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে আজকের আকাশ সংস্কৃতি। এই আকাশ সংস্কৃতির ফলে দেখা যাচ্ছে পরিবারের মধ্যে, পরিবারের গণ্ডিতে যেসব জিনিস এক সময় কল্পনা করা যেতে না, সেটাই এখন হচ্ছে। টিভিতে এমন ধরনের অনুষ্ঠান মা-বাবা-ছেলেমেয়েরা মিলে দেখছে, যেটা রুচি ও শ্রেয়বোধের দিক থেকে উচিত নয়। কিন্তু সেখানে অনেক সময় দেখা যায়, মা-বাবা পুত্র-কন্যার সাথে সম্পর্ক নষ্ট হবে এই কারণে সেসব অনুষ্ঠান দেখতে বারণ করেন না। ফলে সেগুলোর একটা ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। মূল্যবোধ রক্ষা করা যে কত প্রয়োজন সেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইদানীংকার মার্কিন সমাজে যখন আমরা একটা প্রচণ্ড উদ্বেগ লক্ষ্য করছি। সেখানে দেখা যায় বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তাছাড়া বিয়ের আগে নারী-পুরুষ বন্ধুর মধ্যকার সম্পর্কটাকে অনেক পশ্চিমা সমাজ আইনের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য মনে করছে। কিন্তু এটা একটা শাশ্বত আবেদন 'তোমরা তোমাদের বৈবাহিক জীবনকে স্থিত রাখ। বৈবাহিক বন্ধনকে স্থায়ী রাখার চেষ্টা কর। আমৃত্যু তোমাদের এই বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখ'। সমাজ একটা মারাত্মক বিপর্যয়ের দিকে যখন এগিয়ে যায় তখন মূল্যবোধগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা গেলে সমাজকে বাঁচানো বা রক্ষা করা যায়। সেদিকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া ধর্মেরও একটা বিরাট ভূমিকা আছে। ধর্মের যেমন কতগুলো আচরণগত দিক আছে, তার সঙ্গে একজন ধর্মপরায়ণ মানুষ যেহেতু সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করেন সেহেতু অসামাজিক, অনৈতিক এবং ধর্ম যা স্যাংশন করে না, এই ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকেন। কাজেই কেবলমাত্র আইন বা পুলিশী প্রশাসন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা আমাদের সমাজে মূল্যবোধগুলোকে রক্ষা করতে পারবো না। এর পাশাপাশি নৈতিকতার শিক্ষাটাকে আমরা শিশুকাল থেকে ব্যাপকভাবে নতুন প্রজন্মের হৃদয়ের মধ্যে প্রোথিত করে দিতে পারি। তাহলে হয়তো সমাজকে রক্ষা করা যাবে।

আফতাব আহমাদ :

পাশ্চাত্য জগতে একতরফা একটি প্রচারণা আছে, ধর্মকে কেন্দ্র করে তথাকথিত মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন। আমরা যদি এখন গভীর মনোযোগের সাথে পাশ্চাত্য সমাজের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখবো ধর্মকে কেন্দ্র করে যে শ্রেয় নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কথা আপনি বললেন, এগুলোকে পাশ্চাত্যে সমাজ আজ গভীর মমত্ব ও যত্নের সাথে লালন করার চেষ্টা করছে এবং পাশ্চাত্যের সমাজ বিজ্ঞানীরা এখন এর ওপরে অনেক বেশী গুরুত্বারোপ করছেন। একই সঙ্গে আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে, ইউরোপ এবং আমেরিকায় বর্তমানে একটি আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। সেটি হচ্ছে, পরিবারকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া, পরিরক্ষণ ও সুন্দরভাবে পুনর্গঠন করা এবং পরিবার যে সমাজ কাঠামোর একটি primary ও অত্যন্ত effective unit তা রিকগনাইজ করা। পরিবার যাতে নষ্ট না হতে পারে সেদিকে আজকে তারা অনেক বেশী যত্নবান হয়ে উঠেছেন। এর কারণ হলো যা গোড়াতেই আমরা বলেছি, পরিবারই হচ্ছে সেই primary institution যেখানে আমরা নাগরিকদের সামাজিকায়নের প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হতে দেখি।

আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা শতদিক থেকে পাশ্চাত্য জগতের বিকৃতি ও অবক্ষয়ের সঙ্গে পুঁজিবাদী অর্থনীতির কারণে সংগ্রথিত হয়ে আছি। আমাদের দেশে মাত্রাজ্ঞান বিবর্জিত পন্থায় যে ধাঁচের মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তিত হয়েছে তার ফলে আমাদের অর্থনীতি একটি

www.pathagar.com

ডিসটর্টেড শেপ গ্রহণ করেছে।ফলে আমরা এমন সব মূল্যবোধ দ্বারা আজকে তাড়িত এবং পরিচালিত যে মূল্যবোধ আদিতে আমাদের সমাজে ছিলো না। আমরা সবাই জানি, ছোটবেলায় আমাদের ধারাপাত পড়াবার সময় জীবনের আদর্শ বুলি হিসেবে এ সুবচনগুলো পড়ানো হতো, "লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে সে" "আপনারে বড় বলে বড় সে নয়/ লোকে যারে বড় বলে, বড় সে হয়"। এই নীতিবাক্যগুলোকে আজকের ইতর বস্তুবাদ এবং নগ্ন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার যুগে দেখা যায় ঠিক তার উল্টো রূপে। এখন একজন তরুণ বা তরুণী আর বলতে রাজী নয় লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে। কারণ, সে তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, লেখাপড়া করে না যে গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে সে। পাশাপাশি সে এও দ্যাখে যে, নিজেকে যে বড় বলে, সেই বড় হয়। প্রকৃত বড় মানুষের কদর সমাজে নানাবিধ কারণে কমে এসেছে। এর ফল হচ্ছে এই যে, অধঃপতিত বিকৃত জীবনাচরণকে জীবনের শ্রেয় এবং মুখ্য আচরণ বলে মানুষ গ্রহণ করছে। আমাদের সমাজে আমরা যদি খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, বিশ্বের এই unbridled consumer market-এর সঙ্গে interact করতে গিয়ে যে নতুন নতুন demands সোসাইটির ওপর সৃষ্টি হচ্ছে- যে new goalsগুলো সেট হচ্ছে, সেগুলো achieve করা বা fullfill করার জন্য আমরা এমন সব পন্থা বেছে নিচ্ছি যেগুলো কোন অবস্থাতেই social equilibrium বা stability'র পক্ষে কাজ করে না। যেমন ধরুন, একটা সময় ছিলো, যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণী শিক্ষক কোন মেধাবী প্রতিভাবান ছাত্রকে দেখতেন, তাকে যত্নের সঙ্গে তার জ্ঞানের কীভাবে আরও উৎকর্ষ করা যায়, কীভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, সাহায্য যোগাতেন বইপত্র ইত্যাদি দিয়ে। কালানুক্রমে হয়তো সে শিক্ষক মনে মনে এও ভাবতেন যে, এই ছাত্রটির কাছে যদি তার কন্যা সম্প্রদান করা যায়, তাহলে অতি উত্তম একটি কাজ হবে। কিন্তু এখন দেখা যায়, শিক্ষকতার মতো একটি মহৎ পেশায় নিবেদিত প্রাণ একজন ব্যক্তি এখন চিন্তা করেন যে, দুবাই ফেরত একটি ছেলের কাছে তার কন্যাকে কীভাবে সম্প্রদান করা যায়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক টানাপড়েনে এই সময়ে এখন মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, বস্তুগত দিক থেকে কে কত বেশী সাফল্য অর্জন করেছে। কার কত বেশী বিত্ত তার নিরিখেই একজন ব্যক্তির মূল্যায়ন হচ্ছে। এই যে মূল্যবোধের অবক্ষয় এর পিছনে কোন জিনিসটি কাজ করছে? এর পেছনে মূলত যে জিনিসটি কাজ করছে, সেটি হল আমাদের সমাজ কাঠামোর ভিতরে এক ধরনের ভারসামীহ্যনতা।

আমরা জানি যে, গ্রামের দরিদ্র মানুষ সাধারণত সৎ থাকার চেষ্টা করেন এবং দরিদ্র কৃষক মিথ্যা কথা বলেন না। কিন্তু বিগত দু'দশকের একটি অভিজ্ঞতা বিশেষ করে সমাজকর্মীদের হয়েছে। সেটি হলো এক সময় ছিল যখন ঘূর্ণিঝড় বা মহাপ্লাবনের পর ত্রাণসামগ্রী নিয়ে উদ্ধারকর্মী, সমাজসেবীরা যেতেন প্রপীড়তদের কাছে তখন কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো, 'তোমার কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে?' তখন সে সঠিক হিসেবটি দিয়ে দিত। কিন্তু আজকাল দেখা যায় সামান্য একটি ঘূর্ণিঝড় হয়ে যাওয়ার পরও যার ঘরের দুটো টিন উড়ে গেছে, সে বলে বসে 'আমার দশটি টিন উড়ে গেছে।' বা যার কোন ক্ষতিই হয়নি, সে তার ক্ষতির পরিমাণটি অনেক স্ফীত আকারে তুলে ধরে। তার কারণ, জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে সে শিখেছে যে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে যারা আসে তাদের কাছে যা চাওয়া হয়, তা তারা পরিপূর্ণভাবে দিতে নারাজ এবং তাদের কাছে যা বলা হয়, তা তারা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে নারাজ। প্রশাসন বা সমাজকর্মীদের এই যে দৃষ্টিভঙ্গি ভুক্তভোগী মানুষ আজ তা বুঝতে পারছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা আজ বাধ্য হয়ে মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছে এই ভেবে যে, দশটি ঢেউটিন নষ্ট হয়েছে বললে দশটির স্থলে অন্তত তিন/চারটি তো পাওয়া যাবে। একটি ঢেউটিন নষ্ট হয়েছে বললে কিছুই তো পাওয়া যাবে না। এই যে relief oriented mentality যেটা আজকে সাধারণ কৃষকদের বা গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যেও গড়ে উঠেছে, এটির একটি

www.pathagar.com

কিউম্যুলেটিভ ইমপ্যাক্ট আলটিমেটলি আমরা দেখি সমাজের নানা পর্যায়ে এসে পড়েছে। এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রেও আপনি দেখুন, সত্যিকার অর্থে লেখাপড়া করে, মৌলিক গ্রন্থাদি হাতিয়ে, মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে একটি মৌলিক বিষয় উপস্থাপন করার পরিবর্তে সকলে ব্যস্ত আছেন কী করে বাজিমাত করা যায়। চটকদার কথাবার্তা বলে কী করে মানুষকে সম্মোহিত করা যায়। এ কারণে আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, আমাদের বিদ্বৎজনদের মধ্যে যে প্রবণতাটি তীব্র নগ্নরূপ লাভ করেছে তা হলো এমিনেন্স অর্জন করা নয়, প্রমিনেন্ট হওয়া এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার একটি বিশেষ অবদান আছে। যারা যত বেশী এই মিডিয়াগুলোর সার্কুলেশনে থাকবেন, তাদের ধারণা, তাদেরকে মানুষ বেশী জ্ঞানীগুণী এবং পণ্ডিতজন হিসাবে স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এতে চিন্তা ও মননের জগতে দৈন্যের প্রসারই শুধু ঘটে এবং সেখানে এক ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাংক্রাপ্টসি যে সৃষ্টি হয়, যা ইন্ টার্ন একটি বিকৃত মূল্যবোধের জন্ম দেয়। এটি একটি ভিশাস সার্কেলের মতো আমাদের সমাজটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। সেজন্য সমাজ কাঠামোর ভারসাম্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবার ও ধর্মের ভূমিকা, কোন অবস্থাতেই খাটো করে দেখার বিষয় নয়। একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার সমাজে যাঁরা নেতৃত্ব দেন সামাজিক, কৃষ্টিক বা রাজনৈতিক পর্যায়ে তাদের মধ্যে আজকে একটি পরিবর্তন আশু প্রয়োজন।

মাহবুব উল্লাহ :

এখানে কনজিউমারিজমের কথা এসেছে। ভোগবাদের কথা এসেছে। আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশের ফলে হাজারো ধরনের ভোগ্যপণ্য আজকে পৃথিবীতে উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলোর বাণিজ্যিক বিনিময় হচ্ছে। এর কতোগুলো আমাদের প্রয়োজন, সেটা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। দার্শনিকরা বলেন যে, মানুষের চাহিদা দু'রকম। এক রকম চাহিদা হচ্ছে ফেল্ট নীড। আরেকটা হচ্ছে ক্রিয়েটেড নীড। আজকে যে বাজার অর্থনীতির কথা বলা হচ্ছে, সেটা মানুষের মধ্যে ফেল্ট নীডের চাইতে অনেক বেশী করে ক্রিয়েটেড নীড বা মেকী চাহিদার সৃষ্টি করছে এবং এটা সৃষ্টির করার পিছনে চটকদার এডভার্টাইজমেন্টের একটা ভূমিকা আছে। মানুষের ভোগবাদ, বিকৃত রুচি তৈরীর পিছনেও এর একটা ভূমিকা রয়েছে। আমার মনে হয় পুঁজিবাদী সমাজও এখন বুঝতে শুরু করেছে যে, শুধু বর্তমানের ভোগের দিকে না তাকিয়ে ভবিষ্যতের দিকেও তাকানো দরকার। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিছু রেখে যাওয়া দরকার। সেই জন্য এক নতুন ধরনের এথিক্স ডেভেলপ করেছে। সেটা হচ্ছে পরিবেশ সচেতনতা। শুধু আমরা বাঁচবো না, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও বাঁচাতে হবে। এই উপলব্ধি মানুষকে কিছুটা কনজিউমারিজম থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি। আজকে কেবল উৎপাদন. ভোগ আর সমৃদ্ধি অর্জন যে শেষ কথা নয়, মানবজাতির মধ্যে এই উপলব্ধি আসছে এবং ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মানুষ চিন্তা করতে শুরু করেছে। এটা আশার দিক এবং আমার মনে হয়, আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সুনীতিবোধগুলো যদি আমরা শিশু বয়স থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে দিতে পারি, তাহলে আমাদের সমাজে কিছুটা স্থিতিশীলতা, কিছুটা শান্তি ফিরে আসবে। সেই ধরনের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রত্যেকটি পরিবার, প্রত্যেকটি মানুষ চেষ্টা করবে এটাই আমরা আশা করি।

আফতাব আহমাদ :

আসলে আমাদের যে জিনিসটির ওপর বেশী জোর দেয়া দরকার, সেটি হচ্ছে সমাজ জীবনে প্রকৃত condition কী তা অনুধাবন করে মানুষের shared standards কী ধরনের discrepancy জন্ম দিচ্ছে তা চিহ্নিত করা। আমরা যদি contrasting

www.pathagar.com

attitude and demand কে উস্কে দিয়ে contrasting solution'র চাপাচাপি করি তাহলে সেখানে আমরা এক ধরনের সংঘাত বা সংঘর্ষের জন্ম দেব, সে ক্ষেত্রে সমাজের স্থিতি এবং কাংক্ষিত যে মূল্যবোধের কথা বলছি, সেটি হবে প্রথম এবং প্রধান victim. সমাজ ও রাজনীতির যারা শীর্ষস্থানে, তারাই এই ধরনের কনফ্লিক্টের জন্ম দেন। আমি একটি উদাহরণ দিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই। শেখ মুজিবুর রহমান যখন দেশে ফিরে আসেন তখন তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবস্থা দেখে জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তিন বছর তোমাদের কিছু দিতে পারবো না। তোমরা ধৈর্য ধারণ করো।' এ দেশের মানুষ ঠিকই ধৈর্য ধারণ করা শুরু করেছিল। কিন্তু দেখা গেলো, শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের তিন বছরের জন্য ধৈর্য তো ছিলই না, উপরন্তু দেশের কলকারখানা থেকে শুরু করে সবকিছুর দলীয়করণ ঘটাবার পরেও যেভাবে দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে লুণ্ঠন প্রক্রিয়া চালিয়ে ছিল, এমনকি দলভুক্ত বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলো কলকারখানার বিভিন্ন উপকরণ এবং ইনপুটস যেভাবে কালোবাজারে বিক্রি করা শুরু করেছিলো এবং দেদারসে লুটপাট জারি রাখলো, তাতে সাধারণ একজন শ্রমিক ভাবা শুরু করলো আমি তো এই কারখানা এবং এর কাঁচামালকে এতোদিন হেফাজত করেছিলাম এবং আমি তো ভেবেছি যে, তিন বছর ধৈর্য ধারণ করার পর এই কারখানা থেকে যে লভ্যাংশ সৃষ্টি হবে, এই কারখানা সম্প্রসারণে এবং শিল্পায়নে যে অবদান রাখবো, এতে পরোক্ষভাবে সমাজ থেকে আমরা সকলেই সম্মিলিতভাবে উপকৃত হব। কিন্তু আওয়ামী লুটতরাজের ফলে স্বাভাবিকভাবে ঐ শ্রমিক তার পূর্বতন মূল্যবোধে অটল থাকতে পারেনি। সে যখন দেখলো শীর্ষস্থানীয়, নেতৃবৃন্দ ও সংগঠন সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার দাবি নিয়ে সমাজের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসে একটি ভিন্ন তাড়নায় ছুটে চলেছে তখন সেও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলো। অর্থাৎ মূল্যবোধের ব্যাপারটা শুধু একজন ব্যক্তি কিংবা একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। গোটা সমাজটার মধ্যে যে নানা ধরনের units & structure আছে সেগুলো একে অপরের সাথে কীভাবে interact করছে এবং একে অপরকে কীভাবে compliment করছে সেদিকে সমাজ প্রকৌশলী যদি নজর না দেন, তাহলে আমরা মূল্যবোধের যে কাংক্ষিত ভূমিকা সমাজের প্রগতির ক্ষেত্রে দেখতে চাই, সেই ভূমিকা আমরা কখনোই প্রতিপালিত হতে দেখবো না।

মাহবুব উল্লাহ :

এখানে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথার ইতি টানবো। পাকিস্তান যখন হলো ১৯৪৭ সালে, তখন লাহোরে রেলের যে ওয়ার্কশপ ছিলো তার শ্রমিকরা পালাক্রমে গেটে পাহারা দিতো। তারা নজর রাখতো কোন শ্রমিক বা কেউ ওয়ার্কশপ থেকে ছোট কোন লোহার টুকরাও নিয়ে যাচ্ছে কিনা। পরবর্তীতে দেখা গেলো ম্যানেজমেন্টে যেসব বড় বড় আমলারা আছেন, তারাই কারখানা থেকে মাল সরাতে শুরু করেছেন। এটা দেখার পর শ্রমিকরাও সেই একই রোগে সংক্রমিত হয়ে গেলো। এই গল্পটি আমাকে বলেছিলেন মির্জা ইব্রাহিম। বিখ্যাত শ্রমিক নেতা মির্জা ইব্রাহিম সাহেব তিনি এখন জীবিত আছেন কিনা জানি না। এটা একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত যে, উপরের স্তরে যদি দুর্নীতি দেখা দেয় তাহলে সামাজিক ধস নামতে বাধ্য। আমরা কথায় বলি মাছের পঁচন ধরে মাথা থেকে। সমাজেরও পঁচন ধরে মাথা থেকে। এই মাথার পচন বা সমাজের যারা কর্তৃত্বে আছেন, তাদের পঁচন সর্বাগ্রে রোধ করতে হবে।

www.pathagar.com

২৪ অক্টোবর ১৯৯৯

আওয়ামী শাসন ও বোমা রহস্য

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশে স্বাধীনতা-উত্তরকালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কখনোই খুব একটা ভাল ছিল না। বিশেষ করে, '৭২-'৭৫-এ রক্ষীবাহিনীর নির্মম নিপীড়ন এবং একদলীয় শাসনের কঠোরতা ও নির্মমতা এ দেশের দেশপ্রেমিক সাহসী যুবসমাজকে অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ বেছে নিতে বাধ্য করে। রাজনীতি যখন তার সুস্থ ও স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয় না, এই স্বাভাবিক স্রোতকে যখন অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়, তখনই রাজনীতি একটা অস্বাভাবিক অবস্থার দিকে ধাবিত হয়। সেই জন্য রাজনীতি বিজ্ঞানীরা বলেন, স্বাভাবিক গতি প্রবাহকে, মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে, মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে. কখনোই নিষ্ঠুরভাবে দমন করতে নেই এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যখনই ক্ষুণ্ণ হয়. তখনই তা মানুষকে অগণতান্ত্রিক পন্থা বেছে নিতে উৎসাহিত করে। তৎকালীন রক্ষীবাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কারও কারও মতে এই দেশে ৩৭ হাজার, কারও মতে ৪২ হাজার যুবক নিহত হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোন সরকারের আমলে এ ব্যাপারে কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। এমনকি তখনকার এই নিষ্ঠুর দমননীতির ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নানাভাবে, তাদের একটা তালিকা প্রণয়ন করা এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের এই ক্ষতির জন্য সমবেদনা বা দুঃখ প্রকাশ করাও হয়নি। জিয়াউর রহমান এ দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে বহুদলীয় রাজনীতির পথ উন্মুক্ত করে দেন এবং তিনি নিজে একজন সেনানায়ক হওয়া সত্ত্বেও দেশে গণতান্ত্রিক বিধিবিধান চালু করেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর রাজনীতি ছিল জাতীয় সমঝোতার রাজনীতি। সেখানে বহুদল থাকবে, বহুমত থাকবে, কিন্তু কেউ কারও বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না এবং জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে না– এটাই ছিল তাঁর নীতি। এর ফলে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আগে বেআইনী ছিল, তাদেরকেও তিনি প্রকাশ্যে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং এই সুযোগ কম্যুনিস্ট, নকশালপন্থী থেকে শুরু করে ইসলামী দলগুলো সকলেই গ্রহণ করেছিল। এর একটা শুভ প্রভাব সমাজের মধ্যে পড়েছিল এবং আমরা লক্ষ্য করেছি সেই সময়ে গ্রামের মানুষ বলত এখন আমরা নিরাপদে ঘুমাতে পারি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, জিয়াউর রহমান তাঁর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। কারণ, ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে হত্যা করে। পরবর্তী সময়ে দেশে সামরিক শাসন আসে এবং এই সামরিক শাসনের সময়ে স্বাভাবিক রাজনীতির পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে দেশে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, আন্দোলন ইত্যাদি হতে থাকে। এরপর যখন নব্বইয়ের গণআন্দোলনের পথ ধরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শুভ সূচনা হলো, দেশে সুস্থ রাজনীতি করার একটা সুযোগ হলো, তারপরেও আমরা দেখতে পেলাম যে, দেশে রাজনৈতিক সহমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটা না হওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে, সেটা নীতি নির্ধারণে ভুলের কারণে হতে পারে, বৈদেশিক ষড়যন্ত্র বা একদেশদর্শিতার কারণে হতে পারে। এরপর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয় এবং এরা ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রথমদিনেই তাদের কর্মীদের হাতে এক যুবক নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় এবং সে ছিল বিরোধী দলেরই একজন কর্মী। এরপর বহু দুর্ভাগ্যজনক, লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগজনক, আতঙ্কজনক যে ক'টি ঘটনা সারা জাতিকে বিমূঢ় করে দিয়েছে, সারা জাতি যেভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কুষ্টিয়ার জনসভা চলাকালে জাসদ নেতা কাজী

www.pathagar.com

আরেফসহ ৫ জনের নির্মম হত্যাকাণ্ড। তার পরপরই ঘটল যশোরে উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা– যাতে ১০ জন নিহত হলো, আরও বহু লোক আহত হল। সেই বোমা কারা পেতেছিল, এর উৎস কোথায় ছিল, এর পিছনে কারা ছিল, কী উদ্দেশ্যে তারা এটা করেছিল, সেটা কিন্তু দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হয়নি। সম্প্রতি বিরোধী দলের এক নেতাকে জড়িয়ে এ নিয়ে মামলা হয়েছে। কিন্তু তদন্তে এটাও দেখা যাচ্ছে যে, এ ঘটনার সাথে সম্ভবত সরকারী দলের স্থানীয় জনৈক নেতা জড়িত ছিলেন।

সুতরাং এই ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। এরপরে আমরা বারবার শুনতে পেলাম দেশে একটা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলছে। আবার হত্যার রাজনীতি শুরু করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং বিরোধী দল শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের রক্ষা করার জন্যই সরকারকে উৎখাত করা এবং দেশে একটা অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য তৎপর রয়েছে এবং নানা ধরনের cock and bull stories manufacture করা হচ্ছে, অমূলক সব কাহিনী প্রচার করা হচ্ছে, ফাঁদা হচ্ছে। শোনা গেল, চট্টগ্রামের এক নিরীহ যুবক নূরুল আবছার এক ভয়ানক মারাত্মক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের সাথে জড়িত এবং সে দেশে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে চেয়েছিল। একটি ভুয়া ফ্যাক্সের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের নামে তার ওপর শারীরিক অত্যাচার করা হয়। কিন্তু পরে জানা গেল, কোন সন্ত্রাসী তৎপরতা বা কোন চক্রান্তের সাথে তার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। হাল আমলে অতি সম্প্রতি গত দু'মাসে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। জনকণ্ঠ অফিসে রেখে যাওয়া এক ব্রিফকেসে মারাত্মক ধরনের ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন আবিষ্কার করা হয়েছে। এরপর খুলনার এক কাদিয়ানী উপাসনালয়ে দুটো বোমা বিস্ফোরণে ৬ জন নিহত হলো। সেই সাথে ঢাকার কাদিয়ানী অফিস থেকেও দুটো বোমা উদ্ধার করা হয়। ঢাকার মিরপুরে একটি মসজিদ থেকেও বোমা উদ্ধার করা হল। বলা হল যে, প্রধানমন্ত্রীর ইউনেস্কো পুরস্কার নিয়ে দেশে ফেরার পর তাকে পল্টন ময়দানে যে সংবার্ধনা দেয়ার আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে যাওয়ার পথে বিজয়নগর থেকে পল্টন ময়দান পর্যন্ত কোন একটি স্থানে বোমা নিক্ষেপ করে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এসব রটনার ফলে সারা দেশে এক আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ঢাকার অনেক বহুতল আবাসিক ভবনেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সামান্য একটা বাক্স বা কোন কার্টুন পড়ে থাকতে দেখলেই লোকজন আতঙ্কিত হয়ে ছুটে পালাতে থাকে। পুলিশ ডাকা হয়, সেনাবাহিনীর লোকজনও ডাকা হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, এসব ঘটনাগুলো যখন ঘটছে, তার আগে সেগুলো নিরোধ করা বা সেগুলো যাতে না ঘটে– সেজন্য নিরাপত্তামূলক কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। পরে পেতে রাখা বোমা বা মাইন আবিষ্কার করা হয়। অথচ এই ধরনের মারাত্মক মারাণাস্ত্র দেশের কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এগুলো হ্যান্ডল করার জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সেনাবাহিনী এগুলো উদ্ধার করার পর এগুলোকে ২৪ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখা হয়েছে, তারপরও সেগুলো বিস্ফোরিত হল না। অতঃপর সেগুলোকে সেনাবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জে নিয়ে গিয়ে ধ্বংস করা হল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু খুলনার মসজিদের ঘটনাটি ছাড়া– যে বোমা বা মাইন পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো কার্যকর অবস্থায় ছিল না। সেগুলো পেতে রাখা হয়েছিল হয়ত বিশেষ কোন মতলবে বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য।

পৃথিবীতে দেখা গেছে, স্বৈরশাসকরা তাদের প্রতিপক্ষকে বা অপজিশনকে দমন করার জন্য নানা ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। হিটলার রাইখ্‌সট্যাগে আগুন দিয়ে বক্তৃতায় বললেন কমিউনিস্টরা গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চাচ্ছে। তারপর কমিউনিস্ট দমনের জন্য হিটলার তৎপরতা শুরু করলেন এবং আপনারা জানেন, হিটলারের শাসন শেষ পর্যন্ত মারাত্মক ফ্যাসিস্ট শাসনে পরিণত হয়েছিল। ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করার জন্যই অজুহাত বা পরিবেশ সৃষ্টি করা, জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার জন্যই এই ঘটনাগুলোর অবতারণা করা হয়।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে এই যে একের পর এক ভয়াবহ কতগুলো ঘটনা ঘটছে, এগুলো যদি সত্য হয় এবং সত্যি সত্যিই যদি কোন সন্ত্রাসীরা এই নাশকতামূলক

www.pathagar.com

কাজগুলো করে থাকে, সেটা যেমন খুবই অশুভ ইঙ্গিত দেয়, ঠিক পাশাপাশি মিথ্যে মিথ্যি শুধুমাত্র কাউকে ফাঁসিয়ে দেয়া বা বিপদে ফেলার জন্য যদি এগুলো করা হয়, সেটাও কিন্তু সমানভাবে মারাত্মক এবং বিপজ্জনক। রাজনৈতিক মহল দাবী করছে যে, আওয়ামী লীগের দুঃশাসন, অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ দিনদিন তীব্র হচ্ছে। জনগণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এই কারণে সম্ভাব্য একটা গণআন্দোলন সৃষ্টির যে পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, তা থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার জন্যই এসব করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এসব ঘটনার সুযোগে বিরোধী মত বা বিরোধী দলের লোকদের বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে গ্রেফতার করে নিপীড়ন, নির্যাতন চালানোর উদ্দেশ্যে এগুলো করা হচ্ছে বলে অনেকে ধারণা করছে। এছাড়া আমরা দেখেছি, সরকার জননিরাপত্তা আইন নামে একটা মারাত্মক ধরনের অধিকার হরণের আইন প্রণয়নের প্রস্তাব কেবিনেটে পাস করেছে এবং সেটা সংসদে পাস করিয়ে নেয়ার উদ্যোগ তাদের আছে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন বলে জানা গেছে এবং তিনি এই আইনের কিছু কিছু বিধান সম্পর্কে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছেন। এমনও তো হতে পারে, এই ধরনের মারাত্মক অধিকার হরণকারী ল' এনেক্ট করার জন্য যে পরিবেশ বা অজুহাত সৃষ্টি করা দরকার, সেজন্যই এগুলো করা হচ্ছে। অন্যদিকে এই ঘটনাগুলোর সংগে আরেকটা নতুন মাত্রা জড়িত হয়েছে। সেটা হচ্ছে ধর্মীয় সংঘাতের মাত্রা। যারা বাংলাদেশের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে খর্ব করতে চায়, বাংলাদেশকে তাদের ইচ্ছা ও নির্দেশমতো পরিচালনা করতে চায়, সেসব বিদেশী গোষ্ঠী, তাদের একটা চেষ্টা থাকতে পারে, বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার। আমরা পাকিস্তানের প্রতি যদি লক্ষ্য করি, আমরা দেখব যে, ধর্মীয় দিক থেকে পাকিস্তান মোটামুটি একটা হোমোজেনাস কান্ট্রি। সেখানে মোহাজির এবং স্থানীয় সিন্ধী মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় শত শত লোক নিহত হচ্ছে।

পাকিস্তানের বাণিজ্য বন্দর নগরী করাচী প্রায় অচল হয়ে গেছে। এছাড়া গত কিছু দিনে শিয়া-সুন্নীদের মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু সাম্প্রতিককালে ২৮ জন শিয়া-সুন্নী বিরোধে নিহত হয়েছে। এগুলোকে খুব ছোট ঘটনা হিসেবে দেখা যাবে না। এর পিছনে যারা রয়েছে তারা ঐ রাষ্ট্রের শত্রু। যারা ঐ রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের বীজকে ব্যবহার করে সেই রাষ্ট্রকে ভেঙে তছনছ করে দিতে চায়– এটা তাদেরই ষড়যন্ত্রের বা নীলনকশার একটা অংশ বলে অনেকে সন্দেহ করেন। সুতরাং সেখানেও রিলিজিও-এথনিক গোষ্ঠীর ঐক্যের প্রয়োজনটি বেশ তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে কি ওহাবী, কি সুন্নী, নানান ফেরকার কথা তুলে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালান হচ্ছে। দেয়ালের লিখন যদি আমরা পড়ি, তাহলে আমরা দেখব, ইসলামের মধ্যে যে বিভিন্ন মতবাদ অনুসারী একগোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে অত্যন্ত কুৎসিত ও আপত্তিকর ভাষায় আক্রমণ করছে। এর ফলে জাতীয় ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের ভাবতে হবে এই সমস্ত ঘটনার পিছনে কোন বিদেশী শক্তির হাত আছে কিনা। এসব ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং তার ভিত্তিতে যথাযথ বিচারও হওয়া উচিত বলে জনগণ মনে করে।

আফতাব আহমাদ :

সারাদেশে বর্তমানে বিরাজ করছে বোমাতঙ্ক। একটি ত্রাসের পরিবেশের মধ্যে মানুষ বসবাস করছে এবং এভাবেই দেশের মানুষ একটি ত্রস্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছে। ত্রাসনের এই শাসনের মধ্য দিয়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটিকে চরিতার্থ করতে চাইছে। কী সেই মূল লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য? আজ আমাদের এটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আমরা জানি, ১৯৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত বর্তমানের ক্ষমতাসীন দলটিই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং এই দেশের মানুষের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভূলুণ্ঠিত ও পদদলিত করে তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো একদলীয় স্বৈরশাসন। এ দেশের মানুষের

www.pathagar.com

মৌলিক, নাগরিক, মানবিক অধিকার হরণ করে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে এবং প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী সম্প্রসারণবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে যে গণবিরোধী লুটপাটের শাসন আওয়ামী গোষ্ঠী চালিয়ে ছিল, সে জন্য তার যেমন ধিকৃত হয়েছিল, তেমনি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহু যোজন দূরে নিক্ষিপ্তও হয়েছিলো। ১৯৯৫-৯৬-এ আওয়ামী লীগ এ দেশের দুর্বল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে অনিয়মতান্ত্রিক, সংবিধানবিরোধী সন্ত্রাসী ও সহিংস রাজনীতি শুরু করেছিল, তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল তারা কী চাইছিল। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে দলে দলে বিরোধিতা, মতদ্বৈততা থাকতে পারে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে। একদল আরেক দলকে মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করে, জ্বালিয়ে ফেলার মতো হীন কাজ কেবলমাত্র দেশদ্রোহী এবং রাষ্ট্রঘাতী চক্রের পক্ষেই সম্ভব।

১৯৯৫-৯৬-এ আমরা লক্ষ্য করেছি, কীভাবে রেলস্টেশন ধ্বংস করা হয়েছে, রেললাইন উপড়ে ফেলে কীভাবে রেলের সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে। বন্দরকে বন্ধ করে দিয়ে দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ কীভাবে করা হয়েছে। এমনকি বন্দরের বিভিন্ন অবকাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলা হয়েছিলো পরিস্থিতি, সে সবই আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ১৯৯৬-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের কাছে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর দলের ১৯৭২-৭৫ সময়ের অপকর্মের জন্য এবং কাকুতি-মিনতি করে বলেছিলেন দেশ শাসনের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যে আর একবার দেশবাসী যেন অন্তত একটি সুযোগ দান করে। ১৯৯৬-এর নির্বাচন সম্পর্কে আজ আর কারও মনে কোন সংশয় নেই যে, নানা-কূটচাল, কৌশল এবং কারসাজির মধ্যে দিয়ে জনগণকে প্রতারিত করে এই দলটি ক্ষমতায় এসেছিল। ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় পুনরেকত্রীকরণ, জাতীয় পুনর্গঠনের এবং জাতীয় সমঝোতার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, জাতিকে আরও নির্মমভাবে বিভক্ত করার জন্য একের পর এক তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সবকিছুতে ক্ষমতাসীন দলের প্রধানের জন্মদাতার স্বপ্ন খুঁজে পাওয়া, মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে এই জাতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ অর্জন– সব কিছুর দলীয়করণ করে এবং একমাত্র দাবীদার ও প্রতিনিধিত্বকারী সেজে গোটা জাতির সঙ্গে চরম প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার কাজটি হাসিনার আওয়ামী লীগ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে। আওয়ামী শাসকচক্র বাংলাদেশকে ভারত-নির্ভরশীল একটি প্রতিবন্ধী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ভারতের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি থেকে শুরু করে নানা ধরনের চুক্তি– বিশেষ করে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশকে আজ কার্যত একটি প্রতিবন্ধী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। দেশকে ফালি ফালি করে তার মধ্য দিয়ে ভারতের সামরিক বাহিনীকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গমনাগমণের জন্য ট্র্যানজিট/ ট্র্যান্সশিপমেন্টের নামে মিলিটারী করিডোর দেয়ার জন্য যেভাবে ক্ষমতাসীন দল উঠেপড়ে লেগেছে, সেটি আজকে এ দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এই রাষ্ট্রঘাতী, এই গণবিরোধী, এই বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতাকে ক্যামাফ্লাজ করার জন্য, জনগণের দৃষ্টি থেকে নাশকতামূলক কার্যক্রমকে আড়াল করে রাখার জন্য, সংগোপনে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজটি সুচারুভাবে সম্পাদন করার জন্য হাসিনা ও তার স্তাবকেরা একের পর এক ঘটনার এমন বিকৃত অথচ ব্যাপক প্রচার দিতে সক্ষম হয়েছে যে, জনগণ মাঝে মাঝে, সময়ে সময়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ক্ষমতায় আসার পরদিন থেকেই এই দলটি একটি 'পেট থিওরি' দাঁড় করায়– প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। সত্যি বলতে কি, একটি দেশের সরকারপ্রধানকে যদি হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে, এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক ও দুঃখজনক তো আর কিছু হতে পারে না এবং দেশের যে কোন নাগরিক চাইবেন যে এই ষড়যন্ত্রের হোতা কারা, এই ষড়যন্ত্র কোথায় সংঘটিত হচ্ছে, ষড়যন্ত্র কীভাবে ফাঁস হল এবং ষড়যন্ত্র পরিপূর্ণভাবে নির্মূল হয়েছে কী-না, তার আদ্যোপান্ত তথ্য এ দেশের জনসাধারণকে অবহিত করা হোক। আজ পর্যন্ত সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলের তরফ থেকে ষড়যন্ত্রের প্রকৃত চেহারাটা কী, কারা এই ষড়যন্ত্রের শরীক ছিল, এটি তুলে ধরা হয়নি এবং যতবারই প্রধানমন্ত্রীর

www.pathagar.com

প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়, ততবারই দেখা যায় যে, এ দেশের মানুষ সন্দিগ্ধভাবে এই বক্তব্যটিকে গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি লক্ষ্য করা গেছে, ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে তাদের একেকটি সন্ত্রাসী চক্র যখন প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলভুক্ত সন্ত্রাসীচক্রকে আক্রমণ করে কিংবা পাল্টাপাল্টি গোলাবর্ষণ করে, তার দায়-দায়িত্ব বিরোধী দলের ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হয়, নিরীহ নাগরিকদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আমি এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো ভাই শেখ হেলাল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভেতরে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টার সাথে কলহে লিপ্ত হওয়ার পর পত্র-পত্রিকায় খবর বেরুলো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গুলীবর্ষণ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার এক বিশাল ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে। এই ষড়যন্ত্রের মূল উদঘাটনের জন্য একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটিও নাকি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু দেশবাসী আজ পর্যন্ত কী সেই ষড়যন্ত্র ছিল, কারা এই গুলী নিক্ষেপ করেছিল, তার কিছুই জানতে পারেনি। যেটুকু জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সূত্র ধরে, যেখানে নানা ধরনের নানা স্তরের কর্মচারী-কর্মকর্তারা রয়েছেন– সেই সূত্র থেকে যেটা জানা গেছে, তা হলো এই যে, স্বয়ং শেখ হেলালের পিস্তল থেকেই গুলীটি বেরিয়েছিল এবং এখানে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার কোন ব্যাপারই ছিল না। আমরা পত্রিকায় দেখেছি, রকেটলঞ্চার নামক একটি যন্ত্র নাকি আবিষ্কার হয়েছিল কোন এক জায়গায় এবং প্রধানমন্ত্রীকে মারার জন্যই নাকি এই যন্ত্রটি এদেশে আনা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তদন্তে দেখা গেল যে, ওটি আদৌ একটি রকেটলঞ্চার নয়। এই যে ঘটনাগুলো ঘটানো হচ্ছে– এ নিঃসন্দেহে বিচলিত হবার বিষয় এবং আপনি যথার্থই বলছেন যে, এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিরোধী দলকে দলন এবং দমন করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। আপনি যেমন বলেছেন যে, হিটলার রাইখ্‌সট্যাগ পুড়িয়ে দিয়ে কমিউনিস্টদের ওপর দোষ চাপিয়ে সারা দেশে একটি দলন-পীড়নের প্রশাসন চালু করেছিলেন; আমাদের এখানেও দেশের ভেতরে বিরোধী দল এবং দেশপ্রেমিক নাগরিকদের দলন-পীড়নের জন্যই যে চারদিকে এই সন্ত্রাসের কল্পকাহিনী, এই বোমাতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য এর আরও একটি মাত্রা আছে। এ দেশের মানুষ লক্ষ্য করেছে, আপনি-আমি জানি যে, গত ক'মাস ধরে বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর চতুর্দিকে ভারতীয় আগ্রাসী শক্তি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা একের পর এক আক্রমণ পরিচালনা করছে। এমন কি সময় সময় বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের বেশ গভীরে প্রবেশ করেছে তারা। সিলেটে এক পর্যায়ে তারা প্রায় ৩ মাইল গভীরে প্রবেশ করেছে। আমরা এও দেখেছি, পঞ্চগড়কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্য দু'দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ পরিচালনা করেছিল ভারতীয় বিএসএফ। এসবের বিরুদ্ধে সরকারের যেমন কোন প্রতিবাদ নেই, তেমনি জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেয়ার জন্য, জনগণ যাতে এই সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ না হয় এবং ভারতের বিরুদ্ধে যাতে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে, সেই জন্য দেশের ভেতরে বোমাতঙ্কের নামে মানুষকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে এসব অভিনব ষড়যন্ত্রের কাহিনী পত্র-পত্রিকায় ছাপছে এবং এর ব্যাপক প্রচার দিচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয়, যখনই সন্ত্রাসমূলক কোন ঘটনা ঘটে বা এই কাল্পনিক বোমাতঙ্ক যখন ছড়ান হয়, বিশাল আকারে বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়া বা পত্র-পত্রিকায় আমরা লক্ষ্য করি, ব্যানার হেডিং দিয়ে এগুলো যেভাবে ছড়ান হয় এবং সে কাহিনী যখন কোন পাঠক পড়তে যায়, দেখবে যে এর মধ্যে কোন ঘটনা নেই। ঘটনার নায়কদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। একটি ব্লাঙ্কেট টার্ম তারা ব্যবহার করেন, বিরোধীরা 'বঙ্গবন্ধু' হত্যাকারীদের রক্ষা করার জন্য এগুলো করছে– প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের জন্য এসব ষড়যন্ত্র করছে ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারত যে সমস্ত তৎপরতা চালাচ্ছে বা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী যেসব ক্রিয়াকলাপ দেশের ভেতরে ঘটছে, সেগুলো নিয়ে এই সরকার এবং সরকারের কৃপাপুষ্ট প্রিন্ট মিডিয়া উচ্চবাচ্য করে না।

www.pathagar.com

সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ পাখির মতো আমাদের নাগরিকদের হত্যা করছে। বিডিআর-এর জোয়ানরা ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে শহীদ হচ্ছেন। বিএসএফ আমাদের নাগরিকদের ধরে নিয়ে হত্যা করছে। হালের বলদ অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে এবং শস্য লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাভাষী ভারতীয় মুসলমানদের সীমান্ত বরাবর লাখে লাখে জড়ো করা হচ্ছে বাংলাদেশে 'পুশ ইন' করার জন্য। যুগপৎভাবে অরুণাচলে বসবাসকারী চাকমাদের শরণার্থীর নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। এসব বিষয়ে সরকার, সরকারী দলের বা সরকার সমর্থক পত্রপত্রিকায় কোন আলোচনা বা প্রতিবাদ প্রকাশ হতে দেখা যায় না। রাজশাহীর মসজিদ থেকে আরডিএক্স বিস্ফোরক আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ যৌথ অভিযানে উদ্ধার করে নিয়ে গেল এবং এ সম্পর্কে যে উস্কানিমূলক মন্তব্য, সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখল আনন্দবাজার গোষ্ঠী, এ সম্পর্কে সরকার উচ্চবাচ্য করে না, এ সম্পর্কে আওয়ামী সমর্থক ও আওয়ামী অনুগ্রহপুষ্ট পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক কোন প্রতিবাদের ঝড় ওঠে না। আজ সীমান্তের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই? আমাদের এক সীমান্ত ফাঁড়ি (বিওপি) থেকে অন্য সীমান্ত ফাঁড়িতে যাবার কোন motorized road নেই। কিন্তু ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়িগুলো একে অপরের সাথে motorized road দ্বারা সংযুক্ত। এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। ভারতীয় প্রতিটি সীমান্তের সড়কগুলোর সঙ্গে motorized road দ্বারা সুবিন্যস্তভাবে link করা। Daily Star (০৭ অক্টোবর, ১৯৯৯)-এর ভাষ্য অনুযায়ী সবশেষ খবরে জানা গেছে যে, ২০০১ সন নাগাদ ঢাকার সঙ্গে ভারতের যতোগুলো রেল স্টেশনের সাথে সম্ভব ততগুলো রেলসংযোগ স্থাপন করা হবে। এই অবকাঠামোগত বিন্যাস আমাদের জন্য যে কত বিপজ্জনক ও ভয়াবহ এবং ভারতীয় আগ্রাসী তৎপরতার সহায়ক তা কি অধিক বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে? উদীচীর বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে বিএনপির একজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা তরিকুল ইসলামকে জড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা সরকার করে যাচ্ছে। অথচ দেড় সপ্তাহ আগে দেখলাম যে, পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের মুখে গ্রেফ্যতারকৃতদের একজন স্থানীয় আওয়ামী লীগের এক নেতার নাম উল্লেখ করেছে। তার বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি না। যশোরের 'রানার' পত্রিকার সম্পাদক সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন। জনান্তিকে প্রকাশ, সুষ্ঠু তদন্ত হলে আওয়ামী গডফাদারদের জড়িত থাকার ঘটনা বেরিয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রেও তাই আগাম বিএনপি নেতা তরিকুল ইসলামের নাম জড়ানোর চক্রান্ত বাস্তবায়ন করা হয়। অথচ 'রানার' সম্পাদকের পরিবার-পরিজনরা আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছেন যে, প্রকৃত হত্যাকারীদের আড়াল করে এই ধরনের অপচেষ্টা উদ্দেশ্যমূলক এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এতদসত্ত্বেও আওয়ামী কুচক্রীরা তাদের ঘৃণ্য তৎপরতা থেকে নিবৃত্ত হয়নি। আজকে সারা দেশে যে বোমাতঙ্কের কথা বলা হচ্ছে, সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি প্রকাশ্য জনসভায় বলেছেন যে, বিরোধী দল, বিশেষ করে বিএনপি এই বোমাতঙ্ক বা বোমা বিস্ফোরণের পেছনে রয়েছে। অথচ জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়ে গেছে যে, বোমাবাজী যদি কেউ করে থাকে, সেটি হচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের লুটপাট সমিতির নায়করা, সন্ত্রাসীরা।

সিলেটে আওয়ামী লীগ এমপি মানিকের ঘরে বোমা তৈরী করতে গিয়ে বিস্ফোরণে পুরো বাড়ীটির ছাদ উড়ে যায়। দু'জন মারা যায় এবং এই দু'জনই আওয়ামী যুবলীগের সন্ত্রাসী সশস্ত্র ক্যাডারভুক্ত খলনায়ক। অথচ দেখা গেল যে, ক্ষমতাসীন দলের সেই সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা তো হলই না, উপরন্তু সেই সংসদ সদস্য উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে বললেন যে, বিরোধী দল এটা ঘটিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে তার এবং আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য। এই ঘটনাগুলো থেকে আমাদের বোঝা দরকার যে, একদিকে জননিরাপত্তা আইন এবং সন্ত্রাস দমন আইনের মতো কঠোর, গণনিপীড়ণমূলক, গণবিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য এই সরকার বদ্ধপরিকর ও হন্যে হয়ে উঠেছে। আরেক দিকে তারা পর্যায়ক্রমে ভারতের হাতে বাংলাদেশের ভাগ্য তুলে দিচ্ছে– এটাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য, ভারতীয় আগ্রাসনের ঘটনা থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার জন্য, একটার পর একটা এই ধরনের কল্পিত ঘটনার অবতারণা করছে।

www.pathagar.com

এ দেশের নাগরিকদের অধিকার আছে জানবার যে, কারা, কোথায়, কীভাবে এসব বোমা স্থাপন ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটাচ্ছে। এটি একটি সরল প্রশ্ন। এন্টিট্যাংক মাইনের মতো একটি বিস্ফোরক দ্রব্য সাধারণ মানুষের চেনার কথা নয় এবং এটি জনকণ্ঠের মতো একটি পত্রিকা অফিসে ব্রিফকেসে করে কেউ নিয়েছিলেন বলে জনকণ্ঠ পত্রিকাতেই লেখা হয়েছে, সেই ব্যক্তিটি জনকণ্ঠ অফিসে বেশ কিছুক্ষণ বসে, অনেকের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে ওটি ফেলে চলে যান। ঐ ব্যক্তির চেহারাটি পর্যন্ত জনকণ্ঠের কেউ মনে রাখতে পারল না। এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে? ব্রিফকেসটি লক্‌ডও ছিল না। কোন এক ব্যক্তি ওটি খুলেই চিনে ফেলন যে, ওর ভেতরে যা আছে, সেটি এন্টিট্যাংক মাইন। কী চমৎকার! এভাবে মানুষকে বেকুফ ভাবা যে কত বড় বোকামি তা বলাই বাহুল্য। আরো একটি বিষয় এখানে প্রণিধান করার আছে। এসব বোমা বা এন্টিট্যাংক মাইন কোথাকার তৈরী সে সম্পর্কে এ পর্যন্ত সরকার কোন তথ্য প্রকাশ করেনি। এগুলো যে ভারত থেকেই আগত সে সম্পর্কে আজ সকলেই নিশ্চিত। আর তাই সরকার এ প্রসঙ্গে টুশব্দটি করছে না। একইভাবে আমরা দেখি যে, হত্যাকারী বা ষড়যন্ত্রকারীরা আগাম পয়গাম দিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে যে ব্যক্তিটিকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, তিনি ফ্যাক্স কিংবা ই-মেইল বার্তা পাঠিয়ে তাঁর এই অভিলাষ চরিতার্থ করার কথা ব্যক্ত করেছেন। চমৎকার! এ ধরনের অশ্রুতপূর্ব ঘটনা রাজনীতির জগতে বা ইতিহাসে কেউ পাঠ করেছে বলে আমার জানা নেই। এর সঙ্গে সম্প্রতি আরো যোগ হয়েছে, যে আজিজ মোহাম্মদ ভাই প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী তহবিলে বিশাল অংকের অর্থ ১৯৯৬-এর নির্বাচনে চাঁদা দিয়েছিলেন বলে কথিত, সেই আজিজ মোহাম্মদ ভাইও নাকি প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত। এ ষড়যন্ত্র মামলায় এ নামটিও জুড়ে দেয়ার জোর কোশেশ চলছে। আসলে ঘটনাটি কী? হয় বর্তমান অযোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর অধিকতর অনুগ্রহ ও কৃপা লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কথিত প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র বানচাল করতে পারার কৃতিত্বের ঢাকঢোল পেটাচ্ছেন, না হয় খোদ আওয়ামী লীগের উপদলীয় চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য নাসিমের এই অতি উৎসাহ।

শামসুর রাহমান, আমাদের একজন শীর্ষস্থানীয় কবি। তাঁর পুত্রবধূর সাথে পাড়ার মাস্তানদের রেষারেষি ও কলহ-বিবাদ ছিল। কিছু যুবক শামসুর রাহমানের শয়ন কক্ষে ১৫ মিনিট অবস্থান করার পরও তাঁকে হামলা করার কোন কারণ বা সুযোগ খুজে পায়নি। ঘরটি ছেড়ে বিদায় নেয়ার মুহূর্তে কবির পুত্রবধূর সাথে কথা বলে প্রকৃতির ডাকে বাথরুমে যাবে বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করল এবং কবির বৃদ্ধা স্ত্রী ও 'অবলা' পুত্রবধূ তা প্রতিহত করলো। এ ঘটনা নিয়ে সাথে সাথে পত্র-পত্রিকায় প্রচারণা করা হলো যে, তালেবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ দেশে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গড়ে উঠছে। এরা ওসামা বিন লাদেনের ভক্ত, এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো দরকার– এ কথা বলে এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ তাদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যেসব মাদ্রাসায় পাঠিয়েছেন, সেসব মাদ্রাসার ওপর এক ধরনের আক্রমণ চালানো হলো। অর্থাৎ এখানকার মানুষের ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক বিশ্বাস, জনগণের মধ্যে যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, এ সবকিছু বিনষ্ট করে দিয়ে মানুষকে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে অনৈক্য, ফাৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে ভারতীয় অধিপতি গোষ্ঠী, সম্প্রসারণবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীগোষ্ঠি বাংলাদশকে কুক্ষিগত করার যে নীল নকশা রচনা করে রেখেছে, সেই নীল নকশা অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হরণ করার পথটাকে সুগম করে দেয়াই এদের মূল লক্ষ্য।

মাহবুব উল্লাহ :

আমরা জানি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। এসব গোষ্ঠী কখনও তালেবান, কখনও হরকাতুল জিহাদ বা অন্য কোন নামের ফান্ডামেন্টালিস্ট সংগঠন। এর পাশাপাশি আরেকটি ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সীমান্তের

www.pathagar.com

ওপারে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় একটি অর্কেস্ট্রেটেড ক্যাম্পেইন চলছে। সেটি হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে আইএসআই, উলফারা অনেকগুলো ঘাঁটি গড়েছে এবং সেখান থেকে তারা ভারতে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাচ্ছে। সুতরাং আমার মনে হয় যে, বাংলাদেশের সরকারপন্থী, ভারতপন্থী পত্র-পত্রিকাগুলো যে ধরনের প্রচারণা অর্থাৎ একটি মিথ্যাকে বারবার বলে সত্যে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে প্রপাগাণ্ডার বিশেষ গুরুত্বের কথাই মনে পড়ছে। জনমত তৈরীর এ কৌশলকে Walter Lippmann অভিহিত করেছেন manufacture of consent হিসেবে। এই কৌশলকে Lippmann সরকারের একটি regular organ হিসেবেও অভিহিত করেছেন। সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সরকারের এবং সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত অভিলাষকে চরিতার্থ করার জন্য একটা পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখন বিশ্বব্যাংক থেকে একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছিল। তাতে প্রতিবেদক উল্লেখ করেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর, এই একুশ বছর পরে যারা তাদেরকে ক্ষমতায় আনার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, যাদের আশীর্বাদে তারা পুষ্ট হয়েছে, তাদের সেই আশীর্বাদ ও সমর্থনের ঋণ যদি আওয়ামী লীগ পরিশোধ করতে চায়, তাহলে দেশের জন্য সেটা খুব বিপর্যয়ের কারণ হবে এবং আওয়ামী লীগ সরকারও ব্যর্থ হবে।

এখন আমার মনে হচ্ছে, আজকে সারা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এর পেছনে অধিকাংশ ঘটনার নায়কই হচ্ছে শাসক দলীয় লোকেরা এবং এসব ঘটনার পেছনে মূলত অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধই কাজ করছে। সাম্প্রতিক ইউসিবিএল-এর যে বিরোধ, সেখানেও কিন্তু একটা বিরাট অর্থনৈতিক স্বার্থগত বিরোধীই কাজ করেছে। এছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেন্ডার নিয়ে, চাঁদাবাজির ভাগ নিয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এগুলোর দিকে কিন্তু সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের বা নিরাপত্তা বাহিনীর কোন নজর নেই। শাসক দল এ ব্যাপারে চোখ বুজে থাকাটাকেই পছন্দনীয় মনে করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত ক্রোনিজরা সন্ত্রাসের মাধ্যমে নানাভাবে সহায়তা করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্য কাজ করেছে, আজকে তাদেরকে লুটপাটের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ একুশ বছরের ঋণ শোধ করা হচ্ছে। আর এই একুশ বছরের ঋণের মধ্যে ভারতের কাছে আওয়ামী লীগের একটা বড় ঋণ আছে। এটা অস্বীকার করা যাবে না। শুধু একাত্তর সালেই নয়, পঁচাত্তর সালের পরেও তাদের একটা ঋণ আছে। সেই ঋণ পরিশোধের একটা পালা শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে বিভিন্ন চুক্তির মধ্য দিয়ে। এভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে, সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে একটা ঋণ পরিশোধের চর্চা বা প্রচেষ্টা। দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশবিরোধী শক্তি; তাদের কাছে তারা ঋণী এবং তাদের এই ঋণ পরিশোধ করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা হন্যে হয়ে উঠেছে। আর এই টিকে থাকার জন্য যত রকম অপপ্রচার, মিথ্যার বেসাতি করা যায়, তারা করছে। সেটা করতে গিয়ে তারা জনমতকে বিভ্রান্ত, বিভক্ত করেছে। তারা প্রথমেই একটা কথা বলেছে যে, তারা ঐকমত্যের সরকার গঠন করেছে। সেটার পরিণতি যে কী হয়েছে, আমাদের সবার জানা আছে। সুতরাং এই সরকার যে অত্যন্ত সুকৌশলে জনমতকে বিভ্রান্ত করে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

আফতাব আহমাদ :

আওয়ামী লীগ জনগণকে বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষ এবং পটু, এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আওয়ামী লীগের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ছদ্মাবরণে, অপকৌশলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে, প্রতারিত করে একটি মজবুত অবস্থান গ্রহণ করা। ১৯৯৬-এও তারা ঠিক এই কৌশলটিই অবলম্বন করে আজকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। তবে তারা জনগণের কাছে যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দেশ গঠন এবং জাতি গঠনে তাদেরকে আরেকটি সুযোগ

www.pathagar.com

করে দেয়ার আবেদন করে, সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তারা আদৌ যত্নবান বা সচেষ্ট নয়। প্রকৃত অর্থে দেশসেবার বা জাতি গঠনের জন্য তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি। তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। এ দেশের মানুষকে নির্যাতন-নিপীড়ন করার জন্য। তারা দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে সম্প্রীতি ও উদারতার আলোকে মানুষকে আরও ঐক্যবদ্ধ করার কর্মযজ্ঞে কখনোই উৎসাহী হয়নি এবং উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আমি একটি ছোট ঘটনার উদাহরণ দেই। প্রধানমন্ত্রীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ বছরেই কক্সবাজারে কাঙ্গালীভোজের সময়ে খাবারে বিষ মেশান হয়েছিল এবং বেশ কিছু লোক সেই খাবার খেয়ে মারাও গিয়েছিল। সাথে সাথে ক্ষমতাসীন দলের অনুগ্রহপুষ্ট মিডিয়া এবং পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে বলা হল, বিরোধী দল ষড়যন্ত্র করে এই খাবারে বিষ মিশিয়ে নিরীহ দরিদ্র লোকগুলোকে হত্যা করেছে। অথচ পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী তদন্তে বেরিয়ে এল যে, কক্সবাজার অঞ্চলের আওয়ামী লীগের ভেতরকার দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে পরস্পরের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য কাঙ্গালীভোজের সেই খাবারে বিষ মিশিয়েছিল। এই হচ্ছে আওয়ামী লীগ।

তারা নিজেরা হত্যা, গুম, খুন, লুটপাট, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি করে বেড়ায়। অথচ সব সময় দেশের নিরীহ মানুষ, দেশপ্রেমিক ঈমানদার মানুষদের ওপর, বিরোধী দলের ওপর এসব দোষ তারা চাপিয়ে দেয়। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, ঢাকার বাইরে পাওয়ার গ্রীডের একটি টাওয়ার বিএনপির চারজন শীর্ষস্থানীয় নেতা নাকি নাশকতামূলক তৎপরতার মাধ্যমে উড়িয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং সেই চারজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে যখন বলল, 'প্রাইমাফেসি কেইস হিসেবে কিছু এভিডেন্স আনো।' সরকার অপারগতা প্রকাশ করলো। সুপ্রীম কোর্ট সেই চারজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে কেবল মুক্তিই দেয়নি, সরকারকে জরিমানাও করেছিল। আসলে এই সরকার অসত্য ও মিথ্যা প্রচারণার মধ্য দিয়ে এ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে– সরকারের বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করছে না। আমি বলব, এই রাষ্ট্রঘাতী চক্র জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। বাংলাদেশ বিরোধী এই রাষ্ট্রঘাতী চক্রের যে hidden agenda রয়েছে, দেশের মানুষ তার বিরুদ্ধে আজ শুধু সোচ্চারই নয়– এ সরকারকে প্রকাশ্যে গণশক্তির বলে বলিয়ান হয়ে উচ্ছেদের এক জঙ্গী গণতান্ত্রিক আন্দোলন রচনায়ও তৎপর। ভারতপন্থী ও আওয়ামী কৃপাপুষ্ট পত্র-পত্রিকায় লেখা হয় যে, সীমান্ত এলাকায় মৌলবাদীদের কমপক্ষে ৫০টি ঘাঁটি গড়ে উঠেছে, যেখানে আইএসআই তৎপর এবং তার পরপরই আমরা দেখি যে, এসব সংবাদের উসিলায় ভারতীয় গোষ্ঠী সীমান্ত বরাবর বিএসএফ এবং সামরিক শক্তি দিয়ে অভিযান চালাচ্ছে। অতএব, আজকে আমার মনে হয়, দেশব্যাপী যে মিথ্যা প্রচারণা চলছে, বোমা আতঙ্ক সৃষ্টির নামে বিরোধী দলকে দমন করার যে ষড়যন্ত্র চলছে, তার মূল রহস্য স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধভাবে জনগণের কাছে উন্মোচিত এবং জনগণ সরকারী খেলাটা পুরোপুরি ধরে ফেলেছে। আজকে প্রয়োজন হচ্ছে সমাজের সর্বস্তর থেকে সরকারের প্রতি একটি সুস্পষ্ট হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করা যে, এ ধরনের গণবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত থেকে বিরত হও। আর সত্যিই যদি এ দেশের রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র থাকে, তাহলে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণপঞ্জিসহ খোলামেলাভাবে মানুষের কাছে তুলে ধর– কী সেই ষড়যন্ত্র? কারা এই ষড়যন্ত্রের হোতা? ঢালাওভাবে বিরোধী দল ষড়যন্ত্র করছে প্রধানমন্ত্রীর পিতার হত্যাকারীদের বিচার যাতে না হতে পারে, এগুলো দেশের মানুষ গ্রহণ করবে না। কারণ তারা ভালভাবেই বুঝে ফেলেছে যে, এগুলো হচ্ছে ধাপ্পা, প্রতারণা, শঠতা ও অজুহাত। মূল লক্ষ্য হচ্ছে এ দেশের মানুষকে গোলামে পরিণত করা, এই দেশ, এই রাষ্ট্রটিকে ভারতের কাছে তুলে দেয়া। এ দেশের মানুষ নিঃশ্বাস থাকতে এবং তাদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের স্পন্দন থাকতে, তা হতে দেবে না।

www.pathagar.com

৩১ অক্টোবর ১৯৯৯

সিভিল সোসাইটি, এনজিও এবং রাষ্ট্র

মাহবুব উল্লাহ :

১৯৯১ সালের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার সাথে সাথে একটি প্রত্যয় বা একটি প্রপঞ্চ রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবীমহলে আলোচিত হচ্ছে। বিষয়টি হচ্ছে সিভিল সোসাইটি এবং প্রায় সব রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী বলে থাকে যে, সিভিল সোসাইটিকে শক্তিশালী করাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য। কিন্তু এই সিভিল সোসাইটি কী? এর প্রকৃতি, পরিচয় বা অভিব্যক্তি কী? সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা আমরা লক্ষ্য করি না। অনেকেই মনে করেন যে, বেসামরিক যে কোন কিছুই হচ্ছে সিভিল সোসাইটির অন্তর্গত। আর সামরিক যা কিছু, তা হচ্ছে সিভিল সোসাইটির শত্রুপক্ষ। Thinking About Development বইটিতে Paul Streeten-এর মত একজন বিখ্যাত উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ বলেছেন, গণতন্ত্রের জন্য, উন্নয়নের জন্য সিভিল সোসাইটি অপরিহার্য। আর এ কথা বলতে গিয়ে তিনি নির্দেশ করেছেন যে, সিভিল সোসাইটি হচ্ছে এনজিও। অর্থাৎ এনজিওগুলোই হচ্ছে সিভিল সোসাইটি। আজকাল কেউ কেউ মনে করেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে একদিকে কাজ করে রাষ্ট্র, অন্যদিকে প্রাইভেট সেক্টর। আর থার্ড সেক্টর অব ডেভেলপমেন্ট হিসেবে কাজ করে এনজিওগুলো। আমার একান্ত নিজস্ব মত হচ্ছে যে, Paul Streeten-এর মতো মানুষের কাছ থেকে এ ধরনের একটি অন্তঃসারশূন্য সিভিল সোসাইটির ডেফিনিশন একেবারেই কাম্য ছিল না। সিভিল সোসাইটির তত্ত্বটা অত্যন্ত গভীর এবং এটা বুঝতে গেলে নানা প্রসঙ্গ আমাদের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে।

আজকে আসার পথে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, একটি পকেটমারকে উন্মত্ত জনতা ঘিরে ধরেছে, মারধার করছে এবং লোকটির প্রাণবায়ু প্রায় বেরিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তার কাপড়চোপড় ছিড়ে ফেলা হয়েছে, প্রায় দিগম্বর অবস্থা। হয়তো সে মারাও যেতে পারে। একটি সিভিল সোসাইটিতে এ ধরনের ঘটনা আশা করা যায় না। একটি সিভিল সোসাইটিতে কেউ অপরাধ করলে তাকে বিচারে সোপর্দ করা হয়। পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়। তারপরে সে সত্যি সত্যি অপরাধী কিনা সেটা নির্ণয় করা হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ সিভিল সোসাইটির কনসেপ্টটার সাথে সিভিলিটির, পলিশনেস-এর একটা গভীর যোগাযোগ আছে। কিন্তু এই পলিশনেস, সিভিলিটি, সিভিলাইজেশন বা সফিসটিকেশন– এই জিনিসগুলো কিন্তু absolute নয়, এগুলো সময়, কাল, সমাজব্যবস্থার সংগে আপেক্ষিক। যেমন– মার্কিন সমাজ। সেখানে আমরা বলি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা অত্যন্ত উচ্চমাত্রায় পৌঁছেছে। সেই সমাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে হার্বার্ট মার্কিউজ বলছেন যে, সেখানে এক ধরনের রিপ্রেশন থ্রু টলারেন্স চলছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি' অর্থাৎ সভ্যতার যতটুকু অগ্রগতি হয়, তার মধ্য দিয়ে মানুষের নিপীড়ন বা সামাজিক বঞ্চনার কৌশলগুলো পাল্টে যায় এবং এগুলোরও এক ধরনের সফিসটিকেশন অর্জিত হয়। সুতরাং সভ্যতা এগুলেই সিভিল সোসাইটি এগুচ্ছে– এটা বলা কতটা যৌক্তিক, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তাছাড়া দার্শনিকদের মধ্যে এ নিয়ে যে তর্ক, তাতে তারা কেউ কেউ বলছেন, সিভিল সোসাইটি অত্যন্ত জরুরী। আবার কেউ কেউ বলছেন, সিভিল সোসাইটি কথাটি অর্থহীন। যেমন– আমরা যদি আইডিয়া অব সিভিল সোসাইটির দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে, আমরা যে সমাজে বাস করি, সেখানে কীভাবে এই সমাজের যে এক ধরনের এক্সট্রারনাল

www.pathagar.com

অথরিটি থাকে, তার পাশাপাশি এক ধরনের যে প্রাইভেট ইন্টারেস্ট থাকে. এ দুয়ের মধ্যে যে একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম সম্পর্ক থাকে, বা যে ডেলিকেট রিলেশনশীপ আছে, সেটা আমাদের বুঝতে হবে এবং সিভিল সোসাইটি আমাদের এগুলো বুঝতে সাহায্য করে– আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, কীভাবে সমাজের রহস্যময় এবং অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়াগুলো কাজ করে। সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, লিখেছেন। সেগুলোর হয়তো একটা সাহিত্যমূল্য থাকতে পারে, কিন্তু তার বিশ্লেষণীমূল্য খুবই কম। আমরা সিভিল সোসাইটির সংজ্ঞা নিয়ে নানান বিতর্ক করে থাকি কিন্তু তার পাশাপাশি প্রশ্ন করি না যে, সেই সিভিল সোসাইটিটাকে গ্রহণ করার পরিণতিটা কী? এই অর্থে সিভিল সোসাইটির তর্কটা অনেকটা অন্তঃসারশূন্য এবং বিরক্তিকর হয়ে গেছে।

কিছুদিন আগে আমি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করি, যেখানে আমাদের কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে দু'জন ছিলেন, যারা সামরিক সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং এদের মধ্যে একজন, বিশ্বাস করেন যে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী থাকা উচিত নয়। এ ছাড়া আরো একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে একেবারে বাংলাদেশের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে বিরাট আকারে সহযোগিতার কথা এডভোকেট করেন এবং সেখানে এদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল এই বলে– In this gathering the best representatives of our civil society are present, সেখানে দু'চারটা বিখ্যাত এনজিও'র উপর স্তরের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এই হচ্ছে আমাদের দেশে সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে উপলব্ধি। আমি মনে করি, এটি কেবল খণ্ডিত উপলব্ধিই নয়, এটি অত্যন্ত ভ্রমাত্মক ও বিপজ্জনক উপলব্ধি। এভাবে যদি সিভিল সোসাইটির মূল্যায়ন হয়, তাহলে খুব ভুল করা হবে। আমাদের দেশে সিভিল সোসাইটির best বা reknowned representatives বলতে যাদের আমরা জানি, তারা সময় বুঝে নীতির কথা বলেন– আবার সময় বুঝে নীতিবিচ্যুত হয়ে নীরব থাকাটা পছন্দ করেন। এমনকি নীতি বিবর্জিত, গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার বিরোধী ধ্যান-ধারণা তারা পোষণ করেন। সুতরাং সেই অর্থে আমাদের দেশে সত্যিকারের সিভিল সোসাইটি গড়ে উঠেছে কী না, সে প্রশ্ন জাগতে পারে। আমাদের দেশে যেসব বিদেশী সাহায্যদাতারা আসে, তারাও একেবারে ব্ল্যাঙ্কেট টার্মে, নিরেটভাবে এনজিওদেরকে সিভিল সোসাইটি মনে করে। আমি যে ব্যক্তিবর্গের কথা বলছিলাম, সেই ধরনের ব্যক্তিবর্গকেই সিভিল সোসাইটি হিসেবে তারা গ্রহণ করে।

পত্রিকায় যারা কলাম লেখেন, বিভিন্ন ধরনের গোলটেবিল বৈঠকে যারা আলোচনার ঝড় তোলেন– এ জাতীয় লোকদেরকেই তারা সিভিল সোসাইটি হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু এদের মধ্যে সিভিলিটির, মূল্যবোধের কনসিসটেন্সি কতটা আছে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সিভিল সোসাইটি যদি বুঝতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে, সমাজটাকে আমরা কতটা 'সমাজ' হিসেবে সম্ভব করে তুলতে সক্ষম হয়েছি। এই সমাজকে 'সমাজ' হিসেবে সম্ভব করার যে প্রয়াস, সেটাই সম্ভবত সিভিল সোসাইটি সৃষ্টির প্রয়াস। আমাদের সমাজে সিভিল সোসাইটির কেন বিকাশ ঘটছে না এবং কেন আমরা সিভিল সোসাইটির একটা কদর্থ করছি তার ওপর একটা আলোচনা হওয়া দরকার। এই সংক্রান্ত যে মিথগুলো, যে ভুল ধারণাগুলো রয়েছে, সেগুলোও এক্সপোজ করা দরকার।

আফতাব আহ্মাদ :

আসলে নব্বইয়ের দশককে বলা হয়, গণতন্ত্রের জোয়ারের দশক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন একে অভিহিত করে বলছেন The Third Wave হিসেবে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে, নব্বইয়ের দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে

www.pathagar.com

বহুলভাবে আলোচিত যে কনসেপ্ট সেটি হচ্ছে সিভিল সোসাইটির কনসেপ্ট। ভাবখানা এমন যে, সিভিল সোসাইটি নামক কোন বস্তুর অস্তিত্ব ইতোপূর্বে ছিল না। হঠাৎ করে এই সিভিল সোসাইটি বিনির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সিভিল সোসাইটির যথোচিত বাংলা পরিভাষা হলো 'জনসমাজ'। 'জনসমাজ' বলতে আমরা কী বুঝি সে সম্পর্কে যদি আমরা গোড়াতেই ধারণা নিতে পারি, তাহলে আমাদের আর কোন বিভ্রান্তি থাকবে না। আমাদের সমাজে অধুনা বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তির আনাগোনা আমরা লক্ষ্য করছি, যারা পালাক্রমে কখনও বলেন 'সিভিল সোসাইটি' কখনও বলেন 'সুশীল সমাজ'। ভাবটা এই যে, একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে কিছু লোক সুশীল এবং কিছু লোক দুঃশীল; শিষ্টাচারবর্জিত, বর্বর। এই ধারণাটি অত্যন্ত স্থূল, অবৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবতাবর্জিত ধারণা। সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে কথা বলতে গেলে অনেক পেছনে চলে যেতে হয়। প্রাচীন যুগের রোমান রাষ্ট্রনায়ক ও দার্শনিক Marcus Tullius Cicero-কে নিয়ে তাহলে এ প্রসঙ্গে একটি আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে। Cicero দৃঢ় এবং গভীরভাবে Moderation, Concord ও Constitutionalism-এ বিশ্বাস করতেন। এ ধরনের বিশ্বাস কেবলমাত্র সামাজিক স্থিতিশীলতার মধ্যেই অব্যাহত থাকতে পারে। সমাজে অসহনীয় চিড় ও ফাটল সামাজিক স্থিতিশীলতাকে যখন মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে তোলে তখন কেবলমাত্র বিশ্বাস দিয়ে কিছুই হতে পারে না। প্রয়োজন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের। এ প্রসঙ্গেই তিনি *Civilis Societas* অভিধারণা বা কনসেপ্টটি আলোচনায় নিয়ে আসেন। *Civilis Societas* অর্থাৎ Civic Society এবং এ society-তে সভ্য ও মার্জিতভাবে বসবাসের শর্তাবলী কী সে নিয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেন। Cicero জনসাধারণের দায়িত্ব বলতে কী বুঝানো হয়, সে সম্পর্কে অত্যন্ত উন্নত এবং সম্যক ধারণা আমাদের দিয়ে গেছেন। ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের মধ্যকার পার্থক্যকেও তিনি চমৎকার স্বচ্ছতার সঙ্গেই নির্দেশ করে গেছেন। তিনি সবসময় আইনের ওপর এবং আইনের শাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাষ্ট্র হচ্ছে *Juris Societas* অর্থাৎ community of law. মানুষের সম্পদের সমতা বিধান করার বিষয়ে আমরা একমত না হতে পারি, মানুষের innate ability'র সমতা বিধান করা অসম্ভব, কিন্তু তার আইনগত অধিকারের একটি সমতা অন্তত বিধান করা সম্ভব। আইনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তিনি আইনকে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব এবং বাধ্যবাধকতার অর্থেই চিন্তা করতে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, "True law is right reason in agreement with nature", তাঁর এ কথা থেকে "those who have reason in common must also have right reason in common" এ বক্তব্যটি বেরিয়ে আসে। এ থেকে জন্ম নিয়েছে তাঁর conception of justice. ন্যায়বিচারের ভাবনা থেকে উত্থিত হয়েছে তাঁর consciousness of love বা ভালবাসার চেতনা যা এক মহাশক্তিশালী সামাজিক বন্ধন। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে মানুষকে ভালবাসা- "Our natural inclination to love our fellow men" থেকে *Civilis Societas* vis-a-vis *Juris Societas* এর গুরুত্ব এতবেশী। *Civilis Societas* বা Civic Society-কেই আজ civil society হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। এই কনসেপ্টটির মূল অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে যে, জন লক, রুশো এবং এডাম স্মিথ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। Natural society বা state of nature থেকে civil government-এর পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য তাঁরা civil society টার্মটি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁদের মতে, সিভিল সোসাইটির innate rationality সমাজের মঙ্গল বা হিত সাধন করে।

এখন দেখা যাক, সমাজবিজ্ঞানীরা সিভিল সোসাইটিকে কীভাবে দেখছেন। সে বিষয়ে আমরা যদি একটু পর্যালোচনা করি, বিষয়টি আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। গোটা জিনিসটি সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্র কী? রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বোচ্চ

www.pathagar.com

সামাজিক সংগঠন। মানুষ তার নিজের তাগিদে, নিজের প্রয়োজনে তার নিহিত গুণাবলী, প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের বিকাশের জন্য সে নিবিড় থেকে নিবিড়তরভাবে সংঘবদ্ধ বা একত্রিত হয়েছে। এই সংঘবদ্ধ হওয়ার সর্বোচ্চ রূপ পরিগণিত হয় রাষ্ট্রগঠনের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে এটি লক্ষ্য করা ও অনুধাবন করার বিষয় যে, রাষ্ট্র পরস্পরবিরোধী দুটি কর্মধারার সমন্বয় সাধন করে। একদিকে রাষ্ট্র বল প্রয়োগ বা দমনমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করে, আরেক দিকে নিয়ন্ত্রিত চিন্তা-ভাবনা ও আচরণ প্রসারিত করতে থাকে– যাতে জনগণের স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য সে অর্জন করতে পারে। এক কথায় রাষ্ট্র হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজ ও জনসমাজের ভারসাম্যেরই একটি বিশিষ্ট রূপ। রাজনৈতিক সমাজ কাকে বলে? রাজনৈতিক দল, আইন সভা, আইন প্রণেতাগণ, নির্বাচকমণ্ডলী, মন্ত্রীমণ্ডল বা রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং সেসব সংগঠিত স্বার্থগোষ্ঠী যারা নিজেদের মধ্যে কোয়ালিশন গড়ে তোলে ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়– এসবের সমন্বিত রূপ হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজ। আমরা জানি যে, রাষ্ট্র হচ্ছে উপরিকাঠামো। অবকাঠামো হচ্ছে অর্থনীতি। এই অর্থনৈতিক অবকাঠামো এবং রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু বিরাজ বা অবস্থান করে, এটাকেই জনসমাজ বা সিভিল সোসাইটি বলা হয়। রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে, যে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ওপর ভর করে রাষ্ট্র তার চরিত্র পরিগ্রহ করে, তার দায়িত্ব সম্পাদন করে, সেই অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপযোগী করে তোলার জন্য জনসমাজের ওপর রাষ্ট্র তার কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে এবং এ কাজ করতে রাষ্ট্রকে সংকল্পবদ্ধ থাকতে হয়। আর তা না হলে রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না।

এ কারণেই প্রখ্যাত ইতালীয় পণ্ডিত আন্টোনিও গ্রামসি 'হেগিমনি' বা সর্বাধিপত্যের কনসেপ্টটি নিয়ে এসেছেন। এর দ্বারা তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা হলো, অর্থনৈতিক অবকাঠামোর যে চরিত্র, সেটিই ধারণ করে রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, তার ওপরে এর প্রতিফলন যাতে ঘটাতে পারে, তার জন্য রাষ্ট্র এক ধরনের মতাদর্শগত সর্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামোর মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো পরিবর্তনের সূত্র অনুযায়ী ঘটতে থাকে, রাষ্ট্রকে সেই সব পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। এ কারণেই সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজ এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। কারণ, জনসমাজের মধ্যে যদি অর্থনৈতিক অবকাঠামোর প্রতিফলন না ঘটে এবং রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে যদি জনসমাজ একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারে বা একটি অনুকূল সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে– তাহলে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। অধুনা এই সিভিল সোসাইটির দোহাই দিয়ে তৃতীয় বিশ্বে এনজিওজীবীরা এবং ডোনাররা যে নতুন প্রপঞ্চের জন্ম দেয়ার চেষ্টা করছে, তার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের নিরাকরণ সাধন করা কিংবা রাষ্ট্রকে এমন দুর্বল অবস্থায় নিয়ে যাওয়া– যাতে বৃহত্তর ভূমণ্ডলীয় পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কর্মজালে রাষ্ট্রকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা সম্ভব হয় এবং বিশ্ব পুঁজিবাদের বাজারের অংশ হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রীয় বাজারগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। তৃতীয় বিশ্বে সিভিল সোসাইটির প্রবক্তারা বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যেন মনে হয়, রাষ্ট্র না থাকাটাই বোধ হয় শ্রেয়। অবশ্য এর জন্য তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের পরিগঠন পদ্ধতিটাও অনেকাংশে দায়ী। আমরা জানি যে, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে কর্তৃত্ববাদী বা অথরিটেরিয়ান গভর্নমেন্ট গণতন্ত্রকে যেভাবে নিষ্পিষ্ট করেছে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে যেভাবে দলন করেছে, তাতে জনসমাজের মধ্যে যারা চিন্তাশীল বা সক্রিয়বাদী, তাদের পক্ষে এই কর্তৃত্ববাদী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই বা সংগ্রাম করতে গিয়ে এমন সব অবস্থান গ্রহণ করতে হয়েছে, যা সেই কর্তৃত্ববাদী, স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের বিপক্ষেই যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, গণতন্ত্রের মূল ভিতকে নস্যাৎ করে, রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রহীন বা যেটাকে বলা যায় স্টেট অব ফ্লাকস– সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। এটিকে ডোনার এজেন্সীগুলো, ইন্টারন্যাশনাল এইড ফোরামগুলো

www.pathagar.com

বিশেষভাবে লালন করে এজন্য যে, তারা মনে করে, এর মধ্যদিয়ে বাজার অর্থনীতির একটি বিশাল প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং যে কারণে নব্বইয়ের দশকে আমরা লক্ষ্য করি, সিভিল সোসাইটির নামে তারা বলছে যে, এনজিওগুলোই হচ্ছে গণতন্ত্রে উত্তরণের সর্বোত্তম মাধ্যম এবং এর মধ্যদিয়ে দেখা গেছে যে, সিভিল অর্গানাইজেশন ও সামাজিক আন্দোলনগুলোর যে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা অতীতে সমাজে পরিদৃষ্ট হয়েছিল, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কমপ্রোমাইজড এবং মিনিমাইজড হয়ে গেছে।

মাহবুব উল্লাহ :

আপনি গ্রামসির প্রসঙ্গ এনেছেন। গ্রামসি ইতালীতে মুসোলিনীর কারাগারে ছিলেন। মুসোলিনী সেখানে একটা ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করেছিল। গ্রামসি সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবতেন। ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থা কীভাবে পরিবর্তিত হবে সেটা তাঁর গ্রন্থের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ইউরোপে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে জনমত প্রকাশের যে সহনশীলতা ও স্বাধীনতা ছিল, সেই পরিস্থিতিতে ক্লাসিক্যাল ফর্মে বিপ্লব হওয়া সম্ভব নয়– এটাই ছিল গ্রামসির বক্তব্য এবং সে কারণে গ্রামসি সিভিল সোসাইটির কনসেপ্টটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামসি এই সিভিল সোসাইটির সাথে পুঁজিবাদী ও উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের যে বিরোধ, সেটা সমাধানের পন্থা হিসেবে বলেছিলেন যে, এটা হচ্ছে অনেকটা ট্রেঞ্চ ওয়ারফেয়ারের মত। এটা হচ্ছে, শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যরা ট্রেঞ্চের মধ্যে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখল এবং শত্রুপক্ষ মনে করল যে তাদের দিগ্বিজয় হয়ে গেছে। তারা উল্লাসে ফেটে পড়ল। জয়জয়কার করল। কিন্তু তখনই দেখা গেল যে, ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে একটা প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে। সিভিল সোসাইটির কাজটা হচ্ছে এই ট্রেঞ্চওয়ারফেয়ারের মতো। অর্থাৎ হেগিমনি বা কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের লড়াই, যে লড়াইটা ক্লাসিক্যাল ফর্ম অব রেভুলেশন নয়। যেটা ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবে ঘটেছিল।

এখানে যেটা তত্ত্বগত প্রশ্ন এসে যায়, সেটা হচ্ছে, সমাজে বাস করতে গিয়ে একজন ব্যক্তি কতগুলো টেনশন অনুভব করে। সে ব্যক্তি হিসেবে নিজের মতো করে হয়ত কিছু করতে চায়, নিজের মতো চলতে চায়– আবার অন্যদিকে সমাজ বা রাষ্ট্র তাকে তার খেয়ালখুশি মতো আচরণ করা থেকে বারণ করে বা বিরত করে। এই যে ব্যক্তির নিজের ইচ্ছামত কিছু করার যে চেষ্টা বা আকাঙ্খা, তার সাথে সামগ্রিক সমাজের বাধার ফলে যে ধরনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত টেনশনের সৃষ্টি হয়, এটা যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে আমরা বুঝব যে, সিভিল সোসাইটিটা কী? একদিকে প্রত্যেকটি ব্যক্তি সমাজেরই মানুষ বা সদস্য, আবার অন্যদিকে সে সমাজ থেকে নানা ধরনের বাধারও সম্মুখীন হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে একই ব্যক্তির একদিকে যেমন একটা দ্বৈত রূপ থাকে, অন্যদিকে সে অভিন্ন একটি মানুষ। সুতরাং সিভিল সোসাইটির প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই একদিকে রাষ্ট্র, অন্যদিকে ব্যক্তি এই দুটো স্ফিয়ার এসে যায়। প্রাইভেট স্ফিয়ারটাকে যদি আমরা খুব ক্ষুদ্র আকারে দেখি, তাহলে আমরা সেটাকে পরিবারের গণ্ডির মধ্যে দেখতে পাই। আর পাবলিক স্ফিয়ারটাকে আমরা রাষ্ট্রের মধ্যে দেখতে পাই। মানুষ যখন পরিবারের মধ্যে বাস করে, তখন সে এক ধরনের নিজস্ব নর্মস দ্বারা পরিচালিত হয়। আর যখন পরিবার থেকে সে বেরিয়ে আসে, বৃহত্তর সমাজে যখন সে বিচরণ করে, তখন তাকে সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় এবং সমাজ বা রাষ্ট্র যদি তার ওপর এমন সব বাধা-বন্ধন চাপিয়ে দিতে পারে, যেটা তার স্বাভাবিক বিকাশের পথটাকে রুদ্ধ করে দেয়। সেটাকে প্রতিহত করার জন্য প্রাইভেট ইনডিভিজুয়ালরা নিজেরা কতগুলো স্বেচ্ছামূলক এসোসিয়েশন গড়ে তোলে। এই ভলান্টরী এসোসিয়েশনের প্রসঙ্গটা কেন আসছে, সেটা কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে। কারণ, ফিউডাল বা প্রাক ধনতান্ত্রিক সমাজে সিভিল সোসাইটির প্রসঙ্গ ছিল না। যিনি

www.pathagar.com

ফিউডাল সভরেন ছিলেন, তার কর্তৃত্বের বাইরে সমাজের কোন সদস্যের আর ভিন্ন কোন অধিকার ছিল না এবং তখনকার সমাজে যেহেতু যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি উন্নত ছিল না, সে জন্য তখনকার সমাজ বেসিকালি ছিল প্রাইমারী সোসাইটি। অর্থাৎ মানুষ কমিউনিটিতে বাস করতো। এর ফলে কমিউনিটির নর্মস, নিয়মনীতি তারা মেনে চলত এবং এরা একে অপরকে জানত, মানত। গ্রামে লক্ষ্য করা যায় যে, চাচা-ভাতিজা-মামু ইত্যাদি বলে একে অপরকে সম্বোধন করে। অথচ রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে এরা সবাই চাচা-ভাতিজা-মামু নয়। এই ধরনের সম্পর্ককে ফিকটিভ কিনশিপ রিলেশন বলা হয়। যেখানে এই ধরনের রিলেশনের ব্যবস্থা আছে, সেখানে সিভিল সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা ঐভাবে উপলব্ধি হয় না এবং ভলান্টারী এসোসিয়েশন গড়ে তোলার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু যখন নাগরিক সমাজ বিকশিত হয়, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড সোসাইটি ডেভলপ করে, মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য তার পরিবারের গণ্ডি থেকে বাইরে চলে আসে, তখন প্রতিনিয়তই আমরা অপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই। এটা অফিস-আদালতে হতে পারে, যাতায়াতের পথে হতে পারে। যেমন ধরুন– আপনি গাড়ী চালাতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আপনি কাউকে ধাক্কা দিলেন– তাকে আপনি চেনেন না। কিন্তু সেই মুহূর্তে ব্যাপারটি কীভাবে দেখতে হবে, কীভাবে এর একটা বিহিত বা সমাধান করতে হবে, সেটা সিভিল সোসাইটি আপনাকে বলে দেয় না। এখানে প্রযুক্তির প্রসঙ্গটাও খুব উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, আজকের যুগকে কেউ কেউ বলছেন ইনফরটেইনমেন্টের যুগ। ইনফরমেশন এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট– এ দুটোকে মিলিয়ে একটি শব্দ করা হয়েছে ইনফরটেইনমেন্ট। এখানে আমরা লক্ষ্য করছি, প্রযুক্তির বিকাশের ফলে মানুষের আনন্দ-উল্লাস করা, ব্যক্তিগতভাবে কিছু সুখময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা– এগুলো সোশালাইজড থেকে প্রাইভেটাইজড হয়ে গেছে টিভি-ভিডিওর কল্যাণে। আবার একদিকে যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি আমাদেরকে পরিবারের গণ্ডির বাইরে একটা অপরিচিত জগতে নিয়ে এসেছিল এবং সেই অপরিচিত জগতে আমরা কীভাবে আচরণ করব, সে সম্পর্কে সিভিল সোসাইটির বোধটা আমাদের মধ্যে থাকা যেমন প্রয়োজন ছিল বা আছে এবং সেগুলোকে কার্যকর করার জন্য ভলান্টারী এসোসিয়েশনগুলোর যেমন একটা ভূমিকা আছে, ঠিক তার পাশাপাশি আজকে এই বিংশ শতাব্দীর শেষ মুহূর্তে এসে আমরা লক্ষ্য করছি, প্রযুক্তি যে দ্রুত গতিতে বিকশিত হচ্ছে তাতে নিউক্লিয়ারাইজেশন অফ ইনডিভিজুয়ালস হচ্ছে,এমনকি পরিবার পর্যন্ত থাকছে না। পরিবার যেখানে এক সময় পিতামাতা সন্তানকে নিয়ে গড়ে উঠত, সেখানে দেখা যাচ্ছে এখন এক ব্যক্তির পরিবার বা গৃহস্থালি। সুতরাং এখানে আবার কিন্তু সিভিল সোসাইটির প্রসঙ্গটা অন্যভাবে আসছে। আগামী শতাব্দীর সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে পণ্ডিতেরা মনে করছেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এর একটা মৃত্যু ঘটাতে পারে। যেখানে মানুষ রোবোট দিয়ে কাজ করবে, টেলিফোন কম্পিউটার দিয়েই কাজ শেষ করবে এবং হিউম্যান রিলেশনশীপ বলতে কিছু থাকবে না। দৃষ্টান্ত দিয়ে যেমন বলা যেতে পারে যে, আজকে শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দুরশিক্ষণ পদ্ধতি চালু হয়েছে। সেখানে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদানের একটা ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। এর দ্বারা একদিকে যেমন এক সাথে বহু লোককে শিক্ষিত করা যায়, ইনফরমেশন সুবিধা দেয়া যায়, তার পাশাপাশি এটা আবার আমাদেরকে একটা মহান সম্পর্ক থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সেটা হচ্ছে, ছাত্র-শিক্ষকের পাশাপাশি শিক্ষা দান এবং শিক্ষা অর্জন– এই প্রক্রিয়াতে যে সামাজিকতা গড়ে ওঠে, যে সামাজিকায়ন সৃষ্টি হয়, সেটার কিন্তু মৃত্যু ঘটছে। গুরু-শিষ্যের আত্মিক বা হৃদয়ের সম্পর্কটার মৃত্যু ঘটছে। সুতরাং আমার কাছে মনে হয়েছে, আধুনিক সিভিলাইজেশনের উৎপত্তিতে সিভিল সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা যেটা বিভিন্ন সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট থিউরিতে বলা হয়েছে, আধুনিক সমাজের এই অতি উন্নত বিকাশের পর্যায়ে এসে সিভিল সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা এখন অন্যভাবে অনুভূত হচ্ছে।

www.pathagar.com

আফতাব আহ্‌মাদ :

আমি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসতে চাই। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সিভিল সোসাইটিকে কিভাবে ডোনার এজেন্সিগুলো এবং তাদের কৃপাপুষ্ট এনজিওজীবীরা দেখছেন। এরা যাকে 'সুশীল সমাজ' বলেন প্রকৃত অর্থে তা হচ্ছে এনজিও গোষ্ঠীগুলোর সমষ্টিগত পরিচয়। এ পরিচয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর। সমাজের সুষ্ঠু ও সুস্থ বিকাশে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যই এ শঠতা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ। এনজিও গোষ্ঠীগুলো সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। এই যে হঠাৎ করে ভদ্রবেশী শঠ, প্রতারক ও এনজিওজীবীরা 'সিভিল সমাজ', 'সুশীল সমাজ' অভিধায় সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজ-এর নতুন ব্যাখ্যা করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন, তার কারণ কী? সিভিল সোসাইটির অপব্যাখ্যা এনজিওজীবী ও তাদের ফরমায়েশী বুদ্ধিজীবীরা এভাবে দেন যে, এটি পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি সত্তা এবং সমাজে এর একটি সুনির্দিষ্ট স্থায়ী নীতিনির্ধারণী অর্থাৎ পরোক্ষ রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ণীত ও নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, তাদের মতে সমাজের 'সাধারণ' সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করে এই 'সিভিল সোসাইটি'। অভিনব ব্যাখ্যা বটে। রাজনৈতিক দল না করেও তারা রাজনীতির নিয়ন্তা হতে চায়, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ না হলেও তারা ক্ষমতার Linchpin হতে চায়– এদের জন্য সমাজে সকলকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর বিকৃতি চায় তারা। তা হলে তো একই ব্যাপার হলো। চরিত্রগত অভিন্নতা যদি থেকেই যায় স্বাতন্ত্র্যের দাবি কি হাস্যকর নয়? হেগেল সিভিল সোসাইটিকে জার্মান ভাষায় Die burgliche Gesellsehaft বলে অভিহিত করেছেন। "এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে ব্যক্তিগণ পারিবারিক ঐক্য বিসর্জন দিয়ে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছেন। এটি নির্দিষ্ট প্রয়োজন, আত্মস্বার্থ ও বিভেদের এমন একটি মণ্ডল যার আত্মবিনাশের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।" মার্কস হেগেলের পরিভাষাটিই ধার করে সিভিল সোসাইটিকে বুর্জুয়া সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে রাষ্ট্রকে transcend করে অধিপতি শ্রেণীর স্বার্থ, ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য পায়। মার্কস-এর মতে– "civil society embraces the whole material intercourse of individual within a definite stage of the development of productive forces. It embraces the whole commercial and industrial life of a given stage and in so far, transcends the state and the nation though on the other hand, again it must assert itself in its foreign relations as nationality, inwardly must organize itself as state... Civil society as such only develops with the bourgeoisie; the social organization evolving directly out of production and commerce which in all ages forms the basis of the state." মার্কসের মূল যে ধারণা রাষ্ট্র এবং জনসমাজের দ্বান্দ্বিক অবস্থান সম্পর্কে সেটি কিন্তু আজকের liberal traditionও অস্বীকার করতে পারছে না। জনসমাজকে লিবারেল ট্রেডিশনের দিক থেকে যদি আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি, এটি হচ্ছে এমন একটি সার্বজনিক ক্ষেত্র, যেটি পরিবার এবং রাষ্ট্রের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে এবং নাগরিকদের যে নানা ধরনের সমিতি বা সংগঠন গড়ে ওঠে সমাজে– যেটাকে আমরা বলি প্লুরালিটি অব সিভিল এসোসিয়েশন্স– সেগুলোকে নিয়েই মূলত সিভিল সোসাইটি গড়ে ওঠে। এখানে স্বেচ্ছামূলকভাবে ব্যক্তিগণ যোগদান করেন, কিন্তু তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যৌথ স্বার্থ বা যৌথ কোন উদ্দেশ্য সাধন করা এবং এই সিভিল এসোসিয়েশনগুলোর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতা ও সম্পদের যে অপব্যবহার, অসদ্ব্যবহার ঘটছে, তার বিরুদ্ধে পাল্টা একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে স্বেচ্ছাচারিতা, স্বৈরতন্ত্র কিংবা

www.pathagar.com

সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে নির্যাতন-নিপীড়ন বা সমাজের ওপর কোন অপচ্ছায়া জগদ্দল পাথরের মতো চেপে না বসে। Aid doner রা বলছেন জনসমাজ হচ্ছে an aggregation of organized interests pursuing a benign and rational political agenda. এটাকে ইউনাইটেড নেশনের ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে এভাবে যে, সিভিল সোসাইটি হচ্ছে সেই বলয়, যেখানে সংগঠিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠবে। যার উদ্দেশ্য হবে বৈচিত্র্যময় এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পরবিরোধী সামাজিক শক্তির সহাবস্থান। এই অবস্থানে থাকা অবস্থায় তারা তাদের সামাজিক ভিতটাকে, তাদের যে কন্সটিটিউয়েন্সি বা তাদের যে এরিয়া অব থিমেটিক অপারেশন, এগুলোকে তারা সংগঠিত করবেন। R. C. Riddell and A. J. Bebbington ১৯৯৫ সনে প্রকাশিত তাঁদের Developing Country NGO and Donor Governments শীর্ষক Report to the Overseas Development Adminstration-এ উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে কেন্দ্র করে যেসব জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়, কিংবা ট্রেড ইউনিয়নগুলো বা কো-অপারেটিভ মুভমেন্টকে কেন্দ্র করে বা অন্যান্য সার্ভিস অর্গানাইজেশন বা কমিউনিটি গ্রুপ কিংবা যুব সংগঠন এমনকি একাডেমিক ইনস্টিটিউশনগুলোকে কেন্দ্র করে সমাজে যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, এ সবই কিন্তু জনসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আফ্রিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৯৯৪ সনে L. Diamond তাঁর Towards Democratic Consolidation প্রবন্ধে সিভিল সোসাইটি কীভাবে সংগঠিত হতে পারে, তার সাতটি ক্যাটাগরি দেখিয়ে দেন।

তাঁর মতে প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে ইকনমিক ক্যাটাগরি, যেখানে প্রডাকশন এবং কমার্শিয়াল এসোসিয়েশনের নেটওয়ার্কগুলো গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় ক্যাটাগরি হচ্ছে কালচারাল। এর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয়, সম্প্রদায়গত এবং জাতিকতা বা জাতিসত্তা কেন্দ্রিক বিভিন্ন সমিতি বা ethnic associations. তৃতীয় ক্যাটাগরিতে তিনি বলছেন ইফরমেশন এবং এডুকেশনাল অর্গানাইজেশনগুলোর কথা। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ধ্যান ধারণা, মতামত এবং তথ্যের সঞ্চালন করা বা সংবহনের ব্যবস্থা করা। চতুর্থ ক্যাটাগরিতে Diamond বলছেন, এটি স্বার্থভিত্তিক গোষ্ঠী। যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং শ্রমিক ও পেশাজীবী ইত্যাদির স্বার্থ সংরক্ষণ করা। পঞ্চম ক্যাটাগরিতেও রয়েছে developmental Organization এই ক্যাটাগরিতে Diamond এনজিওদের এবং স্বেচ্ছামূলক যে সংগঠনগুলো আছে বা Self-help Groupগুলোকে তিনি অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ষষ্ঠ ক্যাটাগরিতে তিনি বলেছেন, Issue oriented group, বিভিন্ন ইস্যু থাকে সমাজে যেমন পরিবেশের একটা ইস্যু বা নারী অধিকার Gender equalities ইত্যাদি ইস্যুকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে– সেগুলোকে তিনি এই ক্যাটাগরিতে ফেলেছেন এবং সবশেষে তিনি বলছেন, নাগরিক সংগঠন, Civic Organization-যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাকে সংহত, শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সঞ্চার করা, চালু করা। Diamond অবশ্য এই সবকিছুর সাথে গণমাধ্যম এবং academic institutionগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ গণমাধ্যম এবং একাডেমিক ইন্সটিটিউশনস প্রকাশনা সংস্থাসমূহ ইনফরমেশন এবং আইডিয়ার ফ্লোকে এনকারেজ করে, প্রচার করে, সংগঠিত করে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত স্বার্থের সমিতিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে না। এই জনসমাজকে যদি অর্থবহ ও কার্যকর করতে হয়, তাহলে তিনটি শর্ত পূরণ করা অপরিহার্য। ১৯৯৪-এ প্রকাশিত Civil society and Political Institutions in Africa প্রবন্ধে Ratton সিভিল সোসাইটি ও পলিটিক্যাল ইন্সটিটিউশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনটি শর্তের উল্লেখ করেছেন ঃ material, organizational ও ideological এবং তিনি

www.pathagar.com

এও উল্লেখ করেছেন যে. রিসোর্সের অ্যাকসেস যদি জনসমাজের না থাকে, তাহলে জনসমাজ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে Diamond যে ৭টি ক্যাটাগরির সংগঠনের কথা বলেছেন, তার মধ্যে একমাত্র ডেভেলপমেন্টাল ক্যাটাগরিতে যারা NGO কিন্তু Self-help group নয়, এইড ডোনারদের ওপর নির্ভরশীল. তারাই একমাত্র রিসোর্সের অ্যাকসেস পান এবং তাদের অঢেল অর্থের যোগান ঘটে। এর ফলে দেখা গেছে, এই এনজিওগুলো একদেশদর্শী এবং পক্ষপাতমূলক এক ধরনের আচরণ সমাজে করছে। তারা মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে, বিকেন্দ্রীকরণ. প্রাইভেটাইজেশন. পিপলস পার্টিসিপেশন, এন্টারপ্রেনারশিপ ও স্বনির্ভরতার নামে এমন সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, যেগুলোর মূল লক্ষ্য গণতন্ত্রের জন্য ভিত রচনা করা নয়। যার মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র যে ইউটিলিটি ও পাবলিক সার্ভিস জনগণকে প্রোভাইড করে, সেগুলোকে স্ট্রেংদেন করার পরিবর্তে রাষ্ট্রকে কীভাবে আরও দুর্বল করা যায় রাষ্ট্রের একটি অলটারনেটিভ ডেলিভারি সিস্টেম হিসেবে, রাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ হিসেবে তারা নিজেদেরকে কীভাবে দাঁড় করাতে পারে. সেটিই হচ্ছে এদের মূল লক্ষ্য। এর ফলে সমাজে এবং রাষ্ট্রদেহে যে বিভাজন দেখা যায়, তা আজকে মানুষকে এনজিও বিরোধী হিসেবে তৈরী করছে। কারণ মানুষ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে যে, সিভিল সোসাইটির নামে রাষ্ট্রের ইউটিলিটি সার্ভিস, পাবলিক সার্ভিস বা কমন গুডের জন্য রাষ্ট্র যে উদ্যোগ গ্রহণ করে, এগুলোকে আন্ডারমাইন্ড করা হচ্ছে এবং সিভিক রেসপনসিবিলিটিকে আন্ডারমাইন্ড করা হচ্ছে। সেজন্য আজকে এনজিও এবং জনসমাজ পরস্পরবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে এনজিওদের পক্ষে যারা বলেন যে,এনজিওরাই কেবল জনসমাজের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে এটি আসলে বাস্তবতা বিবর্জিত। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের দু'চারটি ব্যতিক্রমধর্মী এনজিও ছাড়া অধিকাংশই আজকে জনসমাজবিরোধী একটি গোষ্ঠী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে এবং এরা সিভিক অর্গানাইজেশনের ক্যাপাসিটিকে ইনক্রিজ করার পরিবর্তে সিভিক অর্গানাইজেশনগুলো ধ্বংসের কাজে জড়িত। নতুন নতুন সামাজিক আন্দোলন যাতে রাষ্ট্রের সিভিল এমিনিটিজ, সোশ্যাল সার্ভিস এবং ইউটিলিটি সার্ভিসকে আরো এক্সপ্যান্ড করতে পারে সেক্ষেত্রে একটি সহযোগিতার হাত যাতে সিভিক অর্গানাইজেশনগুলো বাড়াতে পারে সেইদিকে অগ্রসর না হয়ে তারা রাষ্ট্রের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর ফলে জনসমাজ এবং এনজিও'র মধ্যে একটি বিরোধ আমাদের এখানে লক্ষ্য করা গেছে এবং এর মূল কারণ হচ্ছে নব্বইয়ের দশকে যে তৃতীয় তরঙ্গ বা ঢেউ, ডেমোক্রেটাইজেশনের যে third wave তৃতীয় বিশ্বে লক্ষ্য করা গেছে, তার সূত্র ধরে এটা বলা যেতে পারে যে পুঁজিবাদী বিশ্বে যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রাইভেটাইজেশন হবে তা টপমোস্ট প্রায়োরিটি এবং পলিটিক্যাল এজেন্ডার এক নম্বর বিষয়। সে কারণে আজকে এনজিও এই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং এনজিও চাইছে রাষ্ট্রকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর একটি অবস্থানে নিয়ে যেতে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজ লালন, বর্ধন ও বিকাশের জন্য ১৯৯২-এ Landell-Mills Governance Cultural Change and Empowerment প্রবন্ধে যে ৪টি পূর্ব শর্তের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন তার ওপর গুরুত্ব দেয়া দরকার। এগুলো হচ্ছে ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন এর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা, শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং সেলফ এক্সপ্রেশনের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, আইনের শাসনকে সংহত করা ও শক্তিশালী করা এবং যাতে উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে, সেজন্য এসোসিয়েশনাল একটিভিটিজগুলোকে কোনোভাবে সংকুচিত না করে আরো উত্তরোত্তর ক্ষমতাশালী করার ক্ষেত্রে প্রণোদনা যোগানো।

www.pathagar.com

মাহবুব উল্লাহ :

আমার মনে হয়, এই প্রসঙ্গে কিছু ফিলোসফিকাল কথা এসে যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিভিল সোসাইটির আইডিয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেটা হচ্ছে, সমাজ কীভাবে সম্ভব হবে এবং সমাজে যে মানুষ বাস করে, সে ইচ্ছামাফিক সবকিছু যে করতে পারে না, সমাজ সংগঠন তাকে বাধাগ্রস্ত করে। জন লক, এডাম ফার্গুসন, রুশো–এরা বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক সঙ্কট, বুদ্ধিবৃত্তিক যে এনলাইটেনমেন্ট, টেকনোলজির ডেভেলপমেন্ট এবং র‍্যাপিড অর্গানাইজেশন অব সোশ্যাল লাইফ-এর পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আরেকটা সমস্যা দেখা গেল। একই প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন উঠল, যে সমাজে আমরা বাস করি, সেই সমাজটা বাস করার জন্য কতটুকু নিরাপদ এবং সেই সময় সমাজতাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানীরা ও দার্শনিকরা পথ বাতলাচ্ছিলেন যে, কীভাবে সভ্যতাকে একটা কমপ্লিট বারবারাইজেশন অব হিউম্যান এগজিসটেন্স থেকে রক্ষা করা যায় এবং তখন অবশ্য বলা হত যে সমাজের এই পরণতির জন্য সমাজ নিজেই দায়ী। সমাজে যা ঘটছে, সেটাই দায়ী। আর আমি আধুনিক সভ্যতা বা আজকের দুনিয়া সম্পর্কে বলতে চাই ভুপেন হাজারিকার একটি গানের পংক্তি ধরে– সেটা হচ্ছে 'প্রেমহীন ভালবাসা' অর্থাৎ আজকাল মানুষের মধ্যে যে ভালবাসা বা সম্পর্ক হয়, তার মধ্যে প্রকৃত প্রেম থাকে না। আমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলছি, কিন্তু তার মধ্যে আর্ট অব কনভারসেশন ইজ ডেড। আজকে আমরা অনেকেই বহুতল ভবনে থাকি– কিন্তু একে অপরে পাশের ফ্লাটের লোকটি বা পরিবারটিকে চিনি না। তার বিপদে আমরা এগিয়ে যাই না। এই ধরনের নানা সমস্যা হচ্ছে। আজকাল আর কেউ উপন্যাস পড়তে চায় না। সময় নেই। সমাজের বন্ধন এভাবে প্রচণ্ড গতিতে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে এক ধরনের ক্রীপিং এলিয়েনেশন। অর্থাৎ মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং সে কারণেই সম্ভবত আজকে আবার নতুন করে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক রচনা করার জন্য সত্যিকারের আন্তরিক স্বেচ্ছামূলক সংগঠন দরকার। এখন আমাদের সামনে মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আমাদের দেশে যে সমস্ত স্বেচ্ছামূলক সংগঠন বা এনজিও আছে তারা কতটা সমাজের এই কনসার্নের দিকে লক্ষ্য রাখছে এবং তারা কি শুধু নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে, না সমাজকে মানুষের বাসযোগ্য রাখার চেষ্টা করছে? এটা বিরাট প্রশ্ন। কিছুদিন আগে গণসাহায্য সংস্থা নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটে গেল, সেটা আমাদেরকে সেই ইঙ্গিতই দেয়। আমার মনে হয়, আজকে এই জিএসএস জাতীয় এনজিও সব রকমের প্রতারণা, সবরকম অসামাজিকতার জন্ম দিয়েছে। নারী মুক্তিআন্দোলনের নামে নারী নির্যাতনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে বেলেল্লাপনা ও লাম্পট্যের প্রসার ঘটানো হয়েছে। সুতরাং এই ধরনের এনজিও বা এই ধরনের স্বেচ্ছামূলক সংগঠন আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা চাই, সমাজে সত্যিকারভাবে মানুষের সাথে মানুষের ম্রিয়মান সম্পর্ককে আবার নতুনভাবে বিনির্মাণের জন্য যে ধরনের স্বেচ্ছামূলক সংগঠন প্রয়োজন সেই ধরনের সংগঠন সমাজে গড়ে উঠুক এবং সেইদিকে সংশ্লিষ্ট সবাই আত্মনিয়োগ করুক।

www.pathagar.com

৭ নভেম্বর ১৯৯৯

পরিবেশ ভাবনা

মাহবুব উল্লাহ :

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক বিতর্ক আছে। বিশেষ করে এই বিতর্কটা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্বকে নিয়ে। প্রশ্ন হল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জিনিসটা কী? প্রবৃদ্ধি হচ্ছে একটি ইকনমির ফিজিক্যাল ডায়মেনশনের পরিমাণগত বিকাশ। এটাকে যদি আমরা পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করতে চাই, তাহলে সেটা দাঁড়াবে এরকম যে, একটি ইকনমিতে বস্তু এবং শক্তির যে ধারা প্রবাহিত হয়, পরিবেশ থেকে এক ধরনের র-ম্যাটেরিয়াল হিসেবে যার উৎপত্তি এবং সেটা পরিবেশের মধ্যেই বর্জ্য হিসেবে ফেরত যায়। এই সব বর্জ্যের মধ্যে কেবল যে শক্তি এবং বস্তুই আছে তা নয়। তার মধ্যে মানবদেহ, প্রাণীদেহসহ অন্য সব রকম জিনিস আছে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সংজ্ঞা থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। উন্নয়ন হচ্ছে একটি অর্থনীতির কাঠামো, এর প্রকরণ, এর গঠন এবং এর ফিজিক্যাল স্টকস এ্যান্ড ফ্লোজ এর গুণগত উন্নয়ন। এই গুণগত উন্নয়ন সম্ভব হয় মানুষের জ্ঞানের ফলে, মানুষ যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে তার ফলে এবং যে উদ্দেশ্যে মানুষ সেটাকে ব্যবহার করতে চায় তার ফলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, Growth হচ্ছে কোয়ানটিটিভ ইনক্রিজ ইন ফিজিক্যাল ডায়মেনশনস। আর Development হচ্ছে কোয়ালিটিটিভ ইমপ্রুভমেন্ট ইন নন-ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিসটিকস।

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট যে, একটি ইকনমি ডেভেলপ করতে পারে, কিন্তু তার গ্রোথ নাও হতে পারে। আমরা জানি, ভূমণ্ডল এবং সূর্য থেকে যে তাপশক্তি উৎসারিত হয়, সেটা সুদের হারের গতিতে বৃদ্ধি পায় না। বস্তুতপক্ষে সেটাকে প্রবৃদ্ধি বলা হয় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করি পৃথিবীতে একটি গুণগত পরিবর্তন, একটি বিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এখন প্রশ্ন হল, অর্থনীতির যে প্রবৃদ্ধির কথা আমরা বলি সেটার সীমাবদ্ধতা কী? সীমাবদ্ধতা দুরকম। একটি হচ্ছে বায়োফিজিক্যাল লিমিটেশন অর্থাৎ জৈবিক বা বস্তুগত সীমাবদ্ধতা এবং আরেকটি হচ্ছে এথিকোসোশাল লিমিটেশন। অর্থাৎ নৈতিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত সীমাবদ্ধতা। এই উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়ন নয়, প্রবৃদ্ধিই সীমিত হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা পাঠ্যপুস্তকে যে অর্থনীতি পড়ি বিশেষ করে আজকের বিশ্বে যেটাকে মেইনস্ট্রিম বা স্ট্যান্ডার্ড নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিকস্ বলা হয়, সেই ইকোনমিক এনালিসিসের পেছনে এজামপ্‌শনটা হচ্ছে এই যে, ইকোনমিতে এই উভয় ধরনের কোন লিমিটই বিদ্যমান নয়। তার মানে হচ্ছে, বায়ো ফিজিক্যাল ও এথিকোসোশাল উভয় বিবেচনায় এগ্রিগেইট প্রোডাক্ট অর্থাৎ একটি ইকোনমিতে এক বছরে যা কিছু উৎপাদন হয়, তার বৃদ্ধিটা কাম্য। অর্থনীতিবিদ অ্যাব্রামউয়িচ-এর প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, 'ইকনমিস্টস হ্যাভ রিলাইড হাউএভার অন প্র্যাকটিক্যাল জাজমেন্ট, নেইমলি, দ্যাট এ চেঞ্জ ইন ইকনমিক ওয়েলফেয়ার ইমপ্লাইজ এ চেইঞ্জ ইন টোটাল ওয়েলফেয়ার ইন দি সেইম ডাইরেকশন, ইফ নট ইন দি সেম ডিগ্রী। এই যে কথাটা, এর অর্থ হলো, অর্থনৈতিক কল্যাণে পরিবর্তন হলে সামগ্রিক কল্যাণে পরিবর্তন আসবে। সেই কল্যাণ একমুখী হবে, যদিও একই হারে বা একই মাত্রায় হয়তো হবে না। এটা সম্ভব হয় না যখন একটি ইকোনমি এই দুই লিমিটের দিকে পৌছে যায়। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, কোনো কিছু উৎপাদন করে আমরা ভাবছি, আমরা অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি করছি। কিন্তু দেখা যাবে, এর ফলে ইকোসিস্টেম সার্ভিসের যে ক্ষতি হয়, সেটা অর্জিত কল্যাণকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বা ঘটনাবিশেষে যতটুকু কল্যাণ অর্জিত হয়েছে বলে আমরা ধারণা করি, সেটা বস্তুগত হিসেবে যা, আসলে তা নয়।

www.pathagar.com

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অতিরিক্ত উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা এক ধরনের ক্ষতিসাধন করি। সেই ক্ষতিটা সৃষ্টি হয় সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ বা গুণাবলীর অবক্ষয় থেকে এবং এর পেছনে বেপরোয়াভাবে মেরিট্রিশাস গুডস অর্থাৎ যেগুলোর মূল্য আছে কিন্তু দাম নির্ধারণ করা যায় না, এমন সব জিনিসের ক্ষতি থেকে। এসব জিনিসের মধ্যে নির্মল বায়ু, বিশুদ্ধ পানি, উদ্ভিদ, জীব বৈচিত্র্য ইত্যাদি অন্তর্গত। তাত্ত্বিকভাবে অর্থনীতিতে একটি কথা বলা হয়, সেটা হচ্ছে, এক্সটারনালিটি। বাহ্য প্রভাব। অর্থাৎ ধূমপানে হয়তো আমার এক ধরনের তৃপ্তি হতে পারে, এক ধরনের সুখানুভূতি আসতে পারে, কিন্তু আমার আশপাশে যারা আছে, তারা তখন passive smoker এ পরিণত হয়। দেখা গেছে, active smokerদের চাইতে ধূমপানের খারাপ প্রভাব passive smokerদের ওপরে অনেক বেশী পড়ে। যে কারণে পৃথিবীর অনেক দেশে বিশেষ করে জনবহুল স্থানসমূহ, রেল স্টেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সিনেমা হল বা অপেরা হাউস প্রভৃতি স্থান, যেখানে লোক সমাগম বেশী হয়, সেসব স্থানকে ধূমপান নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এই যে একজনের ভোগের ফলে অন্যের ওপর যে প্রভাব সৃষ্টি হয়, সেটাকেই অর্থনীতিতে বলা হয়, 'বাহ্য প্রভাব'। এখন অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে,এই বাহ্য প্রভাবকে যদি সম্পূর্ণভাবে অন্তস্থ করা যায়, তাহলে হয়তো এই লিমিটের সমস্যার উদ্ভব হতো না। যেমন, নিও ক্লাসিক্যাল ইকনমিস্টরা অনেকটা ক্লাসিক্যাল ফিজিসিস্টদের মত মনে করেন, একটি বিশেষ অবস্থায় আমরা সবরকম সীমাবদ্ধতার বাইরে। যেমন, ফিজিসিস্টরা মনে করেন, আলোর যে গতি আছে, তার লিমিট থেকে আমরা অনেক দূরে। কিংবা তাঁরা মনে করেন, একটি এলিমিন্টারি পার্টিকলের ক্ষুদ্রতা থেকে আমরা অনেক দূরে। অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে আমরা আমাদের পরিবেশের ধারণক্ষমতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। অর্থাৎ ক্যারিং ক্যাপাসিটির মাত্রা অতিক্রম তো দূরের কথা; তার ধারে কাছেও আমরা পৌছাচ্ছি না। সুতরাং আমরা যখন এই দুই লিমিটের কথা বুঝতে পারব, তখন কিন্তু আমরা সেই ক্লাসিকাল ফিজিকস বা ক্লাসিকাল ইকনমিকস থেকে অনেক দূরে সরে আসব। এর জন্য আমাদের এক নতুন ধরনের উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ দরকার। যে বিশ্লেষণে limit in case যেখানে বিরাজমান, সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের তত্ত্ব ও আচরণকে প্রয়োগ করতে পারব। আমাদেরকে এটাও মনে রাখতে হবে, যতই আমরা ঐ সীমাবদ্ধতার কাছাকাছি চলে আসব, ততই দেখব আমাদের সার্বিক কল্যাণের দিকে কিন্তু আর আগের গতিতে পৌছাতে পারছি না। তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, অর্থনীতির বস্তুগত বিকাশের ফলে যে কল্যাণ অর্জিত হয় বলে মনে করা হয়, আসলে সেটা কল্যাণকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বাধাগ্রস্ত করে। এমনকি মুছে ফেলে, যখন সেই সীমা অতিক্রান্ত হয়। একদিকে আমরা চিন্তা করতে পারি, একটি পৃথিবী আছে, সেখানে কিছু নেই, তবে ক্ষুধার্ত মানুষ আছে। আবার অন্যদিকে যদি আমরা চিন্তা করি যে, পৃথিবীতে অনেক কিছুই আছে, জীবনযাত্রার বহু সামগ্রী আছে। তার পাশাপাশি অভুক্ত ও গৃহহীন মানুষ আছে। এই দুই ধরনের অর্থনীতির মধ্যে তফাৎ বিবেচনা করতে হবে।

আফতাব আহমাদ :

মানুষ, সমাজ, পরিবেশ– এসব কিছু একে অপরের সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত। মানুষ নিজেকে পুনরুৎপাদনের জন্য পরিবার গঠন করে এবং মানুষের এই প্রথম উৎপাদনের কমর্ককাণ্ডকে আমরা বলি প্রজনন। এই প্রজননের মধ্যদিয়ে মানুষ নিজেকে নিজে পুনরুৎপাদন করে। মানুষ তার নিজের জীবনকে ধারণ ও লালন করার জন্য, জীবনের মানকে আরও উন্নত ও উৎকৃষ্ট করার জন্য প্রকৃতিদত্ত সম্পদকে ব্যবহার করতে যখন শিখলো, তখন একদিকে সরাসরি, প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতির সম্পদ যেমন মানুষ ভোগ করা শুরু করে, তেমনি প্রকৃতিদত্ত সম্পদের প্রথমদিকে যে ধরণ থাকে, যে ধরন ভোগযোগ্য নয়, সেই ধরনে রূপান্তর ঘটায় মানুষ তার দৈহিক বা কায়িক শ্রম প্রয়োগ করে। বস্তুত John Locke সম্পত্তি তত্ত্ব সম্পর্কে

www.pathagar.com

বলতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রকৃতির ওপর প্রযুক্ত মানুষের শ্রমই হচ্ছে সম্পত্তির মূল উৎস। এই যে প্রকৃতির সম্পদকে মানুষ নিজের চাহিদা বা প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যবহার করতে শিখলো, তার ফলে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্যে একটি বহিঃ হস্তক্ষেপ ঘটে। যার ফলে প্রকৃতির আদি যে ভারসাম্য বা আদি সমীকরণ তার একটি ব্যাঘাত বা ব্যত্যয়ও ঘটে।

মানুষ যদি নির্বিচারে প্রকৃতির সম্পদের ওপর হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং ভারসাম্য ও সমীকরণ সম্পর্কে না ভাবে তাহলে এক মহাবিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এটি যত দিন যাচ্ছে, মানুষের জ্ঞান যত বিকশিত হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে মানুষ আরও নতুন করে যত জানছে, ততই গভীরভাবে উপলব্ধি করছে যে, প্রকৃতির সম্পদ এবং প্রকৃতির মধ্যে নিহিত ভারসাম্য রক্ষা করা না গেলে এই গ্রহ মানুষের বাসযোগ্য থাকবে না। আমরা সমাজবদ্ধ জীবনের কথা, মানুষের উন্নয়নের কথা বলছি এবং সে অর্থেই development-এর কথা বলছি। ইংরেজী development শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহৃত হয় উন্নয়নের অর্থে, বিকাশের অর্থে, স্ফূরণের অর্থে এবং development-এর আরেকটি বিকল্প শব্দ improvement বা উৎকর্ষ সাধন অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়। এই সবকিছুকে মিলিয়ে যদি আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক, সেটাকে বিচার করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে প্রথমে প্রকৃতির দিকে তাকাতে হবে যে, এই প্রকৃতি মানুষকে কীভাবে তার জীবন ধারণের জন্য এবং তার জীবনের নানা চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাবার জন্য সম্পদ সরবরাহ করে। প্রকৃতি আছে বলেই আজকে মানুষ সংঘবদ্ধ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারছে। তবে প্রকৃতিদত্ত যে সম্পদ, তাকে মানুষের প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহারোপযোগী করার জন্য মানুষকে তার জ্ঞান ও মনীষাকে ব্যবহার করে কৃৎকৌশল উদ্ভাবন করতে হয়েছে। এই প্রকৃতিদত্ত সম্পদকে মানুষ তার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী রূপান্তর করতে শিখেছে। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ার একটি দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি। খনিজ সম্পদ– যেমন আকরিক লোহা মানুষ বিভিন্ন হাতিয়ার, যেমন– লাঙ্গলের ফলা, কাস্তে, কোদাল, নিড়ানি কিংবা অন্যান্য কৃষিকাজের হাতিয়ার তৈরির জন্য ব্যবহার করে। মানুষ ইস্পাত তৈরী করছে। মানুষ খনি থেকে কয়লা এবং হীরা আহরণ করছে। আরো অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদ ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়ামের মতো মানব সভ্যতা বিধ্বংসী জিনিসও আহরণ করছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনা করতে গিয়ে, সম্পদ আহরণ করতে গিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে যেভাবে ডিপ্লিট করেছে এবং প্রকৃতির ভারসাম্য যেভাবে বিনষ্ট হয়েছে, সে ব্যাপারে মানুষ খুব একটা যত্নবান ছিল না।

কিন্তু আজকে যখন মানুষ প্রতিবেশ এবং পরিবেশ সম্পর্কে ভাবতে এবং বুঝতে শুরু করেছে ঃ প্রকৃতির সম্পদ অসীম নয়, সসীম এবং এই সম্পদকে যদি যথোচিতভাবে ব্যবহার করা না যায় এবং ব্যবহার করার সময়ে প্রকৃতি বা এই গ্রহের প্রাণশক্তি বা vitality যদি সংরক্ষিত না হয় এবং জীব বৈচিত্র্য বা biodiversity যদি রক্ষা করা না যায় তাহলে ভবিষ্যতে মানুষ এই গ্রহকে বাসযোগ্য গ্রহ হিসেবে আর পাবে না। এর ফলে যে কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মানুষ এখন অনেক বেশী যত্নবান হচ্ছে। ভাবনাটি হচ্ছে এরকম যে, এই গ্রহের structure, function, diversity— এগুলোকে সংরক্ষণ করে উন্নয়নের কলাকৌশল এবং উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমাদের এই গ্রহে প্রাকৃতিক যে বিধিবিধান রয়েছে, এটি এমন একটি ব্যবস্থা, যা মানুষসহ যত রকমের প্রাণী এই গ্রহে বসবাস করে, তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি life support system বিধান করেছে। এই বিধানটি ইকোলজিক্যাল প্রসেসকে জেনারেট করছে, যে কারণে এই গ্রহে জীবনের স্পন্দন আমরা অনুভব করি। এই ইকোলজিক্যাল প্রসেস একদিকে আবহাওয়াটাকে নানা ধরনের বৈচিত্র্য দিচ্ছে, বায়ুকে দূষণমুক্ত রাখছে, পানির প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করছে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ, অত্যাবশ্যকীয় যেসব উপাদান প্রকৃতির মধ্যে থাকা দরকার, সেসবকে পুনরুৎপাদন করছে।

www.pathagar.com

ভূমির ক্ষেত্রে যেমন এর উর্বরতাকে regenerate করছে এবং Ecosystem এর ক্ষেত্রে একদিকে যেমন নতুন নতুন Ecosystem ক্রিয়েট করছে, আরেকদিকে একইভাবে regenerate করছে। তাই আমাদেরকে যত্নবান হতে হবে, কোন্ কোন্ ফ্যাক্টর এই ক্রিয়েশন এবং রিজেনারেশনের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই ফ্যাক্টরগুলোকে যেন বাধাগ্রস্ত করা না হয়। প্রকৃতি থেকে যে সম্পদ মানুষ তার কল্যাণের জন্য, উন্নয়নের জন্য এবং তার প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাবার জন্য ব্যবহার করছে, সেই সম্পদ রিসাইকল্‌ড হয়ে প্রকৃতিতে পুনরুৎপাদন সম্ভব কী না সে বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে– সম্ভব হলে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। আবার, অনেক সম্পদ আছে, যেগুলো পুনরুৎপাদন সম্ভব নয় এবং যেগুলো অপরাপর সম্পদের চাইতে দীর্ঘস্থায়ী নয় ও সসীম, সেইসব সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেমন পরিমিতি ও সংযমের পরিচয় দিতে হবে, তেমনি প্রয়োজন না হলে অত্যন্ত সুকৌশলে সেই সম্পদ যেন যখন তখন যত্রতত্র ব্যবহার করা না হয়, সে ব্যাপারেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। এভাবেই নিশ্চিত করতে পারবো এই গ্রহের প্রাণশক্তি এবং জীব বৈচিত্র্য।

মাহবুব উল্লাহ :

আমি আবার বায়োফিজিক্যাল্ লিমিটসের প্রসঙ্গে আসতে চাই। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে আমাদেরকে তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত অবস্থার কথা বিবেচনা করতে হবে। এগুলো হচ্ছে– ফাইনিচিউড, অ্যানট্রপি এবং কমপ্লেক্স ইকোলজিক্যাল ইন্টারডিপেনডেন্স– অর্থাৎ জটিল প্রতিবেশগত আন্তঃনির্ভরশীলতা বা পরস্পর নির্ভরশীলতা। এই তিনটি জিনিসই যে কোন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। যে কোন ইকনমিকে যদি শুধু আমরা তার বস্তুগত দিকে দেখি, তাহলে সেটা একটি আবদ্ধ ইকোসিস্টেমের একটি ওপেন সাবসিস্টেম। যে ইকোসিস্টেম বা যে প্রতিবেশগত অবস্থানের কথা বলা হচ্ছে, সেই প্রতিবেশ থেকে আমরা পাই লো-অ্যানট্রপি ম্যাটেরিয়ালস। আর উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেগুলো হয়ে যায় অ্যাবজরভার অব হাই অ্যানট্রপি ওয়েস্টেজ। এখন যে কোন ইকনমিক সাবসিস্টেম গ্রোথটা ওভারঅল সিস্টেমের সীমাবদ্ধতার ওপর নির্ভর করে এবং যে ওভারঅল সিস্টেমের মধ্যে আমরা একদিকে পাচ্ছি লো অ্যানট্রপি ইনপুটস। আরেকদিকে হচ্ছে হাই অ্যানট্রপি ওয়েস্টেজ বা আউটপুটের একটি অবস্থা। এই ব্যাপারটা একটি জটিল প্রতিবেশগত সম্পর্ক। ইকনমিক সাবসিস্টেমটা যতই গ্রো করতে থাকবে, ততই টোটাল ইকোসিস্টেমটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকবে। এখন, এই যে তিনটি বেসিক লিমিটের কথা আমি বললাম, তাদের মধ্যে কীভাবে মিথস্ক্রিয়া হয় সেটি বুঝতে হবে। যেমন– ফাইনিচিউডের সমস্যা। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, ফাইনাইটের সাথে এর সম্পর্ক। এটা কোন সমস্যাই হত না।

একটু আগে আপনি বলেছেন যে, খনিজ সম্পদ ফুরিয়ে যায়, কিন্তু যদি আমরা যা উৎপাদন করি এবং সেটা থেকে যা ওয়েস্টেজে পরিণত হয়– সেটাকে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিসাইক্‌ল্ করতে পারতাম, তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা এরাইজ করতো না। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, ফিজিক্সে যেটাকে বলে অ্যানট্রপি সমস্যা। এই অ্যানট্রপি সমস্যার ফলেই কিন্তু আমরা সর্বাত্মক রিসাইক্লিং করতে সক্ষম হই না। যেমন– কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে সেই ছাইকে আর কয়লাতে ফেরত নেয়া যায় না। এই যে দু'রকম সমস্যা এতে আমরা উৎপাদন বৃদ্ধি করছি বটে, কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর সাথে সাথে আমরা এই উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে একটি ডিজঅর্ডার, একটি ইমব্যালান্স সৃষ্টি করি।

এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, সিস্টেমটা কী রকম? যদি সিস্টেমটা এই রকম হয়, যেখানে মানুষ যা কিছু উৎপাদন করে, তার বিরাট এবং প্রধান শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য। অর্থাৎ যেখানে অ্যানট্রপি বিলটা সৌর শক্তি থেকে পাওয়া যায়– সেই রকম একটি ইকনমিক সিস্টেম। সাধারণত পেজেন্ট ইকনমিক সিস্টেমে এরকম হয়ে থাকে। কারণ এতে আধুনিক যন্ত্রপাতি, আধুনিক শক্তি বা তাপের ব্যবহার নেই বললেই চলে। সূর্য কিরণের ওপর নির্ভর করে ফসলের চাষ, তারপর সেটাকে প্রক্রিয়াকরণের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা হয়। সুতরাং এই রকম সিস্টেম বহুলাংশে সূর্যের শক্তির ওপর নির্ভরশীল। আমাদের ইকনমিক সিস্টেমটা যদি এরকম হত, তাহলে আমাদেরকে অ্যানট্রপি সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হতো না। কিন্তু একটি আধুনিক শিল্পায়িত অর্থনীতি বা আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা আমাদের এই গ্রহের ওপরে এক ধরনের disorder চাপিয়ে দিচ্ছে। এই disorderটা হচ্ছে একদিকে ডিপ্লিশনের আরেকদিকে পলিউশনের। অর্থাৎ একদিকে সম্পদের ক্ষয় অন্যদিকে দূষণ। এর ফলে ইকোসিস্টেমের মধ্যে যে life support service আছে, সেটা এই ডিজর্ডারগুলোর ফলে বিভিন্ন প্রাণীর, প্রকৃতির বিভিন্ন বায়োজিওকেমিক্যাল প্রডাক্টসের ক্ষতি করে। আমরা যখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করি, তখন আমরা উৎপাদনের মাত্রা বাড়াই। কিন্তু এটা করতে গিয়ে যে ডিপ্লিশন এবং পলিউশন এর উদ্ভব হয় সেই ক্ষতিটাকে cost of growth হিসেবে আমাদেরকে কাউন্ট করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেটা বাংলাদেশই হোক বা পৃথিবীর যে অন্য কোন দেশই হোক, ইকনমিক গ্রোথ মেজার করার সময়ে আমরা কস্ট অফ গ্রোথ বিবেচনা করি না। এমনকি এই ক্ষতিগুলো নিবারণ করার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা আমরা নিই সেগুলোও আমরা প্রবৃদ্ধির অংকের সঙ্গে যোগ করি। কাজেই বর্ধিত উৎপাদন দিয়ে আমরা যে সত্যিকার অর্থে কতটুকু কল্যাণ অর্জন করছি, সেটা আমরা বুঝতে পারি না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যদি বুঝতে না পারি যে, সমপরিমাণ কাঁচামালের সঙ্গে সমপরিমাণ বর্জ্যের বিরাট পার্থক্য আছে, তাহলে অর্থনীতির কল্যাণটা কী হবে? এবং এই পার্থক্যের যদি পরিমাপ করা হয় অ্যানট্রপির মাধ্যমে, এ ক্ষেত্রে ইকনমিস্টরা ল' অব থার্মোডায়নামিক্সের ফার্স্ট ল' বুঝেছেন। অর্থাৎ ল' অব কনজার্ভেশন অব ম্যাটার এ্যান্ড এনার্জি। বস্তু এবং শক্তির যে অবিনাশী রূপ। কিন্তু থার্মোডায়ানামিক্সের আরেকটি সূত্র আছে। সেটি হচ্ছে তার তৃতীয় সূত্র– বস্তু বা শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যখন প্রবেশ করে, তখন সেটা এক ধরনের নিঃশেষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। সেটাকে আবার তার মূল রূপে ফেরত নিয়ে আসা যায় না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিচারে আমরা অনেক সময়ে এটা বিবেচনায় আনি না। কিন্তু হাল আমলের ইকনমিস্টরা এই জিনিসটা বিশেষ করে অ্যানট্রপি কনসেপ্টটির ওপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। ঠিক বাজারে যেভাবে বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে এটা যে একটি বাধা তা নয় এবং সেটার কোন বিকল্পও নয়। মার্শাল বলেছিলেন, Man cannot create material things. His efforts in sacrifices result in changing the form or arrangement of matter to adopt it better for the satisfaction of his wants. As it is production of material products, is really nothing more than a rearrangement of matter which gives it new utilities. So it's consumption of them is nothing more than a disarrangement of matter which destroys its utilities. যদি মার্শালের এই সংজ্ঞার মধ্যে থেকে আমরা থার্মোডায়নামিক্সের ল'টাকে না বুঝতে পারি, তাহলে আমরা কিন্তু একটা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যাব। সুতরাং ম্যাটার এবং এনার্জি একটি আইসোলেটেড সিস্টেমের মধ্যে হয়তো গ্রো করতে পারে। এবং তার কোন প্রবেশ বা নির্গমণপথ নাও থাকতে পারে। এই রকম একটি ধারণার বশবর্তী হয়েই কিন্তু ইকনমিস্টরা ইকনমিক গ্রোথের মডেল তৈরী করেন। এটা করতে গিয়ে একটা সার্কুলার ফ্লোর কথা তারা বলেন। কিন্তু যখন বাইরের সঙ্গে এর যোগাযোগ ঘটে সেখানে প্রচুর লিকেজেস সৃষ্টি হয় এবং এটাই হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের সমস্যা।

আফতাব আহমাদ :

দ্রুত উন্নয়নের জন্য, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধনের জন্য মানুষ রাতারাতি হাতের কাছে যে সম্পদই পায় তার সর্বোচ্চ ব্যবহার বা সর্বোচ্চ এক্সপ্লয়টেশনের দিকে নজর দেয়। কিন্তু প্রকৃতিতে এমন অনেক সম্পদ আছে, বিশেষ করে খনিজ সম্পদ– সেগুলো কোনোভাবেই নবায়নযোগ্য নয় অথচ ব্যবহারের ফলে এগুলোর ডিপ্লিশন কন্সট্যান্টলি হতেই থাকে। আমরা তেল, গ্যাস, কয়লা এগুলোর কথা বলতে পারি। এখন এগুলো যেহেতু সীমিত এবং নবায়নযোগ্য নয় অথচ অর্থনীতি

www.pathagar.com

এবং মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনে ব্যবহার করা দরকার, সেহেতু এগুলোর আয়ু কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সে ব্যাপারেও মানুষের নজর দেয়া প্রয়োজন। কারণ এটাকে রিসাইকল করা যাবে না। এই সম্পদ ব্যবহার করতে গিয়ে এর যে বাইপ্রোডাক্ট বা এই খনিজ সম্পদের ওপর ভিত্তি করে ভিন্নতর শিল্প কল-কারখানা হতে পারে সে সম্পর্কে যেমন চিন্তা-ভাবনা দরকার তেমনি এই সম্পদ যত কম ব্যবহার করা যায়, অথবা এই সম্পদের বিকল্প নবায়নযোগ্য কোন সম্পদ যদি মানুষ আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করতে পারে, তাহলেই দেখা যাবে, এই ননরিনিউয়্যাবল রিসোর্সের লাইফ স্প্যানটা সম্প্রসারণ করা সম্ভব। পরিবেশের ভারসাম্যের কথা যখন আমরা বলি বা জীবন যাপনের উপযোগী করে পরিবেশকে যদি রাখতে চাই, তাহলে আমাদের এই গ্রহের ক্যারীং ক্যাপাসিটির প্রতি নজর রেখেই মানুষের সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবনের সর্বোচ্চ রূপ রাষ্ট্রকে এমনভাবে তার নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের লাইফ স্টাইল এবং সেই সঙ্গে তারা যে কৃৎকৌশল ব্যবহার করবে, সেটি যাতে natural capacity'র সাথে ব্যালান্স করে এবং সেই balancing-এর ব্যবস্থাপনা যাতে যত্নের সঙ্গে সম্পাদিত হয় সেদিকে যদি লক্ষ্য রাখা। তাহলেই আমার মনে হয়, একটি সঙ্গতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মানুষের জীবন ধারণ করতে গিয়ে মানুষ তার মৌলিক ও vital needs পূরণ করার জন্য ধরিত্রীর সম্পদের ওপর নির্ভর করা যেমন অত্যাবশকীয় মনে করে, তেমনি এ সম্পদ diminished হয়ে যাক বা deteriorate করুক সে risk ও মানুষ নিতে পারে না। আর সে কারণেই ধরিত্রী এবং sustainable living এর জন্য আমাদের অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে।

Sustainability of living-এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত Sustainable Society গড়ে তোলার প্রসঙ্গটি। Sustainable Society গড়ে তোলার অর্থ হচ্ছে উন্নয়নের এমন একটি Strategy নির্ধারণ করা যার দ্বারা মানুষের জীবনের মানের সত্যিকার গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হবে এবং একই সঙ্গে যুগপৎভাবে এই ধরিত্রীর Vitality ও diversity conserve করা সম্ভব হবে। উন্নয়ন কৌশল হতে হবে গণমুখী বা People centred, যে কৌশল মানুষের অবস্থার উৎকর্ষ বিধানে মনোযোগী হবে। এ কৌশল হবে নিত্যতাভিত্তিক বা Conservation based যার ফলে প্রকৃতির Variety এবং Productivity বজায় থাকবে। মানব সমাজ, কৃষ্টি, ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি, Institutions এবং Tradition-এর দিক থেকে সময়ের আবর্তে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে এবং একে অপর থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে। এতদসত্ত্বেও Sustainably বাঁচতে হলে, Sustainable Society গড়তে হলে প্রকৃতি যা replenish করতে পারে না, প্রকৃতি থেকে তার অধিক মানুষ কোন অবস্থাতেই নিতে পারে না। পরিবেশ বিশারদগণ World Conservation Strategy প্রণয়ন করতে গিয়ে নয়টি নীতিমালা enunciate করেছেন Sustainable Society গড়ে তোলা প্রসঙ্গে ঃ Respect and Care for the Community of life, Improve the Quality of life, Conserve the Earth's Vitality and Diversity (Conserve life support systems, Conserve biodiversity and ensure that uses of renewable resources are sustainable), Minimize the depletion of non-renewable resources, Keep within the Earth's Carrying Capacity, Change Personal Attitudes and Practices, Enable Communities to Care for their Own Environments, Provide a National Framework for Integrating Development and Conservation এবং Create Global Alliance. এ নীতিমালাকে কার্যকর করার জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য World ethics দাঁড় করানো অপরিহার্য। মানব জীবন সকল মানব সমাজকে এক সঙ্গে সংগ্রথিত করে, বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মসহ মানবিকতা এবং প্রকৃতির অপরাপর অংশকেও। এ জীবন একই সঙ্গে আলিঙ্গন করে কৃষ্টিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে। প্রত্যেক মানুষের একই মৌলিক ও সমান অধিকার রয়েছে।

www.pathagar.com

Right to life, liberty and security of person: to the freedoms of thought. conscience and religion: to enquiry and expression: to peaceful assembly and association: to participation in Government: to education; and within the limits of the Earth, to the resources needed for a decent standard of living-এ অধিকারগুলো আজ সার্বজনীন অধিকার হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। সার্বজননীভাবে এও স্বীকৃতি যে কোন ব্যক্তি, কমিউনিটি বা নেশান অন্যকে Means of subsistence থেকে deprive করতে পারে না। একই সঙ্গে every life form warrants respect independently of its worth to People আজ ওয়ার্ল্ড এথিকস এর একটি গুরুত্বপূর্ণ element হিসেবে বিবেচিত। মানব উন্নয়ন nature-এর integrity বা অন্যান্য প্রজাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি হলে চলবে না।

মানুষের পুরনো মূল্যবোধ, তার যে আচার ব্যবহার সেগুলোরও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তন আনা বা পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা দরকার। সমাজ একটি নির্দিষ্ট ধরনের জীবন প্রণালীকে উৎসাহিত করতে পারে কী না বা একটি নির্দিষ্ট ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করাটাকে উৎসাহিত করতে পারে কী না- যেমন ধরুন, আমরা জ্বালানির জন্য গ্যাস ব্যবহার করি, এখন যখন তখন গ্যাসের চুলা খুলে রাখা বা যখন আমার উনুনের কাজে প্রয়োজন নেই তখন গ্যাস চুলা জ্বালিয়ে রাখা- এই যে অপরিমিতির একটি ব্যাপার আমাদের আচার-আচরণের মধ্যে অনেকটা মজ্জাগত হয়ে গেছে- এটিরও পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। প্রকৃতি দত্ত এই Scarce resources আমরা কত frugally, efficiently ব্যবহার করতে পারছি সে বিষয়ে আমাদের সবিশেষ যত্নবান হতে হবে। সেই সাথে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা যদি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করতে না চাই, দূষণমুক্ত থাকতে চাই, তাহলে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, উদ্ভিদ থেকে শুরু করে প্রাণীজগতের যতরকম অর্গানিজম বা প্রজাতি আছে এবং এসব প্রজাতির জেনেটিক স্টকসের যতগুলো রেঞ্জ আছে, এগুলোকে রক্ষা করতে হলে জীব বৈচিত্র্যের ব্যাপারে আমাদের অধিকতর যত্নবান হতে হবে। সে কারণে ইফেকটিভলি কতগুলো অ্যাকশন প্রোগ্রাম এবং precautionary approach মানুষকে সজ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে। সেটি হচ্ছে, আমরা এমন সব কর্মকাণ্ড নিরুৎসাহিত করব, যেসব কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ু দূষণ এমন পর্যায়ে চলে যায়, যাতে ওজন লেয়ারে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং গ্রীন হাউস ইফেক্ট তৈরী হতে পারে। যার ফলে এই গ্রহে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠবে, মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে। সেই জন্য সজ্ঞানে আমাদের কতিপয় ইন্টারভেনশনিস্ট অ্যাকশন প্রোগ্রাম নেয়া দরকার। যেমন সালফার ডাই-অক্সাইড এমিশন যত কম হয়, সে ব্যাপারে আমাদের নজর দেয়া দরকার। নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন এমিশন যাতে কম হয় সেদিকে আমাদের নজর দেয়া দরকার। ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা মিথেন এমিশন যদি আমরা রিডউস করতে না পারি, তাহলে পৃথিবীর ইকোসিস্টেমটাই কিন্তু বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমাদের আসলে একটি সমন্বিত এ্যাপ্রোচ, যেটাকে বলে ইনটিগ্রেটেড এ্যাপ্রোচ নেয়া দরকার- ভূমিসম্পদ, পানিসম্পদ, খনিজসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব drainage basinসমূহকে স্বাভাবিক ইউনিট হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কারণ একটি drainage basin-এর ভূমি ও পানির ব্যবহার পানির Quality এবং Flowকে affect করে। পানি নীতি নির্ধারিত হতে হবে drainage basin carrying'র মূল্যায়নের ওপর। Deforestation কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে। বিপুল বনাঞ্চল, temperate rainforests, temperate grasslands, tropical dry forests এবং tropical moist forests সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। Modified forest estate স্থায়ীভাবে গড়ে তোলাও জরুরী। বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী বিশেষ করে বিরল প্রজাতিসমূহের conservation-এর ওপর গুরুত্বারোপ করে এ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা খুবই জরুরী। এসব প্রজাতি এবং ইকোসিস্টেম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকেও আরও উন্নত ও

www.pathagar.com

সমৃদ্ধ করা সমভাবে জরুরী। এক কথায়, আমার মনে হয় একটি কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যান নিয়ে যদি আমরা অগ্রসর না হই, তাহলে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হবে এবং তাতে প্রতিবেশ ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আমাদের স্বাভাবিক জীবন বিপন্ন হবে।

মাহবুব উল্লাহ :

এখন পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, সেটা Global 2000 নামে একটি রিপোর্টে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করা হয়েছিলো। সেখানে দেখানো হয়েছে ২০৩০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১০ বিলিয়নে। ২১ শতকের শেষ দিকে এটা হবে ৩০ বিলিয়ন। US National Academy of Science-এর হিসাব অনুযায়ী সারা পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতাকে এটা ছুঁয়ে ফেলবে বা অতিক্রম করবে। পাশাপাশি রিনিউয়্যাবল রিসোর্স বলতে আমরা যেগুলোকে বুঝি যেমন– বন, মৎস্য সম্পদ, শস্য ভূমি, তৃণভূমি এগুলোরও মাথাপিছু উৎপাদন একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং ইদানীংকালে এহার ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে। এর পিছনে একটি বড় কারণ হচ্ছে, ফসিল ফুয়েলে আমরা যে সাবসিডি দেই, তার ফলে এগুলোর প্রোডাকশন যে হারে কমার কথা সে হারে কমছে না। কিন্তু যদি সাবসিডি উইথড্র করা হয়, তাহলে সেটা আরো দ্রুত নেমে আসবে এবং দেখা যাবে, পৃথিবীতে আর কোন যাবার মত দিগন্ত নেই, কোন শূন্য মহাদেশ নেই এবং কোন ইনফিনিট সোর্সও নেই। একমাত্র জায়গা, সেটা হচ্ছে হায়ার ফ্রন্টিয়ার বা আউটার স্পেসে যাওয়া। যেটা একেবারেই অসম্ভব। আমি এথিকোসোশাল লিমিট সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলে শেষ করতে চাই। সেটা হচ্ছে, প্রথমত, প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে গিয়ে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কী ধরনের খরচের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি? দ্বিতীয়ত, এই প্রবৃদ্ধি করতে গিয়ে আমরা বনাঞ্চল ধ্বংস করছি এবং অন্যান্য হ্যাবিট্যাটগুলোকে ধ্বংস করে শহর-নগর, বাসগৃহ গড়ছি। অন্য প্রাণীর বেঁচে থাকার অধিকারকে আমরা বিনষ্ট করছি। এটা নৈতিক দিক দিয়ে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? তৃতীয়ত, প্রবৃদ্ধিরও একটি সেলফ ক্যানসেলিং এফেক্ট আছে বিশেষ করে ওয়েলফেয়ারের ওপর। সেটা সম্পর্কে আমরা কতটা সচেতন? এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের নৈতিকতার মান যেটা ফাস্টার গ্রোথ এবং কনজুমারিজমের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে, সেটার মূল কারণ হচ্ছে নিজেকে বড় করে দেখানোর প্রবণতা, বড়াই করা এবং সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীটাকে একটি সায়েন্টিফিক টেকনোক্র্যাটিক অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা, অন্য কোনরকম স্পিরিচুয়াল এবং মরাল ভ্যালুজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না দেখা। এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে প্রতিবেশ নৈতিকতার বিরোধী এবং এ ব্যাপারে আমাদের প্রখরভাবে সচেতন হতে হবে। আজ বাংলাদেশে কী হচ্ছে? বুড়িগঙ্গা দখল করে তার জায়গা কাঠাপ্রতি বিক্রি করা হচ্ছে। বুড়িগঙ্গার মৃত্যু ঘটছে। সিলেটের হাওর টাংগুয়ার হাওরকে লিজ দিয়ে ব্যক্তি মালিকানায় তুলে গিয়ে সেখানকার জীব বৈচিত্র্য, সেখানকার অরিজিনাল কনডিশনকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করা হয়েছে। বিখ্যাত চলনবিল আজ আর নেই। তার মৃত্যু ঘটেছে। তার সঙ্গে মৃত্যু ঘটেছে বহু প্রজাতির মাছের, প্রাণীর, মৃত্যু ঘটেছে একটি বিরাট প্রাকৃতিক বৈচিত্রপূর্ণ জলাশয়ের। সুন্দরবনের অভয়রাণ্যেও কিন্তু হরিণ বধ চলছে নির্বিচারে। আর অন্যদিকে দেশের বাইরে বিশেষ করে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরকমভাবে বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে। তার উপরে আছে পলিথিনের মত ননবায়োডিগ্রেডেবল উপকরণের ব্যবহার। এর ফলে আমাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। এছাড়া যানবাহনের ধোঁয়াও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না– এর ফলে বহু রোগ-ব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইসব কিছুই আমাদেরকে একটি বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশ ছোট ও জনবহুল দেশ। আমার তো মনে হয়, ইতোমধ্যেই এই দেশটি তার ক্যারিং ক্যাপাসিটির শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। এখন থেকেই এ ব্যাপারে কোনরকম কারেকটিভ মেজার নেয়া না হলে এই দেশ নিজ থেকেই হয়ত বসে পড়বে।

www.pathagar.com

১৪ নভেম্বর ১৯৯৯

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যার ব্যাপারে আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি। সেখানে শিক্ষার গুণগত মানের অবক্ষয়ের কারণগুলো নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। এর পাশাপাশি আমরা পরীক্ষা পদ্ধতি বা Student Evaluation System সম্পর্কেও কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছিলাম। আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব পরীক্ষায় দুর্নীতি, গণটোকাটুকি, নকল প্রবণতা ইত্যাদি নিয়ে। এই সমস্যা আমাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটা কর্কট ব্যাধির মত এবং এই সমস্যার যদি কোন সমাধান আমরা খুঁজে না পাই, তাহলে আমরা কোনক্রমেই শিক্ষার গুণগত মানকে উন্নত করতে পারব না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সমস্যার স্বরূপটা কী এবং এই সমস্যা ক্রমান্বয়ে মহামারি আকারে কেন ছড়িয়ে পড়ছে এবং এই সঙ্কট বা সমস্যা থেকে উত্তরণের আদৌ কোন পথ আছে কী না। সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কথা বলতে পারি। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে গিয়ে দেশের কলেজগুলোতে যে ডিগ্রী পরীক্ষা হয়, তাতে যে ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করা হয়, সে সম্পর্কে একজন পরিদর্শক হিসেবে বা ভিজেলেন্স টিমের সদস্য হিসেবে যেসব অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি, সেগুলোর ওপর কিছুটা আলোকপাত করা যায়। যেমন- ১৯৯১ সনে কলেজ শিক্ষকরা একবার ধর্মঘট করলেন। তারা ডিগ্রী পরীক্ষায় ইনভিজিলেশনের কাজ করবেন না। ফলে আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে এই কাজে যেতে হল। আমি চট্টগ্রামের একটি কলেজে গেলাম। আমার সাথে কয়েকজন সহকর্মীও ছিলেন। সেদিন যে বিষয়ে পরীক্ষা হচ্ছিল, সেটা ছিল অত্যন্ত সহজ। কমার্সের একটি বিষয়। সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স। কীভাবে বিজনেস লেটার লিখতে হয়, করসপন্ডেন্স করতে হয়, এই সংক্রান্ত বিষয়। ঐ কলেজটিতে যাবার পরে আমরা টের পেলাম যে, প্রায় প্রত্যেকটি পরীক্ষার্থী বিভিন্ন নোট বইয়ের পাতা ছিঁড়ে তাদের দেহের বিভিন্ন জায়গায় রেখে দিয়েছে নকল করার জন্য এবং সেই কলেজটি আইন শৃঙ্খলার বিচারেও বেশ চিহ্নিত একটি কলেজ। তখন আমি এবং আমার সহকর্মীরা বললাম, আমরা জানি, তোমাদের কাছে অবৈধ কাগজপত্র রয়েছে। এগুলো তোমরা স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিলে তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব না। তোমরা ১০ মিনিটের মধ্যে এগুলো দিয়ে দাও। তারপরে লক্ষ্য করা গেল,এমন একটি পরীক্ষার্থী ছিল না, যার কাছে ঐ ধরনের কাগজপত্র ছিল না। কেউ পকেট থেকে, কেউ আন্ডারওয়্যারের মধ্য থেকে, কেউ হাঁটুর নিচ থেকে, কেউ জামার আস্তিন থেকে কিংবা গেঞ্জির নিচ থেকে এই সমস্ত কাগজপত্র বের করা শুরু করল। শেষে এই কাগজপত্রের পরিমাণ যে এত বিশাল হবে সেটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। পরে দুই মণ ওজন বহন করতে পারে, এমন দু'টি বস্তা জোগাড় করা হল এবং বস্তা দু'টি পূর্ণ হয়ে গেল। এই হচ্ছে নকলের অবস্থা।

আরেক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, যখনই এই ধরনের পাবলিক এগজামিনেশন হয়। তখন লক্ষ্য করা যায়, পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কী না সে ব্যাপারে সাহায্যের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ডেপ্লয় করা হয়। তাদের সহায়তায় কিছু পুলিশ ও আনসার বাহিনীর লোকও থাকে। ম্যাজিস্ট্রেটরা সার্বক্ষণিকভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারেন না। তারা এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে ছোটাছুটি করেন। কিছু কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রে এক ধরনের সাংকেতিক ভাষা বা ইঙ্গিত প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। ম্যাজিস্ট্রেট কেন্দ্রের গেটে এসে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে এই সাংকেতিক ইঙ্গিতের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা তাদের

www.pathagar.com

অবৈধ কাগজপত্র সরিয়ে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে আগে থেকেই ম্যাজিস্ট্রেট আসার খবর পেয়ে যায় নকলবাজরা। এ ধরনের ঘটনা ঘটা সম্ভব হয়, যদি কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নকলকারী পরীক্ষার্থীদের একটি যোগসাজশ থাকে। অর্থাৎ সেখানে শিক্ষকরা একটি ন্যাককারজনক অনৈতিক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া টেবিলে বা বেঞ্চে লিখে রাখা, আগের দিনের প্রশ্নপত্রের ওপর ক্ষুদ্রাক্ষরে লিখে রাখা– এসব মাধ্যমেও নকল করা হয়। আমাকে বেশ কয়েকবার এইসব পরীক্ষা সংক্রান্ত ডিসিপ্লিন কমিটির প্রধান হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছি, পরীক্ষায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে কাউকে শাস্তি দিতে গেলে কিছু প্রমাণাদির প্রয়োজন হয়। ঐ সময়ে যে সমস্ত পরীক্ষার্থীর খাতা নকলের প্রমাণসহ হাজির করা হয়েছে তাতে অদ্ভুত সব নকলের উপকরণ লক্ষ্য করেছি। স্কেলের ওপর, জ্যামিতি বক্সের মধ্যে হোমিওপ্যাথির পুরিয়ার মতো ক্ষুদ্র কাগজে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে নকল লিখে রাখতে দেখেছি এবং এগুলো করার জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে বহু কসরত করতে হয়েছে। সাদা বলপেন বা পেন্সিলের গায়েও খুব সূক্ষ্মভাবে কোন সূচালো জিনিস দিয়ে নকল লিখে রাখা হয়। অনেকগুলো বলপেন বা পেন্সিল নিয়ে যাওয়া হয় এবং তা থেকে দেখে লেখা হয়। আবার পরীক্ষার সময়ে অনেক পরীক্ষার্থীর প্রকৃতির ডাক খুব বেড়ে যায়। ঘন ঘন তারা বাথরুমে যায়। পরীক্ষা কেন্দ্র সংলগ্ন বাথরুমগুলো ইনসপেকশন করে দেখা গেছে যে, সেখানে গিয়ে তারা লুকিয়ে রাখা নোটবই বা নকলের মোড়ক থেকে প্রয়োজনীয় উত্তর জেনে আসে। এছাড়া সকলের কাছে খ্যাত বেশ কিছু পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে দেশে। সেসব কেন্দ্রে নকলের জন্য বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। লক্ষ্য করা যায়, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে অনেকেই নানা অজুহাতে পরীক্ষা কেন্দ্র বদল করে ঐসব সুনির্দিষ্ট বা চিহ্নিত কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে থাকে। আমি এমন একটি কলেজের বিজ্ঞাপন দেখেছি, যাতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, এই কলেজে পরীক্ষা দেয়ার সকল প্রকার সুব্যবস্থা আছে। একথাটাকে সুন্দরভাবেও ব্যাখ্যা করা যাবে আর কিছুটা বক্রভাবেও দেখা যায়। সুব্যবস্থা বলতে যদি বুঝায় যে, পরীক্ষার্থীরা গিয়ে সেখানে থাকার এবং পড়াশোনার নিরিবিলি পরিবেশ পাবে–সেটাকে বলা যায় সুব্যবস্থা। আসলে এখানে ইঙ্গিতে বলা হচ্ছে, এই সুব্যবস্থাটা হল নকল করার সুব্যবস্থা। এবং এরই সুবাদে ঐ সমস্ত কলেজে বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর ঢল নামে। সারা বছর যত ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়ে, পরীক্ষার সময় দেখা যায় যে, তার ৫ থেকে ১০ গুণ পরীক্ষার্থী হয়ে গেছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মেয়ে পরীক্ষার্থীরা তাদের শরীরের এমন সব জায়গায় নকল বহন করে, যেটা ধরতে গেলে শালীনতা বোধে বাধে। এই হচ্ছে নকল করার বিভিন্ন ধরন। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, শুধু এই নকলের কাজটি করতে গিয়ে তারা যে পরিশ্রম করে, ঠিক সেটুকু পরিশ্রমই যদি পড়াশোনার কাজে ব্যয় করত, তাহলে তাকে পাস করার জন্য দুশ্চিন্তায় ভুগতে হত না। এছাড়া নকলের অবৈধ কাগজপত্রগুলো কোন ভাল পাঠ্যবই থেকে সংগ্রহ করা হয় না। এগুলোর বেশরিভাগই এক ধরনের সংক্ষিপ্ত নোট, শিওর সাকসেস জাতীয় নোট গাইডের কাটিং। এছাড়া আরো এক ধরনের নকলেরও সুবিধা আজকাল প্রযুক্তির কল্যাণে হয়েছে। এটাকে বলা হয় টেকনিক্যাল গাইড বুক। এটা হচ্ছে এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র কম্পিউটার টাইপে একেবারে পকেট সাইজ নোটের মধ্যে তাবৎ বিষয় ছাপানো এক ধরনের গাইড বই, যা সাধারণত খোলাবাজারে বিক্রি হয় না। নির্দিষ্ট কিছু মার্কেট ও দোকানে গিয়ে আকারে ইঙ্গিতে বা কানে কানে ফিসফিস করে বললেই এগুলো বের করে দেয়া হয়। এগুলো নকলের জন্য বহন করা খুব সহজসাধ্য এবং এইসব টেকনিক্যাল গাইডের সাথেও কিন্তু জড়িত রয়েছে অনেক শিক্ষক। সুতরাং সমস্যাটা যে কত প্রকট এবং এর প্রকরণ যে কত অদ্ভুত সেটা বলে বোঝাবার অবকাশ নেই। বাংলাদেশে ব্রিটিশ বা পাকিস্তান আমলেও হয়ত নকলের প্রচলন ছিল। কিন্তু সেটা ছিল একটি ক্বচিৎ, কদাচিৎ ব্যাপার। এত বিশাল বা ব্যাপক রূপ এর ছিল না। কিন্তু ১৯৭২ সালের পর থেকেএই নকল এত মহামারি আকারে দেখা দিল যে, এখন সবাই যেনতেনভাবে সার্টিফিকেট আদায় করতে

www.pathagar.com

চায় এবং দেখা যায়, যে মেয়েটি কোনদিনই এসএসসি পাস করতে পারত না, সেভেন-এইটে পড়ত, সেও ঐ ১৯৭২-৭৩-এর পরীক্ষার সুবাদে সরাসরি এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে দিল এবং পাসও করল। এতে তার জ্ঞানগরিমা বাড়ল কি কমল, সেটা বড় কথা নয়, তবে এর মধ্যদিয়ে তার জন্য 'পাত্র' জোগাড় করার একটি সুযোগ হয়ে গেল। এখন, আমাদের শিক্ষাবিদরা নকল প্রবণতা সম্পর্কে নানা কথা বলেন, কিন্তু এটাকে কীভাবে রোধ করা যায়, এ থেকে আমরা কীভাবে বেরিয়ে আসতে পারি, সে ব্যাপারে কখনোই কিন্তু কোন সুষ্ঠু চিন্তা-ভাবনা হয়নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে কিংবা ভিজিলেন্স টিম পাঠিয়ে, সরকারী কোষাগারের লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে নকল প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার যে চেষ্টা, সেটা লোক দেখানো একটা কসরত মাত্র। এভাবে কখনোই নকল প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হবে না, যদি আমরা পরীক্ষা পদ্ধতিতে একটি বিরাট, বিপুল সংস্কার আনতে না পারি এবং সেই সংস্কারটার স্বরূপ কী হতে পারে সে সম্পর্কে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে।

আমি এ প্রসঙ্গে ছোট দু'টি মারাত্মক দৃষ্টান্ত দিতে চাই। কয়েক বছর আগে চট্টগ্রামে দেখা গেল, এক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র বোর্ডের পরীক্ষায় ফার্স্ট হল। কিন্তু সে যখন কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেল, তখন সে কোয়ালিফাই করতে পারল না। কারণ জানা গেল যে,এসএসসি পরীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নপত্রের উত্তরপত্র বাইরে থেকে লিখে বোর্ডের অফিসিয়াল চ্যানেলে এই পরীক্ষার্থীর কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং এজন্য তার পিতা বিপুল অংকের টাকা খরচ করেছিলেন। সম্প্রতি আরেকটি ঘটনা আমি শুনেছি। একটি বোর্ডের পরীক্ষায় দেখা গেল ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড তিনটি পজিশন পেয়েছে একটি স্কুলের পরীক্ষার্থীরা। অথচ বাস্তবে নাকি তারা পরীক্ষার হলেই ছিল না, তারা পরীক্ষাই দেয়নি। কিন্তু তাদের পরীক্ষা হয়েছে, উত্তরপত্র তৈরী হয়েছে এবং ইভ্যালুয়েশনে তারা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান পর্যন্ত অধিকার করেছে। ঘটনা যখন এমন ঘটল, এই সম্পর্কে জানাজানি হয়ে গেল, তখন ফল প্রকাশের ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ অনীহা প্রকাশ করতে শুরু করল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের ওপর উর্ধ্বতন মহল থেকে চাপ আসল ফল প্রকাশ করার জন্য। তখন সংশ্লিষ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান কিছুটা নৈতিকতা বা বিবেকের তাড়না থেকে বললেন, এই রেজাল্ট পাবলিশড হওয়ার আগে আমাকে আমার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক। জানি না, ঘটনার সুরাহা শেষ পর্যন্ত কী ভাবে হয়েছে। তবে এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার চালচিত্র এবং এটা আমাদের দেশ, জাতি, সমাজের জন্য কি সর্বনাশ ঘটাচ্ছে, সেটা কিন্তু আমরা কেউই প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারছি না। বুঝতে চাচ্ছি না। যে কোন উপায়ে বা যে কোন অর্থমূল্যের বিনিময়ে আমরা এই যে সার্টিফিকেট লিপ্সায় মেতে উঠেছি। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের বিষয়টি যে কত গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দাবি করে, সেটা বুঝিয়ে বলার কোন অবকাশ নেই বললেই চলে।

আফতাব আহমাদ :

আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই এখন বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে বলে আমার মনে হয় এবং শিক্ষার বিষয়ে আমার খুব একটা নজর দিচ্ছি বা খুব একটা যত্নবান হচ্ছি কিনা, সে ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এই আত্মবিনাশী কাজ থেকে আমরা যদি বিরত না হই, তাহলে এই জাতিকে রক্ষা করা যাবে না। পরীক্ষায় নকল প্রবণতা, অসদুপায় অবলম্বন ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা যত কথাই বলি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াতে নজর দেয়া দরকার। আজকাল যারা বিদ্যায়তনে বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় এদের অধিকাংশই কিন্তু জ্ঞানের স্পৃহা দ্বারা পরিচালিত হয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য ভর্তি হতে আসে না। ড. মাহবুব উল্লাহ, আপনি উল্লেখ করেছেন, সবাই যেনতেনভাবে একটি সার্টিফিকেট আদায় করতে চায়। এই সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষাকে একদিকে অভিভাবকরা উৎসাহিত করছেন। সমাজের অধিপতিরা এবং খোদ রাষ্ট্রও উৎসাহিত করছে। কারণ, এর ব্যতিক্রম ঘটানো এবং শিক্ষাকে একটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিন্যস্ত করার জন্য কোন উদ্যোগ এখন পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করিনি। এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে আমরা যদি যত্নবান না হই তাহলে ভবিষ্যৎ আমাদেরকে যে কী উপহার দেবে, সেটা ভাবতে গেলে যে কোন বিবেকবান মানুষকে শিউরে উঠতে হয়।

নকলের কথা আমরা বলছি। পরীক্ষার্থীরা নকল করে কেন? সারা বছর যদি সুষ্ঠুভাবে ক্লাস হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতিটা যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি,উপস্থিতিটা যদি প্রপারলি মনিটরিং করতে পারি, শিক্ষক ক্লাসে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান করেছেন কী না, যদি আমরা মনিটর করতে পারি, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকতায় শিক্ষকদের জবাবদিহিতার একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা ছাড়া তার আর বিকল্প কোন পথ থাকবে না। কয়েক সপ্তাহ আগে আমরা যখন শিক্ষার ওপর আলোচনা করছিলাম, যেখানে একটি উদাহরণ তখন আমি দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি যুগপৎভাবে চালু আছে। আইবিএতে সেমিস্টার পদ্ধতি এবং অন্যান্য বিভাগ ও ইন্সটিটিউটগুলোতে সাধারণ কোর্স সিস্টেমে বছরান্তে পরীক্ষা পদ্ধতি। আইবিএ'র সেমিস্টার সিস্টেমে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে ক্লাস ফাঁকি দেয়া যেমন সম্ভবপর হয় না, তেমিন অনেক কষ্ট করে হলেও তাদেরকে মৌলিক বইগুলো পড়তে হয়। ১৯৭২ থেকে এ পর্যন্ত আমাদের সমাজে যে প্রবণতাগুলো গড়ে উঠেছে, তার একটি হচ্ছে সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষা, আরেকটি হচ্ছে এক অসাধারণ জনতুষ্টিবাদী প্রবণতা। ১৯৭২-এ যখন শিক্ষার্থীরা দাবী করলো 'আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি অতএব, আমাদেরকে অটো প্রমাশন দেয়া হোক' অর্থাৎ বিনা পরীক্ষায় আমাদেরকে উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া হোক। অর্থাৎ আমি যদি এসএসসি পরীক্ষার্থী হই, বিনা পরীক্ষায় আমাকে এসএসসি সার্টিফিকেট দেয়া হোক। এইচএসসির পরীক্ষার্থী হলে বিনা পরীক্ষায় এইচএসসি সার্টিফিকেট দেয়া হোক। অনার্সের পরীক্ষার্থী হলে বিনা পরীক্ষায় অনার্স সার্টিফিকেট দেয়া হোক। মাস্টার্সের পরীক্ষার্থী হলে বিনা পরীক্ষায় মাস্টার্স সার্টিফিকেট দেয়া হোক। এই ধরনের একটি আজগুবি আবদার বা দাবী যেদিন উত্থাপিত হয়েছিল, যা পুরোপুরি কার্যকর করা যায়নি, বিরোধিতা অনেকেই করেছিলেন– অনেক শিক্ষাবিদ, সমাজ সচেতন ব্যক্তি, ছাত্রদের মধ্যে বিবেকবান একটি বিরাট অংশও সেদিন প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু অটোপ্রমোশনের বিষয়ে যখন নীতিগতভাবে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, তখন দেখা গেল, পরীক্ষায় যখন ছাত্র-ছাত্রীরা অসদুপায় অবলম্বন করছে, তখন উপরমহল থেকে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সর্বত্র আকারে-ইঙ্গিতে বলা হয়েছে 'এটা ওভারলুক কর।' কারণ, এইসব ছাত্ররা হল 'সোনার ছেলে'। এরা 'মুক্তিযুদ্ধে' 'অবদান' রেখেছে। আমার জানা মতে, পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসেএ ধরনের কোন নজির নেই যে, মুক্তি সংগ্রাম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেমন সারা ইউরোপে ওয়ার অব রেজিস্টেন্স-এ যারা অংশ নিয়েছে, তাদেরকে এই ধরনের অসদুপায়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কোন ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছিল। এমন নজির পাওয়া যাবে না। এর দ্বারা আমরা আমাদের সমাজ, জাতি, আমাদের ভাই-বোন, সন্তানদের যে ক্ষতি করলাম, সেটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেদিন পরিমাপ করবে, সেদিন আমাদের উদ্দেশ্যে অভিশাপ দেয়া ছাড়া তাদের আর কিছু করার থাকবে না।

একটি জিনিস লক্ষ্য করার যে, আমাদের দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী গণমাধ্যম বেতার ও দূর-প্রেক্ষণে এখনও নিয়মিত শিক্ষা বিষয়ক কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় এবং সেখানে কী করা হয়? জ্ঞান বিতরণ করার পরিবর্তে কিংবা একটি বিশেষ কনসেপ্ট বা বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে ব্যাপক চুলচেরা আলোচনা করার পরিবর্তে সেখানে বলা হয়, "এসএসসি পরীক্ষার্থী ভাই-বোনেরা, পরীক্ষা সন্নিকটে। পরীক্ষার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও– কীভাবে পরীক্ষা দিতে হবে," ইত্যাদি বলে তাদেরকে একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মতো দেখিয়ে দেয়া হয়, যেমন– তোমাদের হাতে এত মিনিট সময় আছে, এর মধ্যে এতগুলো উত্তর লিখবে, সেইভাবে সময় বরাদ্দ করবে ইত্যাদি। অর্থাৎ তাকে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে উৎসাহিত না করে, কোন্ বই, কোন্ প্রবন্ধ পড়তে হবে, কোন্ বইয়ে একটি বিশেষ বিষয় সবচাইতে ভাল আলোচনা করা আছে, সেই সম্পর্কে তাকে কোন রেফারেন্স

www.pathagar.com

না দিয়ে কীভাবে চটজলদি একটি উত্তর সে লিখবে এই টেকনিকালিটিগুলোর ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এক কথায় বলে দেয়া হচ্ছে, লেখাপড়ার দরকার নেই, কতগুলো প্রশ্ন মুখস্ত কর এবং এই প্রশ্ন আসলে এইভাবে উত্তরটা লিখবে। নোট বইগুলো এভাবেই লেখা হচ্ছে। যেটা ড. মাহবুব উল্লাহ বললেন, টেকনিক্যাল নোট বইয়ের কথা। এগুলো যে শুধু কিছু সংখ্যক শিক্ষক লেখেন, তাই নয়, আমার জানা মতে, প্রকাশকরা বিএ, এমএ পাস অনেক বেকার যুবকদেরকে দিয়ে এগুলো লেখায়, সেই সঙ্গে প্রকাশকরা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের অনেক শিক্ষকের নামও ভাড়া করে। নামটি ব্যবহার করার জন্য তাঁকে যৎসামান্য 'সম্মানী' দেয়া হয়। যে নোট বইয়ের প্রচলন আমাদের দেশে হয়েছে, এটাকে যদি প্রতিরোধ করা না যায়, তাহলে আমার মনে হয়, শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা কোন ধরনের সংস্কারই আনতে পারবো না। এখানে একটি কথা বলা দরকার, আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড বই বলতে যা বোঝায়, তা আশানুরূপভাবে এখনো লেখা হয়ে ওঠেনি। একেবারে যে হয়নি তা নয়। কিছু কিছু হয়েছে। তবে ব্যাপকভাবে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আজকে যেভাবে বিস্তার লাভ করছে তাকে বিবেচনায় রেখে এসব শাখা-প্রশাখায় আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কোন গ্রন্থ নেই। এর ফলে কিন্তু আমরা আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করছি, সীমান্তের ওপার থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলায় লেখা কিছু বই দেদারসে আমাদের দেশে ঢুকে পড়ছে এবং ছেলে-মেয়েরা সেইসব বই পড়ছে। এইসব বই যে মারাত্মক ক্ষতিগুলো করছে, তাহলো মৌলিক বইগুলোর দিকে আমাদের ছেলে-মেয়েদের আকর্ষণ কমিয়ে দিচ্ছে।

একদিকে সহজ ডিগ্রী লাভের প্রবণতা, অন্যদিকে না পড়ে, কম পড়ে, কোন রকমে পরীক্ষা পার হয়ে, তারপরে নিজেকে একজন বিদ্বান হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা, এগুলোই আমাদের মূল সমস্যা।

এখন অনেকেই হয়ত বলবেন যে, শিক্ষকরা কেন বই লেখেন না বা যারা জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিতজন তারা কেন মৌলিক বই লেখেন না? কেন লেখেন না, সেটা হয়ত আমরা বারান্তরে আলোচনা করতে পারব। আলোচনা করতে পারবো সমস্যাগুলো কী। কিন্তু এই সমস্যা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই যে একটি পিকুলিয়ার সমস্যা তা নয়। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রায় সকল দেশেরই এটি একটি বিরাট সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধান কিন্তু খুব সহজভাবে করা যায়। ফিডেল ক্যাস্ট্রো কিউবার ক্ষেত্রে এই সমাধানটা এত চমৎকারভাবে করেছেন যে, এটি আজকে প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে আলোচনা করা দরকার। ক্যাস্ট্রো দেখেছিলেন, একদিকে যেমন বিপুল নিরক্ষরতার চাপ, আরেকদিকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তার দেশের যেসব শিক্ষক এবং পন্ডিতজনেরা আছেন, তারা ভেবে-চিন্তে, গবেষণা করে কবে একটি মৌলিক বই লিখবেন এবং সেই বই পাঠ করে দেশের নাগরিকরা কবে বিদ্বান, পণ্ডিত, জ্ঞানবান হবে সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে উন্নত বিশ্বে যেসব বই লেখা হয়েছে ইতোমধ্যে, সেইসব বইপত্র জাহাজ বোঝাই করে কিউবাতে নিয়ে আসলেই সমস্যার আপাতত একটি সমাধান হয়ে যায়। বিশ্বের তাবত দেশ থেকে বই আমদানী করার তিনি ঢালাও নির্দেশ দিলেন। প্রতিটি দূতাবাসকে বলা হল, স্প্যানিশ বা ইংরেজী ভাষায় যত রকমের টেকনিক্যাল বই পাওয়া যায়, উন্নততর, কারিগরি, বিজ্ঞান সম্পর্কিত যে সমস্ত বইপত্র পাওয়া যায়, সেগুলো জাহাজ বোঝাই করে পাঠিয়ে দিতে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঔপনিবেশিকতার কারণে কিউবার আদি ভাষা লুপ্ত হয়ে যায়। দেশটি এখন স্প্যানিশভাষী। দেশ-বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণের বইপত্র নিয়ে আসা হল এবং ব্যাপকভাবে অনুবাদ করা হল। ক্যাস্ট্রো বললেন, মৌলিক বই যেদিন লেখা সম্ভবপর হবে তখন দেখা যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে বিশ্বে যে জ্ঞান বিকশিত হচ্ছে, বিজ্ঞান, কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে যে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে সে সম্পর্কে যে সমস্ত বইপত্র বিদেশী ভাষায় লেখা হচ্ছে সেই বইগুলো দেশে নিয়ে এসে অনুবাদ করে ছেলে-মেয়েদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলে পাঠ্য করেই জ্ঞানের দৈন্য দূর করা সম্ভব। আমাদের জন্য একটি বিরাট অ্যাডভান্টেজ ছিল। আমরা একদিকে যেমন ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিলাম

www.pathagar.com

আরেকদিকে যেহেতু দীর্ঘদিন আমাদের এখানে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যম ছিল, আমাদের এখানে শিক্ষকদের একটি বিরাট অংশ ইংরেজী ভাষা ভাল বোঝেন ও জানেন, ফলে বাইরে যে স্ট্যান্ডার্ড বইপত্রগুলো আছে, সেগুলো যদি আমরা শুধু অনুবাদের কাজে হাত দিতাম তাহলে এখনকার এই বিশাল অচলায়তন এতদিনে ভাঙ্গা হয়ে যেত। এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি রাষ্ট্রের বা সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। রাষ্ট্র যদি ভর্তুকি দিয়ে ও নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনার অধীনে ব্যাপকভাবে এইসব বইপত্র অনুবাদের স্কীম হাতে নিত এবং একটি সুনির্দিষ্ট পাবলিশিং হাউস যদি দাঁড় করাত, যার কাজই হবে শুধু অনুবাদ করা– তাহলে আমার মনে হয়, ছেলে-মেয়েদের বইপত্রের অভাব দূর করা অনেক সহজ হয়ে যেত। আর ঐ পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা আধখেঁচড়া বইগুলোর ওপর ভিত্তি করে এখানে যে সমস্ত চটুল নোটবই চালু আছে সেগুলোর প্রাদুর্ভাব এখানে ঘটত না। এদিকে যেমন আমাদের নজর দিতে হবে, আরেকদিকে তেমনি আমাদের শিক্ষকদের প্রতিও নজর দিতে হবে। বিশেষ করে আমি বলব স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকরা অনেক ফাঁকি দেন। শুধু ছাত্রদের দোষ দিয়ে লাভ নেই; শিক্ষকরা ক্লাসে এসে কোন রকমে দায়সারাগোছের ক্লাস নিয়ে বলে দেন– এটা এটা পড়ে নাও। আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা আছে, যেটি আজকে না বললেই নয়। আমি আগে জানতাম, সরকারী বাসভবন যখন বরাদ্দ হয়, সরকারী কর্মচারীদের জন্য, বিশেষ করে স্বল্পআয়ের কর্মচারীদের জন্য, তারা অনেকেই তাদের ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্টের একাংশ সাবলেটিং করে এবং প্রায় সকলেই জানেন এই ব্যাপারটি। কিন্তু শিক্ষকতার পদও যে সাবলেট করা হয়, বিশেষ করে প্রাইভেট কলেজগুলোতে– এটি অকল্পনীয় ব্যাপার। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন শিক্ষকতা করতাম তখন ভাইস চ্যান্সেলরের নমিনি হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য হবার সুযোগ আমার হয়েছিলো। সেখানে আমি দেখেছি, ইতিহাসের একজন শিক্ষক, যিনি মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, তিনি একটি বেকার এমএ পাস ছেলেকে ব্যক্তিগতভাবে ৫০০ টাকা দিয়ে বলেন, "তুমি তো বেকার আছ, তুমি আমার ক্লাসটি নাও। আমি তোমাকে প্রতি মাসে ৫শ' টাকা দেব" এবং ঐ ছেলেটি ক্লাসটি নিত। আর শিক্ষক নামের এই ব্যবসায়ী 'ভদ্রলোক' আগ্রাবাদ, খাতুনগঞ্জ এলাকায় তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থটি দেখে বেড়াতেন। মাসের শেষে যে টাকাটা তাঁর বেতন হিসেবে আসত, তা থেকে ৫০০টি টাকা ঐ বেকার ছেলেটির হাতে তুলে দিয়ে তিনি তাঁর শিক্ষকতার দায়িত্ব সম্পাদন করতেন। এই যে কলেজ কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষার সাথে জড়িত রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, তাঁরা যদি স্কুল-কলেজে কী ধরনের শিক্ষাদান করা হচ্ছে, এ ব্যাপারে যত্নবান না হন, কোন্ ধরনের শিক্ষক এই শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত আছেন, তাঁদের কর্মকাণ্ডকে যদি মনিটরিং করা না হয়, তাহলে ছাত্রছাত্রীরা শিখবে কী? তারা কী পূর্বনজির পাবে? কী ধরনের ইনসপিরেশন পাবে? স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে এই একটি অপমূল্যবোধ সঞ্চারিত হয়েছে যে, ডিগ্রী চাই, পরীক্ষায় পাস চাই। অতএব, যেনতেনভাবে পরীক্ষাবৈতরণী কীভাবে পার হব তার প্রস্তুতি নেব, নকল করে বা অন্য কোন অসদুপায় অবলম্বন করে হোক, কিংবা ঘরে বসে উত্তরপত্র অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করে আর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে তারপর বোর্ডে জমা দিয়ে– যেভাবেই হোক। এগুলোকে রোধ করার জন্য আমার মনে হয় আজকে সম্মিলিত একটি সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন।

মাহবুব উল্লাহ :

আপনি সামাজিক আন্দোলনের কথা বলেছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, কিছু প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগও প্রয়োজন। বিশেষ করে, আমাদের দেশে যেসব পাবলিক এগজামিনেশন হয় বিভিন্ন বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আওতায়, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি? অনেকে মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে বিকেন্দ্রীকৃত, আমাদের দেশেও তেমনটি চালু হওয়া উচিত। বিশেষ করে, আমাদের এডুকেশনের স্কেল আজকে

www.pathagar.com

যেখানে পৌছে গেছে– শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে। আর পাশাপাশি এই বৃদ্ধির সঙ্গে একটি গুণগত, মানগত অবক্ষয়ও এসেছে এবং এটা আসা স্বাভাবিক। অর্থনীতিতে ইকনমিজ অব স্কেল এবং ডিজইকনমিজ অব স্কেল বলে একটি কথা আছে। আমার মনে হয়, আমাদের বর্তমান শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে এক ধরনের ডিজইকনমি অব স্কেল চলে এসেছে। আমরা জানি যে বাংলাদেশে অধিকাংশ উচ্চতর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডমিশন টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া ভর্তি হওয়া যায় না। এমনকি অনেক স্কুল বা কিন্ডার গার্টেনেও এডমিশন টেস্টের ব্যবস্থা আছে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, পাবলিক এগজামিনেশনের সার্টিফিকেটের দামটা তাহলে কতটুকু? সেই ক্ষেত্রে আমরা কী এটা চিন্তা করতে পারি না যে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার নিজ নিজ ছাত্র-ছাত্রীকে নিজেরাই ইভ্যালুয়েট করবে এবং নিজেদের সীলমোহর ব্যবহার করে তাদেরকে সার্টিফিকেট দেবে এবং এটাকে ভিত্তি করে সে তার পরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডমিশন টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি হবে। এখন এই এডমিশন টেস্টের ব্যাপারটাও হয়ত বিরাট সংস্কার দাবী করে। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য GRE, TOEFL, SAT, GMATসহ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার ব্যাপার আছে, যেগুলো এখন ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও চালু হয়ে গেছে। সুতরাং আমার মনে হয়, শিক্ষাক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেয়ার ব্যাপারটা যদি এভাবে বিকেন্দ্রীকৃত হয় এবং প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলবে নিজ গুণে অর্থাৎ সেখান থেকে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েরা প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে যদি পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করতে না পারে, তাহলে মার্কেট ফোর্সেস-এর নিয়মে দেখা যাবে যে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হওয়ার জন্য আসছে না, বিশেষ করে যারা জ্ঞানলাভের জন্য আগ্রহী। এভাবে একটি প্রসেস অব এলিমিনেশন চালু করা যায়। স্বাভাবিকভাবে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে– তাহলে শিক্ষা বোর্ডগুলো কী করবে? শিক্ষা বোর্ডগুলো পরীক্ষা কনডাক্ট করা, পরিচালনা করা, প্রশ্ন প্রণয়ন করা, প্রশ্নের গোপনীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি কাজে রত। কিন্তু তারা কলেজগুলোতে শিক্ষার গুণগত মান বজায় থাকছে কী না, নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে কী না– এই সমস্ত সুপারভিশন জাতীয় কাজগুলো তারা মোটেও করতে পারে না। ফলে দেখা যায় যে, আমাদের স্কুল সিস্টেমের ওপর সুপারভিশন এবং একাউন্টিবিলিটি প্রায় উঠে গেছে। সুতরাং বোর্ডগুলোর দায়িত্ব হবে এফিলিয়েশন দেয়া হবে কি হবে না, কিংবা বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ইন্সপেকশনের ব্যবস্থা চালু করা এবং কোন অনিয়ম হলে সেজন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি। এমনটি করতে পারলে আমার মনে হয় যে,একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসলেও আসতে পারে। এছাড়াও প্রশ্ন উঠতে পারে, যে, লেখাপড়ার স্ট্যান্ডার্ড কীভাবে অর্জন করা যাবে? বোর্ডের এটাও একটি দায়িত্ব থাকতে পারে। তারা সিলেবাস এবং মডেল কোয়েশ্চেন স্কুল-কলেজেগুলোতে সার্কুলেট করতে পারে, যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা তাদের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন। এতে একভাবে বলা যায় যে, আমরা শিক্ষকদের ওপরেই দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছি তাদের ছাত্র-ছাত্রীর মূল্যায়নের এবং ধরে নিচ্ছি যে, তাদের ওপর একটি নৈতিক দায়িত্ব অর্পিত হল। সাথে সাথে বাজার বা কমপিটিশনের এলিমেনেশন প্রসেসে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সত্যিকার শিক্ষাদান করা হয় না, সেগুলো নিরুৎসাহিত হবে। এছাড়া, আমাদের প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতিটা বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব অলিখিত নিয়ম চালু হয়ে গেছে। যেমন– গত বছর যে প্রশ্নটি এসে গেছে, সেটি বর্তমান বছরে আসবে না। আর এমনটি যখনই করা হচ্ছে, তখনই দেখা যাচ্ছে যে, সিলেবাসের ফিফটি পার্সেন্ট অংশ ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ার প্রয়োজন অনুভব করছে না। এমনকি যারা খুব মেধাবী ছাত্র, যারা কিছু শিখতে চায়, তাদের মধ্যেও এক ধরনের শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। এটাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য প্রশ্নপত্রে গতানুগতিকতা পরিহার করতে হবে। শুধু মুখস্থ বিদ্যা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মনন, মেধা, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে একটি কৌতূহলোদ্দীপক সমাধানও হয়তো বের করতে পারবে। ফলে সরাসরি নোটবুক,

www.pathagar.com

টেকনিক্যাল গাইড বুক জাতীয় বই দেখে তাকে হয়ত উত্তর দিতে হবে না। এছাড়া, বর্ণনামূলক প্রশ্নের পরিমাণ কমিয়ে সেখানে অবজেকটিভ প্রশ্নের নির্ভরতা বাড়ানো যেতে পারে। ১৮০ মিনিটের পরীক্ষায় যদি ১৮০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, পরীক্ষার্থীরা ডানে-বাঁয়ে তাকানোর সময় পাচ্ছে না এবং তাকে পুরো পাঠ্যসূচী পড়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এরকম কিছু সংস্কারমূলক চিন্তা-ভাবনা আমরা করতে পারি। এছাড়া, সর্বস্তরে যদি এক ধরনের কমপ্রিহেনসিভ পরীক্ষা চালু করা যায়, যেখানে অন্তত একটি পত্র থাকবে, সে পত্রে সংশ্লিষ্ট সিলেবাসভুক্ত সমস্ত বিষয়ের তাৎক্ষণিক জ্ঞান পরীক্ষা করা হবে, তাহলেও ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার জন্য আরও ব্যাপকতর প্রস্তুতি নেবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, নকল সংক্রান্ত অপরাধকে ব্যয়সাধ্য করে তোলা। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি অসদুপায়ের দায়ে দায়ী হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে এমন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া, যাতে সেই প্রতিষ্ঠান আর কখনোই এই নকলকে উৎসাহিত করতে সাহস না পায়। তাদের এফিলিয়েশন বাতিল করা, দায়ী শিক্ষকদের সরকারী বেতন-ভাতা প্রত্যাহার করা ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। আমরা যদি পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের ব্যাপারে নতুনভাবে, সৃজনশীলভাবে চিন্তা না করতে পারি, তাহলে এই অবক্ষয় রোধ করা যাবে না। আমি আগেও বলেছি, এ ব্যাপারে আমাদের কিছু এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার। বিভিন্ন মডেলের পরীক্ষা পদ্ধতি আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে যে, আমরা শেষ ফলটা কী পাই। কোন্ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী করে পড়াশোনা করে, বেশী করে শিখতে পারে, সেই পদ্ধতিটা বাছাই করার জন্য একেবারে এপ্রায়োরি কোন সিস্টেমের কথা না বলে এমপিরিকাল টেস্টের মাধ্যমে একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করার কথা আমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারি।

আফতাব আহমাদ :

আপনি সংস্কারের কথা বলেছেন। প্রশাসনিক সংস্কারের যেমন প্রয়োজন, তেমনি আমার মনে হয়, আমাদেরকে দু'টি মৌলিক বিষয়ে নজর দেয়া দরকার। একটি হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কলেজ ও স্কুলগুলোতে শিক্ষকতায় যারা আসছেন, তাঁদের যোগ্যতা ও শিক্ষার মান কী, এটি নির্ণয় করার জন্য এবং টিচার রিক্রুমেন্টের ক্ষেত্রে নতুন পলিসি প্রণয়ন করা দরকার। বিশেষ করে, আমরা জানি, উন্নত বিশ্বে এবং আমাদের দেশেও এটা সর্বজন স্বীকৃত যে আগামী দিনের নাগরিক বা আগামী দিনের যেসব ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসছে তার বেসিক গ্রুমিং কিন্তু স্কুলে হয়, স্কুলেই তার ফাউন্ডেশনটা তৈরী হয়, সেখানেই তার মৌলিক শিক্ষাটা দেয়া হয়। এই স্কুলে যিনি শিক্ষকতা করছেন, তাঁর শিক্ষার মান কেমন, তাঁর যোগ্যতা কেমন, তার ওপর নির্ভর করবে ঐ ছাত্র বা ছাত্রী কী ধরনের বা কী মানের হবে। সেজন্য আমরা লক্ষ্য করি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে রিক্রুটমেন্টের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও একটি মানদণ্ড রক্ষা করে রিক্রুটমেন্ট হয়— অনার্স বা মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস দরকার হয় ইত্যাদি। এছাড়া পাবলিকেশন্স, এডিশনাল ডিগ্রী এবং হায়ার বা এডভান্সড ডিগ্রীও দরকার হয়। দেখা যায়, একজন এমএ পাস পুরুষ বা মহিলার একটি উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, যেভাবেই হোক কলেজে শিক্ষকতা করার (তিনি যদি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে চান) এবং তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন প্রথমে বিসিএস দিয়ে Education ক্যাডারে চাকরি পাবার। এতে অকৃতকার্য হলে প্রাইভেট কলেজে ঢোকার চেষ্টা করেন। প্রাইভেট কলেজের শিক্ষকদের দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতা হচ্ছে নিজ উদ্যোগে ডিজি Higher Education-এর অফিসে তদ্বির করে বেড়ানো, যাতে কলেজটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা যায়। কলেজটি যাতে রাতারাতি সরকারী কলেজ হয়ে যায় এবং তারা সরকারী কর্মচারীতে যাতে পরিণত হন। যার ফলে তারা সহজেই অন্যান্য স্থানে ট্রান্সফার নিতে পারেন। অথচ এই

www.pathagar.com

এমএ পাস যে ছেলে বা মেয়েটি কলেজে শিক্ষকতায় যাচ্ছে, তাকে কলেজে শিক্ষকতায় না পাঠিয়ে যদি স্কুলে শিক্ষকতায় পাঠানো হয় তাহলে হয়ত স্কুলের শিক্ষাদানের মানটা অনেক উন্নত হতে পারতো। এ ব্যাপারে আমার মনে হয়, সকলে সম্মিলিতভাবে একটি সুচিন্তিত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। পরিকল্পিত রিক্রুটমেন্ট পলিসিটি কী হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করার জন্য দেশব্যাপী গুণীজনদের মতামত নেয়া দরকার। আজকে যেভাবে ডিগ্রীসর্বস্ব শিক্ষা প্রচলিত হয়েছে এবং এর ফল হিসেবে এমন ডিগ্রীধারী হয়ে যারা বেরিয়ে আসছেন, তারাই তো শিক্ষকতায় আসছেন– কাজেই আমার মনে হয়, এই লেভেলটি আরেকটু তোলা দরকার। এখন স্কুলে সাধারণ বিএ পাস শিক্ষককে দিয়ে শিক্ষাদান করা হচ্ছে, সেটা আমার মনে হয় না, ভবিষ্যতের যে রিকয়্যারমেন্ট, সেটা ফুলফিল করতে পারবে। এটি একটি দিক। আরেকটি দিক হচ্ছে, আমাদের কলেজ এবং স্কুলগুলোতে বিশেষ করে অধিকাংশ স্কুলেই এখন পর্যন্ত কোন গ্রন্থাগার গড়ে ওঠেনি। সকল ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে সকল বইপত্র কেনা সম্ভব এটা যেমন বাস্তব নয়, কেউ কেউ বেশ কিছু বইপত্র কিনতে পারলেও সব বইপত্র কেনা সম্ভব নয়। আমরা বারবার বলি রেফারেন্স বইয়ের কথা। একই বিষয়ে দু'জন লেখক দু'টি উন্নত বই লিখতে পারেন, স্কুলের নিজস্ব গ্রন্থাগারে যদি ঐ উন্নত বই দু'টি থাকে, তাহলে সেগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট উপকারে আসতে পারে। এই গ্রন্থাগারের জন্য একটি জাতীয় ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। একদিকে যেমন স্কুলে বা কলেজে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা দরকার, অপরদিকে জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে, সরকারী উদ্যোগে গ্রন্থাগারের আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরী হয়ে পড়েছে এবং আমাদের পাবলিক লাইব্রেরীগুলোর একটি বিরাট সেকশন স্কুল ও কলেজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যদি গড়ে তোলা হয়, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে এবং ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে এ অজুহাত দেখাতে পারবে না যে, তাদের পক্ষে বই কেনা সম্ভব হয়নি বা প্রাসঙ্গিক বইটি দেখা সম্ভব হয়নি। আমাদের গ্রন্থাগারগুলোকে জ্ঞান আহরণের উপযোগী করেই সজ্জিত করা দরকার।

মাহবুব উল্লাহ :

গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। আমি বাংলাদেশের বহু কলেজ সরেজমিনে দেখেছি। সেইসব গ্রন্থাগারের যে জীর্ণদশা, এমনকি অনেক নামকরা পুরানো কলেজের যে জীর্ণদশা, সেটা আমাকে রীতিমতো বেদনা দিয়েছে। এ অবস্থা দেখে আমি সেখানকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রকারান্তরে ভর্ৎসনাও করেছি। হয়ত তাতে তারা কিছু লজ্জা পেয়েছেন আর আমি নিজে কিছু গ্লানি বোধ করেছি। সেসব গ্রন্থাগারে যেসব বই রয়েছে সেগুলো বইয়ের নামান্তর মাত্র। অধিকাংশই হচ্ছে বাংলাবাজারের নোট বই। সুতরাং এই বই দিয়ে তো আর উচ্চতর জ্ঞান হবে না এবং এটা এনশিওর করার জন্য যাতে ভাল বই স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারে থাকে, সেজন্য একটি প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন চালু করা দরকার আছে বলে আমি মনে করি। তবে দুর্নীতি আমাদের সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ করেছে। বিদেশী ডোনাররা আমাদেরকে টাকা দেয় বিদেশ থেকে বই কেনার জন্য, সেখানেও যে কারচুপি, যে দুর্নীতি লক্ষ্য করা গেছে, তাতে শিক্ষা বিভাগের বেশকিছু কর্মচারী ফুলে ফেঁপে কলাগাছ হয়েছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থগারগুলোর তেমন কোন উন্নতি হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে খুবই বাজে বই ইমপোর্ট করা হয়েছে। সুতরাং এই গোটা সমস্যাটা হচ্ছে আসলে মরাল হ্যাজাডের সমস্যা, করাপশনের সমস্যা এবং এজন্য এপ্রোপ্রিয়েট সোশাল, ইকনমিক, কালচারাল এন্ড পলিটিক্যাল মুভমেন্ট প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

www.pathagar.com

২১ নভেম্বর ১৯৯৯

প্রয়োজন ব্যাপক জাতীয় ঐক্য

মাহবুব উল্লাহ :

গত ১১ নভেম্বর রাতে বিবিসি'র এক সংবাদ ভাষ্যে আমরা জানতে পেরেছি, বাংলাদেশে একটি ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিনিধি দল এসেছিল। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশে ব্রিটিশ বিনিয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করা। সাংবাদিকরা এই ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিনিধি দলকে তাঁদের সফরের সাফল্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন যে, তাঁদের এই সফরে চট্টগ্রামও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেখানে তাঁদের যাবার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দেশে হরতাল হওয়ায় বন্দরনগরী চট্টগ্রামে তাঁদের যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁদেরকে এই হরতাল চলাকালে হোটেলে বসেই অলস সময় কাটাতে হয়েছে। প্রতিনিধি দলের নেতা অবশ্য বলেছেন, যেহেতু তাঁদের বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়ে গেছে, সেহেতু তাঁদের সফর আরো একদিন বাড়াতে হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, এই প্রতিনিধি দলের নেতা আরো বলেছেন যে, বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ নেই। কারণ, দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা রয়েছে এবং এই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশের কথা চিন্তা না করে পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশে বিনিয়োগের কথা চিন্তা করবেন বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এছাড়া ব্রিটেনে বসবাসরত বাঙালী পুঁজিপতি যারা আছেন তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এই দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে। তিনিও একইভাবে হতাশা ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, এই দেশে শুধু যে রাজনৈতিক পরিবেশের অভাব আছে তা নয়, তার সঙ্গে আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য কোথাও কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কর্মকর্তাদের কাছে থেকে কোন সহযোগিতা বা কোন সুস্পষ্ট জবাবও পাওয়া যায় না। তাঁরা 'হ্যাঁ-না' কিছু বলেন না। তিনি বলছিলেন, 'আমরা অন্তত একটা কথা শুনতে চাই। সেটা হচ্ছে 'হ্যাঁ' অথবা 'না'। বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে এক্সপেকটেশন এবাউট দি ফিউচার-এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। যেটাকে আমরা বলতে পারি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক বা কারক। যদি একটি সমাজে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা চলতে থাকে, তথ্যের যথাযথ প্রবাহ না থাকে এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে যথাযোগ্য সহযোগিতা না পাওয়া যায়, তাহলে সে দেশে কিছুতেই বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসবে না।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা নতুন নয়। এই অস্থিরতা বাংলাদেশোত্তরকালে প্রায় পুরো সময়টাই বজায় ছিল। তবে বর্তমানে যে ধরনের অস্থিরতা চলছে, সেটা ইতোপূর্বে আর কখনো ছিল কী না, সন্দেহ আছে। আমরা বাংলাদেশের উন্নয়ন চাই। বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন চাই। দেশের রাজনীতিবিদরাও ঐ একই ভাষায় কথা বলেন। তাঁরা বলেন, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই হচ্ছে তাঁদের রাজনীতি। অথচ তাঁদের রাজনৈতিক আচরণে আমরা এমন কোন সুসভ্য শালীন এবং কাম্য আচরণ লক্ষ্য করি না, যার ফলে একটি দেশে সত্যিকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তি বিরাজ করতে পারে। এদেশে যখন ১৯৯১ সালে নির্বাচন হল একটি তত্ত্বাবধায়ক সকারের অধীনে, তখন আমরা অনেকেই আশান্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু সেই নির্বাচনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন। অথচ তাঁর দলের একজন নেতা জনাব তোফায়েল আমহদ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে দাবী করেছিলেন। এছাড়া ডঃ কামাল হোসেনও একই রকম দাবী করেছিলেন। এঁরা দু'জনই আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন তখন। তবে ডঃ কামাল হোসেনকে

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। এরপরে ঘটনা তিন বছর না যেতেই অন্য দিকে মোড় নিল। একটি উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়ে গেলো এবং তার সঙ্গে যুক্ত হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবী এবং এই দাবীকে কেন্দ্র করেই এক হিংসাত্মক সন্ত্রাসী আন্দোলনের সূচনা করা হল, যার ফলে দেশের সহায় সম্পদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ঐ সময়ে হরতালই হয়েছে সবমিলিয়ে ১৭৩ দিন। বন্দর এবং অফিস-আদালত বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। নব নির্মিত চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের ব্যাপক ভাঙ্গঁচুর হলো। রাস্তাঘাটে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল। মানুষের মান-সম্মান নিয়ে যাতায়াত করার অবস্থা পর্যন্ত ছিল না। এমনকি ভদ্রলোকদের রাস্তায় দিগম্বর পর্যন্ত করা হয়েছিল। এসব ঘটনা এ দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। সে সময়ে এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা লক্ষ্য করলাম, অস্ট্রেলিয়া থেকে স্যার নিনিয়ান কে আনা হলো উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল। সর্বশেষে যখন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল এবং সংসদে উভয়পক্ষের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি চুক্তি হতে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে সরকার দলীয় একজন সদস্যের একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ বললেন, 'আমরা মুচলেকা দিয়ে রাজনীতি করবো না।' সরকার দলীয় সদস্যরা চেয়েছিলেন এই গ্যারান্টি যে, এই সমঝোতা হয়ে যাওয়ার পর আর হরতাল করা হবে না এবং সেখানেই সেই দিন তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত বিরোধী দলীয় সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করলেন। তাঁদের পদত্যাগ পত্র আগেই তাঁদের দলীয় প্রধানের কাছে জমা দেয়া ছিল। এর কিছুদিন পরে নতুন সংসদ নির্বাচন করার জন্য সংসদ ভেঙে দেয়া হল। কিন্তু সেই নির্বাচন করার জন্য বিরোধী দল এগিয়ে আসলো না। অথচ সেই নির্বাচনের উদ্দেশ্য ছিল একটি। কারণ, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান যদি করতে হয়, তাহলে সংবিধানে একটা পরিবর্তন বা একটা সংশোধনী আনতে হয়, কয়েকটি নতুন অনুচ্ছেদ সহ একটি নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজন করতে হয় এবং করার জন্য সংসদে যে ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিলো তা বিরোধী দলীয় সদস্যদের অনুপস্থিতির কারনে ছিল না এবং সে জন্যই নতুন নির্বাচনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই নির্বাচনে যখন বিরোধী দলীয়রা যোগ দিতে অস্বীকার করল, তখন সংকট আরো ঘনীভূত হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষ একতরফাভাবেই কিছু ছোটখাটো দল নিয়ে নির্বাচন করল এবং প্রায় সবক'টি আসনই সরকার পক্ষ পেল। সঙ্গত কারণেই নির্বাচনটি দেশী-বিদেশী মহলে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আর পায়নি বলেই তখন এক ধরনের ক্রাইসিস অব লেজিটিমেসি সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরেও বলবো, সুখের বিষয়, শেষ পর্যন্ত সেই নতুন সংসদ ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করলো, যার মাধ্যমে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা হল। তারপরে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন-অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আরো অন্যান্য কিছু দলের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতাসীন হল। যেদিন তারা ক্ষমতাসীন হল সেদিন থেকেই তারা তাদের বিরোধী পক্ষের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল এবং প্রথম দিনেই তাদের হাতে নিহত হল নোয়াখালীর ছাত্রদল নেতা সুমন। সেই থেকে বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলীয় কর্মীদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা-হামলা অব্যাহত থাকে। কারো হাত-পা কেটে ফেলা, কারো চোখ উপড়ে ফেলা অন্ধ করে দেয়া। এগুলো এখন দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজে এটি কতটুকু কাম্য হতে পারে সেটি একটি বিরাট প্রশ্ন। তারপরও একের পর এক ইস্যু তৈরী করা হয়েছে। যেটি প্রয়োজন ছিল না, সেই ধরনের কর্মকাণ্ড করা হয়েছে। ৭ নভেম্বরের ছুটি এদেশের মানুষ ১৯৭৭ সাল থেকে পালন করে আসছে, সেই ছুটি প্রত্যাহার করা হল। শহীদ জিয়াউর রহমানের মাজারে যাওয়ার বেইলী ব্রিজটি রাতের অন্ধকারে সরিয়ে ফেলা হল। সেটা নিয়েও ছিল প্রচণ্ড রাখঢাক। শুধু তাই নয়, রাজপথে সমাবেশের ওপর পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া হলো এবং রাজপথে সমাবেশ আয়োজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা

www.pathagar.com

হলো। ফলে বিরোধী দলের পক্ষে সমাবেশ জনসভা করা কঠিন হয়ে পড়ল। এ রকম একের পর এক নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি বিরোধী দলের ওপর সৃষ্টি করা হল।

অথচ ১৯৯১-৯৫ সময়টাতে সেই সময়কার বিরোধী দল অন্তত একথা বলতে পারবে না যে, তাদের সমাবেশের ওপর এমন ধরনের বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যাই হোক, আজকে দেশের রাজনৈতিক সঙ্কট এক চরম অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। বিশেষ করে দেশের স্বার্থ এবং জাতীয় স্থিতিশীলতার প্রশ্নে যে ব্যাপারগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেসব ব্যাপারগুলোকে অন্ধকারে রেখে সরকার একের পর এক চুক্তি সম্পাদন করছে। তারা তিরিশ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানিচুক্তি করেছে ভারতের সঙ্গে, যেখানে কোন গ্যারান্টি ক্লজ নেই, যেখানে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার কথা নেই এবং দেখা গেল চুক্তি বাস্তবায়নের পরের বছর শুষ্ক মৌসুমে যখন পানি আসার দরকার, তখন এক ফোঁটা পানি আসেনি। কাজেই এই ধরনের চুক্তির বাতুলতা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। পার্বত্য চুক্তিরও এই একই অবস্থা। বলা হল যে, দীর্ঘ ২৫ বছর পর এই পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরে এসেছে। কিন্তু সেখানে এই 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার নামে অসহায় বাঙালী বসতি স্থাপনকারীদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসল। শুধু তাই নয়, এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে আগামীতে বাংলাদেশের এই এক-দশমাংশ ভূখণ্ড বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শাসনভুক্ত থাকবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরী হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, একটা এককেন্দ্রীক রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের এদেশের যে কোন স্থানে যাবার এবং বসতি গড়ার যে অধিকার আছে, সেই অধিকার পর্যন্ত অস্বীকার করা হল। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করছি, বর্তমানে দেশে দলীয়করণ প্রচণ্ডভাবে চলছে। শাসক দল এমন কোন সরকারী বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে নিজ দলীয় লোকদের নিয়োগ করছে না ন্যায়বিচারসহ অন্যান্য সকল মাপকাঠিকে চূড়ান্তভাবে বিসর্জন দিয়ে। উদ্দেশ্য একটাই। সেটা হচ্ছে দেশের রাষ্ট্র কাঠামো, শাসন কাঠামোয় নিজস্ব কর্তৃত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাতে আর কোন দিন বিরোধী শক্তির পক্ষে শাসন ক্ষমতায় আসা সম্ভব না হয়। সে জন্যই তারা বারবার বড়াই করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য উচ্চারণ করছে। আমরা কিছু দিন আগে বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলতে শুনেছি 'আমরাতো এখনো শুরুই করিনি'। এতো কিছু করার পরও এমনকি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশের হিউম্যান রাইটস পরিস্থিতি সম্পর্কে পরপর দু'বার যে প্রতিবেদন দিয়েছে, তারপরও যদি তিনি বলেন যে, তিনি এখনো শুরুই করেননি, তাহলে শুরু করলে দেশের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে সেটা ভেবে আতঙ্কিত হতে হয়।

একটা ফ্যাসিবাদী সরকার যে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করে, সেই ধরনের একটা অবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেটা একটা ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশ। এখন যে কেউ সরাসরি সরকারের সমালোচনা করতে পর্যন্ত ভয় পায়। অথচ ঘরের ভেতরে বসে আজকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকই সরকারের কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত বিরক্ত, অসন্তুষ্ট, বীতশ্রদ্ধ মনোভাব নানাভাবে প্রকাশ করছে। এই সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আরেকটি পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। সেটা হচ্ছে প্রচার মাধ্যম, সংবাদ মাধ্যম-এগুলোর ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং বর্তমানে সরকারপক্ষীয় কিছু পত্র-পত্রিকা প্রায় একতরফাভাবে সরকারের এসব কর্মকাণ্ডের গুণকীর্তন করছে। সরকারের সাফাই গেয়ে যাচ্ছে। এর ফলে জনমত বিভ্রান্ত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সংসদের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখবো যে পরিস্থিতিটাই অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক। বিরোধী দলকে সেখানে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয় না। স্পীকার অত্যন্ত একচোখাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে Leader of the House-এর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁকে একচোখা স্পীকার বললেও ভুল হবে না। তাঁর নীতি যে একচোখা সেটা অবশেষে প্রমাণিত হল স্বপন এবং আলাউদ্দীন নামে যে দু'জন সংসদ সদস্য নিজেদের দল পরিবর্তন করে সরকারে যোগদান করেছে। সে প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি যে দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নিয়েছেন এবং তাকে কেন্দ্র করে হাইকোর্ট ডিভিশনে যে রায় হয়েছে, তা থেকেও এটা স্পষ্ট যে, স্পীকার নিরপেক্ষভাবে কাজ করছেন না। অথচ একটি

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমরা আশা করি, স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার আগে তিনি যে দলেরই থাকুন না কেন, স্পীকার নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পরে তিনি তাঁর দলীয় পরিচয় হারান এবং তিনি সকলের স্পীকারে পরিণত হন। ঠিক তদ্রুপ প্রধানমন্ত্রী যিনি হন, তিনি শুধু একটি দলের প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে দেশের প্রধানমন্ত্রীর মত কথা বলতে হয়, আচরণ করতে হয়। অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার বিষয় এই যে, আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সংসদে মাঝে মাঝে এমন সব লাগাম ছাড়া উক্তি করেন যা কোন ভদ্রজনের পক্ষে উচ্চারণ করা কঠিন। বিশেষ করে তার প্রতিপক্ষ বিরোধী দলীয় নেত্রী সম্পর্কে তিনি যে সব উক্তি করছেন বা করে চলেছেন, সেগুলোও কোন ভদ্র মানুষের পক্ষে করা সম্ভব না সেটা তিনি নিজেই চিন্তা করে দেখতে পারেন। মোদ্দা কথা গণতন্ত্র একটা জিরো সাম গেইম নয়। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। কিন্তু সেটা পরিচালিত হবে সংখ্যালঘিষ্ঠের সম্মতিতে। যখন এই সংখ্যালঘিষ্ঠকে চরমভাবে অবজ্ঞা করা হয়, অবমাননা করা হয় তখন গণতন্ত্র কিছুতেই কার্যকর থাকতে পারে না।

ইদানীং আমরা উদ্বিগ্ন হচ্ছি এই খবরটি শুনে যে, সরকার পুলিশ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার নামে আরো ৫০ হাজার পুলিশ নিয়োগ করতে যাচ্ছে। এদের নিয়োগ কতোটা নিরপেক্ষ আর কতোটা দলীয় ভিত্তিতে হবে, কেউ বলতে পারে না। এর ফলে দেশে একটি একদলীয় শাসনের পরিস্থিতি প্রকট হয়ে উঠবে। সুতরাং আজ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে। কিছুদিন আগে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মি. হোলজম্যান একটি উক্তি করেছিলেন যে, এদেশের জনগণের যা পাওয়া উচিত তারা সেটা পাচ্ছে না এবং এর ফলে জনগণের হতাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার মনে হয়, বাংলাদেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মহলেই শুধু নয়ই, দেশের ভেতরে সকলের মধ্যেই একটি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, নিরাপত্তাহীনতা কাজ করছে। আজ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে নেমে গেছে যে, এখন সন্ধ্যার পরে মুসল্লিরা নামাজ পড়তে মসজিদে পর্যন্ত যেতে ভয় পায়। কয়েক দিন আগে পত্রিকায় বেরিয়েছে যে, বেবিট্যাক্সিতে করে ৪০০ ছিনতাই হওয়ার ঘটনা ঘটেছে এবং এ জন্য সংঘবদ্ধ দল রয়েছে সারাদেশে। ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অযোগ্য নিয়োগ, বিশৃঙ্খলা, সিদ্ধান্তহীনতা এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে– যার ফলে সরকারের যোগ্যতা সম্পর্কে আজকে প্রশ্ন উঠেছে। তাই আজকে সকলে মনে করছে যে, এই সরকার একটি ব্যর্থ অযোগ্য দেউলিয়া এবং দলীয় মনোবৃত্তিতে দুষ্ট একটি সরকার। এ ধরনের সরকার দেশে যদি কায়েম থাকে, তাহলে দুষ্টের দমন হবে না, শিষ্টের পালন হবে না এবং এই ধরনের একটি উক্তি করার জন্যই বিচার বিভাগের ওপর তাদের খড়গ নেমে আসছে। আজ বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার প্রশ্ন উঠছে। অথচ আমরা সবাই জানি, বিচার কার্য অত্যন্ত খোলামেলা ভাবেই উভয়পক্ষের উকিলদের সামনেই হয়। তাদের সব কাজই অত্যন্ত খোলামেলা। নিম্নতর আদালতকে উচ্চতর আদালতের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। বিচার বিভাগকে তার নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি থাকতে হয়। বিচারকদেরকে শেষ পর্যন্ত সংবিধানের কাছে জবাবদিহি থাকতে হয়। বাংলাদেশে যদি কোন প্রতিষ্ঠান থাকে, তাহলে অন্তত আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের উচ্চ আদালতগুলোই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেগুলো ন্যায়বিচার ও নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আজ সেটাই সরকারকে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট করে তুলেছে। সেজন্যই বিচার বিভাগের প্রতি তাঁরা উষ্মা প্রকাশ করছেন। বক্রোক্তি করছেন, তীর্যক মন্তব্য পেশ করছেন, জবাবদিহিতার প্রশ্ন তুলছেন। একইভাবে সংবাদপত্রের কথাও ওঠে। সবকিছু মিলিয়ে দেশে বিশাল একটা সংকট।

শেয়ার বাজারে যে সংকটটা হল, দেশে রাজস্ব আদায়ে যে সংকট-আজকে দেশে ব্যাংক এবং জনগণের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সরকারের এডিমনিস্ট্রেশন চালানোর যে ব্যবস্থা, সেটা ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সুযোগকে বিপন্ন করছে। সব মিলিয়ে বলতে হয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং জনগণের মৌলিক অধিকার সমস্ত কিছুই আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই বিপন্নতার মুখে বিরোধী দলগুলো এক-দফা আন্দোলনের কথা বলছে। এই এক দফা আন্দোলন

www.pathagar.com

হচ্ছে এই যে, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নতুন নির্বাচন দিয়ে নতুন করে ম্যান্ডেট নিয়ে দেশে একটি সুষ্ঠু সরকার ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। এখন দেখতে হবে, বিরোধী দল কি খুব অন্যায় আন্দোলন করছে? তারা কি অন্যায় আবদার করছে? তারা কি শুধু অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যই এটা করছে? কিংবা তাদের মাথায় কোন ষড়যন্ত্র কাজ করছে? এ প্রশ্নের পাশাপাশি এ প্রশ্নও ওঠা স্বাভাবিক যে, সরকার দেশে গণতন্ত্র রাখার ব্যাপারে কতোটা আগ্রহী বা আন্তরিক। এই প্রশ্নগুলোর একটা জবাব আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

আফতাব আহ্মাদ :

১৯৯১ সনে যখন একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে এদেশে নির্বাচন হয়, তখন এদেশের সকল নাগরিক, সকল আন্তর্জাতিক Human rights organization এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহল একবাক্যে স্বীকার করেছিল যে সেই নির্বাচন ছিল বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত অবাধ নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন। ডঃ মাহবুব উল্লাহ এখানে উল্লেখ করে বলেছেন যে, নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক দলটিকে সংসদে বিরোধীদলের অবস্থান গ্রহণ করতে হয়েছে, সেই আওয়ামী লীগের দলীয় দুজন নেতা জনাব তোফায়েল আহমদ এবং ডঃ কামাল হোসেন প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেন যে নির্বাচন গণতান্ত্রিক পরিবেশে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি এ প্রসঙ্গে তৃতীয় আরেকজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে চাই। তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিনী সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন। তিনিও বলেছিলেন যে ঐ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখেছি তিন নেতাকে দলের ভেতরে অপদস্থও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। তোফায়েল আহমেদ এবং জোহরা তাজউদ্দীন সামলে উঠলেও এক পর্যায়ে ডঃ কামাল হোসেন বাধ্য হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করতে। ১৯৯১ সনকে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি ওয়াটার শেড যদি আমরা ধরি, তাহলে আমরা আজকের পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হব। সেদিন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে সূক্ষ্ম কারচুপির মাধ্যমে বিএনপিকে ক্ষমতায় আনা হয়েছে। তিনি তাঁর দলীয় সদস্যদের উদ্দেশে এও বলেছিলেন যে, এক সেকেণ্ডের জন্যও এই সরকারকে স্বস্তি দেয়া যাবে না। এটি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পরবর্তী পর্যায়ে পালন করেছেন। ১৯৯৩-৯৪ থেকে শুরু করে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত যে হিংসাত্মক সন্ত্রাসী রাজনীতি তিনি এদেশে চালু করেছিলেন তার কুফল আমাদের অর্থনীতি আজও ভোগ করছে। ১৯৯৬-এর নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং আমরা এও জানি যে, ১৯৯৬-এর জুনের নির্বাচনের পূর্বে ১৯৯৬-এর মে মাসে সামরিক বাহিনীর সেনাপ্রধানসহ কিছু উচ্চাভিলাষী সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশ করে একটি অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। এ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার অনেক বিষয় এখনো প্রকাশিত হয়নি। অনেক কিছুই এখনো পুরপুরি জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু যদ্দুর জানা গেছে দুটি বিকল্প লক্ষ্য ছিল ঐ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার। একটি ছিল সরাসরি সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতায় অধিষ্টিত করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে কোন এক কৌশলে আওয়ামী লীগকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা। দ্বিতীয় বিকল্পটি ছিল, সেনাবাহিনী নিজে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াকে পরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগের অনুকূলে পরিচালনা করে আওয়ামী লীগের জন্য জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিশ্চিত করা। কিন্তু অভ্যুত্থান প্রয়াসীদের দুর্ভাগ্য, ঘটনা পরম্পরায় তাদের হীন উদ্যোগ সফল হয়নি। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর দেশপ্রেমিক জওয়ান ও অফিসারদের কারণেই প্রধানত সেই সামরিক অভ্যুত্থান ভন্ডুল হয়ে যায়। তারপরও আমরা লক্ষ্য করেছি যে নানাধরনের কৌশলে ১৯৯৬-এর জুন নির্বাচনের ফলাফল আওয়ামী লীগের অনুকূলে আনার ব্যবস্থা করে দলটিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে জনগণের কাছে নানাভাবে কান্নাকাটি করেছিল, করজোড়ে অতীত অপরাধ ও কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল এবং অতি বিনয়ের

www.pathagar.com

সঙ্গে নম্রসুরে কাকুতি-মিনতি করে বলেছিল, "একটি বারের জন্য আমাদের সুযোগ দিন। এবার আমরা আপনাদের যথাযথভাবে সেবা করবো।" আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পেয়েই কিন্তু তাদের চেহারা এবং মূর্তি পাল্টে ফেলেছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই দেশে এক অকল্পনীয় কৃষ্টি যার অপর নাম পৌত্তলিকতার কৃষ্টি চালু করা হয়েছে। ব্যক্তি আর বিগ্রহ পূজার কৃষ্টি। প্রধানমন্ত্রীর পিতার নামে যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের নতুন করে নামকরণ করা যেমন শুরু হলো একদিকে, তেমনি অন্যদিকে ঘটা করে প্রধানমন্ত্রীর পিতার জন্মদিন, মৃত্যুদিন উপলক্ষে স্বয়ং মহামান্য রাষ্ট্রপতিসহ এদেশের মানুষকে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের পিতার প্রতিকৃতির সামনে স্তোস্তবাক্য উচ্চারণ এবং অর্ঘ্য নিবেদন করতে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের যা কিছু সাফল্য, যা কিছু অর্জন সে-সবকিছুকে জনগণের কৃতিত্ব হিসেবে অস্বীকার করে একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর পিতার সাফল্য ও অর্জন, নিদেন পক্ষে স্বপ্নের বাস্তবায়ন হিসেবে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একই সঙ্গে অতীতের সরকারসমূহের সকল সাফল্য অর্জন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর পিতার একক স্বপ্ন বলে এদেশের মানুষকে বোকা ঠাউরে বিশ্বাস করানোর সেকি প্রাণপণ চেষ্টা! হাসিনার কর্মকাণ্ডে মানুষ অতিষ্ঠ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। লক্ষ্য করার এবং বোঝার বিষয়টি হচ্ছে, জনগণের কাছে ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা করে যারা ক্ষমতায় এসেছে, তারা জনগণকে সেবা করার পরিবর্তে জনগণকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে শুধু শাসানোই নয়, জনগণের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানা শুরু করেছে। হাসিনা সরকার বারবার তার আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে একটি কথাই বোঝাতে চাইছে যে এদেশের জনগণকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে হাসিনার পিতার মৃত্যুর বদলা নেবার জন্য। জনগণের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই এবং জনগণকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যই প্রতিহিংসার রাজনীতিকে সম্বল করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে। আর এ কারণেই জনগণের অনুভূতি, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার তোয়াক্কা না করে, জনগণের করুণ অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত না করে একতরফা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী, দলীয় ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই একে একে তারা পদক্ষেপ নিচ্ছে। আজকে Custodial killing একটি নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। যাকেই তাদের সন্দেহ হয়, যাকেই তারা অপছন্দ করে তাকেই ধরে নিয়ে এসে থানায় মারধর করে, পিটিয়ে খুন করে কিংবা গুম করে দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে পুরো ব্যাপারটি অস্বীকার করা আজ তাদের পৈশাচিক কার্যক্রমের নিরবচ্ছিন্ন অংশে পর্যবসিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, তুহিনের মতো একটি তরুণকে ধরে নিয়ে এসে এই ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মতিঝিল থানায় হত্যা করার পর পরবর্তী পর্যায়ে বলা হলো, এই তরুণ উন্মাদ হয়ে জুতোর ফিতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। একটি শিশুও এমন ঘটনা শোনার পর হাসি সংবরণ করতে পারবে না। আমরা লক্ষ্য করেছি, মেধাবী ছাত্র রুবেলকে কীভাবে পুলিশের ভাড়াটে বাহিনী পিটিয়ে হত্যা করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে জনরোষে বাধ্য হয়ে পুলিশ নামের কলংক পুলিশের এসি আকরাম এবং জনৈক আওয়ামী এমপির উপপত্নী আওয়ামী লীগ নেত্রী মুকুলী বেগমকে গ্রেফতার করা হলেও রুবেল হত্যার সেই মামলার এখন পর্যন্ত কোন কূলকিনারা হয়নি। উপরন্তু, রুবেলের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজনকে নানাভাবে শাসানো হচ্ছে, প্রাণনাশের হুমকী দেয়া হচ্ছে, হয়রানি নির্যাতন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নির্মমভাবে নিহত রুবেলকেও একজন অসৎ, সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত বা প্রমাণ করার জন্য তারা আজকে উঠে-পড়ে লেগেছে। পুলিশী হাজতে শিশু তানিয়াকে ধর্ষণ করে পুলিশ তার দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসে বিমানের নিরীহ কর্মকর্তা নূর শরীফ পুলিশের হাতে সন্দেহজনক আততায়ীর অভিযোগে নিহত হয়। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

পাশাপাশি পুলিশকে দলীয়ভাবে গড়ে তোলার জন্য যে নতুন কর্মসূচী এই সরকার হাতে নিয়েছে, তার অন্যতম একটি ব্যবস্থা হচ্ছে দলীয় কর্মীদেরকে সরাসরি যৎসামান্য নামকা ওয়াস্তে প্রশিক্ষণ দিয়ে পুলিশে recruit করে নেয়া। ইদানীং আমরা লক্ষ্য করেছি, বিরোধী দলীয়

www.pathagar.com

হরতাল, সমাবেশ, মিছিলের সময়ে গুলী এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী আক্রমণ চালানোর জন্য এক ধরনের বিশেষ বাহিনী ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি হচ্ছে রক্ষীবাহিনীর আদলে গড়ে তোলা কুখ্যাত Eagle Force. এই Eagle Force- এর অস্তিত্ব সম্পর্কে যখন পত্রপত্রিকায় প্রথম সংবাদ বের হয় তখন পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ তা অস্বীকার করতে চাইলেন। সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় এ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে লেখার পর পুলিশ বাহিনী থেকে বলা হলো যে, এই ধরনের কোন বাহিনী নেই। এটি হচ্ছে একটি কল সিগনাল। সাংবাদিকদের চাপের মুখে দু'একজন কর্মকর্তা মিনমিনে সুরে বললেন, বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ইউনিটকে হয়তো ঐ কোড নামে ডাকা হয়। কিন্তু এই সরকারের একজন মন্ত্রীর মালিকানাধীন 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার ২২ অক্টোবরের সংখ্যায় 'যশোরে ঈগল ফোর্স। সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসা ঃ তাহারা পুলিশ না সন্ত্রাসী'। এই শিরোনামে ডবল কলাম সংবাদ পরিবেশিত হবার পর আজ পর্যন্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কিংবা সরকারের কোন দায়িত্বশীল মহলের তরফ থেকে ঐ রিপোর্টকে অস্বীকার করা হয়নি, কিংবা প্রতিবাদও করা হয়নি। এই একটি রিপোর্ট থেকে যশোর অঞ্চলে ভয়াবহ পরিস্থিতিটি কেমন বোঝা যাবে। ঐ রিপোর্টে বলা হয় যে জেলা পুলিশের পুলিশ লাইনের এসআই পদমর্যাদার একজন রিজার্ভ অফিসারের নেতৃত্বে এই ঈগল ফোর্স যশোরে গঠন করা হয়েছে এবং এই ফোর্সের সদস্য সংখ্যা আট। ঈগল ফোর্সের কার্যকলাপ নিয়ে কোতোয়ালি পুলিশে দ্বন্দ্বও দেখা দিয়েছে। 'পুলিশের খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি সম্প্রতি উক্ত ফোর্সের তৎপরতা বন্ধ করার জন্য জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। কিন্তু ওই নির্দেশ আজ পর্যন্ত পালিত হয়নি।'

এতেই বোঝা যায় যে, একটি বিশেষ প্রাইভেট বাহিনী পুলিশের ভেতরে তৈরী করা হয়েছে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও নির্মূল করার জন্য এবং প্রতিপক্ষের ওপরে নিপীড়ন নির্যাতন চালানোর জন্য। এর অর্থ যদি গণতন্ত্র হয়, তাহলে তা গণতন্ত্র নয়। ড. মাহবুব উল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন যে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন একথা যেমন সত্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘিষ্ঠের সম্মতি নিয়েই শাসন করে, সে কথাও তেমনি সত্য। সংসদে দাঁড়িয়ে মিথ্যাচার করাটা যেমন একটি মহাপাপ এবং অসাংবিধানিক কাজ তেমনি সংসদে দাঁড়িয়ে যেসব অশ্লীল অশ্রাব্য খিস্তি-খেউড় ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা করছেন, এগুলো কোন সভ্য, সুরুচিসম্পন্ন, মার্জিত এবং কালচারড লোকের ব্যবহারিক আচরণ কখনই হতে পারে না। ইতরপ্রাণীদের ভাষা যখন সংসদে উচ্চারিত হতে আমরা শুনি, তখন আমাদের শুধু আশংকাই হয় না, আমরা তখন ভাবি যে আমরা বোধহয় আবার সেই একদলীয় ফ্যাসিস্ট শাসনের দিকে এগিয়ে চলেছি। বস্তুত যারা জনগণের কাছে ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা করে আধিপত্যবাদীদের কৃপাপুষ্ট হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ লাভ করেছে আজ তারা দেশটিকে পৈতৃক তালুক এবং জনসাধারণকে তাদের ক্রীতদাস ভাবা শুরু করেছে। আমরা জানি, এদেশে গণতন্ত্রের বুলি কপচিয়ে রাষ্ট্রীয়করণের নামে জনগণের সম্পদ কুক্ষিগত করে আওয়ামী লীগ ১৯৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত অবাধ লুটপাট ও সকল শ্রেয় গুণাবলী বিবর্জিত একটি দুর্বত্ত গোষ্ঠীর ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করেছিল। সেই ফ্যাসিস্ট শাসনকে পাকাপোক্ত করার জন্য এক পর্যায়ে তারা সকল দল নিষিদ্ধ করে দিয়ে একটি একক দলের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর বিরুদ্ধেই জনগণ যখন বিক্ষোভে ফেটে পড়ার উপক্রম করেছিল তখনই ঘটেছিল ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং ক্ষমতার পালাবদল। ঐ পরিবর্তন ছিল অনিবার্য, অপরিহার্য এবং ঐতিহাসিকভাবে ন্যায়সঙ্গত। এই পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে যে ভারত-রুশ অক্ষশক্তির বলয় থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ ছায়ারাষ্ট্র (satellite state) থেকে রাষ্ট্রীয় অবয়বের পূর্ণতা অর্জন করলো। ১৯৯৬-এর ক্ষমা প্রার্থী একজনকে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখলাম সংসদে দাঁড়িয়ে ১৯৭৫-এর সংবিধানের কুখ্যাত চতুর্থ সংশোধনীকে সমর্থন করে তার পক্ষে নিলর্জ্জভাবে সাফাই গাইছে। এ থেকে একটি জিনিস আজ স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে যে এই দলটি অতীতের অপরাধ ও কৃতকর্মের জন্য ন্যূনতমভাবে অনুতপ্ত নয় কিংবা কোন ধরনের অনুশোচনাও বোধ করে না। জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভোট ভিক্ষা ছিল আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগের জন্য একটি ভেক মাত্র। জনগণের সঙ্গে এ ছিল এক ধরনের প্রবঞ্চনা ও শঠতা। আসলে আমাদের একটি জিনিস বোঝার আছে, সেটি হচ্ছে এই যে, ১৯৯৬-এর নির্বাচনের সময়ে আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছিল, এটি ছিল একটি ভাওতা মাত্র। এটি ছিল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার একটি মেকী দলিল। তার লুক্কায়িত কৃত্যসূচী অর্থাৎ তার hidden agenda সে তখন প্রকাশ করেনি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই আওয়ামী লীগ আজ একটির পর একটি তার hidden agenda ভুক্ত বিষয়গুলো একে একে বাস্তবায়ন করা শুরু করেছে। আমি অতীতে বহু সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে বলেছিলাম যে, ভারতের সাথে পঁচিশ বছরের যে গোলামি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৭২- এ সেই চুক্তির মেয়াদ ১৯৯৭ সালের মার্চে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর তা আর নবায়ন করা হবে না। কিন্তু এর চেয়েও জঘন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুক্তির দ্বারা একের পর এক এমন সব চুক্তি বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে, যা বাংলাদেশকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে যে, যার একমাত্র পরিণতি হবে– আরও নিকৃষ্টতম অধীনতামূলক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক। আজ যদি আমরা ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানিচুক্তির দিকে তাকাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের তথাকথিত শান্তিচুক্তির দিকে তাকাই, যদি আমরা ভারতকে তোড়জোড় করে মিলিটারি করিডোর দেয়ার উদ্দেশ্যে ট্রানজিট-ট্রানশিপমেন্টের বাহনার আড়ালে সরকারী সিদ্ধান্তের দিকে তাকাই, যদি আমরা ভারতের কাছে গ্যাস রফতানী, গ্যাস পাইপ লাইন বসাবার ষড়যন্ত্রের কথা শুনি কিংবা চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও মিজোরামের সমন্বয়ে দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন চতুর্ভুজ, দেমাগিরি থেকে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত রোড ও রেল লিংকের প্রস্তাব পর্যালোচনা করি এবং ভারতকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার প্রস্তাবের কথা শুনি, তখন বিষয়টি আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। আমরা এও লক্ষ্য করছি যে, আমাদের গোটা উত্তরাঞ্চলে একদিকে পঞ্চগড়, তেঁতুলিয়া, রংপুর, অন্য দিকে সিলেট, মৌলবীবাজার এসব সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ছত্রছায়ায় বিএসএফ যেভাবে হামলা করছে, তার প্রত্যুত্তরে আমাদের সরকার সুস্পষ্ট দৃঢ় কোন অবস্থান গ্রহণ করছে না। বরং আমরা লক্ষ্য করছি, সরকারের তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে, এদেশে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাঁটি আছে, এদেশে আইএসআই'র ঘাঁটি আছে এবং আমাদের দেশের অভ্যন্তরে এসবের তৎপরতা আছে। ডাহা মিথ্যা ভাষ্য প্রচার করে হাসিনার ক্রীড়নক সরকার বাংলাদেশে সামরিকভাবে আক্রমণ করার জন্য ভারতের হাতে অজুহাত তুলে দিচ্ছে। একই কথা প্রতিধ্বনিত হতে দেখি আমরা পশ্চিবঙ্গের সিপিএম দলীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বিজেপিপন্থী ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানীর কণ্ঠে। এই সম্ভাব্য অভিযানের অংশ হিসেবে আমরা লক্ষ্য করছি, আজ আমাদের সীমান্তের ওপর প্রচণ্ড সামরিক চাপ এবং সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে ভারতীয় সাফল্য যে একেবারেই নেই তা নয়। এক কথায় বলা যায়, বর্তমান সরকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধির জন্য কাজ না করে একদিকে ভারতের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে ভারত তোষণ নীতি তার পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে ভারতীয় ভোগ্য পণ্যের বাজার এদেশে সম্প্রসারিত করার কাজকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এরই পাশাপাশি ভারতকে ট্রানজিট–ট্রান্সশিপমেন্টের নামে হাসিনা সরকার ভারতকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে মিলিটারী করিডর দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। এসব ভারতের প্রত্যক্ষ সামরিক উপস্থিতি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে নিশ্চিত করার এক গভীর ও বিশাল ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি পেতে হলে আজকে সমগ্র দেশবাসীকে যেমন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তেমনি এদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল, যারা দেশ, মাটি ও মানুষকে ভালবাসে, দেশের অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই ঐক্যের সাধনাকে ভণ্ডুল করে দেয়ার জন্য এবং দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার জন্য RAW এবং ক্ষমতাসীন দল হেন কর্ম নেই যা থেকে বিরত থাকবে।

www.pathagar.com

Walter Lippmann-এর বিখ্যাত Manufactue of consent তত্ত্বকে সার্থক প্রমাণ করে আওয়ামী প্রিন্ট মিডিয়া, হাসিনার অনুগ্রহপুষ্ট কতিপয় ব্যক্তি যারা Yellow Journalism-এ সিদ্ধহস্ত, RAW এর অর্থপুষ্ট ব্যক্তিরা এবং ভারতীয় রাষ্ট্রে লীন হবার অভিলাষী রাষ্ট্রঘাতীচক্র জনমত 'জরিপ' বা 'নিরুপণ'-এর নামে Print media- তে manufacturing consent কার্যক্রমটিকেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমরা পত্র পত্রিকার দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখব, সেগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করছে সরকারের মসিলিপ্তি ভাবমূর্তিকে ঘষে- মেজে উজ্জ্বল করে তুলতে। কিন্তু নির্মম বাস্তবতার কারণে উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হচ্ছে সরকারের দুর্নীতি, নির্যাতন, নিপীড়ন, সন্ত্রাস ও অপকর্মগুলো সম্পর্কে প্রতিবেদন ছাপতে। তারপরও আমরা জানি যে, আমাদের এখানকার গণমাধ্যমে ভারতীয় পুঁজির বিনিয়োগ রয়েছে– ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একজন ধিরু ভাই আদবানী, ভারতীয় নাগরিক চিত্তরঞ্জন সুতার বিপুল অর্থ আমাদের প্রিন্টমিডিয়াতে ইনভেস্ট করেছেন। এই ইনভেস্টমেন্টের ফলে আমাদের প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে আমরা যে ডিসটরশন, পারভারশন এবং অ্যাবারেশন লক্ষ্য করছি, তার কারণেও সরকার অনেক সময়ে ভাবে যে, বোধহয় জনমত তার অনুকূলেই ধরে রাখা সম্ভব। বাস্তবতা হল এই যে, আজকে জনগণ এই সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে, এই সরকারকে ধিক্কার দিচ্ছে এবং এই সরকারের উচ্ছেদ কামনা করছে। এই মাত্র দু'দিন আগে এদেশের জাতীয় সংসদের একজন সদস্য সাদেক হোসেন খোকা, যিনি রাজধানী ঢাকা মহানগরীর অত্যন্ত জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁকে, তাঁর সাথে নোয়াখালীর নির্বাচিত সংসদ সদস্য জয়নুল আবেদীন ফারুক এবং একজন প্রাক্তন সংসদ সদস্য, প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আবদুল্লাহ আল নোমান-তাঁদের ওপরে যেভাবে পুলিশ বর্বরোচিত হামলা করেছে, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা হয়ে থাকবে। ব্রিটিশ আমলে, পাকিস্তান আমলে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর জন্মদাতা পিতা শেখ মুজিবের আমলেও এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়নি। আজকে সরাসরি যেভাবে জাতীয় সংসদের সদস্যগণকে এবং প্রাক্তন মন্ত্রীদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলী ছোঁড়া হচ্ছে তা যে কোন সভ্য সমাজের জন্য একটি কলঙ্ক। আল্লাহর অশেষ রহমত যে তারা প্রাণে বেঁচে গেছেন, অথচ আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে এই ঘটনা নিয়ে যে ধরনের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, তামাশা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে দেখেছি তাতে সাধারণ মানুষ অপমানিত ও লজ্জাবোধ করেছে। অশ্রাব্য ও কুশ্রী যেসব শব্দ, যে ভাষা শৈলী এবং যে বাক্য রীতি তারা প্রয়োগ করেছেন, যে ধরনের উপমা ও ব্যঞ্জনা তারা ব্যবহার করেছেন এগুলো কোন ভদ্র সন্তান ব্যবহার করতে পারে– ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। কবি আবদুল হাকিমের ভাষায়– ক্ষুব্ধ হয়ে বলতেই হয়, 'সেসব কাহার জন্ম নির্নয় ন জানি'। সংসদীয় রীতিনীতিতে এগুলো কোন অবস্থাতেই বরদাশত করা যায় না। সংসদ কর্তৃক গৃহীত কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ীও এ এক অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু এটিই হচ্ছে আজকের বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক কৃষ্টির স্বরূপ। এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হলে আজকে দলমত নির্বিশেষে রাষ্ট্রাতিক শক্তির মদদ ও কৃপাপুষ্ট এই আওয়ামী ফ্যাসিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সকল অহংবোধ, ক্ষুদ্রত্ব ও সংকীর্ণতা ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যারা দেশকে এই ফ্যাসিস্ট চক্রের হাত থেকে উদ্ধার করতে চায় তাদের সকলকে আজ একমঞ্চে হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। এক টেবিলে বসতে হবে। একক কর্মসূচী ঘোষণা করতে হবে। এটিই উপযুক্ত সময়। লড়াই এবং সংগ্রামের strategy- তে মাহেন্দ্রক্ষণ বলে একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। আমার মনে হয়, এটিই হচ্ছে সেই উপযুক্ত সময়। আজ পার্লামেন্টারি ইমিউনিটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বিচার বিভাগকে যেভাবে গালিগালাজ করা হচ্ছে, বিচার বিভাগকে জনসমক্ষে যেভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, সংবাদপত্র সম্পর্কে যেভাবে কুৎসা রটানো হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য দেশে ব্যক্তিবাদ এবং একদলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করা ও তাকে নিরঙ্কুশ করা। তার একটি বিহিত করার জন্য আমি মনে করি ভবিষ্যতে যারা ক্ষমতায় আসবেন তাদেরকে সংবিধান ও সাংবিধানিকতা সম্পর্কে নির্মোহ

www.pathagar.com

নৈর্ব্যক্তিক ভাবনাচিন্তা করে সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানকে জনগণের ধীগুণ, মনন, মনীষা, অভিজ্ঞতা সঞ্জাত উপলব্ধি ও বাস্তবতা, অভিপ্রায় এবং মতামতের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিমার্জন ও পুনর্বিন্যাস করা অত্যন্ত জরুরী। আমাদের দেশে ব্রিটিশ ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্র যেমন কখনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সে ধরনের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো নির্মিত হয়নি, তেমনি অতীতে যেমন আমাদের এখানে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার ছিল, তাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধরনের চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স-এর প্রেসিডেনিসয়াল পদ্ধতির সরকার ছিল না। তাই আজকে আমাদের সামাজিক শক্তিসমূহের বিন্যাসের কথা ভেবে traditional এবং modern elite- দের dichotomy'র কথা ভেবে, অস্তিমান রাজনৈতিক কৃষ্টির কথা ভেবে, সংশোধনযোগ্য সামাজিকায়নের অধঃপতিত রূপের কথা ভেবে একটি workable ও functional effective সরকার, সরকার পদ্ধতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা গভীর গুরুত্বের সাথে ভাবতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বের এক আলোচনায় দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরের Political system-এর কথা উল্লেখ করে বলেছিলাম যে, ওটি ছিল Corporatist model-এর একটি বিশেষ রূপ। আমরা জানি, প্রত্যেক দেশের সংবিধানে কোন না কোন অর্থে সে দেশের জনগণের broad social configuration-এর এক ধরনের reflection ঘটে। কিন্তু এর বাইরেও দেখা গেছে Robert Dahl-এর ভাষায় People as individuals সম্পর্কিত উপাত্ত আহরণ করা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই অনেক দেশের সংবিধানই Civic wisdom-এর democratic magnifier-এর কর্ম সম্পাদন করতে পারলেও, এমনকি বৃহত্তর গণতন্ত্র এবং গভীরতর Wisdom-এর জন্য সত্যিকারের effects সৃষ্টি করতে পারলেও, আধুনিক সমাজে তা বাস্তবে সম্ভবপর কার্যক্ষম রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। তৃতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিক সংবিধানের আনুষ্ঠানিক দস্তুর ইংরেজদের গণতন্ত্র থেকে খুব একটা ভিন্নতর ছিল না। অথচ দেখা গেছে যে, ইংরেজদের গণতন্ত্র ফ্রেঞ্চদের থেকে বৃহত্তর degree of political wisdom বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। আসলে কোন কিছুকে সাংবিধানিকতা দান করা অত সহজ ব্যাপার নয়। Supportive governmental agencies- এর মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের চেয়েও আরও অনেক কিছুই এর দ্বারা বুঝান হয়ে থাকে। সাংবিধানিকতা অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে attempt করে to elicit, protect and magnify the application of democratic civic wisdom to the problems of government. এদিক থেকে বিচার করলে সরকারের ধরনের general theory এবং সাংবিধানিককতার special theory'র পার্থক্য নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝা যাবে। আধুনিক সাংবিধানিকতার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে যেভাবেই হোক সরকারকে যুগপৎভাবে জনপ্রিয় এবং যথার্থ হবার পথে যে সব সমস্যা রয়েছে তা নিরসন করা। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ সম্পর্কে Edward Shils মন্তব্য করেছেন যে, এসব হচ্ছে old societies and new states এবং Clifford Geeartz-এর ভাষায়, এসব দেশে integrative revolution-এর মাধ্যমে quest for modernity'র সংগ্রাম নিরন্তর চলছে। Deeply entrenched একটি traditional social structure- কে উচ্ছেদ করে উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের অগ্রযাত্রা সাফল্যমন্ডিত করতে হলে Organski যে syncratic politics উদ্ভাবন ও অনুসরণের কথা বলেছেন এই মুহূর্তে তার কোন বিকল্প আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। Sycratic মডেলের নানান রকমফের আবার দাঁড়িয়ে যেতে পারে। Issue টা হচ্ছে style of governanceটা এমন হতে হবে যাতে Industrial বা enterpreneurial elites এবং deeply entrenched traditional agrarian elites- দের conflict eliminate করে bargain payoffs এবং Proactive devices-এর মাধ্যমে একটি broad coalition গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এই Coalition-এ ছাড় এবং Compromise ও accomodation অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপাদান। ক্ষমতাসীন হয়ে এ Coalition social structure-কে তেমন বেদনা বা পীড়াদায়কভাবে ঝাঁকুনি না দিয়ে

www.pathagar.com

traditional ও local peculiarities কে বিবেচনায় নিয়ে internal impediments দূর করার সর্বার্থসাধন বা Comprehensive পরিকল্পনা প্রণয়ন করে রাষ্ট্র গঠন ও জাতি গঠন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের সংঘাত ও বৈরিতা পরিহার করার জন্য সংবিধানে সুনির্দিষ্ট রক্ষাকবচের বিধান আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এসব কিছুকে নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রঘাতী চক্রসমূহকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী, ইসলামী শক্তিসহ সকল উৎপাদনমুখী সামাজিক শক্তির মধ্যে একটা সুদৃঢ় সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। A new social covenant স্বাক্ষর করা আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রপতিকে একটি পত্রিকায় যেভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে নাম ধরে নিবন্ধ, প্রবন্ধ এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করে আক্রমণ করা হয়েছে তা অত্যন্ত শঙ্কার কারণ। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এ ধরনের একজন মহামান্য ব্যক্তি সম্পর্কে এটর্নি জেনারেল ও তার দফতর নীরবতা পালন করেছে। প্রধানমন্ত্রী ও তার কার্যালয় নীরবতা পালন করেছে, এমন কি স্পীকার এবং জাতীয় সংসদও নীরবতা পালন করেছে। এর চেয়ে আর লজ্জাজনক কী হতে পারে? কাজেই আজকে আমাদের নতুন করে সব কিছু ভাবতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে আগে যেটি প্রয়োজন সেটি হল, এদেশের মানুষের হৃত অধিকারকে যদি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, সর্বোপরি থট পুলিসিংকে যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলে এই মুহূর্তে এই সরকারকে বিদায় দিয়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান অনিবার্য করে তুলতে হবে। এদেশের মানুষের সামনে এ মুহূর্তে আর কোন বিকল্প আছে বলে আমি মনে করি না।

মাহবুব উল্লাহ :

আমি গত কিছুদিন ধরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড লেন্ডিসের ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ, যা সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছে, The Wealth and Poverty of Nations গ্রন্থটি পড়ছিলাম। এই বইটির ২১৭ পৃষ্ঠায় লেন্ডিস বলেছেন যে, একটি Society'র ideal growth and development-এর Characterestic গুলো কী কী? তিনি ৫টি উপাদানের কথা বলেছেন– "1. knew how to operate, manage, and build the instruments of production and to create, adapt, and master new techniques on the technological frontier, 2. Was able to impart this knowledge and know-how to the young, whether by formal education or apprentinceship training. 3. Chose people for jobs by competence and relative merit; promoted and demoted on the basis of performance. 4. Accorded opportunity to individual or collective enterprise, encouraged initiative, competition, and emulation. 5. Allowed people to enjoy and employ the fruits of their labor and enterprise. আর এই প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের শর্তগুলো পূরণ করার জন্য তিনি আরও ৭টি রাজনৈতি শর্তের কথা বলেছেন।

"1. Secure rights of private property, the better to encourage saving and investment. 2. Secure rights of personal liberty-Secure them against both the abuses of tyranny and private disorder (crime and corruption). 3. Enforce rights of contract, explicit and implicit. 4. provide stable government by publicly known rules (a government of law rather than men). If democratic, that is, based on periodic elections, the majority wins but does not violate the rights of the losers; while the losers accept their loss and look

www.pathagar.com

forward to another turn at the polls. 5. Provide responsive government, one that will hear complaint and make redress. 6. Provide honest government, such that economic actors are not moved to seek advantage and privilege inside or outside the maket place. In economic jargon, there should be no rents to favor and position. 7. Provide moderate, efficient, ungreedy government.-The effect should be to hold taxes down, reduce the government claim on the social surplus, and avoid privilege". এখন আমরা এই শর্তগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখবো, বর্তমানে যে সরকারটি ক্ষমতায় আছে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে সত্য কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠের কোন অভিযোগের প্রতি কোন কর্ণপাত করে না। এই সরকারটি দুর্নীতিমুক্ত নয়। এই সরকার যে কোন নিয়োগের ক্ষেত্রে মেরিট বা যোগ্যতাকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার না করে ব্যক্তিগত পরিচয় ও দলীয় আনুগত্যকে ব্যবহার করে। এছাড়া সবচেয়ে বড় মারাত্মক জিনিসটি হচ্ছে, এই সরকার আইনের শাসন চালাচ্ছে না। চালাচ্ছে ব্যক্তির ইচ্ছা অভিরুচি ও খামখেয়ালীর শাসন। এ ধরনের শাসনকে কোনক্রমেতো গণতান্ত্রিক বলা যাবেই না, বরং বলা যাবে চরম স্বৈরতান্ত্রিক। আমরা জানি, পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষা করা, ব্যক্তি জীবন– স্বাধীনতা, সম্পদ-সম্পত্তিকে রক্ষা করা। অথচ রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ এজেন্সিটি সেই দায়িত্ব বর্তমানে পালন করছে না। এটি অন্তত দেশের প্রায় সকল সংবাদ পত্রের পরিবেশনা থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়– This government has lost the right to govern the people এবং এই পরিস্থিতিতে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, যেদিন সাদেক হোসেন খোকা, আবদুল্লাহ আল নোমান, জয়নাল আবেদীন ফারুকের ওপর পুলিশ নির্বিচারে গুলী চালালো পুলিশ কোডকে লংঘন করে, সেইদিনই উচিত ছিল এ দেশের সমস্ত বড় রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের এক টেবিলে বসে এর একটি প্রতিবিধান নির্ণয় করা এবং দেশবাসীকে উদাত্ত আহবান জানানো, চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য।

আফতাব আহমদ :

এ প্রসেঙ্গ আমিও বিশেষভাবে একটি কথা বলতে চাই, ড. মাহবুব উল্লাহ আপনি যথার্থই বলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের অর্থ হচ্ছে সংখ্যালঘিষ্ঠের সম্মতি নিয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন করবে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে যদি যান্ত্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে অনেকে ভাবতে চাইবেন সংসদে যে দলের অধিক সংখ্যক সদস্য রয়েছে, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সমাজে স্থিতি, শান্তি এবং নির্বিঘ্ন প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন যদি আমরা কামনা করি, তাহলে দেখতে হবে সামাজিক শক্তিসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংসদে যারা অধিক সংখক আসন পেয়েছে তাদের সমর্থক কী না? অথবা তাদের পক্ষে কী না? তাছাড়া একটি নির্বাচন হয়ে যাবার পর যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন সে দল যদি ভাবতে থাকে, যা খুশী তা যথেচ্ছভাবে করার নিরংকুশ ও এক তরফা ম্যান্ডেট পেয়ে গেছে তা ভাবাও হবে মারাত্মক অন্যায়, পাপ, অপরাধ ও অমার্জনীয় ভুল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে এসব বিষয় যদি নিরূপণ না করে এক লহমায় একটি সিদ্ধান্তে পৌছার বা তুষ্টি লাভের চেষ্টা করি, তাহলে মারাত্মক ভুল হয়ে যাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বলতে আমরা বুঝি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এবং ড. মাহবুবর উল্লাহ আপনার জানা আছে যে, আওয়ামী লীগ গত নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্য থেকে মাত্র ৩৩ শতাংশের ভোট পেয়ে অধিক সংখ্যক আসন সংসদে লাভ করে। এককথায় শতকরা ৬৭ জন মানুষ আওয়ামী লীগের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। আজ হাসিনা শুধুমাত্র সংসদের ভেতরে তাঁর দলের যে টেকনিক্যাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, তা দেখে ধরাকে

www.pathagar.com

সরাজ্ঞান করছেন এবং নির্বাচনকালীন সময়ে জনগণের কাছ থেকে তাঁর যে মূল hidden agenda, তা চাতুর্যের সাথে আড়াল করে রেখে এখন জনগণের ওপর চরম নিপীড়ন ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি রয়েছে ভারতের পক্ষপুটে আশ্রয় নেবার আত্মহননমূলক এক হীন কামনা, বাসনা ও লালসা। এ হচ্ছে ব্যক্তিপূজা ও পৌত্তলিকতার ওপর নির্ভরশীল এক নিকৃষ্টতম সর্বেশ্বরবাদী ফ্যাসিজম। এর আর অন্য কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না। গত কয়দিন আগের বর্বরোচিত পৈশাচিক ঘটনাবলীর কথাগুলো একবার স্মরণ করলে এদের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে কারও পক্ষেই কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। একবার বিচার করে দেখুন, সংসদের স্পীকার মারাত্মকভাবে আহত তাঁর দুইজন মান্যবর সদস্যকে দেখতে যাওয়া তো দূরের কথা খোঁজ-খবর নেয়া, সামান্যতম সহানুভূতি পর্যন্ত প্রকাশ করলেন না। সংসদের পবিত্র মেঝেতে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘনঘন ঐ ফ্যাসিস্ট ঘটনাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও হাসি তামাশায় পরিণত করতে গিয়ে ঢাকার সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, সংসদের বিশিষ্ট সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার ওপর ফ্যাসিস্ট ঈগল ফোর্সের নারকীয় হামলায় রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনাকে রঙ্গ-রসিকতা করছিলেন, স্পীকার পাষণ্ড স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে শিষ্টাচার সম্পর্কে ও সংসদীয় ভব্যতা সম্পর্কে সতর্ক না করে ও স্মরণ না করিয়ে দিয়ে বরং সেই নির্মম তামাশায় শরীক হন। দুজন সংসদ সদস্য যেখানে আহত হয়েছেন এবং একজন প্রাক্তন মন্ত্রী যেখানে আহত হয়েছিলেন, তাদের দেখতে যাওয়া তো দূরের কথা, ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা তো দূরের কথা এমনকি আহতদের প্রতি সহানুভূতি জানানো তো দূরের কথা, সংসদীয় রীতিনীতি, সুসভ্য নাগরিকের সকল সুরুচি ও সকল শিষ্টাচার বিসর্জন দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ভাষায় এবং যে অঙ্গভঙ্গি করে সংসদে খিস্তিখেউড় করেছেন, তা যে কোন চরম অর্বাচীন ও ইতর প্রাণীরও অভিরুচিতে বাধত। হাসিনা ভুলে গেছেন, যারা তাঁর জন্মদাতা মুজিবকে যৎসামান্য হলেও সম্মান ও শ্রদ্ধা করত, তারা লজ্জা ও ঘেন্নায় মুখ লুকিয়ে শিউরে উঠে ভাবতে থাকে 'মুজিব এ কোন ধরনের সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন? একে কী ধরনের শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছিলেন? হাসিনা তাঁর প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে গেলেন। তিনি ভুলে গেছেন যে, তিনি সারাদেশের প্রধান মন্ত্রী এবং দেশের সকল নাগরিক তাঁর কাছ থেকে একই ধরনের সুসভ্য আচরণ প্রত্যাশা করে। হাসিনা সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যটি সম্পাদনের দিকে ন্যূনতম নজরও দেয়া প্রয়োজন বোধ করেননি। এককথায় বলা যায়, তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন ও দলের মধ্যকার স্তাবকদের একাংশকে নিয়েই দেশ শাসনে বিশ্বাসী। একটি বিষয় আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। তা হল পারিবারিককরণ ও দলীয়করণের বাইরে আর যেসব কাজ হাসিনার সরকার করছে, সে সব দেশের জন্য কতটুকু মঙ্গলজনক আর কতটুক অমঙ্গলজনক সে বিষয়ে আমরা সবাই ওয়াকিবহাল; অত্যাচার নিপীড়নের শিকার হয়ে নিরীহ ও অসহায় মানুষ যখন ন্যায়ের প্রত্যাশায় বারবার বিচারালয়ের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হচ্ছে, তখন আমরা লক্ষ্য করছি বিচার বিভাগকে আওয়ামী গোষ্ঠীরা ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে– উচ্চবিচার বিভাগকে তারা রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে, যেহেতু সেখানে খুব বেশীকিছু করার সাহস তারা এই মুহূর্তে পাচ্ছে না। এরই পাশাপাশি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় যে প্রতিষ্ঠান, এই জাতির বিভিন্ন সংকটকালে, এদেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো যে প্রতিষ্ঠান, এদেশের অখন্ডতা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে রক্ষার জন্য সদা অতন্দ্র যে প্রতিষ্ঠান সেই সশস্ত্র বাহিনীকে আজ ধ্বংস করার এক গভীর ষড়যন্ত্রও চলছে। ভারতীয় মিলিটারী হার্ডওয়্যার ও লজিস্টিক্স এবং সাপ্লাইয়ের ওপরে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে ডিপেনডেন্ট করার জন্য একদিকে সামরিক কাজে ব্যবহারের অযোগ্য ভারতীয় যানবাহন, নিম্নমানের ভারতীয় সমরাস্ত্র প্রকিউর করার পলিসি আমাদের কমপ্লিটলি ভারতনির্ভরই শুধু করে তুলবে না– সামরিক শক্তির দিক থেকে আমরা হয়ে পড়বে অকার্যকর ও বীর্যহীন। রুশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ক্রয় করা হচ্ছে সেকেলে মিগ-২৯ বিমান। যার স্পেয়ার্স পেতে হলে ভবিষ্যতে ভারতের

www.pathagar.com

কাছেই আমাদের হাত পাততে হবে। এক কথায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে হ্যান্ডিক্যাপড বা প্রতিবন্ধিত্বে আক্রান্ত একটি অকেজো প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার রাষ্ট্রঘাতী ব্যবস্থাটি প্রায় পাকাপোক্ত করে আনা হচ্ছে। আজকে পুলিশ বাহিনীকে প্রাইভেট বাহিনী হিসেবে যেমন ব্যবহার করা হচ্ছে, অপরদিকে দেশের জনসাধারণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে যে, ক্ষমতাসীন দলের একজন হোমরাচোমরা ব্যক্তি যার সামাজিক খ্যাতি খুব বেশী নেই, কিন্তু লুণ্ঠিত অর্থের দাপট রয়েছে– তিনি পুলিশকে পাইকবরকন্দাজের মত তাড়া করে সাথে নিয়ে গিয়ে, রাজধানীর অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত একটি ব্যাংক দখল করে বসেন। তারপরও আমরা দেখেছি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরকে এক ধরনের পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়ে দলপুষ্ট গৃহপালিত কর্মচারীর মতই আচরণ করেছেন। আমরা সকলে জানি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র-কর্মীরা কীভাবে একের পর এক নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ করে গেছে এবং এ ব্যাপারে আওয়ামীগোষ্ঠী ছাড়া দলমত নির্বিশেষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। এমনকি, জনসমাজের মধ্য থেকে বিশেষ করে নারী সমাজের মধ্য থেকে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সেই উপাচার্য কিন্তু ঐসব ধর্ষণকারীদেরকে আইনানুযায়ী যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান না করে তাদেরকে কোনরকমে বাঁচিয়ে দেয়ার যে ঘৃণ্য ও হীন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তার জন্য আজ তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। আসন্ন একটি উপনির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন লাভ করেছেন। আমরা যে বারবার বলে আসছি, শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে যতরকমের প্রতিষ্ঠান আছে, সর্বত্রই এই সরকার শুধুমাত্র পরিবারতন্ত্র ও দলবাজি ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দলবাজ উপাচার্যকে আগামী একটি উপনির্বাচনে মনোনয়ন দানের মধ্য দিয়ে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা ও যৌক্তিকতা আজ অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। এই সরকার শুধুমাত্র দুর্বৃত্তসুলভ দলবাজি, পরিবারতন্ত্র এবং লুণ্ঠনের রাজনীতি করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতাকে দখল করেছে। ক্ষমতাসীন এই গোষ্ঠীর রাষ্ট্রাতিক আনুগত্যের কারণে জাতীয় স্বার্থবিনাশী ও রাষ্ট্রঘাতী যতরকমের কর্মতৎপরতা আছে, তা একের পর এক বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রশ্নে বিলম্ব করার আর সময় নেই। এখনই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। আমি মনে করি এই ধরনের পৌত্তলিকতাবাদী ফ্যাসিবাদ যাতে বাংলাদেশের বুকে দ্বিতীয়বার অংকুরিত না হতে পারে, সেজন্য বাংলাদেশের সকল সামাজিক শক্তির মধ্যে একটি নতুন সোশ্যাল কভনেন্ট হওয়া দরকার, একটি নতুন সামাজিক চুক্তি হওয়া অত্যাবশ্যক। এই কভনেন্টের ভিত্তিতেই বাংলাদেশে নতুন করে যাতে আর ফ্যাসিবাদের পুর্নজন্ম না ঘটে, তা নিশ্চিত করা সম্ভব। ভারতের কৃপাপুষ্ট বর্তমান রাষ্ট্রঘাতী চক্র রাষ্ট্রক্ষমতায় পুনরায় যাতে অধিষ্ঠিত হতে না পারে, সেটি নিশ্চিত করার জন্যই এই নতুন সামাজিক চুক্তিটি– This new social covenant অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আজকে বিরোধী শিবিরে যাঁরা রাজনীতি করছেন, যাঁরা দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতায় যাঁরা বিশ্বাস করেন এবং জনদরদী, তাঁদের সকলকে এ বিষয়ে সবিশেষ নজর দেয়ার জন্য আমি উদাত্ত আহবান জানাব এবং অনুরোধ করব, আর কালবিলম্ব না করে সুদৃঢ় জঙ্গী জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে 'দেশ বাঁচাও' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

www.pathagar.com

২৮ নভেম্বর ১৯৯৯

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী স্মরণে

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক জেলে-তাঁতি, মুটে-মজুর, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্তসহ সর্বস্তরের মানুষের নয়নমণি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে গত ১৭ নভেম্বর। এই দিনটি বছর ঘুরে ঘুরে আমাদের কাছে আসে, আসবে, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, এই পৃথিবী থাকবে, যতদিন এই পৃথিবীর মানুষ থাকবে। মওলানা ভাসানী আমাদের এই শতাব্দীর এবং বিগত শতাব্দীর অন্যতম মহাপুরুষ। মওলানা ভাসানীর জন্ম হয়েছিল এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে, সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামে। কিন্তু মওলানা ভাসানীর কর্মক্ষেত্র, রাজনৈতিক জীবনের একটি বিরাট অংশ কেটেছে আসামে। এই আসাম, যেটি আজ নানানভাবে বিভক্ত হয়ে ৭টি রাজ্যে পরিণত হয়েছে, এক সময়ে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, স্বাপদ-সংকুল। বাংলাদেশের যেসব মানুষ ভূমিহীন হয়ে পড়তো, তারা তাদের জীবন-জীবিকার সন্ধানে আসামের দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে এক সময়ে বসতি স্থাপন করেছে এবং এই বসতি স্থাপনের মধ্যদিয়েই আসামে কৃষি ও উৎপাদন ব্যবস্থা সমৃদ্ধি অর্জন করে। একটা সময় এসেছিল, কয়েক বছর আগের কথা, যখন আসামে স্থানীয় অধিবাসী এবং এই বাংলাদেশ থেকে যাওয়া লোকজনের মধ্যে একটা ভেদরেখা নির্ণয় করা হয়েছিল এবং আসাম থেকে বিদেশী খেদাও' নাম দিয়ে বাংলাদেশের কৃষকদের তাড়িয়ে দেয়ার একটা প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছি। এরকম প্রচেষ্টা ব্রিটিশ আমলেও হয়েছে। মওলানা ভাসানী সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছিলেন, সেই কুখ্যাত লাইন-প্রথা বিরোধী আন্দোলন, আজও তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। আমরা মওলানা ভাসানীকে কী ভাবে মূল্যায়ন করবো? একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাকে আমরা কীভাবে দেখবো? মওলানা ভাসানী কী একজন কাঠমোল্লা ছিলেন? মওলানা ভাসানী কী একজন আধুনিক মানুষ ছিলেন? মওলানা ভাসানী কী মধ্যযুগ থেকে কৃষকদের-সামন্ত শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে যে লড়াই এর যে বিপ্লবী ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যের সর্বশেষ প্রতিনিধি? মওলানা ভাসানী কী আমাদের আজাদী ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক?

আমরা বহুভাবে মওলানা ভাসানীকে দেখতে পারি। মওলানা ভাসানী উল্লেখ করার মত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর যে অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্থাৎ সামাজিকায়নের মাধ্যমে তিনি যে জ্ঞানার্জন করেছিলেন, সেটা তুলনাবিহীন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই, তিনি কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশ ও আসামের কৃষকদের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলেন। এমন সাদামাটা সরল হৃদয়ের মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তিনি জিন্নাহ সাহেবের সামনে যেভাবে বাংলার কৃষকের হত দরিদ্র অবস্থা বর্ণনা করে কেঁদে ফেলেছিলেন, সেটা লক্ষ্য করে জিন্নাহ সাহেবের মত একজন প্র্যাগমেটিক নেতা বলেছিলেন, এই রকম আবেগপ্রবণ মানুষকে দিয়ে রাজনীতি হয় না। এখানে সম্ভবত জিন্নাহ সাহেবের রাজনীতির সঙ্গে মওলানা ভাসানীর রাজনীতির একটা পার্থক্য আছে। জিন্নাহ সাহেব রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছিলেন। রাজনীতিকে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের পন্থা হিসেবে গণ্য করেছিলেন এবং এই উপমহাদেশের মানচিত্রে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী সেই রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনে এক বিরাট অবদান রেখেছিলেন। আমরা যারা সিলেট রেফারেন্ডামের কথা জানি- যে সিলেট আসাম প্রদেশ গঠিত হবার পূর্বে ঢাকা বিভাগের একটি জেলা ছিলো- সেই সিলেট আসামের অঞ্চল হিসেবে থাকবে, না পূর্বপাকিস্তানে আসবে– এই

www.pathagar.com

প্রশ্নে যখন গণভোট নেয়া হল সেই গণভোটকে পাকিস্তানের পক্ষে সফল করার জন্য মওলানা ভাসানী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। মওলানা ভাসানীর আবেগপ্রবণ মনের কথা ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের Friends Not Masters বইয়ের শেষদিকে টীকায় উল্লেখ করা আছে। হ্যাঁ, মওলানা ভাসানী একজন আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। যিনি মানুষকে ভালবাসেন, সাধারণ মানুষের প্রতি যাঁর দরদ আছে তাঁর পক্ষে আবেগপ্রবণ হওয়ার বিকল্প কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু তাই বলে তিনি যে একেবারে অপার্থিব ছিলেন, একথাও বলা যাবে না।

তিনি এই দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়েছেন। এমনকি তাঁর জীবনের একটি বিরাট স্বপ্ন ছিল একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সন্তোষে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় যথার্থ অর্থে সেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে যে সকল সরকার ক্ষমতায় এসেছে তারা মওলানা ভাসানীর নাম ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা নিয়েছে, অথচ মওলানা ভাসানীর আরব্ধ কর্মটি সমাধা করেননি। মওলানা ভাসানী এই অঞ্চলের কৃষক-প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের জন্য বহু সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এর মধ্যে সিরাজগঞ্জের প্রজা সম্মেলন, কাগমারী প্রজা সম্মেলন বিখ্যাত হয়ে আছে। কাগমারীতে সন্তোষের জমিদার মুসলমানদের গরু জবাই করতে দিত না। মওলানা ভাসানী এর প্রতিবাদ করলেন এবং তিনি তার শিষ্য ও অনুসারীদের নিয়ে এই অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন। এভাবেই তিনি লড়াই করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, মওলানা ভাসানীর রাজনীতির মধ্যে ধার্মিকতা, ধর্মাশ্রয়িতা যেমন ছিল আবার অন্যদিকে আধুনিকত্য ছিল। তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন, তিনি ইসলামের কথাও বলতেন এবং আমাদের আজকের এই বাংলাদেশের সত্যিকারের রূপকার যদি কাউকে বলতে হয়, তাহলে মওলানা ভাসানীকেই বলতে হবে। কারণ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ এই দেশে যে স্বৈরাচারের জন্ম দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন মওলানা ভাসানী এবং তিনি একটি সংগঠিত বিরোধীদলের জন্ম দিয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে আওয়ামী মুসলিম লীগ। মওলানা ভাসানীর অবদান বহুবিধ। মওলানা ভাসানীর রাজনীতির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– তিনি আজীবন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। এ দেশের জনগণকে আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের অভিসন্ধি সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ করেছেন। এখানে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে হক-ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট জয়যুক্ত হয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা খুব বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এখানে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং ৯২ (ক) ধারা জারি করা হয়েছিল। এ সময় মওলানা ভাসানী হেলসিংকিতে শান্তি সম্মেলনে ছিলেন। সেই মুহূর্তে ইস্কান্দার মির্জা অত্যন্ত দম্ভের সঙ্গে উক্তি করেছিলেন যে, মওলানা ভাসানী যদি দেশে ফিরে আসেন তাহলে এমন একজন দক্ষ সৈনিক দিয়ে তাকে গুলী করা হবে যাতে সেই গুলী কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, এবং লিয়াকত আলী খান আস্ফালন করে তার সম্পর্কে বলেছিলেন যে, "সের কুচাল দেঙ্গে" অর্থাৎ মাথা কেটে নেয়া হবে। তৎকালীন পূর্ব বাংলায় স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের চেতনার যে উন্মেষ, তার জন্য মওলানা ভাসানীর যে অবদান, সেটা এ দেশের ইতিহাসে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মওলানা ভাসানী তাঁর হাতে বহু রাজনীতিককে রাজনীতি শিক্ষার হাতেখড়ি দিয়েছেন। মওলানা ভাসানী বলতেন, 'আমার ৩৩ জন সেক্রেটারীর মধ্যে মুজিবরই হল শ্রেষ্ঠ সেক্রেটারী'। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে বরাবর স্নেহঝরা কণ্ঠে মুজিবর বলেই সম্বোধন করতেন। শেখ মুজিব সম্পর্কে বলতে গিয়ে মওলানা ভাসানী বলতেন, এই মুজিবরকে আমি সামান্য কিছু পয়সা দিয়ে পাঠালেও সে একটা চোঙ্গা নিয়ে সাইকেলে চড়ে ঢাকা শহর থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ঘুরে আসত এবং আওয়ামী লীগের কাজ করত।' এভাবেই মওলানা ভাসানীর হাতে শেখ মুজিবের রাজনীতির গণভিত্তি তৈরী হয়েছে। ১৯৫৭ সালে যখন সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন আওয়ামী লীগের বিঘোষিত নীতি ছিল, জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা- আর

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দী সাহেব ক্ষমতায় গিয়ে বললেন যে, জোটনিরপেক্ষ থাকা আর আফ্রিকা এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার অর্থ হচ্ছে শূন্যের সঙ্গে শূন্য যোগ করা। আর যদি পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয় তাহলে তার ফলে একটি সমষ্টি অর্থাৎ জিরো প্লাস সামথিং সৃষ্টি হবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে বক্তৃতা দিতে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলেও তিনি এসেছিলেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সামনের মাঠে তিনি তাঁর এই পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে ওকালতিও করেছেন। তিনি Foreign Affairs পত্রিকাতেও এর পক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রতিভাধর রাজনীতিবিদ ছিলেন, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক চিন্তারদুস্তর পার্থক্য ছিল। এমনকি যখন আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসল, তখন মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে জনসভা করে বললেন, 'তোমরা ক্ষমতায় গেছো। প্রধানমন্ত্রী হয়েছো, কিন্তু আমার হাতে আছে চাবুক, জনতার আন্দোলনের চাবুক। তোমরা যদি জনগণের বিরুদ্ধে কিছু করো, তাহলে এই চাবুক মেরে তোমাদের আমি শায়েস্তা করবো।' অর্থাৎ চিরকালের বিদ্রোহী পুরুষ চিরকালের প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিলেন মওলানা ভাসানী। তিনি কখনোই রাষ্ট্রক্ষমতায় যাননি। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তনে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। যেমন আমরা লক্ষ্য করি, ১৯৬৮ সালে যখণ সারাদেশে প্রচণ্ড হতাশা এবং সকলে ধরেই নিয়েছিল যে, আইয়ুব খান যখন তার উন্নয়নের দশক উদযাপন করছে, এই দেশ থেকে হয়তো আর কখনও এই স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অবসান ঘটবে না। মওলানা ভাসানী মানুষের হৃদয় অনুভূতির কথাটি জানতেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন– 'মাটিতে পাতিয়া কান/শুনেছি শুনেছি কী কহে মাটির প্রাণ।' মওলানা ভাসানীর জন্য একথাটি অত্যন্ত প্রযোজ্য এবং মওলানা ভাসানী মাটির মানুষের ভাষায় কথা বলতেন। আনা লুই স্ট্রং বলেছিলেন, পৃথিবীতে তিনজন বক্তা আছেন, যাঁরা জনগণের ভাষায়, জনগণের বোধগম্য ভাষায় কথা বলেন। এঁরা হলেন, চীনের নেতা মাও সে তুং, ইন্দোনেশিয়ার এক সময়কার কম্যুনিস্ট নেতা ডি এন আইদিত এবং কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো। আমি বলবো এই নামের সাথে আরও একটি নাম যুক্ত হতে পারে, তিনি হলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মওলানা ভাসানীর শিক্ষা নিয়ে অনেকে তাঁর জীবদ্দশায় ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁকে বলা হয়েছে 'লুঙ্গীসর্বস্ব নেতা'। অথচ এই লুঙ্গীসর্বস্ব নেতা যে কত প্রজ্ঞাবান, কত মেধাবী ছিলেন, সেটা বর্ণনা করা কঠিন। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করার আমার সুযোগ হয়েছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য বিবৃতি ড্রাফট করার জন্য একটা দায়িত্ব সম্পন্ন কমিটি কাজ করত। যে কমিটিতে ডঃ আলীম আল রাজি, মশিয়ূর রহমান (যাদুমিয়া) আনোয়ার জাহিদ প্রমুখের মত ব্যক্তি কাজ করতেন। তাঁরা ইংরেজী ভাষায় তৈরী করা তাঁদের ড্রাফট মওলানা সাহেবের কাছে পেশ করার পর তিনি বলতেন, 'পড়ো, তোমরা কী লিখেছো?' নুরুল হুদা কাদের বক্স পড়ে শোনানোর পরে মওলানা বলতেন– ঐ শব্দটার পরিবর্তে এ শব্দটি ব্যবহার করলে কেমন হয়– ইত্যাদি এবং লক্ষ্য করা যেত যে বিশেষ শব্দটি তিনি সাজেস্ট করতেন, সেই শব্দটিই প্রাসঙ্গিকভাবে যথার্থ ভাষাগত প্রয়োগ। তিনি বাংলা এবং উর্দুতে অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। ১৯৭০ এ কৃষক স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনে সন্তোষে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক ডেলিগেট এসেছিল। সম্মেলনে তিনি বাংলার পরিবর্তে উর্দু, ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানী মেহমানদের সুবিধার্থে। তাঁর মত এরকম সাধু উর্দু ভাষা আমি খুব কম লোকের মুখেই শুনেছি।

মওলানা ভাসানীর কূটনৈতিক মাত্রাজ্ঞানও ছিল চমৎকার। ১৯৭২-৭৫ এর সময়টায় বাংলাদেশ ছিল রুশ-ভারতের বলয়ে। কিন্তু তিনি যখন পল্টন ময়দানে এই রুশ-ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতেন, সেখানে তিনি শালীনতা ও সৌজন্যবোধ হারাতেন না। তিনি সভিয়েত রাশিয়ার সমালোচনা করতে গিয়ে ভাষা প্রয়োগ করতেন পরিমার্জিত। তখন সভিয়েত রাশিয়াতে ব্রেজনেভ ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁকে উদ্দেশ করে মওলানা বলতেন ঃ 'ব্রেজনেভ, তোমার দেশ সভিয়েত ইউনিয়ন, তোমার দেশ পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তোমার দেশ দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষকে সাহায্য করেছে। তোমরা আজকে দিল্লীকে মদদ দিচ্ছ

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য। এইটাতো আমরা লেনিনের দেশের কাছ থেকে আশা করি না।' এভাবে তিনি তাঁর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভারসাম্য পূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করতেন। এমনকি ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তাঁকে সম্বোধন করতেন 'প্রিয় দর্শিনী' বলে। এটি ছিল ইন্দিরাকে রবীন্দ্রনাথের দেয়া ডাক নাম। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করতে গিয়েও পরিমিতিবোধ কখনও হারাতেন না। যেমন তিনি বলতেন, 'ইন্দিরা, তুমি জওহর লালের মেয়ে। তুমি মতিলাল নেহরুর নাতনী। তোমার কাছে আমরা অনেক কিছু আশা করি। তোমার পিতার সঙ্গে একসংগে আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি। তোমার পিতা আমার বন্ধু ছিল। তোমার কাছে আমরা বাংলাদেশের মানুষ এ ধরনের আচরণ আশা করি না।' অর্থাৎ একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন মওলানা ভাসানী।

তিনি সাধারণ মানুষকে কত যে ভালবাসতেন সেটা বোঝা যায় মরহুম ফজলে লোহানীর 'দৈনিক পাকিস্তানে' প্রকাশিত 'মহিপুরের প্রান্তর' সিরিজটি পড়লে। তাতে তিনি লিখেছেন যে, মওলানা ভাসানীর কাছে অনেকেই আসত পানিপড়া নিতে রোগমুক্তি ও বিপদ মুক্তির জন্য। মওলানা ভাসানী সবাইকে ফু দিয়ে পানি পড়া দিতেন। এই পানিপড়ার পাশাপাশি তিনি তার কুর্তার পকেট থেকে অনেককেই দু/পাঁচ টাকা বের করেও দিতেন চিকিৎসা করানোর জন্য। মওলানা ভাসানীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, 'এই লোকটি আমার কাছ থেকে একদিকে নিয়ে গেল বিশ্বাস, অন্যদিকে নিয়ে গেল বিজ্ঞান।' অর্থাৎ পানি পড়া দিয়ে বিশ্বাসের শক্তি অর্জন এবং আজকের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে– মানুষ যদি আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় তাহলে অনেক সময়ে অনেক কঠিন রোগ নিরাময় সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসারও যে প্রয়োজন আছে, সেটাও কিন্তু মানুষকে বোঝাতে হবে। মওলানা ভাসানী সম্পর্কে বলতে গেলে চমৎকার সব ঘটনা বলার আছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর একটি শ্লোগান ছিল– 'জ্বালো, জ্বালো, আগুন জ্বালো।' তিনি যখন সেই '৬৯-এর আন্দোলনের সময়ে পাকিস্তান সফরে গেলেন, করাচীতে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার চেষ্টা করলো এই বলে, 'মওলানা তুমি জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতির প্রচার করছো–' মওলানা সাহেব অত্যন্ত চমৎকারভাবে এর জবাব দিয়েছিলেন এই বলে– এটাতো আমার কথা নয়। এটাতো তোমাদের প্রিয় কবি আল্লামা ইকবালের কথা : ' যে ক্ষেতের ফসল পায় না কিষাণ খেতে, সে ক্ষেতে আগুন জ্বালিয়ে দাও।' লক্ষ্য করা গেল পুরো হলে যত সাংবাদিক সমবেত হয়েছিলেন তারা সবাই মওলানার সঙ্গে সেই কবিতাটি সমস্বরে আবৃত্তি করতে লাগলেন। এরকম চমৎকারভাবে সাংবাদিকদের ফেইস করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। ১৯৬৯ সালে সামরিক শাসন জারির পরবর্তী সময়ে আরেকটি সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি কথা বলছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তর পর্বও শেষ হয়ে গেছে। চা-চক্র ও গল্পসল্প চলছে। কিন্তু মওলানা সাহেব অনুমতিনা দিলে তো সাংবাদিকরা উঠতে পারেন না। কিন্তু অনেকেই অস্থির বোধ করছিলেন, কারণ– তাদেরকে অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। এমন সময় একজন সিনিয়র সাংবাদিক অনুমতি চাইলেন মওলানা সাহেবের কাছে। মওলানা ভাসানী শেখ সাদীর একটি ছত্র বয়ান করলেন, যার অর্থটা হচ্ছে এই যে, প্রিয় মানুষ যারা, তাদেরকে চলে যাও এটা বলতে নেই। এটা বলা যায় না।

মওলানা বললেন, 'তোমরা সাংবাদিকরা হলে আমার প্রিয় মানুষ। কাজেই আমিতো তোমাদেরকে চলে যেতে বলতে পারি না"। রাজনীতির মধ্যে এই যে চমৎকার নান্দনিকতা এটা আজ বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেছে। আমরা তো এখন অনেক দুঃখের সংগে লক্ষ্য করি, দায়িত্বশীল অবস্থান থেকে আজকে রাজনীতিবিদরা যে ভাষায় কথা বলেন, সেটা কোন সভ্যমানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তারা কী মওলানা ভাসানীর কাছ থেকে কিছুই শিখতে পারেন না?

আফতাব আহমাদ :

মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দিনের পর দিন আলোচনা করতে হবে। আমার মনে হয়, মওলানা ভাসানী ছিলেন এ শতাব্দীর এক বিশাল মহীরূহ। এক

www.pathagar.com

বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব, যে ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া অন্ধের হস্তী দর্শনের মতই হবে। তাই মওলানা ভাসানীর জীবনের কয়েকটি দিক নিয়ে শুধু আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব। তাঁকে আজকের বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করব। কায়েদে মজলুম মওলানা আবুদল হামিদ খান ভাসানী কিংবা রাহবারে আওয়াম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী-এই উপাধিগুলো বাংলাদেশের মানুষ তাকে দেয়নি, এই উপাধিগুলো দিয়েছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান– আজ যেটি পাকিস্তান– সেখানকার জনসাধারণ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে হক–ভাসানীর যে জোট, যে যৌথ নেতৃত্বের মধ্যদিয়ে পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের রাজনীতির কবর রচিত হয়, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের 'ডন' পত্রিকা সম্পাদকীয় লিখে মওলানাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছিল, কায়েদে মজলুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দেখিয়ে দিলেন, মজলুমদের কী ভাবে জাগ্রত করতে হয়, তাদের নিজেদের অধিকার কী ভাবে আদায় করতে হয়, প্রতিষ্ঠা করতে হয়। অনুরূপভাবে যখন দেশে সামরিক শাসন জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, তখন মওলানা ভাসানী ছিলেন সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রাণপুরুষ। প্রেরণার মূল উৎস। সে সময়েও পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষক সমাবেশ থেকে আওয়াজ উঠল 'রাহবারে আওয়াম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী'। অর্থাৎ, জনগণের পথ নির্দেশক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। কথাটি আমি এ জন্যই বলছি যে, যত কর্তৃত্ববাদী সরকারকেই আমরা দেখেছি, যতরকম স্বৈরাচারী সরকারকে আমরা দেখেছি, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো যখন সেইসব নিপীড়ন- নির্যাতনমূলক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কোন উপায় খুঁজে পেতেন না, মওলনার জন্য এটি ছিল চোখের পলকের ব্যাপার। কী এক অপূর্ব সম্মোহন দিয়ে, কী এক ঐন্দ্রজালিক মোহন সুর সৃষ্টি করে আধমরা ঘুমন্ত মানুষগুলোকে এক অলৌকিক জীয়ন কাঠি দিয়ে কীভাবে যে জাগিয়ে তিনি একত্রিত করে ফেলতেন, তা বর্ণনা করার মতো কোন ভাষা আমার জানা নেই। তিনি মানুষকে আহবান করে বলতেন ডাক, ও রে ডাক, মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে'। মন্ত্রমুগ্ধের মতো লড়াকু মানুষ যেভাবে জীবন বাজী রেখে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এটি যারা প্রত্যক্ষ করেনি, তাদেরকে বোঝানো আজকে সাধ্যাতীত একটি ব্যাপার। আমি নিজে তাঁর একটি ঘেরাও কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই ১৯৬৮-এর ৬ ডিসেম্বর জুলুম প্রতিরোধ দিবসে পল্টনের মাঠ থেকে যখন তিনি বললেন– "খাদ্যাভাবে মানুষ আজ জর্জরিত, কৃষক আজ মৃত্যুপথযাত্রী, এস ভাই সকল, আমরা ডিসির বাড়ী ঘেরাও করি, এসডিওর বাড়ী ঘেরাও করি, সার্কেল অফিসারের বাড়ী ঘেরাও করি, এস লাট সাহেব 'গভর্ণর মোনেমের' বাড়ী ঘেরাও করি আর চীৎকার করে বলি– আমাদের খাদ্য দাও, খাদ্য দাও, না হয় বুলেট দাও"। এই জঙ্গী শ্লোগান তুলে তিনি যখন আজকে যেটাকে আমরা বঙ্গভবন বলে অভিহিত করছি তৎকালে তা ছিলো গভর্ণর হাউজ– তার সামনে গিয়ে ফটক ধরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন– ' মোনেম খাঁ তুমি বেরিয়ে আস, ভুখা-নাঙ্গা মানুষদের সাথে তুমি কথা বল'। সেখান থেকে অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে পুলিশ যখন লাঠিচার্জ করে সবাইকে সরিয়ে দিল, মওলানা ভাসানী বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এসে মাগরিবের নামাজ আদায় করার পরপরই ঘোষণা দিলেন, ৭ ডিসেম্বর যানবাহন হরতাল। এই যানবাহন হরতাল হয়ে গেল পূর্ণ হরতাল। আর ঐ পূর্ণ হরতালই পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে গেল গণ অভ্যুত্থানে। মওলানা ভাসানী কখনোই ক্ষমতার প্রত্যাশী ছিলেন না। তিনি ছিলেন জনদরদী, কৃষকের বন্ধু, শ্রমিক, ভূমিহীন, সর্বহারার বন্ধু, তরুণের বন্ধু, যুবকের বন্ধু, ভুখা নাঙ্গা সাধারণ মানুষের বন্ধু। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের ছত্রছায়ায় নানাজন নানা ধরনের রাজনৈতিক পাঠ নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবন-দর্শনের মূল মর্মকথা খুব কম ব্যক্তিই ধারণ করতে পেরেছেন। যে শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তী পর্যায়ে মওলানা ভাসানীকে অপদস্ত করে মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত দলকে দ্বিখণ্ডিত করতেও দ্বিধাবোধ করেননি, সেই শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক শিক্ষাও

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীরই হাতে। আর মুজিবী শাসনের সময়ে তার যে স্বৈরচরিত্র, তার যে স্বৈরমূর্তি আমরা দেখি, এটি তাহলে কোত্থেকে এসেছিল? এটি এসেছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অধীনে যখন শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের ন্যাশনাল হোম গার্ডের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর লাঠিয়াল মিনা পেশোয়ারীর সাথে কলকাতায় টহল দিয়ে বেড়াতেন, সেখান থেকে। তখন থেকে তিনি বুঝতে শিখলেন যে, যুক্তি নয়- শক্তিই হচ্ছে রাজনীতির নিয়ামক। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, সভ্যতা বলে, ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, শক্তি নয়- যুক্তিই হচ্ছে রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা রাষ্ট্র বিনির্মাণের ক্ষেত্রে একমাত্র নিয়ামক উপাদান। আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি যে, মওলানা ভাসানীর সারল্যের সুযোগ নিয়ে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে তাঁকে প্রতারিত করেছে। কিন্তু তিনি এতে কখনও দুঃখ পাননি। কিংবা সেই ব্যক্তিকে কখনও অভিসম্পাত করেননি। আমার নিজের কানে শোনা পল্টনের মাঠে দাঁড়িয়ে তিনি বারবার শেখ মুজিবুর রহমানকে আশির্বাদ করেছেন, দোয়া করেছেন। আমার মনে পড়ে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত মুজিবুর রহমান যখন পাকিস্তানী সরকারের দূতদের মারফৎ এক ধরনের রাজিই হয়ে গিয়েছিলেন- প্যারোলে তিনি আইয়ুব খানের সাথে আলোচনা বৈঠকে বসবেন- তখন সে খবর পাওয়ার পরদিন ছিল পল্টনে মওলানা ভাসানীর এক বিশাল জনসভা। সেই জনসভায় দাঁড়িয়ে মওলানা বলেছিলেন, 'আমার তেত্রিশ জন সেক্রেটারীর মধ্যে মুজিবর ছিল শ্রেষ্ঠ সেক্রেটারী। মুজিব, তুমি আমার সন্তানের মত। গণআন্দোলন, গণসংগ্রাম কী জিনিস, তুমি জানো না, তুমি দেখো নাই। আমি জানি, গণআন্দোলন, গণসংগ্রাম কাকে বলে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও। ফরাসী জনগণ যখন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, যখন বিপ্লবের চেতনায় বিস্ফোরিত হয়, তখন বাস্তিলের দুর্গের পতন ঘটেছিলো। ঐ ক্যান্টনমেন্ট ভেঙে বাস্তিলের দুর্গের মতো তার পতন ঘটিয়ে আমি তোমাকো মুক্ত করে আনব। এই আশ্বাসই সেদিন শেখ মুজিবকে শক্তি যুগিয়েছিল, বল যুগিয়েছিল এবং আপসে প্যারোলে যাওয়ার পথ থেকে বিরত রেখেছিল। কিন্তু মুজিবুর রহমান পরবর্তী জীবনে এ কথাটি মনে রেখেছেন কিনা, আমার গভীর সন্দেহ আছে। আরেকটি কথা আমার মনে হয় এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা দরকার, সেটি হচ্ছে, মওলানা ভাসানী ক্ষমতার রাজনীতি করতেন না। একথা যাঁরা বলেন তারা অতি সরলোক্তি করেন। মওলানা ভাসানী নিজে ক্ষমতা চাইতেন না, কিন্তু ক্ষমতা চর্চা করার জন্য, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য শত-সহস্র কর্মী তিনি তৈরী করেছিলেন। তাদের মধ্যে তিনি সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, ঈমান, ইনসাফ- এই সমস্ত মূল্যবোধ সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল রোজ গার্ডেনের সেই সভায়। অনেকেই বলল, 'আমরা মুসলিম লীগ বিরোধী, আমরা কেন আমাদের দলের নামে মুসলিম শব্দটি রাখব? আমরা তো অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে চাই।' মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, ' যে মুসলিম লীগ এদেশের কৃষক প্রজা সর্বসাধারণের শোষণ মুক্তির জন্য পাকিস্তান এনেছে; যে মুসলিম লীগের জন্য পাকিস্তান সংগ্রামে আমিও অংশ নিয়েছি, সেই মুসলিম লীগ আজ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, সেই মুসলিম লীগ হচ্ছে পকেট মুসলিম লীগ। আর আমি যে মুসলিম লীগ করতে যাচ্ছি সেই মুসলিম লীগ জনগণের মুক্তিতে বিশ্বাস করে, সেটি হচ্ছে জনগণ বা আওয়াম এর মুসলিম লীগ- অর্থাৎ আওয়ামী মুসলিম লীগ। তিনি সেই আওয়ামী মুসলিম লীগের মেনিফেস্টোতে যাকে মূল দাবী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিলো তাতে কয়েকটি কথা চমৎকারভাবে উৎকীর্ণ করেছিলেন। বহু পরে আওয়ামী মুসলিম লীগ তা তার মেনিফেস্টো থেকে বাদ দেয়। কিন্তু মওলানা ভাসানী আমৃত্যু সেই নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন কুল মখলুকাতে যা কিছু আছে সব কিছুরই ওপর রয়েছে মহান আল্লাহ তা'লার সর্বাধিপত্য। অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহই হচ্ছেন সার্বভৌম। মানুষ আল্লাহর বান্দা, পৃথিবীতে আল্লাহর প্রেরিত খলিফা হিসেবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা তার অন্যতম ইবাদত। তাই মূল দাবীতে তিনি

www.pathagar.com

জনগণের সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝিয়েছিলেন "রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর প্রতিভূ হিসাবে জনগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে"। এর দ্বারা তিনি যা বুঝাতে চেয়েছিলেন তা হলো এই যে. জনগণ আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের পথ থেকে বিচ্যুত হলে আল্লাহর প্রতিভূ হিসেবে আর বিবেচিত হবার দাবী রাখে না। অতএব আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতা চর্চার অধিকারও হারায়। বিষয়টিকে আরো প্রাঞ্জল করার জন্য আমি মূল দাবী থেকে প্রণিধানযোগ্য অংশবিশেষ উদ্ধৃত করার লোভ এখানে সংবরণ করতে পারছি না। আওয়ামী মুসলিম লীগের মূল দাবী শীর্ষক মেনিফেস্টোতে বলা হয়েছিলো ঃ "বিরুদ্ধ পরিবেশে মানবের দেহ, মন ও মস্তিষ্কের উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষ পরিবেশের দাস– একথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন। বিরুদ্ধ পরিবেশে পূর্ণ ইসলামিক মনোভাব এবং সমাজ বিধান গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানগণ বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতে এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়াই বিরুদ্ধ পরিবেশে বা দারুল হরবের পরিবর্তে ইসলামিক পরিবেশ বা দারুল ইসলাম কায়েম করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু .... শুধু মুসলমানের রাষ্ট্র যা মুসলমানদের জন্য (রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা করিবার এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা প্রভাবান্বিত ইসলাম বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী, ধনতান্ত্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক পরিবেশ গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না।

রব বা স্রষ্টা হিসাবেই সৃষ্টির বিশেষ করে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সাথে আল্লাহর সবচাইতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বস্তুতঃ রব বা স্রষ্টা পালন বা পোষণকর্তা হিসাবে বিশ্ব ও সৃষ্টিকে ধাপের পর ধাপ, স্তরের পর স্তর, পরিবর্তনের পর পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কতগুলি স্থায়ী ও সাধারণ ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে সুনিশ্চিতরূপে চরম সুখ, শান্তি ও পূর্ণ প্রাপ্তির দিকে আগাইয়া দিবেন। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহ শুধু মুসলমানের নয়– জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবের রবই আল্লাহর সত্যিকার পরিচয়, রব হিসাবে রবুবিয়্যাৎ বা বিশ্ব পালনই তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। সুতরাং দুনিয়ার ওপর আল্লাহর খলিফা বা প্রতিভূ হিসাবে মানব এবং খেলাফত হিসাবে রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কাজ ও কর্তব্য হইল আল্লাহর উপায় ও পদ্ধতি অনুসারে বিশ্বের পালন করা এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সামগ্রিক সুখ, শান্তি, উন্নতি, কল্যাণ ও পূর্ণ বিকাশের জন্য চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করা। ..... সাম্রাজ্যবাদী সরীসৃপের ফোঁস ফাঁস শব্দ আজ সমাজের আনাচে-কানাচে সর্বত্র শোনা যাইতেছে। সে ফোঁস ফাঁস শব্দই যেন এই যুগের সঙ্গীত। আমাদের কওমী প্রতিষ্ঠান এই সরীসৃপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া তাহাদের বিষদাঁত উৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর।"

মানব এবং মানবিকতা বিরোধী ফোঁস ফাঁস করা সরীসৃপদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সংগ্রাম করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী যে সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন তাঁকে তিনি শেষ জীবনে হক্কুল ইবাদ বলে উল্লেখ করেছেন। একদিকে ছিল যেমন আল্লাহর হক যা আল্লাহকে দিতে হবে, আর এক দিকে রয়েছে বান্দার হক বা হক্কুল ইবাদ যা বান্দাকে দিতে হবে। আল্লাহর হকের জন্য যে পাঁচটি ফরজ আদায় করতে হয়, সে ব্যাপারে মওলানা ভাসানী যেমন ছিলেন সৎ একাগ্র ও নিষ্ঠাবান, বান্দার হক আদায় করার জন্য শোষিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা মেহনতী মানুষদের সংগঠিত করার জন্য সারাজীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন তেমনি সততা একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের মাঝে তিনি থেকেছেন। তিনি পর্ণ কুটিরে বাস করতেন। বিশাল অট্টালিকায় বাস করতেন না। রাজধানীতে তাঁকে আসতে হত, কারণ রাজধানী থেকেই সংগ্রাম শুরু করার প্রয়োজন হত রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে। কিন্তু তিনি বারবার ফিরে গেছেন সন্তোষের পর্ণ কুটিরে। এখান থেকেই আমাদের বোঝা দরকার, প্লেটো যে গার্ডিয়ান ফিলোসফার কিং-এর কথা বলেছেন, সে ফিলোসফার কিং কী করছেন, সমস্ত নাগরিক যেন দেখতে পায়, মওলানা ভাসানী ছিলেন তেমনি এক প্রতীকি প্রতিভূ। মওলান ভাসানীর ব্যক্তিত্ব এমনই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ

www.pathagar.com

ছিলো যে, সেখানে কোন গোঁজামিল ছিল না। সবাই জানত, তিনি কী ধরনের জীবনযাপন করেন। তিনি কী ধরনের অভিরুচির ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে কী ধরনের শালীনতাবোধ কাজ করে। ব্যক্তিগতভাবে যখন তাঁকে আক্রমণ করা হত, তিনি কোনোদিন তার প্রত্যুত্তরে তেমন কিছু বলেননি। এমনকি, মওলানা ভাসানী মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত মুজিবের জন্য দোয়া করে গেছেন। আমি একটি মহত্তম ঘটনা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। শেখ মুজিবের লাশ যখন ৩২ নং সড়কের ৬৭৭ নং বাড়ীর সিঁড়ির গোড়ায় পড়েছিল এবং কিছুসংখ্যক সামরিক অফিসার যখন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন সন্তোষে– তিনি তার আগের দিন তাহাজ্জুদের নামাজের পর থেকে হু হু করে কাঁদছিলেন, অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছিলেন দেশের ওপর এক ভয়াবহ পরিস্থিতি নেমে আসছে, যে কোন সময় যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, 'হায় আমার মুজিবের কী হবে?' এই ভেবে ভেবে। ঐ সৈনিকরা গিয়ে তাঁকে স্যালুট করে যখন বলল, "হুজুর যা হবার তাতো হয়ে গেছে, আপনি আমাদের দোয়া করুন"। তখন তিনি তীব্র স্বরে চীৎকার করে বললেন, "বেরিয়ে যাও এখান থেকে, তোমরা কারা? তোমরা কী মুসলমান?" তারা উত্তরে বলল, "হ্যাঁ, হুজুর আমরা তো মুসলমান"। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন, "মুজিবর কী মুসলমান?" তারা বলল, "হ্যাঁ হুজুর, তিনি তো মুসলমান"। তখন তিনি বললেন, "তার লাশ কী করেছ?" সৈনিকরা মাথা নীচু করে চুপ করে ছিল। তখন তিনি আদেশ করে বললেন, "যাও, রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন, মুসলমান ছিলেন তিনি। মুসলমানের তরিকা মোতাবেক তাঁর জানাযার নামাজের ব্যবস্থা কর, তাঁর দাফন কাফনের ব্যবস্থা কর। তারপর আমার কাছে আসিবা কথা বলার জন্য"। মুজিবকে তিনি এই যে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, মুজিব একদলীয় স্বৈরশাসন প্রবর্তন করার পরও তাঁর লাশ দাফনের জন্য মওলানা ভাসানী যেভাবে উৎকণ্ঠিত ছিলেন, উদ্বিগ্ন ছিলেন, বাংলাদেশে আর কোন ব্যক্তিকে এ ধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে আমি দেখিনি, আমি শুনিনি। অথচ মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকীতে যখন বাণী দেয়া হয়– আজকে মুজিব কন্যা যখন মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বাণী দিলেন, তাতে এই কৃতজ্ঞতাবোধের কোন প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না। বরং আরও দুঃখের বিষয়, আওয়ামী লীগের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে একবারের জন্যও মওলানা ভাসানী যে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, মওলানা ভাসানী যে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু ছিলেন– এ কথাগুলো উচ্চারিত হয়নি।

মাহবুব উল্লাহ :

ড. আফতাব, আপনি শেখ মুজিবের জন্য মওলানা ভাসানীর অপত্য স্নেহের কথা বলেছেন–এ প্রসংগে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে। ১৯৬৭ সালে রংপুরে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সম্মেলন হচ্ছিল। সেই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দুটো ন্যাপ তৈরী হয়েছিল। একটিকে বলা হল 'ভাসানী ন্যাপ', আরেকটিকে বলা হল ' মোজাফফর ন্যাপ'। যারা ভাসানীকে সমর্থন করলেন, তারা রংপুর কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করলেন। বিকেল বেলা রংপুর টাউন হল ময়দানে জনসভার আয়োজন করা হল। মওলানা ভাসানীর পাশে দাঁড়িয়ে সালোয়ার কুর্তা পরে এডভোকেট গাজীউল হক সাহেব শ্লোগান দিচ্ছিলেন– 'শংকর বোসের মুক্তি চাই, মনি কৃষ্ণ সেনের মুক্তি চাই'। এঁরা কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। এঁরা আইয়ুবের কারাগারে বন্দী ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তিনি এঁদের মুক্তি দাবী করে শ্লোগান দিয়েছিলেন। এমন সময় মওলানা নিজে গর্জে উঠলেন। বললেন, "বল, শেখ মুজিবরের মুক্তি চাই"। সমগ্র মাঠজুড়ে শ্লোগান উঠলো– "শেখ মুজিবের মুক্তি চাই"। এমনি ধরনের মানুষ ছিলেন তিনি। শেখ মুজিবের মত এবং পথের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না। এমনকি শেখ মুজিবের ৬ দফাকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু তিনি এটা কখনোই মেনে নিতে পারেননি যে, শেখ মুজিব স্বৈরাচারী আইয়ুবের দ্বারা নিপীড়িত, নির্যাতিত হবেন।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর জীবনের আরেকটি ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য। সেটি হচ্ছে– ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের এক শেষ পর্যায়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে আসলেন ২৪ মার্চ। তাঁকে ঢাকা বিমানবন্দরে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা দেয়া হল। সেই সংবর্ধনা মিছিল শেষ পর্যন্ত শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হল। সেখান থেকে তিনি মরহুম সাইদুল হাসানের বাসভবনে আসলেন। সন্ধ্যার পর আমরা অনেকেই তাঁকে ঘিরে বসলাম। দেশে কী হতে যাচ্ছে। মওলানা ভাসানী আমাকে 'মহবুব' বলে ডাকতেন। তিনি বললেন, "মহবুব উল্লাহ, বল তো, দেশে যদি মার্শাল ল' হয় তখন তোমরা কী করবা?" আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, " দেশে কি মার্শাল ল' হওয়ার সম্ভাবনা আছে?" এমন সময় আমার পাশে বসা ফরিদপুরের সদ্য কারামুক্ত কমিউনিস্ট নেতা সমর সিং বললেন, "এত বড় গণআন্দোলনের মুখে দেশে মার্শাল ল' হওয়া সম্ভব নয়। কোন সামরিক শাসকের পক্ষেই এ সময় সামরিক শাসন জারি করা সম্ভব নয়"। মওলানা ভাসানী রসিকতার সংগে বললেন, "তোমরা কমিউনিস্টরা পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে বুঝতে পারনি। তোমরা জান না, পাকিস্তান রাষ্ট্রটি কী?" এই যে, তাঁর উপলব্ধি, অর্থাৎ একজন রাজনীতিবিদ, তিনি যে রাষ্ট্রে রাজনীতি করবেন, সেই রাষ্ট্রের চরিত্র, সেই রাষ্ট্রের বিবর্তন, সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতার বলয়, ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে যদি তিনি ওয়াকিবহাল না থাকেন, তাহলে তার পক্ষে রাজনীতি করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে যারা নিজেদেরকে বামপন্থী বলে দাবী করেন, তারা এই সমাজ এবং এই রাষ্ট্রকে সম্ভবত বুঝে উঠতে পারেননি। আর পারেননি বলেই তারা তাঁদের কাংক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারেননি।

আফতাব আহমাদ :

মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আমরা একবাক্যে যদি মূল্যায়ন করতে চাই, তাহলে কী বলব? এই প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করেছেন। আমি প্রত্যুত্তরে সব সময় যে জবাবটি দিয়েছি, আজও আবার তাই উল্লেখ করতে চাই ঃ মওলানা ভাসানী ছিলেন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। মওলানা ভাসানী স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নই শুধু দেখেননি, তিনি আরও স্বপ্ন দেখেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে আরও পরিবর্তন আসবে, এবং ১৯০৫ এর রাঢ়াঞ্চল বাদ দিয়ে বাকী অংশ নিয়ে বিবর্তনের সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশী বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আমাদের সকলেরই আশা ও স্বপ্ন এই যে, মওলানা ভাসানী আমাদের যে স্বপ্ন দেখিয়ে গেছেন একদিন সত্যিই তা বাস্তবে রূপলাভ করবে। মওলানা ভাসানী এ দেশের রাজনীতির জন্য যে কত অপরিহার্য ছিলেন, আমি একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিলে অত্যন্ত প্রাঞ্জল হয়ে যাবে বিষয়টি। মুক্তিযুদ্ধের কথা আমাদের সকলের স্মরণে আছে। আওয়ামী লীগের একটি স্বভাব-চরিত্র হচ্ছে, সবকিছু একচেটিয়াভাবে দলীয়করণ করা। জনগণের আন্দোলনকে হাইজ্যাক করে তারা সব সময় দাবী করে বসে "এ আন্দোলন আমরা শুরু করেছি"। এহেন আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল ১৯৫৭ সনে। পল্টনের মাঠে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, "হামি প্রধানমন্ত্রী আছে তো নাইনটি এইট পার্সেন্ট অটোনমি আছে"। তখন মওলানা ভাসানী সেই পল্টনের মাঠে বজ্র নির্ঘোষে এক হুংকার দিয়ে বলেছিলেন ঃ "খামোশ! শহীদ, তোমার প্রধানমন্ত্রিত্বে আমি পদাঘাত করি"। এই সেই আওয়ামী লীগ, যারা নয় বছরের মাথায় স্বায়ত্তশাসনের আওয়াজ তুলল, যে আন্দোলন নানা ঘাত প্রতিঘাতের পর ১৯৭১-এ সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হল। তারা দাবী করা শুরু করল যে, এই সংগ্রামের জনক এককভাবে তারা। মুজিবনগর সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন দেখা গেল, হয়ে গেল একটি এক দলীয় সরকার এবং আমার এখনও মনে আছে, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পর্যায়ে প্রশ্ন উঠেছিল যে, দেশের ভিতরকার সকল রাজনৈতিক দল এই সরকারের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে কী না এবং দেশের সকল মানুষ এই মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে আছে কী না। এইটুকু প্রশংসা আমাকে করতেই হবে– তাজউদ্দীন আহমদ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে তখন মওলানা ভাসানীর দ্বারস্থ হলেন এবং কাকুতি-মিনতি করে তাঁকে করজোড়ে বললেন, "হুজুর, আপনি আমাকে যদি

www.pathagar.com

সহায়তা না করেন, সমর্থন না করেন, তাহলে বাংলাদেশ অর্জন সম্ভব নয়"। মওলানা ভাসানীর চির দিনের স্বপ্ন ছিলো একটি সাচ্চা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই তিনি আকুল হয়ে বলেছিলেন, "তাজউদ্দীন, তুমি কী চাও, বল"। তিনি বললেন, "আমি সরকারের একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে চাই এবং সেই উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি হবেন আপনি। আমি থাকব তার অন্যতম সদস্য"। মওলানা ভাসানী সেদিন মুজিবনগর সরকারকে আন্তর্জাতিক কৌলিন্যা ও বৈধতা দেয়ার জন্য উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ পরবর্তী পর্যায়ে সেই মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতিকে ন্যূনতম সম্মান, শ্রদ্ধা ও প্রাপ্য দেয়নি। বরঞ্চ দেখা গেছে, আনন্দবাজার পত্রিকা যখন তাঁর সম্পর্কে অশ্লীল, অশ্রাব্য ভাষায় নিন্দাসূচক লেখা প্রকাশ করতে শুরু করল, তখন একই সুরে এখানকার আওয়ামীপন্থী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মওলানা ভাসানীর সমালোচনা শুরু করেছিল। মওলানা ভাসানী একটি কথা স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "পাকিস্তান ভেঙেছে যদি ভেবে থাক, ভুল করেছ। পাকিস্তান ভেঙেছে, যারা পাকিস্তান অর্জন করেছিল, তাদের আশা-আকাংক্ষা, পাকিস্তানী রাষ্ট্রে পূরণ করতে পারেনি বলেই তারা বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তানী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে, জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষ নিতে। কিন্তু হিন্দুস্থান যদি একইভাবে বাংলাদেশের জনগণের ওপর নির্যাতন, জুলুম, অত্যাচার করে, তা হলে বাংলাদেশের মধ্য থেকে জনগণের যে জোয়ার সৃষ্টি হবে, সেই গণজোয়ারের মুখে ভারত ভেঙে খান খান হয়ে যাবে"। আজ ভারতের দিকে এবং তার নেতৃত্বের বিভাজনের দিকে তাকালে আমার বারবার মওলানা ভাসানীর কথাই মনে পড়ে।

সবশেষে আমি আবদুল গাফফার চৌধুরী, যিনি বহুবার মওলানা ভাসানী সম্পর্কে নানা কটুক্তি ও লেখা লিখেছেন, কিন্তু পঞ্চাশের দশকে মওলানা ভাসানী এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের যে personification ঘটিয়েছিলেন তাতে অভিভুত ও আপ্লুত হয়ে সেই আবদুল গাফফার চৌধুরী "আমাদের মিলিত সংগ্রাম ঃ মৌলানা ভাসানীর নাম" শীর্ষক যে বিখ্যাত কবিতাটি লিখেছিলেন, সেই কবিতাটি থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে মাওলানা ভাসানীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এখানেই আমার আলোচনা শেষ করতে চাই ঃ

শহরে বন্দরে গ্রামে ঘরে
হৃদয়ে নগরে মুখের ভাষায় শুনি
বুকের সাড়ায় শুনি
চোখের তারায় দেখি নাম
মৌলানা ভাসানীর নাম
পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণের কালাম-
কণ্ঠে শুনি তার।
হতবাক সবিস্ময়ে দেখি জীবনে জীবনে এ কী মিলিত প্রাণের গতি;
কলকণ্ঠে আকাশ মুখর বজ্রে আর ঝড়ে শুনি স্বচ্ছ স্বর।
মুখের ভাষায় শুনি নাম।
মৌলানা ভাসানীর নাম।
মানুষ শুনেছে সে নাম।
মৌলানা ভাসানীর নাম।
আমাদের মিলিত সংগ্রাম
মৌলানা ভাসানীর নাম।

www.pathagar.com

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯

সমাজ সরকার ও দুর্নীতি

মাহবুব উল্লাহ :

বহুদিন আগে গুনার মির্ডালের লেখা Asian Drama বইটি পড়েছিলাম। সেই বইতে মির্ডাল ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরুকে Quote করেছিলেন। জওয়াহরলাল নেহরুর সেই উক্তিটি ছিল দুর্নীতি সম্পর্কে। নেহরু বলেছিলেন, I shall hang every corrupt person to the next lamp post. নেহরুর মত একজন আধুনিক পণ্ডিত দুর্নীতি এবং তার সমাধান সম্পর্কে যেভাবে চিন্তা করেছিলেন, সেটি ভারতীয় গণতন্ত্রে কার্যকর করা সম্ভব ছিল না এবং সম্ভবত পৃথিবীর কোন দেশেই দুর্নীতি সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয় না। আমাদের অনেকেরই একটি ধারণা আছে যে, দুর্নীতির মত একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিকে যদি উচ্ছেদ করতে হয়, তাহলে দুর্নীতিবাজদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ফাঁসি বা ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এই ধরনের পদক্ষেপ সাময়িক কিছু সুফল বয়ে আনলেও দেখা যায়, দুর্নীতি তার নিজস্ব নিয়মেই আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সমাজে দুর্নীতি অব্যাহত থাকে। সুতরাং দুর্নীতির বিষয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন আছে। কিছুদিন আগে জার্মানী ভিত্তিক ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটি রিপোর্টে দেখা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, ভারত ও পাকিস্তান অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। তাঁরা একটি সূচকের ভিত্তিতে এই দেশগুলোর দুর্নীতিতে অবস্থানকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

দুর্নীতি পৃথিবীর সবদেশেই হয়। কিন্তু এটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি বিশেষ সমস্যা। দুর্নীতি যেসব দেশে দেখা দেয়, সেখানে বুঝতে হবে যে, রাষ্ট্র সঠিকভাবে কাজ করছে না এবং রাষ্ট্র যদি সঠিকভাবে কাজ না করে, তাহলে সেসব দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনও সম্ভব হয় না। এখন প্রশ্ন হল, যদি তৃতীয় বিশ্বে বা উন্নয়নশীল দেশে কোন নেতা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, তিনি তাঁর দেশ থেকে দুর্নীতিকে উচ্ছেদ করবেন, তাহলে তাঁর সামনে বিকল্প কী? এর জবাবে বলতে হয়, এর জন্য কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজন আছে। এই সংস্কারের আওতায় পড়বে ট্যাক্স এবং কাস্টমস কালেকশন, প্রাইভেট বিজনেসের রেগুলেশনের এবং রাস্তা নির্মাণসহ যে সমস্ত অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক প্রকল্প হয়, সেগুলো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। নোবেল বিজয়ী শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জর্জ স্টিগলার, যিনি দক্ষিণপন্থী অর্থনীতির প্রবক্তা বলেও অনেকের কাছে পরিচিত, তিনি বলেছেন, একটি দেশে কত লোক দুর্নীতিবাজ- সেটি নির্ণয় করার জন্য সেই দেশ বা সেই সমাজ কতটা প্রস্তুত রয়েছে, সেটি আগে দেখতে হবে। বেশীরভাগ দুর্নীতিই হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে। সুতরাং দুর্নীতি সম্পর্কে যদি অনুসন্ধান করতে হয়, তাহলে তার জন্য ব্যয়সাপেক্ষ উদ্যোগের দরকার রয়েছে। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ, আমলা, পুলিশ বাহিনী বা কাস্টমস বিভাগের কতজন সৎ, সেটি আমরা তখনই জানতে পারব যদি একটি সঠিক তদন্ত আমরা করতে পারি। সুতরাং এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায় যে, দুর্নীতি উদঘাটন করতে গিয়ে আমরা যে লাভটা করি আর এ জন্য যে ব্যয়টা হয়- এই দুয়ের মধ্যে যখন্য ভারসাম্য হারিয়ে যায়, অর্থাৎ ব্যয় যখন লাভের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়, তখন ঐ দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করাটা রাষ্ট্র এবং সমাজের জন্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আমি যে সংস্কারের কথা বললাম, তার মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং এর মধ্য দিয়ে অর্জন করা যায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

www.pathagar.com

বিশেষ করে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এছাড়া সমাজ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করতে গেলে দেশের সিভিল সার্ভিস এবং দেশের আইন-কানুনগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও উন্নয়ন প্রয়োজন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের Law and Political Science-এর প্রফেসর সুজান রোলস একারম্যান একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি তিনি ১৯৯৭ সালের বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলনে উপস্থাপন করেছিলেন। সেখানে তিনি উন্নয়নের সংগে দুর্নীতির সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনাটি ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং আমি মনে করি যে, পাঠকদের জন্য তার এই চমৎকার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে একটি রাষ্ট্রে যদি দুর্নীতিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে, সেই রাষ্ট্র সঠিকভাবে কাজ করছে না। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যে কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো, বিশেষ করে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে দুর্নীতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার পক্ষেও একারম্যান মত দিয়েছেন। যারা ঘুষ দেয়া-নেয়া করে, তারা একটি জাতির সম্পদকে আসলে লুণ্ঠন করে, এবং এর ফলে জাতির অনগ্রসর দরিদ্র অংশ প্রচণ্ড বঞ্চনায় ভোগে এবং যেসব দেশে দুর্নীতিটা একটি সিস্টেমে দাঁড়িয়ে গেছে, সেসব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও দেখা যায় যে, সেসব দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। আমরা নাইজেরিয়ার কথা জানি। নাইজেরিয়া তেলসমৃদ্ধ সম্পাদশালী দেশ ছিল। এ রকম আফ্রিকার আরও অনেক দেশ আছে, যেগুলো খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। কিন্তু দুর্নীতি সেসব দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিশেষ করে যেসব দেশে দুর্নীতি মারাত্মক বা চরম সীমায় পৌঁছে যায়, সেসব দেশের সরকারের লক্ষ্য যদি হয় সমাজে সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন নিয়ে আসা, সমাজকে সংশোধিত করা, তাহলে তাদের জন্য এটি একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। দুর্নীতিকে আমরা একটি খারাপ জিনিস হিসেবেই জানি এবং এই দুর্নীতি ঘটছে, দুর্নীতি আছে এটিই আমাদের জন্য উদ্বেগের বিষয়।

অর্থনীতিবিদরা দুর্নীতির ব্যাপারটিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। সেটি হচ্ছে, একটি ইকনমিক সিস্টেমের দক্ষতার উপর অর্থাৎ কত সুষ্ঠুভাবে উৎপাদনমুখী উপায়ে সম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছে, তা দেখা এবং আয় বন্টনের উপর দুর্নীতির প্রভাব কী তা নির্ণয় করা। যদি দেখা যায় যে, দুর্নীতির প্রতিক্রিয়া তেমন মারাত্মক নয়, তাহলে তাঁরা বলবেন আইন কাঠামোর সংস্কারের কথা এবং তাঁরা ঐ ধরনের কোন পদক্ষেপের কথা বলবেন না, যাতে আইন কাঠামোকে সংস্কার না করে বিদ্যমান দুর্নীতির বিষয়গুলো খুঁজে বের করার একটি ব্যয়সাপেক্ষ পন্থা অনুসরণ করা হয়। তাহলে আমাদের জানতে হবে যে, দুর্নীতির cost টা কী এবং দুর্নীতির কারণটা কী? পৃথিবীতে উদারনৈতিক ও Repressive উভয় ধরনের রাষ্ট্রই আছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে বিভিন্ন ধরনের বেনিফিট দেওয়া এবং তা বহনের cost চাপিয়ে দেয়া। অর্থাৎ রাষ্ট্রের পদক্ষেপের কারণে কেউ উপকৃত হচ্ছে, কেউ তার আয় বা সম্পদ বাড়াতে পারছে আবার কারও উপর খরচের বোঝা চাপছে এবং এই উভয় কাজটি রাষ্ট্র করে তার বিভিন্ন এজেন্সীর মাধ্যমে। এই এজেন্সীসমূহের অন্তর্ভূক্ত এজেন্ট বলতে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, যাদের হাতে থাকে ডিসক্রিশনারী পাওয়ার, তাদের বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেরাই সিদ্ধান্ত দিতে পারে বা সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা রাখে। এখন বাস্তব অবস্থাটি হচ্ছে এই যে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কোন একটি সুবিধা পাওয়া জন্য এই সমস্ত এজেন্টদের কিছু পয়সা ধরিয়ে দিতে চাইবে। সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টি থেকে দেখলে কিন্তু এতে আপত্তি করার কিছু নেই। কোন সুযোগ প্রাপ্তির বিনিময়ে টাকায় কিছু আমি দিতে চাচ্ছি, তাতে দোষেরটা কী? কিছু বেনিফিট বা কিছু সুযোগ পাওয়ার জন্য কিছু ব্যয় করা, এটি বাজারভিত্তিক অর্থনীতিরই একটি বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

বাজারভিত্তিক অর্থনীতির একটি মানদণ্ড হচ্ছে willingness to pay। যিনি ঘুষ দিতে চান, তিনি ঘুষ দিতে যদি willing বা ইচ্ছুক হন, তাহলে সে ব্যাপারে কারও আপত্তি করার কী কিছু আছে? সমস্যাটি আসলে এ রকম নয়, সমস্যাটি হচ্ছে এ রকমঃ যে এজেন্ট রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কাজ করে সে তার একজন principal-এর কাছে দায়ী থাকে। এই agent ও principal-এর লক্ষ্যের মধ্যে অনেক সময় মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির theory'র সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন– আমি অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা করি। আমাদের দু'জন পিয়ন আছে। তারা বিভাগের অধ্যাপক ও কর্মকর্তাদের নির্দেশে কাজ করে। এখন দেখা গেল, কোন একটি কাজের সময় একজন পিয়নকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে যখন তাকে দেখা গেল, তখন সে বলল, আমাকে অমুক স্যার অমুক কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে, এই এজেন্টের Principal- এর সংখ্যা অনেক বেশী। ফলে অনেকের কাছেই তাকে জবাবদিহি করতে হয়। যে কারণে সুনির্দিষ্ট কেউ, তার কাছ থেকে বেশী কাজ আদায় করে নিতে পারে না। এটি হচ্ছে Principal Agent এর সমস্যার একটি সাধারণ ব্যাখ্যা। যেমন– নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এজেন্ট। একটি রাষ্ট্রের মন্ত্রীরা শাসক কোয়ালিশনের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আবার ভোটদাতাদের কাছে দায়বদ্ধ এবং সর্বশেষে রাষ্ট্রের বিচারকরা দায়ী তাঁদের পরাৎক্রমিক বা hierarchical কাঠামোর অন্তর্গত বিধি বিধান ও disciplines এবং নিজেদের প্রকাশ্য ও বিচার ব্যবস্থার গ্রাহ্য নর্মসের কাছে। এখন আমরা সেই ধরনের payment- কেই দুর্নীতি বলব– যেটি বেআইনীভাবে public agent কে দেয়া হয় একটি সুনির্দিষ্ট সুবিধা ভোগ করার জন্য অথবা কোন সুনির্দিষ্ট খরচ কমানোর জন্য। যেমন– বাড়ীর মালিক হলে আমাকে হোল্ডিং ট্যাক্স দিতে হবে। কিন্তু যারা এই হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করে, তাঁদের কাছে অনেক বাড়ীর মালিক এককালীন কিছু ঘুষ দিতে রাজি থাকেন। কারণ তারা বছর বছর অতিরিক্ত ট্যাক্সের টাকা গোনা থেকে রেহাই পেতে চায়। অর্থাৎ তারা একটি cost avoid করতে চায়। আবার অন্যদিকে আমি বিশেষ কোন একটি সুবিধা চাচ্ছি। তার জন্যও আমি কিছু ব্যয় করতে প্রস্তুত আছি। অথচ এই ধরনের ব্যয় করা বা এই ধরনের সুযোগ লাভের চেষ্টা আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়। আর সেটাই হচ্ছে দুর্নীতি। এই যে অবৈধভাবে টাকা লেনদেনের ঘটনা-এক হাতের টাকা আরেক হাতে গেল তাতে অসুবিধার কী আছে– এমনটি না ভেবে দেখতে হবে যে, এই ধরনের লেনদেনের ফলে উৎকোচ গ্রহিতা এবং উৎকোচদাতার আচরণে একটি পরিবর্তন আসে। বিভিন্ন সমাজে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আইনসঙ্গত উপঢৌকনের সাথে বেআইনী টাকা-পয়সা লেনদেনের একটি পার্থক্য বিচার করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কোনটিকে আমরা লিগ্যাল গিফ্‌ট আর কোনটিকে ইল্‌লিগ্যাল পে-অফ হিসেবে দেখব? আমরা যদি দেখি যে, এই ধরনের পেমেন্টের ফলে রাষ্ট্র ও সমাজের ঈপ্সিত লক্ষ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই সেটিকে আমাদেরকে দুর্নীতি হিসেবেই দেখতে হবে। আর দুর্নীতির অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ হচ্ছে, দুর্নীতির মাধ্যমে যে সুযোগ পাবলিক-এজেন্টদের কাছ থেকে কেনা হয়, সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর তার প্রতিক্রিয়া কী হয়, তা আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে। বিভিন্ন গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে, যদি একটি দেশে শক্তিশালী সরকার ও শক্তিশালী লিগ্যাল ইনস্টিটিউশন থাকে, তাহলে সেই দেশে দুর্নীতির মাত্রা কম থাকে। আর দুর্নীতির মাত্রা কম হলে সেখানে বিনিয়োগের মাত্রা বেশী এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশী অর্জিত হয়।

দুর্নীতির সাথে ব্যুরোক্রেটিক এফিশিয়েন্সির একটা সম্পর্ক আছে বলে আমরা মনে করি। একটি দেশের আমলাতন্ত্র কতটা লালফিতার দৌরাত্ম্যে ভারাক্রান্ত এবং জুডিশিয়ারীর কোয়ালিটি কী ধরনের— তা জানা সম্ভব হলে বুরোক্রেটিক এফিসিয়েন্সির স্তরও নির্ণয় করা সম্ভব হবে। একটি দেশে দুর্নীতি লালফিতার সাথে সম্পর্কিত, অন্যদিকে লালফিতাও দুর্নীতির সাথে সম্পর্কিত। কী রকম? যদি দেখা যায় যে, একই কাজের জন্য একাধিক অফিসারের

www.pathagar.com

কাছে যেতে হয়, একাধিকভবে ফাইল চালাচালি করা হয়, তাহলে প্রতিপদেই সেই ফাইলটিকে পার করার জন্য ভুক্তভোগীকে অর্থব্যয় করতে হবে। অন্যদিকে দুর্নীতিবাজরা এমন কতগুলো কৌশল উদ্ভাবন করে, যাতে এই লালফিতার দৌরাত্ম্য বেড়ে যায় এবং দুর্নীতির সুযোগও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও দুর্বলতা রয়েছে, সেগুলোকে যদি আমরা অপসারণ করতে না পারি, তাহলে আমরা কিছুতেই দুর্নীতির হাত থেকে রেহাই পাব না।

আফতাব আহমাদ :

দুর্নীতি এমন একটি সামাজিক ব্যাধি, যেটিকে পরিপূর্ণভাবে নির্মূল করা যাবে কী না এটি রাষ্ট্র দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে একটি বিরাট প্রশ্ন। আমরা যদি মানব সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে একটি জিনিস আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। মানুষ একদিকে যেমন সামাজিক জীব, আরেক দিকে মানুষের মধ্যে দ্বান্দ্বিকভাবে দু'টি সত্তা বিরাজ করে। একটি তার সুপ্রবৃত্তি, আরেকটি তার কুপ্রবৃত্তি। লোভ-লালসা কামনা-বাসনা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, যা কাঙ্খিত বা বাঞ্ছিত ও কাম্য নয় এবং যা নিষিদ্ধ এ সবকিছুই মানুষকে তার কুপ্রবৃত্তির দিকে প্ররোচিত করে। হযরত আদম (আঃ) যখন বেহেশতে ছিলেন, পরম সুখে ও আনন্দেই ছিলেন এবং তার কোনো দুঃখবোধ বেদনা বা অভাব ছিল না। কিন্তু শায়াতিন ইবলিস তাঁর কুপ্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে তাঁকে যেভাবে প্রলুব্ধ করে গন্দম খাওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল তার ফলে আদম (আঃ) বেহেশতচ্যুত হন এবং তাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়। এই যে মানুষের সু এবং কুপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব, এটি মানুষের আদি থেকে অর্থাৎ সৃষ্টির পর থেকেই চলে আসছে। মানুষের সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবনের সর্বোচ্চ রূপ রাষ্ট্র যখন তারা গঠন করল, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের যখন সে জন্ম দিল, তখন সর্বত্রই একদিকে কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব যেমন মানুষের ওপর বর্তায়, তেমনি অন্য দিকে দায়িত্ববান মানুষ মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য উদ্যোগী হওয়া, সমব্যাথী ও সমমর্মী হওয়া কর্তব্য নিষ্ঠার অপরিহার্য একটি রীতি এবং ব্যবস্থায় পরিগণিত হয়। এক্ষেত্রে মানুষের সেই আদি এবং কুপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্বই জন্ম দিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতিকে। সে দুর্নীতিকে এখন পর্যন্ত যাঁরা সমাজের জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন, যারা সমাজমনস্ক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী-এঁরা নানাভাবে দুর্নীতিকে কীভাবে নির্মূল করা না গেলেও অন্তত হ্রাস করা যায়, সে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। বিখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্র-দার্শনিক ও ইতিহাসবদি Robert Brooks দুর্নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, দুর্নীতি হচ্ছে এমন একটি প্রপঞ্চ, যেখানে transaction and conditions of very different kinds are stigmatized as the anti– thesis of reform, rationality and the demands of the public will. অর্থাৎ সংস্কার, যুক্তিবাদিতা এবং মানুষের বিভিন্ন ধর্মী অনেক ধরনের চাওয়া-পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকে রূপান্তর করতে, সমাজে পরিবর্তন আনতে, সমাজের বিকাশ ঘটাতে গেলে যা যা করা দরকার তার বিপরীতে যেসব প্রতিকূল শর্ত এবং লেনদেন সৃষ্টি হয়, সেটি হচ্ছে দুর্নীতি। এ সম্পর্কে খুব চমৎকারভাবে বলেছেন- Nathaniel Leff যিনি একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর মতে, "Corruption is an extra legal institution, used by individuals or groups to gain influence over the actions of the bureaucracy. As such the existence of corruption *per se* indicates only that these groups participate in the decision making process to a greater extent than would otherwise be the case." অর্থাৎ প্রশাসন চালাতে গেলে যে আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়, তারা যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ায় যেভাবে অংশগ্রহণ করার কথা তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে যে বিশেষ গোষ্ঠী বা দল প্রক্রিয়াটিকে ভিন্ন ধরন ও গতিতে পরিচালনার চেষ্টা করে সেটিই প্রতিষ্ঠানিক দুর্নীতি যাকে তিনি extra-legal institution হিসেবে অভিহিত করছেন। আসলে দুর্নীতির নানা মাত্রা রয়েছে এবং সমাজের এমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে দুর্নীতি তার প্রভাব এবং প্রতাপ বিস্তার করে না। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনরি দুর্নীতি সম্পর্কে ৯টি সংজ্ঞা দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে তিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য। এর একটি হচ্ছে- The destruction or spoiling of anything especically by the disintegration of, by decomposition with its attendant unwholesomeness and loathsomeness; putrefaction. (বা পচন) নৈতিকতকার দিক থেকে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনরি বলছে A making or becoming morally corrupt; the fact or conditon of being corrupt: moral deterioraion or decay/ depravity; (বা বঞ্চনা) এবং একই ডিকশনরি আরও বলছে- The perversion of anything from an original state of purity-perversion of an institution, custom and so-forth from its primivive purity-an instance of this perversion is called corruption. এ থেকে আমরা একটি জিনিস স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি, একদিকে যেমন নৈতিকতার একটি ব্যাপার রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে সমাজ কাঠামোগত একটি বিষয় ও এবং এ দু'য়ের সঙ্গে মিলে প্রশাসনের একটি রহস্যাবৃত অবস্থান ঘটে। এই প্রশাসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী H, Bayley চমৎকারভাবে corruption বা দুর্নীতির সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, corruption while being tied particularly to the act of bribery, is a general term covering misuse of authority as a result of considerations of personal gain, which need not be money অর্থাৎ শুধু টাকা-পয়সা ঘুষ দেয়া -নেয়াতেই যে দুর্নীতি হয়, তা নয়। যে কোন ধরনের personal gain বা একজনের due নয়; কিন্তু যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ যদি তার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার অপব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার করে এবং তা যার প্রাপ্য নয় তাকে যদি দেয়া হয় সেটাকেও দুর্নীতি বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানী M. Mclullan প্রশাসন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, "A publice official is corrupt if he accepts money or money's worth for doing something that he is under duty to do any way, that he is under duty not to do or to exercise a legitimate discretion for improper reasons," অর্থাৎ অযৌক্তিক কারণে একজন সরকারী ব্যক্তি যখন তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যা তার এমনিতেই করার কথা, কিংবা আদৌ করার কথা নয়, কিংবা কোনো কিছুর বিনিময়ে তা অর্থ হতে পারে বা অন্য যে কোন বিষয় হতে পারে, যা তাকে সন্তুষ্টি দান করতে পারে তাকে দুর্নীতিপরায়ণ বা দুর্নীতিবাজ বলা যেতে পারে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী J. S. Nye বলেছেন, corruption হচ্ছে একটি behaviour which deviates from the normal duties of a public role because of private-regarding যেমন family, close private clique বা pecuniary অর্থাৎ অর্থসংশ্লিষ্ট অথবা statuss gains এর জন্য করা হয়ে থাকে which violates rules against the exercise of certain types of private regarding influence. This includes such behaviour as bribery যেমন, use of rewards to pervert the judgement of a person in a position of trust কিংবা nepotism যার দ্বারা patronage কারো ওপর bestow করা হয় by reason of ascriptive relationship rather than merit. অর্থাৎ মেধার যোগ্যতা নয় এক ধরনের জ্ঞাতি

www.pathagar.com

সম্পর্কের কারণে কাউকে যদি বিশেষ ধরনের পৃষ্ঠাপোষকতা দেয়া হয়, সেটাকে তিনি বলছেন, নেপটিজম বা স্বজন তোষণ বা প্রিয়জন তোষণ। এক কথায় misappropriation বা illegal appropriation of public resources for private uses : কেই তিনি দুর্নীতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমরকৌশলবিদ Samue P. Huntington কিন্তু Corruption কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, "corruption may by functional to the maintenance of the political system in the same way that reforms it" অর্থাৎ তাঁর মতে, সংস্কারের মাধ্যমে যেভাবে একটি পলিটিক্যাল সিস্টেমকে sustain করা হয়, corruption ও অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা যদি এই বিষয়গুলোকে welfare concept বা public-interest concept বা market concept দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তাহলে দেখব যে, দুর্নীতি সমাজে কখনোই কাম্য হতে পারে না। বাজার ও বিপণন বিশেষজ্ঞ Jacov Van Klaveren দুর্নীতি সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে, "A corrupt civil servant regards his office as a business, the income of which he will seek to maximizing until the size of his income depends upon the market situation and his talents for finding the point of maximal gain on the public's demand এবং অনুরূপভাবে Robert. Tilurveman বলছেন, "corruption involves a shift from mandatory pricing model to a free market model. The centralized allocative mechanism, which is the ideal of modern bueaucracy may breakdown in the face of disequilibrium between supply and demand. Clients may decide that it is worth while to risk known sanctions ands pay the higher costs in ordor to be assured of receiving the desired benefits. When this happens bureaucracy ceases to be patterned after the mandatory market and takes on characteristics of the free market, অর্থাৎ তখন নৈতিকতার কোন বালাই থাকে না। আর আমরা public welfare-interest কে কেন্দ্র করে যে দুর্নীতির কথা চিন্তা করি, যে সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Carl Friedrich বলেছেন, The pattern of corruption can exist whenever a powerholder who is charged with doing certain things i. e. who is a responsible functionary or officeholder by monetory or other rewards not legally provided for induced to take actions, which favour whoever provides the rewards and thereby does damage to public and its interests." এভাবে দুর্নীতির অনেক সংজ্ঞা আমরা দিতে পারি। দুর্নীতির সংজ্ঞা নিরূপণ দুর্নীতি উৎপাটনের প্রাথমিক পদক্ষেপ। দুর্নীতির উৎপাটনের জন্য সমাজের নৈতিকতার মান উন্নত করতে হবে। নৈতিকতার মানে ধস নামার ফলেই বাংলাদেশে দুর্নীতি বহুলাংশে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। দুর্নীতি নিরোধে নৈতিকতার ভূমিকা যেমন অনস্বীকার্য তেমনি স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা সম্বলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ পালন করতে পারে।

www.pathagar.com

১২ ডিসেম্বর ১৯৯৯

চার নেতার শীর্ষ বৈঠক

মাহবুব উল্লাহ :

৩০ নভেম্বর, ১৯৯৯ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অনন্য অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে বাংলাদেশের প্রধান চারটি রাজনৈতিক দল– বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের প্রধানরা এক ঐতিহাসিক শীর্ষ সম্মেলনে সমবেত হয়ে দেশকে সংকট থেকে উত্তরণের পথনির্দেশ হিসেবে যে যৌথ ঘোষণা দিয়েছেন তা আমাদের ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন হিসেবে বিবেচিত হবে। ইতিহাসে এমন কিছু সময় আসে যখন সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করাই হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব। জাতীয় নেতৃত্ব যদি সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে ইতিহাস তাঁদের ক্ষমা করে না। বাংলাদেশের জনগণ ১৯৯৬-এর ২৩ জুনের পর যে অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী সরকারের কবলে পড়ে সমুদ্রের দিশাহীন নাবিকের মত পরিস্থিতিতে পড়েছে, সেই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে রক্ষা করা এবং জাতিকে তার মনজিলে মকসুদে পৌঁছে দেয়ার আর কোন বিকল্প আছে বলে আমার মনে হয় না। ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখব যে, ঐক্যে মানুষ বিজয় অর্জন করে, আর অনৈক্যে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। সহযোগিতা সহমর্মিতায় মানুষ এগিয়ে যায়। বিদ্বেষ এবং হলাহলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। আজ বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঐক্য। ইতিহাসে কখনোই হয়ত সমগ্র জনগণ অর্থাৎ শতকরা একশ' ভাগ নাগরিকদের ঐক্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষ অর্থাৎ শতকরা ৮০/৯০ ভাগ মানুষকে যদি ঐক্যবদ্ধ করা যায়, তাহলে জাতি বিশাল সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে বহুমাত্রিক সংকট চলছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ বিপর্যস্ত। একের পর এক এ নিয়ে ১৬ বার বাংলাদেশী মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়েছে এই সরকারের আমলে। শেয়ার বাজারের মাধ্যমে দেশে যে নতুন পুঁজি গঠন সম্ভব হয়ে উঠছিল সেই শেয়ার বাজার ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে একটি সুচতুর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। দেশের রপ্তানী বাণিজ্যেও নেমে এসেছে আজ এক মহা সংকট। আজ আমরা বিদেশী বাজার হারাতে বসেছি এবং আমাদের রপ্তানী পণ্যের মূল্য কমতে শুরু করেছে। যার ফলে টাকায় রপ্তানী আয়ের মাত্রা বজায় রাখার জন্য আমাদেরকে অতিরিক্ত পরিমাণে পণ্য রপ্তানী করতে হচ্ছে এবং এর জন্য অর্থনৈতিক ক্ষতিও মেনে নিতে হচ্ছে। এছাড়া আজকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টির আরও বড় কারণ– সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছে প্রচণ্ড দলীয়করণের ফলে এবং যাঁরা সরকারের অনুগত নন্ বা যাঁরা সরকারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন, অথচ যাঁদের প্রতিভা ও মেধা আছে দেশকে কিছু দেবার মত, তাঁদের প্রতিভা ও মেধাকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। একমাত্র ১৯৭২-৭৫ এর সময় ছাড়া বাংলাদেশের রাজনীতি এর আগে কখনো এত সংঘাতময় অবস্থার মধ্যে পড়েছে কিনা সন্দেহ। সেই সময়েও আওয়ামী লীগের দলীয় সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে, জনগণের ভাত ও ভোটাধিকারের কথা বলে, আর কার্যত মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়, মানবাধিকারের চরম লংঘন ঘটিয়ে মানুষকে পশুর তুল্য করে তোলে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে দেশে মানুষের মর্যাদা বলতে আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই। আজ প্রতিটি মানুষ বলছে, "আমরা মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চাই এবং আমরা স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি

www.pathagar.com

চাই।" কিন্তু দেশে আইনশৃংখলা পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটেছে যে, আজকে কারোরই মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচার এবং স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি নেই"। রাজপথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়ে জনপ্রতিনিধিদের ওপরে গুলিও চালানো হচ্ছে তাঁদের হত্যার উদ্দেশ্য। এরকম ঘটনা ব্রিটিশ ভারতেও কল্পনা করা কঠিন ছিল। ব্রিটিশ ভারতের ঔপনিবেশিক সরকার এদেশের রাজনীতিবিদদেরকে জেলে পাঠিয়েছে, অত্যাচার করেছে, কিন্তু প্রকাশ্যে রাজপথে এভাবে গুলী করে জন প্রতিনিধিকে হত্যা করার চেষ্টা করেনি। এমনকি পাকিস্তান আমলেও আমরা এই ধরণের কোন নজির দেখি না। কিন্তু এই নজির আমরা লক্ষ্য করলাম বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। আজকে দেশের রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে, রেডিও টেলিভিশন একটি দলের প্রচার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এগুলোর একমাত্র কাজ হচ্ছে ব্যক্তি পূজা এবং পৌত্তলিকতার প্রচার করা। একটি ব্যক্তি এবং একটি পরিবারের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মধ্যদিয়ে দেশের জন্য অন্য যাঁরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, তাঁদের অবদানকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং অবাধ তথ্য প্রবাহকে রুদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে। অথচ নির্বাচনের আগে তারা ওয়াদা করেছিল যে রেডিও টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে। কিন্তু আজকে এই সরকারের আয়ু প্রায় ৪ বছর হতে চললে, অথচ রেডিও-টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার কোন নাম নেই। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং স্কুলগুলোকে প্রচণ্ডভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে।

দলীয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করছি– যাঁরা যোগ্য, মেধাবী এবং যাদের একাডেমিক রেকর্ড উন্নত, তাঁদেরকে বাদ দিয়ে দলীয় লোকদেরকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। আজ পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যন্ত তাদের নির্বাচন অবাধে করতে পারছে না। বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের মত প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন নিয়ে অতীতে কখনোই প্রশ্ন ওঠেনি সেই প্রতিষ্ঠানের সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই সরকারী ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে চিকিৎসকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের সুনির্দিষ্ট প্যানেলের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য প্রথমদিন থেকেই চাপ প্রয়োগ করা অব্যাহত রেখেছে। আজকে শুধু জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেই নয়, কিংবা কোন একটি উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলাদেশে যতগুলো নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আছে, যেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে, সেখানে নির্বিচারে হস্তক্ষেপ চলছে। আমরা জেনেছি, বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান এফবিসিসিআই, ডিসিসিআইয়ের মত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সরকার ও সরকারীদল প্রচণ্ডভাবে হস্তক্ষেপ করছে তার অনুগত বা সমর্থকদের বিজয়ী করার জন্য। এছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর যে কয়টি উপনির্বাচন হয়েছে, তার মধ্যে কিছু কিছু আসনে বিরোধী দলীয় প্রার্থী জয়যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ফলাফলে ভোটের হেরফের ঘটিয়ে তাদেরকে পরাজিত করা হয়েছে।

আর কতগুলো নির্বাচন তো প্রচণ্ড জালিয়াতির মাধ্যমে করা হয়েছে। তার সর্বশেষ প্রমাণ হচ্ছে, আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগকারী সংসদ সদস্য আবদুল কাদের সিদ্দিকীর আসনে সদ্য অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনের ঘটনা। এই উপ-নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছে নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলো, সাংবাদিক এবং বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দ। এদেশের ইতিহাসে আমরা কখনোই শুনিনি বিদেশী রাষ্ট্রদূতেরা গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা, এই উপ-নির্বাচনে কী কী অনিয়ম ঘটেছে জিজ্ঞাসা করতে। রাষ্ট্রদূতগণ তাদের নিজস্ব চ্যানেলের মাধ্যমে অনিয়মের বিষয় অবগত হয়ে নির্বাচন কমিশনের নজরে এনেছেন। বর্তমান নির্বাচন কমিশন নিয়েও বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ বহুদিনের। নির্বাচন কমিশনের বর্তমান প্রধান একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। তাঁর নিরপেক্ষতা ও

www.pathagar.com

সততা সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। তাঁর পদত্যাগের দাবী উঠেছে সকল বিরোধী দলের পক্ষ থেকে। কিন্তু তারপরও একজন আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তির মত তিনি পদত্যাগ করছেন না, হয়তো বা শাসকদলের চাপের কারণে কিংবা তাঁর পক্ষদুষ্টতার কারণে।

আজ বাংলাদেশের রাজনীতিতে যেভাবে বিদেশী হস্তক্ষেপ হচ্ছে অতীতে কখনোই এরকম হয়েছে বলে মনে হয় না। আমরা জানি, আজকে এমন কতগুলো আয়োজন করা হচ্ছে, যেগুলো সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের পৃথক এবং স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্ব বজায় থাকবে কিনা সন্দেহ আছে। এইজন্যই আজকে ট্রান্সশিপমেন্টের নামে ভারতকে সামরিক করিডোর দেয়ার অভিসন্ধি চলছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে সম্পাদিত তথাকথিত শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বস্তুত একদিন বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সরকার সমাজের শান্তি-স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। রাষ্ট্রের নির্ভীক আমলা, সৎ কর্মকর্তাদেরকে আইনানুযায়ী কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। আইন যা বলে সেভাবে সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হচ্ছে না। ব্যক্তিবিশেষ ও গোষ্ঠী বিশেষকে তুষ্ট করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে। আজ দেশে আইনের শাসন নেই। আজকে ব্যক্তির খেয়াল-খুশি, ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই দেশ পরিচালিত হচ্ছে। একে আর যাই বলা হোক, গণতন্ত্র বলা যাবে না। দেশের পুলিশ বাহিনীকেও পরিপূর্ণভাবে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এজন্য পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যে অসন্তোষ নেই– একথা বলা যাবে না। আজকে সামরিক বাহিনীতেও দলীয়করণ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছেন। ইতিহাস বিকৃত করে মনগড়া কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন এবং বিদ্বেষ ধর্মী আক্রমনাত্মক উচ্চারণ করেছেন। এসব বক্তব্যের, বিবরণের ও উচ্চারণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এসব সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট বিভক্তি সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং আমরা লক্ষ্য করছি, বাংলাদেশের এমন কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নেই, যা আজকে সম্পূর্ণভাবে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়নি। সুতরাং এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিকভাবে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো– অতিসত্বর এই সরকাকে পদত্যাগে বাধ্য করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে সাংবিধানিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে নতুন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর অভিপ্রায়কে প্রতিফলিত করার সুযোগ করে দেয়া। অনেক সময় সরকারী দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'আমরা পাঁচ বছরের জন্য ম্যান্ডেট নিয়ে এসেছি। সুতরাং পাঁচ বছর আমরা দেশ শাসন করবো'। আমরা এর আগেও বহুবার বলেছি আমাদের সংবিধান মোতাবেক একটি সরকারের সুনির্দিষ্ট কোন মেয়াদ নেই– পাঁচ বছরের একটি মেয়াদ আয়ু হিসেবে জাতীয় সংসদের জন্য বেধে দেয়া হয়েছে। তদুপরি দেশে যদি কোনো সংকট ও সমস্যা হয়, তাহলে পাঁচ বছরের আগে যে সাধারণ নির্বাচন হতে পারবে না, এমন কোনো বিধানও আমাদের সংবিধানে নেই। অতি সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করেছি, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মাহাথির মেয়াদ পূর্তির আগেই সে দেশে নতুন করে সাধারণ নির্বাচন দিয়েছেন। কারণ তাঁর নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে দেশের মধ্যে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো, যার ফলে মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে একটি বিভাজন এবং সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো বলা যেতে পারে। একজন বিচক্ষণ স্টেটসম্যান হিসেবে মাহাথির নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সময়ের আগেই তিনি নির্বাচন দেবেন এবং নির্বাচন তিনি করে ফেললেন। নির্বাচন দিয়ে তিনি বরং লাভবান হয়েছেন। অতীতের মতো এই নির্বাচনের রায়ও তাঁর পক্ষেই এসেছে। তিনি দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। মালয়েশিয়ার উন্নতির পেছনে একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে সেদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নেতৃত্বের বিচক্ষণতা। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন যে, সমগ্র এশিয়ার নিরাপত্তা নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। মাহাথির মোহাম্মদের মতো একজন দেশপ্রেমিক বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়কের পক্ষেই এ ধরণের চিন্তা করা সম্ভব। কারণ পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, নতুন শতাব্দী আসছে, প্রযুক্তির বিরাট বিপ্লব ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে এশিয়ার জন্য যে একটি পৃথক ব্যবস্থা দরকার, সেটা তিনি উপলব্ধি করেছেন।

www.pathagar.com

দেশের এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য চার নেতা একত্রিত হয়ে এক টেবিলে বসে যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা দেশের বিদ্যমান সংকট উত্তরণের জন্য একমাত্র পথ বলে আমি মনে করি। এখন অনেকেই এই ঘোষণায় যেসব রাজনৈতিক দল শামিল হয়েছে তাদের মতাদর্শ ও অতীত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। তারা প্রশ্ন তুলেছে যে, এদের মধ্যে কেউ স্বৈরাচারী, আবার কেউ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, অতীতে যখন বিএনপির সরকার ক্ষমতায় ছিলো, তখন সেই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে এই সমস্ত দলের সাথে হাত মেলাতে। নানা আপত্তির মুখেও একপা পিছু হটতে দেখিনি। ঐজন্য অবশ্য তাদের কোনো গ্লানিবোধও ছিলো না। সুতরাং আজকে যেসব কথা বলে বর্তমানে বিরোধী দলীয় এই ঐক্যের বিরুদ্ধে ধূম্রজাল সৃষ্টি করার অপচেষ্টা হচ্ছে এর কোনো যৌক্তিকতাই নেই। বরং আমরা বলবো, আজকে যে ঐক্য হয়েছে, সেই ঐক্য দেশকে রক্ষা করার জন্য, জাতিকে সংকটের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য এবং এই ধরনের ঐক্যের নজীর পৃথিবীর দেশে দেশে আমরা খুঁজে পাই।

আফতাব আহ্মাদ :

৩০ নভেম্বর ১৯৯৯ কে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি নতুন বাঁক, একটি নতুন মোড় বলে আমি মনে করি। এই দিন যে যৌথ ঘোষণা জাতিকে উপহার দেয়া হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে হতাশাগ্রস্ত, বিপন্ন জাতি নতুন করে বাঁচবার, নতুন করে চলার দিশা পেয়েছে। আজ একটি কথা আমাদের সবাইকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হবে– দেশ ও জাতি গঠনের কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও মেধাসাধ্য কাজ। এই কাজ হেলাফেলায় যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সমষ্টিগত নিষ্ঠা, একাগ্রতা, মেধা ও প্রতিভা এবং সমষ্টিগত ঐক্য প্রচেষ্টা যদি নিয়োজিত করা না হয়, দেশ ও জাতি গঠন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে ২৮ বছর স্বাধীনতা ভোগ করার পরও বারবার আমাদের ফিরে যেতে হয় জাতীয় মূল ইস্যুগুলোতে এবং বিভেদ রেখা টেনে প্রশ্ন তোলা হয় জাতিকে কোন ইস্যুর ভিত্তিতে বা কোন কোন বিষয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ করবো ইত্যাদি। অথচ আমাদের মানুষের সুমহান ত্যাগের পথ ও লড়াকু চেতনা প্রণোদনার ভেতর দিয়ে যে জাতীয় ঐক্য ইতঃপূর্বে আমরা সৃষ্টি করেছি, সেটিই হচ্ছে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ ও প্রণোদনা।

আজ অনেক ধরনের প্রশ্ন আমাদের সকলের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। একদিকে বলা হচ্ছে, যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই যৌথ ঘোষণা দিয়েছে, এসব দল কখনো কখনো স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলো, কখনো কখনো স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলো আবার কখনো কখনো গণতন্ত্রের নামে বিজয় অর্জন করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে যথাযথ মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই অভিযোগ যদি সত্যিই আমরা উত্থাপন করতে চাই তাহলে তো এই অভিযোগ দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধেই উত্থাপন করা সম্ভব। বিভিন্ন সভ্যতার দিকে যদি আমরা তাকাই, বিভিন্ন জাতির অভ্যুদয় কিংবা উত্থানকে যদি অভিনিবেশ সহকারে অভীক্ষণ করি তাহলে এটি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে যাবে এবং আমরা প্রত্যক্ষ করবো যে প্রত্যেক দেশ ও জাতির ইতিহাসে একেকটি সময় বা মুহূর্ত আসে যাকে বেছে নিতে হয় সেই দেশ এবং জাতির অস্তিত্বের জন্য। বাংলাদেশে আজ তার অখন্ডতা, অবিভাজ্যতা, সম্প্রযুক্তি, স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং সংহতি যেভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে, অতীতে এভাবে কখনো হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ১৯৭১-এর ২৩ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিভিল অ্যাফেয়ার্স অর্গানাইজেশনের চীফের জেনারেল বিএন সরকারের হাত ধরে বঙ্গভবনে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলো তারাই পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭২-এর ১৯ মার্চ ২৫ বছরের গোলামী চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের পক্ষপুটে আবদ্ধ করে। বাংলাদেশের মানুষের ওপর রক্ষীবাহিনীর মতো একটি ঘাতকবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে সীমাহীন নিপীড়ন ও নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায়। অর্থনীতিকে

www.pathagar.com

ফোকলা করে ফেলা হয়। গণতন্ত্রের নামে, এক ব্যক্তির নামে একদলীয় পৌত্তলিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে নারকীয় ও চরম বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলো। সেই পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ আমাদেরকে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে সেদিন রক্ষা করেছিলেন। আর তাই সেদিন বাংলাদেশের অখণ্ডতা, অভিভাজ্যতা, সম্প্রযুক্তি, স্বাতন্ত্র স্বকীয়তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং সংহতি রক্ষা পেয়েছিলো। একটি ছায়ারাষ্ট্র (satelite state) থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পূর্ণতাপ্রাপ্তি সম্ভাবনার সুযোগ লাভ করে। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ কখনোই সেই জাতিকে সাহায্য করেন না, যে জাতি নিজেকে সাহায্য করে না।

আমাদের জনগণ অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং ধর্মপ্রাণ। কিন্তু তারা সাম্প্রদায়িকতা কিংবা ধর্মীয় উন্মাদনায় বিশ্বাস করে এমন প্রমাণ আমাদের ইতিহাস খুঁজলে কখনোই পাওয়া যাবে না। কিন্তু ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, একটি বিশেষ চক্র, বিশেষ করে তারা, যারা বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক, প্রজাকুল মুক্তির জন্য যেদিন পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করেছিলো, সেই আন্দোলনকে একটি সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে সেদিন বাংলাদেশের মানুষকে একটি অখণ্ড ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের পথে চরম অন্তরায় সৃষ্টির পর পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ববাঙলার নিপীড়িত মানুষের জন্য মায়াকান্না জুড়ে দিলো। এই মায়াকান্নার ফাঁদে পড়ে এদেশে যে রাষ্ট্রঘাতী চক্র দিনে দিনে পরিপুষ্ট হয়ে আসছিলো, তারা জনগণের আশা-অকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন না ঘটিয়ে এদেশে একটি ক্রীড়নক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলো। সেই ক্রীড়ানক সরকার অবসানের পরও আমরা লক্ষ্য করেছি, ৮১ দিনের জন্য একটি দুর্বল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যারা ইতোপূর্বে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো তাদেরই মধ্য থেকে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সিপাহী জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে এদেশের সত্যিকারের আজাদী এবং রাষ্ট্রীয় পূর্ণতা অর্জন করে। স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে যখন অর্থবহ ও কার্যবহ এবং সত্যিকারের রূপদান করার জন্য যখন ঐক্যবদ্ধ আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে আনা হলো তখন নানামুখী আক্রমণ বাংলাদেশের ওপরে নেমে আসে। রাষ্ট্রঘাতী অন্তর্ঘাতমূলক এবং পঞ্চমবাহিনীর অপতৎপরতা, নাশকতামূলক আক্রমণ ও দুষ্কর্ম আমরা দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্য করে আসছিলাম। আর এসব কিছুতেই ইন্ধন ও মদদ যুগিয়ে আসছিলো আঞ্চলিক বরকন্দাজ রাষ্ট্রটি। এই বরকন্দাজ রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক ভৌগলিক অবস্থান আরো সুদৃঢ় ও সংহত করে তোলার অসীম অভিলাষেরই পরিণতি হিসেবে আমরা দেখেছি, ১৯৯৬-এর ২৩ জুন দিল্লী পছন্দ যে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সরকারের একটিই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো- তার মূল এজেন্ডাকে জনগণের কাছ থেকে সযত্নে গোপন রেখে, করজোড়ে অতীত কৃতকর্ম ও অপরাধের জন্য সুকৌশলে ক্ষমা ভিক্ষা করে ভোট চেয়ে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, তঞ্চকতা এবং শঠতার আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতার মসনদ দখল করা। এরপর থেকেই একের পর এক রাষ্ট্রঘাতী, দেশদ্রোহী, গণবিরোধী, সমাজবিরোধী এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে একের পর এক কার্যক্রম গৃহীত হতে আমরা দেখেছি। ৩০ বছরের গঙ্গার পানি চুক্তির বলে আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার স্বীকৃতিকে বানচাল করে দিয়ে তাকে একটি ভারতীয় নদীতে পরিণত করা হয়। তারপরও ঐ চুক্তিতে না রাখা হলো গ্যারান্টির বিধান, না রাখা হলো আরবিট্রেশনের বিধান। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আনয়নের নামে অশান্তির বীজ বপন করে এদেশের এক দশমাংশ ভূখণ্ডকে ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথকে প্রশস্ত করে দেয়া হলো। তারপরও আমরা লক্ষ্য করেছি, যে স্বপ্ন মজলুম, জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দেখতেন, সেই স্বপ্নকে বানচাল করে দেয়ার জন্য বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতকে একটি মিলিটারী করিডোর প্রদানের জন্য ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্টের নামে নানা ধরনের বাহানা ও ছলনার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। আজ তাই এ সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে একটি বক্তব্য আমাদের জনগণের সামনে সুস্পষ্টভাবে হাজির করা দরকার। আমাদের মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী, মেধাবী, ধৈর্যশীল ও দক্ষ। তারা প্রতিকূল প্রকৃতি যেমন বন্যা, ঝড়-তুফান ও গোর্কীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচতে শিখেছে, তেমনি তারা চরম অর্থনৈতিক মন্দার দিনে বহুমুখী পেশায় নিয়োজিত থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শ্রম করে

www.pathagar.com

জীবিকা উপার্জন করতেও শিখেছে। আমাদের শ্রমিকেরা যখন বাইরে যায়, দেশ-বিদেশের কারখানায় যখন কাজ করে আমরা লক্ষ্য করি তাদের শৃংখলা ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে বিশ্ববাসী প্রশংসা করে। আমাদের সৈনিকরা যখন আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষীর দায়িত্ব পালন করে তখন তাদের মধ্যে একটি অনন্য দেশপ্রেমের আদর্শ কাজ করে এবং বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে তাদের প্রশিক্ষণ ও শৃংখলার তারিফ করে। আমাদের জাতি যখন প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট দুর্যোগে প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম তখন প্রত্যেকবার আমরা লক্ষ্য করি আমাদের এই সব বীর লড়াকু, অজেয় মেহনতী মানুষ পরাভবকে পরাস্ত করে জাতির অর্থনীতিকে আবার চাঙ্গা ও পুরিপুষ্ট করে দাঁড় করিয়েছে। কাজেই আজকে এই আপাত ক্ষমতাহীন, বাকরুদ্ধ এবং অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ যে জনগণ-একটি রাষ্ট্রঘাতী চক্রের কীড়নক সরকারের gladiatorial-game (মরণ ক্রীড়া/যুদ্ধ)- এ বধ্ হবার লক্ষ্য এবং শিকারে পরিণত হয়েছে তাদের মুক্ত করাই হচ্ছে আমাদের পরম ও প্রধানতম এবং পবিত্রতম কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রথম যে চারটি দল এগিয়ে এসেছে সেজন্য তাদেরকে আমি যেমন একদিকে মোরারকবাদ ও অভিনন্দন জানাব, সেই সঙ্গে আমি আরো বলতে চাই ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশপ্রেমী গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠের কৃষ্টি ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী লোক সমাজ এবং জনদরদী আরও যেসব গোষ্ঠী আছে তাদের প্রত্যেককে আজ এক কাতারে, এক মঞ্চে এসে দাঁড়াতে হবে। আজকে জাতিকে বিভক্ত করার জন্য সেই পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে নতুন করে আবার সেই চর্বিত চর্বন উচ্চারণ করা জাতীয় বেঈমানীর সমতুল্য। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষ এবং বিপক্ষ' বলে এক সুগভীর ষড়যন্ত্র রচনা করা হয় সেই জেনারেল বিএন সরকারের আমল থেকেই। স্বাধীনতার ২৮ বছর পর, বিশেষ করে ১৯৪৭ এর ব্রিটিশসৃষ্ট ভারতের বিভাজন যে ব্রাহ্মণ্যবাদী, সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্যবাদী ও রাষ্ট্রঘাতী চক্র স্বীকার করতে চায় না, তাদের হীন তৎপরতার প্রতিহত করতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষ কিংবা বিপক্ষ বলে আজ আর কিছু নেই। নেই এই অর্থে যে, দেশ স্বাধীন করে আনার পর আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে এর ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা, স্বাধীনতা ও সম্প্রযুক্তি, স্বাতন্ত্র, স্বকীয়তা সার্বভৌমত্ব এবং সংহতি অক্ষুন্ন রাখা ও রক্ষা করা। এই প্রশ্নে যারা দ্বিধান্বিত, দোদুল্যমান, পরাশ্রয়ী; এই প্রশ্নে যারা বিদেশের নিয়োগ এবং রাষ্ট্রাতিক আনুগত্যে পুষ্ট তাদের বিরুদ্ধে আজ আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ আমরা করেছিলাম পিন্ডির গোলামীর জিঞ্জির ভেঙ্গে একটি স্বাধীন, বৈষম্য ও শোষণ মুক্ত একটি ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং একটি সহনশীল বহুবাচনিক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা পিন্ডির জিঞ্জিরের পরিবর্তে দিল্লীর জিঞ্জির আমাদের কাঁধে তুলে নেব। দেশে আজ একদিকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার, আরেকদিকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে প্রগতির। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে একদিকে Rightist আর একদিকে Leftist-এর বা বামের। কিন্তু নির্জলা সত্য হচ্ছে এই যে, আজ এখানে প্রতিক্রিয়া এবং প্রগতির সংজ্ঞা পাল্টে গেছে। ডান এবং বাম বলে কোন বিভাজন আর নেই। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ও দেশজ স্বার্থে right cause এ যারা নিবেদিত প্রাণ তাদেরকে কেউ অভিহিত করতে চাইলে rightist অভিহিত করতে পারেন। কিন্তু এদের যদি কোন নামে অভিহিত করতেই হয় তাহলে বলা যেতে পারে Patriotic Workers Front of True Path বা True Pioneers অর্থাৎ সাচ্চা পথের দেশপ্রেমিক কর্মী জোট এর সদস্য অথবা সাচ্চা পথিকৃৎ। আর যারা দেশের ও দেশজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরামুখাপেক্ষী হয়ে পরাশ্রয়ী রাষ্ট্রাতিক ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে have left the righteous cause of the people, country and the nation এরাই হচ্ছে আজকের যুগের leftist (Those who have left the right and correct cause. They are the self-styled leftists) এসব বামচারী গোষ্ঠি প্রকৃত বাম নয়, বামের ইতিহাস সম্পর্কে হয় তারা অজ্ঞ না হয় তাদের বিধি বাম কিংবা রাজনৈতিক অবিমৃষ্যকারিতার ব্যাধিতে ভুগে নিজেদের বাম ঠাউরে আত্মপ্রসাদে ভুগছেন– যা জন-প্রবঞ্চনা ও আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর- এদের track

www.pathagar.com

record তাই সাক্ষ্য দেয়। রাষ্ট্রাতিক আনুগত্যপোষীদের প্রগতির অভিধায় অভিষিক্ত করে লেজুড় বৃত্তি করার অর্থ আর যাই হোক 'বাম' রাজনীতি চর্চা নয়। দেশ আজ সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে অবস্থান করে তারা যাদের হাতে রয়েছে দিল্লীর গোলামীর জিঞ্জির, আরেক ভাগে অবস্থান করে তারা যাদের হাতে রয়েছে এদেশের মানুষের আযাদীর ঝাণ্ডা। এই ঝাণ্ডা লাখ লাখ শহীদের রক্তে রঞ্জিত, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে রঞ্জিত-এদেশের লড়াকু, আপসহীন অজেয় মেহনতী দেশপ্রেমিক মানুষের অশ্রু, শ্রম, ঘাম ও ত্যাগে সিক্ত। সেই ঝাণ্ডা ধরে যারা দাঁড়িয়ে আছে বা এই ঝাণ্ডার দলে যারা আসবে তারাই হচ্ছে সাচ্চা দেশপ্রেমিক, সাচ্চা দেশদরদী, সাচ্চা জাতীয়তাবাদী, সাচ্চা জনদরদী ও সাচ্চা নাগরিক-যারা এই দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা সম্প্রযুক্তি ও সংহতি রক্ষা করতে জীবনবাজী রেখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চিত্তে লড়াই করে চলেছে। এই লড়াইয়ে ইনশাআল্লাহ তাদের জয় হবেই।

আজকে অনেকেই বলে যে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির পক্ষপুটে উদারনৈতিক বিরোধী দল আশ্রয় নিচ্ছে কেন? আজকে যারা দেশপ্রেমের কথা বলে, প্রগতির কথা বলে, উদারনৈতিক রাজনীতির কথা বলে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির কথা বলে তারা কেন ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করেছে? কেউ কারো পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করেছে বলে আমি মনে করি না। এটি একটি দেশ প্রেমিকজাতীয় জোট (Patriotic National front)। ঘরে যখন আগুন লাগে তখন আবাল-বৃদ্ধ বণিতা প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে সেই আগুন নেভানো। যার পক্ষে সম্ভব এক বালতি পানি ঢালা বা এক বালতি বালি ঢালা সে তাই করবে। একবার দেশে দেশে জাতীয় মুক্তির ইতিহাসের দিকে তাকালে তো বিষয়টি প্রাঞ্জল হয়ে যাবে। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে কী দেখবো? আমরা দেখব, ভিয়েতনামের কমিউনিস্টরা ধর্মাশ্রয়ী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গেও ঐক্যমোর্চা করতে পিছপা হয়নি। আমরা আরও দেখতে পাই ফ্লোরিডা বিচ থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্যারিবীয় দ্বীপ কিউবায় গীর্জাকে কিউবার মহান নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো তার রাজনৈতিক মোর্চার বাইরে রাখেননি। এই সেদিন পোপ ক্যাস্ট্রোর কিউবা পরিদর্শন করে এসেছেন। কিন্তু ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে গীর্জার ধর্মযাজকরা যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মোর্চা গঠন করেছিলেন তারা ক্যাস্ট্রোর পাশে থেকেই পোপের উদ্দেশ্য বলেছেন, 'ধর্মপ্রচার করতে এসেছে, ধর্ম প্রচার করে যাও। ধর্মের অপব্যবহার, অসদ্ব্যবহার করে ধর্মের নামে অন্যের রাজনীতির ফেরি এখানে কর না'। দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামে ম্যান্ডেলার অনুপস্থিতিতে গীর্জা এবং বিশপ টুটুর কথা কে অস্বীকার করতে পারবে? একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার অভিযোগ যারা করে তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, একাত্তরে শুধু যারা এই দেশে বসবাস করে সরাসরি পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল এটিই কি তাদের অপরাধ? আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের পিতামাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী এমনকি বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমানও কি পাকিস্তান চাননি? তিনিও কি সেই 'অপরাধে' অপরাধী নন? ১৬ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানী সামরিক চক্রের সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন তিনি, তা তো পাকিস্তান রক্ষারই প্রয়াস ছিলো। শেখ মুজিব নেগোশিয়েশনের মাধ্যমে আপস-রফা করেই তো একটি অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের জন্য আমাদের দেশের মানুষ বাধ্য হয়েছিল অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করতে এবং সেই মুক্তিযুদ্ধের সময়েও আমরা দেখেছি আওয়ামী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিলো সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব প্রধানত এসেছিল সামরিক বাহিনীর মধ্য থেকে এবং সামরিক বাহিনীর সেই অজেয়, অমর, চিরঞ্জীব বীর শহীদ জিয়াউর রহমান সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা ও ডাক দিয়ে জাতির মধ্যে একটি নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন। হতাশায় মুহ্যমান জাতিকে তিনি প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি দান করেছিলেন। যার ফলে পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের পক্ষে একটি মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। তাই আজ নতুন করে যখন প্রশ্ন ওঠে যে, কেন জামায়াতে ইসলামী কিংবা অন্যান্য ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে উদারনৈতিক বিরোধী

www.pathagar.com

দলগুলো ঐক্য গঠন করছে এবং এই ঐক্যকে কেন বিদ্যুৎজনরা সমর্থন করেন? এর উত্তর হচ্ছে জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোন ভেদাভেদ করার কোন সুযোগ আর আমাদের সামনে নেই। স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান যখন এক পর্যায়ে ভারতের মাত্রাতিরিক্ত হস্তক্ষেপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য উপায়ন্তর না দেখে ভারতীয় উপদেষ্টাদের পশ্চাৎদেশে পদাঘাত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন তখন তিনিও তো সকলকে অতীতের তিক্ততা ও ভেদাভেদ ভুলে যেতে আহবান জানিয়ে ভেদরেখা ও জাতীয় বিভাজনের অবসানের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেছিলেন– যাঁরা দেশ গঠন করতে চান এগিয়ে আসুন-সকলে মিলে অতীত ভুলে গিয়ে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ভেদরেখা ও বিভাজনের কথা বিস্মৃত হয়ে আসুন নতুন করে আজ আমরা আমাদের দেশটি গড়ে তোলার কাজটি শুরু করি। আমি শেখ হাসিনা সে কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাই যে রাষ্ট্রঘাতী চক্র, রাষ্ট্রের দুশমনদের সঙ্গে এবং যারা এই রাষ্ট্রকে বিপথগামী করতে চায়, বাংলাদেশকে যারা বৃহত্তর ভারতের ইউনিয়নভুক্ত করতে চায় তাদের সাথে কোনো আপসরফা হতে পারে না। এদেশের মানুষ বাংলাদেশকে একটি শিখণ্ডী রাষ্ট্র, একটি ছায়ারাষ্ট্র কিংবা একটি করদ রাষ্ট্র বানানোর জন্য এতসব ত্যাগ করেনি। এই দেশকে রক্ষা করতে হলে, এই দেশকে তার স্বাতন্ত্র নিয়ে তার স্বকীয়তাকে রক্ষা করতে হলে, এদেশের পুঁজিকে যদি জাতীয়ভাবে পুনর্গঠিত করতে হয়, তাহলে ভারতের মুখাপেক্ষী না হয়ে বা অন্য যারা এদেশের বাজার দখল করতে চায় তাদের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমাদের হাত বাড়াতে হবে সেইদিকে যারা আমাদের সাথে সমমর্যাদার ভিত্তিতে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসবে। আজকে আমাদের মনে রাখতে হবে, অতীতের সমস্ত শত্রুতা, গ্লানি ভুলে গিয়ে দেশের প্রতি, মাটি ও মানুষের প্রতি, দেশের সম্পদের প্রতি অনুগত থেকে আজ আমাদের লড়তে হবে একটি আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য। যে বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য, যে বাংলাদেশের জন্য আমরা মরতে রাজি আছি, জীবন দিতে রাজি আছি। আমাদের এই নবজাগৃতি ও জাতীয় পুনর্গঠনের মূল মন্ত্র হবে "প্রথম বাংলাদেশ আমার, শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার, মরণ বাংলাদেশ"।

মাহবুব উল্লাহ :

এখানে এই যৌথ ঘোষণার তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। কথা উঠেছে যে, ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির সঙ্গে যারা লিবারেল ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করে, তারা কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন যে, বিএনপি'র মত একটি লিবারেল উদারপন্থী গণতন্ত্রী দল কীভাবে কট্টর ধর্মাশ্রয়ী জামায়াতে ইসলামী এবং স্বৈরাচারীর সঙ্গে হাত মেলাতে পারে? আমার মনে হয়, এই প্রশ্নটির জবাব দেয়া দরকার। প্রথমত আমি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে অভিনন্দন জানাব এ জন্য যে, তিনি দেরিতে হলেও স্বীকার করেছেন যে, বিএনপি উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দল। এটি তারা কখনোই স্বীকার করতেন না। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই ঐক্য? আমরা জানি, পৃথিবীতে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে জাতিকে রক্ষা করার জন্য মানব সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য অনেক সময়ে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা যদি আমরা স্মরণ করি, তাহলে আমরা দেখব, হিটলার এবং মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, জাপানের মিলিটারিজমের বিরুদ্ধে সেই সময় সভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এলাইড পাওয়ার্স গঠন করেছিল। একসিস পাওয়ার্সের বিরুদ্ধে একটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমাধান হয়েছিল ফ্যাসিবাদ না গণতন্ত্র বা মানুষের মর্যাদা জয়যুক্ত হবে। তেমনিভাবে আমরা যদি চীনের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলেও আমরা দেখব যে, সেখানে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও সেতুং কুয়োমিনতাং পার্টির নেতা চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। যাঁরা চীনের ইতিহাস জানেন, তাঁদের

www.pathagar.com

বিখ্যাত সিয়ান ইনসিডেন্টটির কথা নিশ্চয়ই স্মরণে আছে। সেই ঘটনায় চীনের তৎকালীন সামরিক বাহিনীর কিছু দেশপ্রেমিক অফিসার চিয়াং কাইশেককে একটি অভ্যুত্থানের ঘটিয়ে বন্দী করে ফেলে। মাও সে তুং তখন চিয়াং কাইশেককে যাতে হত্যা কবা না হয় সেজন্য তার সহযোদ্ধা চৌএন লাই-কে পাঠান এবং সেখানে বন্দী অবস্থায় চিয়াং কাইশেকের সংগে দীর্ঘ নেগোসিয়েশন হয় এবং সেই নোগোসিয়েশনের পথ ধরেই জাপ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এই যুক্তফ্রন্টই চীনকে জাপানি আগ্রাসনের থাবা থেকে রক্ষা করে। যদিও চিয়াং কাইশেকের হাতে অনেক কমিউনিস্ট নেতাকর্মী নিহত হয়েছিলেন এবং চীনের জনগণ নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়েছিল। জাতীয় প্রয়োজনে এ ধরনের ঐক্য করতে হয়। ভিয়েতনামের বৌদ্ধ ভিক্ষু থেকে কমিউনিস্ট পর্যন্ত সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজকে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বাংলাদেশের জন্য কী ভারতই প্রধান দ্বন্দ্ব? আজকে কী বাংলাদেশ বহিরাক্রমণের শিকার যে কারণে এই ধরনের একটি ঐক্য মোর্চা বা যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজন? আজকের পৃথিবীতে সরাসরি আগ্রাসন আমরা খুব একটা লক্ষ্য করি না। এ প্রসঙ্গে ভারতের সিকিম গ্রাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ডমিনিকান রিপাবলিকে মার্কিন ছত্রীসেনা নামিয়ে আগ্রাসন বা আক্রমণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রেনাডায় মার্কিন সামরিক অভিযান কিংবা পানামার নরিয়েগোর অপহরণের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। বলকান অঞ্চলের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। বর্তমানে এখনও চেচনিয়াতে রাশিয়ার আগ্রাসন চলছে। বাংলাদেশে সরাসরি ঠিক সে ধরনের ভারতীয় আগ্রাসনের সমস্যা না থাকলেও বাংলাদেশকে ধীরে ধীরে সুকৌশলে গ্রাস করার একটি নীতি ভারতীয় আধিপত্যবাদীরা বহু পূর্ব থেকেই কার্যকর করে আসছে। সেই জন্যই আজকে বাংলাদেশে একটি দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা জরুরী হয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন মতাদর্শের দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সুতরাং আজ যারা এই ঐক্যের বিরোধিতা করেন, তারা প্রকারান্তরে আধিপত্যবাদের অনুচর বা সেবাদাস হিসেবেই কাজ করছেন। আমাদেরকে এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। এই যৌথ ঘোষণায় যা এসেছে তাতে এমন কিছু নেই। যেটাকে আজকে খুব তরল, রসালো এবং চটুল অর্থহীনভাষায় বলা যায় ফান্ডামেন্টালিজম। এই ঘোষণাটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে দেখবেন, সেখানে কোথাও লক্ষ্য করা যাবে না যে, এর মধ্যে মৌলবাদের কোন চিহ্ন আছে। বরং বলা হয়েছে, সংবিধানের প্রতি অনুগত থেকে একটি রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা করা, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং সেটাই হচ্ছে আজকের অঙ্গীকার। এই সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও আস্থার কথা আছে। তাঁর প্রতি আনুগত্যের কথা আছে। একই সঙ্গে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের কথাও উল্লেখ করে বলা হয়েছে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ বাধাহীন ভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। সুতরাং এই মূল্যবোধগুলোকে কেন্দ্র করে আমাদের জাতীয় জীবনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। আওয়ামী লীগ যখন এবার ক্ষমতায় আসলো তখন আমরা লক্ষ্য করলাম, বিসমিল্লাহকে বাংলায় তরজমা করার একটা চেষ্টা। সেই সঙ্গে তারা আরো কিছু আয়াতেরও বাংলা তরজমা চালু করলো। কিন্তু আমরা আরো লক্ষ্য করছি, আজকাল শেখ হাসিনা যে কোন প্রকল্প উদ্বোধন করতে গেলে সেখানে পাথরের ফলকে ঠিকই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'উৎকীর্ণ করা হয়। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠানের শেষে মোনাজাতও করা হয়। অর্থাৎ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি তারা বাহ্যিকভাবে হলেও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বাধ্য হচ্ছে। এমনকি বিগত সাধারণ নির্বাচনের পোস্টারে মোনাজাতরত অবস্থায় শেখ হাসিনার একটি ছবিও লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং যেসমস্ত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক ফান্ডামেন্টালিজমের বিপদের অজুহাতে এই ধরনের ফ্রন্ট দেশকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে বলে যে কুৎসা রটাচ্ছে, তাদের এই বক্তব্য যে কতটা অমূলক এবং বাস্তবতাবিবর্জিত সেটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। আজকে তাই যে ঘোষণা এসেছে, সেই ঘোষণা সমগ্র জাতিকে উদ্বেলিত করেছে, প্রাণচঞ্চল করেছে। ঘোষণার দিন ২৯ মিন্টো রোডের জনসমাবেশ থেকেই বোঝা যায়

www.pathagar.com

যে, জাতির মধ্যে একটি নতুন প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছে। একটি নতুন ইচ্ছাশক্তি জন্ম নিয়েছে। যার ফলে মানুষ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন এবং জালেম, অত্যাচারী, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার হরণকারী, রাষ্ট্রঘাতী চক্রের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামী প্রত্যয় আরো বলিষ্ঠ হয়েছে। আমি মনে করি, আমাদের জাতীয় নেতৃত্বের উচিত ছিল আরো আগেই এ ধরনের একটি ঐক্য মোর্চা গঠন করা। এখন এই ঐক্য মোর্চাকে সযত্নে লালন করতে হবে এবং একে ভবিষ্যতের অভীষ্টের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে গঠনমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে। সকল প্রকার বিভ্রান্তি, বিদ্বেষ, বিরোধ পরিহার করে, যেসব প্রশ্নে ন্যূনতম ঐক্য আছে, সেই ঐক্যটুকু বজায় রাখতে হবে।

আফতাব আহ্‌মাদ :

একটি কথা এ প্রসঙ্গে না বললেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধানের দিকে তাকালে আমরা লক্ষ্য করব, সেইসব সংবিধানে আজ এখানে যেসব শব্দকে মৌলবাদ বা ইংরেজিতে fundamentalism বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে, একইভাবে অভিযুক্ত করা যেতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, রাষ্ট্র কোন ধর্মকে আনুকূল্য প্রদর্শন বা কোন ধর্মের প্রতি বৈরিতাও প্রদর্শন করবে না। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন পবিত্র বাইবেলের ওপর হাত রেখে তাঁর শপথ বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছিলেন এবং এরপর থেকে ট্র্যাডিশন হিসেবে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট পবিত্র বাইবেলের ওপর হাত রেখেই শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন। এর দ্বারা সেখানে মৌলবাদ চর্চা হচ্ছে বোঝানো হয় না কিংবা সেখানে মৌলবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বলেও বুঝানো হয় না। বলাই বাহুল্য, 'মৌলবাদ' basically হচ্ছে একটি Christian concept. ইসলামের মধ্যে মৌলবাদ বলে কোন জিনিস নেই। যারা মৌলবাদের কথা বলে, তারা মৌলবাদের অর্থ না বুঝে বলেন। আমরা শ্রীলংকার সংবিধানেও দেখি, সেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, সংবিধানের মৌল লক্ষ্য হবে বৌদ্ধ শাসনের সুনিশ্চিতি এবং সুরক্ষা করা। এর ফলে শ্রীলংকাকে কেউ বলে না যে, ওটি মৌলবাদী রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমরা যদি রোববার ব্রিটেনের রেডিও-টেলিভিশন খুলি তাহলে দেখব, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে ক্রিশ্চিয়ানদের মাস সার্ভিস প্রচার করা হচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে, সেখানে মৌলবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মানুভূতিকে শ্রদ্ধা করা, সম্মান করা এবং যথাযথ মূল্য দেয়াই হচ্ছে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য। আর রাজনীতিকে যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হয় তাহলে ধর্মভিত্তিক মৌলিক চেতনাজাত নৈতিকতাগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। আর সেটি না করা হলে দেখা দেবে ধর্মের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার। এই প্রসঙ্গে একটি কথা সুস্পষ্টভাবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে আজকে যারা মৌলবাদ মৌলবাদ বলে চিৎকার করছে তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে যাতে কোনভাবেই একটি জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে না পারে এবং বাংলাদেশকে ভারতের পশ্চাৎভূমি হিসেবে যাতে ব্যবহার করা যায়। এইসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যদি আমাদের রুখে দাঁড়াতে হয় তাহলে আমাদের একটি জিনিস উপলব্ধি করতে হবে। আজকে ইসলামী শক্তিগুলো ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিভেদ ও বিভাজন সৃষ্টি করার জন্য নানা মহল থেকে নানা ধরনের কারসাজি শুরু হয়ে গেছে। এ ধরনের তৎপরতা ভবিষ্যতে আরো হবে। রাষ্ট্রাতিক শক্তিগুলো টাকার ঝুলি নিয়ে ইতোমধ্যেই মাঠে নেমে গেছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত, তাদের বিভিন্ন বাহিনী ও চেলাচামুণ্ডার এবং তাদের ফরমায়েশী কলমবাজরা আজকে নানা ধরনের গল্প, চটুল খবর ও জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করে ও ধর্মপ্রাণ মানুষদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেই যাবে। আজকে আমাদের সে ব্যাপারে একদিকে যেমন সজাগ থাকতে হবে তেমনি পাশাপাশি খেয়াল রাখতে হবে যে, আগামী নির্বাচনের সময় যাতে কোন বিভ্রান্তি ও বিভেদের ধুম্রজাল সৃষ্ট করতে না পারে। গত নির্বাচনে

www.pathagar.com

আমরা দেখেছি মাত্র ৩৩ শতাংশের ভোট পেয়ে হাসিনা বিনতে মুজিবের সরকার দাবী করছে যে, তারা জনগণের ম্যান্ডেট পেয়ে গেছে। অথচ ৬৭ ভাগ জনগণ তাদের বিপক্ষে। আগামী নির্বাচনে যেমন ঐক্যবদ্ধভাবে একটি মোর্চা গঠন করে ভারত পন্থীদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে বিদায় করতে হবে, তেমনি যাতে ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্রদ্রোহী, রাষ্ট্রঘাতী, গণবিরোধী চক্র বাংলাদেশে আর অংকুরিত হতে না পারে, সেজন্য এই ঐক্যকে কমপক্ষে ২৫ বছর যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি তার জন্য আমাদেরকে পরিপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, আমরা এতে কামিয়াব হব।

মাহবুব উল্লাহ :

ড. আফতাবের বক্তব্যের সঙ্গে আমি শুধু ছোট দু'টি বক্তব্য যোগ করব। কিছু দিন আগে ফ্রান্সে মুসলিম ছাত্রীরা অবগুণ্ঠিত হয়ে ক্লাসরুমে যেতে চেয়েছিল। সে ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাধা এসেছিল। শেষ পর্যন্ত আদালতের রায়ে তাদেরকে অবগুণ্ঠন পরিধানের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিছুদিন হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা যদি দাঁড়ি রাখতে চান, তাহলে তাঁরা দাঁড়ি রাখতে পারবেন। এই যে সিদ্ধান্তগুলো পাশ্চাত্য জগতে নেয়া হচ্ছে এটাকে কী আমাদের দেশের তথাকথিত মৌলবাদ বিরোধীরা ' মৌলবাদ' বলবেন, না মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাস্থাপন হিসেবে গণ্য করবেন? আজকে তারা নিশ্চয়ই এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারবেন না। কেউ দাঁড়ি রাখলে, টুপি পরলেই মৌলবাদী হয়ে যায় আর অন্য ধর্মের কিছু অনুকরণ করলে একেবারে প্রগতিশীল হয়ে যায়, এরকম ভাবা বোধহয় ঠিক নয়। বরং এই ধরনের ভাবনার পিছনে যে গূঢ় অভিসন্ধি কাজ করছে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সাংস্কৃতিক আগ্রসনের বিষয়টিকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় কী? আমি আবারও বলব যে, বিরোধী দল সমূহের পক্ষ থেকে যে যুক্ত ঘোষণা এসেছে সেটা অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত এবং যদি একে সত্যিকার অর্থে যত্নের সঙ্গে লালন করা হয় এবং ধরে রাখা সম্ভব হয়, যে মূল্যবোধগুলোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলো যদি চর্চা করা হয়, তাহলে আমাদের জাতীয় জীবনে এক গুণগত বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সব রকম সংকট থেকে মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে সন্ত্রাস কবলিত আমাদের এই বাংলাদেশে সন্ত্রাসের পেছনে রাষ্ট্রাতিক শক্তির মদদ আছে বলে অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু একটি শক্তিশালী সরকার যদি এদেশে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে সেই সরকারের পক্ষে দৃঢ় রাজনৈতিক প্রত্যয় ও অঙ্গীকার নিয়ে সন্ত্রাসকে দমন করে এই দেশকে বাসযোগ্য করে তোলা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। কারণ সন্ত্রাস সেই ধরনের পরিবেশেই ছড়িয়ে পড়ে, যখন অনিশ্চয়তা বিরাজ করে এবং দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় চেলাচামুণ্ডাদের নিয়ে লুণ্ঠন ও তস্করবৃত্তির মাধ্যমে সমগ্র দেশকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। সেই জন্য তারা আমলা, পুলিশ, রাষ্ট্রযন্ত্র- সব কিছুকেই ব্যবহার করে। সতুরাং আজ দেশকে একটি স্টেবল গভর্ণমেন্ট উপহার দিতে হবে। দেশে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। রাজনৈতিক নৈরাজ্য থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে বিরোধী দলগুলোর এই যৌথ ঘোষণা তাৎপর্যমণ্ডিত ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমরা আগামী দিনের বিজয়ের দিকে তাকিয়ে আছি। তাকিয়ে আছে এদেশের সাড়ে বার কোটি জনগণ।

www.pathagar.com

১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯

বাংলাদেশের জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী অপরিহার্য

মাহবুব উল্লাহ :

অতি সম্প্রতি ঢাকায় 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিড অ্যান্ড পিস স্টাডিজ'-এর উদ্যোগে 'বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার আঙ্গিকসমূহ' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী একটি গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ এবং ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই গোলটেবিলের শেষ দিনে আলোচনার মূল বিষয় ছিল 'সামরিক বাহিনী ও জাতীয় নিরাপত্তা'। এই বিষয়ের ওপর সেদিন মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন 'দৈনিক প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমান। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা নীতি ঃ একজন নাগরিকের ভাবনা'। তিনি তাঁর এই প্রবন্ধে কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন− যেগুলো নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। বাংলাদেশে কয়েক বছর আগেও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে বা জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে আলোচনার রেওয়াজ বিদ্বৎসমাজ বা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিলো না। এই বিষয়টি আমরাই ১৯৯৪ সালে একটি সেমিনারের মধ্য দিয়ে সামনে নিয়ে আসি। পরবর্তীকালে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি 'দৈনিক ইনকিলাব'-এর উদ্যোগে 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার সংকট' শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠক হয়েছে এবং দৈনিক ইনকিলাব সেটি নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেছে। জনাব মতিউর রহমানের প্রবন্ধ পাঠ করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে, তাঁর এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দৈনিক ইনকিলাবের সেই গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিবাদ্য বিষয় এবং সেখানে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোরই জবাব দেয়ার একটি কৌশলী চেষ্টা।

প্রথমত, মতিউর রহমান বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর বাজেট, যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং প্রতিরক্ষা বিষয় নিয়ে দেশে বেশ আলোচনা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, অতীতে রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে তেমন আলোচনা হত না। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার বিষয়টি তার সামরিক শক্তির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এটা শুধু আজকের কথা নয়, আমরা যদি প্রাচীন মৌর্য আমলের কথাও চিন্তা করি, চানক্যের অর্থশাস্ত্র নিয়েও যদি আলোচনা করি, তখনও দেখবো যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন হল, প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা আমরা কতদূর করব? নিঃসন্দেহে প্রতিরক্ষা বিষয় নিয়ে জন প্রতিনিধিরা আলোচনা করবেন, তর্ক-বিতর্ক করবেন এবং দেশের নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বকে নিশ্চিত করার জন্য যা যা প্রয়োজন, সেটা করার জন্যে তাঁরা সরকারকে চাপ দেবেন বা দাবী তুলবেন− এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু স্পর্শকাতর বিষয় রয়েছে, যেগুলো প্রকাশ্য আলোচনায় আসা বা আনা উচিত নয়। আমরা যদি উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে, এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও নেপালের প্রতিরক্ষা নীতি যতটা পরিস্ফুট, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি ততটা পরিস্ফুট নয়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদেরকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর্বে ফিরে যেতে হবে। আমরা জানি, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমরা ভারতের ওপর নির্ভর করেই করেছিলাম। ফলে আমাদের রাষ্ট্রের ওপর ভারতের এক ধরনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব থেকে যায়। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময়ও কিছু কিছু লোক দাবী তুলেছিলো যে, এই সুযোগে বাংলাদেশকে বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে যেন ভারতের অঙ্গীভূত করে নেয়া হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের জনগণের মনমানসিকতা উপলব্ধি করে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু তারপরও বলতে হবে, ভারতের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের পথে একটি বিরাট পদক্ষেপ ছিল ১৯৭১। অর্থাৎ পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করা। বাংলাদেশের জনগণ চেয়েছিলে বাংলাদেশকে একটি সত্যিকার স্বাধীন-সার্বভৌম আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি সবসময় অ্যাডহক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে বলে জনাব মতিউর রহমান উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কী কারণে এই adhocism হয়েছে, সেটা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। আমার মনে হয়, এখন সময় এসেছে, এই কারণটি স্পষ্ট করে বলা। আমরা সবাই জানি যে, ১৯৭২ এর মার্চ মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন এবং তৎকালীন শেখ মুজিব সরকারের সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা তথাকথিত শান্তি-মৈত্রী এবং সহযোগিতা চুক্তি নামে অভিহিত হয়েছিলো। সাধারণ জনগণ অবশ্য ঐ চুক্তিটিকে গোলামীর চুক্তি হিসেবেই অভিহিত করে। একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য একটি রাষ্ট্রের যে কোন ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হতেই পারে। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পাদিত ভারতের এই চুক্তিটি নিছক শান্তি-মৈত্রীর চুক্তি ছিল না। এর সামরিক তাৎপর্য ছিল অনেক বেশী ব্যাপক এবং গভীর। কারণ ঐ চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী কোন রাষ্ট্র অর্থাৎ ভারত বা বাংলাদেশ কোন তৃতীয় রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা পরস্পর বৈঠকে বসবে এবং এ সম্পর্কে কী পদক্ষেপ নেয়া যায় তা আলোচনা করে সমাধান করবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা মনে-প্রাণে জানতেন, ভারতের আসল অভিসন্ধিটি কী। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির উদ্ভব এমন একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়েছিল, যার ফলে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় বা সরকারীভাবে ভারতের অভিসন্ধিগুলোকে জনসমক্ষে বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যখন যাঁরাই এসেছেন, তাদের পক্ষে সরাসরি তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। অবশ্য, সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে সব সময় প্রতিরোধ-প্রতিবাদ এসেছে। এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ১৯৭২-'৭৫ বিভিন্ন জনসভায় বিভিন্ন বিরোধী দল তৎকালীন সরকারের ভারতঘেঁষা নীতির প্রতিবাদ করেছেন। তারপরও বলব যে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই একটি প্রতিরক্ষা চিন্তা ছিল, কারণ, একটা প্রতিরক্ষানীতি ছাড়া কোন সামরিক বাহিনী গড়ে উঠতে পারে না। সামরিক বাহিনীর একজন সৈনিককে প্রশিক্ষণ দিতে গেলে তাকে অবশ্যই ভাবতে হবে, সে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। কাকে সে মোকাবিলা করবে, কী জন্য করবে। সুতরাং এই বিষয়গুলো বিঘোষিত বা প্রকাশ্য নীতি হিসেবে নির্ণয় করা না হলেও ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই এটি একটি অবয়ব ধারণ করছিলো। যথার্থভাবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা অস্বীকার করতে পারবো না যে, বাংলাদেশের বা যে কোনো রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষানীতি তার সীমান্ত, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান, তার জাতীয় স্বার্থ ইত্যাদির দ্বারাই পরিচালিত হবে এবং এই প্রতিরক্ষানীতিও পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে এই প্রতিরক্ষানীতিকেও খাপখাইয়ে নিতে হয়। তারপরও একথা সত্য যে প্রত্যেক রাষ্ট্র তার আত্মরক্ষার জন্য একটা প্রতিরক্ষা নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষানীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা বা ঘোষনা না থাকার একটা বড় কারণ ছিল এই যে, একটি চুক্তির মাধ্যমে আমরা ভারতের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম এবং দায়বদ্ধ অবস্থায় বাংলাদেশের পক্ষে প্রকাশ্যে তার শত্রুকে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। বিশ্বে এক সময়ে সামরিক জোট গঠন করার নীতি অনুসৃত হত। আমরা CENTO, SEATO, ANZUS, NATO WARSAW প্রভৃতি জোট গঠন করার কথা জানি। কিন্তু এই ধরনের জোট অকার্যকর হয়ে পড়েছে। যার ফলে আজকের দুনিয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে এক রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সমঝোতাকে চুক্তির চাইতেও বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। চীন এবং সভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সেই ১৯৫০ সাল থেকে একটি দীর্ঘমেয়াদী সামরিক চুক্তি ছিল, তা সত্ত্বেও ১৯৬০ সালের পর যখন চীন-সভিয়েত আদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দিল, তা শুধু আদর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না, সামরিক দ্বন্দ্বেও পরিণত হলো। এ থেকে শিক্ষনীয় বিষয় হলো শুধুমাত্র চুক্তি থাকলেই একটি দেশ আরেকটি দেশের কাছে নিরাপদ থাকবে তা সঠিক নয়। পরস্পরের নিরাপত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে পৃথিবীর কোন দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে না।

আফতাব আহমাদ :

গত ৮ ডিসেম্বর দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় 'প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমান 'বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রতিরক্ষানীতি ঃ একজন নাগরিকের ভাবনা' এই শিরোনামে যে প্রবন্ধটি ছাপা শুরু করেছিলেন, সেটির ছাপা শেষ হয় ৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৯। এটি প্রথমে তিনি উপস্থাপন করেন 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড পীস স্টাডিজ' আয়োজিত একটি গোলটেবিল বৈঠকে। এই গোলটেবিল বৈঠকটি 'দেশের সামরিক বাহিনী ও জাতীয় নিরাপত্তা' শীর্ষক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। প্রথমে মতিউর রহমান, যিনি প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেছেন– নাগরিকদের পক্ষ থেকে নাগরিক ভাবনা হিসেবে, তাঁর সম্পর্কে দু'টি কথা বলতে হয়।

'প্রথম আলো'র সম্পাদক হওয়ার আগে তিনি ছিলেন ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক। তারও আগে তিনি আজকের কাগজ-এর সম্পাদক এবং তারও আগে তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'একতা'র সম্পাদক এবং কমিউনিস্ট পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, পলিটব্যুরোর সদস্য এবং মস্কোর প্রতি নিবেদিত প্রাণ একজন একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট। আজকে তাঁর লেখায় সেসবের কোন প্রতিফলন নেই। তিনি বারংবার একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান এবং একজন বিশিষ্ট আমলা, যিনি এক সময় সামরিক বাহিনীকে 'সেবা' দিয়েছেন উপদেষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, সেই আবুল মা'ল আবুদল মুহিতের গ্রন্থরাজি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বলাই বাহুল্য যে, একজন একাডেমিশিয়ান একটি পরিস্থিতিতে যে ধরনের চিন্তা-ভাবনা করেন তা সব সময় স্থির বা স্থবির বা অনড় হয়ে থাকার কথা নয়, তার চিন্তা নতুন নতুন variables identified হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। তাঁর চিন্তা পরিমার্জিত ও পরিশীলিত হতে থাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে। সিটিজেন আর্মি বা জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে একদশক আগে প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জমান যে ধারণা পোষণ করতেন, আজকের পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে সে চিন্তায় যে ব্যাপক ও গুণগত পরিবর্তন এবং রূপান্তর ঘটেছে, এ খবর সম্ভবত সম্পাদক মতিউর রহমান রাখেন না। প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামানের বহু আগে প্রকাশিত একটি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তাঁর যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে একথাটিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রফেসর মনিরুজ্জামানের রচিত প্রবন্ধটির সময়কার socio-political ecology ও context জানা যেমন খুবই জরুরী তেমনি গ্রন্থটির actual text বুঝাও অত্যন্ত জরুরী। অপরদিকে, জনাব আবুল মা'ল মুহিত যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সে সম্পর্কে আমার গভীর সন্দেহ রয়েছে, কারণ, হেন বিষয় নেই যে বিষয়ে তিনি full authoity এবং authenticity সহ কথা বলেন না। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। ঘটনাটির সঙ্গে আমি নিজেই সংশ্লিষ্ট ছিলাম। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্ট্রাডিজের একটি গোলটেবিল বৈঠকে গিয়ে মুহিত সাহেবের মৌখিক একটি উপস্থাপনা শ্রবণ করা এবং তার বক্তব্য খণ্ডন করার সুযোগ আমার হয়েছিল এবং অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, সেখানে তিনি যে ভ্রান্ত তথ্য দিয়েছেন,

www.pathagar.com

সেটা না বললে আমার মনে হয় সত্যের প্রতি সুবিচার করা হবে না। তিনি বলে বসলেন যে, বিশ্বে অনেক দেশ আছে, যাদের সেনাবাহিনী নেই। সেসব দেশের তালিকায় তিনি সুইজারল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে বসলেন এবং আমাদের জ্ঞান দান করে জানালেন যে, সুইজারল্যান্ড একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তার প্রত্যুত্তরে আমি বলেছিলাম যে, সুইজারল্যান্ডের নিরপেক্ষতা বুঝতে হলে ইউরোপের কমপক্ষে দু'শ' বছরের অতীত ইতিহাস যেমন বুঝতে হবে, তেমনি বুঝতে হবে Hundred Years War, Thirty Years War, War of Roses, Nepoleanic War, Treaty of Westphalia এবং Two Great World Wars ইত্যাদি সম্পর্কে। একই সঙ্গে জানতে হবে যে, নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য সুইজারল্যান্ড কোন পরিস্থিতির আবর্তে নিক্ষেপিত হয়েছিলো এবং তার নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার পরও সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের ৭ গুণ বড় সশস্ত্রবাহিনী মেইনটেইন করে। ঠিক তখন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের ডি জি, বিগ্রেডিয়ার শাহেদ আনাম খান Jane's Defence Journal- এর সর্বশেষ সংস্করণটি এনে তা থেকে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা থেকে পাঠ করে শোনান যে, কী পরিমাণ সমরাস্ত্র সুইজারল্যাণ্ডের মত দেশে আছে। অতএব, সুইজারল্যান্ড্ বা সুইডেনে সেনাবাহিনী নেই বা সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে, আবুল মা'ল মুহিত যখন এই ধরনের দৃষ্টান্ত দেন, বুঝতে হবে– এটি সৎউদ্দেশ্যে দেন না। তৃতীয়ত, কোস্টারিকার কথা যখন মা'ল মুহিতরা বলেন এবং যারা এই দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে যুক্তি দাঁড় করাতে চান তাঁরা ভুলে যান Costa Rica in no way fits into the world order, বিশ্বরাজনীতিতে এবং ভূমণ্ডলীয় রাজনীতিতে কোস্টারিকার কোন ভূমিকা নেই। তদুপরি, কোস্টারিকা বিশ্ব নিরাপত্তা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নে সামরিকভাবে কোন বিবেচনার মধ্যেই আসে না।

আজকের বিশ্বে যে সামরিক প্রতিযোগিতা চলছে, সেই প্রতিযোগিতায় এমনকি ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে যে দ্বন্দ্ব এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা চলছে, সেখানেও কোস্টারিকা অপ্রাসঙ্গিক। তারপরও বলতে হবে, কোস্টারিকায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটার পর কোস্টারিকার জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, রাষ্ট্রের পক্ষে বলপ্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে একটি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বা একটা সশস্ত্র মিলিশিয়াই যথেষ্ট। তারা সশস্ত্রবাহিনী রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। এ প্রশ্নে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ন্যূনতম ভিন্নমত বা বিভাজন ছিলো না এবং এক ধরনের monolithic consensus ছিলো। কিন্তু আমি এবার প্রসঙ্গটি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। জনাব মতিউর রহমানের প্রবন্ধ পড়লে আমার কাছে দু'টি জিনিস স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এক, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই বিশ্ব জগতে কোন শত্রু নেই। ভারত তো নয়ই। দুই, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ, বাংলাদেশের কোন শত্রুই যেখানে নেই সেখানে এ প্রসঙ্গটিই অবান্তর। প্রথমত, বাংলাদেশের যে কোন শত্রু নেই, বিশেষ করে ভারতের তরফ থেকে যে বাংলাদেশের প্রতি কোন সামরিক বৈরিতা আসতে পারে না– এই তথ্য সর্বৈব ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, কাল্পনিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তার কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং যে কথাটি ড. মাহবুব উল্লাহ বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেননি। তিনি বলেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটি ভারত নির্ভর ছিল। আমি কথাটিকে এভাবে না বলে বলব, বাংলাদেশের মানুষ তাদের জীবনের অস্তিত্বের প্রয়োজনে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল– কারণ, বাংলাদেশের মানুষের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৬ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ, ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানকে অখণ্ডভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য ইয়াহিয়া সামরিক হুন্টার (Junta) সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে ছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে যখন এই আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হয়; তিনি 'সুসভ্য' 'আইনানুগ' নাগরিক হিসেবে ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানের মেহমানদারিত্ব গ্রহণ করেন। আর অন্যদিকে গণহত্যার

www.pathagar.com

প্রশ্নে তাঁর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল কিনা জানি না– এ প্রসঙ্গটি সমগ্র জাতির কাছে আজো একটি রহস্যাবৃত ও প্রহেলিকা বিভূষিত প্রপঞ্চ হিসেবেই পরিগণিত হয়ে আছে। তাঁর বিশ্বস্ত ড. কামাল হোসেন নির্মম গণ হত্যা চালু হবার পরও কোন রহস্যজনক কারণে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধ এক সপ্তাহ ধরে চলার পরও আত্মগোপনরত অবস্থান ত্যাগ করে তাঁর নেতা মুজিবের মতই কেন বা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসর্ম্পণ করলেন তা আজো সকলের কাছে অজ্ঞাত। এ দেশের মানুষের ওপর যখন গণহত্যা চাপিয়ে দেয়া হল, তখন এ দেশের মানুষ স্বীয় অস্তিত্বের জন্য, নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য ভারতের দিকে যেমন একদিকে ছুটে গেছে, অপরদিকে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে এক দুর্ভাগ্যজনক বিভাজন সৃষ্টি হয়– এক অংশ ভারতে গিয়ে যুদ্ধ করা শুরু করল, আরেক অংশ দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধ করা শুরু করল। যে অংশ ভারতে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করল সেই অংশের সঙ্গে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজাল এবং ভারতীয় সামরিক স্থাপনা এক ধরনের সখ্য ও মিতালী গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। এটাকে অনেকে বলেন ভারত নির্ভর মুক্তিযুদ্ধ। আমি মনে করি, এটি পরিপূর্ণভাবে সঠিক নয়। সঠিক নয় এই জন্য যে, ভারত কখনই চায়নি যে, বাংলাদেশে একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে উঠুক। ভারত চেয়েছিল, ছোট ছোট বিভিন্ন অর্ধশিক্ষিত গেরিলা গ্রুপগুলোকে সামরিক দিক থেকে আধা বা আধখেচড়া প্রশিক্ষণ দিয়ে কোনরকমে সম্মুখভাগে ঠেলে দিয়ে পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা ব্যূহকে দুর্বল করে তুলে চূড়ান্তভাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনী দিয়ে বিজয়ের গৌরবটি বাংলাদেশীদের কাছ থেকে ছিনতাই করে স্থায়ীভাবে গেড়ে বসতে। অপরদিকে, মুক্তিযুদ্ধের যিনি প্রথম ঘোষণা দেন এবং আহ্বান জানান, সেই শহীদ জিয়াউর রহমান যখন প্রধান সেনাপতি বঙ্গবীর ওসমানীকে রাজী করিয়ে একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে Z Force নামে প্রথম ব্রিগেড গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেন তখন ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ বাধা দান করে। কিন্তু শহীদ দেশ নায়ক জিয়াউর রহমান ভারতীয় ডিকটেশনকে ডিফাই করে প্রথম ব্রিগেডটি যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে গঠন করে ফেলেন এবং তাঁর সম্মানে এ ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় জেড ফোর্স। তাঁর দেখাদেখি পরবর্তী পর্যায়ে এস ফোর্স, কে ফোর্স নামেও দু'টি পৃথক ব্রিগেড গড়ে তোলা হয়। এগুলো ছিল আমাদের আজকের সেনাবাহিনীর প্রথম নিউক্লিয়াস, সেগুলোকে কেন্দ্র করে পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী গড়ে উঠেছে। কাজেই ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ করতে চায় না বলে একদিকে জনৈক নূরুজ্জমানের কতগুলো যুক্তি হাজির করে মতিউর রহমান সাহেব যে যুক্তি আমাদের সামনে হাজির করেছেন, তা অত্যন্ত খেলো। ভারতীয় সামরিক উপস্থিতির কারণে এবং বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেয়া ২৫ বছরের গোলামী চুক্তির কারণে, ভারতের পারমাণবিক শক্তি অর্জনের কারণে, নূন-নেহরু চুক্তির অধীনে এবং ভারতীয় সংবিধানের নবম সংশোধনীর অধীনে যে বেরুবাড়ি বাংলাদেশের সার্বভৌম অংশ ছিল, সেই বেরুবাড়ির জনগণের কোন গণভোট এবং গণরায় না নিয়ে ভারতের সাথে একটি অসাংবিধানিক চুক্তির মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বেরুবাড়ি নয় পশ্চিম উমাপতি গ্রামও ভারতকে দিয়ে দেন। অপরদিকে, অতি সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করছি, ভারত সামরিক অভিযান চালাচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্তে। মুহুরীর চরসহ বাংলাদেশের বিপুল সার্বভৌম অংশ ভারত তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি মতিউর রহমান সাহেব জনৈক গ্রুপ ক্যাপ্টেন ইশফাক ইলাহী চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন যে, ভারতের সাথে বাংলাদেশের তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ নেই। আমরা জানি, ভারত বাংলাদেশের ওপর প্রতিবেশগত যুদ্ধ already চাপিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের দেশে মরুকরণ থেকে শুরু করে লবণাক্ততার যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, এর জন্য সার্বিকভাবে ভারতই দায়ী। আমাদের বনাঞ্চল যেভাবে আজ উজাড় হয়ে যাচ্ছে, এর জন্য ভারতের নীতিই বিশেষভাবে দায়ী। অথচ তিনি বলছেন যে, ভারতের সাথে আমাদের তেমন কোন বিরোধ নেই। এর কয়েক প্যারাগ্রাফ পরেই মতিউর

www.pathagar.com

রহমান নিজেই Paradoxically বলছেন, "এ কথাও অনস্বীকার্য যে, দু'দেশের মধ্যে বেশ কিছু সমস্যা দীর্ঘদিন যাবত ঝুলে আছে। সমাধান হচ্ছে না।" মতিউর রহমান সাহেব আসলে কী বলতে চাইছেন, এটি স্পষ্ট নয়। কিন্তু যেটি স্পষ্ট, সেটি বারবার আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, তিনি মনে করছেন যে, বাংলাদেশের জন্য সেনাবাহিনী একটি বোঝা হয়ে যাচ্ছে এবং সেনাবাহিনীর খাতে অর্থ বরাদ্দ করাটা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য অর্থের অপচয়। মতিউর রহমান সাহেবদের এই ধরনের অসার বক্তব্যের বহু পূর্বে সেনাবাহিনীর ভেতরে থেকে কর্নেল জিয়াউদ্দীন Hidden prize নামে Holiday পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে বললেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে আমরা যখন বিজয় অর্জন করে নিয়ে আসতে পেরেছি, শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাড়াই বাকি কাজও আমরা করে যেতে পারব। তবে ভারতের কাছে গোপনে কী মুচলেকা দেয়া হয়েছে, সেটি জনসাধাণের জানার অধিকার আছে।' সরাসরিভাবে সরকারের পক্ষ থেকে, সেনাবাহিনী কিংবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয়ের পক্ষ থেকে এই বক্তব্যের কোন প্রতিবাদ করা হয়নি। যদিও কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে পরবর্তী পর্যায়ে সেনাবাহিনী ছেড়ে আসতে হয়েছে। অনুরূপভাবে কর্নেল তাহেরও সেনাবাহিনীকে একটি প্রোডাকটিভ ফোর্স হিসেবে কীভাবে ডেভেলপ করা যায়, সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তখন মতিউর রহমান গংদের পূর্বসূরীরা বলার চেষ্টা করেছে যে, এরা সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে চায়। আর আজ আমি যদি বলি, সেনাবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে একটি প্রতীক হিসেবে জনসাধারণের কাছে যখন সমাদৃত হতে চলেছে, তখন এই সেনাবাহিনীকে পঙ্গু করে দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নভুক্ত করার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নামে বাংলাদেশেকে গ্রীসের এথেনীয় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক লোকরাষ্ট্রে রূপান্তর করার আদলে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সি..জেন আর্মি গড়ে তোলার যে ফাঁদ পাতা হচ্ছে, তার উদ্দেশ্যমূলত ভারতকে শক্তিশালী ক.র ভারতের আশপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করা। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ভারতের নীলনকশা হচ্ছে সাতচল্লিশের বিভাজনকে অস্বীকার করা এবং বাংলাদেশসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে অঙ্গীভবনের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়াকে কেন্দ্র করে একটি বিশাল বা অখিল ভারত গড়ে তোলা। এই চিন্তা-ভাবনাকেই মগজধোলাইয়ের একটা কৌশল হিসেবে মতিউর রহমান তাঁর প্রবন্ধকে ব্যবহার করেছেন।

মাহবুব উল্লাহ :

মতিউর রহমান বিআইআইএসএস জার্নালে জনাব মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের যে প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেই প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। ভারত বাংলাদেশকে দখল করতে চাইবে না- এই যুক্তি দাঁড় করাতে গিয়ে তিনি নূরুজ্জামানের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'বাংলাদেশ ভারতের জন্য not an asset বরং একটি liability হবে'। আমার মতে, এটি ঠিক সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলাদেশ ভারতের জন্য asset, liability নয়। তার কারণ হচ্ছে, প্রথমত বাংলাদেশের সম্পদ কী পরিমাণ, সেটা আজও আমরা নিজেরাই নির্ণয় করতে পারিনি। বাংলাদেশের মাটির নিচে যেমন গ্যাস এবং তেল সম্পদ রয়েছে বলে আজকে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন মহল মনে করে। আমাদের দেশে এই মুহূর্তে খনিজ সম্পদভিত্তিক আন্তর্জাতিক তৎপরতা যেভাবে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে, তা থেকেই তার প্রমাণ মেলে। আজকে এ রকম একটি দেশকে liability মনে করা কতটা যুক্তিসঙ্গত, সেই প্রশ্ন আমি পাঠকের কাছে উত্থাপন করতে চাই। ভারতের কাছে বাংলাদেশ একটি asset এই কারণে যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার সংকট থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়ার জন্য ভারত বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বকে খর্ব করে বাংলাদেশকে তাদের সামরিক স্বার্থের জন্য একটি করিডোর হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। তারপরও তিনি বলেছেন যে, বর্তমান শতাব্দীতে কোন দেশ আক্রমণ করা প্রচলিত ধ্যানধারণার বাইরের বিষয় এবং এতে উল্টো ফল হয়।

www.pathagar.com

কোন দেশ জয়ের চেয়ে শাসন করা আরও কঠিন। কিন্তু মতিউর রহমান সাহেব কি খুব জোর দিয়ে বলতে পারবেন যে, আজকের দিনে একটি দেশ অন্য একটি দেশে আক্রমণ করছে না? আমরা কিন্তু বিশ্বের অনেক দেশে এমনই ঘটনা লক্ষ্য করে আসছি। গত কিছুদিন ধরে চেচনিয়াতে যে যুদ্ধ চলছে, সেটা কি একটি আগ্রাসনের ঘটনা নয়। তারপরও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চেতনা এত তীব্র যে, সেখানে বাংলাদেশীরা শান্তিপ্রিয় জাতি হলেও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সব সময়ে লড়াই করে তাদের পরাজিত করেছে। তাহলে এটাও কিন্তু তার যুক্তির বিরুদ্ধেই যায়। সুতরাং নিশ্চয়ই আমাদের শত্রুরাষ্ট্রগুলো ভাববে যে, বাংলাদেশ আক্রমণ করা সহজ হলেও তাকে গ্রাস করা ততটা সহজ নয়। 'বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য ভারত ফ্যাক্টর যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ভারতের কাছে বাংলাদেশ ফ্যাক্টর সেরকম নয়'। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত ফ্যাক্টরটি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এটাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রশ্নে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহমত লক্ষ্য করা যায় না। একটি দলকে আমরা যতদূর ভারতঘেঁষা মনে করি, অপর দলটি হয়তো ততই ভারত থেকে দূরে অবস্থান করতে চায়। সুতরাং এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নের ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। খোদ ভারতে বহু রাজনৈতিক দল রয়েছে; কিন্তু প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তারা ঐকমত্য পোষণ করে– সেটা হচ্ছে ভারতের নিরাপত্তা। ভারতের জাতীয় স্বার্থ, ভারতের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে সেখানে বিজেপি'র সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)-এর তেমন কোন পার্থক্য নেই। অথচ বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে এই ধরনের রাজনৈতিক সহমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জনাব মতিউর রহমান তাঁর প্রবন্ধে ইনিয়ে বিনিয়ে ভারতের পক্ষে একটা সাফাই গাওয়ার কৌশল নিয়েছেন এবং এরই মধ্য দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন, বাংলাদেশের জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী দরকার নেই।

সেনাবাহিনী কীভাবে শক্তিশালী হবে? সেটা খুব বড় আকারের সেনাবাহিনী হলেই হবে, নাকি ছোট আকারের সেনাবাহিনী হলে হবে, উন্নতমানের অস্ত্র থাকলে হবে, নাকি জনগণের সমর্থন থাকলে হবে– এগুলোই হচ্ছে প্রতিরক্ষা নীতির বিষয়। আমরা সিঙ্গাপুরের কথা জানি, এটি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপনগররাষ্ট্র। সেখানেও একটি প্রতিরক্ষা নীতি আছে। সিঙ্গাপুর তার অস্তিত্বের জন্য মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার দিক থেকে বিপদ প্রত্যক্ষ করে, যে কারণে সিঙ্গাপুর একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে, যে সশস্ত্র বাহিনী ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ এবং সেখানে যেহেতু জনসংখ্যা কম, সেজন্য তারা ছোট আকারের উচ্চমান প্রযুক্তিনির্ভর সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছে। আমাদের জনবহুলতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা নীতি প্রসঙ্গে বলব– আমরা জানি, ১৯৭১ সালে আমাদের যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল, সেটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল কোর। তাকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য গেরিলা বাহিনী, অন্যান্য যোদ্ধা বাহিনীগুলো গঠিত হয়েছিল। আজও দেশের অস্তিত্বের জন্য আমাদের সামরিক বাহিনীই হচ্ছে মূল কোর। এই কোরকে দুর্বল রেখে আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করতে পারব না। তাই আমাদের দেশকে যদি রক্ষা করতে হয়, এই কোরকে আরও শক্তিশালী, দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে, আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করতে হবে এবং এর অস্ত্রের সূত্রগুলো হবে এমন সব রাষ্ট্র, যারা বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি অত্যন্ত সহায়ক, সমমর্মী এবং এই সেনাবাহিনীর সঙ্গে ব্যাপক জনগণের একটা মৈত্রীর সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে হবে, যাতে বিপদের সময়ে সেনাবাহিনী এবং জনগণ কাধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। ভারতের বিভিন্ন আগ্রাসী পদক্ষেপ ও তৎপরতা ভুলে গেলে আমরা মস্তবড় ভুল করব। শুধু ভুলই করব না, আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বকে বিলীন করে দেব। আমরা জানি যে, আজকের যুগে মানব নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে

www.pathagar.com

সম্পর্কিত। কিন্তু সেনাবাহিনীও যে আমাদের মানব নিরাপত্তার জন্য কাজে আসছে, এ ব্যাপারে কী সন্দেহের অবকাশ আছে? বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আমাদের সেনাবাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়ায়। এছাড়া আমাদের বিভিন্ন অবকাঠামোকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনী আমাদের পাশে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা আজকে বিদেশে পীস কীপিং ফোর্সে গিয়ে দেশের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করছে। এ কথা অবশ্য জনাব মতিউর রহমান স্বীকার করেছেন। কিন্তু তারপরও আজকে কেন তিনি সেনাবাহিনীকে ক্ষুদ্র করা, এর ব্যয় হ্রাস করার যুক্তি আনেন, আমি ঠিক সেটা বুঝে উঠতে পারছি না এবং তিনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, তার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের পরিসংখ্যানের তুলনীয় অবস্থান কী, সেটাও যদি তিনি মেহেরবানী করে বলতেন, তাহলে ভাল করতেন। ভারত তার সামরিক খাতে জাতীয় বাজেটের কত অংশ ব্যয় করে, পাকিস্তান, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া কত অংশ ব্যয় করে, এগুলোও প্রণিধানযোগ্য বিষয়।

আফতাব আহমাদ :

মতিউর রহমান সাহেবদের একটা সমস্যা হল, তাদের ঘরানার যাঁরা তাঁদের মধ্যে যিনি যে বিষয় বোঝেন না, সে বিষয়ে বেশি কথা বলতে চান। লক্ষ্য করে থাকবেন যে, প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী হচ্ছেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের লোক– তিনি লিখবেন রাজনীতি ও সংবিধান নিয়ে। প্রফেসর কবীর চৌধুরী, যিনি সবসময় ডিগবাজি খেয়েছেন বিভিন্ন সরকারের আমলে বিভিন্ন সরকারকে সমর্থন করে– আইয়ুব খাঁর আমল থেকে শুরু করে ইয়াহিয়া খাঁর আমল পর্যন্ত এবং সাম্প্রতিক সরকারের আমলেও– এঁদেরকে দেখবেন যে, এরা সাহিত্যকর্ম বাদ দিয়ে বা সমাজসেবা কর্ম ছেড়ে তারা রাজনীতির ব্যাপারে অনেক বেশি কথা বলতে চান। যদিও রাজনীতির ব্যাপারে কতোটুকু তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষজ্ঞতা আছে, সে সম্পর্কে আমার গভীর সন্দেহ আছে। মতিউর রহমান সাহেব কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে না জেনে যখন বলেন যে, আজকের আধুনিক যুগে কোন দেশের ওপর আগ্রাসন করাটা অকল্পনীয় ব্যাপার–আমি তাঁকে শুধু তিনটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। একটি হল আমাদের দক্ষিণ এশিয়ায় সিকিমকে কীভাবে ভারত গ্রাস করেছে এবং মনে রাখতে হবে সিকিমকে camouflaged সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে গ্রাস করা হয়েছে, camouflage-এর এই mischief যাতে ধরা না যায় সে জন্য সেখানে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল। ডমিনিকান রিপাবলিকে মার্কিণ ছত্রীসেনা নামিয়ে কীভাবে সেখানে একটি ক্রীড়নক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং কমিউনিস্ট মতিউর রহমান তার প্রতিবাদ করেছিলেন, এ কথা আজকে বিস্মৃত হয়ে যেতে পারেন। কিংবা এই সেদিন রোনাল্ড রেগানের আমলে যখন গ্রানাডায় সরাসরিভাবে মার্কিন সৈন্য পাঠিয়ে মরিস বিশপকে হত্যা করে একটি ক্রীড়নক সরকারকে ক্ষমতায় বসানো হয়– তিনি সেই আক্রমণের কথা ভুলে গেছেন। কিংবা যখন এই সেদিন পানামার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নরিয়েগাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারের সম্মুখীন করার নামে অপহরণ করে নিয়ে আসা হয় সেই সামরিক আক্রমণের কথা তিনি ভুলে গেছেন। আক্রমণ হয় না এবং আজকের যুগে আক্রমণ করা সম্ভব নয়– এ কথা বলা মানেই হচ্ছে, তিনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন। ভারতের যে বিশাল সামরিক শক্তি, যে বিশাল সামরিক আয়তন, এ সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে অবহিত করার চেষ্টা করছেন না। বাংলাদেশ ছোট রাষ্ট্র হতে পারে, বাংলাদেশ আয়তনে ক্ষুদ্র হতে পারে; কিন্তু বাংলাদেশেরও সম্ভাবনা আছে। ফ্লোরিডার ৯০ মাইল দূরে অবস্থান করে কিউবা যেভাবে পরম প্রতাপশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছে এবং এখনও চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, বাংলাদেশও ভারত বেষ্টিত হয়ে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, বাংলাদেশও ভারত বেষ্টিত হয়ে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

www.pathagar.com

তারপরও যে মূল কথাটি থেকে যায়, বাংলাদেশকে আক্রমণ করার কোন সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশকে আক্রমণ করার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করে, ক্রীড়নক সরকার প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে কেন ট্রানজিট/ট্রান্সশিপমেন্টের নামে সামরিক করিডোর চাওয়া হয়, রেল যোগাযোগ চাওয়া হয়, বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর কেন তারা ব্যবহার করতে চায়, বাংলাদেশ থেকে কেন তারা গ্যাস আমদানী করতে চায়, বাংলাদেশে কেন তারা বিদ্যুৎ রফতানী করতে চায় এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নদীগুলোর মুখ কেন তারা অবরোধ করে বাংলাদেশে মরুকরণ এবং লবণাক্ততা প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে প্রতিবেশগত যুদ্ধকে আরও প্রসারিত করতে চায়? এটি সুস্পষ্ট যে, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কোনদিন বাংলাদেশকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নিতে চায়নি। কিন্তু ১৯৭১-এ এমন একটি সময় ও সুযোগ ছিল, যে সময় ও সুযোগে একদিকে বিশ্ববাসী বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষের প্রতি সমব্যথী এবং সমমর্মী হয়ে পড়েছিল, আরেক দিকে পাকিস্তান ভাঙার জন্য একটি মাহেন্দ্রক্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় সমর কৌশলবিদরা প্রথম অপশনটা বাদ দিয়ে দ্বিতীয় অপশনটা বেছে নিলেন। অর্থাৎ আগে পাকিস্তান ভাঙা, পরবর্তী পর্যায়ে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রেখে বাংলাদেশে একটা আধখেঁচড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রবর্তন করে এবং বাংলাদেশের ওপর হুকুমদারি জারি করে বাংলাদেশকে একটি বরকন্দাজ ও তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করে ধীরে ধীরে গ্রাস করা যেটাকে প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেছেন, ক্রিপিং অ্যানেকসেশন। যাকে বাংলা ভাষান্তর করলে আমরা বলতে পারি সংসর্পিল সংগ্রশন। এটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আস্তে আস্তে কীভাবে গ্রাস করবে, সেই নীলনকশা নিয়ে আজ বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আছে সম্প্রসারণবাদী ভারত এবং তাদের পক্ষ হয়ে তাদের নিয়োগীরা, তাদের বেতনভুক তাত্ত্বিক ও বিদ্বৎজনরা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। আমার মনে হয়, এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য দৈনিক ইনকিলাব জাতীয় নিরাপত্তার ওপর যে বিশেষ সংখ্যা বের করেছিল তার যেমন পুনর্মুদ্রণ হওয়া দরকার, তেমনি পাঠকদের প্রতি আমার আকুল আবেদন থাকবে, সেই বিশেষ সংখ্যাটি সংগ্রহ করে আবার পাঠ করে দেখুন, বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি কোথায় নিহিত। জাতীয় নিরাপত্তা এবং মানব নিরাপত্তাকে গুলিয়ে ফেলে তিনি সামাজিক নিরাপত্তার কথা ভুলে যান। মানব নিরাপত্তা জাতীয় নিরাপত্তার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ; কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কমপোন্যান্ট হচ্ছে সামরিক নিরাপত্তা। সামরিক নিরাপত্তাকে লঘু করে দেখে শুধুমাত্র মানবিক নিরাপত্তাকে ফোকাস করে তিনি সামাজিক নিরাপত্তাকে আবার ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই অর্থে তিনি একদিকে পচনশীল ধনবাদী সমাজের পক্ষেও ওকালতি করার চেষ্টা করছেন।

মাহবুব উল্লাহ :

এখানে বলা প্রয়োজন, জার্মানী যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সারা ইউরোপে আগ্রাসন চালাচ্ছিলো, তখন মানব নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তার অবস্থা কী হয়েছিল? গ্যাস চেম্বারে কত লক্ষ লোককে নিহত হতে হয়েছিল, সে কথাটি তিনি ভুলে যান এবং ভুলে যান অন্য রাষ্ট্রের সামরিক দুর্বলতারই সুযোগ নিয়ে জার্মান ফ্যাসিস্টরা এই আগ্রাসন চালিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের কথা বলেছেন, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জিইয়ে রাখার ব্যাপারে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুই বলেননি। শান্তিবাহিনীর ক্যাম্পগুলো পার্বত্য ত্রিপুরায় কোথায় ছিল, কীভাবে তাদেরকে লালন-পালন করা হত, প্রশিক্ষণ দেয়া হত, অস্ত্র সরবরাহ করা হত– এই বিষয়গুলো তিনি এড়িয়ে গেছেন। কাজেই বাংলাদেশের নিরাপত্তা সমস্যাটি যে শুধুমাত্র প্রকাশ্য আগ্রাসন দ্বারা আসবে, এমন নয়। বরং

www.pathagar.com

বাংলাদেশে কিছু বিভেদ সৃষ্টিকারীদের ব্যবহার করে, পঞ্চমবাহিনী সৃষ্টি করে, বাংলাদেশকে দখল করা এবং বাংলাদেশকে দুর্বল করার প্রয়াস নেবে ভারত। সুতরাং এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে অবশ্যই সার্বক্ষণিকভাবে অতন্দ্র প্রহরীর মত প্রস্তুত থাকতে হবে। ভারতের বিরাট সামরিক শক্তি আছে, কিন্তু তার পুরো ১০০ ভাগ নিয়েই ভারত আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। তাকে পাকিস্তান এবং ভারত মহাসাগরের প্রতি, উত্তরে চীন সীমান্তের প্রতি নজর রাখতে হবে। তাদের যে আণবিক শক্তি আছে, সেটাও তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ, ঢাকার ওপর যদি আণবিক বোমা নিক্ষেপ করতে হয়, তার বিকীরণ, তার তেজস্ক্রীয় পদার্থ কলকাতা, আগরতলা, শিলং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং ভারতের সামরিক শক্তি দেখে ভীত হলে আমাদের চলবে না। বরং আজকে যদি একটি কোরফোর্স হিসেবে আমাদের একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকে এবং সেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনগণের যদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পৃক্ততা থাকে, তাহলে তারা সংকটকালে একত্রিত হয়ে বাংলাদেশের অস্তিত্ব এবং নিরাপত্তাকে বিপদমুক্ত রাখার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে যাবে। আমাদেরকে সাবধান হতে হবে সকল রাষ্ট্রঘাতী চক্রের বিরুদ্ধে। এটা শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর আকৃতি কতোটুকু হবে নিছক সেই ব্যাপার নয়, এটা আদর্শের লড়াই। আমরা বাংলাদেশকে রাখতে চাই, না বাংলাদেশকে মুছে ফেলতে চাই-এই দুই আদর্শের মধ্যে লড়াইয়ের প্রশ্ন।

আফতাব আহমাদ :

আমি সবশেষে মতিউর রহমান এবং আবুল মা'ল মুহিত সাহেবের উদ্দেশে বলতে চাই যে, সানজু থেকে শুরু করে ক্লজভিক, ব্লাংকি, লেনিন, মাওসেতুং কিংবা মুশাসী এদের প্রত্যেকের গ্রন্থ যদি আমরা পাঠ করি তাতেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব একটি দক্ষ সশস্ত্র সেনাবাহিনীর ওপরই নিহিত। জনগণ সার্বভৌম আমরা জানি, কিন্তু সেই সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র পাহারাদার হচ্ছে সশস্ত্র সেনাবাহিনী। সেই জন্যেই লেনিন বলেছিলেন যে, যদি বিপ্লব সংঘটিত করতে হয়, তাহলে বুর্জোয়াদের সশস্ত্র বাহিনীকে দ্বিখণ্ডিতও করা প্রয়োজন। কারণ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সশস্ত্র বাহিনীর হৃদকন্দরেই অবস্থান করে। অতএব, প্রাক্তন কমিউনিস্ট মতিউর রহমান কী করে লেলিনের এই মহান উক্তিটি ভুলে গেলেন, আমি বুঝতে পারি না। তবে কমিউনিস্ট না হয়েও তিনি যদি সানজ্যু, মুশাসী, ব্লাংকি কিংবা ক্লজভিক পাঠ করতেন, তাহলে আমার মনে হয় এই বিভ্রান্তিতে ভোগার কোন সুযোগ থাকতো না। আমরা পাঠকদের আহবান জানাব, যারা বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনীকে খাটো করে এ দেশের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করার জন্য ভারতের রাষ্ট্রঘাতী চক্র ও নিয়োগী হিসেবে এখানে কাজ করছে, তাদের ব্যাপারে যেন তাঁরা সজাগ থাকেন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য যেন সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

১ জানুয়ারী ২০০০

একবিংশ শতাব্দী হবে এশিয়ার শতাব্দী

মাহবুব উল্লাহ :

সারা বিশ্বজুড়ে একটি শতাব্দীর অবসান, একটি নতুন শতাব্দীর শুরু, একটি সহস্রাব্দের অবসান এবং একটি নতুন সহস্রাব্দের সূচনা উদযাপন করা হচ্ছে মহাসমারোহে। পত্র-পত্রিকাগুলো এ উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে। সারা পৃথিবী জুড়ে নানা উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে মানবজাতি বিগত এক হাজার বছরে বিশেষ করে বিগত এক শতাব্দীতে তাদের অর্জনসমূহ পরিমাপ ও মূল্যায়ন করতে নিঃসন্দেহে ব্রতী হবে। এর উদ্দেশ্য একটি। আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কোথা যাব, কীভাবে যাব– সেই প্রশ্নের একটি জবাব খুঁজে পাওয়া। মানব জাতির জন্য বিংশ শতাব্দীটা ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। এই শতাব্দীতে দু'দুটো মহাযুদ্ধ হয়েছে। উপনিবেশবাদের অবসান হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় বহু স্বাধীন জাতির উদ্ভব হয়েছে। এই শতাব্দী ছিল বিপ্লবের শতাব্দী। রাজনৈতিক পরিবর্তনের শতাব্দী। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, মহাকাশ গবেষণা– সর্বক্ষেত্রে মানব জাতির অভূতপূর্ব সাফল্যের শতাব্দী। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই শতাব্দীতে যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, বর্ণবৈষম্যের কারণে বর্ণগত দাঙ্গা, যেমন পৃথিবীর বহুদেশের সমাজ ব্যবস্থাকে নাড়া দিয়েছে, ঠিক তেমনি নতুন সমাজ তৈরী করার জন্য একটা বিশাল প্রয়াস এই শতাব্দীতেই নেয়া হয়েছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের বিপ্লব হয়। সেই বিপ্লবের ঘোষণা ছিল, নিপীড়িত সর্বহারা শ্রেণীর গণতন্ত্র কায়েম হয়েছে। কিন্তু এই শতাব্দীতেই আমরা লক্ষ্য করলাম, সেই বিশাল সমাজতান্ত্রিক জগৎ, যেটা গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপর– সেটা ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে। এসব ঘটনা মানুষকে নানাভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই শতাব্দীতে যুদ্ধ যেমন মানুষের জন্য বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছে, যুদ্ধ তেমনি মানুষের মুক্তির পথও খুলে দিয়েছে। যুদ্ধের অবসানে বহু দেশ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে। যুদ্ধকে কেন্দ্র করে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বিপ্লব এসেছে, সেই বিপ্লবও মানুষের অগ্রগতিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই শতাব্দীতেই মানুষ চাঁদে গিয়েছে, মহাশূন্য অভিযানে গিয়েছে এবং মহাশূন্যের অনেক অজানা রহস্য উদঘাটন করেছে। কাজেই বলা যায়, গত এক হাজার বছর ছিল রেনেসাঁ, যুক্তিবাদিতা, অ্যাডভেঞ্চার বা অভিযানের সহস্রাব্দ। তার পাশাপাশি আমরা এ কথা বলতে পারি যে, এই শতাব্দীতে এসে আমরা যেন সবকিছুকে একসঙ্গে ঘটতে দেখেছি। এই শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিশাল বিপ্লব ঘটেছে। বিশেষ করে জেনেটিক প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে মানুষ জীবনের অনেক রহস্য জানতে পেরেছে। আর পৃথিবীর মধ্যেও মানুষের অনেক কিছু অজানা ছিল, সেই অজানা রহস্যগুলো একে একে উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, মানব জাতির জ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সার্বিক অগ্রগতির যৎসামান্য অংশই স্পর্শ করেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে, বিশেষ করে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের জন্য বিগত এক শতাব্দী রাজনৈতিকভাবে ঘটনাবহুল হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে– এ কথা বলা যাবে না। বিগত একশ' বছরের বাংলাদেশে বড় বড় রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে। এই শতাব্দীতে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ঘটনা ঘটেছিল এবং ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আবার বঙ্গভঙ্গ রদও করা হয়েছিল এই শতাব্দীতেই, ১৯১১ সালে। আমাদের এই বাংলাদেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে,

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর আমাদের এই বাংলাদেশে বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। এছাড়া এই সময় ছিল অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনের সময়। এমনকি বাংলার যুবকদের একটি অংশ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। এই শতাব্দীতেই ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর্যায়গুলো শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীনে পর্যায়ক্রমিক মাত্রায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের আবরণে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানোর পূর্বপ্রস্তুতি গৃহীত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট আমাদের এই দেশের রাজনীতিতে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়ে পাকিস্তান নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটিয়েছে এবং এটাও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পৃথিবীতে যত দেশে উপনিবেশবাদের অবসান হয়েছে, সেখানে এই ধরনের রাষ্ট্র বিভাজন খুব কমই ঘটেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, কোরিয়া উপদ্বীপ থেকে উপনিবেশবাদ যখন সরে যায়, তখন উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া উভয় রাষ্ট্রই বলছে যে, তারা একদিন একতাবদ্ধ হবে। এক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। ফরাসী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভিয়েতনামেও দু'টি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল— উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের মধ্যদিয়ে ভিয়েতনামী জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই উপমহাদেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটেছে। ব্যতিক্রমটা হচ্ছে এই জায়গায় যে, '৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি আলাদা রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, আবার সেই পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এটিও এই শতাব্দীর ইতিহাসে একটি অনন্য ঘটনা। বিশেষ করে উপনিবেশবাদের অবসানের পর যেসব নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল, সেসব রাষ্ট্রের একটি নতুন প্রদেশ বা একটি অঞ্চল মূল রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি পৃথক নুতন স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভবের ঘটনা সম্ভবত এই একটিই। আমরা জানি যে, নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা নামক একটি প্রদেশ এই শতাব্দীতেই চেষ্টা করেছিল বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ ধরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব অর্জন করতে, কিন্তু বায়াফ্রার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশ একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই অর্থে যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অংশ হওয়া সত্ত্বেও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগ করে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য সংঘটিত আন্দোলনসমূহের পরিণতি হিসেবেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব। আবার অন্যদিকে, যদি বিশ্ব পরিসরের দিকে আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে, এই শতাব্দী ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ঠাণ্ডা যুদ্ধের শতাব্দী। পৃথিবী দু'টি শিবিরে বিভক্ত ছিল। একদিকে সমাজতান্ত্রিক আর অন্যদিকে পুঁজিবাদী শিবির। এই দুই শিবিরের মধ্যকার প্রতিযোগিতা ও প্রভুত্ব বিস্তারের দ্বন্দ্ব পৃথিবীর নানা দেশে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনেও বিভিন্ন শক্তি বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া এক ধরনের ভূমিকা পালন করেছে। আবার অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য এক ধরনের ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও উপনিবেশবাদের অবসান নিয়ে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা গেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, যখন মিসরে জামাল নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করেন, তখন এর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে ইসরাইল, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য মিসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু সেই সময়ে প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে সেই যুদ্ধের অবসান ঘটে। সুতরাং পরাশক্তিগুলোর এই দ্বন্দ্ব একদিকে যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি করেছে, রক্তপাত ঘটিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই দ্বন্দ্ব পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথকে সহজতর করেছে। এখন আমরা বলছি, ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান হয়েছে এবং পৃথিবী

www.pathagar.com

বড় ধরনের যুদ্ধের বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান না হলেও অস্ত্র প্রতিযোগিতায় রাশ টেনে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে রাশিয়ার পতনের শেষ সময়টাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আণবিক অস্ত্র সীমিতকরণের ব্যাপারে যে চুক্তিগুলো হয়েছিল, সেগুলো পৃথিবীতে অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করতে অবদান রেখেছে। নানা দিক থেকে চমকপ্রদ এই শতাব্দীতেই লক্ষ্য করেছি পুঁজিবাদের এক মারাত্মক সংকট। ১৯৩০ -এর মহামন্দার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনবাদী রাষ্ট্রেও বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বহু শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছিল এবং পৃথিবী ব্যাপী বাণিজ্যিক মন্দা দেখা দিয়েছিল। তার প্রভাব আমাদের এই বাংলাদেশেও পড়েছিল। এই শতাব্দীতেই বলা হল যে, পুঁজিবাদের একটা পুনর্জাগরণ ঘটেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারক-বাহকরা দৃষ্টান্ত দিতে শুরু করল তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরের। এসব দেশে শিল্পায়ন অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। পুঁজিবাদী মহল থেকে বলা হল যে, পুঁজিবাদ একটি নতুন মডেল খুঁজে পেয়েছে। এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হল এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোকে এই সমস্ত রাষ্ট্রের মডেল অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হল। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল যে, এর প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অর্থনীতিতে তেমন কোন ছাপ রাখতে পারেনি। তবে এই চারটি রাষ্ট্রের অভূতপূর্ব উন্নতি পুঁজিবাদীদের পক্ষে একটি যুক্তি যুগিয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, মুক্তবাজার পেলে, মুক্ত অর্থনীতি হলে এবং উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকলে একটি দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। যে কারণে বাংলাদেশ স্বাধীনতা উত্তরকালে কিছুকাল মেকী সমাজতন্ত্রের অভাবনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আস্তে আস্তে ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার চিন্তাভাবনা করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং আজকে তো আমরা বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করেছি। তবে তা সত্ত্বেও আমরা কি সত্যিই উন্নয়নের কোন সুনির্দিষ্ট পথ খুঁজে পেয়েছি? এটা আমরা খুব জোরগলায় বলতে পারব না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক বিপর্যয় বাংলাদেশকে তাৎক্ষণিভাবে স্পর্শ না করলেও অনেক অর্থনীতিবিদই এর সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আজকে যখন আমরা নুতন শতাব্দীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বিগত শতাব্দীর অভিজ্ঞতা। সেটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হোক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই হোক, অথবা অর্থনৈতিক বা রণনীতি-রণকৌশলের ক্ষেত্রেই হোক– সেই অভিজ্ঞতাকে আমরা আগামীতে কিভাবে ব্যবহার করব সে ব্যাপারে ভাবতে হবে।

আফতাব আহমাদ :

আগামী শতাব্দী এবং আগামী সহস্রাব্দকে সামনে রেখে ড. মাহবুব উল্লাহ খুব চমৎকারভাবে পাকিস্তান প্রসঙ্গটি টেনে এনেছেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এটি সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে একটি অনন্য ঘটনা, বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে। এ প্রসঙ্গে তিনি কোরিয়া এবং ভিয়েতনামের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এ বিষয়ে একটু যত্নবান হয়ে যদি আমরা অনুসন্ধানী দৃষ্টিপাত করি তাহলে প্রসঙ্গ এবং প্রাসঙ্গিকতার ভিন্নতা সহজেই অনুধাবন করতে পারব। তাই এ প্রসঙ্গে আমি ড. মাহবুব উল্লাহর বক্তব্যের সঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় সংযোজন করতে চাই। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির ঘটনাটি দক্ষিণ এশিয়া বা পূর্ব এশিয়ার একটি অনন্য এবং অসাধারণ ঘটনা। তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা সাধারণভাবে বলতে গেলে পূর্ব এশিয়ার আরেকটি অনন্য ও অসাধারণ ঘটনা হচ্ছে স্বাধীন ও সার্বভৌম নগররাষ্ট্র হিসেবে সিঙ্গাপুরের অভ্যুদয়। ১৯৬৩-র ১৬ সেপ্টেম্বর মালয়া উপদ্বীপ, উত্তর বোর্নিও'র প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ সাবাহ, সারাওয়াক এবং সিঙ্গাপুর সম্মিলিতভাবে ফেডারেশন অব মালয়েশিয়া গঠন ও প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এর দু'বছর পর ৯ আগস্ট, ১৯৬৫ সালে বৈষম্যনীতির অভিযোগ এনে মালয়েশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিনা রক্তপাতে সিংগাপুর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। এবার আসুন আফ্রিকার দিকে আমরা একটু দৃষ্টিপাত করি। গত শতাব্দীতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রিকার চারটি রাষ্ট্রের কথা আমরা স্পষ্টভাবে এখানে উল্লেখ করতে পারি। দু'টি রাষ্ট্র বর্তমানে একই নামধারণ

www.pathagar.com

করে আছে– কঙ্গো। প্রথমটি পশ্চিম মধ্য আফ্রিকায় অবস্থান করে এবং ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। দ্বিতীয়টি মধ্য বিষুবরেখাঞ্চলীয় আফ্রিকার অবস্থান করে। এটি বেলজিয়ামের উপনিবেশ ছিল। কাটাঙ্গা নামে এটি কঙ্গো রাষ্ট্রটির খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী একটি প্রদেশ ছিল এবং ৩০ জুন, ১৯৬০-এ কঙ্গো স্বাধীনতা লাভের পরপরই সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের ক্রীড়নক মোশে শোম্বে কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা দিয়ে বসেন ১১ জুলাই, ১৯৬০ সালে। এর ফলে যে গৃহবিবাদ এবং রাজনৈতিক সংকটের জন্মলাভ করে তার পরিণতিতে দেশপ্রেমিক প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমাম্বাকে প্রাণ দিতে হয়েছে দেশদ্রোহী কুচক্রীদের হাতে এবং পরবর্তী পর্যায়ে নয়া উপনিবেশবাদের বিশ্বস্ত ও বেলজিয়ানদের আস্থাভাজন জেনারেল মবুতু রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পর কাটাঙ্গা কঙ্গোর সঙ্গে পুনরায় একত্রিত হয়। ১৯৭১-এর ২৭ অক্টোবর মবুতু দেশটির নতুন নামকরণ করেন জায়ার। জায়ার হতে মবুতুর উচ্ছেদের পর বর্তমানে জায়ার পুনরায় কঙ্গো নাম ধারণ করেছে। দুই কঙ্গোর পুনঃ একত্রীকরণের কোন প্রলক্ষণই পরিদৃষ্ট হচ্ছে না।

এমনি সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া উপনিবেশবাদী কারসাজির ফলে দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকায় আমরা দু'টি রোডেশিয়াকে জন্ম নিতে দেখি। উত্তর রোডেশিয়া জাম্বিয়া নাম ধারণ করে প্রথম ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়। দক্ষিণ রোডেশিয়া খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী হওয়ায় এবং শ্বেতাঙ্গ দালালদের সংখ্যা পর্যাপ্ত থাকায় ১৯৬৫-১৯৭৯ পর্যন্ত একতরফা শ্বেতাঙ্গ শাসিত রোডেশিয়াকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে বিশ্ববাসীকে। ১৯৭৯ -তে ল্যাংকাস্টার হাউজের নেগোসিয়েশনের সাফল্যের পথ ধরে শ্বেতাঙ্গদের অবৈধ শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুগাবের নেতৃত্বে দক্ষিণ রোডেশিয়া জিম্বাবুয়ে নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভ করে। আরেকটি অনন্য ঘটনা ঘটেছে অতি সম্প্রতি ইথিওপিয়া থেকে রক্তাক্ত পথে ইরিত্রিয়ায়। আসলে গোটা আফ্রিকার মানচিত্রের দিকে তাকালেই বুঝা যয়, ঔপনিবেশিকতা কী নির্মম কাটাছেঁড়া করেছে আফ্রিকা মহাদেশটিকে নৃতাত্ত্বিকতা, ভৌগোলিকতা ও ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা ভৌগোলিক আবিষ্কারের পরে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অঞ্চলগুলোকে তাদের নিজস্ব খেয়াল খুশিমত ভাগ করে নেয়। ভাগ করে আধিপত্য বিস্তার করে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। অবশ্য পশ্চিম এশিয়ার আরব উপদ্বীপে আমরা লক্ষ্য করেছি, দুই ইয়েমেন বহু রক্তপাত ও কাঠখড় পোড়ানো পর একটি একক রাষ্ট্রে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গগুলো আলোচনায় আমি শুধুমাত্র এজন্য আনছি, কারণ শুধুমাত্র ভৌগোলিক অবস্থান বা প্রত্নতাত্ত্বিক অভিন্নতা কিংবা সাদৃশ্য অথবা অভিন্ন অবস্থান, ভৌগোলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য জাতিরাষ্ট্র গঠনের জন্য যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত নয়। এমনকি একক একটি ভাষা, ধর্ম, বর্ণ এবং শাসন বা অবয়বগত দিক থেকে অভিন্ন রাষ্ট্র কাঠামো একটি জাতিরাষ্ট্র গঠনের জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়। জাতিরাষ্ট্র গঠনের জন্য সর্বোপরি যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে একটি অভিন্ন একক মন, যে মনের ভিত্তিতে মানুষ মানুষকে অভিন্ন ভাববে, একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করবে, এক বন্ধনে এক সেতু রচনা করবে এবং এ কেবল সম্ভব অনুধ্যান ও অভিজ্ঞতার ঐকতান ও বিভাসিত মননের জন্যই। সেজন্যই বিগত সহস্রাব্দের দিকে আমাদের তাকাতে হবে। এই সহস্রাব্দের মধ্যে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। ড. মাহবুব উল্লাহ বিংশ শতাব্দীর ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। আমি সহস্রাব্দের দিকে একটু নজর দিতে চাই। এই সহস্রাব্দে আমরা লক্ষ্য করেছি, মানব সভ্যতা একদিকে সামন্ত অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটিয়েছে অন্যদিকে পুঁজিবাদ বিরোধী এক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটিয়েছে। সমাজতন্ত্রের নামে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কেউ একে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, কেউ একে আমলাতান্ত্রিক যৌথবাদ, কেউ একে ব্যবস্থাপকদের স্বেচ্ছাচার বা স্বৈরতন্ত্র, আবার কেউ একে সর্বায়তিক একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবেও অভিহিত করেছেন। যে অভিধাতেই ধ্রুপদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই বিকল্প রূপটিকে অভিহিত করা হোক না কেন জেমস বার্ন বা মিলোভান জিলাস-এর ভাষায় এ ব্যবস্থাগুলো শ্রমিক শ্রেণীর নামে নব্য

www.pathagar.com

আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপক শ্রেণীর বা একটি নয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে অধঃপতিত রাষ্ট্রের জন্মই শুধু দিতে পেরেছে। আর এ কারণেই সভিয়েত ইউনিয়নের সকল সামরিক শক্তি ও ক্ষমতাকে তুচ্ছ করে দিয়ে সভিয়েত ইউনিয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল- অনেকটা যেন নিজেই নিজের ভার আর বহন করতে পারছিল না। তাই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। তবে সভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে যারা আজ উল্লাস প্রকাশ করছেন এবং যারা মনে করছেন যে, সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে, তারা কিন্তু একটি মারাত্মক ভুল করছেন। প্রকৃত অর্থে সমাজতন্ত্র আদৌ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা এ নিয়ে পণ্ডিতজনের মধ্যে এবং সক্রিয়বাদীদের মধ্যে মতের প্রচণ্ড মতভিন্নতা রয়েছে। তবে যা ছিল তা যে কাঙ্ক্ষিত ছিল না এ বিষয়ে কোন ভিন্নতা নেই।

সভিয়েত ইউনিয়নের দোর্দণ্ড প্রতাপের কালেই সভিয়েত ইউনিয়কে defy করে ওয়ারশ জোট থেকে বেরিয়ে এসেছিল আলবেনিয়া এবং রুমানিয়া। এ শক্তি তারা কোথায় পেল এও তো ভাববার বিষয়। সভিয়েত ইউনিয়নের নির্দেশিত অর্থনৈতিক ছক থেকে বেরিয়ে এসেছিল ইউগোশ্লাভিয়া ও হাঙ্গেরী। এ দু'দেশেই বিশেষ করে হাঙ্গেরীতে মার্কেট সোশ্যালিজম বা বাজার সমাজতন্ত্র বলে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় যা বেশ সাফল্যের চেহারাও এক পর্যায়ে দেখেছিল। এদিকটিতেও আমাদের নজর দেয়া দরকার। তা হলেই চিন্তার একতরফা একরেখিক বিকাশের ধারাকে যান্ত্রিকভাবে ধরে রাখার সংস্কার মুক্ত হতে পারব আমরা। কাজেই সহস্রাব্দের ইতিহাসে এই যে, পরিবর্তনগুলো ঘটেছে তার পেছনে প্রকৃত যে সামাজিক শক্তি কাজ করেছে তাকে আজ আমাদের চিহ্নিত করা দরকার। সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ ও পুঁজিবাদ থেকে পরবর্তী পর্যায়ে যেটাকে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ না বলে আমরা পুঁজিবাদবিরোধী সমাজ পরিবর্ধন বলতে পারি বা অনেকেই যাকে বলেন, এগজিসটিং সোশ্যালিজম- মানে বিদ্যমান বা অস্তিমান সমাজতন্ত্র- এর প্রকৃত গূঢ় রহস্য ভেদ করে স্বরূপ উদঘাটন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। ধ্রুপদী পুঁজিবাদের সঙ্গে এ ব্যবস্থার পার্থক্য কোথায় এবং শোষণ-বৈষম্য মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজের স্বরূপটি কী? কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কেও আমাদেরকে নতুন করে সম্যক ধারণা নিতে হবে এবং তার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করতে হবে। গণতন্ত্রের সঙ্গে দ্রুপদী পুঁজিবাদের অঙ্গাঅঙ্গি গাঁটছড়া রয়েছে নাকি এটি একটি Marriage of convenience যেখানে দ্রুপদী বা নয়া ধ্রুপদী পুঁজিবাদ ছাড়া গণতন্ত্রের Consummation সম্ভবপর হয়ে ওঠে না? এ বিষয়ে 'বাজার' প্রপঞ্চটি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে আমাদের। বাজারের সঙ্গে রাজনীতির বিশেষ করে "Public Policy"র একটি গভীর সংযোগ রয়েছে যা আরও বহু জটিল সামাজিক গ্রন্থির জন্ম দেয়। এ প্রসঙ্গেই প্রখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত রবার্ট ডাল গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে আরেকটি ব্যবস্থার কথা বলেছেন, যাকে তিনি পলিয়ার্কি বলে অভিহিত করেছেন। গণতন্ত্রায়ন আজকের যুগের সবচেয়ে মুখরোচক শ্লোগান। কিন্তু কেমন 'গণতন্ত্র' একটি সমাজের জন্য প্রয়োজন বা অপরিহার্য? এদিক থেকে বহু মত ও পথের সহাবস্থানকে স্বীকার করেই বহুবাচনিক গণতন্ত্রের কথা উঠেছে, যাকে রবার্ট ডাল পলিয়ার্কিও বলছেন। গণতান্ত্রিক বহুবাচনিকতা কিন্তু সামাজিক বহুবাচনিকতা ছাড়া অনেক সময়ই অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে না। আবার এ দুই অভিধারণার দ্বন্দ্বও অনেক সময় খোদ গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে তোলে।

এ দুয়ের সংমিশ্রণে যুক্তরাষ্ট্রে আপাতগ্রাহ্য গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ করা গেলেও In effect এবং in spirit যা অনুশীলন করা হয়, তাকে neo-corporatism বলেই অনেকে অভিহিত করতে চান। আমি প্রসঙ্গান্তরে জড়িয়ে পড়ে আজকের মুখ্য বিষয় থেকে কিছুটা সরে পড়েছি। মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসার আগে আমাদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, আজকে বিশ্বব্যাপী নতুন আরেকটি প্রপঞ্চ আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ প্রপঞ্চটি আজ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কি দর্শন, কি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কি সমাজবিজ্ঞান, কি অর্থনীতি- সকল ক্ষেত্রে মুখ্য আলোচ্য বিষয় হচ্ছ গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন-এর প্রপঞ্চটি। আজ একটি কথাই

www.pathagar.com

বারবার উচ্চারিত হচ্ছে যে, জাতিরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে জাতিরাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে দেখা দেবে এবং তার পরিবর্তে আসবে বৃহৎ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংগঠনসমূহ, যারা ভৌগোলিক সীমান্ত অতিক্রম করে একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করবে। মানুষের বিকাশকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবর্তনবাদী ইতিহাসবিদরা যেমন এক সময় বলত যে, মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের রূপ এবং চরিত্র পরিগ্রহ করেছে, অনরূপ ব্যাখ্যার ধারাকে অনুসরণ করে অনেকেই বলার চেষ্টা করেছেন যে, বিভিন্ন পর্যায়ে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র আজকে যে অবস্থায় এসেছে, এই অবস্থা থেকে টেকনোক্র্যাটিক এবং টেকনোলজিক্যাল রেভ্যুলিউশনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে যে অবস্থায় উপনীত হবে সেখানে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে শুধু একটি কথাই বলাই যথেষ্ট সেটি হচ্ছে– আজকের এই আধুনিক জাতিরাষ্ট্র কিন্তু হঠাৎ করে জন্মলাভ করেনি। এ বিষয়গুলো বুঝতে হলে আমাদেকে গভীরভাবে ইউরোপের ইতিহাসের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাকাতে হবে এবং মর্মোদ্ধার করে বুঝতে চাইতে হবে। Cardinal de Reheliey থেকে শুরু করে Metternich এবং Bismark থেকে শরু করে Garibaldi পর্যন্ত ইউরোপের এ চার রাষ্ট্র নায়কের কূটনৈতিক পারদর্শিতা, দক্ষতা, দূরদৃষ্টি এবং Selfless Commitment to National Interest -এর স্বরূপ বুঝতে যদি আমরা পারি তাহলে বিগত সহস্রাব্দের বহু অমীমাংসিত বিষয়ের ব্যাখ্যার সূত্র খুঁজে পেতে পারি। ১৬১৮-তে যে Thirty years war ইউরোপের ওপর চেপে বসে তাকে Emperor এবং Prince -দের মধ্যকার বহু প্রাচীন জার্মান দ্বন্দ্ব বলে অনেকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। আবার অনেকে একে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যকার আন্তর্জাতিক ধর্মীয় যুদ্ধের সম্প্রসারিত রূপ হিসেবেও বিবেচনা করে থাকেন। তিরিশ বছরের এ যুদ্ধকে প্রথিতযশা কৃতি ইতিহাসবিদ Veranica Wedgwood বলেছেন, এসব were actuated by fear rather than by lust of conquest or passion of faith. They wanted peace and they fought for thirty years to be sure of it. They did not learn then and have not learned since, that war only breeds war. রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল রাজকীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন নিশ্চিত করা এবং প্রদেশসমূহ ও Nobility 'র Privileges বা সুযোগ-সুবিধার ওপর চরম আঘাত হানা। Nobility 'র বা সম্পদের ওপর এসময় নির্মম ও নিষ্ঠুর আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। ১৬৪৮-এ Treaty of Westphalia 'র মাধ্যমে শুধু তিরিশি বছরের যুদ্ধেরই ইতি ঘটেনি– এক যুগান্তকারী অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। জাতি রাষ্ট্র গঠনের Idea এখানে থেকে প্রণোদনা লাভ করে। Westphalia'র সন্ধি নয়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পত্তন ঘটায়– জার্মানীতে ক্যালভিনিস্ট, লুথেরান এবং ক্যাথলিকগণ সমমর্যাদার ভিত্তিতে সমঅধিকার ভোগ করার সুযোগ লাভ করল। Prince -দের হাতকে শক্তিশালী করা হয় এবং Imperial legislation আইন সভার অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হতে পারবে বলে স্বীকৃত হল। সবচেয়ে বড় কথা ভূখণ্ডগত বিরোধের অবসান ঘটে এ সন্ধির মধ্যদিয়ে এবং রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অলংঘনীয় বলে স্বীকৃতি পায়। সুইটজারল্যাণ্ড এ সময়েই স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। Treaty of Westphalia- যে নতুন সামাজিক শক্তিসমূহের জন্ম দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে unleash করেছিল তাই Nationalism, Liberty এবং Democrcy'র মতো Revolutionalry idea গুলোকে সৃজন করে ও লালন করে। ১৮১৫-তে Congress of Vienna 'র মাধ্যমে অস্ট্রিয়ান চ্যান্সেলর Metternich চেয়েছিলেন ইউরোপে একটি নতুন ভারসাম্য আনয়ন করতে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাই তিনি রাশিয়া, প্রুশিয়া, ব্রিটেন এবং নিজ দেশ অস্ট্রিয়াকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন– ইতিহাসে Concert of Europe বলে থেকে যাকে অভিহিত করা হয়। Metternich -এর মতে, When Paris sneezes, Europe catches cold এবং 'ফ্রেঞ্চ স্টাইলের গণতন্ত্র রাজা, গীর্জা ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে চরম হুমকি'। অতএব লক্ষণীয় বিষয়

www.pathagar.com

হচ্ছে যে, সহস্রাব্দের মধ্যভাগ পেরিয়ে বিশ্ব যখন পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ বা উদগ্রীব হয়ে উঠছিল, Concert of Europe -কে তৈরীই করা হল বিশ্বের আসন্ন পরিবর্তনকে প্রতিহত করার জন্য। Concert ভুক্ত দেশসমূহ মনে করত সংস্কারের সূচনা করা মানেই বিপ্লবের সূচনা করা, অর্থাৎ চিরায়ত ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা রহিত হওয়া। এতসব করেও কিন্তু ফ্রান্সকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ধীশক্তি, মনন ও প্রতিভার কোন বিকল্প নেই– এবং ফ্রান্সে কখনই এর ঘাটতি ছিল না। ১৮১৮-তে ফ্রান্সকে Concert of Europe -এ বরণ করে নিতে হয়েছে অন্য শরীকদের। এখানেই Metternich -এর পরাজয়। তবে এককথায় যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে ১৮১৫ থেকে গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীটি তিনটি পৃথক পৃথক বা ভিন্ন ভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে আমাদের পৌঁছে দিয়েছিল। প্রথম স্তরে ইউরোপের রক্ষণশীল শক্তিসমূহ ১৮৪৮ পর্যন্ত তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্সে বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডের ফলে রক্ষণশীলতার প্রাচীরে প্রথমবারের মত চিড় ধরে। তদুপরি এ বছরই ৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় মার্কস ও এ্যাঙ্গেলস বিরচিত বিখ্যাত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। দ্বিতীয় স্তরের শক্তিধরবর্গের সভ্যরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রিত সংস্কারে সম্মত হতে বাধ্য হলেন। না হলে সব হারাতে হবে এই ভয়ে সংস্কারের বিরুদ্ধে অন্তহীন প্রতিরোধের চেয়ে এই শ্রেয় বলে তারা ভাবতে শুরু করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহে সংবিধান প্রবর্তন করা ও সাংবিধানিকতার একটি ধারার সূচনা হয় এবং ভূমিদাসরা মুক্তি লাভ করল। তৃতীয় স্তরে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতা এমন অবিশ্বাসের জন্ম দিল যে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায় জোট পুনর্বিন্যাসের নয়া কূটনীতির প্রয়োগের ফলে। শুরু হয় তীব্র ও উৎকট সমরসজ্জা এবং রাষ্ট্রোতিক বাজার দখলের জন্য উপনিবেশ স্থাপনের এক অন্তহীন, অসীম ও তীব্র প্রতিযোগিতা। এর পূর্বের শতাব্দীতে দু'টি বিশাল বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। একটি হচ্ছে ১৭৭৫-১৭৮৫ পর্যন্ত উত্তর আমেরিকায় ১৩টি উপনিবেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ১৭৭৬ -এর ৪ জুলাই সেই উপনিবেশসমূহের Declaration of Independence. অপরটি হচ্ছে ১৭৮৯ -এর ফরাসী বিপ্লব। এই বিপ্লবের মর্মবানী ছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এ তিনটি পরম অভিধার অভিব্যক্তি, বিবর্তন পরিবর্তন ও বিপ্লবের সিঁড়ি মাড়িয়েই ১৮৪৮-৫০ -এর ফরাসী বিপ্লবী কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে এবং ১৮৭১-এ প্যারী কমিউন তথা প্রথম সর্বহারার (নগর) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন্ সে জাতীয় চেতনা, কোন্ সে বোধ যা এসব ঐতিহাসিক ঘটনাকে উজ্জীবিত ও প্রণোদিত করেছিল? মানুষকে মানুষের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি একক অবিভাজ্য সত্তায় লীন হওয়ার জন্য বিবর্তন, পরিবর্তন ও বিপ্লবের চেহারা এখনও সুস্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করেনি।

বিবর্তনবাদ এবং পরিবর্তন সম্পর্কে এক পর্যায়ে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি বলেছিলেন যে, বিবর্তনবাদের সূত্রই যদি সঠিক বলে ধরে নিই এবং যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ধরেই নিতে হবে যে, মানুষের আরও বিবর্তন ঘটবে। আজ মানুষের যে অবয়ব ভবিষ্যতে বিবর্তিত মানুষের রূপে ভিন্ন অবয়ব পরিগ্রহ করতে নিশ্চয়ই বাধ্য। এর প্রত্যুত্তরে কিন্তু টয়েনবি নিজেই বলছেন যে, কৃৎকৌশল ও বিজ্ঞান যে পর্যায়ে গেছে এবং মানুষ এসবের ওপর যে প্রভুত্ব অর্জন করেছে তার পরিবাহিত কৃৎকৌশল ও বিজ্ঞান মানুষকে সেবাদানে এবং মানুষের আজ্ঞাবাহী থাকতে বাধ্য। মানুষের যৎসামান্য পরিবর্তন হলেও তেমন কোন বিবর্তনের শিকার মানুষ হবে না। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিন্সের কথা যিনি একটি হুইল চেয়ারের ওপর বসে আছেন, যার দেহের মস্তিষ্ক কোষ ছাড়া আর কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে না– সমস্ত কিছু কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এবং যার মস্তিষ্ক কোষের নির্দেশে দেহের বিভিন্ন কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কাজ করছে। তাহলে আমাদের ভাবতে হবে, আগামী সহস্রাব্দে, ইনফরমেশন টেকনোলজিক্যাল রেভ্যুলেশনের হাইয়েস্ট ফর্মে আমরা এমন সব বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরিবর্তন লক্ষ্য করব, বিশেষ করে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সে

www.pathagar.com

যে পরিবর্তনটি আসবে তা ভাবতে এখনই অনন্য রোমাঞ্চ অনুভব করি। মানুষ ইতোমধ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠেই শুধু অবতরণ করেনি, মানুষ বিভিন্ন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বিভিন্ন নভোযান প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা মঙ্গলগ্রহের মানচিত্র পর্যন্ত রচনা করতে সক্ষম হয়েছি এবং অদূর ভবিষ্যতে মঙ্গলগ্রহ এবং শনিগ্রহের পরিপূর্ণ আবহাওয়া এবং তার পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারব। একবার শক্তি এবং দ্রুততার কথা ভাবতে গেলেই অবাক বিস্ময়ে স্থানু হয়ে থাকতে হয় কিছুক্ষণের জন্য হলেও। ১৮২৮-এ লিভারপুল এবং ম্যানচেস্টারের মধ্যে যখন প্রথম প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করা হয়েছিল তখন কি কেউ বর্তমান জাপানের দ্রুততম 'বুলেট' ট্রেনের কথা ভাবতে পেরেছিল? ১৮৯৮-এ প্রথম ব্রিটেনের সড়কে মোটরযান চালু করা হয়। এর সর্বোচ্চ গতি ছিলো ঘন্টায় মাত্র চার মাইল।

কারিগরি উন্নয়ন ও অগ্রগতির পাশাপাশি লক্ষণীয় যে, ইউরোপ অত শত কিছুর পরও ধর্মকে আঁকড়ে থাকতে কখনো কুণ্ঠা বা লজ্জাবোধ করেনি। বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের অগ্রগতিতে অর্জিত ক্ষমতা, শক্তি ও সাফল্যের সাথে ইউরোপ সগৌরবে খ্রিস্টীয় সংস্কৃতির সংযোজন করতে কখনো পিছিয়ে থাকেনি। দৃষ্টান্ত দিয়েই বলি-রেলওয়ে যুগকে বলা হত Muscular Christianity -এক রেল দুর্ঘটনায় নিহত William Pickerig এবং Richard Edger উভয়ের অভিন্ন সমাধি ফলকে Journey on the Spiritual Railway' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা উৎকীর্ণ করা আছে। কবিতাটির শেষ স্তবকটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"Come then poor sinners, now's the time at any station on the line,
The train will stop and take you in" (24 Decmber 1845)

জীবনের মান উন্নয়ন ও উৎকর্ষকে এমনিভাবে ইউরোপীয়রা ধর্মের সাথে মিশিয়ে নিয়েছে যে একে পৃথক কোন সত্তা নয়, প্রাত্যহিক অস্তিত্বই মনে হয়। এখন পর্যন্ত মহাকাশ গবেষকগণ যে লক্ষ্য স্থির করেছেন, সেটি হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম কোয়ার্টারেই মঙ্গলগ্রহে মানুষের পদার্পণ ঘটানো। এটি অস্বাভাবিক অনেকের কাছে মনে হতে পারে, তবে আমার মনে হয় যে, বিজ্ঞান এবং কৃৎকৌশলের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বিগত সহস্রাব্দে, নতুন সহস্রাব্দে তা শত সহস্রগুণে এগিয়ে যাবে। কারণ বিগত সহস্রাব্দ পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখব, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটতে যে কষ্ট, বেদনা ও যন্ত্রণা এ সমাজকে ও মানুষকে সহ্য করতে হয়েছে, যে অমানবিকতার শিকার মানব সভ্যতাকে হতে হয়েছে, একবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে আমাদের সেই ধরনের যন্ত্রণার শিকার হতে হয়নি। আমার এখন মনে পড়ে যে, কী করে মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে মানুষ নবজাগৃতির ও যুক্তিবাদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে আলোকনের দিকে। একবার ভেবে দেখুন Ptolemy' র অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা বিসর্জন দিতে কত সময় লেগেছে। প্রায় গোটা সহস্রাব্দ। বিংশ শতাব্দীল শেষ তিন দশকে যে অভূতপূর্ব অর্জন মানব সভ্যতার, তার কোন তুলনা চলে না। একটি সময় ছিল, যখন মানুষ Alchemists, astrologers এবং Magician -দের জালিকার জিয়নকাঠি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু মানুষের Natural progression তাকে নবজাগৃতির মানবতাবাদে দীক্ষিত করে তোলে- জ্ঞানমনস্ক করে তোলে এবং এর ফলে তার সৃজনী ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটে। যার পরিণতিতে সে অতিপ্রাকৃতিক সত্তাকে অস্বীকার করে নিসর্গকে জানতে চাইল, বুঝতে চাইল নিসর্গের রহস্যগুলো, নিসর্গের ওপর স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। এ পথ ধরেই বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লবের সূচনা। Copernicus (প্রকৃত নাম ঃ Mikolaj Kopernik) Ptolemy -র তত্ত্বকে অসর প্রমাণ করে যখন heliocentric idea প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন, কিন্তু তেমন সুযোগই খুব একটা পেলেন না। অথচ সূত্রটি তিনি ঠিকই ধরেছিলেন ১৬১৬-তে। রোমান চার্চ তাকে Condemn করে। পোল্যান্ডের রাজার মুদ্রা সংস্কারেও Copernicus নিয়োজিত ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে আজ যা অর্থনীতিতে গ্রেশামের সূত্র বা Greshm's Law হিসেবে

www.pathagar.com

পরিচিতি লাভ করেছে তা তিনি গ্রেশামেরও তিনিশ বছর আগে (১৫২৬-এ) তার Monetae cudendae ration গ্রন্থে enunciate করে বলে গেছেন যে, 'bad money drives good money out of circulation". কত অগ্রগামী মানুষ ছিলেন! অথচ কী আশ্চর্য, আমরা ক'জন এ তথ্যটি জানি বা রাখি? Copernicus -এর পর Johan Kepler গ্রহসমূহের কক্ষপথ পরিক্রমার রেখাচিত্র অংকন করতে গিয়ে নিরূপণ করেন যে এটি eliptical shape অনুসরণ করে। তিনি Copernicus -এর সূত্রে নিহিত Laws of motion - গুলোকে enunciate করেন। Galiles Galilei আরো ব্যাপকভাবে Copernicus -কে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করে গেলেন। ১৬৩২-এ প্রকাশিত তার Dialogue on the Two Main World Systems গ্রন্থে তিনি Ptolemy 'র ধ্যান-ধারণা পরিপূর্ণভাবে অযৌক্তিক প্রমাণ করে ধূলিসাৎ করে দেন। গির্জা এতে তুষ্ট হতে পারেনি– গ্যালিলীকে ধর্মদ্রোহী সাব্যস্ত করা হয় inquisition -এর মাধ্যমে এবং Recant করতে বাধ্য করা হয়। Inguisition বিচারে গ্যালিলীকে সারাজীবনের জন্য গৃহে অন্তরীণ থাকার দণ্ড দেয়া হয়। গ্যালিলী দমবার পাত্র ছিলেন না। বিচার সভা ত্যাগ করার সময় তিনি স্বগতোক্তি করেন ঃ Eppur si mouve yet it cloes move. অর্থাৎ তথাপি এটা [এই ধরিত্রী] [সূত্রের চতুর্দিকে কক্ষপথে] চলে।) বস্তুবাদের দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়ার অপরাধে ইটালীয় ডমিনিকান Giodarno Bruno -কে শেষ পর্যন্ত ১৬০০ সনে অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়ে মারা হয়। এ ধরনের ত্যাগ এবং তিতিক্ষা এখন তেমন করতে হচ্ছে না। আলোকন সৃষ্টি করে বিভাসিত মানুষ, আলোকিত মানুষ। এই আলোকনের প্রচেষ্টা হচ্ছে আধুনিকতা। আজকের এই আধুনিকতার সঙ্গে উত্তরাধুনিকতার প্রসঙ্গটি এখানে এসে যায়। উত্তরাধুনিকতা মানে এই নয় যে, আধুনিকতার সকল অর্জনকে বিসর্জন দিয়ে, একটি গোঁজামিল দিয়ে নতুন একটি কিম্ভূতকিমাকার কিংবা শুধুমাত্র একটি স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। মানুষের মনুষ্যত্ব এবং সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে আরও সুশৃঙ্খলভাবে আনয়ন করাই হবে আগামী দিনের বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশ লের প্রধান লক্ষ্য এবং আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে আধুনিকতা বিগত সহস্রাব্দে আমরা লক্ষ্য করেছি সেই আধুনিকতা আরও ব্যাপকতর রূপলাভ করবে। যদিও বলা হচ্ছে যে উত্তরাধুনিকতা এসে এখন আমাদের চিন্তার পটকে পরিবর্তন করছে– আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে উত্তরাধুনিকতা এখনো আমাদের পেয়ে বসেনি। উত্তরাধুনিকতা অপেক্ষায় আছে নতুন সহস্রাব্দের। আধুনিকতা গভীরে প্রোথিত হওয়া তো দূরের কথা, তৃতীয় বিশ্ব এখন পর্যন্ত বিগত সহস্রাব্দের সপ্তদশ কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে (সে সময়ের দিক থেকে) অবস্থান করছে উন্নত বিশ্বের তুলনায়। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ যে অঞ্চল তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত তার উত্তরণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘটে এবং আধুনিকতার পরিপূর্ণ স্পর্শে স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ও স্ববশ্যতা নিয়ে তা দাঁড়াতে না পারলে আগামী সহস্রাব্দের কোন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন কোন অবস্থাতেই মানব কল্যাণ কিংবা গণতান্ত্রিকভাবে মানুষকে রূপান্তর করা বা বাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তেমন কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে না।

উরুগুয়ে রাউন্ডের কথাই বলি, আর্থ সামিটের কথাই বলি সর্বত্রই বক্তব্য একটিই ঃ তৃতীয় বিশ্বের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াও, তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশবিনাশী কর্মতৎপরতা রোখ। আর অধিক মুনাফালোভী– যারা চায় না যে, তৃতীয় বিশ্বের পণ্যসামগ্রী ব্যাপকভাবে উন্নত বিশ্বে এসে তাদের বাজারটিকে জিম্মি করে তুলুক– তারা তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদনমুখী প্রক্রিয়ায় বাধা দান করার জন্য নতুন নতুন আইন প্রণয়ন ও নতুন নতুন শর্তারোপ করছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে এখন উন্নত দেশগুলো ট্রেড ইউনিয়ন বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করতে চাইছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, রাষ্ট্রসংঘ থেকে শুরু করে আইএলও এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে শ্রমিক অভিজাততন্ত্র ও ট্রেড ইউনিয়নিজমের নামে উৎপাদনবিমুখ কর্মতৎপরতা শিল্পখাতে প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গে

www.pathagar.com

উৎপাদনবিরোধী কাজে লিপ্ত, অথচ আজকে তারা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে ট্রেড ইউনিয়নিজম প্রবর্তন করতে উৎসাহী। তার কারণ হচ্ছে একটিই– একবিংশ শতাব্দী যাতে কোন অবস্থাতেই তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে না পারে।

বিগত সহস্রাব্দের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে এইখানে যে, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে ভৌগোলিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যে উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল, সহস্রাব্দের শেষ শতকের মধ্যভাগে এসে সেই উপনিবেশের অবসান ঘটিয়ে ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো। এখন তারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে একবিংশ শতাব্দীকে কাজে লাগাবে। তাদের ধীশক্তি, মেধা, মননকে সম্মিলিতভাবে সেই দিকে এগিয়ে নিলে শিল্পোন্নত বিশ্ব স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিরুদ্ধে একটি ঐক্য মোর্চা গঠনের একটি নতুন রণনীতি ও রণকৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করবে। আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সেই রণনীতি ও রণকৌশলকে ভেদ করে কীভাবে একটি বিশ্ব সরকার এবং একটি বিশ্বসমাজ গড়ে তোলা যায় সেদিকে মনোযোগী হওয়া এবং সেদিকে আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করা।

মাহবুব উল্লাহ :

একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অবয়ব কেমন হবে, সারা পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেমন হবে— সে সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট প্রেডিকশন করা খুব কঠিন। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছু কিছু প্রেডিকশন করতে পারি এবং সেটা তখনই সঠিক হবে, যখন দেখব, তার সাথে তত্ত্বের এবং যুক্তির একটা সমন্বয় ও সমঝোতা আছে। ইতিহাসে দুর্ঘটনা বা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটে না এমন নয়। তারপরেও ইতিহাস একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন ফলো করে অগ্রসর হয় এবং সেই প্যাটার্নটা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছিলেন যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিকরা। যেমন– জার্মান দার্শনিক হেগেল ফিলোসফির ক্ষেত্রে ডাইলেকটিক্সের কথা বলেছিলেন। হেগেল বলেছিলেন– History is the development of spirit in time. অর্থাৎ ইতিহাস মানুষের চিন্তা এবং মননজগতের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই বিবর্তনের পথে এগিয়ে যায়। সেটাকে আবার মার্কস উল্টো করে দিয়ে বললেন, Historical materialism এবং এই দর্শনে তিনি সভ্যতার বস্তুগত ভিতকে এবং শ্রেণী সংগ্রামকে প্রাধান্য দিলেন। যার ফলে দেখা গেল তাঁর ইতিহাসের ব্যাখ্যায় শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শ্রেণী সংগ্রাম একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে। মার্কস শ্রেণী সংগ্রাম আবিষ্কার করেননি, শ্রেণী সংগ্রাম পৃথিবীতে ছিল। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম সমাজে কি ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে, যেটা চিহ্নিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। সেই প্রয়াস থেকেই তিনি বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতন ঘটবে। পুঁজিবাদ কারো কারো দৃষ্টি পেয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছে এবং সেখান থেকে নতুন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটবে। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল, সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও টেকসই হল না। এর পেছনে বড় কিছু কারণও আমরা লক্ষ্য করি। যেমন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি গুণ হচ্ছে কেনেথ গলব্রেথের ভাষায়, "সংকটের সংগে নিজেকে এডজাস্ট করে নিতে পারে পুঁজিবাদ।" যেমন– ১৯৩০ সালের মহামন্দার পর কেইনসিয়ানিজমের প্রভাবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে আমরা রাষ্ট্রের উদ্যোগের একটা বিশেষ ভূমিকা প্রত্যক্ষ করলাম, যা পুঁজিবাদের চিরায়ত ব্যক্তি উদ্যোগের পরিপন্থী। ব্যক্তি উদ্যোগের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ যতটা কম হয়, সেটাই মঙ্গল— পরিস্থিতিগত কারণে এই ধারণা থেকে পুঁজিবাদ সরে এসেছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবিরে সমস্যাটা হচ্ছে, যেহেতু সেখানে রাষ্ট্র একটা সুনির্দিষ্ট দর্শন অনুসরণ করে, সেহেতু, রাষ্ট্র নমনিয়তা হারিয়ে ডকট্রিনিয়ার স্টেটে পরিগণিত হয়। এর ফলে সেখানে এডজাস্টমেন্টের তেমন কোন সুযোগ ছিল না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে সমস্যা ও সংকট দেখা দেয়, সে ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো নজর দিতে পারেনি।

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো মানুষের জন্য অনেক আশাব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, বিশেষ করে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করার ক্ষেত্রে; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রাধান্য বজায় রেখে ব্যক্তি উদ্যোগকে প্রাণবন্ত রাখার জন্য একটা ন্যূনতম প্রেরণা বজায় রাখতে ব্যর্থ হবার ফলেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সংকটের সৃষ্টি হয়। সুতরাং আজকে আমি একথা খুব পরিষ্কারভাবে বলতে পারি যে, আবার যদি এই একবিংশ শতাব্দীতে একজন কার্লমার্কসের উদ্ভব না হয়, যিনি সমসাময়িক পুঁজিবাদের একটি সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, তাহলে যে ক্লাসিক্যাল রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে পরিবর্তনের স্বপ্ন অনেক বিপ্লবীরা দেখেছিলেন, সেটা হয়তো সম্ভব হবে না। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় আরেকটি ব্যাপারে খুব গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেটি হচ্ছে সংস্কৃতির ভূমিকা। বিশেষ করে উন্নয়নের প্রসঙ্গটা আলোচনা করতে গিয়ে সংস্কৃতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়। ম্যাক্সওয়েবারও সংস্কৃতির ওপর এরকম গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে সংস্কৃতির ওপর যদি আমরা অধিক গুরুত্ব দেই, তাহলে বলতে হবে সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষই উন্নতি করবে। আর ঐ সংস্কৃতি বা ঐ ইন্সটিটিউশন বহির্ভূত মানব জাতি উন্নতি করতে ব্যর্থ হবে। এই তত্ত্বের মধ্যে এক ধরনের বর্ণবাদের বীজ আমরা লক্ষ্য করি। এর পাশাপাশি আমরা একথা বলতে পারি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি প্রয়োজনে নতুন সংস্কৃতি, নতুন কর্মোদ্যোগ আয়ত্ত করতে সক্ষম। যেমন– চীনা জাতি একসময়ে আফিম সেবন করে ঘুমিয়ে পড়েছিল, চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল, সেই চীনা জাতি আজ জেগে উঠেছে। বিশাল কর্মোদ্যোগে মেতে উঠেছে। যার ফলে অনেকে মনে করেন, আগামী শতক হবে এশিয়ার শতক এবং চীনের শতক। এর পাশাপাশি আরেকটি জিনিস প্রণিধানযোগ্য। সেটি হচ্ছে মার্কস এক সময় বলেছিলেন– Capitalism will dig its own grave. কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব? সেটা সম্ভব হয় শিল্পায়নের ফলে। শ্রমিক শ্রেণী এক জায়গায় জড় হয়, যার ফলে তার পক্ষে সংঘ সংগঠন করা সম্ভব হয় এবং পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সম্ভব হয়। পুঁজিবাদের এই যে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, সেটা শিল্প বিপ্লবের পথে এসেছিল। এর ফলেই কিন্তু এ ধরনের পরিবর্তনের কথা মার্কস চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু একই সাথে মনে রাখতে হবে পুঁজিবাদও পরিবর্তিত বিশ্বে খাপ খাইয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে শিখেছে। লেনিন যে পুঁজিবাদকে মুমূর্ষু বলেছিলেন, সেই মুমূর্ষু পুঁজিবাদও তেজীয়ান হয়ে দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ, ঠাণ্ডা লড়াই অতিক্রম করে আজ এককেন্দ্রিক বিশ্ব গঠনে দুঃসাহসী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। পুঁজিবাদের যে গুণটি Appreciate করার তা হলো সংকটকালে বা Better Performence -এর জন্য অন্য আদর্শ থেকে ধ্যান-ধারণা ধার করার প্রশ্নে তার কোন সংকোচ নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংকট উত্তরকালে আমরা বেনিতো মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালীতে ফ্যাসীবাদ এবং এডলফ হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীতে নাৎসীবাদের জন্ম হতে দেখেছি। জাত্যাভিমান পুঁজিবাদী সংকট থেকে উত্তরণের এটি সহজতর পথ বলে তারা ভেবেছিলেন। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে Marshall plan -এর অধীনে পশ্চিম জার্মানীকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় দ্বারপ্রান্তে উপনীত কমিউনিজমকে ঠেকাতে। অনুরূপভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান। মডেলটি খুব সহজ—গণতন্ত্রের বালাই নেই– অথরিটেরিয়ান করপোরেটিস্ট Model এ USA -এর Nuclear Umbrella ও Financial Patronage ও backing এ hub areas of development গঠন করে ভুখা-নাঙ্গা পুঁজিবাদবিরোধী মানুষগুলোকে চমকে দেয়া যায়। বিপ্লব, উপপ্লব বিঘটনে যেও না– সংযমী হয়ে একটু ধৈর্যের সঙ্গে মার্কিন মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলেই 'তোমার নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়া নিঃশেষিত হতে বিলম্ব হবে না'। এসব কিছুকেই মাথায় রেখে ঠাণ্ডা লড়াই উত্তরকালে আরো সতর্ক পদক্ষেপে এই প্রান্তিক পুঁজিবাদকে মোকাবিলা করতে হবে। আজকে একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা যদি সিয়াটলের ঘটনা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব, পৃথিবীতে সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এক নতুন ধরনের সম্ভাবনা পুঁজিবাদ নিজেই সৃষ্টি করে দিয়েছে। কিভাবে? সেটা হচ্ছে তার

www.pathagar.com

তথ্য-প্রযুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে। আজকে সারা পৃথিবীর মানুষ একযোগে একে অপরের সংগে ভাববিনিময় করতে পারে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে এবং এই তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে একদিকে যেমন পুঁজিবাদী শিবির বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শক্তি অর্জন করবে, সাথে সাথে আরেক ধরনের শক্তিরও জন্ম দেবে, যেই শক্তি সেটাকে রোখার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটা পথ খুঁজে পাবে এবং প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে তারা সেটা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এখন প্রশ্ন হল একবিংশ শতক আমাদের জন্য কোন ধরনের দ্বন্দ্ব নিয়ে আসছে? সেটা কি সংস্কৃতি, আদর্শ ও অর্থনীতির দ্বন্দ্ব, নাকি অন্য কোন ধরনের দ্বন্দ্ব– সেটা আজকে আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং তার ওপরেই নির্ভর করছে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক মানচিত্র কেমন হবে।

আফতাব আহমাদ :

মার্কস বিপুলভাবে ঋণী হেগেলের কাছে। মার্কস, ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম এবং বিপ্লব সম্পর্কে বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবে হেগেলের কথা এসেই যায় এবং এ প্রসঙ্গে হেগেলের কথা আসলে, তাঁর অপর সতীর্থ Schleiermacher -এর কথাও এসে যায়। এরা দুজনই খুব নিবিড়ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ডাচ materialist দার্শনিক Baruch Spinoza'র দ্বারা। Spinoza'র মতে, "man's highest good is his knowledge of the union existing between the mind and the whole of nature." বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয়, লেলিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক বিপ্লবের কথা। তারপরেই বলতে হয় হাঙ্গেরীর ব্যর্থ বিপ্লবের কথা। তারপরে আসে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনের বিপ্লবের কথা, হোচিমিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামে বিপ্লবের প্রচেষ্টা এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেই বিপ্লবের পরিপূর্ণতার কথা। কিম উল সুংয়ের নেতৃত্বে বিপ্লবের সাফল্য আমরা লক্ষ্য করি কোরিয়াতে। ফিদেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে কিউবাতে ও ডেনিয়েল ওর্তেগার নেতৃত্বে নিকারাগুয়াতে আমরা বিপ্লবের সাফল্য লক্ষ্য করি। কিন্তু একটি বিপ্লব বিংশ শাতব্দীর সমস্ত বিপ্লবের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। এ যাবতকালের যে কয়টি বিপ্লবের কথা আমি বললাম, সেগুলো ইহজাগতিক দর্শনকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ইহজাগতিক ব্যস্থার সাথে পারলৌকিক দর্শনকে একত্র করে যে বিপ্লব সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, সেই বিপ্লবের মহানায়ক হচ্ছেন ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী, যিনি ১৯৭৯ সালে ইরানে একটি সফল সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে ইরানের স্বেচ্ছাচারী শাহকে উচ্ছেদ করে সমগ্র পাশ্চাত্য দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং আজও সেটি একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বের মানুষের কাছে ইরানের বিপ্লবের এই ঘটনা একটি অনন্য ঘটনা। বিপ্লবের ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ মডেল এবং অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে বহুকাল ধরে অন্যতম উৎস হয়ে থাকবে। আসলে বিপ্লবের কথা যদি আমরা বলতে যাই, তাহলে গোড়াতেই বলতে হবে যে, মানুষের প্রথম পরিকল্পিত বিপ্লব ছিল ১৭৭৬-এ যখন ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশ উত্তর আমেরিকায় ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতা দাবী করেছিল, সেটিই ছিল Intellectually led first conscious বিপ্লব। একটি সুপরিকল্পিত রূপরেখা অনুযায়ী সেই স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখেছি সেই বিপ্লবের পরিণতিতে একটি পর্যায়ে এসে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মানবাধিকার উদ্বোধনের স্বার্থে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হতে আমেরিকানরা বাধ্য হল। সেখানে তখন ছিল মানুষ মানুষের মানুষে ভেদাভেদের প্রশ্নটি, ছিল মানবিক গুণাবলী এবং মানুষের অধিকারের প্রশ্নটি। কে দাস থাকবে, কে মুক্ত মানুষ থাকবে এই ইস্যুটি। আজকের এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে গত সহস্রাব্দে বাংলাদেশের মানুষের অর্জন সম্পর্কে যদি দু'টি কথা বলা না হয়, তাহলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গত সহস্রাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের সবচেয়ে গৌরবের বিষয় হচ্ছে ১৩৪২-এ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের নেতৃত্বে এই ভূখণ্ডে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা, যেটি ২৩৪ বছর পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব,

www.pathagar.com

অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা নিয়ে টিকেছিল। দিল্লীর ওপর নির্ভর না করে, দিল্লীর প্রতি ন্যূনতম আস্থা প্রদর্শন না করে, আনুগত্য জ্ঞাপন না করে বরং দিল্লীর বিরুদ্ধে সেই স্বাধীন সালতানাত সেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সদর্পে ও সগর্বে টিকেছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে সহস্রাব্দের গোড়াতেই ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী এসেছিলেন এখানে এবং মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠার করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা নিষ্পেষিত এদেশের নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষ সেদিন ইসলামকে আপন ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিল ও আলিঙ্গন করেছিল। বিগত সহস্রাব্দে সুফিবাদের প্রভাবের মধ্য দিয়ে আমাদের সংস্কৃতিতে যে রূপান্তর ঘটেছে, আমাদের মানুষের মনের চালচিত্রের যে পরিবর্তন ঘটেছে, সেটি আজকে আমাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের এও মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশেরই শাসক শেরশাহ সূরী দিল্লী শাসন করার মত ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন হুমায়ুনকে পরাস্ত করে এবং শেরশাহ সূরীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মুঘলরা দ্বিতীয়বার দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। হুমায়ুনের পক্ষে শেরশাহ সূরীর জীবদ্দশায় কোনদিন সম্ভব হয়নি দিল্লীর মসনদ পুনরুদ্ধার করা। সর্বোপরি বিগত সহস্রাব্দে বাংলাদেশের মানুষের অন্যতম সাফল্য হচ্ছে বিংশ মতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে একটি সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করা এবং দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে যে রূপান্তরের প্রক্রিয়া ১৩৪২ এ শুরু হয়েছে, সেই রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে নবপর্যায়ে উপনীত করে আগামীদিনে তার যথার্থ মনজিলে মকসুদে পৌঁছে দেয়া। বিগত সহস্রাব্দের মধ্য দিয়ে এবং আগামী সহস্রাব্দে আমি আশা করি, বাংলাদেশের অনুকূলে দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্র আরো রূপান্তরিত হবে এবং ড. মাহবুব উল্লাহ যে বললেন আগামী শতক হচ্ছে এশিয়ার শতক তা আমি আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই যে, আগামী শতক এবং আগামী সহস্রাব্দ হচ্ছে পূর্ব এশিয়ার শতক ও সহস্রাব্দ। এখানে শীর্ষস্থানে থাকবে, নেতৃত্ব দেবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অন্যতম রাষ্ট্র বাংলাদেশ নামক বঙ্গপসাগরের তীর ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই গাঙ্গেয় বদ্বীপটি– যা একদা গঙ্গাঋদ্ধি নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এও জানি যে, পূর্ব এশিয়াতে চীন দেশ ও জাপানের একটা ভূমিকা থাকবে, কিন্তু বাংলাদেশকে অস্বীকার করে এখানকার মানচিত্রের পুনর্বিন্যাস করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। চীন দেশ, জাপান ও বাংগাদেশকে অঙ্গীকার বা উপেক্ষা করে অঞ্চলকেন্দ্রিক পরিকল্পনা, রণনীতি বা রণকৌশল নির্ধারণ করা সম্ভম হবে না।

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি আমাদের একটি বিরাট অর্জন– এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিগত ২৮ বছরে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আমরা যা করেছি, তাতে গর্ব করার মত তেমন কিছু আছে বলে মনে করি না। আজকে বাংলাদেশকে প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধী রাষ্ট্র হিসেবে রেখে দেয়ার এক ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা যদি এই ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করতে পারি তাহলে শুধু আমরা নিজেরাই নিজের পায়ে দাঁড়াব না, আমরা অন্যদেরও, বিশেষ করে উপমহাদেশের অন্যান্য নিপীড়িত জাতিকেও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর একটা পথ দেখাতে পারব। কাজেই এই অর্থে বলা যায়, একুশ শতক যদি কোন কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে এই শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসবে এই বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশ উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে ১৯৪৭-৭১ যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, কেউ যদি মনে করেন, সেই পরিবর্তনের ধারা থেমে গেছে বা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, তাহলে ভুল করবেন। সে কারণেই আজকে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা যেন বাংলাদেশের জন্য উত্তরোত্তর আরো ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে– তার জন্য একযোগে কাজ করতে হবে।

www.pathagar.com

১৫ জানুয়ারী ২০০০

সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রদায় ভাবনা

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংঘাত নিয়ে দেশী এবং বিদেশী অনেক মহলেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ যদিও একটি রাষ্ট্র এবং জনগোষ্ঠী হিসেবে অত্যন্ত হোমোজেনাস, এখানকার জনগণ প্রায় সবাই এক ভাষায় কথা বলে, ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকেও এখানকার জনগণের বিপুল একটি অংশ একই ধর্মে বিশ্বাসী, তৎসত্ত্বেও আমাদের রাজনীতিতে যে বিভাজন, সংঘাত ও সংঘর্ষ ঘটে চলেছে, তা নিয়ে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। কারণ এই সংঘাত-সংঘর্ষ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সম্ভাবনাকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, একথা আমরা সবাই জানি। বাংলাদেশে আজকে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ করে এই দেশটির অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রায় সকল মহলেই আমরা একটা হতাশার সুর লক্ষ্য করি।

স্বাধীনতার পরপরই এই দেশে একটা বিরাট বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই বিভাজনটা হচ্ছে এই রকম যে, যারা মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে গিয়েছিল, তারাই হচ্ছে সত্যিকার দেশপ্রেমিক আর যারা দেশের অভ্যন্তরে ছিল, তারা হচ্ছে পাকিস্তানী সামরিক শাসকচক্রের কলাবরেটর বা দালাল। সেই সময় দালাল আইন তৈরী করে বহু নিরীহ লোককেও জব্দ করা হয়েছিল। একটি দেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতার সংগ্রাম হয়, তখন সকল মানুষ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এটা কখনো বয়সের কারণে, কখনো বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে অথবা নানা ধরনের অসুবিধার কারণে সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সেদিন অনেকেই প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্রে গিয়েছিলেন ; কারো কারো হিসাব মতে এই সংখ্যা এক কোটি বা তার কিছু কম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যারা দেশে ছিলেন, তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন, তারা পাকিস্তানের কলাবরেটর ছিলেন, এই ধরনের একটা ধারণা প্রবলভাবে প্রচার করার চেষ্টা চলছে। যে কারণে সে সময় সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকার সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ খান 'সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন কলাবরেটরস' শিরোনামে একটি বিখ্যাত প্রতিবেদন লিখেছিলেন। সেদিন দেশের ভেতরে যে সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী ছিল, তাদের সকলকেই কলাবরেটর হিসেবে ভাবা হতো। অথচ যারা এই কথাটি প্রচার করেছিলেন, তারা ভুলে গিয়েছিলেন যে, এই মানুষগুলোই মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, তাদেরকে নানাধরনের তথ্য দিয়েছে, শত্রুবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে তাদেরকে নানাভাবে সতর্ক করেছে এবং শত্রুবাহিনীকে কখন, কীভাবে ঘায়েল করতে হবে- সেই সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়া, তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং তাদেরকে নানাভাবে সহায়তা দেয়ার জন্য এই মানুষগুলো চেষ্টা করেছে এবং এই চেষ্টা তারা প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে করেছে। আমি তাদের এই ঝুঁকি ভারতে গমনকারীদের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক বড় বলে মনে করি এই কারণে যে, তারা শত্রুকবলিত দেশে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন সেই সাহসিকতার কোন তুলনাই হয় না। কারণ তারা জানতেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া, তাদের মনোবলকে উৎসাহিত করা এসব তাদের জন্য বিরাট বিপদ ডেকে আনতে পারে। তৎসত্ত্বেও তারা সেটা করেছিলেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের উদ্ভবের গোড়ার দিকে আমাদের এই দেশে একটা বিরাট বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল আমাদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে। ফলে জাতি গঠনের পথে এটা একটি বিরাট অন্তরায় হিসেবে থেকে গেলো। পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করলাম, সেটাকে আরো একটু পরিবর্তিত করে

www.pathagar.com

বলা হলো যে, আমাদের দেশে একদল লোক হচ্ছে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি আরেক দল হচ্ছে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি এবং এই দুই শক্তির মধ্যে কোন ধরনের আপস হতে পারে না। স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে যাদেরকে চিহ্নিত করা হয়, তাদের নির্মূল করা ছাড়া এই দেশের স্বাধীনতা সংহত করা সম্ভব নয় বলেও প্রচার করা হয়ে থাকে। অথচ আমরা লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশের উদ্ভবের পর যদিও এই দ্বন্দ্বটি তীব্র করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল, তৎসত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান তার দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত বজায় রাখা জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। যে কারণে তিনি যারা পাকিস্তানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাদেরকে দেশগঠনের কাজে আত্মনিয়োগের আহবান জানিয়েছিলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে দাবী উঠেছিল, সেই দাবীটাও তিনি প্রত্যাহার করেছিলেন এবং সেটা করেছিলেন পাকিস্তানের স্বীকৃতির বিনিময়ে। নবগঠিত রাষ্ট্রটির স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন অবস্থা কাটানোর প্রয়োজন ছিল এবং আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশকে একটি স্বীকৃত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার কূটনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। সে কারণে যে পাকিস্তানীরা আমাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে, সেই পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের স্বীকৃতিটা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল এবং এই স্বীকৃতিটা আদায় করতে গিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি'র সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র দূতের ভূমিকা পালন করেছিল। সেসব দেশের নেতারা বাংলাদেশে এসে শেখ মুজিবুর রহমানকে ঐ সম্মেলনে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেই আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে শোনা গিয়েছিল, তার মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যই এই সিদ্ধান্তে নাখোশ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ভারতের শাসকগোষ্ঠী ও বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও শেখ মুজিবের এই সিদ্ধান্তে বিব্রত বোধ করেছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব লাহোরে গেলেন, শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিলেন এবং পাকিস্তানও তার লাহোর সফরের আগে আগেই বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিল। একজন রাষ্ট্রনায়ককে যখন একাই রাষ্ট্রের উদ্ভব থেকে তার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে হয়, তখন তাকে অনেক সময় কিছু তিক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সেটা হয়তো হুজুগী বা পুপুলিস্টদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, কিন্তু জাতির বৃহত্তর মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। তখন সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ বিভাজনটি আজ পর্যন্ত গেলো না। সম্প্রতি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে চারটি দলের জোট গঠিত হয়েছে। সেই জোট গঠনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকে আবার নতুন করে স্বাধীনতার সপক্ষ বিপক্ষ বিতর্কটিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বিতর্কটি চাঙ্গা করার পেছনে যে একটি বিরাট অভিসন্ধি কাজ করছে তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। আমরা যদি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারি, তাহলে কিছুতেই জাতির নিরাপত্তা ও অস্তিত্বকে বিঘ্নমুক্ত করতে পারবো না। আজকে কী উদ্দেশে, কী কারণে সেই পুরনো বস্তাপচা বিভাজনমূলক বক্তব্য ও শ্লোগানকে আবার নতুন করে চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটার গূঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য আমাদেরকে বুঝতে হবে। জাতি যদি সেটা বুঝতে ভুল করে, তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্নই থেকে যাবে।

আফতাব আহমাদ :

একটি বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করা দরকার। সেটি হচ্ছে যে কোন দেশের মুক্তি সংগ্রাম বা রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়ে দেশের শতকরা একশ' ভাগ মানুষ কখনোই একমত পোষণ করতে পারে না এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নেও দেশের মানুষ সকলেই যে একটি মত পোষণ করবে, তা ভাবা একটি কল্পনার বিষয়মাত্র। পৃথিবীর ইতিহাসের দিক যদি আমরা তাকাই

www.pathagar.com

তাহলে দেখবো যে দেশে দেশে যেসব মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তি সংগ্রাম হয়েছে, সেখানে দেখা গেছে, আদর্শিক প্রশ্নে এসে কে কতটুকু রাজনৈতিক ঝুঁকি নেবে, কে কতটুকু বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের পক্ষে যাবে, এ নিয়ে নানা ধরনের মতানৈক্য, মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। শেষ বিশ্লেষণে এসে দেখতে হয়, যখন শত্রুমুক্ত হয়ে যায় দেশটি বা দেশের সামনে যখন সেই ইস্যুগুলো থাকে না, দেশ গঠন করার ও দেশ বিনির্মাণের প্রশ্ন যখন আসে, তখন দেশের মধ্যকার এই সমস্ত বিভাজন রেখাকে, যেগুলোকে সাধারণত কৃত্রিম বিভাজন রেখা হিসেবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন, সেগুলোকে মুছে ফেলা হয়। আসুন আমরা একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের ওপর দৃষ্টিপাত করি। আমাদের অনেকেরই হয়তো ধারণা যে, ১৭৭৬ এর ৪ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স হয়ে গেল, আর অমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়ে গেল। কথাটা অত সহজ এবং সরল নয়। মূলত উত্তর আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ ১৭৭৫ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে এবং সেই স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত চলে। এর মাঝখানে ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই তারা ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স এডপ্ট করে এবং এডপশনের পর পর্যায়ক্রমে এক এক রাজ্য স্বাক্ষর করে। সকলে একযোগে সম্মিলিতভাবে স্বাক্ষর করে। এই ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্সের পক্ষে মত তৈরী করার জন্য যে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল, যে সহমত তৈরী করতে হয়েছিল, যে বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, জাতির মধ্যে ঐক্যের যে প্রাণস্রোত সৃষ্টি করতে হয়েছিলো তা অতি সহজ ও চাট্টিখানি ব্যাপার ছিলো না। ১৭৮৭ তে যখন সংবিধান রচিত হয় তাও হঠাৎ করে হয়নি। মনে রাখতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি কনফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে। কনফেডারেশনের অভিজ্ঞতা খুব সুখকর ছিলো না বিধায় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎগণ একটি অর্থবহ ও কার্যক্ষম রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। এ থেকেই রাষ্ট্র চিন্তা বিষয়ক লেখাঝোকার ধুম পড়ে যায়। একটি উন্নততর রাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন কীভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে– বিশেষ করে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এটিই ছিলো কেন্দ্রীয় চিন্তা। আর এ চিন্তারই সার্থক ফসল হচ্ছে Federalist Papers যা আমেরিকান রাষ্ট্র চিন্তাকেই শুধু নয়, বিশ্বব্যাপী ফেডারেল রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ার পূর্ব শর্তসমূহ কী কী হতে পারে এবং তা কীভাবে পূরণ করা যেতে পারে যে সম্পর্কেও একটি দার্শনিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। Federalist Papers রচিত হওয়াতেই জনমনে সাড়া জাগানো সম্ভব হয়েছিলো এবং রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় জনগণের অর্থবহ অংশকে অংশগ্রহণ করানো সম্ভবপর হয়েছিলো। Federalist Papers ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার ভিত্তি তৈরী করে ১৭৮৭ সালে সংবিধান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হলেও সংবিধান বলবৎ করার জন্য সকল রাজ্যের Ratification কে পূর্ব শর্ত হিসেবে ধার্য করা হয়েছিলো। এ প্রক্রিয়া ১৭৮৯ এ সমাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াগুলো যদি আমরা অনুসরণ করি, তাহলে বুঝতে হবে, জাতি গঠন প্রক্রিয়া কত কঠিন, কত কঠোর।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি কাকতালীয় ঘটনা ঘটে গেছে। আমরা ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রসঙ্গে এবার আসতে পারি। কারণ, এটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশে ১৯৭১-এর মুক্তিসংগ্রাম হঠাৎ করে জন্মলাভ করেনি। অনেক বলার চেষ্টা করেন যে, এটি হচ্ছে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতার একটি পরিণতি। আমি অত্যন্ত বিনয়ের তাঁদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করি। ১৯৭১-এর আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে ১৯৫২ এর চেতনা ও প্রেরণা পরিপুষ্ট করেছে। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু ১৯৭১-এর রাজনীতির যে মূল ফোকাস, রাজনীতির যে মূল থ্রাস্ট, তা বুঝতে হলে ১৯৬৮-৬৯ এর গণসংগ্রামকে তার সকল মাত্রায় বুঝতে হবে। কারণ ১৯৭১ কে পরিপুষ্ট করেছিল ১৯৬৯-এর গণসংগ্রাম এবং গণ অভ্যুত্থান। ১৯৬৯ এ প্রথমবারের মত প্রকাশ্যে এদেশের মানুষ ঘোষণা দিল যে, পাকিস্তানী রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে যদি তাদের জীবনের স্বপ্ন, তাদের আশা আকাংক্ষা পূরণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তারা একটি পৃথক রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব কামনা করে। ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের শ্লোগান ছিল– 'শ্রমিক কৃষক অস্ত্র ধর, পূর্ববাংলা

www.pathagar.com

স্বাধীন কর'। এই শ্লোগান আওয়ামী লীগের শ্লোগান ছিল না। এই শ্লোগান তথাকথিত বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের শ্লোগান ছিল না। এই শ্লোগান ছিল বাংলাদেশের নিপীড়িত কৃষক-শ্রমিক মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের শ্লোগান। এইসব কর্মীরা আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে ডান-বাম বিভিন্ন সংগঠনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু মূল কথা হল, সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে যখন এই শ্লোগান উত্থিত হয়, তখন রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং যার ফলে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের পর, যে গণ অভ্যুত্থানের ফলে শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসির আসামীর অবস্থান থেকে মুক্তি দিয়ে মুক্ত নাগরিক হিসেবে আইয়ুব খাঁ আলিঙ্গন করে নিলেন গোল টেবিল বৈঠকে। সেই শেখ মুজিবুর রহমান জনসমাবেশে এসে বলতে শুরু করলেন, 'আর নয় জ্বালাও, পোড়াও, এবার চাই শান্তি শুধু শান্তি আর শান্তি'। এই শান্তির বাতাবরণে সেদিন মানুষের মধ্যে যে জঙ্গী চেতনা জাগ্রত হয়েছিল, সেই চেতনাকে ভোঁতা করে দেয়ার একটি প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি। উদ্দীপ্ত ১৯৬৯-এ যে সামাজিক শক্তিকে আনলীশ করা হয়েছিল, সেই সামাজিক শক্তি কালানুক্রমে ১৯৭০ এর নির্বাচন, নির্বাচনপূর্ব যে জলোচ্ছাস, যে গোর্কী বাংলাদেশের মানুষের বৈষয়িক সর্বনাশ সাধন করে মর্মমূলে আঘাত হেনেছিল, সেসব শুধুমাত্র চেতনাগত দিক থেকেই নয়, বাস্তব অবস্থার দিক থেকেও প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, পাকিস্তান মূলত ছিলো দু'টি ভিন্ন রাষ্ট্র, দুটি ভিন্ন জাতি। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগ এককভাবে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল জাতীয় নির্বাচনে, তখন আওয়ামী লীগের মধ্যে বৃহৎদলীয় দাম্ভিকতা এসে পড়ে। যার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ কোন পর্যায়েই অন্য রাজনৈতিক দল তথা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দলগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। আওয়ামী লীগ ধরে নিয়েছিল যে, সমগ্র দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে এককভাবে দেশ গঠণ এবং দেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেছে। এখানে হচ্ছে আমি বলব আমাদের ইতিহাসের মূল সংকট।

আমরা লক্ষ্য করেছি, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম তারিখে যখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবি করে দেয়া হয়, তারপর থেকে যে জঙ্গী আন্দোলন এখানে শুরু হয়, সেই আন্দোলনের লাগাম টেনে ধরার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের সে কি প্রাণান্তকর চেষ্টা এবং দেখা গেছে, ফরাসী দেশের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা লামোঁদ- এর একজন সাংবাদিকের কাছে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির উদ্দেশ্যে সানুনয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বলে বসলেন ঃ "পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গ কি বোঝেন না যে, আমি হচ্ছি তাদের শেষ ভরসা, আমি না হলে এখানে কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে নেবে। তারা কেন আমার সাথে আপসরফা করছেন না?" এ কথা বলার মধ্য দিয়ে মুজিবুর রহমানের রণনীতি, রণকৌশল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান যখন পাকিস্তানের মেহমানদারি গ্রহণ করে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে কারাবরণ করেন; বুঝতে হবে, তাঁর রাজনৈতিক স্ট্রাটেজীটা কী ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান যদি সুস্পষ্টভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশকে পাকিস্তানের ইন্টারনাল কলোনী মনে করতেন এবং সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে যদি রাজনৈতিক রণনীতি, রণকৌশল প্রণয়ন করে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাতেন, আর, আমরা সম্মিলিতভাবে একটি জাতীয় সহমতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতাম তাহলে আজকে রাজনীতির ক্ষেত্রে যে বিভাজন রেখা সৃষ্টি হয়েছে, আজকে স্বাধীনতার সপক্ষ-বিপক্ষের নামে যে নতুন ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করছি, এই তৎপরতা হয় তো আমরা প্রত্যক্ষ করতাম না। একটি জিনিস আমার মনে হয় এখানে প্রণিধান করার আছে। আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের কথা জানি- তা থেকে একটি নজিরও আমরা দিতে পারব না, যেখানে আমরা দেখব যে, জাতীয় নেতা একদিকে যেমন আত্মসমর্পণ করেছেন শত্রুপক্ষ বা প্রতিপক্ষের কাছে, অপরদিকে তার পরিবার-পরিজনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করে এমনকি কন্যার সন্তান প্রসবের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে

www.pathagar.com

তাদেরকে লালনপালন করা হয়েছে। আমরা দেখেছি, কিইল্‌সুং-এর পবিবার কীভাবে নির্যাতিত হয়েছে, তার পিতাকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। মাওসেতুংয়ের স্ত্রীকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে। লেনিনের ভাইকে কীভাবে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের কাউকে স্পর্শ করা হয়নি। এই প্রসঙ্গটি আমি এ আলোচনায় আনতে চাই, কারণ স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমানের নিজেরই যথার্থ উপলব্ধি ছিল যে, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগঠিত করার যে মহাযজ্ঞের প্রয়োজন সেই মহাযজ্ঞে একজন অনুঘটকের ভূমিকাটিই শুধু পালন করেছিলেন, কিন্তু যেদিন মূল নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল, অর্থাৎ এ দেশের ভুখানাঙা মানুষ, এ দেশের মুক্তিকামী জনতা যেদিন অস্ত্র তুলে নিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শপথ করেছিল, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাগ্র মেদিনি', সেদিন রণক্ষেত্রে মূল নায়ক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অনুপস্থিত। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্ট্যানালি উলপার্টের 'জুলফি ভুট্টো অব পাকিস্তান' গ্রন্থটি যদি আমরা পাঠ করি, যেটি একটি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ, সেই গ্রন্থে আমরা দেখব, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী জিন্দানখানা থেকে বেরিয়ে আসার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জুলফিকার আলী ভুট্টোকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেল স্টেট হিসেবে টিকিয়ে রাখা যায় কিনা তা বিবেচনা করার প্রস্তাব। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য তিনি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এসে বলেছেন, 'ভুট্টো সাহেব, তুমি সুখে থাকো, আমার দেশ এখন আলাদা হয়ে গেছে। অতএব, তোমার সাথে আর আমার মিল হবে না'। এর কারণ হচ্ছে, তিনি পাকিস্তানী কারাগার থেকে বেরিয়ে যে বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছেন সেই প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ডিক্টেট করেছে যে, পাকিস্তানের সাথে আর সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে বিশ্ববাসীকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, বাংলাদেশ তখন ছিল ইন্দোনেশিয়ার পর দ্বিতীয় বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল, তারা শুধু সীমান্তের ওপারে গিয়েই মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিল, এই বক্তব্যটি অতি সরলীকরণকৃত। যারা এ ধরনের সরলীকরণ করেন, তারা বাংলাদেশের চেতনার মর্মমূলে আঘাত করেন। এটি হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্রের নীলনকশার একটি অংশ। কারন, ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র চিরদিন চেয়েছিল, পাকিস্তানকে ভাঙতে বা দ্বিখণ্ডিত করতে। আর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি বিশেষ চক্র চিরদিন চেয়েছিল বাঙালীপনা ফলিয়ে বাঙালীত্বের চাপ প্রয়োগ করে অখণ্ড পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে এবং কেবল সে কারণেই ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নেগেসিয়েশন করে যাচ্ছিলেন। অখণ্ড পকিস্তান টিকিয়ে রাখার জন্য আওয়ামী লীগের এবং শেখ মুজিবের তরফ থেকে সর্বশেষ যে খসড়া প্রস্তাব ইয়াহিয়ার কাছে জমা দেয়া হয়েছিল তা আমাদের স্বাধীনতার দলিল সংক্রান্ত ১৫ খণ্ডবিশিষ্ট গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করা আছে। তাতে দেখা যায় যে, অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন। সে কারণেই ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি উপলব্ধি করেছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের একাংশ পাকিস্তানে হয়ত বাঙালীরাজ কায়েম করতে চেয়েছে কিংবা পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেল স্টেট হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে, মার্কিন কনফেডারেল স্টেট যেমন পরবর্তীকালে ফেডারেশনে রূপান্তরিত হয়েছে, পাকিস্তানের ঐ কনফেডারেল স্টেটও হয়ত পরবর্তীতে পুনরায় ফেডারেল স্টেটে রূপান্তরিত হবে সেই আশঙ্কা থেকে তারা গোড়াতেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির জন্য একদিকে যেমন সরাসরি সামরিক বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, আরেকদিকে তারা নানা ধরনের নিয়ন্ত্রিত বাহিনী তৈরী করেছে মুক্তিযুদ্ধের কমান্ড স্ট্রাকচার এবং মিলিটারী হায়ারারকিতে গোলাযোগ সৃষ্টি করার জন্য। একদিকে মুজিব বাহিনী তৈরী করেছে, আরেকদিকে মস্কোপন্থী বলে পরিচিত যারা, তাদেরকে কেরালায় নিয়ে বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে আলাদা একটি গোষ্ঠী তৈরী করেছে। জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে সিএনসি স্পেশাল বলে আলাদা একটি গোষ্ঠী তৈরী করেছে। একদিকে ভিত্তি ফৌজ, আরেকদিকে মেলাঘরকে কেন্দ্র করে খালেদ মোশররফের নেতৃত্বে FF বা ফ্রীডম ফাইটার গোষ্ঠী তৈরী করা হয়। আবার খালেদ মোশাররফের অনুরাগী তরুণদের জন্যও

www.pathagar.com

পৃথক প্রশিক্ষণ ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে সিপিএম-এর তত্ত্বাবধানে তথাকথিত চীনপন্থী বলে যারা পরিচিত, তাদেরকে পৃথক প্রশিক্ষণ দিয়ে আরেকটি পৃথক সশস্ত্র গোষ্ঠী তৈরী করার চেষ্টা করা হয়েছিল। অর্থাৎ, এককথায়, একটি সিঙ্গল কমান্ডের অধীনে এককভাবে একটি সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। এদের অনেকেই দেশে ফিরে এসে দেশে যারা অবস্থান করছিলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যারা সহায়তা দিয়েছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যারা জায়নামাজে বসে মোনাজাত করেছিলেন, অশ্রু ফেলেছিলেন যারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রোজা রেখেছিলেন, মানত করেছিলেন, তাদেরকে চরমভাবে অপমান ও অপদস্থ করে ঘোষণা করা হল যে, এরা সকলেই দালাল। এই কাজটি করার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্থায়ীভাবে একটি লড়াকু সৃজনশীল জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করা।

এই দ্বিখণ্ডিত জাতিকে পুনরেকত্রীকরণের কোন প্রয়াস মুজিব আমলে গৃহীত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায় করা কিংবা মুসলিম বিশ্বে যেভাবে মুজিবুর রহমান কূটনৈতিক স্বীকৃতির জন্য ডিপ্লোম্যাটিক অফেন্সিভে গিয়েছিলেন, এইসব কিছু ছিল তার ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। কারণ, আমরা পরবর্তী পর্যায়ে লক্ষ্য করেছি যে, ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য তিনি একদলীয় ব্যবস্থায় গিয়েছিলেন এবং একদলীয় ব্যবস্থায় তিনি সকল ক্ষমতা নিজ হাতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মুজিব যে ভিন্নমত পোষণ করতেন এবং বহুবাচনিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করতেন না তা পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনায় আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

মাহবুব উল্লাহ :

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে নিরঙ্কুষ করতে চেয়েছিলেন, তিনি তাঁর একক আধিপত্য রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তার প্রমাণ সেই শ্লোগান 'এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। কিন্তু আজকে ভাববার বিষয় এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় হল প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ক্রিয়া আরেকটি বিক্রিয়ার জন্ম দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান হয়ত তাঁর ক্ষমতাকে নিরঙ্কুষ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই নিরঙ্কুষ করার প্রক্রিয়ায় গিয়ে তিনি যেসব কৌশল, যেসব ডিপ্লোম্যাটিক অফেন্সিভ, প্রতিপক্ষের প্রতি যে অলিভ ব্রাঞ্চ তিনি দেখিয়েছিলেন তেমনটি করতে গিয়ে এমন কিছু অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন, যেখানে আজকে যারা স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ বিতর্ক তুলছেন, তাদের সঙ্গে তাঁর কর্মভঙ্গীর একটা পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করি। আজকে এরা মূলত আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে একটা ইসলাম বিরোধী যুদ্ধ হিসেবে বা ইসলাম বিরুদ্ধ প্রয়াস হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। মনে হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ করা মানে ইসলামকে ত্যাগ করা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম, বিশ্বাস বা ঈমানকে ত্যাগ করা। বাস্তবে কি তাই ছিল– মোটেও তা নয়। কারণ আওয়ামী লীগ সত্তরের নির্বাচনের মেনিফেস্টোতে ঘোষণা দিয়েছিল, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে কোরআন এবং সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করবে না। ধর্মের প্রতি এদেশের মানুষের দুর্বলতাকে অনুধাবন করেই আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো রচনা করা হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যারা নামাজ পড়েছিলেন, রোজা করেছিলেন, তারা কি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিলেন? এই প্রসঙ্গে আমি হুমায়ূন আহমেদের 'আগুনের পরশমনি' চলচ্চিত্রটি, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের দাবীদাররা যেটি তাদের প্রচার মাধ্যমে প্রচার করছে, তাতে আমরা একটি চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাই। আহত মুক্তিযোদ্ধা বদিকে আশ্রয় দিয়েছে একটি পরিবার। কামনা করা হচ্ছে স্বাধীনতা দেখার আগে তার যেন মৃত্যু না হয়। তাকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। লক্ষ্য করা গেল ফজরের নামাজের সময়ে উদাত্তকণ্ঠে মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম' উচ্চারিত হবার সাথে সাথে সেই মুক্তিযোদ্ধার জীবনাবসান ঘটল। এই দৃশ্যটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে। এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ আমাদের চিরায়ত বিশ্বাসের সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটা অদ্ভূত, সফল সার্থক সমন্বয়

www.pathagar.com

ঘটিয়েছেন। এ ধরনের দৃশ্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কী, আমাদের জনগণের চেতনা কী-সেটা তুলে ধরেছে যা তারা উপলব্ধি করতে পারেন না। সেদিন যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু জায়নামাজে দাঁড়িয়ে নফল নামাজ আদায় করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি কামনা করে, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় কামনা করে– তারা কি মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ শক্তি ছিলেন? আজকে যারা এই ধর্মীয় বিশ্বাস চেতানাকে বিকৃত করে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছেন, তারা বোধ হয় ইতিহাসের বাস্তবতাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আজকে প্রশ্ন উঠেছে যে, সাতচল্লিশের চেতনার সাথে একাত্তরের চেতনার কি দুস্তর ব্যবধান আছে? এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমারেখা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্নে অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতা দিবসের পূর্বদিন পর্যন্ত যে ভূখণ্ড নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল, সেই ভূখণ্ডই হবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যদি পাকিস্তান সৃষ্টি না হত, ৪৭ সালে, তাহলে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টি সম্ভব হত না। কারণ আমরা যদি বৃহত্তর ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ হয়ে যেতাম, তাহলে আমাদের পক্ষে আর কখনই একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চিন্তা করা সহজ হত না। আজকে ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গীভূত অনেক রাজ্যেই স্বাধীনতা-মুক্তির জন্য, আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই চলছে। তারা যে কী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লড়াই করছেন, সেটা বর্ণনা করা কঠিন। আজ কাশ্মীরীদের কী অবস্থা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যের জনগণ কী নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। কিন্তু তাদের স্বাধীনতা অর্জনের কাজ কিন্তু খুব সহজ নয়। সুতরাং, সাতচল্লিশের ঘটনাকে অস্বীকার করে একাত্তরের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। সাতচল্লিশের সাথে একাত্তরের একটা বিরোধও সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের জনপ্রিয় জাতীয় নেতারা– শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ প্রত্যেকেই মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁদের পক্ষে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁরা যদি সেদিন এই অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনুভূতি না বুঝতেন, তাহলে একাত্তরে এসেও তাঁরা এই অঞ্চলের জনগণের অনুভূতিকে বুঝতে পারতেন না। আমরা লক্ষ্য করেছি এই দেশের কম্যুনিস্টরা সবসময় ব্যাখ্যা দিয়েছে, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের ফলে দ্বিজাতি তত্ত্বও ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং পাকিস্তান ছিল একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে না।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যদি তৎকালীন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য অধিকারের প্রতি মর্যাদা দিত, তাহলে হয়ত একাত্তরের ঘটনা ঘটত না। সেদিন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর একগুঁয়েমির কারণেই মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তাই একাত্তর আর সাত চল্লিশের বিরোধের কথা বলে ডামাডোল সৃষ্টি করার কোন অবকাশ নেই। আসলে আমাদের ভারত থেকে আলাদা হওয়ার পেছনে কারণটা কী? কারণটা বোঝা যাবে 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার' নামে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ থেকে। যেটি গৌতম ঘোষ ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *নিম্নবর্গের ইতিহাস* গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং এতে তিনি নানা ঘটনা, নানা সংবাদপত্র থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দেয়ার চেষ্টা করেছেন। একটি উদ্ধৃতি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। উদ্ধৃতিটি তারাকৃষ্ণের 'রাজভক্তি বিষয়ক' প্রবন্ধ থেকে। "পূর্ব্বকালে যখন এই দেশ হিন্দু জাতির শাসনাধীন ছিল তখন রাজগণের পক্ষপাতিতা দোষে জাতিবিশেষ অপর সমস্ত জাতির উপর সম্পূর্ণ প্রভূত্ব করিতেন, ঐ সকল জাতিকে স্বর্গ বা নরকগামী করণের কর্ত্তা ছিলেন। ... যখন এই রাজ্য যবনদিগের হস্তে ছিলো, তখন তাহারা হিন্দুবর্গকে নাস্তিক ও অধ্যার্মিকের শেষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। স্বজাতি প্রজাবর্গের প্রতি যাবতীয় বিষয়েই অনুগ্রহ, হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি সর্বতোভাবেই নিগ্রহ করিতেন। ... ব্রিটিস জাতির

www.pathagar.com

রাজনিয়মাবলীতে এই সকল দোষের লেশও নাই, তাঁহারা আপন জাতীয় এবং এদেশস্থ ডোমপ্রভৃতি যৎপরোনাস্তি নীচ ব্যক্তিকে বিচারকালে সমান দেখেন। ... ঐ জাতির পক্ষপাতশূন্যতা গুণের অধিক প্রশংসা কী করিবো?" (পৃ. ১৩৪-৬)। এ থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর ব্রিটিশপ্রীতিটা কতো প্রবল ছিলো। আরেক জায়গায় তিনি উদ্ধৃত করছেন, যেটি ভোলানাথ চক্রবর্তীর লেখায় ছিলো। সেটা হচ্ছে, 'সকল বিষয়েরই সীমা আছে, যখন মুসলমানদিগের অত্যাচার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন জগদ্বীশ্বর তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় বিধান করিলেন। ... যেদিন এদেশে ব্রিটিশ পতাকা প্রথম উড্ডীন হয়, সেইদিন হইতেই এদেশের পুনঃ সৌভাগ্যের সূত্রপাত্র হইয়াছে। বলুন দেখি, যদি এই পর্যন্ত যবনাধিকার অব্যাহত থাকিত, তবে আজ দেশে কী দশা ঘটিত? অতএব একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, পরমেশ্বরের মঙ্গলের জন্য ইংরেজ জাতিকে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। ব্রিটিশ অধিকারে যবনদিগের অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে। ... যবন শাসনের সহিত ব্রিটিশ শাসনের তুলনাই হইতে পারে না। অন্ধকার ও আলোতে যত অন্তর, দুঃখ ও সুখে যত প্রভেদ, যবনশাসন ও ব্রিটিশ শাসনে তদপেক্ষাও অধিক প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। [ভোলানাথ চক্রবর্তী; সেই একদিন আর একদিন অর্থাৎ বঙ্গের পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা কলকাঁতা, ১৮৭৬।] এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা স্পষ্টত উপলব্ধি করতে পারছি, ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতে এদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর চেতনা এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর চেতনার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য ও ভেদরেখার সৃষ্টি হয়েছিলো। এই ভেদরেখা সহজে মুছে যাবার নয়। তার প্রমাণ আমরা আরেক জায়গায় পাই। উপরোল্লিখিত একই গ্রন্থে 'ভগ্নাংশের সমর্থনে ঃ দাঙ্গা নিয়ে কী লেখা যায়?' শীর্ষক জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের একটি লেখা ছাপা হয়। সেই প্রবন্ধ থেকে আমি এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করতে চাই। সেখানে লেখা হচ্ছে– "এই সমস্ত থেকেই অবশ্যই মুসলিম সম্পর্কে আতংক তৈরী হয় এবং দাবী ওঠে তাকে নিরস্ত করবার। তার ভোটাধিকার কেড়ে নাও। তার সংস্কৃতি হরণ কর। আমাদের নাম, আমাদের ভাষা, আমাদের পোশাক নাও। এই দাবীই উচ্চকিত হয়ে ওঠে যে, যদি মুসলিমরা এই দেশে থাকতে চায়, তাহলে আমাদের মত করে থাকতে হবে। আমরা কারা? এটা কখনই পরিস্কার করে বলা হয় না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে যেন আদৌ সেটাতে কিছু এসে যায় না। 'হিন্দুস্তানমে র‍্যাহনে হ্যায় তো হামসে মিল কর রাহনে হোগা। হিন্দুস্তান মে র‍্যাহনে হ্যায় তো বন্দে মাতরম কাহনে হোগা।'" সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হিন্দু মানসের মধ্যেও একটা চিন্তা কাজ করছিলো, সেই চিন্তাটা হচ্ছে– যদি মুসলমানরা ভারতবর্ষে থাকতে চায়, তাহলে তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে। তাদেরকে বন্দে মাতরম বলতে হবে। আমার মনে হয়, এই অনুভূতি সহজে কাটবার নয়। রুশ বিপ্লবের ৮০ বছরের ইতিহাসে উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, তুর্কেমেনিস্তান এবং আজকের চেচনিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের ধর্মীয় চিন্তা চেতনা বিস্মৃত হয়নি। চেচনিয়ার যুদ্ধ তার প্রমাণ। একটি সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও সেখানে মুসলিম চেতনা কীভাবে এতো শক্তিমান হয়ে উঠলো, সেটা দেখে অবাক হতে হয়। আজকে তাই, আমরা যদি মনে করি, বাংলাদেশ হয়ে গিয়ে আমরা রাতারাতি সেক্যুলার হয়ে গেলাম, ধর্মকে ভুলে গেলাম, আমার মনে হয় এখানে আমাদের বিদ্বৎজনদের চিন্তার মধ্যে একটা বিভ্রান্তি আছে। নীরোদ চৌধুরী একটা উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন। তার মন্তব্যটি ছিলো এই 'হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্ধুত্ব হতে পারে, সদ্ভাব হতে পারে, সহমর্মিতা হতে পারে, একে অপরের মধ্যে আদান-প্রদান হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সেই ধরনের সহমর্মিতা, সেই ধরনের আদান-প্রদান আশা করা যায় না। কারণ একটাই, সাতশ' বছর এদেশে মুসলমানরা শাসন করেছিলো। আর দিল্লীতে যখন মুসলমানরা শাসন করেছিলো, তখন হিন্দু রাজন্যবর্গ, অমাত্যবর্গ এমনকি রাজকর্মচারীদেরকে করজোড়ে সেই বাদশা, রাজা

www.pathagar.com

বা সুলতানের সামনে দাঁড়াতে হতো। এই বেদনা, এই গ্লানি তারা কখনো ভুলে যায়নি. আজকে একজন সফল রাষ্ট্র নায়কের কাজ হবে. এই ধরনের অনুভূতিকে কীভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিরসন করা যায় তার চেষ্টা করা। শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শ্লোগান দিয়ে বিভাজনকে বাড়িয়ে তুলে এবং মানুষকে আরো বেশি করে চরমপন্থার পথে যেতে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান আসবে না। যারা এটা করছেন, তারা বাংলাদেশের মঙ্গল নয়, অমঙ্গলই করছেন।

আফতাব আহমাদ :

নীরোদ চৌধুরী ভারত সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরেকটি চমৎকার কথা বলেছেন যে, ভারতকে বুঝতে হলে হিন্দুকে বুঝতে হবে। হিন্দুর মনকে বুঝতে হবে। তার Hinduism গ্রন্থের মুখবন্ধে এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনি এই বলে অভিব্যক্ত করেছেন ঃ "For one thing, more can deal with India or understand the social and cultural life of the people of the country, without a knowledge of Hindusim" আমরা ভারতের যে কোন পণ্ডিতের কথাই বলি না কেন প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লক্ষণীয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এত বড় জ্ঞানবৃক্ষ, এত বড় একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, তিনি যখন ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বলেন, বাঙালী সংস্কৃতির কথা বলেন, তখন তিনি সুস্পষ্টভাবে তার 'ভারত সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলছেন যে, মুসলমানের সংস্কৃতি বাঙালীর সংস্কৃতি নয়। অর্থাৎ হিন্দুর সংস্কৃতি হচ্ছে বাঙালীর সংস্কৃতি। সুনীতি বাবু বলছেন, 'আকারে যেমন, প্রকৃতিতেও তেমনি বাঙ্গালী ভারতীয়ই বটে। বাঙ্গালী তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতে হয়তো চার আনা ইউরোপীয়, তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে, এবং আট আনা ভারতীয়; বাকী চার আনায় সে বাঙ্গালী এবং এই চার আনার মধ্যে আবার অনেকটা ভারতীয়ত্বের বাঙ্গালা বিকারমাত্র, বাকীটুকু খাঁটি বাঙ্গালী, অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙ্গালী। বাঙ্গালী জাতির এক অংশে আবার ইসলামের প্রভাব আছে– সে প্রভাব কতটা আছে, তাহার নির্ণয় বাঙ্গালী মুসলমান ঐতিহাসিকেরাই করিবেন, তবে তাহা খুব বেশী নহে'। একই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'ইংরেজ সরকারের প্ররোচনায় ঘরের মুসলমানের চাপও আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালার হিন্দুদের উপর অনুচিত ও অন্যায়ভাবে এখন আসিয়া পড়িতেছে– ইংরেজানুগৃহীত মুসলমানের এখনকার এই দাপট, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই হানিকর হইবে'। পণ্ডিত সুনীতি চাটুজ্জ্যে 'বিষয় বিভ্রম' যাহাতে না ঘটে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া এক অভিনব তত্ত্ব দাঁড় করাইলেন। তাহার মতে, 'আমাদের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকে এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আমাদের যে আধ্যাত্মিক যোগ আছে, সেই যোগকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। .... ভারতীয় জাতীয়তার দোহাই পাড়িয়া যাহারা আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমাদের বাড়া ভাতে ভাগ বসাইতেছে, মুখের গ্রাসটি কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদের বাধা দিতে হইবে। কিন্তু সেই কারণে বাঙ্গালার বাহিরের ভারতের, নিখিল ভারতের সভ্যতাই যে বাঙ্গালার সভ্যতায় প্রতিষ্ঠা তাহা ভুলিলে চলিবে না।... উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা এবং তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য-অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর ভারতের আর্য্য ও অনার্য্যের ইতিহাস ও পুরাণ বঙ্গদেশের অধিবাসীরাও গ্রহণ করিল .... উত্তর ভারতের গাঙ্গের সভ্যতাই .... এই নবসৃষ্ট আর্য্যভাষী বাঙ্গালী জাতির জন্ম নীড় হইল। .... বাঙ্গালীর অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে আর্য্যমনের ছাপ পড়িল। ইহা তাহার পক্ষে মঙ্গলের কারণই হইল। আর্য্যমনের ব্রাহ্মণ্যের- এই ছাপটুকু, আদিম অপরিস্ফুট বাঙ্গালীকে একটি চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য দিল।... আর্য্যভাষী বাঙ্গালী জাতির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যখন বাঙ্গালী সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়, তখন কেহ বাঙ্গালীর নিজস্ব অনার্য্য সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই; তখন যে ছাঁচে বাঙ্গালী মন, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য-রীতিনীতি, শিল্প-সাহিত্য সবই ঢালা হইয়াছিল, তাহা ছিল উত্তর ভারতের বা নিখিল ভারতের সর্বজয়ী হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন) মন, ব্রাহ্মণ্য,

www.pathagar.com

বৌদ্ধ, জৈন, সমাজ-ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, শিল্প ও সাহিত্য। যে ছাঁচে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতিকে ঢালা হইল, মোটের উপর সেই ছাঁচ এখনও বাঙ্গালী সমাজে বিদ্যমান'। অপরদিকে বাঙ্গালী মুসলমান সম্পর্কে সুনীতি বাবু যে অপব্যাখ্যা দাঁড় করালেন তা কেবল জ্ঞানপাপীদের দ্বারাই সম্ভব। তার মতে, 'বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী মুসলমানদের বাঙ্গালী স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত, তাহাদের সন্তানরা ভাষায় বাঙ্গালীই হইত।... মুখ্যত ব্রাহ্মণ্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙ্গালী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। বাঙ্গালা দেশে যে মতের মোহাম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটি শরিয়তী অর্থাৎ কোরআন অনুসারী ইসলাম নহে'। অন্যত্র ইসলাম সম্পর্কে তার তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য এরকম, 'মুসলমানের ধর্ম সহজবোধ্য, তাহাতে হিন্দু অর্থাৎ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের Intellectualism বা অবধি মানসিকতা নাই বলিয়াই তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে আপাত গ্রহণীয় ছিল।... স্বাধীন মুসলমান রাজাদের অধীনে থাকিয়া বাঙ্গালা দেশ ভারতভর্ষের এক কোণে পড়িয়া ছিল এবং রুদ্ধবারি জলাশয়ের মত অবস্থা ছিল; বাহিরের জগতের সঙ্গে তাহার তেমন কোন যোগ ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, বাঙ্গালার পক্ষে আংশিকভাবে সমগ্র ভারতের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া সম্ভবপর হইল। দিল্লী-আগ্রার কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালার পক্ষে হিতকর হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। এ প্রসঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমান সম্পর্কে সুনীতি বাবু বিদ্বেষপ্রসূত অত্যন্ত বাজে ধারণার বশবর্তী হয়ে মন্তব্য করেন 'যদিও বাঙ্গালী জাতির অর্ধেকের উপর এখন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, [পণ্ডিত হয়ে সুনীতি বাবু জানার সামান্যতম চেষ্টাও করলেন না যে মুসলমান ধর্ম নামে কোন ধর্ম নেই। মুসলমানদের ধর্মের নাম ইসলাম] ইহা লক্ষণীয় যে অতি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সংস্কৃতি (অর্থাৎ আরবী, ফারসী ও উত্তর ভারতীয় মুসলমান মনোভাব বা বাস্তব সভ্যতা, রীতিনীতি এবং চিন্তা প্রণালী) বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনেও তেমন কার্যকর হয় নাই।... সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমান (কতকগুলো বিশেষ প্রান্তে, বিশেষ কতগুলো গোষ্ঠী বা পরিবার ব্যতীত), বিশিষ্ট মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল।... সম্প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানদের কেহ কেহ যেভাবে বাঙ্গালায় 'ইসলামী সংস্কৃতি' আনিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহার মধ্যে Positive অর্থাৎ সংগঠনকারী দিক অপেক্ষা Negative অর্থাৎ ধ্বংসকারী দিকটাই প্রবল'। এই যে বিভাজন ভারতীয় পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনরা ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে ইতিহাসের বিভিন্ন পাকে এবং বিভিন্ন মোড়ে তৈরী করেছেন– এ থেকে আমাদের বুঝতে হবে হিন্দুর এই হিন্দুর মন ও মানসিকতাটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বাঁচার অধিকারকে অস্বীকার করেই বেড়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের এই অঞ্চলের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় পঠিত ঔপন্যাসিক। কিন্তু তার 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন, ... ইস্কুলের মাঠে বাঙালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ'-এর কথা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ তিনি বাঙালী বলতে হিন্দুকেই বুঝিয়েছেন এবং এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলমান কখনও বাঙালী হতে পারে না। মুসলমান ধর্মকে তিনি মনে করেন বিজাতীয় ধর্ম এবং পাশাপাশি আরও একটি কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস পড়ে তাঁকে উদার ও অসাম্প্রদায়িক বলে যতটা মনে হতে পারে অনেকের কাছে, আসলে তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিলেন অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক ও অনুদার ব্যক্তি। হুগলী কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে তিনি 'বর্তমান হিন্দু মুসলমন সমস্যা' প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, হিন্দু-মুসলমানের মিলন কখনও হতে পারে না। কারণ 'মুসলমানের যদি কখনও বলে– হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেইদিন কেবল লুট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্বহানি করিয়াছে। বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সংকোচ মানে নাই'। তার মুসলিমবিদ্বেষ এত তীব্র ছিল যে, সকল রাখঢাকের

www.pathagar.com

বিসর্জন দিয়ে শরৎবাবু ঘোষণা দেন যে, মিলন হয় সমানে সমানে। শিখা সমান করিয়া যাইবার আশা আর যেই করুক আমি তো করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না ... হিন্দু মুসলমান মিলন একটি গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গাল ভরাণোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে নাই। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে।.... আমাদের একদল পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্ম ত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোশাক বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেয়া যে আকৃতি, সে পর্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার জো নাই ! ... অতএব, হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে।

শরৎচন্দ্রের মতে, 'হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এই দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। এ বিষয়ে তার সুস্পষ্ট অভিমত ছিল এরকম যে, 'হিন্দু-মুসলমান মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে তো সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানদের পরে।... জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান মিলনও সে জাতীয় বস্তু'। অতএব, মুসলমানদের প্রতি শরৎচন্দ্র কোন ধরনের কৃপা পোষণ করার বা মুসলমানদের তুষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না। এই সম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানকে সম্পূর্ণ কোণঠাসা করে ফেলেছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত এই মুসলমানরা ছিল খেটে খাওয়া কৃষক। এরা ছিল নির্যাতিত প্রজাকূল এবং এদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব সহানুভূতিশীল ছিল। স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন কমিনফর্ম সুস্পষ্টভাবে ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে সমর্থন করেছিল, এবং সেই মর্মে তারা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে নির্দেশও প্রদান করেছিল। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে যারা কম্যুনিজমের বাতাবরণে মূলত সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রাখার জন্য কম্যুন্স্টি সেজেছিলেন, তাদের ভূমিকা ছিল এরকম আর ত্যাগী পুরুষ কমরেড মুজফফর আহমদের মত যারা সত্যিকার অর্থে দেশের স্বাধীনতা, জাতির মুক্তি, জনগণের বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন, তারা সুস্পষ্টভাবে সেদিন মুসলিম সভ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করার জন্য। আমি কথাগুলো এই জন্য টেনে আনছি যে, যারা আজকে, বলার চেষ্টা করছেন যে, পাকিস্তান ছিল একটি ষড়যন্ত্রের ফসল, অতএব পাকিস্তান ইতিহাসের একটি বিকৃতি মাত্র- তাদের এই অপব্যাখ্যার জবাবে আজকে ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাকে আমাদের যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে হবে এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে প্রকৃত তথ্য বের করে নিয়ে আসতে হবে। আজকে যারা বলছেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ এবং বিপক্ষ বলে দু'টি শক্তি আছে, তাদের কাছে একটি সুস্পষ্ট প্রশ্ন আমার-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের যেসব দেশে জার্মানরা তাদের প্রভূত্ব বিস্তার করেছিল-ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, স্পেনসহ যে সমস্ত রাষ্ট্র বা দেশ তারা তাদের দখলে নিয়েছিল, সেসব রাষ্ট্র বা দেশের মানুষরা কী ভূমিকা পালন করেছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে যখন জার্মানীর দখলমুক্ত হয় এই সমস্ত দেশ। সেসব দেশে কি তারা স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ বলে কোন বিভাজনের উদ্ভব ঘটিয়েছিল? আমরা তো জানি, ভারতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে হিন্দু নেতৃত্বের মধ্যে মতভেদ ছিল; কিন্তু ভারত যখন রাষ্ট্রীয় বিনির্মাণ কাজে আত্মনিয়োগ করল, জওহরলাল নেহরু তো সেখানে স্বাধীনতার পক্ষ এবং বিপক্ষ বলে কোন অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করেননি।

আমাদের দেশে স্বাধীনতার পক্ষ এবং বিপক্ষ বলে জিকির তোলার চেষ্টা করার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমাদের এখানে সৃজনী ক্ষমতা যেহেতু অত্যন্ত সীমিত, বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত সংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির ছিল বলে তাদেরকে আরও কীভাবে অবদমিত, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল করে তোলা যায় সে জন্য ব্রাহ্মণবাদী ও তার ক্রীড়নকরা একটি গভীর ষড়যন্ত্র রচনা করেছে। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে আমরা দেখি, ১৯৭১-এর জুলাই মাসে শিলিগুড়িতে

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সম্মেলনে প্রথমবারের মত আওয়ামী লীগ তার ম্যানিফেস্টোর বিঘোষিত নীতিকে বিসর্জন দিয়ে– যে ম্যানিফেস্টোর কথা ডঃ মহাবুব উল্লাহ একটু আগেই উল্লেখ করলেন– যেখানে তারা অঙ্গীকার করেছিলেন যে, কোরআন এবং সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণীত হবে না– সেই ঘোষণাকে অস্বীকার করে তারা হঠাৎ করে সেক্যুলারিজমের একটি বক্তব্য নিয়ে আসলেন এবং সেই সেক্যুলারিজমের নামে তারা যে ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন, তার সাথে ইউরোপীয় ইতিহাসের অভিজ্ঞতার কোন মিল নেই। বাংলাদেশে যে সেক্যুলারিজম, যা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে চালাবার চেষ্টা হয়েছে, তা মূলত হচ্ছে ধর্মের ব্যঙ্গ করা, ধর্মহীনতাকে প্রচার করা, নাস্তিকতাকে প্রচার করা। সেক্যুলারিজমের অর্থ কিন্তু ধর্মকে ব্যঙ্গ করা নয়, ধর্মকে নাস্তিকতার পর্যায়ে পর্যবসিত করা নয়– ইউরোপের অভিজ্ঞতা তা বলে না। ইউরোপ সুস্পষ্টভাবে ধর্ম এবং রাষ্ট্র- এর দু'টি সীমানা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছে। তারপরও আমরা যে সমস্ত বড় বড় ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে জানি ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার রাষ্ট্র হিসেবে, সেখানে আমরা দেখি ধর্মের গুরুত্ব কত অপরিসীম। আসলে এই সেক্যুলারিজম হচ্ছে ইহজাগতিকতা বা ঐহিকতা, যাকে সর্ব ধর্ম ভাবনা হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইবেলে হাত রেখে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথগ্রহণ করেন। আমরা জানি, ব্রিটিশ অ্যাংলিকান চার্চের প্রধান হচ্ছে ব্রিটিশ রাজমুকুট। আমরা দেখি, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ধর্মযাজকরা এসে একদিকে যেমন রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে আর্শীবাদ করেন, পবিত্র বারি সিঞ্চন করেন, তেমনি আমরা দেখি রণাঙ্গনের দিকে যখণ সৈন্যরা অগ্রসর হয়, তখন বাইবেল হাতে প্রতিটি সৈন্যকে শপথ গ্রহণ করাত। অতএব, ধর্মের ভূমিকাকে অহেতুক খাট করে কিংবা ধর্মকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে আজকে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনুভূতির বিরুদ্ধাচরণ করতে চান, তারা মূলত বাংলাদেশকে একটি পরশ্রয়ী, পরনির্ভরশীল বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যবাদ নির্ভরশীল একটি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়– এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করে যারা এ দেশে রাজনীতি চর্চা করে স্বাধীনতার সপক্ষে-বিপক্ষ বলে একটি বিভাজন রেখা তৈরী করতে চান- আজকে সুস্পষ্টভাবে আমাদের নজর দিতে হবে এই নির্মূল কমিটির সাথে যারা জড়িত তাদের ভূমিকার প্রতি। কে এই কে এম সোবহান? যিনি ১৯৭১ সালে দখলদার বাহিনীর সময় পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের বিচারক হিসেবে শপথ নিয়েছেন, সেই কে এম সোবহানের মুখে স্বাধীনতার সপক্ষ-বিপক্ষ উচ্চারণ শোভা পায় না। কে এই কবীর চৌধুরী? কারণ, তাঁর কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটি সরকারের সেবা করা। আইয়ুব খাঁ থেকে শুরু করে ইয়াহিয়া, মোমেন খাঁ পর্যন্ত প্রত্যেককে তিনি সেবাদান করেছেন। তিনি আজকে যখন স্বাধীনতার সপক্ষ-বিপক্ষের কথা উচ্চারণ করেন, তখন প্রশ্ন করতে হবে– কেন তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে ১৯৭১-এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন? আজকে শামসুর রাহমান যখন তালেবানী হামলার শিকার হন বলে দাবী করেন, মিথ্যাচার করেন, তখন প্রশ্ন করতে হবে– মুক্তিযুদ্ধের সময় শামসুর রাহমানকে যখন আমি বলেছিলাম সীমান্তের ওপার চলে যেতে এবং আমি তাকে সাহায্য করব, কেন তিনি ঢাকার মাটিকে আঁকড়ে ধরে দৈনিক পাকিস্তানে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় রচনা করেছিলেন? এদেরকে এই কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়ার অর্থ এই নয় যে, আমরা উইচ হান্টিংয়ে বিশ্বাস করি।

আমি এ কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এই জন্য যে, মানুষ ঘটনার শিকার হয়ে অস্তিত্বের প্রয়োজনে একেকটি সময় একেকটি ভূমিকা গ্রহণ করে; কিন্তু যখন ঝড় থেমে যায়, যখন প্রলয় বন্ধ হয়, যখন মহামারী দূর হয়ে যায়, তখন মানুষকে স্থিত হতে হয়। তখন মানুষকে ভাবতে হবে, কী করে আবার নতুন করে পত্তন ঘটাতে হবে সভ্যতার। নতুন করে কীভাবে রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের সামনে বহু নজির রয়েছে। ভিয়েতনাম, কম্পুচিয়া কীভাবে পুনরেকত্রীত হয়ে পুনর্নির্মিত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা কীভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছে? খেমাররুজরা মহাহত্যাযজ্ঞ চালাবার পরও তাদেরকে

www.pathagar.com

সাধারণ ক্ষমা প্রদান করে কম্পুচিয়ায় ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশনের একটা নতুন পলিটিক্স প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশে আজকে ডান-বামের নামে যে বামাচারী পাপাচার করা হচ্ছে, সে কথা আজকে আমাদের মনে রাখতে হবে এবং সে জন্য আজকে আমাদের নজর দিতে হবে, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থগুলোকে চিহ্নিত করে সেই স্বার্থের পক্ষে এবং প্রতিকূলে কারা কাজ করছে, তা নির্ণয় করতে হবে। এর দ্বারাই নির্ণীত হবে স্বাধীনতার সপক্ষ এবং বিপক্ষ শক্তি কারা। ১৯৭১-এর যারা পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন বা পাকিস্তানের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, তা দিয়ে আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষ-বিপক্ষ নির্ণয় করা যাবে না। কারণ, বাংলাদেশ আজকে একটি বাস্তব সত্য। বাংলাদেশ আজকে রাষ্ট্র সংঘের সদস্য এবং বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যারা যাবে, তারাই হচ্ছে স্বাধীনতার শত্রু। এই রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনে ইবলিসের সাথেও হাত মেলাতে হবে।

মাহবুব উল্লাহ :

ডঃ আফতাব যে কথা বলেছেন, আমি সেই যুক্তিকে আরো নির্ভরশীল ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সি এ বেইলীর লেখা [C. A. BAYLY] Origins of Nationality in South Asia গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করতে চাই ঃ Discussions of the causes of religious and communal ritos have alway run into severe problems of logic and method. First, it is important to avoid the danger of assuming that whenever Hindus and Muslims or Sikhs and Muslims were in comflict, a significant number of people saw these events in communal terms. Certainly, it is not justifiable to class conflicts as religious or communal simply because the antagonists predominantly had different religious affiliations in all the cases discused below, howevere, there is an adequate evidence that participants and observers both recognised that subjective matters of religious affiliation did in fact represent a significant, if not exclusive issue in the conflicts. সুতরাং আজকে আমাদেরকে বুঝতে হবে এই উপমহাদেশের ইতিহাসের বিবর্তনকে, ইতিহাসের অতীতকে। আজকে যারা স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের কথা বলছেন, এই উপমহাদেশে ইতিহাসের সঠিক ব্যাখ্যা তাদের উপলব্ধি ও চেতনার মধ্যে নেই। সেজন্য আজকে তারা জাতিকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে নেমে পড়েছেন। কম্যুনালিজম বা সাম্প্রদায়িকতার যে কথাটি বলা হয়, সেটি কেবল ব্রিটিশের সৃষ্ট নয়। এটিকে যদি সরলার্থে হিন্দু মুসলমানদের দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখা হয়, তাহলে দেখবো, সেটা ব্রিটিশ শাসনের আগেও ছিল এবং সেই দ্বন্দ্বের চরিত্র নিছক ধর্মীয় নয়। সেই দ্বন্দ্বের পেছনে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের দ্বন্দ্বও ছিল। আমি একথা বলবো যে, সাম্প্রদায়িক হওয়া এক কথা, আর সম্প্রদায়ের স্বার্থে কথা বলা; লড়াই করা আরেক কথা। কাজেই আমরা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত থাকব, কিন্তু সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বিসর্জন দেব না। পৃথিবীর কোন দেশের রাজনীতিতেই সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বিসর্জন দেয়া সম্ভব হয় না। আজকে তাই স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ বলে সাম্প্রদায়িকতার কথা তুলে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে, এটা আসলে উপলব্ধির জগতের দীনতা এবং মানসিক দাসত্বের মনোবৃত্তিরই প্রতিফলন।

www.pathagar.com

২২ জানুয়ারি ২০০০

অপরাধ প্রবণতা এবং ক্ষমতার চর্চা

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশ আজ অপরাধ এবং অপরাধীদের জন্য এক স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে এখন নিরাপত্তার সাথে জীবন-যাপন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এখানে হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি, নারী ধর্ষণ, টেন্ডারবাজিসহ নানা ধরনের রাজনৈতিক সংঘাত এবং অপরাধ বলা যেতে পারে একেবারে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ একে নিয়ন্ত্রণ করার কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। বর্তমানে দেশে যে একটা সরকার আছে, এটা আজকের এই বিরাজমান পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে আমরা ভাবতে পারি না। এ দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের সেঞ্চুরী উদযাপন করা হয়। এদেশে এখন রাস্তায় রিকশাযোগে যাতায়াত করার সময় তরুণীরা ছিনতাইকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। টাকা দাবী করে না পেলে ছিনতাইকারীরা তাদের মুখে এসিড নিক্ষেপ করে। এখানে রেলস্টেশন, বাসস্টেশন, বাজার এবং বিভিন্ন কর্মস্থলে যে পরিমাণে চাঁদাবাজি চলছে সেটা কোনো সুসভ্য দেশে হয় না। আজকে প্রত্যেকটি নাগরিকের নাভিশ্বাস ওঠে গেছে। এই তো সেদিন ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসকে উপলক্ষ করে রাস্তায় রাস্তায় একদল তরুণের চাঁদা আদায়ের অভিযান লক্ষ্য করা গেল। যারা চাঁদা দিতে অপারগ তাদেরকে হেনস্তা করা হয়েছে। আমি সেদিন লক্ষ্য করেছি একজন রিকশাওয়ালার কাছ থেকে পর্যন্ত বিজয় দিবসের চাঁদা আদায় বা টিকিট বিক্রির নাম করে টাকা আদায় করা হয়েছে। ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কে চলাচলকারী বাসকে পথের মাঝখানে আটকে রেখে যাত্রীদের কাছ থেকে বিজয় দিবসের চাঁদা আদায় করা হয়েছে। কমলাপুর রেলস্টেশনসহ আরো অনেক স্টেশন বা স্ট্যান্ডে একটা দৃশ্য আপনারা সকলেই হয়তো লক্ষ্য করবেন। সেটা হচ্ছে, প্রত্যেক বেবিট্যাক্সিওয়ালাকে একজন নির্ধারিত ব্যক্তির কাছে একটা নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে হয়। কিন্তু এই চাঁদার অর্থ কে নিল, কার কাছে গেল তার কোন হদিস নেই। এই তো সেদিন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অফিসে টোকাই মিজান নামে একজন সন্ত্রাসী পুলিশের সাথে গুলিবিনিময় করতে গিয়ে আহত হল। টেন্ডার নিয়ে সরকারী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছিল, তারই ফলাফল ছিল এই ঘটনাটি। সেখান থেকে পুলিশ শামীম নামে একজনকে গ্রেফতার করে; কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই উপর মহলের চাপের মুখে তাকে পুলিশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এক কথায় বলা যায়, আজকে কারো জীবনের নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তা নেই। প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই এমন সব লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য চোখে পড়ে, যা রীতিমতো আমাদের শিশুদের পর্যন্ত বিকারগ্রস্ত করে তুলছে। একটি দেশে সরকার থাকতে, পুলিশ বাহিনী ও আইন-আদালত থাকতে এমন ঘটনা কীভাবে ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন করা দরকার। এই দেশটিকে যদি নাগরিক সমাজের জন্য নিরাপদ না করা যায়, তাহলে এখানে কোন উন্নয়নই ফলপ্রসূ হবে না। বরঞ্চ দিনের পর দিন আমরা অধঃপতনের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাব। সুতরাং এই বিষয়টি নিয়ে সমাজের সকল গোষ্ঠী ও সকল মতের মানুষকে চিন্তা করতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে যেভাবে অপরাধ হচ্ছে, সেটা অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। আমরা ছোটবেলায় গ্রামদেশে সংঘটিত অপরাধের মধ্যে সিঁধেল চুরি এবং ক্বচিৎ-কদাচিৎ ডাকাতির ঘটনা ঘটতে দেখেছি। এছাড়া জমির বা জমি আইল বা দখল নিয়ে সংঘাত হত। তাতে কিন্তু খুনখারাবীও হত, তবে সেই অপরাধগুলো খুবই সীমাবদ্ধ

www.pathagar.com

ছিল। কিন্তু আজকাল অপরাধের যে কত বিচিত্র প্রকরণ সৃষ্টি হয়েছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। যেমন– আজকে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে তুলে নিয়ে পণবন্দী করে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা ঘটছে এবং যারা এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত পবিত্র অঙ্গনে অবস্থান করে এই কাজগুলো করছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়াসের কথা উল্লেখ করলেও এই সমস্যার সমাধান হয়নি। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করছি, টেন্ডার, চাঁদাবাজি নিয়ে বা ডাকাতি ও লুষ্ঠনের ভাগ নিয়ে অনেক সময় নির্দিষ্ট মাস্তান গ্রুপের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যাকে কেন্দ্র করে খুনোখুনিও হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা একটি তালিকা প্রণয়ন করতে পারলে দেখতে পারব, বাংলাদেশে অপরাধ কর্মকাণ্ড নিয়ে যে সৃজনশীলতা লক্ষ্য করা যায়, তা পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। অপরাধ বিজ্ঞানে বা অপরাধ সংক্রান্ত স্টাডিতে অপরাধকে নানাভাবে বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ইংরেজীতে Crime and Delinquency-র বিষয়টি একটা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি ইনকোয়ারি।

এই ইনকোয়ারিতে সমাজ তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং আইন শাস্ত্রের সমন্বয় ঘটে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আইনের বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ, যার নিরিখে আমরা কোন কর্মকাণ্ডকে অপরাধমূকল বা ডেলিংকুয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। আরেকটি দিক হচ্ছে, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক বা জৈবিক তাড়না, যা মানুষকে অপরাধী করে তোলে। যেসব প্রক্রিয়ায় হত্যা, চুরি, ভিক্ষাবৃত্তি, দৈহিকভাবে অন্যকে আহত করা প্রভৃতি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, তার ওপর ঐতিহাসিক গবেষণায় দেখা যাবে যে, জনগণের প্রথাগত বিশ্বাস ও নৈতিক মানদণ্ড সম্পর্কে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এগুলোকে অপরাধমূলক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বেশিরভাগ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে অপরাধ হিসেবে যে কারণে বিবেচনা করা হয়, সে ব্যাপারে খুব সামান্যই ঐকমত্য হয়েছে।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়, কীভাবে একটা ইন্টারেস্ট গ্রুপ তাদের চিন্তাধারাকে আইন হিসেবে প্রণয়ন করে। অর্থাৎ তাদের নিজস্ব স্বার্থকে রাষ্ট্রের স্বার্থের সমার্থক বলে তুলে ধরে। আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি যে, ইংল্যাণ্ডে চার্চ ও সামন্ত অভিজাতদের সঙ্গে রাজার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল এবং এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণেই হত্যাকাণ্ড রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়। নাগরিকদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে চার্চ এবং সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে রাজা তার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করেন। আমরা এও জানি যে, ইংল্যান্ডে এক সময় কমন প্রপার্টিতে বৃক্ষচ্ছেদন, পশু শিকার, মৎস্য শিকার মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হত। তখন রাজা চাইলেন, তার অনুগত অভিজাত শ্রেণীকে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে পশু শিকার, মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দেবেন। আমরা যে কালাকানুনের কথা বলি, সেই কালাকানুনের উৎপত্তিও এখান থেকেই। ইংল্যান্ডের দরিদ্র মানুষেরা তাদের জীবন-জীবিকার জন্য অনেক সময় এই ধরনের কমন প্রপার্টিতে মৎস্য শিকার, পশু শিকার করত কিংবা বৃক্ষ কর্তন করত। অনেক সময়ে তারা তাদের চেহারা লুকিয়ে রাখার জন্য মুখে কালো রঙ মেখে নিত। তখন আইন করা হল, যদি এরকম মুখে কালো রঙ মাখা অবস্থায় কাউকে পাওয়া যায়, তাকে আইন লংঘন করার অপরাধে শাস্তি দেয়া হবে এবং তখন থেকেই 'কালাকানুন' শব্দটির উৎপত্তি। প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাজা তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সুসংহত করার জন্য অভিজাতদের এবং চার্চগুলোর অধিকারকে খর্ব করেছেন, আবার অন্যদিকে তার অনুগত একটি অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করার জন্য নিরঙ্কুশ অধিকার দিয়েছেন তার নিজস্ব গোষ্ঠীকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সমাজে কোন্‌টা অপরাধ, কোন্‌টা অপরাধ নয়, সেটা অনেক সময় ক্ষমতা বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নিরিখে দেখা হয়। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে, ক্রাইম এবং ডেলিংকুয়েন্সির ক্ষেত্রে যৎসামান্যই অকাট্য তত্ত্ব বা তথ্য রয়েছে। যেমন অপরাধ শাস্ত্রের একটি কথা হচ্ছে, প্রত্যেক সমাজের মানুষ জীবনে

www.pathagar.com

তার কোন না কোন সময়ে একটা অপরাধ করে। মানুষ কেন অপরাধ করে, তারা ব্যাখ্যা করতে হলে বুঝতে হবে, আইনের দৃষ্টিতে যা অপরাধ বা অপরাধমূলক আচরণ, যা প্রায় সবার মধ্যেই রয়েছে, তার কারণটা কী? আরেকটি তত্ত্ব হল, জীবনের যে কোন বয়সেই মানুষ অপরাধ করতে পারে। তবে ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সে মানুষের অপরাধ করার প্রবণতাটা বেশি থাকে। এই বয়সে যাদেরকে অপরাধ করতে দেখা যায়, তাদেরকে এই বয়স পার হওয়ার পর আর সেভাবে অপরাধকর্মে লিপ্ত হতে দেখা যায় না। কোন কোন অপরাধ বিজ্ঞানীর মতে, অপরাধ ও অপরাধীর সংজ্ঞা রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত হতে দেখা যায়। গত ১০০ বছরে বেশিরভাগ দেশের তথ্য থেকে দেখা গেছে, অপরাধের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অপরাধ বিজ্ঞানীরা এসব তথ্য সম্পর্কে সন্দিহান। কারণ কোন অপরাধকে অপরাধ বলা হবে, তা আমলাতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত এবং ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। পুলিশ বিভাগ সরকারের রাজনৈতিক অভিপ্রায় হিসাবে অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যগুলোকে মেনিপুলেট করে। দাপ্তরিক তথ্যে আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি, সমাজের উচ্চবিত্তদের অপরাধ সাধারণত তালিকাভুক্ত করা হয় না। অন্যদিকে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের অপরাধ বড় করে দেখানো হয়। সেজন্য অপরাধবিজ্ঞানীরা অপরাধ প্রবণতার হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে বেশ সাবধানী হতে চান। তাই আজকাল অপরাধের পরিমাণ, বিস্তৃতি পরিমাপ করার জন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সেটা হচ্ছে, জনগণের মাঝে জরিপ চালিয়ে দেখা যে, তারা তাদের জীবনের কোন মুহূর্তে কোন অপরাধমূলক ঘটনার শিকার হয়েছেন কীনা। অবশ্যই, অপরাধের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য এই পদ্ধতিটিও খুব পারফেক্ট নয়। তবে অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে অর্থাৎ অফিসিয়াল স্ট্যাটিসটিক্সের তুলনায় এ ধরনের পদ্ধতিতে অপরাধের ঘটনা এবং এর বিন্যাস সম্পর্কে ভাল তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এটা তো গেল আমরা কী করে বুঝতে পারব, একটা সমাজে কী পরিমাণ অপরাধ হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে সে কথা। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে, অপরাধের সব তত্ত্বগুলো এখানে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আফতাব আহমাদ :

এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অপরাধের সংজ্ঞা এবং অপরাধ নির্ণয় করার মানদণ্ডগুলো আজকে প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। তবে ব্যর্থ হয়ে গেছে বলাটা বোধ হয় পুরোপুরি সঠিক হবে না। গোটা বিশ্বটাই তো একটি দ্বান্দিকতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মানুষও সৃষ্টি হয়েছে তার দ্বৈতসত্তা নিয়ে–ভাল এবং মন্দ, শ্রেয় এবং পরিত্যাজ্য গুণাবলী নিয়ে। মানুষের মন্দ বা পরিত্যাজ্য বা বর্জনীয় অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপরাধমূলক গুণাবলী যাকে বিখ্যাত জার্মানী দার্শনিক Leibniz বলেছেন Evil. সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে Leibniz তাঁর Thedicy গ্রন্থে এর তিনটি শ্রেণীভাগ করেছেন : metaphysical, moral and physical. মানুষের metaphysical অপরাধের একটি limitation আছে, moral অপরাধ হচ্ছে পাপ এবং physical evil হচ্ছে pain যাকে বেদনা বা যাতনা বলা যেতে পারে। বার্ট্রান্ড রাসেল এ বিষয়ে অধিকতর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন "metaphysical evil" এর মধ্যে রয়েছে "Source of the whole" এবং ঠিক এ কারণেই একটি রাষ্ট্র বা সমাজদেহের বিকাশ/বিবর্তন/অভ্যুদয় অনুধাবন না করতে পারলে সামগ্রিক মূল্যায়ন নিরূপণ করে কোন যৌক্তিক উপসংহারে যেতে আমরা ব্যর্থ হবো। আসলে বাংলাদেশে অপরাধপ্রবণতা, অপরাধী এবং অপরাধের চালচিত্র যদি আমরা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে চাই, তাহলে বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রক্রিয়াটিকে আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বাংলাদেশে আজকে যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি, আজকে যে পরমত সহিষ্ণুতার অনুপস্থিতি, আজকে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলতে আমরা যা বোঝাই, এসবের দোর্দণ্ড প্রতাপের ফলেই বাংলাদেশে অপরাধের ব্যাপকতা এবং বিস্তৃতি ঘটে চলেছে।

www.pathagar.com

একথা এক সময় অকল্পনীয় ছিল যে, একটি বহুল প্রচালিত দৈনিক পত্রিকার প্রত্যক্ষ করতে হবে যে, মা মইয়ের গোড়া চেপে ধরে আছেন এবং পিতা সেই মই বেয়ে কাঁটা তারের ওপর দিয়ে ইডেন কলেজের ক্লাসরুমের ভেতরে নকল ছুড়ে মারছেন এইচএসচি পরীক্ষার সময়ে। বহুল প্রচারিত এমনি একটি দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এই ছবিটি দেখার পর কে না শিউরে উঠেবেন! একজন অভিভাবক যদি এভাবে প্ররোচিত করেন তার সন্তানকে নকল করার জন্য বুঝতে হবে, অপরাধের মাত্রা এবং প্রবণতা সমাজে কত গভীরে প্রোথিত এবং সমাজের যে মনস্তত্ব, লোক সমাজের যে ধ্যান-ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ এটি আমাদের তাহলে নতুন করে যাচাই করে দেখতে হবে। নতুন করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। ডেলিংকুয়েন্সি সঙ্গে আরেকটি কনসেপ্ট আমাদের নিয়ে আসা উচিত, যেটাকে আমরা বলি ডিভিয়েন্ট বিহেভিয়ার। অবশ্য এটির সঙ্গে ক্রাইম এবং ডেলিকুয়েন্সির ওতোপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। এর ওপর আমি জোর দিচ্ছি এই জন্য যে, যে কোন অস্তিমান একটি সমাজের একটি কাঠামো থাকে এবং সেই কাঠায়োর অন্তর্গত বেশকিছু মূল্যবোধ এবং কৃষ্টিগত আচার-আচরণ অন্তর্র্নিহিত থাকে। যেগুলোকে কখনোই কেউ লংঘন করতে চায় না। কারণ তা যদি লংঘন করা হয় বা তার মধ্যে যদি কোনো ব্যত্যয় ঘটানো হয়, তাহলে সমাজ কাঠামোর ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারে, কিংবা ভারসাম্যহীনতার কারণে সে সমাজে নৈরাজ্য এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্ম হতে পারে।

বাংলাদেশে আমরা যদি বিশেষ করে ষাটের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত, কী রাজনীতি, কী সংস্কৃতি, কিংবা অন্য যে কোন ধরনের সামাজিক আন্দোলনের কথাই বলুন, তাকে যদি আমরা সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাভাবে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখব, সেখানে মহাপ্রাবল্যের সঙ্গে প্রতাপ বজায় রেখেছিল পেশীশক্তি–বাহুশক্তি অর্থাৎ অনাচার দুরাচার নির্ভর দৈহিক অপশক্তি। যুক্তিনির্ভর বা যুক্তিনিষ্ঠ আন্দোলন নয়, বরং উচ্চকণ্ঠে এবং হাতের জোরে, গায়ের জোরে যে যার বক্তব্য, যে যার মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছে। সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা যে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের কথা নিয়ে আজকে আমরা গর্ব করি, সেই স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টির পক্ষে এদেশের মানুষকে প্রস্তুত করার প্রশ্নে আমরা যত না যুক্তির পন্থা অবলম্বন করেছি তার চাইতে বেশি যত্নবান ছিলাম অন্যের মতামতের প্রতি কোন ধরনের তোয়াক্কা না করে অন্যের মতামতকে প্রকাশ করার কোন সুযোগ না দেয়া। ওখান থেকেই ভ্রূণাকারে জন্মলাভ করেছে আজকের অপরাধপ্রবণতা। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন আমরা শৌর্য, বীর্য এবং গৌরবের অধিকারী করেছি, আরেকদিকে আমরা মহামূল্যবান সম্পদ হারিয়েছি। সেই সম্পদ হচ্ছে আমাদের দেশজ শাশ্বত সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সহনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং জাতিগতভাবে একটি নৈতিক অহংকার যে আমরা পরের ধন আত্মসাৎ করে, অন্যকে বঞ্চিত করে নিজেরা ধনবান হওয়া বা নিজেদের লাভবান করার চেষ্টা করি না। সে সাক্ষ্য ইতিহাস দেয় না। আমাদের সমাজের আরেকটি মূল্যবান শ্রেয়বোধ ছিল যে আমি নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে হলেও নিজের পড়শী, নিজের নিকটাত্মীয় নিজের সন্তান-সন্ততিতে সামন্যতম সুযোগ করে দেব একটি শ্রেয়তর জীবন-যাপন করার জন্য। কিন্তু যে ব্রুটালাইজেশন প্রসেস, প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের সমাজে সূচিত হল, তার মধ্য দিয়ে মানুষ তার মানবিক গুণাবলী হারিয়ে একটি ডিহিউম্যাননাইজড এন্টিটিকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এই রূপান্তর কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌছতে পারে, একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিলেই বোধহয় সকলের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। কয়েক বছর আগে আমরা পত্রিকায় একটি সংবাদ লক্ষ্য করেছি। দুই বন্ধুর মধ্যে একটি ক্যামেরা নিয়ে ঝগড়া হয়। ক্যামেরা যে বন্ধুটির সেই বন্ধুটিকে তার অপর বন্ধু শেষ পর্যন্ত হত্যা করল ক্যামেরাটির মালিকানা অর্জন করার জন্য। এটি কখনো ভাবা যায়? সামান্য একটি ক্যামেরার জন্য দীর্ঘদিনের একজন বন্ধু, বাল্যকাল থেকে যে এক সাথে, একই সমাজে

www.pathagar.com

সুখ-দুঃখ, আনন্দবেদনা এবং উচ্ছ্বাসের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে, বেড়ে উঠেছে- সে কী করে তার বন্ধুকে হত্যা করতে পারে। এভাবে আমরা একের পর এক বহু নজির আনতে পারি। কিন্তু মূল প্রশ্ন হচ্ছে, ডিভিয়েন্ট বিহেভিয়ার অর্থাৎ সামাজিকভাবে স্বীকৃত আচরণ যেমন, একটি সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতিকে মানা, রেওয়াজকে মানা, তাহজীব মানা, তমদ্দুন পালন করা, কৃষ্টি বজায় রাখা, বয়োজ্যাষ্ঠকে সম্মান ও মান্য করা, সমাজের fabric বা বুনন রূপী এই মূল্যবোধগুলো কেন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে? এটি বুঝতে হলে বুঝতে হবে যে, প্রাক-একাত্তর, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় এবং একাত্তারোত্তরকালে power বা ক্ষমতা আমাদের দৃষ্টিতে মূল কেন্দ্র এবং একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে আমাদের কাছে চিহ্নিত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষমতা চর্চা করতে হবে এবং ক্ষমতাই হচ্ছে জীবন-জীবিকা ও অস্তিত্ব এবং নিজের পরিচয়ের একমাত্র উৎস। এই ক্ষমতা চর্চা করার জন্য সকলেই মনে করছি যে নিজরা যা করব বা বলব, সেটিই রীতিসিদ্ধ। নিজের সকল কর্মকাণ্ড হচ্ছে আইনসিদ্ধ, বৈধ। এজন্য প্রচলিত কোন আইন বা রীতির তোয়াক্কা না করে মানুষের অনুভূতি, অন্তরের স্পর্শকাতরতা ও সংবেদনশীলতার দিকে না তাকিয়ে আমরা অত্যন্ত রূঢ় নিষ্ঠুর এবং কঠোর আচরণ করতে শিখেছি। এ থেকেই জন্ম নিচ্ছে অপরাধের জগত। যে জগতে মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনীর সম্পর্কগুলো লোপ পেয়ে আজকে ব্যক্তি কীভাবে ব্যক্তিকে পরাস্ত করে নিজের অস্তিত্বকে ধারণ করে রাখবে তার এক সর্বগ্রাসী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এক ধরনের ইতর অস্তিত্ববাধ অর্থাৎ ভালগার এগজিসটেন্সিয়ালিজম আজকে পেয়ে বসেছে বাংলাদেশের সমাজকে। এ থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের দরকার ব্যাপক একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের নতুন প্রতীক, জীবনের নতুন অভীষ্ট এবং জীবন সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞান যাতে আমরা সঞ্চার করতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে বিশেষ করে যারা এখন তরুণ, তারা যাতে আগামী দিনের নাগরিক হিসেবে জাতির দায়িত্বগুলো যথোচিতভাবে প্রতিপালন করতে পারে, সে জন্য ব্যাপকতর পরিসরে বিদ্যৎজনদের যথাসাধ্য দায়িত্ব পালন করতে হবে। আজকে কোদালকে কোদাল এবং বেলচাকে বেলচাই বলতে হবে। এ ব্যাপারে যদি আমরা সামান্যতম অনীহা বা দুর্বলতা প্রকাশ করি, তাহলে আমার মনে হয় এটিও একটি বিরাট অপরাধ হয়ে দাঁড়াবে এবং এই অপরাধের জগত থেকে বেরিয়ে আসতে হলে ক্ষমতার চর্চা সম্পর্কে আমাদের আজকে একটি নতুন ধারণাও গ্রহণ করতে হবে।

মাহবুব উল্লাহ :

আমি আগেই বলেছি, বাংলাদেশের অপরাধপ্রবণতা বা অপরাধ চিত্রটা ট্রাডিশনাল ক্রিমিনোলজির সায়েন্স দিয়ে বোঝা খুব কঠিন। এ জন্য আমার মনে হয় তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আমরা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলোর দিকে তাকালে লক্ষ্য করব যে, সেসব সমাজে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের ক্ষেত্রে business crime কিংবা বা রাজনৈতিক দুর্নীতির জন্য আইন প্রয়োগে এক ধরনের শৈথিল্য আছে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে, যেমন, জুয়াখেলা, মাদক সেবন, ভিক্ষাবৃত্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য খুব কড়াকড়িভাবে আইন প্রয়োগ করা হয়। পাশ্চাত্যে গ্রেফতারকৃত শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি লোক সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর অপরাধী। কিন্তু মারাত্মক অপরাধের জন্য সেটা নিম্ন শ্রেণীরই হোক, মধ্য শ্রেণী বা উচ্চ শ্রেণীরই হোক-তার ক্ষেত্রে গ্রেফতারের হার তুলনামূলক হারে অনেক কম।

অপরাধের স্টাডির জন্য ৪টি প্যারাডাইম আছ। একটি হচ্ছে সমাজ মনস্তাত্ত্বিক, দ্বিতীয়টি জৈব বৈজ্ঞানিক, তৃতীয়টি সমাজতাত্ত্বিক এবং চতুর্থটি হচ্ছে মার্ক্সীয়। এখন সমাজ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অপরাধ কেন ঘটে, সেটা দেখা যাক। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, অপরাধ মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার দিকগুলো

www.pathagar.com

দেখব। যেমন পারিবারিক সম্পর্ক, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক। আমরা বলে থাকি, ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তানেরা অনেক সময়ে অপরাধপ্রবণ হয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অপরাধের উৎপত্তি ঘটে থাকে। এই কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম গৃহবধূ রুমার হত্যাকাণ্ড। বিয়ের মাত্র ক'মাস পরেই তাকে হত্যা করা হল, অথচ কাহিনী সাজানো হল অন্যরকম। এরপরে আসে অপরাধের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ যারা অপরাধী হতে অভ্যস্ত, তারা বিশেষ ধরনের সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়, আর যারা অপরাধমূলক আচরণে অনভ্যস্ত, তারা আরেক ধরনের সংস্কৃতি আয়ত্ত করে। সেই জন্য আমরা অনেক সময় বৈবাহিক সম্পর্ক ইত্যাদি নিরূপণের ক্ষেত্রে বংশ পরিচয়, পিতা-মাতা, ভাই-বোনের পরিচয়-এগুলো জানার চেষ্টা করি। কারণ পরিবারের মধ্যে থেকেই সামাজিকায়ন শুরু হয় এবং এই সামাজিকায়ন ব্যক্তির সংস্কৃতিকে, ব্যক্তির সাংস্কৃতিক প্রবণতা ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। মানুষ অপরাধী হয় এ কারণেও যে, তারা একবার যদি অপরাধ করে পরিবারের কারো কাছে কিংবা পুলিশ বা বন্ধু-বান্ধবদের হাতে ধরা পড়ে, তখন থেকে তার লজ্জা চলে যায়। ফলে সে দ্বিতীয়বার অপরাধ করতে আর পিছপা হয় না। আরেকটি কথা এখানে বলা দরকার। সেটি হচ্ছে আমাদের দেশে জেলখানাগুলোতে বয়স্ক, মারাত্মক, ডাইহার্ড অপরাধীদের সঙ্গে সাধারণ আনকোরা, অল্প বয়স্ক, লঘু অপরাধীদের একত্রে একই খাতায় (জেলখানার উপভাষা, প্রকৃত অর্থ প্রকোষ্ঠ) রাখা হয়। এর ফলে তারা জেল থেকে ফিরে নানা ধরনের অপরাধ সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যে কারাদণ্ড তাকে দেয়া হচ্ছে অপরাধ শোধরানোর জন্য, সেই কারাদণ্ড তাকে আরো মারাত্মক ধরনের অপরাধী করে তুলছে। আরেকটি হচ্ছে, যেটিকে অ্যানমি থিওরি বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে সাধারণ মানুষ সমাজের সাধারণ মূল্যবোধের মর্মবস্তুকে আত্মস্থ করতে পারে না। এবার আমরা আসছি বায়োলজিক্যাল তত্ত্বের দিকে। ১৯০০ সালের পরে আমরা লক্ষ্য করেছি, এই তত্ত্বটি তেমনভাবে সমাদৃত হয়নি। এই তত্ত্বের মূল কথা ছিল যে, বংশগত কারণে কেউ অপরাধী হতে পারে। কিন্তু ইদানীং বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে আবার নতুন করে সেই তত্ত্বের এক ধরনের রিভাইভালিজম লক্ষ্য করা যায়। সেটা হচ্ছে যে, অপরাধীদের জীন সাধারণ মানুষের তুলনায় একটু ভিন্নভাবে গঠিত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতা বিরাজ করে। সামাজিক শ্রেণীর কোন বৈশিষ্ট্য মানুষকে অপরাধী করে, তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। মানুষ অপরাধ আয়ত্ত করে সেসব মানুষের কাছ থেকে, যারা এটাকে way of life হিসেবে মনে করে। আমার মনে হয়, বাংলাদেশে এখন যে ধরনের অপরাধগুলো ঘটছে, বিশেষ করে ছিনতাই এবং চাঁদাবাজি আমাদের দেশের তরুণ সমাজ এক ধরনের way of life হিসেবে বেছে নিয়েছে। তারা যখন দেখছে যে পাশের বন্ধুটি এই কায়দায় বিলাসিতার জীবন এনজয় করছে, তখন সেও এই ধরনের জীবনযাত্রাকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে একই ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বে অপরাধ বোঝার জন্য ব্যক্তির শ্রেণীগত অবস্থানকে সাধারণত বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধটা কেবল নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বস্তুত নিম্নবর্গ, মধ্যবর্গ এবং উচ্চবর্গ– সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই অপরাধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুসারে সমাজতাত্ত্বিক শ্রেণীগত ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে অপরাধকে সেখানে দেখা হয় সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণী সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। এ ক্ষেত্রে দু'রকমের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি হচ্ছে, ইন্সট্রুমেন্টাল, আরেকটি হচ্ছে ডায়ালেক্টিক্যাল। ইন্সট্রুমেন্টাল থিওরি অনুযায়ী শাসক শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, যাতে তারা তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। আরো sophisticated তত্ত্ব হল একটি সময়কালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে অপরাধ প্রবণ হওয়ার প্রণোদনা সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদীরা অবৈধভাবে পুঁজি সঞ্চয় করতে চাইবে, যদি অবৈধ পন্থা অতিরিক্ত পুঁজি

www.pathagar.com

সঞ্চয়ের জন্য একটি কার্যকর উপায় হয়। যেমন– স্বাভাবিক বাণিজ্যের পথে না গিয়ে স্মাগলিংয়ের পথে যাওয়া কিংবা মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করা। আমাদের দেশে মাদকের সমস্যাটা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের তরুণ সমাজের একটি অংশের মধ্যে ফেনসিডিল এবং হেরোইন সেবন সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনা লক্ষ্য করে আমার মনে হয়েছে এক সময় চীনা জাতিকে পরনির্ভরশীল করে তোলার জন্য এবং তার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দেবার জন্য তাদেরকে আফিম সেবনে প্ররোচিত করেছিল ব্রিটিশরা এবং এর ফলে সেই চীনাদের সঙ্গে আফিমযুদ্ধ হয়েছিল ব্রিটিশদের। বাংলাদেশের সীমান্তপথ দিয়ে যেভাবে লাখ লাখ বোতল ফেনসিডিল আসছে, এর ফলে আমাদের তরুণ সমাজের অধঃপতন ঘটছে। সুতরাং বাংলাদেশে অপরাধ বিস্তারের মধ্যে যে একটা রাষ্ট্রাতিক ষড়যন্ত্র বা প্রভাব আছে সেটা আমরা ধারণা করতে পারি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব যেভাবে হয়েছে, তার মধ্যেই বাংলাদেশে অপরাধপ্রবণতার অনেকটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের জন্য যে ধরনের মানসিক মনস্তাত্ত্বিক ও আদর্শিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, সেটা তখন ছিল না। একজন মানুষের হাতে যদি অস্ত্র তুলে দেয়া হয়, তাহলে সে ডাকাতও হতে পারে, আবার সেই অস্ত্র দিয়ে সে অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইও করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বিরাট সংখ্যক যুব সমাজকে মাত্র ৯ মাসের মধ্যে আদর্শগতভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি, তার ফলে দেখা গেল, এই সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যক্তির বিচ্যুতির উদ্ভব ঘটিয়ে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের জন্য। আমরা লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশের উদ্ভবের পর পরই ষোড়শ বাহিনী নামে একটি বাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল। একটি রাইফেল পেয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, তারা রাতারাতি মুক্তিযোদ্ধা সেজে বসেছিল। যেভাবে শাসকগোষ্ঠী মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট বিতরণ করেছে, তাতে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের চরম অবমাননা হল। তারই পরিণতিতে আমরা লক্ষ্য করলাম, বাংলাদেশে '৭২ থেকে '৭৫-এর সময়টাতে যুব সমাজের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়কার রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে কতিপয় ত্যাগী এবং আদর্শবাদী তরুণ অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তাদের আন্দোলনের কোন সুনির্দিষ্ট সঠিক কর্মসূচী বা সঠিক কোন programme of action ছিল না, সে কারণে সেসব আন্দোলন লক্ষ্যচ্যুত হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, জাতীয় সামাজতান্ত্রিক দল, বিভিন্ন আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টি ও সর্বহারা দলের শত শত কর্মী, একদিন যারা দুঃশাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল– পরবর্তীকালে তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক ধরনের ওয়ারলর্ডিজম প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা সেখানকার সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদেরই অনুকরণে এরশাদ শিকদার, লাল্টু বা সিরাজের মত নরপিশাচদের নেতৃত্বে নানারকম সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে এখন যে ধরনের অপরাধ আমরা লক্ষ্য করি, সেগুলোকে উল্লিখিত ঐ চারটি তত্ত্ব দিয়ে ঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না।

নিউইয়র্ক শহর সম্পর্কে একটি গল্প আছে। নিউইয়র্ক শহরও ছিনতাইয়ের জন্য খুব বিখ্যাত। সেখানে ছিনতাইকারীরা এত বেশি তৎপর হয়ে পড়ল যে. এক সময় দেখা গেল, কোন মানুষ আর ঘর থেকে পথে বের হচ্ছে না। ছিনতাইকারীরা বুঝল তাদের অতি তৎপরতার কারণে মানুষ আর রাস্তায় নামতে সাহস পাচ্ছে না। যেহেতু মানুষ রাস্তায় নামছে না, সেহেতু ছিনতাইকারীরা কোন শিকারও খুঁজে পাচ্ছে না। এর ফলে ছিনতাইকারীদের আয় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। তারপর তারা তাদের আচরণকে এক ধরনের ইকুইলব্রিয়ামের মধ্যে নিয়ে এসেছে, যেখানে ছিনতাইও হচ্ছে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ছে কম আবার তাদের অর্থাগমও হচ্ছে কাম্য স্তরে। ছিনতাইয়ের মাত্রায় তারতম্য ঘটিয়ে এই ধরনের একটা অবস্থার মধ্যে তারা এসেছে। যার ফলে বলা হয়, নিউইয়র্ক শহরে রাস্তায় বের হলে পকেটে কম

www.pathagar.com

পক্ষে ২৫ ডলার নিয়ে বেরিও। কারণ তোমার কাছে যদি ২৫ ডলার ছিনতাইকারী না পায়, তাহলে তোমার ছুরিকাহত এমনকি নিহত হওয়ারও আশংকা আছে। আমার প্রশ্ন তাহলে কি আমরা এমন একটি দিনের জন্য অপেক্ষা করব, যেদিন রাজপথে কোন মানুষ নামবে না তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড করার জন্য, যেদিন কোন নারী-পুরুষ কর্মস্থলে যাবে না এই অপরাধীদের ভয়ে? এটাই হচ্ছে মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চন এবং এর জন্য আমাদের যদি অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে ততদিনে হয়ত বাংলাদেশের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে। সুতরাং আমার প্রস্তাব হচ্ছে, বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে এখানকার অপরাধ মনস্তত্ত্ব বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের পাঠ্য-পুস্তকে, শিক্ষা কর্মসূচীতে, সিলেবাসের মধ্যে কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা এদেশের তরুণ সমাজকে অপরাধ থেকে দূরে থাকতে প্রণোদিত করবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সে ধরনের কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে আমি অত্যন্ত জরুরী মনে করি।

আফতাব আহমাদ :

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে Richard Price যে দর্শন আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন সেটিকে বোদ্ধা ও বিদ্বৎজনগণ Platonist, epistomological, moral, cosmological এবং metaphysical দর্শন বলেই অভিহিত করেছেন। Price অনেকাংশে John Lock-এর রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে বলার চেষ্টা করেছেন যে প্রকৃতির রাজ্যের বহুপূর্ব থেকেই মানুষ অন্যান্য অধিকারের মধ্যে native এবং pre-political liberty ভোগ করে এসেছে যা তার জীবন, সম্পত্তি এবং সুনাম সংরক্ষণের অধিকার বহন করে বেড়িয়েছে। Price এর মতে civil government মানুষের এমন একটি trust যা সে তার অধিকারসমূহ যাতে আক্রান্ত না হয় সেজন্য পরীক্ষণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। অপরাধপ্রবণতাকে বুঝতে হলে এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রেক্ষাপটে না ফেলে বুঝা যাবে না। মানুষের imperfect wisdom কে প্রাধান্য না দিয়ে Cicero যেভাবে social nature of duty system-এর কথা বলেছেন আমাদের সে দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। কারণ মানুষ একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান থেকেই কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেধার ব্যবহার, অপব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার করে থাকে।

বাংলাদেশের অপরাধপ্রবণতাকে বুঝতে হলে এ বিষয়গুলো বিস্মৃত হলে চলবে না। বাংলাদেশের অপরাধপ্রবণতাকে বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই বুঝতে হবে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াটিকে যে চারটি প্যারাডাইমের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে একত্রিভাবে প্রয়োগ করে আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং এই চারটি প্যারাডাইমের মধ্যে একটি কমন ডিনোমিনেটর হিসেবে যেটি বেরিয়ে আসছে, সেটি হল ক্ষমতার চর্চা। ক্ষমতা বলতে শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা চর্চা করাকেই বোঝায় না, যে ছাত্রনেতা তার ছাত্রাবাসে-কিংবা তার শ্রেণীকক্ষে, যে শ্রমিক নেতা তার কারখানায় কিংবা শ্রমিকপল্লীতে, যে কৃষক নেতা কৃষকপল্লী বা কৃষকপাড়ায়, যে জেলে তার জেলেপাড়ায় তার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে তাকেও বোঝায়। এককথায়, এভাবে নানা জায়গায় নানাজনের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রয়োগ করার ব্যাপারটি একটু নতুন মাত্রা লাভ করে ১৯৬৯ থেকে '৭১-এর মধ্যে ক্ষমতা ও ক্ষমতা চর্চার এক ভিন্ন রকমের ধরন ও রূপ হিসেবে। একদিকে স্বাভাবিক যুক্তিতর্কের পরিবর্তে বল প্রয়োগ, নিজের গায়ের জোর এবং অস্ত্র এই তিনটি জিনিস এসে আমাদের এখানকার শাশ্বত মূল্যবোধে একটি বিরাট ধস নামায়। আজকে আমাদের সেই মূল্যবোধকে যদি পুনরুদ্ধার করতে হয়, তাহলে আমাদের শিশু কিশোরদের , আমাদের তরুণ-তরুণীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন বিষয়-আসয় নিয়ে আসা উচিত, যেগুলো তাদের

www.pathagar.com

মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে আরো অনেক শক্তিশালী করবে। আমি বিশেষভাবে মনে করতে পারি ব্রিটিশ আমল এমনকি পাকিস্তানী আমলে শিশু-কিশোরদের, তরুণদের Morality এবং Ethics- এ দুটি বিষয়কে আলাদাভাবে পড়ানো হত। এই দুটি বিষয়কে বাধ্যতামূলকভাবে যদি আমরা পাঠ্যক্রমের মধ্যে নিয়ে না আসি-এমনকি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে এক সময় Catechism বলে একটি বিষয় আলাদাভাবে পড়ানো হত- খ্রীষ্ট ধর্ম থেকে কিছু Morals নিয়ে এসে Aesop এর গল্পগুলো যেভাবে পাঠ করানো হত ক্লাসে, আজকাল সেই রেওয়াজ, সেই রীতি উঠে গেছে। কাজেই পাঠ্যক্রমের সেই জিনিসগুলোকে যদি আমরা আবার ফিরিয়ে আনতে পারি, এই অপরাধ প্রবণতাগুলোকে আমরা রোধ করতে পারব। আমরা লক্ষ্য করি, যেখানে পার্কিংয়ের কোন ব্যবস্থা নেই, অথচ জবরদস্তিমূলকভাবে পার্কিয়ের জন্য বেবিট্যাক্সিওয়ালাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। ফুটপাতে শোয়ার জন্য ছিন্নমূলদের কাছ থেকে মাস্তানরা চাঁদা আদায় করছে। এই দুস্থ দরিদ্রজনদের কাছ থেকেও এভাবে চাঁদা আদায় করে যে কিছু পরজীবী পরম পরিতুষ্টি লাভ করছে, তার সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে। অপরাধের জগতটাকে তার সকল মাত্রা, প্রেক্ষাপট ও পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে যদি আমরা বোঝার চেষ্টা না করি, তাহলে আমার মনে হয় আমরা অপরাধের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাবার কথা বলছি, সে অভিযান সার্থক হবে না। হবার কোন সম্ভাবনাই নেই- কপচানো বুলির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। Power of the soul কে apprehension of truth অর্জনক্ষম করে তোলার মধ্যেই সত্যিকার সার্থকতা নিহিত।

মাহবুব উল্লাহ :

গতকাল 'প্রথম আলো' পত্রিকায় দেখলাম কুষ্টিয়ায় 'বঙ্গবন্ধু'র ছবি টাঙিয়ে একটি কলেজের কক্ষে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র নকলে লিপ্ত হয়েছে। সেই কক্ষে কোন ইনভিজিলেটর প্রবেশ করতে সাহস পাচ্ছে না। অর্থাৎ আমাদের সমাজ যে কত নিচে নেমে গেছে, এটাই হচ্ছে তার প্রমাণ। যারা 'বঙ্গবন্ধু' কে মহান নেতা জ্ঞান করে একক জাতীয় প্রতীকে পরিণত করতে তীব্রভাবে উদগ্রীব সেই তারাই কথিত জাতীয় প্রতীককে অপরাধ চর্চার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে- আজকের বাংলাদেশে কেবল জমিজমা, অর্থ–সম্পত্তি এগুলোই এক মাত্র asset নয়, এখানে power টাও একটি asset এবং যার power আছে, সে power প্রয়োগ করে physical asset-এরও মালিক হতে পারে। এর পেছনে সম্ভবত একটি বড় কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে আসা বিপুল বৈদেশিক সাহায্য। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থ লুটতরাজ করে খাওয়ার জন্যই আজকে power-কে ব্যবহার করা হচ্ছে- রাজনৈতিক অস্থিরতাকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে।

www.pathagar.com

২৯ জানুয়ারী ২০০০

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়

মাহবুব উল্লাহ :

বিংশ শতাব্দীর একটি প্রধান ঘটনা হল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন কেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, সেটা আমদের দেশে অনেকেই বুঝতে চান না বা বোঝার চেষ্টা করেন না। একথা সত্য যে, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের মধ্যদিয়ে মানবজাতি তার মুক্তি ও কল্যাণের একটা বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল এবং এই বিপ্লব উপনিবেশবাদ কবলিত জাতিসমূহের মুক্তিরও একটা পথ দেখিয়েছিল। বিশ্বের নিপীড়িত জাতি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য।

তাত্ত্বিকভাবে বলা হয়েছিল যে, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের চেয়ে উন্নত একটি সমাজব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের নামে যে ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, সেই ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্র বলা যাবে কী-না, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট তর্কবিতর্ক রয়েছে। যে কারণে আজকে অনেকেই রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে, চীন, উত্তর কোরিয়া এবং কিউবাকে পোস্ট রেভ্যুলুশনারী সোসাইটি বলেন কিংবা এইসব দেশের সমাজব্যবস্থাকে বিদ্যমান সমাজতন্ত্র বা এগজিস্টিং সোশ্যালিজম বলেন। ১৯৫৬ সালে সভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম অধিবেশনে ক্রুশ্চেভ দাবী করেছিলেন যে, সমাজতন্ত্র শুধু সমাজতন্ত্রেই থেমে থাকবে না। অচিরেই সেটার সাম্যবাদের স্তরে উত্তরণ ঘটবে এবং তিনি এটাও আশা করেছিলেন যে, পুঁজিবাদের সাথে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও সহাবস্থানের মধ্যদিয়ে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে। ১৯৫৭ সালে রাশিয়া যখন মহাকাশে স্পুটনিক পাঠায়, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে সভিয়েত রাশিয়া অনেক এগিয়ে গেছে। এরকম একটা ব্যবস্থাকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পেলাম, পুঁজিবাদ এই চ্যালেঞ্জকে যেভাবে গ্রহণ করল, তাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাসটেইন্যাবিলিটি অনেক বেশী শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হল। আবার অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করলাম, আশির দশকের শেষদিকে এসে সমাজতান্ত্রিক শিবির তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একটি সমাজব্যবস্থা, একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি অন্য একটি ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত হয়, তাহলে সেই ব্যবস্থাটি কেন এমন ধ্বংস ও বিপর্যের সম্মুখীন হবে? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করা দরকার।

মার্কস ক্যাপিটালিজমের ক্রিটীক লেখেন তাঁর DAS CAPITAL সহ অন্যান্য গ্রন্থে। সব গ্রন্থে তিনি পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পুঁজিবাদের ডিনামিক্স বিশ্লেষণ করেছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বরূপ কী হবে, সে সম্পর্কে তিনি খুব সামান্যই বলতে পেরেছেন। যৎসামান্য আমরা যেটা পাই, সেটা তাঁর লেখা ছোট্ট একটি পুস্তিকা 'ক্রিটীক্ অব গোথা প্রোগ্রাম'। এই পুস্তিকায় তিনি বলেছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিপূর্ণ সাম্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। এই সমাজে মানুষ মানুষে কিছু বৈষম্য থাকবে পরিবারের আকারের কারণে বা লেবার ফোর্সে পার্টিসিপেশনের কারণে। তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজে গ্রাম ও শহর এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের মধ্যকার পার্থক্য থেকে যাবে বলে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে এর বেশী কিছু বলা সম্ভবপর হয়নি। অপর দিকে লেনিনও তাঁর বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বেশী সময় পাননি। লেনিনের মৃত্যুর পর

www.pathagar.com

সভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্ব চলে যায় স্ট্যালিনের হাতে। স্ট্যালিনের হাতে এসে সমাজতন্ত্রের বিকৃতি চরম রূপ লাভ করে। স্ট্যালিনের সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, বলপূর্বক কালেক্টিভাইজেশন করা হয়েছিল। আর এটা করতে গিয়ে সভিয়েত রাশিয়ায় বিরাট বিপর্যয় নেমে এসেছিল। কৃষির উৎপাদন প্রচন্ডভাবে কমে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, কৃষকরা অনেকেই তাদের হালের পশু জবাই করে খেয়ে ফেলেছিল। কৃষিকাজ ফেলে তারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। যে কারণে স্টালিন ইন্টারনাল পাসপোর্ট চালু করেছিলেন। অর্থাৎ এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর যে কথাটা বলা হয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেই ব্যাপারটি সার্থকরূপ লাভ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, সভিয়েত রাশিয়াতে ক্যাপিটাল ফর্মেশনের জন্য যে স্ট্র্যাটেজি নেয়া হয়েছিল, তা ছিল গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত এনে শিল্পায়নের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ শিল্প ও কৃষির মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে বাণিজ্যিক বিনিময় ব্যবস্থা কৃষকদের জন্য প্রতিকূল করে শিল্পায়ন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিন গড়ে তোলার স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছিল। যার ফলে কৃষকদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বঞ্চনাবোধ কাজ করছিল। তাই সমাজতন্ত্রের পতন হলে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, রাশিয়া কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। খাদ্যে স্বয়ম্ভর বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না।

আরেকটি বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা ছিল ইনসেনটিভের সমস্যা। আমরা লক্ষ্য করলাম, বিপ্লবের প্রথম দিকে বিপ্লবের চেতনার কারণে বিরাট কর্মোদ্যোগ থাকলেও বিপ্লব যখন থিতিয়ে আসল, যখন নতুন প্রজন্ম আসল, তখন তাদের মধ্যে সেই বৈপ্লবিক চেতনা, যেটা মরাল ইনসেনটিভ হিসেবে কাজ করছিল, সেটা আর কাজ করল না। তখন মানুষকে কাজ করানোর জন্য যেটা প্রয়োজন ছিল, সেটা হল ম্যাটেরিয়াল ইনসেনটিভ। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ম্যাটেরিয়াল ইনসেনটিভ সৃষ্টি করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা না থাকার ফলে উৎপাদনে একটা সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। যে কারণে অর্থনীতিতে স্থবিরতা দেখা দেয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার একটা ত্রুটি ছিল-টার্গেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে। যেমন; ফ্যাক্টরী ম্যানেজারদের বলে দেয়া হত– তোমাদের এই পরিমাণ ওজনের জিনিস তৈরী করতে হবে। তখন তারা ওজনের দিকটার প্রতিই লক্ষ্য রাখত। কোয়ালিটির ব্যাপারে লক্ষ্য রাখত না। উৎপাদিত পণ্যের মান উদ্ভাবনার ওপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে Alec Nove তাঁর Economic Reforms in USSR and Hungary– A Study in Contrast প্রবন্ধে বিষয়টিকে এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ "Innovation suffered from lack of any built in incentive to innovate. Grossman once spoke of routines inertia and pressure, The traditional system gave no reward for risk taking, gave good bonuses to those who went on doing and making whatever they did before, only more so. Pressure, orders from above, did lead to technical progress in many sectors, yet lack of incentives for change has cost loss. The lack of direct influence of user-enterprises on their suplier in the matter of product mix, mentioned already, also damages technical progress. In many instances modern productive equipment is not supplied, because aggregate plans for machinery are more easily fulfilled by making obsolete machines." ফলে সম্পদের অপচয় ঘটেছিল এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল।

আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার। মার্কস বলেছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আসবে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে। জার্মানীর মত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, সমাজতন্ত্র আসল রাশিয়ার মত একটি পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী দেশে। তখন তত্ত্ব দেয়া হল যে,

www.pathagar.com

সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো সম্ভব পুঁজিবাদী স্তরকে অতিক্রম করে, সেটাকে বাইপাস করে। এই তত্ত্ব বাস্তবতার নিরিখে কতটা যুক্তিসঙ্গত ছিল সেটাও একটা প্রশ্ন। কারণ আমরা জানি, একটা নতুন ধরনের ব্যবস্থার জন্য সহায়ক বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত ভিতের প্রয়োজন হয়। পুঁজিবাদ সামন্তবাদের স্তর অতিক্রম করে সেই ধরনের প্রোডাকটিভ ফোর্সের ভিত্তি রচনা করে। মার্কস স্বয়ং বলেছেন যে, ক্যাপিটালিজম রেভিলিউশনাইজেস দি ফোর্সেস অব প্রোডাকশন। অথচ রাশিয়ায় চেষ্টা করা হল পুঁজিবাদী স্তরকে এড়িয়ে গিয়ে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক স্তরে যাওয়ার এবং এটাও যে বাস্তবসম্মত ছিল না, সেটা লক্ষ্য করা গেল ওয়ার কম্যুনিজমের পর। যে কারণে লেনিন তাঁর নিউ ইকনমিক পলিসি দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি কৃষক এবং বিভিন্ন ক্ষুদে মালিকদের জন্য নানা ধরনের ইনসেনটিভ, প্রণোদনা বা প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন। একই কথা চীন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বলা যায়। যে কারণে আজকে চীনে যে ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে আমরা লক্ষ্য করছি সে দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে তার ম্যানেজারিয়াল সিস্টেম, তার ইনসেনটিভ সিস্টেম ধার করা হচ্ছে। চীনদেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় একটা বিরাট বিতর্ক দেখা দেয়। বিতর্কটি এরকম- হোয়েদার প্রাইমেসি অব প্রোডাকটিভ ফোর্সেস অর প্রাইমেসি অব প্রোডাকশন রিলেশনস। দ্যাং জিয়াও পিং প্রাইমেসি অব প্রাডাকটিভ ফোর্সেসের পক্ষে বলেছিলেন এবং সেই অনুযায়ীই আজকে চীনের অর্থনীতিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তার ফলও চীন পাচ্ছে। তবে যে কোন দেশের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করতে গিয়ে এবং নতুনভাবে উদ্যোগ ও প্রেরণা সৃষ্টি করতে গিয়ে যেসব সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, চীনেও তা সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে দুর্নীতি আজ প্রবল রূপ ধারণ করেছে। বলা হচ্ছে, জানালা খুলে দিলে যেমনি মুক্ত হাওয়া আসবে, তেমনি কিছু মশা-মাছি, কীটও প্রবেশ করবে। আর সেই মশা-মাছি, কীট কতটা প্রবল সেটা ভবিষ্যৎই কেবল বলতে পারে। কাজেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এসব দুর্বলতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরেকটি বড় দুর্বলতা ছিল সম্ভবত এই যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা নিউ এলিট, একটা নিউ ব্যুরোক্র্যাটিক ক্লাস সৃষ্টি করেছিল। সেটা এমন এক ধরনের ব্যুরোক্র্যাসি যা পার্টি ব্যুরোক্র্যাসির ডিক্টেটরশিপে পরিণত হয়েছিল। অন বিহাফ অব দি প্রোলেটারিয়েট সেই ব্যুরোক্র্যাটরাই রাষ্ট্রকে, সমাজ জীবনকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করত। যার ফলে রাষ্ট্রের সংগে জনগণের একটা বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র নেই। কিন্তু লেনিনের মতে, তাঁদের রাষ্ট্র পরিচালিত হয় ডেমোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজমের মাধ্যমে। অর্থাৎ পার্টির ভেতরে যদি কোন দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে সেটা পার্টির ভেতরেই ডেমোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজমের মাধ্যমে সমাধান করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সেই বিতর্কে উদ্দীপ্ত না করে, অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে কেবল একটি নির্দিষ্ট এলিট বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিতর্কটিকে সীমাবদ্ধ রেখে একটি প্রাণবন্ত সমাজ সৃষ্টি করা যায় কী? শুধু তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এক ধরনের আদর্শিক অন্ধত্বে ভুগেছে, যেটাকে আমরা বলতে পারি রাষ্ট্রটা ডক্ট্রিনেয়ার হয়ে গিয়েছিল এবং এর বিপদটা হচ্ছে এই যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে এ ধরনের সমাজ কখনই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। বলা যায়, এক ধরনের ফান্ডামেন্টালিজম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। অর্থাৎ কম্যুনিস্টিক বা মার্কসিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম-যার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটির কোন অবকাশ ছিল না। যে কারণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা আমি যোগ করব। অনেকেই বলে থাকেন, সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে। অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদীরা এই চেষ্টা করেছে। তবে সমাজতান্ত্রিক সিস্টেমে যদি অন্তর্নিহিত সবলতা বা শক্তি-সামর্থ্য থাকত, কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সেটাকে ধ্বংস করা সম্ভব হত না। তাই আমাদের বুঝতে হবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো কী কী এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যায়, সেটা সম্পর্কেও আমাদের ভাবতে হবে।

www.pathagar.com

আফতাব আহ্‌মাদ :

আমাদের আজকের আলোচনা যে কেউ পাঠ করলে মনে করবেন যে, আমরা সমাজতন্ত্রের নেতিবাচক দিকগুলোকে তুলে ধরার জন্যই বোধ হয় এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। মূলত এটি আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, বোঝার চেষ্টা করা যে– চুয়াত্তর বছর ধরে যে সমাজতান্ত্রিক শিবির বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী শিবিরকে চ্যালেঞ্জ করে এসেছিল, সেই চুয়াত্তর বছরের সমাজতান্ত্রিক শিবির কী করে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, মার্কস প্রণীত সমাজ বিকাশের যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বকে যথেষ্ট সংস্কার করেছিলেন লেনিন। এই সংস্কারের একটি পর্যায়ে এসে তিনি the concept of the party নিয়ে আসলেন। এখনে তিনি পার্টিকে বলেছেন– the vanguard of the proletariat অর্থাৎ, সর্বহারার অগ্রবাহিনী। এই যে vanguard of the proletariat বলা হচ্ছে, এই vangurad কারা? কাদের এই অভিধায় অভিহিত করা হচ্ছে? এরা কী পরিমাণ ডিক্লাসড এবং রিক্লাসড হয়েছে। সে সম্পর্কে আজকে দার্শনিক ও তাত্ত্বিকভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং প্রথম যখন ওয়ার কম্যুনিজম ফেইল করল, লেলিন নিজে তা প্রত্যক্ষ করলেন– তিনি বাধ্য হলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিউ ইকনমিক পলিসি প্রবর্তন করতে। অর্থাৎ তার State and Revolution-এ তিনি যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন–প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে এবং নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিতে হবে। সেই তত্ত্বকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি পূর্বতন রাষ্ট্রের পূর্বতন অভিজ্ঞতালব্ধ আমলা এবং ব্যবস্থাপকদের নতুন করে সুযোগ করে দিলেন নিউ ইকনমিক পলিসির আওতায়। এই পরিবর্তনটি তিনি কেন করলেন, তা চমৎকারভাবে লেনিন Last Testament-এর একাংশে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ "I have nationalized the means of production, but unfortunately I could not nationalize man." মানুষের চিরন্তন কামনা-বাসনা, লোভ-লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে মরাল ইনসেনটিভ, যে মরাল ইনডকট্রিনেশন, যে মরাল মোটিভেশনের প্রয়োজন হয়, তার জন্য পার্টিকে যেভাবে তৈরী থাকতে হয়, সেভাবে কি পার্টি তৈরী হতে পেরেছিল? লেনিনের দলকে যদিও বলা হতো আরএসডিএলপি– বলশেভিক যার অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু মূলত ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছে যে, বলশেভিকরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং অধিকাংশ সভিয়েতস অব পেজেন্টস, সভিয়েতস অব সোলজারস এবং সভিয়েতস অব ওয়ার্কার্স সংখ্যার দিক থেকে বিপুলভাবে মেনসেভিকদের পক্ষেই ছিল। কিন্তু লেনিনের বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশলের সার্থকতা ও সাফল্যের কারণে সেদিন জার শাসিত রাশিয়াতেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। এটিকে আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র না অন্যকিছু বলব– এ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক পণ্ডিতজন ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের মধ্যে আছে। বাহরো এটাকে বলছেন, এগজিসটিং সোশালিজম বা অস্তিমান সমাজতন্ত্র। অনেকে এটাকে বলছেন পোস্ট রেভ্যুলোশনারি সোসাইটি। এখন, রেভ্যুলেশনারিই যদি আমরা বলি একটি সমাজকে, তার বিপ্লবাত্মক কী কী রূপান্তর ঘটেছে, সেগুলোকে আমাদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

সভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয় ১৯২২-এ। কীভাবে সভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে. সেই প্রক্রিয়াটির দিকে আমাদের তাকাতে হবে। আজকে যদি আমরা বিলাপ করি যে, সভিয়েত ইউনিয়ন কেন ভেঙ্গে গেল, তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই বিলাপ অর্থহীন বিলাপে পর্যবসিত হবে যদি আমরা সভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়াটিকে বৈজ্ঞানিক নিরিখে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা না করি। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা, যেটিকে বিপ্লবী বুলি হিসেবে কপচানো হয়েছিল, সত্যিকার অর্থে বাস্তবে রূপদান করা হয়েছিল কী না, সেটি আজকে আমাদের ভাবতে হবে। মধ্য এশিয়ার যে সমস্ত প্রজাতন্ত্র সভিয়েত ইউনিয়নের আওতাভুক্ত হয়েছিল, সেই সব প্রজাতন্ত্রে সত্যিকার অর্থে জনসম্পৃক্তি ঘটেছিল কী না, সেটাও

www.pathagar.com

দেখতে হবে। বিপ্লব শুধুমাত্র সর্বহারাদের একটি নৈশভোজ বা উৎসব নয় বিপ্লব মানেই হচ্ছে সামাজিক শক্তির পুনর্বিন্যাস ঘটানো, তেমনি আরেকদিকে এর মানে হচ্ছে সোশাল ও প্রোডাকটিভ ফোর্সেসকে ডেভলপ করার মহাকর্মযজ্ঞের জন্য মানসিক এবং চিন্তার ক্ষেত্রে বিষয়মুখী প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতি পশ্চাৎপদ রাশিয়াতে কতটুকু ছিল সেটা আজকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিতজনরা আজকে বলছেন, লেলিনের এপ্রিল থিসিসের ভিত্তিতে যে বিপ্লবটি সম্পাদিত হয়েছিল, সেটি ছিল মূলত একটি শর্ট সার্কিটের ব্যাপার। অর্থাৎ সোশাল ডেভলপেমেন্টের ক্ষেত্রে ক্যাপিটালিজমের ফেইজটাকে অতিক্রম করে আমরা সমাজতন্ত্রে সরাসরি উত্তরণ ঘটাতে পারি কী না? এটা করতে গিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে যে সমাজ পরিগঠন লক্ষ্য করা গেছে, যাকে ট্রটস্কি বলছেন, অধঃপতিত শ্রমিক রাষ্ট্র– a degenerated workers' state, যেখানে একটি নতুন এলিটের জন্ম হয়েছিল। এরই পরিণতি হয় এলিট এ the new rulling class। এই এলিটের জন্ম হয়েছিল লেলিন প্রণীত পার্টির মধ্যে পার্টি হিসেবে। আপনি পার্টি যদি করেন, পাটির সভ্য যদি হন, পার্টির বড় কর্তার সাথে যদি সম্পর্ক থাকে, তাহলে সকল সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যাবে। সাধারণ নাগরিকরা সেসব সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে কোন হদিসও রাখতে পারবে না। এর মাধ্যমে যে বিশাল কেন্দ্রীভূত একটি রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে উঠেছিল, তার সাথে জনগণের যে বিচ্ছিন্নতা ক্রমাগতভাবে তৈরী হচ্ছিল, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় যখন কৃষিখাতে বিপর্যয় নেমে আসে।তখন বুখারীন একটি বাস্তবমুখী তত্ত্ব নিয়ে হাজির হন কৃষিকে চাঙ্গা ও পুনর্বিন্যাস করে গতিশীল করার জন্য। বুখারীনের সাথে স্ট্যালিন সুস্পষ্টভাবে ভিন্নমত পোষণ করলেন। শুধু ভিন্নমত পোষণ করলেন না, বুখারীনের অনুগামী ও সমর্থকদের প্রত্যেককে তিনি চিহ্নিত করলেন রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে। শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু হিসেবে। তারপর শুরু হল সেই বিখ্যাত মস্কো ট্রায়াল, যে ট্রায়ালের মধ্যে দিয়ে বুখারীন, জিনোভিয়েব, প্রিয়োব্রাজেন্সকিসহ বহু ত্যাগী বিপ্লবী নেতাকে যারা না হলে সভিয়েত ইউনিয়ন নির্মাণ করা যেতোনা, যারা না হলে হয়তো বলশেভিক বিপ্লব সুচারুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হতো না, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে স্ট্যালিন এককভাবে ওরিয়েন্টাল ডেসপটিজমের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। অপরদিকে স্ট্যালিন এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন, যে রাষ্ট্রটিকে এসেনশিয়ালি বলা যেতে পারে একটি সেন্ট্রালাইজড কর্পোরেটিস্ট স্টেট। যে স্টেট হেভি ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে ওয়ার মেশিনারিজ তৈরী এবং মানব বিধ্বংসী অস্ত্র পর্যন্ত তৈরী করতে সক্ষম ছিলো।

সভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্রের এই সজ্জা ও শক্তি প্রত্যক্ষ করে কম্যুনিজমবিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন সভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী বাঁধতে বাধ্য হয়েছিলো। একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, ইউরোপকে বিভাজন করার ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণের জন্য স্ট্যালিন হিটলারের সঙ্গেও চুক্তি করেছিলেন এবং এই চুক্তিকে সমর্থণ করে অনেক কমিউনিস্ট বলেন যে, স্ট্যালিন শুধু সময়ক্ষেপণ করার জন্য এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি নেয়ার জন্যই এই ব্যবস্থাটি গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখবে যে, ঐ সময়ে শুধু সময়ক্ষেপণ নয়, আরও কিছু ছিল যেটাকে বলা হয় দি এক্সপানশন অব সভিয়েত ইউনিয়ন-এক সময়ে ফিনল্যান্ড পর্যন্ত সভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়ার মতো বালটিক দেশগুলো পর্যন্ত সভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। পোল্যান্ড কীভাবে পার্টিশানড হয়ে সভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে এগুলোর দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাহলে আমাদের কাছে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রপঞ্চটি। দি ফেনমেনন অব দি স্টেট। এটি সর্বহারার রাষ্ট্র না বুর্জোয়ার রাষ্ট্র এটি বড় কথা নয়। রাষ্ট্রের নিজস্ব একটি ধর্ম থাকে, যে ধর্মের কারণে রাষ্ট্র নিজেকে সম্প্রসারিত বা স্ফীত করার চেষ্টা করে এবং এই সম্প্রসারিত ও স্ফীত রাষ্ট্রের আইডিয়াটা আইভান দি টেরিবল থেকে শুরু করে পিটার দি গ্রেট

www.pathagar.com

এবং জারিনা ক্যাথরিন পর্যন্ত সকলে যেভাবে বলকান পলিসি এডপ্ট করেছিল, যেভাবে রাশিয়ান সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, সেই সাম্রাজ্য, সেই বলকান পলিসির সমাহার আমরা দেখেছি স্ট্যালিনকে বারবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্ররোচিত করতে। 'সোশ্যালিজম ইন ওয়ান কান্ট্রি' বলে তিনি এক দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করার নামে তাঁর চতুর্দিকে একটি রক্ষাব্যুহ রচনা করার জন্য, পরিখা খনন করার জন্য, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তিনি সেখানে যেভাবে রেড আর্মিকে ব্যবহার করেছিলেন সেটা আর যাই হোক বিপ্লব ছিলো না। সেটা ছিলো সভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়ার সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থকরণ। এই সমস্ত সংকীর্ণতা এবং যে নিউ এলিট বা নিউ ক্লাসের জন্ম হয়েছে পার্টির মধ্য দিয়ে, যেটাকে জেম্‌স বার্নহাম বলছেন 'দি নিউ ম্যানেজারিয়াল ক্লাস', মিলোভান জিলাস যেটাকে বলছেন 'দি নিউ ক্লাস'– এই নিউ ক্লাস, এই ম্যানেজারিয়াল ক্লাস-এর কারণে একটি কাউন্টার রেভ্যুলেশনের মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে একটি অতিকায় রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ অতিকায় রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ এবং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হাসিল এড়িয়ে পুঁজিবাদী একটি রাষ্ট্রের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং সেই প্রতিযোগিতায় তার মান সম্ভ্রম সংরক্ষণের জন্য জনগণের ওপর করের বোঝা চাপানো এবং জনগণের অধিকার হরণ করা থেকে শুরু করে যতরকম নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নির্যাতন করা সম্ভব, সমস্ত কিছুই করেছে। গুপ্ত পুলিশ, গুপ্ত বাহিনী এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে জনগণকে পণবন্দী করে। এমন এক ধরনের শক্তিশালী রাষ্ট্র পরবর্তী পর্যায়ে নিজেকেই নিজে আর সামাল দিতে পারেনি। তার ভার বহন করার ক্ষমতা সে নিজেই রহিত করে ফেলে এবং তার নিজের ওজনেই নিজে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এর দোষ শুধু সাম্রাজ্যবাদের ওপর যদি আমরা চাপাই তাহলে আমার মনে হয়, মারাত্মক ভুল করা হবে।

মাহবুব উল্লাহ :

এখানে কয়েকটি প্রসঙ্গ এসেছে। একটি হচ্ছে– পূর্ব ইউরোপকে রাশিয়ার ঢাল বা নিরাপত্তাব্যুহ হিসেবে ব্যবহার করা। পূর্ব ইউরোপে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চালু করা হয়েছিল, সেই ব্যবস্থা ছিল ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া এবং অনেকেই মনে করেন যে, সভিয়েত ট্যাংকের নিচেই এই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল। সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর এর জন্য প্রস্তুতি ছিল না। তার চাইতেও বেদনাদায়ক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সমাজতন্ত্র যেখানে প্রত্যেক জাতিকে শোষণ মুক্তির জন্য অভয় দেয়, সেখানে আমরা লক্ষ্য করলাম, অনগ্রসর জাতিগুলোকে বঞ্চিত করার প্রয়াস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট এবং নাজীবাহিনীকে প্রতিরোধ করার নামে রেড আর্মি সহায়তা দিয়েছিল, সেই সহায়তার জন্য ওয়ার রিপারেশনের নামে পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশ থেকে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, নানা ধরনের উৎপাদন সামগ্রী, এমনকি রেলের লাইন পর্যন্ত তুলে নিয়ে যাওয়া হল। একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই ধরনের আচরণ তাদের প্রচারিত আদর্শ ও মতবাদের সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অথচ ঘটনাটি ঘটেছিল এবং এটি একটি নির্মম সত্য। পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে কেন্দ্র করে যে কমেকন্ বা সিএমইএ গঠন করা হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল একটিই। সেটি হচ্ছে, রাশিয়ার বাইরে এই জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো রুশ অর্থনীতির এক ধরনের পশ্চাৎভূমি বা হিন্টারল্যান্ড হিসেবে থাকবে। যে জন্য আমরা লক্ষ্য করলাম, মঙ্গোলিয়ার পশুচারণভিত্তিক অর্থনীতির উন্নয়নে রাশিয়া বাধা দিল এবং মঙ্গোলিয়া থেকে পশুর চামড়া, পশুর দুধ, ভেড়ার পশম ইত্যাদি গেল রাশিয়ায় প্রক্রিয়াজাত দুধ ও শীতবস্ত্র তৈরী করার জন্য। কিন্তু মঙ্গোলিয়ায় শিল্পায়ন হল না। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল পূর্ব ইউরোপের আরও অনেক দেশে। যে কারণে ১৯৫৬ সালের পরে পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। Otasik এবং Janos Kornai-এর মতো অর্থনীতিবিদসহ

www.pathagar.com

অন্যরা সেইসব দেশের অর্থনীতিকে সংস্কার করার প্রয়াস পান। Some Lessons from the Hungarian Experience for Chinese Reformers শীর্ষক প্রবন্ধে Kornai বলছেন ঃ "The proponents of Hungarian reform usually referred to the requirements of higher effieciency, flexibility, innovation, technical progress and better adjustment to consumer demand. Of course, it was constantly emphasised that the ultimate goal was the improvement of the life of people, but it was argued that the main instrument for achieving the ultimate goal was to make production more efficient." কেউ কেউ রাশিয়ার ভীতিকর শাসন ব্যবস্থাকে একটু পরিবর্তণ বা সংস্কার করার জন্য এক নতুন ধরনের ব্যবস্থার কথাও বললেন। সেটা হচ্ছে giving a human face to socialism. আজকে এই সমস্ত প্রয়াসগুলোকে আমরা কিছুতেই অবজ্ঞা করতে পারি না। এড়িয়ে যেতে পারি না। সমাজের বাস্তব অবস্থা থেকেই সেটা সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে আরও বলা দরকার যে, আজকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর সেখানে মার্কেট ইকনমি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই মার্কেট ইকনমির সবচেয়ে শক্তিমান উপাদান হচ্ছে একটি নতুন শ্রেণী- নোমেনক্লেটুরা। এই Nomenkletura কারা? বিজ্ঞজনরা এবং অর্থনীতিবিদরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, অতীতে যারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন এবং এর technocrat ও bureaucrat হিসেবে Communist Party'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বা যোগাযোগ ও সম্পর্শ রাখতেন তারাই এখন নোমেনক্লেটুরা। নতুন শতাব্দী ও নতুন সহস্রাব্দের সূচনালগ্নে রাশিয়ায় ইয়েলৎসিন পদত্যাগ করলেন। তিনি এক সময় সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। এই ইয়েলৎসিনের পদত্যাগের পর পুটিন যখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, রাশিয়ার অ্যাকটিং হেড সব দি স্টেট হিসেবে, তখন তিনি একটি ডিক্রি জারি করেন, যেটি হচ্ছে ইনডেমনটি ডিক্রি। এই ডিক্রির উদ্দেশ্য হচ্ছে- ইয়েলৎসিন অন্যায়ভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে যে সমস্ত সম্পদ আহরণ করেছেন, তাঁর পরিবারবর্গ যেসব সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন সেগুলোর ব্যাপারে আদালতে আর কোন অভিযোগ গঠন করা যাবে না। রাশিয়ার ডুমা থেকেও কোন অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না। এ থেকে একটা জিনিস স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মিলোভান জিলাস যে নিউ ক্লাসের আশঙ্কা করেছিলেন, সেই ধরনের একটি ক্লাসই সেখানে শাসন করত। প্রাইভেট প্রপার্টি আইনগতভাবে উচ্ছেদ করলেই তা উচ্ছেদ হয়েই যায় না। আমাদেরকে দেখতে হবে যে, ডিফ্যাক্টো এবং ডিজিয়োরে প্রাইভেট প্রপার্টি রাইটসের মধ্যে পার্থক্য আছে কী না। ডি জিয়োরে প্রাইভেট প্রপার্টি উচ্ছেদ হলেও ডি ফ্যাক্টো প্রাইভেট প্রপার্টি থেকে যেতে পারে। আমাদের দেশে একজন আমলা যখন বিরাট ধরনের ম্যানশনে বাস করেন, অথবা একটা বিলাসবহুল গাড়ী ব্যবহার করেন, সেটা তাঁর প্রাইভেট প্রপার্টির মতই ব্যবহৃত হয়। রাশিয়ার অনেক কমিউনিস্ট নেতার ডাচা ছিল অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে বা মুক্ত পরিবেশ তারা বিরাট বাগানবাড়ী তৈরী করতেন এবং সেখানে তারা অবকাশ যাপন করতেন। কাজেই সেখানে যারা পার্টিতে ছিলেন, তাদের সঙ্গে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যখন পাউরুটি, দুধ, মাখন পাচ্ছে না, তখন কমিউনিস্ট আমলারা তাদের জন্য সংরক্ষিত বাজারে বিলাসবহুল দ্রব্য কিনতে পারতেন। এই ভেদাভেদগুলো কেন সৃষ্টি হয়েছিল, এটা বোঝা কঠিন। একটা পুঁজিবাদী দেশে একজন অতি ধনাঢ্য ব্যক্তিও যেমন বাজারে যেতে পারেন একজন দরিদ্র ব্যক্তিও সে বাজারে যেতে পারেন। কিন্তু একটা সমাজতান্ত্রিক দেশে একেবারে পার্টি আমলাদের জন্য আলাদা করে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ব্যবস্থা কী করে সম্ভব হয়, নৈতিকতার দিক থেকে কীভাবে যুক্তিসঙ্গত হয়, সেটা বুঝে ওঠা কঠিন। আমাদের দেশের অনেক কমিউনিস্ট এই ব্যাপারগুলোকে লক্ষ্য করেন নি এবং আমাদের দেশে যারা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বলেন, তারা যদি এই জিনিসগুলো ভুলে যান, তাহলে প্রচণ্ড ভুল করবেন।

www.pathagar.com

আফতাব আহমাদ :

আসলে সভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা সমাজতান্ত্রিক শিবির যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে না, তার প্রলক্ষণগুলো পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই দেখা গেছে। স্ট্যালিনের জীবদ্দশাতেই টিটোর নেতৃত্বে ইউগোশ্লাভিয়া সভিয়েত শিবির থেকে বেরিয়ে এসেছিল। স্ট্যালিন হুমকি দিয়েছিলেন যে, তিনি ইউগ্নোশ্লাভিয়া ইনভেড করবেন, কিন্তু তিনি তা করার সাহস পাননি। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে লক্ষ্য করেছি ১৯৫৬-তে যখন হাঙ্গেরী সংস্কার আনার চেষ্টা করেছে তখন সেখানে নির্মমভাবে সভিয়েত ট্যাংক সে প্রচেষ্টাকে বিদ্রোহ বলে অভিহিত করে দমন করেছে। ১৯৬৮ তে ডুবচেকের নেতৃত্বে চেকোশ্লোভাকিয়া যখন socialism with a human face দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিল, তখন একইভাবে, নির্মমভাবে সভিয়েত ট্যাংক সে প্রচেষ্টাকে নির্মূল করে দেয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, পোল্যান্ডে লেখ ভাওয়েজ্ঞার নেতৃত্বে সেখানে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠছিল কম্যুনিস্ট নির্যাতনের বিরুদ্ধে। একবার ভেবে দেখুন, কম্যুনিস্ট পার্টি রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য, আর সেখানে শ্রমিক শ্রেণী কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে– পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল যে, গোমুলকাকে উৎখাত করার পর ক্ষমতায় আসা গিয়েরেকের শুধু প্রাইভেট ভিলা ছিল না, তার প্রাইভেট দ্বীপও ছিল। তার প্রাইভেট হারেম ও ক্যাসিনো ছিল। এগুলো শুধু যে পাশ্চাত্য জগতের পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তাই নয়, জেনারেল ইয়েরোজেল্স্কি যখন প্রথমবারের মতো একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামরিক আইন জারি করলেন, তখন তিনি নিজে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে সেই সব তথ্য স্বীকার করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ভেতর থেকেই তিলে তিলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরটি কীভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরটি কীভাবে ফোকলা হয়ে উঠছিল। পরবর্তী পর্যায়ে যে বিপর্যয় আমরা লক্ষ্য করেছি, ১৯৮০'র দশকের পরে– সে বিপর্যয়ের জন্য মূলত দায়ী হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের স্টেট ক্রাফট ম্যানেজমেন্টের নিউ অ্যারেঞ্জমেন্টট। এই নিউ অ্যারেঞ্জমেন্টটা হচ্ছে– না আইন সভার ওপর, না নির্বাহী বিভাগের ওপর, না সশস্ত্র বাহিনীর ওপর নির্ভর করা। শুধুমাত্র নির্ভর করা গোয়েন্দা বিভাগের ওপর। এই ইন্টেলিজেন্স এস্ট্যাবলিশমেন্ট বহির্বিশ্বে এসপিওনাজ নেটওয়ার্ক যেমন একদিকে গড়ে তুলেছে, অপরদিকে দেশের ভেতরে প্রতিটি নাগরিকের ওপর এমনকি দলের কর্মীদের ওপরও গোয়েন্দাগিরি করেছে। অর্থাৎ যে নতুন শ্রেণীর জন্মলাভ হয়েছিল ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে, ওয়ার কম্যুনিজমের ব্যর্থতার পর নিউ ইকনমিক পলিসি সে ডেলিভারী দিতে পারেনি। কারণ লেনিনের মৃত্যুর পরপরই আমরা দেখেছি, স্ট্যালিন নিউ ইকনমিক পলিসিকে ডিসকার্ড করে ফোর্সড কালেকটিভাইজেশনের দিকে চলে গেলেন। তিনি একটি নতুন শ্রেণীর জন্ম দিলেন, যে শ্রেণীর বিকাশ হয়েছে একমাত্র রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে একটা সম্পর্ক বজায় রেখে– যেটাকে অনেক সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিত পরবর্তী পর্যায়ে বলেছেন ব্যুরোক্রেটিক কালেকটিভিজম এবং এই যে প্রাইভেট প্রপার্টির নতুন কনসেপ্ট ডেভলপ হলো, যেটি একটু আগে ড. মাহবুব উল্লাহ বললেন, ডিজিয়োরে এবং ডি ফ্যাক্টো প্রপার্টি। চার্লস বেটলহ্যাম এ সম্পর্কে খুব চমৎকারভাবে বলছেন– দি জুরিডিকাল কন্ট্রোল ওভার প্রপার্টি–এটিই হচ্ছে নিউফর্ম অব প্রাইভেট প্রপার্টি। অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ যদিও ডিজেয়োরে মালিকানা দেয় না, ডিফোক্টো মালিকানা দেয়– এটি সম্ভব, কেননা ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সেই সম্পত্তি বা সম্পদের ওপর একটি জুরিডিকাল কন্ট্রোল বাই এ লিগ্যাল সিস্টেম স্ট্যাবলিশড হয় এবং এই লিগ্যাল সিস্টেমটাই সাসটেইন করেছিল যেটাকে বলা হয় দি পার্টি অ্যাপারেচিক। পার্টি একটা লেভ্যায়াথান হিসেবে সেখানে জন্মলাভ করে বৃহদাকার একটি মৎস্য প্রাণীর মতো সমগ্র সমাজের শ্রেয় ও কল্যাণকর সমস্ত কিছুকে গ্রাস করে এক ধরনের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেটা কোন অবস্থাতেই সর্বহারার একনায়কত্ব ছিল না।

www.pathagar.com

সর্বহারার অগ্রবর্তী দলের একনায়কত্ব ছিল না। ছিল একটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় অংশের একনায়কত্ব। যে একনায়কত্বের ভারে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। শুধু সামান্য একটু ধাক্কার প্রয়োজন ছিল এবং সেই ধাক্কা এসেছিল গণতন্ত্রের থার্ডওয়েভ থেকে।

ওয়ারসো জোট থেকে বেরিয়ে আসা আলবেনিয়া এবং ওয়ারসো জোটের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও রুমানিয়া এক পর্যায়ে ওয়ারসোর মিলিটারী এক্সারসাইজে অংশগ্রহণ করেনি। কারণ, সভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রাতিক আধিপত্যবাদ যেটাকে পরবর্তী পর্যায়ে অনেক সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন– এই প্রবণতাগুলোকে রোধ করার জন্য যে গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলো সভিয়েত বলয়ের বাইরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে পরিচালিত হয়, বা সাধিত হয়, তারই কাউন্টার ইফেক্ট হিসেবে সভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে একটি প্রলয়ংকারী অবস্থার সৃষ্টি হয়। যে প্রলয়ংকারী অবস্থার ফলে সভিয়েত ইউনিয়নের পার্টির মধ্যে বিভাজন দেখা দেয় এবং গর্বাচেভ ইয়েলৎসিনের মতো লোকের উত্থান ঘটে।

মাহবুব উল্লাহ :

গর্বাচেভ তো কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র পতনের জন্য ব্যক্তিগতভাবেই দায়ী নন। তার মধ্যে কোন সমাজতান্ত্রিক নীতিবোধ ছিল কিনা, সে ব্যাপারেই সন্দেহ আছে। তিনি ব্যবহার করতেন অত্যন্ত দামী ঘড়ি, কলম ইত্যাদি। এছাড়া এমন কোন দামী বিলাস দ্রব্য ছিল না যেটা তিনি ব্যবহার করতেন না এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি হিসেবে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন।

অনেক ক্লাসিক্যাল কমিউনিস্ট মনে করেন, স্ট্যালিন জাতিগত সমস্যার সমাধান করেছিলেন। একথা সত্য যে, জাতিগত সমস্যার প্রশ্নে স্ট্যালিন চমৎকার তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। বাস্তবে তিনি সেটা কিভাবে প্রয়োগ করেছিলেন সে ব্যাপারে আজকে অনেক তথ্যই উদঘাটিত হচ্ছে। তিনি যে সমস্ত জাতিগোষ্ঠীকে বিশ্বাস করতে পারেননি, তাদেরকে তাদের নিজস্ব ভূ-খণ্ড বা পৈতৃক নিবাস থেকে উৎখাত করে অন্যত্র সেটেল করিয়েছেন। এভাবেই তিনি জাতিগত দ্বন্দ্ব বা সমস্যার সমাধানের একটা ন্যককারজনক পলিসি নিয়েছিলেন। এতে তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের একটা বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। আজকে সমাজতান্ত্রিক শিবির ধসে পড়ার পেছনে তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও স্থবিরতাকেই দায়ী করতে হবে। আমরা কেবল সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী করে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাব না। সভিয়েত ইউনিয়নের অনেক অর্থনীতিবিদ এই সমস্যাগুলো স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন এবং এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। রাশিয়ার Liberman এটা করার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের বুঝতে হবে, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে সেটা ধর্মানুভূতি বা পজেসিভ ইন্সটিংট অথবা মানুষের পারস্পরিক আচরণের প্রশ্নেই হোক না কেন, কোন Social experiment সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

৫ ফেব্রুয়ারী ২০০০

ক্ষমতার স্বরূপ ও প্রয়োগ

মাহবুব উল্লাহ :

আমরা গত এক সংখ্যায় অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, বাংলাদেশে আজ যে মারাত্মক ধরনের অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে, তার পেছনে কাজ করছে নোংরা ক্ষমতার চর্চা। কাজেই ক্ষমতার বিষয়টি আমাদের বোঝা দরকার। ক্ষমতা মানুষ যেমনি মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে পারে, তেমনি ক্ষমতাকে মানুষ মানুষের অনিষ্ট করার জন্যও ব্যবহার করতে পারে।

বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে 'Power'. রাসেল সেখানে বিভিন্ন ধরনের Power বা ক্ষমতার কথা বলেছেন। যেমন- Priestly power, Kingly Power, Naked Power, Revolutionary Power, Economic Power, Power Over Opinion, Creeds as Sources of Power, Organizational Power ইত্যাদি। আসলে ক্ষমতার এতো সব রূপ আছে যে, সম্ভবত রাসেল যে রূপগুলোর কথা বলেছেন, এর বাইরে গিয়েও ক্ষমতার রূপ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারি। যেমন- আজকের যুগের মার্কেট ইকনমিতে Market Power একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট। এই মার্কেট পাওয়ার একদিকে যেমন হতে পারে কমপিটিটিভ মার্কেট পাওয়ার, অন্যদিকে তেমন হতে পারে মনোপলি মার্কেট পাওয়ার। কমপিটিটিভ মার্কেট পাওয়ার থাকলে বুঝতে হবে বিভিন্ন উৎপাদনকারী সংস্থা বা ফার্ম একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে নিজ দক্ষতা ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষের ফলে, প্রযুক্তির শক্তিতে উৎপাদন ব্যয় কমানোর মাধ্যমে এবং মুনাফার পরিমাণ বাড়ানোর মাধ্যমে। অন্যদিকে মনোপলি মার্কেট পাওয়ারের বাজারে উৎপাদনকারী থাকে একজন এবং ক্রেতা থাকে অনেকজন। আর এ বাজারে অন্য প্রতিযোগীদের প্রবেশাধিকার থাকে না। এছাড়া আজকের দিনে ক্ষমতার আরেকটি দিক নির্দেশিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে Social Capital বা সামাজিক পুঁজি। এটিও ক্ষমতার একটি উৎস হতে পারে। আমরা Capital-এর কথা জানি, কিন্তু সোশ্যাল ক্যাপিটাল সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট তেমন কোনো ধারণা নেই।

Capital বা পুঁজি হচ্ছে একটি কোয়ার্সিভ সোশ্যাল পাওয়ার। ক্লাব, রাজনৈতিক দল, সংস্থা, সংগঠন, সামাজিক নেটওয়ার্ক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতাধর হতে পারেন। এই ক্ষমতা দিয়ে তাঁরা পার্থিব সম্পদ আহরণ করতে পারেন। এটাই হচ্ছে সোশ্যাল ক্যাপিটালের ধারণা। এটি গরীব-ধনী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। Power সম্পর্কে আরো বহু লেখক-চিন্তাবিদ লিখেছেন এবং গবেষণা করেছেন। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে জন কেনেথ গলব্রেথের The Anatomy of Power. এছাড়া Power সম্পর্কে আরও অনেকে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সি রাইট মিল্স, চার্লস এস লিন্ডব্লম, রিচার্ড সেনেট এবং ডেনিস রস। সি রাইট মিলসের বইটি একটি গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। বইটির নাম হচ্ছে- The Power Elite. অন্যদিকে চার্লস এস লিন্ডব্লমের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম হচ্ছে Politics and Markets. রিচার্ড সেনেট এবং ডেনিস রসের বই দু'টির নাম যথাক্রমে Authority এবং Power. এছাড়া Power সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলীরও আলোচনা আছে। আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশে মৌর্য রাজাদের আমলে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা জানি। যে অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য রাজার ক্ষমতাকে

www.pathagar.com

কীভাবে নিরঙ্কুশ করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়া কৌটিল্যের কাছাকাছি সময়ে তিরু ভল্লভর তাঁর 'দি কুরাল' গ্রন্থে Power এবং রাজার ক্ষমতা ও গুণাবলী সম্পর্কে বেশ কিছু ভার্সেস সংকলিত করেছেন। যেমন– These four unfailing mark a king : Courage, liaberality, wisdom and energy. সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ক্ষমতা সম্পর্কে অন্তত গত দু'হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে আলোচনা চলছে। বাংলাদেশের সমাজের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অর্জনের জন্য সৃষ্ট দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে আজকে বাংলাদেশী সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং বলা যায়, প্রত্যক্ষভাবেই দু'টি শিবির একে অপরের সঙ্গে ক্ষমতার জন্য লড়াই করছে। এর ফলে আমাদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের বীতশ্রদ্ধ ভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যাঁরা এই ক্ষমতার লড়াইয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন তারা বুঝবেন যে, এ লড়াই নিছক ক্ষমতার লড়াই নয় এবং এই লড়াইয়ের সঙ্গে জনগণের স্বার্থের একটা সংশ্লিষ্টতা আছে। জনগণকে বুঝতে হবে, এই লড়াইয়ে আজকে তারা কোন দিকে অবস্থান নেবে। যেটা তাদের স্বার্থের অনুকূলে সেইদিকে, না যেটা জাতীয় স্বার্থবিরোধী, রাষ্ট্রীয় স্বার্থবিরোধী, সেই দিকে? সুতরাং ক্ষমতা সম্পর্কে একদিকে যেমন একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তেমনি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও বিদ্যমান।

আমরা কবি শেলীর একটি বিখ্যাত কবিতার উদ্ধৃতি দিতে পারি। তিনি বলছেন,

"...Rulers who neither see. nor feel, nor know,
But leech-like to their fainting country cling,
Till they drop, blind in blood, without a blow".

এটা শেলী তার সময়কার রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে বলেছেন। তাঁর এই কবিতাটির মর্মার্থ হচ্ছে যে, শাসকরা দেখতে পায় না, অনুভব করতে পারে না, বুঝতে পারে না। কিন্তু জোঁকের মত তাঁরা দেশের ওপর আঁকড়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা রক্তচোষণ করে ঝরে পড়ে তাদেরকে কোন আঘাত করার আগেই। শেলী সম্ভবত তাঁর সময়কার রাজনৈতিক পরিবেশের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন।

আজকে আমরা যদি বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে তাকাই, তাহলেও এরকম অনেক নিরাশাবাদী লোককে দেখতে পাব– যারা মনে করে, গ্রাম্য প্রবাদে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। অর্থাৎ যে ক্ষমতার লড়াইয়ের সাথে জনগণের স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই, সেই লড়াইয়ে জনগণের অংশগ্রহণেরও প্রশ্ন নেই। অথচ সেই লড়াইকে কেন্দ্র করে প্রজাসাধারণের অনেক ক্ষতি হয়। আমাদের পূর্বেকার আলোচনায় অপরাধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলাম যে, বাংলাদেশের অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে রাজনীতির একটা সংশ্লিষ্টতা যুক্ত হয়েছে এবং এই রাজনীতিকে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করা হয়। একথাও বলা হয় যে, রাজনীতিকে যদি দুর্বৃত্তায়ন থেকে মুক্ত না করা যায়, তাহলে এ দেশে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। সুতরাং ক্ষমতার বিষয়টি আমাদেরকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। সেটা অবশ্যই গণতন্ত্র, জনকল্যাণ এবং জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অন্যদিকে ক্ষমতা মানুষের অকল্যাণের জন্য যেভাবে ব্যবহৃত হয়, সেটাও আমাদেরকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে।

আফতাব আহমাদ :

যে কোন রাজনৈতিক দর্শনের সেন্ট্রাল কনসেপ্ট হচ্ছে Power বা ক্ষমতা। এই ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডাব্লিউ ডাব্লিউ নর্টন তাঁর Power : A New Social Analysis গ্রন্থে বলেছেন, "Of the infinite desires of man. the chief are the desires for power and glory." রাজনীতিতে ক্ষমতার উৎস হিসেবে আমরা

www.pathagar.com

দু'টি অথবা উভয়ের অ্যামালগমের কথা উল্লেখ করতে পারি। এগুলো হচ্ছে- Physical and organizational resources যা একটি অর্থনীতি এবং সমন্বিত ব্যক্তিবর্গ coordinated individual গণ produce করে থাকে। ক্ষমতার এ দু'টি রূপ ধারনকে আমরা exchange power এবং coordination power হিসেবে অভিহিত করতে পারি। ক্ষমতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে যে তত্ত্বটি দু'জন বিখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন, থমাস হবস এবং কার্ল মার্কস। এঁদের দু'জনকেই greatest political power theorists বলা হয়ে থাকে।

ক্ষমতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'লেভ্যায়াথান' গ্রন্থে থমাস হবস বলেছেন, "Power is one's present means to obtain some future apparent good, আর জীবন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "life itself is a perpetual and restless desire of power and only power that ceaseth only in death." অর্থাৎ মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত কেবল ক্ষমতা এবং ক্ষমতাই মানুষ ভোগ করতে চায়। এ সম্পর্কে থমাস হবসের প্রায় দু'শতাব্দী পরে বিশিষ্ট মার্কিন পণ্ডিত এবং রাষ্ট্রনায়ক আলেকজান্ডার হ্যামিলটন ৩৩নং Federalist Paper-এ বলেছেন, ক্ষমতা হচ্ছে সেই এবিলিটি বা ফ্যাকাল্টি, যার দ্বারা কিছু করা যায় এবং এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ম্যাকস ভেবার ক্ষমতা সম্পর্কে বলেছেন, 'এটি এমন এক সম্ভাবনা যেখানে একজন অ্যাক্টর একটি সামাজিক সম্পর্কের ভিতরে নিজের ইচ্ছাকে অপরের অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কার্যকর করতে পারবে। ম্যাক্স ভেবার তাঁর Economy and Society গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ক্ষমতাকে এভাবেই দেখার চেষ্টা করেছেন। আর মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাজওয়েল এবং আব্রাহাম ক্যাপলন ক্ষমতার চর্চাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এটি এমনভাবে act করে, যা অন্যের অ্যাক্টকে এফেক্ট করে বা ডিটারমিন করে।

এভাবে আমরা ক্ষমতার নানা সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তা দীর্ঘই হবে। কিন্তু আমাদের মূল যে জায়গাটায় আসা দরকার, সেটি হচ্ছে, এই ক্ষমতা বা ক্ষমতার মূল লক্ষ্যটা কী? মূল লক্ষ্য যদি মানুষের কল্যাণ, মানুষের হিত সাধন হয়, তাহলে রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার চালচিত্রটা আমাদের একটু বোঝা দরকার। একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় power exercise করার অনেকগুলো instruments থাকতে পারে। এগুলোর সোর্স বা উৎস, যথাক্রমে ব্যক্তিত্ব, সম্পত্তি এবং সংগঠন- এই তিনটির ওপর যদি আমরা আলোকপাত করি, তাহলে প্রথমেই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে ব্যক্তিত্বের ওপরে। বিশেষ করে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আমরা জানি যে, এখানে এক ধরনের সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে, যেটাকে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলি ক্যারিজমাটিক লীডারশীপ। এইসব ক্ষেত্রে যে কোন নেতৃত্বের সম্ভূতি/কারিশমা বা ক্যারিজমা একটি শাসক গোষ্ঠীর যেমন পতন ঘটাতে পারে, তেমনি নতুন মূল্যবোধ সঞ্চার করে পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীকে প্রতিস্থাপনও করতে পারে। ক্ষমতার এ ধরনের পালাবদলকেই বোধ হয় Exchange Power হিসেবে সমাজবিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। আবার এই ক্যারিজমাকে চমৎকারভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা একটি শাসকগোষ্ঠীর শাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতাকে নিশ্চিত করতে পারে। "The power of a charismatic leader backed by large numbers may readily bring down a regime but may not have much value in creating a new one in its place or in maintaining one. Exchange power may be especially valuable in maintaining a regime"- এক কথায় বলা যায় যে, ক্ষমতার একটি Typical casual notion রয়েছে। এর application produces results, সেটা কী?

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে হবস বলেছেন যে, সার্বভৌম সত্তার যদি ঐ ধরনের ক্ষমতা না থাকে, যে ক্ষমতার দ্বারা সার্বভৌমত্ব সৃষ্টি করার যে মূল কারণ– অর্থাৎ সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা; সেটি যদি চরিতার্থ করা না যায়, তাহলে ঐ ক্ষমতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। মার্কস ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন– উৎপাদন সম্পর্ককে বিন্যাস করে, ব্যাখ্যা করে এবং মার্কসের কাছে শ্রেণী, বিশেষ করে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা নির্ভর করছে– উৎপাদন সম্পর্কে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা নির্ভর করছে– উৎপাদন সম্পর্কে শাসক শ্রেণীর অবস্থান কী, তার ওপরে। মার্কস স্পষ্টভাবে ধরতে পেরেছেন উৎপাদনী শক্তি, কৃৎকৌশল এবং সমাজের শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য যে তদারকি করতে হয় সেই ব্যবস্থা পুঁজিবাদী উৎপাদনী প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি তা চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন। এটি দেখাতে গিয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই প্রক্রিয়ার ভেতরে দিয়ে অর্থাৎ এই mode of production কে জন্ম দিতে গিয়ে একদিকে প্রোলেতারিয়েত বা সর্বহারার যেমন জন্ম হচ্ছে, আরেকদিকে একটি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিকাশ ঘটছে। মার্কসের মতে– that mode while it created a proletariat, also created a state apparatus; while it has remained intact, has been impervious to threat from revalutionary class অর্থাৎ রাষ্ট্র যেমন একদিকে অটুট থাকছে, অপরদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে যে power চ্যালেঞ্জ বা হুমকি হতে পারে অর্থাৎ মার্কসের ভাষায় সেই বিপ্লবী শ্রেণীও সংগঠিত হতে থাকে এবং দু'য়ের ক্ষমতার ভারসাম্য যেমন একের পক্ষে চলে আসে, তখনই এক্সচেঞ্জ পাওয়ার অপারেট করার একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত সৃষ্টি হতে পারে। এজন্যই মার্কসকে হবসের মতই কনফ্লিক্ট থিওরিস্টদের পর্যায়ে ফেলা হয়। কনফ্লিক্ট বা দ্বন্দ্ব যখন স্যাচুরেশনের পয়েন্টে-চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায়, তখন পালাবদল অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ক্ষমতা একদিকে যেমন ভোগের বিষয়, আরেকদিকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য চর্চার বিষয়।

অনেকে মনে করেন, ধ্বংস এবং সৃষ্টি করার ক্ষমতা বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন। এটা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি একই বস্তুতে দ্বান্দ্বিকতার সূত্র অনুযায়ী দু'টি সত্তাই একই সঙ্গে অবস্থান করতে পারে। ঠিক তেমনি the power to destroy and the power to create একই প্রক্রিয়ায় অঙ্গাঙ্গীভাবে সহাবস্থান করতে পারে। একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমরা গমকে ধ্বংস করি আটা বা ময়দা পাওয়ার জন্য। আটা এবং ময়দাকে ধ্বংস করি, রুটি বা পাউরুটি পাওয়ার জন্য। এখানে ডেস্ট্রাকশন ও ক্রিয়েশনের কাজটি ওতপ্রোতভাবে একই সত্তার মধ্যে বিরাজ করে। সমাজেও যদি ডেস্ট্রাকশনের পরে ক্রিয়েশনের একটি বিকল্প তৈরী না হয়, তাহলে কোন ডেস্ট্রাকটিভ পাওয়ারকে কোন অবস্থায় জাস্টিফাই করা যাবে না। কারণ, এই পাওয়ার কমিউনিটির জন্য কোন বেনিফিট নিয়ে আসে না। ডেস্ট্রাকটিভ পাওয়ারে involved হচ্ছে cost আর কন্সট্রাকটিভ পাওয়ারে invoved হচ্ছে its benifits. Benefits যখন costs কে exceed করে যায় কেবল মাত্র সেই groundয়েই ডেস্ট্রাকটিভ পাওয়ারকে জাস্টিফাই করা যায়। এ কারণে ক্ষমতাকে বুঝতে ও অধ্যয়ন করতে গিয়ে তার নানা মাত্রা সম্পর্কে পণ্ডিতজনেরা আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করেছেন। প্রধানত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতাকে তাঁরা দেখার চেষ্টা করেছেন। একটি থ্রেট পারসেপশন, অপরটি ইকনমিক পারসেপশন এবং সবশেষে ইনটেগ্রিটি পারসেপশন থাকে। থ্রেট পারসেপশন থেকে যখন ক্ষমতার মূল্যায়ন পণ্ডিতরা করার চেষ্টা করেন, তখন তারা আরেকটি কনসেপ্ট পাশাপাশি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। সেটি হচ্ছে ফোর্স বল বা শক্তি। যার অর্থ হচ্ছে অন্যের ওপরে বল প্রয়োগ করা। অর্থাৎ অন্যে যে কাজটি করতে চাইছে, সে কাজ থেকে তাকে নিবৃত্ত করা বা বিরত রাখার জন্য কিংবা তাকে ভিকটিমাইজ করার জন্য বল প্রয়োগ করা অথবা অন্যে

www.pathagar.com

যখন হুমকি দেখায়, চোটপাট্ করে তখন পাল্টা হুমকি বা চোট্পাট্ দেখানো। অথবা যে বল প্রয়োগ করতে চায়, তাকে নিরস্ত বা নিবারণ করা। এইসব দিক থেকে থ্রেট পারসেপশনটি আমরা বুঝতে পারি। ইকনমিক পারসেপশন থেকে ক্ষমতাকে বিচার করতে গেলে ধনী এবং দরিদ্রের অর্থনৈতিক বুনিয়াদই বলে দেবে, ক্ষমতা কার বেশী, কার কম। আর ইনটিগ্রেটি পারসেপশন থেকে লয়্যালটি, লেজিটিমেসি, অ্যাফেকশন, কমিউনিটি, ফ্র্যাটার্নিটি বা আইডেনটিটি– এই ধরনের যে সমস্ত বিষয়-আশয় মানুষকে সংগ্রথিত করে, সংযুক্ত করে এক ধরনের ক্ষমতা প্রদান করে– বিশেষ সত্তা সৃষ্টি করে, যে সত্তা কোন অবস্থাতেই আর চ্যালেঞ্জের বা ভারসাম্যহীনতার সম্মুখীন হয় না। স্থিতি বজায় রাখতে পারে বলেই এ সত্তাকে ইনটিগ্রেটিভ পাওয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মাহবুব উল্লাহ :

ড. আফতাব ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। খুব সাদামাটা ভাষায় আমরা যেটা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে– ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করার যে সক্ষমতা, সেটাই ক্ষমতা। একটি ঐতিহাসিক উক্তি থেকে আমি উদ্ধৃতি দিতে পারি। 'ইউনিভার্সাল সভরেইনটি ডাজ নট বিলং টু এনি ইনডিভিজুয়াল টু দি এক্সক্লুশন অব অল দি রেস্ট, অ্যান্ড নো ওয়ান এভার স এ ডাইনেস্টি হুইচ কুড কাউন্ট এ হানড্রেড জেনারেশন অব এমপায়ার্স'। পজেশন অ্যান্ড পজেশন ওনলি– গিভস ও রাইট টু গভার্ন।' এই উক্তিটি চীনে যে তাইপেং বিদ্রোহ হয়েছিল মানচু সম্রাটদের বিরুদ্ধে ১৮৫০ সালে, সেই বিদ্রোহের নেতা Tiente-এর। তিনি প্রশ্ন তুলছেন যে, মানচুরা, যারা বিদেশী তারা আমাদের চীনের ১৮টি প্রদেশ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারে কী? দেখা গেছে, বিশ্বের প্রায় সব দেশেই সামরিক ক্ষমতা বা অস্ত্রের ক্ষমতার বলে মানুষ জমির মালিক হয়েছে। যেমন, ইংল্যান্ডের ভূস্বামীরা যেভাবে জমির মালিক হয়েছে তার পেছনে ছিল স্যাকসনদের উইলিয়াম দি কংকারারদের ওপর লুণ্ঠন এবং হেনরি দি এইটথ কর্তৃক চার্চের জমিগুলো বাজেয়াপ্তকরণ। আমেরিকার ক্ষেত্রে রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আফ্রিকার স্বর্ণ ও হীরকও জোরজবরদস্তি করে নিগ্রো কালো মানুষদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল। তাহলে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সর্বত্রই জমির মালিকানা শেষ বিচারে অস্ত্রের শক্তির ওপরে নির্ভর করে। তাহলে এই ব্রিগেনডেজ বা ছোটখাটো সশস্ত্র দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে আমরা কেন কথা বলি না? আমরা যদি বলি যে, ধনীদের সম্পদের ওপর তাদের অধিকার নেই, তাহলে বোধ হয় যুক্তিটা ধোপে টেকে না। কারণ, আজকে যিনি ধনী ব্যক্তি তিনি যে সম্পদ বা জমির মালিক হয়েছেন, অতীতে তার কোন পূর্বপুরুষ হয়তো লুটতরাজ করেই এই সম্পদের মালিক হয়েছেন। আপত্তিটা আসলে অন্য জায়গায়। সেটা হচ্ছে এই যে, যদি আমরা মনে করি, সমাজে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা দরকার, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই একটা ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে। সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষ যদিও শক্তি দিয়ে সম্পত্তির মালিক হয়, কিন্তু সেই মালিকানাকে আইনগত বা লিগ্যাল এনেকমেন্টের মাধ্যমে একটা স্যাংশান নিতে হবে। রাষ্ট্রের ভেতরের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব যে, সরকার আইন করে দিয়েছে যে, কেউ কারও ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা বা কারও জীবন বিনষ্ট করতে পারবে না। অর্থাৎ একজন মানুষ সম্পত্তির যে অধিকার ভোগ করে, সেটা একটা ম্যাটার অব কনভিনিয়েন্স ছাড়া আর কিছু নয়।

যদি আমরা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্কের কথা ধরি, তাহলে দেখব যে, তিয়েনতে যে যুক্তি দিয়েছিলেন, সেটাই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুবার প্রযোজ্য হয়েছে। যেমন– একটি যুদ্ধ জয়ী জাতি পরাজিত শত্রুর কাছ থেকে জোরজবরদস্তি করে যা কিছু সম্ভব আদায় করে নেয়। যেটা নেপোলিয়ন করেছেন, জার্মানরা করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও এই ধরনের ঘটনা

www.pathagar.com

ঘটেছে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষমতা, শক্তি বা অস্ত্রকে ব্যবহার করে এক ধরনের আন্তর্জাতিক দস্যুতা চলছে। এই দস্যুবৃত্তি থেকে যদি পৃথিবীকে মুক্ত করতে হয়, তাহলে পৃথিবীকে অবশ্যই যুদ্ধ থেকে মুক্ত করতে হবে। আর যুদ্ধ থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের ভবিষ্যতে হয়ত একটি বিশ্ব সরকারের স্বপ্ন দেখতে হবে এবং সে বিশ্ব সরকারের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকতে হবে, যাতে এই ধরনের কোন ঘটনা আর না ঘটে এবং এতেই সম্ভবত একটা স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমরা আমাদের পূর্বের আলোচনায় বলেছিলাম যে, রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের অনেক সময়ে একটা বিরক্তি থাকে। শেলীর উল্লিখিত কবিতায় তিনি ইংল্যান্ডের রাজা জর্জ দি থার্ডকে একজন "ওল্ড ম্যাড্, ব্লাইন্ড, ডেসপাইস্ড অ্যান্ড ডায়িং কিং" হিসেবে বর্ণনা দিয়েছিলেন।

শেলীর এই বর্ণনার সাথে যে কোন উদারমনা মানুষই হয়তো একমত হবেন। কিন্তু মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, মানুষ পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, অনেক পশুই যেটা পারে না। যে কারণে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিশাল বরফ যুগের পর পৃথিবীতে বহু প্রাণীর অস্তিত্ব বিনাশ হয়েছে এবং আমরা লক্ষ্য করেছি পশুরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু মানুষই হচ্ছে একমাত্র প্রাণী, যারা সেই বিশাল বরফ যুগ, বিভিন্ন যুদ্ধ, মহামারী বা বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। তাই মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার পূর্বপুরুষকে অন্ধভাবে অনুকরণ না করা এবং পরিবর্তিত অবস্থায় নিজের মেধা, বুদ্ধি এবং যুক্তি প্রয়োগ করে নিজের জন্য নতুন পন্থার ব্যবস্থা করা। ক্ষমতাকে যদি এভাবে ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের জন্য কল্যাণের কাজে যদি ক্ষমতাকে ব্যবহার করা যায়, তাহলে আমরা দেখব যে, ক্ষমতাটা একটা কল্যাণময়ী রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আসছে। আমার মনে হয়, ক্ষমতার প্রশ্নে আলোচনা করতে গেলে মানুষে মানুষে বৈষম্যের প্রশ্নটিও আলোচনা করতে হবে। কারণ, মানুষে মানুষে বৈষম্য যদি থাকে, তাহলে ক্ষমতার অ্যাসিমেট্রি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। এখন আমরা কীভাবে মানুষে মানুষে বৈষম্য কমাতে পারি এবং তার পাশাপাশি মানবকল্যাণ কীভাবে বৃদ্ধি করতে পারি, সেটা নিয়ে আলোচনা করব।

আফতাব আহ্মাদ :

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আচরণ ও মানব সমাজে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত, বিতর্কিত এবং অনেকটা বিস্ময় ও রহস্যের সাথে বিবেচিত কনসেপ্টটা হচ্ছে- Power. ড. মাহবুব উল্লাহ ক্ষমতার কল্যাণধর্মী যে সমস্যার কথা বলছেন, সে সম্পর্কে যে কোন বিবেকবান মানুষের ভিন্নমত পোষণের কোন সুযোগই নেই। আমরা জানি, লর্ড অ্যাকটন ক্ষমতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, Power corrupts, absolute Power corrupts absolutely. তিনি যখন এ কথাগুলো বলছিলেন, তখন ছিলো absolutism-এর যুগ। একদিকে মনারকি; অপরদিকে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। ক্ষমতা চর্চার মৌল লক্ষ্য ছিল যেভাবেই হোক পার্থিব ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ বিধান। আজকে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বে ক্ষমতাকে কিন্তু আর কোন একক ব্যক্তির বিষয় হিসেবে দেখা হয় না। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী Hannah Arendt চমৎকারভাবে বলেছেন যে, ক্ষমতা এখন আর কোন লোন এজেন্ট বা অ্যাক্টরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। একটি গোষ্ঠী বা একটি যৌথ দল, যারা সম্মিলিতভাবে স্বীয় স্বার্থে কাজ করে, ক্ষমতা তাদের জন্য। তাঁর মতে- "Power corresponds to the human ability not just to act but to act in concert." "Power is never the property of an individual; it belongs to a group and remains in existance only so long as the

www.pathagar.com

group keeps together" অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সম্মিলিতভাবে act করতে হবে। একটি গোষ্ঠী যদি অবিভাজ্যভাবে নিজেদের সংহতি অক্ষুণ্ণ রেখে অস্তিমান থাকে, তাহলেই তাদের পক্ষে ক্ষমতা চর্চা করা সম্ভব এবং ক্ষমতা চর্চা করতে হলে, ক্ষমতাকে যদি কল্যাণধর্মী করতে চাই, ক্ষমতাকে যদি ব্যাপক গরিষ্ঠ মানুষের সেবার কাজে ব্যবহার করতে চাই, তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে, ক্ষমতা কীভাবে সম্প্রসারিত হতে পারে, বর্ধিত হতে পারে। মানব সভ্যতার ইতিহাসের বিকাশের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে আমরা দেখব যে, Power বর্ধিত হতে পারে নানা ধরনের মেশিনারিজ, হাতিয়ার, অস্ত্র, যোগাযোগ ব্যবস্থার উপাদান, এমনকি অর্থ বা ক্ষয়ক্ষমতার বর্ধন বা অন্যকে একটি বিশেষ মত, বিশেষ পথ মেনে নেয়ার জন্য যুক্তি প্রদর্শনের ablility-র মধ্যে দিয়ে। আমরা জানি in human behaviour and society and in the social sciences, the concept of power অত্যন্ত widespread এবং diverse. যিনি বা যাঁরা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন যদি দেখতে চান, তাহলে তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই পরিবর্তনটি শুধুমাত্র ফিজিক্যাল সিস্টেমের মধ্যে আসলেই চলবে না। এই পরিবর্তন বিলিফ সিস্টেম, নলেজ সিস্টেমের মধ্যে আসতে হবে এবং পরিবর্তনটি আইনগতও হতে হবে। এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিকও হতে পারে। এর সীমা সংকীর্ণ বা নির্দিষ্ট করে দেয়া যায় না। ক্ষমতা লালন ও ধারণ করার জন্য কোন গোষ্ঠীকে এবং গোষ্ঠীর ভিতকে প্রসারিত করা প্রয়োজন। সেটি যদি করা না যায়, তাহলে Robert Dahl-এর ভাষায় ঃ 'One actor's ability to make another do something that the latter would not otherwise do' পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে। অন্য পরিস্থিতিতে যে লোকটি বা গোষ্ঠীটি যে কাজটি করতে চায় না, তাকে সে কাজটি করতে বাধ্য করতে যে ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজন, সেটি কেবলমাত্র সম্ভব, যদি ক্ষমতার ভিতকে আরও প্রসারিত করা যায়, সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা না হয়। ক্ষমতা চর্চার ইন্সট্রুমেন্ট সম্পর্কে জন কেনেথ গল ব্রেথ তাঁর Anatomy of Power গ্রন্থটিতে তিনটি জিনিস উপস্থাপন করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ Condign (কনডাইন) পাওয়ার, Compensatary (কমপেনসেটারি) পাওয়ার এবং Conditioned (কণ্ডিশণ্ড) পাওয়ার। কনডাইন পাওয়ারের ক্ষেত্রে ইন্সট্রুমেন্টটা এমন হবে, যেখানে বাধ্য করা হবে প্রতিপক্ষকে বা যাদের ওপর ক্ষমতা চর্চা করা হয়, তাদেরকে, যাতে তারা এমন একটি পরিস্থিতিতে ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাধরের কাছে সাবমিট করে, অর্থাৎ অবজেক্টকে কোন বিকল্প দেয়া হয় না, কোন প্রেফারেন্স দেয়া হয় না– একটিমাত্র পক্ষ অবলম্বন করার পথ ছাড়া। দেখা যায় আপাতদৃষ্টিতে যে বিকল্পগুলো রাখা হয় সেই বিকল্পগুলোর জন্য তাকে এত চড়ামূল্য শোধ করতে হয়, যাতে ক্ষমতাবানরা যা করতে চাইছে তাতে সম্মত হয়ে যাওয়াটাই উত্তম। এক কথায় বলা যায়, কনডাইন পাওয়ারের মধ্যে নিহিত আছে পানিশমেন্টের একটি ইমপ্রেশন। কমপেনসিটেরী পাওয়ার হল একজনকে দিয়ে একটি কাজ যদি করাতেই হয়, তাহলে যে কোন কিছুর বিনিময়ে সেই ব্যক্তি সে কাজটি করতে যেন বাধ্য থাকে। অর্থাৎ এক ধরনের পুরুষকৃত করার ব্যবস্থা রাখা। অর্থাৎ একজনকে যদি এক ধরনের উপযুক্ত আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়, বা সে যে সার্ভিস প্রদান করবে, তার উপযুক্ত প্রতিদান যদি তাঁকে দেয়া হয়, তাহলে এ পরিস্থিতিতে সে একজনের খবরদারী, নেতৃত্ব বা ক্ষমতা প্রয়োগকে মেনে নিতে পারে। আর কন্ডিশন্ড পাওয়ার, যেটি প্রধানত সমাজে বিরাজ করছে–এর প্রাবল্যই আজকের সমাজে বেশী আমরা লক্ষ্য করি। এই পরিস্থিতিতে ক্ষমতাটি এমনভাবে চর্চা করা হয়, যার ফলে মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদির গুণগত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায় এবং এই পরিবর্তন ঘটার ক্ষেত্রে সামাজিক অঙ্গীকার, শিক্ষা ইত্যাদি বিরাট ভূমিকা রাখে। এ ব্যবস্থাগুলোকে যদি সেভাবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, একটি বিশেষ

www.pathagar.com

cause বা objective-এর জন্য মানুষের সোশালাইজেশন প্রসেসটা তাকে এমনভাবে ধাতস্থ করে ফেলে যে, তখন একটি নির্দিষ্ট আদর্শ বা পন্থার অনুকূলে কাজ করা ছাড়া তার সামনে আর অন্য কোন বিকল্প থাকে না। সেই ক্ষেত্রে তার বিলিফ সিস্টেমটা কীভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, সে কীভাবে সোশালাইজড্ হচ্ছে নতুন নতুন মূল্যবোধকে গ্রহণ করার জন্য এসব গুরুত্বপূর্ণ খুব হয়। এক্ষেত্রে সোসাইটিতে যে Process of Socialisation চালু রয়েছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত হিসেবে দেখা দেয় ক্ষমতাকে লালন ও ধারণ করার জন্য। যদি পর্যাপ্ত সোশালাইজেশন একটি সমাজে সংঘটিত না হয়, তাহলে সেই সমাজে স্থিতিশীলতা আসে না। বিভিন্ন সামাজিক শক্তির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে যে কোন সময় নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে এবং একটি ভঙ্গুর ও বিপর্যয় প্রবণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিকায়ন নিশ্চিতকরণ।

মাহবুব উল্লাহ :

ড. আফতাব ক্ষমতার রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ক্ষমতার অর্থনৈতিক দিকও রয়েছে এবং দৈনন্দিন জীবনে এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখন আমরা এই অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কীভাবে পরিমাপ করব? এটা পরিমাপ করতে গেলে যেটা সাধারণত দেখতে হয় তাহলো, উৎপাদনে বা উদ্বৃত্তে একজন economic agent-এর হিস্যা কতটুকু। সেটার ওপরেই একজন ইকোনমিক এজেন্টের পাওয়ার নির্ভর করে। সম্প্রতি দেশাই লিখিত 'পাওয়ার অ্যান্ড এগরেরিয়ান রিলেশন্স ঃ সাম কনসেপ্টস অ্যান্ড মেজারমেন্টস' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ "এগরেরিয়ান পাওয়ার অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকটিভিটি ইন সাউথ এশিয়া" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, যেটি সম্পাদনা করেছেন দেশাই, রুডলফ এবং রুদ্র। এখানে দেশাই প্রস্তাব করছেন যে, অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তে একজন ইকোনমিক এজেন্ট কত অংশ পাচ্ছেন সেটাই ইকোনমিক পাওয়ারের ইনডিকেটর হিসেবে কাজ করে। স্পষ্টতই এখানে ইকোনমিক পাওয়ারটাকে পলিটিক্যাল পাওয়ার থেকে বিচার-বিবেচনা করার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তবে যদি আমরা দেশাইয়ের এই কনসেপ্টটাকে একটু সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করি তাহলে দেখব যে, তিনি যে ইনডেক্স সাজেস্ট করেছেন, সেটা পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ আমরা জানি যে, একজন ইকোনমিক এজেন্টের যদি কোন বিকল্প আয়ের সুযোগ বা সূত্র থাকে, তা হলে সেটা তাকে বর্ধিত অর্থনৈতিক শক্তি দেয় এবং এভাবে যদি অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন পাশাপাশি তার বিপরীতে যে ইকোনমিক এজেন্ট থাকে তার অর্থনৈতিক ক্ষমতাটা কমে যায়। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, একটা ইকোনমিক এজেন্ট কতটা অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করবে সেটা শুধুমাত্র তার অর্থবিত্তের ওপরই নির্ভর করে না, সেটা তার রাজনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শক্তির উপরও নির্ভর করে এবং শুধু সেই ক্ষমতা ব্যবহার করা নয়, সেটাকে কীভাবে নোংরা উপায়ে ব্যবহার করা যায়, তার উপরেও। এছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষমতার পরিমাণটা সেই ইকোনমিক এজেন্টের বার্গেনিং স্কিলের উপরেও নির্ভর করে। এই বার্গেনিং স্কিল আবার তার জ্ঞান, যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে। তাহলে যদি কেউ ক্ষমতা সম্পর্কে গাণিতিকভাবে কোন সূচক তৈরী করতে চায়, তাহলে সেই সূচকটা হবে একটা কম্পোজিট ইনডেক্স। এখন আমাদের কাজটা হচ্ছে শুধু ইকোনমিক কম্পোনেন্টটাকে আলাদা করে দেখা এবং সেটা করতে গেলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে, একজন ইকোনমিক এজেন্ট কী কী, সুবিধা ভোগ করছে। সে সুবিধাগুলোর উৎস হচ্ছে, উৎপাদনের যন্ত্র বা ক্ষমতার ওপর তার কী ধরনের, কতটুকু মালিকানা রয়েছে, সেটুকু এবং তার বিপরীতে অন্যজনের অবস্থানটা কী? এইসব ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে, শেষ পর্যন্ত কার কতটা লাভ বা ক্ষতি হবে সেটা নির্ভর করবে একটা Nash equilibrium-এর ওপর, যেখানে

www.pathagar.com

বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক আসপেক্টগুলো বিবেচিত হয় এবং যেখানে মীন্‌স্ অব প্রোডাকশনের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য অলটারনেটিভ অপরচুনিটিগুলো কতটা ব্যবহারের সুযোগ পার্টিকুলার ইকোনমিক এজেন্টের আছে তার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং আমরা এভাবে একটি ব্যক্তির অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে মাপতে পারি। তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে গেলে তার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতার বিষয়টি এসে যায়। আমি এখানে একটা চমৎকার গল্প যেটা অর্থনৈতিক শাস্ত্রে 'ব্যাটল অব সেক্সেস' হিসেবে পরিচিত হয়েছে সেই গল্পটার কথা উল্লেখ করতে চাই। ঘটনাটা হচ্ছে স্বামী এবং স্ত্রী চিন্তা করলেন যে, তারা সন্ধ্যাটা বাইরে কোথাও গিয়ে কাটাবেন। কিন্তু বাইরে কোন স্থানে যাবেন, সেটা নিয়ে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ। স্বামী চাইছেন যে, তিনি ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যাবেন আর স্ত্রী চাইছেন যে, তিনি নাটক দেখতে যাবেন। তবে তাদের দু'জনের মধ্যেই একই বাসনা যে, তারা বাইরে কোথাও যেতে চান। সুতরাং এইখানে দেখা যাচ্ছে যে, তারা যদি শেষ পর্যন্ত দু'জনই এক জায়গায় যেতে চান, তাহলে তাদের উভয়েরই কল্যাণ হয়। এখন দু'জনেই যদি তাদের স্ব স্ব সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন তাহলে কিন্তু জিদটাই পে করছে এখানে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে এরকম অবস্থা বিরাজ করে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, কে তার অপশনটা প্রথম ব্যবহার করবে। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে নেতা প্রথমেই তাঁর অপশনটি ঘোষণা করতে সক্ষম হন, রাজনীতির দাবা খেলায় তাঁর বিজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষক প্রজার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের একমাত্র পূর্বশর্ত হিসেবে উথাপন করে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে অনিবার্য করে তুলেছিলেন। শেখ মুজিবসহ বর্তমান আওয়ামী লীগের বহু প্রবীণ নেতা উৎসাহের সঙ্গে সেই পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যে কোন stratigic game এর reaction function এ যে পক্ষ তার choice সুপরিজ্ঞাত করে তুলতে সক্ষম হয় সে পক্ষই অধিকতর লাভবান হয়।

আফতাব আহ্‌মাদ :

এ প্রসঙ্গে একটি জিনিস বলা দরকার যে, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শান্তি আনয়নের জন্য মানব বিধ্বংসী বা ধ্বংসাত্মক অনেক তৎপরতাও অনেক সময়ে ক্ষমতা বিরোধী হুমকিগুলোকে হ্রাস করে। যেমন উন্নততর কামান যখন উদ্ভাবন করা হয়, তখন সামন্ত দুর্গের পতন ঘটে, নগরের দেয়ালগুলো ধসে পড়ে এবং তার বিনিময়ে জন্মলাভ করে জাতি রাষ্ট্র। এই জাতি রাষ্ট্র তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী অভ্যন্তরীণ শান্তি আনয়নে সক্ষম হয়। Piter Moris তাঁর Power : A Philosophical Analysis-এ ক্ষমতা চর্চাকে এভাবে দেখেছেন ঃ To exercise power is not merely a matter of affecting someone, it implies effecting, that is causally affecting some-one or something so as to bring about some sort of change. আর এ জন্যেই Isaac বলেছেন সমাজে ক্ষমতার উৎস নির্ণয় করার সময় moral responsiblity fix করা অত্যাবশ্যক। কেবলমাত্র তার দ্বারাই আমাদের সকলের ওপর enablements এবং constraints কীভাবে operate করে, সেসব বুঝতে সক্ষম হবো।

www.pathagar.com

১২ ফেব্রুয়ারী ২০০০

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

মাহবুব উল্লাহ :

১১ দফার ভিত্তিতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর ৩১ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আজ আমরা সেই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নিয়ে আলোচনা করব। কারণ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল জানুয়ারী মাসে। অবশ্য তার প্রেক্ষাপটে ছিল ডিসেম্বর মাসে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে হরতাল এবং ঘেরাও কর্মসূচী। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, Natutre abhors vacuum. প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণাসহকারে পরিহার করে। সে রকমই একটি পরিবেশ যখন ১৯৬৯ বা ১৯৬৮ সালের শেষপাদে সারা পাকিস্তানে বিরাজ করছিল, ঠিক তখনই এই গণঅভ্যুত্থানে সূচনা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সরকার পক্ষে কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষে প্রতিদ্বদ্বিতা করেন মিস ফাতেমা জিন্নাহ। সেই নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ পরাজিত হলেন, সারা পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রচণ্ড নিরাশা নেমে আসে। যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা ছাত্র আন্দোলনের সূতিকাগৃহ হিসেবে জানি, সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ-আমরা সমন্বিতভাবে যেসব প্রতিবাদ সভা এবং সমাবেশ করতাম, তখন আমরা লক্ষ্য করতাম, আমাদের সমাবেশগুলোতে পঞ্চাশ জনের বেশী ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণের সাহস পেত না। তার কারণ ছিল একদিকে সরকারপন্থী জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন -এনএসএফ-এর সন্ত্রাস, অন্যদিকে একটা সার্বিক হতাশাবোধ। রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের নেতারা সেই সময়ে স্থির করে উঠতে পারছিলেন না, কীভাবে তারা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাদের মধ্যে অনৈক্য ছিল, দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সন্দেহ ও স্বার্থের কোন্দল ছিল। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি, যখন শেখ মজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৬ দফার আন্দোলন শুরু হল, তখন ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে হরতাল পালিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের বহু নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের ফলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেও একটা শূন্যতা নেমে আসে। এক পর্যায়ে মিসেস আমেনা বেগমের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের একটা রাজনৈতিক শূন্যতার প্রেক্ষাপটেই আমাদের দেশে এ যাবতকালের সবচেয়ে শক্তিশালী গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। আমরা যদি সমসাময়িককালের অন্যান্য দেশের ছাত্র গণঅভ্যুত্থানগুলোর দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব-১৯৬৮ সালের মে'তে ফ্রান্সে ছাত্রসমাজ এক বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিল একদল নতুন বামপন্থী নৈরাজ্যবাদী চিন্তায় বিশ্বাসী যুবক, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কোন ব্যান্ডিট এবং রুডিডাটস্কি। ফ্রান্সের সেই অভ্যুত্থান পশ্চিমা সংবাদপত্র জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হার্বার্ট মার্কিউসের মত দার্শনিকের চিন্তাভাবনা এই ছাত্র-গণআন্দোলনকে প্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি, ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। তৎসত্ত্বেও ফ্রান্সের ছাত্র-শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে পুলিশী পীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সেই আন্দোলনেরও পরিণতিতে গিয়ে দ্যগলের শাসনের অবসান ঘটাতে পারেনি। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান হয়েছিল। এভাবে দেখতে গেলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, ফ্রান্সের আন্দোলন যা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, আমাদের এই

www.pathagar.com

দেশের ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান তা অর্জন করেছিল। একজন ডিক্টেটর ক্ষমতার মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিল। সেই সময়ে ঢাকায় সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় ২৪ জানুয়ারীর গণঅভ্যুত্থানের ৪ দিন পর (২৮-১-৬৯) যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল : The students of East Pakistan, have left the entrenched opposition parties behind both in their programme and action. They have taken upon themselves the most challenging task of leading a political movement. By their actions and determined movement, the student community have been able to infuse unbounded courage among the common people while the political parties are busy modifying their points and counter-points, the students have iispired all sections of the people to come out in the streets under their own banner of the eleven point programme. The demand charter placed by them acceeds the imagination of the orderly political parties. What the students are agitating for can very well form the basis of an anti-feudal, anti-capitalist and anti-imperialist democratic movement. Their programme and leadership have largly been accepted by the people of the country." আমার মনে হয়, এটি ১১ দফার গনঅভ্যুত্থান সম্পর্কে অত্যন্ত সঠিক, সময়োপযোগী এবং যৌক্তিক মূল্যায়ন। এ ধরনের একটি মূল্যায়ন থেকে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করার আছে। আমরা যখন একটা গণআন্দোলন বা গণঅভ্যুতথান সম্পর্কে আলোচনা করি, সেখানে কোন দল বা সংগঠন নেতৃত্ব দিয়েছে, কোন নেতা বা নেতৃত্বের ভূমিকা প্রধান বা অপ্রধান ছিল, কোন আদর্শ প্রাধান্য অর্জন করেছিল, সেগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ তারচেয়ে আরও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং আন্দোলনের ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন আসে, আলোড়ন ও কম্পন সৃষ্টি হয়, সেটাকে বুঝা ও উপলব্ধি করা অত্যন্ত জরুরী। আজকের এই বাংলাদেশে আমরা যখন 'জননিরাপত্তা আইন'-এর শৃংখলে একটি বন্দী বা শৃংখলিত জাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছি, তখন এদেশের জনগণ অত্যন্ত হতাশভাবে লক্ষ্য করছে একদিকে নেতৃত্বের ব্যর্থতা, অন্যদিকে মানুষ ভেবে পাচ্ছে না সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? আমি এখানে একটি দলিলের মুখবন্ধ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপন করতে চাই। ১৯৬৯-এর জানুয়ারীতে রচিত ১১ দফার মূল দলিলটির ভূমিকায় লেখা হয়েছিল : "স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘদিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসন-শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র-জনতা, ছাত্রগণ-আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই অবস্থায় সরকার বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের দিকে আগাইয়া আসিতেছে না। সম্প্রতি দু'একটি দিবস ঐক্যবদ্ধভাবে পালন করা হইলেও কর্মসূচীভিত্তিক কোনো ঐক্যফ্রন্ট গড়িয়া উঠিতেছে না। আমরা ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত দাবীসমূহের ভিত্তিতে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করিয়া ব্যাপক গণআন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিবার জন্য সকল সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি"।

উল্লেখ্য যে এই দলিলে যা কিছু সেদিন কালির অক্ষরে লেখা হয়েছিল, পরবর্তীকালে মুদ্রণযন্ত্রে ছাপানো অক্ষরে যে ১১ দফার কর্মসূচী জনগণ ও ছাত্র সমাজের নিকট প্রচার করা হয়েছিল, তার মুখবন্ধে এই অংশটি বাদ দেয়া হয়েছিল। কারণ, ছাত্র নেতৃবৃন্দ জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাননি। যদিও তাদের বাস্তব উপলব্ধিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দীনতা, ক্লীবতা, সাহসিকতা ও দৃঢ়তার প্রচণ্ড অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। আজও আমরা লক্ষ্য করছি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে—দাড়ি, কমা, সেমিকোলন নিয়ে

www.pathagar.com

ক'জন আহবায়ক, যুগ্ন আহ্বায়ক হবেন, এক জায়গায় আমরা বসবো কি বসবো না, কারোর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে কি হবে না–তা নিয়ে লুকোচুরি খেলা চলছে। কিন্তু ইতহাস সাক্ষ্য দেয়, জনগণের ওপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র একটি দলের আকার আয়তনের উপর নির্ভর করে না। সেটা নির্ভর করে, সেই দল জনতার স্বার্থে কতটা এগিয়ে আসতে প্রস্তুত, জনগণের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত তার উপরে। আমাদের এই উপমহাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা বার বার এই সাক্ষ্যটিই পাই। রাজনীতি যদি সঠিক হয়, আন্দোলনের কলাকৌশল যদি সঠিক হয়, তাহলে যে রাজনৈতিক মতবাদের পেছনে একদিন মাত্র একজন সমর্থক থাকে, কালক্রমে সেটা লক্ষ-কোটি জনতার সংহত শক্তিতে পরিণত হয়। আর রাজনীতি যদি সঠিক না হয়, আদর্শগত ভিত্তি যদি দৃঢ় না হয়, তাহলে আজকে যে দল বা ব্যক্তি শত-কোটি জনতার সমর্থন ভোগ করছে, কালক্রমে তা শূন্যে পরিণত হবে। এটাই হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা। ১১ দফার গণঅভ্যুত্থানকে সেই আঙ্গিকেই মূল্যায়ন করতে হবে এবং এ থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

আফতাব আহমাদ :

৩১ বছর আগে ১১ দফার ভিত্তিতে এদেশে সংগঠিত হয়েছিল কালজয়ী এক গণসংগ্রাম, যে গণসংগ্রাম শেষ পরিণতিতে গণঅভ্যুত্থান পরিণত হয়। গণঅভ্যুত্থান শব্দটি যত সহজে উচ্চারণ করা যায়, ঘটনাটি তত সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য যদি আমরা উপলব্ধি না করি, তাহলে কোন্‌টি গণসংগ্রাম কোন্‌টি গণআন্দোলন; পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়বে। আমার মনে হয়, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটটি আমাদের একটু আলোচনা করা দরকার। এর বেশকিছু ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন ৬৫'র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথা–যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের মানুষের অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন ছিল, কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলে সেই স্বপ্ন আশা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। ব্যাপক জনগোষ্ঠির সমর্থন মিস ফাতেমা জিন্নাহ'র পক্ষে থাকা সত্ত্বেও আইয়ুব খান-এর প্রণীত নীল নকশা এবং তাঁর বুনিয়াদী গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কৃতিত্বের কারণে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খানই বিজয়ী হয়েছিলেন। সমগ্র জাতি যখন হতাশ সে সময়ে আমাদের এক সিংহপুরুষ কবি সিকান্দার আবু জাফর ইত্তেফাক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁর সেই বিখ্যাত গণসংগীতটি প্রকাশিত হয়। "আমাদের সংগ্র চলবে। জনতার সংগ্রাম চলবে। দিয়েছি তো রক্ত। আরও দেব রক্ত। প্রয়োজন হলে দেব এক নদী রক্ত"। কী অদ্ভুত প্রফেটিক কথা। উনসত্তরের মাত্র দু'বছর পর এক নদী নয়, এক সাগর রক্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। এই যে মানুষকে উজ্জীবিত করার, অনুপ্রাণিত করার দক্ষতা ও ক্ষমতা সিকান্দার আবু জাফর দেখাতে পেরেছিলেন, তাঁরও উৎস হচ্ছে সমাজের অন্তর্নিহিত সামাজিক শক্তিসমূহের বিন্যাস। এদেশের মানুষকে প্রথম সাধারণ নির্বাচন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল ১৯৫৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে। কিন্তু সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। কারণ, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমগ্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বানচাল করে দেন। তারপর এদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, '৪৭-এ যে স্বপ্ন, যে আশা-আকাঙক্ষা নিয়ে এদেশের মানুষ এই উপমহাদেশে একটি নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিল সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য, সেই আশা-আকাঙক্ষা চরিতার্থ করার জন্য রাজনৈতিক সুযোগ কখনও এদেশের মানুষ পায়নি। আর পায়নি বলেই আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষেব তিলে তিলে জমা ক্ষোভ যখন একটি বিস্ফোরণের দিকে ধীরে ধীরে কিন্তু অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে এগুচ্ছিল, তখন রাজনৈতিক শূন্যতা চরমভাবে বিরাজ করছিল। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। বাংলাদেশের মানুষের জাতিগত নিপীড়ন, বেদনা এবং দুঃখবোধকে পুঁজি করে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা না বলেও তিনি স্বায়ত্তশাসনের যে নতুন ধ্বনি উচ্চারণ করলেন সেটি এদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দেখা গেছে, ৬৬'র ৭ জুনের

www.pathagar.com

হরতাল কর্মসূচী ছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী লীগ এবং তার নেতৃত্বে দেশের মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি। এই ক্ষেত্রে শূন্যতা পুরণের জন্য এগিয়ে এসেছিল ছাত্র-যুব নেতৃত্ব। '৬৬ থেকে '৬৮ পর্যন্ত বছরের প্রায় প্রতিটি দিন এই ছাত্র-যুবক নেতৃত্ব প্রাণপণভাবে চেষ্টা করেছিল দেশের মানুষকে সংগঠিত করতে, কিন্তু সেদিনকার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং গণবিরোধী কালাকানুনসমুহের বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। পরবর্তী পর্যায়ে এই যুব নেতৃত্ব উপলব্ধি করেছে যে, ছাত্র হিসেবে, তরুণ হিসেবে তাদের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার জন্য মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর দুরদৃষ্টি ও রাষ্ট্রনায়কোচিত পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে যে ঘেরাও কর্মসূচীর প্রবর্তন করেন সেটি তরুণদের এবং গণমানুষের জন্য ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে কী ঘটেছিল? আমরা কোন্‌টাকে বলি গণঅভ্যুত্থান আর কোন্‌টাকে বলি গণসংগ্রাম? সমাজে যারা উৎপাদন করে এবং উৎপাদিত পণ্য যারা ভোগ করে-শ্রেণী নির্বিশেষে সকল স্তর থেকে যখন মানুষ একত্রিত হয়ে একটি অস্তিমান ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে নতুন একটি ব্যবস্থার পত্তন ঘটাতে চায়, সেই ধরনের একটি পরিস্থিতিকে আমরা অভ্যুত্থানমুখী পরিস্থিতি বলতে পারি। ৬৯'এ সাধারণ মধ্যবিত্ত কিংবা ছাত্র বা চাকরিজীবীরা শুধু আন্দোলন করেনি, বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত কল-কারখানার শ্রমিক, ক্ষেতের কিষাণ, মজুর, ছাত্রসমাজ ও চাকরিজীবীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজপথে নেমে পড়ে জগদ্দল পাথরের মত প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য। এই সংঘ-শক্তি যে রূপ পরিগ্রহ করে, আরাম কেদারায় অভ্যস্থ রাজনীতিবিদরা সেই ভয়ংকরী রূপ দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। যে কারণে আমরা ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পরিণতিতে দেখি শেখ মুজিবুর রহমান কারামুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসে এই সংগ্রামকে তার যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সংগ্রামের অগ্রভাগে স্বীয় নেতৃত্বকে অধিষ্ঠিত করার জন্য এবং পুরো আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণভার নিজের হাতে তুলে নেয়ার জন্য নতুন মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন ঃ 'আর নয় জ্বালাও পোড়াও, এবার চাই শান্তি, শান্তি এবং শান্তি'। এই শান্তির বাতাবরণে সেদিন আরামকেদারার রাজনীতিবিদরা, যারা গণচাপকে প্রয়োগ করে নিজেদের স্বীয় স্বার্থ এবং শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতচক্রের সঙ্গে আপসরফার পথ খুঁজছিলেন, তারা আন্দোলনটিকে সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে দেখা গেছে, মানুষের জীবন কোথাও বিপন্ন হয়নি। বিপন্ন হয়েছে, কায়েমি স্বার্থবাদীদের স্বার্থ, শোষক শ্রেণীর দুর্গ, শাসকগোষ্ঠির আসন। এর ফলে আমরা দেখি যে, সমাজের সংখ্যালঘু অধিপতিগোষ্ঠী যেভাবে আইনের ফাঁকফোকড় দিয়ে একটি কীটদষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বৈরতান্ত্রিক কলকব্জাকে ব্যবহার করে মানুষের ওপরে একটি শোষণমূলক বৈষম্যের সমাজ চাপিয়ে দিয়েছিল, তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল শ্রমিক, কৃষক এবং ছাত্র তরুণরা। সেদিন রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য নতুন শ্লোগান মানুষের মুখে আমরা উচ্চারিত হতে শুনি। আমি নিজে এবং শহীদ চিশতী শাহ হেলালুর রহমান অসংখ্য শ্লোগান তৈরি করি। সেদিন শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র যুবক সংঘবদ্ধভাবে আওয়াজ তুলেছিল বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; শ্রমিক-কৃষক অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। ক্ষেতে কিষাণ কলের মজুর, জোট বাঁধ, তৈরি হও। সেদিন আওয়াজ উঠেছিল, আমার বাড়ী আমার বাড়ী গ্রাম বাংলার প্রতিবাড়ী; তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা যমুনা। জ্বালাও জ্বালাও, আগুন জ্বালাও। সেদিনের এসব শ্লোগান শাসক শ্রেণীর ভিতকে প্রকম্পিত করে তোলে, মানুষকে উজ্জীবিত করে। যার ফলে দেখা গেছে, প্রচলিত যে আইনি ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার দুয়ারে মাথা কুটে মানুষ কোনদিন ন্যায়বিচার পায়নি–সেগুলোর তোয়াক্কা না করে তার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে মানুষ গ্রামে-গঞ্জে হাটে গণআদালত, নতুন আইন, নতুন বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেছিল। চোর-ডাকাত, ঘুষখোর, বাটপাড়, দুর্নীতিপরায়ণ লোকগুলোকে ধরে ধরে এনে তারা গণধোলাই দেয়। পাশ্চাত্যের দক্ষিণপন্থী মহল প্রচার করা শুরু করল যে, তৎকালীন পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তান বোধহয় লাল হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কমিউনিস্টরা বোধ হয় ক্ষমতা দখল করে নিচ্ছে। এই কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে সেদিন যারা আপসের রাজনীতি, প্রাসাদ রাজনীতি করতেন, তাদেরকে কীভাবে পাদপ্রদীপের সম্মুখ ভাগে নিয়ে এসেছিল সেটি আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। নতুন করে কিছু বলার নেই। সংগ্রামকে তিথিয়ে দেয়ার জন্য, আন্দোলনকে ছুরিকাঘাত করার জন্য সেদিন আইয়ুব খান একটি চমৎকার ফাঁদ এঁটেছিলেন। তিনি আহ্বান জানালেন প্রচলিত রাজনীতিবিদকে, "আসুন, আমরা একটি গোলটেবিল বৈঠক বসে আমাদের যা কিছু মতপার্থক্যতা দূর করার চেষ্টা করি এবং আমাদের যা দাবী-দাওয়া আছে সেগুলোকে আমরা নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়ে একটি নতুন সহমতে পৌছার চেষ্টা করি'। যদিও জানা কথা ছিল যে, এটি হবার নয়। কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্র ততদিন যে চরিত্র ও রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সেখানে সামরিক-অসামরিক আমলাতন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে জনসাধারণের প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিল না, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিল না। যেখানে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে অস্বীকার করে একটি চক্রতন্ত্র পাকিস্তানকে কুক্ষীগত করে নিয়েছিল সেখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে রাজনীতিবিদরা কী সমাধান দিতে পারতেন? আমরা লক্ষ্য করেছি, সংসদীয় গণতন্ত্র কিংবা পাশ্চাত্য ধাঁচের নামে সেদিন আইয়ুব খানের সাথে একটি আপস করার চেষ্টা চালানো হয়েছিল জনসাধারণকে অন্ধকারে রেখে। অপরদিকে সেদিন ক্ষমতার পালা বদলের জন্য প্রস্তুতিও চলছিল। আমি অনেকের সঙ্গে একটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করি। সেটি হচ্ছে এই-উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক শক্তিকে আনলিশ্ড করেছিল কিন্তু সেই সামাজিক শক্তি আইয়ুব খানকে শেষ বিশ্লেষণে উৎখাত করতে পারেনি। এই আনলিশ্ড সোশ্যাল ফোর্সেসকে কনটেইন করার জন্য পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ভেতর থেকে আবার পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই আইয়ুব খানকে বিদায় করা হয়। অবশ্য সুযোগটা তারা নিয়েছিল গণঅভ্যুত্থানের। গণঅভ্যুত্থানের বিজয় ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে যে সহমত রচিত হয়েছিল সেগুলোকে সামনে নিয়ে রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া যেত। আজকে কথায় কথায় আমরা বিভিন্ন মহলের কাছ থেকে গণসংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থানের কথা শুনি, কিন্তু প্রত্যেকের কাছেই এটি আজকে একটি ভীতি ও শঙ্কা। সেটি হচ্ছে সেই অভ্যুত্থান বা সেই গণসংগ্রারে ফসল আরাম কেদারার রাজনীতিবদদের হাতে থাকবে না মাঠের কিষাণ, কল-করখানার শ্রমিকদের হাতে চলে যাবে? তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে আন্দোলন এদের হাতে চলে গেলেই কিন্তু সেই আন্দোলন কমিউনিস্ট আন্দোলনে হয়ে যায় না, 'লাল' আন্দোলন হয়ে যায় না। তার প্রমাণ পাশ্চাত্য দুনিয়ার বহু দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু আজকে সেটিই যেন বারবার পেছন থেকে টেনে ধরে রাখছে আমাদের রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে। যে কারণে আমরা শহরভিত্তিক আন্দোলনগুলোকে আজকাল সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে দেখছি শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কোনরকমে ফুঁসলে-ফাঁসলে রাস্তায় নামানোর মধ্যে। মিছিল, শোভাযাত্রা ও সমাবেশের নামে যা কিছু প্রশাধনীভাবে করার চেষ্টা আমরা প্রত্যক্ষ করি তাকে বলা যেতে পারে অনেকটা ফটোসেশনের আয়োজন মাত্র। অর্থাৎ সাংবাদিকরা আসলেন, ছবি তুলে নিয়ে চলে গেলেন, তারপরে দেখা গেল মিছিল, শোভাযাত্রা, সমাবেশের আর কোন খবর নেই। এ হচ্ছে এক ধরনের প্রশাধনী আন্দোলন। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য আমার মনে হয়, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন কলাকৌশল এবং সেই গণঅভ্যুত্থানের যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা কীভাবে জনগণকে সংগঠিত করেছিলেন এবং কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে রাস্তায় সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করেছিলেন তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

মাহবুব উল্লাহ :

আমি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের দু-চারটি ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে বলবো। এই গণঅভ্যুত্থানের যখন প্রস্তুতি চলছিল ১১ দফা কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার উপর সরকারের হুলিয়া ঝুলছিল। বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় আমার বিশালকার ছবি

www.pathagar.com

পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল আমাকে গ্রেফতার করার জন্য। সেজন্য আমি আত্মগোপন করতে বাধ্য হই। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম যে গণঅভ্যুত্থানের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন গ্রামবাংলা থেকে রাজধানী ঢাকায় এসে কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করি। তখন প্রায় প্রতিরাতেই কর্মীদের সাথে আমাদের যোগাযোগ হত এবং ঠিক ২০ জানুয়ারী যেদিন আসাদ পুলিশের ডিএসপির হাতে নিহত হলেন, সেদিন গোটা শহর নিথর হয়ে গিয়েছিল। আর সেই অবস্থাটি ছিল একটি ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। সেদিন বিকেলে হাজার হাজার ছাত্রজনতা শোক মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে এসেছিল। পরবর্তীতে এর প্রতিবাদে ২৪ জানুয়ারী সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করা হয়। সেদিন খোদ আদমজীনগর থেকে ৩০ হাজার শ্রমিক মিছিল করে এসে সেই হরতালকে সফল করে। আগের দিন রাতেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আমি ২৪ জানুয়ারী, যখন গণঅভ্যুত্থান চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাবে, তখন আত্মগোপন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসব। আগের দিন রাতে আমি গোপীবাগের একটি বাড়ীতে অবস্থান করছিলাম। কবি শহীদ কাদরীর বাড়ীতে। সেখান থেকে সকালবেলা পল্টনের মাঠে ছুটে আসলাম। লক্ষ্য করলাম, সেখানে ৫ লক্ষাধিক জনতা একত্রিত হয়েছে। সামনে রয়েছে শহীদ মতিউরের লাশ। আর একটি বেঞ্চের উপর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করতে চাইছেন। তাঁরা বলেছিলেন ঃ 'আমাদের সামনে শহীদের লাশ পড়ে আছে। এই লাশ দাফন করতে হবে। শহীদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য আমাদের দোয়া করতে হবে। আপনারা শান্ত হোন'। কিন্তু সেদিন জনতা নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে হুকুম চাইছিল লাট ভবন আক্রমণ করার জন্য। কারণ, পাশেই ছিল গভর্ণর মোনেম খানের লাট ভবন। যেটা আজকের বঙ্গভবন। আমরা লক্ষ্য করলাম, সেই লাট ভবনের বিভিন্ন প্রহরী সেন্ট্রিপোস্টে মেশিনগানধারী সৈনিকরা জনতার অভিযানকে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত। মাথার উপর দিয়ে হেলিকপ্টার চক্কর দিতে দেখলাম। ঠিক সেই পরিস্থিতিতে আমরা যদি জনতাকে বলতাম, 'আসুন আমরা এখন মোনেম খানের লাট ভবনকে আক্রমণ করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করি'–তাহলে হয়তো জনতা তাই করতো। কিন্তু তার পণিতিতে রাশিয়ার জার-এর শীত প্রাসাদ আক্রমণ করতে গিয়ে যেভাবে ব্লাডি সানডের ঘটনা সৃষ্ট হয়েছিল, সেরকম একটি বিয়োগান্তক ঘটনাও ঘটতে পারতো। সেদিন জনতা পল্টন ময়দান থেকে কর্মসূচী ঘোষণার দাবী করলো। ছাত্রনেতারা সুকৌশল জানাজার পর মিছিল নিয়ে তৎকালীন ইকবাল হলের চত্বরে চলে আসেন। এই সময়ে যে মওলানা সাহেব জানাজা পড়ান তিনি আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বললেন, 'আল্লাহ, তুই জালেমের মুখ কালা করে দে'। তখন সমগ্র ময়দানে, (যেটা আজকের পল্টন ময়দানের মত ক্ষুদ্র নয়, সেটা তখন অনেক বিশাল ছিল) গগনবিদারী কণ্ঠে উচ্চারিত হলো–'ইয়া আল্লাহ'। মনে হলো এই একটি উচ্চারণে অত্যাচারীর প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়লো। ইকবাল হলে ফিরে ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে কর্মসূচী প্রণয়ন করা উচিত কি উচিত নয়, আরো হরতাল দেয়া উচিত কি উচিত নয়, এই মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের জঙ্গী কর্মীরা তখন আগামীদিন হরতাল চাই বলে যখন শ্লোগান তুললো, তখন ঘোষণা দেয়া হলো যে হরতাল অব্যাহত থাকবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা শহরে কারফিউ জারি করা হলো। তারপরে আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমি এখানে ১৮ ফেব্রুয়ারীর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। ঐদিন রেডিও সংবাদে জানা গেলো যে রীডার শামসুজ্জোহাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে সৈন্যরা হত্যা করেছে। এই খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ঢাকা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো। এই ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে তারিক আলী তার *Pakistan : Military Rule or People's Power?* গ্রন্থে বলছেন ঃ "Inside the city the first group to defy the army, were the slumd-wellers, whose misery had hardened them to face anything. They were joined by other sections of the city poor, and they all linked up with the workers.

www.pathagar.com

Finally, the students joined in and Dacca became a mass of moving people. In many cases army officers stationed at keypoints of the city panicked and ran away. In others they behaved like any colonial army and shot the workers down in cold blood. Leadership of the left NAP was meeting in a house in Eskaton. The old Moulana was pacing up and down in the garden, frustrated by his inability to give the lead and weeping as he heard the sound of the machine-gun fire; the other 'leaders were debating how to escape if the army should raid the house. At one stage workers ran into the house and asked Bhashani for guns to use aganist the army, but no guns existed- at any rate, none were made available. When the workers wanted to assert their political power, they faced the barrels of the ruling class's guns". আমি নিজে মওলানা ভাসানীর কাছ থেকে শুনেছি, সেদিন বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁর পায়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে বলেছিল আপনি আমাদের অস্ত্র দিন, না হয় আপনি আমাদেরকে মেরে ফেলুন। আমরা সামরিক বাহিনীকে মোকাবিলা করতে চাই। জনতার বিভিন্ন অংশ সেদিন মেশিনগানের বুলেটকে মোকাবিলা করার জন্য ঢেউটিনকে ঢাল হিসেবে সামনে রেখে সামরিক বাহিনীর মেশিনগানকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। এর চেয়ে বীরত্বের মহিমাময় কাহিনী আর কী হতে পারে-সেটা আমার জানা নেই। আজকে আমাদের সেই আন্দোলন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ২২ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসলেন। পরের দিন তাঁর সম্মানে একটি গণসংবধনার আয়োজন করা হল রেসকোর্সে। সেই সংবর্ধনায় প্রায় ৫ লক্ষাধিক লোক উপস্থিত ছিল। তারিক আলী এই ঘটনাটি বর্ণনা করিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "The meeting in Dacca called by the SAC (Student Action Committe) to celebrate Mujibur's release was attended by over half a million people. Mahbub Ullah spoke at the meeting in no uncertain terms, and warned Mujibur and his co-thinkers that the masses would not tolerate any attempt to by-pass the eleven-point demands of the students. Mujib was forced to say that he would fight for them. The EPSU leftist had every right to be pleased with themselves. Both they and Mujib knew the truth, but the latter have been forced to accept the eleven-points in front of half a million people. এখানে আমি তারিক আলীর বর্ণনার সঙ্গে একটি ছোট্ট কথা যোগ করতে চাই। সেটা হচ্ছে-আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে জনতার রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলাম, এই জনতা বুলেটকে পুষ্পেমাল্যের মত বুকে বরণ করে নিয়েছে, এ জনতার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। যখন আমি বসে পড়লাম শেখ মুজিবুর রহমান আমার পীঠ চাপড়ে বললেন, খুব তো বলেছিস, আমাকে তো একটু ঝামেলায় ফেলে দিলি। শেখ মুজিবুর রহমান নিজে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি কেন রাউন্ড টেবিলে যাবো না, আমি কি আইয়ুব খানকে ডরাই? আমি সেখানে বাঙালীর দাবী উত্থাপন করব। ৬ দফা, ১১ দফার দাবী উত্থাপন করবো"। আর এভাবেই তিনি জনতাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এখানে আরেকটি ছোট ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। সেটা হচ্ছে-ছাত্র নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা। সেই সময়ে ঢাকা মেডিকেল অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারের বদরুদ্দীন উমর তখনকার গণঅভ্যুত্থানের একটা মূল্যায়ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ছাত্র নেতৃত্বের দ্বারা একটি

www.pathagar.com

অভ্যুত্থান কিছুদূর অগ্রসর হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনা"। কারণ তাদের নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা আছে। বদরুদ্দীন উমর সেদিন ২৪ জানুয়ারীর ঘটনাকে মস্কো অভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন, ছাত্র নেতৃত্ব তার শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার কারণেই এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। যখন জনগণের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, তখন দেখা গেল যে, আমলাতন্ত্র ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল একটা সমঝোতা আনার জন্য। এখানে আবার আমি তারিক আলীর গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছি।

Between midnight and one a.m. even government officials with curfew passes were not allowed into streets. Some journalists who defied this order and sneaked out saw for themselves the bodies of dead workers and peasants being carried way and soldiers, cleansing the streets of blood. According to unoffficial estimates (there are not official figures) over a hundred people were killed that night. But the newspapers were silent. Once again the workers and the city poor without any leadership whatever had defied the rulling class and faced the bullets of the bourgeoisie. এখানে পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ The very fact that at this critical stage they could agree to talk to the hated local bureaucracy shows the reformist consciousness of a large majority of the student leaders. Mahbub Ullah admitted this freely and said that he had subjected himself to strenuous self criticism for agreeing to the meeting; But quite clearly it would have been wrong for him to split with the SAC on the issue and isolate himself. ঘটনাটি উল্লেখ করা দরকার যে, প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে আমাদের ছাত্রনেতাদের এক বৈঠকে আমরা বলেছিলাম সকল রাজবন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে এবং শহর থেকে পুলিশ, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্ত পুলিশ সেনা প্রত্যাহার করার পর জনগণ প্রশাসন ব্যবস্থা তৎকালীন ইকবাল হলমুখী হয়ে পড়ল এবং সারা শহরের আইন-শৃঙ্খলার যেসব সমস্যা, নারী নির্যাতন, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদির বিচার করার জন্য ছাত্র নেতৃত্বের ওপর চাপ আসতে লাগল। জামালপুর, হাইমচরসহ বিভিন্ন এলাকায় গ্রামবাসীরা অত্যাচারী, টাউট-বাটপারদের বিরুদ্ধে জেগে উঠল। অর্থাৎ সারাদেশে বৃত্তবানদের জন্য একটা ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যারা উর্ধ্বতনের প্রতি বিরক্ত, অধস্তনের প্রতি ভীত, যারা চক্ষুহীন, কর্ণহীন, কুম্ভিলক বৃত্তিতে লিপ্ত তারা এভাবেই জনগণকে ভয় পায়। রাষ্ট্রযন্ত্রের অভ্যন্তরে তখন কী ঘটেছিল, সেটাও একটু আলোকপাত করব। কারণ, আজ সেটা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। আলতাফ গওহর *Ayub Khan : Pakistan's First Military Ruler* নামে সম্প্রতি একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এর মধ্যে তিনি বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছেন। আলতাফ গওহর বলছেন ঃ Khwaja Shahabuddin, who had been advising Ayub to enter into negotiations with the opposition. found himself in the dock. A man of infinite civility he was outrased by the accusations that ministers were hurling at him. He told Ayub that he had asked him to negotiate with the opposition to prevent bloodshed and to maintain the constitutional order. Since his advice had failed he must submit his resignation. Ayub reacted angrily. "this is not time to talk of resignation. We

www.pathagar.com

have the deal with the present situation? Ayub recalled : what Duncan Sandys had told him in 1962 that he introduced the constitution prematurely. "The basic problem" Ayub said, "is that we are not a nation. We are not clear in our mind. We should give all that East Pakistan wants and all that the provinces in West Pakistan want." আমার মনে হয়, যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকেন, তারা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হয়ত কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেন। আইয়ুব খানও সেই শিক্ষাটা গ্রহণ করেছিলেন যে, সময় এসেছে একথা স্বীকার করার যে 'we are not a nation'. তার মানে এই ১৯৬৯ সালেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বোঝা গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সত্যটি আইয়ুব খান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এই দূরদর্শিতার জন্য তিনি কিছুটা প্রশংসারও দাবীদার হতে পারেন।

আফতাব আহমাদ :

গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই বলতে পারি। বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু গোড়াতে আবার ফিরে আসি, যখন এই অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিপর্ব চলছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যখন প্রথমে কর্মিসভা এবং তারপর প্রথম সাধারণ ছাত্রদের সভা বটতলায় আহ্বান করেছিল ১৭ জানুয়ারী ১৯৬৯, সেটি অনেক ছোট সভা ছিল। তিনটি প্রধান সংগঠন–পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, মস্কোপন্থী বলে পরিচিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কর্মীরা সেদিন সেখানে জমায়েত হয়েছিলো। তাদের প্রত্যেকের একটি আওয়াজ ছিল যে বেআইনীভাবে, অন্যায় ও অযৌক্তিকতাভাবে যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে তা আমরা লংঘন করবো। সেদিনও দেখা গেছে যে ছাত্র নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে একটি দোদুল্যমানতা। ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের পক্ষ থেকে শামসুদ্দোহা বলে বসলেন যে আন্দোলনের অবজেকটিভ কন্ডিশান বিরাজ করলেও সাবজেকটিভ প্রস্তুতি নেই বলে আমার সংগঠন ১৪৪ ধারা ভাঙতে পারে না। সেদিন আমরা যারা '৬৯-এর গণসংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থানের কর্মী সংগঠক ছিলাম আমরা মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা ১৪৪ ধারা লংঘন করে যখন কলাভবনের ফটক থেকে বেরিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনের সামনে দিয়ে রোকেয়া হলের দিকে এগুচ্ছিলাম, তখন সামনে এবং পেছন থেকে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল (ইপিআর) সাঁড়াশি আক্রমণ করে এবং সেই আক্রমণের পরপরই শুরু হয় চারদিক থেকে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ। এই সামান্য একটি ঘটনা থেকে সূত্রপাত হয় সেই সংগ্রামের, যে সংগ্রাম আসাদের শাহাদৎ বরণের মধ্যে দিয়ে আরো ব্যাপ্তিলাভ করে। ২৪ জানুয়ারী সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের সময়ে দেখা গেছে মতিউর যখন সচিবালয়ের সামনে পুলিশের গুলীতে নিহত হলো তার লাশ সচিবালয়ের ভেতরে ইপিআর টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, আমি এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীরা সেই লাশ নিয়ে টানাহেঁচড়া করছিলাম। নির্মমভাবে ইপিআর তখন জনতার ওপর হামলা করলো, সেই হামলাকে প্রতিহত করার জন্য যারা এগিয়ে এসেছিল প্রাথমিক পর্যায়ে, তারা ছিল প্রাক্তন ফুলবাড়িয়া স্টেশনের বস্তির সাধারণ মানুষ। তারা এগিয়ে এসে মতিউরের লাশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের সাহায্য করলো লাশটি উদ্ধার করার জন্য। এমনিভাবে রুস্তম ও মকবুলের লাশও উদ্ধার করা হয়েছিল। আজকে কথাটি এজন্য বলা প্রয়োজন যে, একটি ঘটনা সে ঘটনা যত সামান্যই হোক, তা যে একটা বিশাল স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে, ১৭ জানুয়ারী যে ২৪ জানুয়ারীতে পরিণত হতে পারে, এটি ইতিহাস আমাদেরকে শিখিয়ে গেছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে ১৫ ফেব্রুয়ারী এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে যখন ক্যান্টনমেন্টে বেয়নেট বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়, তখন পল্টনের মাঠে

www.pathagar.com

মাওলানা ভাসানী এক বিশার জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সেই জনসভা থেকে মানুষ নেমে পড়ে চারদিকে ছুটে গেলো। আমরা দেখেছি ২৪ জানুয়ারী থেকে শুরু করে ১৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সারা দেশে যে জঙ্গী আন্দোলন হয়েছিল তখন অনেক প্রতিষ্ঠান জনরোষে আক্রান্ত হত। সেদিনকার দৈনিক পাকিস্তান, মর্নিং নিউজ ২৪ জানুয়ারী জনসাধারণ পুড়িয়ে দেয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জাস্টিজ এস এ রহমানের বাসভবন যেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্সে ছিল সেটিও জনগণ পুড়িয়ে দেয়। জনতার শক্তি এমনই অজেয় ও অবিনাশী যে সেই শক্তিকে যদি সঠিক খাতে, সঠিক প্রবাহে পরিচালিত করা যায় তাহলে জনতার বিজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ১৯৬৯-এর আন্দোলন সুস্পষ্টভাবে একটি নির্দেশ করে সেটি হচ্ছে নেতৃত্ব যত আপসকামীই হোক না কেন, আন্দোলনে যদি সর্বস্তরের জনসাধারণ বিশেষ করে কলকারখানায় শ্রমিক, ক্ষেতের কৃষকরা অংশগ্রহণ করে সেই আন্দোলন অবশ্যাম্ভাবীরূপে একটি বিপ্লবাত্মক চেহারা পরিগ্রহ করতে বাধ্য। আজকে যারা দেশে এই দুর্বিষহ অবস্থায় ভাবছেন যে কিছুই করার নেই, তাদের উদ্দেশে একটি বক্তব্য আমরা নিবেদন করতে পারি, এদেশের খেটে খাওয়া মানুষ মুটে-মজুর, কিষাণ, কলকারখানার শ্রমিক সবাই শুধু একটি ডাক, একটি আহ্বানের অপেক্ষা আছে, সেই আহ্বান আসলে আজকে যেসব সন্ত্রাসীগোষ্ঠী, যাদের ছবি পত্রপত্রিকায় ছাপা হচ্ছে অহরহ, অথচ ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এসব সন্ত্রাসীরা আজকে দেশে একটি অরাজক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি কর চলেছে-তাদের অস্তিত্বই থাকবে না-জনতা তাদের সমুচিত শিক্ষা দেবে। আজকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং জনগণের বিরুদ্ধে একটি স্বৈরতান্ত্রিক হিংস্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস পরিচালনার জন্য জননিরাপত্তার নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে–এ আইন জনগণের নিরাপত্তার জন্য করা হয়নি। এ আইন জননির্যাতনের জন্য করা হয়েছে, করা হয়েছে ক্ষমতাসীনদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে জনগণই হচ্ছে একমাত্র রক্ষক, নিরাপত্তা বিধানের একমাত্র রক্ষাকবচ। জনগণকে বাদ দিয়ে যদি অন্য কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র করা হয়, শেষ বিশ্লেষণে সেইসব ষড়যন্ত্র তছনছ হয়ে যেতে বাধ্য। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

মাহবুব উল্লাহ :

এখানে হাসান জহীরের লেখা *Seperation of East Pakistan : The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism* গ্রন্থ থেকে কিছু তথ্য উপস্থাপন করবো। হাসান জহীর পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে ১৯৫৪ সালে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন মহকুমা ও জেলাতে প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কাজ করেন। তিনি ১৯৫৬ থেকে ৬২ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত ছিলেন। আবার ১৯৭১-এর মে-তে ঢাকায় তার পোস্টিং হয় এবং তিনি এবার প্রভিন্সিয়াল সেক্রেটারীর একটি সিনিয়র পজিশন লাভ করেন। পাকিস্তান আর্মীর আত্মসমর্পণের পর তিনি ভারতে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। ১৯৭৪-এর জানুয়ারী মাসে তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান। আমি শুরুতেই বলেছি, গণআন্দোলন, গণসংগ্রাম রাষ্ট্রযন্ত্রকে কতভাবে আলোড়িত করতে পারে, সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান যখন তুঙ্গে পৌছলো তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী আইয়ুবের ওপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে। অথচ আইয়ুব খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য অনেক কিছু করেছেন। 'The army's withdrwal of support to Ayub Khan was reflected in two ways. It was firstly less than enthusiastic in handling the violent agitation against the regime in the big cities. Secondly, it refrained from strengthening negotiations with the politicians. During RTC it was thought that a hint to Mujib by Yahya Khan that a political deadlock might lead to martial law

www.pathagar.com

would instil a sense of realism in him. In the meeting that was arragned for the purpose, however, Yahya Khan feigned indiference and told Mujib that he had nothing to do with the negotitations and it was for the governmnet and politicians to resolve the problems. The preperations for the army take-over had been set in motion at least from the middle of March. A colleague invited me along with eight to ten civil servants, to his house, if not earlier, early March, to meet the head of military intelligence over a cup of tea. The conversation naturally centred on the current situation. Everyone critisized the political failing of the Ayub regime, though it was agreed that economic progress had taken place in the last decade. The Brigadere did not talk much, but we all did, which obviously was the purpose of the meeting. The exercise was repeated with a cross section of the bureacracy. It was a sort of opinion poll by the army to back up its decision to topple Ayub Khan. The fact that the army was so openly discussing the President's shortcomings in official circles was itself indicative of its intentions'. এখনে আমি আমার একটি ছোট্ট স্মৃতিকথা উল্লেখ করবো। ২৪ মার্চ মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জনসমাবেশে বক্তৃতা করে ঢাকায় ফিরে আসলেন। তাঁকে তেজগাঁও বিমান বন্দরে বীরোচিত সংবর্ধনা দেয়া হলো। সংবর্ধনা মিছিল শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হলো। রাতের বেলায় আমরা যখন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলোচনায় বসলাম তখন তিনি বললেন, 'মহবুব (তিনি আমাকে এই নামেই ডাকতেন) যদি এখন দেশে মার্শাল ল' হয়, তাহলে কী করবা?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, মার্শাল ল' হবে কিনা। তখন আমার পাশে উপবিষ্ট ফরিদপুরের কমিউনিস্ট নেতা, সদ্য কারামুক্ত সমর সিং বলেছিলেন, এতবড়ো গণঅভ্যুত্থানের মুখে সামরিক শাসন হওয়া সম্ভব নয়। তখন মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'তোমরা কমিউনিস্টরা পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে চিনতে পারোনি। সে জন্য তোমরা কিছুই করতে পারোনি। এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে এই বিশাল গণঅভ্যুত্থানকে সেদিন পাকিস্তানী রাষ্ট্রযন্ত্র আইয়ুব খানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সামরিক বাহিনী দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। আর কোনা অবস্থাতেই নয়। সেদিন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবও হয়েছিল। কারণ, রাজনীতিবিদদের অনেকেই এই পদক্ষেপের প্রতি মৌন সমর্থন যুগিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০০

সরকার বিরোধী অর্থবহ ঐক্য চাই

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশে বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে উঠছে। এই সংকটের কোন সহজ সমাধানের সম্ভাবনাও আমরা লক্ষ্য করছি না। সংকট সমাধানের জন্য যে ধরনের আন্তরিক প্রয়াসের প্রয়োজন, সেটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট মহল থেকে কোন সুষ্ঠু উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসার লক্ষণও আমরা দেখছি না। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের দাতাগোষ্ঠী বা একটু ভদ্রভাষায় যাদেরকে বলা হয় Partners of Develpopment তারা বারবার এই ঘণীভূত রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিভিন্ন বিশ্বসংস্থা একযোগে বেশ কয়েকমাস আগে এ ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পরবর্তীকালে তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ সরকারী দল, বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়েও তাদের উদ্বেগের কথা ব্যাখ্যা করেছেন।

দেশের ব্যবসায়ী মহল বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখছেন। তাঁরা মনে করছেন, এ ধরনের রাজনৈতিক সংকটের ফলে যে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে তাঁদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ ব্যহত হবে এবং বাংলাদেশে কাংক্ষিত বিদেশী বিনিয়োগ আসবে না। সংকট যে কতটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, সেটা যদি আমরা দৈনিক পত্র-পত্রিকার প্রথম পাতাটিতে চোখ বুলাই, তাহলেই সেটা অনুধাবন করতে পারি। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা মেললেই লোমহর্ষক, বীভৎস অপরাধের কাহিনী লক্ষ্য করা যায়। দিনের পর দিন যেন পরিস্থিতি খারাপ হতে চলেছে। সর্বশেষ ঘটনাটি হচ্ছে– পোস্তগোলায় এক অপরাধীকে গ্রেফতার করতে গিয়ে ডিবি পুলিশরা স্থানীয় অপরাধী চক্রকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল এবং তারা মুখোশ পরা ছিল। এই অভিযান চালাতে গিয়ে তারা একজনকে হত্যা করে এবং অপর দু'জনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। ঘটনাটি কী কারণে ঘটেছে, তার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সরকারী মহল থেকে পাওয়া যায়নি। শুধু এটুকুই বলা হয়েছে যে, সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের ক্রসফায়ারের সময় সেই দুর্ভাগা তরুণটির মৃত্যু হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এত মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে যে, গত কয়েকদিন আগে নরসিংদীতে সকাল সাড়ে ৯টায় যানবাহনের বহর থামিয়ে ৪৩টি বাস-ট্রাকে লুটতরাজ হয়েছে। রাজবাড়ীতে পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অস্ত্র লুট হয়েছে। তার মধ্যে সাবমেশিনগানও রয়েছে। একটি দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যখন এরকম পর্যায়ে নেমে আসে, তখনই আমরা আশঙ্কা করি দেশে একটা রাজনৈতিক ঝড় অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে। দিনের পর দিন অপরাধমূলক ঘটনা, সন্ত্রাস এমনভাবে বাড়ছে যে, তার সঙ্গে নাগরিক সমাজ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। প্রতিটি মানুষ নিদারুণ আতঙ্কে ভুগছে। ঢাকা এবং চট্টগ্রামে বিরোধী রাজনৈতিক দলের অফিসে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। সেই বোমা বিস্ফোরণের পেছনে কে বা কারা দায়ী ঘটনার খবর শুনে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা অত্যন্ত কঠিন, নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে একথাটি বলতে হয়। কিন্তু সব মিলিয়ে বলা যায় যে, আজ দেশ একটা চরম সংকটের মুখোমুখি। এই সংকট থেকে বেরিয়ে না আসতে পারলে দেশকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে কী না সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। আজকে বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের চর্চা ও সঠিক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি উপস্থিত না থাকার

www.pathagar.com

ফলে, সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে সমঝোতা ও সংলাপ না থাকার ফলে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। সংসদ কার্যক্রম অচল হয়ে পড়েছে। যদিও বিরোধী দলগুলো সংসদ অধিবেশনে যোগ দিচ্ছে না, কিন্তু তারা সংসদীয় কমিটিগুলোতে যোগদান করছে। এগুলো হচ্ছে, সমস্যার বাহ্যিক দিক। যদি আমরা সমস্যার অন্তর্নিহিত দিকটা উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে আমরা সমস্যার সমাধানও বের করতে পারব না। সর্বশেষ সরকারের পক্ষ থেকে সংসদে জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) বিল্ বলে একটি আইন পাস করা হয়েছে এবং এটি এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এখন পর্যন্ত (১২-২-২০০০) রাষ্ট্রপতি এতে তার চূড়ান্ত অনুমোদন দেননি এবং এটাকে কেন্দ্র করে সাংবিধানিক জটিলতার খবরও প্রতিদিন সংবাদপত্রে বেরুচ্ছে। সিভিল সোসাইটি, আইনজীবী, পেশাজীবী এবং রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে বারবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে, তিনি যেন এরকম একটি কালো আইনে তার সম্মতি না দেন। এটা রাষ্ট্রপতির কাছে এ দেশের জনগণের একটা সামান্য আকাঙ্খামাত্র। কারণ, এ দেশের মানুষ এই রাষ্ট্রপতিকে একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। বিশেষ করে, যখন তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তখন তিনি বলেছিলেন মাজার জিয়ারত ও মোনাজাত করা ছাড়া বর্তমানে রাষ্ট্রপতির আর কোন ক্ষমতা নেই। তৎসত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন সময়ে বিবেক দ্বারা তাড়িত হয়ে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি কথা হয়েছেন শ্রমিক সংঘ বা ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্কে, কথা বলেছেন রাজনীতিতে কালো টাকার দৌরাত্ম সম্পর্কে, ব্যাংকিং খাতের অব্যবস্থা সম্পর্কে। ছাত্র রাজনীতি এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক বিরোধ প্রসঙ্গসহ বলা যায়, এমন কোন বিষয় বা এমন কোন সামাজিক সমস্যা নেই, যেটা সম্পর্কে তিনি তার মন্তব্য করেননি। শেষ পর্যন্ত, তিনি একটা চমৎকার মন্তব্য করলেন, সেটা হচ্ছে– রাজনীতিবিদদের বই পড়ার অভ্যাস নিয়ে এবং সেই বই পড়ার অভ্যাসের ব্যাপারে আমাদের মুখরা প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বভাবজাত ভঙ্গীতে প্রতিবাদও জ্ঞাপন করেছেন রাষ্ট্রপতি বক্তব্যের। কারণ, এতগুলো ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়ার পর তিনি পড়াশোনা করেন না, এমন ধরনের কথা তিনি শোনার জন্য প্রস্তুত নন।

এখন প্রশ্ন হল, আগামী দিনে দেশে কী ঘটতে যাচ্ছে? বিশেষ করে জননিরাপত্তা আইন পাস হওয়ার পর পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নিচ্ছে, সেটা আজ সকল নাগরিকের ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জননিরাপত্তা আইনটি কেন কালো আইন সেটা আমরা এই আইনের ধারাগুলো পড়ে দেখলেই বুঝতে পারব। একদিকে যেমন অতি দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা, অন্যদিকে অপরাধের যে সমস্ত সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং কাউকে এসব অপরাধে গ্রেফতারের পর তার জামিন পাওয়ার ব্যবস্থা নেই অন্তত ৯০ দিন পর্যন্ত এবং এটাকে উচ্চতর আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না– এই ধরনের বিধানই আজ সর্বমহলকে আতঙ্কিত করে তুলছে। আমাদের দেশে অতীতে কালো আইন ছিল না, সেটা বলব না। পাকিস্তান আমলে ইস্ট পাকিস্তান পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট ছিল, ছিল সেন্ট্রাল সেফটি অ্যাক্ট, ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস ইত্যাদি। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতেও অনেকগুলো কালো আইন আছে। ভারতে কোন এলাকায় বিদ্রোহ সংঘাত দেখা দিলে সেখানে 'ডিস্টারবড এরিয়া' ঘোষণা করে সেনা আইন জারির ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতে মেইনটেইন্যান্স অব ইন্টারনাল সেফটি অ্যাক্ট বলে একটি আইন ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং সেখানে ইমার্জেন্সির সময়ে এটা ব্যাপকভাবে প্রয়োগও করা হয়েছিল। বিশেষ করে, রেল কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এটা প্রচণ্ড হিংস্রতার সংগে প্রয়োগ করা হয়েছিল। পাকিস্তানেও সন্ত্রাস দমন আইন আছে এবং করাচীসহ সিন্ধু প্রদেশের গোলযোগ ও জাতিগত সংঘাত কঠোর হাতে দমন করার জন্য এই আইনটিকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে প্রধানমন্ত্রীর আমলে এই আইনটি প্রণীত হল, সেই নওয়াজ শরীফই আজকে সেই আইনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। কেউ

www.pathagar.com

কেউ আশঙ্কা করছেন বিচার সমাপ্ত হলে হয়তো তাঁর মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। একটি সভ্য দেশে এ ধরনের আইন কতটুকু যুক্তিযুক্ত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে এটা কতটা সঙ্গতিপূর্ণ তা নিয়েও যেমন বিতর্ক আছে, তার পাশাপাশি আবার অনেকে মনে করেন যে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের অধিকার আছে দেশে জঘন্য অপরাধ দমনের জন্য শক্ত আইন প্রণয়ন করার। এটার বিরুদ্ধে যারা বলেন, তাদের বক্তব্য হচ্ছে, দেশের প্রচলিত ফৌজদারী আইনগুলোকে যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং সঠিকভাবে অপরাধের তদন্ত করা যায়, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে যদি পৃথক করা যায়, তাহলে সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমেই এই সমস্ত জঘন্য অপরাধগুলোকে দমন করা সম্ভব। কিন্তু তড়িঘড়ি করে এই ধরনের একটি আইন পাস করার ফলে সকলের মনেই এর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমরা সকলেই জানি যে, ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এটা সন্ত্রাস দমন আইন নামে মন্ত্রিসভায় বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা গেল, নানা মহলের সমালোচনা এবং শাসক দলের নিজস্ব স্ট্রাটেজি বিবেচনা করে এই আইনটি কিছুদিনের জন্য হিমাগারে রাখা হয়। তারপর আবার নতুন করে এই আইন প্রণয়নের মহড়া শুরু হল ২০০০ সালে এবং এই নতুন বছরের প্রথম অধিবেশনেই এই আইনটি পাস করা হল। একদিন খবরের কাগজে দেখলাম, সরকার এই আইন প্রণয়নের চিন্তা করছে না, তার পরের দিন বিরোধী দলীয় নেত্রী ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে বক্তৃতা করলেন, প্রয়োজন হলে দিনের পর দিন হরতাল করে এই ফ্যাসিস্ট সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়ন করা হবে। পরের দিনই মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠকে এই আইনটির অনুমোদন দেয়া হল এবং সেটাকে সংসদে তড়িঘড়ি করে পাস করিয়ে নেয়া হল। যেটা সাধারণত সংসদীয় নিয়মে করা হয় না, সেটা হচ্ছে এই যে, প্রাইভেট মেম্বারস ডেতে এই বিলটি পাস করা হল . এই আইন পাস করার পর দেশের প্রায় সবক'টি বিরোধী রাজনৈতিক দল এই আইনটির বিরোপিতা করছে। তাদের আশঙ্কা যে, সরকার এই আইনটিকে ব্যবহার করে বিরোধী দলীয় কর্মীদের কারাগারে নিক্ষেপ করবে। তাদের জামিনের পথ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তাদের ওপর নেমে আসবে নির্যাতনের স্টীম রোলার। লক্ষ্য করার বিষয়, এই আইনটি পাসের পরপরই প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের দলের লোকদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, তারা যেন নির্বাচনের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ থেকে জনমনে আশঙ্কা আরো বৃদ্ধি পেল এ জন্য যে, মানুষ ভাবতে শুরু করল যখন বিরোধী দলের সক্রিয় নেতা-কর্মীদের সকলকে জেলে পোরা শেষ হয়ে যাবে, সেদিনই হয়ত প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে একটা নাটকীয় ঘটনা সৃষ্টি করবেন। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার তখন ক্ষমতায় এসে বিরোধী দল দাবী জানালেও তাদের আটক নেতা-কর্মীদের মুক্তি দিতে পারবেন না। কারণ, তখন সেটা হবে সংসদে পাসকৃত আইনের বিরোধী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা কিছু রুটিন ওয়ার্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ মূলতঃ নির্বাচন সংক্রান্ত কাজকর্মগুলো করা। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নানা ধরনের পলিটিক্যাল সিনারিওর কথা চিন্তা করতে পারি। যেমন ঘটনা এমন দাঁড়াতে পারে যে, বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করল, তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কী করার থাকবে? হয় নির্বাচনী শিডিউল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে. না হয়, ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে যদি নির্বাচন সম্পন্ন করেও ফেলা হয়. তাহলে সেটি কিন্তু আক্ষরিক অর্থে বেআইনী নির্বাচন হবে না। তবে এটাকে বলা যাবে a sort of non participatory election এবং তার মধ্য দিয়ে যে সংসদ গঠিত হবে সেই সংসদের আয়ু যতদিনই হোক না কেন, সেই আয়ুষ্কালে তারা বিদ্যমান সংবিধানকে যে পরিবর্তন করবে না, সেটাও আমরা গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারি না। আগামী নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি সকল দলের অংশগ্রহনহীন নির্বাচন রাজী না হয় তাহলে বিরাট ধরনের সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে দেশ একটা মারাত্মক শূন্যতার মধ্যে পড়ে যাবে।

www.pathagar.com

সম্প্রতি বিচারপতি হাবীবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীকে একটি খোলাচিঠি দিয়েছেন। তিনি তার এই চিঠিতে কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমন, এক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আপনাদের উভয়ই ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ এ দু'টি সাধারণ নির্বাচনের অন্তত একটিকে সুষ্ঠু হয়েছে বলে স্বীকার করবেন'। এখানে তিনি কিন্তু তাঁর নিজের মত প্রকাশ করেননি যে, কোন নির্বাচনটি সুষ্ঠু হয়েছে। বাক্যটি পড়লে আমরা বুঝতে পারি, '৯১-তে যারা জয়যুক্ত হয়েছিল, তাদের কাছে সেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ছিল, আর '৯৬-তে যারা জয়যুক্ত হয়েছিল, তাদের কাছে '৯৬-এর নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ছিল। উল্টোভাবে বলতে গেলে '৯১-এর নির্বাচনে যারা পরাজিত হয়েছিল, তারা সেই নির্বাচনকে গ্রহণ করেনি। ঠিক তেমনিভাবেই '৯৬-এর নির্বাচনেও এমনটি ঘটতে দেখা যায়। তিনি আরেকটি কথা বলেছেন। সেটা হচ্ছে দু'পক্ষকে গণতন্ত্র চর্চার একটি কার্যকর পদ্ধতির বিষয়ে সমঝোতায় আসতে হবে। পরস্পরের প্রতি তাদের মনোভাব ও মূল্যায়ন যাই হোক না কেন, এটা করতে ব্যর্থ হলে স্বীকার করে নিতে হয়, বাংলাদেশের রাজনীতি বহুদলীয় গণতন্ত্রের উপযোগী নয়। কিন্তু এটি নিশ্চয়ই তাদের কারো জন্য একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হতে পারে না। তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যেও ভবিষ্যতের আনফোল্ডিং পলিটিক্যাল সিনারিও সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিকল্প কী? বিকল্প হতে পারে একদলীয় শাসন কিংবা সামরিক শাসন। তিনি কী এ ধরনের কোন ইঙ্গিত দিচ্ছেন? তাহলে আমরা ভাবব যে, বাংলাদেশের বর্তমান সংকটে একটি সামরিক সরকারেরও উদ্ভব ঘটাতে পারে। আমার মনে হয়, এই ধরনের প্রশ্ন জাগা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানের পর আমাদের দেশের অনেকেই বলতে শুরু করেছিলেন যে, পৃথিবীর আর কোন দেশে, বিশেষ করে অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে সামরিক শাসন বা স্বৈরাচারী শাসনের সম্ভাবনা নেই। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের যুগ, নির্বাচিত সরকারের যুগ। নির্বাচিত সরকারই রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। কিন্তু গত কয়েক মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কিছু রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। সেগুলো কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন– পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবর্তন, আফ্রিকার আইভরিকোস্টের কিংবা ল্যাটিন আমেরিকার ইকোয়েডারের রাজনৈতিক পরিবর্তন। সুতরাং আজকের বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র– যারা নীতি ও আদর্শের দিক থেকে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রকে সবচেয়ে মূল্যবান বলে দাবি করে, তারাও কিন্তু এসব ঘটনাবলীকে অনেকটা বাস্তব সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং তারা যে বিশ্বের সব দেশের ঘটনাবলীকে তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা মত পরিচালনা করতে পারে না, সেটাও বোধ হয় এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি এমনটিও মনে হতে পারে যে, এ ধরনের পরিবর্তন যদিও খুব কাম্য নয়, তবু সেগুলো একেবারে কাম্যতাবিবর্জিতও নয় এবং আমেরিকার সাধারণ যেসব স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ আছে, তাতে প্রচণ্ড বিঘ্ন না ঘটলে, আমেরিকা খুব একটা বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে– এটা চিন্তা করা হয়ত সঠিক নাও হতে পারে। সুতরাং আমাদের দেশে কী ঘটবে সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। দেশের রাজনৈতিক সংঘাতময় পরিস্থিতির দুটো দিক সম্পর্কে এ পর্যায়ে উল্লেখ করা হলো। একটা বাহ্যিক দিক, আরেকটা অন্তর্নিহিত দিক।

একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য সেই রাষ্ট্রে বিদ্যমান রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোর মধ্যে কতগুলো মৌলিক প্রশ্নে একটা সহমত থাকতে হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নটি হল জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। বাংলাদেশের জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে আমাদের দু'টি প্রধান দল বা শিবিরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান দেখা যায়। একদল যখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতকে সভ্য ও বন্ধু হিসেবে গণ্য করছে, অন্য দল তখন ভারতের বিভিন্ন আচরণকে বৈরী আচরণ বলে চিহ্নিত করছে এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছে। এছাড়া সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রশ্নেও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা

www.pathagar.com

লক্ষ্য করা যায়। আমার মনে হয়, সাংবিধানিক কোন সংকট সৃষ্টি হলে সামরিক বাহিনীর একটা ভূমিকা অনিবার্য হয়ে দাঁড়াতে পারে, বিশেষ করে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতাকে রক্ষা করার জন্য। আমাদের দেশে অতীতে যে সকল রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে, সেগুলোর ক্ষেত্রে একদিকে জনগণের যেমন ভূমিকা ছিল, ঠিক তেমনি সামরিক বাহিনীরও একটা ভূমিকা ছিল। এসব পরিবর্তনের চরিত্র নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তব ঘটনা যা ঘটেছে, সেটাকে তো অস্বীকার করা সম্ভব হবে না। পঁচাত্তর সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনটা যতই বিয়োগান্তক হোক না কেন, সেই ঘটনার প্রেক্ষাপট কিন্তু তৈরী হয়েছিল একদলীয় শাসন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। তারপরে পঁচাত্তরের ৩ নভেম্বরের পরিবর্তনটিতেও সামরিক বাহিনীর একটা ভূমিকা ছিল। সেটা সামরিক বাহিনীর একটা অংশের হতে পারে, বিশেষ একটা গ্রুপেরও হতে পারে; তবে সংশ্লিষ্টতা ছিল। আবার পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বরের ঘটনায় সৈনিকরা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়ার ঘটনায়ও সামরিক বাহিনীর সংশ্লিষ্টতা আমরা লক্ষ্য করি। '৯০-এর গণসংগ্রামের অন্তরালেও সামরিক বাহিনীর একটা ভূমিকা ছিল। তখন সামরিক বাহিনী এরশাদের উপর থেকে তাদের আশীর্বাদ বা ব্লেসিং প্রত্যাহার করেছিল। আমরা লক্ষ্য করলাম এরশাদের সরকার তাসের ঘরের মতো পড়ে গেল। তারা যে সমর্থন প্রত্যাহার করেছিল, এটা প্রমাণের জন্য আমাদের খুব বেশীদূর যেতে হবে না। সে সময়কার সামরিক বাহিনীর চীফ অব স্টাফ লেঃ জেনারেল (অবঃ) নুরুদ্দীন সাহেব যিনি বর্তমান সরকারের একজন মন্ত্রী তিনি নির্ধিধায় স্বীকার করেছেন যে, নব্বইয়ের গণতান্ত্রিক পরিবর্তনে তাঁর একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। একজন চীফ অব স্টাফের ভূমিকা মানে তার বাহিনীরই ভূমিকা। এরপর '৯৬-তে যখন বেগম জিয়াকে শাসন ক্ষমতা থেকে সরে আসতে হয়, তখনও কিন্তু সামরিক বাহিনীর একটা ভূমিকা ছিল, যেটা পরবর্তীকালে জেনারেল নাসিমের অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায়। কয়েকদিন আগে যায়যায়দিন পত্রিকায় শেফিক রহমান একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি সেখানে কথোপকথন আকারে 'দিনের পর দিন' নামে একটি নিয়মিত রচনা উপস্থাপন করেন কিছুটা রসরচনার ভঙ্গিতে। সেখানে বলা হয়েছে যে, একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সম্ভাবনা আছে। অন্তর্ববর্তীকালীন সরকারের ব্যবস্থা এবং তাকে ৬ মাস সময় দেয়ার কথা কিন্তু আমাদের সংবিধানে নেই। এই ধরনের একটি সরকারকে যদি কার্যকর করতে হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তার পেছনে সামরিক বাহিনীর শক্তি ও সমর্থনের প্রয়োজন হবে। হয়ত সেই ধরনের একটি সরকারের লক্ষ্য হবে রাজনৈতিক আবর্জনাগুলোকে দূর করা এবং দেশে একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সেই ধরনের পরিবর্তনও কতটা জনগণের জন্য মঙ্গলজনক হবে, সে সম্পর্কে আমরা কোনকিছু স্পষ্ট করে বলতে পারি না। সেটা নির্ভর করবে সে সময়ে এ ঘটনায় নেতৃত্ব দানকারীরা ঘটনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে, তাদের নীতিনির্ধারণী মহল কীভাবে সমগ্র বিষয়টাকে পুনর্বিবেচনা করে, তার উপর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আগামী দিনে দেশের রাজনীতিতে নানা ধরনের বিকল্প সম্ভাবনা রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, গণতন্ত্রের জন্য শেষ সুযোগটি কী আমরা হারিয়ে ফেলেছি? তাহলে গণতন্ত্রকে যদি বাঁচতে হয়, তবে বিরোধী দলকে কী ধরনের ভূমিকা নিতে হবে? কী ধরনের ভূমিকা নিতে পারলে আমরা এখানে একটা শক্তির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে একটা শান্তিপূর্ণ ট্রানজিশন বা উত্তরণের আয়োজন করতে পারব।

আফতাব আহমাদ :

দেশে আজকে যে সংকট চলছে, তাকে যদি আমরা শুধু মনে করি, দু'টি পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দলের সংঘাত বা তাদের মধ্যে সমঝোতার অভাবে সৃষ্ট সঙ্কট, তাহলে আমার মনে হয় আমরা মারাত্মক ভুল করব। একটি বিষয় আজ অত্যন্ত স্পষ্ট। আওয়ামী লীগ নতুন করে ক্ষমতা লাভ করার পর বাংলাদেশের জনগণের সামনে নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯৭২ থেকে '৭৫ আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

প্রথম যখন এ দেশের সরকার পরিচালনার দায়িত্বে ছিল, তখনও যেমন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দল এবং দেশপ্রেমিক নাগরিকদের অভিযোগ ছিল যে ঐ সরকার ভারতীয় স্বার্থের রক্ষক এবং ভারতের ক্রীড়নক হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্যকে সংরক্ষণে কুণ্ঠিত, আজও তেমনি হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ভারত নির্ভর, ভারতের সমর্থন ও মদদপুষ্ট এবং ভারতের ভূ-কৌশল ও রাজনৈতিক স্বার্থকে সমুন্নত রাখাই তার একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৯৭৫-এর পরিবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশ একটি ব্যালেন্সড ফরেন পলিসি পারস্যু করছিল, কিন্তু ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগের পুনরায় ক্ষমতারোহণের মধ্যদিয়ে ভারতমুখীতার যে নতুন পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করল, এটি জনগণের কাছে সমাদৃত হয়নি এবং জনগণ এটিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। একটি দেশের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ যদি ছলচাতুরির আশ্রয় না নিয়ে খোলামেলাভাবে বিষয়টি আলোচনা করে জনমত গ্রহণের চেষ্টা করত, তাহলে ফলাফল কী হত, তা আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। আওয়ামী লীগ ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে ভারতমুখী ও ভারতনির্ভর যে নীতি অনুসরণ করে চলেছে, এর জন্যই আজকে প্রধানত বাংলাদেশের মানুষ উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন। কথাটি আরও খোলামেলাভাবে যদি আমরা বলি, তাহলে এ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ যেসব চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, সেগুলোরও একটি পর্যালোচনা করা বোধহয় আজকে খুব জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। ভারতীয় সমর্থন, মদদ, পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুগ্রহ লাভের শর্তে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার বহু পূর্বে আওয়ামী লীগ দু'দফায় সিঙ্গাপুর ও কলকাতায় ভারতের সঙ্গে গোপন সমঝোতায় পৌছায় এবং ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় বলে শোনা যায়। ক্ষমতায় আসার পরপরই আওয়ামী লীগ গঙ্গার পানি প্রশ্নে দ্রুততার সঙ্গে এবং জাতীয় সংসদ, মন্ত্রিপরিষদ এমনকি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়কে পাশ কাটিয়ে যেভাবে তড়িঘড়ি করে ৩০ বছরের একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে, সেখানে আর যাই থাকুক, খোলামেলা কোন জাতীয় বিতর্ক বা আলাপ-আলোচনা ছিল না। একই কায়দায় আমরা লক্ষ্য করেছি, পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে বিদ্যমান সংকট সমাধানের নামে ভারতের মুখাপেক্ষী হয়ে মোটামুটি ভারতীয় ইঙ্গিতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, সেটির প্রশ্নেও দেখা গেছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন সহমত গড়ে তোলার পরিবর্তে পুরো বিষয়টি জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো এবং মানুষ বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। বিরোধীদলীয় রাজনীতিকরা যদিও গোড়া থেকেই এর প্রতিবাদ করে আসছিলেন, কিন্তু মানুষের উৎকণ্ঠা ও আশংকাকে কেন্দ্র করে গোটা পরিস্থিতিকে যথার্থ ইতিবাচক রাজনীতিতে রূপান্তর করতে তাঁরা অনেকাংশে বলতে গেলে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও চুক্তি স্বাক্ষরের শেষদিকে তাঁরা ব্যাপকভাবে জনগণকে মবিলাইজ করে এই চুক্তিকে বাতিলের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের সঙ্গে যে বিশেষ সম্পর্কে আওয়ামী লীগ গড়ে তুলতে চায়, শুধু সে কারণেই ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়নের রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা যায় কী না? উত্তর হচ্ছে– 'না'। কিন্তু আমরা বা দেশের জনগণ যদি এটুকু বুঝতে পারি যে, একটি দেশের সঙ্গে বিশেষ সখ্য গড়ে তোলার পরিবর্তে জাতীয় অখণ্ডতা, জাতীয় অস্তিত্ব এবং সার্বভৌম সত্তা বিলীন হওয়ার উপক্রম হবে, তাহলে তো বলতেই হয় যে, বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষ কিংবা জনসমাজের অন্য যে কোন অংশ এই দল বা সরকারের বিরুদ্ধে একটি সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতেই পারে। কথাটি এজন্য বলছি যে, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারতের যে ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত নানা পরিকল্পনা রয়েছে তা আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। আজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে ভারত তার স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত পরিকল্পনার সঙ্গে বাংলাদেশকে তার হিস্যাদার করে ফেলতে চায়। যেমন ভারত চায় বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাওয়ার একটি সামরিক করিডোর এবং ক্ষমতাসীন দল এই করিডোর দেয়ার

www.pathagar.com

জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। কিন্তু জনরোষে পতিত হতে হবে, সেজন্য তারা ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে প্রথমে বলল, আজমীরে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর মাজার জিয়ারত করার জন্য তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে ঢাকা-আজমীর বাস চলাচলের একটি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেছে যে, এটি বাস্তবে সম্ভব নয় এবং ভারতীয়রাই বলল যে, আজমীর পর্যন্ত সরাসরি বাসে যাওয়া সম্ভব নয়। তার চেয়ে বরং ঢাকা-কলকাতা সরাসরি বাস সার্ভিস চালু করা হোক এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেটাই চালু হয়ে গেল। আমাদের আশংকা ছিল যে, এটি একটি গভীর পরিকল্পনার অংশমাত্র। কারণ, আমরা জানি ভারত ঢাকা-কলকাতা বাস সার্ভিসে তাদের দাবী এবং লক্ষ্য সীমিত করে রাখবে না। অতি সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করেছি, ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিসের ব্যাপারেও একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অজিত পাঁজা সম্প্রতি বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ করার আগে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলে গেছেন যে, ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিসের ব্যাপারে নীতিগতভাবে বাংলাদেশ এবং ভারত একমত হয়েছে। এর পরপরই আমরা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবটি পত্রিকায় দেখলাম। এ প্রস্তাব মোতাবেক ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস চালু হওয়ার পরপরই আগরতলা-কলকাতা বাস সার্ভিস বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে চালু করতে হবে।

অর্থাৎ ঢাকা-কলকাতা এবং ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস চালু করার নামে কার্যত ভারতকে আগরতলা-কলকাতা করিডোর প্রোভাইড করা। রাশিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে মিগ-২৯ বিমান ক্রয়সহ প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এমন সব আত্মঘাতী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে এবং নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে যা আমাদের চূড়ান্তভাবে ভারতের করুণার মুখাপেক্ষী করে তুলবে। বলাই বাহুল্য যে, রাশিয়া মিগ-২৯ আর উৎপাদন করছে না। এর খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন করে ভারত। সম্প্রতি ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। তিনি এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, দুই দেশের বিমান বাহিনীর মধ্যে যৌথ মহড়া ও এক্সারসাইজের মাধ্যমে আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপরও ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে ভারত আমাদের প্রতিরক্ষা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রশ্নে প্রধান হুমকি সে ভারতের সঙ্গে এ ধরনের সহযোগিতার অর্থ যে ভারতীয় ডিফেন্স স্ট্রাটেজি এবং মিলিটারী ইন্টারেস্টের কাছে আত্মসমর্পণ করা তা কী আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে? উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের নামে বাংলাদেশ তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কথা না ভেবে ভারতীয় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে পরিপূরক ভূমিকা কীভাবে গ্রহণ করতে পারে তার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা যে বিপন্ন হবে তা বলাই বাহুল্য। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে অন্যান্য যেসব বিষয় জড়িত এগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন আমরা বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করেছি। এই যে ভারতকে সামরিক করিডোর প্রোভাইড করার নামে সরাসরি ভারতমুখী ও ভারত তোষণনীতি গ্রহণ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ করেছে, এটিই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংকটের মূলে বলে আমি মনে করি। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে এসব বিষয় আকারে ইঙ্গিতেও উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুত একটি hidden agenda তার আস্তিনে লুক্কায়িত রেখে আওয়ামী লীগ জনগণের সঙ্গে চরম প্রতারণা ও শঠতা করেছে। আজকে যদি দাবী উত্থিত হয় যে এই সরকারের এই সমস্ত কাজকর্ম করার কোনো ম্যান্ডেট নেই এবং এই সরকারের বিদায় নেয়ার সময় এসে গেছে, তাহলে আমার মনে হয় না যে, খুব একটা অন্যায় কথা বলা হবে না। এইসব বিষয়কে সামনে রেখেই আজকে আমাদের সামনে হাজির করা হয়েছে একটি নিকৃষ্ট কালাকানুন বা কালো আইন, যেটাকে নাম দেয়া হয়েছে জননিরাপত্তা আইন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এটি জননিরাপত্তার চাইতে জননির্যাতনের কাজেই ব্যবহার করা হবে বেশী এবং এটি হচ্ছে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের গদি রক্ষার শেষ রক্ষাকবচ। আমাদের এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে যে বিয়োগান্তক ঘটনার

www.pathagar.com

মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে, সে ঘটনাটি ঘটতে পারতো না যদি ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ একদলীয় শাসন ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত না হতো, ২৫ জানুয়ারীর দুর্দিন যদি এদেশে না আসতো। আজকে জননিরাপত্তার নামে ভারতীয় যানবাহন চলাচলের এবং ভারতীয় সামরিক সরঞ্জামাদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বহনের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য যে আইন প্রণীত হয়েছে, সে আইন ক্ষমতাসীনদের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবে কী পারবে না, সেটি একটি বিরাট প্রশ্ন। কিন্তু তার চাইতে বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই সঙ্কটের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক যে শূন্যতা সৃষ্টি হতে চলেছে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে যে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি হতে পারে বলে ড. মাহবুব উল্লাহ আশংকা প্রকাশ করেছেন, সেই শূন্যতা কাটিয়ে আমরা সত্যিকারের গণতন্ত্র কীভাবে চর্চা করতে পারবো, সত্যিকারের রাজনীতি কীভাবে অনুসরণ করতে পারবো, সেটি আজকে আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। আর এটা ভাবতে গেলে প্রথমেই যে জিনিসটি আমাদের মনে এসে যায়, সেটি হচ্ছে যে একটি বিকল্প সরকার গঠন করার মতো কোনো পূর্ব প্রস্তুতি আমাদের আছে কী না। সংবিধানের আওতায় যদি পরিবর্তন আনয়ন করতে হয়, তাহলে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে ক্ষমতাসীন দলকে জানিয়ে দিতে হবে যে, তারা ইতোমধ্যে যে সমস্ত কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে করার ইচ্ছা পোষণ করে, এসবের বিষয়ে জনগণের কোনো ম্যান্ডেট তাদের দেওয়া হয়নি। তারা তাদের কার্যকলাপের মধ্যদিয়ে দেশের অর্থনীতি, আইন-শৃঙ্খলা, সর্বোপরি সরকারের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতিকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। ফলে বাংলাদেশ আজকে ভারত এবং ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করছে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। আমাদের অন্যতম ডেভেলপমেন্ট পার্টনার জাপান যখন রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পদপ্রার্থী হলো তখন দেখা গেল, বাংলাদেশ জাপানের বিরোধিতা করে ভারতকে সমর্থন করেছিল। অথচ আমাদের এই স্ট্যান্ড নেয়ার কথা ছিল না।

অর্থাৎ ভারতকে তুষ্ট করে, তোষণ করে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকার যে পথ অনুসরণ করছে, সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রঘাতী পথ। এই রাষ্ট্রঘাতী পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো থাকতে আওয়ামী লীগকে এগুতে দেয়া যায় না। এজন্য অতি দ্রুততার সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতা ত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একটি সংসদ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়ে মেয়াদ পূর্ণ করার আগেই নির্বাচনের দাবী করাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত। বলাই বাহুল্য, কোনো সরকার একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয় না। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর একটি সংসদ তার মেয়াদ পূর্ণ করার পরই যে আরেকটি নির্বাচন হতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতাও সংবিধানে নেই। নতুন ম্যান্ডেট গ্রহণ করা যদি প্রয়োজন পড়ে, তাহলে নিশ্চয়ই নতুনভাবে একটি সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন অপরিহার্য। বাংলাদেশ আজ বিশেষ করে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে, পররাষ্ট্রনীতি ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে নতুন করে জনগণের ম্যান্ডেট নেয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু আমরা জানি, ভলান্ট্যারিলি কেউ ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। আওয়ামী ইতিহাসেও তাই বলে। ১৯৭৪-এ আমরা যখন দেখলাম, রাজনৈতিক সংকট প্রচণ্ডভাবে ঘনীভূত হয়ে আসছিল, তারা প্রথমে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট চালু করলো, তাতেও যখন কুলালো না, তখন রক্ষীবাহিনীর হাতে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করে নতুন আইন প্রণয়ন করলো। তাতেও যখন কুলালো না, তখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে দেশে মৌলিক অধিকার হরণ করে একটি নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। যে পরিস্থিতির চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারী একদলীয় সরকার ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয়। আজকে বিশেষ ক্ষমতা আইন থাকা সত্ত্বেও, ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড থাকা সত্ত্বেও জননিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করে এই সরকার ১৯৭২-৭৫-এর ঘটনার একটি পুনরাবৃত্তি করতে চলেছে কীনা

www.pathagar.com

আমি জানি না, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, আমরা সেদিকেই ধাবিত হচ্ছি। তবে একটি কথা বলা ভালো, সেটি হচ্ছে, পীসফুল এবং কনস্টিটিউশনাল মীন্‌স্ অব ট্রানজিশন যদি ব্লক্‌ড হয়ে যায় তাহলে এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল মীন্‌স্ অটোমেটিক্যালি ইন্টারভিন করতে বাধ্য। আজ বাংলাদেশের বিরোধীপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখবো যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন রাষ্ট্রঘাতী পদক্ষেপের সমালোচনা এবং বিরোধিতা করে আসছে। নানা ধরনের প্রতিবাদ সমাবেশ, মিছিল, শোভাযাত্রার আয়োজন করে চলেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যে, বিরোধী দলের টোটাল প্রিপারেশন বলতে যেটা বোঝায়, অর্থাৎ জনগণকে একত্রিত করে দলীয় কর্মীদেরকে সুসংহত করে একটি ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া, ঠিক তা হয়ে ওঠেনি। এই হয়ে ওঠেনি বলেই বর্তমান সরকার নানা সময়ে কালক্ষেপণ করে, নানাধরনের অজুহাত সৃষ্টি করে এখন পর্যন্ত ক্ষমতায় আসীন রয়েছে। বিরোধী দল আজকে যে জাতীয় ঐক্যমোর্চা রচনা করেছে, এতে ফাটল ধরানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। একদিক থেকে এ সরকারের পরম সৌভাগ্য যে– এটি বিশ্বের আর কোনো সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়– মিডিয়াকে যে করেই হোক, তারা তাদের পক্ষে রাখতে পেরেছে। ট্রেডিশনালি আমরা জানি যে, মিডিয়া সাধারণত এন্টিএস্ট্যাবলিশমেন্ট, এন্টিগভর্নমেন্ট হয়। বাংলাদেশ একমাত্র ব্যতিক্রম, যেখানে মিডিয়া সরকারের শুধু সমর্থকই নয়, সরকারের অপকর্মকে সিদ্ধ করার জন্য নানা ধরণের প্রোপাগাণ্ডাসুলভ কার্যকলাপের সাথে জড়িত। বলা বাহুল্য যে, আমাদের মিডিয়ার একটি বিরাট অংশে আজকে ভারতীয় পুঁজিরও লগ্নী ঘটেছে। ধিরু ভাই-আমবানী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং গোয়েন্দা কর্মজালের নানাধর্মী ফ্রন্ট অর্গেনাইজেশন বিভিন্ন মিডিয়াতে অর্থ বিনিয়োগ করেছে– একথা আজ আর কারো অজানা নয়। মিডিয়াতে নিকট ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় মিডিয়ার রোল সম্পর্কে যতো কম বলা যায়, ততোই ভালো। তারপরেও যে কথাটি না বললেই নয়, সেটি হচ্ছে মিডিয়ানির্ভর কোনো সরকার কোনো দেশেই স্থিতিশীলতা আনতে পারে না। মিডিয়ানির্ভর একটি সরকার স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে না। যদি তাই হতো, তাহলে বিশ্বের নানা দেশে, যেখানে আমরা অথরিটেরিয়ান গভর্নমেন্ট দেখি, বা ডিক্টেটরিয়াল গভর্নমেন্ট দেখি যারা মিডিয়াকে টোটালি কন্ট্রোল করে, তাদের নিজেদের পক্ষে প্রচারণা একতরফাভাবে চালিয়ে কন্ট্রোল করে তাদের নিজেদের পক্ষে প্রচারণা একতরফাভাবে চালিয়ে আসছিলো, সেইসব গভর্নমেন্ট টিকে যেতো। আমাদের দেশেওতো একদলীয় ব্যবস্থা করে, মিডিয়ার ওপর টোটাল কন্ট্রোল এস্ট্যাবলিশ করে চেষ্টা হয়েছিল টিকে থাকার জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই এক দলীয় বাকশাল সরকারতো টিকে থাকতে পারেনি। বাংলাদেশে আজকে মিডিয়ার ওপর এই একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে যদি ক্ষমতাসীনরা মনে করে যে, তারা পার পেয়ে যাবেন, তাহলে আমার মনে হয়, মারাত্মক ভুল করা হবে। মিডিয়া নির্ভর অথচ জনগণ থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে কোন সরকারই টিকে থাকতে পারে না। দলীয় সর্বাধিপত্যের কারণে যে বাহ্যস্থিতি ও ভারসাম্য সমাজে পরিদৃষ্ট হয় তা অত্যন্ত ভঙ্গুর ও নড়বড়ে। সকলের অলক্ষ্যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সামাজিক শক্তিসমূহ যেভাবে কাজ করে যায় তাকে নদী তীরের ভাঙনের সঙ্গেই কেবলমাত্র তুলনা করা চলে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, নদীর পাড় অত্যন্ত মজবুত কিন্তু কখন যে ভেতর থেকে মাটি ক্ষয়ে সরে পড়েছে অকস্মাৎ ভূমি ধসের পূর্বে তা টের পাবার উপায়টি অনেক সময় থাকে না। সামাজিক পরিবর্তনের এ প্রক্রিয়ার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক রাজনীতি সচেতন সক্রিয়বাদীর কর্তব্য। যথোপযুক্ত সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি যথোচিত পরিবর্তন আনয়নে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিকল্প

www.pathagar.com

শক্তি এগিয়ে আসতে বাধ্য। সমাজ বিকাশের এ সরল অংক ক্ষমতাসীন মহল যে বোঝে না তা কিন্তু নয়। এ অংক ভালোভাবে বুঝে বলেই লক্ষ্য করা গেছে যে, তারা নানা ধরনের লুপহোল প্লাগ করার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। কথাটি এ জন্যে বললাম যে, ১৯৭৫-এর কথাটি মনে রেখেই বোধহয় ক্ষমতাসীন মহল রাষ্ট্রের কোয়ার্সিভ মেশিনারিজকে নিজেদের অনুকূলে রাখার জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে। তার একটি হচ্ছে সেনাবাহিনীকে পলিটিসাইজ করা। বর্তমানে সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে যাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে তিনি এলপিআরে ছিলেন। সেনা আইনের সকল নিয়মনীতি লংঘন করে এলপিআরে থাকা একজন ব্যক্তিকে, এলপিআরের শেষদিনে হঠাৎ করে আবার সার্ভিসে প্রত্যাবর্তন করিয়ে তাঁকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার রয়েছে নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক। এই নিয়োগে নানা ধরনের সমালোচনা জনসমাজে এমনকি সামরিক বাহিনীর মধ্যে হয়েছে। আমরা পুলিশ বাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করেছি যে, দলীয় সন্ত্রাসী ক্যাডারদের বিভিন্ন জায়গায় রিক্রুটমেন্টের নানা আয়োজন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়। সেটি হচ্ছে– ঢাকা শহরের বিভিন্ন থানার ওসিদের ভূমিকা, বিশেষ করে রমনা থানা, মতিঝিল থানার ওসি যেভাবে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ওপর অমানবিক, নিষ্ঠুর, পৈশাচিক হামলা বিভিন্ন সময়ে পরিচালনা করেছে তা থেকে বোঝা যায় যে, পুলিশ বাহিনীকেও পলিটিসাইজ করা হয়েছে মারাত্মকভাবে। এর বাইরে আরও কতগুলো বিষয় আছে লক্ষ্য করার। যেমন– সরকার বলছে যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের তৎপরতার কারণে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। বিরোধী দল সরকারকে সহযোগিতা করছে না বলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবণতি ঘটছে। কিন্তু দেশের মিডিয়াগুলো এই সরকারের অনুকূলে কাজ করা সত্ত্বেও তারা কতগুলো বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকায় গত ৭/৮ মাস ধরে যে সমস্ত সন্ত্রাসী তৎপরতার রিপোর্ট ছাপা হয়েছে, তাতে সরকারী এমপি থেকে শুরু করে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা অধিকাংশ সন্ত্রাসী তৎপরতার হোতা বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সরকারদলীয় এমপির বাড়ীতে বোমা তৈরীর পর সেই বোমার বিস্ফোরণে এমপির বাড়ীর ছাদসহ উড়ে গেল। সরকার দলীয় এমপির সামনে নাইন শূটারগান নিয়ে যারা বিরোধী দলীয় কর্মীদের ওপর গুলী ছুঁড়েছে তাদের ছবি সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এবং সরকার দলীয় কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবণতি ঘটিয়ে যেভাবে পুলিশকে মোকাবিলা করেছে, সেসব রিপোর্টও পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কিন্তু এসব ঘটনায় কোন পুলিশ কেস হয়নি। সরকার দলীয় কর্মকর্তা পুলিশের সহায়তার সন্ত্রাস করে মতিঝিলের মতো কর্মব্যস্ত এলাকায় ব্যাংক দখল পর্যন্ত করেছে। কোন কেস হয়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সরকার দলীয় এমপি থেকে শুরু করে সরকার দলীয় ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের আইনগত ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। এ আজ এক সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে আইন-শৃঙ্খলার অবণতির জন্য বিরোধী দলের ওপর যতই দোষ চাপান হোক না কেন, আসলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবণতির জন্য সরকার দলীয় সংগঠনের সদস্য ও কর্মীরাই দায়ী।

অন্যদিকে আমাদের যেটি লক্ষ্য করার বিষয়, সেটি হলো– সরকারের এই ব্যর্থতা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবণতিতে সরকারের যে অবদান তাকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের দেশব্যাপী যে জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা সেই জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তুলতে বিরোধী দল বারবার ব্যর্থ হয়েছে কিংবা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বাধাপ্রাপ্ত কি সরকারের তরফ থেকে হয়েছে কিংবা সরকারী নির্যাতন ও হামলার কারণেই শুধু হয়েছে? আমার মনে হয়, একথা বললে বিষয়টির অতি সরলীকরণ করা হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি, পাকিস্তান আমলে এবং মুজিব আমলেও সরকারী নির্যাতন নেমে এসেছিল। তা সত্ত্বেও এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলন রচনার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেনি। বারবার তারা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। কিন্তু এবার এই প্রথমবার আমরা লক্ষ্য করছি যে, মনে হয় বিরোধী শিবিরে ঐক্য এবং শৃঙ্খলা অনেকটা বিপর্যস্ত রূপ ধারণ করেছে। তা না হলে বিরোধী শিবিরকে নিয়ে সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকা যত ব্যতিব্যস্ত– বিরোধী দলে কতটুকু সমঝোতা হল, বিরোধী শিবিরে কতটুকু অনৈক্য সৃষ্টি হল– খোদ্ বিরোধী শিবির স্বীয় ঐক্যকে অটুট ও লক্ষ্যকে স্থির রাখা নিয়ে তত ব্যতিব্যস্ত নয়। এর প্রধান কারণ আমি মনে করি, বিরোধী দলের নিজের ঘরের ভেতরেই নিহিত। আজ দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে সরকারী দল ও রাষ্ট্রাতিক শক্তির পেনিট্রেশন ঘটেছে, আমার মনে হয় বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলগুলোও তা থেকে মুক্ত নয়। বিরোধী দলকে এ সমস্ত প্লান্টেড এজেন্ট বা এজেন্ট প্রভোকেটিয়ার্স এবং যারা অনৈক্যের বীজ বপন করতে সক্রিয়, যারা এই সরকারের আয়ু বর্ধিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে, তাদের সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। এর মাধ্যমেই তারা তাদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে পারবে। বিরোধী দলের অন্যতম কর্তব্য হবে জনসংযোগ বাড়ানো এবং জনমত সৃষ্টির জন্য পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, নগরে নগরে, হাটে-বাজারে সর্বত্র জনগণকে উজ্জীবিত করার জন্য কর্মী সমাবেশ, জনসমাবেশ করা এবং সরকারের অসদুদ্দেশ্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। বিরোধী শিবিরে নানা ছলচাতুরী নিয়ে যারা অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করবে, তাদের সম্পর্কে জনগণকে সাবধান করে দিতে হবে। কারণ, জাতীয় প্রতিরোধ ও জাতীয় ঐক্য ছাড়া এই ধরনের একটি রাষ্ট্রঘাতী ও জাতীয় নিরাপত্তা বিরোধী বৈরী রাজনৈতিক দল ও সরকারকে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

কমিটিতে সংখ্যাধিক্য প্রতিষ্ঠা করে কিংবা মঞ্চে আসন গেড়ে বসে, পোস্টারের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন ও নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়। জনগণের দুঃখ-কষ্টে শরিক হয়ে, জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, প্রথম ইনিশিয়েটিভ বা উদ্যোগ নেয়ার যোগ্যতা যিনি দেখাতে পারবেন তিনিই জনগণের আপন লোক। জনগণের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে জনগণ নেতৃত্ব দেয়ার বিরল গৌরব অর্জন করতে তিনিই সক্ষম হবেন। ছোট-বড় দলের ভেদাভেদ রেখা নিয়ে যারা মাতামাতি করবেন তারা ম্যাঠ পর্যায়ে প্রতিপক্ষের তৎপরতা লক্ষ্য করতে এবং অনুধাবন করতে অবধারিতভাবে ব্যর্থ হবেন। এই কথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ভারতের সকল অভিসন্ধি মোটা দাগে এ দেশের মানুষের কাছে ধরা পড়ে গেছে। এ কথাও সত্য যে, তাদের কৃপাপুষ্ট ক্রীড়ানক হাসিনার সরকার আজ চরমভাবে ধিকৃত। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্র তাই তাদের বিকল্প নিয়োগীদের মাধ্যমে গণসংগ্রামের স্রোতে এসে ভেলা ভাসালেও অবাক হবার কিছু থাকবে না এবং উপযুক্ত মাহেন্দ্রক্ষণে ঘোলা পানি তৈরী করে তাদের বিশ্বস্ত হাসিনাকে রক্ষার্থে নির্বাচনে পাঠিয়ে তৃতীয় শক্তিকে ক্ষমতায় আসার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে আনবে এটাই তো স্বাভাবিক। জনগণকে যদি মবিলাইজ না করে ফটোসেশন ও কাগুজে প্রচারণার মধ্যে বিরোধী দল তার তৎপরতাকে সীমাবদ্ধ রাখে তাহলে তৃতীয় শক্তি তা প্রত্যক্ষ সামরিক মদদে হোক কিংবা সামরিক-বেসামরিক আমলা ও টেকনোক্র্যাটদের সমবায়ে কতিপয় 'ভদ্রলোক' বা 'ভাল মানুষ'-এর মদদেই হোক রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার অবারিত সুযোগ পাবে। সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, মিছিল ও নানাধর্মী মার্চ জনগণকে মবিলাইজ করার এক একটি রূপ। রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতা সংরক্ষণ এবং ভারতীয় আধিপত্য ও সম্প্রসারণবাদী জিয়ো স্ট্র্যাটেজিক ও জিয়ো ইকনমিক ইন্টারেস্টের বিরোধিতা করতে সম্মত এমন সবাইকে দল-ব্যক্তি নির্বিশেষে এক মঞ্চে সমবেত করতে হবে। কেবল তখনই জনগণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে ট্রানজিশন ঘটতে বাধ্য অন্যথায় অর্থাৎ ঐক্যের নামে প্রহসনমূলক বা ননসিরিয়াস এক্সারসাইজ রাষ্ট্রঘাতী চক্র ও তার দোসরদের উৎসাহিত করবে মাত্র।

www.pathagar.com

২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০০

বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র

মাহবুব উল্লাহ :

১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনের পর আমাদের জাতীয় জীবনের প্রায় অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেছে। এটি বিংশ শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বিরাট সময়। ভাষা আন্দোলনের পর '৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। সেই নির্বাচনে যে দলটির নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই দলটি যুক্তফ্রন্টের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। কিন্তু '৫৪ সালের নির্বাচনের পর দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে– একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নানামুখী ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শরিক দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই এবং কোন্দল। বলা যেতে পারে, আদর্শিক দ্বন্দ্ব এই কোন্দলকে তীব্রতর করে তুলেছিল। এছাড়া আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে, তখনও পাকিস্তানের সংবিধান গৃহীত হয়নি এবং সংবিধানের কতগুলো মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে বিরোধ চলছিল। যেমন– পাকিস্তানের অন্তর্গত প্রদেশগুলোকে কী মাত্রায়, কতটুকু স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, নির্বাচন ব্যবস্থা পৃথক না যুক্তনির্বাচন হবে এবং জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যার ভিত্তিতে হবে না সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে হবে– এসব বিতর্ক জাতির সামনে ছিল। এছাড়া তখন থেকেই অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বও প্রকট হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে।

আমরা লক্ষ্য করেছি, পূর্ব পাকিস্তান যদিও পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ উপার্জন করত, তৎসত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগের পরিমাণ– সেটা দেশীয় বা বিদেশী সাহায্যের সূত্রেই হোক, ছিল যৎসামান্য। পরবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তার পরিবর্তে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবরে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন এবং আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। ঘটনাপ্রবাহে আমরা লক্ষ্য করলাম, ৭ থেকে ২৭ অক্টোবর এই মাত্র ২০ দিনের মধ্যে ইস্কান্দার মির্জা ক্ষমতা থেকে উৎখাত হলেন এবং তিনি তার স্ত্রীসহ লন্ডনে নির্বাসিত হলেন। দেশে শুরু হল প্রথম সামরিক শাসন।

তখনকার দিনে বিরাজমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আমরা লক্ষ্য করেছি, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শিবিরের মধ্যে একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছিল। যে দ্বন্দ্বকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভাষায় বলা হয় ঠাণ্ডাযুদ্ধ এবং মার্কিন বিদেশ নীতির একটা মূল বিষয়বস্তু ছিল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে ঘিরে ফেলা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে সামরিক জোট রচনা করা। পাকিস্তান এই ধরনের সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করবে কী না, সেই বিতর্ক অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৫৪-এ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পর সেই বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ করে এবং '৫৪ সালেই পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পরবর্তীকালে পাকিস্তান সিয়াটো এবং সেনটো চুক্তি– যা প্রথমে বাগদাদ চুক্তি বলে পরিচিত ছিলো– সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করে। এখানে লক্ষণীয় যে, ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে এবং অনেকেই মনে করেন, '৫৯ সালে নির্ধারিত

www.pathagar.com

নির্বাচন যদি অনুষ্ঠিত হত, তাহলে সেই নির্বাচনে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এই শক্তিটি সরকার গঠনে একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াতো। সেই ক্ষেত্রে যারাই সরকার গঠন করত, তাদের প্রতি তারা এই শর্তটি প্রয়োগ করত যে, একটা স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে হবে এবং এভাবে তারা সরকারকে পশ্চিমী জোট থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারত। এই ধরনের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে বহুদিন থেকেই নির্ধারিত নির্বাচন যাতে না হতে পারে, সে জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছিল এবং বলা যায়, সংগোপনে এর মধ্যে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে জড়িত করা হয়েছিল।

এই সব ঘাত প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংকটের মধ্যদিয়েই পূর্ব বাংলার জাতীয় আকাংক্ষা বিকশিত হতে থাকে। এই সময় আমরা একটা অকল্পনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে প্রস্তাব দিলেন পাকিস্তান ও ভারত দু'টি রাষ্ট্র মিলে একটি যৌথ সামরিক কমান্ড গঠনের। জয়েন্ট ডিফেন্স স্ট্রাকচার গড়ে তোলা যায় কী না। নেহরু তখন জিজ্ঞেস করলেন, এই জয়েন্ট ডিফেন্স কার বিরুদ্ধে। আইয়ুব খানের পক্ষ থেকে বলা হল, against the northern peril. অর্থাৎ উত্তরের বিপদের বিরুদ্ধে এই জয়েন্ট ডিফেন্স কাঠামো তৈরী করা হবে। পাকিস্তানের উত্তরে একদিকে যেমন সোভিয়েত রাশিয়া ছিল, তেমনি ছিল চীন। কিন্তু আইয়ুব খানের সেই প্রস্তাব নেহরুর কাছে তখন গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কারণ, তখন বিশ্বব্যাপী যে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল যুগোশ্লাভিয়ার টিটো, মিসরের জামাল আবদুন নাসের এবং ইন্দোনেশিয়ার সুকর্নকে নিয়ে, তিনিও তার নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯৬২ সাল নাগাদ পট পরিবর্তন ঘটল। ভারত এবং চীনের মধ্যে সীমান্ত যুদ্ধ বাধলো।

এই যুদ্ধের পর আমরা লক্ষ্য করলাম, ভারতকে সামরিকভাবে সুসজ্জিত করার জন্য একদিকে যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন মদদ দিল, অন্যদিকে মদদ দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে, ভারতের জোটনিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে পড়ল। সুতরাং, ভাষা আন্দোলনের পরে দেশীয় রাজনীতিতে যেভাবে ঘটনাবলী উন্মোচিত হচ্ছিল, তার পেছনে একদিকে যেমন দেশের ভেতরের দ্বন্দ্বগুলো কাজ করছিল, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বও এই ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করছিল। আমরা যদি ভাষা আন্দোলন পরবর্তী এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখি, তাহলে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রেক্ষাপটটিও কিছুটা বুঝতে পারব। '৬২ সালে নেহরু যখন জয়েন্ট ডিফেন্সের প্রস্তাবটা নতুন করে পেশ করলেন আইয়ুব খান তখন সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন। ততদিনে পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে এবং এই বোঝাপড়ার ফলেই আইয়ুব খান ভারতের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াটা অপছন্দ করলেন। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, যদি সেদিন সেই জয়েন্ট ডিফেন্স চুক্তি হত, তাহলে তাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ও ভারত মিলে একটা বিশাল ভারত এবং একটা বিশাল বাজারও সৃষ্টি হত। সেই বাজারের ওপর ভারতের ৭৬টি বড় পুঁজিপতি পরিবার সেদিন সেখানে আধিপত্য বিস্তার করতে পারত। কিন্তু সেদিন সেই ঘটনাটি সেভাবে ঘটল না।

আইয়ুব খানের শাসনামলেই ৪ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের ব্যক্তিগত পুঁজি খাতে একটা বিকাশ লক্ষ্য করা গেল। বিশেষ করে বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্প খাতে। যার ফলে এই পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজির একটা দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হচ্ছিল। যে দ্বন্দ্বের ফলে সেদিন পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা নতুন মিত্রের সন্ধান করছিল এবং ফলে একটা নতুন পরিস্থিতিও সৃষ্টি হল। পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কও থাকল, চীনের সংগে সম্পর্কও থাকল, শুধু তাই নয়, যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত শীতল ছিল, যে সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাশে পাকিস্তান থেকে মার্কিন U2 গোয়েন্দা বিমান গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য গিয়েছিল, সেই সভিয়েত

www.pathagar.com

ইউনিয়নের সঙ্গেও ইষদুষ্ণ সম্পর্ক তৈরী হলো। তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধানের বিষয়ে একটা চুক্তি হল। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠল। এরই পরিণতিতে '৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পরপরেই শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবী করে ৬ দফা কর্মসূচী পেশ করলেন।

এই ৬ দফার পরেই এলো ছাত্রদের নেতৃত্বে ১১ দফার আন্দোলন। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস সত্ত্বেও পাকিস্তান কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক চুক্তিগুলো থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়নি। সকল ঘটনা দ্রুত গতিতে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল। আসল '৭০ সালের নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটার কোন সমঝোতা না হওয়ার পরিবেশেই '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হল এবং বাংলাদেশ ৯ মাসের যুদ্ধের মধ্যদিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। তবে বাংলাদেশ যেভাবে একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো, তাতে তার কতটুকু স্বাধীনতা, কতটুকু সার্বভৌমত্ব ছিল, সেটা নিয়ে বোদ্ধা মহলে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। আমার মনে আছে, ১৯৭২ সালে ভারতের মার্কবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ নেতা মুজফফর আহমদ ঢাকায় এসেছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ' বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, এই সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী'? জবাবে মুজফফর আহমদ বলেছিলেন, 'আপনারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন মাত্র'। তিনি কিন্তু স্পষ্টভাবে স্বীকার করেননি যে, বাংলাদেশ একটা সত্যিকারের স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা যদি '৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা দেখব যে, এই ভাষা আন্দোলন একটি নতুন জাতিরাষ্ট্র উদ্ভবের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। '৫২-র ভাষা আন্দোলন নিয়ে আরও বহু কথা আছে। এই ভাষা আন্দোলনের সূচনা কবে, এর সঠিক ইতিহাস কী এবং এই আন্দোলনকে অন্য কোন শক্তি ব্যবহার করেছিল কী না, এইসব প্রশ্ন আজকাল অনেকেরই মনে উঁকি মারছে। আজকে তাই যেমন আমরা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব, তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করব, তেমনি মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা একযোগে কাজ করে যাব এবং মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে গণশিক্ষার যে বিস্তার দরকার, সেটা করব। সেই কাজগুলো করার সঙ্গে সঙ্গে আমদের জাতি গঠনে '৪৭, '৫২-এর ভূমিকা, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর যে প্রভাব, সেগুলো আমাদেরকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং আজও দেশে যে রাজনৈতিক সংকট চলছে সেই সংকটের প্রেক্ষাপটগুলো একটু পেছনের দিকে তাকিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে।

আফতাব আহমাদ :

এ বছর একুশে ফেব্রুয়ারী সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়েছে। UNESCO'র প্রস্তাবানুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে। কানাডা প্রবাসী দু'জন বাংলাদেশী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম সর্বপ্রথম UNESCO'র কাছে এ প্রস্তাব পেশ করেন। ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে '৫২-র ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে আমরা অনেক সময়ে আবেগতাড়িত হয়ে অনেক কথাই বলি। আবেগে আমরা এতদূরও যাই, বোধ হয় ১৯৪৭ এর পরই বাংলাদেশেরই বাংলা ভাষীরা এই প্রথম তাদের মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম করেছে। ইতিহাস কিন্তু সে সাক্ষ্য দেয় না। '৫২-র ভাষা আন্দোলন একটা বিশেষ মাত্রা লাভ করে পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে। কিন্তু এ অঞ্চলের মানুষের ভাষার যে সংগ্রাম, সে সংগ্রাম সুদীর্ঘকালের।

www.pathagar.com

বস্তুত বাংলা ভাষাকে ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য আমরা লক্ষ্য করি ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে সেটি হয়েছিল এ অঞ্চলে মুসলমানদের শাসনামলে। মুসলমানরা এ অঞ্চলের শাসনভার লাভ করার আগ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ছিল প্রাকৃতজন, ইতরজন কিংবা ম্লেচ্ছদের ভাষা।

বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য এবং বাংলা ভাষার বর্তমান এই রূপটি দেয়ার জন্য এই অঞ্চলের মুসলমান শাসকদের বিরাট অবদান রয়েছে এবং যেখানে এই ভাষাকে বলা হত ইতরজনের ভাষা, সেখানে দেখা গেছে যে, আমাদের এই অঞ্চলের বাসিন্দারা এই ভাষাকে প্রকৃত অর্থে তার যথাযথ মর্যাদা দেয়ার জন্য সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে যখন আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্ত এবং ব্রিটিশ শাসনের ফলে বাংলা ভাষার চরিত্রগত পরিবর্তন লক্ষ্য করি, তখন নানা ধরনের জটিলতার মাত্রা এখানে যোগ করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে যে বাংলা ভাষার চর্চা আমরা এই অঞ্চলে লক্ষ্য করেছি, তার সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ ছিল। এই ফোর্ট উইলিয়াম কেন্দ্রিক ভাষাটিকে বলা হল ' সাধু ভাষা' বা 'ভদ্রজনের ভাষা'। আর এর বাইরের যে ভাষা, যেটি প্রধানত আমরা পুঁথি সাহিত্যে প্রত্যক্ষ করি, তাকে বলা হল অশিষ্টজনের ভাষা।

ভাষার চর্চাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রূপান্তর ও পরিবর্তন ঘটতো– এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি। যেটি গুরুত্বপূর্ণ এবং যেটি অনুধাবন করার বিষয়, সেটি হচ্ছে এই যে, বাংলা ভাষাকে নিজের ভাষা হিসেবে এই অঞ্চলের মানুষ যখন গ্রহণ করে, তখন তাদের মধ্যে কোন রকমের কুণ্ঠাবোধ কাজ করেনি। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিতর্ক এবং অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে যেভাবে সামাজিক শক্তিসমূহ ক্ষমতার সাথে যুক্ত হয়েছে, তার বহিঃপ্রকাশ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ঘটেছে। যার ফলে আমরা এমনভাবে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছি যে, আমাদের অনেকের কাছে মনে হয়েছে সাধারণ মানুষের ভাষাটি প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষা নয়। বাংলা ভাষা হচ্ছে সেই ভাষা যে ভাষাটি উইলিয়াম কেরী এবং তার সাথের 'বাবু'রা বিনির্মাণ করছেন। এ ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এ থেকেই বাঙ্গালী মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন করার একটি হীন প্রবণতা আমাদের মধ্যে তীব্রভাবে কাজ করে আসছে। ভাষা আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট মার্কসিস্ট বদরুদ্দীন উমর উল্লেখ করেছেন যে, 'বাঙালী মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' ঘটেছে। এর দ্বারা তিনি এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বাঙালী মুসলমান কখনো এই অঞ্চলটিকে তার স্বদেশ ভূমি ভাবেনি।

সে ভাবত যে সে ইরান, তুরান, বোখারা, সমরখন্দ ইত্যাদি অঞ্চল থেকে এসেছে। কিন্তু আসলে যে সে ভূমিপুত্র এটি কখনো বোঝার চেষ্টা করেনি। ভাষা আন্দোলন তাকে আত্মপরিচয়ের শক্তি যুগিয়েছে, নির্দেশনা দিয়েছে। বদরুদ্দীন উমর সাহেবের এই বক্তব্যটি খণ্ডিত সত্য। এ কথা ঠিক যে বাঙ্গালী মুসলমানদের অতি সংখ্যালঘু একটি অংশ নিজেদেরকে বহিরাগত ভাবে। এ কারণেই তাদের মধ্যে বহির্মুখিতা কাজ করে। কিন্তু তিনি এর পাশাপাশি যে জিনিসটি উল্লেখ করেন নি তা হচ্ছে বাঙালী হিন্দুরও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটেনি। বাঙালী হিন্দু যখন গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এগুলোতো বাংলাদেশের কোন নির্দিষ্ট জনপদের নাম নয়। এগুলো তো বাংলাদেশের বাইরের। বহির্মুখী হওয়া বা বাইরের গৌরবকে স্বীয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কেউ যদি গণ্য করে, তার কারণে নিশ্চয়ই স্বদেশপ্রেমে ঘাটতি পড়ার কথা নয়। বাঙালী মুসলমানের স্বদেশ প্রেমে কোন দুর্বলতাই কখনো কাজ করেনি।

বাংলা ভাষার আজকের যে চেহারা ও চরিত্র, তা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানরাই সর্বাধিক অবদান রেখেছে। অনেকে বলেন যে, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে

www.pathagar.com

আমরা দ্বিজাতিতত্ত্বের কবর রচনা করার একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম। এ হচ্ছে যুক্তিবিদ্যায় যাকে বলে ফ্যালাসি অব ফোর্থটাম। আসলে ভাষার প্রশ্নে আমাদের জনগণ একটি অবস্থান গ্রহণ করেছিল। মাতৃভাষাকে যখন অপদস্ত হতে তারা দেখেছে, মাতৃভাষার স্বীকৃতি যখন তারা লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার জন্য তারা সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে, আন্দোলন করেছে এবং এই আন্দোলনের একটি পর্যায়ে এক ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে। এই আন্দোলন পরবর্তীতে যে রাজনৈতিক উপেক্ষা ও অবজ্ঞা, অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা এবং অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের যে রাজনীতি, সেই রাজনীতির শক্তি অর্জন করার ক্ষেত্রে, সেই রাজনীতিকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন একটি অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে– আমি এই তত্ত্বটি স্বীকার করতে রাজি নই। ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বাংলাদেশের সৃষ্টির পেছনে এদেশের শ্রমিক-কৃষক এবং এদেশের রাজনৈতিক দল নানা ধরনের ভূমিকা পালন করেছে। এদের প্রত্যেকেই রাজনীতির বিভিন্ন বাঁকে, বিভিন্ন মোড়ে সব সময়েই চেয়েছে, পাকিস্তানকে একত্রিত করে রাখতে। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তো বটেই। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকদের মূঢ়তা, মূর্খতা, গোঁয়ার্তুমি ও একগুঁয়েমির ফলে পুরো অবস্থা যে পর্যায়ে এসে পর্যবসিত হল, সেখানে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এর দু'পথে যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। বস্তুত বাংলাদেশের জনগণের ওপর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী গণহত্যা চাপিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের ভাঙন নিশ্চিত করে। তা না হলে ১৯৫৬'র সংবিধান রচনার সময়ে যে কম্প্রোমাইজ এবং অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করা হয় তার পুনরাবৃত্তি যদি করা যেত, তাহলে আমার মনে হয় না যে, পাকিস্তানের ইতিহাস এ ধরনের হত। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসও হয়তো ভিন্নরূপ ধারণ করত। একটি কথা এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, ভাষা আন্দোলনের সময়ে বাংলাদেশের মানুষের দাবী কিন্তু বাংলা ভাষাকে এককভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ছিল না। তারা বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চেয়েছিল।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বিশের দশকে যখন সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে বিতর্ক চলছিল যে, ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত সে সময়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতি প্রকাশ না করে হিন্দি ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা করার সুপারিশ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের এক সভায় জ্ঞানতাপস ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, যেহেতু বাংলা ভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেহেতু সর্বভারতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা। তদুপরি বাংলা ভাষা অত্যন্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষা। পরবর্তী পর্যায়েও পাকিস্তান যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন একদিকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জিয়াউদ্দিন যখন বললেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উর্দু তখন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বললেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা। বাংলা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা।

একথাগুলো এই জন্য বলছি যে, ভাষার প্রতি ভালবাসা ও প্রীতি প্রকাশ করতে গিয়ে বাংলাদেশের বাংলা ভাষীরা কখনোই পিছিয়ে থাকেননি। আজকে একথাও সাথে সাথে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বাংলা ভাষার প্রতি অগাধ এবং প্রগাঢ় ভালবাসা ও প্রীতি দেখাতে গিয়ে আমরা বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারকে উন্মোচনের চাবিকাঠি ইংরেজী চর্চা যদি আমরা বন্ধ করে দিই তাহলে কোনভাবেই আমরা আমাদের সমাজ, জাতি এবং রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য যে জ্ঞান, মনীষা ও মেধা সৃষ্টির দরকার সেটা করতে পারব না। ভাষা দিবস আসলেই বাংলা

www.pathagar.com

ভাষার প্রতি আমদের ভালবাসা অনেকটা উপচে পড়ে। কিন্তু সারা বছর ভাষার প্রতি যত্নবান হই না। আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর বিদ্যুৎজন আছেন, যারা কথায় কথায় বলেন, মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা সম্পাদন করা উচিত।

উচ্চ শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার দোষের কিছু নেই। কিন্তু জোরজবরদস্তিমূলকভাবে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে ব্যবহার করার যে প্রবণতা কাজ করছে, সেটা যে আমাদেরকে কূপমণ্ডুকতার দিকে ঠেলে দেবে, তা বলাই বাহুল্য। আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে, গভীর পান্ডিত্যপূর্ণ এবং গবেষণাধর্মী রচনা বাংলা ভাষায় করার মত পরিবেশ এবং ভৌত কাঠামো আমরা এখনও তৈরী করতে পারিনি এবং আমরা যারা মোটামুটি সুবিধাজনক অবস্থানে আছি তারা সন্তানদের হয় বহির্বিশ্বে ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছি কিংবা মোটা টিউশন ফি দিয়ে দেশের ভেতরেই প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশোনা করাচ্ছি। কিন্তু তারপর প্রতিবছর ঐ একুশের বারোয়ারী অনুষ্ঠানে মাতৃভাষা চর্চার বুলি কপচিয়ে আমরা একটি আত্মঘাতী, একটি আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছি। সেজন্য আমাদের ভাষার প্রশ্নটিকে চুল চেরা বিশ্লেষণ করা দরকার এবং এ সম্পর্কে আমাদের একটা মতামত গড়ে তোলা দরকার।

ভাষাকে যেমন শক্তিশালী করে তুলতে হবে, ভাষার শব্দ ভান্ডার যেমন বাড়াতে হবে, ভাষার ধারণক্ষমতা যেমন বাড়াতে হবে তেমনি একথাও মনে রাখতে হবে যে, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা এবং মূঢ়তাকে লালন করে ভাষার প্রতি প্রেম দেখানও মূলত ভাষারই ক্ষতিসাধন করা হবে।

মাহবুব উল্লাহ :

বদরুদ্দীন উমর বাঙালী মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে যেটি প্রণিধানযোগ্য সেটি হচ্ছে এই যে ভারতের বিশাল হিন্দুত্ববাদী জনগোষ্ঠী কখনোই মুসলমানদেরকে ভারতের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেনি এবং তাদের বিভিন্ন লেখায়, ইতিহাসের পর্যালোচনায়, বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যারা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে, বিশেষ করে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখ ধর্মাবলম্বীরাই হচ্ছে ভারতের আসল সন্তান। আর মুসলমানরা হচ্ছে ভারতমাতার অ্যাডপ্টেড চাইল্ড অর্থাৎ পালিত সন্তান। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই সম্ভবত ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে মিলনের চেষ্টাটি বারবার ব্যর্থ হয়ে গেছে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহও চেষ্টা করেছিলেন এবং তাকে হিন্দু-মুসলিম ইউনিটির অ্যাম্বাসাডর বা অগ্রদূত বলা হত।

কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত যেটাকে বলে পলিটিক্স অব ন্যাশনাল সেপারেটিজমের পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির ভিত্তিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেন। আজও বাংলাদেশে বেশ কিছুসংখ্যক কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা বাংলা কাব্য বা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানকে স্বীকার করতে চান না বা স্বীকার করলেও সেটাকে অত্যন্ত নিম্নমানের অবদান বলে চিহ্নিত করেন। সাম্প্রতিক কবিতা সম্পর্কে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের একটি প্রবন্ধ পড়েছি। সেই প্রবন্ধে তিনি বলতে চাইছেন, নজরুলের সেই কবিতা যাতে আছে 'দাড়ি মুখে সারি গান লা শারিক আল্লাহ' এটা কোন কবিতাই নয়। অথচ আমরা জানি যে, মোহিতলাল মজুমদারের মত লোক এই শব্দচয়নকে কুণ্ঠাহীনভাবে প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশেরই সন্তান এবং মুসলমানদের সন্তান হুমায়ূন আজাদ কবি নজরুলকে সেই প্রশংসাটুকু দিতে চান না।

বাংলা ভাষা কালে কালে, যুগে যুগে সমৃদ্ধ হয়েছে। একদিকে যেমন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে এর বিবর্তন ঘটেছে, অন্যদিকে বাংলার কিছু আদি শব্দ ছিল সেগুলোও

www.pathagar.com

এই ভাষার সঙ্গে আদিকাল থেকে যুক্ত হয়ে আছে। সেই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বা অভিবাসনের কারণে দেশ-বিদেশের বহু ধরনের শব্দ এই ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আরবী, ফারসী, ইংরেজী, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, তুর্কী, ওলন্দাজসহ নানা ধরনের শব্দ এই ভাষায় এসে এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। সুতরাং ভাষার ব্যাপারে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যে কত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হুমায়ুন আজাদ কবিতার মূল্যায়ন করে যেমন বলেছেন- একটি বিশাল স্বপ্ন যদি না দেখা যায়, একটি বিশাল ভাবের যদি উদয় না হয় কোন কবিতার চরণ পাঠ করার পর, তাহলে সেটাকে কবিতা বলা যায় না। আমি সাহিত্যের ছাত্র নই, কিন্তু কবিতার তো আরো কিছু সংজ্ঞা আছে। কারো কারো মতে, best words in best order- এটাই হচ্ছে কবিতা। এ ধরনের সাহিত্য সমালোচক ও বুদ্ধিজীবীরাই বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদানকে অত্যন্ত খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র আকারে দেখতে চান।

তাঁরা এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগেন। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, পদ্মাপাড়ের মানুষরা ভাষার জন্য আন্দোলন করেছে, কিন্তু ভাগিরথি তীরের মানুষরা ভাষার জন্য আন্দোলন করেনি। তারা বৃহত্তর ভারতীয় সত্তার সঙ্গে নিজেদের সত্তাকে লীন করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ যেহেতু হিন্দু জমিদার সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, সেহেতু সেটা রদ করার জন্য একটা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলা হল। যার ফলে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হল এবং পূর্ববঙ্গের মুসলমান কৃষক, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে এক ধরনের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও ব্যঙ্গ করে সে সময়ে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলা হত এবং বাংলা ভাষার একজন বড় কবি এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতাও করেছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যপনার পদে যোগ দেয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন সংকোচ আমরা লক্ষ্য করিনি। তাহলে বুঝতে হবে, সমস্যাটি বেশ গভীর। এর সঙ্গে নানা ধরনের সেনসিটিভিটি যুক্ত আছে যার কারণে আজকে পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীরা বৃহত্তর ভারতের অংশ। আর আমরা, পূর্ব বাংলা অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, আজকের বাংলাদেশের বাংলা ভাষীরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করেছি এবং সেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে সংরক্ষণ করার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছি।

আফতাব আহমাদ :

বছর দুয়েক ধরে একটি নতুন প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করছি। সুদীর্ঘ ৪৫/৪৬ বছর ভাষা আন্দোলনের স্মরণে যখন আমরা একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপন করি, আমরা সব সময়ে সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত-এঁদের অবদানের কথাই বলতাম; কিন্তু হঠাৎ করে আমরা লক্ষ্য করছি- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে শুরু করে বসন্ত কুমার এ ধরনের আরও অনেকের নামই এখন উচ্চারণ করা হয়, যারা ভাষা সৈনিক বা ভাষার প্রশ্নে একটা ভূমিকা রেখেছেন বলে দাবী করা হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান সংবিধান সভায় যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন ১৯৪৮ সনে, তার দ্বারা তিনি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু সেই কারণেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে হঠাৎ করে মাতামাতি করা এবং আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ার কারণ আমাদেরকে আজ বুঝতে হবে। বাংলাদেশে আজকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে, ভারতের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার নামে এক ধরনের অশিষ্ট প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করছি। যা কিছু মুসলমানদের অর্জন, যেখানে মুসলমানদের নাম বা আরবী-ফার্সী নাম পাওয়া যাবে, সেটাকে হেয় করা, ক্ষুণ্ন করা, খাটো করাই হচ্ছে প্রগতিশীলতা।

প্রণিধান করার বিষয় হচ্ছে, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে এত আলোচনা, এত বাড়াবাড়ি আমরা করতে পারি, অথচ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ-যিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত সভায় বাংলা ভাষার মর্যাদাকে এত উপরে তুলে ধরেছিলেন-তিনি এ পর্যন্ত দাবী করেছিলেন যে, বাংলা ভাষা সর্বভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবী রাখে- অথচ তাকে নিয়ে কোন মাতামাতি নেই। তিনি যে একজন ভাষাসৈনিক, ভাষার জন্য তিনি যে বিরাট অবদান রেখে গেছেন, এমনকি পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার আগেই আমাদের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে লিখেছিলেন ও বলেছিলেন, সেজন্য তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দেয়ার তাগিদ অনুভব করি না। আমরা হঠাৎ করে তাগিদ অনুভব করছি যে, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে মর্যাদা দিতে হবে। অর্থাৎ বরকত, সালাম, জব্বারের মহান ত্যাগকে কী ভাবে খাটো করা যায়।

আমি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে মর্যাদা দেয়ার বিরুদ্ধে বলছি না। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে যখন বরকত-সালামের বিপরীতে দাঁড় করানো হয় একটা পাল্টা ভাবমূর্তি হিসেবে, স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে, তাহলে কেন আমরা কবি আবদুল হাকিম, সৈয়দ সুলতানের কথা এবং জ্ঞান তাপস ড. শহীদুল্লাহর কথা বলব না? এইসব কিছুর পেছনে আসলে যে এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল ইন্সপিরেশন কাজ করছে তা বলাই বাহুল্য। এই যে, হুয়ামুন আজাদের কথা বলা হলো- তিনি একজন অপাঠ্য লেখক। বাংলা ভাষায় তিনি কী লেখেন না লেখেন তার মূল্যায়ন যথাস্থানেই করা আছে। তিনি নানা কারণে নিন্দা ও ধিক্কার কুড়িয়েছেন। তার গুণমুগ্ধ কোন পাঠকের সঙ্গে আমার আমার সাক্ষাতের 'সৌভাগ্য' হয়নি। তিনি ক্রমাগতভাবে নজরুলের বিরুদ্ধে বলেই যাচ্ছেন। এই প্রথমবারই নয়, বস্তুত একবার টিএসসির সড়কদ্বীপে দাঁড়িয়ে একটি সভায় নজরুলের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তাই অশালীন ভাষা যখন তিনি প্রয়োগ করেছিলেন, তখন শোতৃমণ্ডলীর পক্ষ থেকে মানুষজন ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে তাড়া করেছিল।

এই ধরনের একজন মনোবৈকল্যে আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিয়ে আমার মনে হয় বেশী আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশ অর্জন এবং বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পর তাকে হাজারো বার প্রতিবন্ধী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সকল চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনগণ যেভাবে ভাষা সংগ্রাম করেছিল সেভাবে সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। এদের এই সংগ্রামে তারা শেষ বিশ্লেষণে জয়ী হবে, সার্থক হবে সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। সে কারণে রাষ্ট্রাতিক শক্তি আমাদের দেশের অভ্যন্তরে যে রাষ্ট্রঘাতী চক্রকে লালন করার চেষ্টা করছে, সে হুমায়ুন আজাদের(?) আদলেই হোক কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির নামেই হোক, এদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা বা প্রীতি দেখাতে গিয়ে আমাদের এই সমস্ত কূপমণ্ডুক এবং এই সমস্ত মতলবী লোকদের কুমতলব সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে।

www.pathagar.com

৪ মার্চ ২০০০

সংঘাত নয়, চাই জাতীয় ঐক্য

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংঘাতময় পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সাম্প্রতিককালে নানা মহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কিন্তু এই রাজনৈতিক সংঘাতের মূলে কী আছে, সেই বিষয়টি আমাদের দেশে সুধীমহল, বিশেষ করে যারা নিজেদেরকে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি বলে দাবী করেন, তারা সুস্পষ্টভাবে তাদের কথা তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছেন বলে আমার মনে হয় না। সাধারণভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত হোমোজেনাস নেশন স্টেট। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের ভাষা এবং ধর্ম অভিন্ন। এখানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য খুবই সামান্য। কিন্তু তদসত্ত্বেও বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই আমরা দেখেছি যে, এখানে গণতন্ত্র সার্থকরূপ লাভ করতে পারেনি। এদেশে ১৯৭২-এ প্রণীত সংবিধান সম্পর্কে অনেকেই বলে থাকেন যে, গণতান্ত্রিক বিশ্বে এটি একটি আদর্শ সংবিধান। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৯৭৫ সালের মধ্যেই এই সংবিধানটি ৪ বার সংশোধিত হয়েছে এবং চতুর্থবার সংশোধনীর সময় এই সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে একটি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় থেকে একদলীয় ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হয়। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, যারা বাংলাদেশের জন্য লড়াই করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং এর আদর্শগত ভিত্তি নিয়ে বিরাট একটা মতপার্থক্য সেই ১৯৭১ সাল থেকেই বিদ্যমান ছিল।

একটা সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে যখন একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় তখন রাষ্ট্রের নেতৃত্বে অবস্থানকারীদের দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রটির উদ্ভবের পর সেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোষ্ঠী, দল ও মতের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করা। আর এই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা না গেলে সত্যিকার অর্থে জাতীয় রাষ্ট্রও গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। লক্ষ্য করার বিষয় যে, বাংলাদেশে আজ রাজনৈতিক বিভাজনটা হচ্ছে মূলত আদর্শগত বিভাজন। এই আদর্শগত বিভাজনটার কারণ হচ্ছে এই যে, ১৯৭১-এ সংঘটিত ৯ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রকৃত মুক্তি সংগ্রামীদের নেতৃত্ব নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং বলতে গেলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য গঠিত প্রবাসী সরকারও বস্তুত ভারতের আদেশ নির্দেশেই পরিচালিত হত। এ কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। এছাড়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে যে ৪টি মূল নীতির কথা প্রথম দিকে বলা হয়েছিল, সেই মূলনীতিগুলোর ব্যাপারেও জনগণের সুস্পষ্ট রায় ছিল, একথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে না। কারণ, ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল, কিন্তু তার সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক এবং এ কারণে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্যদিয়েই পাকিস্তান রাষ্ট্রটি রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত হয়ে যায়।

নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। আর পূর্ব পাকিস্তান তথা সার্বিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় আওয়ামী লীগ। কিন্তু পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়নি বলেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ঘটে। তবে আমরা লক্ষ্য করেছি, ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জনগণের কাছ থেকে যে সব বিষয়ে ম্যান্ডেট নিয়েছিল, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর সেই সব ম্যান্ডেট থেকে দূরে সরে গিয়ে নতুন রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে কিছু বিষয় গ্রহণ করা হয়, যেগুলোর ব্যাপারে পূর্বক্ষণে জনগণের কোন সম্মতি

www.pathagar.com

নেয়া হয়নি। ফলে গোড়াতেই জাতি বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং অনেকেই সেই সময় সমালোচনা করতে থাকেন যে, বাংলাদেশ ও ভারতের আদর্শ যদি একই হয়, তাহলে এই দু'টি রাষ্ট্র পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে কেন থাকবে? বলা হয়েছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। অন্যদিকে আমরা এও জানি যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শও ছিল এই তিনটিই। আমরা লক্ষ্য করলাম, শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাংলাদেশে ফিরে আসলেন এবং তারপর কলকাতায় গিয়ে আরও একটি বিষয় এর সাথে যোগ করলেন। সেটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। সম্ভবত শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের মধ্যে আত্মলীন হতে চাননি বলেই জাতীয়ত্যবাদের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি, স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্য কী, সেটা নিয়ে বিতর্ক থেকেই গেছে এবং যে ভিত্তি বলে বাংলাদেশ তার স্বাধীন-সার্বভৌম অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে, সে সম্পর্কেও বিতর্ক রয়ে গেছে এবং এই বিতর্ক সমাধানের জন্য কোন সুসংহত প্রয়াসও গ্রহণ করা হয়নি।

এরই মাঝে বাংলাদেশ বিভিন্ন রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে এগিয়েছে। এখানে যেমন একদিকে বহুদলীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছিল আবার অন্যদিকে এখানে সামরিক শাসনও চলেছে, জনগণের অধিকারকেও খর্ব করা হয়েছে। আজকাল অনেক বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক সংঘাতের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা বলেন, সেটা হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশে এখন যেহেতু দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল আছে, সেহেতু এখানে কোন একটি দলের পক্ষে, অপর একটি দলকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ দু'টি দলের মধ্যে সহাবস্থান থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, বাংলাদেশে পারস্পরিক সংহারের রাজনীতির জন্ম কখন হয়েছিল? এটার জন্ম কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবদ্দশাতেই হয়েছিল। তিনি তার নেতৃত্বে রক্ষীবাহিনীসহ বিভিন্ন ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী গঠন করে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন। বিয়াল্লিশ হাজার যুবককে সেদিন রক্ষীবাহিনীর জল্লাদদের হাতে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল? এভাবেই একটা রক্তাক্ত ইতিহাসের সূচনা হয় এবং জাতীয় বিভাজনেরও সৃষ্টি হয়।

ফল হলো যারা আওয়ামী লীগ পন্থী নন, তাদের পক্ষে আওয়ামী লীগকে সহ্য করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে যারা আওয়ামী লীগ পন্থী বা আওয়ামী লীগের মতাদর্শে বিশ্বাস করেন, তারা মনে করেন যে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌরুসীপাট্টা তাদের হাতেই এবং তারাই স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন। তারা ছাড়া আর যত মত এবং পথের লোক আছে, তারা হচ্ছে স্বাধীনতার বিরুদ্ধশক্তি। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই জাতি আজ বিভাজিত এবং পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত। আমাদের রাজনীতিবিদদের আচরণের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি প্রচণ্ড ধরনের অসহিষ্ণুতা। এই অসহিষ্ণুতা এসেছে কিছুটা আমাদের সংস্কৃতি থেকে আর কিছুটা আমাদের বিদেশনির্ভরতা থেকে। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই অসহিষ্ণুতার মূল খুঁজতে গেলে এশিয়ান ডেসপটিজমের তত্ত্বে ফিরে যেতে হবে। পশ্চিমা অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই মনে করেন যে, এশিয়ার অনেক দেশেই গণতন্ত্রের বস্তুগত ভিত্তি নেই বলেই হয় রাজতন্ত্র না হয় স্বৈরতন্ত্র এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পাশাপাশি আমাদের রাজনীতির এই অসহিষ্ণুতার মূলে সম্পদ ভোগ-দখলের জন্য ক্ষমতার চর্চাও বহুলাংশে দায়ী।

আমরা জানি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর হাজার হাজার কোটি ডলারের বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশে এসেছে এবং সিংহভাগই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যদিয়ে চ্যানেলাইজড হয়েছে এবং ডোনাররা মনে করেন যে, তাদের প্রদত্ত অর্থ সাহায্যের সদ্ব্যবহার হয় না এবং এর জন্য সর্বব্যাপক দুর্নীতিই দায়ী। অনেকেই মনে করেন, প্রতি ১০০ ডলার সাহায্যের ৪০ ডলারও বাস্তব ক্ষেত্রে জনগণের জন্য খরচ করা হয় না। এই কথাটি অনেক দুঃখ করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এক সভায় বলেছিলেন। এই ৬০ ডলারের অধিক অংশ নানা ধরনের সুবিধাভোগী মানুষ নিয়ে যায়। রাষ্ট্রের ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য

www.pathagar.com

এবং ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য যে ধরনের অনৈতিক ব্যবস্থাদি ক্ষমতাসীন দলগুলো নিচ্ছে, তার পেছনে সম্পদের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদ বন্টনের ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অস্থিরতা, রাজনৈতিক বিভাজন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কনফ্রন্টেশন বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশকে যদি আমরা একটা আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, আমরা যদি এখানে একটা স্বয়ম্ভর অর্থনীতি সৃষ্টি করতে না পারি, তাহলে জনগণের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা, গণতন্ত্রের জন্য মানুষের আকুতি সত্যিকার অর্থে কখনই কার্যকর হবে না।

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের দু'জন বুদ্ধিজীবী-একজন প্রফেসর রেহমান সোবহান আরেকজন প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংঘাতময় পরিস্থিতির ওপর দু'টি প্রবন্ধ লিখেছেন। সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু ইঙ্গিত দেয়ারও চেষ্টা করেছেন তারা। আবার তার পাশাপাশি প্রচণ্ড কনটেনশাস বা বিরোধপূর্ণ ইস্যুগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে আপাতত রাজনীতি করা যায় কিনা সে ব্যাপারেও ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। আমার মনে হয়, রাজনীতি সম্পর্কে যাদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই, তারাই শুধু সেই মেজর কনটেনশাস ইস্যুগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে এক ধরনের জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছানোর আহবান জানাতে পারেন। অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করা গেছে– প্রফেসর রেহমান সোবহানেরর লেখাটি ডেইলি স্টার এবং বাংলা দৈনিকেও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, The confrontational approach to politics in Bangladesh is now a decade old. The very issues which now find the opposition on the streets kept the Awami league on the streets during the term of office of the BNP. The one difference lay in the fact that the Awami League's primary issue over holding of elections under a non-party Caretaker Government was widely supported issue which was recognised in the passage of the constitutional amendment by the BNP Government institutionalizing the Caretaker Government. Had the BNP not resisted this demand, when it was first put before parliament by the Awami league their political fortune may have been different. প্রথমত আমার মনে হয় প্রফেসর রেহমান সোবহান এই ভুলটি করছেন যে, বাংলাদেশের কনফ্রন্টেশনাল পলিটিক্সের বয়স এক দশকের মত। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, বাংলাদেশের জন্ম থেকেই এই সমস্যাটা চলে আসছে। যেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বেছে বেছে আওয়ামী লীগপন্থীদেরকেই কেবল ট্রেনিং দেয়া এবং মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বাহিনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের সাথে দ্বিমত পোষণকারীদেরকে মুক্তিযুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করা হয়। পৃথিবীর কোন দেশের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে এ ধরনের নজির পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে। এ ছাড়া, আমরা সে সময়ে আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, যেটা আজকে অনেক মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই যে, মুক্তিযোদ্ধাদের যেমন লক্ষ্য ছিল একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব; অন্যদিকে ভারতীয়দের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে ভেঙে দু'টুকরো করা, তাদের জাতশত্রুকে দুর্বল করা। সুতরাং লক্ষ্যের দিক থেকেও যে রাষ্ট্রটি মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা দিয়েছে বলে দাবী করা হয়, সেই রাষ্ট্রটির লক্ষ্য আর আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য এক ছিল না। এসব বিষয় এখন ভারতীয় অনেক লেখকের লেখা থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সুতরাং, আমাদের দেশে পলিটিক্যাল কনফ্রন্টেশনের ইতিহাসটা শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে। এখানে আরও লক্ষণীয়, যে সিভিল সোসাইটির ওপর দারুণভাবে ভরসা করা হচ্ছে, তারাও আজ বাংলাদেশে প্রচণ্ডভাবে বিভক্ত। বিশেষ করে উল্লিখিত এই দু'জন

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যের মধ্যেও একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, প্রফেসর রেহমান সোবহানের লেখায় তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কেয়ারটেকার সরকারের যৌক্তিকতার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, বিএনপি যদি সময় মত এটা মেনে নিত, তাহলে হয়ত বিএনপি'র রাজনৈতিক ভাগ্য অন্য রকম হত। অবশ্য তাঁর প্রবন্ধের শেষে এসে তিনি বলেছেন, Furthermore the atmosphere of hatred and intolerance which permeats our political life aggravated by a year of confrontation on the streets, will ensure that the prospective election of 2001 will be far more divisive and violent than its two predecessors. In such a climate the task of a Caretaker Government could become unattainable. So that it will be difficult to find people willing and acceptable to participate in such a Government. The results of such an election may be exposed to immediate challenge by the losing party so that the life of the next parliament could begin in a state of confrontation. খুবই খাঁটি কথা। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারও হয়তো ভবিষ্যৎ উত্তরণের পথ দেখাবে না, সঠিক পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না এবং এ ধরনের একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করাও দুরূহ হয়ে পড়বে।

তিনি বলেছেন যে, এ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তার ফলাফলও পরাজিত পক্ষ মেনে নেবে না। এটাও সত্য কথা। কিন্তু তিনি তার প্রবন্ধের কোন জায়গায় লিখেননি যে ১৯৯১ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে তিনি নিজে ছিলেন, সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের ব্যাপারে আজকের প্রধানমন্ত্রী, সেদিনকার বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে, নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। তিনি এও বলেছিলেন যে, বিএনপিকে একদিনও শান্তিতে ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হবে না। এই বিদ্বেষ এবং ক্রোধের মানসিকতা মূলত আমরা আওয়ামী লীগের মধ্যেই লক্ষ্য করি। অনেকেরই হয়তো মনে আছে, শেখ হাসিনা ঐ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে দেয়া তার ভাষণেও জিয়াউর রহমান সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন 'অখ্যাত মেজর' বলে। তার এই ধরনের উক্তি তার জন্যও যে ভাল ফল নিয়ে আসেনি, সেটা সেই নির্বাচনের ফলাফলেই প্রতিফলিত হয়েছে।

তারপরই আমরা লক্ষ্য করলাম, বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ প্রতিদিনই সেদিনকার সরকারের বিরুদ্ধে হরতাল-অবরোধ, জ্বালাও-পোড়াও নীতি অনুসরণ করেছে। আজকে বাংলাদেশে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর নামক যে বিশেষ কর ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তার ফলে রাষ্ট্রের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সেদিনকার নির্বাচিত বিএনপি সরকারেরই অবদান। অথচ সেদিন আওয়ামী লীগ তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল। এমনকি আওয়ামী লীগের এক নেতা মহিউদ্দীন চৌধুরী এই ভ্যাট চালুর প্রতিবাদে চট্টগ্রামে প্রচণ্ড প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে লক্ষ্য করা গেল যে, তাদের পেশকৃত বাজেটগুলোতে সেই ভ্যাট নির্ভরতা অব্যাহত থাকলো ব্যাপকভাবে, উপরন্তু ভ্যাটের আওতা আরো সম্প্রসারিত করা হল।

আমরা লক্ষ্য করছি, পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে একটা বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের প্রতিফলন এবং এরই ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদ্বেষ ও হিংসার রাজনীতির শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে। আজকে শেখ হাসিনা কথায় কথায় হরতাল-ধর্মঘট পরিহার করার কথা বলেন। তিনি অবশ্য এক সভায় স্বীকারও করেছেন এই বলে, 'হরতালের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই, কারণ আমি নিজেও অনেক হরতাল করেছি'। আমরা লক্ষ্য করেছি, বিএনপি সরকারের আমলে

www.pathagar.com

সরকার এবং বিরোধীদলের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানান প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টার ফল হিসেবে যখন এক ধরনের সমাধান অর্জিত হতে যাচ্ছিল, অর্থাৎ, আওয়ামী লীগ তার দীর্ঘদিনের সংসদ বর্জনের অবসান ঘটাতে যাচ্ছিল এবং সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছিল, তখন বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, আমাদেরকে আশ্বাস দেয়া হোক যে, ভবিষ্যতে আপনারা আর হরতালের রাজনীতি করবেন না। সেই মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে আওয়ামী লীগ সংসদ থেকে পতদ্যাগ করে বলে যে 'মুচলেকা দিয়ে আমরা রাজনীতি করব না'।

রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌছার পর এই ধরনের একটি প্রত্যাশা নিশ্চয়ই সরকারী দলের পক্ষ থেকে খুব অযৌক্তিক ছিল না দেশের স্বার্থে, যে স্বার্থের কথা এখন খোদ প্রধানমন্ত্রী নিজে বারবার বলছেন। সুতরাং আমার মনে হয় যে, এখানে একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে এবং এই ফাঁকটা নিছক বিদ্বেষ বা নিছক রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হওয়ার ব্যাপারেই নয়, এর পেছনে আরও সুগভীর কোন বিষয় রয়েছে। প্রফেসর রেহমান সোবহান তার প্রবন্ধের শেষে একটা ছোট উক্তি করেছেন। সেটি হচ্ছে- The prospect of transforming a nation of enormous promise into a failed state must thus be projected before our political leaders to enable them to compute the costs of their ongoing political confrontation. তিনি যথার্থই Failed state- এর কথা বলেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের একটা Failed state-এ পরিণত হওয়া, সেটাকে আজ বিরোধী দলীয় রাজনীতির ভোকাবুলারিতে বলা হয় রাষ্ট্রঘাতী উদ্যোগ-এই রাষ্ট্রঘাতী উদ্যোগই সম্ভবত বাংলাদেশে এই রাজনৈতিক বিভাজনের জন্ম দিয়েছে। কাজেই এই রাষ্ট্রঘাতী উদ্যোগগুলোকে বিশ্লেষণ না করে, ব্যাখ্যা না করে, মূল্যায়ন না করে এই রাজনৈতিক অচলাবস্থার সমাধান আমরা করতে পারব না।

ক্রমান্বয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিরোধের ক্ষেত্রগুলো আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, ব্যাপক হচ্ছে। সম্প্রতি জননিরাপত্তা আইন নামক এক বিশেষ আইন পাস করে এই বিরোধের ক্ষেত্রটিকে আরও প্রসারিত করা হয়েছে। বলা চলে, এর মধ্য দিয়ে কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনের কাছ থেকে যেভাবে এই আইনটির ওপর স্বাক্ষর আদায় করা হয়েছে সে ব্যাপারটাও জাতিকে বড় ধরনের দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কোন কোন পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির ফাইল তৈরী করা হয়েছে। আবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কিছু কিছু দুর্ব্যবহারের কথাও শোনা যাচ্ছে। কোন কোন পত্রিকায় রাষ্ট্রপতির ওপর নজরদারী বাড়ানোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ক্লিনটনের সফর শেষে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে পারেন বলেও পত্রিকায় লেখা হচ্ছে। কাজেই সমস্যাটা যে কত গভীর, আমরা তা এই সব ঘটনা থেকেই উপলব্ধি করতে পারি। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহম্মদ যদি পদত্যাগ করে বসেন, তাহলে দেশের এই বর্তমান সংকট আরও কত প্রকট আকার ধারণ করবে সেটা পাঠক সমাজ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন।

আফতাব আহমাদ :

আমাদের দেশের রাজনীতি সংঘাতের রাজনীতি। প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার রাজনীতি। এভাবে যদি আমরা আমাদের দেশের রাজনীতি মূল্যায়ন করি, খুব একটা ভুল করা হবে না। এর একটি গুণগত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সংঘাত-সংঘর্ষ, প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন বা নির্মূলকরণ-এসব ধ্যান-ধারণা বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের রাজনীতিতে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে। আমি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা যদি স্মরণ করি-আমার এখনও মনে পড়ে, সামরিক প্রশিক্ষণের সময় আমাদেরকে বলা হত, যদি একজন কমিউনিস্টকে বা নকশালপন্থীকে ধরতে পারো, সাথে সাথে তাকে বধ করবে। কিন্তু পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর কোন দালালকে যদি

www.pathagar.com

ধরতে পার, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বার বার। তার ওপরে নানা ধরনের দৈহিক, শারীরিক চাপ প্রয়োগ করে তার কাছ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে। সবশেষে তাকে বন্দী করে রাখবে। ভারতীয় সামরিক মোটিভেটররা এই যে ধ্যান-ধারণাগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতরে সঞ্চার করার চেষ্টা করেছিলেন, তারও একটি কুফল আমরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ করছি এখন। এর চেয়ে বড় কথা হল, যে দলটি বলতে গেলে মুক্তিযুদ্ধের একচেটিয়া দাবীদার হয়ে বসে আছে, তার রাজনৈতিক এবং সামরিক ভুলটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে লজ্জায় মুখ ঢাকতে হবে। আওয়ামী লীগ মূলত দেশের জনগণের সাথে যে শঠতা ও প্রতারণা করেছে, সেটি আজকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। একথা আজ কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, তাজউদ্দীন আহমদের মুজিবনগর সরকারকে আওয়ামী লীগাররাই চমরভাবে বিরোধিতা করেছিল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কমপক্ষে ৩৬ বার তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনয়নের চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু তাজউদ্দীনের সে সময়ে ভরসা ছিল ভারতীয় সরকার, যে সরকার তাকে সব রকমের সমর্থন এবং মদদ যুগিয়েছিল।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, মুক্তিযুদ্ধের জন্য রিক্রুটমেন্টের সময়ে সযত্নে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যারা যুক্ত নয়, কিংবা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মতাদর্শকে যারা বিরোধিতা করে, তাদেরকে যে শুধু সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরনের দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মী, দেশপ্রেমিক নাগরিক যারা সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে এসেছেন, তাদেরকে গ্রেফতার করে ভারতীয় কারাগারে নিক্ষেপ পর্যন্ত করা হয়েছিল। অনেককে গুম করে ফেলা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে। তাদের অপরাধ এটিই, তারা আওয়ামী লীগ সংগঠনের সাথে কোন রকমের সম্পর্ক রাখেনি কিংবা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে তাদের কোন রকমের মিল ছিল না। আসলে এই যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, বিদ্বেষ, ঘৃণা-এটি আওয়ামী লীগের রাজনীতির অন্যতম মূলধন এবং আমরা ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর সেটি আরও স্পষ্টভাবে দিবালোকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাই।

দেখা গেছে, বিভিন্ন জেলায় যারা আওয়ামী লীগের সংগঠনের সাথে যুক্ত নয় কিংবা যারা সরাসরি ভিন্ন রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কিংবা বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি বা অন্যান্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পার্টির সদস্য এবং এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাদেরকে বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ঢাকায় নিয়ে এসে চরম নির্যাতন করে অনেক সময়ে হত্যাও করা হয়েছিল। আর প্রতিপক্ষকে এককথায় নকশালপন্থী, চরমপন্থী, পাক-মার্কিন চর, বাংলাদেশ বিরোধী ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করে সর্বত্র এক ধরনের সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং সেই সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা হয়। তবে সর্বত্র এই নির্মূলকাজ ফল দেয়নি। বহু জায়গায় সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলা থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তারা সেসব এলাকা থেকে পালিয়ে এসে রাজধানী ঢাকায় তাদের মুরুব্বীদের আশ্রয়ে নতুন করে সন্ত্রাস ছড়াবার নীলনকশা রচনা করে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সমঝোতার অভাব প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয়, সাধুবাদ পাওয়ার জন্য এবং গোড়ার দিকে যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ একটি সুসংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করেনি সেজন্য মুজিবনগরে ১০ এপ্রিল স্বাধীনতা যে সনদ ঘোষণা করা হয়, তাতে তিনটি মৌলনীতি উল্লেখ করা হয়েছিল– সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করি, ভারতীয় প্ররোচনা ও চাপে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলা শুরু করলেন যে, সেক্যুলারিজম বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং সেক্যুলারিজমকে কখনও তিনি বলেছেন অসাম্প্রদায়িকতা, কখনও বলেছেন ধর্ম নিরপেক্ষতা। ইন্টারচেইঞ্জ্যাবলি এই শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যে, এটি অর্জনই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা বাঞ্ছনীয় যে, ১৯৭০-এ

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত পাকিস্তানভিত্তিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে তারা বলেছিল যে, তারা কখনোই কোরআন এবং সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করবে না।

তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে কোথাও তারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেনি। এমনকি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি কীভাবে তারা অনুশীলন করবেন, সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট বক্তব্য তারা তুলে ধরেননি। আসলে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে কোন সহমত সৃষ্টি না করে, বাংলাদেশের জনগণের মধ্য থেকে কোন সমর্থন বা মতামত না নিয়ে জনগণের ওপর এই যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও মৌলনীতির নামে যে কতগুলো মতাদর্শ চাপিয়ে দেয়া হয়, এরও একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমাদের সমাজে আমরা লক্ষ্য করি। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক কর্মী সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ সমর্থন ও প্রচার করলেও ব্যাপক জনগোষ্ঠী সমাজতন্ত্র কতটুকু সমর্থন করতেন বা সমাজতন্ত্র বলতে কি বুঝতেন সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহ রয়েছে এবং আজ এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আমাদের দেশের মানুষ সমাজতন্ত্র বলতে প্রধানত বুঝতেন সামাজিক ন্যায়বিচার। ঢালাওভাবে রাষ্ট্রীয়করণ কিংবা ঢালাওভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সম্পত্তি নেয়ার নামে লুটপাটের যে অর্থনীতি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আরোহণ করে এদেশে প্রবর্তন করেছিল– এটিকে আর যাই বলা হোক, সমাজতন্ত্র বলা যায় না এবং এটিকে এদেশের মানুষ কখনোই সমর্থন করেনি।

রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আওয়ামী লীগের যে অসহিষ্ণুতা, প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্বেষ এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, খোদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি নিজেকে ভাবতেন যে, তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক তিনি প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে এ ধরনের উক্তিও করেছিলেন, নকশাল দেখলেই গুলী কর। একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কীভাবে এই ধরনের ঢালাও একটি উক্তি করতে পারেন, এটা ভাবা অত্যন্ত দুষ্কর। নকশাল তো কারও গায়ে লেখা নেই এবং কেউ যদি নকশালপন্থী হয়েই থাকে এবং সে যদি আইন লংঘন করে কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে, দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার বিচার হতে পারে। কিন্তু দেখামাত্র একজনকে নকশাল সন্দেহ করে গুলী করা আর যাই হোক, গণতন্ত্রসম্মত কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমরা এও লক্ষ্য করেছি, পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন প্রাইভেট বাহিনী, আওয়ামী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত রক্ষীবাহিনী–যাকে সাধারণ মানুষ ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী বলে উল্লেখ করত–এসব বাহিনী দেশব্যাপী ৪২ হাজারেরও বেশী প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের কর্মীদের হত্যা করেছে এবং তার দ্বিগুণ সংখ্যক লোককে যেভাবে পঙ্গু এবং কারারুদ্ধ করেছে, তা যদি আমরা একবার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি, তাহলে তৎকালীন সরকারের প্রকৃত চরিত্র কী, তা যথাযথভাবে আমরা চিত্রিত করতে পারব।

আজকে বলা হয় যে, বাংলাদেশে প্রধানত দুটি দলের যেহেতু অভ্যুদয় ঘটেছে, সেহেতু এই দুটি দলের মধ্যে একটি সমঝোতার রাজনীতি দাঁড় করাতে হবে। কিন্তু দেশে দুটি দল না ক'টি দল সক্রিয়ভাবে বিরাজ করছে বা কাজ করছে তার সত্যিকারের রায় এবং সিদ্ধান্ত আমরা পেতে পারি, জনগণের সমর্থনের যদি একটি চালচিত্র আমাদের সামনে নিয়ে আসি। একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের সমাজ বহুধাবিভক্ত। যদি আমরা সত্যিকারের গণতন্ত্র চর্চা করতে চাই, তাহলে এই নানাধর্মী, নানামতের, নানা আদর্শের রাজনৈতিক সংগঠন ও দলগুলোর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। আমরা নিশ্চিহ্নকরণ এবং নির্মূলের রাজনীতি যদি অনুশীলন করতে যাই, তাহলে কোন অবস্থাতেই আমরা একটি শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় সহমত প্রতিষ্ঠা করতে পারব না। নিজের মত চাপিয়ে দিয়ে আমরা যদি বলি, এটিই হচ্ছে জনগণের মত, সেটা আর যাই হোক গণতন্ত্রসম্মত নয়। আওয়ামী লীগ সংবিধান প্রণয়নের সময়েও বলার চেষ্টা করেছে যে, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে প্রেরণা পেয়েছি এবং যে আদর্শগুলোকে আঁকড়ে ধরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল, সেগুলোই নাকি আমাদের সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এ বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখতে পারি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার সনদে আমাদের সরকার পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্মের ছিল, যেখানে প্রেসিডেন্টের হাতে নির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল। এমন কি যেহেতু, সংবিধান প্রণীত হয়নি, সেহেতু প্রেসিডেন্টের হাতে আইন প্রণয়ন এবং বিচারেরও ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। অতএব, যখন আমরা বলি যে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রতি আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম, সেই পদ্ধতিকেই আমরা বহাল করেছি ১৯৭২-এর সংবিধানে-সেটি সঠিক নয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কোথাও আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা কিংবা সমাজতন্ত্রের মতাদর্শকে আমাদের মতাদর্শ কিংবা রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি হিসেবে তুলে ধরিনি। কিন্তু আমরা পরবর্তী পর্যায়ে দেখেছি, এগুলোই এদেশের জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। উপরন্তু ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশনের জন্য আমরা কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি।

যে কোন দেশের মুক্তিসংগ্রাম বা স্বাধীনতা সংগ্রামে কিংবা উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে শতকরা একশ' ভাগ লোক একই রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা একই রাজনৈতিক কর্মসূচী সমর্থন করবে, এ ধরনের নজির বিশ্ব ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে হোক, কিংবা রাজনৈতিক বাস্তবতাকে সত্যিকার এবং সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ব্যর্থতার কারণে হোক, একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করেনি এবং তারা প্রাণপণভাবে চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে টিকিয়ে রাখতে। এটি নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক মতপার্থক্য। খুব জোর বলা যায়, রাজনৈতিক অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই একে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পুনর্গঠনের অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত বা চিহ্নিত করা যায় না। কারণ, একটি রাষ্ট্র পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা অর্জন করার পর এর সার্বভৌম স্বতন্ত্র অবয়ব সৃষ্টি হওয়ার পর, সেই রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের কর্তব্য এবং দায়িত্ব হচ্ছে সেই রাষ্ট্রটিকে লালন করা এবং সেই রাষ্ট্রের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সেক্ষেত্রে প্রয়োজন ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন। আমরা বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকা, এমন কি ভিয়েতনামের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখব, সেখানে কীভাবে ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন কাজ করছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশনের ভাবনা শেখ মুজিবের মাথায় যে একেবারেই ছিল না, এটি আমি বলব না- তবে দলীয় দাম্ভিকতা এবং দলীয় শভিনিজমের কারণে তার দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেকটা এরকম ছিল, আমি আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দিতে রাজি আছি, যদি তারা আমার দলের পক্ষে কাজ করে। যদি তারা আমার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সংহত করার পক্ষে থাকে। এই বিশ্বাস ও অনুভূতি থেকেই তিনি এদেশে 'সাধারণ ক্ষমা'র ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাকে রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করতে প্রস্তুত নয় কিংবা তাঁর দলে যোগদান করতে প্রস্তুত নয়, তখন দেখা গেছে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যাদের সাধারণ ক্ষমতায় কারাগার থেকে ছেড়ে দেয়া হল, পালাক্রমে তাদেরকে আবার কারান্তরালে প্রেরণ করা হল।

এভাবে লক্ষ্য করলে, আমরা একটা জিনিস স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব, সেটি হচ্ছে- রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখাটাকে আওয়ামী লীগ তার একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে। এ থেকেই আমরা দেখি, যে সংবিধানে জরুরী অবস্থার বিধানও ছিল না, সেই সংবিধানকে পরিবর্তন করে জরুরী অবস্থার বিধান প্রবর্তন করা হয়, এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি যে, সংবিধানটির ন্যূনতম গণতান্ত্রিক চেহারাটা পর্যন্ত বিকৃত করে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য একটি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা হয়। এর পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা পরিবর্তনের ক্ষমতায় রদবদল ঘটাবার সকল পথ যদি রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন অসাংবিধানিক পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবেই

www.pathagar.com

ইন্টারভিন করে এবং সেরকম ইন্টারভিনশনের মধ্য দিয়ে আমরা ১৯৭৫ সালের একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করি। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা আওয়ামী লীগকে দেখেছি, নানাভাবে নিজেদের দোষ স্খালন করার জন্য নানা ধরনের প্রচারণায় লিপ্ত হতে এবং এই প্রচারণা ফলপ্রসূ করতে তাদের ২১ বছর লেগেছে।

একুশ বছরের মাথায় তারা জনগণের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অনুশোচনা ব্যক্ত করে নানা কৌশল অবলম্বন করে দেশজুড়ে দিনের পর দিন হরতাল-অবরোধ এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের প্রশাসনকে অচল করে দিয়েছিল। সেই প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়ে ১৯৯৬-এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আরোহণ করে। কিন্তু এবারও আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে যেসব প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে ব্যক্ত করেছিল, সেসব ভুলে গিয়ে তাদের গুপ্ত বা লুক্কায়িত এজেন্ডাগুলোকে তারা সামনে নিয়ে আসে। সেই এজেন্ডাগুলোর অন্যতম হচ্ছে, ভারতের কাছে বাংলাদেশের উন্নয়ন অবকাঠামো, বাংলাদেশের অর্থনীতি, সার্বভৌমত্ব, কিভাবে তুলে দেয়া যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, গঙ্গার পানি চুক্তি, এবং ট্রানজিট-ট্রানশিপমেন্টের নামে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সংকুচিত করে ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদকে বিকশিত করার জন্য এই সরকার একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমরা এ প্রসঙ্গে এর আগেও আলোচনা করেছি, তাই এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।

এখানে রাজনৈতিক সহমত বা ঐকমত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি কথা আমাদের সুস্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন, যে কোন রাষ্ট্রের কতগুলো মৌলিক বিষয়ে নাগরিকদের মধ্যে ঐকমত্য থাকে, সহমত থাকে। নাগরিকরা যেসব বিষয়কে রাষ্ট্রের মৌল বিষয় বলে গণ্য করে, সেগুলো যদি রাজনৈতিক দল তাদের মূল কর্মসূচী বা মূল এজেন্ডায় নিয়ে আসে তাহলেই বুঝতে হবে, কোথাও একটা গোলমাল বা সমস্যা আছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে আমরা কতটুকু সচেতন এবং যত্নবান হয়েছি, সেটি আজকে সমগ্র দেশবাসীর কাছে একটি মৌল প্রশ্ন আকারে দেখা দিয়েছে। আওয়ামী লীগকে জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবে বিবেচনা করে এসেছে এ পর্যন্ত এবং আওয়ামী লীগ তার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রমাণও করেছে যে, তারা ভারতকে তোষণ করা এবং ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণ করাটাকে তাদের অন্যতম বলে দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে। এই দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা এবং তার গ্রোয়িং ভায়াব্র্যান্ট ইকনমিটাকে কীভাবে লালন করা যায়, প্রটেক্ট করা যায়, সে সম্পর্কে আওয়ামী লীগ যত না বেশী যত্নবান, তার চেয়ে অনেক বেশী যত্নবান ভারতকে আরও অধিক পরিমাণে কীভাবে কনসেশন্স দেয়া যায়– বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী না করে একে আরও কত বেশী ভারত নির্ভর করে তোলা যায়, সে ব্যাপারেও বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অনেক বেশী যত্নবান। এসব প্রশ্ন কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রশ্ন নয়, এগুলো আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্ন।

এগুলো আমাদের রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন-স্বতন্ত্রভাবে টিকে থাকার প্রশ্ন। কাজেই এই প্রশ্নগুলোকে যখন দলীয় রাজনীতির সঙ্গে এককার করে ফেলা হয়, কিংবা যখন আঞ্চলিক সহযোগিতা বা উন্নয়ন চতুর্ভুজ রচনার নামে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় এবং ১৯৪৭-এর ব্রিটিশ ভারত ভাগকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয় না, এবং প্রাক '৪৭ সীমান্তে ফিরে যাওয়ার পায়তারা কারা হয় সেই রাজনীতি কোন রাজনৈতিক দল যদি লালন করে, তাকে কোন অবস্থাতেই সমর্থন করা যায় না। এখানেই আমি মনে করি, আমাদের রাজনৈতিক সমঝোতার মূল সমস্যাটি নিহিত। আমরা যদি আজকে মৌল কতগুলো বিষয়ে যেমন, বাংলাদেশের নদীসমূহের পানির প্রশ্নে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রশ্নে, বাংলাদেশের সীমান্তে উদ্ভূত সামরিক হুমকি ইত্যাদির প্রশ্নে একটি জাতীয় ঐকমত্য গড়ে

www.pathagar.com

তুলতে হলে আওয়ামী লীগকে সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে যে, তারা ভারতের স্বার্থের অনুকূলে কাজ না করে বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করার জন্য কোন্ কোন্ পদক্ষেপ গ্রহণ করার পক্ষপাতি।

এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেই একটি জাতীয় সমঝোতা ও জাতীয় সহমত গড়ে তোলা যায়। জাতীয় প্রশ্নে যদি আমরা ঐকমত্যে পৌছুতে পারি তাহলে যে অসহিষ্ণুতা ও অস্থিরতা আমরা রাজনীতিতে লক্ষ্য করছি, তা দূর হতে বাধ্য। রাষ্ট্রকে কীভাবে আমরা আরও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি, জাতীয় অর্থনীতিকে পুনর্বিন্যাস করে প্রবৃদ্ধির দিকে কীভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সে সম্পর্কে আমাদের মতপার্থক্য থাকতে পারে, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচী থাকতে পারে– এ নিয়ে নিশ্চিয়ই গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রশ্নে কোন ধরনের প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, আমরা ভারতীয় অস্তিত্ব এবং ভারতীয় অর্থনীতির সাথে নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের অর্থনীতি কীভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলবো এবং ভারতমুখাপেক্ষী না হয়ে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ককে ডিলিংক করে বিকল্প যে সমস্ত পদক্ষেপে নেয়া যায়, যার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় অখণ্ডতা ও নিরাপত্তাকে আমরা নিশ্চিত করতে পারব, এবং ভারতের 'অখণ্ড ভারত' তৈরী করার গ্র্যান্ড ডিজাইনটিকে বানচাল করে দিতে পারব, সেই লক্ষ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করার কথা আমাদের ভাবতে হবে। এই ভাবনার ক্ষেত্রে যেসব রাজনৈতিক দল এগিয়ে আসবে, তাদের মধ্যে সহমত সৃষ্টি হওয়াটা খুব সহজতর। আর যারা এগিয়ে আসবে না, তাদের সাথে যে দ্বন্দ্ব, যে মতবৈরিতা, তা জাতীয় স্বার্থেই অব্যাহত থাকবে।

এই দ্বন্দ্বের নিরসন হতে পারে একমাত্র– যারা জাতীয় স্বার্থের তেজারত করতে চায়, জাতীয় স্বার্থের সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়, তাদের রাজনৈতিক পরাজয়ের মধ্য দিয়েই। অন্য কোন পন্থায় এর অবসান সম্ভব বলে আমরা মনে করি না।

মাহবুব উল্লাহ :

এই ধরনের দ্বন্দ্বের অবসান করতে হলে সর্বাগ্রে যেতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে বলতে হবে– বিরোধটা আসলে কোথায়? বিরোধটা যে শুধু সংসদের কথা বলতে না দেয়ার বিরোধ নয়, টেলিভিশনে চেহারা দেখানোর সময় নিয়ে নয়, কেবল মাঠে-ময়দানে মিছিল করতে দেয়ার অধিকারের বিরোধ নয়, তার চেয়েও অনেক বড় এবং গভীর এই বিরোধ-এই কথাটা সমস্ত মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারলেই আমার মনে হয় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, যারা জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয় স্বতন্ত্র্য ও অস্তিত্বের প্রশ্নে একমত, সেই মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে এদেশে গণতন্ত্রকে আমরা নিশ্চিত করতে পারব, সত্যিকার অর্থে জাতির এই বিভাজনের অবসান ঘটাতে পারব এবং জাতিদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তিকে চূড়ান্তভাবে প্রান্তিক সীমানায় ঠেলে দিয়ে একটা বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য সহমতের পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবো। এর বিকল্প আমাদের আর কিছুই নেই।

www.pathagar.com

১১ মার্চ ২০০০

ক্লিনটনের আসন্ন সফর ও বাংলাদেশের রাজনীতি

মাহবুব উল্লাহ :

আমরা যখন এই আলোচনা করছি তখন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর একটি হচ্ছে বঙ্গভবনের সাথে গণভবনের সম্পর্কের টানাপড়েন, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কে অস্বস্তিবোধ। আর অন্যটি হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের আসন্ন বাংলাদেশ সফর। যদি বঙ্গভবনের সাথে গণভবনের টানাপড়েনটি সৃষ্টি না হতো, তাহলে সম্ভবত বিল ক্লিনটনের সফরই আমাদের দেশের মানুষের সমস্ত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করত। কারণ, মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সফর আমাদের দেশের জন্য একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাৎপর্যপূর্ণ এই অর্থে যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এই প্রথমবারের মতো একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফর করছেন। এটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, স্ট্র্যাটেজিক এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিক গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন এই সফরে আসছেন তার কিছুদিন পূর্বেই কার্ল ইন্ডারফার্থ উপমহাদেশের সবক'টি দেশ সম্পর্কে তাঁর একটি মূল্যায়ন পেশ করেছেন।

সেই মূল্যায়নে তিনি বাংলাদেশকে চিহ্নিত করেছেন মুসলিম বিশ্বে একটি উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হচ্ছে– 'মুসলিম' এবং 'গণতন্ত্র'-এর ওপর গুরুত্বারোপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্টতই বুঝতে সক্ষম হয়েছে– বাংলাদেশের মুসলিম পরিচয়টি এই দেশের রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা ও জীবনযাত্রাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে এই দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনরকম নীতিনির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে কিছু বুদ্ধিজীবী বলার চেষ্টা করছেন যে, যদি কোনো কিছুর সঙ্গে 'মুসলিম', 'ইসলাম'– এ জাতীয় কিছুর সংস্পর্শ থাকে, তাহলে সেটা হবে ' মৌলবাদ'। এই একবিংশ শতাব্দীতে যখন আমরা পা রাখছি তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ করে ইসলামী মৌলবাদকে বিশ্বের স্থিতিশীলতা, শান্তি এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে একটি বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করছে। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের মূল্যায়নটি একটু ভিন্ন ধরনের। এই মূল্যায়নে তারা বাংলাদেশকে ইসলামের উদারনৈতিক বৈশিষ্ট্যের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবেই গ্রহণ করে।

মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই দেখা যায় জনগণের নির্বাচিত সরকার নেই। অধিকাংশ দেশে হয় স্বৈরতন্ত্র না হয় রাজতন্ত্র চলছে। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। মুসলিম বিশ্বের অপর একটি প্রধান দেশ ইন্দোনেশিয়া দীর্ঘকাল সুহার্তোর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অধীনে থাকার পর সম্প্রতি গণতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্র কতটা টেকসই হবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। তৎসত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ার নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান অত্যন্ত ধীর এবং দৃঢ় পদক্ষেপে গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশনগুলো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছেন। তিনি সেনাবাহিনীর সংস্কার কাজেও হাত দিয়েছেন। শুরু করেছিলাম বঙ্গভবনের সঙ্গে গণভবনের সম্পর্কের টানাপড়েন প্রসঙ্গ দিয়ে। এই টানাপড়েনটি সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে যে, সম্প্রতি জননিরাপত্তা আইন নামে একটি কালো আইন সংসদে পাস করা হয়েছে এবং আইনটি পাস করা ও এর কিছু বিধান নিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রকারান্তরে তাঁর আপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন এবং এক পর্যায়ে তিনি বিলটিতে সই না দিয়ে, অনুমোদন না করে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। কিন্তু সংসদ

www.pathagar.com

বিষয়ক সচিব মঞ্জুরে মাওলা বঙ্গভবন থেকে ফাইলটি ফেরৎ পেয়েই তাৎক্ষণিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী ঝড়ের বেগে আইনমন্ত্রীসহ বঙ্গভবনে ছুটে আসেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বঙ্গভবনে আসেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ। সেখানে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাদের দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা হয় এবং সেই আলাপ-আলোচনাও যে মধুর ছিল না, সেটিও বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে। ঘটনাটি এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, টিভিতে দেশবাসীর মুখোমুখি অনুষ্ঠানেও প্রধানমন্ত্রী বলার চেষ্টা করেছেন যে, এই বিলটি ছিল অর্থবিল এবং ফাইল দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

তবে টেলিভিশনে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য প্রত্যক্ষ করার পর রাষ্ট্রপতির মধ্যে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তিনি যখন প্রধানমন্ত্রীর আবেদন-নিবেদন বা চাপের কাছে নিজেকে কিছুটা সঁপে দিয়ে বিলটি স্বাক্ষর করেছিলেন তখন তিনি একটি শর্ত দিয়েছিলেন যে, অবিলম্বে এই আইনের আপত্তিকর ধারাগুলোর সংশোধনী এনে একটি অর্ডিন্যান্স পাস করাতে হবে। তাঁর সেই শর্ত আরোপের পর সপ্তাহখানেকের বেশি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত (২-৩-২০০০) এ ধরনের কোন অর্ডিন্যান্স পাস করা হয়নি। ঘটনা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন রাষ্ট্রপতি আরেকটি অনুষ্ঠানে বলছেন যে, কঠোর আইন না করেও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব এবং আমার মনে হয়, এতে জননিরাপত্তা আইন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির দৃষ্টিভঙ্গিটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতি তাঁর সাংবিধানিক অসহায়ত্ব সত্ত্বেও যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, সেটা প্রশংসার দাবীদার। আমরা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করেছি, বঙ্গভবনের সেই নাটকের পরদিন আবদুস সামাদ আজাদ সাহেব এক বক্তৃতায় বলেছেন, রাষ্ট্রপতিকে সবকিছুতে জড়াবেন না।

জনগণ লক্ষ্য করেছে, সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে এই জননিরাপত্তা বিশেষ বিধান বিলটি পাস করানোর পর দেশের গণ্যমান্য আইনজীবী, সিভিল সোসাইটির সদস্যবৃন্দ এবং সংসদের বিরোধী দলীর নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতিকে এই বিলে স্বাক্ষর না করে বিলটি ফেরৎ পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি সবার মতামত ধৈর্য ধরে শুনেছেন, আবার তাঁর অসহায়ত্বের কথাও বলেছেন, এমনকি বিলটির মধ্যে যে ভয়ানক মানবাধিকারবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক বিধান রয়েছে, সে ব্যাপারেও তিনি বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের মতের সংগে তাঁর মতের মিলের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে, আমাদের জনগণের সামনে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কের টানাপড়েনের বিষয়টিই সামনে চলে আসছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ ধরনের প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে যে, বর্তমান ক্ষমতাসীন দল চাইছে রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিক, যাতে তাদের পক্ষে একেবারে তাদের দলের অনুগত একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করা সম্ভব হয় এবং এভাবে যিনি নতুন রাষ্ট্রপতি হবেন, তিনি নিষ্কণ্টকভাবে আগামী ৫ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালন করবেন। ধরা যাক, সবকিছু ঠিকঠাক চললে ২০০১ সালে এ দেশের নতুন নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনের ফলাফল যদি বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধেও যায়, তাহলেও যারা সরকার গঠন করবে তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সম্পর্কের সংকট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখে বাংলাদেশের গণতন্ত্র যতোই আশার সঞ্চার করুক না কেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সংকট কাটছে না বা কাটার কোন লক্ষণ আমরা দেখছি না। বরং পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে এ দেশের সুধী সমাজ, সাধারণ মানুষ সবাই এমনকি প্রিন্ট মিডিয়া মনে করছে যে, রাষ্ট্রপতিকে তার স্বপদে বহাল থাকতে হবে। সাহাবুদ্দীন আহম্মদ সাহেবকে সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। কারণ, তাঁর কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক। একজন বিবেকবান

www.pathagar.com

মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর দায়িত্ব এবং বিশ্বাসে অটল থাকবেন–এটাই জনগণ আশা করে। ইতোমধ্যে সমগ্র দুর্বলতা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির ভূমিকা জনগণের কাছে প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু আমরা এর পাশাপাশি এও লক্ষ্য করছি, যখন দেশে একটি ঘৃন্য কালো আইন চালু হতে যাচ্ছে, এই কালো আইনের ফলে দেশে বিরোধী দলের পক্ষে রাজনীতি করাটাই দুরূহ হয়ে পড়বে এবং যে মুহূর্তে রাষ্ট্রের দুই প্রধান কর্মকর্তা– রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারের মধ্যে যখন বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই মুহূর্তে বিরোধী দলগুলো কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব পালনে দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আজকে এই কালো আইনকে কেন্দ্র করে যে জনমত গঠন করা যেতো, সেটাও তারা যথার্থভাবে করতে পারছে না। এটা জনগণকে হতাশ করছে। তার সঙ্গে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মানবাধিকার রিপোর্ট– যেটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরের দু'সপ্তাহ আগে প্রকাশ করা হয়েছে; তার প্রতি নজর দিলে স্পষ্টভাবেই বর্তমান সরকারের মানবাধিকারবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং পুলিশবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ তথা আইনের শাসন বজায় রাখতে ব্যর্থতার চিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

আমার মনে হয়, এই রিপোর্ট, মার্কিন প্রেসিডেন্টের আসন্ন সফর এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মনকষাকষি-এসব কিছু যারা এই দেশে গণতন্ত্রের পথকে সুপ্রশস্ত করতে চান তাদের জন্য একটি বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে এবং এই সুযোগকে রাষ্ট্রনায়কোচিতভাবে ব্যবহার করতে পারলে, এর বিষয়গুলো জনগণের সামনে নিয়ে যেতে পারলে এ দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশাবাদী হতে পারব। এখানে আরেকটি কথা বলার প্রয়োজন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, বিল ক্লিনটনের এই সফরের সময় তিনটি বিষয় গুরুত্ব পাবে। এগুলোর প্রথমটি হচ্ছে– বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের ব্যাপারে মার্কিন কোম্পানীগুলোর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন। দ্বিতীয়টি, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে– বালাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে মার্কিন সেনাবাহিনীর সহযোগিতা বৃদ্ধি। বিল ক্লিনটন ঢাকা সফরের আগে দিল্লী আসবেন এবং দিল্লীতে সরকারী কর্মকর্তা বিশেষ করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার যে আলাপ হবে, সেই আলাপে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক, বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্ক এবং ভারত-মার্কিন সম্পর্কের বিষয়গুলো যে আসবে প্রায় নিশ্চিত। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যেভাবে বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্ককে দেখতে চায়, তা জোরদারভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আন্তর্জাতিক স্ট্যাটেজির আলোকেই বাংলাদেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী ধরনের হবে, সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করবে।

এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো মিলে যাবে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বিরোধের অবকাশও থাকবে। যেমন– মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতার বিষয়টি ভারত খুব একটা নেকনজরে দেখবে–এটা আমার মনে হয় না। সুতরাং আমাদের সরকারের জন্যও নীতিনির্ধারণে দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়ার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বলা যায় বাংলাদেশ–আমেরিকা, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশের মাটির নিচের সম্পদের ওপর জনগণের কর্তৃত্ব এবং বিরোধী দলের কর্তব্য–এসব প্রসঙ্গ এই স্বাধীনতার মাস মার্চ মাসে এসে যেন একসঙ্গে জমা হয়েছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখব যে, এই মাস বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে ভবিষ্যতে কী ঘটবে– সেটা অনেকটাই নির্ভর করবে এই মার্চ মাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপরই।

আফতাব আহমাদ :

সরকার প্রধানের সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধানের যে স্নায়ুযুদ্ধ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে, তার অবসান কবে হবে এবং কীভাবে হবে তা সুনিশ্চিত করে আমরা এখনো বলতে পারি না। তবে একথা

www.pathagar.com

নির্দ্বিধায় বলা যায়, সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধানের আগের যে সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্ক আর পুনঃস্থাপিত হবে না। তার কারণ, আমরা বারবার লক্ষ্য করছি, জননিরাপত্তা আইনকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হল এবং যে নাটক মঞ্চস্থ হল তাকে ঘিরে সরকারী মহলের নানাজনের নানা ধরনের যে উক্তি শোনা যাচ্ছে তা সংসদীয় রীতিনীতির আওতায় পড়ে না এবং অনেকটা বলা যেতে পারে শিষ্টাচারবিবর্জিত। একদিকে সরকার যেখানে সুস্পষ্টভাবে সংবিধান এবং কার্যপ্রণালিবিধি লংঘন করেছে; সেখানে একটি বিল অর্থবিল হল কি হল না, এটি একটি তুচ্ছ ব্যাপার গণ্য করার জন্য মন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারী দলের নানা হোমরাচোমরারা জনগণের উদ্দেশে হিতোপদেশ দিয়ে চলেছেন। আইনমন্ত্রী বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলছেন যে, এটা তেমন কোন ব্যাপারই নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, সরকারী দল এবং সরকার বঙ্গভবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, সেটা সংঘাতের দৃষ্টিভঙ্গি। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনকে একটি বিষয়ে সাধুবাদ জানাতে হয়– এই জননিরাপত্তা আইনটি মৌলিক অধিকারপরিপন্থী, সাংবিধানিক বিধানের পরিপন্থী–এই ধারণা এই বিলটি পাস হওয়ার পরই যে জন্ম হয়েছে, তাই নয়, এই বিলটি নিয়ে গোড়াতে যখন সরকারী দল চিন্তাভাবনা করছিল, তখন থেকেই রাষ্ট্রপতি বারংবার নানা পন্থায়, নানা সময়ে হিতোপদেশ দিয়ে ক্ষমতাসীন দলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, এভাবে কাজটি করা ঠিক নয় এবং এ ধরনের সংবিধানপরিপন্থী একটি আইন প্রণয়ন মঙ্গলজনক নয়। সরকারী দল এই আইন পাস করতে গিয়ে যে খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করাচ্ছেন বারবার, সেটি হল এই যে, দেশে একদিকে যেমন আইনশৃংখলা ভেঙে পড়েছে, অন্যদিকে আইনশৃংখলা ভাঙার জন্য নতুন নতুন যেসব অপরাধ দায়ী সেগুলোকে সামাল দেয়ার মতো আইনগত বিধিবিধান আমাদের নেই।

অতএব নতুন 'উপদ্রব' কে নতুন কায়দায়, নতুন পদ্ধতিতে মোকাবিলা করার জন্য নতুন আইনের প্রয়োজন– এই অজুহাত দেখিয়ে তারা জননিরাপত্তা আইনের মতো একটি কালো আইন সংসদে একতরফাভাবে পাস করিয়ে নিয়েছে। এখানে জননিরাপত্তা আইন প্রণয়নের পটভূমিটা একটু আলোচনা করা দরকার। সরকার যে সততার সঙ্গে এবং খোলামেলাভাবে দেশের আইনশৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য এই আইন প্রণয়ন করেনি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল– আজ থেকে দেড় বছর আগে যখন তারা প্রথম এ ধরনের একটি জঘন্য আইন তৈরীর পাঁয়তারা করছিল, তখন প্রথম মুসাবিদা করা হল নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের, যে আইনের ভেতরে জননিরাপত্তা আইনের সব বিধান ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং সে সময়ে জনসমাজের পক্ষ থেকে যে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়, এমনকি নারী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সভা-সমিতি করে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী বরাবরে আবেদন করে কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল এই বলে যে, নারী এবং শিশুদের স্বার্থে যদি কোন নতুন আইন প্রণয়ন করতে হয়, তবে সেটি পৃথক আইন হতে হবে এবং জননিরাপত্তা সংক্রান্ত যেসব বিধিবিধান এই আইনে ঢোকানো হয়েছে, সেগুলো মূলত নারী-শিশুর স্বার্থ সংরক্ষণের চাইতে জনগণের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন করার হাতিয়ারে পরিগণিত হবে। ঐ সময় আমরা লক্ষ্য করেছি, রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সরকারী দলের নানাজনকে, খোদ প্রধানমন্ত্রীকেও পরামর্শ দিয়েছিলেন এই ধরনের আইন না করার জন্য। শুধু তাই নয়, পৃথকভাবে জননিরাপত্তার নয়, জননিরাপত্তার জন্য যদি নতুন কোনো আইন করতে হয়, সেই আইনেও যাতে মৌলিক অধিকার হরণ করার জন্য কোন বিধান না থাকে, সে ব্যাপারেও তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তখন একটি পরিস্থিতির কথা মনে রেখে এবং বিরোধী দলের সঙ্গে দরকষাকষি করার একটি সুযোগ হাতে রেখে সরকারী দল ঐ আইন প্রণয়ন করা থেকে বিরত থাকে। এমনকি জননিরাপত্তা আইনটি আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদে উত্থাপিত হওয়ার ৪ দিন আগেও প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এই আইনটি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন। কিন্তু

www.pathagar.com

তার পরই আমরা লক্ষ্য করলাম তড়িঘড়ি করে, বেসরকারী সদস্য দিবসে (বৃহস্পতিবার) ঝটিকা বেগে এই আইনটি উত্থাপিত হয় সংসদে। এই আইনটি সংসদীয় কমিটি থেকে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে অনুমোদন করিয়ে সংসদে সরকারী দলের সদস্যদের সমর্থনে পাস করিয়ে নেয়া হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, তাদের নিয়ত ভাল ছিল না।

তা না হলে তড়িঘড়ি করে এ ধরনের একটি আইন প্রণয়নের কোন প্রয়োজন ছিল না। সংসদীয় কমিটিতে যখন বিলটি যায়, সেখানেও আমরা লক্ষ্য করেছি, বিরোধীদলীয় প্রতিনিধিরা তাদের ভিন্নমত প্রকাশ করেন এবং তাঁদের সেই ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করা হয়নি। উপরন্তু বিরোধী দলীয় সদস্যরা যখন এই আইনটি সংসদীয় কমিটিতে পর্যবেক্ষণের জন্য গ্রহণ করেছিলেন, সে সময়ও কোথাও এই বিলটিকে অর্থ বিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকেও সরকারী দলের অসদুদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এবারে আমি অন্য একটি প্রসঙ্গে আসব। দেশে আইন-শৃংখলা ভেঙে পড়ছে এবং তাই প্রচলিত আইন দিয়ে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব নয়– এই যে খোঁড়া যুক্তিটি সরকারী মহল বারবার দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে, এটি যে ধোপে টেকে না, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল–আমরা কয়েক মাস আগেও লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশের উত্তর-দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য পরিচালিত 'বিশেষ অভিযান' যথেষ্ট সার্থক এবং সফল বলে প্রতীয়মাণ হয়েছিল।

বহু জায়গায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় কিংবা সাঁড়াশি অভিযানের মুখে তারা ধৃত হয়। সাধারণ আইন দিয়ে যদি ঐ কাজটি করা যায়, তাহলে জননিরাপত্তা আইনের প্রয়োজনটি কোথায়, সেটি সাধারণ মানুষ বুঝতে অক্ষম। অতএব এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আমাদের পুলিশ বাহিনী যদি নিষ্ঠার সাথে ক্রিমিনাল প্রসিজিউর কোড ফলো করে সন্ত্রাসী, অসামাজিক শক্তি এবং দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়, তাহলে জননিরাপত্তা আইনের মত একটি কালো আইনের প্রয়োজন হয় না। অতএব, বিবেকবান মানুষ হিসেবে সাহাবুদ্দীন সাহেব যে কাজটি করেছেন এই আইনের প্রশ্নে, আমি মনে করি, এটি সত্যিই প্রশংসার দাবী করে। সাংবিধানিকভাবে তাঁর অসহায়ত্বের মধ্যে থেকেও তিনি জানতেন যে, শঠতা ও চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে সরকার যদিও এটিকে অর্থ বিল বলছে, এই বিলে তিনি স্বাক্ষর দিতে চাননি, প্রথম কিস্তিতে তিনি তা ফেরতই দিয়েছিলেন।

তারপর কীভাবে এই স্বাক্ষর আদায় করা হয়েছে, সেটি সবার জানা আছে। এখন প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন কতদিন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর তল্পিবাহকদের সঙ্গে তাঁর বিবেক নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়ে এই বিরোধে থাকবেন? আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, সাহাবুদ্দীন সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং তিনি যদি বঙ্গভবন ত্যাগ করেন, তার পরিণতি কী হতে পারে, দেশের রাজনীতিতে এটি তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করেন। এই দেশ এবং দেশের জনগণ তাঁকে যে সম্মান দিয়েছে অতীতে এবং তাকে যেভাবে শ্রদ্ধার ব্যক্তি হিসেবে এই দেশ, জাতি ও দেশের মানুষ জানে, তার প্রতিদান হিসেবে সাহাবুদ্দীন সাহেব পদত্যাগ করতে পারেন না। যদি করেন, সেটি এই দেশ ও দেশের মানুষের জন্য আরও অমঙ্গল বয়ে আনবে। দেশের মানুষ যে শুধু সাহাবুদ্দীন সাহেব সম্পর্কে অনেক আশা নিয়ে বঙ্গভবনের দিকে তাকিয়ে থাকে তাই নয়, আন্তর্জাতিক মহল, আমাদের ডেভলপমেন্ট পার্টনাররাও কিন্তু বঙ্গভবনের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে।

আমরা কিছুদিন আগে লক্ষ্য করেছি, মার্কিন রাষ্ট্রদূত মি. হোলজম্যান রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন এই বলে– আপনি আপনার ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে সকল রাজনৈতিক দলকে আলোচনার টেবিলে বসান এবং আমিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সাহাবুদ্দীন সাহেব যদি উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি দেশের সকল রাজনৈতিক দলের একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকতে পারেন এবং দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং কোন কোন বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য হওয়া প্রয়োজন, তার ওপর

www.pathagar.com

গুরুত্বারোপ করে খোলামেলা একটি আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন। কারণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যে আইন প্রণীত হয়, জনসমাজের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যখন আমরা নানাজন দেখা করেছিলাম, তখনও তিনি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন যে, এই আইনগুলোর বহু বিধান সংবিধানের সাথে সংঘাতপূর্ণ এবং এই সংঘাতের নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁর সেই একই অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে এই চারটি বিধানকে অর্থবিল হিসেবে পাস করিয়ে আইনে রূপান্তরিত করা হয়।

আজকে দেশের উদ্ভূত সংকটের মধ্যেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফরে আসছেন এবং ইন্ডারফার্থ ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সম্পর্কে যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিশেষ করে বাংলাদেশে হোঁচট খাওয়া অবস্থায় হলেও গণতন্ত্র যে বিরাজ করছে এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি নানা পর্যায়ে অনুশীলন করা হচ্ছে এই প্রশংসাসূচক মন্তব্য করার পর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সরকার ক্লিনটনের সফরের আগে হয়ত চাইবে না কোন ধরনের রাজনৈতিক ক্রাইসিস মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক। পরিস্থিতির উদ্ভব যাতে না হয় সেজন্য আমি মনে করি, জনসমাজের প্রত্যেকের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনের প্রতি তাঁদের নৈতিক সমর্থন যোগানো এবং তাঁকে অনুপ্রেরণা দেয়া। যে কথাটি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী বিশেষ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ উচ্চকণ্ঠে বলার চেষ্টা করছেন, 'কথায় কথায় রাষ্ট্রপতিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন না বা রাষ্ট্রপতির কাছে যাবেন না'–এই উক্তিটি যে কি পরিমাণ শিষ্টাচার বিবর্জিত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের মানুষ যখন ক্ষমতার দম্ভে মত্ত একটি রাজনৈতিক দলের কাছে কোন সুষ্ঠু আলোচনা কিংবা প্রত্যুত্তর আশা করে না, রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়া ছাড়া রাজনৈতিক দল কিংবা দেশের মানুষের আর কোন বিকল্প পথ থাকতে পারে না। প্রকারান্তরে তাহলে কী ক্ষমতাসীন দল একথাই বোঝাতে চায় যে, রাষ্ট্রপতির কাছে না গিয়ে রাষ্ট্রের অন্যান্য স্তম্ভের কাছে আবেদন-নিবেদন করো।

এটা কি সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার জন্য খুব শুভ হবে? মোটেও নয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে যেভাবে দলীয়করণের প্রক্রিয়া এই দেশে চালু করেছে– আমলাতন্ত্র থেকে শুরু করে পুলিশ বাহিনী, সামরিক বাহিনী সর্বত্র যে ধরনের একচক্ষুনীতি এবং দলীয়করণের প্রক্রিয়া তারা প্রবর্তন করেছে তাতে রাষ্ট্রের মধ্যে ইতোমধ্যেই নানা ধরনের উত্তেজনা এবং উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা কিছুদিন আগে লক্ষ্য করেছি সেনাবাহিনীর একজন অফিসার আত্মহত্যা করেছেন বলে পত্র পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। একই সঙ্গে পত্র-পত্রিকায় এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কয়েকটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও বেরিয়েছে। যেখানে প্রকারান্তরে বলার চেষ্টা হয়েছে যে, এই ঘটনাটি আত্মহত্যার ঘটনা নয়, এটি একটি হত্যা বা খুনের ঘটনা। সত্যাসত্য আমরা সবটা জানি না, তবে মানুষের মনে যখন এ ধরনের প্রশ্ন দোলা দেয়, তখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, সেনাবাহিনীর মধ্যে যে প্রফেশনালিজম থাকার কথা ছিল, তা কতটুকু আছে কিংবা থাকলেও সেটিকে নস্যাৎ করার জন্য কী ধরনের প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে সেনাবাহিনীতে ব্যাপক রদবদলও ঘটেছে। যে কোন প্রতিষ্ঠানে রদবদল তো হতেই পারে। এটি একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বাভাবিক রুটিন অ্যাফেয়ার হওয়ার কথা। কিন্তু এই রদবদল যখন সংবাদপত্রে ডাবল কলামে বা ট্রিপল কলামে হেডলাইন হয়ে বের হয়, তখন ভাবনার অনেক অবকাশ থেকে যায় এবং পত্রিকাতেই ফলাও করে আসছে যে, একদা এককালের সেই কুখ্যাত রক্ষীবাহিনীর একজন অফিসারও মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

এই অফিসারটির গুণাগুণ বা যোগ্যতা সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু পত্রিকায় যখন তার পরিচয়টি রক্ষী বাহিনীর সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়, তখন অনেক কিছু ভাবনার আছে। জনগণ এ থেকে যা অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তা স্বাভাবিকভাবেই করবে। এটি দেশের জন্য যে মঙ্গলজনক নয়, ক্ষমতাসীন দলের জন্যও নয়। এই পরিস্থিতিতে যখন বিল ক্লিনটন

www.pathagar.com

বিশেষ করে যখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর সহযোগিতাকে আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ করতে চাইবেন তাঁর এই সফরের সময়ে। দিল্লীতে যেহেতু তিনি বাংলাদেশ সফরের আগে অবতরণ করবেন, ভারতীয়দের পক্ষ থেকে ব্রিফিং তাঁকে দেয়া হবে, সেটি নিঃসন্দেহে এই ধরনের সহযোগিতার অনুকূল হবে না, তা ধরেই নেয়া যেতে পারে। কিন্তু অপরদিকে বাংলাদেশ আর্মির নিজস্ব ইন্সটিটিউশনাল কর্পোরেট ইন্টারেস্টও আছে, এটি আমাদের মনে রাখতে হবে। বাংলাদেশ আর্মি প্যাসিফিক কমান্ডের সাথে জয়েন্ট এক্সারসাইজে অংশগ্রহণ করে থাকে এবং দীর্ঘদিন ধরে এটাকে বলা যেতে পারে তাদের একটি ট্র্যাডিশনাল রিচুয়ালসের মধ্যে পড়ে যায় যে, তারা প্যাসিফিক কমান্ডের সাথে দীর্ঘদিন ধরে সহযোগিতা করে আসছে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যথেষ্ট দক্ষতা ও কুশলতা দেখিয়েছে এসব জয়েন্ট এক্সারসাইজে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন নামজাদা সিনিয়র কমান্ডাররা বেশ এপ্রিশিয়েট করেছে।

এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণ করতে পারবে কি পারবে না, তা অনেকটা নির্ভর করছে এতদিন যে কর্পোরেট ইন্টারেস্ট দেখা হত, সেটি আবার নতুনভাবে প্রতিফলিত হবে কিনা তা নিয়ে নানা মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা এখন চলছে। আরো একটি বিষয় আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ। বিশেষ করে তেল ও গ্যাসের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে যাচ্ছে। পত্রিকায় ইতোমধ্যেই খবর বেরিয়েছে যে, বাংলাদেশ ভারতের কাছে গ্যাস পাইপ লাইনের মধ্যে সবরাহের বিষয়ে সম্ভবত নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছে। অপরদিকে, বিকল্প প্রস্তাবও বাংলাদেশের কাছে আছে– গ্যাসভিত্তিক জ্বালানি সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত জ্বালানি যে বাজার গ্রহণ করবে, সেই বাজারে রফতানী করা। কিন্তু যেহেতু এটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, সেহেতু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিশেষ করে যারা আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোতে কমিশন লাভে প্রত্যাশী থাকেন, তাঁরা এই ধরনের প্রস্তাবকে হয়ত স্বাগত জানাবেন।

তাঁরা হয়ত চাইবেন, খুব দ্রুততার সঙ্গে বাংলাদেশের গ্যাস মার্কিন বা ভারতীয় কোম্পানীগুলো যেভাবে বাংলাদেশ থেকে হাতিয়ে নিতে চায়, সেভাবেই দিয়ে দেয়ার জন্য। এই সবকিছু মিলে যে সংকটের জন্ম দেবে সেই সংকট বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার পরিবর্তে আরো দরিদ্র পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপে দেখতে চায় এবং যে সংবেদনশীল মন নিয়ে ইন্ডারফার্থ বাংলাদেশের মানুষের ধর্মানুরাগকে মৌলবাদ বলে ভুল করেননি, তিনি একে কেবল ধর্মানুরাগই মনে করেছেন, ঠিক একই সংবেদনশীল মন নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উৎকণ্ঠাকে যদি বিল ক্লিনটন বিবেচনায় নেন, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের বিপরীতে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অবস্থানের যে গুরুত্ব, এটিকে যদি বিবেচনায় নেন এবং দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিও–স্ট্রাটেজিক ইন্টারেস্টে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে– কারণ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি হাইফেনের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং আগামীতে এই অঞ্চলে রাজনীতি বিশেষ করে ভূ-রাজনীতির যে পুনর্বিন্যাস ঘটতে যাচ্ছে, সেখানে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ যদি আরও শক্তিশালী হয়, বাংলাদেশের ভূমিকা মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ার কথা নয়।

এটিকে মনে রেখে যদি বাংলাদেশের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে যে সরকার শুধু সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য এবং কোনরকমে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মার্কিন আশীর্বাদকে ব্যবহার করতে চায়, সেই সরকারের ওপর যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকে ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ডে একটি এক্সক্লুসিভ পজিশন হোল্ড করে তারা যদি চায় সেই সরকারকে যথাযথভাবে আচরণ

www.pathagar.com

করার জন্য যথেষ্ট হিতোপদেশ ও পরামর্শ দিতে পারেন। বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজকে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সেটি হল যারা ক্ষমতায় এসেছেন, তারা জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হয়ে যেসব বিষয় জনগণের সামনে কখনও উন্মোচিত করা হয়নি, জনগণের কাছে ভারতকে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট দেয়ার কথা নির্বাচনী ইশতেহার অঙ্গীকার করা হয়নি, বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চল ভারতীয় মিলিটারী ইন্টারেস্টে ব্যবহার করতে দেয়ার কথা বলা হয়নি এবং আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি দ্বিপাক্ষিকতার জালে আবদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি ক্ষমতাসীন দল জনগণকে কখনও দেয়নি সেগুলোই করছে বা করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে এ দেশের মানুষ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন এবং এ ক্ষেত্রে তারা মনে করেন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সফরে পজিটিভ কতগুলো ইন্ডিকেটরস তারা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন এবং এ রকম কিছু যদি তারা দেখেন, তাহলেই আমার মনে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতা একটি নতুন মোড় নেবে এবং এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।

মাহবুব উল্লাহ :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি মনোযোগী হতে পারে। আমার মনে হয়, যেই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুসলিম সত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের পৃথক সত্তাটিও কিন্তু স্বীকৃত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ যে ভারত থেকে একটি পৃথক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র, সেটি আমরা ইন্ডারফার্থের বক্তব্য থেকেও ইনফার করতে পারি। এখন বাকি যে বিষয়টি থাকে, সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে, বিশেষ করে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে গ্যাস ও তেলসহ অন্যান্য যে খনিজ সম্পদ রয়েছে, সে ব্যাপারে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার– আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বাংলাদেশের কোন সরকারই বাংলাদেশের এসব সম্পদ সম্পর্কে কোন দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা প্রণয়ন করেনি। যার ফলে আমরা এখন লক্ষ্য করছি, অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের সবগুলো গ্যাসের ব্লক ইজারা দেয়ার কথা হচ্ছে, বাংলাদেশ বাধ্য হবে এই গ্যাস বিদেশে বিশেষ করে ভারতে রফতানী করতে। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কতটা ন্যায্যমূল্য পাবে, সে ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ, ভারতই হচ্ছে এই গ্যাসের একমাত্র ক্রেতা।

আমরা সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করেছি, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের গ্যাসের ব্যাপারে উৎসাহ দেখানো হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া বলছে যে, বাংলাদেশের গ্যাসকে এলএনজি হিসেবে সিলিন্ডারজাত করে বিদেশে রফতানী করা সম্ভব এবং এ ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতাকে বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারে। আবার, ডি-এইট সম্মেলনে ইরানও বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদের ব্যাপারে উৎসাহ ব্যক্ত করেছে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, কুশলী নীতি গ্রহণ করলে বাংলাদেশ এই গ্যাস সম্পদ দিয়ে সর্বাধিক সুবিধা আদায় করতে পারত। কিন্তু অত্যন্ত মায়োপিক নীতির ফলে এবং আশু ক্ষমতায় টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষা থেকে যেভাবে তড়িঘড়ি করে চুক্তিগুলো করা হচ্ছে, সেটি যে জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না, সে ব্যাপারে সুধী সমাজের অনেকেই মন্তব্য করেছেন, বিশেষ করে আমাদের দেশের ভূতত্ত্ববিদ, এমনকি পেট্রোবাংলার বিশেষজ্ঞরাও একই কথা বলেছেন। এছাড়া এর অর্থনৈতিক পরিণতি কী হতে পারে, সেটিও কিন্তু ভাববার বিষয়। বছর দুয়েক আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জন এডামস মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের স্পনসরে বাংলাদেশ সফর করে গেছেন– তিনি এক আলোচনায় বাংলাদেশের জনগণকে এই গ্যাস সম্পদের যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেছেন।

তিনি বলেছেন, এই ধরনের খনিজ সম্পদ যে সব দেশে পাওয়া যায়, সেসব দেশের জন্য একটু সমূহ বিপদ হচ্ছে– অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে 'ডাচ ডিজিজ'। যে ডিজিজের

www.pathagar.com

ফলে নাইজেরিয়ার অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। অর্থাৎ তড়িঘড়ি করে চুক্তি সম্পাদন করে যখন এ ধরনের মূল্যবান সম্পদকে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়, তখন এগুলোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কায়েমী স্বার্থবাদীরা মোটা অংকের একটি মধ্যস্বত্ব পেয়ে থাকে। এর ফলে সমাজে একটি বিত্তশালী অলিগার্কির সৃষ্টি হয়, সেটি দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্যও বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে হঠাৎ করে পাওয়া সম্পদের ফলে বিলাস দ্রব্যের পেছনে ছোটার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে, যে রকম ঘটনা নাইজেরিয়ায় ঘটেছিল– খুব দামী-দামী বিদেশী গাড়ী, বিলাস দ্রব্য আমদানী হবে– এর ফলে অচিরেই বিদেশী মুদ্রার ভান্ডার শেষ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, অর্থনীতিতে দরিদ্র জনগণের প্রতি দৃষ্টি এড়িয়ে কেবলমাত্র শহর এবং দেশের বাহ্যিক চাকচিক্য বৃদ্ধি করার জন্যই বিনিয়োগের বিকৃত ব্যবহার হবে। এটা অনেকটা দুর্ভিক্ষের সময়ে দরিদ্র কোন লোককে যদি পোলাও বিনিয়ানী খেতে দেয়া হয়, তার যেমন অবস্থা হবে, বাংলাদেশেরও কিন্তু সেই ধরনের অবস্থা হতে পারে। এই জন্য এই মুহূর্তে জাতিকে সাবধান হতে হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বলতে হবে,বাংলাদেশের সুদূরপ্রসারী স্বার্থ এবং বাংলাদেশে আমেরিকানদেরও সুদূর প্রসারী স্বার্থ কোথায়।

আফতাব আহমাদ :

আমার মনে হয়, গ্যাস সম্পর্কে আরেকটি কথা না বললেই নয়। আমাদের চট্টগ্রামে যে ইস্পাত কারখানা আছে, এটি বহুকাল আগে থেকেই সেকেলে এবং অনুৎপাদনশীল হয়ে আছে। বর্তমানে বিভিন্ন উন্নত দেশে বিশেষ করে জাপানে যে টেকনোলজি ডেভলপ করেছে, গ্যাসভিত্তিক ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার– আমাদের যদি শিল্পায়নের দিকে এগুতে হয়, নিঃসন্দেহে আমাদের যেহেতু সুলভ গ্যাস রয়েছে, সেই গ্যাসভিত্তিক ইস্পাত কারখানার দিকে যদি আমরা নজর দেই, তাহলে এই গ্যাসের একটি ইতিবাচক, কার্যকরী ও যথার্থ ব্যবহার আমরা করতে পারব, যেটি জাতীয় স্বার্থের পক্ষে কাজ করবে।

আজকের আলোচনায় সবশেষে আমি বলব, বিরোধী দলগুলো এখন পর্যন্ত বঙ্গভবন এবং গণভবনের টানাপড়েনের প্রশ্নে এক ধরনের মৌনতা অবলম্বন করছে। আমি মনে করি, এই মৌনতা ভাঙার সময় এসেছে। গণভবন যেভাবে বঙ্গভবনকে অপদস্থ করার জন্য বা রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধে যেভাবে অবস্থান করতে চাইছে, এটির কঠোর নিন্দা করা বিরোধী দলের অন্যতম কর্তব্য এবং দায়িত্ব এবং একই সাথে সারাদেশের মানুষকে আজকে সচেতন এবং সজাগ করে তোলা দরকার যে, আমরা অনেক কষ্টে যেসব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, সেগুলো এবং সর্বোপরি সংবিধানকে পদদলিত করে এখানে পরোক্ষ এক ধরনের একদলীয় শাসন এবং একদলীয় প্রশাসন গড়ে তোলার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য জানবাজি রেখে হলেও চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার এখনই সময়।

www.pathagar.com

২৫ মার্চ ২০০০

সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

মাহবুব উল্লাহ :

মানুষের জীবনে রাজনীতি একটি অপরিহার্য উপাদান। বলতে গেলে রাজনীতিই সাধারণ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে। প্রতিটি মানুষই একটি রাজনৈতিক প্রাণী। যেহেতু সমাজবদ্ধ প্রতিটি ব্যক্তি তার স্বার্থের অন্বেষণ করে, তার মঙ্গলের অন্বেষণ করে, সেহেতু তাকে অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে হয়। রাজনৈতিক সচেতনতাবিবর্জিত মানুষ কখনোই তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। বাংলাদেশে বর্তমানে যে ধরনের রাজনীতি চর্চা হচ্ছে, সেই রাজনীতি চর্চা সম্বন্ধে বিভিন্ন মহলে নানা ধরনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রাজনীতি যদি মানুষের কল্যাণের জন্য হয়, তাহলে এ প্রশ্ন করার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি মানুষের কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম নয়। আমার মনে হয় এই অভিযোগটা শুধু যে সরকারী দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা নয়, বিরোধীদলগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রথমত আমরা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক আচার-আচরণের যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের ক্ষোভ প্রকাশ করি, সেটা হচ্ছে আমাদের রাজনীতিতে প্রচণ্ডধরনের বিদ্বেষ-ঘৃণা চালু রয়েছে, যার সাথে গণতন্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই। যদি আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, তাহলে এই বিদ্বেষ ও ঘৃণাকে পরিহার করতে হবে। কিন্তু তারও আগে বড় যে প্রশ্ন, সত্যিকার অর্থে একটি রাজনৈতিক দল কখন জনগণের রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়? পরিণত হয় তখনই, যখন সে তার রাজনীতিকে কৃষকের পর্ণকুটিরে, শ্রমিকের বস্তিতে, কিংবা মধ্যবিত্তের বাসস্থানে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। আজকে বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি চলছে, যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলো গড়ে উঠেছে– সেই সব কর্মকাণ্ডের দিকে লক্ষ্য করলে দেখব যে, জনগণের প্রতি এক ধরনের দায়িত্বহীনতা এই সব রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কাজ করছে। গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল কথাই হচ্ছে From the masses to the masses–জনগণের কাছ থেকে জানতে হবে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কী, তারা কী চায়, কী অনুভব করে। তাদের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার সার সংকলন করে সেই অনুসারে নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে জনগণের কাছে ফিরে যাওয়া তাদের দায়িত্ব।

রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের রাজনীতিও করে। এটার প্রয়োজন হয় জনগণের স্বার্থকে সংরক্ষণের জন্য, মানবাধিকার ও জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখার জন্য জনগণকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা। কিন্তু বাংলাদেশোত্তরকালে যে রাজনৈতিক কালচার এই দেশে গড়ে উঠেছে, সেখানে ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষ নির্বাসিত হয়ে যাচ্ছে। অতীতে আমরা লক্ষ্য করেছি, ব্রিটিশ, ভারত কিংবা পাকিস্তান আমলে একটি হরতাল ডাকার আগে একটা বিশাল ধরনের প্রস্তুতি থাকত। এর মধ্যে ছিল জনগণের মধ্যে খণ্ডসভা করা, বিভিন্ন শ্রমিকসংস্থার সাথে যোগাযোগ করা, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং হরতালের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা। সেই কারণে আমরা লক্ষ্য করতাম যে, প্রত্যেকটি হরতাল সেই সময়ে অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হত জনগণের অংশগ্রহণ ও সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি হরতালই একটি জঙ্গী হরতালের রূপ ধারণ করত। কিন্তু বাংলাদেশোত্তরকালে আমি বলবো হয়তো সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের কারণে কিংবা আমাদের রাজনীতিতে রাজনীতির চেয়ে অস্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হয়ে যাবার ফলে প্রতিপক্ষকে ভয় দেখিয়ে নিজস্ব কর্মসূচী বা কর্মকাণ্ডকে প্রতিষ্ঠা করার একটি কালচার এই দেশে গড়ে উঠেছে। যে জন্য আমরা লক্ষ্য করি আজকাল হরতাল কর্মসূচীর সময়ে বোমাবাজি বা অস্ত্রের হুমকি দেখানোর ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আরো অদ্ভুত ব্যাপার, আজকাল রাজনৈতিক জনসভাগুলো করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষ করে বস্তিগুলো থেকে লোকজনকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়। আমরা শুনেছি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জন্য বিভিন্ন ধরনের 'রেট' রয়েছে। অর্থাৎ পুরো রাজনীতিটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এক ধরনের মার্সিনারী রাজনীতি। আমাদের রাজনীতিতে আরেকটি জিনিস এখন খুব প্রবলভাবে উচ্চারিত হয়। সেটা হচ্ছে ক্যাডার বাহিনী। এক সময়ে 'ক্যাডার' কথাটি একটি মর্যাদাপূর্ণ বিষয় ছিল। বিশেষ করে এটি কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এই ক্যাডাররা হতেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, ত্যাগী। রাজনীতিতে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করার জন্য তারা প্রস্তুত থাকতেন। কিন্তু আজকে ক্যাডার বলতে আমরা বুঝি, একধরনের দলীয় পেটোয়া বাহিনী। যে বাহিনী দলের কর্মসূচীকে সফল করার জন্য প্রতিপক্ষকে নানা ধরনের ভয়ভীতি ও হুমকি দেখায় এবং কখনোবা হামলাও চালায়। অর্থাৎ জনগণকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে, নানাভাবে পার্সু করে, আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে তাদেরকে রাজি করিয়ে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচীকে সফল করার সংস্কৃতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এটি এখন আমাদের ছাত্র রাজনীতি, শ্রমিক রাজনীতি থেকে শুরু করে বৃহত্তর জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রেও একইভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আজকে দেশে ছাত্র সংগঠনগুলোর সমর্থন তৈরী করার জন্য নানাধরনের জঘন্য কৌশল অবলম্বন করা হয়। যেমন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যদি চান যে তিনি মেধার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করবেন, তিনি সেটি পারেন না। বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা এসে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কাছে তাদের দলের জন্য কোটা দাবী করে এবং তা পূরণ করা না হলে শিক্ষক এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপর হামলা চালায়। এখানে ছাত্রদের রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে রিক্রুট করার কোন সুযোগ নেই; যেটি হচ্ছে সেটি কেবল তাদের ভর্তি করানোর প্রলোভন দেখিয়ে দলভুক্ত করে নেয়ার প্রচেষ্টা। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করার একটি প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করে আসছি। অন্যদিকে শ্রমিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি, অবৈধ উপায়ে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা করায়ত্ত করার প্রচেষ্টা। বাংলাদেশ হওয়ার পর যখন সমুদয় কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল, তখন এই সুযোগটা প্রচন্ডভাবে বৃদ্ধি পেল এবং এর ফলে একধরনের ভুঁইফোঁড় পরজীবি শ্রমিকনেতার উদ্ভব ঘটল। তারা শ্রমিকদের, সর্বহারাদের বা মেহনতি মানুষের রাজনীতিকে পরিত্যাগ করে কেবল মাত্র নিজস্ব ক্ষমতার খুঁটিকে মজবুত করার জন্য যা প্রয়োজন- সেই কাজটিই করছে। এমনকি কারখানার ক্ষতিসাধান করে ভুয়া শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা করতেও তারা পিছপা হননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের রাজনীতিটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে পড়েছে এবং সত্যিকার রাজনীতি চর্চা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়নের মধ্যেও এক ধরনের বিকৃত সংস্কৃতি আমরা লক্ষ্য করি। সেটি হচ্ছে, যারা ব্যাংক ডিফল্টার, যারা লুটেরা, লুম্পেন ক্যাপিটালিস্ট, তাদের চাঁদায় রাজনৈতিক দলের জন্য অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলা। অথচ সাধারণ জনগণের কাছে গিয়ে তাদের সাহায্য-সমর্থনটা নেয়ার কোন প্রচেষ্টা আমাদের দেশে নেই, অথচ যেটি আমরা উন্নত পাশ্চাত্যের দেশে লক্ষ্য করে থাকি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এই শ্রমসাধ্য কাজটি করতে চায় না। সত্যিকথা বলতে গেলে আমাদের রাজনীতিতে এক ধরনের লুম্পেনিজম প্রভাব বিস্তার করেছে। এই লুম্পেনিজমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেখাপড়া না করে সার্টিফিকেট নেয়া, রুগীর যথেষ্ট সেবাযত্ন না করে, রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা-

www.pathagar.com

নিরীক্ষা না করে একটি প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে মোটা অংকের ফী আদায় করা, কারখানায় কাজ না করে সপ্তাহ শেষে মজুরি গোনা এবং অফিস আদালতে নিয়মিত কাজ না করে মাসের শেষে বেতন গোনা। ঠিক একইভাবে আজকে আমাদের দেশে অনেকেই অল্প আয়াসে, অল্প কষ্টে, খুব শর্টকাট পথে ধনবান হয়েছেন। সঞ্চয়ের মনোবৃত্তি, একিউমুলেশনের প্রচেষ্টা, এন্টারপ্রেনারশীপ ইত্যাদির মাধ্যমে পুঁজিগঠনের পথে এই দেশের ধণিকশ্রেণী অগ্রসর হয়নি। শিক্ষকদের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি তাদের শিক্ষকসুলভ চরিত্র ও আচরণ এখন আর তেমন নেই। সে কারণে আজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও জ্ঞানচর্চার জন্য শিক্ষকগণ যতটা না নিবেদিত, তার চেয়ে অনেক বেশী নিবেদিত তাদের দলীয় ক্ষমতা বিস্তার করার জন্য। যে কারণে আজকে বলা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টিচার রিক্রুট করা হয় না, করা হয় ভোটার রিক্রুট। কারণ, আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে যারা নিয়োজিত থাকেন, তারা নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা করায়ত্ত করে নিতে পারেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সামগ্রিকভাবে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সমস্যাটা আসলে বৃহত্তর সমাজেরই সমস্যা। বাংলাদেশের সমাজ আজকে যে সামাজিক স্তরের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে, সেই ট্রানজিশনেররই সমস্যা। যতদিন এই সমস্যা থাকবে, যতদিন এখানে একটি বলিষ্ঠ মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে না উঠবে, একটি সত্যিকার প্রফেশনাল গ্রুপ গড়ে না উঠবে, একটি সত্যিকার শ্রমিক শ্রেণী গড়ে না উঠবে; যতদিন একটি বিদ্যানুরাগী ছাত্র সমাজ গড়ে না উঠবে– ততদিন এই ধরনের অবস্থা বলবৎ থাকবে বলে আমি মনে করি। আর এই ধরনের অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন খুব সহজসাধ্য হবে না। তাই যারা সমাজ ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করেন, তাদের কর্তব্য হল রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিষয়টি এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের এই পরিস্থিতিটি ব্যাপকভাবে তুলে ধরা।

আফতাব আহমাদ :

আসলে আমাদের যে বাস্তবতা, তার দিকে লক্ষ্য করে তার বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জটিল কাঠামো যদি আমরা অবলোকন করি, তাহলে আমার মনে হয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিটাকে আমরা বুঝতে পারব। আমরা এর আগে একবার মূল্যবোধের ওপর আলোচনা করেছি এবং এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর যৎসামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করেছিলাম। একটি জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্তর্গত কী কী বিষয়? তবে রাজনৈতিক ঐতিহ্য তার লোকনায়ক, তার গণপ্রতিষ্ঠানগুলোর চেতনা, নাগরিকদের রাজনৈতিক আবেগ-অনুভূতি, রাজনৈতিক মতাদর্শের লক্ষ্য এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেসব নিয়ম-কানুন আছে– এসব কিছুর সম্মিলিত সমাহারকে আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসেবে ধরতে পারি। আমাদের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে রাজনৈতিক যোগসূত্রটি যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, তাহলে এর বিকৃত এবং অধঃপতিত রূপের কারণটিও আমরা উপলব্ধি করব। সমাজের অধিপতি গোষ্ঠী যারা সমাজকে নেতৃত্ব দেন, তাদের মধ্যে ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং মতাদর্শের যে চরিত্র আমরা লক্ষ্য করব, তার প্রতিফলন আমরা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্য করব। এই কালেকটিভ ওরিয়েন্টেশনটি রাজনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পদ্ধতি নিরূপণ করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা যদি বিশেষ করে লক্ষ্য করি, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই যারা রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকার দাবীদার বলে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই আওয়ামী লীগ কী ধরনের রাজনীতি এ দেশে চর্চা করত, এটি যদি আমরা

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ করি তাহলে বিষয়টি অনেক বেশি প্রাঞ্জল হয়ে যাবে। মতপার্থক্য, মতভেদ বা ভিন্নমতের কারণে যখন বিরোধী দল রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করতে শুরু করে, তখন আওয়ামী লীগের প্রধান ব্যক্তি বা প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান জনসভায় দাঁড়িয়ে উক্তি করেছেন, 'রামের ধনুক সহ্য হয়, হনুমানের ভেংচি সহ্য হয় না'। বিরোধী দলের সমালোচনা এবং বিরুদ্ধবাদী আচরণের রাজনৈতিক জবাবদানের পরিবর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের দাম্ভোক্তি ছিল, 'লালঘোড়া দাবড়িয়ে দেব'। অর্থাৎ ভিন্নমতের কোন স্থান বাংলাদেশে হবে না। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক কর্মসূচী ও মতাদর্শ প্রচার করতে দেয়া হবে না। এই যে অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি, এটি প্রধানত আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন, পলিটিক্যাল অ্যাকশনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হচ্ছে পলিটিক্যাল সিস্টেম। এই সিস্টেমটি গড়ে ওঠে একটি বিশেষ প্যাটার্ন বা ধরনের ওরিয়েন্টেশনের ফলে। এই ওরিয়েন্টেশনটা আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা বলতে পারি 'অথরিটেরিয়ান ওরিয়েন্টেশন'। এখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। এর অনেকটা কারণ হয়ত আমাদের পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত। তবে পারিবারিক কাঠামোকে অতিক্রম করে সামাজিকায়নের মধ্য দিয়ে আমাদের এখানে বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসনের আমল থেকে অনেক ধরনের রূপান্তর ঘটেছে এবং আমরা মোটামুটি পাশ্চাত্য ধাঁচের এক ধরনের গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতার বিষয় যত্নবান হতেও শিখেছিলাম। কিন্তু ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অস্ত্রবলে বলীয়ান তরুণ এবং রাজনৈতিক দাম্ভিকদের পদচারণা আমাদের রাজনীতিকে অনেক অধঃপতিত এবং অনেক বিকৃত ধারায় পর্যবসিত করেছে। যার ফল হচ্ছে এই যে, আমরা গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করার জন্য, তাকে ট্রান্সফর্ম করার জন্য এবং উন্নত রাজনৈতিক ভারসাম্য, রাজনৈতিক সমীকরণ সৃষ্টি করার জন্য যে কাজগুলো করা দরকার সে কাজগুলো আমরা পরিহার করে চলেছি এবং দৈহিক শক্তি কিংবা অস্ত্রের শক্তি দিয়ে আমরা রাজনৈতিক সমস্যাকে মীমাংসা করার চেষ্টা করেছি। এর ফলেই আমরা দেখি যে, বাংলাদেশের যাত্রা যদিও গণতন্ত্র অর্জন এবং সংরক্ষণের জন্য শুরু হয়েছিল– কিছু ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য এবং এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার যাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য, একটি ডেসপটিক স্টেট গড়ে তোলার বিভিন্ন পদক্ষেপ একে একে 'গণতন্ত্রমনা' আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে দেখি।

আওয়ামী লীগ কতটুকু গণতন্ত্রমনা, সে সম্পর্কে অবশ্য খোদ পাকিস্তান আমল থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন মত ছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি, পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগ থেকে ভিন্নমত পোষণ করে যখন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করা হয়, তখন খোদ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মওলানা ভাসানীর সম্মেলন কীভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। আমরা এও দেখেছি, আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর বিরোধিতা করে যারা জনসভা করার চেষ্টা করেছিল সেসব জনসভা কীভাবে লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে ভেঙে দেয়া হয়। এই যে চর দখলের রাজনীতি আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে টেনে আনল, এই রাজনীতির ওপর যবনিকাপাত এখনও ঘটেনি। এ কারণেই আমরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নানা ধরনের জটিলতা প্রত্যক্ষ করি। বাংলাদেশ হওয়ার পর আমরা দেখেছি একেবারে গোড়ার দিকে শেখ মুজিবুর রহমান অন্তত গণতন্ত্রের ব্যাপারে যাকে আমরা বলি 'লিপ সার্ভিস'– এই লিপ সার্ভিসটা অব্যাহত রেখেছিলেন। যে কারণে সংবিধানের গোড়ার দিকে তিনি জরুরী অবস্থার বিধান রাখাও প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু যখন পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন করলে এ দেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবে তা গ্রহণ করবে না। তার বিরুদ্ধ পক্ষ তার স্খলন, তার ত্রুটি এবং তার একদেশদর্শী নীতির বিরোধিতা করে

www.pathagar.com

জনমত গড়ে তুলবে, তখন তিনি জরুরী অবস্থার বিধান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। একই সাথে দেখা গেছে, সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে যেখানে ধরতে গেলে, কোন ক্ষমতাই দেয়া হয়নি। মূল সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে শুধু প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল আর বাদবাকী সব কাজ রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে করতে হত। অবশ্য চতুর্থ সংশোধনবীর মাধ্যমে যখন সংবিধানের পুরো চেহারাটাই পাল্টে দেয়া হয়, তখন রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। বাংলাদেশের সংবিধানে সাধারণ ক্ষমা, দণ্ড ও মওকুফ ইত্যাদি অধিকার রাষ্ট্রপতিকে দেয়া হয়েছে। যদিও এসব ক্ষেত্রে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ প্রয়োজন হত। বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রের প্রতি তার 'নিষ্ঠা' প্রকাশ করার জন্য রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার পরিবর্তন করে অস্থায়ী সংবিধান আদেশের মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করলেন এবং বিচারপতি আবূ সাঈদ চৌধুরী, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যিনি যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশের হাইকমিশনার ছিলেন তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীও শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেননি। তার কারণ হচ্ছে, পরপর দু'বার সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে, যে সাধারণ ক্ষমা দেয়ার সাংবিধানিক এখতিয়ার একমাত্র রাষ্ট্রপতির ছিল; কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং সেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। এর ফলে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যে দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পদত্যাগের মধ্য দিয়ে। এই ধরনের একটি সংকট বর্তমানে বাংলাদেশে আবার দেখা দিয়েছে। শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক প্রশংসা বিশেষ করে ডোনারদের প্রশংসা এবং গণতান্ত্রিক মহলের প্রশংসা পাওয়ার জন্য বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনয়ন দান করেন এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তার বিরোধিতা করা হয়নি। অতঃপর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। বলতে গেলে তার তেমন কোন ক্ষমতা নেই সংবিধানের অধীনে। যদিও দ্বাদশ সংশোধনীর কারণে বর্তমান রাষ্ট্রপতি ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের তুলনায় একটি ক্ষমতা অধিক ভোগ করেন। তিনি প্রধান বিচারপতিও নিয়োগ করতে পারেন স্বাধীনভাবে। এছাড়া আর সমস্ত বিষয়ে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হয়। অতি সম্প্রতি জননির্যাতনের জন্য যে জননিরাপত্তা আইন নামক একটি কালো আইন সংসদে একতরফাভাবে পাস করা হল সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে নির্বাহী বিভাগ চরম শঠতা এবং প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। রাষ্ট্রপতিকে বলা হয়েছিল যে, এই বিলে রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যয়ের বিলটি সংসদে উপস্থাপনের আগে প্রশ্ন জড়িত– এই বলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আদায় করা হয়েছিল। বিলটি পাস হওয়ার পর স্পীকার বললেন যে, এই বিলটি হচ্ছে অর্থবিল এবং প্রকারান্তরে তিনি বলার চেষ্টা করলেন যে, রাষ্ট্রপতি এই অর্থবিলে আগেই তাঁর সম্মতি দিয়েছিলেন। কারণ, রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতিরেকে কোন অর্থবিল জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা যায় না। অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির একমাত্র ক্ষমতা হচ্ছে সরাসরি বিলে সম্মতি দেয়া, অথবা তিনি যদি সম্মতি দিতে অপারগ হন ১৫ দিন পর এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইনে পরিণত হবে। প্রথমত রাষ্ট্রপতি গণমাধ্যমের মাধ্যমে জনসাধারণকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এই বিলটি তাঁর কাছ থেকে অর্থবিল হিসেবে সুপারিশকৃত বিল নয়। দ্বিতীয়ত, তিনি ১৪টি দিন অপেক্ষা করেছেন এই বিলে তাঁর স্বাক্ষর না দিয়ে। তিনি আশা করেছিলেন যে, সরকারের তরফ থেকে তাঁর সাথে অন্তত আলাপ-আলোচনার চেষ্টা করা হবে এবং আওয়ামী লীগ ছাড়া এ দেশের প্রত্যেকটির দল এই বিলের বিরোধিতা করেছে। এই বিল যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্যাতন করার জন্য, ঘায়েল করার জন্য প্রণীত হয়েছে সে সম্পর্কে সর্বমহল থেকে আশংকা প্রকাশ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। সবাই এ বিষয়ে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেছে যে, একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যা সম্ভব হয়নি, সেরকম কিছু প্রবর্তন না করেই এই জননিরাপত্তা আইন দিয়ে তার চেয়ে জঘন্য একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হবে।

চৌদ্দদিন অপেক্ষা করার পর শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি যখন এই বিলটিতে স্বাক্ষর না করে ফেরত পাঠালেন, তখন সংসদ সচিব মজ্জুরে মওলা, যাঁর দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রপতির ফেরত দেয়া ফাইলটি সরাসরি সংসদ ভবনে নিয়ে যাওয়া– তিনি তা না করে ফাইলটি বঙ্গভবনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করলেন এবং প্রধানমন্ত্রী পরবর্তী পর্যায়ে আইনমন্ত্রীকে নিয়ে সরাসরি বঙ্গভবনে হাজির হলেন। এর কিছুক্ষণ পর সেখানে গিয়ে হাজির হলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদও। পত্রিকান্তরে প্রকাশ যে, আবদুস সামাদ আজাদ প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেছেন। রাষ্ট্রপতি অবশ্য মাথা নত করেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ভিন্নমত এবং অক্ষমতার কথা প্রকাশ করেছেন। সবশেষে একটি আপসরফা হয়। রাষ্ট্রপতির দাবী অনুযায়ী দু'-চারটি সংশোধনী করতে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি জ্ঞাপন করে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে কৌশলে এই বিলে স্বাক্ষর আদায় করেন। দরজার আড়ালে বঙ্গভবনে আর কী ধরনের অশিষ্ট আচরণ এবং ঘটনা ঘটেছে, তার বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নেই। কিন্তু এটি আজ অত্যন্ত স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রপতির দফতরের সাথে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের একটি সুস্পষ্ট ভেদরেখা এবং তীক্ষ্ণ মতপার্থক্য হয়েছে। আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির তেমন কিছু করার না থাকলেও রাষ্ট্রপতির ডেরিবেটিভ এবং রেসিডিউরি পাওয়ার এগুলো এখন পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রপতি প্রয়োগ করেননি। তিনি এ পর্যন্ত সমাজ এবং জাতির উদ্দেশ্যে মরাল পারচুয়েশনের কতগুলো আবেদন করেছেন বিভিন্ন ইস্যুতে– শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, শিল্প-কারখানায় শ্রমিক নৈরাজ্য, ব্যাংকে ঋণখেলাপীদের ব্যাপারে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরাজমান অসহিষ্ণুতার প্রশ্নে তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। এই মতামত তুলে ধরতে গিয়ে অনেক সময় ক্ষমতাসীন দলকে যথেষ্ট বিব্রতও করেছেন। এগুলো বর্তমান ক্ষমতাসীন দল স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি এবং তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে আসছেন, যে উদ্দেশ্যে বা যে লক্ষ্যে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্য চরিতার্থ হবে না এবং সে কারণে ক্ষমতাসীন দল একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়, যে পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি আত্মসম্মানজ্ঞানে প্ররোচিত হয়ে পতদ্যাগ করে চলে যাবেন এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীন যদি পদত্যাগ করে চলে যান, তাঁর জায়গায় তারা সরাসরি একজন দলীয় ব্যক্তিকে, যিনি দলনেতার হুকুমবরদার হবেন– তাকে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করা সহজ হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তার বিঘোষিত নীতিকে পাশ কাটিয়ে তার যে লুক্কায়িত কর্মসূচী, যা জনগণকে আগে জানান হয়নি, তা একের পর এক বাস্তবায়ন করে চলেছে। যে কর্মসূচীকে আজকে সবাই এক বাক্যে বলেন, রাষ্ট্রঘাতী কর্মসূচী। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, জাতীয় অর্থনীতির অস্তিত্ব এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও বিপন্ন করে একের পর এক পদক্ষেপ বর্তমান সরকার গ্রহণ করছে। ভারতীয় স্বার্থের আনুকূল্যে একের পর এক যেসব নীতিমালা এই সরকার প্রণয়ন করছে। তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ এবং তাকে কেন্দ্র করে বিরোধীদলে যে রাজনীতি গড়ে উঠেছে, তার অন্যতম আওয়াজ হচ্ছে– বর্তমান সরকারের পদত্যাগ এবং জাতীয় সংসদের জন্য একটি নতুন সাধারণ নির্বাচন। এই সাধারণ নির্বাচনের দাবী আজকে একটি সার্বজনীন দাবীতে পরিণত হয়েছে এবং অচিরে এই দাবী আদায়ের জন্য বিরোধী দলের যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠবে, সেই আন্দোলনের কথা মনে রেখেই বর্তমান সরকার ভাবছে যে, রাষ্ট্রপতির দফতরে যদি একটি পরিবর্তন আনা

www.pathagar.com

যায়, তাহলে ইতোমধ্যে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীতে যে রাজনীতিকরণ ও দলীয়করণ ঘটেছে, তার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতির দফতরকেও যদি দলীয়করণ করা যায়, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তারা নিশ্চিতভাবে তাদের দলের পক্ষে কাজ করার একটি ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গড়ে তুলতে পারবে। সে কারণেই আজকে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং তারা বঙ্গভবন ও বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে আছে।

সাধারণ মানুষ এখনও মনে করে যে, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন একজন সজ্জন ব্যক্তি এবং তিনি তাঁর বিবেক অনুযায়ী যথেষ্ট করার চেষ্টা করছেন। তাঁর মতো একজন প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, বিবেকবান এবং মোটামুটি দলনিরপেক্ষ ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকা অনেক বেশী প্রয়োজন। অতি শীঘ্রই যেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে, এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণে জাতীয় নির্বাচন যেখানে অনুষ্ঠিত হবে। এসব কিছুর জন্য আমাদের যে বিশেষ রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখানে গড়ে উঠেছে, তাকে আমরা দায়ী করতে পারি। আমরা বলছি যে, সংসদীয় গণতন্ত্রই হচ্ছে আমাদের ঈপ্সিত রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে আমরা এটাই গ্রহণ করেছি; এটিই আমাদের অন্যতম কাম্য– অপরদিকে সংসদীয় গণতন্ত্র লালন করার জন্য বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিকাশ এবং ভিন্নমতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সংসদকে সুস্পষ্টভাবে আইন প্রণয়নের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা, সংসদের কাছে সরকারকে দায়বদ্ধ রাখা এবং জবাবদিহি করার যে সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়োজন, সে ব্যাপারে আমরা আদৌ যত্নবান নই। বর্তমান সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অস্বচ্ছতা এবং সংগোপনে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, এর কোন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই। গঙ্গার পানি প্রশ্নে ভারতের সাথে যে তিরিশ বছর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আনয়নের নামে ভারতের পরামর্শে এবং ভারতের মধ্যস্থতায় যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং অতি সম্প্রতি ভারতকে সামরিক করিডোর দেয়ার জন্য ট্রান্সশিপমেন্টের যে আওয়াজ বর্তমান সরকার তুলেছে এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা যেটি স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, বিরোধী দলের সাথে আলাপ-আলোচনা তো দূরের কথা, সংসদে বিরোধীদলকে এনে তাদের সাথে পুরো বিষয়টি খোলাখুলিভাবে বিতর্ক করা তো দূরের কথা, ক্ষমতাসীন দল তার নিজের সংসদীয় দলের মধ্যেও এসব বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে রাজি নয়। এমনকি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সাথেও ক্ষমতাসীন দল আলোচনা করতে রাজি নয়। অর্থাৎ কর্তৃত্ববাদী যে প্রবণতাগুলো আমরা রাজনীতিতে গোড়া থেকে প্রত্যক্ষ করেছি, সেটি দিনে দিনে আরো গভীরভাবে, আরো প্রগাঢ়ভাবে আমাদের ওপর চেপে বসেছে এবং বর্তমান সরকার বা বর্তমান ক্ষমতাসীন দলকে এক কথায় বলা যায় রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিসর্জনকারী এবং রাষ্ট্রঘাতীচক্র। এর পেছনে মূল প্রবণতা হিসেবে কাজ করছে প্রতিশোধ এবং প্রতিহিংসার রাজনীতির প্রেরণা। ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পরিবর্তনটাকে এখন পর্যন্ত ক্ষমতাসীন দল মেনে নিতে পারেনি। তারা একটি বিষয় বিস্মৃত হয়ে যান যে, এদেশের মানুষ যে ম্যান্ডেট তাদের দেয়নি– মানুষের মূল ম্যান্ডেটকে লংঘন করে মানুষকে দেয়া মূল ওয়াদা ভেঙে এদেশের গণতন্ত্রকে কবর দেয়া হয়, বহুদলীয় রাজনীতিকে কবর দেয়া হয় এবং সংবিধানে সন্নিবেশিত সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোকে বিকৃত করে একদলীয় ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়াই শুধু নয়, ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। বিশ্ব ইতিহাস, বিশ্ব সভ্যতা সাক্ষী দেয় যে ক্ষমতার পালাবদল বা ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের যদি সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই অসাংবিধানিক পন্থায় পরিবর্তন আসতে বাধ্য। বাংলাদেশেও ১৯৭৫-এ এই ঘটনাটি ঘটেছিল। এর জন্য ক্ষমতাসীন দল এবং সেই দলের নেতাই দায়ী ছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫-এর পরিবর্তনকে বাংলাদেশের মানুষের চরম অপরাধ হিসেবে গণ্য করে জনগণের

www.pathagar.com

ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব এবং জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যে জিও-স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা রচনা করেছে তার অনুকূলে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল কাজ করেছে। ক্ষমতাসীন দলের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে জনগণকে সংগঠিত করার পরিবর্তে ক্ষমতাসীন দল যেমন শক্তিনির্ভর অস্ত্রনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছেন প্রতিপক্ষের মধ্যেও অনেক সময় তেমনি এই প্রবণতাগুলো লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একটি জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জনগণই হচ্ছে সকল শক্তির আধার এবং জনগণ যাদের সাথে নেই, তারা কোন অবস্থাতেই একটি রাজনীতির পরিবর্তন আনতে পারে না। সে কারণেই আজকে আমাদের আরও অনেক বেশী জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে জনগণকে সংঘবদ্ধ করার কাজে হাত দেয়া অত্যাবশ্যক বলে আমি মনে করি।

মাহবুব উল্লাহ :

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি নেগেটিভ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা। এ থেকে আমাদেরকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ফরাসী দার্শনিক আর্নেস্ট রেনানের কছে। ১৮৮২ সালে 'What is a nation' শীর্ষক বক্তৃতা করতে গিয়ে রেনান বলছেন যে, জাতি হচ্ছে একটি নিরন্তর সাংস্কৃতিক উদ্ভাবনা এবং একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। জাতি গঠিত হয় একটি দীর্ঘদিনের ত্যাগ ও সনিষ্ঠ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। এর মধ্যে একদিকে যেমন থাকে অতীতের ঐতিহ্য সম্পর্কে অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ও সমৃদ্ধ স্মৃতি, তার সাথে থাকতে হবে বর্তমান মানুষের সম্মতি। এটিকে তিনি বলেছেন, 'গ্রেট সলিডারিটি'। কিন্তু এটি অর্জন করতে গেলে প্রয়োজন ক্রিয়েটিভ রিনিউয়াল বা এক ধরনের সৃজনশীল নবায়ন এবং তিনি এটিও বলছেন যে, এই ধরনের নবায়ন যখন একবার হয় তখন এটিকে প্রতিনিয়ত আমাদের দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হয়। এর জন্য এক ধরনের আদর্শগত নবায়নেরও প্রয়োজন হয়। আর এই আদর্শগত নবায়নের জন্য রেনান মনে করেন যে, এক ধরনের নিত্যদিনের জনসম্মতি প্রয়োজন হয়। জনগণের মনোভাব জানতে হয়। আমাদের রাজনীতিতে এ ধরনের সংস্কৃতি কতটুকু উপস্থিত আছে, সেটাই আজকে প্রশ্ন এবং আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষ এবং জাতিকে একটি চোরাগোপ্তা পথে নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা তার পেছনে সেই ধরনের মানসিকতাই কাজ করছে, যে মানসিকতা প্রতিদিন মানুষের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করতে চায় না এবং এই মানসিকতার কারণেই পার্বত্য চুক্তি, গঙ্গার পানি চুক্তি এবং ট্রানজিটের প্রশ্নে মানুষের সম্মতি নেয়া হয়নি। আর এ সম্মতি না নিয়ে মানুষের ওপর নিজের চিন্তা-ভাবনা চাপিয়ে দেয়ার মানসিকতাই হচ্ছে আমাদের বিদ্যমান রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য এবং এ থেকে মুক্ত হতে না পারলে জাতি তার কাংক্ষিত গন্তব্যে পৌছুতে পারবে না।

www.pathagar.com

১ এপ্রিল ২০০০

দলীয়করণের আবর্তে ক্লিনটনের সফর

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এই প্রথমবারের মত একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে সফরে এসেছেন। তিনি বিল ক্লিনটন। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের এই সফর ছিল তাঁর দক্ষিণ এশিয়া সফরেরই একটি অংশ। আমরা গত এক সংখ্যায় উল্লেখ করেছিলাম যে, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তাঁর দক্ষিণ এশিয়া সফরের জন্য বাংলাদেশকে প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে বেছে নিলেও তিনি প্রথম অবতরণ করবেন দিল্লীতে এবং তিনি সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন ২০ মার্চ বাংলাদেশে আসেন। এ প্রসংগে দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে মার্কিন নীতির ইতিবৃত্তটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় সব সময়ই ভারতকে এক অর্থে তুষ্ট করার নীতি অনুসরণ করে এসেছে।

ভারত ১৯৪৭ সালে যখন স্বাধীন হয়, তখন পররাষ্ট্র বিষয়ে খুব স্পষ্ট কোন নীতি গ্রহণ না করলেও পরবর্তীকালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে ভারত সভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করে। যেহেতু জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রতি সেসময় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন সমর্থন জানিয়েছিল, সে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জোট নিরপেক্ষতাকে সন্দেহের চোখে দেখে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সময় আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব ফস্টার ডালেসের বক্তব্য ছিল Those who are not with us, are against us এবং এই নীতির প্রেক্ষাপটেই ভারতকে সভিয়েত, চীন তথা কমিউনিস্ট ব্লক ঘেঁষা বলে বিবেচনা করা হত। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে জওহরলাল নেহেরুসহ ইন্দোনেশিয়ার আহমদ সুকর্ণ, মিসরের জামাল নাসের এবং যুগোস্লাভিয়ার টিটো– এরা প্রত্যেকেই নানা ধরনের জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এক ধরনের সন্দেহ পোষণ করতেন। অন্য দিকে তাঁরা সভিয়েত ইউনিয়নের অভিলিপ্সা সম্পর্কেও যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। বিশেষ করে যুগোস্লাভিয়ার টিটো। ১৯৬২ পর্যন্ত ভারত ও চীনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল। এই সময়টাকে বলা হত হিন্দি-চীনি ভাই ভাইয়ের যুগে। তারপর ভারতের উত্তর সীমান্ত ম্যাকমোহন লাইনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধ নিয়ে চীন ও ভারত সীমান্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ ভারতের জোট নিরপেক্ষতার আসল রূপটিকে উন্মোচিত করে। আমরা লক্ষ্য করলাম, চীনের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার পর পরই ভারত যুগপৎ সভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য পেতে শুরু করে। সভিয়েত ইউনিয়ন তখন চীনের সাথে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদর্শগত লাইনের ইসুতে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। চীনা নেতৃত্বকে কোণঠাসা করার জন্যই সভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে সামরিকভাবে মদদ যুগিয়ে যায়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে এই বিরোধের ঘটনাকে ভারতের রাজনীতি বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতিতে মার্কিন প্রভাব বিস্তার করার একটি সুযোগ হিসেবে বেছে নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সামরিকভাবে মদদ যোগাতে শুরু করে। এভাবে ভারত বিশ্বের দুটি পরাশক্তির কাছ থেকে সামরিক সমর্থন লাভ করার মধ্যদিয়ে উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই ভারতকে তার পক্ষে টেনে নেয়ার চেষ্টা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণ তাদের 'স্টেট অব দি ইউনিয়ন' ভাষণে বিভিন্ন সময়ে ভারতকে 'ন্যাচারাল লিডার অব সাউথ এশিয়া' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ভারতের আরও একটি বৈশিষ্ট্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্রশংস

www.pathagar.com

দৃষ্টি কুড়ায়। সেটি হচ্ছে ভারতের টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আমেরিকানরা ফলাও করে ভারতকে তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে আসছে। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে ভারতের একটি আদর্শগত বন্ধনও সৃষ্টি হয়।

আমরা লক্ষ্য করেছি, পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও পাকিস্তান তার সংকট মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সাহায্য-সহযোগিতা পায়নি। বস্তুত বলা চলে, ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত থাকে। যে কারণে পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর *Myth of Independence* গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন, কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ভারত-পছন্দ নীতি গড়ে উঠেছে এবং সেই সম্পর্কের বিচারে যুক্তরাষ্ট্র কী করে পাকিস্তানকে শেষ বিচারে সমর্থন করতে অনীহা প্রদর্শন করে। এর পক্ষেও তিনি জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছেন। কাজেই এবার যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তাঁর দক্ষিণ এশিয়া সফরে আসার সময় প্রথম দিল্লীতে অবতরণ করেন এবং রাত কাটান, তখন তাঁর এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার অপরাপর রাষ্ট্রগুলোর কাছে একটা ম্যাসেজ বা সিগন্যাল পাঠাতে চেয়েছেন। সেটি হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যান্য রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও ভারতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সম্পর্কের দিকটি গুরুত্ব সহকারে বুঝিয়ে দেয়া এবং সেই অনুসারে অন্য রাষ্ট্রগুলোকে বিশেষ করে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা প্রভৃতি রাষ্ট্রকে ভারতের সম্পূরক নীতি অনুসরণে মনোযোগী হওয়া।

আজকের যুগকে বিশ্বায়নের যুগ বলা হয় এবং এটিকে স্নায়ু যুদ্ধোত্তরকালে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই অর্ডারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হল, সমগ্র বিশ্বের রাজনীতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সারা বিশ্বের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। এর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্র নীতিতে কিংবা অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে যে ধরনের কাঠামোগত, গুণগত এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আনা দরকার, সেটি তারা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দৃশ্যত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারতের এককালের খুব ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথা, এমনকি মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে যে ভারত-সভিয়েত মৈত্রী চুক্তি হয়েছিল, এসব তারা ভুলে যেতে চায়। সভিয়েত ইউনিয়ন আর নেই। আজকে যে রুশ ফেডারেশন জন্মলাভ করেছে সভিয়েত ইউনিয়নের ভস্মের মধ্য দিয়ে, সেটিও আর আগের মত শক্তিমান রাষ্ট্র নেই। বলা যেতে পারে, রুশ ফেডারেশন এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল একটি রাষ্ট্র, যদিও তার আণবিক শক্তি রয়েছে। অন্যদিকে আমরা এ কথা বলতে পারি, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় চীন বলল যে, ভারতের জোট নিরপেক্ষতার মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে এবং ভারত প্রমাণ করেছে যে, সে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়। ভারত জোট নিরপেক্ষ তো নয়ই, বরং দুটি জোটের সঙ্গে তার গাঁটছড়া বাঁধা আছে। একদিকে সভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এখানে এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বিশারদরা একটি কাজ অত্যন্ত চমৎকারভাবে করতে পেরেছেন। সেটি কাজটি হচ্ছে, তারা তাদের অনুসৃত নীতির মাধ্যমে স্নায়ু যুদ্ধকালে দু'টি পরাশক্তির কাছ থেকেই সুবিধা আদায় করেছে। পৃথিবীর খুব কম রাষ্ট্রের পক্ষেই এটি সম্ভব হয়েছে। ভারতের পক্ষেই এটি সম্ভব ছিল। কারণে, রাষ্ট্র হিসেবে ভারত একটি বিশাল দেশ এবং ভারতের অর্থনীতি বিশাল। এছাড়া ভারতের রণনীতিগত অবস্থানও ভারতকে এসব শক্তির কাছে একটি অপরিহার্য রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনার সুযোগ করে দেয়।

যে কথাটি বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে এই যে, দিল্লীতে রাত যাপনকালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কেবলই কি বিশ্রাম নিয়েছেন? সম্ভবত নয়। শেষ মুহূর্তের জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশে তিনি কি আলাপ করবেন, সেই বিষয়টিও তিনি হয়তো কিছুটা বোঝাপড়া

www.pathagar.com

করে নিয়েছেন। এদিকে বাংলাদেশের শাসক মহল বিল ক্লিনটনের সফরকে কেন্দ্র করে এক বিরাট ধরনের প্রচারণার জাল বিস্তার করে এবং এই ঘটনাটি তারা তাদের একটি বিরাট সাফল্য, বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি বিরাট সাফল্য হিসেবে প্রচার করা শুরু করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন বাংলাদেশের সঙ্গে 'সোফা' চুক্তি সম্পাদন করতে চেয়েছিল, তখন বাংলাদেশের শাসক মহলেও এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে এক ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ এই 'সোফা' চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানের নেপথ্য ঘটনা হচ্ছে, দিল্লী তখন সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশকে জানিয়ে দিয়েছিল, এ ধরনের একটি চুক্তি করার জন্য ১৯৭১-এ ভারত বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি। অর্থাৎ দিল্লী পরিস্কারভাবে ঢাকাকে বলছে– 'আমরা যা করতে পারি, তোমরা তা করতে পারো না') মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক কেবল আমরাই করব। তোমাদের যদি করতে হয় তাহলে সেটি আমাদের মাধ্যমেই করতে হবে এবং আমাদের নির্ধারিত Parameters-এর মধ্যে থেকেই তোমাদের সেটি করতে হবে। এ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের একটি টানাপড়েন সৃষ্টি হলেও পরবর্তীকালেও বাংলাদেশ সরকার 'হানা' চুক্তি সম্পাদন করে এবং মার্কিন পীসকোরকে এ দেশে আসার সুযোগ করে দিয়ে 'সোফা' চুক্তিকে কেন্দ্র করে যে ক্ষতটুকু সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা করেছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশে বিল ক্লিনটনের সফরটি ছিল অত্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য। বলা হয়েছিল তিনি সকাল ১০ টায় (২০ মার্চ) ঢাকায় এসে পৌছবেন। ক্লিনটনের এই সফরকে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উৎসুক টিভি দর্শকরা লক্ষ্য করলেন, তাঁর এই সফর তথা ঢাকায় এসে পৌছানো এক ঘন্টা ২০ মিনিট বিলম্বিত। তার সফরসূচীর অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচীতেও ব্যাপক কাটছাঁট ঘটে। এই কাটছাঁটের বিষয়টি ক্রমান্বয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এমনকি সরকারী মহলও বিষয়টি আস্তে আস্তে স্বীকার করে নিচ্ছে। যেমন সাভারে স্মৃতিসৌধে যাওয়া কিংবা জয়পুরা গ্রামে গিয়ে ব্র্যাক এবং গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার কর্মসূচী ৫ দিন আগেই বাতিল করা হয় বলে অথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা। কিন্তু পরবর্তীতে সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র সচিব এক ধরনের কথা বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী আরেক ধরনের কথা বলেছেন। একজন বলেছেন, তারা আগের দিন রাতের বেলা জানতে পেরেছেন। আরেকজন বলেছেন, তারা আগের দিন দুপুর বেলা জানতে পেরেছেন। এ থেকেও বিষয়টি রহস্যময় হয়ে উঠেছে। অথচ সরকার শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড ধরনের নীরবতা পালন করে গেছে। যখন ক্লিনটনের সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বা জয়পুরা গ্রামে যাওয়া হল না, তখনই কেবল জনগণকে জানানো হল ক্লিনটন তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন বলেই তাঁকে সফরসূচী থেকে এই প্রোগ্রামটি কাটছাঁট করতে হয়েছে। ক্লিন্টনের এই সফরটিকে আমরা একান্তভাবে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা না করেও বলতে পারি যে, বাংলাদেশ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার দীর্ঘদিনের প্রচারণা এবং disinformation-এর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় বাংলাদেশে ক্লিনটনের সফরটি যত সার্থক হতে পারত, তা হওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা জানি যে, দীর্ঘকাল থেকেই, বিশেষ করে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রচার করা হচ্ছিল যে, বাংলাদেশে চরমপন্থী মৌলবাদী গ্রুপ তৎপর রয়েছে। তাদের সাথে আফগান তালেবানদের সম্পর্ক রয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে ভারত এমন একটি আবহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় যে, বাংলাদেশ সত্যিই একটি নিরাপদ রাষ্ট্র নয়। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী রাজশাহীর একটি মসজিদ থেকে আরডিএস বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করেছে বলে জানানো হয়। এছাড়া যশোরে উদীচীর সম্মেলনে সংঘটিত মর্মান্তিক বোমা বিস্ফোরণসহ বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে, এখানে সত্যি সত্যি মৌলবাদী গ্রুপগুলো অত্যন্ত তৎপর রয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার আজ পর্যন্ত স্পস্ট করে বলেনি এই সমস্ত

www.pathagar.com

ভয়াবহ ঘটনার নেপথ্যে কোন শক্তি কাজ করছে। আর এবার আমরা লক্ষ্য করলাম, ক্লিনটনের সফর উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয় বেশ ক'টি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এগুলোর মধ্যে Polictics of Bangladesh : Democracy versus Religious Fundamentalism এ যে ধরনের বক্তব্য হাজির করা হয়েছে তাতে যে কোন বিদেশী পাঠক তিনি সাংবাদিকই হোন, কিংবা পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত কোন বিশেষজ্ঞ কিংবা কোন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যই হোন, তাঁরা আঁতকে উঠবেন এই ভেবে যে, বাংলাদেশ সত্যিই একটি নিরাপদ স্থান নয়। এর ফলে সরকার আগেভাগেই নিজের প্রচারণার জালে নিজেই আটকে পড়ে। সরকারের এই প্রচারণার জাল সৃষ্টি করার পেছনে ভারতীয় কর্তৃপক্ষেরও হাত রয়েছে বলে মনে হয়। সুতরাং আমরা লক্ষ্য করছি, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এ দেশের একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় যে ধরনের প্রচারণা ভারতীয় পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সুর মিলিয়ে করা হচ্ছিল, সেটাই শেষ পর্যন্ত ক্লিনটনের সফরকে অমসৃণ সফরে পরিণত করেছে। এ কারণেই বাংলাদেশ সরকার ক্লিনটনের সফর থেকে যতটুকু সুবিধা বা যতটুকু ক্রেডিট হাসিল করতে পারত, সেটি তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। আমরা আরও লক্ষ্য করলাম, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর ক্লিনটন তাঁর জন্য নির্ধারিত পতাকাশোভিত লিমোজিনে না চড়ে একটি জীপে চড়লেন, যে জীপটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাও ছিল না। শুধু তা-ই নয়, তিনি এখানকার হোটেলে অবস্থানকালে খাবার দাবার যেভাবে বর্জন করলেন, তাতেও এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি তাঁর তেমন আস্থা নেই। আরেকটি পরিতাপের বিষয় হল, বাংলাদেশের বিরোধীদলীয় নেত্রীর সঙ্গে ক্লিনটনের ১৫ মিনিটের একটি সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হয়েছিল। বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর সাক্ষাৎকার সঙ্গীরা নির্ধারিত দিনে সংশ্লিষ্ট সড়ক দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলার জন্য সরকারের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু সরকার এই সাক্ষাৎকারকে বানচাল করার জন্য 'পাস' দেয়া থেকে বিরত থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সেখানে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ইস্যু করা পাস দিয়েই শেষ পর্যন্ত সেই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানটি ১৫ মিনিটের পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত ৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এটিও শাসক দলের জন্য গাত্রদাহের কারণ হয়ে ওঠে। এছাড়া আমাদের প্রধানমন্ত্রী গোটা সফরকে ঘিরে যে উদ্ভট আচরণ করেছেন, সেটি আর যা-ই হোক একজন প্রধানমন্ত্রীর জন্য শোভন ছিল না। বিশেষ করে যখন ক্লিনটন জয়পুরা গ্রামে যাওয়া বাতিল করলেন, তখন জয়পুরা গ্রাম থেকে কতিপয় মহিলা ও এনজিও সুবিধাভোগী মার্কিন দূতাবাসে এসে ক্লিনটনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সেই অনুষ্ঠানেও দেখা গেল যে, প্রধানমন্ত্রী সশরীরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত। অথচ এ ধরনের কোনো কর্মসূচীর কথা আগে ভাগে ঘোষণা করা হয়নি। ক্লিনটনে তো ভারত সফর করেছেন এবং দিল্লীর বাইরে ভারতের একাধিক শহরেও গেছেন। কিন্তু কোথাও তো ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গী হননি। কারণ, এটি শোভন হত না। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর দেশের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যই অতটা বাড়াবাড়ি করতে চাননি। কাজেই আমাদের রাষ্ট্রের পরিচালকরা তাঁদের রাষ্ট্রের মর্যাদা সম্পর্কে কতটা সচেতন. সে ব্যাপারে খুব সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলতে পারি। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি. খুব ব্যাপকভাবে প্রচার করা হলেও যে ধরনের চুক্তিগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হয়েছে, সেগুলো অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ের অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিএল ৪৮০এর অধীনে খাদ্যসাহায্য বাবদ প্রাপ্ত ঋণের সুদ মওকুফের বিষয়টিও শর্তসাপেক্ষ করা হয়েছে। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন সংরক্ষণ আইনের অধীনে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সেই ঋণের সুদকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করতে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ এক অর্থে সেই ঋণ মওকুফ হয়নি।

www.pathagar.com

আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একটি বৈশিষ্ট্যকে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছে। বিল ক্লিনটন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে দেয়া তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের ইসলামী ঐতিহ্য এবং এখানকার মানুষের সহনশীল মানসিকতার প্রশংসা করেছেন। অথচ এই বৈশিষ্ট্যটির কথা আমাদের নেতৃবৃন্দ ক্লিনটনের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করেননি। আমার মনে হয়, এই একটি মাত্র ক্ষেত্র, যেখানে ক্লিনটন সফরের ইতিবাচক দিক আমরা দেখতে পাই। কারণ বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে আমাদের মত অনুরূপ ধর্মীয় সহনশীলতা নেই, সেটি একটি প্রমাণিত সত্য। ভারতে বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে একটি হিন্দু মৌলবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠী। সুতরাং বাংলাদেশকে তার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে অবশ্যই তার ধর্ম ও ঐতিহ্যগত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হবে। এই একটি ব্যাপারে আমি বলব যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও স্বতন্ত্র অবস্থানের প্রতি বিশেষভাবে সমর্থন জানিয়েছে এবং আগামীতে যারা এই দেশের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কাজ করবেন, তাদের অবশ্যই এই দিকটিকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভারতে যত ধরনের সশস্ত্র তৎপরতা হয়, বাংলাদেশে সেরকম কিছু নেই বললেই চলে। ভারতের কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জঙ্গি তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এক সময় ভারতে শিখ জঙ্গিরা তৎপর ছিল। অথচ সেই দেশে বিল ক্লিনটন অনেক স্বচ্ছন্দে, অনেক স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে না যাওয়ার ব্যাপারটি যদি আওয়ামী লীগ শাসনামলে না হয়ে অন্য যে কোন দলের সরকারের শাসনামলে ঘটত, তাহলে এই আওয়ামী লগী এবং তার অনুসারী সংবাদপত্রে বুদ্ধিজীবীরা এই মর্মে প্রচার করতেন যে, স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার গৌরব কালিমালিপ্ত হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ঘটনাটি খোদ আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ঘটল এবং খোদ আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে বিল ক্লিনটন স্মৃতিসৌধে না যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর মনোবেদনার কথা প্রকাশ করায় প্রধানমন্ত্রী নিজেই সে বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে আমরা বলব যে, পুরো সফরটিকে সরকার handle করেছে ভারতের একটি ক্লায়েন্ট স্টেটের মত। বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা, জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদার বিষয়টিকে তারা জলাঞ্জলি দিয়েছে এবং ভারতের তৈরী ষড়যন্ত্রের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার ফলেই এমনটি হতে পেরেছে। ভারত কখনই চায় না যে, বাংলাদেশ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথিবীর কোন বড় শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুক।

আফতাব আহমাদ :

বাংলাদেশে বিল ক্লিনটনের সফরকে কেন্দ্র করেই আমরা আমাদের আজকের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছি। বাংলাদেশে রাতযাপন না করে বিল ক্লিনটন দিল্লীতে যে রাতযাপন করলেন, তার দ্বারা বর্তমানে মার্কিন নীতিটা ভারতমুখী নীতি– এমন সহজ-সরলভাবে, এমন উপসংহার টানাটা বোধহয় সঠিক বা যথার্থ হবে না। আমরা জানি, দীর্ঘকাল ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশীয় নীতি ছিল মূলত ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দৃষ্টির একটি সম্প্রসারিত রূপ এবং ট্রেডিশনালি এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, রিপাবলিকান পার্টি যখন হোয়াইট হাউসে অধিষ্ঠিত তখন তারা দক্ষিণ এশিয়ায় এক ধরনের ভারসাম্যমূলক নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করত। ডেমোক্রেটিক পার্টি ট্রেডিশনালি অনেকটা ভারতমুখী বা ভারতপন্থী। আমার মনে হয়, বিল ক্লিনটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের মধ্যে প্রথম ব্যতিক্রমী প্রেসিডেন্ট যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারত নীতির সম্প্রসারিত নীতিকে দক্ষিণ এশীয় নীতি বলে গণ্য করেন না। সে কারণেই ভারতের চরম বিরোধিতার মুখে একদিক যেমন তিনি বাংলাদেশ সফর করেছেন, অপরদিকে তিনি পাকিস্তান সফরেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই দুটি দেশেই তার সফরের সময় অত্যন্ত সীমিত এটি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের ব্যাপারটি হচ্ছে সেখানে নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে সামরিক বাহিনীর প্রধান প্রশাসন চালাচ্ছেন। পাকিস্তানের পরিস্থিতি গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন চরিত্র গ্রহণ করেছে। আর বাংলাদেশের প্রশ্নে যেটি আপনি গোড়াতেই বললেন যে, বাংলাদেশ সরকার নিজেকে ভারতের একটি ক্লায়েন্ট স্টেট হিসেবে প্রতিপন্ন করার কারণেই বাংলাদেশের প্রতি বর্হিবিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশে বিল ক্লিনটনের আগমনের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক যেটি আমি মনে করি- সেটি হচ্ছে এই যে, এটি একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি যে, বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা বিশ্ব দরবারে আজ গৃহীত হয়েছে।

২৫ মার্চ ভারতীয় অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত ঢাকার একটি দৈনিকে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিল ক্লিনটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করার আগে সিক্রেট সার্ভিসের পক্ষ থেকে তাঁকে অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং বিল ক্লিনটন নিরাপত্তার খাতিরে কোন অবস্থায়ই যেন বাংলাদেশ সফর না করেন। তিনি যেন এই সফর বাতিল করে দেন। এই তথ্য আদৌ সত্য কিনা, বলা মুশকিল। তবে ২৫ মার্চ এই দৈনিকের প্রতিবেদকের কলম দিয়ে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তাতে আরও বলা হয়েছে যে, দিল্লীতে অবতরণ করার পরও সিক্রেট সার্ভিস ক্লিনটনকে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ সফর বাতিল করার জন্য। কিন্তু ক্লিনটন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তিনি বাংলাদেশে আসবেনই। এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, এসব তথ্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীকেও নাকি অবহিত করা হয়েছিল, এবং ক্লিনটনের সাথে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কর্তাবৃন্দের রাগারাগি, কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ক্লিনটন তার নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেই বাংলাদেশে আসেন। বলা হয় যে, নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর টানাপড়েন ও বচসার কারণেই ক্লিনটনের ঢাকা আগমনে বিলম্ব ঘটে এবং লক্ষ্য করার বিষয়, ক্লিনটন তাঁর জন্য নির্ধারিত এয়ারফোর্সের বিমানটিতে না এসে অনেক ছোটখাট একটি জেট বিমানে করে ঢাকায় অবতরণ করেন এবং তাঁকে প্রথম রিসিভ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মি. হোলজম্যান। আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী পরে হুড়মুড় করে গিয়ে ক্লিনটনকে বরণ করে নেন। আসলে ক্লিনটনের সফরের যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে এখন পত্রপত্রিকায় শোরগোল হচ্ছে, এর জন্য আমার ব্যক্তিগত ধারণা, না ছিল ক্লিনটনের কোন দোষ, না ছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কোন দোষ। সম্পূর্ণত বাংলাদেশ সরকারের সৃষ্ট একটি পরিস্থিতির শিকার ক্লিনটনের এই সফর। আমরা সবাই জানি যে, '৯৬-এ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে সমস্বরে একটি কথা দেশব্যাপী প্রচার করা হয়েছে, সেটি হল বাংলাদেশে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং মৌলবাদী শক্তিগুলো সন্ত্রাসী, নাশকতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত। এমনকি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হত্যা করার নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত। এর আগে আমরা একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের কথিত কাহিনী পত্রপত্রিকায় দেখেছি এবং শুনেছি। সবশেষে এসে যে উপাদানটি যোগ হল, সেটি হল আফগানিস্তানের তালেবানদের সমর্থকরা এখানে এসে জঙ্গী প্রশিক্ষণ নিয়ে সরাসরি ওসামা বিন লাদেনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করছে এবং শামসুর রাহমানের পুত্রবধুর পড়শীদের ঝগড়া-কলহকে কেন্দ্র করে তাঁর বাড়ীতে হামলাকে লাদেন বাহিনীর হামলা হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টাও আমরা এখানে লক্ষ্য করেছি। আজ বাংলাদেশে একজন বিদেশী মেহমান সফর করতে এসে সেই লাদেন বাহিনী সম্পর্কে যে উৎকট প্রচারণা এখানে সৃষ্টি করা হয়, তারই ফলশ্রুতিতে তিনি তার সফরের মূল কার্যসূচীকে কাটছাঁট করতে বাধ্য হন। একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস তাদের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে কোন ঝুঁকি নিতে পারেন না। আমেরিকান সংবিধানের অধীনে সিক্রেট সার্ভিসের যে আইন প্রণীত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, যে কোন কিছুর বিনিময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তাদের রক্ষা করতে হবে। রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে মৌলবাদী তৎপরতার নামে যেসব অপপ্রচার ইতোমধ্যে করা হয়েছে,

www.pathagar.com

তার ভিত্তি এবং উদ্দেশ্যটি কী সেটি ব্যক্তিগতভাবে ক্লিনটন বুঝলেও তাঁর সিক্রেট সার্ভিসের কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই বুঝাতে চাইবেন না এবং বুঝতে চাননি।

বস্তুত সরকার ক্লিনটনের সফরকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের লুকোচুরি এবং কানামাছি খেলার চেষ্টা করেছে। যেমন– সরকার একটি কর্মসূচী নির্ধারণ করেছিল যে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে উদ্বাস্তু এবং ছিন্নমূলদের পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, যার নাম 'আশ্রয়ন' প্রকল্প সেই প্রকল্প ক্লিনটন পরিদর্শন করবেন। এই প্রকল্পটি কাগজে-কলমে অস্তিত্বমান। বাস্তবে এর কোন রূপ নেই। ক্লিনটনের সফর যখন চূড়ান্ত হয়, তখন প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন এই 'আশ্রয়ন' প্রকল্পে হাত দেয়ার জন্য এবং দ্রুত নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য। বাংলাদেশে মানবাধিকার, আইন-শৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাসীনদের আচরণ সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এবং হোয়াইট হাউসের কোন কিছুই অজানা নয়। তারা খুব ভাল করেই জানেন যে, 'আশ্রয়ন' প্রকল্প নামে কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 'আশ্রয়ন' পরিদর্শনের কর্মসূচীটি বাতিল করে দেয়া হয়। সরকার এখন নিজে অনেকটা অপদস্ত বোধ করে জয়পুরার এনজিওদের (ব্র্যাক এবং গ্রামীণ ব্যাংকের) যে দু'টি প্রকল্প তার দেখার কথা সে সম্পর্কে বাধ সাধল। সরকারী মহল থেকে বলা হল যে, জয়পুরায় যাওয়াটা নিরাপত্তাজনিত কারণে ঠিক হবে না এবং আশপাশে যে সমস্ত ঝোঁপঝাড় আছে, সেখান থেকে 'মৌলবাদী'রা আক্রমণ করতে পারে। এর ফলে যেটি হল– সিক্রেট সার্ভিস শুধু জয়পুরার অনুষ্ঠানই বাতিল করল না, তারা সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়ার কর্মসূচীটিও বাতিল করে দেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ব্র্যাক এবং গ্রামীণ ব্যাংকের জয়পুরার প্রকল্পগুলোতে যারা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সাথে ক্লিনটনের সাক্ষাৎকারের একটি ব্যবস্থা দ্রুতভাবে আয়োজন করে মার্কিন দূতাবাস। অথচ একটি আত্মমর্যাদাশীল সরকার যদি আমাদের থাকত, তাহলে তাদের কর্তব্য ছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কিংবা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে এসে ক্লিনটনের সাথে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা। দেখা গেছে, দুটো প্রকল্পের অংশীদার, নির্মাতা এবং এই প্রকল্পের দুই প্রধান পুরুষ ফজলে হোসেন আবেদ এবং প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস– এঁরা সবাই ছুটে গেলেন মার্কিন দূতাবাসে। অর্থাৎ বাংলাদেশে ক্লিনটনের সফরটি শেষ পর্যন্ত সরকারের আমন্ত্রণে একটি রাষ্ট্রীয় সফরের পরিবর্তে এনজিওদের উদ্যোগে আয়োজিত এনজিও পরিবেষ্টিত একটি সফরে পর্যবসিত হল।

১৯৯৬-এর ডিসেম্বর মাসে শেখ হাসিনা নেলসন ম্যান্ডেলা, ইয়াসির আরাফাত এবং সুলেমান ডেমিরেলকে আমাদের বিজয় দিবসের অনষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে নানা কায়দা-কানুন করে সুলেমান ডেমিরেলের মুখ দিয়ে শেখ হাসিনা তার পিতাকে 'জাতির পিতা' হিসেবে ঘোষণা করিয়েছিলেন এবং সুলেমান ডেমিরেলকে একটি জনসভায়ও শেখ হাসিনা হাজির করিয়েছিলেন এবং তার পিতা সম্পর্কে অনেক প্রশংসাসূচক বক্তব্য তার মুখ দিয়ে আদায় করিয়ে নিয়েছিলেন। ঠিক একই কায়দায় তিনি এবারও চেয়েছিলেন বিল ক্লিনটন একটি জনসভায় ভাষন দেবেন– যেটি গোড়াতেই মার্কিন পক্ষ প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তী পর্যায়ে তাকে একটি নাগরিক সংবর্ধনা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, এটিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়ারও একটি আয়োজন করা হয়– এটিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান করে। সবশেষে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন, যেটিকে এখন একটি জাদুঘরের রূপান্তর করা হয়েছে এবং যেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বিরাট প্রতিকৃতি তৈরী করে রাখা হয়েছে– নিয়মিতভাবে আওয়ামী লীগ এবং তার স্তাবকরা সেখানে গিয়ে এক ধরনের পৌত্তলিকতা সম্পাদন করে থাকেন– প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সরকার মার্কিন পক্ষকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর যখন বাংলাদেশ সফরে এসেছেন– তিনিও মুজিবের

www.pathagar.com

বাসভবনে গিয়ে এই প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এই রাজনৈতিক ছেলেখেলার মধ্যে কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট হতে চাননি। তাঁরা সরাসরি এটিকে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী, রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী নয় হিসেবে বিবেচনা করে বাতিল করে দেন। অর্থাৎ এক কথায় ক্লিনটনকে রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ করে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিষয়-আশায় নিয়ে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করার পরিবর্তে ক্ষমতাসীন দল অনেক বেশী আগ্রহী ছিল ক্লিনটনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার জন্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গোয়েন্দা বিভাগ এবং খোদ প্রেসিডেন্ট শেখ হাসিনার হাতের বড়ে হিসেবে ব্যবহৃত হতে চাননি। এ কারণেই বাংলাদেশ যে সমস্ত বিষয়-আশায় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা করতে পারত সেগুলো অনুষ্ঠিত হয়নি। বরঞ্চ দেখা গেছে, একটি জঘন্য বাজে কাজে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিল ক্লিনটনের আগমনের আগে সম্পাদন করেছেন। সেটি হচ্ছে, নির্বাহী আদেশ দিয়ে 'কমপ্রিহেনসিভ টেস্ট ব্যান ট্রিটি' তিনি অনুমোদন করেছেন। এ ধরনের চুক্তি নির্বাহী আদেশ দ্বারা অনুমোদন করা যায় না তা বলাই বাহুল্য। পরমাণবিক শক্তি কিংবা নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম একেকটি দেশ একেকটি প্রয়োজনে একেক সময়ে ব্যবহার বা গ্রহণ করে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এবং ডিফেন্স প্রায়োরিটির দৃষ্টিকোণ থেকে একটি দেশ কী কী ধরনের অপশন্স রাখে, তা নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষাজনিত বিষয়ে তারা যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, তার ওপরে। এ বিষয়ে বিশদ বিতর্কের প্রয়োজন হয়। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতামত প্রয়োজন হয়, জাতীয় সংসদের মতামত প্রয়োজন হয়। এসব কিছুকে তুচ্ছজ্ঞান করে কলমের এক খোঁচায় একটি নির্বাহী আদেশ দ্বারা শেখ হাসিনা সিটিবিটিকে র‍্যাটিফাই করেন এবং দ্বারা তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তুষ্ট করতে চেয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, এতকিছু করার পরও বিল ক্লিনটনের মুখ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে 'জাতির পিতা' বা 'বঙ্গবন্ধু' বিশেষণটি আদায় করা যায়নি। ইতিহাসে শেখ মুজিবুর রহমানের যে অবদান, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে যতটুকু অবদান– তাঁকে যতটুকু স্বীকৃতি দেয়ার, ঠিক ততটুকু স্বীকৃতি দিয়েই ক্লিনটন তাঁকে সম্বোধন করেছেন 'প্রধানমন্ত্রীর পিতা' বলে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সরকারী দল এবং সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিল ক্লিনটনের সফরটিকে ব্যবহার করতে চেয়েছে, জাতীয় স্বার্থে নয়। এখানে আরও একটি বিষয় বলা দরকার, সেটি হচ্ছে, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রসঙ্গে। তিনি যেভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরের বিষয়টি handle করেছেন, তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক এবং এক কথায় বলা যায়, বেশ অযোগ্যতার সাথে তিনি এই সফরকে handle করেছেন। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি ব্যাপক রদবদল করা জরুরী হয়ে পড়েছে। কারণ আমাদের এই পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমরা লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে বারবার তিনি ভারতীয় স্বার্থকে সংরক্ষণের ব্যাপারে অধিকতর তৎপর। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সোফা স্বাক্ষরের জন্য শেখ হাসিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ওয়াদা করা সত্ত্বেও এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে উদ্যোগে গ্রহণ করার পরও কেবলমাত্র আবদুস সামাদ আজাদের একগুঁয়েমির কারণে 'সোফা' স্বাক্ষর করে যায়নি। পরবর্তী পর্যায়ে যখন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী HANA স্বাক্ষরের উদ্যোগে গ্রহণ করেন, তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীর ওপর এত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং এত চটে যান যে, তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিং করতে গিয়ে বলেছেন যে, ভবিষ্যতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কে কোন কিছু জানতে হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা পররাষ্ট্র সচিবের ব্রিফিং ছাড়া সাংবাদিকরা যেন আর কারও বক্তব্য গ্রহণ না করেন। আবদুস সামাদ আজাদের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। কিন্তু বয়সের তুলনায় আচরণে পরিমিতিবোধ, শিষ্টাচার এবং কৌশল লক্ষ্য করা যায় না। অত্যন্ত নগ্নভাবে ভারতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণে তার ভূমিকা অনেক সময়ে শেখ হাসিনাকেও বিব্রত করে তোলে।

যেমন, ক্লিনটন ভারত চলে যাওয়ার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করে বসলেন যে, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে ক্লিনটন যে যেতে পারেননি, তার প্রধান কারণ ক্লিনটনের অনিচ্ছা নয়,

www.pathagar.com

নিরাপত্তাজনিত বিপদ এবং এই বিপদ দেশের ভেতর থেকে আসেনি, এসেছে খোদ দেশের বাইরে থেকে। গত কয়েকদিনের পত্র-পত্রিকায় দেখা গেছে, প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ ধরনের লাগামহীন মন্তব্যে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ এবং তিনি তাঁর ক্ষোভের কথা একটু লুকিয়েও রাখেননি বরং স্পষ্টভাবে তিনি যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তার একটি হচ্ছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিকদের সাথে যে ব্রিফিং তা তাঁর নির্দেশে বাতিল করে দেয়া। কাজেই আজ স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটি সকলের কাছে নিবেদন করা প্রয়োজন, এ ধরনের একজন অথর্ব, অযোগ্য এবং বেফাস মন্তব্যকারী লোককে তোপখানার দায়িত্বে আর রাখা শ্রেয় কী না। আমার তো মনে হয় তাঁকে পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এবং ইতিবাচক দিকটি হল– বর্তমান সরকার উঠেপড়ে লেগেছিল মার্কিন তেল কম্পানীগুলোর সাথে প্রোডাকশন শেয়ারিং কনট্রাক্ট দ্রুত সই করার জন্য। এই কন্ট্রাক্ট সই করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের গোপন লেনদেনও হয়ে থাকে বলে নানা দেশে নানা কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের এখানেও প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টগুলো কীভাবে ইতোপূর্বে সম্পাদিত হয়েছে, তা স্বচ্ছ নয়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, তড়িঘড়ি করে কোন চুক্তি এখনও সম্পাদিত হয়নি। সেদিক থেকে বলব যে, ক্লিনটন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যেমন বলেছেন যে, এটিই কোন মার্কিন প্রেসিডেন্টের শেষ সফর নয়। ভবিষ্যতে আরও অনেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়ত বাংলাদেশে আসবেন। আজকে বাংলাদেশের জিও-স্ট্রাটেজিক ও জিও-ইকোনমিকসের গুরুত্বের প্রতি যদি আমরা নিজেরা যত্নবান হই তাহলে আমার মনে হয়, কূটনীতিতে আমরা অনেক সাফল্য অর্জন করতে পারব। যে কারণে, ক্লিনটন দিল্লীতে রাত যাপন করে বাংলাদেশে এসেছেন, এটি যত না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতমুখী নীতির কারণে ঘটেছে তার চেয়ে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতাই এখানে বেশী। বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা হচ্ছে, তারা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে গিয়ে দেশব্যাপী সন্ত্রাস-সহিংসতার যে অপপ্রচারে জড়িয়ে পড়েছিল, তার ফাঁদেই বিল ক্লিনটনের সফরসূচী অনেকটা কুপোকাত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু তারপরও ক্লিনটন বাংলাদেশ সফর করে দক্ষিণ এশিয়ার অপরাপর রাষ্ট্রকে একটি বার্তা পৌছে দিতে চেয়েছেন। সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশ নামেও একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র আছে এবং তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়াই শ্রেয়। বিল ক্লিনটনের সফরের আগে কার্ল ইন্ডারফার্থ এবং স্বয়ং বিল ক্লিনটন বাংলাদেশের মানুষের ধর্মনিষ্ঠা এবং ধর্মভিত্তিক ঐতিহ্য সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন, তাতে একটি বার্তা সুস্পষ্ট যে, ধর্মনিষ্ঠা , ধর্মানুরাগ আর ধর্মান্ধতা এক কথা নয় এবং সরকার পক্ষ 'পুস্তক-পুস্তিকা' বের করে যেখানে বলার চেষ্টা করেছে যে, বিরোধী দল এখানে মানবতাবিরোধী, 'মৌলবাদী' গোষ্ঠীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রের সর্বনাশ করতে চাইছে– এটিকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ যে আমলে নেয়নি, তার বড় প্রমাণ হল বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে নির্ধারিত ১৫ মিনিট আলোচনার পরিবর্তে একটি পূর্ণাঙ্গ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দীর্ঘ ৪৫ মিনিট ধরে। এ থেকে সুস্পষ্ট সিগন্যাল যেটি আমরা পাই সেটি হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধে মার্কিন কর্তৃপক্ষ জড়িত হতে চায় না এবং সরকার ও সরকারে যারা আছেন, তাদের উচিত হবে কোনো বহিঃশক্তিকে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যুক্ত না করে সব সময় জাতীয় স্বার্থে এবং জাতীয় প্রয়োজনে মৈত্রী কামনা করা।

মাহবুব উল্লাহ :

আমি সংক্ষেপে পাদটীকা হিসেবে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এর একটি হচ্ছে ক্লিনটনের এই সফরের মধ্য দিয়ে একটি ব্যাপার অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আওয়ামী লীগের দলীয়করণের নীতি শুধু দেশের অভ্যন্তরেই সীমিত নয়, সেটি এখন পররাষ্ট্রনীতির

www.pathagar.com

চৌহদ্দির মধ্যেও প্রবেশ করেছে। যে কারণে বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্পর্ক State to State ভিত্তিতে হওয়া উচিত, সেটি না করে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার চেষ্টা করেছে Party to State অর্থাৎ Awami League with United States of America এই পর্যায়ে সম্পর্ক রচনা করতে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তারা চেয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে ক্লিনটনকে নিয়ে যেতে এবং এ ধরনের আরও কিছু কর্মসূচীতে তাঁকে অংশগ্রহণ করাতে।

প্রতিটি রাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে জাতীয় মর্যাদার ভিত্তিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও আমাদের সম্পর্ক হবে এই নীতির ভিত্তিতেই। আমরা আমাদের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কামনা করি না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিল ক্লিনটনের সঙ্গে আলোচনার সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অনুরোধ করেছেন, বাংলাদেশের সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে কোন ধরনের সরকার পরিবর্তনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন উৎসাহিত কিংবা সমর্থন না করে। প্রধানমন্ত্রী কি বিল ক্লিনটনকে বোঝাতে চাইছেন যে, বাংলাদেশে এ ধরনের একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে? তাহলে প্রশ্ন, এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার জন্য দায়ী কে? তার অপশাসন-কুশাসন, নাকি তার ভুল রাষ্ট্রনীতি? আবার অন্যদিকে প্রশ্ন করা যায়, একজন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রধানকে কেন দেশের ভেতরের বিষয়, বিশেষ করে স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করা? মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ ক্লিনটনের নিরাপত্তার ব্যাপারে যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সেটি নিছক উদ্বেগ, নাকি দক্ষিণ এশিয়া সফর সম্পর্কে আমেরিকার স্ট্র্যাটেজি কী হবে সেটি নিয়ে মার্কিন সরকারের উচ্চ মহলের বিরোধের একটি প্রতিফলন, আমাদের অবশ্যই এ ব্যাপারটিকে বিবেচনায় আনতে হবে। যারা Seymour M. Hersh-এর *The Price of Power* বইটি পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং পররাষ্ট্র সচিব হেনরী কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালে যখন চীনের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগোপনে কাজ করে যাচ্ছিলেন, তখন কিসিঞ্জারের কাজকর্মের ওপর নজরদারী করছিল পেন্টাগন। পেন্টাগনের এজেন্টরা এ সংক্রান্ত বহু কাগজপত্র সরিয়ে ফেলেছিল, ফটোকপি করে নিয়েছিল। এমনকি প্যারিসে কিসিঞ্জারের সফর বিরতির সময়ে তাঁর স্যুটকেস থেকে কিছু কাগজপত্র খোয়া গিয়েছিল। কাজেই এবার যে কানামাছি খেলাটা হল, সেটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সাথে তাঁর আমলাতান্ত্রিক চক্রের কোন নীতিগত বিরোধ কিনা. সে ব্যাপারটিও নীতিনির্ধারকদের চিন্তা করতে হবে। আমি এটি চিন্তা করতে বলছি এই কারণে যে, এসব বিষয়ও পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের সময় চিন্তায় রাখা দরকার। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব চাই, প্রভুত্ব চাই না। অনুরূপভাবে আমরা চীন, রাশিয়া, ভারতের বন্ধুত্ব চাই কিন্তু প্রভুত্ব চাই না। বাংলাদেশ তার নিজ মর্যাদা নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক– এটাই একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে প্রতিটি সরকারের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের সংগ্রামকে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন 'অস্তিত্বের জন্য বাংলাদেশের একাকী সংগ্রাম' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কূটনীতির ভাষায় শব্দ চয়ন সবিশেষ ইঙ্গিতবহ। তিনি 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বা 'মুক্তিযুদ্ধ' কথাগুলো ব্যবহার করেননি। বস্তুত বাংলাদেশের জন্য অস্তিত্বের (existence) বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১-এ অস্তিত্বের প্রশ্নটি যেমন কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল. আজ ২০০০ সালে সে বিষয়টি একইভাবে গুরুত্বের দাবীদার। ক্লিনটন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্নে এদেশের জনগণকে আশ্বস্ত করে গেলেন। এটাই আমাদের আনন্দের কথা।

www.pathagar.com

৮ এপ্রিল ২০০০

হুমায়ুন আহমদের অনশন রাজনীতি

মাহবুব উল্লাহ :

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও ভবনের নামকরণ নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে সিলেটে একটি অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সিলেটবাসীর গরিষ্ঠ অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রস্তাবিত নামকরণ প্রত্যাহার এবং তার পরিবর্তে এইসব ভবনের নামকরণ হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর শিষ্য, অনুগামীদের নামে করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলনের পেছনে সিলেটবাসী তথা সমগ্র দেশবাসীর বিরাট সমর্থন রয়েছে। দেশের একটি ক্ষুদ্র এবং মুষ্টিমেয় অংশ এই প্রস্তাবিত নামকরণের পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের দৃষ্টিতে যারা নামকরণের বিরোধিতা করছে, তারা হচ্ছে, মারাত্মক ধরনের মৌলবাদী গোষ্ঠী; তারা হচ্ছে, অন্ধকারের জীব। আর যারা এই নামকরণকে সমর্থন করছে তারা হচ্ছে সত্যিকারের মুক্তচিন্তার মানুষ; তারা অন্ধকারের বিপরীতে আলোকের পথযাত্রী। তারা এই আন্দোলনকে গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। নামকরণের একটি ব্যাপার নিয়ে জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি হবে এবং জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশ জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশের চিন্তাচেতনা ও আকুতির বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াবে, এটা ভাবতে অবাক লাগে। অবাক লাগে এই কারণে যে, আমরা যখন কোন একটি সমাজে বাস করি, তখন সেই সমাজের মূল্যবোধ, তাহজিব-তমদ্দুন এগুলোর বিরুদ্ধে গিয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। মাছ যেমন পানিকে অস্বীকার করে বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনি সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজের মূলধারার মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করতে পারে না। এ কারণেই আমরা লক্ষ্য করেছি, ঔপনিবেশিক যুগে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলো যদিও পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শাসন করছিল, তৎসত্ত্বেও তারা তাদের উপনিবেশভুক্ত জনগণের কৃষ্টিকালচার সম্পর্কে জানার জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছে। তারা যে জনগোষ্ঠীকে শাসন করবে সেই জনগোষ্ঠীকে বোঝার চেষ্টা চালিয়েছে। যারা ভারতের ঔপনিবেশিক আমলের ইতিহাস চর্চা করেছেন, তাঁরা জানেন যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা এবং তাঁদের ইংরেজ কর্মচারীরা এদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গভীর অনুসন্ধান চালিয়েছেন। যারা Hunter-এর *Annals of Rural Bengal* কিংবা *A Statistical Account of Bengal* পড়েছেন, Lewin-এর *The Chittagong Hill Tracts and the Dwellers Therein* বা *Duferin Report* পড়েছেন তাঁরা দেখবেন যে, এই রকম অনেক বিষয় নিয়ে তারা গবেষণা ও অনুসন্ধান করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এদেশের সমাজকে জানা, এদেশের মানুষ এবং তাদের মনের অনুভূতিকে জানা। এর ওপর ভিত্তি করে তারা এমন ধরনের শাসননীতি রচনা করা, যার ফলে এই উপনিবেশে তাদের শাসন দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয়, তাদের শোষণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের এই নীতি বেশ কাজে এসেছিল। যার ফলে আমরা লক্ষ্য করেছি, তারা প্রায় দুই শত বছর এদেশকে তাদের অধীনে রাখতে পেরেছিল এবং এদেশের জনগণের সঙ্গে একটা সম্পর্কও তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল।

নৃ-বিজ্ঞানকে সাধারণত উপনিবেশবাদের সমাজ বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তার কারণটা হচ্ছে, উপনিবেশবাদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নৃ-বিজ্ঞানেরও বিকাশ ঘটে এবং বিভিন্ন

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী মানুষের সংস্কৃতি, রীতিনীতি জানার চেষ্টা করা হয়। তখন নৃ-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ছিল রক্ষণশীল অর্থাৎ সমাজের পরিবর্তনের স্রোতধারাকে ঠেকিয়ে রাখা। এটি করতে গেলে সমাজের বিকাশসূত্র, সমাজের জনগোষ্ঠীর মন-মানসিকতা ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে। অবশ্য নৃ-বিজ্ঞান হাল আমলে একটি অত্যন্ত প্রগতিশীল বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। আর এর পেছনেও যে চিন্তাভাবনাটা কাজ করছে, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে, মানুষ যখন বিভিন্ন পশ্চাৎপদ সমাজের আধুনিকায়নের কথা ভাবছে; তখন সেই আধুনিকায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধগুলো কতদূর বাধা হিসেবে দাঁড়াবে, সেটি তারা ভাবতে এবং জানতে চেষ্টা করছে। যেমন ধরুন, আপনি কোন একটি সমাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠী জন্য আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধি করতে চান। আমিষ বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যেতে পারে। এখন যদি ভারতে কোন সরকার জনগোষ্ঠীর জন্য আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধি করতে গবাদি পশুপালনের কর্মসূচী গ্রহণ করে, গবাদি পশুর সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করে, সেটা ভারতীয় সমাজে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ সেখানকার বেশীরভাগ মানুষ গো-মাংস ভক্ষণ করে না। তারা গরুকে দেবতা হিসেবে বিবেচনা করে। কাজেই তারা গো হত্যার বিরুদ্ধে। আমরা এও জানি যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেসব শুদ্ধি আন্দোলন হয়েছে, হিন্দু পুনর্জাগরণের যেসব আন্দোলন হয়েছে, সে সময়ে 'গো মাতা'র প্রশ্নটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল। সুতরাং এই সমাজে গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে আমিষের চাহিদা পূরণ করা বাতুলতা মাত্র। সেক্ষেত্রে জনগণের জন্য যে ধরনের আমিষ গ্রহণযোগ্য, সেটারই ব্যবস্থা করতে হবে।

একটি সমাজে শুধু মানুষের রীতিনীতিগুলোই গুরুত্বপূর্ণ নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজে কি ধরনের Symbols বা প্রতীক ব্যবহৃত হবে, সে প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা এদেশের নিকট অতীত ইতিহাস সম্পর্কেও জানেন, তারা হয়ত জানবেন যে, তিরিশের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল মনোগ্রামে যখন শ্রীপদ্ম অঙ্কন করা হয়েছিল, তখন এই বঙ্গ দেশের বেশীর ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা সেটা গ্রহণ করতে পারেনি এবং এর বিরুদ্ধে সেকালে মওলানা আকরম খাঁ তার 'আজাদ' পত্রিকায় অত্যন্ত জোরালো প্রতিবেদন লিখেছিলেন। সে কারণে মওলানা আকরকম খাঁকে 'আক্রমণ খাঁ' নামে আখ্যায়িত করেছিল তৎকালীন হিন্দু 'ভদ্রলোকেরা'। শ্রীপদ্ম হচ্ছে সরস্বতীর আসন। সেটা হিন্দু সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু মুসলিম সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং প্রতীক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা আমরা এই ঘটনা থেকে আঁচ করতে করতে পারি। কিন্তু আমাদের দেশের এক ধরনের বুদ্ধিজীবী নিজ ধর্ম, নিজ সমাজ ও সংস্কৃতির মানুষের প্রধান মূল্যবোধগুলোকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করে, কিন্তু অন্য ধর্মের মূল্যবোধকে গ্রহণ করা এবং গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করাটাকে প্রগতিবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলে চিহ্নিত করেন। সুতরাং আমার কাছে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও ভবনের নামকরণের ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি করেছে সিন্ডিকেট, সেটা এদেশের জনগণের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য বলে কখনই মনে হয়নি। এখানে আরও উল্লেখ করা দরকার যে, কিছু ব্যক্তির নামে যে নামকরণ করা হল, সেক্ষেত্রেও এক ধরনের আতিশয্য লক্ষ্য করা গেছে। যে হলের এখনও ভিত্তিপ্রস্তর হয়নি, যে ভবন এখনও নির্মিত হয়নি, আগাম তার নাম দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আগাম নাম দেয়ার পেছনে এমন একটা মানসিকতা কাজ করেছে, যার মূলকথা হচ্ছে এই যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকাকালেই সবকিছু করে যেতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে অন্য কোন সরকার, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দয়িত্ব পেলে এই নামকরণের কোন পরিবর্তন না ঘটে। সুতরাং এখানে কোন উদার মানসিকতা কাজ করেনি, এক ধরনের সংকীর্ণ চিন্তা কাজ করেছে।

www.pathagar.com

এখানে আরো উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই নামকরণ করা হয়েছে স্থানের নামে। একমাত্র সিলেটের এই বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণ হয়েছে একজন অলি আল্লাহ সাধক পুরুষের নামে। কাজেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সিলেটবাসী তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর বক্তব্য হচ্ছে শাহজালাল (রঃ)-এর নামে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ হয়েছে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও ভবনের নামকরণও এমনসব আধ্যাত্মিক পুরুষের নামে হওয়া উচিত, যারা হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর সতীর্থ হিসেবে এসেছিলেন এবং সিলেটে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে দেখা যায় ইসলামের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাসও সম্পর্কিত রয়েছে। এদেশের প্রচলিত ধর্মে জাতপাতের যে ব্যবধান ও বৈষম্য ছিল– ইসলাম একটি বিপ্লবী ধর্ম হিসেবে এখানে সেইসব বৈষম্যের অবসান ঘটায়। যার ফলে এদেশের নিম্নবর্গের মানুষ ইসলামের উদারতা, মহত্ব, সাম্য, সহনশীলতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু বা অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা ইসলামের এই ব্যাপক প্রসারকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। হযরত শাহজালাল (রঃ) থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত মুসলমান সাধক পুরুষের রওজা মোবারক রয়েছে, সেইসব অঞ্চলের ইতিহাসে দেখা যাবে প্রতিটি অঞ্চলেই কোন না কোনভাবে একজন অত্যাচারী রাজা শাসন করত। তারা ক্ষেত্রবিশেষে নরবলির মতো একটি মানবতাবিরোধী প্রথার চর্চা করত। যার ফলে বহু নিরীহ প্রজাসাধারণকে প্রাণ দিতে হয়েছে। সেখানে যখন এসব সাধক পুরুষরা এসে বললেন নরবলি নিষিদ্ধ, অত্যচার-অবিচার নিষিদ্ধ, জাতপাতের ব্যবধান নিষিদ্ধ– ঠিক সেই মুহূর্তে এদেশের জনগণ ইসলামকে গ্রহণ করল। ইসলামের আবেদন এদেশের মানুষের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল। কাজেই আজকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও ভবনসমূহের নামকরণকে কেন্দ্র করে যে ধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, তা কোন সাদামাটা দ্বন্দ্ব নয়। কোন তুচ্ছ ব্যাপার নয়। এই দ্বন্দ্বের পেছনে ঐতিহ্যের প্রতি, নিজের সমাজের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নটি জড়িত আছে। এখানে আমি আমার সেক্যুলার বন্ধুবান্ধবদেরকে একটি কথা সবিনয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, পাশ্চাত্যের যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উচ্চারণ করে আমরা গৌরব বোধ করি বা যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের সুযোগকে আমরা একটা বিরল সুযোগ বলে মনে করি, সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের মধ্যে যিশুখ্রীস্টের ক্রুশের চিত্র কি লক্ষ্য করি না? তার ফলে কি একথা বলা যাবে যে, পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধর্মীয় গোঁড়ামিতে বিশ্বাস করে, মুক্তচিন্তায় বিশ্বাস করে না এবং সেখান জ্ঞানের বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা হয় না। তারা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে রয়ে গেছে একথা নিশ্চয়ই বলা যাবে না। সবকিছুর পেছনে একটা ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট কাজ করে। আমাদেরকে বিষয়টা সেভাবেই দেখতে হবে। ভারতে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় যেমনি আছে, তেমনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় রাষ্ট্রের একটি মূলনীতি হওয়া সত্ত্বেও এই নামগুলো বজায় আছে। তবে সামগ্রিকভাবে ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সেই ধর্মনিরপেক্ষতার যথার্থ প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি না। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হিন্দুত্ববাদের পুনর্জাগরণ হওয়ার ফলে আমরা লক্ষ্য করেছি, সেখানে মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে এই ধরনের পরিবেশ নেই। এখানে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান তথা সকল সম্প্রদায়ের লোকজন বিভিন্ন নবী, পয়গাম্বর ও অবতারের অনুগামী হলেও তারা একে অপরকে পরস্পরের ভাই হিসেবে গণ্য করে এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি সদাচারণ করার চেষ্টা করে। এখানে ধর্মীয় সহনশীলতার একটা চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে, যা পৃথিবীর অনেক দেশেই হয়ত নেই। জার্মানীর মত সুসভ্য দেশে যেভাবে ইহুদীদের নিধন

www.pathagar.com

করা হয়েছিল, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। সুতরাং আজকে এখানে মৌলবাদ বিরোধিতার নামে নিজের শেকড়কে অস্বীকার করার প্রবণতা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই প্রবণতা যে শুধু আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, তাই নয়, আমরা যদি আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে দেখব, বাংলাদেশের মৌল অস্তিত্বকে অস্বীকার করার একটা সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা কাজ করছে। বাংলাদেশের অস্তিত্ব বহুলাংশে নির্ভর করে এর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মূল্যবোধগুলোর উপর। এগুলোর ওপরই আঘাত হানার চেষ্টা চলছে। সুতরাং এই নামকরণের ব্যাপারটির পেছনে একটা রাজনৈতিক অভিষন্ধি কাজ করছে– যেটি হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের অধিকর্তা বা শাসকদের মনোরঞ্জন করা এবং ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশে এক ধরনের তথাকথিত সাংস্কৃতিক শুদ্ধিকরণের নামে এদেশের স্বতন্ত্র চরিত্র ও পরিচয়কে অস্বীকার করা।

আজকে বিষয়টি একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে এবং এই বিষয়টির সাথে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে সবশেষে এসে যুক্ত হয়েছেন লেখক হুমায়ূন আহমেদ। হুমায়ূন আহমেদ একজন জনপ্রিয় লেখক। বিশেষ করে এদেশের তরুণ সমাজের কাছে তার বিরাট একটি গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। একুশে গ্রন্থমেলাসহ অন্যান্য বইমেলায় হুমায়ূন আহমেদের বই ব্যাপকভাবে বিক্রি হয়, সমাদৃত হয়। আমরা এই হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে গর্ব করতে পারতাম এ কারণে যে, বাংলাদেশোত্তরকালে আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে এমন একজন লেখকের উদ্ভব হয়েছে, যিনি কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের লেখক-ঔপন্যাসিকদের সাথে জনপ্রিয়তার দিক থেকে পাল্লা দিতে পারেন। তাঁর ভাষা, তাঁর লেখার রীতি সবই প্রশংসনীয়। আমার মনে আছে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে লেখালেখিতে আসার পেছনে তিনি প্রেরণা কীভাবে পেলেন– সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, একবার বরিশাল যাওয়ার পথে স্টীমারে কিছু হকার বই বিক্রি করার সময়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, 'আছে আছে খুব ভালো বই আছে। কলকাতার হিন্দু লেখদের বই আছে'। একথা শোনার পর হুমায়ূন আহমেদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল তাহলে বাংলাদেশের মুসলমান লেখকরা কি ভাল বই লিখতে পারে না? সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই হুমায়ূন আহমেদের মনে একটা আকাংক্ষা সৃষ্টি হয় যে, তাকে লিখতে হবে, সাহিত্যে মনোনিবেশ করতে হবে। আমার মনে আছে ১৯৭৬ সালে যখন তাঁর প্রথম দুয়েকটি বই বের হয় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক আবু মাহমুদ, যিনি দশ বছর প্রবাস জীবনযাপন করার পর দেশে ফিরে এসেছেন, তিনি হুমায়ূনের বইপড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন, চমৎকৃত হন। তিনি হমায়ূন আহমেদের বাসায় যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে বলেছিলেন, এই লেখকের মধ্যে প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা রয়েছে। এঁকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আমি তাঁকে হুমায়ূন আহমেদের মীরপুর রোডের বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সেখানে তিনি হুমায়ূনের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। আমরাও ভাবতে পারতাম যে, সমরেশ-শীর্ষেন্দুর পাশাপাশি আমাদেরও একজন লেখক আছেন, যাঁকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। কারণ, এই লেখকের বই শুধু ঢাকার বাজারেই নয়, কলকাতাতেও তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে কেন্দ্র করে আমাদের একটা জাতীয় গর্ববোধেরও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভাবতে খুবই কষ্ট লাগে যে, সেই হুমায়ূন আহমেদ নিজেকে এমনভাবে বিতর্কিত করে তুললেন যে, তাঁর সাম্প্রতিক আচরণ ও কর্মকাণ্ডের দ্বারা দেশবাসী দুঃখ ও বেদনায় জর্জরিত হচ্ছে, তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছে এবং তিনি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য উদ্বুদ্ধ বলে সন্দেহ করছে। কয়েক দিন আগে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে এক ব্যক্তিগত আলাপে হুমায়ূনের লেখা অত্যন্ত চমৎকার বলে প্রশংসা করে তিনি তাঁকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেও বলেছিলেন যে,

www.pathagar.com

বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে তার প্রচণ্ড সর্বনাশ হয়ে গেল। আজকে হুমায়ূন আহমেদের কাছে দেশবাসীর যে প্রত্যাশা, তার সঙ্গে তাঁর আচরণের এই ব্যবধানের ফলে দেশে তাকে নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্কের সূচনা হয়েছে। বলতে আপত্তি নেই, আজকে আমাদের দেশের কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা তাঁর পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে তাঁকে রীতিমত একটি বিশাল হিরোতে পরিণত করার চেষ্টা করছে। আবার অনেক পত্রিকা তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন তুলছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গড়িয়েছে যে, তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও নানা ধরনের অবাঞ্ছিত লেখালেখি শুরু হয়ে গেছে। এটাতো কাংক্ষিত ছিল না। অর্থাৎ দেশবাসীর আকাংক্ষা ও মনমানসিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে, সে যত বড়ই হোক, যত নামকরাই হোক না কেন, সেটা তাঁকে নিঃসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য করে তুলবে, তাঁর জনপ্রিয়তায় ধস নামাব এবং এর ফলে দেশ ও জাতির বড় ক্ষতি হতে পারে।

আফতাব আহমাদ :

সিলেটবাসীকে এক বিষয়ে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং দেশবাসীর পক্ষ থেকে সিলেটবাসীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁরা শত প্রতিকূলতার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটি আন্দোলনকে যেভাবে ধরে রেখেছেন, লালন করছেন, সে আন্দোলনের বিজয় অবধারিত– এ সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই, দেশবাসীরও কোন সন্দেহ নেই। আমার এখনও মনে পড়ছে, ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর এদেশের মানুষ এত বেশী আবেগাপ্লুত ছিল এবং ভারতীয় প্রচারণা ও তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৈন্য সেদিনকার তরুণদেরকে এমনভাবে প্ররোচিত করেছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী সলিমুল্লাহ মুসলিম ও ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে 'মুসলিম' শব্দটি তাঁরা বাদ দিয়েছিলেন। এসব তাঁরা করলেন ধর্মনিরপেক্ষতা অসাম্প্রদায়িকতার নামে। কিন্তু সেই তরুণ ছাত্রছাত্রীরা যখন সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে গিয়ে আবেদন নিবেদন করলো যে, জগন্নাথ হলটিকেও সকর ধর্মের অনুসারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে, শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্য সংরক্ষণ করা চলবে না– তখন আমরা লক্ষ্য করেছি, হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা কী প্রচণ্ডতার সঙ্গে তার বিরোধিতা করেছিল। এমনকি তৎকালীন ভারতীয় হাই কমিশন থেকেও হস্তক্ষেপ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে দেয়া হয় যে, হিন্দুদের জন্য পৃথক, স্বতন্ত্র হল সংরক্ষিত থাকতে হবে। কথাটা আজকের আলোচনায় আনতে হচ্ছে এই জন্য যে, আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনুভূতি, মূল্যবোধগুলোকে আমরা নির্বাসন পাঠিয়ে এদেশে যে মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি চর্চার তাগিদ একশ্রেণীর লোকের মধ্যে লক্ষ্য করেছি, তা আমাদের জন্য রাষ্ট্রঘাতী ও আত্মবিনাশী। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল নামকরণ প্রতিরোধ আন্দোলনে শুধু সিলেটবাসীই নয়, এদেশের সকল মানুষ একাত্মতা ঘোষণা করেছে। যে বিশ্ববিদ্যালয় হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর পুণ্য স্মৃতিকে ধারণ করে জন্মলাভ করেছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিতর্কিত কোন নাম যুক্ত হয়ে সামান্যতম কোনো অবমাননা কাম্য নয়। বলা হয়েছে যে, যাদের নামে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন ও হলের নামকরণ করা হয়েছে, এরা এদেশের নামকরা শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম। নামকরা এরা নিঃসন্দেহে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম কিনা, সে নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে, নানা বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। আসলে বিতর্কের গোড়াপত্তন ঘটে, যখন জাহানারা ইমামের নামে ছাত্রীদের একটি হলের নামকরণ করা হয়। অধিকাংশ হল ও ভবন এখনো নির্মিত হয়নি। জাহরানা ইমামের নামে যে হলটির নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, সেটিকে সিদ্ধ করার জন্য পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট অন্যান্য

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের নাম একত্রিত করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং এর দ্বারা তাঁরা বোঝাতে চাইলেন যে, বিভিন্ন মনীষী ও জাতীয় ব্যক্তিত্বের নামে বিভিন্ন হল ও ভবনের নামকরণ করা হচ্ছে এবং এর সাথে হযরত শাহজালালের আদর্শের কোনো বিরোধ নেই কিংবা হযরত শাহজালালের স্মৃতিকে মুছে ফেলার কোনো ষড়যন্ত্রও নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যক্তির নামে হলের নামকরণ করার আগে আমাদের বহুবার ভেবে দেখা দরকার যে, আমরা সেই ব্যক্তিকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, সেই ব্যক্তি সমাজে কী ধরনের অবদান রেখেছেন এবং সাধারণ মানুষ সে অবদানকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

আজকে বিশেষ করে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে বিতর্কটি সামনে নিয়ে এসেছে একশ্রেণীর মতলববাজ গোষ্ঠী, সেটি হচ্ছে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মিতব্য বিভিন্ন ভবন বা দালান কোঠার নামকরণের কোন সম্পর্ক আছে কিনা সে ব্যাপারে আমার গভীর সন্দেহ রয়েছে। কে এই জাহানারা ইমাম? জাহানারা ইমাম একজন ব্যক্তিমাত্র এবং তিনি যেহেতু রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বল্পমেয়াদের জন্য হলেও বিচরণ করেছেন, বিতর্কিত হয়েছেন, তাঁকে কেন্দ্র করে একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে এভাবে অচল করে রাখার কোন অর্থ হয় না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যারা লালন করতে চান, তাঁদের কাছে সবিনয়ে আমার প্রশ্ন– তারামন বিবি, কাঁকন বিবি এবং তাপসী রাবেয়ার নামে কেন হল করার প্রস্তাব তাঁরা করেননি? কিংবা নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী বেগম রোকেয়ার নামে হলের নামকরণ করলে কী অসুবিধা হত? জাহানারা ইমামকে কেন বেছে নেয়া হল? অনেকে মনে করেন জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধের একটি প্রতীক। 'শহীদ জননী' হিসেবে তাঁকে একটি মহল বিশেষভাবে আমাদের সমাজে পরিচয় করিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে যেসব কৃষক শ্রমিকের সন্তানেরা শহীদ হয়েছে তাদের মায়ের স্বীকৃতি কোথায়? জাহানারা ইমামের সন্তান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শহীদ হয়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস জাহানারা ইমামের কী ভূমিকা ছিল, সেগুলো ওয়াকিবহাল মহল জানেন। জাহানারা ইমামের কৃত্রিম ভাবমূর্তি পরিকল্পিতভাবে তৈরী করা হয়েছে এ জাতিকে বিভক্ত করার জন্য। শেখ মুজিব যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন তখন কোথায় ছিলেন জাহানারা ইমাম? সেদিন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি তৈরী হয়নি কেন? বস্তুত জাহানারা ইমাম ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চরদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন এবং জাতীয় অনৈক্যের দৃঢ় ভিত রচনায় ব্যস্ত ছিলেন।

যে প্রসঙ্গটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে এই যে, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার সমাধান সুস্পষ্টভাবে হয়ে যেতে পারত, যদি ক্ষমতাসীন দল পুরো ব্যাপারটিকে দলীয় দৃষ্টিকোণ ও দলীয়করণের প্রবণতা এবং ভারতপন্থীদের তোষণ ও তোয়াজ করার প্রবণতা থেকে না করত। আমাদের অতি জনপ্রিয় সুলেখক হুমায়ূন আহমেদ এই আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে এসে নামকরণের পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। গত কিছুদিন ধরে পত্র-পত্রিকায় তার সম্পর্কে বহু ধরনের লেখা বেরিয়েছে। তিনি নিজেও নানা সাক্ষাৎকার এবং নিজের লেখায় মন্তব্য করেছেন যে, তিনি রাজনীতি করেন না, তিনি কোন রাজনৈতিক দলের লোক নন। হুমায়ূন আহমেদকে আমি সাধুবাদ জানাই যে, তিনি এই কথাটি স্পষ্টভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। তাহলে আমি কি সবিনয়ে তাকে প্রশ্ন করতে পারি যে, তিনি কেন একটি পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে সিলেটে অনশন করতে গেলেন? যেভাবে তিনি অনশনটি পালন করলেন পুলিশ ও বিডিআর পাহারায়, যেভাবে পুলিশ বেষ্টনীতে তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন, এমনকি ঢাকা থেকে দু'প্লাটুন পুলিশ সাথে নিয়ে তাঁর নিরাপত্তাকে তিনি যেভাবে নিশ্চিত করতে চাইলেন– এখানেইতো হাজার প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে। হুমায়ূনের ভক্ত ও সমর্থকরা হয়ত বলবেন যে, তাঁর নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র এই ব্যবস্থাটি করেছে। সমগ্র

www.pathagar.com

দেশবাসীর বিরুদ্ধে গিয়ে হুমায়ূন কেন নিজেকে বিপন্ন করে তুললেন- এই প্রশ্ন আমি করতে চাই। হুমায়ূন যদি মনে করেন যে, এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ত্রাসমুক্ত হওয়া দরকার, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ বিরাজ করা দরকার এবং বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়া দরকার, সাদামাটাভাবে হুমায়ূন তো এ কথাটি বলতে পারতেন, 'শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে, আমি তার সমাধান চাই, সকল পক্ষ এগিয়ে আস। বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ কর, হুমায়ূন তো এই বক্তব্য উপস্থাপন করেননি। হুমায়ূন একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের পক্ষ হয়ে সেখানে গেছেন এবং দেখা গেছে, সিলেটের কোন লোক হুমায়ূনের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। ঢাকা থেকে যারা মতলবী উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে গেছেন, তাদের কথা আলাদা। হুমায়ূন বলছেন, তার বিবেক আছে। হুমায়ূন বলছেন, শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের অচলাবস্থা চলতে দেয়া যায় না। শিল্পীর বিবেক থাকা স্বাভাবিক। হুমায়ূন একজন কথাশিল্পী। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ধর্ষণের সেঞ্চুরী উদযাপিত হয় কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় দুর্বৃত্ত শিক্ষকের যৌন কেলেঙ্কারীর কেচ্ছা শিক্ষাঙ্গনে গ্লানির বোঝা বাড়িয়ে তোলে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ঘুমন্ত ছাত্রকে হত্যা করা এবং এমনি ধরনের নানা অসদাচরণ যখন শিক্ষাঙ্গণে উত্তপ্ত পরিস্থিতি ও বৈরী পরিবেশের জন্ম দেয় তখন হুমায়ূনের বিবেক কোথায় থাকে? এখানেই আমার প্রশ্ন। হুমায়ূন যত তারস্বরেই বলুক না কেন যে, তিনি রাজনীতি করছেন না, আমার এবং এদেশের মানুষের এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি চান বা না চান, তিনি একটি রাজনৈতিক পক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক।

আজকে প্রসঙ্গক্রমে আমি আরেকটি কথা স্মরণ করতে চাই। আমাদের এখানে বহুমতলবী লেখককে আমরা অতীতেও দেখেছি- যারা এক সময়ে আইয়ুব খাঁর বন্দনা করতেন, পরবর্তী পর্যায়ে ইয়াহিয়া খাঁর বন্দনা করেছেন, মুজিবের বন্দনা করেছেন এবং মুজিবের মৃত্যুর পর যারা বিভিন্ন সরকারের বন্দনা করেছেন, তারা আজকে পুনরায় আওয়ামী বন্দনায় লিপ্ত। এই সব স্তাবক ও ভাঁড়দের মধ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে একেক ব্যক্তিকে লালন করে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের দেশের মূল ভাবধারা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির মূলভিত্তিগুলোকে আঘাত করার জন্য। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের লেখক শওকত ওসমানকেও আমরা এ ধরনের ঘৃণ্য ভূমিকায় দেখেছি। আজকে কি সেই একই কায়দায় একশ্রেণীর গোষ্ঠী এবং একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশের মানুষের ঐতিহ্য চেতনা, ধর্মানুভূতি, সাংস্কৃতিক অর্জন ও সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে প্রতিহত করার জন্য হুমায়ূনকে ব্যবহার করতে চাইছে, এটি হুমায়ূনকে আজ ভেবে দেখতে হবে। তবে, ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, হুমায়ূন এই ঘটনার পর থেকে দল নিরপেক্ষ, রাজনীতি নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে- যেটাকে বলা হয়, শিল্পীর দৃষ্টি থেকে সমাজকে অবলোকন করে মানুষের অনুভূতি ও আবেগকে অনুভব করে সাহিত্যে ধারণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবেন। অন্যদিকে হুমায়ূন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে তাদের রোষানলেও পতিত হয়েছেন বৈকি।

এক সময় এদেশের পাঠক হুমায়ূনকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। এখন সবাই হুমায়ূনের সাহিত্যকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করার একটি অবকাশ পাবে। আজকে প্রশ্ন উঠবে যে. হুমায়ূন যা যা লিখেছেন. যা সৃষ্টি করেছেন তা এদেশের সমাজের কতটা কাজে আসবে. এদেশের সমাজের প্রকৃত চালচিত্র তাঁর সাহিত্যে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে বা ভবিষ্যতে কতটা প্রতিফলিত হবে। এই প্রশ্নগুলো একজন লেখকের জীবদ্দশায় যখন উত্থাপিত হয়, তখন সেই লেখকের সৃজনী ক্ষমতাকেই প্রশ্ন করা হয়। কোন লেখক পাঠকের প্রতিরোধের মুখোমুখি. তখন তাঁকে জীবন্মৃতই বলা চলে। হুমায়ূনের এ পরিণতি আমাদের জন্য একটি বিরাট ক্ষতি বলে আমি মনে করি। একই সঙ্গে একথা আজকে বলা উচিত যে. সিলেটে যে আন্দোলনের

www.pathagar.com

সূত্রপাত হয়েছে, এই আন্দোলনকে যারা মৌলবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত বা চিত্রিত করার চেষ্টা করছে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে 'মৌলবাদ' পশ্চাৎপদতা, কূপমণ্ডুকতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধিতার কোন সম্পর্ক নেই।

এই আন্দোলন সুস্পষ্টভাবে একটি কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা আমাদের সমাজের মূলভিত্তি থেকে যাতে বিচ্যুত না হই। আমাদের জাতীয় আশা-আকাংক্ষা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আকাংক্ষা কখনই কোন অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ধর্মানুভূতি, ভাবানুভূতির বাইরে থাকতে পারে না। ইসলামকে সমর্থন করা বা ইসলামের কোন ব্যক্তিত্বকে সমর্থন করা বা ইসলামের কোন মুজাহিদের প্রশংসা করা– এগুলো কখনই মৌলবাদের বিষয় হতে পারে না। ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্র। প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ, তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে পাশ্চাত্যের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশ এখনও তাদের মনোগ্রামে শোভা পায়। শুধু ক্রুশই শোভা পায় না, বাইবেল থেকে ল্যাটিন ভাষায় বিভিন্ন উদ্ধৃতিও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম আমরা লক্ষ্য করি। এর ফলে যেসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'মৌলবাদের' বা পশ্চাৎপদতার ঘাঁটি হয়ে যায়নি কিংবা কূপমণ্ডুকতার অন্ধকূপও হয়ে যায়নি। বরং সেসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলোকিত মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক কালজয়ী ও বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন, রাখছেন এবং মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের দেশে আমরা লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশ হওয়ার পরপর আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামগুলোকে রাতারাতি পাল্টে ফেলা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম আরবী হরফে লেখা ছিল 'রাব্বি জিদনি ইলমা"– তা উল্টে বাংলায় লেখা হল, 'প্রভু আমাকে জ্ঞান দাও।' আরবী হরফ উল্টে আমরা কি এক মহাবিপ্লব ঘটালাম, তার অর্থ সেদিন আমাদের কাছে বোধগম্য না হলেও আজ সেটি অত্যন্ত স্পষ্ট। সেটি হচ্ছে, আমাদের সাথে আমাদের ধর্মের যোগসূত্রটিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া। এক অর্থে, আমাদের মূল ভিত্তি থেকে উৎপাটন করে পরিচয়হীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করা। আজকে এ কথা নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি যে, আমাদের দেশে যে সংস্কৃতি চর্চার কথা বলা হয়, যেমন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা লক্ষ্য করি, একশ্রেণীর লোক 'মঙ্গল প্রদীপ' জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। কিংবা আমরা গত ৭/৮ বছর ধরে লক্ষ্য করছি, পহেলা বৈশাখে বাঘ-ভাল্লুক, বানর, কুকুর-বেড়ালের মুখোশ ধারণ করে নববর্ষ উদযাপন করার জন্য রাস্তায় কিছু সংখ্যক লোক ধেই ধেই করেন নৃত্য করছে। এগুলোর সাথে শ্বাশত বাঙালী, বাংলাদেশের কিংবা বাংলাভাষাভাষীদের কোন সম্পর্ক নেই। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময় এখনই এসে গেছে এবং সিলেটবাসীরা শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন রচনা করেছে, সেই আন্দোলন আমাদেরকে আজ অনুপ্রাণিত করছে ও নতুন করে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যেসব প্রতীককে, রূপককে জোর করে আরোপ করা হচ্ছে, সেসব নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য আমাদের আজ সাহস জোগাচ্ছে। এই প্রশ্ন আজ আমরা যারা করছি– আমাদের অনেককেই একটি অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে– এরা নব্য 'মৌলবাদী', নব্য 'রাজাকার' ইত্যাদি। এসব গালাগাল করে, এসব আক্রমণ করে এ দেশের মানুষকে তাদের মূল সাংস্কৃতিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্ভব হবে না। কারণ আমার ধর্মানুরাগ, ধর্মানুভূতি এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে আমার সামাজিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বিচ্ছিন্ন নয়। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্যের সভ্যতা আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছে; প্রাচ্যের সভ্যতাও আমাদের সেই দিকেই পরিচালিত ও উৎসাহিত করছে। যারা আজকে অন্য মতলব করার চেষ্টা করছেন তারা রাষ্ট্রীতিক শক্তির অনুকূলে যে কাজ করেছেন, তার বড় প্রমাণ হচ্ছে মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনের নামে আমরা লক্ষ্য করেছি,

www.pathagar.com

যেসব জেলায় এ ধ্বংসের উৎপাত এক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিরোধী মতলববাজরা করছে, সেসব জেলা ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দেখেছি, এনজিওরা মানুষের সামাজিক মূল্যবোধকে, স্বাভাবিক রুচিকে, ধর্মানুভূতিকে এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে আঘাত করে যে সমাবেশ করার চেষ্টা করেছিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাধারণ মানুষ তা ভণ্ডুল করে দিয়েছে। সিলেটের সাধারণ মানুষও আজকে সেখানে যে ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রচিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য আমি আবারও সিলেটবাসীকে ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং আমি কামনা করছি, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার অবসান হবে। হুমায়ূনের পেছনে যেসব মতলববাজ লোক একত্রিত হয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আজকে অবস্থান গ্রহণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশবাসী ধিক্কার জানাচ্ছে।

মাহবুব উল্লাহ :

আমি এই পর্যায়ে হুমায়ূন আহমেদের বিবেচনার জন্য সনির্বন্ধভাবে আমেরিকার একজন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী, যাকে আজকের আমেরিকার সক্রেটিস হিসেবে গণ্য করা হয়, সেই নোয়াম চম্‌স্‌কির একটি উদ্ধৃতি মনোযোগসহকারে পাঠ করে দেখার জন্য অনুরোধ করব। চম্‌স্‌কি ডেভিড বার্সামিয়ানকে বেশ ক'টি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। এই সাক্ষাৎকারগুলো *Class Warfare* নামে একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এটি প্রকাশ করেছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। চম্‌স্‌কি এখানে বলেছেন, "If there's some brand of Islamic fundamentalism, that's out of control, that's dangerous. If there's some brand of the Catholic church that's out of control, that's dangerous. If it's a democratic politician in Guatemala, who is out of control, that's dangerous, If you're out of control, you're dangerous. Islamic fundamentalism is one of the ways, in which a very repressed part of the world is beginning to organize itself independently. So naturally that's unacceptable. And it's not Islamic fundamentalism. You can tell that right off". সুতরাং আমাদের অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার। সেটা হচ্ছে এই যে, যেকোন মতাদর্শের আন্দোলনকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে স্থান-কাল-পাত্রের আপেক্ষিকতায়। আজকে সারাবিশ্বে যেসব আন্দোলনকে 'ইসলামী মৌলবাদ' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, সেসব আন্দোলনের সাথে যেহেতু পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোর কোন বোঝা পড়া নেই, সেজন্য আজকে সেসব আন্দোলনকে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই কথাগুলো বলেছেন আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক, MIT'র প্রফেসর নোয়াম চম্‌স্‌কি, যিনি মূলত ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন; কিন্তু সমসাময়িক ঘটনাবলীর উপরও আলোকপাত করে বিশ্লেষণধর্মী, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং গ্রন্থ রচনা করেন। যেহেতু হুমায়ূন আহমেদ আমেরিকায় শিক্ষালাভ করেছেন, যদিও তাঁর বিষয় ছিল কেমিস্ট্রি– আমি জানি যে, চম্‌স্‌কির কথা তিনি সম্যক অবগত আছেন। চম্‌স্‌কির বক্তব্যের আলোকে হুমায়ূন আহমেদ চিন্তা করে দেখবেন যে, তিনি আজকে কাদের পক্ষে আর কাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক আন্দোলনই নিঃসন্দেহে কারো পক্ষে যাবে অথবা কারো বিরুদ্ধে যাবে। আজকে যে আন্দোলন স্বাধীনচেতা, কর্তৃত্ববিরোধী, আধিপত্যবাদবিরোধী তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মূলত তিনি কর্তৃত্ববাদ ও আধিপত্যবাদের দোসর হিসেবেই নিজেকে তুলে ধরেছেন এবং একটি মহা ভুল করেছেন বলে আমার ধারণা।

www.pathagar.com

আফতাব আহমাদ :

এখনো সময় আছে, আমি মনে করি, হুমায়ূন নিজেকে শুধরে নিতে পারেন। হুমায়ূন সিলেটের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা-উৎকণ্ঠা ইত্যাদি ব্যক্ত করে যে লেখাটি পত্রিকায় ছেপেছেন 'শহর সিলেট' শিরোনামে সেই লেখার সূত্র ধরেই বলতে চাই, মাগুরছড়ায় যখন দুর্ঘটনা ঘটে এবং বহুজাতিক কোম্পানী অক্সিডেন্টাল যখন মাগুরছড়ার বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করে, এমনকি মাগুরছড়ায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানকার পরিবেশ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়, তখন হুমায়ূনের বিবেক কোথায় ছিল? হুমায়ূনের কাছে এই প্রশ্নগুলো এই জন্য রাখছি যে, তাঁর কাছে আমাদের চাওয়া অনেক। এই দেশ যেমন তাকে সম্মান দিয়েছে, এ দেশের বয়ঃসন্ধির তরুণ-তরুণীরা তাঁর গ্রন্থকে যেভাবে সমাদৃত করেছে, তাতে হুমায়ূনের একদিকে যেমন সফল লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন, অন্যদিকে তিনি বিশাল বাণিজ্যিক সুবিধাও পেয়েছেন। তাঁর একটা দায় আছে এই দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে, তাঁর একটি দায় আছে এ দেশের সমাজের কাছে, এই জাতির কাছে। অতএব, দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে নানা অনাচার চলছে, সেসব অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যদি হুমায়ূন উদ্যোগ গ্রহণ করেন এ দেশের মানুষ নিশ্চয়ই তাঁকে সাধুবাদ জানাবে। তবে কোন অবস্থাতেই যারা বাংলাদেশের স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বকীয় অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অহর্নিশ ষড়যন্ত্র করে এবং যারা রাঢ়বঙ্গের সংস্কৃতিকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে, কিংবা যারা ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশকে একীভূত করে ফেলতে চায়, তাদের পক্ষে হুমায়ূন যদি অবস্থান গ্রহণ করেন, তাহলে তার চেয়ে দুঃখজনক ও নিন্দনীয় ঘটনা আর হতে পারে না।

সময় এখনো আছে, হুমায়ূন নিজেকে শুধরে নেবেন। কারণ, হুমায়ূনের একটি কথা মনে রাখা দরকার, তিনি সাহিত্যকর্মে হাত দিয়েই এ দেশের মানুষের স্নেহ-ভালবাসা, সমর্থন পেয়েছিলেন। চলচ্চিত্রে তিনি কতদিন থাকবেন, সেটি আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু দুঃখ লাগে, তিনি শিক্ষকতার মহান পেশা ছেড়ে দিয়েছেন চলচ্চিত্রে সাফল্য অর্জন করার জন্য। সেই সাফল্যের মুখ তিনি কতটুকু দেখবেন, আমরা জানি না। কিন্তু ইতোমধ্যেই চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে তার জীবন, বিশেষ করে তাঁর পারিবারিক জীবনকে নিয়ে যেসব বিতর্ক পত্র-পত্রিকায় বেরুচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে সুখকর তো নয়ই, হুমায়ূনের জন্য শুভও নয়। কাজেই সময় এখনো আছে, হুমায়ূন নিজেকে শুধরে নেবেন– এটাই আমি আশা করব। হুমায়ূনের সৃজন ক্ষমতার অপমৃত্যু আমাদের কাম্য নয়।

www.pathagar.com

১৫ এপ্রিল, ২০০০

মুজিব বাহিনীওয়ালাদের সাম্প্রতিক তৎপরতা

মাহ্‌বুব উল্লাহ্ :

গত ৩১ মার্চ ঢাকায় জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজিব বাহিনী-বিএলএফ সদস্যদের মতবিনিময় সভা। এই সভায় বক্তব্য রেখেছেন আওয়ামী লীগের প্রিসিডিয়াম সদস্য খাদ্যমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, পানিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, মুজিব বাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ডার শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, মুজিব বাহিনীর অন্যতম সংগঠক জাসদের সভাপতি মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রী আ স ম আবদুর রব, আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু, শ্রমমন্ত্রী আবদুল মান্নান, জাসদের কার্যকরী সভাপতি নূর আলম জিকু, সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু প্রমুখ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রায় ৩০ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে এবং বর্তমানে আওয়ামী লীগ যখন দ্বিতীয়বার এ দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সরকারের মেয়াদ আর বছর খানেক অবশিষ্ট থাকতে এ ধরনের একটি সভার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক অনেক। কারণ, একদিকে আমরা এই সভার উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু তথ্য পেয়েছি যেটি সাধারণত ড্রয়িংরুমে বসে আলোচনা হত, কিন্তু কেউ প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি বা কোনো সংবাদ মাধ্যমের কাছে তুলে ধরেননি। সঙ্গে সঙ্গে এই সভায় বলা হয়েছে যে, চক্রান্তকারীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সক্রিয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মুজিববাহিনীর মূল নেতৃত্ব যেটি ছিল, সেটি স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের মধ্য দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনাব সিরাজুল আলম খান ও আ স ম আবদুর রবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নতুন দল গঠন করেন। যে দল ১৯৭২-৭৫-এ যুবশক্তির একটি বিশাল প্রাণচঞ্চল অংশকে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়। এই যুবশক্তিকে তারা সুসংগঠিত করে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধে নেমে পড়ে। লক্ষ্যণীয় যে, পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নানাভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর নেতৃবৃন্দের অনেকেই কারারুদ্ধ হন। শেখ মুজিবের আমলেও তাঁদের নেতৃবৃন্দ নির্যাতিত হয়েছেন, কর্মীরা কারারুদ্ধ হয়েছেন এবং রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহতও হয়েছেন। এ রকম প্রবল আওয়ামী বিরোধী এক রাজনৈতিক শক্তি তাঁদের প্রতিপক্ষের সাথে প্রায় ২৫ বছর পর এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন আবার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন, তখন যারা দেশ ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবেন, তাঁদেরকে অবশ্যই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাবতে হবে।

চরম বিরোধিতা থেকে আজকে কোন সুতার টানে এই সখ্য সৃষ্ট হল, সেটি আজকে বোঝা দরকার, বিশ্লেষণ করা দরকার। সাথে সাথে আমাদের জানা দরকার, মুজিববাহিনীর ইতিহাসটা কী, এর পেছনে কী উদ্দেশ্য কাজ করেছিল, মুক্তিযুদ্ধে তাদের কী ভূমিকা ছিল এবং তৎকালীন অস্থায়ী মুজিব নগর সরকারের সাথে এই মুজিববাহিনীর সম্পর্ক কী ছিল। সেদিনকার সভায় আমির হোসেন আমু বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু' স্বাধীনতার পরিকল্পনা নিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথেও যোগাযোগ করেছিলেন। ছয় দফা আন্দোলন নিয়ে তিনি কথা বলেন অনেকের সাথে। জেলে বসেই ত্রৈলক্যনাথ মহারাজ, চিত্তরঞ্জন সুতার ও নেপাল নাহার সাথে 'বঙ্গবন্ধু' চুক্তি করেছিলেন। তাঁরা 'বঙ্গবন্ধু'কে সমর্থন দেয়ার কথা বলেছিলেন। বিষয়টি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথম কথা হল, শেখ মুজিবুর রহমান যখন

www.pathagar.com

কারাগারে ছিলেন, তখন কারাগারের চার দেয়ালে বন্দী থাকা সত্ত্বেও তিনি বাইরের কিছু পলিটিক্যাল এলিটমেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্যাপারটি খুব অসম্ভব নয়। যারা কারাগারে দিন কাটিয়েছেন, বিশেষ করে রাজবন্দী হিসেবে, তাঁরা সকলেই জানেন যে কারাগার থেকে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য জেল ওয়ার্ডেন বা যাদেরকে জেলখানার ভাষায় 'মিয়া সাহেব' বলা হয়, তারা একটা উত্তম বাহন বা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। তারা বেশ নিষ্ঠার সাথে কারাবন্দী বা রাজবন্দীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ এবং আদেশ-নির্দেশ বাইরে চিরকুটের মাধ্যমে পৌঁছে দিতো। আজকের প্রজন্ম এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে খুব পরিচিত না হলেও সংবাদপত্রে হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদ কারাগারে বন্দী থাকাকালেও এ ধরনের অনেক চিরকুট চালাচালি করেছেন। এটা যে কড়া পাহারা সত্ত্বেও সম্ভব হয়– এ ঘটনা তারই প্রমাণ। এখন প্রশ্ন, হল তৈলক্যনাথ মহারাজ, চিত্তরঞ্জন সুতার এবং নেপাল নাহা– এঁরা কারা? কী এদের পরিচয়? কী এদের রাজনৈতিক পরিচয়? এ সম্পর্কে বোঝা এবং জানা দরকার। মুজিববাহিনীর এই সভায় মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, "যারা ইতিহাস বিকৃত করতে চায়, তারা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন।১৯৬১ সালে সংগ্রামী জনতার নামে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে লিফলেট বিলি করা হয়েছিল তাঁরই নির্দেশে। এরপর ১৯৬২ সালে গঠন করা হয় 'নিউক্লিয়াস'। ১৯৬৫ সালে তিনি প্রস্তুতি নিলেন, আগরতলার ঘটনা ছিল সত্য। বঙ্গবন্ধু '৬৬ সালেই আমাদের বলেছিলেন, 'আমি সব প্রস্তুত করে রেখেছি। আমেরিকা ও চীন আমাদের সমর্থন করবে না। কিন্তু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের সাহায্য করবে'। পাঁচ বছর পর তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল'। "জনাব রাজ্জাক আরও বলেছেন, ২৬ মার্চের পূর্বে 'বঙ্গবন্ধু' ভারতের সাথে যোগাযোগ করে কোথায় ট্রেনিং হবে, কোথায় আমাদের থাকতে হবে, সব ঠিক করে রেখেছিলেন। তাই স্বাধীনতার সংগ্রামকে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে সীমাবদ্ধ করার সুযোগ নেই"। তিনি আরও বলেছেন, "মুজিববাহিনীর সদস্যরাই ছিল একমাত্র রাজনৈতিক ও আদর্শিক চেতনায় সংগঠিত। আমাদের অনেক ভুলের মাশুল আজ আমাদের দিতে হচ্ছে। চক্রান্তকারীরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে চক্রান্ত করছে অথচ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি এখনও এক হতে পারছে না। আজ প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তা না হলে ওরা মহা সর্বনাশ করে দিতে পারে"। তিনি দু'মাসের মধ্যে মুজিববাহিনীর সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমাদের সার্টিফিকেট দেবেন'। এর পাশাপাশি জনাব তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, "বঙ্গবন্ধু স্বয়ং বলেছেন, পাকিস্তান হওয়ার পর পরই তিনি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে চিন্তা শুরু করেন। আগরতলায় গিয়ে বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করার উদ্যোগ নেন। আগরতলার ঘটনা ষড়যন্ত্র নয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়"। আজকে এসব কথা যখন আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতাদের কাছ থেকে শুনতে পাই, তখন মনে প্রশ্ন জাগে, ১৯৬৯-এ আমরা যখন এক দেশকাঁপানো গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম, তখন ছাত্র-জনতার স্লোগান ছিল– 'মিথ্যা মামলা, আগরতলা, মানি না, মানি না। জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো' এগুলো কি মিথ্যা ছিল? সেদিন তো আমরা জনগণকে সংগঠিত করেছিলাম এই কথা বলে যে, শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে যে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে, তা বানোয়াট, এটি তাঁকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবন নিঃশেষিত করার জন্য দায়ের করা হয়েছে। জনাব তোফায়েল আহমদ সেদিন উনসত্তরে অনেক জনসভায় বলেছিলেন যে, 'এটা আগরতলা ষড়যন্ত্র নয়, এটা হচ্ছে পিন্ডির ষড়যন্ত্র। ইসলামাবাদের ষড়যন্ত্র'। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে ১৯৬৯-এ মুক্তিলাভের পর উল্লেখ করেছিলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলাটি ছিল 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র'। কাজেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, ইতিহাসের ঘটনা হিসেবে সত্য কোনটি? পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী যেটি বলেছিলো, সেটি সত্য, না আজকে এত বছর

www.pathagar.com

পর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এই বক্তব্য সত্য? তাঁদের এই উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁরা কি জাতির সামনে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে একথা স্বীকার করছেন যে, সত্যি সত্যিই শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের সঙ্গে যোগসাজশ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং তাঁদের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এই অভিযোগটি প্রমাণিত হয় যে, এদেশে যারা মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে তারা ভারত কর্তৃক অনুপ্রাণিত, হিন্দুদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল– এবং এখানে বিশিষ্ট কয়েকজন হিন্দু নেতা বা রাজনৈতিক করিৎকর্মার নাম উল্লেখ করার পর ব্যাপারটি তো সেভাবেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আমরা কথায় কথায় বলি যে, সত্যিকারের ইতিহাস লিখতে হবে, ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে, ইত্যাদি। তাহলে প্রশ্ন, ইতিহাসের বিকৃতিটা কোথায়? ১৯৬৯-এ যখন দাবী করা হয়েছিল ইসলামাবাদের ষড়যন্ত্র– সেটাই কি ইতিহাসের বিকৃতি, না আজকে যা বলা হচ্ছে, আগরতলায় শেখ মুজিব গিয়েছিলেন, ভারতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল সেটাই ইতিহাসের বিকৃতি। তিনি পূর্ব থেকেই বলে রেখেছিলেন, কোথায় ট্রেনিং হবে, কোথায় যেতে হবে, কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে– এগুলো কি সত্য? এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চরিত্র সম্পর্কে আমার মনে হয় জনমনে প্রশ্নের সৃষ্টি হবে। প্রশ্নটি হচ্ছে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধটি একদিকে যেমন এদেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায্য সংগ্রাম ছিল, কিন্তু এর পাশাপাশি একটি বিরাট ষড়যন্ত্র ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল, মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে উদ্ভূত রাষ্ট্রটিকে একটি প্রতিবন্ধী ও পুতুল রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত করা এবং সে ধরনের একটি বোঝাপড়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতীয় নেতৃত্বের হয়েছিলো।

আজকে আমরা যারা বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিভাজন নিয়ে প্রতিনিয়ত কথা বলি এবং মুক্তিযুদ্ধের কথিত সপক্ষ শক্তিরা বিপক্ষ শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য রণধ্বনি তুলে যেভাবে জাতীয় বিভাজন সৃষ্টি করছে, তার মূল উৎস খুঁজতে গেলে সেই একাত্তর ও তার পূর্ববর্তী ঘটনায় আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী অত্যন্ত হেমোজেনাস– ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে, সেই রাষ্ট্র আজকে কেন একটি জাতি রাষ্ট্র হিসেবে শক্তিশালী হতে পারছে না? কেন স্বাধীন, স্বনির্ভর উন্নয়নের পথে যেতে পারছে না? কেন ১৩ কোটি লোকের একটি দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বসভায় সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলেও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরিত্র, নেতৃত্বের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ– এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদ যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন মুজিব বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য, যারা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ ধরনের আদর্শে দীক্ষা নিয়েছেন, তাদেরকে বিশেষভাবে সংগঠিত করার পেছনে আসল উদ্দেশ্যটা কী সেটা আজকে আমাদের একটু চিন্তা করা দরকার। সেটা কি আগামী নির্বাচনকে আওয়ামী লীগের পক্ষে নেয়ার জন্য পেশীশক্তিকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, নাকি এর মধ্য দিয়ে দেশকে একটি গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যার ফলে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ভূলুণ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে– এটা সে ধরনের কোন উদ্যোগ কিনা– সেটাও আমাদেরকে ভাবতে হবে। একদিকে আ স ম রব, অন্যদিকে তোফায়েল আহমদ– এঁরা যখন একজোট হন– সেক্ষেত্রে কোন উপলব্ধি আ স ম রবকে তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করলো, সেটাও আমাদেরকে ভাবতে হবে। তাহলে স্বাধীনতার পর প্রবচনের মতো যে বক্তব্য জনমনে প্রচলিত ছিলো যে, জাসদকে গঠন করা হয়েছিলো ভারতীয়দের সেকেন্ড ফ্রন্ট হিসেবে– এর কি সত্যিই কোন সারবত্তা রয়েছে? এই প্রশ্ন ওঠাটাও কিন্তু খুবই স্বাভাবিক। মুজিব বাহিনীর ইতিহাস, এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ড. আফতাব আমার চেয়ে বেশি জানেন এবং এই প্রক্রিয়াটি অবলোকন করার সুযোগ তাঁর হয়েছিলো। কাজেই আমি মনে করি, তিনি তা এখন পাঠকের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন।

www.pathagar.com

আফতাব আহমাদ :

মুজিব বাহিনী নামে কোন বাহিনী গঠন করবে এমন কোন পরিকল্পনাই আজ যারা মুজিব বাহিনীর নেতা বলে দাবী করছেন, তাঁদের ছিলো না। এই বাহিনীর নামকরণ মুজিব বাহিনী করেছিলেন ভারতের একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনালে– সুজন সিং ওবান। ওবান সাহেবের তত্ত্বাবধানে আওয়ামী পন্থী ছাত্র-যুবক, শ্রমিক-কৃষক, যাঁরা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনের সদস্য ছিলেন, তাঁদেরকে নিয়েই গঠন করা হয় এই মুজিব বাহিনী। বস্তুত গোড়াতে এই বাহিনীর নাম ছিলো বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট। আমার ভাবতে খুব অবাক লাগছে, ৩১ মার্চ মুজিব বাহিনীর মত বিনিময় সভা করার আগে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে উদ্যাক্তারা বলেছেন, যে, এর আদি নাম ছিলো বাংলাদেশ লিবারশন ফোর্স। এটি তথ্যের বিকৃতি মাত্র। বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স নামে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিলো না। আসলে এই নামকরণেরও একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্তানের সময়ে আমরা যখন 'শ্রমিক কৃষক অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' এ ধরনের লড়াকু স্লোগানগুলো দিতাম, তখন ছাত্রলীগের মধ্যে যাঁরা র‍্যাডিক্যাল ছিলেন এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি যাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সে সময়ে যাঁরা মার্কসবাদ, লেনিনবাদকে অনুশীলনের ওপর জোর দিতেন তাঁরা অনেকটা রোমান্টিক কায়দায় ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ভিয়েতনামের ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট এনএল এফ'র আদলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করার চিন্তা-ভাবনা করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'জন ছিলেন– বাংলাদেশের পতাকার অন্যতম রূপকার, শহীদ হয়েছেন ২৬ মার্চ, দর্শনের ছাত্র চিশতী শাহ হেলালুর রহমান, জগন্নাথ কলেজের বীর মুক্তিযোদ্ধা গজারিয়ায় যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, নজরুল ইসলাম। এখনও যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের মধ্যে এখন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল করেন– আ ফ ম মাহবুবুল হক, সুদূর মধ্যপ্রাচ্যে আছেন রায়হান ফেরদেউস মধু, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় আছেন বদিউল আলম, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত আছেন একরামুল হক, রেজাউল হক মুশতাক, লিটল কমরেড রফিকুল ইসলাম, মহিউদ্দিন আহমদ বুলবুল এবং আমি ও আমার মত আরো অনেকে, যাঁদের কেউ কেউ সরকারী চাকুরীতে আছেন, তাঁদের নাম উল্লেখ না করাটাই সমীচীন। আমরা অনেকটা রোমান্টিকভাবেই বলতাম বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট-বিএলএফ। এবং ১৯৬৯-এর পর ঢাকার বিভিন্ন দেয়ালে বিএলএফে যোগ দিন–এ ধরনের চিকা মারা হত। এটা তখন খুব একটা গুরুত্ব লাভ করেনি। ২৬ মার্চের পর ২৭ মার্চ যখন ঢাকা থেকে কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়, তখন কেরানীগঞ্জের দিকে আমরা যখন সমবেত হলাম– একদিকে আমরা দেখলাম সিরাজুল আলম খান ছুটাছুটি করছেন, আরেকদিকে আব্দুর রাজ্জাক ছুটাছুটি করছেন। আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এতো ছুটাছুটি করছেন কেন, তখন উত্তরে তাঁরা বললেন, লীডার একটা জায়গায় থাকার কথা, আছেন কিনা খুঁজে দেখছি। 'লীডার' বলতে এখানে শেখ মুজিবুর রহমানকেই বোঝানো হয়েছে। আব্দুর রাজ্জাক আজকে যে গল্প বলছেন বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সেটি ২৭ মার্চ, ১৯৭১-এ তাঁর বর্ণিত 'লীডার' কে খুঁজছি– তাঁর নির্দিষ্ট একটি স্থানে থাকার কথা– সেই বক্তব্যের সাথে মেলে না। ইতিহাস বিকৃতি কোনটি– সেটি আজকে আমাদের সবারই প্রশ্ন। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখলাম কলিকাতার একদিকে কিড স্ট্রীটে পশ্চিমবঙ্গের এম এল এ হোস্টেলে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিরা আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যদিকে সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক হঠাৎ হঠাৎ কিড স্ট্রীটে এসে হাজির হতেন– খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেলো, তাঁদের অধিকাংশ সময় ব্যয় হতো ভবানীপুরে। ভবানীপুরের ২৬ নম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদ সড়কে অবস্থিত চিত্তরঞ্জন সুতারের বাসভবন। যাঁর ভারতীয় পাসপোর্টে নাম হচ্ছে ভুজঙ্গ ভূষণ রায়।

www.pathagar.com

ঘটনাচক্রে ৩১ মার্চে মতবিনিময় সভায় আব্দুর রাজ্জাক চিত্তরঞ্জন সুতারের নাম উল্লেখ করেছেন। এই চিত্তরঞ্জন সুতার সম্পর্কে এখানে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন। তাঁর আদি নিবাস বৃহত্তর বরিশাল। তিনি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপনা সভার সদস্য ছিলেন পঞ্চাশের দশকে এবং প্রথম আতাউর রহমান-মন্ত্রিসভার পতনের পেছনে যে দু'চারজন ব্যক্তি দায়ী ছিলেন, তাঁদের একজন হচ্ছেন তিনি যিনি তখন শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের প্রতিনিধিত্ব করতেন। অপারেশন ক্লোজ ডোর চালাতে গিয়ে আতাউর রহমান যখন চোরাকারবারের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযানকে সমর্থন করলেন, তখন শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। এই চিত্তরঞ্জন সুতার পরবর্তী পর্যায়ে পররাষ্ট্রনীতি প্রশ্নে মওলানা ভাসানী যখন আওয়ালী লীগ ছেড়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন– তাতে যোগদান করেছিলেন। আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলো যখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তখন অন্যান্য সব দলের সঙ্গে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৪-তে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এরপর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ অন্যান্য দলগুলোও পুনরুজ্জীবিত হয়। চিত্তরঞ্জন সুতার নতুন করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করলেন না। তিনি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার কালিদাস বৈদ্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঢাকার ফরাশগঞ্জে ফলক ঝুলিয়ে একটি সংগঠনের জন্ম দিলেন, যে সংগঠনটির নাম গণমুক্তি দল। ১৯৬৪'র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময়ে তিনি ভারতের কলকাতায় চলে যান। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯-এ কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর নানা জায়গায় তখন তাঁকে গণসম্বর্ধনা দেয়া হচ্ছিল– এমনি একটি গণসংবর্ধনা ওয়ারীতে অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তরঞ্জন সুতার সদলবলে সেখানে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং গণমুক্তি দলের বিলুপ্তি ঘটান। এরপর চিত্তরঞ্জন সুতারকে লোকারণ্যে, জনসমক্ষে আর দেখা যায়নি। চিত্তরঞ্জন সুতার সম্পর্কে যতদুর তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি– তিনি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একজন ব্যক্তি। বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হওয়ার বহু আগেই তিনি কলকাতায় অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল নিঃসন্দেহে। হয়তো গোপন কিছু রাজনৈতিক বোঝাপড়াও ছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সুতারের মাধ্যমে তিনি আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন ভারতের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য এবং প্রশিক্ষণের–এর কোন সত্যতা নেই? তার কারণ হল, আমরা লক্ষ্য করেছি, শেখ মুজিবুর রহমান নিঃশর্তে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানী আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন সুতার যখন বিএলএফের তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সাথে কথাবার্তা বলতেন– প্রচণ্ড রকমের উষ্মা প্রকাশ করতেন যে, মুজিব এটা কী করলেন? আওয়ামী লীগের ভেতর নানা ধরনের গ্রুপিং ছিল এবং সেই গ্রুপিংয়ের প্রতিফলন ছাত্রলীগের মধ্যেও ছিল। ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগের এই গ্রুপিংয়ের দুই প্রধান পুরুষ ছিলেন সিরাজুল আলম খান এবং শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি। এঁরা তাজউদ্দীন যখন সরকার গঠন করে ফেললেন তখন হতাশায় ভুগছিলেন। চিত্তরঞ্জন সুতারের সাথে এঁরা সকলে একত্রিত হলেন এবং তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, আওয়ামী লীগ ও তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছে এই সরকার বৈধ সরকার নয় এবং এই সরকারকে ঢাকার ক্ষমতা গ্রহণ করতে দেয়া যায় না। বস্তুত, যে বিএলএফ পরবর্তী পর্যায়ে 'মুজিব বাহিনী' নামে পরিচিতি লাভ করেছে, তার জন্ম হয়েছে আওয়ামী লীগের মুজিব অনুসারীদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে সরিয়ে আওয়ামী ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে যে তরুণ নেতৃত্ব ছিল তাদেরকে ক্ষমতায় বসানোর লক্ষ্যে এবং চিত্তরঞ্জন সুতার ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করে শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক—এদের বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। যার ফলে পরবর্তী পর্যায়ে শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান যাঁদেরকে

www.pathagar.com

নিজেদের লোক বলে সার্টিফাই করবেন, তাঁদেরকে পৃথক সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রশিক্ষণ দেয়ার সময়েও লক্ষ্য করা গেছে যে, দুই ক্যাটাগরিকে বেছে নেয়া হয়। এক ক্যাটাগরি হচ্ছে- যাঁরা এদের ইনার ক্লিকের সাথে ওতপ্রোতোভাবে যুক্ত ছিলেন এবং এদের প্রতি যারা লয়ালিস্ট- তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় দেরাদুনের কাছে চাকরারতার থাণ্ডুয়ায়। আর যারা ইনার কোটারিতে বিলং করতো না, যারা কোটারির প্রতি প্রশ্নতীতভাবে সরাসরি লয়ালিস্ট হিসেবে গণ্য হতো না, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় মেঘালয়ের হাফলঙ্গে। এর মধ্যে আবার শেখ মনির উপদলীয় গোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা এরকরকম ছিল, সিরাজুল আলম খানের উপদলীয় গোষ্ঠীর ধ্যান-ধারনা আরেকরকম ছিল। সিরাজুল আলম খানের অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের কথা বলতো, কিন্তু কৌশলগতভাবে তারা ভারতীয়রা যাতে টের না পায় সেজন্য সমাজতন্ত্রের কথা প্রকাশ্যে বেশি বলত না। অন্যদিকে ভারতীয় প্রশিক্ষকরা এদেরকে এই মোটিভেশন দিত- তোমরা হলে মুজিবের সরাসরি অনুসারী এবং তাঁর সত্যিকার আদর্শের পতাকাবাহী। তোমাদের কাজ হচ্ছে মুজিবের আদর্শ এবং বাংলাদেশের লক্ষ্যের বিরুদ্ধে যারা রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছে, তাদেরকে নির্মূল করা, প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রধানত চিহ্নিত করা হয় চীনপন্থী বিভিন্ন কমিউনিস্ট সংগঠন ও তার কর্মীদেরকে। মোটিভেশন ক্লাসে এরকমও বলা হত যে, একজন রাজাকারকে যদি তোমরা ধর, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তাকে নানাভাবে প্রশ্নবানে জর্জরিত করবে। বারবার করবে এরকম। এতেও যদি কাজ না হয়, প্রয়োজনে কিছু শারীরিক নির্যাতনও করবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে যত পার তথ্য সংগ্রহ করে তার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা কাবে। জিজ্ঞাসাবাদ ও শারীরিক নির্যাতনের পরে এদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে। আর যদি একজন কমিউনিস্টকে ধরো সাথে সাথে তার প্রাণ সংহার করবে। এই ছিলো পলিটিক্যাল মোটিভেশন। অতএব, বোঝা যায় মুজিব বাহিনী বা বিএলএফকে ভারতীয়রা সামরিক প্রশিক্ষণ কেন দিয়েছিলো, কী উদ্দেশ্যে দিয়েছিলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ মুজিব বাহিনী গঠনের পেছনে শেখ মুজিবের কতোটুকু যোগাযোগ ছিলো এবং আজকে দীর্ঘ ২৯ বছর পর নতুন করে মুজিব বাহিনীভুক্ত সদস্যদের একত্রিত করে যে কথা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে এবং পরিকল্পনা মোতাবেকই মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিলো- এটি আসলে সত্যের অপলাপ। শেখ মুজিব নিজেও জানতেন না যে, তাঁর নামে এ রকম একটি বাহিনী তৈরি হয়েছে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ- তিনি দেশে ফিরে আসার পর ১০ জানুয়ারী (১৯৭২) রাতেই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'বলিস কী! আমার নামে বাহিনী!' তখনকার ধানমন্ডির ১৮ নম্বরের ২৬ নং বাসায় গভীর রাতে তাঁর এই বিস্ময় দেখে অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে অবাক হননি এই জন্য যে, আমাদেরকে বিশেষ করে সিরাজুল আলম খান এবং আবদুর রাজ্জাক যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি মোটিভেট করেছিলেন, সেটি হলো এই যে শেখ মুজিবর রহমান আর এদেশে কোনোদিন জীবিত ফিরে আসবেন না। মুজিবের অনুপস্থিতিতে যেহেতু রাজনৈতিক দায়িত্বটি ছাত্রলীগের র‍্যাডিক্যাল অংশকে পালন করতে হবে, সে জন্যেই মুজিবের নামের ক্যারিশমাকে ব্যবহারের লক্ষ্যে এই বাহিনীর নামকরন করা হয় মুজিব বাহিনী। আজকে সেসব কথা যখন আবার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে, তখন পত্র-পত্রিকায় আবদুর রাজ্জাক নতুন যে বক্তব্য দিচ্ছেন তা মেলাতে পারি না। এখানে আরেকটি কথা সুস্পষ্টভাবে বলা দরকার সেটি হচ্ছে মুজিবুর রহমান এই উগ্রপন্থী, চরমপন্থী বা র‍্যাডিক্যাল বলে আওয়ামী লীগে বা ছাত্রলীগে যারা ছিলো, এদেরকে কেন প্রশ্রয় দিতেন? তিনি কি আসলে তাদের মতাদর্শকে সমর্থন করতেন? এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাবে ফজলুল কাদের কাদরীর Press and Genocide in Bangladesh গ্রন্থে। তেহরানের একটি বিখ্যাত পত্রিকা 'কায়হান ইন্টারন্যাশনাল'-এর সংবাদদাতা আমির তাহেরীর একটি প্রতিবেদনে সে বক্তব্যটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আমির

www.pathagar.com

তাহেরী লিখছেন, শেখ মুজিব বলছেন যে, পাকিস্তানীরা বোঝে না কেন, ...If I listen to what the students say, the military will kill me, and if I listen to what the military says, the students will kill me-এই যে; উভয় সংকটে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন, তা থেকে বাঁচার জন্যই তিনি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। লক্ষ্য একটাই ছিলো, এই উগ্র আন্দোলনকে, অতিমাত্রায় বাঙালীপনাকে প্রেসার ট্যাকটিক্স হিসেবে ব্যবহার করে পাকিস্তানের কাছ থেকে যতদূর পলিটিক্যাল কনসেশন্স আদায় করা যায়, সেই কনসেশন্সকে ব্যবহার করার জন্য নিজের অনুকূলে তিনি সব সময় এ ধরনের র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠিকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের মতামতের প্রতি কখনো subscribe করেননি। সে কারণে আজকে মুজিব বাহিনী যখন নতুন করে সংগঠিত করার প্রশ্ন উঠছে, তখন শংকিত হতে হয়। কেননা, তৎকালীন মুজিববাহিনীর বহু সদস্য বীরত্বের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, একথা সত্য, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, দখলদার বাহিনীর চেয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল করাটাও তাদের অন্যতম কার্যক্রম ছিলো।

মাহবুব উল্লাহ :

শেখ মুজিবুর রহমানের যে উভয় সংকটের কথা উল্লেখ করা হলো, বিশেষ করে স্বাধীনতার ব্যাপারে, তার পক্ষে অনেক সাক্ষ্য আমরা পাই। ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১-এ জেনারেল ইয়াহিয়া খান আহূত পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর এবং সামরিক আইন প্রশাসকদের এক সভায় জেনারেল হামিদ, জেনারেল পীরজাদা এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই সম্পর্কে লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান যে বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি বলছেন ঃ .....We were asked to inform Mujib on 28 February about the postponement. On 28 February Ahsan, myself and Farman, met Mujib who was accompanied by Tajuddin, in the Governor House. Mujib was perturbed when told about the postponement. He asked Tajuddin to go out and then said that he would be in serious trouble with his extremists. He pleaded that if postponement was inevitable, a fresh date may be announced simultaniously. We promised to convey his views to the President and did this in a series of signals, urging postponement to a definite date and again warned Rawalpindi of the serious consequences if this was not done. I and Ashan franatically tried to contact the president and communicated our views in the strongest terms to Peerzada and General Hamid. (Source : Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan-The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism.* P. 141, UPL, 1994) এখানে উল্লেখ্য যে, তাজউদ্দীন সাহেবকে বাইরে পাঠিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান জেনারেল সাহেবজাদাকে বলছেন, তিনি আওয়ামী লীগের চরমপন্থীদের দ্বারা মারাত্মক চাপে পড়বেন– যদি সংসদ অধিবেশনের তারিখ আবার ঘোষণা না করা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান তাজউদ্দীনকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না, কারণ তিনি তাজউদ্দীনকে বাইরে চলে যেতে বলেছেন। তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে মুজিব বাহিনীর যে একটা বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো, সে সম্পর্কে তাজউদ্দীন আহমদের তৎকালীন ব্যক্তিগত সচিব মঈদুল হাসান তাঁর *মূলধারা ৭১* গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'এই অবস্থায় মুজিববাহিনীর নেতৃত্বের একাংশের পক্ষে অধীর

www.pathagar.com

হয়ে পড়া অস্বাভাবিক ছিলো না। কিন্তু তাদের এই অধীরতার সহিংস প্রকাশ ঘটে তাজউদ্দীনের প্রাণনাশের অসফল প্রয়াসের মধ্যদিয়ে'। জনাব মঈদুল হাসান আরও লিখেছেন ঃ "...দিল্লীতে তাজউদ্দীন সৈয়দ নজরুলের উপস্থিতিতে প্রথমবারের মতো ইন্দিরা গান্ধীর কাছে 'র'-এর সমর্থনের ফলে মুজিব বাহিনী যে নানা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে চলেছে, তার উল্লেখ করেন। ইন্দিরা এই অবস্থার ত্বরিৎ প্রতিবিধানের জন্য সভায় উপস্থিত ডি পি ধরকে নির্দেশ দেন। ডি পি ধর মুজিব বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করার জন্য জেনারেল বি এন সরকারকে নিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে যথাশীঘ্র কলিকাতায় এক বৈঠকেরও আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তাজউদ্দীন ও কর্নেল ওসমানী, মুজিব বাহিনীর পক্ষে তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক (আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও শেখ মনি অনুপস্থিত থাকেন) এবং ভারতের সামরিক বাহিনীর পক্ষে মেজর জেনারেল সরকার ও ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার এক পর্বে একজন যুবনেতা দাবী করেন, আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলার অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে। এরপর আলোচনা আর এগুতে পারেনি। পরে বি এন সরকার কেবল যুবনেতাদের নিয়ে আলোচনার জন্য ফোর্ট উইলিয়ামে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করেন। কিন্তু সেখানে আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলার একমাত্র অধিকারী সেই যুবনেতা ছাড়া আর কেউই হাজির হননি। কয়েকদিন বাদে যেহেতু যুবনেতাদের সকলে আগরতলায় উপস্থিত থাকবেন, সেহেতু সেখানে তাদের সাথে বিএ ন সরকারের পরবর্তী বৈঠকের সময় স্থির করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে মুজিববাহিনীর সকল নেতা একযোগে অনুপস্থিত থাকেন, মেজর জেনারেল সরকারও এই পণ্ডশ্রম বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য জরুরী কাজে মনোনিবেশ করেন"। এই বক্তব্য থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে,মুজিববাহিনীর নেতৃত্ব অত্যন্ত শক্তির ছিল; তারা সরাসরি বাংলাদেশের সরকারের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল এবং ইন্দিরা গান্ধীর লোক দেখানো যে প্রয়াস অন্তরে তিনি তা কতটা বিশ্বাস করতেন, সেটা মুজিববাহিনীর নেতৃত্বের অসহযোগিতার মধ্যদিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, আজ যাঁরা দেশের ক্ষমতায় আছেন, তাঁদের সাথে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কী ধরনের গভীর ষড়যন্ত্র সেদিন চলছিলো। এখন আমার প্রশ্ন, এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ যারা একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগসাজশ গড়ে তোলে তাদের সেই যোগসাজশ বিলুপ্ত হয়েছে কি?

আফতাব আহমাদ :

অনেকের ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ আমার মনে হয় এখনও অব্যাহত আছে। আমার এখনও মনে পড়ে, আমরা যখন মৌলিক এই প্রশ্নটি ১৯৭১-এ তুলেছিলাম যে, ভারতীয়দের কাছ থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা ভারতীয়দের সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্যবাদী উদ্দেশ্যের শিকার না হয়ে পড়ি– তখন আমাদের সেই তরুণ বয়সে আমাদেরকে বিশেষ করে সিরাজুল আলম খান এবং আবদুর রাজ্জাক বলতেন যে, কিউবার ক্যাস্ট্রোর সৈন্যদেরও তো স্প্যানিশ General Bayo প্রশিক্ষণ দিয়েছিলে তাই বলে কি তারা স্প্যানিশ আর্মির মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল? আমরা একটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করছি মাত্র। আমরা তো আমাদের মূল লক্ষ্য 'শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ'-এর জন্যই কাজ করে যাব পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেছে, মুজিববাহিনী ছিল বাংলাদেশ সরকারের একটি সমান্তরাল শক্তি। কোনো অবস্থাতেই মুজিব বাহিনী তাজউদ্দীন সরকারকে বৈধ, স্বীকৃত, আইনানুগ সরকার হিসেবে মানতে চায়নি। লক্ষ্য করার বিষয় যে, মুজিব বাহিনীর মূল নেতারা ১৯৭২-এর জানুয়ারী মাসে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে সংবাদ সম্মেলন করলেন। বিশেষ করে আজকের পশু ও মৎস্য বিষয়ক মন্ত্রী আ স ম আবদুর রব পল্টনের জনসভায় তার স্বরে ঘোষণা করলেন যে, 'কোন অবস্থাতেই আমরা আমাদের অস্ত্র সমর্পণ করব না। কারণ, আমরা মুজিববাহিনীর

www.pathagar.com

সদস্য, মুজিবের নামে অস্ত্র ধরেছি। অস্ত্র যদি সমর্পণ করতেই হয়, মুজিবের নির্দেশে তাঁর কাছেই করব'। এ থেকে স্পষ্ট যে, তখনও মুজিব বাহিনীর শীর্ষ নেতাদের ধারণা ছিল যে, শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত জীবিত বাংলাদেশে ফেরত আসবেন না এবং পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয়, তাহলে তাজউদ্দীনের সরকারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি নতুন পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করবে। বলা বাহুল্য যে, মুজিববাহিনীকে শুধু ভারতীয়রা যে প্রশিক্ষণ দিয়েছে তা-ই নয়, এই গোটা প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW, যেটি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল। শুধু তা-ই নয়, মুজিববাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিভিন্ন সেক্টরের ইনডাকশন পয়েন্টে যখন বাংলাদেশের ভেতরে প্রেরণ করা হত, ভারতীয় বিভিন্ন এলাকা পার হওয়ার সময় যে সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করতে হত, সে শব্দটি ছিল RAW। এই শব্দটি বললেই মুজিববাহিনীর ছেলেদের ফ্রি প্যাসেজ দেয়া হত। কোন ধরনের প্রশ্ন করা হত না, বাধা দেয়া হত না। বাংলাদেশ-উত্তরকালে আমরা লক্ষ্য করেছি, ভারতীয় নাগরিক ভুজঙ্গ ভূষণ রায় যিনি বাংলাদেশের পাসপোর্টে চিত্তরঞ্জন সুতার, তিনি ১৯৭৩-এ বরিশালের একটি আসন থেকে আওয়ামী লীগের টিকেটে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি কিন্তু বাংলাদেশে বসবাস করতেন না। তিনি কলকাতাতেই থাকতেন। জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকা হলে তিনি দু-তিন দিনের জন্য বিমানে করে বাংলাদেশে আসতেন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, আওয়ামী লীগ, মণি সিংয়ের কমিউনিস্ট পার্টি, 'গণকণ্ঠ' ও 'বাংলার বাণী' কার্যালয়সহ আরও বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে শীর্ষনেতাদের সাথে কথাবার্তা বলে ফরাশগঞ্জের বাড়ীতে গিয়ে সময় কাটাতেন। অধিবেশনের প্রথম দিনে যোগদান করে তিনদিন পরে তিনি যথারীতি আবার কলকাতায় ফিরে যেতেন। অতএব বোঝাই যায় তাঁর ভূমিকাটি কী ছিল এবং সে জন্য লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, ১৫ আগস্ট (১৯৭৫) যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল ঘটে, তখন সরকার প্রথম যে কাজটি করেছিল, সেটি ছিল চিত্তরঞ্জন সুতারের পাসপোর্টটি বাজেয়াপ্ত করা। এ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষ করে RAW কত গভীরভাবে জড়িত। এই চিত্তরঞ্জন সুতার বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারকে বিব্রত করার জন্য যে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে তার নাম হচ্ছে পার্থ সামন্ত। তিনি স্বাধীন বঙ্গভূমির রাষ্ট্রপতি হিসেবে এই নাম ধারণ করে 'বঙ্গভূমি আন্দোলন' এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্গভূমি আন্দোলনের পেছনেও RAW-এর পরিকল্পনা, প্রণোদনা এবং উৎসাহ কাজ করছে।

আজকে নতুন করে সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুজিব বাহিনীর সদস্যরা যারা আওয়ামী লীগের আদি রাজনীতি বা আওয়ামী লীগের পেট চিরে জন্মলাভ করা জাসদ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে হয়ত ব্যক্তিগতজীবন যাপন করছেন, কিন্তু একটা নস্টালজিয়া হয়ত কাজ করে যে, মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা একটা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন, এদের সকলকে আবার একত্রিত করার লক্ষ্য একটাই-ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতাকে সুষ্ঠুভাবে কো-অর্ডিনেট করে তাকে একটি নতুন রাজনৈতিক মুখোশ দেয়া। এ সম্পর্কে তাই আমাদের সকলকে আজ হুঁশিয়ার ও সাবধান হতে হবে। সবচেয়ে আনন্দ ও উৎসাহের বিষয় হচ্ছে, মুজিব বাহিনীর বহু সদস্য এই হীন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বোধ হয় ইতোমধ্যেই সজাগ হয়ে পড়েছেন। খোদ ৩১ মার্চের মতবিনিময় সভাকে কেন্দ্র করে যে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে গেছে, যা সচেতন আওয়ামীপন্থী পত্রপত্রিকাগুলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে: কিন্তু একটি পত্রিকা বিশেষ করে 'আজকের কাগজ' ১ এপ্রিল এ সংক্রান্ত যে রিপোর্ট করেছে তাতে বলা হয় যে, এই সভায় আগত মুজিব বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ কাজ করেছে। তাঁরা সেখানে লক্ষ্য করেছেন, মুজিব বাহিনীর সাথে সংশ্রব ছিল না– সেই আমির হোসেন আমু

www.pathagar.com

সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। মতবিনিময়ের নামে সেখানে সরকারের বাছাই করা নেতারা একেরে পর এক মঞ্চে উঠে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু অন্য সদস্যদের বক্তব্য দেয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। তাদের সামনে প্রলোভনের একটি মুলো ঝোলানো হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যে মহাসমাবেশটি হবে তাতে প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে নতুন সনদ দেবেন। শুনেছি, ঐ মতবিনিময় সভায় এমন এমন লোকজনও গিয়ে হাজির হয়েছে, যাদের অনেকের জন্মও হয়নি ১৯৭১-এ। অনেকের জন্ম হলেও বয়সে তারা তখন এত কনিষ্ঠ ছিল যে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, সাধারণ একটি হাতিয়ার তুলে ধরতেও তারা সক্ষম ছিল না। অতএব আরেকটি ভুয়া বিএলএফ যে তৈরী হবে, যেমন ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা অনেক তৈরী হয়েছে ১৬ ডিসেম্বরের পরে তা বলাই বাহুল্য। এই সবকিছুর উদ্দেশ্যে একটিই– বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তোলা এবং জাতিগত দিকদিয়ে বাংলাদেশকে চিরস্থায়ী ভাবে বিভক্ত করে রাখা। আজকে নতুন করে বলতে হয়, মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ চলাকালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এই খবরটি জানার পর ডি পি ধরের শরণাপন্ন হয় এবং এ নিয়ে বেশ উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছিল সেদিন। যার শেষ ফয়সালায় ডি পি ধর তাদের আশ্বস্ত করলেন এই বলে, 'তোমাদের তরুণদেরও একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে'। সেই সমঝোতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বেশকিছু তরুণকে কেরালাসহ কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বিভিন্ন সরকারের তত্ত্বাবধানে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এক কথায় বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারত একটি সুসংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য একটি কার্যক্ষম মুক্তিবাহিনী যাতে গড়ে না ওঠে, সেদিকে অত্যন্ত যত্নবান ছিল। নানাভাবে রাজনৈতিক গুটি চালনা করে, নানাজনকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র শক্তিকে নানাদিকে বিভক্ত করে রেখে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। আজকে সেই একই যজ্ঞ , একই আয়োজন আমরা আবার লক্ষ্য করছি। এ সম্পর্কে এখনই যদি আমরা হুঁশিয়ার না হই, সতর্ক না হই, তাহলে না জানি ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের জন্য আরও কত অশুভ অপেক্ষা করছে।

মাহবুব উল্লাহ :

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে বেশকিছু অপরিচিত মুখ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাড়ায়-পাড়ায় তারা বাড়ী ভাড়া নিয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যবসা-সংগঠনের নামে তারা এখানে নানা ধরনের কুট চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। জনমনে গভীর সন্দেহ, এরা হচ্ছে সেই RAW-এর এজেন্ট, যারা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য নানা তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। আজকে নতুন করে চিত্তরঞ্জন সুতারের কথা বলা হচ্ছে, যে চিত্তরঞ্জন সুতার স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের হোতা এবং ষড়যন্ত্রকারী। জাতিকে অবশ্যই এসব কথা ভাবতে হবে। ভাবতে হবে, মুজিব বাহিনী পুনরুজ্জীবিত করার নামে নতুন করে RAW-এর পুরানো এজেন্টদেরকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে কিনা? এ ব্যাপারে তোফায়েল আহমদ, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জনগণের উদ্দেশ্যে কি ব্যাখ্যা দেবেন?

www.pathagar.com

২২ এপ্রিল ২০০০

সমাজের সুস্থতা ও সুস্থ মানুষের সমাজ

মাহবুব উল্লাহ :

আইরিশ লেখক এবং রাষ্ট্রনায়ক Conor Cruise O'Brien ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সময়কালে জার্মানী রাষ্ট্র হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন– সমগ্র জার্মান জনগোষ্ঠী একটা নার্ভাস ব্রেক ডাউনে ভুগছে। এই নার্ভাস ব্রেক ডাউন থেকেই জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যেটাকে বলা হয় 'হলোকস্ট' (ব্যাপক মানব নিধন) অর্থাৎ ইহুদী নিধন এবং জার্মানীতে এক তীব্র জাত্যাভিমানী মানসিকতার সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার মূল কথা ছিল 'জার্মানরা' জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি এবং জার্মানীর প্রতি ঐতিহাসিকভাবে যেসব অবমাননা করা হয়েছে, তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। O'Brien-এর এই নার্ভাস ব্রেক ডাউনের তত্ত্বটি জার্মানীর ক্ষেত্রে যেভাবে প্রযোজ্য, সেটি অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। একটি জাতির নার্ভাস ব্রেক ডাউন কখন ঘটে? সম্মিলিতভাবে একটি জাতির সমগ্র জনগোষ্ঠীর নার্ভাস ব্রেক ডাউনের সৃষ্টি হতে পারে অর্থনৈতিক মন্দা, ক্ষুধা-দারিদ্র, বেকারত্ব, শিল্পে অনগ্রসরতা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির বন্ধ্যাত্ব থেকে।

বর্তমান বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে, এখানে সমগ্র দেশবাসীর নার্ভাস ব্রেক ডাউনের একটা পরিবেশ বিরাজ করছে। প্রতিদিন সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় যেসব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য তুলে ধরা হয়, তা রীতিমত লোমহর্ষক। এ ছাড়া প্রতিনিয়ত খুন-খারাবী, ছিনতাই, রাজনৈতিক দাঙ্গা, নানা ধরনের সংঘাত, বিক্ষোভ ইত্যাদিতো লেগেই আছে। কোনও নাগরিক রাজপথে বেরিয়ে একথা ভাবতে পারে না যে, তার পক্ষে নিরাপদে ঘরে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে। ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রেখে সেই টাকা নিরাপদে থাকবে, সেটা কোনও নাগরিকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। স্কুলে বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। এমনকি কারাগারে, যেখানে বলা হয় একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা কারাকর্তৃপক্ষের নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব, সেখানেও জীবনের নিরাপত্তা নেই। পুলিশের হেফাজতে অনেক বন্দীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এবং এদের অনেকেই নিরাপরাধ। বাংলাদেশের কোন মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। এর ফলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের নার্ভাস ব্রেক ডাউনের সৃষ্টি হয়েছে। যার প্রতিফলন আমাদের রাজনীতিতেও ঘটছে। রাজনীতিতে নার্ভাস ব্রেক ডাউনের বড় লক্ষণ হচ্ছে এই যে, অনেক ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক কর্মসূচীতে জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছে না। এই না চাওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণটি হচ্ছে, এই সমস্ত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করলে তার জানমালের নিরাপত্তা কতটুকু বজায় থাকবে, সেই প্রশ্ন। আমরা লক্ষ্য করেছি, যখন দেশের প্রধান বিরোধী দলগুলো সম্মিলিতভাবে একটি শান্তি মিছিল বের করেছিল, তখন বিনা উস্কানিতে সেই মিছিলের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল। মিছিলের মূল নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও তখন নিরাপদ ছিলেন না। অথচ এরকম একটি ঘটনা ব্রিটিশ বা পাকিস্তান আমলেও আমরা কল্পনা করতে পারতাম না। রাজনীতিতে এ ধরনের অসহিষ্ণুতা এবং অগণতান্ত্রিক আচরণ মানুষের মধ্যে নাভিশ্বাসের সূচনা করেছে। এছাড়া আজকে নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে,

www.pathagar.com

তার ফলে কোন মানুষ তার নিজ গৃহেও নিজেকে নিরাপদ মনে করেন না। চুরি, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড এখন নিজ গৃহেও যে কোন সময়ে ঘটতে পারে। এটাই আজ সকলের আশঙ্কা। এ রকম একটি পরিবেশে একটি জাতি অগ্রগতির মুখ দেখাতো দূরের কথা বরং সেই জাতির পক্ষে অন্ধকারের অতল গহবরে তলিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রশ্ন হলো, আমাদের সমাজে এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পেছনে আমরা নিজেরা কতটা দায়ী এবং যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে সেই আন্তর্জাতিক পরিবেশ কতটা দায়ী। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে, বাংলাদেশ একটা মারাত্মক ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে চলেছে। বাংলাদেশে বহু শিল্প-কারখানা আজ বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা বন্ধ হয়ে যওয়ার উপক্রম হয়েছে। এর পেছনে যে মূল কারণটি কাজ করছে, সেটি হচ্ছে ১৯৮০'র দশক থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানোর জন্য হাতে নেয়া সংস্কার পরিকল্পনা। এই সংস্কার মূলত আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত বিশ্বায়নের নীতি এবং বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলোর ওপর অর্থনৈতিক মোড়লদের চাপিয়ে দেয়া নীতিরই পরিণতি। সীমান্ত উন্মুক্ত হয়ে অবাধ চোরাচালানের ফলে আমাদের শিল্প কারখানাগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে উঠতে পারছে না ও বাজার হারাচ্ছে এবং সেই বাজার প্রতিবেশী রাষ্ট্র দখল করছে। এর ফলে বহু শ্রমিক তার কর্মস্থল থেকে বিচ্যুত হচ্ছে এবং বেকার হয়ে পড়ছে। এছাড়া বাংলাদেশের পরিবেশেও বিরাট ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বিশেষ করে ফারাক্কা বাঁধের ফলে বাংলাদেশের নদীগুলো তার নাব্যতা হারাচ্ছে। বাংলাদেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। লবণাক্ততার সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। সুপেয় পানির অভাবে ও আর্সেনিক দূষণের ফলে নিরাপদ পানির সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ফলে মানুষ স্বাভাবিক জীবন ধারনের সূত্রগুলো থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ছে। দেশের কৃষি সংকটের মুখে পড়েছে। মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। সারাদেশে পরিবেশগত বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। জীবন অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য বাধ্য হচ্ছে একাধিক পেশা গ্রহণ করতে। যারা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সরকারী অফিসে চাকরি করেন তাদের অনেকেই বিকেল থেকে আবার ছোট-খাটো দোকান চালানো বা টিউশনী বা টাইপ রাইটিং ধরনের কাজকর্ম করে জোড়াতালি দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যে পরিস্থিতি সেটাও জাতির নার্ভাস ব্রেকডাউনের একটা অন্যতম কারণ। উচ্চশিক্ষার জন্য যেভাবে বিরাট চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিমাণে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং সুযোগ বাড়েনি। ফলে ভর্তি মৌসুমে প্রতিটি অভিভাবককে ভীষণ উদ্বিগ্ন থাকতে দেখা যায়। প্রতিটি অভিভাবক তার সন্তানের ভর্তির জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠানে চেষ্টা ও তদবির চালিয়ে যান এবং অনেককেই নিরাশ হতে হয়।

সড়কপথে বহু যানবাহন ডাকাতির শিকার হয়। ছদ্মবেশে ডাকাতরা যানবাহনে আরোহণ করে যাত্রীদের সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে। হাসপাতালে গেলে চিকিৎসা পাওয়া যায় না। এমনকি সমাজে যারা একটু মান-মর্যাদার অধিকারী, যাদের সামাজিক পরিচয় আছে তারাও হাসপাতালে যথাযথ চিকিৎসা পান না। ডাক্তাররা রোগীদের প্রতি যথার্থ যত্নবান হন না। সারাদেশে গড়ে ওঠা প্যাথলজিকাল ক্লিনিকগুলো বিপুল অংকের ফী নেয়ার পরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের রিপোর্টগুলো বিদেশী কোন উন্নতমানের প্রতিষ্ঠানের কাছে গ্রহণযোগ্য থাকে না। ফলে অনেক রোগীর পক্ষে বিদেশে যাওয়া সম্ভব হয় না। এসব রিপোর্টের ভিত্তিতে যে চিকিৎসা হয় তাতে জটিলতা বাড়ে। বাংলাদেশের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য মোটেই ভালো নয় এবং পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, বাংলাদেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা উদ্বেগজনক। আমরা ওষুধের দোকানগুলোতে একটা জরিপ চালালে হয়তো লক্ষ করবো, যারা অনিদ্রা-দুশ্চিন্তা বা নানা দরনের মানসিক বিপর্যয়ে ভোগেন, তাদের নিরাময়ের জন্য ব্যবহার্য ওষুধের বিক্রয় খুব বেড়ে গেছে। এসব ঘটনাকে একত্র করে দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে, এসব নার্ভাস ব্রেকডাউনেরই কারণ অথবা ফলাফল।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার যেসব নীতি গ্রহণ করেছে তার অন্যতম একটি কৌশল হচ্ছে বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের প্রেরণ করা। বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশে যারা যান তারা যে যাতনা ও বিড়ম্বনা ভোগ করেন তার কোন তুলনা হয় না। অনেক শ্রমজীবী মানুষ দালালের হাতে পড়ে তাদের সর্বস্ব হারান। জমি, ভিটেমাটি বিক্রি করে যারা ভাগ্যান্বেষণে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে ল্যাটিন আমেরিকার মত দেশগুলোতে গিয়ে তারা দেখতে পায় যে ভূয়া আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে এসব দেশে পাঠান হয়েছে। এর পরিণতিতে তারা অনেকেই কারাভোগ করে থাকে। এ ধরনের ঘটনা ভুক্তভোগীদের জন্য কী ধরনের মানসিক বিপর্যস্ততা সৃষ্টি করতে পারে, সেটা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। আমরা প্রতিনিয়ত এ ধরনের মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছি।

আমাদের দেশের পাবলিক এগজামিনেশানগুলোতে যারা লেখাপড়া করে পরীক্ষা দিতে যায় তাদের জন্য কোন সুস্থ পরিবেশ নেই। এইতো ক'দিন আগে এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে একটি কেন্দ্রে ৬টি নিস্পাপ প্রাণ হারিয়ে গেল। চিন্তা করতেও অবাক লাগে যে, পরীক্ষার হলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং আমাদের সমাজের এই নার্ভাস ব্রেকডাউনগুলোর পেছনে মূল কারন হচ্ছে, এদেশে সত্যিকার সুশাসন বলতে যা বোঝায় তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা প্রতিনিয়ত এডভাইস দিচ্ছেন যে, আমাদের দেশের গভর্নেন্সের মানকে উন্নত করতে হবে। এই উন্নতি ঘটাতে না পারলে আমাদের পক্ষে কোনরকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে না।

এখন প্রশ্ন হল, একটি দেশের সুশাসন কিসের ওপর নির্ভর করে? সুশাসন নির্ভর করে প্রথমত, একটি সরকার কতটা আইনের শাসনের প্রতি অবিচল তার ওপর। এ ছাড়া সুশাসন নির্ভর করে সরকারের আমলাতন্ত্র কতটা দক্ষ, কতটা জনগণের সমস্যার প্রতি মনোযোগী তার ওপর। এশীয় সমাজের একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানকার গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে বাস করতে গিয়ে গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যকে গোষ্ঠীর নিয়মকানুন কিংবা এথিক্সকে অনুসরণ করতে হয়, মেনে চলতে হয়। এগুলো মানার বাধ্যবাধকতা আইনগত নয়, অনেকটা ঐতিহ্যগত ও সংস্কৃতিগত। আমাদের সমাজের এই গোষ্ঠীগত নৈতিকতা ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়ছে। একটা সময় ছিল, গ্রামে যখন কোন সমস্যা বা বিবাদ বিসংবাদ হতো, তখন গ্রামের মুরুব্বী, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মিলে সমাজের সবাইকে একত্র করে, নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করতেন। কিন্তু আজকাল লক্ষ্য করা যায় সামান্য একটি লাউ চুরির ঘটনা পর্যন্ত থানায় মামলা হিসেবে রুজু হচ্ছে এবং সেই মামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ দেদারসে ঘুষ খাচ্ছে। কৃষকরা সর্বাস্বান্ত হচ্ছে এবং এর সুবাদে পুলিশ, আইনজীবী, এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটরা দু'পয়সা কামাই করে নিচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে সুশাসন আশা করতে পারি? আমাদের সমাজে যেসব বাঁধন ছিল, যেসব নীতি নৈতিকতা ছিল সবই একের পর এক ধসে পড়ছে। একটি সমাজে বিদ্যমান নীতি নৈতিকতা হয়তো চিরন্তন নয়। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতি নৈতিকতারও কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়। আজকে যেভাবে আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন চলছে তার ফলে প্রতিনিয়ত বিজাতীয় সংস্কৃতি শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি লোকের মনমানসিকতাকে আচ্ছন্ন করছে। এর ফলে রুচিবোধ, সংস্কৃতিবোধ, শ্রেয়বোধ মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটছে এবং এই পরিবর্তন শুধু ব্যক্তিগত নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে আসছে তা নয়, এই পরিবর্তন আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করছি। রাজনীতিতে যিনি নিষ্ঠাবান, আদর্শবান, তিনি তার দলের কাছে যথার্থ মূল্য পান না। যারা অর্থবান, বিত্তবান এবং বিত্তবান হওয়ার জন্য যারা ব্যাংকের টাকা মেরে দিয়েছেন কিংবা ঋণখেলাপি, চোরাকারবারী বা অন্য কোন অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করেছে, কিংবা আমলাতান্ত্রিক জীবনে থাকার সময়ে নানা ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে প্রচুর অর্থবিত্ত করেছেন, তারাই রাজনীতিতে কদর

www.pathagar.com

পাচ্ছেন, মর্যাদা পাচ্ছেন। অথচ ত্যাগী, আদর্শবান লোকরা সেটি পাচ্ছেন না। ফলে সৎ ও নীতিনিষ্ঠ মানুষের পক্ষে রাজনীতিতে প্রবেশ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এটাও লক্ষ্য করা যায়, নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দেয়ার সময় একটি দলের কাছে সবচেয়ে বড় বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় প্রার্থীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা, আর্থিক শক্তির সাথে পেশীশক্তি। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনি তাঁর মেধা এবং মননকে কতটা ব্যবহার করতে পারবেন, কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে জনগণের সেবা করতে পারবেন, কতটা অবিচলভাবে নীতির প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবেন সেগুলো যেন আজ কোন বিবেচ্য বিষয়ই নয়। ফলে আমরা লক্ষ্য করেছি, ঔপনিবেশিক আমলে যেসব শ্রেষ্ঠ মানুষ রাজনীতিতে যোগ দিতেন, আজ সে ধরনের মানুষ নিরুৎসাহিত এবং উপেক্ষিত। সেধরনের বহু রাজনীতি মনস্ক মানুষ থাকা সত্ত্বেও কোন সৎ মানুষ রাজনীতিতে এগিয়ে আসতে উৎসাহবোধ করেন না। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রাখার চেয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সন্ত্রাসের পথকে অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয়। এর ফলে রাজনীতি একটা বিভীষিকার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। রাজনীতিও এদেশের মানুষের জন্য নার্ভাস ব্রেকডাউনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই সমস্যা অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন। এ দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসাটাও অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর জন্য যে ধরনের নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব প্রয়োজন, আজ তার প্রচণ্ড অভাব। জনগণের সামনে আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে যদি নেতৃত্ব এগিয়ে না আসে, তাহলে জনগণের মধ্যকার ক্ষোভ , হতাশা ও মানসিক যাতনাবোধ থেকে তাদের মুক্ত করা সম্ভব হবে না। এখন এই অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা কী পদক্ষেপ বিবেচনা করতে পারি, সেটা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন এবং এই কঠিন কাজটি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করা উচিত। বিশেষ করে সত্যিকার সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষের মনে নতুন করে আশার সঞ্চার এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা ও তাদের রাজনীতির মূল স্রোতে নিয়ে আসার কাজটি আমরা কিভাবে করতে পারি, সেটি খুঁজে বের করতে হবে।

আফতাব আহমাদ :

এখন বাংলাদেশের যেদিকেই তাকাই, শুধু বিপর্যয় আর ধস দেখতে পাই। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে একটি আলোকিত, মুক্ত এবং অগ্রসর সমাজে আমরা কী করে জীবনযাপন করবো, সেটি আমাদের সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য। যে ধস ও বিপর্যয়ের কথা আমরা বলছি, এটি একদিনে সৃষ্টি হয়নি, কিংবা একদিনেই এদেশের মানুষ এর শিকার হয়নি। আমাদের জাতীয় বিকাশের দীর্ঘ পরিক্রমায় বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা যেভাবে মূল্যবোধ বিসর্জিত হয়েছি, অধঃপতিত হয়েছি এবং যেভাবে দুর্নীতি ও শ্রেয়নীতিকে বিসর্জন দিয়েছি, তারই সম্মিলিত প্রভাব হচ্ছে আজকের বিপর্যস্ত জীর্ণ-শীর্ণ, হতাশাগ্রস্ত সমাজদেহ এবং সামগ্রিকভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি বা সামাজিক উন্নয়নের প্রতি মানুষের অনীহা বা 'অ্যাপেথি'। একে যদি আমরা বুঝতে চাই, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের মানস গঠন প্রক্রিয়াটিকেও আমাদের বুঝতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের জনসমাজের যে বিন্যাস, যেখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন মূল্যবোধের বিকাশ কিভাবে ঘটেছে, তার একটি বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নও করতে হবে। ১৯৪৭-এ যখন ব্রিটিশ শাসিত ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান এবং ভারত দুটি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়, তখন আমরা লক্ষ্য করেছি, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় একটি মর্মন্তুদ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা যদি শুধু পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল, আজ যে অঞ্চলকে নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত, এই অঞ্চলের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে সাদামাটা কথায় কেউ যদি বলেন যে, ১৯৪৭-এর পর প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছিল— এটি অতি সরলীকৃত একটি উক্তি বা বক্তব্য হবে মাত্র। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব সেটি শুধু সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব হিসেবে যদি আমরা দেখি,

www.pathagar.com

তাহলে মারাত্মক ভুল করবো। বাংলাদেশের কৃষক প্রজার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রশ্নে উচ্চ বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন কোন অবস্থাতেই তৎকালীন অখণ্ড বাংলাদেশের স্বার্থের কথা বলত না, স্বার্থের পক্ষে দাঁড়াত না কিংবা তারা সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানদের অনুভূতি, মন-মানস বোঝার চেষ্টা করেনি, বরং একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবধারা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা সেদিন ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসেবে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সামনে প্রতিভাত হয়েছিল এবং সেকারণেই যা কিছু ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করত বলে মনে হয়েছে, তার বিরুদ্ধেই মানুষ ক্ষেপে উঠেছিল, আঘাত হেনেছিল। এর মধ্যে প্রধান ক্যাজুয়ালটি ছিল মনুষ্যত্ব, মানবিকতা। আমরা এটা অস্বীকার করতে পারব না, যে রক্তক্ষয় সেদিন ঘটেছিল, সেটা অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত ছিল; কিন্তু একথাও তো স্বীকার করতে হবে, যারা ব্রাহ্মণবাদী শোষণের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, যারা ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রের অখণ্ডতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, তারা তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে কখনও এ কথা প্রমান করতে পারেনি যে, তারা এ দেশের মাটির সাথে সংলগ্ন, তারা এদেশের মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। এ ধরনের একটি পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটতে আমরা দেখি ঠিক একইভাবে ১৯৭১-এ। এদেশে যারা অবাংলা ভাষাভাষী, যাদেরকে সাধারণ ভাষায় বলা হয়, 'বিহারী' যদিও এরা সকলেই বিহার থেকে আসেনি, ভারতের অন্যান্য অবাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল থেকেও এসেছেন, তাদের বিরুদ্ধেও আমরা দেখেছি, এক ধরনের ভাষাভিত্তিক দাঙ্গা পরিচালিত হত। একজন দরিদ্র বিহারী, একজন স্বল্প আয়ের বেতনভুক বিহারী কিংবা একজন সাধারণ জীবিকা উপার্জনকারী বিহারী নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করার অবস্থায় ছিল না, কিংবা বাংলাদেশের দরিদ্র শ্রমিক, দরিদ্র কৃষকের সঙ্গে একজন দরিদ্র বিহারীর কোন ধরনের শ্রেণীগত পার্থক্য ছিল না, তা সত্ত্বেও আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের মানুষ বিহারীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণায় ক্ষেপে ওঠে। পরিণতিতে আমরা বিহারীদের ওপর নির্মম ও অমানবিক নির্যাতন নেমে আসতে দেখেছি। ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিহারীদেরকে আমরা দেখেছি অকাতরে প্রাণ দিতে। এ ঘটনা যেমন দুঃখজনক, মর্মান্তিক ও অমানবিক, তেমনি কোন শ্রেয় নীতিই এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে অনুমোদন করতে পারে না। তা সত্ত্বেও এটি ঘটেছে এবং এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখন পর্যন্ত এর জন্য অনুশোচনা বা অনুতাপ প্রকাশ করে না। কেন? তার কারণ হচ্ছে, দুর্ভাগ্যবশত এবং কাকতালীয়ভাবে যারা বিহারী বলে পরিচিত তারা পাকিস্তানী শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছিলেন। শাসকগোষ্ঠীর প্রক্সি হিসেবে তারা চিহ্নিত হয়েছিলেন এবং বিহারী জনগোষ্ঠী এ কথা কখনই যত্নের সঙ্গে প্রমাণ করার চেষ্টা করেনি যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে তাদের ভাগ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বরঞ্চ দেখা গেছে, এরা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী পদক্ষেপসমূহকে নানা সময়ে সমর্থন ও মদদ দিতেন। আমি প্রসঙ্গটা এই জন্য টানছি, যে অমানবিকতা, যে পৈশাচিকতার উত্থান ১৯৪৭ এবং ১৯৭১-এ ঘটতে দেখেছি, তারই একটি পরিণত রূপ হচ্ছে আজ চারদিকে যে বিপর্যয় এবং ধসের আলামত আমরা দেখতে পাচ্ছি। আসলে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে যখন গণতন্ত্র, সুরুচিবোধ, শ্রেয় নীতি অনুপস্থিত থাকে, মানবিকতা যেখানে প্রধান ক্যাজুয়ালটি হয়, সেখানে কোন অবস্থাতেই আমরা একটি সুষম সমাজ, একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, মানবিক মর্যাদা স্বীকার করে– এমন কোন বহুত্ববাদী, সহনশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ প্রত্যাশা করতে পারি না। এটি একপেশে হয়ে যেতে বাধ্য। এখানেই রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা, রাজনৈতিক কর্মসূচী, রাজনৈতিক মতাদর্শ, এ দেশের মানুষকে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার মধ্যদিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেনি। চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে, গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠা করার

www.pathagar.com

চেষ্টা করেছে। প্রতিপক্ষের সভা-সমিতি, সমাবেশ বানচাল ও ভণ্ডুল করে দিয়ে, পেশীশক্তি, বাহুশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজেদের মত ও ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। আর তাই সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক দলগুলোও অমানবিকতা, পৈশাচিকতা এবং অগণতান্ত্রিকতার শিকার হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোকে আমরা যদি এখন বস্তুনিষ্ঠতার সাথে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখব যে, তারা তাদের কর্মসূচী জনগণের মধ্যে প্রচার করার চাইতে আরোপ করার ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী। যে কারণে এদেশে আমরা কোন ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করার যে ব্যাপক আয়োজন, তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করি। একটি বিশাল গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ও বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য সকল পূর্বশর্ত বিরাজ করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোকে আমরা দেখি, ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে এক ধরনের অ্যাডহকিজমের দ্বারস্থ হতে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কিংবা অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখব– সর্বত্র ব্যক্তিবাদ এবং ব্যক্তি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কী এক দোর্দণ্ড, অকল্পনীয় প্রতিযোগিতা নিত্য অব্যাহত রয়েছে। এই প্রতিযোগিতা সুস্থতা ও স্বাভাবিকতার লক্ষণ নয়। অসুস্থ এবং ব্যাধিগ্রস্ত সমাজেরই প্রতিফলন আমরা আমাদের বিভিন্ন ধরনের সংগঠনগুলোতে লক্ষ্য করি। এখানে মেধা, যোগ্যতা, সাহস এবং উদ্যোগ উৎসাহ পাওয়ার পরিবর্তে পেশী, অর্থবিত্ত, উঞ্ছবৃত্তি এবং স্তুতিকারদের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। এর ফলে চারদিকে একটি গ্রহণের কাল ও বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে, যা থেকে বেরুবার পথ একটিই। একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা। এটি শুরু হতে হবে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যদি শুধু পরীক্ষার প্রশ্নের জবাব কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে কিংবা ছক বাঁধা কেতাবী জ্ঞান বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে কোন অবস্থাতেই একজন কিশোর যুবককে পরিণত মানুষে রূপান্তর করা সম্ভব হবে না। সেটি যদি সম্ভব না হয়, তাহলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে 'ডিগ্রীধারী' হিসেবে যাঁরা বেরিয়ে আসবেন, তাঁরা মূলত সংস্কৃতির ও গণতন্ত্রের প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে গড়ে উঠবেন। গণতন্ত্র শুধু একটি সরকার পদ্ধতি বা একটি সাংবিধানিক বিষয়ই নয়। গণতন্ত্র জীবনের একটি পদ্ধতি বা একটি সাংবিধানিক বিষয়ই নয়। গণতন্ত্র মানুষের সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি। গণতন্ত্র মানুষের সুরুচিবোধের পরিচায়ক। এটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে, পারিবারিক ও সামাজিক, জাতীয় পর্যায়ে একে আত্মস্থ করা ও ধারণ করা। তারপর একে লালন করার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন, সেইসব প্রতিষ্ঠান গড়ার বিষয়ে যত্নবান হওয়া। আমাদের সমাজে অর্থনীতির দু'টি আপ্তবাক্য এখন প্রবলভাবে শাসন করছে। ডিমাণ্ডকে বোঝাতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে সাদামাটা ভাষায় বলা হয়, wish অর্থই হচ্ছে demand এবং এর সাথেই সেই বিখ্যাত আপ্তবাক্যটি জুড়ে দেয়া হয়– শুধু wish হলে হবে না। কারণ, 'ইচ্ছা যদি ঘোড়া হয়, তাহলে ভিখারীও ঘোড়ায় চড়বে'। কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যায়, ইচ্ছা এখন ঘোড়া এবং ভিখারীরা অর্থাৎ যার কোন যোগ্যতা ও গুণাবলী নেই, সেই-ই কিন্তু যা হতে চায়, তাই-ই হতে পারে। একই সঙ্গে অর্থনীতিতে গ্রেশামের একটি সূত্র আছে Bad money drives good money out of circulation. বাংলাদেশে শুধু রাজনীতি নয়, সমাজদেহের প্রতিটি পর্যায়ে, প্রতিটি সংগঠন আজকে গ্রেশামের এই সূত্রটি দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে সক্রিয় রয়েছে। এখানে good money'র স্থান নেই। Bad mony এখন তার শাসন জারি রেখেছে। এর কারণ একটিই। আমাদের সমাজের কাঠামো পরিশীলিত হয়নি, গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক মতাদর্শে উজ্জীবিত ও পরিচালিত হয়নি। এই গণতন্ত্রের চর্চা যদি আমরা সুষ্ঠুভাবে না করি, গণতন্ত্র যদি আমরা বোঝার চেষ্টা না করি, পরমতকে শুধু সহ্য করা নয়, পরমতকে শ্রদ্ধা করা এবং পরমতে সত্য লুক্কায়িত থাকতে

www.pathagar.com

পারে, তা মেনে নেয়া এবং গ্রহণ করার মানসিকতা যদি আমাদের গড়ে না ওঠে, তাহলে চারদিকের যে ধস ও বিপর্যয়ের কথা বলছি, তা আরও বিশাল আকারে দেখা দেবে, আরও ব্যাপক রূপ নিতে বাধ্য।

রাজনীতির প্রতি মানুষের আজকে এই অনীহা কেন? এক কথায় বলা যায়, দেশে যদিও কাগজে-কলমে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে, কিন্তু কার্যত একদলীয় ব্যবস্থাই এদেশে এখন দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে শাসন করছে। তা নইলে দৈনিক পত্রিকাগুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই, এদেশে যাঁরা বিদ্বৎজন বলে পরিচিত এবং সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মুখনিঃসৃত বাণী যদি আমরা শ্রবণ করি, তাহলে দেখি, সকলে সম্মিলিতভাবে একটি দলের, একটি ব্যক্তির এবং একটি গোষ্ঠীরই স্তুতি করে যাচ্ছে। প্রতিবাদ খুবই ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা যায় বা উচ্চারিত হয়। অথচ জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে তীব্র ক্ষোভ, আক্ষেপ এবং প্রচণ্ড বেদনা। জনগণের এই মনোভাবকে সাংগঠনিক রূপ দিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার যে সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার, তা না করে আমরা দেখেছি, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আধখেচড়াভাবে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য যে প্রয়াস দরকার সেটি তারা করতে পারছেন না। তার কারণ, তারা এদেশের সাধারন মানুষকে, পেশাজীবীদেরকে, এই দেশের এলিটদের মধ্যে যারা ক্ষমতার পালাবদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন, তাদেরকেও আকৃষ্ট করতে পারছেন না। এরা সকলেই সহযোগিতা দেয়ার জন্য একদিকে যেমন উন্মুখ, এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছেন, তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়ে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হতে পারছে না। কেন পারছেন না। এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শুধু মেঠো বক্তৃতা, বিবৃতি কিংবা দায়সারগোছের একটি বা দুটি হরতাল দিয়ে রাজনীতিকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের খাতে প্রবাহিত করা যাবে না। এদেশে সত্যিকারের একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব যতদিন পর্যন্ত সূচিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত এই ধস এবং এই বিপর্যয়ের কষাঘাতে এই সমাজকে আরও জর্জরিত, আরও চৌচির হতে হবে। এ থেকে মুক্তির পথ একটিই, সেটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক চেতনাকে শাণিত করে গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের পূর্ব শর্তগুলোকে চিহ্নিত করে সেই সব শর্ত ও চেতনাকে ধারন ও লালন করার জন্য সংগঠনকে যেভাবে পুনর্বিন্যাস করা দরকার, তেমনটি করা। সংগঠন বলতে আমি শুধু রাজনৈতিক দল বোঝাচ্ছি না– রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং জনসমাজে আর যতরকমের সংগঠন হতে পারে, সব সংগঠনের মধ্যে একটি ব্যাপক পরিবর্তন সূচনা করতে হবে। এটি যদি না করা যায়, তাহলে আমরা যে তিমিরে আছি, সেই তিমিরেই থাকব। হয়ত আরও ভয়ঙ্কর কোন বিপর্যয় ও ধস আমাদের অপেক্ষায় আছে।

মাহবুব উল্লাহ :

চিকিৎসা শাস্ত্রে 'ট্রমা' নামে একটি কথা আছে। এটি শারীরিক ট্রমা হতে পারে, মানসিক ট্রমাও হতে পারে। কোনো দুর্ঘটনায় কেউ আহত হলে সেটা হয় যেমন শারীরিক ট্রমা, তেমনি কোনোরকম বিপর্যয়ে কেউ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে সেটা মানসিক ট্রমার কারণ। আমাদের দেশের ইতিহাসে জনগণের জন্য ট্রম্যাটিক সিচুয়েশন একাধিকবার সৃষ্টি হয়েছে। '৪৭-এ যখন পাকিস্তান হলো, সেই পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এদেশে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, তাতে বহু লোক ঘরবাড়ি, ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু এরপরেও জনগণের একটা স্বপ্ন ছিলো যে, একটা সুন্দর-সুখী, শোষণমুক্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তারা এর বিনিময়ে অর্জন করবে। কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আসল একাত্তর। একাত্তরে আমাদের এই

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মানুষ আবার ট্রমার মধ্যে পড়ল। গণহত্যা এখানকার মানুষকে যেভাবে ট্রম্যাটিক বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিল, সেটা যে আমাদের সমাজের মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা ও চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে কী বিশাল পরিবর্তন এনেছে তা আজকের সমাজের দিকে অবলোকন করলে আমরা বুঝতে পারি। একাত্তর পরবর্তীকালে আমরা অনেকেই স্বপ্ন দেখেছিলাম, এই দেশে আবার শান্তি, সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে। কিন্তু তা হয়নি। আমাদের ওপর এক ধরনের নিষ্ঠুর ফ্যাসিস্ট শাসন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসল। যারা দ্বিমত পোষণকারী, যারা দেশপ্রেমিক, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছে, তাদেরকেও হত্যা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ৪২ হাজারের মতো। সুতরাং সমাজে ট্রমা বা 'নার্ভাস ব্রেকডাউন' সৃষ্টি হওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিস্থিতি এখানে সৃষ্টি হয়েছে। আজকে জাতির মধ্যে যে ধরনের আশাহত, উদ্যমহত অবস্থা আমরা লক্ষ্য করছি– বিদেশীরা যতই আমাদের দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচী বা আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর প্রশংসা করুক না কেন– আমাদের সমাজের মধ্যে যে ব্যাধি বাসা বেঁধে বসেছে তা থেকে মুক্তি অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সিভিল সোসাইটিকে অধিকতর জোরদার করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সিভিল সোসাইটির নামে আজকে বাংলাদেশে যেটা চর্চা করা হচ্ছে, সেটা একান্তভাবে দলীয় চরিত্রের। আমাদের দেশে সিভিল সমাজ প্রচণ্ডভাবে বিভক্ত। এটাও জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা। এরপরেও আমি মনে করি, গ্রাম পর্যায়ে বা তৃণমূল পর্যায় থেকে নগর পর্যন্ত বিভিন্ন পেশার মানুষ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত– সেসব মানুষ তাদের স্বার্থ, অধিকার, তাদের নিরাপত্তা, তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে এদেশের রাজনৈতিক দলের বাইরেও অধিকার অর্জনের আন্দোলনকে যদি সংগঠিত করতে পারে, তাহলে তার প্রভাব যেমন সামগ্রিকভাবে সমাজের মধ্যে পড়বে, দেশের রাজনীতি চর্চার উপরও পড়বে। এজন্য আমাদের প্রতিটি মহল্লার, প্রতিটি গ্রামের, প্রতিটি এলাকার সচেতন ও অগ্রসর মানুষের কর্তব্য হবে তার পাশে আর দশ-বিশটি মানুষকে সংগঠিত করা– উদ্যোগী করে তোলা। এই উদ্যোগ আমাদের সমাজে বিশাল একটি সম্পদের সৃষ্টি করবে। আজকাল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যেমন পুঁজি, প্রযুক্তি কিংবা বিদেশী বিনিয়োগের কথা বলা হয়, তেমনি সোশ্যাল ক্যাপিটালের উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সোশ্যাল ক্যাপিটালে যে সমাজ যতবেশি সমৃদ্ধ সেই সমাজের উন্নয়নের সম্ভাবনাও তত বেশি। আমরা হয়তো খুব বেশি করে এই মুহূর্তে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারব না। হয়তো খুব বেশি করে জাতীয় বিনিয়োগকেও বৃদ্ধি করতে পারব না। কিন্তু আমরা যদি সোশ্যাল ক্যাপিটালকে সংগঠিত করতে পারি বিভিন্ন সংগঠনের মধ্য দিয়ে সেটা যেমন আমাদের রাজনীতিতে প্লুরালিজমকে জোরদার করবে এবং পরিণতিতে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সংগঠিত হয়ে তাদের অধিকারগুলো উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে এই দেশে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে, যেখানে একটা সম্ভাবনা ও আশার আলো দেখতে পাওয়া যায়।

আফতাব আহ্মাদ :

আমরা দেশ এবং সমাজ সম্পর্কে যত কথাই বলি না কেন, রাজনীতিকে এড়িয়ে যাওয়া খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। দলীয় রাজনীতির বাইরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি। এটি দলমত নির্বিশেষে সবকিছুর উর্ধ্বে। আমরা বাংলাদেশের দুটি বিপর্যয় এবং ধসের কথা উল্লেখ করলাম। এমনি আরেকটি বিপর্যয় দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি সামনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে; আজকে এদেশে একটি চরম সাম্প্রদায়িক সংগঠন জন্মলাভ করেছে, যার নাম হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। এই সংগঠনটি জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় নিরাপত্তা এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে

www.pathagar.com

কোনো ধরনের মতামত না রেখে কেবল সাম্প্রদায়িক কতিপয় স্বার্থ ক্ষেত্রবিশেষে যেসব স্বার্থ জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, সেইসব স্বার্থের ব্যাপার অনেক বেশি সোচ্চার। আমরা এও লক্ষ্য করেছি, একদিকে যখন ফারাক্কা আমাদের এখানে পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি করছে এবং অন্যদিকে যখন আমরা দেখি সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সশস্ত্র হামলা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলছে, তখন এই সংগঠনটি সম্পূর্ণ রহস্যজনক নীরবতা অবলম্বন করছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে গিয়ে কাজ করা এবং সমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এরা ক্রমাগতভাবে চিহ্নিত হয়ে পড়ছে ভারতীয় স্বার্থ দেখভাল করার প্রতিনিধি হিসেবে। কিন্তু আমরা জানি, এই সংগঠনটির পেছনে অনেক নিরীহ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান রয়েছেন, যাঁরা ভারতীয়দের তল্পিবাহক হতে রাজি নন। যাঁরা কোনো অবস্থাতেই একটি দিল্লি-পসন্দ রাজনৈতিক দলের সমর্থক হতে রাজি নন। সেইসব সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে আমি শুধু এইটুকু নিবেদন করতে চাই, একাত্তরে বিহারীরা যেমন পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন, আপনারা যেন সেভাবে চিহ্নিত না হন। কারণ, এ দেশের অসংগঠিত ঘুমন্ত, নিস্পৃহ এবং আপাতদৃষ্টিতে যারা রাজনীতির প্রতি অনীহ, সেই মানুষ যেদিন হতাশা থেকে ক্রোধে ফেটে পড়বে, সেদিন আবার একটি ট্রম্যাটিক সিচুয়েশন আমাদের ফেস যেন করতে না হয় তার জন্য আপনারা আপনাদের জাতীয় দায়িত্ব দেশপ্রেমের অঙ্গীকার নিয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবেন, এটিই এ দেশের মানুষ প্রত্যাশা করে। সেই প্রত্যাশা যদি পূরণ হয়, আগামী দিনে ঐ ধরনের একটি ট্রম্যাটিক সিচুয়েশন আমরা আর ফেস করব না এবং সেই ধরনের একটি অমানবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হব না। পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, লাদেন বাহিনী ইত্যাদি কল্পিত যে সমস্ত ভীতির সঞ্চার করে একটি রাজনৈতিক ফ্রাসিস্ট চক্র এদেশে গৃহযুদ্ধ আয়োজনের হুমকি দিচ্ছে, তাদের সম্পর্কে আমাদের সজাগ এবং সচেতন থাকা দরকার। গণতান্ত্রিক সংগ্রামে এখন অন্যতম লক্ষ্য হবে সকল সাম্প্রদায়িকতা, সকল ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং এ দেশে গণতন্ত্রের পতাকাকে সমুন্নত করে তোলা।

www.pathagar.com

২৯ এপ্রিল ২০০০

বিচারপতিগণ ব্ল্যাকমেইলিং এর শিকার

মাহবুব উল্লাহ :

গত কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এর কারণ হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার বিষয়টি। শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের বিচার একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সম্পন্ন হয় ১৯৯৮ সালের সেই ট্রাইব্যুনালের বিচারক ছিলেন কাজী গোলাম রসুল। এই বিচারের রায় ঘোষণার সময়ে মৃত্যুদণ্ডের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে রায় দেয়া হল ফায়ারিং স্কোয়াডে অপরাধীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে হবে। বাংলাদেশের ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে কোন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য এ ধরনের কোন আইনী ব্যবস্থা নেই। অথচ সে রকম একটি ব্যবস্থারই নির্দেশ দেয়া হল। ফলে জনমনে এই বিচারক সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেক হলো, বিচারের রায় দিতে গিয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন কি-না। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই বিচারের রায় ঘোষিত হওয়ার পর সেই বিচারকের কন্যা-সন্তানরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তাদেরকে কিছুদিন পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যাপারটি একজন বিচারকের জন্য এবং তাঁর পরিবারের জন্য কী পরিমাণ স্নায়বিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে, এ ঘটনা থেকে আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশ দিনের পর দিন উত্তপ্ত থেকে উত্তপ্ততর হয়ে উঠছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবকাশ যাপনকালে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী বন ও পরিবেশ মন্ত্রী বেগম সাজেদা চৌধুরীসহ অপর কয়েকজন মন্ত্রী ও শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব হত্যা মামলার ব্যাপারে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের ভূমিকা নিয়ে কটাক্ষপূর্ণ আচরণ করেছেন। আমরা জানি, এই বিচারকার্যটি, যেটাকে বলা হয় 'ডেথ রেফারেন্স' সেটা এখন হাইকোর্টের এখতিয়ারাধীন রয়েছে। এটা আমাদের দেশের আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলেছে। ডেথ রেফারেন্সের প্রশ্নটি হাইকোর্টের বিভিন্ন বেঞ্চে প্রেরণ করার পর কোন কোন বেঞ্চ থেকে বলা হয় যে, তাদের হাতে আরও একাধিক অনিষ্পন্ন হত্যা মামলা রয়েছে, সুতরাং তারা সেই ক্রম ভঙ্গ করে অতিরিক্ত কোন মামলার কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন না। আবার কোন কোন বেঞ্চ এই মামলাটিকে তাদের বিচার্য বিষয় নয় বলে উল্লেখ করে ফেরত দিয়েছে। কোন কোন বিচারপতি এই বিচারকার্য পরিচালনায় বিব্রতবোধ করছেন। হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে এই বিব্রতবোধ করার ঘটনাকে ইস্যু করে বেগম সাজেদা চৌধুরীরা যেসব উক্তি করেছেন, তা রীতিমত বিপজ্জনক– দেশের স্থিতিশীলতার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য এবং দেশে আইনের শাসন বজায় রাখার জন্য। বেগম সাজেদা চৌধুরী বলেছেন, 'যেসব বিচারপতি শেখ মুজিব হত্যার বিচার করায় বিব্রতবোধ করেন, তাদের আদালতের পবিত্র ঘর ছেড়ে দেয়া উচিত'। এছাড়া সেদিন কোন কোন নেতা বিচারপতিদের বাসভবন ঘেরাও করার হুমকিও দিয়েছেন। সেই সভা থেকেই ঘোষণা করা হল, ১৮ এপ্রিল এই বিচার দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে লাঠি মিছিল অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই লাঠি মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের কাফনের কাপড় নিয়ে আসার জন্যও আহবান জানানো হয়। এখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত একটি দল কী করে লাঠি মিছিলের মত উত্তেজনা

www.pathagar.com

সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঘোষণা দিতে পারে। তার চেয়েও ভয়াবহ হচ্ছে কাফনের কাপড় নিয়ে আসার ব্যাপারটি। এই কাফনের কাপড় কী উদ্দেশ্যে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে, আমরা জানি না। তবে সাধারণ মানুষ যদি ভাবে যে, বিচারপতিদেরকে আওয়ামী লীগের নেতাদের কথামত বিচার না করার 'অপরাধে' বধ করে তাদেরকে কাফনের কাপড়ে সজ্জিত করে কবরস্থ করা হবে– এ ধরনের দুর্ভাবনা বা আশংকা যদি কারও মধ্যে সৃষ্টি হয়, তাহলে সেটাকে খুব অযৌক্তিক বলা যাবে কি? আমরা দেখেছি যথাসময়ে সেই কাফনের কাপড় নিয়ে লাঠি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও মিছিলটি বাহ্যত শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজনীতিতে যে উত্তাপ-উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে, সেটা এক মারাত্মক অশনি সংকেত দেয়।

আমরা আরও লক্ষ্য করেছি, প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে ফিরে এসে এ ধরনের বিক্ষোভ মিছিলের ব্যাপারে সাফাই গাইলেন। তিনি বললেন, 'মানুষ আবেগতাড়িত হয়ে এই ধরনের ক্ষোভ প্রকাশ করতেই পারে'। তিনি আরও বললেন, 'যদি এই ধরনের খুনের বিচার না হয় তাহলে প্রতিদিন দু'তিনটি খুন হবে, এটাইতো স্বাভাবিক'। একজন প্রধানমন্ত্রী কী করে এ ধরনের বক্তব্য রাখেন সেটা কোন বিবেকবান মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। নির্দিষ্ট একটি হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি বলে দেশে প্রতিনিয়ত খুন-খারাবি চলতে থাকবে, এটা কোন দায়িত্বশীল শাসক বা নেতার উক্তি হতে পারে না। তিনিও খুব ভাল করেই জানেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের বিচার তাঁর শাসন আমলে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হয়েছে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, এই মামলাটি নিছক কোন রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা বা প্রতিবিপ্লবের মামলা নয়, এটি দেশের সাধারণ ফৌজদারি আইনে একটি হত্যা মামলা। হত্যা মামলায় কোন অপরাধীকে শাস্তি দিতে হলে তা দিতে হয় beyond any shadow of doubt. যদি সামান্যতম shadow of doubt বা সন্দেহ কোন আসামীর বেলায় দেখা দেয়, আমরা যতদূর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানি– তাহলে সেই আসামী বেকসুর খালাসও পেয়ে যেতে পারে। কিংবা তার কোন লঘুদণ্ড হতে পারে। কাজেই এই মামলাটিতে যদিও নিম্ন আদালতে আসামীদের ফায়ারিং স্কোয়াডে বা ফাঁসি দিয়ে হত্যার রায় দেয়া হয়েছে, উচ্চতর আদালতকে অবশ্যই তার বিচারে বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগ করতে গিয়ে অত্যন্ত সাবধানী, যত্নপরায়ন, ন্যায়পরায়ণ এবং আইনের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে রায় প্রদান করতে হবে। আমরা লক্ষ্য করলাম, প্রধান বিচারপতি ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। প্রধান বিচারপতির কার্যালয়ে কোন কোন বেঞ্চের বিচারপতিদের ডেকে এনে সভা করা হয়েছে। কোন কোন পত্রিকার সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে, কোন কোন বিচারক এ ধরনের প্রশ্ন তুলেছেন যে, এ ধরনের লাঠির নিচে থেকে সুবিচার করা কি সম্ভব? আজকে তাই প্রশ্ন, যখন একটি বিচার প্রক্রিয়াধীন থাকে, তখন সেই বিচারকে বাইরে থেকে প্রভাবিত করার চেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এর ফলে সুবিচার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

বিচার বিভাগকে নিয়ে বর্তমান শাসক দল আওয়ামী লীগের উষ্মা নুতন কোন ব্যাপার নয়। আমরা জানি যে, খোদ প্রধানমন্ত্রী হাইকোর্টে বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলার আসামীদের জামিন দেয়ার প্রশ্নে উষ্মা প্রকাশ করেছেন এবং অনেক আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসেছেন। এ কারণে একজন আইনজীবী আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে এ ব্যাপারে বিচার প্রার্থনা করলে সুপ্রীম কোর্টের ফুল বেঞ্চ প্রধানমন্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে দিয়েছিল, সেই সাথে তাকে সাবধান করেও দিয়েছিল। আমার মনে হয়, এরপরও প্রধানমন্ত্রী নিজেকে শুধরে নেননি। আমরা আরও লক্ষ্য করলাম, বস্তি উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টের একটি রায়কে প্রভাবিত করার জন্য এক জঘন্য কাণ্ডের অবতারণা করা হল. রাতারাতি হাইকোর্টে

www.pathagar.com

প্রাঙ্গণকে বস্তিতে পরিণত করা হল। এর পেছনে যারা সক্রিয় ছিল, তাদের নামোল্লেখ না করলেও সচেতন দেশবাসী সেটা জানে। আমাদের মনে রাখতে হবে, গণতন্ত্রকে সচল এবং কার্যকর রাখার জন্য রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ তিনটি স্তম্ভ হচ্ছে, নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে নির্বাহী বিভাগের কী হাল, সেটা বর্ণনা না করলেও চলে। মারাত্মক ধরনের দলীয়করণ, আত্মীয়করণ এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে পুলিশ বিভাগ এবং প্রশাসন বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে নিস্ক্রিয় করে দেয়া হয়েছে এবং দলের আজ্ঞাবহ লাঠিয়ালে পরিণত করা হয়েছে। অন্যদিকে সংসদও অকার্যকর রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী দল সংসদে তাদের ন্যায্য কথা বলার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সংসদ অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে অনেক জনগুরুত্বসম্পন্ন আইন সংসদে একতরফাভাবে পাস হয়ে যাচ্ছে। বিরোধী দলের অংশগ্রহণহীন এভাবে শুধু সংখ্যার জোরে আইন পাস করানো দেশের জন্য কতটা মঙ্গলজনক সেটা ভাববার বিষয়। এ দেশের মানুষের শেষ ভরসাস্থল ছিল উচ্চতর আদালত। এ দেশের নির্যাতিত অধিকারবঞ্চিত, নানা ধরনের অবিচার-উৎপীড়নের শিকার সাধারণ মানুষ উচ্চ আদালতের আশ্রয় নিয়ে কিছুটা প্রতিকার পাওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু আজকে উচ্চতর আদালতকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে, মান্যবর বিচারপতিদের ভয়ভীতি দেখিয়ে, তাদের বাড়ী ঘেরাওয়ের হুমকি দিয়ে এবং আকারে ইঙ্গিত প্রাণে বধ করার হুমকি দিয়ে দেশে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে অনেকে বলতে শুরু করেছেন যে, ঘটনাটি যদি শেষ পর্যন্ত একটি গৃহযুদ্ধে গড়ায় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। শুধু তা-ই নয়, বিচার কবে নাগাদ সমাপ্ত করতে হবে, সে ব্যাপারেও দিন-তারিখ বেঁধে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে বিচার শেষ করতে হবে। এভাবে কোন বিচারের তারিখ বা সময় রাজনৈতিকভাবে বেঁধে দেয়া গণতান্ত্রিক সুসভ্য দেশে সম্ভব কি-না, সেটা সচেতন দেশবাসী জানেন। তাই আমাদের মনে বিরাট প্রশ্ন, শাসক দল আওয়ামী লীগ কী চায়? তারা কি মনে করে যে, তাদের মেয়াদকালেই এই বিচারটি সম্পন্ন হতে হবে? তারা কি এ কথা ভেবে আতঙ্কিত বোধ করছে যে, তারা ক্ষমতা থেকে একবার চলে গেলে আর ক্ষমতায় ফিরে আসবে না, যে কারণে তড়িঘড়ি করেই এই বিচার সম্পন্ন করতে হবে? তাতে যদি সুবিচারের পথ রুদ্ধ হয় হোক, তবু তাদের ইচ্ছামত একটি রায় চাই। এটা নিঃসন্দেহে একটা গণতান্ত্রিক দেশে কাম্য হতে পারে না। যে ইস্যুকে কেন্দ্র করে এই হত্যা মামলা, সেটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আমরা জানি, ১৯৭৫ সালে যখন গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতার হাত বদলের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছিল, তখনই এই রক্তাক্ত বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব ইতিহাস বারবার সাক্ষ্য দেয়, যখনই এভাবে কোন শাসক তার শাসন ক্ষমতা থেকে চলে যাবার স্বাভাবিক রাস্তা খোলা রাখেন না, তখনই অসাংবিধানিক এবং বলপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। সুতরাং কোন সমাজে বলপূর্বক কিছু চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা শেষ বিচারে যে অত্যন্ত counter productive হয়, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

আফতাব আহমাদ :

একটি দেশে আইনের শাসনের পরিবর্তে যদি ব্যক্তির শাসন কিংবা শক্তির দাপট, সন্ত্রাস, প্রতিরোধ এবং প্রতিহিংসা অর্ডার অব দ্যা ডে হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেদেশে বিপর্যয় নেমে আসতে বাধ্য। গণতন্ত্র সেখানে পর্যুদস্ত হতে বাধ্য। আজ বাংলাদেশে যা হচ্ছে, তা প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার রাজনীতি। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল এবং এই দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা আইনের শাসনের পরিবর্তে দলীয় শাসনে বিশ্বাস করেন। আইনের নীতিকে

www.pathagar.com

সমুন্নত রাখার পরিবর্তে দলীয় মতাদর্শকে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়াটাকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলটির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব, অতীতেও তারা জনমতের তোয়াক্কা করেনি। জনগণের আবেগ-অনুভূতির কোন মর্যাদা দেয়নি। তারা জনগণকে নিপীড়ন ও নিষ্পেষণ করার জন্য সমগ্র রাষ্ট্রদেহের ওপর এমন একটি নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা এক বীভৎস ফ্যাসিবাদী শাসনের জন্ম দিয়েছিল। আজ যখন প্রশ্ন উঠেছে মুজিব হত্যার বিচারের, জনগণ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল এবং আমরা সবাই লক্ষ্য করছি, যে দল হত্যার রাজনীতির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল এবং হত্যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিল, তাদের সেইসব হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোন ধরনের উচ্চবাচ্য কেউ করছে না। সেইসব হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এবং বিচারের কোন প্রক্রিয়া আজও শুরু হয়নি। ১৯৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত আওয়ামী দুঃশাসনে কমপক্ষে ৪২ হাজার দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মী শাহাদত বরণ করেছে। প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় সংসদের মেঝেতে দাঁড়িয়ে দম্ভোক্তি করেছিলেন, 'কোথায় সিরাজ সিকদার?' সেই সিরাজ সিকদার হত্যার বিচারও হয়নি। নীতিগতভাবে কোন মানুষ, কোন সভ্য সমাজ হত্যার রাজনীতিকে সমর্থন করতে পারে না। আমরাও কোন হত্যাকে সমর্থন বা অনুমোদন করি না। কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্যতা বলে একটা কথা আছে। এদেশে যখন নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল পথরুদ্ধ করে দেয়া হয়, তখন এদেশের বুকে যে দুঃখজনক ও বিয়োগান্তক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার জন্য সর্বৈবভাবে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর একদলীয় ফ্যাসিস্ট বাকশালী শাসনই দায়ী ছিল। গোড়ায় যদি প্রশ্ন করতে হয়, এদেশে কি মুজিব হত্যা নামে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে? তার উত্তর হল 'না'। একটি সংসদীয় অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ সংসদীয় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে সংসদের ভেতরে যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তারা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ওপর একদলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন চাপিয়ে দেয় এবং সেই ফ্যাসিজমের শেষ পরিণতিতে অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও কলহের সুযোগ নিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসন ভেঙ্গে যায়। ১৯৭৫ এর ১৫ আগাষ্ট ফ্যাসিবাদী দলটির অন্তর্কলহ, অন্তর্দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতিতে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, যাতে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের দিকে এবং বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে সর্বত্রই এ ধরনের অসংখ্য নজির আমরা দেখতে পাই। এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার কখনও হয় না। কখনও করা সম্ভব নয়। কারণ, সমগ্র জাতি, দেশের সমগ্র জনসাধারণ এইসব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শেখ মুজিবুর রহমানের জীবিত দুই কন্যা এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কোন আদালতে কোন মামলা রুজু করেননি। এমনকি মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কাছে গিয়ে কোন ফরিয়াদ পর্যন্ত করেননি। আজ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে তাঁরা তাঁদের দলনেতার হত্যার বিচারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই বিচার প্রক্রিয়া ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছিল এবং সে সময়েও আমরা লক্ষ্য করেছি, সরকার প্রধান প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বেড়িয়েছে ঃ 'রাজপথ দখলে রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত আদলতের রায় ঘোষিত না হচ্ছে'। প্রকারান্তরে মুজিব হত্যা মামলা চলাকালে যে বৈরী পরিবেশ তৈরী করা হয়েছিল এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে যে তথ্য সন্ত্রাস ছড়ানো হচ্ছিল তার ফলেই আমরা লক্ষ্য করেছি, ফৌজদারী দণ্ডবিধির সকল নীতিমালা লংঘন করে বিচারক কাজী গোলমা রসুল কথিত অপরাধীদের ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার রায় ঘোষণা করলেন। অথচ আমাদের দেশের ফৌজদারী

www.pathagar.com

দণ্ডবিধিতে এ ধরনের কোন বিধান নেই। আজ এই মৃত্যুদণ্ডাদেশ হাইকোর্ট ডিভিশনের অনুমোদনের জন্য ডেথ রেফারেন্স বেঞ্চে যখন বার বার প্রেরিত হচ্ছে, বিচারকরা একের পর এক বিব্রতবোধ করে মামলাটি ফেরত দিচ্ছেন। গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করছেন। প্রথমত যে কোন বিচারক বিব্রতবোধ করতেই পারেন। এটি আইনত, ন্যায়ত এবং নৈতিকতার দিক থেকে বিচারকের অধিকারের মধ্যে পড়ে। তিনি যদি মনে করেন যে, একটি মামলার ব্যাপারে যথাযথভাবে, ন্যায়ানুগভাবে, নিষ্ঠার সাথে আইনানুযায়ী তিনি যথোচিত রায় দিতে পারবেন না, তাহলে তিনি সেই মামলাটি গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করতেই পারেন। একজন বিচারক যদি উপলব্ধি করেন যে, একটি বিশেষ মামলা যে আইনের অধীনে পরিচালিত হয়েছে, সেই আইনের বিভিন্ন বিধান লংঘন করে এই মামলাটি সম্পাদিত হয়েছে, অথচ ঐ কথাগুলো বলার পরিবেশ নেই কিংবা এমন একটি বৈরী পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে যখন বিচারকের প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে– সে অবস্থায় যে কোন বিচারকই এ ধরনের মামলা বিবেচনায় নিতে বিব্রতবোধ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশও আজকে সেই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

মুজিব হত্যার সাথে বা পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে যারা জড়িত ছিলেন পত্রপত্রিকায়, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে যাঁদের নাম বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছে, এমনকি ১৫ আগস্টের পরিবর্তনকে সাধুবাদ জানিয়ে স্বনামে পত্রিকায় যারা নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন তাঁদের অনেকেই আজকে ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রিসভার শোভাবর্ধন করছেন। এঁরা এখন মুক্ত মানুষ হিসেবে রীতিমত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ এবং চর্চা করছেন। অপরদিকে, কিছু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে কারাগারে রাখা হয়েছে। ন্যায়বিচার কতটুকু করা হয়েছে আর প্রতিহিংসা পরায়ণতার কারণে কাদেরকে কারা প্রকোষ্ঠে আটক করে রাখা হয়েছে, এটি আজ এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে মানুষের কাছে দেখা দিয়েছে। জাতীয় সংসদের একজন নির্বাচিত সদস্য এই প্রতিহিংসার শিকার হয়ে এখন কারান্তরালে রয়েছেন। অতএব যে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাববার, সেটি হচ্ছে– একটি সাধারণ খুনের মামলা দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী যেভাবে পরিচালিত হওয়ার কথা, সেভাবে পরিচালিত হতে পেরেছে কিনা এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির সকল অপরিহার্য শর্তপূরণ করা হয়েছে কিনা। পেশীশক্তির প্রদর্শন, সন্ত্রাস, হুমকি এবং কাফনের মিছিলের নামে যেভাবে মান্যবর বিচারকদের ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাতে ন্যায়বিচার হতে পারে না। সেই পথে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই আচরণ আমাদের আবার একটি কথা মনে করিয়ে দেয়– শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান সংসদীয় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অবৈধভাবে দেশের অনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন ১৯৭৫ সালের জানুয়ারীতে, তখন তিনি বিচারকদের তার দাসানুসাদে পরিণত করেছিলেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করে বিচরকদের নিয়োগ এবং চাকরি তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে রেখেছিলেন। শেখ হাসিনা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার মতই আচরণ করতে চাইছেন। কিন্তু সে সুযোগ নেই বলে তাঁরা একটি স্বঘোষিত একদলীয় শাসন প্রবর্তণ করার পাঁয়তারা করছেন। বস্তুত বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে আইন বিভাগ সর্বত্র আজ অঘোষিত একটি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চলছে, যা দেশ এবং জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭৫-এ যেভাবে দেয়ালে পীঠ ঠেকে যাওয়ার পর মরিয়া হয়ে উঠেছিল, সেভাবে যদি আবার এ দেশের মানুষকে তেমন একটি মরিয়া পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়া হয়, তার পরিণতি কিন্তু শুভ হবে না। এটি শাসক চক্রকে, শাসক দলের নেতাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হবে। বিচার বিভাগকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে বিচারকদের প্রতি হুমকি প্রদর্শন করে এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ডের

www.pathagar.com

পক্ষে সাফাই গেয়ে যাঁরা বলছেন যে, মানুষ আবেগতাড়িত হয়ে এসব কাজ করছে– তাঁদের উদ্দেশ্যে সবিনয়ে এটুকু নিবেদন করতে চাই যে, মুজিব হত্যা মামলার সাথে এ দেশের মানুষের কোন আবেগ জড়িত নেই। একটি হত্যা মামলা স্বাভাবিক নিয়মে যেভাবে বিচার হওয়া দরকার, যদি সেভাবে বিচার করতে পারে এই সরকার, সেভাবেই যেন করে। অস্বাভাবিক পথে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধ পরায়ণতার কারণে যদি বিচার প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করে তারা তাদের দলীয় অভিলাষকে চরিতার্থ করতে চান, এ দেশের মানষ তা হতে দেবে না। এটি ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের বিচার এভাবে পৃথিবীর কোথাও সম্ভব হয়নি। জার নিকোলাস যখন সভিয়েত বিপ্লবে নিহত হন, তার বিচার করা সম্ভব হয়নি। আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। ইয়েলৎসিন দীর্ঘদিন শাসন করেছেন, পুতিন ক্ষমতায় আছেন, কিন্তু জার নিকোলাসের হত্যার বিচারের প্রশ্নই উঠছে না। রোমানিয়ায় চচেস্কুকে হত্যা করে সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন করা হয়– চসেস্কুর হত্যার বিচার কোন দিন হবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। না হওয়ারই কথা। কারণ, রাষ্ট্রশক্তির সাথে সংঘাতে যদি কোন ব্যক্তির প্রাণ যায়, সেটিকে নিছক হত্যা বলা হয় না। সেটি একটি বিপ্লব কিংবা প্রতিবিপ্লব। সেটি একটি গণঅভ্যুত্থান কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান। অভ্যুত্থানের নিয়মই হল যে, সেখানে প্রাণহানি ঘটতেই পারে। আর গণতন্ত্রের কথা হচ্ছে, নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে থেকে রক্তপাত না ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তন সাধন করা। আমরা এ দেশে গণতন্ত্র, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছি। আমরা চাই রক্তপাতহীনভাবে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যদিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো যেন সম্পাদিত হয় এবং অশুভ শক্তি যেন আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর চেপে বসতে না পারে সে ব্যাপারে যাতে সবাই সচেষ্ট থাকে।

মাহবুব উল্লাহ :

আমরা পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, সেখানে বিচার বিভাগের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে গণতন্ত্র ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। আমরা আরও বহু দেশের অভিজ্ঞতা থেকে জানি– যেমন জার নিকোলোসের কথা বলা হলো। ইরাকের দিকে তাকালে দেখব সেখানে 'রাজতন্ত্র' উচ্ছেদের জন্য রক্তাক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৫৮ সালের জুলাই বিপ্লবের সময়ে গোটা রাজ পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। মাওলানা ভাসানী জনতার রুদ্ররোষ সম্পর্কে তাঁর জীবদ্দশায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বক্তৃতা করতে গিয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিতেন। সেটি হল সেই ১৯৫৮ সালে ইরাকের 'রাজতন্ত্র' বিরোধী অভ্যুত্থানের ঘটনা। সেই অভ্যুত্থানে শুধু যে রাজতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়েছিল তাই নয়, সাথে সাথে রাজার পদলেহী প্রধানমন্ত্রীও জনতার রুদ্ররোষে নিহত হলেন। তাঁর নিহত হওয়ার পর মওলানা ভাসানীর ভাষায়, বাগদাদের রাজপথে জনতা উল্লাস করছিল এবং তার রক্ত চেটে চেটে খাচ্ছিল। শুনতে অত্যন্ত বীভৎস মনে হয়, কিন্তু মানুষের হিংসাকে জাগ্রত করে এমন কোন কারণ বা পরিবেশ সৃষ্টি হলে তার পরিণতি এমনি মারাত্মক হতে পারে। কাজেই ক্ষমতাসীনদেরকে ভাবতে হবে, ক্ষমতা শুধু মানুষকে শক্তি বা বল প্রয়োগের ক্ষমতা দেয় না, ক্ষমতা মানুষকে মানুষের কল্যাণ করার ক্ষমতাও দেয়। তাঁরা ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে শুধু কিভাবে প্রতিশোধ নেবেন, কীভাবে বল প্রয়োগ করবেন, কীভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোকে আরও নিপীড়নমূলক করবেন, সেটাই ভাবছেন। সে তুলনায় জনকল্যাণের ব্যাপারে তারা মোটেও মনোযোগী হননি। আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে পুরস্কার বা সার্টিফিকেট এনে একটি সরকার লেজেটিমেসি অর্জন করতে পারে না। একটি সরকারকে এটি অর্জন করতে

www.pathagar.com

হয় জনগণের ভালবাসা ও সম্মতির মাধ্যমে। কিন্তু সেটি ভুলে গেলে তাঁরা বিরাট ভুল করবেন। ড. আফতাব আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন। শেখ হাসিনা আবদুল মালেক উকিলের কী বিচার করেছেন? মালেক উকিল পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ঘটনার পর লণ্ডনে গিয়ে বলেছিলেন, 'দেশ একজন ফেরাউনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে'। এছাড়া মরহুম মহিউদ্দীন আহমদ মস্কোতে খন্দকার মোশতাকের হয়ে দূতিয়ালী করতে গিয়েছিলেন এবং সভিয়েত শাসকদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, বাংলাদেশে যে পরিবর্তন হয়েছে, সভিয়েত শাসকদের তা মেনে নেয়া উচিত। স্বাগত জানানো উচিত। এগুলো তো সবই এদেশের পত্র-পত্রিকায় রয়েছে। আমরা জানি, দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যাণ্ডেলা যে নীতি অনুসরণ করেছেন– তিনি ট্রুথ অ্যাণ্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন করে একদিকে যেমন জাতির সামনে শ্বেতাঙ্গ শাসনের সময়ে যেসব মানবাধিকার লংঘিত হয়েছিল, মানুষের বিরুদ্ধে যে নিকৃষ্ট, জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, তার উন্মোচন করেছেন, অন্যদিকে যারা এসব কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী, তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে সেখানে জাতীয় ঐক্যের মত পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন। এমনকি তাঁর পরম রাজনৈতিক বৈরীকে নিয়ে তিনি মন্ত্রিসভা পর্যন্ত গঠন করেছেন। বাংলাদেশের মানুষ চরিত্রগতভাবে প্রতিশোধপরায়ন নয়। মানুষের এই স্বাভাবিক চরিত্রটিকে ভুলে কেবল ক্ষমতার দম্ভে আস্ফালন করা যে কত বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, আজকে শাসকগোষ্ঠীকে সে কথাটি ভেবে দেখতে হবে। আমার মনে হয়, আজকে এই উত্তেজনা সৃষ্টির পেছনে আরও গূঢ় কারণ রয়েছে, যা দেশকে হয়ত একটি গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেবে এবং সেই গৃহযুদ্ধের সুযোগে দেশকে একটি আধিপত্যবাদী শক্তির পদানত করার কোন পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয়, তাহলে বাংলাদেশের মানুষ জানে কীভাবে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা, অস্তিত্ব, মানমর্যাদাকে রক্ষা করতে হয়।

•

www.pathagar.com

৬ মে ২০০০

দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান সংকট

মাহবুব উল্লাহ :

এটি প্রচণ্ড উদ্বেগের বিষয়, বাংলাদেশের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় গত ক'মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গত ৫ মাস ধরে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গত ৪ মাস ধরে বন্ধ। আমরা যে মুহূর্তে এই আলোচনা করছি, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে খোলা যায় সে ব্যাপারে এক বৈঠকে বসেছেন। সংবাদপত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনরত ছাত্র ছাত্রীদের পানি পান করিয়ে অনশন ভঙ্গ করিয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে তাঁর সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। বাংলাদেশের মত বিশ্বের আর কোথাও এ ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করে কি-না, আমার জানা নেই। সম্ভবত, আফ্রিকার সবচেয়ে অনগ্রসর দেশেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে না। অথচ বাংলাদেশে ঘটেছে। এক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট সুনাম ছিল। একে বলা হত 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড'। আজও পত্রপত্রিকায় তেমনটিই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই বিশেষণটি কতটুকু প্রযোজ্য সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ, শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি, ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খল পরিবেশ, হল দখল, সীট দখল, 'ফাও' খাওয়া, এসব সেখানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন। অভিভাবক এবং ছাত্রদের অনেকের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এ ধরনের অবনতিশীল পরিস্থিতির জন্য মূলত শিক্ষক রাজনীতিই দায়ী। আবার শিক্ষক এবং সুধীমণ্ডলীর অনেকে এবং খোদ রাষ্ট্রপতি নিজে মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনের অসুস্থ ছাত্র রাজনীতিই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশক বিঘ্নিত করছে। এছাড়া শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও নানা রকম অভিযোগ রয়েছে। যেমন– এক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করা এবং এ জন্য কর্তৃপক্ষের যথাযথ পূর্বানুমতি না নেয়া। এছাড়া শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, তাঁরা নানা ধরনের কনসালটেন্সির কাজে নিযুক্ত থাকেন বলে ছাত্রদের টিউটরিয়াল ক্লাস নেয়া, তাদের লেখাপড়ার বিষয়ে পরামর্শ দেয়া এবং একাডেমিক ও এক্সট্রা একাডেমিক কার্যকলাপে সহায়তা করার জন্য যথেষ্ট সময় দেন না। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স বা মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়েও বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় সঠিকভাবে একটি চিঠি বা দরখাস্ত পর্যন্ত লিখতে পারে না। এটা আমাদের উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার মানের অবনতিরই বহিঃপ্রকাশ। এই অবনতির পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার যে হাল বা পরিস্থিতি, সেটাকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য যে সম্পদ প্রয়োজন, তার প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বাংলাদেশকে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয় এবং সে কারণে বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে তার অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলাদেশের উন্নয়ন কীভাবে ঘটবে? উন্নয়ন ঘটাতে হলে পর্যাপ্ত সম্পদের প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু আমাদের জমি সীমিত, এখনও উল্লেখযোগ্য কোন খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়নি; বনজ সম্পদ এবং মৎস্য সম্পদ অত্যন্ত সীমিত, সেক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যে

www.pathagar.com

সম্পদভিত্তি দরকার, সেটা বাংলাদেশের নেই। কিন্তু বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের ওপর বিরাট এক জনসংখ্যার চাপ বিদ্যমান। মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর নিম্নপর্যায়ের দেশগুলোর মতই। কিন্তু অন্য মাপকাঠিতে যদি আমরা দেখি অর্থাৎ, প্রতি বর্গমাইলে কী পরিমাণ জিডিপি বাংলাদেশে প্রতিবছর সৃষ্টি হয়, তাহলে দেখব, বাংলাদেশের স্থান বিশ্বের অনেক দেশের ঊর্ধে। এর অর্থ হচ্ছে, এখানকার বিপুল জনগোষ্ঠী এখানকার ভূমির ব্যবহার এতটা নিবিড় পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যার ফলে এখানে অধিকতর নিবিড় ভূমি ব্যবহারের সম্ভাবনা সীমিত হয়ে এসেছে। এ পরিস্থিতিতে ভূমির ওপর আর চাপ বাড়ালে সেটা হয়ত এদেশের পরিবেশের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করবে যেটা জনগণের জন্য কল্যাণকর হবে না। সুতরাং এদেশের উন্নয়ন আনতে হলে এদেশের বিরাট জনশক্তিকে মানবসম্পদে পরিণত করেই সেটা করতে হবে। আমরা জানি, সারাবিশ্ব বিশ্বায়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। সারাবিশ্বে পুঁজির একটা সচল প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। তুলণামূলকভাবে শ্রমের প্রবাহ এতটা সচল নয়, বরং বলা চলে বেশ সীমাবদ্ধ। তৎসত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করি, আজ জনশক্তি একদেশ থেকে অন্যদেশে রফতানী হয়। বাংলাদেশের রফতানী আয়ে জনশক্তি থেকে অর্জিত আয়ের পরিমাণ বিশাল। কিন্তু আমরা যে জনশক্তি রফতানী করি, তা দক্ষ জনশক্তি নয়। যার ফলে তাদেরকে বিদেশে কম মজুরিতে, কম বেতনে কাজ করতে হয়। কিন্তু আমরা যদি জনশক্তির মানের উন্নয়ন ঘটাতে পারতাম, তাহলে আরও অনেক বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারতাম। আর এ জন্যই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা জরুরী। শিক্ষার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার। এ বছর এস এস সি এবং এইচ এস সি পরীক্ষা যে মহাযজ্ঞের মত নকলের পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নকল সরবরাহের জন্য আমরা বিভিন্ন কেন্দ্রে তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করেছি। এমনকি পরীক্ষা কেন্দ্রের টিনের চাল খুলেও নকল সরবরাহের দৃশ্য আমরা সংবাদপত্রের পাতায় দেখেছি। এছাড়া বাঁশের মাথায় করে, মই দিয়ে উঠে, দেয়াল বেয়ে নকল সরবরাহের দৃশ্য তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আর এভাবে যারা পরীক্ষায় পাস করবে, তারা দেশের জন্য কী অবদান রাখতে পারবে, সেটা তো খুব সহজেই অনুমেয়। এর ফলে ক্ষতির বোঝাটাই বাড়ছে।

এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোন ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই ক্রমানুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি করা হত। যেহেতু আজকাল পাবলিক এগজামিনেশনগুলোর প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আর কোন আস্থা নেই, সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নতুন করে ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন করতে হয়। এর ফলে দেশের বিপুল সম্পদ–সেটা অভিভাবকদেরই হোক, আর বিশ্ববিদ্যালয়েরই হোক বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারেরই হোক, ব্যয় হচ্ছে। সময়েরও অপচয় হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন সময়ে অনির্ধারিত ছুটির শিকার হচ্ছে। এসব ছুটির পেছনে মস্তানী, ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ ইত্যাদিই মূলত দায়ী। এসব সংঘর্ষের ফলে অনেক মুল্যবান প্রাণ আমরা হারিয়েছি। এ ধরনের ঘটনা থেকে দু'একটি ছোটখাট বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই ব্যতিক্রম নয়। তাই আমাদের খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি থাকবে কি থাকবে না। ছাত্র রাজনীতির নামে যে অসুস্থ পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান অত্যন্ত নিচে নেমে গেছে। এই ধরনের ছাত্র রাজনীতির কবল থেকে কলেজগুলোও মুক্ত নয়। এছাড়া স্কুল-কলেজগুলোর গভর্নিং বডির নির্বাচন নিয়েও এ ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও দলীয়করণ চলে। তাতে স্কুল-কলেজের শিক্ষার মানেরও অবনতি ঘটছে। যেভাবে আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছি,

www.pathagar.com

তাতে প্রাথমিক শিক্ষকদের স্থানীয় কমিউনিটির কাছে কোন জবাবদিহিতার অবকাশ নেই। মাসের শেষে তাঁরা বেতন নেন ঠিকই, কিন্তু সময়মত স্কুলে ক্লাস নেয়ার কাজটি যত্নের সাথে করেন না। এজন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচণ্ড অধোগতি সৃষ্টি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অসুস্থ রাজনীতির সূচনা পাকিস্তান আমল থেকেই। বিশেষ করে আইয়ুব খাঁর স্বৈরশাসন আমলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারপক্ষীয় ছাত্র সংগঠন সৃষ্টি করা হয়েছিল– যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের তাণ্ডব সৃষ্টি করত তারা। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককেও পর্যন্ত লাঞ্ছিত করে। সেদিন যে সংঘাত-সংঘর্ষ হকিস্টিক, ছোরার মধ্যে সীমিত ছিল, স্বাধীনতা-উত্তরকালে সেটা আধুনিক মারণাস্ত্রের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচনে ব্যালট বাক্স হাইজ্যাক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিটি সরকারের আমলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অসুস্থ পরিবেশ বিদ্যমান। কিন্তু প্রশ্ন হল, স্বাধীনতার আগে ছাত্র রাজনীতির যে ভূমিকা, প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক তাৎপর্য ছিল– সেটা আজ কতটুকু আছে? আজ সমাজের মানুষের ওপর ছাত্রদের প্রভাব ক্রমাগত ক্ষয়িষ্ণু। ছাত্রদের ভাবমূর্তি হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন মস্তানের ভাবমূর্তি। বায়ান্নতে ছাত্রদের ডাকেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রাষ্ট্রভাষার দাবীতে আন্দোলনে নামে। ১৯৫৪ সালে ভোটের প্রশ্নে সাধারণ জনগণ ছাত্রদের আবেদনের প্রতিই কর্ণপাত করে। গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের শিক্ষিত সন্তানরা যা বলেছে, সেটাকে এক ধরনের 'বেদবাক্য' হিসেবে গ্রহণ করত। কিন্তু আজ আর ছাত্রদের সেই ভাবমূর্তি নেই। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলোকে চিন্তা করতে হবে যে, তারা তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোকে বহাল রাখবে কী না এবং এই ছাত্র সংগঠন বহাল রেখে তারা রাজনৈতিকভাবে কতটা লাভবান হচ্ছেন– সেটাও রাজনীতিবিদদের চিন্তা করতে হবে. লক্ষ্য করা গেছে, গত এক দশকে কোন ছাত্র আন্দোলনে ছাত্ররা তাদের যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারেনি। কাজেই আমার কাছে মনে হয়, রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ছাত্রদের ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত হয়ে এসেছে। সুতরাং রাজনৈতিক কারণে ছাত্ররা বলা যেতে পারে আনপ্রোডাকটিভ বা কাউন্টারপ্রোডাকটিভ হয়ে পড়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলো আজ রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য অ্যাসেট না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলের লেজুড়ে পরিণত হওয়ার ফলে তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না, সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এর ফলেও সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের অবনতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী। সিনেট, সিণ্ডিকেট ও ডীন নির্বাচন এবং সর্বোপরি ভাইস চ্যান্সেলরের প্যানেল নির্বাচন– এগুলোকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদেরকে প্রচুর সময় কাটাতে হয়। তাদেরকে তাদের কাজের একটা বিরাট সময় এ ধরনের নির্বাচনী তৎপরতা এবং নির্বাচনী বৈতরনী পার হওয়ার জন্য ব্যয় করতে হয়। ফলে তাদের নিজেদের অধ্যয়ন ও গবেষণার মানের অবনতি ঘটে। আমাদের সীমিত সময়কে আমরা জ্ঞানচর্চার জন্য ব্যয় করতে পারি কিংবা অন্যকোন কাজের জন্যও ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু যখন অন্য কর্মকাণ্ড জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে ফেলে, তখন অন্য কর্মকাণ্ডই গুরুত্ব অর্জন করে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য রাজনৈতিক তকমাটি যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছে। ফলে জ্ঞানচর্চায় ভাটা পড়েছে। শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষক রাজনীতি, ছাত্র রাজনীতি এবং জাতীয় রাজনীতির মধ্যে সংশ্লেষ ঘটায় এগুলো আজ একাকার হয়ে গেছে। রাজনৈতিক অঙ্গনের বিরোধ আজ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন বা ক্যাম্পাসেও ছড়িয়ে পড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আমার কাছে মনে হয়, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি নতুনভাবে পর্যালোচনা করার সময় এসে গেছে। তার আগে আমাদেরকে দেখতে হবে আমরা কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদটি পূরণ করব। বিশ্বের বেশকিছু দেশে উন্মুক্ত

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলের পদ যখন শূন্য হবে, তখন উৎসাহী প্রার্থীদের আবেদনের জন্য ঘোষিত বিজ্ঞপ্তিতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারন করা থাকবে। পাশাপাশি ভাইস চ্যান্সেলর পদে প্যানেল তৈরী করার জন্য দেশী-বিদেশী গুণী-মান্যবর-শিক্ষাবিদ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি সিলেকশন কমিটি গঠিত হতে পারে। যে কমিটির কাজ হবে সুনির্দিষ্ট এই পদের জন্য মনোনয়ন দেয়া। বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সেহেতু এর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। যে কারণে সেই সিলেকশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ে সিনেটের মনোনয়নের মাধ্যমে ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হতে পারেন। তিনি যে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক হবেন, এমন কোন কথা নেই, তিনি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এমনকি অন্য পেশারও মানুষ হতে পারেন, যদি জ্ঞানের ক্ষেত্রে, প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ যোগ্যতা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো নির্বাচনই আমরা পরিহার করতে পারি। যেমন– ডীন পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা না রেখে যদি প্রফেসরদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে রোটেশন পদ্ধতিতে ডীন নিয়োগ করা হয়, তাহলে আমরা এই নির্বাচনের বেড়াজালকে অতিক্রম করতে পারব। একইভাবে, সিণ্ডিকেটেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এতে একদিকে যেমন শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে, অন্যদিকে একটা ভারসাম্যমুলক প্রশাসন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয়করণের সমস্যাও হ্রাস পাবে। এছাড়া দেশব্যাপী আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে আরও নানাবিধ সংস্কারমূলক উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘাত-সংঘর্ষের ফলে যেভাবে হতাহতের ঘটনা ঘটে, তার জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনের কোন অপরাধীরই দৃষ্টান্তমুলক বিচার হয় না। ফলে একের পর এক অপরাধ বেড়েই চলেছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব উদ্যাগে যে সমস্ত আইন-শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত, সে ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিকীকরণের ফলে প্রশাসনকে নিরুৎসাহী ভাব দেখাতে আমরা লক্ষ্য করি। এছাড়া অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের মধ্যে এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। বলা হয়ে থাকে, প্রো-ভাইস চ্যান্সেরলর অনেক সময় হয়ে পড়েন এন্টি ভাইস-চ্যান্সেলর। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আমরা তেমনটিই লক্ষ্য করেছি। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ধরনের ঠাণ্ডা লড়াই চলে। একজন যদি তাঁর কাজে কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করেন, অন্যজন সেটাকে ভণ্ডুল করে দেয়ার জন্য নানা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে এ ব্যাপারে দায়ী করতে চাচ্ছি না। দায়ী করতে চাচ্ছি গোটা ব্যবস্থাকে, আমাদের নৈতিক মানের অবনতিকে। আমরা আরও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের ঘটনা পর্যন্তও ঘটে। ছাত্র থেকে শুরু করে শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও এ ব্যাপারে অভিযোগ উঠেছে। এটা চিন্তা করে যে কোন বিবেকবান মানুষ শিউরে উঠবেন। এটাও লক্ষ্য করা যায়, অনেক সময়ে কতিপয় শিক্ষক ছাত্রীদের উপর যৌন সুযোগ গ্রহণ করে তাদের পরীক্ষার ফলাফলকেও প্রভাবিত করে থাকেন। এসব মোটেও কাম্য নয়।

সবশেষে বলবো, উল্লিখিত যে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন ধরে বন্ধ রয়েছে তার জন্য না সরকারের, না রাজনৈতিক দলগুলোর কোন মাথা ব্যথা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় দুটির পরিস্থিতি নিয়ে তারা ভয়ানক খেলায় মেতে উঠেছে। কেউ কেউ মনে করছেন, গায়ের জোর প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে দমন করেই তারা রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করবেন। তাই দেশের সিভিল সোসাইটির নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে, শিক্ষার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর একটি সুস্পষ্ট অঙ্গীকার আদায় করা এবং তার ভিত্তিতে শিক্ষার পরিবেশকে উন্নত করার চেষ্টা চালানো। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন বেশ কিছুদিন ধরেই ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়ে আসছেন এবং এটা বিভিন্ন মহলের প্রশংসাও অর্জন করছে। আমার মনে

www.pathagar.com

হয়, রাষ্ট্রপতির এই উদ্যোগটি বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অবশ্যই সমাজ সচেতন ও রাজনীতিমনস্ক হবে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা একে অপরের সাথে সংঘাতের জড়িয়ে পড়বে। তারা তাদের শিক্ষা অর্জন ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে নিজেদেরকে সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটিজের মধ্য দিয়ে নানা ধরনের মতাদর্শগত লড়াই হতে পারে, বিতর্ক বা প্রতিযোগিতা হতে পারে। কিন্তু তার জন্য মস্তানী করার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে আমাদের পাঠদান পদ্ধতি, পাঠ্যসূচীরও আধুনিকায়নের প্রয়োজন রয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন রয়েছে। যাতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আমরা বাধ্য করতে পারি আরও অধিকতর পাঠ্যপুস্তকমুখী, জ্ঞানচর্চামুখী হওয়ার জন্য, এতে তারা বাধ্য হবে রাজনীতি বা কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে শিক্ষার জন্য অধিক মনোনিবেশ করতে। সেশন জটের ফলে ৪ বছরের স্থলে দ্বিগুণ সময়েও ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না। ফলে সে তার অভিভাবক এবং নিজের উপরও একটি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ আমরা সবাই যেন এ ব্যাপারে খুবই অসহায়। কারণ, সবকিছুর উৎস হচ্ছে রাজনীতি। এই রাজনীতির কালচারের পরিবর্তণ না আসলে এই পরিস্থিতিরও কোন উন্নতি হবে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের রাজনীতিবিদরা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন কতটা আন্তরিকভাবে চান– সেই প্রশ্ন আমি সঙ্গতভাবেই করতে পারি।

আফতাব আহমাদ :

দেশের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে। এর মধ্যে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার একমাত্র কারণ হচ্ছে, সরকারপক্ষীয় কতিপয় সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়টির ওপর যেভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে সিলেটবাসী মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন ও হলের নামকরণকে কেন্দ্র করে যে উৎকট দলীয়করণ এবং রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্যে যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছে, তার প্রতিবাদ যখন সিলেটবাসী করেছেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেয়া হয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরকার ছাত্র রাজনীতির কোন দ্বন্দ্ব কিংবা ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস এবং মস্তানির কারনে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ হয়নি। অতএব, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টি আমাদের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা উচিত। যত দ্রুত সম্ভব একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আমাদের আসা উচিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যত কম বলা যায়, ততো ভাল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলবাস্থার পেছনে দু'টি বড় কারণ রয়েছে। একটি হচ্ছে, বর্তমান ক্ষমতাসীন দলটি ক্ষমতায় আসার পর থেকে সর্বত্র যে নির্লজ্জ দলীয়করণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে, তারই অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে ছাত্রদের হল দখল সব কিছুতেই উৎকট দলীয়করণ শুরু করা হয়। এ প্রক্রিয়ারই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের হাতে বিরোধী দলীয় ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা নিহত হয়। এর পাশাপাশি ভাইস চ্যান্সেলর ও প্রো ভাইস চ্যান্সেলরের মধ্যে যে অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বৈরিতা–এ দু'টি কারণই অচলাবস্থাকে জিইয়ে রাখার পেছনে যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে। একটি সরকারের আইনী এবং নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে, দেশের, সমাজের সকল প্রতিষ্ঠান যাতে সচল থাকে, সে ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। সরকারেরই প্রধান দায়িত্ব সকল প্রতিষ্ঠানকে চালু রাখা। দুর্ভাগ্যবশত শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সরকারকে দেখা গেছে সম্পূর্ণ উদাসীন আচরণ করতে। সরকারের কোন বিকার নেই এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে। অথচ সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এ অচলাবস্থার জন্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে। এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি সচল বা রাহু মুক্ত করতে

www.pathagar.com

হয়, তাহলে সরকারকেই প্রথমে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে আমি মনে করি, দেশের রাজনৈতিক দলগুলোসহ জনসমাজের প্রতিনিধিত্বকারী সুধীজনদের আজ এগিয়ে আসা উচিত এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনের জন্য। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আমরণ অনশন শুরু করেছিল এবং আমরা লক্ষ্য করেছি, রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাদেরকে অনুরোধ করে সেই অনশন ভঙ্গ করিয়েছেন এবং সবশেষে গত ২৯ এপ্রিল তিনি সশরীরে অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের সামনে হাজির হয়ে তাদের অনশন ভঙ্গ করান।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আমাদের রাষ্ট্রপতিই শুধু নন, যেদিন থেকে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে অতিষ্ঠিত হয়েছেন, বাংলাদেশের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করার প্রাণপণ চেষ্টা করে আসছেন। তার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। ব্যক্তিগত এবং সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা। এতদসত্ত্বেও তিনি যে সাধু প্রচেষ্টা ইতোমধ্যে বহুবার গ্রহণ করেছেন, সে জন্য তাকে অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাতেই হয়। আমাদের উচ্চ শিক্ষার সমস্যা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারাই অনেকখানি প্রভাবান্বিত হয়। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির নামে আজকে যা চলছে, তা কোন সভ্য সমাজ গ্রহণ করতে পারে না, বরদাশত করতে পারে না। ছাত্রদের রাজনীতি সচেতন বা রাজনীতিমনস্ক হওয়া আর শিক্ষাঙ্গনে অছাত্রদের দাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। আজ যে ক'টি ছাত্রসংগঠন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় রয়েছে, তার অধিকাংশ সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছে অছাত্র কিংবা ছাত্রত্ব পেরিয়ে 'টেকনিক্যালি' বিভিন্ন সাবজেক্টে নাম এনরোল করা ছাত্র। এটা অসুস্থতার পরিচায়ক। বর্তমানে আমাদের সমাজে ছাত্রদের ভাবমূর্তি এবং ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা,সম্পূর্ণ নেতিবাচক। ছাত্রদের ভাবমূর্তি বলতে গেলে কিছুই নেই। এর কারণ হচ্ছে, ছাত্রদের মধ্যে লেখাপড়ার স্পৃহা এখন অনুপস্থিত। এখন যে সব অছাত্ররা ছাত্ররাজনীতি করছে তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল অসুস্থ রাজনীতি চর্চা করা এবং চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি থেকে শুরু করে যত রকমের অসামাজিক কার্যকলাপ আছে, সেগুলোকে শিক্ষাঙ্গনে চালু রাখা। এর ফলে শিক্ষাঙ্গনের ভৌত কাঠামোর উন্নয়নের ব্যাঘাত যেমন ঘটছে, একই সঙ্গে মেধা এবং বিদ্যায়তনিক বিকাশেরও ব্যাঘাত ঘটছে। এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় আমার মতে একটিই : প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদের আহ্বান মোতাবেক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা। আজও সেই সেই আহ্বানের প্রতি যখন পুনর্ব্যক্ত করতে চাই। সকল শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেয়ার সময় এসে গেছে বলেই মনে হয়। আমি ছাত্রদের রাজনীতি করার বিরোধিতা করছি না। প্রাপ্তবয়স্ক বা সমাজচেতন যে কোন ছাত্র অবশ্যই রাজনীতি চর্চা করতে পারে। সেই চর্চা শিক্ষাঙ্গনের বাইরে হতে হবে। শিক্ষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে হলে চলবে না। একজন ছাত্র বা ছাত্রী মিছিলে আগ্রহী হলে সে মিছিলে অংশ নিতে পারে রাজপথে বা জনপথে গিয়ে।

শিক্ষাঙ্গনে মিছিল করে, মাইক বাজিয়ে, গলাবাজি করে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করার অসুস্থ রাজনীতির জন্য এ দেশ সৃষ্টি হয়নি। এই রাজনীতি এ দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জ্ঞান এবং মুক্তচিন্তা থেকে বঞ্চিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বত্র শিক্ষার মানের যে অবনতি ঘটেছে, তার জন্য অনেক সময় দোষারোপ করা হয় ছাত্র এবং শিক্ষকের গুণগত মানকে। হয়তো এখানে কিছুটা সত্য লুকিয়ে আছে, কিন্তু ব্যাপকতর সত্য হচ্ছে, শিক্ষার পরিবেশ যেখানে নেই, শিক্ষা এবং জ্ঞান আহরণের প্রতি আগ্রহ যেখানে নেই, সেখানে মানের অবনতি ঘটতে বাধ্য। এসএসসি কিংবা এইচএসসি পরীক্ষায় আমরা যখন দেখি হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বহিষ্কৃত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে এসব ছেলেমেয়ে মরিয়া হয়ে শিক্ষকদের মারধর পর্যন্ত করছে নকলের 'অধিকার'

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার জন্য, তখন স্বাভাবিকভাবেই ভাবতে হয়, আমাদের সমাজের গোড়াতেই নিশ্চয়ই কোথাও মারাত্মক কোন গলদ রয়ে গেছে। এ গলদ যদি আজকে আমরা না সারাতে পারি, তাহলে সমাজ ভেঙ্গে পড়বে। এবং ভবিষ্যতে এ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আমরা ধীশক্তিসম্পন্ন প্রশিক্ষিত, আলোকিত যে নাগরিকদের কামনা করি, তা আমরা পাব না। সে জন্য আজকে আমাদের বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে, শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে ভেঙ্গে না পড়ে। তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে শিক্ষাব্যবস্থার সর্বস্তর থেকে দলীয়করণ, রাজনীতিকীকরণ এবং অসুস্থ রাজনীতির চর্চা নিষিদ্ধ করে দেয়া। জনতুষ্টিবাদী কথা বলাটা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সমাজে কতিপয় বহুল পরিচিত বিদ্বান এবং বুদ্ধজীবীরা কথায় কথায় বলেন যে, ছাত্রদের বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে এদেশে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সূচিত হয়ছিল, এদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগঠিত এবং স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। এসবই আংশিক সত্য। সেদিনকার ছাত্ররাজনীতি আর আজকের ছাত্র রাজনীতির মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই পার্থক্যটা যদি আমরা বোঝার চেষ্টা না করি, তাহলে মারাত্মকহ ভুল করব। বাংলাদেশের জন্মের পর ক্ষমতাসীন দল শিক্ষাঙ্গনে যেভাবে শ্বেতসন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহবোধ করেছিল– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে ছাত্রসমাজের মতামত ক্ষমতাসীন দলের অনুকূলে আনার অপচেষ্টা করা হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে যে অশুভ, অশুদ্ধ ছাত্র রাজনীতির জন্ম হয়েছিল '৭২-৭৫ এ তা আজ ডালপালা মেলে অনেক বিশাল আকার ধারণ করেছে এবং একটি বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। আজ সময় এসেছে, এই বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করার। এ বিষয়ে আমার মনে হয় কিছু সিদ্ধান্ত যদি আমাদের কঠোরভাবেও নিতে হয়, তা নেয়ার সময় এসেছে।

উচ্চ শিক্ষার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে ছাত্ররাজনীতি এবং তার পাশাপাশি সে অসুস্থ শিক্ষক রাজনীতি চালু রয়েছে, তার মূলোৎপাটন করার জন্য ১৯৭৩ -এর যে বিশ্ববিদ্যালয় আইনগুলো রয়েছে, বিশেষ করে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, সেই আইনগুলোকে খোল-নলচেসহ বদলে ফেলা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন বলতে আমরা যদি অবাধ লাইসেন্স বা ও জি এল বুঝি, তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে। পাকিস্তানী আমলে আমাদের গুনীজন, সুধী, বিদ্বৎজনরা, গবেষকরা যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনের কথা বলতেন, তখন তারা মূলত বোঝাতেন একাডেমিক ফ্রিডম, ফ্রিডম অব রিসার্চ ইত্যাদির কথা। আর আজ? আজ স্বায়ত্তশাসনের নামে আমরা বুঝি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদটি কিভাবে দখল করা যায় কিংবা রাজনৈতিক দলের হয়ে কিভাবে 'ম্যানেজ' করা যায়, সেদিকে দৃষ্টিপাত করা। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক। এর ফলে আমাদের গোটা উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাটি ভেঙ্গে পড়েছে। উচ্চ শিক্ষার নজিরকে সামনে রেখে উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক স্তরেও আমরা এর প্রতিফলন দেখি। গভর্নিং বডির নির্বাচন কিংবা স্কুলগুলোর বিভিন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আজকে একটি অুসস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে– এই পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের বৃহত্তর সমাজের কাছে আবেদন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতা বা অভিবকদেরও একটি নৈতিক কর্তব্য আছে। সময় এসেছে, আজ তাদেরকেও সংগঠিত হতে হবে এবং সমগ্র দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাতে হবে যে, আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অসুস্থ রাজনীতির কাছে জিম্মি করে রাখব না, তাকে মুক্ত করব। শিক্ষাকে মুক্ত করতে হলে সরকারের কাছেও আবেদন করতে হবে : সরকার ও সরকারী দলসহ সকল রাজনৈতিক দল একটি সহমতে আসুন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতা এবং বৈরীতার বাইরে রাখতে হবে। একথাগুলো বলা যত সহজ, কার্যকর করা তত সহজ নয়। যেটা গোড়াতেই বলেছি, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে, কোন অসুস্থ বা সহিংস ছাত্র রাজনীতির কারণে নয়, কোন ছাত্র মস্তানীর জন্য নয়। সরকারের দলীয়

www.pathagar.com

রাজনীতির আধিপত্য বিস্তারের নগ্ন মনোবৃত্তির ফলেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ রয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে সিলেটবাসী তথা সমগ্র দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

হযরত শাহজালাল (র) এবং তার অনুগামী ৩৬০ জন আউলিয়ার নামে বিভিন্ন হল ও ভবনের নামে নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকার এ বিশ্ববিদ্যালয়টি খুলে দিতে পারেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য অনতিবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হতে পারে। হত্যাকাণ্ডের পিছনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোন ইন্ধন ছিল কী না; ভিসি-প্রোভিসির অসুস্থ বৈরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইটালিটিকে ধ্বংস করছে কী না, তারও একটি সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার। সবচেয়ে বড় কথা, যে নিরীহ ছাত্ররা প্রাণ দিয়েছে, তাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমবেদনা জ্ঞাপন করা। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া সরকারের আইনী এবং নৈতিক কর্তব্য। এ কাজ যদি সম্পাদন করা না হয়, তাহলে তড়িঘড়ি বা জোর করে এইসব বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলেও সুস্থ পরিবেশ কোন অবস্থাতেই ফিরে আসবে না। পরিপূর্ণ একটি সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন সহনশীলতা, প্রয়োজন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা এবং সেটি তখনই সম্ভব, যখন আমরা বহু মত, বহু চিন্তার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে মেনে নিতে পারব। দেশ ও জাতিকে বিভক্ত করে, আদর্শের নামে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ইত্যাদি পুরনো কাসুন্দি ঘেটে যারা মনে করেন, দেশ গঠন, জাতি গঠন সম্ভব, তারা মারাত্মক গোলক ধাঁধায় ঘুরবেন, বিভ্রান্তিতে ভুগবেন। কিন্তু দেশের উন্নয়ন, শিক্ষার উন্নয়ন, সমাজের উন্নয়ন কোনভাবেই সাধন করতে পারবেন না। তাই আজ শিক্ষাব্রতী থেকে শুরু করে সকল শিক্ষানুরাগী নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে, জনসমাজ, রাজনৈতিক দল এবং সরকারের ওপর প্রচণ্ড রকমের চাপ সৃষ্টি করা, যার মধ্য দিয়ে জনগণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাহুমুক্ত করার জন্য পথের দিশা খুঁজে পাবে।

মাহবুব উল্লাহ :

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সমস্যা সম্পর্কে জোর তদন্ত হওয়া উচিত এবং একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত। ১৯৭২ থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যে সব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটছে, যেসব অসুস্থ রাজনীতির চর্চা হয়েছে তার ওপর তদন্ত চালানোর জন্য উচ্চতর আদালতের মান্যবর বিচারপতিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যেখানে এসব ঘটনার উৎস কারণ এবং সমাধান সম্পর্কে জনসমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবকসহ সর্বমহলের সুপারিশের ভিত্তিতে সমাধানের পথনির্দেশ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

১৩ মে ২০০০

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক সম্ভাবনা

মাহবুব উল্লাহ্ :

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর ধারণা করা হয়েছিল— সারাবিশ্বে মার্কিন নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ এবং স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরে আসবে। কিন্তু আজ শুধু উপমহাদেশের দিকে তাকিয়েই আমরা বলতে পারি যে, এই মর্ত্যরাজ্যে এক বিরাট বিশৃংখলা নেমে এসেছে। কেন এবং কী কারণে এসব ঘটেছে, সে বিশ্লেষণ পরের ব্যাপার। কিন্তু গত ক'দিনের সংবাদপত্রে চোখ বুলিয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে— বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটি স্থাপনের সম্ভাবনা নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। গত ৪ মে দৈনিক ইনকিলাবে মিনহাজুর রহমানের লেখা প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ভারত কোনমতেই ভারত মহাসাগরে অন্য কোন শক্তির উপস্থিতি মেনে নিতে চায় না। ভারতীয় সমরবিদেরাও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, হয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে রাজি করিয়ে ফেলতে পারে। এরই পাশাপাশি আরেকটি খবর হচ্ছে, ভিয়েতনামের সঙ্গে ভারত যৌথ নৌ-মহড়া করবে। এই নৌ-মহড়ার ব্যাপারে গণচীনের বক্তব্য হচ্ছে, গণচীন কোনমতেই দক্ষিণ চীন সাগরে ভারতের উপস্থিতি সহ্য করবে না। এদিকে শ্রীলংকার পরিস্থিতিও অত্যন্ত জটিল হয়ে গেছে। এলটিটিই গেরিলাদের হাতে শ্রীলংকার সরকারী সৈন্যদের বিপর্যয়ের পর শ্রীলংকা ভারতের কাছে সাহায্য চেয়েছে। কিন্তু ভারত শ্রীলংকাকে সামরিক মদদ দেবে কি-না সেই প্রশ্নে দোটানার মধ্যে পড়েছে। এর কারণগুলো হচ্ছে, এর আগেও একবার শান্তিরক্ষী বাহিনীর নামে ভারতের সেনাবাহিনী শ্রীলংকায় গিয়েছিল। শ্রীলংকায় সাধারণ নাগরিকদের ওপর ভারতীয় বাহিনী প্রচণ্ড ধরনের নিপীড়ন চালিয়েছিল, যার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা জানি, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এলটিটিই গেরিলাদের এক আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিলেন। সে কারণে ভারত শ্রীলংকার ব্যাপারে সাবধানী হতে চাইছে। একদিকে ভারত যেমন চায় শ্রীলংকার পরিস্থিতি দমনে সৈন্য পাঠাতে— কারণ তা না হলে দক্ষিণ এশিয়ায় একচ্ছত্র শক্তি হিসেবে ভারতের বিদ্যমান ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে; অন্যদিকে এর মধ্য দিয়ে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং আরেকবার ভারতের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাজীব গান্ধীর মত এলটিটিই গেরিলাদের হাতে নিহত হবেন কি-না সেই আশংকাও উড়িয়ে দিচ্ছে না ভারত। তাছাড়া দিল্লীর বর্তমান কোয়ালিশন সরকারে তামিলদের বিরাট একটা প্রভাব আছে। এই প্রভাবের কারণেও কোয়ালিশন সরকারে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, এটাও ভারতকে ভাবিয়ে তুলেছে। ভারত মহাসাগর সম্পর্কে ভারতের নীতিটা হল ভারত মহাসাগর হচ্ছে একটি 'ইণ্ডিয়ান লেক'। এই ইণ্ডিয়ান লেকে ভারত আর কোন শক্তির উপস্থিতি সহ্য করতে রাজি নয়। এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'মনরো ডকট্রিন' নামে একটি মতবাদ চালু করেছিল তার. পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে। সেখানে আমেরিকা এবং তার আশপাশের দেশে বা তার সমুদ্র উপকূলে অন্য দেশের বাহিনীর উপস্থিতি তারা নিষিদ্ধ করছিল। এই জন্য তারা গানবোট ডিপ্লোম্যাসির আশ্রয়ও নিয়েছিল। আমেরিকার অনুকরণে ভারতেরও একটি 'মনরো ডকট্রিন' রয়েছে। যার মূল কথা হচ্ছে, ভারত মহাসাগরে তৃতীয় কোন পক্ষের উপস্থিতি ভারত বরদাশ্ত করবে না। এছাড়া বহুদিন থেকেই ভারত ভারত মহাসাগরকে একটি শান্তির এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। শান্তির বাতাবরণ রেখে ভারত যখন বলে যে. ভারত

www.pathagar.com

মহাসাগরকে একটি সামরিক উপস্থিতিবিহীন অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করতে হবে তখন তার গূঢ় অর্থ হচ্ছে, এই অঞ্চলে একচেটিয়া আধিপত্যের ক্ষমতা ভারতের হাতেই থাকবে। সে কারণে ভারত যেমন চায় না এই ভারত মহাসাগরে আমেরিকার উপস্থিতি, তেমনি চায় না চীনের উপস্থিতি। তবে আমেরিকার উপস্থিতিকে ভারত এড়াতে পারছে না। কারণ দিয়াগো গার্সিয়াতে আমেরিকার নৌঘাঁটি রয়েছে। আরও লক্ষ্য করার মত বিষয় ১৯৮৭ সালে যখন ভারত শ্রীলংকায় গিয়েছিল, তখন তারা অজুহাত দেখিয়েছিল ভারত যদি শ্রীলংকায় না যায়, তাহলে তার জায়গায় ইসরাইলীরা সরাসরি আসবে এবং সেটা ভারতীয় নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে। সেই সময়ে ভারতীয় পণ্ডিতরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ভারত যদি শ্রীলংকায় না যায়, তাহলে সে জায়গা শূন্য থাকবে না এবং প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে শূন্যতা পূরণ করা, ভারত না গেলে অন্য কোন শক্তি তো যাবেই। এবার আমরা লক্ষ্য করেছি, শ্রীলংকা সরকার তার জাতীয় নিরাপত্তা, ভৌগলিক অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য সর্বশেষে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে এবং ৩ মাসের জন্য তার বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দ সামরিক প্রস্তুতি এবং বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় খরচ করার কথা ঘোষণা করেছে। এছাড়া নানা ধরনের বৈরী তৎপরতার বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শ্রীলংকা বিশ্বের সাতটি দেশের কাছে সামরিক সাহায্য চেয়েছে। এর মধ্যে ইসরাইলও অন্তর্ভুক্ত। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি বাংলাদেশের কাছে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য প্রস্তাব রেখেছে এবং বাংলাদেশ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চায় না। কারণ তার ফলে কাশ্মীর প্রশ্নটিকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধীয় বিষয় বলে গণ্য করা হবে। আমরা জানি, ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশ এই দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস নিয়েছিল এবং মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ ব্যাপারে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখিছিলেন, যেটা ইরাক এবং ইরানের নেতৃবৃন্দও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছিলেন। অথচ মার্কিনীদের এই প্রস্তাবের সুবাদে বাংলাদেশ কূটনৈতিক পর্যায়ে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পারত, কিন্তু বাংলাদেশ সেই সুযোগটি গ্রহণে বিরত থেকেছে।

এর সঙ্গে আরও উল্লেখ্য, ভারতীয় লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ থেকে ভারতে গ্যাস আমদানীর বিষয়ে একটা সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ ব্যাপারে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর আগে ভারতের জ্বালানি মন্ত্রী বলেছিলেন যে, বাংলাদেশ থেকে ভারতের গ্যাস আমদানীর সম্ভাবনা নেই। মি. বাজপেয়ী তারই মন্ত্রিসভার একজন সদস্যের বক্তব্যকে খণ্ডন করে জানিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী আবদুল জলিল তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস রফতানীর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এর পূর্ববর্তী অবস্থানে অটল রয়েছে। জনাব আবুল হাসান চৌধুরী আরও বলেছেন যে, অন্য একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে তিনি কোন মন্তব্য করতে চান না এবং এ ব্যাপারে সরকারের অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন যে, বাংলাদেশ ৫০ বছরের নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য গ্যাস মজুত রেখে বাকীটা রপ্তানী করার কথা ভাবছে। এখন আমাদের প্রশ্ন হল, কোন বক্তব্যটি সঠিক? ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, না বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, সেটি সঠিক? এছাড়া আরও একটি ঘটনার কথা সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে ইসরাইলের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারটি অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারেও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী জানিয়ে দিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত প্যালেস্টাইনের সমস্যা সমাধান না হবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ ইসরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না।

www.pathagar.com

এটা তো গেল উপমহাদেশ পরিস্থিতির কথা। এর পাশাপাশি বিশ্বময় পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে দেখব, গত পহেলা মে, মে দিবসকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে শ্রমিক এবং সাধারণ জনগণের জঙ্গী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া থাইল্যাণ্ডের চিনমাইতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সম্মেলনকে কেন্দ্র করেও বিক্ষোভের প্রস্তুতি চলছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংককে বিশ্বব্যাংকের একটি ধামাধরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বিশ্ব ব্যাংক সারা বিশ্বব্যাপী তৃতীয় বিশ্বে তার যে সমস্ত নীতিমালা চাপিয়ে দিতে চায়, সেগুলোকে কার্যকরি করার ব্যাপারে এডিবি সহায়তা করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

আরও একটি ঘটনা লক্ষ্য করার মত, ফিলিপাইনের একটি জঙ্গী গ্রুপ কিছু লোককে পণবন্দী করে এবং ফিলিপাইনের একটি দুর্গম দ্বীপের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে তাদেরকে আটকে রাখে। শেষ পর্যন্ত ফিলিপাইনের সৈন্য বাহিনী এই জিম্মিদের উদ্ধার করার জন্য সেখানে সামরিক অভিযান চালায়। বিবিসির ভাষ্য মতে, এই অভিযানে ৪ জন নিহত হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু বিদেশী পণবন্দী সেখানে আটক রয়েছে, যাঁরা অক্ষতভাবে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব। ফিলিপাইনে অবস্থানরত বিবিসির সংবাদদাতা এই খবরটি পরিবেশন করার সময় বলেছিলেন, 'ক্রিশ্চিয়ান ফিলিপাইন সরকারের' সঙ্গে 'মুসলিম বিদ্রোহীদের' সংঘাতের কথা। এই প্রথমবার ফিলিপাইনকে একটি ক্রিশ্চিয়ান রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করা হল এবং তার বিপরীতে মুসলিম বিদ্রোহীদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের সংঘাত-সংঘর্ষের পেছনে ধর্মের ব্যাপারটি অনেক সময় উল্লেখ করা হয় না। এমনকি প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলের মধ্যকার বিরোধকে 'ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের লড়াই'– এভাবে অতীতে পশ্চিমা মুখপত্রগুলো সংবাদ পরিবেশন করেনি। যদিও যারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তাঁরা এটাকে 'জায়নবাদের' বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। এর পাশাপাশি আরেকটি চমকপ্রদ খবর বেরিয়েছে, সেটি হচ্ছে– জেনারেল ম্যাকআর্থার ১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর জাপানের সম্রাটকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নেয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন এবং সম্রাট সেই সময়ে অতি কষ্টে সেই চাপ প্রতিহত করেছেন। তিনি এটাও বলেছিলেন যে, এভাবে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব ঘটনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ধর্মীয় পরিচয়কে আমরা রাজনীতি থেকে যত দূরে সরাতে চাই না কেন, এবং রাজনৈতিক সংঘাত যাতে শেষ পর্যায়ে ধর্মীয় সংঘাতে পরিণত না হয়, সেটা আমাদের বিবেচনায় যতই থাকুক না কেন, পর্দার অন্তরালে অনেক বিরোধের পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে ধর্মীয় অনুভূতি কাজ করে। উপনিবেশবাদ যখন তৃতীয় বিশ্বে যায়, তখন তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই তারা খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেছে। আফ্রিকার অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাই বলেছেন যে, উপনিবেশবাদ আফ্রিকায় এসেছিল বাইবেল হাতে নিয়ে। ফিলিপাইনে আমেরিকা তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার পর সেখানে ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। এসব মিলিয়ে এখন যেন মনে হচ্ছে, হান্টিংটনের তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব হবে সভ্যতার দ্বন্দ্ব। ইসলামী সভ্যতার সঙ্গে খৃস্টীয় সভ্যতার দ্বন্দ্ব। সবকিছু মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, উপমহাদেশের পরিস্থিতি খুব দ্রুত পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ যদি সচেতনভাবে তার নিজস্ব স্বকীয়তা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন নীতি গ্রহণ না করে, তাহলে বাংলাদেশের পক্ষে তার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশের জনগণ এখন খুবই উদ্বিগ্ন বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ রক্ষার প্রশ্নটি নিয়ে। এই গ্যাস সম্পদ থেকে বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সর্বোত্তম সুবিধা অর্জন করার বিষয়টি এখন এদেশের জনগণের মনে নাড়া দিচ্ছে। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

একটি রাজনৈতিক অবস্থান থাকলেও বিশ্বের জ্বালানি সম্পদের মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল না বললেই চলে। কিন্তু বাংলাদেশে গ্যাস সম্পদ আবিষ্কারের সম্ভাবনা বাংলাদেশকে বিশ্বের জ্বালানি সম্পদের মানচিত্রে কিছুটা স্থান করে দিয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে খেয়োখেয়ি আগামী দিনে যে অনেকটা বৃদ্ধি পাবে- সেটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এছাড়া আমরা জানি, যারা বিশ্বের শক্তি-সম্পদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, তাঁরা বলেছেন ২০২০ সালের মধ্যে সারাবিশ্বে একটি জ্বালানি সংকট নেমে আসবে, যার পরিণতিতে বিশ্বব্যাপী এই সম্পদের উৎসস্থলগুলোর উপর দখলদারিত্ব বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব তথা আধিপত্যবাদের বিপদ আরও প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। ভবিষ্যদ্বক্তারা আরও বলেছেন যে, ২০২০ সালের মধ্যে চীনের মত একটি বড় দেশের শক্তি চাহিদা যুক্তরাষ্ট্রকে অতিক্রম করে যাবে। তখন চীনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কি দাঁড়াবে- সেটাও ভাবনার বিষয়। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল প্রেস থেকে প্রকাশিত HAMISH McRAE নামে একজন লেখকের The World in 2020; Power, Culture and Prosperity নামক গ্রন্থে (যেটি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত) লেখক দেখিয়েছেন, আগামী দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতাগুলো কিভাবে ফুটে উঠবে। তার পাশাপাশি অবশ্য তিনি তার শক্তিগুলোও চিহ্নিত করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক আধিপত্য ছিল, সেটা বিভিন্ন কারণে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিএনপিতে সার্ভিস সেক্টরের গুরুত্ব প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটা প্রায় ৭০ শতাংশে উন্নীত হতে চলেছে। সার্ভিস সেক্টর আপেক্ষিকভাবে রপ্তানীমুখী নয়, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যালান্স অব পেমেন্টে সংকট দেখা দিতে পারে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির 'একিলিস হিল'। এর পাশাপাশি অন্যান্য ইউরোপীয় উন্নত দেশ এবং জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটতে থাকলেও সেটা আমেরিকার তুলনায় মন্থর। এসব কারণে সন্দেহ জোরদার হচ্ছে যে, বিশ্বে পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকার একক ক্ষমতা হয়ত ভবিষ্যতে থাকবে না। কারণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব হয়। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিবেচনা করতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্তায়মান সূর্যের বিষয়টি, তেমনি বিবেচনায় আনতে হবে, পৃথিবীতে উদীয়মান শক্তি কোনটি বা কোনগুলো। এটি যথাযথভাবে বিবেচনায় না রাখা হলে আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে সর্বাধিক সুবিধা অর্জণ করতে পারব না।

সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদপত্রে একটি সংবাদ বেরিয়েছে। সেটি হচ্ছে, উলফা নেতা পরেশ বড়ুয়া পাকিস্তানে গেছেন এবং পাকিস্তানের কাছ থেকে তারা আরও সাহায্য-সহযোগিতা চাচ্ছেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর খবর অনুযায়ী গত কিছুদিন উত্তর-পূর্ব ভারতে কিছু সংখ্যক উলফা জঙ্গী আত্মসমর্পণ করায় পরেশ বড়ুয়া বাধ্য হয়েছেন পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে। এখানে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, পরেশ বড়ুয়া বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান হাইকমিশনের ভুয়া পাসপোর্ট জোগাড় করে পাকিস্তানে গেছেন, এই অভিযোগটি। অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারতীয় বিদ্রোহীদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে, এরকম একটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব বিষয়টি নাকচ করে দিলেও বাংলাদেশের ওপর যে প্রচণ্ড একটি চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা সবসময়ে বলে থাকি যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলেই বাংলাদেশের মঙ্গল হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রায় প্রতিটি ব্যাপারেই ভারত সুসম্পর্ক গড়ে তোলায় আন্তরিক নয় এবং নানা প্রশ্নে বাংলাদেশকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ তার

www.pathagar.com

এই প্রতিবেশীর সঙ্গে কিভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে এবং কীভাবে প্রতিবেশীর চাপকে প্রতিহত করে নিজের মর্যাদাকে রক্ষা করতে পারে, সেটিও ভাবনার ব্যাপার। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে বিশ্বের পরিস্থিতি এবং উপমহাদেশের দিকে তাকালে আমরা দেখব, পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে উঠছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের যেসব সুযোগগুলো আসছে, সেগুলো যথার্থভাবে ব্যবহার করার জন্য বাংলাদেশের নেতৃত্বের মধ্যে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস, ধীশক্তি এবং দূরদৃষ্টির অভাব রয়েছে বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

আফতাব আহমাদ :

বিশ্ব পরিস্থিতি যত জটিলই হোক না কেন এবং উপমহাদেশের পরিস্থিতি আপাতদৃষ্টিতে যতই ভারতের অনুকূলে মনে হোক না কেন, আসলে পুরো ব্যাপারটি এমন একটি অবস্থার মধ্যে রয়েছে, যেখানে সযত্নে, সুষ্ঠু কূটনৈতিক উদ্যোগে যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ এবং লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিরাট একটি সুযোগ গ্রহণ করা যায়। আজকের এই আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর যদি আমরা একটু গভীরভাবে মনোনিবেশ করি, তাহলে একটি বিষয় আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যাবে। সেটি হচ্ছে এই যে, আমরা নিজেরা নিজেদের জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে যত না সজাগ এবং যত্নবান, তার চাইতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিষয়ে অনেক বেশী উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, বাংলাদেশ একটি চমৎকার বিশ্বপরিস্থিতি এবং নিজ স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি চমৎকার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে ব্যাপারে বাংলাদেশ যত্নবান হতে পারেনি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে-বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, সকলে এ বিষয়ে অনেক বেশী আগ্রহী এবং বাংলাদেশ মুখাপেক্ষী। অথচ আমরা আমাদের এই গুরুত্বটিকে কখনোই মূল্য দিতে চেষ্টা করিনি এবং আমাদের হাতের এই তুরুপটিকে যথার্থভাবে ব্যবহারের জন্য যত্নবান হইনি।

আজ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রয়েছে, তার কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সকলেই চাইবে বাংলাদেশের অবস্থানটিকে সুদৃঢ় করতে এবং আমরা যদি কূটনৈতিকভাবে এর সদ্ব্যবহার না করতে পারি, সেটি হবে আমাদেরই ব্যর্থতা। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরের সময়ে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম যে, সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি কৌশলগত সমঝোতায় পৌঁছতে হয়ত সক্ষম হবে। কিন্তু সকল তথ্য এবং উপাত্ত থেকে এটি আমাদের কাছে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট নয় যে, এ বিষয়ে আদৌ দু'দেশের মধ্যে কোনও ধরনের কথাবার্তা হয়েছে কি-না। অথচ ভারতীয় পত্র-পত্রিকা বিষয়টি আঁচ-অনুমান করতে পেরে আগে থেখেই যথেস্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছে। ভারতীয় নাগরিকদের এবং পাঠকদের এ ব্যাপারে সজাগ ও সচেতন করার চেষ্টা করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় তারা সর্বশেষ যে খবরটি পরিবেশন করেছে, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সামরিক কিংবা নৌ ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ভারত খুব একটা ভাল চোখে যে দেখে না, সেটি বলাই বাহুল্য। কারণ, ভারত মনে করে, বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের প্রত্যেক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ভারতের অভিপ্রায় অনুধাবন করে ভারতীয় নীতির একটি সম্প্রসারিত রূপ হবে এসব অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতি। এ কারণেই উপমহাদেশে ভারত তার প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শ্রীলঙ্কার প্রসঙ্গটি এভাবেই এসে যায়। ১৯৮৭ সালে শ্রীলঙ্কায় শান্তি রক্ষার নামে ভারত শ্রীলঙ্কার ওপর যে চুক্তিটি চাপিয়ে দিয়েছিল, সেটি শ্রীলঙ্কাবাসী আদৌ গ্রহণ করেনি এবং এর পরবর্তী পরিণতি সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। এমনকি, চুক্তিটি

www.pathagar.com

স্বাক্ষরের পর রাজীব গান্ধী যখন কলম্বো বিমান বন্দরে গার্ড পরিদর্শন করেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর একজন নৌ সেনা রাজীব গান্ধীকে লক্ষ্য করে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করেছিল। সেই নৌ সেনাকে যদিও নৌ বাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, গ্রেফতার করা হয়েছিল- তেমন বড় ধরনের কোন সাজা তাকে দেয়া হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। আজকে শ্রীলঙ্কা তার সামরিক পরিস্থিতিগত কারণে ভারতের সাহায্য যেমন চেয়েছে, একই সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছেও আবেদন জানিয়েছে। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে পাকিস্তানও রয়েছে। এটি অনুধাবন করার বিষয়। ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে মনরো ডকট্রিনের বিকাশ ঘটেছে- যেটিকে কখনও বলা হয় নেহেরু ডকট্রিন, ইন্দিরা ডকট্রিন- অধুনা যেটিকে গুজরাল ডকট্রিন বা আদভানী ডকট্রিন- নানা নামে অভিহিত করে লালন করা হয়েছে, তার সারবস্তু হচ্ছে ভারতীয় প্রভুত্বকে নিরঙ্কুশ ও নিশ্চিত করা। অতএব এই ডকট্রিনকে আমি বলি 'প্রভুত্ব ডকট্রিন'। এই প্রভুত্ব ডকট্রিনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে ভারতকেন্দ্রিক এই অঞ্চলে, যে অঞ্চলে ভারতের বিশালত্ব এবং আধিপত্য রয়েছে সেই অঞ্চলে কখনও কোন ধরনের সমস্যা, সংকট, সংঘাত বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে সেগুলো নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশকে ভারত মুখাপেক্ষী হতে হবে এবং ভারতের কাছে আবেদন করতে হবে তৃতীয় কোন পক্ষকে আহবান করার আগে। এ বিষয়ে ভারতীয় তাত্ত্বিক ভবানী সেন খুব প্রাঞ্জলভাবে বলেছেন যে, ভারতকে আহবান না জানিয়ে তৃতীয় কোন পক্ষকে আহবান জানালে ভারত সেটা তার প্রতি বৈরী আচরণ বলে গণ্য করবে। ভবানী সেন মূলত ইন্দিরা ডকট্রিনের ব্যাখ্যা এভাবেই দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আমার মনে হয়, ভারতীয় সমর বিশারদ, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারক এবং আধিপত্যবাদীদের এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সজাগ থেকেই শ্রীলঙ্কা প্রথমে ভারতের কাছে আবেদন জানিয়েছে। যদিও অতীতে শ্রীলংকার এমন সংকটে ভারতের অংশগ্রহণ শ্রীলংকার জন্য সুখকর ছিল না। তাই আজ নুতন করে ভাববার বিষয় যে, শ্রীলংকা ভারতের কাছে যে আবেদনটি করেছে, সত্যিকার অর্থে শ্রীলংকা কী চায়, যে ভারতীয় সামরিক উপস্থিতি শ্রীলংকায় ঘটুক? কেননা তামিল সমস্যা জন্মের পেছনে ভারতের হাত অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। যে প্রভাকরণ আজকে শ্রীলংকার অখণ্ডতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই প্রভাবকরণ তো ভারতের সৃষ্টি। এলটিটিই গেরিলারা দীর্ঘদিন ভারতে প্রশিক্ষণপাপ্ত হয়ে সেখান থেকে সমরাস্ত্র পেয়ে এসেছে। যদিও একটি জটিল পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে এলটিটিইর একটি নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তথাপি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলের তামিলদের সাথে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং ভারতের তামিলনাড় রাজ্যের একটা গভীর যোগাযোগ রয়েছে। এই যোগাযোগ শ্রীলংকার অখণ্ডতা এবং সংহতির জন্য একটি হুমকি স্বরূপ। অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশের মত একটি দেশকেও স্বাবলম্বী দেখতে চায় না এবং সে কারণে আমরা যতই ভারতের সাথে একটি সৎ প্রতিবেশীসুলভ সৌহার্দ্যপূর্ণ একটি সম্পর্ক কামনা করি বা গড়ে তোলার ওপর জোর দেই না কেন, ভারত একতরফাভাবে তার স্বীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে বাংলাদেশের ওপর নানা সময়ে নানা শর্ত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। যার ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কখনোই সুস্থ এবং স্বাভাবিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। ভারতীয় লোকসভায় যখন অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেন যে, বাংলাদেশের সাথে ভারতে গ্যাস আমদানীর প্রশ্নে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং ভারতের অনুকূলে সিদ্ধান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ভিত্তিহীন একটি উক্তি লোকসভায় দাঁড়িয়ে করতে পারেন না। এর আগেও আমরা লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশের একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠক এবং বিবৃতির মাধ্যমে ভারতে গ্যাস রফতানী করার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেছে।

বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের অন্যতম অভিযোগ হচ্ছে এই যে.

www.pathagar.com

এই দলটি ভারতীপন্থী এবং ভারত মুখাপেক্ষী হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। এই দলটি বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের চাইতে ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের অনেক বেশী যত্নবান। তার পরিচয় ও প্রমাণ হিসেবে ইতোমধ্যে সম্পাদিত ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি চুক্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির সাথে সম্পাদিত চুক্তিই যথেষ্ট। এর পাশাপাশি আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে সম্পাদন করেছে, যেটি বাংলাদেশর সার্বভৌমত্বকে অনেক বেশী কম্প্রোমাইজ করেছে। বাংলাদেশ ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর প্রশ্নে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার একটি চুক্তি সই করে। এই চুক্তি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা স্বার্থে এবং বাংলাদেশের সীমান্তে উত্তেজনা হ্রাসের প্রশ্নে যতটুকু না যত্নবান, তার চাইতে বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে ভারতীয় স্বার্থে ব্যবহারের বিষয়ে অনেক বেশী যত্নবান। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের মানুষ এ ধরনের চুক্তিকে বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল ভাবতে পারে না। যে সরকার এই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে, সেই সরকারই আবার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয় যে, অতীতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ভারতীয় বিদ্রোহীরা ব্যবহার করছে, কিন্তু বর্তমান সরকার ব্যবহার করতে দিতে নারাজ। অথচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কর্মকর্তারা সবসময়ে বলে এসেছেন যে, বাংলাদেশ কখনোই ভারতীয় বিদ্রোহীদের প্রশ্রয় দেয়নি, মদদ যোগায়নি এবং বাংলাদেশকে তাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়নি। লক্ষ্য করার বিষয়, রাজনৈতিক সরকার এক ধরনের আচরণ করছে আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী আমলাতন্ত্র ভিন্ন ধরনের মত পোষণ করছে। এক কথায় বলা যায়, রাজনৈতিকভাবে ভারত যে কথা শুনতে চায় এবং যে অজুহাত ভারত তার ভূ-রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চায়, সেগুলো ক্ষমতাসীন দলটি আগ বাড়িয়ে সরবরাহ করছে। এ থেকে বুঝতে হবে যে, আমরা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার সদ্ব্যবহার না করে নিজেদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণে অনেক বেশী যত্নবান।

ভারত মহাসাগরসহ গোটা প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারত তার আধিপত্যকে সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে অনেক বেশী আগ্রহী, উদগ্রীব এবং যে কারণে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের রাষ্ট্র বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এদের প্রতিরক্ষা, পোটেনশিয়ালকে কিভাবে নস্যাৎ করা যায় এবং ভারতীয় আধিপত্য ও সম্প্রসারণবাদী নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ রাষ্ট্রগুলো যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, তার জন্য একের পর এক পদক্ষেপগুলো কি নেয়া যায়, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভারত তা বিবেচনায় রাখছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভারত যখন ভিয়েতনামের সঙ্গে যৌথ নৌ মহড়ার কথা চিন্তা-ভাবনা করে, কিংবা ভারত যখন বলে যে, ভারত মহাসাগর হচ্ছে ভারতের স্বাভাবিক হ্রদ, তখন ভারতের সামরিক অভিলাষ সম্পর্কে আমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা নেয়া দরকার। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ভারত কব্জা করতে চায়। চট্টগ্রাম বন্দরকে ভারত তার বাণিজ্যিক এবং প্রতিরক্ষা স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। এ বিষয়ে দেবগৌড়া থেকে শুরু করে আই কে গুজরাল এবং বর্তমান ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বহুবার তাদের মনোবাসনার কথা ব্যক্ত করেছেন। ঢাকা-কলিকাতা বাস সার্ভিস চালু করার নামে অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন ঢাকা সফরে এলেন তখনও তিনি বললেন যে, বহুমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত ও উন্নত করা দরকার। তিনি চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ ভারতকে করে দেয়াসহ বাংলাদেশকে ভারতের জন্য ট্রানশিপমেন্ট, ট্রানজিটের নামে করিডোর প্রদানের প্রস্তাব উত্থান করেন। ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে ভারতকে ট্রানশিপমেন্টের নামে করিডোর প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করছে। এই বিষয়কে একত্রিত করে যদি আমরা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে মুল্যায়ন করি, তাহলে একটি জিনিস অত্যন্ত স্পষ্ট– ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পররাষ্ট্রনীতিতে যেসব

www.pathagar.com

উপাদান সংযোগ করা প্রয়োজন বা অত্যাবশ্যক, সে বিষয়ে আমরা যত্নবান নই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের এই অঞ্চলে যে স্বার্থ রয়েছে, সেই স্বার্থের প্রশ্নে এই দুই দেশের সাথে আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমরা গড়ে তুলতে পারি, সে বিষয়ে যত্নবান না হয়ে নিজেদেরকে আমরা একঘরে করে ভারতনির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে যদি বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তোলার চেষ্টা করি, তাহলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই থাকবে না। সব নিঃশেষিত হয়ে যাবে। এ কথা সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক সময় ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার স্বাভাবিক নেতা হিসেবে মানতে আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু যুগপৎভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ করে পেন্টাগনে এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টে এ নিয়ে এ রকম সুস্পষ্ট দু'টি মতামত রয়েছে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারসাম্যের কেন্দ্র কেবল ভারতেই অবস্থিত নয়। এর একাধিক কেন্দ্র রয়েছে এবং পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ এই তিনটি রাষ্ট্রের ওপরে ভর করে যদি ভারতনীতি নির্ধারণ করা যায়, তাহলে একটি ভারসাম্য আনা যেতে পারে পররাষ্ট্র নীতিতে। এটি মার্কিন কৌশলবিদদের কাছে দীর্ঘদিনের একটি বিবেচ্য বিষয়। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যদি এই বিষয়টি অনুধাবন করে কাউন্টারভেইলিং ফোর্স ডেভেলপ করার প্রশ্নে যত্নবান না হই, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কৌশলগত সুবিধা বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করছে, তাকে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনবোধ করবে না। তাই আজ সামগ্রিকভাবে বিশ্ব পরিস্থিতির কথা ভেবে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাব, না ভারতীয় প্রচার মাধ্যম এবং ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ থেকে যে বাহ্যিক ধারণা আমাদের মনোজগতে সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে, তাকে আঁকড়ে ধরে আমরা আমাদের পররাষ্ট্র নীতি চালাব। এ বিষয়ে একটি কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের বলা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে এই, বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য এবং তার ইতিহাস এবং ভূগোল সম্পর্ক যদি বিস্মৃত হয়ে যায়, তাহলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। একথা সত্য যে, আমরা আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান কখনই বদলাতে পারব না। এ কথাও সত্য যে, আমরা আমাদের ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকেও পাল্টাতে পারব না। এ কথাটিও সত্য যে, আমরা চাইলেই প্রতিবেশী বদল করতে পারব না। কিন্তু এ কথাও সত্য, প্রতিবেশীর সাথে আমরা আমাদের সম্পর্ক গড়ে তুলব এবং এর পাশাপাশি প্রতিবেশীর খবরদারীর বিরুদ্ধে ভারসাম্য আনয়নের জন্য আমরা বিশ্বব্যাপী মিত্রের সন্ধানে কোন বিকল্প পথ খুঁজে নেয়ার ব্যাপারে যদি যত্নবান না হই, তাহলে আমার মনে হয়, আমাদের এই স্বকীয়, স্বতন্ত্র, স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। কিউবার মত একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যদি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাকের ডগায় স্বাধীন-সার্বভৌম অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারে, বাংলাদেশের জন্য সে কাজ নিশ্চয়ই অতি দুরূহ হতে পারে না। কারণ বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল মানব সম্পদ, বিশাল খনিজ সম্পদ এবং অতি স্পর্শকাতর, গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক অবস্থান, যার সদ্ব্যবহার আমাদের বিরাট এক সুযোগ এনে দিতে পারে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্নে।

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন নেই– এ ধরনের কথা আমাদের দেশের একদল মুখচেনা বুদ্ধিজীবী অনেকবার বলেছেন। শ্রীলঙ্কার আজকের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মূল কারণ হচ্ছে– খুব গোড়াতে শ্রীলঙ্কা একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি। সেখানে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য একটি পুলিশ বাহিনী ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতের উস্কানিতে তামিলরা যখন বিদ্রোহী তৎপরতা শুরু করে, তখন শ্রীলঙ্কা একটি সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। মালদ্বীপে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী না থাকায় কিছু সংখ্যক দস্যু মালদ্বীপের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রায় দখল করতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বিমান

www.pathagar.com

বাহিনী সেখানে হস্তক্ষেপ করে প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইউমকে তার হৃত ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। এসব ঘটনা থেকে আমাদের বিরাট শিক্ষা নেয়ার আছে। সেটি হচ্ছে এই, বাংলাদেশকে অবশ্যই যত ক্ষুদ্রই হোক, একটি শক্তিশালী, ওয়েল মোটিভেটেড, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য এর বিকল্প আর কিছু নেই। সম্প্রতি একটি খবর আমাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সেটি হচ্ছে, যৌথ সামরিক মহড়ার নামে বাংলাদেশের নদীপথ, ভূ-প্রকৃতি এবং গোপন স্থাপনার ছবি ভারতীয় সেনা সদস্যরা তুলে নিয়ে গেছে। এদেশের যতটুকু জায়গা তারা নদীপথে অতিক্রম করেছে, তার সবটুকুর ভিডিও তারা করে নিয়ে গেছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ ঘটনার ব্যাপারে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি। এটাও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আমরা জানি যে, পঁচাত্তর-পূর্ব পররাষ্ট্র নীতির মূল ভেদরেখাটি হচ্ছে এক জায়গায়। পঁচাত্তর-পূর্ব পররাষ্ট্র নীতি ছিল একান্তভাবেই দিল্লীনির্ভর। পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে দিল্লীনির্ভরতা সামান্য কাটিয়ে উঠে সেটাকে বহুমুখী করার চেষ্টা করা হয়। মাঝে মাঝে এই প্রচেষ্টায় ছেদ পড়লেও এটি অব্যাহত ছিল। কিন্তু '৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবার আমাদের পররাষ্ট্র নীতিকে একান্তভাবে দিল্লীনির্ভর তথা দিল্লীর হুকুমনির্ভর করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। মিগ- ২৯ বিমান আমদানীসহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য অশোক লেল্যাণ্ডের ট্রাক আমদানী ইত্যাদি ঘটনা কিন্তু সেই ভারতমুখীনতারই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, যে সমস্ত সামরিক সরঞ্জাম আমরা সেনাবাহিনীতে সংযোগ করছি, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা যদি ভারতের মত একটি দেশের সঙ্গে থাকে, তাহলে আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এ ব্যাপারে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তার চেয়েও বড় মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের নিরাপত্তাগত দিকটি। আজ বাংলাদেশের সামনে যেমন অপরচুনিটিজ রয়েছে, তেমনি চ্যালেঞ্জও রয়েছে। চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে- বাংলাদেশ প্রায় ভারতবেষ্টিত একটি রাষ্ট্র। কিন্তু অপরচুনিটিও অনেক। বাংলাদেশের নিকটেই চীনের অবস্থান। বাংলাদেশের সামনেই ভারত মহাসাগর। বাংলাদেশ ইচ্ছে করলেই চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ভারসাম্যমূলক শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপন করে তার মর্যাদার আসনকে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, কিন্তু সেই অপরচুনিটিকে আজকে যথার্থ সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে না। আর হচ্ছে না বলেই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ক্রমান্বয়ে ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে আমাদের শাসকগোষ্ঠীর কি বক্তব্য রয়েছে, সেটা জানতে পারলে ভাল হত। বাংলাদেশ যদি যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম বিশ্বসহ অন্যান্য দেশের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, তাহলে ভারতের সাথেও তেমনটি হবে, অন্যথায় নয়। কারণ সে ক্ষেত্রে ভারত থাকবে দাতার প্রান্তে, আর বাংলাদেশ থাকবে গ্রহীতার প্রান্তে।

সাম্প্রতিক আরেকটি খবর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটি হল, 'শান্তিবাহিনী'র অনেক নেতা এখনও দেশে ফেরত আসেনি। আমরা যদ্দূর জানি, প্রীতিকুমার চাকমাও এখন ফেরত আসেনি। তাহলে ভারত কি আরেকটি পার্বত্য বিদ্রোহ সৃষ্টি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে? সেক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত পার্বত্য শান্তিচুক্তির সারবত্তা কি, সেটি এখন ভাবতে হবে।

www.pathagar.com

২০মে, ২০০০

বাংলাদেশের প্রাক্তন ও বর্তমান পররাষ্ট্র সচিবদের মানসলোক

মাহবুব উল্লাহ :

গত ২৯ জানুয়ারী 'প্রথম আলো' পত্রিকার উদ্যোগে 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি গোলটেবিল বেঠক অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান পররাষ্ট্র সচিবসহ সাবেক পররাষ্ট্র সচিবদের নিয়ে মোট ১০ জন পররাষ্ট্র সচিব এই গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। গত ৩ মে ২০০০ তারিখে 'প্রথম আলো' এই গোলটেবিল আলোচনার বিস্তারিত নিয়ে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। এ ধরনের একটি গোলটেবিল বৈঠক নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, রাজনৈতিক সরকার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করলেও পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের ব্যাপারটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত থাকে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আমলারা এই কাজটি করে থাকেন। আমাদের দেশে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে খোলামেলা আলোচনার সংস্কৃতিটি নেই বললেই চলে। বিশেষ করে ব্যক্তিবিশেষ যদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আমলা বা কর্মকর্তা হন, তাহলে তারা এসব বিষয় প্রকাশ্যে তাদের ধ্যান-ধারণা ও মতামত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকেন। অথচ আমরা লক্ষ্য করেছি, পশ্চিমা দেশগুলোতে এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতেও যারা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন কিংবা সরকার পরিবর্তনের ফলে দায়িত্ব থেকে বিদায় নিয়েছেন, তারা তাদের সময়ে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের প্রেক্ষাপট এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে তাদের নিজ রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করে গ্রন্থও রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি হেনরী কিসিঞ্জারের White House Years বইটির কথা উল্লেখ করব। এ ধরনের বড় কলেবরে না হলেও ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব জে, এন দীক্ষিত প্রমুখও এ বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন।

যদিও 'প্রথম আলো'র এই গোলটেবিল বৈঠকের শিরোনাম ছিল 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', কিন্তু আলোচনায় বর্তমানের দিকটি যেভাবে এসেছে, ভবিষ্যতের বিষয়টি ঠিক সেভাবে আসেনি। আলোচ্য দশজন পররাষ্ট্র সচিবের ক্ষেত্রেই এই মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক। আমরা যখন পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে আলোচনা করি, নিঃসন্দেহে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে ভবিষ্যতের বিষয়টিকে সামনে রাখি। কারণ ভবিষ্যৎ তো বর্তমানের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। আর বর্তমান দাঁড়িয়ে আছে অতীতের ওপর। কিন্তু এদের আলোচনা পড়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু কথা মনে হয়েছে। বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব শফি সামী সঙ্গতকারণেই হয়তো তাঁর মনের কথা খোলামেলা বলতে চাননি বা বলতে পারছেন না। তিনি সাদামাটাভাবে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের একটি ইতিহাস, (বিশেষ করে ১৯৭১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত) নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, এই বিষয়ের পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত এবং একদিনের আলোচনায় এ সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে আলোকপাত করা সম্ভব নয়। তিনি উল্লেখ করেছেন, জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ ভারতের সাথে গভীরভাবে জড়িত, কিন্তু ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি উচ্ছ্বাসময়, হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আবার 'জাতির জনকের' হত্যার পর তা চূড়ান্ত অবিশ্বাসে পর্যবসিত হয়। পঁচাত্তরের অগাস্ট থেকে সাতাত্তরের মার্চ পর্যন্ত আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সম্পূর্ণ পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চরিত্র লাভ করে। আমার মনে হয় তিনি যেভাবে মোটা দাগে ভারত

www.pathagar.com

এবং বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কের চরিত্রটি বর্ণনা করতে চেয়েছেন, সেখানে যথেষ্ট গভীরতার অভাব রয়েছে। ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক কেবল একাত্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যদি আমরা আর কিছু উল্লেখ নাও করি, তাহলে আমরা তো এটা জানি যে ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে এবং ফারাক্কা সমস্যা যে কেবল একাত্তর থেকেই শুরু হয়েছে একথা বললে বোধহয় সব কথা বলা হয় না। এছাড়া পাকিস্তানের জন্মলগ্নের পর থেকেই পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের জনগণের মধ্যে যে অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শোষণ-বঞ্চনার যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছিল, সেই সব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারত সযত্নে এই বিষয়টিকে নিজস্ব রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছে। ১৯৬৫'র যুদ্ধ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তেই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ভারত কর্তৃক আক্রান্ত হয়নি। যদিও সেই সময়ে পাকিস্তান সরকার বলেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি জায়গায় ভারতীয় বিমানবাহিনী বোমা নিক্ষেপ করেছে। সেই প্রচারণাটা কতটা সত্য ছিল, সেই প্রশ্ন থেকেই গেছে। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে, সেই সময়েই ১৯৬৫'র যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল যে, যুদ্ধের সময়ে পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত ছিল।

এই প্রশ্নটি উত্থাপনের সাথে সাথে পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত ছিল না এবং পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ মিত্র চীন পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার বিষয়ে গ্যারান্টি দিয়েছিল। এই ঘটনাগুলো জে, এন দীক্ষিতের গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি ১৯৭১-এ গঠিত প্রবাসী সরকারের সাথে ভারতের কিছু কিছু বিষয়ে কিছু সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ করে মুজিববাহিনী গঠনের প্রশ্নে। তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত প্রবাসী সরকারের সম্পূর্ণ অগোচরে এই মুজিব বাহিনী গঠনে 'র'-এর একটা তৎপরতা ছিল এবং 'র'ই এই বাহিনীকে সংগঠিত করেছিল। এছাড়া, বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব কারা করবেন, এ বিষয়েও দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে শুধু রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে ভারত কখন স্বীকৃতি দিয়েছিল, এই বিষয়টি মুখ্য নয়। আমার মনে হয়, একাত্তরের যুদ্ধের সময় সংঘটিত ঘটনাগুলোও আমাদের বিচার-বিশ্লেষণে আনা উচিত। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে পরিচালিত হবে, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী কিভাবে সংগঠিত হবে—এসব প্রশ্নে ভারতীয় সমরনায়কদের সাথে জেনারেল ওসমানীর মতান্তরের কথা আমরা জানি এবং এই দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা কালো মেঘের সূচনা তখন থেকেই হয়েছিল। আমরা জানি একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর ১৭, ১৮ কি ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় সৈনাবাহিনীর সাথে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সম্পর্ক মোটামুটি ভালই চলছিল। কিন্তু ৩/৪ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় বাহিনীর ছোটখাটো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, যার মূলে ছিল এ ধরনের একটি প্রশ্ন যে, ভারতীয় বাহিনীর যা করার তাতো করা হয়ে গেছে, এখন কেন তারা বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছে না। তখন থেকেই দেখা গেল একটা সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের বীজ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এমনকি শেখ মুজিবুর রহমান ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কটি যেভাবে handle করেছিলেন, তাতে বিশেষ করে জে,এন দীক্ষিতের গ্রন্থের আলোকে লক্ষ্য করা যায় যে, তখনও এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট টানাপড়েন ছিল। পঁচাত্তরের পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক একেবারে বিপরীত মেরুতে চলে যায়। এটা বিশ্লেষণ হিসেবে কতটুকু সত্য, সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে। আমার মনে আছে, খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেন খন্দকার মোশতাকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং ১৫

www.pathagar.com

অগাস্টের পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, খন্দকার মোশতাক সে সময়ে রাষ্ট্রের মূল ৪টি মূল নীতিকে অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন। ভারত আসলে সেই সময় বাংলাদেশের ওপর প্রচণ্ড একটা চাপ সৃষ্টি করেছিল। ১৫ অগাস্টের ঘটনা সম্পর্কে সাধারণ বর্ণনায় আমরা পাই যে, ১৫ অগাস্ট দিল্লীতে যখন স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছিল, তখন ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মার্চ পাস্টের মঞ্চ থেকে শেখ মুজিবের নিহত হওয়ার ঘটনাটি জানতে পারেন। তাঁকে ঘটনাটি জানান-'র'-এর প্রধান মি. কাও। আমার প্রশ্ন বাংলাদেশে এতবড় একটি ঘটনা ঘটালো, যখন বাংলাদেশ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য–এদেশের রাজনীতি, ভূ-প্রকৃতি, ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন চিন্তাভাবনা এমনকি মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ভারত গোড়া থেকেই সংগ্রহ করেছিল সেই ভারতই তা আঁচ করতে পারল না? একাত্তরে বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর ভারত বেশ কড়া নজরই রাখছিল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে পঁচাত্তরের ১৫ অগাস্টের ঘটনাটি ভারত হঠাৎ জানতে পারল, এটি ইতিহাসে একটি বিরাট প্রশ্ন হিসেবে থেকে যাবে। যতদিন পর্যন্ত এ সম্পর্কে গবেষণা আরও গভীরে না পৌঁছবে, ততদিন পর্যন্ত এ ঘটনা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা বাকি থাকবে। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য, উল্লেখিত গোলটেবিলে অংশগ্রহণকারী পররাষ্ট্র সচিবগণের কেউ কেউ মুজিব সরকার, কেউ জিয়াউর রহমান সরকার, কেউ খালেদা জিয়া সরকার এবং কেউ শেখ হাসিনা সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিংবা আছেন। এদের আলোচনা থেকে একটি বিষয় বেরিয়ে এসেছে যে, প্রত্যেক সরকারই ক্ষমতায় যাবার আগে ভারতীয় জুজুকে প্রচারণার জন্য ব্যবহার করেন এবং ক্ষমতায় গেলে ভারতের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। এই উক্তি কতটুকু সঠিক, সেটা নিরূপণ না করেও এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবে করা চলে যে, বাংলাদেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র মধ্যে বক্তব্যের ক্ষেত্রে যে পার্থক্যটি দেখা যায় তা হল আওয়ামী লীগ খুব উচ্চৈঃস্বরে ভারতকে বাংলাদেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে প্রচার করে, অন্যদিকে বিএনপি নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে ভারতের আধিপত্যবাদী নীতি সম্পর্কে বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে। এমনকি,সরকারে যাওয়ার পরেও এ ধরনের বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং সরকারে গেলে ভারতের প্রতি এক ধরনের নীতি আর সরকারের বাইরে থাকলে আরেক ধরনের নীতি, এটা বোধ হয় খুব সঠিক নয়।

গোলটেবিলে অংশগ্রহণকারী আলোচকদের মধ্যে ফারুক আহমদ চৌধুরীর বক্তব্য আমার মতে অনেকটা বাস্তবমুখী হয়েছে। তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন '...কিন্তু অতীতকে ছাড়া বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ গড়া যায় না। এর প্রমাণ তো আমরা যারা এখানে বসে রয়েছি, তারাই।' কাজেই তিনি তাঁর আলোচনায় অতীতের প্রেক্ষাপট এনেছেন এবং বাংলাদেশের উদ্ভব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি অন্য আলোচকদের মত ইতিহাস বিস্মৃত হননি। তার আলোচনায় তিনি বলেছেন '.... সেক্ষেত্রে আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। তাহলে দেখা যাবে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ' ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম, তারপর পাকিস্তান আমলে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম, পরে যা পরিবর্তিত হয়ে আওয়ামী লীগ হয়, এভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি সন্ধানের একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ছিল'। তাঁর এই উক্তি যথার্থ এই কারণে যে, হাল আমলের বুদ্ধিজীবীকে আমরা বাংলাদেশের আত্মপরিচয় নিয়ে আলোচনা করার সময়ে দেখি, '৪৭-এর বিভক্তি ও মুসলিম লীগের জন্ম, বঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি বিষয়গুলো তাঁরা সযত্নে এড়িয়ে যান। এমনকি তাদের কথাবার্তায় মনে হয় যে, ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ কিংবা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির ঘটনা ছিল মহাপাপ এবং এই

www.pathagar.com

মহাপাপের স্খালন হয়েছে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে। তাঁরা আরও এক কদম এগিয়ে গিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশের উদ্ভবের ঘটনা ১৯৪৭-এর দ্বিজাতি তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করেছে। অথচ তাঁরা বাংলাদেশের মানচিত্রটির দিকে তাকাতে চান না। এই মানচিত্র কিন্তু রচিত হয়েছিল র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদের মাধ্যমে। তার মাধ্যমেই ভারতীয় উপমহাদেশ ১৯৪৭-এ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়-একটি পাকিস্তান, অন্যটি ভারত। আর পাকিস্তান রাষ্ট্র যদি সৃষ্টি না হত, তা'হলে বাংলাদেশের উদ্ভব আদৌ সম্ভব হত কিনা, সে প্রশ্নটিও তাঁরা ভেবে দেখতে নারাজ।

'৪৭-এর ভারত বিভাগ না হলে কী হত? তাহলে বাংলাদেশ নামের এই ভূখণ্ডটি ভারতেরই একটি রাজ্যে পরিণত হত। সেই রাজ্যটির পক্ষে যারা ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করতো, তারা প্রবল রাষ্ট্রীয় পীড়নের শিকার হতো এবং তাদের পক্ষে কবে আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জন করা সম্ভব হবে, ভবিষ্যতের গর্ভেই তা নিহিত থাকত। যদিও আমরা আশাবাদী, পৃথিবীর যে কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জাতি যদি তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মুক্তি চায়, তাহলে তার পক্ষে প্রবল প্রতিপক্ষকে অগ্রাহ্য করে সেটা অর্জন করা সম্ভব। ভিয়েতনামের ইতিহাস সেটা প্রমাণ করেছে। ভারতের বিভিন্ন নিপীড়িত জাতির ক্ষেত্রে সেটা কেন সত্য হবে না, সেই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই তোলা যায়। তিনি বলেছেন, দুদেশের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে বাংলাদেশের ভেতর থেকে সময়ে সময়ে অনেক রকম দায়িত্বহীন উক্তি করা হয়েছে। এর ফলে দু'দেশের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এ ধরনের ঘটনা সহজেই এড়ানো যেত। আসলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সব বিষয়-আশয় যতটা পারা যায় পেশাগত পর্যায়ে নিষ্পত্তি করা উচিত এবং তা করতে হবে পেশাদারী মনোভাব নিয়ে। অবশ্য, বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়। দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা উক্তি পরিহার করে চলাই উচিত। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবার আছে। তাই খোলামেলা উক্তির বিষয়টি এড়ানো কঠিন। এ ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করাও কঠিন সেটা আমি জানি। তিনি বাংলাদেশের ভেতর থেকে দায়িত্বহীন উক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার পাশাপাশি ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ব্যাপারে যে সমস্ত দায়িত্বহীন উক্তি করা হয়েছে- সেগুলোও উল্লেখ করলে তিনি ভাল করতেন। কারণ, এক হাতে তো তালি বাজে না।

উপরন্তু বাংলাদেশের মধ্য থেকে যদি কোন ক্ষোভ বা বিরক্তি প্রকাশ করা হয়ে থাকে, তার জন্য বাংলাদেশকে এককভাবে দায়ী করা ঠিক হবে না। বরং বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে সেখানকার শাসকদের বিভিন্ন দায়িত্বহীন আচরণের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। তিনি আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেটি আমার কাছে খুব প্রশংসনীয় মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমি গ্রামে গঞ্জে ঘুরে একটা ব্যাপার উপলব্ধি করেছি, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মনে করে, ভারত বাংলাদেশের মানুষের মন-মানসিকতা ঠিকভাবে বুঝতে চায় না। অপর ক্ষেত্রে ভারতের নয়াদিল্লী ও অন্যান্য রাজ্যের নীতিনির্ধারক ও এলিটরা নিজেদের একটু অন্যরকম ভাবেন এবং তারা বড় ভাই সুলভ আচরণ করতে আদেশ করেন। এসব কিন্তু শুরু থেকেই আছে।' আমার মনে হয় ফারুক চৌধুরী ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং গ্রাম গঞ্জে ঘুরে অর্জিত তার অভিজ্ঞতাটি যত চড়া সুরে বলার কথা ছিলো একজন প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে হয়ত তিনি ততটা চড়া সুরে বলতে চাননি। কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব তথ্যই তিনি তুলে ধরেছেন। এই দু-দেশের সম্পর্কের পেছনে যে বিষয়টি কাজ করে তা হলো, দু'টি দেশের জনগণ একে অপরকে কোন দৃষ্টিতে দেখে। বাংলাদেশের মানুষের পার্সেপশনে ভারত সম্পর্কে যদি কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস থাকে তবে সেটা কল্পনাপ্রসূত কিছু নয়। নিশ্চয়ই তার কথা বলতে গিয়েই

www.pathagar.com

তিনি বড় ভাইসুলভ আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বাধীনতার পরপরই আমাদের ক্যান্টনমেন্ট থেকে অস্ত্রশস্ত্র , গোলাবারুদ নিয়ে যাওয়ার কথা, গঙ্গার পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'আমাদের দৃষ্টিতে এ কেবল অনুচিতই নয়, বরং বেআইনী।' আমার মনে হয়, যথেষ্ট বলিষ্ঠতার সাথেই এ কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করেছেন, যেটা অন্য আলোচকদের বক্তব্যে আমরা লক্ষ্য করি না। বিশেষ করে আমি হতাশ হয়েছি জনাব মোহাম্মদ মহসীনের বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, আমরা বন্ধু বাছাই করতে পারি, কিন্তু প্রতিবেশী বাছাই করতে পারি না। প্রতিবেশীর সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থা রক্ষা করবেন, নাকি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন, সে ব্যাপারে আপনি যে সিদ্ধান্তই নেন না কেন, প্রতিবেশী কিন্তু থাকছেই।' সত্য কথা, প্রতিবেশী আমরা বাছাই করতে পারি না। পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রই এটা পারে না। এটা ভৌগোলিক বাস্তবতা। যেমন, আমরা চীন এবং রাশিয়ার সম্পর্কের কথা বলতে পারি। চীনের উত্তরাঞ্চলে রাশিয়ার সাথে এক বিশাল সীমান্ত রয়েছে। আমরা যেমন ভারতের সাথে ১৯৭২ সালে ২৫ বছর মেয়াদী 'শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি' করেছিলাম, যেটাকে এদেশের জনগণ 'গোলামী চুক্তি' হিসেবে মনে করে ও একইভাবে মাওসেতুং এবং স্টালিনের মধ্যে ১৯৫০ সালে একটা ২৫ বছর মেয়াদী 'সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও আমরা জানি, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, সেই সময়ে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে এক রক্তাক্ত যুদ্ধ হয়েছে, যে যুদ্ধে রাশিয়া লেসার রশ্মিসম্বলিত অস্ত্র ব্যবহার করেছে এবং চীনের বহু সৈন্যকে এতে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল উসুলি নদীর দুটি ছোট দ্বীপ নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে। তারও আগে ছিল এই দু'টি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্বের প্রশ্ন। যে কারণে চীন পরবর্তীকালে বলেছিল যে, চুক্তি করে বা মৈত্রীজোটে আবদ্ধ হয়ে দেশে দেশে সুসম্পর্ক রক্ষা করা যায় না। সুসম্পর্ক নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রের সাথে অন্য একটি রাষ্ট্রের সমঝোতা কতটুকু তার উপরে। আজকে ভারত আমাদের চারদিকে রয়েছে। ভারত আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে শুধু যদি আমরা চিন্তা করি যে, লিখিত চুক্তি করেই একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে, তাহলে কিন্তু ভুল করা হবে। এই সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে মনের মিলের মধ্য দিয়ে, শুধু ভূগোলের মিলের মধ্য দিয়ে নয়। কারণ, ভূগোলের মিল অনেক সময়ে অমিলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নৈকট্য বৈরিতা ডেকে আনে। ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের মনে যে সন্দেহ ও আশঙ্কা রয়েছে, সেগুলো যে অমূলক নয়, তা আমাদের বুঝতে হবে। তবে আমাদের পররাষ্ট্র নীতির একটা বিরাট দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, পররাষ্ট্র নীতিকে একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রেক্ষাপটে কখনোই তৈরি করা হয়নি। আমরা সাদামাটাভাবে বলছি, আমরা সকলের মিত্রতা চাই, কারও শত্রুতা চাই না। এটা যত সহজে বলা যায়, তত সহজে করা যায় না। একটি রাষ্ট্র যদি থাকে, তার নিরাপত্তার জন্য হুমকিও থাকবে, তবে সেই হুমকি কোথা থেকে আসছে, তার উৎস কী, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আদর্শগত, নিরাপত্তাগত ক্ষেত্রগুলোকেও আমাদের সযত্নে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে এ ব্যাপারে একে অপরের মধ্যে বিরোধ রয়েছে এবং একে অপরকে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। আজ পর্যন্ত এই দুটি দলের মধ্যে দেশের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে কখনোই একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হল না।

আফতাব আহমাদ :

আমি গোড়াতেই 'প্রথম আলো'কে মোবারকবাদ জানাতে চাই, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূতপূর্ব এবং বর্তমান সচিবদের নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে

www.pathagar.com

একটি গোলটেবিলের আয়োজন করার জন্য। এই আলোচনায় বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। আমি মনে করি এ আলোচনা আরও পূর্ণতা পেত যদি বর্তমান জাতীয় সংসদের স্পীকার, যিনি এক সময় পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন সেই হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীও যদি এতে অংশগ্রহণ করতেন। এই জন্য যে, হুমায়ূন রশীদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বহু ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী এবং মাসুদুল হকের একটি গ্রন্থ রচনার সময়ে তিনি সাক্ষাৎকার দিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কী ধরনের ছিল, সে সম্পর্কে বিশদভাবে বলেছেন। আমার নিজের গবেষণাকর্মেও তাঁর কাছ থেকে যেসব তথ্য পেয়েছি, সেগুলো আমাদেরকে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে বেশ বিচলিত এবং চিন্তিত করে তুলেছে। ড. মাহবুর উল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, আলোচকদের মধ্যে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ এবং বাস্তবানুগ আলোচনা করেছেন ফারুক চৌধুরী। একই সঙ্গে আমি লক্ষ্য করেছি, রিয়াজ রহমানের আলোচনাটিতেও অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো উত্থাপন করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে বহু স্পর্শকাতর বিষয় আলোচনায় এসে পড়ে। যারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে এক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের একটি নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে, এসব স্পর্শকাতর বিষয়কে প্রাঞ্জলভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়, এই গোলটেবিলে প্রায় সব ক'জন আলোচক বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব উপাদান চিড় ধরিয়েছে অতীতে, বর্তমানেও টানাপড়েন সৃষ্টি করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে—এ বিষয়গুলোকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। যেমন—প্রাসঙ্গিকভাবে আমি উল্লেখ করতে পারি, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরতে গিয়ে বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব কেবল ১৯৭১ সালের পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণোত্তর কালটিকেই বিবেচনায় এনেছেন। আমার মনে হয়, আমরা যদি ১৯৪৭-এর ব্রিটিশ ভারত বিভাজনের ইতিহাসকে মনে রেখে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে, মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ভারতীয় পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পর্কটা কেমন ছিল এবং বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রচারণার ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা কী ছিল-এগুলো যদি বিবেচনায় নেই, তাহলে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির roots গুলো আমরা চিহ্নিত করতে পারব। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কী ধরনের, তা বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারব। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রায়ই একটি ক্ষোভ আমরা লক্ষ্য করতাম। আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে নানামুখে প্রবাহিত করার জন্য, নানাদিকে পরিচালিত করার জন্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংহতির মধ্যে ফাটল ধরাবার জন্য ভারতীয়দের যে জোর তৎপরতা ও প্রচেষ্টা ছিল, এটি বাংলাদেশের কোন তরুণ-তরুণী স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। এমন কি যে মুজিব বাহিনী ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা প্রশিক্ষণ দিয়ে, সামরিক সাহায্য দিয়ে তৈরি করেছিল, সেই মুজিব বাহিনীর মধ্যেও ছিল প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং আক্ষেপ। ঐ সময়ে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেটি হল, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক গৌরব যেন ছিনতাই হয়ে না যায়। অথচ আমরা ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক গৌরব ছিনতাই হয়ে গেছে। যৌথ কমান্ডে বাংলাদেশের যথোপপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব তো ছিলই না, উপরন্তু সেই যৌথ কমাণ্ডের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল একজন ভারতীয় সেনাপতির হাতে। এর ফলে যদিও পাকিস্তান সামরিক বাহিনী জয়েন্ট কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, পুরা অনুষ্ঠানটি পর্যবসিত হয়েছিল যেন ভারতীয়দের কাছে পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণের একটি অনুষ্ঠানে। এ প্রসঙ্গে আমি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর কথাটি এখানে উল্লেখ করব। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে মাসুদুল হককে দেয়া সাক্ষাৎকারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন,

www.pathagar.com

মুজিবনগর সরকার এবং ভারত সরকার কয়েকটি গোপন চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল, যে চুক্তির বিশদ বিবরণ মাসুদুল হকের গ্রন্থের পরিশিষ্টতে উল্লেখ রয়েছে। যেসব চুক্তির বিভিন্ন ধারা-উপধারার দিকে নজর দিলে আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়, ভারতীয় অভিলাষ কী ছিল এবং কী ধরনের বাংলাদেশ ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর কাছে কাম্য ছিল। আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে উল্লেখ করতে চাই, বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য, অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক মোশররফ হোসেন Journal of Social Studies-এ বাংলাদেশের Nature of State কী–এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ভারতীয়রা বিশেষ করে ভারতীয় সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রকে প্রশাসনিকভাবে ঢেলে সাজাবার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ঐ প্রবন্ধে প্রফেসর মোশাররফ হোসেন আরও উল্লেখ করেছেন যে, ভারতীয়দের অভিপ্রায় অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে একজন করে ভারতীয় উপদেষ্টাকে নিয়োগ দেয়া হয়। একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য নিশ্চয়ই এটি খুব মর্যাদাকর বিষয় ছিল না। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে আসার পর বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেননি। বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই আসলে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাজউদ্দীন আহমদের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে মতপার্থক্যের জন্ম হয়। মুজিবুর রহমানের চাপ এবং একতরফা সিদ্ধান্তের ফলেই এক পর্যায়ে ভারতীয় উপদেষ্টাদের বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। পররাষ্ট্র সচিবদের এই গোলটেবিল বৈঠকে এ বিষয়ীটি আদৌ উল্লেখিত হয়নি, এটি সত্যিই রহস্যজনক। অথচ যেসব ব্যক্তি এই গোলটেবিলে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন, এঁরা প্রত্যেকেই এসব ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। স্বয়ং ফারুক চৌধুরী, ফখরুদ্দীন আহমদও সাক্ষী। দুর্ভাবশত ফখরুদ্দিন আহমদের আলোচনাটি আমাকে সবচেয়ে হতাশ করেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করার চাইতে ভারত তোষণের প্রক্রিয়াটিকেই এতে মনে হল পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের অন্যতম লক্ষ্য।

আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার বিশেষ করে, সেটি হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে ভারতের ভূমিকা কতটুকু বাংলাদেশের জন্য সৌহার্দ্যের পরিচায়ক, কতটুকু বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি নৈতিক সমর্থনসুলভ, আর কতটুকু ছিল ভারতীয় জাতীয় স্বার্থ এবং রণনীতি ও কৌশলগত কারণে পাকিস্তানকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে নিজের আধিপত্যকে নিশ্চিত করার প্রয়াস-এ বিষয়টি যদি আমরা বোঝার চেষ্টা না করি, তাহলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কটি আমরা বুঝতে পারব না। বিভিন্ন আলোচকের আলোচনায় নানা ধরনের মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেছেন, এটি হচ্ছে বাস্তবতা। সে বাস্তবতাটি হচ্ছে এই যে, ভারত কখনোই তার প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা রক্ষা করেনি। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বিশ্বাসের ওপর গড়ে ওঠেনি এবং ভারতীয় আচরণের কারণেই ভারতের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের অবিশ্বাসের জন্ম। এটি মোটা দাগে প্রায় সব আলোচকই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যে বিষয়গুলোর উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল, সেটি ফারুক চৌধুরী এবং রিয়াজ রহমান ছাড়া আর কেউ প্রাসঙ্গিকভাবে টেনে আনেননি। সঙ্গতকারণেই বা প্রণিধানযোগ্য কারণেই ফারুক চৌধুরী অনেক বেশী সংযম প্রকাশ করেছেন তাঁর মন্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের যেসব বিষয় টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছিল, যে বিষয়গুলো এখনও বেশ নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে, সে বিষয়গুলোর মধ্যে ফারুক চৌধুরী দক্ষিণ তালপট্টি, মুহুরীর চর দখল কিংবা উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুর সীমান্ত বরবার ফাঁড়ি এবং পরিখা খনন করে পঞ্চগড়কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ভারতীয় সামরিক তৎপরতার কথা তিনি এড়িয়ে

www.pathagar.com

গেছেন। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে এ বিষয়গুলোকে আমরা কোনভাবেই উপেক্ষা করতে পারি না, তুচ্ছ ভাবতে পারি না। একই সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাকে এক অর্থে চ্যালেঞ্জ করে যেভাবে সাকসেসিভ ভারতীয় সরকার বাংলাদেশের ওপর উপর্যুপরি চাপ প্রয়োগ করে গেছে, সে বিষয়গুলোও আলোচনায় আসেনি। এ ব্যাপারে অবশ্য প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করেছেন রিয়াজ রহমান সাহেব। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে বন্দরকে ভারতীয় বাণিজ্যিক এবং প্রতিরক্ষা স্বার্থে ব্যবহারের পরিকল্পনা ভারতীয়রা গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের সরকারের ওপর যে চাপ দেয়া অব্যাহত রেখেছে, এ বিষয়টি প্রাঞ্জলভাবে আলোচনায় আসেনি, যা আসা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে বিপর্যস্ত করে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গমনাগমনের জন্য ট্রান্সশিপমেন্টের নামে ভারত যে করিডোর দাবী করছে সে প্রসঙ্গে ফারুক আহমেদ চৌধুরী অতীতে সাক্ষাৎকার দিয়ে সুস্পষ্টভাবে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন, একথা সত্য। সে জন্য আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করতে এসে এ গুরুত্বপূর্ণ গোলটেবিল বৈঠকে এ বিষয়টি বিশদভাবে কেন উত্থাপিত হয়নি, সেটি আমাকে সত্যি বিস্মিত করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আলোচনায় আসেনি সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের রাজনৈতিক অর্থনীতি। বাংলাদেশ-ভারত কমপ্লিমেন্টারি ইকোনমি গড়ে তুলবে, না কমপিটিটিভ ইকোনমি গড়ে তুলবে, বাংলাদেশ-ভারত ইনফরমাল সেক্টরে শুধু ট্রেডিংয়ে লিপ্ত থাকবে, না তারা ফরমাল ট্রেডের সিকিউরিটি, প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করবে, বাংলাদেশ শুধু ভারতীয় পণ্যের বাজার হবে না বাংলাদেশের পণ্য ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করার অবাধ সুযোগ অর্জন করতে পারবে, কিংবা বাংলাদেশ-ভারত যে চোরাকারবারী বা সীমান্ত পাচারের যে কারবারটি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর একটি অশুভ প্রভাব ফেলেছে সেসব বিষয়ে কেবল দু-চারটা মামুলী কথা বলে ছেড়ে দিলেই চলে না। এ বিষয়ে ভারতীয় সরকারের যে ট্যারিফ নীতি এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের একপেশে পদক্ষেপগুলোর বিষয়ে আমার মনে হয় আলোচনা করাটা খুবই প্রয়োজন ছিল। আজকে একটি বিষয় আমাদের খুবই গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। বাংলাদেশ ভারতীয় অর্থনীতির নাগপাশে শত শত বাধা পেরিয়ে স্বাবলম্বী আত্মনির্ভরশীল, শিল্পোন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। না বাংলাদেশ বিকল্প অর্থনৈতিক সম্পর্ক অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে গড়ে তুলবে, বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে তার ট্রেডকে কিভাবে আরও ডাইভার্সিফাই করতে পারে, ভারতনির্ভরশীলতা কিভাবে কমিয়ে আনা যায়, এ বিষয়টি গভীরভাবে যদি ভাবা না হয় এবং ভারতমুখী নীতি যদি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অন্যতম ভিত্তি হয় তাহলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কটি কখনওই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক হতে পারে না। একটি কলোনাইজড মার্কেটে মেট্রোপলিটান কান্ট্রি যেভাবে কলোনির সাথে সম্পর্কিত থাকে সে পর্যায়ে উপনীত হবে, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সামরিক দিক থেকে বাংলাদেশের যে ভায়াবিলিটি ১৯৭৫ এর এর থেকে গড়ে উঠতে আমরা লক্ষ্য করেছি, সাম্প্রতিককালে সেখানে একটি ধস নেমেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশের মিলিটারী হার্ডওয়্যার প্রকিউরমেন্টের নীতি কিভাবে বর্তমান সরকার পরিবর্তন করেছে। এ জন্য সরকারের রাজনৈতিক কমিটমেন্টেই শুধু যে দায়ী তাই নয় এ জন্য আমি মনে করি, ভারতীয় চাপ অনেক বেশী দায়ী।

আমরা সবাই জানি, ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগ নতুন করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই যখন আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা চীন দেশে সফরে যান তখন আনন্দবাজারসহ স্টেটসম্যান এবং অন্যান্য ভারতীয় পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় ও

www.pathagar.com

উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশের চীন দেশের কাছ থেকে সমরাস্ত্র সংগ্রহ করা উচিত হবে না। তার কারণ ভারত অনেক সুলভে এসব সরবরাহ করতে পারে। তারপর থেকেই লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অশোক লে-ল্যান্ডসহ ভারতীয় অন্যান্য যানবাহন ক্রয় করার ঘটনা কিংবা রাশিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে মিগ-২৯ ক্রয়। মিগ-২৯ এর স্পেয়ার্সের জন্য নির্ভর করতে হবে ভারতীয় কারখানাগুলোর ওপর। এক কথায় বলা যায়, শুধু অর্থনীতিই নয় আমাদের সামরিক নির্ভরতাও ভারতের ওপর সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এটি করা হচ্ছে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এবং বাংলাদেশের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি কারণে। বাংলাদেশ একটি Viable State হিসেবে যাতে দাঁড়াতে না পারে, বাংলাদেশ যাতে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ Effective State-এ পরিণত না হতে পারে, সে বিষয়ে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী গোড়া থেকেই যত্নবান ছিল। যে কারণে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নানা ধরনের হস্তক্ষেপ করার পায়তারা তারা করেছে। ১৯৭৫-এ শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হবার পর ভারত কাদের সিদ্দিকীর মাধ্যমে এবং অন্যান্য সশস্ত্র সন্ত্রাসীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভ্রান্ত, বিপথগামী কিছু জাতিগোষ্ঠীর সশস্ত্র সংগ্রামকে পুঁজি করে তারা বাংলাদেশে বিপত্তি ঘটাবার জন্য অনেক প্রচেষ্টা নিয়েছিল। যদিও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে ভারতীয় সেই ষড়যন্ত্র কার্যকর হয়নি। এ কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, মুজিবনগর সরকারের ওপর ভারত অসম এবং অধীনতামূলক চুক্তি তারা চাপিয়ে দিয়েছিল, বাংলাদেশ সরকারে ভারতীয় উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিল এবং বাংলাদেশের বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। এসব বিষয়কে স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেননি এবং করেননি বলেই তার জীবদ্দশায় তিনি বহুবার চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য। এই লক্ষ্যেই ১৯৭৪-এ ভারতের মতামতকে তোয়াক্কা না করে তিনি লাহোরে ওআইসি কনফারেন্স যোগদান করেন। ১৯৭৫-এ তাঁর মৃত্যুর আগে মে মাসে চীনের সঙ্গে চারটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে চীন বাংলাদেশকে তখনও কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়নি। বিষয়টি এখানে এই জন্য উল্লেখ করেছি যে, আওয়ামী লীগকে ভারতের সমর্থক সরকার মনে করা হত। শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের হাতে অনেকটা অসহায়বোধ করতেন। তিনিও ভারতের নগ্ন হস্তক্ষেপকে নানাভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন এবং নানাভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন– কিন্তু পরিপূর্ণ সাফল্য তিনি অর্জন করতে পারেননি। তার কারণ, ১৯৭১-এর গোড়াতে আওয়ামী লীগ যেভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী এবং আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর নিগড়ে বন্দী হয়ে যায়, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তার জন্য একটি দুঃসাধ্য কাজ ছিল এবং আজকেও আওয়ামী লীগ যে কারণে ভারত তোষণ ছাড়া অন্য কোন নীতির কথা ভাবতে পারে না। তার একটিমাত্র কারণ হচ্ছে–১৯৭১-এ আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং সামরিক সংস্থার যে সিমবায়োটিক রিলেশনশীপ সৃষ্টি হয়েছিল সেটি এখনও অব্যাহত আছে। এই সম্পর্ককে দুমড়ে মুচড়ে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ঢেলে নতুনভাবে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে না তৈরি করতে পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের ওপর ভারতের খবরদারী চলবে। ভারতের খবরদারী অব্যাহত থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ-ভারত সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।

মাহবুব উল্লাহ :

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কেমন হবে, সেই বিষয়টি বিবেচনা করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে, ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্রটি কী? ভারত একটি

www.pathagar.com

হেগেমনিক স্টেট, না একটি সাব ইমপেরিয়াল স্টেট, নাকি একটি রিজিওনানল এক্সপেনশনিস্ট স্টেট–এগুলো বিচার-বিশ্লেষণ না করে যদি আমরা পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করি, তাহলে বাংলাদেশের জন্য কোন সুফল আমরা অর্জন করতে পারব না। এখানে তবারক হোসেনের একটি মন্তব্য আমি উদ্ধৃত করতে চাই ঃ 'আমরা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারব না। কারণ, এসব রাজ্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশী শিল্পসমৃদ্ধ।' এটা ঠিক, কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা স্থির সূত্র মেনে চলে না। অনেক সময়ে শিল্পায়নের পথে যারা লেইট স্টার্টার্স, তারা আর্লি স্টার্টার্সদেরকে হয় অতিক্রম করে যায়, না হয় তাদের কাছাকাছি অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে। আমরা যদি কোরিয়া, সিঙ্গাপুর বা তাইওয়ানের প্রশ্নটি বিবেচনা করি, তাহলে আমরা তা বুঝতে পারব। আজকালতো কোরিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানুফাকচারিং প্রোডাক্টসও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যকার সুসম্পর্ক সেসব দেশের সরকার ও জনগণ তাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, জনগণের মধ্যে ঐক্য কতটা সুদৃঢ়, তার ওপরও নির্ভর করে। আমরা লক্ষ্য করেছি, ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতির একটা মৌল বৈশিষ্ট্য আছে যেটা এই আলোচকদের কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, সেটা হচ্ছে,বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। সম্প্রতি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর থেকে প্রকাশিত এশিয়ান ডিফেন্স জার্নালেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারত বরাবরই চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের রাজনীতির অভ্যন্তরীণ গতিপ্রবাহকে প্রভাবিত করতে। এর কারণটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। বাংলাদেশে যদি চিরকালের মত অস্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়, তাহলে বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হবে না। অথচ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হলেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হওয়া এবং ভারতের প্রতিযোগী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবার একটি শুভ সম্ভাবনা রয়েছে, যদি আমরা আমাদের অপরচুনিটিগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারত এই বিষয়টি খুব ভালভাবে উপলব্ধি করে বলেই যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে, ভারত তার জন্য চলার পথকে নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ করে তোলে। এ কারণে সরকারের পক্ষে অনেক অভীপ্স লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। কাজেই আমাদেরকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয়টি শুধু সরকারে সরকারে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। একটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আরেকটা বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে কী ধরনের আচরণ করছে এবং কোন লক্ষ্য হাসিলের জন্য করছে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। জনাব তবারক হোসেন সাহেবের বক্তব্যে তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায় কথা বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে জিয়াউর রহমানের আমলে গঙ্গার পানিচুক্তি গ্যারান্টি ক্লজসহ কিভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেকথা বলতে গিয়ে জগজীবন রামের সঙ্গে জিয়াউর রহমান সাহেবের ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে বৈঠক হয়েছিল, সেটাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন----- "কিন্তু জগজীবন রাম অত্যন্ত বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, সামান্য ব্যাপারে যদি তিনি দরকষাকষি করতে থাকেন, তাহলে একটি বিরাট জিনিস হাতছাড়া হয়ে যাবে"। প্রশ্ন হল, সেই বিরাট জিনিসটি কী? যেটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে বা সন্দেহে ভারত সেদিন ৫ বছরের জন্য হলেও গঙ্গার পানির ব্যাপারে একটি চুক্তি করতে রাজি হয়েছিল। সেই বিষয়গুলোও আমাদের বোঝা দরকার। অর্থাৎ, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হলেও আমাদের হাতে তুরুপের কোন্ তাস আছে, আমরা ক্ষুদ্ররাষ্ট্র হলেও কিভাবে বৃহৎ রাষ্ট্রের নীতিকে প্রভাবিত করতে পারি, বা তাদের জন্য আমরা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারি, সেগুলোও আমাদের বিচার-বিবেচনায় আনতে হবে। অর্থাৎ সোজা কথায়, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বার্গেনিং পাওয়ার আমাদের বাড়াতে হবে। সেটা যদি আমরা করতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের কূটনীতিকে সফলভাবে পরিচালনা করতে পারব না।

www.pathagar.com

উল্লিখিত গোলটেবিল আলোচনায় ফখরুদ্দীন সাহেবের একটি উক্তিকে অত্যন্ত হালকা বলে মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন ---- "পাকিস্তান আমলে এভাবেই রাজনীতিতে ইসলামকে ব্যবহার করা হত। এখন ইসলামের বদলে ভারতকে ব্যবহার করার একটা প্রবণতা আছে। এর কোন যৌক্তিকতা নেই। এটা একটা নিছক রাজনৈতিক বিষয।" হ্যাঁ, এটা নিঃসন্দেহে রাজনীতির বাইরে নয়। কিন্তু এভাবে সহজ সমীকরণ টানা কতটা যুক্তিসঙ্গত-সেটাই বিবেচ্য বিষয়। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্কের কথা যখন ওঠে, তখন কোন না কোন মতাদর্শের বিষয় সামনে এসে পড়ে। কখনও বলা হয়, অমুক রাষ্ট্র ফ্যাসিস্ট আর আমরা গণতান্ত্রিক। কখনও বলা হয়, অমুক রাষ্ট্র কমিউনিজমের নীতিতে বিশ্বাসী, আর আমরা মুক্তবিশ্বের নীতিতে বিশ্বাস করি। কখনওবা ধর্মের প্রশ্নও তোলা হয়। এভাবে ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি-সবকিছুই বিভিন্ন দেশের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। আমরা যদি এভাবে সরলীকৃত উক্তি করি, তাহলে সেটা দায়িত্বহীন কাজ হবে। আর উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটি যে কেবল ব্রিটিশ আমলে ছিল, তা নয়। এর ইতিহাস আরও পেছনে, সাম্প্রতিকালের গবেষণা থেকে সেটা ধরা পড়েছে।

আমি সবশেষে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডকুমেন্টস' নামে একটি বই, যেটি সাম্প্রতিককালে ঢাকার ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডও নতুনভাবে ইস্যু করেছে-তাতে পরিষ্কারভাবে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছে। তারা কিছুতেই চায়নি, এই মুক্তি সংগ্রাম র‍্যাডিকালাইজড হয়ে ভারতের বৈরী পক্ষের হাতে চলে যাক। এজন্য তারা আশ্রিত দল ও মতাদর্শের সাথে সম্পর্কিত সরকারকে যতটা মদদ দিয়েছে, অন্য দলগুলোকে সেভাবেই কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছে। এমনকি খোদ মওলানা ভাসানীকে পর্যন্ত বন্দী জীবন-যাপন করতে হয়েছে। তিনি ভারতে গিয়ে ভারতের 'আতিথ্য' পেয়েছিলেন। তবে সেটা ছিল কারাগারের আতিথ্য। বন্দিত্বের আতিথ্য। এ বিষয় নিয়ে বাংলাদেশোত্তরকালেও ভারতের শাসকবর্গের সঙ্গে মাওলানা ভাসানীর সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়েছিল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছিল যে, মওলানা ভাসানীকে রাখতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। মওলানা ভাসানী ময়মনসিংহের জনসভায় প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'আপনারা যদি বিলটা পাঠিয়ে দেন, তাহলে আমি সেটা পরিশোধ করব। আর এছাড়া আপনারা একটু ভেবে দেখবেন কি, আমার জন্য আপনারা কত টাকা ব্যয় করেছিলেন? সিপাহী, শান্ত্রীর জন্য কত টাকা ব্যয় করেছিলেন যাতে আমি জনগণের সঙ্গে মিশতে না পারি? সুতরাং যে রাষ্ট্র বাংলাদেশের এমন একজন বর্ষীয়ান নেতা এবং যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ জওহরলাল নেহেরুর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন, তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ এবং ভারতের জনগণের সম্পর্কটা কেমন হবে-সেটাও আমাদেরকে ভাবতে হবে। এমনকি শেখ মুজিবুর রহমানও সম্ভবত তাজউদ্দীনের মত ব্যক্তিগতভাবে কলকাতায় যাওয়াটা নিরাপদ মনে করেননি। কেন মনে করেননি, সেটা ভবিষ্যতের গবেষণার বিষয়।

www.pathagar.com

২৭মে, ২০০০

আরেকটি ৩০ মে ঘটানোর হুংকার

মাহবুব উল্লাহ :

আগামী ৩০মে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯তম শাহাদত বার্ষিকী। এই দিনটি এ দেশের জনগণ পালন করে গভীর শোক ও শ্রদ্ধায়।

শহীদ জিয়ার নামটি বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং একটি আত্মমর্যাদাশীল স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ২৬ মার্চ, ১৯৭১-এ মেজর জিয়ার বজ্রগম্ভীর স্বাধীনতা ঘোষণা একটি দিকনির্দেশহীন ও পাশবিক গণহত্যার শিকার জাতিকে প্রতিরোধের সংগ্রামে আত্মনিবেদিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যুগিয়েছিল শত্রুকে পরাস্ত করার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস।

জিয়া একজন সৈনিক ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। একজন সৈনিক তাঁর জীবনের মূল ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁর জনগোষ্ঠির আত্মসংরক্ষণের পরম ইচ্ছাটিকে। জিয়া সেই পরম ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের দু'টি দুর্যোগ মুহূর্তে জিয়া সাহসী কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন– একবার ১৯৭১-এর মার্চে, দ্বিতীয়বার ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে।

১৯৭৫-এ একদলীয় বাকশাল শাসন কায়েমের মধ্যে দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আজীবনের লালিত গণতন্ত্রের স্বপ্নকে যখন টুটি চেপে হত্যা করেছিলেন, তখনই বস্তুত শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নিজস্ব সত্তাকে হত্যা করেছিলেন। ১৫ অগাস্ট ১৯৭৫ নিষ্করুণ অবস্থায় দৈহিকভাবে নিহত হওয়ার পূর্বেই তিনি তাঁর নিজ গ্রিবাদেশে আত্মহত্যার রজ্জু পরিয়ে দিয়েছিলেন।

একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে জাতিকে বহুদলীয় ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজটি সহজসাধ্য ছিল না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যখন তাঁদের নির্বাচনী অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে একদলীয় ফ্যাসিবাদী শাসনের পক্ষে দাঁড়ায়, তখন একজন সৈনিককে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে কঠোর সাধনা করতে দেখে শ্রদ্ধায় শির অবনত হয়ে আসে।

জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তিনি সেনাবাহিনীর মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এই প্রয়াসে তিনি হয়ত সর্বতোভাবে সফল হননি। বহুলাংশেই সফল হয়েছিলেন, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। যদি তিনি সর্বাংশে সফল হতেন, তাহলে ৩০মে ১৯৮১ সালে তাঁকে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী সামরিক অফিসারের হাতে নিহত হতে হতো না। কথায় বলে, শেষ ভাল যার, সব ভাল তার। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠানে দশ লাখ জনতার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু', মাতমধ্বনি জিয়ার কৃতকর্মের উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

এই মানুষটি ছিলেন নির্লোভ, সৎ, ত্যাগী, স্পষ্টভাষী, নির্ভীক এবং ষোলআনা দেশপ্রেমিক।

এ বছরের মার্চ মাসে বাগদাদে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে গিয়ে ইরাকের উপপ্রধানমন্ত্রী তারেক আজিকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তারেক আজিজ বাংলাদেশ ও ইরাকের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক সম্পর্কে প্রবল উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করতে গিয়ে পরম শ্রদ্ধাভরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার নাম স্মরণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে জিয়া ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ। যুদ্ধরত দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরাক ও ইরানের মধ্যে শান্তি

www.pathagar.com

স্থাপনে জিয়ার অকৃত্রিম প্রয়াসের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমরা বাংলাদেশীরা যখন বিদেশে যাই, তখন বিদেশীদের মুখে বাংলাদেশের দুর্যোগ ও দারিদ্র্যের হতাশাব্যঞ্জক যে বিবরণ শুনে মনে কষ্ট পাই, সেই পরিস্থিতিতে একজন বিদেশী বিচক্ষণ নেতার কাছ থেকে শহীদ জিয়ার এ প্রশংসা শুনে গর্বে বুক ভরে গিয়েছিল। দেশের একজন সাধারণ নাগরিকের জন্য এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে?

জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে জিয়ার হাতের স্পর্শ ছিল। বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে তিনি পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন জাতিকে নতুন কর্মোদ্যোগে উজ্জীবিত করতে। বেকার যুবক, নারী, শিশু, মুক্তিযোদ্ধা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, গবেষক, চিন্তাবিদ, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাঁর রাষ্ট্রভাবনার অন্তর্গত ছিল। তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন। কারও দৃষ্টিতে তিনি সৈনিকদের প্রেসিডেন্ট, কারও দৃষ্টিতে তিনি যুবকদের প্রসিডেন্ট, আবার কারও দৃষ্টিতে তিনি মেধাবী ছাত্রের স্বপ্নের ব্যঞ্জনা। শিশুদের তিনি কত যে ভালবাসতেন, তা বোঝা যায় বঙ্গভবনে শিশুদের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে যখন তিনি গান গাইতেন, 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ।'

প্রকৃতপক্ষে একটি জাতিকে গড়ে তুলতে হলে জাতির সর্বস্তরের মানুষের কথা ভাবতে হয়। জাতীয় নেতাকে উপলব্ধি করতে হয় জাতিকে নিয়ে তাঁর স্বপ্ন কী, Vision (ভিশন) কী?

এবার প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যখন দক্ষিণ এশিয়া সফরে এসেছিলেন তখন দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে ক্লিনটন তার Vision on South- Asia পরিব্যক্ত করেছিলেন। ক্লিনটন তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, তিনি শুধু নিজ দেশের ব্যাপারেই vision রচনা করেন না। ভূ-মণ্ডলের নানা অংশ নিয়েও তাঁকে vision রচনা করতে হয়। কারণ, বিশ্ব পরিবারের মুরুব্বীর ভূমিকায় থাকতে হলে এর প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশ কারও মুরুব্বী হতে চায় না। কিন্তু সে তার নিজের ভাগ্য রচনা করতে চায়। এজন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও জাতির যাঁরা নেতৃত্ব দেবেন, তাঁদের বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি vision থাকা বাঞ্ছনীয়। ২০২০ সালের মধ্যে কেমন বাংলাদেশ তাঁদের প্রত্যাশার বিষয়, সে সম্পর্কে একটি ধারণা ও রূপরেখা তাঁদের অবশ্যই থাকতে হবে। শুনেছি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন আমাদের সর্বোচ্চ নেতৃদ্বয়ের কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁদের vision জানতে চেয়েছিলেন। একজন কেবল তাঁর পিতার স্বপ্নের কথা বলেছেন। অন্যজন কি বলেছেন জানা যায়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়া বেঁচে থাকলে মহাশক্তিধর একটি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে ঠিকই যথার্থ জবাব দিতে পারতেন। কত জবাবই তো দেয়া যেতো–একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, কিংবা ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, কিংবা বাংলাদেশকে পৃথিবীর রাজনৈতিক মঞ্চে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, কিংবা বাংলাদেশের দারিদ্র্য, ক্ষুধা-জর্জরিত ভাবমূর্তিকে পরিবর্তিত করে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চাই। আমরা যখন এসব কথা ভাবি, তখন প্রতিটি মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট জিয়ার অনুপস্থিতি অনুভব করি।

গত ১০মে আওয়ামী যুবগলীগের সভাপতি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেছেন, 'আরেকটি ১৫ অগাস্ট ঘটানোর চেষ্টা করা হলে যুবলীগের নেতাকর্মীরা তার আগেই আরেকটি ৩০মে ঘটাবে'। কথাগুলো তিনি বলেছেন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ্য করে। ৩০মে ১৯৮১ জিয়াউর রহমান নিহত হয়েছিলেন। কাজেই নতুন করে আরেকটি জিয়া হত্যা ঘটানো অর্থহীন। তাহলে এই বক্তব্যের গূঢ় অর্থ কী? এর অর্থ কি শহীদ জিয়ার উত্তরসুরি বেগম খালেদা জিয়াকে হত্যার হুমকি নয়? কেউ আরেকটি ১৫ অগাস্ট ঘটাতে চাচ্ছে কিনা, তা খুঁজে বের করার জন্য রাষ্ট্রের বহু সংস্থা রয়েছে। এ দায়িত্ব তাদেরকেই পালন করতে দেয়া উচিত। কিন্তু কেউ ১৫ অগাস্ট

www.pathagar.com

ঘটাতে চাচ্ছে; এই অজুহাতে নিজেরা অর্থাৎ যুবলীগের নেতাকর্মীরা ৩০ মে ঘটিয়ে ফেলবেন, এটা কোন আইনের কথা? এমনিতেই আমাদের নাগরিক সমাজ জাতীয় রাজনীরি সাংঘর্ষিক চেহারা দেখে আতঙ্কিত, বিদেশীরাও চিন্তিত। তারপর সরকারের একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী যদি এ ধরনের দায়িত্বহীন মন্তব্য করেন, তাহলে ভবিষ্যতে দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখে আশঙ্কিত না হয়ে পারা যায় কি? দেশকে একটি গৃহযুদ্ধের পথে নিক্ষিপ্ত করার জন্য দায়িত্বশীলদের মুখ নিঃসৃত এ ধরনের দায়িত্বহীন উক্তি যে যথেষ্ট, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যাঁরা টেলিভিশনে জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখে অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা কি এ ব্যাপারে জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন করার স্পর্ধা রাখেন? যে একুশে টিভিতে খোদ প্রধানমন্ত্রী 'নিঃসংকোচে সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহস' দেখাবার আহ্বান জানিয়েছেন, সেই একুশে টিভির কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে জাতির বিবেককে সুস্থ রাখতে কোন উদ্যোগ নেবেন কি?

আফতাব আহমাদ :

দলমত নির্বিশেষে যে মানুষটির নাম বাংলাদেশের সকলে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে, সেই মানুষটি আর কেউ নন, চিরঞ্জীব শহীদ জিয়াউর রহমান। মসনদ-অভিলাষী চোরাবালির রাজনীতির কানামাছির খেলায় যখন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরম উত্তুঙ্গে পৌঁছে দিয়ে মানুষের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করে, দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পৈতৃক প্রাণ বাঁচানোটাকেই একমাত্র কর্তব্য মনে করেছেন কোন মানুষ, তখন সুশৃঙ্খল জীবনে প্রশিক্ষিত এক অনন্য পুরুষ সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে জীবনকে হাতের তালুতে মুষ্টিবদ্ধ করে সারাদেশবাসীকে উদাত্ত আহবান জানালেন দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য এবং দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্নভিন্ন করার জন্য। এই দুই ব্যক্তি দুই ভুবনের মানুষ– প্রথমজন প্রাপ্তি যোগের প্রত্যাশায় জনগণকে অন্ধকারের আড়ালে রেখে ক্ষমতার হিস্যার জন্য জনরোষকে পুঁজি করে, জনতাকে জিম্মিতে পরিণত করে ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় জন হতভাগ্য, বিপর্যস্ত ও হতাশায় নিমজ্জিত জাতিকে পরিত্রাণের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে নিষ্কামব্রত নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য, মা এবং বোনদের ইজ্জত ও আব্রু রক্ষার জন্য, মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক জাতীয় পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্য এক অশ্রুতপূর্ব সশস্ত্র প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধের মহাযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন। তাঁর এই উদাত্ত আহবানে সমগ্র জাতি পরাভবের সকল শৃঙ্খল ভেঙে দিয়ে এক অবিনাশী ঐক্যবদ্ধ সত্তায় পরিণত হয়। যার ফলশ্রুতি হচ্ছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অস্তিত্বের মধ্য দিয়েই জিয়াউর রহমান স্বপ্রকাশিত এক অমর সত্তায় পরিণত হয়েছেন।

এসবই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। কল্পনাশ্রয়ী কোন ইচ্ছাতত্ত্ব দিয়ে এই ধ্রুব সত্যকে কেউ অপনোদন করতে পারবে না। আর তাই জিয়াউর রহমান ও বাংলাদেশ এক ও অবিচ্ছেদ্য। আজ যখন সারাদেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছে জিয়াউর রহমানের রচিত ও নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার মাশুল কত বিশাল এবং এই বিচ্যুতির আশু সংশোধন কত প্রয়োজন, তখন আওয়ামী তস্করেরা নির্লজ্জভাবে নানা ধরনের আস্ফালন এবং অসংযত উচ্চারণে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করার এক ন্যক্কারজনক প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনির অনুজ শেখ ফজলুল করিম সেলিম সম্প্রতি আস্ফালন করে দম্ভোক্তি করেছেন যে, আরেকটি ১৫ অগাস্ট ঘটার আগে ৩০মে ঘটে যাবে। ১৫ অগাস্ট কী, জাতির হৃদস্পন্দন এবং মননের সাথে ১৫ অগাস্টের পট পরিবর্তন কত গভীর ও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তা সেলিম কিংবা শেখ হাসিনার বোঝার কথা নয়, উপলব্ধি করারও কথা নয়। কারণ ১৯৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত সেলিম এবং শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী দুর্বৃত্তরা জপমালা হাতে উজ্জীবিত হয়ে একটি মাত্র জপ করার কাজে ব্যক্তিব্যস্ত ছিল : 'ওলটপালট করে দে মা লুটেপুটে খাই'। মুজিবের ভাষায় এসব চাটার দল তথা লুটেরাগোষ্ঠি

www.pathagar.com

লুণ্ঠন এবং দুর্নীতির পঙ্কে এমনই আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল যে, কখন তাদের পিতা কিংবা মামা বেঘোরে প্রাণ দিল তা নিয়ে বিলাপ করারও ফুরসত পায়নি।

একথা সর্বজনবিদিত যে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে একদলীয় বর্বর শাসন কায়েমের মধ্য দিয়ে যে কুখ্যাত বাকশালের অশুভ যাত্রা–তা ছিল দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও গণতান্ত্রিক চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও দেশপ্রেমবির্বজ্জিত। আর তাই আপাতদৃষ্টিতে ১৫ অগাস্ট যত দুঃখজনক, বেদনাদায়ক, অনাকাঙক্ষিত কিংবা মুজিবের স্বজনদের কাছে অমানবিক মনে হোক না কেন, রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে মুজিবের দৈহিক উচ্ছেদ ও নির্মম হত্যা সমস্ত জাতিকে দিয়েছিল স্বস্তির মুক্তি এবং আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান স্বনির্ভর ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ে তোলার এক মহাপদক্ষেপ। মানুষ এই রক্তাক্ত পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে সমর্থন ও অনুমোদন দিয়েছিল। আওয়ামী তস্করেরা নিজেদের দুষ্কর্ম ও পাপাচারের নেমেসিস থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য এক বিবর থেকে আরেক বিবরে আত্মগোপন করার ইতরসুলভ এক তীব্র হামাগুড়ির প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত ছিল। এ ছিল জনতার অজেয় ইচ্ছাশক্তির এবং অব্যয় অভিপ্রায়ের এক অসাধারণ অনন্য অভিব্যক্তি। পক্ষান্তরে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর ষড়যন্ত্র-কারসাজির ফলে ভারতীয় নিয়োগীদের ঘৃণ্য তৎপরতার পরিণতিতে আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি দেশনায়ক জিয়াউর রহমানের শাহাদত বরণকে এদেশের মানুষ নিজেদেরই অপমৃত্য ঘটেছে বলে রোদনে রোদনে সকল প্রাণী, গুল্ম-তরুলতাসহ সকলেই নিথর হয়ে পড়ে। যেদিন জিয়াউর রহমানের মরদেহ ঢাকায় এসে পৌঁছায়, সেদিন ঐ মরদেহটিকে ঘিরে সারা বাংলাদেশ ঢাকা হয়ে যায়। বীরের মৃত্যু ইতিহাসের একটি বেদনাবিধুর অনন্য ঘটনায় পরিণত হয়। সারা বাংলাদেশের মানুষ চোখের পানি মুছে জিয়ার লাশ কাঁধে তুলে নিয়ে আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারকাকে সাক্ষী রেখে সেদিন বুলন্দ আওয়াজ তুলেছিলো–এক জিয়া লোকান্তরে কোটি জিয়া ঘরে ঘরে। বীর জিয়া এদেশে সবুজ ধানের শীষে চিরদিন আছে মিশে।

বর্তমান ক্ষমতাসীন দল সরকার গঠন করার পর মূহূর্তে থেকেই তার প্রচার প্রপাগান্ডার একমাত্র লক্ষ্যস্থির করেছে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে জিয়াউর রহমানের নাম মুছে ফেলা। কিন্তু এটি যে একটি হাস্যকর বিষয়, তা ক্ষমতাসীনরা ইতোমধ্যেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। ডন কি হুতি (Don Quixote) যেভাবে সার্ভেনতঁর (Cerventes-এর) সেই বিখ্যাত উপন্যাসের উইন্ডমিলের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন, আওয়ামীদের ইতিহাস বিকৃতির এই অপচেষ্টাও তেমন একটি আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্ষমতার মসনদে বলীয়ান হয়ে যারা দম্ভোক্তি করে, তাদের স্থান ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করে নির্মম নির্যাতনের পর হত্যা করে, গণতন্ত্রকে পদদলিত করে সংসদীয় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতির পদ দখল করে রাষ্ট্রপতিকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে দেশের ওপর একদলীয় বাকশালী ফ্যাসিস্ট শাসন যেদিন মুজিব চাপিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিনও মুজিব বিধাতার সকল বিধান লংঘন করে দম্ভোক্তি করেছিলেন–কোথায় সিরাজ সিকদার? আল্লাহ সোবহানু ওয়াতা'লা বলেছেন, সীমা লংঘন করো না। মুজিব সীমা লংঘন করেছিলেন, আর তাঁর পরিণতি কী হয়েছিলো, এতো আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। সেলিম গয়রহ আরেকটি ৩০ মে বলে যে দম্ভোক্তি করছে, সে প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই নিবেদন করবো–ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও। অবশ্য প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল বলেছেন, ইতিহাসের অমোঘ শিক্ষা হচ্ছে এই যে, কেউই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না।

দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ সাধন করে, সম্প্রসারণবাদী ভারতের জিও–স্ট্রাটেজিক স্বার্থ পরিপূরণ করে বাংলাদেশের মানুষের ঈমান-আকীদাকে অপমানিত করে ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠার যে চিরন্তন প্রেরণা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো, তাকে বিসর্জন দিয়ে এবং বাংলাদেশকে ভারতের ইচ্ছাধীন করে যারা বাংলাদেশের মানুষের রোষানলে পতিত

www.pathagar.com

হয়েছে তারা তাদের প্রভু ভারতের মদদপুষ্ট হয়ে এদেশবাসীকে বহুবার গৃহযুদ্ধের হুমকি শুনিয়ে আসছে। এ হুমকি অশুভ, অকল্যাণকর এবং অমঙ্গলজনক। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি ১৫ অগাস্ট দেখেনি, ৭ নভেম্বর দেখেনি এবং ৩০ মেও দেখেনি। তারা নিজের গুণে এবং রূপে এতোই বিভোর যে, পরিপার্শ্বের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পড়েছে। খোদ আওয়ামী লীগ কিভাবে তার নেতা মুজিবকে খুন করে তার গোর খুঁড়েছিলো, তাও তারা বিস্মৃত। হিন্দু পৌরাণিক ঐ প্রবচনটিও তারা বিস্মৃত ঃ তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে। জমিদখল, বাড়িদখল, ফ্ল্যাট দখল, মার্কেট দখল, জবরদস্তিমূলকভাবে সরকারী চাকরি-বাকরি দখল, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ভারত নির্ভর করে তোলা এবং বাণিজ্য-ক্রয় চুক্তির মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার আত্মসাৎ করার যে এক বল্গাহীন ভোজনবিলাস ক্ষমতাসীন গোষ্ঠির মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, তার ফসলও কিন্তু ইতোমধ্যে তাদের গোলায় ওঠা শুরু করেছে। পত্র-পত্রিকাগুলো খুললেই প্রতিদিন দেখা যায়, সরকারী দলের মূল সংগঠনসহ বিভিন্ন অংগসংগঠনের মধ্যকার কলহের কাহিনী, সশস্ত্র সংঘর্ষের কাহিনী এবং নিজ দলের একে অপরকে হত্যা-গুম-খুনের লোমহর্ষক কাহিনী। এটি ক্ষমতাসীন দলের দুরোরোগ্য ব্যাধির সূঁচ পরিমাণ প্রলক্ষণমাত্র। অতএব, সাধু সাবধান!

আজ সারাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও বিধিবিধান সংরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কারণ কেবলমাত্র এর মাধ্যমেই রক্তপাত এড়ানো সম্ভব, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এসব কিছুরই পূর্বশর্ত হচ্ছে, রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে শেখা এবং তাঁদের মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তার প্রতিফলন ঘটানো। আওয়ামীগোষ্ঠি গণতন্ত্রের এই শাশ্বত মর্মবস্তুকে স্বীকার করতে চায় না। ফ্যাসিস্ট প্রক্রিয়ায় জঠরে তাদের জন্ম, ফ্যাসিজম তাদের একমাত্র ধর্ম এবং ফ্যাসিজম তাদের একমাত্র উপজীব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের ইটালীয় এবং ইউরোপীয় ফ্যাসিজমের অন্তত একটি বৈশিষ্ট্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, আর তা হলো, দেশপ্রেমের প্রশ্নে ইউরোপীয় ফ্যাসিজম ছিলো আপসহীন ও অনমনীয়। পক্ষান্তরে আওয়ামী ফ্যাসিজম দেশপ্রেমবিবর্জিত, ভারত তোষণ ও বাংলাদেশে ভারতীয় রণনীতি ও রণকৌশলের স্বার্থসংরক্ষণ হচ্ছে এদের অন্যতম ধর্ম। সারাদেশ এই জাতীয় বেঈমানদের হাত থেকে পরিত্রাণ চায়। আর সেজন্যই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এক অনন্য জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছে। কোনো হুমকি কিংবা ষড়যন্ত্র এই ঐক্যকে বানচাল করার যত প্রয়াসী হোক না কেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রকেই কেবল রাজনৈতিক ব্যবস্থার একমাত্র স্বীকৃত রূপ হিসেবে গ্রহণ করেছে। মানুষের এই শাণিত চেতনা ও আরাধ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারাই ষড়যন্ত্র করতে চাইবে, তারা নূহের প্লাবনের মতোই এক মহাপ্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। একতরফাভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্টরা যে চণ্ডনীতির নজির স্থাপন করলো, তা ঐ মহাপ্লাবন ও মহাপ্রলয়কেই আবাহন করার সমতূল্য। একদিকে দেশবাসী, আরেক দিকে রয়েছে নীলনকশার নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতের পদলেহী তস্করদের যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন করাতে চায়, তারা।

এ এক গ্রহণের কাল। ইতিহাস ও সভ্যতা অবিমৃশ্যকারীদের কখনো ক্ষমা করে না। আওয়ামীগোষ্ঠি এ কথা যেন ভুলে না যায়।

আজ একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, জিয়াউর রহমান এদেশে জনতুষ্টিবাদী (Populist) রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন না বলেই সমাজ ও জাতির প্রয়োজন ও চাহিদাকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। সে জন্য তিনি উৎপাদনের রাজনীতির এক অভূতপূর্ব জোয়ার সৃষ্টি করেন। একথা সর্বজনবিদিত যে, একটি জাতিতে বিভক্ত রেখে বিদ্বেষ, পৈশূণ্য এবং অসূয়াকে লালন করে জাতি গঠন করা সম্ভব নয়। মুক্তিযুদ্ধ একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ। রাজনীতিতে মতাদর্শগত কারণে কিংবা রণনীতিভিত্তিক নির্ধারিত রণকৌশল একেকজনের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তার মানে এই নয় যে, দেশ-জাতি ও জনগণের প্রতি কারও ভালবাসার ঘাটতি রয়েছে। ১৯৭২ থেকে '৭৫-এ দেশে ঘৃণা, প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার নেতিবাচক ও আত্মধ্বংসী প্রণোদনা জাতি নির্মাণ ও জাতি গঠনের প্রধানতম প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। জিয়াউর রহমান ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় আলোকে এক ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেজন্য বিভেদ-বিদ্বেষ ও অসূয়াকে পরিত্যাগ করে তিনি জাতীয় পুনর্সদ্ভাব (National reconciliation)-এর রাজনীতি অনুশীলনের জন্য সমগ্র দেশবাসীর কাছে উদাত্ত আহবান জানান। এক্ষেত্রে জাতীয় বেঈমান আওয়ামীগোষ্ঠির সদস্যসহ আওয়ামীদের প্রতিপক্ষ সকল রাজনীতিক সংগঠন ও কর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা ব্যক্ত করে তিনি জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার এক বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ভারতীয় গোয়েন্দ সংস্থা 'র'-এর প্ররোচনায় আত্মবিক্রয় করে দেয়া রাজনৈতিক মতলববাজরা জিয়াউর রহমানের এই জাতীয় পুনর্সদ্ভাব-রাজনীতির অপব্যাখ্যা করে চরম বিরোধিতার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কিন্তু দেশবাসী আওয়ামীদের চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে জিয়াউর রহমানকে নেতৃত্বে বরণ করে নেন। আজ শহীদ জিয়া লোকান্তরে। কিন্তু তার অনুগামীদের অনেকেই জিয়াউর রহমানের এই দক্ষ, কুশলী, সাহসী ও যুগান্তকারী রাজনৈতিক পদক্ষেপকে অবমূল্যায়ন করে আওয়ামী গন্ধম সেবন করে দেশ এবং জাতিকে স্থায়ী বিভক্তি ও জাতি পুনর্গঠনের কর্মোদ্যোগকে নিঃশেষিত কিংবা বিপথগামী করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এই পরিস্থিতিতে অতন্দ্র জনতাই জাতির একমাত্র ভরসা। সেই সাথে শত্রু-মিত্র বাছাই করে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছে বর্তমানে, তাকে আরও বেগবান করে তুলতে হবে এবং পরীক্ষিত, ত্যাগী কর্মীদের যথাযথ মূল্যায়ন করে তাদের যোগ্যতানুসারে যথোচিত দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। এই কাজটি যদি নিষ্ঠা ও সততার সাথে করা সম্ভব হয় তাহলে সকল কুচক্রী ভারতের এই বেতনভুক্ত সকল নিয়োগী এবং দিল্লীর আজ্ঞাবাহী পুতুলরা বানের পানিতে ভেসে যাবে। এই বুঝতে পেরেই ক্ষমতাসীনদের চণ্ডনীতি দিনের পর দিন তীব্রতর রূপ ধারণ করছে। এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। রাত যত গভীরই হোক না কেন, তমসার যবনিকা ছিন্ন করে সুবহে সাদেক আসতে বাধ্য। এদেশের আজাদীপ্রিয় মানুষ তার জীবন ও সর্বস্ব পণ করে দেশ, জাতি ও জনগণকে তাদের ইপ্সিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দোলাচল আত্মহত্যারই শামিল হবে। এ ধরনের দোলাচলের সম্ভাবনার ক্ষীণ রশ্মি দেখে মূঢ় সেলিম গয়রহ আরেকটি ৩০ মে'র স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন স্বপ্নই। বাস্তবতা বড় কঠিন ও নির্মম। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে যে আপসহীন ও লড়াকু চেতনার সঞ্চার করেছেন, তার সামনে দিল্লীসহ আওয়ামীদের যে কোন প্রভুর আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী রাজনীতি এদেশের সংগ্রামী জনতার উত্তুঙ্গ উর্মিমালার সামনে খড়কুটো এবং শেওলার মত ভেসে যেতে বাধ্য। ভলতেয়ার বলেছেন, জুলুমের বারি বর্ষিত না হলে স্বাধীনতার বীজ অংকুরিত হয় না। আওয়ামীদের মাধ্যমে এদেশবাসীর ওপর আল্লাহর যে লানত নেমে এসেছিল, তার অবসান হওয়ার সকল আয়োজন হয়েছে। আর আওয়ামীরা সেই তাহাত আসসরাতে নিমজ্জিত হয়ে শেষ পরিণতি ভোগ করবে।

www.pathagar.com

৩ জুন ২০০০

বাংলাদেশে জাফনা নাটক মঞ্চস্থের পাঁয়তারা

মাহবুব উল্লাহ :

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশকে পৃথিবীর সবচাইতে বিপজ্জনক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় যা ঘটছে, যে কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ অঞ্চলটিকে পৃথিবীর সবচাইতে বিপজ্জনক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন–তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত। ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে বা ইরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারার সন্নিকটে ইথিওপীয় বাহিনী পৌঁছে গেছে, দক্ষিণ লেবানন থেকে নির্ধারিত সময়ের দুসপ্তাহ আগে ইসরাইলী বাহিনী নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এর পাশপাশি ইসরাইল সমর্থিত সাউথ লেবানন আর্মিও হিযবুল্লাহ গেরিলাদের আক্রমণের মুখে পাততাড়ি গুটিয়েছে। দক্ষিণ লেবানন এখন হিযবুল্লাহ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। এক অর্থে বলা যায়, লেবাননে এখন দ্বৈতশাসন চলছে। তৎসত্ত্বেও লেবাননের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে দক্ষিণ লেবাননে হিযুবল্লাহদের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণে এই মুহূর্তে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহ লক্ষণীয় নয়। ফিজির ঘটনা আরও চমকপ্রদ। ফিজিতে বহুকাল ধরে জাতিগত বিরোধ বিরাজ করছে। সেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও অভিবাসী নাগরিকদের সাথে ফিজির আদিবাসীদের বিরোধ অনেক দিনের। ফিজির অর্থনীতিতে জাতিগত ভারতীয়দের কবজা অত্যন্ত মজবুত। সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে এদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। অন্যদিকে যদিও আদি বাসিন্দারা অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাও কতদিন বজায় থাকবে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ, ফিজিতে অব্যাহতভাবে ভারতীয়দের অভিবাসন চলছে। ১৯৮৭ সালে ফিজির সমর নায়ক রাবুকা আদিবাসীদের পক্ষে ফিজির শাসন ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিলেন। দীর্ঘ একযুগ রাবুকার শাসনের পরে ফিজিতে একটি সংবিধান গৃহীত হয়। সেই সংবিধানের অধীনে নির্বাচনে জাতিগত ভারতীয়রা প্রাধান্য বিস্তার করে এবং মহেন্দ্র চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই পরিস্থিতি ফিজির আদিবাসিন্দাদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই অসন্তোষেরই বিস্ফোরণ ঘটে জর্জ স্পেইটের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারীর ফিজির পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী মহেন্দ্র চৌধুরীসহ তার মন্ত্রিসভার কতিপয় সদস্যকে আটক করে রাখার মধ্য দিয়ে।

ফিজির ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত পরিণতির দিকে গড়িয়ে চলেছে। সর্বশেষে ফিজির প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ফিজির সংবিধান বাতিল ঘোষিত হয়েছে। ফিজিতে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের প্রায় সব দাবী পূরণ করা সত্ত্বেও জর্জ স্পেইট তার দাবীতে অনড় রয়েছেন এবং সামরিক সরকারকেও ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার আহবান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, তিনিই হচ্ছেন ফিজির আদিবাসিন্দাদের স্বপ্নসাধের প্রতিভু। তিনি আরও দাবী করেছেন, সামরিক বাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাঁর দাবী পূরণ হওয়া ভিন্ন আর কোন সমাধান নেই। ফিজির ঘটনা চমকপ্রদ এই কারণে যে, আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র একটি সশস্ত্র গ্রুপও কার্যত একটি রাষ্ট্রের গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। নতুন শতাব্দীতে সমরবিদেরা যুদ্ধ ও সংঘাতের নানা রূপকল্প এঁকেছেন। কোন কোন সমরবিদদের মতে, একবিংশ শতাব্দীতে আটাশ ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। এর মধ্যে কম্পিউটার ক্রাশ, শেয়ার ও মুদ্রাবাজারে ধসও অন্তর্ভুক্ত। চেরনোবিল ভাইরাস, ওয়াই টু কে ও 'লাভবাগের' পর তথ্যপ্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কী ধরনের যুদ্ধসংঘাত ঘটতে

www.pathagar.com

পারে এবং তা একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতিতে কী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। নতুন শতাব্দীর আরেকটি প্রবণতা হল জাতিগত সংঘাত। একদিকে যখন বিশ্বায়নের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে একটি গ্রামের সমতুল্য করে গড়ে তোলার কথা ভাবা হচ্ছে, তখনই তীব্রভাবে দেখা দিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতিসত্তার assertion-এর এক নতুন প্রক্রিয়া। বসনিয়া, চেচনিয়া, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, মধ্যএশিয়া–সর্বত্র একই প্রবণতা। পৃথিবীর নানাপ্রান্তে এতসব বিরোধ-সংঘাত ঘটছে সত্ত্বেও কেবল দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশকে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন পৃথিবীর সবচাইতে বিপদজ্জনক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম জনবহুল রাষ্ট্র বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের অবশ্যই গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিতে হবে।

এই মুহূর্তে শ্রীলংকার পরিস্থিতি অতি উদ্বেগজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। শ্রীলংকা একটি অখন্ড রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে কি-না, সেটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। শ্রীলংকার জাতিগত তামিলরা একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রভাকরণের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে আসছে। কয়েক দিন আগে গোপন তামিল বেতারে জাফনা উপদ্বীপ থেকে শ্রীলংকার সেনাবাহিনী প্রত্যাহারে করে নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি মারাত্মক মানবিক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে। জাফনায় শ্রীলংকার সরকারী বাহিনীর সাথে কলম্বোর সরাসরি যোগাযোগ ক্ষুণ্ন হওয়ার ফলে শ্রীলংকা সরকারকে উত্তরোত্তর বিমান হামলার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। তৎসত্ত্বেও শ্রীলংকা সরকার পরিস্থিতিকে ততটা উদ্বেগজনক মনে করে না বিধায় সৈন্য প্রত্যাহারের প্রশ্নটি বিবেচনায় আনতে চাইছে না। সৈন্য প্রত্যাহার করা হলে জাফনায় কার্যত এলটিটিইর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সেক্ষেত্রে এলটিটিইকে উচ্ছেদ করা হয়ত সম্ভব হবে না। এদিকে মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী টমাস পিকারিং দিল্লী, ইসলামাবাদ ঘুরে কলম্বো গেছেন। কলম্বো থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রীলংকার খণ্ডিতকরণ মেনে নেবে না এবং এলটিটিইর কর্তৃত্বাধীন কোন সরকারকে স্বীকৃতিও দেবে না। তিনি আরও মনে করেন, শ্রীলংকায় তামিলদের পৃথক রাষ্ট্র গঠন ভারতের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ, ভারতের জাতিগত তামিলরা সম্ভাব্য এই স্বাধীন তামিল ভূখণ্ডের অতিনিকটেই অবস্থান করছে। এর ফলে ভারতীয় তামিলরাও একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে উৎসাহ বোধ করতে পারে। ভারতীয় তামিলরা হিন্দি ভাষাভাষী উত্তর ভারতীয় জাতিগোষ্ঠির আধিপত্যে অনেককাল থেকেই বিরক্ত। এই পরিস্থিতিতে অনেকটা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায়, শ্রীলংকায় একটি পৃথক তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে কি-না, তার ওপরেই নির্ভর করছে দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে বদলের রূপ। শ্রীলংকা প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দ্বান্দ্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যদি তার ভূমিকায় নীতিনিষ্ঠতা বজায় রাখতে হয়, তাহলে কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাতন্ত্র্যকামী জনগোষ্ঠির জন্য সেটি খুব সুখকর হবে না। অন্যদিকে বাংলাদেশে যেসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বিরাজ করছে, তার ওপর আমেরিকার এই অবস্থা একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যা প্রত্যক্ষ করা যায়, সেটি হল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলো কখনোই নীতিনিষ্ঠ অবস্থান বজায় রাখে না।

আফতাব আহমাদ :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মিত্রশক্তিরা ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটিয়ে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোকে স্বাধীনতা প্রদানের অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, ঐ স্বাধীনতা বহুলাংশে ছিল কাগুজে স্বাধীনতা। হিটলার এবং ফ্যাসিজমের পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব ঘটে, যার ফলে উৎপাদনমুখী অর্থনীতি, মুক্তবুদ্ধির শিক্ষা, জাতীয়

www.pathagar.com

আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের যে বিপুল পরিকল্পনা প্রয়োজন ছিল তা উপেক্ষিত থেকে যায়। উপরন্তু, এই সদ্য স্বাধীন দেশসমূহ নয়া উপনিবেশবাদের কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মুক্তিকামী মানুষ সেদিন শোষণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ এবং নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে উচ্চারণ করেছিল ঃ 'দেশ চায় স্বাধীনতা, জাতি চায় মুক্তি এবং জনগণ চায় বিপ্লব'। স্নায়ু যুদ্ধোত্তরকালে এ উচ্চারণ আজও ধ্রুব সত্য। সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রকাঠামো বিন্যাসের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতা কিংবা প্রাক্তন ঔপনিবেশিক প্রভূদের প্রদর্শিত পন্থা অনুকরণ করা যে কত আত্মঘাতী হতে পারে, তা এশিয়া-আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর দিকে তাকালে সহজে বোধগম্য। পুঁজিবাদীদের গুরু ও তাত্ত্বিকেরা স্নায়ু যুদ্ধোত্তরকালে আজ ভাবতে শুরু করেছেন, মানুষের সকল সুখ ও মঙ্গল পুঁজিবাদীদের বিশ্বায়নের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু অর্থনীতির ইতিহাস এ বক্তব্যকে যৌক্তিক বলে স্বীকার করে না। আজ বিশ্বায়নের নামে এককেন্দ্রিক যে বিশ্বব্যবস্থা এই গ্রহের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে, সেটি কেউই যে মেনে নেবে না, খোদ মার্কিন পণ্ডিতদের গবেষণালব্ধ বিভিন্ন মৌলিক রচনাতে তা ইতোমধ্যেই প্রতিফলিত হওয়া শুরু করেছে। পুঁজিবাদীদের সদর দফতর খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবকল্যাণ ও বিশ্ব শান্তির প্রশ্নে মার্কিনী বিদ্বৎজনরা পেন্টাগন ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিশ্ব রণনীতি ও রণকৌলের হীন উদ্দেশ্য ও কুফল সাহসের সাথে জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। মানুষকে ভাবনার খোরাক যোগাচ্ছেন। আমরাও ভাবছি। বিবেচনা করছি এবং এক অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় বুক বেঁধে নিরাপস সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছি। হান্টিংটনের 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনে' কিংবা ফুকায়ামার 'এন্ড অব হিষ্ট্রি' বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করা দূরের কথা, ন্যূনতমভাবে হতাশ করতে পারেনি। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর অনেকেরই ধারণা ছিল যে, বিশ্ব বোধ হয় রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব ও জাতিগত বৈরিতা থেকে অবশেষে মুক্তির সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু আমরা আজ যা করছি, সে চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একদিকে ভূ-কৌশলগত আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ করার জন্য, অন্যদিকে খানিজ-জ্বালানি সম্পদের ওপর একক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য, আজ মার্কিন প্রশাসনিক এস্টাবলিশমেন্ট মাত্রাতিরিক্ত উদ্যোগী ও উৎসাহী হয়ে পড়েছে। অবশ্য এখানে বলা বাহুল্য, মার্কিন এস্টাবলিশমেন্ট এ বিষয়ে সর্বসম্মত নয়। আজকের যুগে সরাসরি সামরিক অভিযান চালিয়ে তাঁবেদার সরকারকে অধিষ্ঠিত করে রাজনীতি অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ কব্জা করার বহুল ব্যবহৃত কৌশলটি সেকেলে হয়ে পড়েছে। তাই, এইসব ভূমণ্ডলীয় দুর্বৃত্তরা দেশে দেশে তাদের শিখণ্ডি খুঁজে বের করার ব্যাপারে অতি তৎপর। দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। স্নায়ুযুদ্ধোত্তরকালে আমরা লক্ষ্য করেছি, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও জীবনব্যবস্থার সাথে অঙ্গীভূত করার এক মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা খুব একটা সফল হয়নি। অদূর ভবিষ্যত সফল হওয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাও নেই। একটি জাতি গঠনের ক্ষেত্রে ধর্ম, ভাষা, বর্ণ বা ভিন্ন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা একেকটি উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে বটে, কিন্তু একক উপাদান হিসেবে কখনও কাজ করতে পারে না। পাশ্চাত্যের আরেকটি মূঢ়তা হচ্ছে, ইসলাম ভীতি। পাশ্চাত্য জগৎ খ্রীস্টীয় দৃষ্টিতে ইতিহাস ও মানবসভ্যতাকে ব্যাখ্যা করতে শিখেছে। ইসলাম সাম্য, মুক্তি, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যে উজ্জীবনী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, তা পাশ্চাত্যের অধঃপতিত পণ্ডিতরা কিংবা সমর কৌশলবিদরা বা রাজনীতিকরা বুঝতে অক্ষম। আর তাই স্নায়ু যুদ্ধোত্তর কালে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ইউরোপের বুক থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে গোড়ার দিকে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু আল্লাহ সহায়, জনগণ অসম সাহসের পরিচয় দিয়ে তাদের সেই অভিলাষ পূরণ হতে দেয়নি। বর্তমানে ভূমণ্ডলীয় রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, তারা যা ভাবে বা বিশ্বের যে কোন দেশের জন্য তারা যে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকে, তা সকলে মানতে বাধ্য। কিন্তু ইতিহাস সভ্যতাকে শিখিয়েছে

www.pathagar.com

সৃজনীশক্তির অধিকারী আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে নজতানু হয় না। কারও করুণা ভিক্ষা করে না। আর তাই বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, চেচনিয়া কিংবা ইঙ্গুশেটিয়ায় দেশমাতৃকার লড়াই, জাতীয় মুক্তির লড়াই এবং জনগণের কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের লড়াই অঙ্গীভূত হয়ে এক দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিন্যাসের ওপরে সংসামান্য আলোকপাত করা অত্যন্ত জরুরী। ষাটের দশকে মার্কিনীরা তাদের আজ্ঞাবাহী কয়েকটি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে বিশ্বকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব ও আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়ে সচেষ্ট ছিল। এই পরিকল্পনার অন্যতম অংশ ছিল ভারত নামক দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ রাষ্ট্রটি। ১৯৭১-এর ভূ-রাজনৈতিক এক জটিল পরিস্থিতিতে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে টানাপড়েন দেখা গেলেও অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তা কিছুটা মেরামত করে তোলা হয়ত সম্ভব হয়েছে। 'হয়ত' এজন্য বলছি, কারণ ভারতীয়দের অভিব্যক্ত অভিপ্রায়কে উপেক্ষা করে স্বল্পসময়ের জন্য হলেও বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফর করে গেছেন এবং ভারতীয় প্রচারমাধ্যম ও এদেশীয় নিয়োগীরা বাংলাদেশী সমাজকে 'মৌলবাদী' হিসেবে চিত্রিত করার যে অপচেষ্টা করেছিল তাতে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বিভ্রান্ত হননি। বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য, তার ধর্মীয় ঐতিহ্য, সর্বোপরি বিশ্বসমাজে তার গৌরবজনক ভূমিকাকে ক্লিনটন ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। এটি ভারত ও তার এদেশীয় নিয়োগীরা যে স্বাভাবিকভাবে নেয়নি, তা সরকার সমর্থক বাকশালপন্থী পত্রপত্রিকা পাঠ করলেই বোঝা যায়।

এখন প্রশ্ন হল, দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ও তার কৌশল দিল্লীকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়াবে না দক্ষিণ এশিয়ার স্বাধীন স্বতন্ত্র সাতটি রাষ্ট্রকে আবদ্ধ করবে। ১৯৪৭-এর ভারত রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর থেকে ভারত তার কোন প্রতিবেশীর সঙ্গে সৎ ও স্বাভাবিক আচরণ করেনি। ক্ষেত্রবিশেষে তার আধিপত্যবাদী, সম্প্রসারণবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ধ্যানধারণা প্রতিবেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর ওপর বিভিন্ন আকার ও আঙ্গিকে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্ন যখন ওঠে তখন স্বাভাবিকভাবেই সমমর্যাদার ভিত্তিতে সম্মানজনক লেনদেনের বিষয়টি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভারত আন্তর্জাতিক স্বীকৃত এই সভ্য রীতিনীতি মানতে নারাজ। দক্ষিণ এশিয়ার প্রশ্নে জওহর লাল নেহরু থেকে শুরু করে আজকের বাজপেয়ী-আদভানী পর্যন্ত ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি তাঁরা যে নীতি অনুসরণ করে আসছেন তাকে এককথায় বলা যায় 'প্রভূত্ব ডকট্রিন' যা মার্কিন মনরো ডকট্রিনেরই একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্করণ। আমরা লক্ষ্য করেছি, বিশ্বের যেখানেই শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা হুমকির মুখোমুখি হয়েছে, সেখানে বিশ্ববাসী একযোগে তার সমাধানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে এসেছে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রভুত্ব ডকট্রিনের মোদ্দা কথা হল– ভবানী সেনের ভাষায় ঃ ভারতের সম্মতি ছাড়া, ভারতের সমর্থন ছাড়া এবং ভারতের অংশগ্রহণ ছাড়া ভারতের কোন প্রতিবেশী যদি অভ্যন্তরীণ সঙ্কট নিরসনের জন্য কোন তৃতীয় পক্ষকে আহ্বান করে, তাহলে সে আচরণকে ভারতের প্রতি বৈরিতা বলেই গণ্য করা হবে না, বরং ভারতের সাথে একটি যুদ্ধাবস্থার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। নেহরু থেকে তার কন্যা ইন্দিরা, তার পুত্র রাজীব, তার উত্তরাধিকারী নরসীমা রাও কিংবা আজকের চরম সাম্প্রদায়িক বিজেপির বাজপেয়ী-আদভানী-এরা সকলেই এই প্রভুত্ব ডকট্রিনকে তাদের একমাত্র ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, যেখানে গৃহযুদ্ধ সশস্ত্র সংঘাত বা সংঘর্ষ ঘটেছে, সেখানে জাতিসংঘের উদ্যোগে কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে বহুজাতিক সশস্ত্র বাহিনী পাঠানো হয়েছে শান্তি, স্বস্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য। ভারত এই আন্তর্জাতিক রীতি-রেওয়াজকে থোড়াই কেয়ার করে। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে ভারত নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়ে আসছে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ কৃপায় এবং আমাদের বীর জনগণের অবিভাজ্য ঈমানের কারণে

www.pathagar.com

ভারতীয় ষড়যন্ত্র বারবার দেশবাসীর কাছে ধরা পড়ে গেছে। প্রশান্তির নীড় ও সমৃদ্ধির তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত শ্রীলংকা নামক যে দ্বীপটি একদা দক্ষিণ এশীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে আসছিল, তার বর্তমান কী বেহাল অবস্থা হয়েছে, সংবাদপত্রের পাঠক কিংবা বেতারের শ্রোতামাত্রই জানেন। শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধন মার্কিন সাহায্য কামনা করা সত্ত্বেও ভারত রুষ্ট হবে শুধু এ কারণে আমেরিকা শ্রীলংকার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। অনন্যোপায় হয়ে জয়বর্ধন ভারতকে অনুরোধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সামরিক সাহায্যের জন্য। শ্রীলংকার প্রতিটি নাগরিক শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা একদা শ্রীলংকায় ভারতের সামরিক উপস্থিতিকে জাতীয় অপমান হিসেবে গণ্য করেছিল। আমাদের মনে রাখা দরকার, শ্রীলংকা ASEAN জোটেরও একটা ডায়ালগ পার্টনার। ভারতের বিশাল আকৃতি ও সামরিক আস্ফালনের কারণে ASEAN ভুক্ত কোন দেশও শ্রীলংকার পাশে এসে দাঁড়াতে সাহস পায়নি। পক্ষান্তরে ভারতের কাশ্মীর, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং আরও বহু বিচ্ছিন্ন এলাকায় মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে এসব রাজনৈতিক ও সামরিক insurrection-কে সামাল দিতে হলে এবং সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান করতে হলে বিশ্বসমাজের বিশ্বনাগরিকের যে কর্তব্যবোধ ও নৈতিকতা, তার দ্বারা প্রভাবিত না হলে রক্তক্ষয় বন্ধ হবে না। শান্তি আসবে না, স্থিতি আসবে না, মানসম্মত জীবনযাপন সম্ভব হবে না। আমরা তো ক্যাম্বোডিয়ার ইতিহাস জানি ও সাইপ্রাসের ইতিহাসও জানি, কিংবা এই সেদিন বুরুনডিতে যা ঘটে গেল, সেই লোমহর্ষক ইতিহাসও জানি। ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে নাইবা আলোচনা করলাম। ভারত শ্রীলংকাকে দ্বিখণ্ডিত করতে চায় না, এটি ভাবতে যুক্তি হাতড়াতে হবে। তার কারণ, হিন্দুকুশের গিরিমালা থেকে শুরু করে ইন্দোচীনের গহীন অরণ্য পর্যন্ত যে বিশাল বিস্তৃত ভূখণ্ড, ভারত তাকে তার স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত ভূখণ্ড মনে করে। এছাড়াও ভারত মহাসাগর (যে নামটি অত্যন্ত আপত্তিকর)-কে ভারত তার পশ্চাৎভূমি ও স্বাভাবিক হ্রদ হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। দিয়াগোগার্সিয়াতে ভারত মার্কিন পারমাণবিক উপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৈরিতায় অবতীর্ণ হওয়ার সাহস রাখে না। এ থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে, সদ্ভাবের ভারসাম্য শুধু নয়, বা ব্যালেন্স অব টেররও শুধু নয়, শত্রুকে ঘায়েল করতে পারে–এ ধরনের যে কোন মিলিটারী টেরর উইপন ডেটারেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর আজ এই ডেটারেন্স শক্তির অধিকারী হওয়া অতি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শ্রীলংকার প্রভাকরণ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা, RAW-এর সৃষ্টি এবং প্রভাকরণের মধ্য দিয়ে ভারত শ্রীলংকার অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শ্রীলংকার সকল তামিলের দেশপ্রেমকে প্রশ্ন করা অন্যায় হবে। শ্রীলংকার দু'ধরনের তামিল জনগোষ্ঠির বাসস্থান। জাফনাসহ শ্রীলংকার উত্তরাঞ্চলে যারা বসবাস করে, তারা চরম কঠোরভাবে সিংহলীদের সাথে কোন ধরনের সামাজিক সম্পর্ককে অনুমোদন করে না। এদের অধিকাংশই ভারতীয় অধিবাসী এবং ভারতের তামিলানাড় রাজ্যে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে সবরকমের কারবার রয়েছে।

তামিলানাড় রাজ্যের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং ভারতীয় ইউনিয়ন সরকারের ওপর তাদের যে নিয়ন্ত্রণ তা ভারতীয়সহ বিশ্ববাসী সকলেই জানে। এরাই হচ্ছে শ্রীলংকায় ভারতীয় পঞ্চম বাহিনী। অপরদিকে শ্রীলংকার দক্ষিণে প্লানটেশন তামিল যারা (চা বাগানে কর্মরত তামিল) তারা কোনও অবস্থাতেই উত্তরের তামিলদের সাথে সদ্ভাব রক্ষা করতে পারেনি। এসব তামিল শ্রীলংকার অখণ্ডতায় বিশ্বাস করে এবং শ্রীলংকায় যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান রয়েছে, তাদের সাথে এদের যে নিবিড় সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও সম্প্রীতি রয়েছে, তা সভ্যতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.com

শ্রীলংকা সমস্যার সমাধান অতীব সহজ। সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করে কিংবা একটা আর্মিস্টিস-এর ব্যবস্থা করে একটা সমাধান হতে পারে। শ্রীলংকা এবং ভারত উভয়েই ASEAN-এর ডায়ালগ পার্টনার। ASEAN বিশেষ করে মাহাথির এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সর্বোপরি রয়েছে রাষ্ট্রসংঘ . নিরাপত্তা পরিষদের ছত্রচ্ছায়ায় বহুজাতিক বাহিনী শ্রীলংকায় প্রেরণ করলে দ্বিপাক্ষিকতার নামে ভারতীয় প্রভুত্ব ডকট্রিনের অপমৃত্যু ঘটবে। ভারতের চরম কূটকৌশল হচ্ছে তারা বহুপাক্ষিকতা কখনও বিশ্বাস করে না। শান্তির মোহন বাণী শুনিয়ে দ্বিপাক্ষিকতার জালে ফাঁসিয়ে ছোট প্রতিবেশীর ওপর ঘুড়ি ঘোরানোকেই তারা শ্রেয় মনে করে। কারণ, ভারত রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সম্পর্কে বিশ্বাস করে না। ভারতের কূটনীতির মূল ভিত্তি হল, ভারতীয় সরকারের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে তাদের ক্রীড়নক দলটির সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিবিড়তর করা এবং ঐসব ক্রীড়নকদের প্ররোচিত করে ভারতের ভূরাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থকে অর্জন করা।

মাহবুব উল্লাহ :

দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র পাকিস্তান ব্যতিরেকে অন্য যে সব ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র রয়েছে, ভারত সে সব দেশে একদিকে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য মদদ যোগায় ও অন্যদিকে এই অস্থিতিশীলতা নিরসনের যে কোন উদ্যোগে ভারত এমনভাবে আচরণ করে যে, অস্থিতিশীলতার শিকার রাষ্ট্রটি ভারতকে না জড়িয়ে কোন সমাধানের কথাই ভাবতে পারে না। শ্রীলংকা খুব ভাল করেই জানে, তামিল বিদ্রোহের ইন্ধন ও মদদদাতা কে। তৎসত্ত্বেও সঙ্কটকবলিত শ্রীলংকা দিল্লীর কাছেই প্রথম সাহায্যের আবেদন করেছে। শ্রীলংকার পক্ষে দিল্লীর দ্বারস্থ হওয়া নিছকই কৌশল মাত্র। কারণ, শ্রীলংকা জানে, দিল্লীকে ডিঙিয়ে অন্যকোনও রাষ্ট্রের সাহায্য চাইতে গেলে তা দিল্লীর রোষানল ডেকে আনবে। শ্রীলংকা যখন দিল্লীর মধ্যস্থতা কামনা করল, তখন দিল্লী জানাল, দিল্লী তখনই মধ্যস্থতা করবে, যখন শ্রীলংকা সরকার ও তামিলরা উভয়ে দিল্লীর মধ্যস্থতা কামনা করবে। দিল্লীর এই শর্তারোপের মাজেজা কী? এর মাধ্যমে দিল্লী স্পষ্টভাবে জানান দিল, এলটিটিই'র প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্বের কথা। বাংলাদেশও ভারতের কাছ থেকে একই ধরনের আচরণ প্রত্যক্ষ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মুষ্টিমেয় উপজাতীয় বিদ্রোহীরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করেছিল। দীর্ঘদিন এই মুষ্টিমেয় উপজাতীয় বিদ্রোহীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটির সমাধানের জন্য বাংলাদেশ যখন উদ্যাগ গ্রহণ করে, তখন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়। বাংলাদেশ সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছিল বলেই এই আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। অথচ বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর শান্তকরণ অভিযান (Pacification compaign) প্রায় ৯০ শতাংশ সফলতা অর্জন করে ফেলেছিল। উল্লেখ্য যে এই অভিযান সফল না হলে বিদ্রোহীরা আলোচনায় বসত না। একটি আপস আলোচনা তখনই সফলতা অর্জন করে, যখন এই আলোচনায় প্রবিষ্ট পক্ষ শক্তিশালী অবস্থান থেকে আলোচনায় শামিল হয়। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যে আবদুল্লাহ-লারমা 'শান্তিচুক্তি' হয়েছে. সেই চুক্তি সকল বিদ্রোহী গ্রুপকে সংশ্লিষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। এখনও প্রীতিকুমার চাকমার দলটি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভয়াবহ রক্তপাতের হুমকি সৃষ্টি করছে। অপরদিকে, সন্তু লারমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসেও নানা হুমকি উচ্চারণ করেছেন। সন্তু লারমা সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবী তুলেছেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংলাদেশী বাঙালীদের দুর্বল সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করতে চাইছেন। সবকিছু প্রত্যক্ষ করে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে. ভারত বাংলাদেশে আরেকটি জাফনা-নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজনে লিপ্ত। ভারত একদিকে সাপ হয়ে দংশন করছে অন্যদিকে 'ওঝা'

www.pathagar.com

সেজে বিষ নামানোর অভিনয় করছে। এই একই ধরনের অভিনয় নেপালের ক্ষেত্রেও জারি রয়েছে। পাকিস্তান বাংলাদেশ বা শ্রীলংকার মত সামরিকভাবে দুর্বল না হওয়ায় এবং শেষপর্যন্ত আণবিক বোমার অধিকারী হওয়ায় পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ভারত তার সাপ ও ওঝা নীতির কার্যকর করতে বেগ পাচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানকে প্রচণ্ডভাবে অস্থিতিশীল করার কাজে ভারত এক মুহূর্তের জন্যও বিরত হচ্ছে না। পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নী বিরোধ, মোহাজের ও স্থানীয় বিরোধ এবং বেলুচিস্তানের পরিস্থিতিতে ভারতের কালো হাত রয়েছে বলে অনেক পর্যবেক্ষকই মনে করেন। পাকিস্তানে বারংবার সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পেছনে পাকিস্তানের অস্থিতিশীলতা কোন অংশে কম দায়ী নয়। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকই এ ব্যাপারটা আমলে আনতে চান না। সবশেষে যে কথাটি বলা যায়, তাহ্‌ল, শ্রীলংকার তামিল সমস্যা, কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের লড়াই, উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাতন্ত্র্য অর্জনের সংগ্রাম, পাকিস্তানের ধর্মীয় গোষ্ঠিগত ও জাতিগত সংঘাত এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তুষের আগুনের মত জ্বলে থাকা সমস্যা দক্ষিণ-এশিয়া উপমহাদেশকে সত্যিই পৃথিবীর অন্যতম বিপজ্জনক এলাকায় পরিণত করেছে। পাকিস্তান ও ভারতের আণবিক সক্ষমতা অর্জনের পর পরিস্থিতি আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার সমস্যাগুলোর মূল উৎস দিল্লীর ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যবাদকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হলে আমাদের ভবিষ্যৎ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের জনগণের গভীর দেশাত্মবোধ এই বিপদ ঘটতে দেবে না। আমরা তা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি।

আফতাব আহ্‌মাদ :

ভারত বিশ্ব রাজনীতির নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই তার পররাষ্ট্রনীতিতে শিষ্টাচার নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের পানির ন্যায্য হিস্যা অস্বীকার করে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবেশগত যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে, বাংলাদেশকে একটি পশ্চাৎপদ কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে ভারত বাংলাদেশের যৌক্তিক অভ্যুদয়কে লুপ্ত করে দেয়ার এক সুগভীর যড়যন্ত্রে লিপ্ত। ক্লিনটন বেইজিং সফরে গিয়ে যখন তিনি বললেন, দক্ষিণ এশিয়ার প্রশ্নে Sino- U.S Engagaement এই অঞ্চলে শান্তি সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে, ঠিক তখনই ভারতের সাউথ ব্লক তথা পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় তথা সিপিআর (Centre for Policy Research) ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এর পরপরই লক্ষ্য করা গেছে, ভারত চীনের প্রতি কিছুটা নমনীয় ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীন তার প্রতিবেশী কিংবা মিত্রদের সাথে কখনও ছলচাতুরী করেছে, এ নজির এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। মার্কিন-চীন সহযোগিতায় চিড় ধরাবার জন্য ভারত এখন China card খেলতে শুরু করেছে। যার সর্বশেষ প্রমাণ আমরা পেলাম ভারতীয় রাষ্ট্রপতির বেইজিং সফরের মধ্য দিয়ে। কিন্তু একথা তো ভুললে চলবে না, নেহরুর জীবদ্দশায় চৌএন লাই যখন ভারত সফরে আসেন, তখন দু'নেতা উর্ধ্বাকাশে হাত উত্তোলন করে এক কাব্যিক উচ্চারণ করেছিলেন ঃ 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই'। কালের আবর্তে 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' এর এই সুস্বাদু চিনি যে কী তিক্ত পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছিল এবং ভারতের একগুঁয়েমি ও গোয়াতুর্মির কারণেই, তা আজ বিশ্বের তাবৎ গবেষক, রাজনীতিবিদ এবং সমাজমনস্ক মানুষ মাত্রই জানে। অতএব, নতুন করে হিন্দী-চীনী ভাই ভাইয়ের মিষ্টিমুখ দেখে আমাদের এদেশীয় জাতীয় বেঈমান ও ভারতীয় নিয়োগীরা সংগোপনে যতই তৃপ্তি লাভ করুক না কেন, তাদের তৃপ্তি অতৃপ্তই থেকে যাবে।

www.pathagar.com

১০ জুন ২০০০

বাংলাদেশী মন ও বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম পুরোধা প্রফেসর আনিসুজ্জামান দৈনিক প্রথম আলোর 'কাল নিরবধি' শিরোনামে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা ধারাবাহিক লিখে চলেছেন। ২ জুন ২০০০ সংখ্যায় তিনি ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রধানত মুলক রাজ আনন্দ ও হুমায়ুন কবীরের উদ্যোগে আয়োজিত 'এশীয় লেখক সম্মেলন' প্রসঙ্গে লিখেছেন। ঐ সম্মেলনে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন কবি গোলাম মোস্তফা, সুফিয়া কামাল, সৈয়দ নূরুদ্দীন, ফয়েজ আহমদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আতোয়ার রহমান, সানাউল্লাহ নূরী, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, কাতিল শাফায়ি ও ইজাজ বাটাল্ভী। শেষোক্ত তিনজন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরও একজন যোগ দিয়েছিলেন যাঁর নাম আনিসুজ্জামান স্মরণ করতে পারেননি। ধারাবাহিক 'কাল নিরবধি'র এই সংখ্যায় দুটি ছবি ছাপা হয়। এর একটিতে দেখা যায়, আনিসুজ্জামান, সুফিয়া কামালের পাশাপাশি সম্মেলন কক্ষে আসন নিয়েছেন। অন্যটিতে পূর্ব পাকিস্তানের তরফ থেকে যাঁরা এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা গ্রুপ ফটোর জন্য পোজ দিয়েছেন সম্মেলনস্থল বিজ্ঞান ভবনের সামনে। উভয় ছবিতে আনিসুজ্জামানকে কালো শিরওয়ানি পরিহিত রূপে দেখা যায়। সে সময়ে আনিসুজ্জামান ছিলেন এম এ ক্লাসের তরুণ ছাত্র। আনিসুজ্জামানের পরনে খাস পাকিস্তানী তথা মুসলমানী শিরওয়ানি লক্ষ্য করে আজকের আনিসুজ্জামানকে চেনা যাবে না। প্রফেসর আনিসুজ্জামানকে ধন্যবাদ দিতে হয় একথা ভেবে যে, ৪৪ বছর ধরে তিনি তাঁর স্মৃতির ছবিটি ধরে রেখেছেন এবং আজকের উৎকট ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশে তাঁর 'রাজাকার মার্কা' পোশাক পরিহিত ছবি সংবাদপত্রের পাতায় ছাপাতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। 'রাজাকার মার্কা' বিশেষণটি ব্যবহার করে আমি প্রফেসর আনিসুজ্জামানকে খাটো করতে চাইনি। সেরকম কোনো অভিসন্ধিও আমার নেই। বস্তুত প্রফেসর আনিসুজ্জামান (যিনি এখন বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান) এর ব্যবহৃত গত ২৮ বছরের পোশাকের সাথে ১৯৫৬ সালে ব্যবহৃত পোশাকের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি বহু বছর ধরেই লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরিধান করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাটকে আজকাল শিরওয়ারি নিছকই 'রাজাকার' কিংবা 'শান্তি কমিটি'র সদস্যদের পোশাক।

শুধু পোশাক নিয়ে আমাকে এতোগুলো কথা বলতে হল এ কারণে যে, কালের বিবর্তনে একই পোশাক হতে পারে গৌরব অথবা গ্লানির প্রতীক। এখন প্রফেসর আনিসুজ্জামানকে জোর-জবরদস্তি করেও শিরওয়ানি পরান যাবে কিনা আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ, প্রফেসর আনিসুজ্জামান এখন যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন, সেই মূল্যবোধের দৃষ্টিতে এটি পরিত্যাজ্য। শুধু পোশাকের ক্ষেত্রেই নয়, জীবন ও সংস্কৃতির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশী এলিটদের মধ্যে এক ধরনের দ্বৈধতা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ আমাদের ইতিহাস, আমাদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা। পাকিস্তানের সাথে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের যে বাংলাদেশ সিকি শতাব্দী ধরে ঐক্যবদ্ধ ছিলো, সেই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার এলিটদের সংঘবদ্ধ হবার ক্ষেত্রে ভারতীয় বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক উপাদনগুলো 'সঞ্জীবনী শক্তি" হিসেবে কাজ করেছিলেন। প্রতিবাদমুখর পূর্ব পাকিস্তানী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীরা সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের 'ভদ্রলোক সংস্কৃতি' তা যতোই হিন্দুয়ানী হোক না কেন, তার সাথে নিজেদের একাত্মবোধ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গীয় 'ভদ্রলোক সংস্কৃতি'র বৈশিষ্ট্যের সংগে পূর্ববাংলার মুসলমান লেখকদের বামপন্থী ভাবধারার মত বিরোধ সত্ত্বেও পূর্ববাংলার মুসলমান লেখকরা (কতিপয়) পশ্চিবঙ্গীয় ধাঁচ ও রীতির স্পর্শে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তৎকালীন পূর্ববাংলার মুসলমান লেখকরা পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে নিজস্ব ও পৃথক কোনো ভাবধারার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হননি বা চেষ্টাও করেননি। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জগতটি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ও সংস্কৃত ভাবধারায় আচ্ছন্ন থেকে যায়।

পূর্ববাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতিতে বিশেষ করে কৃষকদের স্তরে ধর্মীয় সমন্বয়বাদের একটি ক্ষীণ স্রোতধারা প্রবহমান ছিল। হিন্দু সত্য নারায়ণের তুল্য মুসলমানদের ছিল সত্যপীর। উভয় সম্প্রদায়ই এদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করত। ইসলামী পিউরিটানিজমের দৃষ্টিতে ধর্মীয় সমন্বয়বাদ গ্রহণযোগ্য না হলেও লোকপর্যায়ে এর প্রতিফলন ছিল। পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন এই ভাবধারাকে ভিত্তি করে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির মিলনের আকুতি প্রকাশ করেছেন। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে জসীম উদ্‌দীন মুসলমান যুবক ও হিন্দু যুবতীর প্রেমের বিয়োগান্ত কাহিনী বিধৃত করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংঘাত, রক্তপাত এবং বিরোধ জসীম উদ্‌দীনকে প্রচণ্ড কাব্যিক শক্তি যুগিয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু জসীম উদ্‌দীন দেখাতে চেয়েছেন এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির পেছনে ছিল ধনী ও শোষক সম্প্রদায়ের উসকানি। পাকিস্তান আমলে যে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা দানা বাঁধে, তার প্রধান পরিপোষক ছিল শহুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক আবহে গড়ে ওঠা ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত এলিটগোষ্ঠী। একথা সত্য যে, এই বাঙালিত্ববাদী লেখকরা কেউ কেউ এমন কিছু সাহিত্য রচনা করেছেন, যা পূর্ববাংলার বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। তবে এই লেখকদের লেখনী এই বুর্জোয়াগোষ্ঠীকে উপজীব্য করে চালিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর তাঁদের লেখা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। মার্ক্সবাদ ও পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ন সাধন করতে গিয়ে পূর্ববাংলার বিকাশমান জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার মধ্যে এক ধরনের স্নায়বিক চাপ ও সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। এই সংঘাত আমরা লক্ষ্য করেছি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'আরণ্যক দৃশ্যাবলী' নামক প্রবন্ধ সংকলনে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এই গ্রন্থের তাবৎ প্রবন্ধে উদারতাবাদকে মূলত প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জনাব চৌধুরীর দৃষ্টিতে উদারতাবাদ হল রক্ষণশীলতাবাদ। রক্ষণশীলতাবাদ পরিবর্তনকে অস্বীকার করে। বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল এক ধনাঢ্য ভূস্বামী পীরালি ব্রাহ্মণ পরিবারে। রবি ঠাকুর দারিদ্র্য কাকে বলে জীবনে তা কখনও অনুভব করেননি। পাকিস্তান আমলে কিছু জঙ্গী মার্ক্সবাদী মুসলমান বাঙালি তাঁর শ্রেণীচরিত্রের প্রতি নজর দেবার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল সাহিত্যকে শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চেয়েছেন এমন এক সামাজিক চেতনার বিন্যাসে যা মার্ক্সবাদী চিন্তাচেতনার পরিপন্থী নয়। তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যে নান্দনিক শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি প্রগতিশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও খুঁজে পেয়েছিলেন। যদিও তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের প্রগতিবাদ বিপ্লবাত্মক ছিল না, তিনি ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদের পরিকাঠামো থেকে মুক্ত হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম পরিবার গোঁড়া হিন্দুত্ববাদের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করতো। তৎসত্ত্বেও এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ঐতিহ্যের প্রধান প্রধান উপাদানের প্রতি নিবিড়ভাবে

www.pathagar.com

একাত্মবোধ করতেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুয়ানী উচ্চমার্গের সাহিত্যের প্রতি ১৯৪৫ থেকে পূর্ববাংলায় যে অনুরাগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, সেটাই পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর (সিন্ধি, পাঞ্জাবী, বেলুচী ও পাঠান) সংগে বন্ধন ছেদ করার রসদ যুগিয়েছিল। বদরুদ্দীন উমর বাঙালী মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা বলতে গিয়ে মোগল, ফার্সী ও উর্দু সংস্কৃতিকে নিন্দা করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে উপমহাদেশের অন্যান্য মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে একটি অভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাঠামো লুপ্ত হলেও প্রাক ব্রিটিশ ফার্সী উচ্চবর্গীয় মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি একাত্মবোধ লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম রক্ষণশীলতাবিমুখ হওয়া সত্ত্বেও উপমহাদেশীয় মুসলিম সত্তার প্রতি তাদের অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে সুনীতি বিশ্বাস এক আশ্চর্য বিষয় দেখতে পান। নাজমা রহমান নামে এক ছাত্রীর কাছে সুনীতি বিশ্বাস জানতে চেয়েছিলেন নারীর কর্তব্য কী হওয়া উচিত। নাজমা অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে জবাব দিয়েছিলেন, এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। আজকের বিশ্বে নারীরা সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে চায় না। এ কালের নারীরা নারীত্বকে কেবলমাত্র মাতৃত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখে না। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের শহুরে নারী সমাজের মধ্যে নারী মুক্তির যে সংগ্রামী চেতনা সৃষ্টি হয়েছে, নাজমা তারই প্রতিধ্বনি ঘটিয়েছেন। সুনীতি বিশ্বাস ১৯৭৩ এ আরও লক্ষ্য করেছেন, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী পুরুষ এই দৃষ্টিভঙ্গির কট্টর সমালোচনা করেছে। নাজমার কাছে সুনীতি বিশ্বাসের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, 'আপনি কি ভ্রমণ করতে আনন্দ পান? কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আপনি ভ্রমণ করেছেন'? নাজমার জবাব ছিল 'আমি ভ্রমণে আনন্দ পাই। আমি অনেক ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান ঘুরে বেড়িয়েছি। এর মধ্যে রয়েছে আগ্রার তাজমহল, আগ্রার দরবার, দিল্লীর লালকিল্লা, আজমীর, সম্রাট শাহজাহানের উদ্যান এবং কুতুব মিনার'। সুনীতি বিশ্বাসের এই অভিজ্ঞতাটি বর্ণিত হয়েছে *দৈনিক বাংলার* ১৩৮২'র ২২ পৌষ সংখ্যায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনা' প্রবন্ধটিতে। সুনীতি বিশ্বাস উল্লিখিত সাক্ষাৎকারে বাঙালী মুসলমান, ইহজাগতিকতাবাদী ও পাশ্চাত্য ঘেঁষা এলিট নারীর মধ্যে দুই বিচ্ছিন্ন মনন ও মানসিকতার সম্মিলন লক্ষ্য করেছেন। একদিকে নারীরা চাইছে পুরুষদের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে 'নারীমুক্তি' অর্জন করতে, অন্যদিকে মুসলিম সাংস্কৃতিক নান্দনিকতায় জীবনের সমৃদ্ধি ঘটাতে। যে মুসলিম তরুণীটির কথা সুনীতি বিশ্বাস লিখেছেন, সে প্রতিবেশী হিন্দু ভারতবর্ষে গিয়ে মুসলমান বাদশাদের রেখে যাওয়া ইসলামী স্থাপত্য কীর্তির প্রতি আকৃষ্ট বোধ করেছে, কোন হিন্দু মন্দির বা স্তূপের প্রতি নয়। ইহজাগতিকতাবাদী শিক্ষিত বাংলাদেশীরা চুঘতাইয়ের শিল্প কর্মের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করেন, অথচ চুঘতাই মোগল দরবারী শিল্প রীতিতেই ছবি এঁকেছেন। মোগলরা এসেছিল মধ্য এশিয়া থেকে। বদরুদ্দীন উমরের দৃষ্টিতে মোগল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। মোগলদের ফার্সী বাদশাহী সংস্কৃতি চূড়ান্ত পরিণতিতে উর্দু ও পাকিস্তানী সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করে। এক্ষেত্রে একাত্তরোত্তর বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান এলিটদের পছন্দের সঙ্গে পাকিস্তানীদের পছন্দের একটি সাধারণ ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে মনে হয়েছিল বাঙ্গালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের কৃষকদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে চিরতরে ছেদ ঘটিয়েছে। যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা ইসলামের নামে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা প্রদান করতে চেয়েছেন, সেহেতু এইসব বুদ্ধিজীবীরা স্বদেশী সংস্কৃতির সকল প্রকার ইসলামী ও আরব বৈশিষ্ট্যের প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। এদের অনেকে ইসরাইলকে দেখেছেন একটি গতিময় আধুনিক এশিয়ান রাষ্ট্র হিসেবে এবং ইসলামকে

www.pathagar.com

সামাজিকভাবে তমসাবাদী বিদেশী ধর্ম গণ্য করে পূর্ব বাংলার স্থানীয় ইহজাগতিক সংস্কৃতির পরিপন্থী হিসেবে বাতিল করতে চেয়েছেন। তথাকথিত শিক্ষিত এলিটদের এই ইসলামবিমুখ আধুনিকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ইসলামী জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয় রয়েছে। তারা কখনও অবিভক্ত বাংলার ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একাত্মবোধ করে না। যে বাংলাদেশীরা একাত্তরে যুদ্ধ করেছিল, তারা ছিল বাঙ্গালী মুসলমান লেখক ইসমাইল হোসেন সিরাজীর দৌহিত্রতুল্য। ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলকান যুদ্ধে তুর্কীদের পক্ষে লড়াই করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গিয়েছিলেন। এই একাত্তরের প্রজন্ম হল ১৯৫৬ তে সুয়েজ যুদ্ধের প্রতিবাদে যে সকল পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান ব্রিটিশ কনসুলেট ভবন ভস্মীভূত করেছিল, তাদেরই সন্তান।

একটি মিসরীয় ইস্পাত কারখানায় ইসরাঈলীদের বোমাবর্ষণের পর ৭০ ব্যক্তি নিহত হওয়ায় মওলানা ভাসানী ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ১৯৭০ সালে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতে চেয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভলগ্নে পূর্ব বাংলার তরুণরা পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ ব্যক্ত করতে গিয়ে ইকবাল হলকে পরিণত করল জহুরুল হক হলে, জিন্নাহ হল হলো সূর্যসেন হল, জিন্দাবাদের পরিবর্তে হলো 'জয়'। কিন্তু বোধোদয় ঘটতে খুব বিলম্ব হল না। এসব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল সুবিবেচনা ও সুচিন্তা বিবর্জিত উত্তেজনার প্রতিফলন। এমনকি যে গানটিকে মুক্তিযুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ধারণ করা হল এবং পরবর্তীকালে জাতীয় সংগীতরূপে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় তা এমন এক কবির রচিত, যার অপর একটি গান প্রতিবেশী ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। তিনি বৃহত্তর ভারতীয় হিন্দু জাতীয়বাদের মধ্যেই নিজ পরিচয় খুঁজে পেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা এমন এক আত্মবিস্মৃত জাতি যে, আমাদের দেশীয় কবির রচিত কোন গানের মধ্যে জাতীয় সঙ্গীত হবার মত উৎকর্ষ খুঁজে পেলাম না অথবা একাত্তরের রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়েও আমাদের কোন কবির পক্ষে সে রকম যোগ্য একটি গান রচনা করা সম্ভব হল না। আমাদের জাতীয় পরিচয় নির্মাণের এই ব্যর্থতা ক্ষমার যোগ্য নয়। অন্যদিকে এদেশে যারা ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি প্রচণ্ড মমত্ব বোধ করেন, তাঁরাও কবি নজরুলের ভাষায় বলতে হয় 'বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে, আমরা তখন বসে / বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি কোরআন কিতাব চষে।' ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলাদেশী মানস জগতের প্রকৃত প্রতিফলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অবকাঠামো নির্মাণ করেই আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রাহুমুক্ত করা সম্ভব।

আফতাব আহমাদ :

যে কোন জাতির সাংস্কৃতিক চৈতন্যের মূলে ধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। UNESCO এর মতে সকল দেশের কর্তব্য হচ্ছে ধর্ম ও আত্মিক চৈতন্যকে যথার্থ গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে যত্নবান হওয়া। এ প্রসঙ্গে ১৯৮২ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত UNESCO সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয়ঃ (১) একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সে দেশের গণমানুষের ঐতিহাসিক ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিবেচনা করা। (২) সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আত্মিক চৈতন্যকে পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করা (৩) ধর্মের যে আন্তর্জাতিক বিশিষ্টার্থক ও সর্বমানববাদী রূপ রয়েছে তাকে সংরক্ষণ করা এবং তার সঙ্গে সমন্বিত করে সংস্কৃতিকে বিনির্মাণ ও বিন্যাস করা (৪) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিতে যে চিরায়ত ও আত্মিক মূল্যবোধ রয়েছে, আপন-আপন সাংস্কৃতিক বিকাশে সে মূল্যবোধকে যথার্থ মর্যাদা দেয়া। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এবং ব্রিটিশ উপনিবেশোত্তর ভারতে উপর্যুক্ত যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম তা সব সময়ই উপেক্ষিত থেকেছে। ব্রিটিশ ভারত রাষ্ট্রবিজ্ঞান

www.pathagar.com

কিংবা সমাজ বিজ্ঞানের কোন সংজ্ঞাতেই একটি একক অখণ্ড জাতিরাষ্ট্র ছিল না এবং বর্ণাশ্রম প্রথার কারণে মানুষে মানুষে যে ভেদরেখাকে চিরস্থায়ী করে রাখা হয়েছিল, তার ফলে ভারসাম্যপূর্ণ স্থিতিশীল একটি উৎপাদনমুখী প্রাগ্রসর সমাজ বিনির্মাণের প্রশ্নেও ব্রিটিশ ভারতে ছিল বিভেদ ও অনৈক্য। মূলত ব্রিটিশ ভারত ছিল ব্রিটিশের জন্ম দেওয়া এক নব্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারত এবং হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করাই ছিল ব্রিটিশ শাসকদের শাসন কৌশলের অন্যতম চাবিকাঠি।

এ প্রসঙ্গে সুকুমারী ভট্টাচার্য 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থে বলেন: "মুসলমান রাজত্ব চলার সময়ে ভারতবর্ষ থেকে একটি পাই পয়সাও আরব বা পারস্যে যায়নি। ইংরেজ রাজত্বের দেড়শ' বছরের মধ্যে বহু শত কোটি টাকা 'হোম চার্জ' ও অন্যান্য নানা খাতে ইংল্যাণ্ডে যেত। মন্ত্রী উইলিয়াম পিট্ (ছোট) প্রকাশ্য পার্লামেন্টে ভারতবর্ষকে "দুগ্ধবতী গাভী" বলে উল্লেখ করেন। দোহন করার পুণ্য কাজটা ছিলো ইংরেজ শাসকের। অথচ এই শ্বেতাঙ্গ আক্রমণকারীদের পদলেহন করতে আমাদের বিশেষ বাধেনি। বেদ অব্রাহ্মণ ছিলেন যে, তাঁকে বেদে অধিকার দেওয়া গেল? ঐ আগন্তুক ইংরেজের প্রসাদ পাবার জন্য বিংশ শতকের আগে পর্যন্ত ভারতীয়দের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিলো।"

বাংলাদেশে ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রেরণা এবং আত্মিক চৈতন্য সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃজন ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধানত ভূমিকা পালন করছে। আমাদের সকলের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাস যে জীবনের উজ্জীবনী প্রেরণা যুগ যুগ ধরে যুগিয়ে এসেছে, তা আমাদের সামাজিক ইতিহাস ও সমাজ পরিকাঠামো অধ্যয়ন করলেই নিশ্চিত হওয়া যায়। এ দেশের প্রায় সকল উৎসবের উৎস মূলে রয়েছে ধর্ম বিশ্বাসের প্রণোদনা। অথচ গণমানুষের এসব উৎসব একদিকে যেমন অসম্প্রদায়িক ছিল তেমনি অপরদিকে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক চৈতন্যকে সমন্বিত করে যাপিত জীবনে উজ্জীবনী বৈচিত্র্য আনয়ন করে। উদারতা ও মননশীলতার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক কিংবা তমসাবাদী গোষ্ঠী সামাজিক শান্তি ও স্থিতিকে যে কখনো কখনো বিপন্ন করে তোলেনি তা অস্বীকার করা যায় না। তবে এসব ঘটনাকে নিছক বিচ্ছিন্ন, অনাকাঙক্ষিত পরম্পরারহিত ও অগ্রাহ্য ঘটনা হিসেবেই ইতিহাস চিহ্নিত করে রেখেছে।

একটি দেশের সংস্কৃতি স্বল্প পরিসরে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা কোন অবস্থাতেই সহজ ও সম্ভব নয়। সংস্কৃতির সংগে জীবনের রয়েছে নিগূঢ় সম্পর্ক। সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের জ্ঞান, ধীশক্তি, বিশ্বাস, শিল্প, নান্দনিক অভিরুচি, নীতিবোধ, বস্তুনিষ্ঠতা, আচার-ব্যবহার রীতি প্রথা, সাধনা এবং আরো বহুবিধ বিষয় যার সাহায্যে মানুষ একটি সমাজ ও রাষ্ট্রে স্বস্তি ও প্রশান্তির মধ্যে মহিমান্বিত হয়ে জাতি হিসেবে একটি পরিশীলিত ও পরিমার্জিত স্বয়ম্ভর জীবন-যাপন করতে পারে। মানুষের প্রতিটি কর্মে, উদ্যোগে ও উচ্চারণে তার সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে থাকে। তবে তাকে অবলোকন করতে হলে দৃষ্টিকে বিশেষভাবে ব্যবহার করতে জানতে হয়। খোলা চোখে নীল আকাশের দিকে তাকালে চাঁদের আলোকিত একটি পীঠ অবলোকন করার অর্থতো এই নয় যে, চাঁদের অপর পীঠটি সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন। উভয় পীঠকে নিয়েই তো চাঁদের পূর্ণতা বা পূর্ণ চাঁদ। তাই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেই যে কোন দেশ জাতি ও জনগণের সংস্কৃতির অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয় ও কাম্য। বাংলাদেশের সংস্কৃতি অতি প্রাচীন ও মূলতঃ অনার্য এবং মুষ্টিমেয় আর্যদের বাংলাদেশে আগমনের বহু আগে থেকে সে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। আমাদের সংস্কৃতিকে দৃঢ়তার উপর ভিত্তি করে পরিপুষ্টি যুগিয়ে সুবিন্যস্তভাবে পরিপাটি করে গড়ে তুলেছে ইসলাম। এ দেশে ইসলামের আগমনের ফলেই দর্শনের ক্ষেত্রে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, আচারের ক্ষেত্রে, রুচিবোধের ক্ষেত্রে, এক কথায় সামগ্রিক চৈতনের ক্ষেত্রে, এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। ইসলাম মুক্তি ও পরিত্রাণের বাণী নিয়ে বর্ণাশ্রমের ভেদরেখা মুছে সাম্যের সমাজ সৃজনের জন্যে এদেশের

www.pathagar.com

সকলকে আহবান করে। যাঁরা ধারণা করেন যে, এদেশে বখতিয়ার খিলজীর আগমনের মধ্যদিয়েই প্রথম সুযোগ সৃষ্টি হয় ইসলাম প্রতিষ্ঠার, তারা ইতিহাসের অক্ষম পাঠক।

ব্রাহ্মণ্যবাদী নিপীড়ন থেকে বর্ণাশ্রমভিত্তিক বিভেদের সমাজ থেকে বখতিয়ার খিলজী নিঃসন্দেহে সেই দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের গণমানুষের মুক্তির ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু এদেশের ইসলামের প্রকৃত আগমন ঘটে তারও চারশ' বছর আগে। ইতিহাসমনস্ক কোন ব্যক্তির মনে এ বিষয়ে সংশয় থাকার কথা নয়।

প্রফেসর ড. মাহবুব উল্লাহ বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় বিষয় আমাদের সকলের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেছেন। আমি নিজে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি দক্ষিণ এশিয়া যাকে একদা ভারতবর্ষ বলা হত, সেখানে কখনও কস্মিনকালেও বাঙালী জাতীয়বাদের জন্ম হয়নি। গলন পাত্রে উত্তপ্ত উনুনে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর যে শঙ্কর জাতি বাংলাদেশ নামক জনপদে বাঙালী নামে পরিচিতি লাভ করেছিল, তা কেবল সম্ভব হয়েছিল বাংলাদেশ নামক জনপদটি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি একক অবিভাজ্য সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যেমন– কোল্, ভীল মুণ্ডা, বাগদী, পাত্র-পোঁদ, মললার প্রমুখ জনজাতি একটি সুসভ্য রাষ্ট্রীয় সত্তা অর্জন করেছিল, যখন গঙ্গাঋদ্ধি নামে পরিচিত একদা বহু খণ্ডে বিভক্ত এই জনপদ মুসলমান শাসকদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এই জনপদের নামও বাংলাদেশ হিসেবে মুসলমানরাই নির্ধারণ করে।

বাংলাদেশের হীনমন্য হিন্দু মানসিকতার পণ্ডিতজনরা ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশবাসীর এক অদ্ভুত ও অলীক কাহিনী রচনা করেছেন।

ইসলাম সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার এ মর্মবাণী নিয়ে এদেশের মানুষের কাছে এসেছিল, ফলে মানুষ প্রথমবারের মত মুক্তির স্বাদ ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভব করল। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচরণমূলক হওয়াতে তার বেষ্টনি ছিল কঠিন। কিন্তু ইসলাম স্বীকার করে সকল মানুষ সমান এবং একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা করতে পারে। হিন্দুর ক্ষেত্রে এটা অতিশয় সংকীর্ণ। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু। আর সেখানেই পদে পদে হিন্দুত্ববাদীরা নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। হিন্দু যুগ হচ্ছে একটি প্রতিক্রিয়ার যুগ, এই যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদ সুপরিকল্পিতভাবে বিনির্মাণ করা ও গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রাপ্য করে তুলে বিস্মৃত হয়েছিল যে কোন প্রাণবান জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ করে সামলাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। ইসলাম ধর্ম সহজবোধ্য, উদার এবং নৈতিক দৃঢ়তা ও চারিত্রিক ঋজুতার উপর নির্ভর করে সকল মানবের কল্যাণ নির্দিষ্ট করেছে। তাই পরম স্রষ্টা আল্লাহ সুবাহানু ওয়া তায়ালা শুধু রাব্বুল মুসলেমিন নন, তিনি রাব্বুল আলামিনও বটেন।

বাংলাদেশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার শিকারে যখন পরিণত হয় তখন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ও তাদের কুচক্রীরা মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ইংরেজদের সেবাদাসে পরিণত হয়। ১৭৯৩ সালের যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুসলমান সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া। সুসাহিত্যিক আহমদ ছফার ভাষায় শতাব্দীর ফেরারী বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান হলে বাংলাদেশে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। বঙ্কিম লেখেন, "১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল এক্ষেণে তাহার সংশোধন সম্ভব না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করে চিরস্থায়ী করেছে, তার ধ্বংস করে তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত

www.pathagar.com

হন। প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমন কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্খী হইব, সমাজের অমঙ্গলকাঙ্খী হইব। সেই দিন সে পরামর্শ দিব।"

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন হিন্দুত্বের এবং হিন্দু জাতীয়বাদের প্রবল প্রবক্তা। রামচন্দ্র ছদ্মনামে Letters on Hinduism লিখে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা, হিংসা যেমন ছড়িয়েছিলেন, তেমনি 'আনন্দ মঠ' উপন্যাস রচনা করে পল্লী-বাংলার শান্তি বিনষ্ট করে মুসলিম বিরোধিতার আগুনও জ্বালিয়েছিলেন। ১৯২৩-এ বাংলাদেশের মুসলমান এবং হিন্দুরা যখন সৌভ্রাত্রের একটি সন্ধি রচনা করে, যা ইতিহাসে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে খ্যাত, তার তুমুল সমালোচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (হিন্দু সংঘ পত্রিকায় প্রকাশিত বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রবন্ধে)। ১৯২৫ -এ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু মিশন নামক চরম সাম্প্রদায়িক একটি প্রতিষ্ঠান, যার মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করা। ব্রিটিশদের পৃষ্ঠানুকূল্যে হিন্দুত্ববাদীদের উগ্রতা এত চরমে গিয়ে পৌঁছায় যে, তারা ব্রিটিশ বিরোধিতার চাইতে মুসলমানদের বিরোধিতাকেই একমাত্র পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে। হিন্দু মহাসভার নেতা ভি. ডি. সাভারকার হিন্দুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "হিন্দু হচ্ছেন এমন মানুষ, যিনি সিন্ধু থেকে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষকে নিজের পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি এবং তাঁর ধর্মের জন্মস্থান হিসেবে মনে করেন।" এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মুসলমান ও খৃস্টানদের তিনি সরাসরি অভারতবর্ষীয় হিসেবেই অভিহিত করেন। কারণ ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষ নয়। উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা আরো চমৎকারভাবে পাওয়া যায় আর এসএস -এর নেতা গোলওয়ালকার-এর "We or Nationhood Defined" গ্রন্থে 'ভৌগোলিক জাতীয়বাদে'র পরিবর্তে 'সাংস্কৃতিক জাতীয়বাদে'র তত্ত্ব প্রচার করে লেখেন, "জার্মানদের জাতিত্বের গর্ব আজ মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়েছে। নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতিকে কলুষমুক্ত করতে জার্মানী গোটা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে সেমেটিক জাতি, ইহুদীদের দেশ থেকে বিতাড়ন করেছে। জাতিত্বের গর্ব এখানে তার সর্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। জার্মানী এটাও প্রমাণ করেছে যে, নিজস্ব ভিন্ন শিকড় আছে এমন জাতি বা সংস্কৃতির একসঙ্গে মিশে একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তা তৈরী করা সম্ভব। এই শিক্ষা হিন্দুস্থানে আমাদের গ্রহণ করা এবং তার থেকে লাভ করা প্রয়োজন। ... প্রাচীন জাতিগুলোর অভিজ্ঞতা-অনুমোদিত ঐ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হিন্দুস্থানের সমস্ত অহিন্দু মানুষ হয় হিন্দু ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করবে, হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা করবে ও পবিত্র বলে জ্ঞান করবে। হিন্দু জাতি গৌরব-গাথা ভিন্ন অন্যকোন ধারণাকে প্রশ্রয় দেবে না অর্থাৎ তারা শুধু তাদের অসহিষ্ণুতার মনোভাব এবং এই সুপ্রাচীন দেশ ও তার ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাবই ত্যাগ করবে না, এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির মনোভাব তৈরী করবে– এককথায় তারা হয় বিদেশী হয়ে থাকবে, না হলে সম্পূর্ণভাবে হিন্দু জাতির এই দেশে তারা থাকবে অধীনস্থ হয়ে, কোন দাবী ছাড়া কোন সুবিধা ছাড়া এবং কোন রকমের পক্ষপাতমুলক ব্যবহার ছাড়া। এমনকি নাগরিক অধিকারও তাদের থাকবেনা।" (তপন বসু প্রমুখের খাকি প্যান্ট, গেরুয়া ঝাণ্ডা থেকে সংগৃহীত)।

হিন্দুত্বের চরম তমসাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উন্মোচন করে সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে বলেছেন : "১৯২০ সালে 'হিন্দু মহাসভা'র গঠনে যার সূত্রপাত, ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ধ্বংসে ১৯৯২ এ তার ক্রান্তিকাল। শাখায়, পল্লবে বিস্তারিত হয়ে 'জনসংঘ', 'ভারতীয় জনতা পার্টি', 'বজরং দল', 'শিবসেনা', 'আমরা বাঙ্গালী', 'সন্তান দল' ইত্যাদি নানা নামেও আকারে একটি বীভৎস দানবিকতা ঠিকই রক্তাক্ত নখদন্ত মেলে আজ.... মানবিকতাকে গ্রাস করতে উদ্যত। এর চরিত্র... নির্মম ও নির্লজ্জ।" অতএব যে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বা অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ডুগডুগি এবং মন্দিরা নিয়ে আমাদের

www.pathagar.com

বিদ্যুৎজনদের অনেকেরই তুরিয়ানন্দে নৃত্য করতে দেখি তখন তাদেরকে করুণা করতেও কুণ্ঠা হয়। ইতিহাসের পণ্ডিত একদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যে প্রেরণা পায় সংস্কৃত থেকে আর মুসলমানরা পায় আরবী-ফার্সী থেকে। মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামি যেমন হিন্দুদেরকে তাদের প্রতি বিমুখ করেছিল, হিন্দুদের সামাজিক গোঁড়ামীও মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি বিমুখ করেছিল ... হিন্দুরা যাতে মুসলমান সমাজের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাতে না পারে তার জন্য হিন্দু নেতাগণ কঠোর সমাজের বিধান করেছিলেন।" এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত সুনীতিকুমার চাটুজ্যে বলছেন, 'আমাদের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকে এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আমাদের যে আধ্যাত্মিক যোগ আছে, সেই যোগকে অস্বীকার করলে চলবে না। ... ভারতীয় জাতীয়তার দোহাই পাড়িয়া যাহারা আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমাদের বাড়া ভাতে ভাগ বসাইতেছে, মুখের গ্রাসটি কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদের বাধা দিতে হইবে। কিন্তু সেই কারণে বাঙালার বাহিরের ভারতের, নিখিল ভারতের সভ্যতাই যে এই বাঙালার সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, তাহা ভুললে চলবে না। .... সাংস্কৃতিক যোগ ভুলিব না; নতুন সাংস্কৃতিক যোগের সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিব না; এবং আমাদের অতীতের কথার আলোচনার কালে, আমাদের জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য বিচারের কালে, বাঙালার পটভূমিকা নিখিল ভারতবর্ষকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হইব না।"

সুনীতি বাবুর মতে, "স্বাধীন মুসলমান রাজাদের অধীনে থাকিয়া বাঙালাদের ভারতবর্ষের এক কোণে পড়িয়া ছিল এবং রুদ্ধবারি জলাশয়ের মত অবস্থায় ছিলো। বাহিরের জগতের সঙ্গে তাহার তেমন কোনও যোগ ছিল না। .... দিল্লীর আগ্রার কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙালার পক্ষে হিতকর হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।" বাঙালী বলতে, তাচ্ছিল্যভাবে সুনীতি বাবুর মন্তব্য ছিলঃ 'আকারে যেমন, প্রকৃতিতেও তেমনি, বাঙালী ভারতীয় বটে। বাঙালী তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতে হয়তো চারআনা ইউরোপীয়- তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয হইবে এবং আটা আনা ইউরোপীয়, বাকি চারা আনা সে বাঙালী। এবং এই চারা আনার মধ্যে আবার অনেকটা ভারতীয়ত্বের বাঙালী বিকারমাত্র বাকিটুক খাঁটি বাঙালী, অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙালী। বাঙালী জাতির একাংশে আবার ইসলামের প্রভাব আছে- সে প্রভাব কতটা আছে তাহার নির্ণয় বাঙালী মুসলমান ঐতিহাসিকেরাই করবেন, তবে তাহা খুব বেশী নহে।"

সুনীতি বাবুর একান্ত বিশ্বাস, 'বাঙালী নিজেকে এক অখণ্ড ভারতেরই প্রত্যন্ত বা প্রদেশবাসী বলিয়া মনে করিত।'

তাঁর মতে, 'যখন বাঙালী সংস্কৃতির সূত্রপাত হয় তখন কেহ বাঙালীর নিজস্ব অনার্য সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই; তখন যে ছাচে বাঙালীর সমাজ, বাঙালী ঐতিহ্য, রীতিনীতি শিল্প-সাহিত্য সবই ঢালা হইয়াছিল, তাহা ছিল উত্তর ভারতের বা নিখিল ভারতের সর্বজয়ী হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন) মন ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন সমাজ, ঐতিহ্য রীতিনীতি, শিল্প সাহিত্যের ছাঁচে। যে ছাঁচে সৃজ্যমান বাঙালী জাতিকে ঢালা হইল, মোটের উপর সেই ছাঁচে এখনও বাঙালী সমাজে বিদ্যমান।' ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু মন ইসলামের ন্যায়ানুগ সুষম শাসনকে কখনও অন্তরে মেনে নেয়নি। তাই প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে ব্রিটিশদের সাথে হাত মেলায়। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে বড়লাট লর্ড এলেনবারো হিন্দু রাজ রাজাদের সন্তুষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ সরকারী নীতি ঘোষণা করে বলেন, 'মুসলিম রেস মূলত আমাদের শত্রু, এ অবস্থায় হিন্দুদের সন্তুষ্ট করাই হইবে আমাদের নীতি'। ১৮১৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ও ডেভিড হেয়ারের সম্মিলিত চেষ্টায় কলকাতায় প্রথম যে কলেজটি স্থাপন করেছিলেন তার নাম রাখা হয়েছিল হিন্দু কলেজ। হিন্দু রাজনীতিতে যে নব গোপাল মিত্র মহাশয় 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের পিতা' বলে আখ্যাত,

www.pathagar.com

তিনি তাঁর রাজনৈতিক সম্মিলনীর নাম রেখেছিলেন 'হিন্দু মেলা'। বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের মত নিতান্ত একটি প্রেশার গ্রুপের ইংরেজী মুখপত্রের নাম রাখা হল *'Hindu Patriot'*। 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের ঠাকুর দাদা' রাজ নারায়ণ বসু ১৮৭০ সালে বেঙ্গল ন্যাশনাল সোসাইটি নামে যে সমিতি স্থাপন করেন তার আদর্শ-উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিলঃ 'বাঙ্গালার হিন্দুদের মধ্যে একতা ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিই এই সমিতির উদ্দেশ্য'। *Hindu Patriot* এই সমিতিকে সাধুবাদ জানিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যে উল্লেখ করে 'বাঙলার হিন্দুরা নিজেরাই একটি নেশন। সুতরাং সমিতির নামে ও উদ্দেশ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। বাঙালী মুসলমানকে ম্লেচ্ছ, যবন ইত্যাদি কুরুচিপূর্ণ বিশেষণে নিন্দা করে লালা হরদয়াল নামক 'সংগঠন আন্দোলনের' নেতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, মুসলমানদেরকে হয় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে নতুবা তাদেরকে পাততাড়ি গুটিয়ে ভারত ত্যাগ করতে হবে। আজকে বর্তমান ভারতের অন্যতম স্তাবক বাকশালপন্থী বুদ্ধিজীবী 'জনকের পুত্র' বলে খ্যাত অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তাঁর *A History of Freedom Movment : Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali Press 1901-30* নামক গ্রন্থে জনৈক কিন্তু নেতা সত্য দেব-এর ১৯২৫ সালের একটি ঘোষণার উদ্ধৃতি দেন : "আমরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে শক্তিশালী তখন মুসলমানদের নিকটে নিম্ন শর্তাবলী পেশ করব– কোরআনকে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে মানা চলবে না, মুহাম্মদকেও নবী বলে স্বীকার করা হবে না। মুসলমানী উৎসবাদি পরিত্যাগ করে হিন্দু উৎসব পালন করতে হবে। মুসলমান নাম পরিহার করে রামদীন, কৃষ্ণখান প্রভৃতি নাম রাখতে হবে। আরবী ভাষার পরিবর্তে হিন্দি ভাষায় উপাসনা করতে হবে।"

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিকে ঢাকায় মুক্তবুদ্ধি চর্চার 'শিখা' গোষ্ঠীর বিদ্বজ্জনেরা যত শ্রদ্ধার চোখের দেখে থাকুন না কেন, ভূদেব বাবু মনের কথা বলেই ফেলেছেন ঃ "বাঙালী মুসলমানদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতে হলে হিন্দুত্বে অন্তর্লগ্ন হতে হবে।" বৃটিশ শাসনাধীন ভারত এবং বাংলাদেশেই দেখা গেছে হিন্দুত্বের এই উগ্রতা এবং অস্তিমান অন্যান্য ধর্মের অপমান। এহেন পরিস্থিতিতে একক, অখণ্ড, অবিভাজ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য কোন জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠাতো দূরের কথা, জাতীয়তাবোধই জন্ম নেবার কথা নয়। ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা যতই বাস্তব রূপ ধারণ করতে লাগল ততই হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষক প্রজাকে বঞ্চিত ও শোষণের নাগপাশে চিরস্থায়ীভাবে বন্দী করে রাখার উদ্দেশ্যে বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক অলীক সঞ্জীবনী সুধা পান করাবার চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথ 'সোনার বাঙলাকে' ভালবাসতেন বটে তবে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে কূপমণ্ডুকতা বলতেন। তার উপলব্ধি ছিল 'বাঙলা একটা নয়, দুইটা'। জীবন সায়াহ্নে মৃত্যুর মাত্র দু'বছর আগে ১৯৩৯ সালে ভাষা ও সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন 'বাঙলাদেশের ইতিহাস' 'খণ্ডতার ইতিহাস'। ভারবর্ষের ইতিহাস প্রবন্ধে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "পাঠান-মুঘলের শাসন ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়" নিশি রাতের দুঃস্বপ্নের কাহিনী মাত্র। মাহমুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্য গর্ভোদগার পর্যন্ত ইতি কথাটা ভারতবর্ষের বিচিত্র কুহেলিকা।" মুসলমানদের আক্রমণকে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী আক্রমণ বলে আখ্যা করলেও আর্য আক্রমণকে তিনি ভারত তীর্থ দর্শন বলে মনে করেছেন।

কারণ, রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, "সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন, তাঁদের মধ্যে নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনের চিরদিনের জন্য যদি অবরুদ্ধ থাকে, তাহলে তাঁদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না।"

www.pathagar.com

যে কারণে এত কথা বলা অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতিসত্তার স্বরূপ, জাতীয়তাবাদের স্বরূপ, জাতিরাষ্ট্রের স্বরূপ, জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ, সভ্যতার উত্তরাধিকারের স্বরূপ, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের স্বরূপ এক কথায় যে জনপদে একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রিক অবয়ব নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তার কাঠামো সম্পর্কে আমরা কতটুকু অবহিত ও অবিগত সে জন্য এত দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা। মনন ও চিন্তার ক্ষেত্রে সৃজনীশক্তি যদি বিপ্লব সৃষ্টি করতে অক্ষম হয় তাহলে যে কোন সত্তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান ছিল গণমানুষের দাবী, যুগের দাবী, ইতিহাসের দাবী এবং বাংলাদেশের নিরন্ন, দরিদ্র কৃষক প্রজাকুলের দাবী। ষড়যন্ত্র যদি কেউ করে থাকে তা কুচক্রী ব্রাহ্মণ্যবাদীরাই করেছিল। যে শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, আল মুতি শরফুদ্দিন, সৈয়দ হাসান ইমাম, ভাগীরথী সাঁতরে আসা বিচারপতি হাবিবুর রহমান কিংবা পণ্ডিত প্রবর ডঃ আনিসুজ্জামান বা কবির চৌধুরী ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীরা যাঁরাই 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারত ত্যাগ করে সেদিনকার 'সাম্প্রদায়িক' পাকিস্তানে এসে জীবনযাপন শুরু করলেন, কী ভেবে করেছিলেন? তাঁদের পরবর্তী কার্যকলাপ এবং বাংলাদেশের অবিভাজ্যতা এবং অখণ্ডতার প্রশ্নে ভারতের প্রতি তাঁদের সমর্পণবাদী নীতি একটি কথাই প্রমাণ করে রাষ্ট্রিক আনুগত্যে তাঁদের সততার অভাব রয়েছে।

বদরুদ্দীন উমররা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে যখন আবিষ্কার করে বসেন যে, ঐ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালী মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল, তখন তাঁরা বিস্মৃত হয়ে যান যে, বাঙালী হিন্দুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কভু ঘটেনি। বাঙলার বাইরে গয়া, মথুরা বৃন্দাবনের মুখাপেক্ষী হয়েইতো থাকে বাঙালী হিন্দু।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে আমরা পেয়েছি ইতিহাসের গতিধারায় বিকাশমান একটি জনগোষ্ঠীর জায়মান আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্নকে কেন্দ্র করে যে নীড় রচিত হয়েছিল তার ধারাবাহিকতায়। ব্যাপারটি ছিল একদিকে আবেগের অর্থাৎ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের, আরেক দিকে ছিল স্বপ্নচারিতার অর্থাৎ কল্পনাবিলাসের। এর দার্শনিক ভিত্তি তৈরী করার যে কৃষ্টিক ও তাত্ত্বিক কর্তব্য সম্পাদন করা অত্যাবশ্যক ছিল সেদিকে নজর দেয়ার মত কোন যোগ্য ব্যক্তিত্বই এ দুর্ভাগা দেশে জন্ম নেয়নি। কিন্তু আজ এক নব জাগৃতি সূচিত হয়েছে। এই নব বোধোদয়ের মধ্য দিয়ে একটি নতুন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশী স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা, অনন্যতা এবং সৃজনীশক্তির জন্ম দিতে হবে। এ শক্তিই হচ্ছে এ জাতি ও রাষ্ট্রের একমাত্র রক্ষাকবচ যা কখনও কোন ধরনের পরাজয় ও পরাভব মেনে নেবে না।

www.pathagar.com

১৭ জুন ২০০০

কলুষিত রাজনীতির বিবরে শিক্ষা ব্যবস্থা

মাহবুব উল্লাহ :

গত ১১ জুন একযোগে বাংলাদেশের ৫টি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। একজন মানুষের শিক্ষা জীবনে এ পরীক্ষাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এ পরীক্ষাই জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। অবশ্য, প্রাথমিক ও জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষাও এক ধরনের পাবলিক পরীক্ষা। তবে এসব পরীক্ষায় সকল ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে না। কেবল প্রত্যেক স্কুলের বাছাই করা ছাত্র ছাত্রীরাই অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এসএসসি বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেশের সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীরা এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। একসময়ে এ পরীক্ষাটিকে বলা হতো প্রবেশিকা বা এন্ট্রান্স পরীক্ষা। পরে এ পরীক্ষার নাম পরিবর্তন হয়ে হল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। এক সময়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের বলা হতো 'ম্যাট্রিকুলেট', যেহেতু সে সময়ে সমাজে শিক্ষার হার অত্যন্ত নগণ্য ছিল এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা, সেহেতু ম্যাট্রিকুলেটদের প্রচুর সামাজিক কদর ছিল। তারও আগে যখন এই পরীক্ষাটিকে এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা বলা হতো, তখন এন্ট্রান্স পরীক্ষাটির মূল্য ছিল অপরিসীম। এই পরীক্ষাটিকে প্রবেশিকা পরীক্ষা বলা হতো এ কারণে যে, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে একজন ছাত্র বা ছাত্রী উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করার সুযোগ পেত। কায়েদে আযম মোহাম্মদ অলী জিন্নাহর মতো নামজাদা ব্যারিস্টার ও রাজনৈতিক নেতা এন্ট্রান্স পাস করেই বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। শুধু এ কথাটি মনে রাখলেই বোঝা যাবে, এ পরীক্ষাটির ওজন ও দাম কত বেশী ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পূর্ববঙ্গের স্কুলগুলোর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা তদারক করত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পাকিস্তান হওয়ার পরে ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হয় এবং এ বোর্ডের ওপরেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এ বোর্ড ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সার্টিফিকেট প্রদান করত। ১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানী সামরিক শাসক জেনালের আইয়ুব খানের নির্দেশে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন আইয়ুব খানেরই শিক্ষক প্রফেসর শরীফ। আজকাল অনেকে এ কমিশনকে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বলে ভুল করেন। তাঁরা জানেন না, ১৯৬২-তে শরীফ কমিশনের বিরুদ্ধে যে শিক্ষা আন্দোলন হয়েছিল, তারই পরিণতিতে শরীফ কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই রিপোর্টকে কিভাবে সংশোধন করা যায় এবং কিভাবে ছাত্র-বিক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রশমিত করা যায়, তার জন্য আরেকটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। এ কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন বিচারপতি হামিদুর রহমান। এ কমিশনের রিপোর্ট ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। তবে শরীফ কমিশনের একটি মৌলিক সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়। সেটি হল নবম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীরা স্থির করবে, তারা ভবিষ্যতে কোন লাইনে পড়াশোনা করবে। এজন্য নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই শিক্ষার্থীদের স্থির করতে হতো তারা বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস– এগুলোর মধ্যে কোনটি বাছাই করে নেবে। ম্যাট্রিকুলেশন পদ্ধতি যখন ছিল, তখন এরকমটি ছিলনা। একটি সাধারণ কারিকুলামে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করত। যারা ভবিষ্যতে বিজ্ঞান

www.pathagar.com

বিষয়ে পড়াশোনা করবে, তারা অনেকেই অতিরিক্ত গণিত পড়ত। অন্যরা অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে অন্য কোন বিষয় পড়ত। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস, ভূগোল, ক্লাসিকস (আরবী, ফার্সী কিংবা সংস্কৃত) সহ অংক, ইংরেজী ও বাংলা নিয়ে পড়ত। এতে করে এই স্তরে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখতে পারত। কিন্তু নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ার পর শিক্ষায় বিশেষায়ন বা স্পেশালাইজেশন দু'বছর আগেই শুরু হয়ে গেল, যা অতীতে কলেজ পর্যায়ে শুরু হতো। শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা সম্পর্কে এ কথাগুলো বলার এ কারণেই প্রয়োজন রয়েছে– আজকাল অনেকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিবর্তনের এই ইতিহাসটি জানেন না। ম্যাট্রিকুলেশন প্রথা যখন ছিল, তখন বোর্ডও ছিল একটি– ইস্ট পাকিস্তান সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড। ফলাফল প্রকাশের সময় মেধা তালিকায় প্রথম ৩০ জনের নাম প্রকাশ করা হত। এই পরীক্ষা পাসের পরই ছাত্রছাত্রীরা ঠিক করত, তারা প্রি ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রি-মেডিক্যাল অথবা সাধারণ লাইনে (জেনারেল সায়েন্স বা হিউম্যানিটিজ) পড়বে।

এ বছর মার্চে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ লাখ ২৮ হাজার ৩৯১। এদের মধ্যে পাস করেছে ৩ লাখ ৮১ হাজার ৭৬২ জন। সারাদেশে গড় পাসের হার ৪১.১২%। এ থেকেই বোঝা যায়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটিটা কোথায়। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বেশী, সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই দক্ষ (efficient) শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যাবে না। অর্থাৎ, অপচয়ের হার মাত্রাতিরিক্ত। এছাড়া পরীক্ষার ফলাফলে আরেকটি জিনিস লক্ষণীয়। ঢাকা বোর্ডে প্রথম বিভাগে পাস করেছে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ৪৫.৯৭ ভাগ। এইকভাবে রাজশাহী বোর্ডের হার ৩৮.১৩%। চট্টগ্রাম বোর্ডের হার ৪৮.৮৩%। কুমিল্লা বোর্ডের হার ৩৪.৩০%। যশোর বোর্ডের হার ৩০.৬৬% এবং সর্বমোট উত্তীর্ণদের মধ্যে ৩৮.৮৫ ভাগ প্রথম বিভাগে পাস করেছে। কেবলমাত্র ঢাকা, চট্টগ্রাম– এই দু'বোর্ডে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণদের সংখ্যা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তদের চাইতে বেশী। বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের রাজধানী নগর ও প্রধান বাণিজ্য নগরের বোর্ডদ্বয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশী। অপরদিকে, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী। এভাবে দেখলে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, উন্নত নাগরিক সুবিধার আওতায় যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানে প্রথম বিভাগে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী। উল্লেখ্য, এই দুই মেট্রোপলিটান সিটিতে বিপুলসংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। অর্থাৎ, মাধ্যমিক স্তরে উন্নত নগরের তুলনায় কম উন্নত শহর ও গ্রামের ফলাফলে দুঃখজনক বৈষম্য বিরাজ করছে। স্বভাবতই পরবর্তী ধাপের শিক্ষাস্তরে যারা তুলনামূলক ভাল ফল করেছে, তারাই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। সুযোগের প্রশ্নটি কেবল পরবর্তী উচ্চতর স্তরে ভর্তি হওয়ার সুযোগেই সীমাবদ্ধ নয়। ভাল কলেজগুলোতে ভর্তির ব্যাপারে ভাল ফল করা ছাত্র-ছাত্রীরাই সুযোগ পাবে। এভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষ অর্জনে ক্রমপুঞ্জীভূত (cumulative) অবনতির ধারা সৃষ্টি হয়। এই অবনতির বিষয়টি কেবল মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েই প্রত্যক্ষ করা যায় না, স্কুলের বিভিন্ন স্তরেও এ সমস্যা বিদ্যমান। শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা আনতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষাদানের অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও সমতা বিধান করতে হবে। তবে সর্বোতভাবে এই সমতা অর্জন সম্ভব হবে না। কারণ, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বৈষম্য দীর্ঘদিন থেকেই যাবে। এছাড়া জিন (gene) -এর প্রভাবকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। পাশ্চাত্য জগতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যে গবেষণা চলছে, তার ফলে এই সমস্যা অতিক্রম করা সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু এই সমস্যা কাটিয়ে

www.pathagar.com

উঠলে সমাজে নতুন সমস্যাও দেখা দেবে। সবাই যদি সমান প্রতিভার অধিকারী হয়, তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাধ্যমে যে সামাজিক উন্নয়ন ঘটে তা বাধাপ্রাপ্ত হবে। তখন হয়ত অধিকতর পরিশ্রমীরাই পুরস্কৃত হওয়ার আশায় শৌকর্য অর্জনে ব্রতী হবে। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় সারাদেশে সবচেয়ে ভাল ফল করেছে মেয়েরাই। বিজ্ঞানে শবনম জেরীন, মানবিকে নাফিসা তানজীন এবং বাণিজ্যে শায়লা সোয়াত সিদ্দিকী প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এর মধ্যে শবনম সকল বোর্ডে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। সে ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী। সব বিষয়ে লেটার মার্ক নিয়ে তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৪৬। তার মানে, সে বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের মত বিষয়েও লেটার পেয়েছে। শিক্ষার বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করতে চান, তাদের এই মেয়েটির ওপর নজর রাখা দরকার। ভবিষ্যতে সে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কী ধরনের কৃতিত্ব অর্জন করে, তা ঔৎসুক্যের বিষয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, মেয়েটি ভবিষ্যতে কম্পিউটার গ্রাফিক্স পড়াশোনা করতে আগ্রহী। সে নোবেল প্রাইজ দেয়া হয় এমন কোন একটি বিষয়ে পড়তে উৎসাহী নয়। মৌলিক জ্ঞান চর্চার চাইতে প্রায়োগিক বিষয়ে ভাল ফল করে অধিকতর অর্থোপার্জনই তার কাছে শ্রেয় মনে হয়েছে। রাজশাহী বোর্ডে তাপস বিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, সে মহাকাশ বিজ্ঞানী হতে আগ্রহী। এই ছেলেটি মৌলিক বিজ্ঞানে উৎসাহী। শরৎচন্দ্র তার প্রিয় লেখক। এছাড়া মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম তার অপরাপর প্রিয় লেখক। চট্টগ্রাম বোর্ডে মানবিকে সামিয়া প্রথম হয়েছে, সে ইংরেজী সাহিত্যের শিক্ষক হতে চায়। ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী নূরুল হাসান চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট হতে চায়। ঢাকা বোর্ডে মানবিক শাখায় দ্বিতীয় স্থান লাভকারী আসিফা সুলতানা অর্থনীতিতে উচ্চ শিক্ষা লাভে আগ্রহী। অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীরা মৌলিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান বা মানবিদ্যায় উচ্চতর জ্ঞানার্জনে আগ্রহী হবে, এটাই আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু, অনেকের ক্ষেত্রেই তা হয়নি। তবু সুখের কথা, কেউ কেউ মৌলিক বিষয়ে ভবিষ্যতে পড়াশোনা করার আগ্রহ দেখিয়েছে। ভাল ফল করেছে, এরকম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় সবাই বিরাজমান ছাত্র-রাজনীতির প্রতি অনাস্থা ও অনীহা প্রকাশ করেছে। বর্তমান ছাত্র-রাজনীতির যে কালচার, তা যে আজ প্রতিভাবান তরুণদের আকর্ষণ করে না, তা বলাই বাহুল্য। ফলাফল সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার মন্তব্য করেছে কুমিল্লা বোর্ডে বিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকারী গীতালি। সে কুমিল্লার একটি খৃষ্টান মিশনারী স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল। মিশনারী স্কুলে পড়ার প্রভাবে কি-না জানি না; গীতালীর প্রিয় ব্যক্তিত্বদের মধ্যে প্রথম স্থানেই আছেন মাদার তেরেসা। মাদার তেরেসা প্রিয় ব্যক্তিত্ব হওয়ার মধ্যে ভাল দিকটি হল, ত্যাগ ও নিষ্ঠার ব্রতের প্রতি আকর্ষণ। ভাল ফল যারা করেছে, তাদের বেশীরভাগই কলকাতার লেখকদেরকেই প্রিয় লেখক হিসেবে উল্লেখ করেছে। স্বদেশী লেখকরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কাব্যের উপেক্ষিতা উর্মিলা'র স্থানেই রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্মিকীর উর্মিলা চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'কবি কমণ্ডলু হইতে একবিন্দু বারিমাত্র উর্মিলার জন্য সিঞ্চিত হইলো না।' আমাদের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞান তাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সৈয়দ আলী আহসান, কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, জহির রায়হান, শহীদুল্লাহ কায়সার, শাহেদ আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শওকত আলী, আবু ইসহাক, মাহমুদুল হক, হাসনাত আবদুল হাই, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন, রিজিয়া রহমান, দিলারা হাশেম, প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আহমদ ছফা, ফরহাদ মজহার, এদেশের নাট্য আন্দোলনের জনক আসকার ইবনে শাইখ, নাট্যকার নূরুল মোমেন, সেলিম আল দীন, কবি ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, শহীদ কাদরী কিংবা ফজল শাহাবুদ্দীন প্রমুখের প্রতি তাদের আকর্ষণের বারি সিঞ্চন করেনি। পাঠ্য পুস্তক বহির্ভূত পড়াশোনার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

কিভাবে আমাদের মেধাবী তরুণরা বিজাতীয় লেখকদের দ্বারা সম্মোহিত তা তাদের পছন্দের তালিকা থেকেই বোঝা যায়। এ ব্যাপারে শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রচার মাধ্যমের অনেক কিছু করার আছে। আমরা চাই, ভবিষ্যতে দেশের দায়িত্ব যাদের স্কন্ধে অর্পিত হবে, তারা হবে মৌলিক জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহী ও দেশানুরাগী। একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, বিদেশের যা কিছু ভাল তা আমরা শিখব না, জানব না। তবে স্বদেশবিস্মৃত হয়ে পরাঙ্মুখ হওয়া কোনক্রমেই কাম্য নয়।

আফতাব আহমাদ :

প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ গভীরভাবে ইতিহাস মনস্ক। সমাজবিজ্ঞানের পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং এদেশের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত এবং হালফিল অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে গভীর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন এবং পরিসংখ্যান ও সমাজ বিশ্লেষণের গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজের যে স্বরূপ তুলে ধরেছেন, তা থেকে যে কোন সাক্ষরজ্ঞান মানুষ সমাজে যে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং যে অনিবার্য ধসের দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি, তা ভেবে শংকিত না হয়ে পারে না। দেশ, জাতি ও জনগণ সম্পর্কে ভাবতে গেলেই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেয়া অপরিহার্য। আর একথাতো সর্বজনবিদিত, রাষ্ট্রের বিষয়-আশয় রাজনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদের জন্মের পর থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং সকল মতের সমাজ বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে, শ্রম ও উৎপাদনকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির যে অবকাঠামো তৈরী হয়, তার ওপর ভর করেই রাজনৈতিক পরিকাঠামো নির্মিত হয়। রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন হচ্ছে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজ ও জনসাধারণ শাসিত হয়, তার মূলে রয়েছে উৎপাদন সম্পর্ক তথা অর্থনীতি। ড. মাহবুব উল্লাহ মূলত একজন অর্থনীতিবিদ এবং তাই গভীর অনুধ্যান করে এ বিপন্ন ও পতনোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। আসলে একটি রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থাসহ সামগ্রিক সকল আয়োজনে ক্ষমতাসীনদের সমাজ দর্শন ও রাজনীতিই যে মূলত নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে, ইতিহাসের পাঠকমাত্রই তা অস্বীকার করতে পারেন না। লেনিন বলেছেন, 'Politics is the concentrated essence of economics.' অর্থাৎ রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতির ঘনীভূত মর্মবস্তু। একটি দেশের অভ্যুদয় প্রক্রিয়া এবং জাতীয় জাগরণে যাঁরা সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক নেতৃত্ব দেন, তাঁরাই রাজনীতির ভিত্তিমূলটি রচনা করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। আমাদের দেশে রাজনীতিকরা যেমন 'ইতিহাস বিস্মৃত' তেমনি সমাজমনস্কও নন। তাই এক কলস মূর্খতা নিয়ে ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়ার এক তীব্র কদর্য প্রতিযোগিতায় ক্ষেত্রবিশেষে আত্মহনন এবং ক্ষেত্রবিশেষ জাতিহনন কর্মকাণ্ডে তারা জড়িয়ে পড়েন। চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা তথা বিদ্বজ্জনরা এমনি এক বৈরী প্রতিকূল পরিবেশে চরম অসহায়ত্বের মধ্যে যা কিছু উচ্চারণ করেন, তা ধারণ ও লালন করার সাহস কারও মধ্যেই সঞ্চার করতে পারেন না। এ ধরনের তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে বিদ্বজ্জনরাও অনেক সময়ে নির্লিপ্ত ও অনুৎসাহিত হয়ে পড়েন। তবে দু'একজন সম্মানজনক ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটি নিয়ে যদি ভাবতে হয়, তাহলে প্রথমেই স্থির করা প্রয়োজন, আমরা দেশ ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে কী ধরনের বিকাশ উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি কামনা করি। যে মিনতি সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পার করে দিয়ে এমনকি গভীর রাত পর্যন্ত নিরলস শ্রম করে যায়, তার নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সততাকে খাটো করে দেখা মনুষ্যত্বকে অবমাননা করারই সমতুল্য। জাতীয় লক্ষ্য যদি স্থির করা সম্ভব হয় এবং মানুষের আস্থাকে অর্জন করে তাদের

www.pathagar.com

যদি সংঘবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহলে প্রাকৃতিক কিংবা খনিজ সম্পদের যত অভাবই থাকুক, কেবলমাত্র পরিশ্রম বা শ্রমশীলতার কারণেই একটি জাতি যে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে যেতে পারে, তার শুধুমাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট। জাপানের দিকে তাকিয়ে দেখুন এবং কোরিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন।

মানুষের মধ্যে পরম স্রষ্টা যে জ্ঞান ও ধীশক্তি দিয়েছেন, তাকে পরিচর্যা করে মানুষ প্রতিকূলতাকে বশীভূত করে সর্বজয়ী হতে পারে। সমাজ উন্নয়নের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি প্রাঞ্জল হয়ে যায়। সকল মানুষ প্রতিভাবান নয়। কেউ কেউ প্রতিভাবান। বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে কিংবা সমাজ বিজ্ঞান ও মানব বিদ্যার ক্ষেত্রে যে সব মৌলিক সৃষ্টি ও উদ্ভাবনা হয়েছে, তা কেবলমাত্র স্বল্প সংখ্যক ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভাবানদের দ্বারাই হয়েছে। আল্লাহর দেয়া জ্ঞান ও ধীশক্তিকে যথোচিত পরিবেশে যত বেশী পরিচর্যা ও অনুশীলন করার যৌক্তিক ব্যবস্থা নেয়া যাবে, তত বেশী তা একটি সমাজে বিকশিত হতে বাধ্য। মেধার বিকাশ ও চর্চা নির্ভর করে সমাজের স্থিতিশীলতা, ভারসাম্য ও বৈষম্যের ব্যাপকতা অপনোদনের ওপর। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে মুখ্য নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে সমাজপতি ও রাজনীতিকরা। এতদসত্ত্বেও ইতিহাসে দেখা গেছে, কেবলমাত্র কঠোর পরিশ্রমের কারণেই ও নিবেদিত প্রাণ প্রচেষ্টার ফলে মানুষ সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে সমাজকে অনেক কিছুই দিতে সক্ষম হয়েছে। মেধা কম-বেশী সকলের মধ্যেই রয়েছে। শুধু এর বিকাশে যত্নের প্রয়োজন। যে সমাজ উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ স্বার্থকে বিসর্জন দিতে পারে, সে সমাজ মেধা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণেও সফল হয়। প্রতিভা একটি বিরল বিষয়। এটি জন্মগতভাবে পরম স্রষ্টার কাছ থেকে মানুষ পেয়ে থাকে। মার্কস সম্পর্কে তার অকৃত্রিম সুহৃদ বন্ধু ও সহযোগী এঙ্গেলস তার বিখ্যাত *লুদ্‌ভিগ্ ফ্রয়ারবাক্ অ্যাণ্ড দি এণ্ড অফ জার্মান ক্লাসিক্যাল ফিলসফি* গ্রন্থের পাদটীকায় বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন : 'We at best are talented but Marx was a genious. He was far ahead of his time. অর্থাৎ 'আমরা বড় জোর মেধাবী কিন্তু মার্কস ছিলেন একজন প্রতিভাবান। তিনি তার কালের চাইতেও অনেক দূরবর্তী বিষয়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।'

প্রতিভা যখন তখন জন্মায় না। যারা জন্মায়, দেশে দেশে তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত। শ্রমশীলতার মধ্যদিয়ে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মেধা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগারসহ যথোপযুক্ত ভৌত কাঠামো গড়ে তোলার মধ্যে একটি জাতি ও রাষ্ট্র মেধার ব্যাপক বিকাশ ও পূরণে যত্নবান হতে পারে। পুরো বিষয়টিই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এমনি সাধনার ভেতর দিয়েই প্রতিভার জন্ম, সৃজন ও লালন হয়। আজকের যুগে সমাজে শিশু-কিশোর ও তরুণদের বিদ্যামনস্ক করে জ্ঞানার্জনের সাধনায় ব্রতী করার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের তথা সরকারের। কিন্তু এই যুগটিকে আবার বলা হচ্ছে 'গণতন্ত্রের যুগ'– যার সূত্র ধরে বলা হচ্ছে, শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার। অধিকার নিঃসন্দেহে। কিন্তু এর সীমারেখাও তো নির্ণয় করতে হবে। চটকদার কথা বলে এবং জনতুষ্টিবাদী বুলি কপচিয়ে "গণমুখী', 'উৎপাদনমুখী' ও 'বৈজ্ঞানিক' শিক্ষা চাই বলে যে রাজনীতিকরা বা তাদের অন্ধ স্তাবকগণ বা তাদের কৃপাপুষ্ট কথিত বিদ্বৎ ব্যক্তিগণ গভীর উপলব্ধি ও অনুধ্যান ছাড়া শুধু সস্তা শ্লোগান দিয়ে দেশ-জাতি ও জনগণকে বিভ্রান্তির ধূম্রজালে আচ্ছন্ন করে রাখতে চায়। এরা পাপিষ্ঠ ও পামর। এদের অনেকেরই জীবিকা নির্বাহের কোন নির্দিষ্ট অবলম্বন নেই কিংবা আয়ের কোন সৎ উৎস নেই– অথচ এরা প্রভূত বিত্ত, সম্পত্তি, অর্থ ও সামাজিক কৌলিন্যের প্রভু ও ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসে আছে। এদের নিজেদের সন্তানকে এরা নিরুপদ্রব পরিবেশে বিদেশে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপীঠগুলোতে অধ্যয়নের জন্য পাঠায় (ঐসব সন্তানেরা সকলেই যে সাফল্য ও কৃতিত্বের মুখ দেখতে পায়, তার পরিসংখ্যান পাওয়া ভার) অথচ সর্বসাধারণকে 'উগ্রতা' ও

www.pathagar.com

'নিখাদ জাতীয়তাবাদের' নামে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজী থেকে দেশের সন্তানদের অজ্ঞানতা, অপজ্ঞান এবং কূপমণ্ডুকতায় নিমজ্জিত করে রাখার এক চমৎকার কর্মজাল বিস্তার করে রেখেছে। এর ফলে সর্বসাধারণের সন্তানেরা কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান, সম্মানজনক জীবনযাপনের সুযোগ থেকে বহু যোজন দূরেই থাকছে। একটি স্খলন-রহিত (Sustainable) যাপিত জীবনের সুযোগ-সুবিধা, সম্ভাবনা এবং ক্ষীণতম প্রতিশ্রুতি থেকে সর্বসাধারণের সন্তানেরা বঞ্চিত হচ্ছে। একথা মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষাঙ্গনের প্রধান দায়িত্ব যেহেতু রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের এবং আজকের যুগে প্রায় সকল রাষ্ট্রেই সরকারগুলো যেহেতু জনতুষ্টিবাদী বুলি কপচাতে সিদ্ধহস্ত, সেহেতু 'গণতান্ত্রিক' ও 'গণমুখী' শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের নামে সামগ্রিক সুযোগ-সুবিধা ও ভৌত কাঠামো গড়ে না তুলে ছত্রাকের মত একের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। যার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায় না এবং জ্ঞানের স্পৃহা বা জ্ঞানের স্বাদ আস্বাদনের কোন ব্যাকুলতা জন্মায় না। এর সঙ্গে আবার দুর্বৃত্ত পুঁজির মালিকদের রাষ্ট্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার অবাধ ও অবারিত সুযোগ করে দিয়েছে। আজকের যুগ 'গণতন্ত্রের' এবং পাশাপাশি 'বাজার অর্থনীতির যুগ'– এই ধ্বনি তুলে শিক্ষাকে বাণিজ্যিকায়ন ঘটিয়ে কাঁচা অর্থের মূল্যে 'সকলের জন্য' উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও সমাজবিজ্ঞানী R. Birnbaum ১৯৯১ সালে এমনি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেছেন "Those who have gold, rule.'

কিন্তু সভ্যতার ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে যে, একটি দেশের জনসংখ্যার যথোচিত বিন্যাসের বাস্তবতার ভিত্তিতে সে দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার ধরণ, মান, পাঠ্যক্রম ও সীমা নির্ধারণের মধ্য দিয়েই একটি সমাজ ও জনগোষ্ঠী সে দেশের অর্জন ও সাফল্যে পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন মাত্রা সংযোজন করে। স্থুল মেধা ও ধীশক্তি নিয়ে অযোগ্য শিক্ষার্থীকে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার উচ্চতর স্তরে ক্রমোন্নতি দেয়া শিক্ষার শুধু অবমূল্যায়নই ঘটায় না, শিক্ষা ব্যবস্থাটিকেই বিপর্যস্ত করে ফেলে। এর ফলে অপগণ্ডদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে স্ফীত হতে থাকে এবং তারা তাদের সংখ্যাধিক্যের জোরে উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। এসব সার্টিফিকেট ও ডিগ্রীধারী পাস করারাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক– যাদের কেউ 'সমাজপতি', কেউ 'দেশহিতৈষী', কেউ 'জনহিতৈষী'; কেউ 'কর্মবীর', 'বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা' এবং কেউ 'শিক্ষাদানের মহৎ' পেশায় ব্রতী হবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এদের হাতে আমাদের সন্তানেরা এবং ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে বাধ্য। এরা সমাজের ঘুণ ও নষ্টকীট এবং এদের জন্ম রাষ্ট্রের অনাগ্রহ, উদাসীনতা, উপেক্ষা ও অবজ্ঞার গর্ভে। বিশিষ্ট শিক্ষা বিজ্ঞানী G. Psachropoulos ১৯৯১-এর এক জরিপে দেখিয়েছেন যে, জনতুষ্টিবাদের ধারক ও বাহক এসব দক্ষ কুশলীগণ 'গণমুখী' শিক্ষা বিস্তারের নামে শিক্ষায়তনসমূহে যে নাটকীয় রূপান্তর ঘটিয়েছে, তাতে ১৯৫০ থেকে ১৯৮০'র দশকের সময়কালে আফ্রিকায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ গুণ, এশিয়ায় ৫ গুণ এবং লাতিন আমেরিকায় ১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ঐ একই বছর শিক্ষা গবেষক J. Salmi উন্নয়নশীল দেশসমূহে দ্রুত ও ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থী বৃদ্ধির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য করেছেন, "The level of qualiy teaching and research is declining as a result of over crowding. inadequate staffing and deteriorating physical facilities poor library resources and insufficient equipment'

আজ প্রয়োজন এক মহাপ্রলয়ের যা রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটিয়ে রাষ্ট্রের চরিত্রের আমূল পরিবর্তনের জন্ম দিয়ে এমন এক রাষ্ট্র গড়ে তুলবে, যার নিয়ন্ত্রণভার থাকবে এমন মানুষদের হাতে. যারা সমাজ ও জনগণের চাহিদা নিরূপণ করে উন্নয়নের গতি ও ধারা নির্ধারণ করে এবং কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের স্বরূপ ও মান নির্ণয় করে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে

www.pathagar.com

তুলবেন, যেখানে সাক্ষরতা অর্জন, পঠনপাঠনসহ মেধা ও জ্ঞানকে যথাসম্ভব বিকশিত করে যোগ্যতানুযায়ী কর্মজীবনে প্রবেশ করার দক্ষতা অর্জনের সুযোগ একজন মানুষকে সৃষ্টি করে। দেশে এ ব্যবস্থাটি এমন এক পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে, যেখানে মেধা বা প্রতিভা বিকাশের অবাধ সুযোগ ও সুবিধা থাকবে। কিন্তু ঢালাও অধিকার থাকবে না। জনতুষ্টিবাদকে পরিত্যাগ করে শিক্ষা ব্যবস্থার স্তরসমূহকে এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে, যাতে কোন অবস্থাতেই প্রাইভেট স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও কোচিং সেন্টার খোলার নামে সওদাগরী পুঁজির মালিকরা শিক্ষার নিয়ন্ত্রকে পরিণত হতে না পারে। এ ব্যবস্থা এমন হতে হবে, যা শিক্ষায় প্রবেশাধিকার উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে মেধাভিত্তিক ছেঁকে বাছাই করার বিধান সুনিশ্চিত করবে। আমার আবাসন গ্রীন রোড সংলগ্ন পূর্ব রাজাবাজার এলাকার বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার্স। গ্রীন রোডের বক্ষ ভেদ করে তৈরী হয়েছে পান্থপথ নামক প্রশস্ত সড়কটি। গ্রীনরোডকে ভেদ করে কয়েকগজ দূর পার হলেই যে কোন পথচারীর দৃষ্টিগোচরে অতি সম্প্রতি একটি ফলক চোখে পড়তে বাধ্য– 'গ্রীন ভ্যালি ইউনিভার্সিটি'। পশ্চিম পান্থপথ থেকে উত্তর দিকের একটি সরু গলির দিকে মুখ করা তীর চিহ্নটি জানান দিচ্ছে যে, ঐ গলির প্রান্তে পূর্ব রাজাবাজার এলাকাভুক্ত একটি ভাড়া করা সংকীর্ণ দালানে 'মুক্তবাজার অর্থনীতির' কৌলিন্যে 'গ্রীন ভ্যালি ইউনিভার্সিটি' নামক এই 'মহাজ্ঞানপীঠ'টি জ্ঞানের বটিকা বণ্টন ও গলাধ:করণ করানোর জন্য বদান্যতার নিদর্শন হিসেবে ইতোমধ্যেই অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। দুর্বৃত্ত পুঁজিকে পুঁজি করে এমনি ইতরতার আরেকটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'কুইন'স ইউনিভার্সিটি'। জনৈকা শোভা নামের এক 'সমাজসেবিকা' ও 'সমাজহিতৈষিনী' তাঁর কন্যা কুইন এর নামে বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম রেখেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান কোথায় জানেন? বনানীর বহু অঘটন ঘটার জন্য ইতোমধ্যে রাজধানীতে বিপুল 'খ্যাতি' অর্জন করা সেই দালানটিতে, যে দালানটিতে কুখ্যাত 'ক্লাব ট্রাম্পস' অবস্থিত এবং যে ক্লাবে আণ্ডারওয়ার্ল্ডসহ বিচিত্র কারবারের রহস্যজনক লোকজনের অসামাজিক আনাগোনা চলে এবং যে ক্লাবে ড্রাগ ব্যবসা ও 'গণবধূ'দের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত 'অক্ষম' চিত্রাভিনেতা সোহেল চৌধুরী নিহত হয়েছিলেন। কী চমৎকার শিক্ষার পরিবেশ!! আর ঐ পরিবেশে যারা গমনাগমন করে তাদের সম্ভাব্য করুণ পরিণতির কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে? এই হচ্ছে নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে এদেশের শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ।

প্রসঙ্গটির অবতারণা এ জন্য করলাম যে, এ বছর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে গভীর সমাজ মনস্কতা নিয়ে ড. মাহবুব উল্লাহ বিশ্লেষণ করেছেন। যেদিন থেকে এ বছরের এই পরীক্ষা শুরু হল, তার পরদিন থেকে এদেশের প্রতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে, এ পরীক্ষায় ব্যাপক নকল এবং ক্ষেত্রবিশেষ নকলবাজদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও একশ্রেণীর 'শিক্ষক' যেমন সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, তেমনি এর বিপরীত চিত্রে স্কুলের কর্তাব্যক্তিরা এবং জ্ঞান ও বিদ্যামনস্ক বহু নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক শুধু লাঞ্ছিতই হননি, নকলবাজ ছাত্রছাত্রী ও তাদের সহযোগী সন্ত্রাসীচক্র এবং ক্ষেত্রবিশেষে অভিভাকদের সশস্ত্র হামলায় নিহতও হয়েছেন। এটি এ পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে অনুষ্ঠিত সর্বলোকবিদিত (পাবলিক) কোন পরীক্ষায় সবচাইতে কলঙ্কজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা। পরীক্ষার ফলাফলে যারা সত্যিকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের অভিনন্দন জানাতে এ সমাজে কখনই কুণ্ঠবোধ করবে না। কিন্তু আমরা তো এও জানি, এদেশের বর্তমানে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা এমন বিপর্যস্ত যে, শিক্ষা এখন বিদ্যার্জনের চাইতে পণ্যের ফেরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষা আজ এমন এক পণ্যের রূপ নিয়েছে যে, এর লক্ষ্য শুধুমাত্র সার্টিফিকেট অর্জন এবং অতিক্ষিপ্রতা ও দ্রুততার সঙ্গে সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে বিত্ত ও সম্পত্তির নিয়ন্ত্রক হওয়া। এক্ষেত্রে সুনীতি বা শ্রেয়নীতির

www.pathagar.com

কোন বালাই নেই। তাই, একশ্রেণীর শিক্ষক' কোচিং সেন্টার নামে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য 'দোকান' খুলে বসেছে। যেখানে জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে কেবলমাত্র বটিকাকারে কিছু বিষয়ের মুখস্থবিদ্যা অর্জন করার কৌশল শেখান হয়। আর 'জ্ঞানের' এই বটিকা সেবনেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হয়। অর্থাৎ অভিভাবকরা সকল নৈতিকতা ও সুনীতি বিসর্জন দিয়ে যে কোন পন্থায় কেবলমাত্র কাঁচা টাকা উপার্জনের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। এর ফলে সমাজে ও সমাজকাঠামোতে তার বিরূপ প্রতিফলনও ঘটছে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও সহিংসতা আজ যে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে, তার মূলে রয়েছে কাঁচা টাকা উপার্জন তথা লুণ্ঠনের এই দুর্বৃত্ত আচরণ।

আমাদের বেতার ও দূরপ্রেক্ষণ (টেলিভিশন)-এ শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা দেখলে জ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিমাত্রই লজ্জা পাবেন। এই গদবাধা অনুষ্ঠানমালায় জ্ঞানার্জন এবং বিদ্যাচর্চার বিষয়ে প্রণোদনা দেয়ার পরিবর্তে ধন্বন্তরী কায়দায় কিভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কেবল তারই বটিকা গলাধ:করণ করানো হয়। ফলে জ্ঞান ও বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনায় যারা ব্রতী হতে চায়, তারা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে।

এক সময়ে আমরা লক্ষ্য করতাম যে, দেশের পল্লী অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকেই মেধার বিকাশ ও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটত। চিত্রটি আজ কিন্তু পাল্টে গেছে। এ বছর সবচাইতে ভাল ফলাফল যে দু'টি বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীরা দেখাতে পেরেছে, এদের বাস দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মহানগরী বা তার সন্নিকটে এবং এই দু'টি অঞ্চলে অর্থের লেনদেন ও বিত্তের স্ফীতি কিভাবে ঘটছে, তা কারও অজানা নয়। গত কয়েকবছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলোত্তর কালে উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা অকপটে স্বীকার করেছিল (দুয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া) যে, প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে তারা হয় কোচিং সেন্টারে, না হয় প্রাইভেট টিউটরের কাছে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে 'জ্ঞানের' বটিকা গলধ:করণ করেই পরীক্ষায় 'কৃতিত্বের নিদর্শন' রেখেছিল। সমাজের বিবেকমান মানুষ ও উদ্বিগ্ন নাগরিকরা এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় তাদের গভীর শঙ্কা ও জাতির অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বহু মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তাই সম্ভবত এ বছরকার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটারের অবদানের কথা অবলীলায় এড়িয়ে গেছে। সাংবাদিকদের প্রণোদিত প্রশ্নের উত্তরে যত সুবচনই এসব ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আমরা শুনে থাকি না কেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কলুষিত রাজনীতি বিবরে প্রবিষ্ট হয়েছে এবং তা মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। আমরা এখনও যদি সাবধান না হই, তাহলে তমসাবৃত এক আত্মহননের পথেই ধাবিত হব।

পৃথিবীর কোথাও কেউ কি শুনেছেন যে, পরীক্ষার ফলাফল প্রধানমন্ত্রীর কাছে আগে জমা দিতে হয় এবং তারপর তা ঘোষণা করতে হয়? শিক্ষাঙ্গনসমূহে নষ্ট রাজনীতির পাকা বন্দোবস্ত করে শেখ হাসিনা পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ানেরও রাজনীতিকায়ন এমনি দুঃখজনকভাবে করলেন। ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার এমন সর্বগ্রাসী শ্রেয়বোধবিবর্জিত কর্মকাণ্ডকে ধিক্কার জানাবার ভাষা কোন শিষ্টজনেরই খুঁজে পাবার কথা নয়। তাই এ বিষয়টির বিচারের ভার আমি পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। উপসংহারে তবু আমি এ বছর যে সব ছাত্র-ছাত্রী ফলাফলের দিক থেকে কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তাদের অভিনন্দন জানাই এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যাৎ কামনা করি। আশা করি, এরা তাদের বিদ্যা, জ্ঞান, মেধা, প্রতিভা ও কর্মনিষ্ঠা দিয়ে দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

২৪ জুন ২০০০

দুর্গের ভেতর থেকে দুর্গ দখল

মাহবুব উল্লাহ :

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে। এই সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর কোনটি ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ, কোনটি ছিল ফরাসী উপনিবেশ, কোনটি ছিল স্পেন ও পর্তুগালের উপনিবেশ এবং কোনটি ছিল ডাচ্ উপনিবেশ। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এসব দেশের রাজনৈতিক মর্যাদা সমান ছিল না। কিছু রাষ্ট্র ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস নিয়ে স্বাধীন হয়, আবার কোন কোনটি পূর্ণ সার্বভৌম মর্যাদা অর্জন করে। উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে আসার পরও দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের সদ্য স্বাধীন দু'টি রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক অবশেষের ধারাবাহিকতা বহন করে চলে। স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। তিনি ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় ছিলেন। অন্যদিকে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতির পদটি অলঙ্কৃত করেছিলেন একজন ইংরেজ সেনানায়ক মার্শাল গ্রেসি। উপনিবেশবাদের অবসানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, উপনিবেশবাদের প্রতিনিধিরা কেউ কেউ সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে গেলেন। আর যিনি গভর্নর জেনারেল হতেন, তার নিয়োগে ব্রিটিশ ক্রাউনের অনুমোদন প্রয়োজন হত। মোদ্দা কথায়, উপনিবেশবাদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রমন ধাপে ধাপে ঘটেছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপনিবেশগুলোর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করেনি। অর্থনৈতিকভাবে উপনিবেশগুলো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর ওপর নির্ভরশীল থেকে গেল। এটাই হল নয়া উপনিবেশবাদ। অর্থাৎ উপনিবেশবাদের নতুন ধরন। পৃথিবীর বহু দেশে উপনিবেশবাদের নিষ্ক্রমণ অনেক বিরাট সমস্যার জন্ম দেয়। মধ্যপ্রাচ্যে উপনিবেশবাদ যে ধরনের রাষ্ট্রীয় সীমরেখা সৃষ্টি করেছে, তারই ফলশ্রুতিতে মধ্যপ্রাচ্যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধের সমস্যা সৃষ্টি হয়। ইরাক ও কুয়েতের সমস্যা এরকমই একটি সমস্যা। মধ্যপ্রাচ্য তেল সম্পদে সমৃদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইসরাইল নামক একটি ইহুদীবাদী রাষ্ট্রের জন্ম দেয়া হয়। ইসরাইল কিভাবে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ ও সুয়েজ খালের ওপর ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সহায়তা করেছে, তা পাঠকের অজানা থাকার কথা নয়। বস্তুত ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করেছে। ইসরাইল এখনও সিরিয়া, জর্ডান ও প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ড দখল করে আছে। দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে রেডক্লিফের রোয়েদাদের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক সীমারেখা অঙ্কিত হলেও এমন কিছু বিরোধ ও সংঘাতের বীজ এই নতুন মানচিত্র সৃষ্টির মধ্যদিয়ে বপন করা হয়, যার ফলে উপমহাদেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আমরা যদি বাংলাদেশের সীমান্তের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেমন ভারতীয় ছিটমহল আছে, তেমনি ভারতের অভ্যন্তরেও বাংলাদেশের ছিটমহল আছে। দহগ্রাম আঙ্গরপোতা ছিটমহলে বাংলাদেশীদের দুর্দশার কথা আমরা জানি। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ২০ বছর পর্যন্ত দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতাবাসীদের বাংলাদেশে গমনাগমনের স্বাধীনতা ছিল না। এই ছিটমহলের প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বশেষ যে সমঝোতা হয়েছে, সেই সমঝোতা অনুযায়ী ছিটমহলবাসীরা নির্দিষ্ট সময় অন্তর তিনবিঘা করিডর দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে। এতদসত্ত্বেও এই ছিটমহলবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হচ্ছে না। বাংলাদেশের

www.pathagar.com

নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা বাংলাদেশের ভোটার হতে পারছে না। কিছুদিন আগে মশালডাঙ্গা ছিটমহলের অধিবাসীরা ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও ভারতীয় সন্ত্রাসীদের দ্বারা যেভাবে নির্যাতিত হয়েছে, তা কোন সভ্য দেশে কল্পনা করা যায় না। মশালডাঙ্গাবাসীদের সহায়তায় বাংলাদেশ সেখানে কিছুই করতে পারেনি। বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে এসে মশালডাঙ্গার দুর্গত অধিবাসীরা সামান্য কিছু রিলিফ ও আশ্রয় পেয়েছে মাত্র।

আফ্রিকার মানচিত্রে রাষ্ট্রীয় সীমানার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অনেক দেশের পার্শ্ববর্তী দেশের সীমানা সরলরেখার আকারে রয়েছে। এর ফলে আফ্রিকার গোত্রপ্রধান সমাজ বহু ছিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ গোত্রীয় বিরোধ ও সংঘাত আফ্রিকার রাজনীতির স্বাভাবিক অনুষঙ্গে পরিণত হয়। উপনিবেশবাদ তাদের সুদূরপ্রসারী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এভাবে মানচিত্র তৈরী করেছে তাদের বিদায় নেবার প্রাক্কালে। তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে আজ যে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার সমস্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা বহুলাংশেই উপনিবেশবাদেরই সৃষ্টি।

জাতীয় সার্বভৌমত্বের দিক থেকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো খুবই নাজুক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। আমরা যদি শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান এমনকি আমাদের স্বদেশভূমি বাংলাদেশের দিকে তাকাই, তাহলে এ বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে তার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি সবচেয়ে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। নেপাল চীনের কাছ থেকে ১৮টি ফিল্ডগান ক্রয় করার ফলে ভারতীয় অবরোধের সম্মুখীন হয়। এই অবরোধের ফলে ১৯৮৮ সালে নেপালের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা নিশ্চল হয়ে পড়ে। নেপাল খাদ্যসামগ্রী, প্রয়োজনীয় ওষুধপথ্য ও জ্বালানি সংকটের সম্মুখীন হয়। জ্বালানি সমস্যাটি এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, নেপালের রাজা তার ব্যক্তিগত মোটরগাড়ির জন্যও জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারেননি। নেপালের আরেক প্রতিবেশী বাংলাদেশ তখন নেপালকে জ্বালানি সমস্যা লাঘবের জন্য কিছু সাহায্য করেছিল। নেপালে বাংলাদেশ বিমানের যে ফ্লাইট যেত, সে ফ্লাইটের মাধ্যমে নেপালে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী পৌঁছানো ব্যবস্থা করা হয়। ভারত বাংলাদেশের এই উদ্যোগটিকে ভাল চোখে দেখেনি। নেপালে আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্রের ন্যায্য দাবীতে ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলন ১৯৮৮ তে হয়েছিল, তার লক্ষ্যবস্তু ছিলেন মূলত নেপালের রাজা যিনি নেপালের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতীক। রাজা নেপালের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাজার এই প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল করার জন্যই তথাকথিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ছদ্মাবরণে আন্দোলনের নামে একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। সিকিমেও একইভাবে চোগিয়াল বিরোধী আন্দোলন-বিক্ষোভের সৃষ্টি করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত লেন্দুপ দর্জির মাধ্যমে সিকিমে যে পার্লামেন্টারী 'গণতন্ত্র' চালু করা হয়, সেই গণতন্ত্রই সিকিমকে তার স্বকীয়তা ও সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গণতন্ত্রের জন্য সকল আন্দোলনই তাই ন্যায্য আন্দোলন হয় না। যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন একটি দেশকে চূড়ান্ত পর্যায়ে তার সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিতে বাধ্য করে, সেই আন্দোলনকে কখনোই ন্যায্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলা যাবে না। বাংলাদেশে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে। সেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে ১৯৭৫-এর একদলীয় বাকশালী ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় শাসন পদ্ধতি ছিল প্রেসিডেন্সিয়াল ধরনের। পরিবর্তীকালে ১৫ আগষ্ট ও ৭ নভেম্বরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তনের পথ সুগম হয়। কিন্তু নবপ্রবর্তিত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি বজায় থাকে। জনগণের প্রত্যক্ষ সাধারণ ভোটে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেন। এরশাদের আমলেও প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির ব্যবস্থা চালু থাকে। তবে, সে ব্যবস্থাকে জনগণ কখনোই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকার করে নেয়নি। এরশাদের পতনের পর

www.pathagar.com

দেশে পার্লামেন্টারী পদ্ধতি চালু করার পক্ষে প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতি চালু করা হয়।

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বাংলাদেশের বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতির মৌলিক কোনো তফাৎ দেখেন না। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পরিবর্তে এসেছে 'প্রধানমন্ত্রী পদ্ধতি', যা আদৌ সংসদীয় পদ্ধতি নয়। কিন্তু যে ধরনের সংসদীয় পদ্ধতি আমাদের দেশে চালু আছে, তার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ তাদের আধিপত্য ও প্রভুত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যদেরকে নিয়ে হর্সট্রেডিংয়ের অভিজ্ঞতা আমরা জানি। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এই হর্সট্রেডিং কী বিষময় ফল সৃষ্টি করেছে, তা রাজনীতির হালহকিকত নিয়ে যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা সম্যক অবগত আছেন। দ্বাদশ সংশোধনীতে এ ধরনের হর্সট্রেডিংয়ের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ রাখা হলেও নিগূঢ় অর্থে হর্সট্রেডিং বন্ধ হয়েছে, একথা বলা যাবে না। বিরোধী দলের দু'জন সদস্য জনাব হাসিবুর রহমান স্বপন এবং ডাঃ আলাউদ্দীন (মরহুম) ফ্লোর ক্রস করার পর সরকার সমর্থক সংবাদপত্রে আরও ৫০ জন বিএনপির সংসদ সদস্য সরকারে যোগ দেবেন, এরকম খবর পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে দাবী করেন যে, আরও অনেক 'চমক' অপেক্ষা করছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সেই 'চমক' আমাদের দেখতে হয়নি। কিন্তু মৌলিক সমস্যাটি থেকেই যাচ্ছে, যদি আমরা সমস্যাটিকে জাতীয় সার্বভৌমত্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। ধরা যাক, এই ব্যবস্থার অধীনে সংসদীয় দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে চান, যেমন- তিনি এই মুহূর্তে ভারতে গ্যাস রপ্তানি করতে চান না, সেক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ও তেল কম্প্যানিগুলোর স্বার্থ একজোট হয়ে নানাভাবে প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চাইবে। এজন্য গোপনে কিছু প্রভাবশালী সংসদ সদস্যকে ঘুষ দিয়ে যদি কিনে ফেলা হয়, তা একেবারে অসম্ভব হবে না। শোনা যায়, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (RAW) ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অনুকূলে এভাবে সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার জন্য কোন দলের সংসদ সদস্যদের কিংবা সেই দলের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দকে উৎকোচ প্রদান করে- এরকম আশংকা করা একেবারে অমূলক হবে না। অর্থাৎ, একটি দেশের শাসন পদ্ধতিও বৈদেশিক অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই যে কোন দেশের সংবিধান রচনার সময়ে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে সংবিধান যেন কোনক্রমেই বৈদেশিক অনুপ্রবেশের হাতিয়ার হিসেবে কাজ না করে।

আজকাল প্রচার মাধ্যমও একটি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য 'একিলিসের গোড়ালী'তে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশের রেডিও-টেলিভিশন মতাদর্শগতভাবে আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের প্রভাবমুক্ত নয়। এই প্রচারে মাধ্যমকে সুচিন্তিতভাবে জাতীয় ভাবধারামুখী করার কোন প্রয়াসও নেই। বিশেষ কর বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে এমন সব সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য প্রচার করে চলেছে, যার সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী অবস্থান রয়েছে। এমনকি পৌত্তলিকতার মত বিগর্হিত ধর্মাচারও টেলিভিশনের মত শক্তিশালী মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ছোট শিশুদের সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষার আসরে ঐ আসরের উপস্থাপিকা শিশুদের বাদ্যযন্ত্রকে নতজানু হয়ে প্রণতি দিতে অনুপ্রাণিত করেন। অথচ আমাদের ধর্মে বাদ্যযন্ত্র দূরে থাক, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে মাথা নত না করতে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। টিভির অনুষ্ঠানগুলো মনোযোগ দিয়ে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ অনুষ্ঠানই আমাদের জাতীয় চেতনার পরিপন্থী এবং আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের মূল্যবোধগুলোর পরিপন্থী। এভাবেই একটি দেশের সার্বভৌমত্ব দেশের ভেতরে থেকে এবং দেশের বাইরে থেকে হুমকির সম্মুখীন হয়। একটি দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে ভেতর থেকে দুর্গ দখলের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়। ট্রয়ের যুদ্ধে দুর্গের ভেতর কাঠের ঘোড়া প্রবেশ করিয়ে সেই ঘোড়ার পেটের মধ্যে অবস্থান করে শত্রু

www.pathagar.com

সৈন্যরা দুর্গে প্রবেশ করে রাতের অন্ধকারে দুর্গ কব্জা করে নেয়। অনেক সময়ে দেশপ্রেমিক, রাজনৈতিক দলেও ট্রয়ের ঘোড়ার মত অনুপ্রবেশকারীরা প্রবেশ করতে পারে। এরকম হলে একটি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, তখন আর শত্রুকে চিহ্নিত করা যায় না। বর্ণধারণকারী শত্রুর চাইতে বর্ণচোরা শত্রু অনেক বেশী মারাত্মক।

তেইশে জুন পলাশী দিবস। এই দিনে ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠের দেশদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইস্ট ইন্ডিয়া কম্প্যানির মুষ্টিমেয় সৈন্যদের হাতে পরাজয় বরণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। মীরজাফর কোরআন ও তরবারী হাতে নিয়ে শপথ করা সত্ত্বেও নবাবকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি। ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণের মুখে মীরজাফর ও তার স্বগোত্রীয় সেনাপতিদের অধীনস্থ সৈনিকরা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছিল। ফলে নবাব পরাজিত হলেন। ক্লাইভের নেতৃত্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানির পক্ষে কখনোই নবাবকে পরাস্ত করা সম্ভব হত না, যদি নবাবের ক্ষমতাধর সেনাপতিরা ইস্ট ইন্ডিয়া কম্প্যানির সঙ্গে যোগসাজশে নবাবের গদিলাভের দুরাশার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হত। একেই বলে দুর্গের ভেতরে থেকে দুর্গ দখল। বাংলাদেশের মত একটি দেশ গুনার মির্ডালের ভাষায় একটি Soft State -এটি ভেতর থেকে দুর্গ দখলের বিপদের সম্মুখীন। এই আশংকাকে আদর্শিক ও সাংগঠনিকভাবে সর্বোতভাবে নির্মূল না করতে পারলে বিপদ থেকেই যাবে।

আফতাব আহমাদ :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহ গভীরভাবেই উপলব্ধি করেছিল যে, মুসোলিনী ও হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে হলে তাদের পদানত উপনিবেশসমূহের লোকবলের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া তা অসম্ভব। ইতোমধ্যে উপনিবেশগুলোতে জনসাধারণের মধ্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলশ্রুতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চেতনা উন্মোচিত হয়ে একটি নড়বড়ে, কিন্তু সংগঠিত রূপ ধারণ করছিল। সেই সঙ্গে জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ও স্বাধীনতার স্পৃহাও অদম্য হয়ে উঠছিল। সে কারণে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদীদের শীর্ষ নেতারা এবং তাদের সঙ্গে আদর্শিক দ্বন্দ্ব ও প্রভাব বলয় সম্প্রসারণের প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত স্টালিনের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সভিয়েত ইউনিয়ন একটি সমঝোতায় উপনীত হয়। সমঝোতার ফলে এই মিত্রশক্তি অঙ্গীকার করে যে, মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট ইটালী এবং হিটলারের নাৎসী জার্মানী যদি যুদ্ধে পর্যুদস্ত ও পরাজিত হয়, তাহলে উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা প্রদান করে নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পথ উন্মোচিত করে দেয়া হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এ অঙ্গীকার নানা টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে আক্ষরিকভাবে প্রতিপালিত হলেও তাতে কেবলমাত্র একটি ভৌগোলিক অবয়ব ও স্বতন্ত্র পতাকা সংবলিত 'স্বাধীন' রাষ্ট্রসমূহে উদ্ভব পর্যায়ক্রমে ঘটে। এসব রাষ্ট্র ভৌগোলিক বা কাগুজে স্বাধীনতা লাভ করল বটে, কিন্তু প্রাক্তন প্রভু রাষ্ট্রগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট দালাল মুৎসুদ্দী ও প্রশাসনিক আনুকূল্যে সৃষ্ট অনুগত রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতেই রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। বহুজাতিক কম্প্যানিসমূহ ও সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশনির্ভর গড়ে ওঠা শিল্প, কল-কারখানার মালিকরা প্রভু রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণের যাতে যত্নবান হতে পারে সেজন্য সকল আয়োজন সুসম্পন্ন করেই রাষ্ট্রক্ষমতার পালাবদল ঘটে। ফলে এসব রাষ্ট্র যে ধরনের স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তাতে নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করার পরিবর্তে বিদেশ ও পাশ্চাত্য পুঁজিনির্ভর এক বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। সমাজবিজ্ঞানের পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ এ রাষ্ট্রসমূহের সরকারকে ও জনসাধারণকে 'সেমিসভরেন গভর্নমেন্ট' এবং 'সেমিসভরেন পিপল' হিসেবে অভিহিত করেন। কেউ কেউ এদেরকে 'কোয়াজি সভরেন গভর্নমেন্ট অ্যান্ড কোয়াজি সভরেন পিপল' অভিধায়ও অভিহিত করেন। আফ্রিকা জাতীয়তাবাদের জনক ঘানার (পূর্বতন গোল্ডকোস্ট) রাষ্ট্রনায়ক

www.pathagar.com

কোয়ামে এনক্রুমা এই ব্যবস্থাকে নিউ কলোনিয়ালিজম বা নয়া উপনিবেশবাদ বলে অভিহিত করেছেন। মার্কসবাদীদের বিশ্লেষণেও এ ব্যবস্থাকে নয়া উপনিবেশবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, কোয়ামে এনক্রুমা কখনই মার্কসবাদে দীক্ষা নেননি, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদবিরোধী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত ঘানা ও আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামে আদর্শিক, তাত্ত্বিক ও ব্যক্তিগত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মার্কসবাদী ধারার বাইরে অবস্থান গ্রহণকারী তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ও দেশপ্রেমিক বিদ্বৎজ্জনরাও তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহকে নয়া উপনিবেশবাদকবলিত উনসার্বভৌম বা নিমসার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সূত্র ছিন্ন করে স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণতা দান না করলে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা, অর্থনীতির যথোচিত বিকাশ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জন করে তোলা সামাজিক ন্যায়বিচারকে সুনিশ্চিত করা এবং স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণতা দান ও অর্থবহ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এক কথায় নিরঙ্কুশ বা নির্বূঢ় (absolute) সার্বভৌমত্ব অর্জন হনুজ দুরসত।

পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহও এ বিষয়টি যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে যুদ্ধোত্তরকালে নয়া বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের প্রয়োজন, তা নির্ণয়ের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপন শলা-পরামর্শের মাধ্যমে Bretton Wood কনফারেন্সের ফলশ্রুতি হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকন্স্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (IBRD), যা বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা বিশ্বব্যাংক নামে সমধিক পরিচিত– তা প্রতিষ্ঠা করে। একই সঙ্গে IMF বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ও IFC বা আন্তর্জাতিক অর্থায়ন কর্পরেশন নামে পৃথক দু'টি প্রতিষ্ঠানেও জন্ম দেয়া হয়। পরবর্তীতে এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক তথা ADB সহ অঞ্চলভিত্তিক পৃথক পৃথক ব্যাংকসমূহেরও জন্ম দেয়া হয়। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ, আইএফসি এবং উন্নয়নের জন্য স্থাপিত আঞ্চলিক ব্যাংকসমূহকে অর্থনীতিবিদরা একীভূতরূপে দেখে থাকেন এবং এই ব্যবস্থাটি তাদের অনেকেই Bretton Wood System বলেই অভিহিত করে থাকেন। নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন ৫টি সদস্য রাষ্ট্রের যথেচ্ছাচার করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে রাষ্ট্রসংঘের অন্য যে অঙ্গ সংস্থাসমূহের ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তাদেরকে সম্মিলিতভাবে UN সিস্টেমের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হয়। বলা বাহুল্য, বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে শত-সহস্র সূত্রে গ্রোথিত। এরই পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে যে সমাজতান্ত্রিক ভুবন ও অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল, তা অস্তিত্বের দিক থেকে যতই পুঁজিবাদের সমান্তরাল ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হত না কেন, আন্তর্জাতিক লেনদেনের খাতিরে তাকেও পুঁজিবাদের সঙ্গে রফা করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নামে পুঁজিবাদী শর্তাবলী ও সূত্রাবলীর সঙ্গে সমঝোতা করে নিবিড়তা ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে বাধ্য হতে হয়েছিল। এর পাশাপাশি গোটা বিশ্বের ওপর স্বীয় প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্য প্রকাশ্যে ও সংগোপনে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। যার ফলে উদ্ভব ঘটে ন্যাটো ও এবং ওয়ারসো চুক্তিভিত্তিক দু'টি বৃহৎ সামরিক জোটের প্রকাশ্যে এবং সংগোপনে পরিচালিত প্রচার-প্রপাগান্ডা, নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা। এই দুই সমান্তরাল ও পরস্পরবিরোধী শিবিরের মধ্যে যে অঘোষিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, তাকেই বলা হয়ে থাকে Cold War বা স্নায়ুযুদ্ধ। স্নায়ুযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে সামাল দেয়ার জন্য চীন দেশের চৌএন লাই, ইউগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো এবং ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন'র নেতৃত্বে বান্দুং কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে Non Aligned Movement বা জোটমুক্ত আন্দোলন। এই জোটমুক্ত আন্দোলনের চেতনার অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল যদিও তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা তথাপি বাস্তবতা ছিল এই-দুয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী রাষ্ট্র

www.pathagar.com

ছাড়া অধিকাংশ রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক ও তাদের সৃষ্ট দেশীয় দালাল শ্রেণীর কারণে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদনির্ভর ছিল। পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ ঔপনিবেশিক আমলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির আপেক্ষিক দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে অনেকাংশেই এগিয়ে ছিল। এদের মধ্যে বৃহত্তম রাষ্ট্র হচ্ছে সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যকামী ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত।

দক্ষিণ আমেরিকা বা লাতিন আমেরিকার কথা যদি বলি, তাহলে সেই মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্ব ও কার্যকলাপ যুক্তরাষ্ট্রের বিঘোষিত মনরো ডকট্রিনের নাগপাশে আবদ্ধ ছিল। লাতিন আমেরিকায় মার্কিন পুঁজির প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যকে নিশ্চিত করার জন্য বহুবার সরাসরি প্রকাশ্য সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটেছে এবং সংগোপনে বিশ্বস্ত সমরপতিদের দিয়ে বহু সামরিক অভ্যুত্থানও সংঘটিত করা হয়েছে। মনরো ডকট্রিনের আফ্রিকী ভাষ্য কার্যকর করা হয়েছিল বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার নেতৃত্বে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদের অবসানের পূর্ব পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশের দেশে দেশে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যক্ষ প্ররোচনা, প্রকাশ্য সামরিক হস্তক্ষেপ এবং প্রকাশ্য ও গোপন প্রণোদনার কারণেই আফ্রিকা মহাদেশে উপনিবেশবাদের অবসান এত বিলম্বিত হয়। এক কথায় জোটমুক্ত আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করা সত্ত্বেও ঐ আন্দোলনভুক্ত ক্ষুদ্র ও বড় রাষ্ট্র হওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে তদারকির দায়িত্ব লাভ করার কারণে তৃতীয় বিশ্বের ভেতরেও অনেক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই জন্ম নেয় বৃহৎ রাষ্ট্রসুলভ ও পরাশক্তিসুলভ আচরণের। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের সীমিত স্বাধীনতা ও নিমসার্বভৌমত্ব আরও অধিকতর খর্বিত হয়।

স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে এবং স্নায়ুযুদ্ধোত্তরকালে দেশে দেশে যে বৈরিতা ও হানাহানি আমরা করেছি ও করছি এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়টি নিয়ে আমাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও বিচলনকে ব্যাখ্যা করতে হলে এই প্রেক্ষাপটটি এবং তার অন্তর্গত জটিলতা গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে হবে। আসুন, দক্ষিণ এশিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করি। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র ভারত। আয়তন, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সামরিক শক্তি এবং মানববিধ্বংসী বিপুল সমরভাণ্ডার ও মারণাস্ত্রের পরিসংখ্যানে ভারত নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। কিন্তু বর্ণাশ্রমভেদে বিভক্ত ভারত, জাতিগত নিষ্পেষণে নিপীড়িত সশস্ত্র সংগ্রামে উপদ্রুত ভারত, দলিত ও অস্পৃশ্যদের বঞ্চনার ফলে রাষ্ট্রক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের অদমিত সংগ্রামে জর্জরিত ভারত এবং হিন্দুত্ববাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদকে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীসহ অনার্য জাতিসমূহের ওপর চাপিয়ে দেয়া ভয়ঙ্কর পরিণতিতে উদ্বেলিত ভারত নিঃসন্দেহে একটি দুর্বল রাষ্ট্র। এতদসত্ত্বেও 'ভারতীয়ত্ব' ও 'ভারতীয় মন' ভারতের জনগণকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যা ভারতের নড়বড়ে ভিত্তিমূলে সঞ্জীবনী শক্তি এখনও যুগিয়ে যাচ্ছে এবং কেন্দ্রীভূত ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতাপকে অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে যাচ্ছে। এই শেষোক্ত দুই কারণে ভারতীয় শাসককুলের মধ্যে জন্ম নিয়েছে প্রভুত্ব, অহংবোধ ও যুদ্ধংদেহী ভাবের। মার্কিন মনরো ডকট্রিনের ভারতীয় ভাষ্য 'প্রভুত্ব ডকট্রিনের' জন্মের মূলে এটিই প্রধান কারণ (ভারতীয় প্রভুত্ব ডকট্রিন সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নকালে বিভিন্ন অভিধায় ভূষিত হয়েছে। এই প্রভুত্ব ডকট্রিনকে কখনও বলা হয়েছে 'নেহরু ডকট্রিন', কখনও বলা হয়েছে 'ইন্দিরা ডকট্রিন', কখনও বলা হয়েছে 'গুজরাল ডকট্রিন'। অধুনা বলা হচ্ছে 'হিন্দুত্ববাদ' বা 'আদভানী ডকট্রিন'।)

যে নামেই প্রভুত্ব ডকট্রিনকে অভিহিত করা হোক না কেন, এই ডকট্রিনের মর্মকথা হচ্ছে– ইন্দো-সেনট্রিক দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে বাদ দিয়ে বা ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ন প্রতীয়মান হতে পারে এমন কোনও রাষ্ট্রের সাথে এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো কোন ধরনের সামরিক-অসামরিক পরিপূরক কূটনৈতিক সৌহার্দ্য বা কোন ধরনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট লেনদেন করতে পারবে না। প্রভুত্ব ডকট্রিনের আগ্রাসী চরিত্রের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার কোন রাষ্ট্রের সঙ্গেই ভারতের সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি তো নেই-ই বরং রয়েছে একটি বিরোধ, অবিশ্বাস, অনাস্থা এবং বাণিজ্যিক ও

www.pathagar.com

কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর সংকট। এসবের মূলেই রয়েছে ভারতের চরম অসহযোগিতা, অনমনীয়তা, সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণে অবিশ্বাস এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৪৭-এর রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক অখণ্ড বিশাল ভারত প্রতিষ্ঠা। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী Discovery of India গ্রন্থে যে বিশাল ভারতের স্বপ্ন ও তাগিদে ভারতীয়দের প্রণোদিত করার চেষ্টা নিয়েছিলেন, সেই বিশাল ভারতের মানচিত্র হিন্দুকুশ থেকে চীন দেশের দক্ষিনাঞ্চসহ ইন্দো-চীন পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়াকেও বাদ দেয়া হয়নি। বিশাল ভারতের স্বপ্নে বিভোর নেহরু এবং তার বিশ্বস্ত প্যাটেল ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ-ভারতের বিভাজনকে কখনই অন্তর থেকে মেনে নেননি। ভবিষ্যতে পুনরেকত্রীকরণের মাধ্যমে অখণ্ড বিশাল ভারত বিনির্মাণের লক্ষ্যেই তার পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিবেশীদের সাথে আচরণ নির্ণীত হয়েছিল। ১৯৪৭-এর পর থেকেই নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত পাকিস্তানকে তার প্রধান শত্রু নির্ণয় করে পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করার যে লক্ষ্যভেদী পরিকল্পনা রচনা করেছিরেন, তার বাস্তবায়ন তিনি তার জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেননি। নেহরু যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাঁর দুহিতা ইন্দিরা যেখানে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলেন। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অযোগ্যতা, অদক্ষতা, অথর্বতা ও অবিমৃশ্যকারিতার ফলে পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোয় বাংলাদেশের মানুষ যখন হতাশা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছিল, তখন ভারত একদিকে কপটতার আশ্রয় নিয়ে প্রচার মাধ্যম ও অন্যান্য গোপন তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি 'গভীর সমবেদনা' ও 'সহমর্মিতা' প্রকাশ করা অব্যাহত রাখে। অপরদিকে, পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোর বিভিন্ন এস্টাবলিশমেন্টের ভেতরে নগদ নারায়ণের বিনিময়ে অনুগ্রহ ও কৃপা বিতরণ করে এক সুনিপুণ কর্মজাল বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এই কর্মজালে এবং ভারতের পাতা ফাঁদে ইতিহাসের অভিজ্ঞতাবিস্মৃত বহু রাজনীতিক, আমলা এমনকি সমরপতি ভারতের আজ্ঞাবাহী ক্রীড়নকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অখণ্ড পাকিস্তানব্যাপী ধূম্রজাল সৃষ্টি করে এমন এক সংকটের জন্ম হয় এসব ভারতীয় কুশীলবদের হাতে, যার পরিণতিতে বাংলাদেশের নিরীহ, নিরপরাধ ও নিরস্ত্র জনগণের ওপর ইতিহাসের বীভৎসতম গণহত্যা চাপিয়ে দেয়া হয়। এই গণহত্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য এবং বিশ্বস্বীকৃত সর্বজনগ্রাহ্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলাদেশের নাগরিকগণ এবং দেশপ্রেমিক সেনা অফিসার ও জওয়ানরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের এক দৃঢ়সংকল্প নিয়ে জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভারত এমনি মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষাতেই ছিল। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সহায়তার নামে সশস্ত্র লড়াইকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে অস্থায়ী সরকারকে নিজের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ ও কলহ সৃষ্টি করে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয়ে 'ধাত্রী'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে একটি শিখণ্ডী সরকারকে তার প্রভাববলয়ে প্রোথিত করে একটি ছায়ারাষ্ট্রের (Sattelite State -এর) জন্ম প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ত্বরান্বিত করে। জনগণের স্বাধীন ইচ্ছায় যে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ার কথা ছিল এবং যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা অর্জন করে একটি সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হওয়ার কথা ছিল, তা এমনিভাবেই বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু এ দেশের মানুষ শত শত বছর ধরে সংগ্রামের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী দিল্লীর শাসকগোষ্ঠীর নাগপাশ ছিন্ন করে ২৩৪ বছর এক অখণ্ড, অবিভাজ্য ও সম্প্রযুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছিল– এ কথা এ কালের দিল্লীর শাসকরা বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলেন। স্বতন্ত্র মানচিত্রভিত্তিক ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পর কায়েদে মজলুম মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং আমার প্রতিষ্ঠিত মেহনতী মানুষের দৈনিক মুখপত্র 'গণকণ্ঠ' ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী সব চক্রান্তের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলেছিল, তারই ফলে বাংলাদেশে গণচাহিদা পূরণের এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনে

www.pathagar.com

ভারতীয় শিখণ্ডীদের এক ব্যক্তিনির্ভর একদলীয় ফ্যাসিস্ট বাকশালী শাসনের অবসান ঘটে। এর ফলে ভারত প্রথমে হতবাক হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার ক্রোধ ও ক্ষোভ বাংলাদেশের সীমান্তে সশস্ত্র হামলা ও হানায় রূপ লাভ করে। আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র সেনাবাহিনীর অকুতোভয় দৃঢ় অংগীকার ও অতন্দ্র জনগণের প্রতিরোধের মুখে ভারতীয় সকল অভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র ও কারসাজি নস্যাৎ হয়ে যায়। ভারত চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশকে গ্রাস করার আগে ইন্দিরা গান্ধী সিকিমকে গ্রাস করে দক্ষিণ এশিয়ায় যে কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছিলেন, তা থেকে ভারতীয় সমরকৌশলবিদরা ও গোয়েন্দা কর্মজালের কর্মকর্তারা একটি ব্যাপক ও বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পঞ্চাশের দশকে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙে দেয়ার কৌশল হিসেবে একটি তত্ত্ব উদ্ভাবন করে বলেছিলেন: "If we cannot capture the fort from outside, then, we must capture if from within" ট্রয়নগরী দখল করার জন্য প্রস্তুতকৃত ও কাষ্ঠনির্মিত সেই ইতিহাস খ্যাত 'Trojan Horse' বা ট্রয়ের ঘোড়ার এটি ছিল সর্বাধুনিক ভাষ্য। ভারত যেমন মনরো ডকট্রিনের আদলে প্রভুত্ব ডকট্রিন উদ্ভাবন করেছে, ঠিক তেমনি প্রভুত্ব ডকট্রিন বাস্তবায়নের জন্য John Foster Dulles -এর আপ্তবাক্যটিকে রণনীতি ও রণকৌশল প্রণয়নে ক্ষেত্রে জপমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। আজ বাংলাদেশে এমন কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ধর্মভিত্তিক রকমফের সংগঠন, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে ভারতীয় চরদের অনুপ্রবেশ ঘটেনি এবং ভারতীয় নিয়োগীরা নিযুক্তি লাভ করেনি। পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের নামে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের এক সুনিপুণ বিস্তৃত কর্মজাল গড়ে উঠেছে। উদ্দেশ্য-জনসমক্ষে পরিচিত ভারত তোষণকারী ব্যক্তি, সংস্থা বা রাজনৈতিক সংগঠন জনগণের সমর্থন ও আস্থা হারিয়ে যদি গণরোষে পতিত হয়, অস্থিতিশীলতা, অস্থিরতা, নৈরাজ্য ও সহিংস সন্ত্রাসী তৎপরতাও যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে 'গণইচ্ছা'কে সমুন্নত রাখার জন্য এক অভিনব 'গণতান্ত্রিক' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার বিশ্বস্ত চর ও নিয়োগীদের প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রণাধীন আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী একটি গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের অধিষ্ঠানকে নিশ্চিত করা। বলাই বাহুল্য, এ ধরনের একটি সরকার ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে এবং ভারতীয় ছত্রচ্ছায়ার বরাভয় থেকে বঞ্চিত হতে পারে, এই শঙ্কায় সদা ভীতসন্ত্রস্ত থেকে প্রকাশ্যে না হলেও পরোক্ষ, প্রকারান্তরে ও সংগোপনে ভারত-তোষণনীতিকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার একমাত্র গ্রহণযোগ্য শ্রেয় নীতি জ্ঞান করতে বাধ্য।

দুর্ভাগ্য বাংলাদেশে আজ এসব প্রলক্ষণ দিন দিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। মানুষ রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলসমূহের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে না পারলেও এবং রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের প্রতি এক ধরনের অনীহা প্রকাশ করলেও দেশে যা ঘটছে, তা গভীর অভিনিবেশসহকারে পর্যবেক্ষণ করছে এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে ভারতীয় এই রাষ্ট্রঘাতী চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য দিনে দিনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে যিনিই ডাক দেবেন, তার আহবানেই এই জাগ্রত বাংলাদেশ ভারতকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে তার সব দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেবে। চীনদেশী পর্যটক হিউয়েন সাং বলেছিলেন, বাংলাদেশে প্রবেশের বহুপথ থাকলেও নিষ্ক্রমণের কোন জো নেই। একথাটি বাংলাদেশের সংগ্রামী লড়াকু জনতার সংগ্রামের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস বারবার সাক্ষ্য দেয়। ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে ১৯৯৫-এর ডিসেম্বরে শেখ হাসিনা হঠাৎ করে সিঙ্গাপুর সফরে যান। তাঁর সিংগাপুর সফর বাংলাদেশের রাজনীতিতে নানা জল্পনা-কল্পনার জন্ম দেয়। 'জাতীয় নিরাপত্তা স্টাডি গ্রুপ' নামে একটি সংগঠনের প্রচার পত্রে তাঁর এই সফরের রহস্য ভেদ করা হয়।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, ১৯৯৪-৯৬ সময়কালে সহিংস সন্ত্রাসী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণকারী শিক্ষিকা নিলীমা ইব্রাহীম 'আজকের কাগজে' স্বনামে সেনাবাহিনীর স্তুতি করে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমকে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকাশ্য উস্কানি দেন। বিলাসী ইব্রাহীমের এই উসকানিমূলক নিবন্ধ ছিল অত্যন্ত আপত্তিকর ও সেনা বিদ্রোহের জন্য ইন্ধন যোগানোর শামিল। হাসিনা সরকারের বিগত ৪ বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এদেশ ও এদেশের মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি যত্নবান হওয়া তো দূরের কথা জাতির সঙ্গে চরম বেঈমানী করে ভারতের আজ্ঞানুসারে এক রাষ্ট্রঘাতী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এদেশবাসীর ওপর প্রতিশোধ নিয়ে তাঁর জিঘাংসা চরিতার্থ করতে চাইছেন। ১৯৯৪ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিচিত্র দাবী কেন্দ্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে হাসিনা লণ্ডন গিয়েছিলেন। ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের কারণে দেশের ক্ষতি ও জনগণের কষ্টসংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে হাসিনা বিনতে মুজিব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, "যে জাতি তার পিতাকে হত্যা করেছে, সে জাতির কখনও সুখে থাকার অধিকার নেই।" গত ১০ জুন বিবিসি খ্যাত প্রবীণ সাংবাদিক সিরাজুর রহমান দৈনিক ইনকিলাবে 'বাংলাদেশের ভবিষ্যতে হাসিনার কোন স্বার্থ নেই' শিরোনামে প্রকাশিত এক সাধারণ নিবন্ধে লিখেছিলেন, "বাংলাদেশের সঙ্গে শেখ হাসিনার নাড়ির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; এদেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে তাঁর কোন স্বার্থ জড়িত নেই। সে জন্যই তিনি অতীতের কথা বলেন, বর্তমান বা ভবিষ্যতের জন্য তাঁর কোন মাথা ব্যথা নেই। গোরস্থানে পাথরের গায়ে পিতৃপুরুষের নাম খোদাই করে যেমন জীবিতরা সরে পড়ে, শেখ হাসিনার কার্যকলাপ থেকে সে দৃষ্টান্তই মনে আসা অস্বাভাবিক হবে না।" আজ তাই নিজের প্রতিশোধস্পৃহাসঞ্জাত প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভারতকে তুষ্ট রেখে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা এবং সেই ক্ষমতার বলে দেশবাসীর ওপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করা। আর এ কেবল সম্ভব ভারতের অভিলাষকে চরিতার্থ করতে পারলেই। সে কারণে আজ ট্র্যানজিট ও ট্র্যান্সশিপমেন্টের নামে ভারতকে মিলিটারী করিডর প্রদানের পাঁয়তারা চলছে, বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ভারতের অনুপ্রবেশ ও সামরিক হামলার বিষয়ে হাসিনা সরকারের উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা এবং বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে জবরদস্তিমুলকভাবে ভারতীয় কবজায় থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদী কণ্ঠ রহিত থাকা, বাংলাদেশের ভূখণ্ড তালপট্টির সার্বভৌমত্ব দাবীর প্রশ্নে মৌন থাকা, বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য ভূমি মুহুরীর চরকে বিতর্কিত ভূমি ঘোষণা করে ভারতের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন। [ভোরের কাগজ, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ দ্রষ্টব্য] এবং মুহুরীর উজানে ভারতকে বাঁধ নির্মাণে অনুমতি দান, ভারতের সৃষ্ট বঙ্গভূমি আন্দোলন প্রশ্নে মৌনতা পালন, উপআঞ্চলিক জোটের নামে উন্নয়ন ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ প্রকল্প ফেরী করে ভারতীয় সামরিক যোগাযোগের উপরিকাঠামো বিনির্মাণে সহযোগিতা প্রদান, ঢাকা-কলকাতা বাস সার্ভিস চালু করে আগামীতে ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস চালু করার অঙ্গীকার করে মূলত বাংলাদেশের বক্ষভেদ করে কলকাতা-আগরতলা করিডর প্রতিষ্ঠায় ভারতীয়দের সঙ্গে যোগসাজশ করা, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় না করে তিরিশ বছর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদন করা, বাংলাদেশের সার্বভৌম কর্তৃত্বের পরিপন্থী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করা এবং সর্বোপরি ভারতে গ্যাস রফতানির পাঁয়তারা, বিদ্যুৎ আমদানির পাঁয়তারা ও তেল উত্তোলনে বিদেশী কম্প্যানির ছদ্মাবরণে ভারতীয়দের সুযোগ করে দেয়া ইত্যাদি জাতীয় স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাকেই যে বিপন্ন করছে তাই নয়, বাংলাদেশের সার্বভৌম অস্তিত্বকেও প্রশ্নসাপেক্ষ করে তুলতে বাধ্য। প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিভাগে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকসহ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সকল সংস্থায় আজ অতিরাষ্ট্রিক [Extra territorial] আনুগত্য পোষণকারীদের সকল নীতি বিসর্জন দিয়ে ঢালাও নিয়োগ ও অকল্পনীয় পদোন্নতির দাপটে

www.pathagar.com

গোটা প্রশাসন যন্ত্র 'ট্রোজান হর্স' বা ট্রয়ের ঘোড়ার পরিণত হয়েছে বলে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে জনমনে। বাংলাদেশে অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করতে হলে ট্রয়ের ঘোড়ার পেটের ভেতর থেকে গভীর রজনীতে পঞ্চম বাহিনীর এসব দস্যু বাংলাদেশের সংহতি ও অখণ্ডতার ওপর পরিকল্পিত হামলা করার পূর্বেই ট্রয়ের এই ঘোড়াটি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করা অপরিহার্য। ইন্দিরা গান্ধী যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেখানে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন তারই পুত্র রাজীব গান্ধী উত্তরাঞ্চলের ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলদের ট্রয়ের ঘোড়া হিসেবে ব্যবহার করে শ্রীলংকার ওপর আধিপত্য বিস্তারে। আজও শ্রীলংকা গৃহযুদ্ধের দাবানলে জ্বলছে। এই গভীর জাতীয় সমস্যা ও সঙ্কটের কোন কূল-কিনারা করতে না পেরে বিশ্বব্যাপী বহুমিত্র থাকা সত্ত্বেও ইন্দোসেন্ট্রিক দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের উদ্ভাসিত প্রভুত্ব ডকট্রিনের শিকার হয়ে আজ শ্রীলংকা করজোড়ে মিনতি করে তার গৃহবিবাদ মেটানোর জন্য আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে ভারতেরই কাছে। এই প্রার্থনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনও সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়। কারণ রাজীব গান্ধীর আমলে শ্রীলংকায় ভারতীয় শান্তিবাহিনীর প্রবেশ ও অবস্থান খুব সুখকর অভিজ্ঞতার নয়। নেপালকে শায়েস্তা করার জন্য গণতন্ত্রের নামে যে সহিংস আন্দোলনে ভারত প্ররোচনা ও ইন্ধন যুগিয়েছিল, তা নেপালের দেশপ্রেমিক জনসাধারণ শেষ পর্যন্ত সামাল দিতে সক্ষম হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও নেপালের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয় হস্তক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। মালদ্বীপে ভারতীয় সৈন্যদের উপস্থিতি গাইয়ুমের সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রেখেছে। ভুটান রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ লাভ করা সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত বহু অসম চুক্তির ফলে তার কোয়াজি সভরেন অথরিটি এখনও সার্বভৌমত্বের পূর্ণ অবয়ব লাভ করতে পারেনি। তদুপরি ভুটানে প্রচলিত রয়েছে Legal tender হিসেবে ভারতীয় মুদ্রা। প্রতিরক্ষার দায়িত্বে রয়েছে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে দেখ ভাল করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। তবু ভুটানকে দমন করা সম্ভব হয়নি। পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন পাকিস্তানে পারমাণবিক ভারত শত অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক তৎপরতা এবং নিয়োগী ও ক্রীড়নকদের যোগসাজশে অস্থিতিশীলতা ও খণ্ডবিখণ্ডকরণের নীল নকশা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ভারত বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর অস্তিত্ব, অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নির্ভর করছে বাংলাদেশের সিকিমায়ন প্রক্রিয়ার সমূলে সমুৎসাদনের ওপর এবং ভারতীয় খুদকুঁড়োপুষ্ট পরজীবী রাজনীতিকদের মধ্য থেকে একজন লেন্দুপ দর্জি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই গর্ভপাতের ওপর। ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে, স্বার্থ সর্বস্ব পরগাছারা কোন মূল গাছের অবলম্বন ছাড়া বেড়ে উঠতে ও বিকশিত হতে পারে না। কিন্তু ইতিহাস এও শিক্ষা দেয় যে, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, নিপীড়ন ও কুশাসন যখন জনতার ক্রোধকে অবদমিত করতে ব্যর্থ হয়, তখন কুশাসনকে চিরস্থায়ী করার জন্য একের পর এক কালাকানুন ও রাষ্ট্র কাঠামোর বহিঃঅবয়বের যত পরিবর্তন ঘটানো হোকনা কেন, ফ্যাসিস্ট, জুলুমবাজ ও চণ্ডনীতির পূজারী দুর্বৃত্তশাসকের পতন অনিবার্য। ইতিহাস থেকে এ শিক্ষা শেখ মুজিবুর রহমান নিজে নিতে পারেননি, সুতরাং তারই গুণধর কন্যা শেখ হাসিনা নিতে পারবেন কিনা, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। হাসিনা এবং তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠা নষ্ট ও দুষ্ট চক্রের অপচ্ছায়া অসংখ্য শহীদের রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশের নীল আকাশ থেকে বিদূরিত হয়ে স্বচ্ছতার আলো বিকিরণ করতে পারলেই এদেশের সার্বভৌমত্ব পূর্ণতা অর্জনের এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করবে। দেশমনস্ক ও দেশপ্রেমিক সকল মানুষ যত দ্রুত এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন, ততই মঙ্গল এবং আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সত্যিকার অধিকারী আমরা হতে পারব।

www.pathagar.com

১ জুলাই ২০০০

নেতা ও জনতা

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় ৩০ বছর হতে চলল। তিরিশ বছর একটি জাতির জন্য সামান্য সময় নয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল '৪৭-এ, আর একাত্তরে এসে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ২৪ বছর পর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় থেকে আজকের দিনটি পর্যন্ত সময়টা খুব কম নয়। কারণ, ইতিহাসের গতিধারায় প্রায় একরম সময়ের মধ্যেই কোন রাষ্ট্র ভেঙে যায়, কিংবা অস্তিত্ব হারায়। একদা ক্ষমতাধর সভিয়েত ইউনিয়ন সত্তর বছরেরও কিছু বেশি সময়ের মধ্যে ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের চালিকাশক্তি, যে সভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরাশক্তি হিসাবে মর্ত্যলোকে ও নভোলোকে চ্যালেঞ্জ করেছে, সেই সভিয়েত ইউনিয়ন আজ আর নেই। সভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় ৪০ ভাগ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। দেশটি আজ মাফিয়া দস্যুদের করতলে। কারখানার শ্রমিকরা সেখানে মাসের পর মাস বেতন পায় না, এমনকি সৈনিকরা বেতন-ভাতা না পেয়ে তাদের ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ কালোবাজারে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। দেশটির এই করুণ পরিণতি যেকোন চিন্তাশীল মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে। আমরা ইতোপূর্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করেছিলাম। কাজেই এ যাত্রায় তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। তবে সমাজতন্ত্র পরিহার করে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করতে গিয়ে রাশিয়া আজ যে মহাবিপাকে পতিত হয়েছে তার জন্য শুধুমাত্র কোনো তন্ত্রবিশেষকে দায়ী করা সমীচীন হবে না। পাশ্চাত্যে অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে সমস্যাটি হল- ট্রানজিশন (Transition) বা ক্রান্তিকালের সমস্যা। ব্যক্তিমালিকানাবিহীন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ব্যক্তিমালিকানা ও সম্পত্তিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার ক্রান্তিকালে সমাজে যে ভারসাম্যহীনতা ও যথার্থ নীতি ও আইন-কানুনের অনুপস্থিতি দেখা দেয়, তার ফলে এ রকম সমস্যার উদ্ভব হয়। কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করলেও পুরোপুরি সমস্যাটাকে বোঝা হবে না। আইএমএফের অর্থনীতিবিদরা রাশিয়ার অর্থনৈতিক বৈকল্যের জন্য shock therapy (শক-থেরাপী)র পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাস্তবে তা হয়ে গেল অতিরিক্ত শক আর অতিসামান্য থেরাপী। বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন চীফ ইকনমিস্ট প্রফেসর জোসেফ স্টিজলিজ স্বয়ং এই To much shock and too little therapy-র কথা বলেছেন। প্রশ্ন হল, আইএমএফের কতিপয় অর্বাচীন অর্থনীতিবাদ পরামর্শ দিলেন, আর রুশ নেতারা সেটাই বাস্তবায়ন করলেন- এটা কী করে হতে পারে? তাহলে বলতে হয়, এসব নেতারা হয় নির্বোধ, না হয় মতলববাজ। তবে দ্বিতীয়টি হওয়াই অনেক বেশি সম্ভবপর। রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানাগুলোকে পটপরিবর্তনের পর আক্ষরিক অর্থে Stripping বা ফোকলা করে ফেলা হয়। এসব কলকারখানাকে সম্পদহীন করে সুইস ব্যাংকে রাশিয়ান Nomenkletrua গোষ্ঠী সম্পদ পাচার করে। যদি বলি রুশ নেতৃত্বের লক্ষ্য ছিল এভাবে বিদেশে সম্পদ পাচার করা, তাহলে তারা আত্মস্বার্থের বিবেচনায় অর্থনীতিকে যেভাবে পরিচালিত করার দরকার সেভাবেই পরিচালিত করেছে। তাদের এই ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে আইএমএফের পরামর্শ বাড়তি সুবিধা হিসাবে সহায়তা করেছে। এমনও শোনা যায়, আইএমএফের অর্বাচীন অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের সঙ্গে রুশ নেতৃত্বের ব্যক্তিগত স্বার্থের মহাসম্মিলন ঘটেছিল। ফলে আইএমএফের পরামর্শদাতারাও প্রভূত পরিমাণ সম্পদ হাতিয়ে

www.pathagar.com

নেয়। অন্যদিকে গণচীনেও অর্থনৈতিক সংস্কারের মহাযজ্ঞ চলছে। কিন্তু সেখানে রাশিয়ার মতো সমস্যা তো দেখা যায়নি। গণচীন যে একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতিতে পরিণত হবে– এ ব্যাপারে পাশ্চাতের পণ্ডিতরাও প্রায় সবাই একমত। পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি, বিভিন্ন বিশ্ব ফোরামে তৃতীয় বিশ্বের দুটি দেশ চীন ও ভারত জবরদস্ত দর কষাকষি করে। কোনো আন্তর্জাতিক কনভেনশন, treaty বা স্মারকে স্বাক্ষর করার পূর্বে এদেশ দুটির প্রতিনিধিরা রীতিমতো পরীক্ষার্থী ছাত্রের মতো প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর প্রস্তুতি নিয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে আটঘাট বেঁধে দর কষাকষিতে নামায় এই দেশ দুটি জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচণ্ডভাবে লাভবান হয়।

যে WTO (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা)-কে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো অভিশাপ রূপে বিবেচনা করে, সেই WTO- তে চীন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে প্রবেশ করছে। এতে চীনের অর্থনীতি বহুমাত্রিকভাবে লাভবান হবে, আর সেই লাভ কীভাবে আদায় করে নিতে হবে তার পূর্ণ প্রস্তুতি চীন নিয়েছে। পক্ষান্তরে দুঃখজনক ঘটনা এই যে, বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যখন এ ধরনের সংস্থায় অংশগ্রহণ করতে যায় তখন তাদের না থাকে কোন পূর্বপ্রস্তুতি আর যাদেরকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হয়, তাদের থাকে না কোনো বিশেষজ্ঞ জ্ঞান। অতএব, এসব সংস্থার শক্তিধর নেতৃ রাষ্ট্রগুলো যে ধরনের খসড়া বিতরণ করে, সেই খসড়াতে এরা স্বাক্ষর করে আসেন যা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পবিত্র অঙ্গীকারে পরিণত হয়। এরকম সুবিবেচনাহীন সিদ্ধান্তের বিষময় ফল যখন দেখা দেয়, তখন আর কিছু করার থাকে না।

আমরা আলোচনাটা শুরু করেছিলাম, এই কথা বলে যে, বাংলাদেশ বেশ ক'টি বছর অতিক্রম করে এসেছে এবং এই সময়টা জাতির জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান। এই সময়ের প্রায় আড়াই গুণ সময়ে রাশিয়ার মতো মহাশক্তিরও সর্বনাশ ঘটে গেল। আবার এর চাইতেও কম সময়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভেঙে গেল। একাত্তরে যখন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, তখন মালয়েশিয়ায় মাহাথির মোহাম্মদের আবির্ভাব হয়নি। লি কুয়ান ইউ স্বাধীন সিঙ্গাপুরের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে হাল ধরেন ১৯৬৫ সালের ৯ই আগস্ট অথচ এই স্বল্প সময়ের মধ্যে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর Newly Industrialized Country (NIC)- এর প্রথম কাতারে দাঁড়িয়েছে। আমরা যখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, তখন মালয়েশিয়া ও ফিজি থেকে ছাত্ররা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে আসত। আর এখন মালয়েশিয়ার উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের পরম কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তু। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর সময়ের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। গণচীন ও করেছে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এমনটি হল কেন? মালয়েশিয়া মাহাথির মোহাম্মদকে নিয়ে গর্ব করে, সিঙ্গাপুর লি কুয়ান্ড ইউ'র নেতৃত্বে বিশ্বসভায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। গণচীন পেয়েছে মাও সে তুং, চৌএন লাই ও দেং জিয়াও পিং-এর মতো নেতা। তার পাশাপাশি আমরা কাদের পেয়েছি? তাহলে কি এ কথা বলা যায়, একটি জাতির সঙ্গে অপর একটি জাতির উন্নয়নের যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তা বহুলাংশে নেতৃত্বেরই কৃতিত্ব। অর্থাৎ Leadership makes the difference. কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাকের ডগায় তাঁর ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রটিকে নিয়ে সসম্মানে টিকে আছেন। শিশু এলিয়ানকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে সঙ্কট সৃষ্টি হল, সেখানেও ক্যাস্ট্রো সমগ্র কিউবাবাসীকে একট্টা করতে পেরেছেন। প্রশ্নটি শুধু ছোট বালক এলিয়ান আমেরিকায় থাকবে, না কিউবায় ফিরে আসবে নিছক সেই প্রশ্ন নয়; প্রশ্নটি হল, একটি জাতির মর্যাদার। বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি হিসাবে ব্যবহার করা হয়, নির্মমতার দিক ছাড়াও এতে কি জাতি হিসাবে আমাদের চরম অবমাননা হচ্ছে না? এদেশের নারীদের দেহব্যবসার জন্য ভারত, পাকিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্যে যখন পাচার করা হয়, তাতে আমাদের

www.pathagar.com

জাতীয় চেতনার মর্মমূলে কোন আঘাত আমরা বোধ করি কি? জাতি হিসাবে মনে হয়, আমরা সম্বিৎহারা হয়ে পড়েছি। কিছুই আর আমাদের স্পর্শ করে না। সীমান্তে বিএসএফের বর্গীরা যখন এদেশের কৃষকের ক্ষেতের ফসল, হালের গরু লুট করে নিয়ে যায়, এদেশের নাগরিকদের হত্যা করে, শহরে, বন্দরে, জনপদে যখন খুনখারাবি, নারী নির্যাতন, ছিনতাই, রাহাজানি, হাট দখল, বাজার দখল, ঘাট দখল, বাড়ি দখল, ব্যাংক দখল– এমনকি বুড়িগঙ্গার মতো নদী দখল চলতে থাকে, তখন আমরা উট পাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে থাকতে পছন্দ করি। অথবা এতে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতেই নিরাপদ বোধ করি। আজ আমরা এক বিকারগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, আমাদের নেতৃত্বও একইভাবে বিকারগ্রস্ত। তাহলে কি বলতে হবে, এদেশের নেতা ও জনতা উভয়ে মিলেমিশে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পালা করে এখন 'একদল' লুটতরাজ ও নৈরাজ্য চালাবে– পালাবদল হলে আরেক দল তারই পুনরাবৃত্তি করবে, হয়তো অনেক বেশী ক্ষিপ্রতা ও প্রতিহিংসা নিয়ে? আর সবাই বোধ হয় ভেবে নিয়েছে, চক্রাকারে এই প্র্যাকটিস চালিয়ে গিয়ে শেষতক সবাই সমান লাভবান হবে। ঘটনা যদি তাই হয়, তাহলে এ জাতির ভবিষ্যৎ কোথায়?

আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় প্রবেশ করে নিজেকে একটি ব্যর্থ প্রজন্মের সভ্য হিসাবে ভাবতে শুরু করেছি। '৬২-তে আন্দোলন করেছি, '৬৬-তে আন্দোলন করেছি, '৬৯-এ দেশ কাঁপানো গণঅভ্যুত্থান করেছি, '৭১-এ জীবন বাজি রেখে মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়েছি, '৭২-৭৫-এ ভারতের তাঁবেদার খুনি শাহীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করেছি– কিন্তু এতসব করেও Net achievement টা কী? সে কারণেই হতাশাব্যঞ্জক হলেও বলতে দ্বিধা নেই, আমরা এক Failed Generation-এর সদস্য। এই প্রজন্মের বিপুল কর্মশক্তি, প্রাণাবেগ, অশ্রু ও রক্ত-সবই যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে মনে হয়। দিনের পর দিন আমরা সভ্যতা থেকে বর্বরতার পথে পা বাড়িয়েছি। এসব কেন হল? এটা কি শুধু নেতৃত্বের ব্যর্থতা, নাকি জনতারও ব্যর্থতা?

দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন যখন তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত সেনাবাহিনী নিয়ে ইউরোপের সুউচ্চ পর্বতমালা আল্পস অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি গর্বভরে বলেছিলেন, "Look! I am higher than the Alps." মানুষ নেপোলিয়ন নিশ্চয়ই আল্পস পর্বতের চাইতে উঁচু ছিলেন না, কিন্তু আল্পস পর্বতের শিখরে দাঁড়িয়ে নিজেকে আল্পসের চাইতেও উচু ভাবতে পেরেছেন শুধু একারণে যে, তিনি ছিলেন এক সফল দিগ্বিজয়ী বীর। কিন্তু প্রশ্ন, দেশ জয়ে নেপোলিয়নের কৃতিত্ব একা নেপোলিয়নের কী? সেনাপতি নেপোলিয়নের পেছনে সুদক্ষ ও সুসংগঠিত সেনাবাহিনী না থাকলে নেপোলিয়নের পক্ষে 'বীর' হিসাবে পরিচিতি অর্জন করা সম্ভব হতো না। ইতিহাসে তাই যেমন থাকে বীরদের ভূমিকা, তেমনি থাকে জনতার ভূমিকা। আমি এখানে বীর বলতে সকল নেতৃত্বকে বুঝিয়েছি। নেতার উদ্ভব সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই ঘটে থাকে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে ঘাত-প্রতিঘাত হয়, যে অভিজ্ঞতারাশি সঞ্চিত হয়, জনতার অংশ হিসেবে একজন নেতাও সেই একই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নেতার পার্থক্য কোথায়? অভিজ্ঞতা বা ঘটনাকে সূত্রবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কাজেই, নেতার সঙ্গে জনতার পার্থক্য হল সেখানেই, যেখানে নেতা লক্ষ-কোটি জনতার জীবনের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে অভিজ্ঞানে পরিনত করে ও তার সার সঙ্কলন করে সমগ্র জনতাকে সমচেতনায় সংঘবদ্ধ করে কর্মোদ্যোগী হতে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হন। অথচ, একজন সাধারণ মানুষ সে কাজটি পারেন না।

নেতৃত্ব যখন মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণকে সমচেতনায় সুসংবদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়, তখনই আমরা নেতাকে বলি 'জনতার নেতা' আর জনতাকে বলি 'নেতার জনতা'। পৃথিবীর যেসব দেশে এটি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে যেসব দেশ জাতি রাষ্ট্র হিসেবে শক্তিশালী হয়েছে, উন্নত হয়েছে।

www.pathagar.com

দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তার On Politicians প্রবন্ধে লিখেছেন যে, যতই একটি দেশ গণতান্ত্রিক হয়ে যায়, ততই সে দেশের মানুষ তাদের শাসকদের প্রতি কম সম্মান দেখায়। অভিজাততন্ত্র ও বিদেশী দখলদারদের ঘৃণা করা হয়, কিন্তু প্রায়শই অসম্মান করা হয় না। এমনটি আশা করা যায়, একটি জাতি শাসন করার জন্য যাদেরকে নির্বাচিত করবেন তারা সার্বজনীনভাবে প্রশংসা ও ভালবাসার পাত্র হবেন। এ কথা ভাবা যেতে পারে, যারা জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ, জনগণের বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার সূক্ষ্ম ও দায়িত্বশীল কাজটি করার জন্য নির্বাচিত হবেন। কিন্তু সাধারণত তা হয় না। বেশীরভাগ গণতান্ত্রিক দেশে কোন ব্যক্তিকে Politician বলা তাকে গাল দেয়ার শামিল। সমাজ যাদের সম্পর্কে ভাল মত পোষণ করে, তারা বেশীরভাগই ভোটে দাঁড়াতে চান না, আর দাঁড়ালেও ভোটে হেরে যাবেন। যারা সচরাচর ভোটে জয়যুক্ত হন, যাদেরকে বলা যাবে এক ধরনের পেশাজীবী, যে পেশা খুব সুনাম বহন করে না। যেসব দেশ গণতন্ত্রের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করেছে, সেখানে এ ধরনের বৈপরিত্য দেখা যায়নি। বস্তুত, সেকালে এরকম ভাবা যেত না। নতুন গণতন্ত্র সাধারণত বিশাল ব্যক্তিত্বকে সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু, গণতন্ত্র যখন দৃঢ়মূল হয়ে যায়, তখন এরকমটি ঘটতে দেখা যায় না। এটা কেন হয়? রাসেল বলেছেন, এর জন্য সকলের একটি জবাব রয়েছে– এর কারণ হল, 'যন্ত্র' (machinen)। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ জবাব নয়। এ কারণে যে, এ থেকে আমরা বুঝি না, কেন আমরা সকলে মিলে যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করি। শয়তানতুল্য কেউ যদি দলীয় প্রার্থী হিসাবে ভোটে দাঁড়ায় তাহলে তার জয়ের সম্ভাবনা যতটা, একজন ফেরেশতাতুল্য ব্যক্তি যদি নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে ভোটে দাঁড়ান, তার পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনাও ততটা। ব্যাপারটা অদ্ভুত, কিন্তু এটাই বাস্তব। রাসেল এসব কথা বলেছেন।

বাংলাদেশে আমরা অনেক সময়ে বলে থাকি, এবারের নির্বাচনে অমুক দল যদি কলাগাছও দাঁড় করায়, তাহলে সেও জয়ী হবে। রাসেলের বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের এই Folk wisdom-এর বেশ মিল দেখা যায়। কিন্তু রাসেলের যে বক্তব্যের সঙ্গে বাংলাদেশের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, তাহলো, বাংলাদেশ একটি নতুন গণতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও মহান ব্যক্তিত্বে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। বাংলাদেশে কোন মাহাথির নেই, কোন লি কুয়ান ইউ নেই, এমনকি জিন্নাহ, নেহেরুর মতো নেতৃত্বেও আমাদের ভাগ্যে জোটেনি।

তামিল ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি Tiru Valluvar-এর রচনাবলী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তারিখ জানা যায় না। তবে, গবেষকরা মনে করেন, তিনি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে অষ্টম খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে তার কাব্য-সাহিত্য রচনা করেছেন। তার রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ হল 'The Kural'। এতে ১ হাজার ৩৩০টি স্তবক রয়েছে। রাষ্ট্র সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি রাজার যোগ্যতা ও গুণাবলী নিয়ে কিছু বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার মতে, যে রাজার একটি সেনাবাহিনী, প্রজাকুল, খাদ্যসম্ভার, মন্ত্রিকুল, মিত্র এবং দুর্গ–এ ৬টি সম্পদ আছে, সে রাজাই রাজাদের মধ্যে সিংহতুল্য। সাহস, উদারতা, জ্ঞান ও কর্মোদ্যম-এই চারটি হল রাজার আবশ্যক গুণাবলী। Valluvar আরও বলছেন, একজন শাসকের কখনই অধ্যবসায়, শিক্ষা ও বলিষ্ঠতার অভাব থাকবে না। সত্যিকারের রাজা ন্যায়ের প্রতি অবিচল থাকেন, বৃদ্ধি করেন উৎপাদন এবং তার সাহসের কোন ঘাটতি নেই। এমন রাজার অধীনেই একটি দেশ নিরাপদ, যে রাজা ধৈর্য ধরে অপ্রীতিকর কথা শুনতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে একজন তামিল কবি রাজা বা শাসকের গুণাবলী সম্পর্কে যা বলেছেন, তার কতটুকু বাংলাদেশের নেতৃত্বের মধ্যে প্রতিফলিত কিংবা এসব গুণাবলীতে তাদের আগ্রহই বা কতটুকু? Valluvar আরও বলেছেন, সেই রাজাই প্রশংসার যোগ্য, জনগণ খুব সহজে যার কাছে পৌছতে পারে এবং যিনি সংযতভাষী। এসব গুণাবলীও

www.pathagar.com

বা আমাদের নেতৃত্বের কতটুকু আছে? আমাদের নেতৃত্ব কি সংসদে, কি জনসভায় বা সংবাদ সম্মেলনে কিংবা রেডিও-টেলিভিশনের ভাষণে প্রতিপক্ষের প্রতি যে ভাষা ব্যবহার করেন তাতে মনে হয়, জন্মের পর মধুর স্বাদ পাননি।

আবার রাসেলের বক্তব্যে ফিরে আসা যাক। রাসেলের বিশ্বাস, ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ অভ্যাসের দাসে পরিণত হয়। অধিকাংশ ভোটার প্রার্থীর গুণাবলী বিচার না করে তাদের বরাবরের পছন্দের মার্কায় ভোট দেন অথবা তাদের পূর্ব পুরুষদের পছন্দের মার্কায় ভোট দেন। এই বক্তব্যটি যেমন সংস্কারবাদীদের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি রক্ষণশীলদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রাসেল নিজে স্বীকার করেছেন, ইংল্যান্ডের অধিবাসী হিসেবে তিনি লেবার পার্টিকে ভোট দিতেন; কারণ, তার পিতা ছিলেন একজন র‍্যাডিক্যাল। আর তার পিতার র‍্যাডিক্যাল হওয়ার কারণ হল, তার পিতামহ ছিলেন একজন লিবারেল। তার পিতামহের লিবারেল হওয়ার কারণ হল, তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন একজন হুইগ (Whig)। তার হুইগ হওয়ার কারণ হল, তার পূর্ব পুরুষরা অষ্টম হেনরীর সময়ে গীর্জার জমি পেয়েছিলেন। এরকম রাজানুগ্রহের মধ্যে যার radicalism নিহিত, তার পক্ষে কি Conservative হওয়া সম্ভব? রাসেল এটা ভাবতেও পারেন না। রাসেল মনে করেন, অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। আর যতদিন মানুষ অভ্যাসের দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে ততদিন রাজনীতিতে ভাল মানুষের কোন ঠাঁই হবে না। রাসেল তাই প্রশ্ন করছেন, এর কি কোন সমাধান নেই? জবাব হল-আছে। সেক্ষেত্রে অভ্যাসের দাসত্ব থেকে খানিকটা হলেও দূরে সরে আসতে হবে। তার শেষ কথা হল আমাদের মনে রাখা উচিত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পলিটিশিয়ানদের সমালোচনা করা আমাদের নিজেদেরই সমালোচনা করার শামিল। আমরা সে ধরনের পলিটিশিয়ানই পাই, যে ধরনের পলিটিশিয়ানের জন্যই আমরা যোগ্য।

তৃতীয় বিশ্বে জাতিরাষ্ট্র অভ্যুদয়ের পর্যায়ে যে ধরনের বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের কথা আমরা শুনতে পাই, জাতি গঠনের পর্যায়ে তেমনটি আমরা দেখতে পাই না। আহমদ সুকর্ন, জামাল নাসের, বেন বেল্লা, কোয়ামে নক্রুমা, মায় শেষতক নেলসন ম্যান্ডেলা-এরা সবাই বিশাল ব্যক্তিত্ব। উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে এঁদের যে সাফল্য, উপনিবেশোত্তরকালে জাতীয় উন্নয়নে ও জাতিগঠনে তাদের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর। সম্ভবত এ কারণেই বলা হয়, জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টি করার চাইতে জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলা ও সুসংহত করা অনেক বেশি কঠিন কাজ। বিদেশী প্রভুদের বিরুদ্ধে যত চমকপ্রদভাবে এরা জনতাকে সংঘবদ্ধ করেছেন, পরবর্তীতে তেমনটি আর পারেননি।

Clifford Geertz তার *The Interpretation of Cutures* গ্রন্থে বলেছেন, "The transfer of sovereignty from a colonial regime to an independent one is more than a mere shift of power from foreign hands to native ones; it is a transformation of the whole pattern of political life. a metamorphosis of subjects into citizens.' অর্থাৎ যারা ছিল এক সময়ে প্রজা, তাদেরকে নাগরিকে রূপান্তরিত করা এবং পুরো রাজনীতির সংস্কৃতিকে আমূল পরিবর্তিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যে নেতৃত্ব এ কাজটি করতে সক্ষম, তারাই দেশকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে পৌছাতে সক্ষম। প্রজার চরিত্র হল আদেশ মান্য করা, আনুগত্য প্রদর্শন করা, অন্যদিকে নাগরিক সার্বভৌম, ভাল-মন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম এবং সিদ্ধান্তের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। এক কথায় বলা যায়, পুরাতন সমাজের মধ্যে থেকে যে নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, তার জন্য প্রয়োজন নতুন মানুষের। এই নতুন মানুষ দৈহিক গঠনে অবিকল পুরাতন মানুষের মতই, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত। পুরাতন সমাজ থেকে উদ্ভূত নতুন রাষ্ট্রে নতুন মানুষ সৃষ্টি করা খুবই দুরূহ কাজ। এরিস্টটল তাঁর

www.pathagar.com

Politics গ্রন্থে বলেছেন, 'শাসক এবং শাসিতের সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের যে প্রশ্ন, বৃহত্তর প্রশ্নের অংশ হিসেবে এই প্রশ্নগুলোকেও দেখা যায়। বিশেষ করে কথা হচ্ছে, শাসক ও শাসিত এই দু'য়ের গুণ কী এক, না ভিন্ন? ধরা যাক, আমরা বললাম, দু'য়ের গুণ এক এবং উভয়ের ক্ষেত্রে সর্বোত্তমই আবশ্যক, তখন প্রশ্ন দাঁড়াবে, তাহলে শাসক কেবল শাসন করবে এবং শাসিত কেবল মান্য করবে, এর যুক্তি কি? ('পরিমাণগত পার্থক্য' কথাটি এখানে ঠিক হবে না। শাসন করা এবং মান্য করার পার্থক্য গুণগত পার্থক্য। পরিমাণগত পার্থক্য এখানে প্রযোজ্য নয়) অপরদিকে এদের এক পক্ষকে যদি আমরা গুণের অধিকারী বলি এবং অপর পক্ষকে গুণহীন বলি, তাহলে একটি অদ্ভুত অবস্থার উদ্ভব ঘটে। কারণ, একথা যেমন সত্য, যে শাসক তার যদি ন্যায় এবং আত্মসংযমের গুণ না থাকে, সে উত্তমরূপে শাসন করতে সক্ষম হয় না; তেমনি সত্য, যে শাসিত, তারও যদি গুণের প্রশ্নে শাসক এবং শাসিতের এদের উভয়েরই উত্তম গুণের আবশ্যক। অবশ্য গুণের প্রকৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকতে পারে ঃ উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন উত্তম গুণের প্রয়োজন হতে পারে।' এরিস্টটলের উপলব্ধি ও রাসেলের উপলব্ধি বেশ কাছাকাছি। সুশাসক ও সুনাগরিক এ দু'টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সুশাসক যেমন সুনাগরিক সৃষ্টির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে, তেমনি সুনাগরিকও অবশ্যম্ভাবীভাবে অপশাসকের পরিবর্তে সুশাসকের নেতৃত্বকেই বরণ করে নেবে। বাংলাদেশের নেতৃত্বের চারিত্র মার্কসের ভাষায় বলা যায়, 'এরা নিজেদের ওপর আস্থাহীন, উর্ধ্বতনের প্রতি অসন্তুষ্ট, অর্থলোভের সম্মুখে কম্পমান, উভয়পক্ষের প্রতি স্বার্থপর ও সে স্বার্থপরতা সম্বন্ধে সচেতন, রক্ষণশীলদের কাছে বিপ্লবী এবং বিপ্লবীদের কাছে রক্ষণশীল, নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী, আদর্শের বদলে বাগাড়ম্বর প্রিয়, বিশ্বঝঞ্ঝায় আতঙ্কিত, বিশ্বঝঞ্ঝাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে তৎপর। কোন ব্যাপারেই উদ্বেগ নেই এবং প্রতি ব্যাপারেই 'কুম্ভীলক' বৃত্তি, মৌলিকতার অভাবে মামুলি আবার মামুলিপনার ক্ষেত্রে মৌলিক, নিজেদের ওপর আস্থাহীন, জনগণের প্রতি আস্থাহীন, নিজেদের আকাঙ্খা সম্পর্কে দর কষাকষিতে মত্ত; উদ্বেগহীন এবং বিশ্ব ঐতিহাসিক ভূমিকাহীন, একটি বলিষ্ঠ জাতির প্রথম যৌবনের উত্তেজনাকে পরিচালিত ও স্বীয় স্থবির স্বার্থে তাকে বিচ্যুত করতে দায়িত্ব দণ্ডিত এক জঘন্য বৃদ্ধ, চক্ষুহীন, কর্নহীন, দন্তহীন ।' নেতৃত্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে শত শত বাস্তব উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এরই প্রেক্ষাপটে মনে পড়ছে মরহুম বিএনপি নেতা আবদুস সালাম তালুকদারের একটি উক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে আসার পর এক ব্যক্তিগত আলাপে তিনি আমাকে বলেছিলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব থাকবে কী, আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম যাবে, কাল গঙ্গার পানি যাবে, এরপর–দেশ এফোঁড়-ওফোঁড় করে করিডর হবে, তারপর আমরা ক্ষমতায় যাব–এই ক্ষমতায় যাওয়ার কি কোন সার্থকতা আছে? পুতুল দেশের পুতুলরাজা হওয়াতে কোন গৌরব নেই। সে সময়ে জনাব তালুকদার স্বাস্থ্যগতভাবে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলেন, কিছু খেতে পারতেন না, ঘুমাতে পারতেন না। তিনি বলেছিলেন, ক'দিন পর একটু ভাল হলে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সবাইকে নিয়ে একত্রে বসবেন। দেশের দুর্ভাগ্য, তিনি এরপর অল্পক'দিনই বেঁচেছিলেন।

আগামী দিনে যারা দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা ভাবছেন, তাদের মরহুম সালাম তালুকদারের এই অন্তিম ভাবনার কথা জানিয়ে রাখতে চাই। আশা করি বাংলাদেশের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মার্কসের যে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি, তারা যত্নবান হবেন এর উর্ধ্বে উঠতে।

আফতাব আহমাদ :

রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে পুরাকালে মানুষ যখন প্রকৃতিনির্ভর এবং প্রকৃতিদত্ত খাদ্যসামগ্রীনির্ভর জীবন যাপন করত, তখন আধুনিক অর্থে সমাজ বলতে যা বোঝায়, তা অনুপস্থিত ছিল। সংঘবদ্ধ জীবনের নানা চড়াইউতরাই পেরিয়ে কালের আবর্তে মানুষ

www.pathagar.com

সমাজের জন্ম দেয়। এই সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক একটি পর্যায়ে সম্পত্তির জন্ম দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পত্তি ছিল যৌথ বা সামাজিক মালিকানায়। কিন্তু, সমাজ বিকাশের একটি পর্যায়ে সম্পত্তির মালিকানা ও ভোগের প্রশ্নে শ্রমের বিষয়টি যতই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হয়ে উঠুক না কেন, মানুষের মধ্যে বিভেদের জন্ম হয়, যে বিভেদের ফলে মালিকানার প্রশ্নে যৌথ বা সামাজিক মালিকানার অবসান ঘটে এবং এ প্রক্রিয়ার ধারাক্রমেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের জন্ম হয়। মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের নানা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ রয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজের উদ্ভব ঘটে। এই সমাজ যখন শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন অভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা, কর্তব্য ও অধিকার, উৎপাদন ও ভোগ যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত-বণ্টন ও মজুদের বিষয়টি সর্বোপরি জীবনের নিরাপত্তা, অবাধ স্বাধীনতা এবং পরমসুখ যাতে নির্বিঘ্নে সম্ভব করা যায়, তা নিশ্চিত করার জন্যই সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। রাষ্ট্রের সংহতি ও অব্যাহত স্থিতিশীলতার জন্য যে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য, তাকে কেন্দ্র করেই মানুষ যে কর্মকাণ্ডের চর্চা শুরু করেছিল, তাকেই সাদামাটা ভাষায় রাজনীতি বলে হয়ে থাকে। মানুষের জীবন ধারণের জন্য ক্রমাগতভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেমন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, তেমনি উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য ছিল, মানুষের শ্রম। শ্রমের উৎকর্ষ নির্ভর করত নির্দিষ্ট একটি কার্য সম্পাদনের দক্ষতা ও অদক্ষতার ওপর। এসবকিছু অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্য পণ্য, উৎপাদিত সামগ্রীর বিলিবণ্টন, বিতরণ ও ভোগকে কেন্দ্র করে যে শ্রমের বিভাজন ও বিশেষীকরণে বিকাশ ঘটে, রাষ্ট্রের উদ্ভব তারও একটি অপরিহার্য পরিণতি। বস্তুত রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে শ্রমবিভাজন ও শ্রমের বিশেষীকরণের ভূমিকাটি যে মুখ্য ছিল, সে বিষয়ে আজ শীর্ষস্থানীয় সকল সমাজবিজ্ঞানীরা একমত। প্রাকরাষ্ট্রীয় যুগ থেকে শুরু করে আজকের রাষ্ট্রীয় যুগ পর্যন্ত মানুষের সকল কর্মোদ্যোগ ও কর্ম সম্পাদনে একদিকে যেমন যৌথ বা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য, তেমনি অন্যদিকে নেতৃত্বের বা ব্যক্তির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ–ক্ষেত্র বিশেষে অপরিহার্য। জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী মানুষের যত রকমের চাহিদা ও প্রয়োজন রয়েছে তা পূরণের জন্য মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সবসময়েই অব্যাহত থেকেছে। এই প্রচেষ্টারই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হচ্ছে নানান ধরনের এবং নানান চরিত্রের সংগঠন। উৎপাদনের জন্য সংগঠন, বণ্টনের জন্য সংগঠন, বিপণনের জন্য সংগঠন, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিয়মকানুন প্রবর্তনের সংগঠন, নিয়মকানুন যে পালিত হচ্ছে তার তদারকির জন্য সংগঠনসহ মানুষের পার্থিব সকল বিষয়কে কেন্দ্র করেই সংগঠনের প্রসার এখনো অব্যাহত রয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনটি হচ্ছে সর্বোচ্চ সামাজিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র ও সমাজের স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য সংরক্ষণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা-তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা সংগঠন হচ্ছে রাজনৈতিক দল। যত রকমের সংগঠনের কথাই আমরা বলি না কেন, নেতৃত্ব বা ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকাকে লঘু করে দেখার কোন অবকাশ নেই। একটা সময় ছিল, যখন উৎপাদন এবং শ্রমের সম্পর্ক নির্ণয় করতে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনসহ রাষ্ট্রের স্বরূপ অর্থাৎ নিয়ামক শক্তি ছিল অর্থনীতির। কালের আবর্তে এবং মানব সভ্যতাব্যাপী অঞ্চলে অঞ্চলে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশের তারতম্য ও বৈষম্যের ফলে অর্থনীতির পরিবর্তে রাজনীতি তথা ক্ষমতার চর্চা মুখ্য হয়ে ওঠে। অনুন্নত, দুর্বল ও পশ্চাৎপদ তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মন্থর বিকাশ এবং অর্থনীতির শ্লথ গতি, সম্পদের অভাব বা স্বল্পতা এবং সে জন্য তৃতীয় বিশ্বে যেসব রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সেগুলোকে বলা হয় আপেক্ষিক অর্থে অত্যুন্নত রাষ্ট্র। রাষ্ট্র, ক্ষমতা, সমাজ ও রাজনীতি এই ৪টি উপাদান এমনভাবে পরস্পরের সাথে সূত্রবদ্ধ বা সম্পর্কিত যে, Viable সংগঠন ছাড়া এসবের সমন্বয় ও সমীকরণ সম্পাদন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আর সংগঠন মানেই হচ্ছে পারৎক্রম (hierarchy) অর্থাৎ শীর্ষবিন্দুতে যে ব্যক্তি অবস্থান গ্রহণ করেন, সকল কর্মোদ্যোগের দায়

www.pathagar.com

বা নেতৃত্বে তারই ওপর অর্পিত হয়। নেতৃত্ব কোন বিমূর্ত বিষয় নয়। একজন ব্যক্তি স্বীয় গুণাবলী ও যোগ্যতার বলে নেতৃত্বে সমাসীন নন, আবার ক্ষেত্র বিশেষে সংগঠনের ভেতরকার টানাপড়েনে যোগ্যতা কিংবা গুণাবলী রহিত ব্যক্তিও নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

সমাজবিকাশের ধারায় শ্রেণীস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থ যে কত গুরুত্বপূর্ণ, ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে, তা মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করা যায়। পৃথক পৃথক ভূখণ্ডে সমাজবদ্ধ মানুষ যখন থেকে পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়, তখন সেসব রাষ্ট্রেরও পৃথক পৃথক স্বার্থের জন্ম হয়। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সম্প্রীতি-সহযোগিতা এবং আপস ও সমর্পণের নানা ধরনে গূঢ় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাও রাজনীতির বিষয়বস্তু। অর্থাৎ প্রতাপ-প্রতিপত্তি, প্রাধান্য ও প্রাবল্য সম্প্রাসারণ ও আধিপত্য কিংবা সংগ্রসন অথবা দূরত্ব রক্ষাকারী নিঃসঙ্গতা এসবই রাষ্ট্র-রাষ্ট্র সম্পর্কের ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক এবং সম্পর্কের সূত্রগুলোকে যথোচিতভাবে অনুধাবন করতে হবে। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা নেতৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

আমাদের আজকের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শিল্পোন্নত বিশ্বে এবং নব্য শিল্পায়িত দেশসমূহে সৃজনী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ যেভাবে তাদের নিজ নিজ দেশের নেতৃত্ব দিয়ে সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন, সে তুলনায় উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত দেশসমূহে নেতৃত্বের দুর্ভিক্ষ এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে অভিন্ন চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাজমান দৈন্য কিভাবে আমাদেরকে ক্রমাগত অধঃপাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে—এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশেষভাবে আলোচনা দাবী রাখে।

আমরা ব্যক্তি-বিশেষের অন্ধ মোহে আবেগ, স্বতস্ফূর্ততার কারণে যখন গণহত্যার শিকারে পরিণত হই, তখন সংগঠিত সংঘশক্তি নিয়ে কোন রাজনৈতিক দল এগিয়ে আসেনি। কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্খা এবং প্রতিরোধের স্পৃহা আমাদের মধ্যে যে অদৃশ্য সংযোগ স্থাপন করেছিল, তাই ছিল আমাদের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মূল শক্তি ও প্রণোদনা। সামরিক বাহিনীর মধ্য থেকে জিয়াউর রহমানের সময়োচিত স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল নেতৃত্বহীন জনগোষ্ঠিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে যে ভীরু নেতৃত্ব আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিয়েছিল, তারাই সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদী ভারতের সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতা কবজা করে নেয়। এই ভীরু নেতৃত্ব এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি কখনো দেশ ও জনগণকে জাতিগঠন ও রাষ্ট্রগঠনের কোন সমাজদর্শন উপহার দেয়া তো দূরের কথা, অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলার নূন্যতম দিক নির্দেশনা দেয়ার মত কোন গুণের অধিকারীও ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই এই পররাষ্ট্রনির্ভর, সমর্পণবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে জবরদস্তি ও বিকৃতি সাধন করে, তার দুর্ভোগ আজও এই জাতিকে পোহাতে হচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় মনে হয় স্বতস্ফূর্ততা ও আবেগ রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমরা যদি ব্রিটিশ ভারতের কথা বিবেচনা করি, মতিলাল নেহরুর পুত্র জওহর লাল নেহরু পিতৃগুণের উত্তরাধিকারী হিসেবে ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ নেননি। স্বীয় যোগ্যতা ও মেধার বলেই তিনি রাজনীতিতে তার স্থান করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ থেকে অনেকের কাছেই মনে হয়েছে, রাজনীতিতে শীর্ষস্থানে উত্তরণের অন্যতম মূল পন্থা হচ্ছে আদর্শের পরিবর্তে রক্তের উত্তরাধিকারী হওয়া। এ ধরনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা গেছে, চিন্তার দৈন্য, পেশী ও অসৎ অর্থনির্ভরতা এবং তাৎক্ষণিক প্রাপ্তিযোগ। এ ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাঁরা রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁরা অনেক সময় দেশ ও জাতির ভাগ্য বিধাতায় পরিণত হন, অথচ অক্ষমতার কারণে দেশ ও জাতিকে কিছুই দিতে পারেন না। উপরন্তু যারা প্রাজ্ঞ, বিদ্বান ও ধীশক্তিসম্পন্ন তারা যাতে রাজনীতির

www.pathagar.com

চৌহদ্দীতে প্রবেশ করতে না পারেন, এসব অধঃপতিত রাজনীতিকরা তার পাকা বন্দোবস্ত করে রাখে। সম্ভবত এ কারণেই বোঁদলেয়ার বলেছিলেন "Politics is the profession of the scoundrels." আলবেয়ার ক্যামু আরও চমৎকারভাবে বলেছেন, "Politics and the fate of mankind are formed by men without ideals and without greatness. Those, who have greatness within them do not go in for politics." বিশ্ব ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব, যারা ইতিহাসে বীর এবং দিগ্বিজয়ী হিসেবে পরিচিত, তাঁদের জ্ঞান এবং অধীত বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রভূত বুৎপত্তি ছিল। বিনয়, সহৃদয়তা এবং ঔদার্যের গুণাবলীতে তারা পরম শত্রুকেও মিত্র হিসেবে আলিঙ্গন করতে বৃহত্তর ও জাতীয় স্বার্থে দ্বিধা করেননি। এর সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ২০ বছর ধরে বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকার হওয়া সত্ত্বেও নেলসন ম্যান্ডেলা জাতি গঠনের প্রয়োজনে এবং রাজনৈতিক সঙ্গতি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে অতীতকে পেছনে ফেলে দিয়ে অগ্রগতির দিকে এগুবার জন্য যেভাবে জাতীয় সদ্ভাবের (National Reconciliation) রাজনীতির উদ্বোধন করেছেন। মহামতি আলোকজান্ডারের কথাই না হয় বিবেচনা করা যাক। জানা যায় যে, তখনকার দিনে মিসরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে দুটি মজবুত রজ্জুকে এমনভাবে গিঁট দেয়া হয়েছিল যে, তা কারও পক্ষেই খোলা সম্ভব ছিল না। কিংবদন্তির কথিত জনশ্রুতি ছিল, যে ব্যক্তি এই গিঁট বা গেরো (Gordian knot) খুলতে পারবেন, তিনি শুধু বীর হিসেবেই স্বীকৃতি পাবেন না, দিগ্বিজয়ীও হবেন। কথিত আছে যে, আলেকজান্ডার মিসরের ঐ স্থানে উপনীত হয়ে এই Gorian knotটি খোলার প্রাণপণ চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন, তখন তিনি অতি ক্ষিপ্রতার সাথে অশ্বারোহণ করে উন্মুক্ত তরবারি দ্বারা সেই Gordian knotটি কিভাবে কিভাবে খুলতে হবে তা দেখিয়ে অদম্য সাহসেরই পরিচয় দেন। কারণ, কিংবদন্তির জনশ্রুতিতে কোথাও Gordian knotটি কিভাবে খুলতে হবে, তার উল্লেখ ছিল না। হাতে খুলতে না পেরে তরবারিকেই তিনি সমাধান হিসেবে গ্রহণ করলেন। কারণ, তিনি নিজেকে একজন অনন্যসাধারণ বীর এবং বিশ্বের অধিপতি হিসেবে ভাবতেন। আর সে কারণেই তার সেই বিখ্যাত উক্তি "Heaven cannot brook two suns, nor earth two masters" অর্থাৎ উর্ধ্বালোকে যেমন দু'টি সূর্যের অবস্থান ভাবা যায় না, তেমনি ধরিত্রীরও দু'জন প্রভু থাকতে পারে না। এর পরের ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা। এহেন আলেকজান্ডার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে কতটা গুরুত্ব দিতেন, তা তার এই উক্তি থেকেই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যাবে : "I assure you, I had rather exceled others in the knowledge of what is excellent, than in the excellence of my power and dominion" অর্থাৎ আমি এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আমার ক্ষমতা এবং আধিপত্যের পরিধির তুলনায় যা উৎকৃষ্ট–জ্ঞান সাধনায় বুৎপত্তি অর্জনকেই বেছে নেব।

নেতৃত্বের গুণাবলীর মধ্যে চর্চা বা ভোগের প্রশ্নে এই ধরনের মানসিকতা যে কত অপরিহার্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, Aldous Huxley স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "There is no substitute for talent, industry and all the virtues are of no avail" অর্থাৎ মেধার কোন বিকল্প নেই। কর্মঠ হওয়া এবং অপরাপর যত সদগুণই থাকুক না কেন, তা কোন কাজে আসবে না। দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিকে যদি আমরা তাকাই, এর যথার্থতা উপলব্ধি করা সম্ভব। আমাদের ছোট এই দেশটিতে আজ যারা সমাজের উর্ধ্বতন স্তরে সমাসীন রয়েছেন, এদের অধিকাংশই '৪৭ এবং '৭১-এর যে লুটেরা-দুর্বৃত্ত রাজনীতি আমাদের সকল শ্রেয়বোধ ও সুনীতিকে আচ্ছন্ন করে কেবলমাত্র অর্থ-বিত্ত এবং প্রতিপত্তির জন্য নীতিবিবর্জিত অন্ধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তাঁরা তারই জন্ম দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

তারই বিষময়ফল আজ আমাদের সমাজ ভোগ করছে। বিত্ত এবং ক্ষমতাকে করায়ত্ত করার জন্য এক প্রাণঘাতী ও আত্মঘাতী পথে আজ সকলেই দৌড়াচ্ছে অর্থের সন্ধানে। হাসিনা সরকারের আমলে শেয়ার বাজারে ধস নামার আগে মতিঝিল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যে কল্পনাতীত জনসমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে D. H. Lawrence-এর ভাষায় বলতে হয় "Money is our madness, our vast collective madness." এই যৌথ উন্মাদনা অর্থনীতিতে কোন অবদান তো রাখতেই পারেনি, উল্টো ভারতীয় বেনিয়াদের যোগসাজশে তাদের এদেশীয় চর ও নিয়োগীরা দেশের বিপুল অর্থ ভারতে পাচার করে দেয়ার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

ভারতে নেহরুর পর স্বল্পমেয়াদীদের জন্য লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ক্ষমতায় থাকলেও তার মৃত্যুর পরপরই দুই যুগ-ধরে শাসনকার্য চালিয়ে এসেছিলেন নেহরুকন্যা ইন্দিরা। পাকিস্তানে ভুট্টোকন্যা বে-নজীর পিপলস পার্টির নেতৃত্বই শুধু কবজা করেননি– দু দু'বার প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শ্রীলংকায় বন্দরনায়েকে নিহত হওয়ার পর তার স্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে রাষ্ট্রের হাল ধরেছিলেন এবং তাঁর পুত্র অনূঢ়া বন্দরনায়েকেকে ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রস্তুত করার পালা শুরু করা সত্ত্বেও শ্রীলংকার জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করে ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী দলের নেতৃত্বে সমাসীন প্রধান দুই ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারের রাজনীতির সৃষ্টি বলা হলেও হাসিনার ক্ষেত্রে যে সত্য প্রযোজ্য, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

হাসিনা স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকাকালীন সময়ে স্বল্পকালের জন্য ইউরোপে অবস্থান করেছিলেন (পিতৃহত্যার বিচার চেয়ে কোন আন্তর্জাতিক আদালত বা কোন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রসংঘের কোন সংস্থার কাছে ফরিয়াদ করে আবেদন-নিবেদন করা থেকে নিবৃত্ত থাকেন)। তারপর অধিকাংশ সময়েই তিনি ভারতে অবস্থান করেছেন এবং তার স্বামীর প্রকাশিত গ্রন্থের সূত্রানুযায়ী ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-এর ভাড়া করা বাড়িতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সময়ে হাসিনার ভূমিকা ছিল ধূর্ততার সঙ্গে হেয়ালী ও রহস্যের জাল বুনে গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে বানচাল করে দেয়ার অপচেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকা। অপরদিকে,দেশনেত্রী খালেদা জিয়া যখন জাতীয় রাজনীতির হাল ধরলেন, তার আগমুহূর্ত পর্যন্ত রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি যথেষ্ট রাজনীতি সচেতন ও সমাজমনস্ক ছিলেন। তার ছিল নিখাদ দেশপ্রেম এবং দেশের মানুষের প্রতি ছিল ঐকান্তিক ভালবাসার নিষ্ঠা। এসব গুণাবলীর কারণে তিনি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আপসহীনভাবে লড়াই করে 'দেশনেত্রী' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। স্বামী জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পর জিয়ার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য এবং জিয়ার জাতি গঠনের ক্ষেত্রে তার রাষ্ট্র ও সমাজ দর্শনকে বাস্তবায়নের জন্য আধিপত্যবাদ বিরোধী সকল সামাজিক শক্তির আকুতিতে বেগম জিয়া সাড়া না দিয়ে পারেননি। তাঁর নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং স্পষ্টবাদিতা তাঁকে জনতা নিরলস আপোসহীন সংগ্রামে বিজয়ের বরমাল্য দিয়ে পুরস্কৃত করেছে, যার পরিণতিতে তিনিই হয়েছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। হাসিনার উত্তরাধিকারের রাজনীতি হচ্ছে প্রতিহিংসা ছড়ানো ও প্রতিশোধ পরায়ণতার রাজনীতি। পক্ষান্তরে খালেদা জিয়ার রাজনীতি হচ্ছে দেশ গঠন, জাতীয় নিরাপত্তাকে নিশ্চিতকরণ, রাষ্ট্রের অবিভাজ্যতাকে সংরক্ষণ এবং সাধারণ মানুষের সুখ ও স্বস্তির জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা হিসেবে ডালভাতের ব্যবস্থা করার রাজনীতি। আমাদেরকে এই গুনগত পার্থক্য বুঝতে হবে। তবে আমাদের রাজনীতি কিভাবে ক্রমান্বয়ে কলুষিত হয়ে পড়েছে এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দেশের ভেতরের তাদের চর ও নিয়োগীদের দ্বারা সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য নিয়ে যে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের সূচনা করেছে, তা যে কোন দেশপ্রেমিক মানুষকেই ভাবিয়ে তুলতে বাধ্য। আজ ভারতীয় স্বার্থকে সংরক্ষণ করার জন্য এদেশে ক্ষমতাসীনরা যে

www.pathagar.com

নীতি ও শিষ্টাচার বিবর্জিত রাজনীতির প্রবর্তন করেছে সে সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত Henry Brooks Adams বলেছিলেন, "Politics, as a practice, whatever its professions, has always been the systematic organination of hatreds" এবং এ ধরনের পরিস্থিতির কী পরিণত হতে পারে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পরবর্তীতে যিনি দ্বিতীয় প্রসিডেন্ট হয়েছিলেন সেই John Adams ১৮১৪ সালের ১৫ এপ্রিল John Tailor-কে লিখিত এক পত্রে বলেছিলেন, "Demoracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy, that did not commit suicide" বাংলাদেশের গণতন্ত্র আজ তেমনি আত্মহননের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই সকল প্রলক্ষণ থেকে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীর একত্রীকরণের ক্ষেত্রে যিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেই রাষ্ট্রনায়ক বিসমার্ক জার্মানীর একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক Waldec-এর সঙ্গে আলোচনাকালে ১৮৬৭-এর ১১ আগস্ট বলেছিলেন, "Politics is the art of the possible"কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা ও সংহতি বিনষ্ট করার জন্য চারদিকে যে রাষ্ট্রঘাতী তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাকে সময় থাকতে প্রতিহত করা না হলে আমাদের জন্মলাভই বৃথা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্লেটো বলেছেন, "Man was not born for himself, but for his country" তিনি আরো বলেছেন, "Our object in the constuction of the state is the gretest happiness of the whole, and not that of any one class" ভারতের মদদপুষ্ট হয়ে অভিশপ্ত ২৩ জুন ১৯৯৬-এ যে রাষ্ট্রঘাতী চক্র বাংলাদেশে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, তাদের লুণ্ঠন, তাদের দলীয়করণ, তাদের প্রবর্তিত পরিবারতন্ত্র এবং কার্যত একদলীয় যে স্বৈরশাসন আজ এদেশের বুকে জেঁকে বসেছে তাকে সমূলে সমূৎসাদন করতে হলে প্রয়োজন এক ঐক্যবদ্ধ সম্মিলিত নিরপস গণআন্দোলনে, যে গণআন্দোলন, যথেচ্ছচারী পরিবারতন্ত্রের প্রধান শেখ হাসিনাসহ ভারতের কৃপাপুষ্ট আওয়ামী লুটেরা, তস্করেরা খড়কুটোর মত ভেসে যাবে। কেবলমাত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সত্তা ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করা সম্ভব। মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক থমাস জেফারসন ১৯৮৭-র নভেম্বরের একপত্রে চমৎকারভাবে বলেছিলেন, "The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. It is its natural manure." গণসংগ্রামের মাধ্যমে স্বৈরাচারী উৎপীড়ককে উৎখাত করতে হলে সেই উৎপীড়ক এবং দেশপ্রেমিকদের রক্তের প্রয়োজন যে রক্ত, স্বাধীনতা নামক বৃক্ষের তা স্বাভাবিক সার। আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব, আমাদের বিদ্যুৎজনরা এবং সমাজের সর্বস্তরের দেশমনস্ক নাগরিক যত গভীরভাবে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, নেতৃত্বের, চরিত্রের এবং গুণাবলীর কাংক্ষিত রূপান্তরের পালা সূচিত হবার পথ তত প্রশস্ত হবে এবং উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির পথে আমরা সযত্নে পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হব। আমাদের আজ প্রয়োজন একদিকে ক্যারিশমা আরেকদিকে মেধা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ে এমন এক সামাজিক আন্দোলনের জন্ম দেয়া যা সকল গণবিরোধী মতলববাজী তৎপরতাকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হবে। প্রখ্যাত ব্রিটিশ বাগ্মী Edmund Burke-এর স্মরণীয় উদ্ধৃতি দিয়ে উপসংহার টেনে বলতে চাই :"When bad men combine, the good must associate: else they will fall, one by one, and unpitted sacrifice in a contemptible struggle" খারাপ লোকেরা যখন একত্রিত হয়, তখন সজ্জনদের ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে, অন্যথায় এই ঘৃণ্য সংঘাতে সজ্জনদের প্রত্যেককে একেক করে সকরুণ বলির শিকার হবেন।

www.pathagar.com

৮ জুলাই, ২০০০

সেক্যুলারিজম ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য

মাহবুব উল্লাহ :

রাজনীতি হবে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন- এরকম একটি মতবাদ আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করে আসছেন। এরকম গভীরতাশূন্য বিবৃতি দিয়ে তারা নিজেদেরকে প্রগতিবাদের ধারক হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশী জটিল। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের যোগসূত্র বহুমাত্রিক। প্রথমত, বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে আমরা যে জাতিরাষ্ট্র দেখতে পাই, তার সঙ্গে ধর্মের মিথস্ক্রিয়া বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, ধর্ম আন্তর্জাতিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাদির ওপর এর রয়েছে বিশাল প্রভাব। তৃতীয়ত, ধর্মীয় সংঘাত ও রাষ্ট্রের মূল্যবোধের ভিত্তিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতা প্রদান করা হয়, এবং এর ফলে ভোটাধিকার প্রয়োগ ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ওপর সুগভীর প্রভাব সৃষ্টি হয়। চতুর্থত, রাষ্ট্রের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পঞ্চমত, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে আচরণ করেন, তার সঙ্গে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের একটা সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য, এ দু'টি বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক কোন ব্যাপার নয়। এদের একের অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে।

আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে। ইউরোপের জাতিরাষ্ট্রসমূহের ভিত্তি ছিল ভাষা ও সংস্কৃতি। জার্মানী, ইতালী, নরওয়ে এবং পোল্যান্ড প্রভৃতি জাতিরাষ্ট্র আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের মধ্যদিয়ে আত্মসচেতনতা অর্জন করে। ধর্মীয় বিশ্বাসকে এই আত্মসচেতনতার অতিরিক্ত অনুষঙ্গ হিসেবে বিচার করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পোল্যান্ডে ক্যাথলিক ধর্মীয় বিশ্বাস জাতীয় ভাবধারার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদিও এর ফলে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইতালীর ক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, ইতালীর ঐক্যবদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে পাপাল স্টেটগুলোর (Papal states) ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়বাদের ভিত্তি ছিল উদারনৈতিকতাবাদ। ফলে পোপের রক্ষণশীলতাবাদের বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে জাতীয়তাবাদ দাঁড়িয়েছিল। ইতালীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটরা ক্ষমতায় আসে। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক রাজনৈতিক মতবাদ ক্যাথলিক ধর্মীয় মতবাদ ও উদার গনতান্ত্রিক মতবাদের এক সফল সংমিশ্রণ। ক্রিশ্চিয়ানরা ক্ষমতায় আসার পর চার্চের পক্ষে ইতালীর রাজনীতিতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ সম্ভবপর হয়।

অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয় একান্তভাবেই ধর্মভিত্তিক কিংবা আদর্শভিত্তিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রোটেস্ট্যান্ট নেতৃত্ব সত্ত্বেও আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদ ক্যাথলিক মতবাদের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়েছিল। বর্তমান উত্তর আয়ারল্যান্ডে রাজনৈতিক বিভাজন ও ধর্মীয় বিভাজন সমান্তরাল। একটি দেশে ধর্মীয় বিভাজন তীব্র হলেও ভাষাগত ঐক্য জাতিকে সংহত রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মানীতেও তাই হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার্চকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক রাখা হয়েছে। আমেরিকার সংবিধান যখন প্রণয়ন করা হয়, তখন আমেরিকার জনগোষ্ঠি প্রধানত প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের অনুসারী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাথলিক ও ইহুদী

www.pathagar.com

ধর্মাবলম্বীরা ব্যাপকভাবে অভিবাসন শুরু করে। জাপান প্রধানত একটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ। ১৮৮৯ সালে জাপানে যে মেইজি সংবিধান রচিত হয়, সেই সংবিধানে শিন্টু আচার-আচরণকে জাতীয় ভাবধারা হিসেবে সংবিধিবদ্ধ করা হয় এবং এর পাশাপাশি ধর্মীয় স্বাধীনতাকেও নিশ্চিত করা হয়। জাপানী ভাষায় যাকে বলা হয়, ককুতায়ি বা জাতীয় নির্যাস, সেই জাতীয় নির্যাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল শিন্টু আচার-আচরণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোমান ও হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্য ভেঙে যায় এবং নতুন নতুন ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই ভাঙনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য পরিণতি হল, ইহুদীদের জন্য একটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিশ্চিত করা। ইহুদীবাদী আন্দোলনকে পাশ্চাত্যে ইহজাগতিক এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই, ধর্মীয় প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে ইহুদীবাদ বিবেচনা করা যায় না। ইহুদীদেরকে একটি ভিন্ন জনগোষ্ঠি হিসেবে চিহ্নিত করার মূল কারণই ধর্ম বিশ্বাস। ইউরোপে সর্বত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদের সূচনাপর্বে ছিল অসন্তুষ্ট। প্রাক আধুনিক ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা এর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। লুথারিয় ও ক্যাথলিক ইহুদী বিদ্বেষের পেছনে মূল কারণ ছিল ইহুদীগণ কর্তৃক ওল্ড টেস্টামেন্টের খৃস্টীয় ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান। উপনিবেশবাদের বিস্তারের ফলে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়, সে আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মের নানামাত্রায় আপেক্ষিক সম্পর্ক ছিল। সর্ব আরব জাতীয়বাদ (Pan Arab Nationalism) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কাছাকাছি অবস্থানে ছিল। ব্রিটিশ ভারত ছিল নানা জাতি, নানা বর্ণ ও নানা ধর্মের দেশ। ব্রিটিশ ভারত যাতে বিভক্ত থাকে, সেজন্য আধুনিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী নেতৃত্ব হিন্দু মতাদর্শের এক নতুন ব্যাখ্যা হাজির করে। এই মতাদর্শের মূল কথা হল, অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা এবং একই সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য নানা পথ বিদ্যমান। এ ধরনের বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছিল বহুধাবিভক্ত ভারতীয় জনগোষ্ঠিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে। ভারতীয় সংবিধান এই বহুর অস্তিত্বকে মেনেই রচনা করা হয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও তফসিলী সম্প্রদায়কে সাংবিধানিকভাবে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেবার ফলে হিন্দু জাত্যাভিমানের পুনরুত্থান হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিংয়ের আমলে তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য বর্ধিত কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয় বিবেচিত হবার পর ভারতের বর্ণহিন্দুরা প্রবল প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা প্রতিবাদের চরম পন্থা হিসেবে নিজদেহে অগ্নিসংযোগ করে আত্মাহুতিও প্রদান করে। একই ধর্মে বিশ্বাসী কিন্তু সেই ধর্মের নিম্নবর্ণের প্রতি এরূপ প্রকট বিদ্বেষ হিন্দু ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে দেখা যায় না। ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারত-মাতার অঙ্গচ্ছেদ রোধ করতে গিয়ে হিন্দু ধর্মের উদার ব্যাখ্যা হাজির করা সত্ত্বেও ভারত-মাতার অঙ্গচ্ছেদ রোধ করা যায়নি। মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে মুসলমানরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবধারা প্রবল হয়ে ওঠে। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবধারার ভিত্তি ছিল ভাষাগত পরিচয়। ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভাজন রোধ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের উদ্ভবের পরপরই বাংলাদেশীরা নিজেদের ইসলামী পরিচয়কে আরও প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন অনুভব করে। কারণ, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য নতুন হুমকি হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল হিন্দু আধিপত্যবাদী ভারত, যে ভারত বাংলাদেশ সৃষ্টিতে 'সমর্থন' দিয়েছিল।

ইসলামের সঙ্গে যখন জাতীয়তাবাদী অনুভূতির সংশ্লেষণ ঘটে, তখন ইসলাম অত্যন্ত গতিশীল ধর্মীয় মতবাদে পরিণত হয়। ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে যে বিপ্লব হয়েছে, সেই বিপ্লব ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের অপূর্ব সংমিশ্রণের ফলাফল।

www.pathagar.com

ইরানে যখন শাহ বিরোধী বিপ্লব প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে, তখন আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করছিলাম। সেখানে ইরানে বিপ্লবের পক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শনরত ইরানী প্রবাসী নেতৃত্বের বক্তব্য শ্রবণের সুযোগ আমার হয়েছিল। ঐসব অনলবর্ষী বক্তারা ইরানের দুঃখ-দুর্দশা ও অনগ্রসরতার জন্য একদিকে দায়ী করত শাহের শাসনকে এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ধনী দেশগুলোর উপর নির্ভরশীলতাকে। তারা যখন এই নির্ভরশীলতার ব্যাখ্যা দিত, তখন তাদের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে নব্য মার্কসবাদী Dependency theory (নির্ভরশীলতা তত্ত্ব)-এর কোন পার্থক্য একজন অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে আমি দেখতে পাই নি। তারা বলত, ইসলামী মতাদর্শকে মেনে নিলে এই নির্ভরশীলতার জাল থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। ইরানী বিপ্লবের মতাদর্শগত ভাবধারার জনক ছিলেন ডক্টর আলী শরীয়তী। তিনি ইসলামের এই র‍্যাডিক্যাল ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যাখ্যা তুলে ধরেছিলেন। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, জিন্স পরা আধুনিকা আমার ইরানী সহপাঠী ছাত্রীরা খোমেনীর মতবাদের প্রতি বিপুল আস্থা প্রদর্শন করত। একটি জাতির মনোজগতের এসব দিকগুলো আমাদের দেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবি হয় প্রত্যক্ষ করেন না, অথবা তাদের অপছন্দের বলে এগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চান না। অথচ বাস্তবতা বাস্তবতাই। একে অস্বীকার করে আর ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মধ্যে পাপাচার আবিষ্কার করে আর যাই করা সম্ভব হোক না কেন, সমাজের মানুষকে বোঝা যাবে না এবং সমাজের কাঙক্ষিত পরিবর্তনও আনয়ন সম্ভব হবে না।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত অনেক দেশেই মার্কসবাদীরা ক্ষমতায় এসেছে। মার্কসবাদী মতাদর্শ ধর্মের প্রতি প্রচন্ড অনীহা প্রদর্শন করে। ফলে এসব দেশে ঐতিহ্যবাহী ধর্মবিশ্বাস হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। তিব্বত চীনের একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। তিব্বতী জনগোষ্ঠির চেতনার মর্মমূলে রয়েছে ধর্ম বিশ্বাস, ভাষা ও সংস্কৃতি। কমিউনিস্ট চীনের পক্ষেও তিব্বতের ধর্মীয় চেতনাকে আনুষ্ঠনিকভাবে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। তাই চীন সরকারীভাবে একজন তিব্বতী লামাকে আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে স্বীকার করে। অন্যদিকে মুসলিম অধ্যুষিত উইঘর অঞ্চল চীনের জন্য প্রচণ্ড মাথাব্যথার কারণ। আমরা গণচীনের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও চীনের রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রতি এসব বিভাজনমূলক হুমকি অস্বীকার করতে পারি না এবং গণচীনের নেতৃত্ব যত সঠিকভাবে রাষ্ট্রের ভেতরকার এসব দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন, ততই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের ধার ভোতা হয়ে যাবে। শ্রীলংকায় ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা অর্জনের অনতিকাল পরেই শক্তিশালী সিংহলি বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৯৫৬ সালে সলোমন বন্দরনায়েকে কেবলমাত্র সিংহলি ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়ে তার রাজনৈতিক প্রচারণা চালান। কিন্তু ভাষার প্রতি এই অত্যুৎসাহী দৃষ্টিভঙ্গির মূলে ছিল মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ রাষ্ট্রের গৌরবকে পুনর্জাগরিত করা। এ কারণেই তামিলদের সঙ্গে সিংহলিদের সম্পর্কের অবনতি হয় এবং শ্রীলঙ্কায় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। তামিলারা হিন্দু ধর্মালম্বী। এছাড়া শ্রীলঙ্কায় কিছুসংখ্যক ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীও রয়েছে। শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধদের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বীর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অবশ্য স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

ধর্মের সার্বজনীন মূল্যবোধ অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম। লাতিন আমেরিকায় ক্যাথলিক লিবারেশন থিওলজীর একটি বৈপ্লবিক ও পুনর্গঠণবাদী ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বের নানা দেশে আমরা ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করি। সিরিয়া ও মিসরে ইসলামের ব্রাদারহুড আন্দোলন, আফ্রিকায় স্বাধীন গির্জার উদ্ভব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন খ্রিস্টীয় রক্ষণশীলতাবাদ এবং ভারতে বিজেপির নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদের অভ্যুদয় এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চমকপ্রদ বিষয় হল এসবের

www.pathagar.com

অভ্যুদয় ঘটেছে ইহজাগতিকতাবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পরবর্তী সময়ে। এই পুনর্জাগরণের পেছনে যে কারণগুলো কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনাকে সংস্কারের চেষ্টা, পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদের আধুনিকায়নের প্রচেষ্টা, কিংবা ভারতের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এমনসব সুযোগ-সুবিধা সংখ্যালঘিষ্ঠদেরকে প্রদানের চেষ্টা। কোন কোন ক্ষেত্রে অতীত দিনের হারানো গৌরব খুঁজে পেতে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের বিশ্বজনীন মর্যাদা দিতে দিয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগেও এমনটি ভাবা যেত না। পোপ দ্বিতীয় জন পল এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফরে যান। এর রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না। কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো পোপকে সাদর সম্ভাষণ জানান। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম ইল জং পোপকে আমন্ত্রণ জানাতে উদগ্রীব। বিশ্বায়ন তথা ভূমণ্ডলায়ন (Globalization) প্রক্রিয়া ধর্মের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বে এখন নানা আধ্যাত্মিক ব্লকের উদ্ভব ঘটছে। World Council of Churches, World Fellowship of Buddhists এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিভিন্ন ধর্মের মূলমন্ত্রগুলোকে বিশ্বজনীন করে তোলাই এসব আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় ব্লকের অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর ঐতিহ্যের প্রভাবকে জোরদার করাই এই প্রবণতার প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষ প্রযুক্তিগতভাবে ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিক থেকে অনেক অসাধ্য সাধন করছে। অনেক অজানা রহস্যের সমাধানও মিলছে। জিন ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা মানব জীবন রহস্যের অনুদঘাটিত তথ্যের যে অভূতপূর্ব উদঘাটন করেছেন, তা মানুষের চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌছানোর চাইতে অনেক বেশী বৈপ্লবিক। এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ক্যান্সার, ডায়াবেটিসের মতো মারাত্মক রোগ থেকে মানুষ অদূর ভবিষ্যতে মুক্তি পাবে এবং মানুষ হয়তো দীর্ঘদিন যৌবন ধরে রাখতে সক্ষম হবে। বিজ্ঞানের এতসব আবিষ্কারের পরেও কি মানুষ জানবে সে কোথা থেকে এসেছে এবং তার চূড়ান্ত নিয়তি কী? এই জিজ্ঞাসাই ধর্মকে মানব জাতির মধ্যে চিরন্তন অবস্থান রাখবে।

আজকাল মৌলবাদের প্রশ্ন উথাপিত হলে অবশ্যম্ভাবীরূপে ইসলামের মৌলবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু পৃথিবীতে আরও বহু ধরনের মৌলবাদ রয়েছে। যেমন খ্রিস্টীয় মৌলবাদ, ইহুদী মৌলবাদ এবং হিন্দু মৌলবাদসহ বাজার মৌলবাদ ইত্যাদি। আজ যখন ইসলামকে মৌলবাদী খল চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তখন আমাদের ফিরে যেতে হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। মাইমনিডেস (Maimonides) নামে দ্বাদশ শতকে একজন বিখ্যাত ইহুদী পণ্ডিত ছিলেন। সে সময়কার ইউরোপে অসহিষ্ণু ও গোঁড়া খৃষ্টীয় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে কোন ধরনের উদারনৈতিক সংস্কারের কথা ভাবাও যেত না। ইউরোপ ছিল ইনকুইজিশনের অত্যাচার দন্ডে ভীত সন্ত্রস্ত। এরকম সন্ত্রাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাইমনিডেস সুলতান সালাহউদ্দীন শাসিত পরধর্ম সহিষ্ণু ও নাগরিক সংস্কৃতিসমৃদ্ধ কায়রোতে দ্বাদশ শতাব্দীতে চলে আসেন। ইসলাম শাসিত ভূখণ্ড সেই দ্বাদশ শতাব্দীতে একজন ইহুদী পণ্ডিতের কাছে যত নিরাপদ বিবেচিত হয়েছিল, ইউরোপ তার তুলনায় ছিল ভয়াবহ নরক বিশেষ। এককালে যারা ধর্মবিশ্বাসের কারণে মানুষকে গায়ে তুলোর প্যাড জড়িয়ে প্রভূত পরিমাণ দাহ্য পদার্থ ঢেলে দিয়ে আগুণে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতো, তাদের মুখে ইসলামী মৌলবাদী আতঙ্কের কথা প্রবল বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

সমাজবদ্ধ মানুষ নানা পরিস্থিতিতে নিজেকে নতুন নতুন সত্তায় আবিষ্কার করে। এমনকি যে পরিচয়ের কথা তার জানা ছিল না, যে মুহূর্তে সে অজানা পরিচয়টি উন্মোচিত হয় সেই মূহূর্তে তার সত্তার নবতর রূপান্তর ঘটে। রবি ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক গোরা হিন্দু আচার ও ঐতিহ্যের একজন উৎসাহী প্রবক্তা। সে গোঁড়া ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় বিশ্বাসী। কিন্তু এক সময়ে সে তার কথিত মায়ের কাছ থেকে জানতে পারল একটি ভারতীয় পরিবার তাকে

www.pathagar.com

পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ১৮৫৭-র বিদ্রোহে তার আইরিশ পিতামাতা নিহত হবার পর সে ঘটনা অবগত হওয়ার মাধ্যমে হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোরা যে মানসিক দ্বন্দ্বে নিপতিত হয়েছিল, সে ধরনের মারাত্মক পরিচয়ের দ্বন্দ্বে আমরা সচরাচর পতিত হই না। একজন মানুষ যখন জানে, সে একজন ইহুদী, কিন্তু তার এই ইহুদী পরিচয়ের পাশাপাশি তাকে তার অন্যান্য পরিচয়ের মধ্যে নির্বাচনের সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়-যেমন, তার জাতীয়তা কী, শ্রেণীগত অবস্থান কী, রাজনৈতিক বিশ্বাস কী, এরকম আরও অনেক কিছু। গোরার ক্ষেত্রে পরিচয়ের যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, সে সংকটটা ছিল-গোঁড়া হিন্দু রক্ষণশীলতার পরিশপোষক হিসেবে তার অবস্থান দৃঢ় থাকবে, নাকি নিজেকে সে ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করবে। এক্ষেত্রে দেখা গেল, গোরা জন্মগত বর্ণ বা গোত্রীয় পরিচয়ের কথা না ভেবে নিজেকে ভারতীয় হিসেবে ভাবছে। কিন্তু জন্ম পরিচয়ের বিভ্রান্তিতে পড়ে নিজেকে ভারতীয় হিসেবে ভাবাটা ছিল যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে পরিচয় নির্মাণ করা। মানুষ পরিবর্তনশীল সমাজে নিরন্তর নিজের নতুন নতুন পরিচয় আবিষ্কার করে অথবা কোন সুনির্দিষ্ট পরিচয়কে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। এতে প্রতিক্রিয়াশীলতা নেই, তবে প্রতিক্রিয়া আছে। বাংলাদেশে আমরা কতটুকু বাঙালী, কতটুকু মুসলমান-এ নিয়ে ইতিহাস, ঐতিহ্য থেকে নানা উপকরণ খুঁজে নিজস্ব পছন্দের ধারণাটিকে জোরদার করতে চেয়েছি। কিন্তু এ ধরনের প্রচেষ্টা কার্যত অর্থহীন। ইতিহাসের ধারায় আমাদের মুখ্য পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটছে, কখনও একটি সুনির্দিষ্ট পরিচয় মনে হবে মুখ্য আর অন্য পরিচয়গুলো হবে গৌণ। তবে কোন পরিচয়ই হারিয়ে যাবে না। চল্লিশের দশকে যে ভূখণ্ড আজ বাংলাদেশ নামে পরিচিত সেই ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠি মুসলিম পরিচয়টিকে মুখ্য বিবেচনা করত। পঞ্চাশের দশকে ভাষাগত পরিচয় প্রাধান্য অর্জন করল। অথচ একাত্তরোত্তরকালে আবার ধর্মীয় পরিচয় অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করছে। আজকাল নামাজীর সংখ্যা বেড়েছে। জুমআর নামাজের জামাত রাজপথে উপচে পড়ে। এটা নিছক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল নয়। মসজিদেরও সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই ঈদ এখন পরিপূর্ণ জাতীয় উৎসবের মর্যাদায় অভিষিক্ত। পবিত্র মক্কায় হজ্জ করতে যাওয়া আজকাল শুধু ধর্মানুরাগের পরিচয়বহ নয়, আভিজাত্যেরও লক্ষণ। এসবের পাশাপাশি শহরাঞ্চলে নববর্ষের উৎসবও প্রচণ্ড গুরুত্ব পাচ্ছে। যারা এই উৎসবটিকে একটি সেক্যুলার উৎসব হিসেবে তুলে ধরেন, তারা এই উৎসবে হিন্দু ধর্মীয় প্রতীকগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে। তাহলে এই উৎসবটির 'সেক্যুলার' চরিত্র থাকল কোথায়? আসল উদ্দেশ্য হল-অখণ্ড ভারতীয় সত্তার মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া। সাময়িকভাবে এর আবেদন যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, যখন 'বাংলাদেশী' পরিচয়টি বিলুপ্তির মুখোমুখি হবে, তখন অনেক মোহাবিষ্টদেরও মোহমুক্তি ঘটবে। ভারতীয় আধিপত্যবাদের প্রতিবাদ হিসেবে আজ ধর্ম পালন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতীকসমূহ দৈনন্দিন জীবনে প্রাধান্য পাচ্ছে। সেটাকে নিছক অদৃষ্টবাদের প্রসার কিংবা 'হিংস্র' মৌলবাদের বিস্তৃতি হিসেবে বিবেচনা করা হবে চরম মূর্খতা। ভারতবেষ্টিত বাংলাদেশে আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ যে গুরুত্ব অর্জন করেছে, তার ইহজাগতিক প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

আফতাব আহমাদ :

বস্তুত একটি জনগোষ্ঠি যখন জাতি হিসাবে বেড়ে ওঠে বা আত্মপ্রকাশ করে, তখন সেই জনগোষ্ঠির মধ্যকার অন্তিমান যৌথ পৌরাণিক চরিত্র বা কাহিনী, তার বিকাশের ইতিহাস তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে রূপান্তরিত হয়। একটি জনগোষ্ঠি যখন জাতীয় সত্তায় রূপান্তরিত হওয়ার উৎক্রান্তির মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হতে থাকে, তখন তার পৌরাণিক। ঐতিহ্য এবং অবধারণা বা উপলব্ধ বিষয় অর্থাৎ Perception তার আচরণকে নির্দিষ্টভাবে প্রভাবিত

www.pathagar.com

করে। এর পরিণতিতে যৌথ জীবন ব্যবস্থার বা সংঘবদ্ধ জীবন ব্যবস্থার ধরন নির্বিশেষে অতীতের আচার-আচরণ, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, আবেগ-অনুভূতি, প্রতীক ও চিহ্ন মানুষকে পরস্পরের কাছে যেভাবে টেনে নেয়, তা রূপান্তরিত এই নতুন সত্তায় অবিচ্ছেদ্যভাবে আত্মস্থ হয়ে যেতে বাধ্য। সমাজ বিকাশের ইতিহাস আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়। জাতীয়তা, জাতিবোধ বা জাতীয়তাবাদ-এসবই সময়, পরিস্থিতি, অভিন্ন অভিজ্ঞতা, অভিন্ন যৌথ জীবন-যাপন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্যকে কেন্দ্র করে যে অভিন্ন চিন্তার বিকাশ ঘটে, তা মনোজগতকে এমনভাবে সংহত ও গ্রথিত করে ফেলে যে,সম্মিলিতভাবে এসব উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করে একটি জনগোষ্ঠির পরিচয়, বোধ, আকাঙ্খা এবং প্রণোদনা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। উপরে বর্ণিত যে কোন একটি উপাদান সময় ও ক্ষেত্রবিশেষ অগ্রগণ্য বিবেচিত হতে পারে কিংবা প্রবল হয়ে অপরাপর উপাদানকে অবদমিত অবস্থায় রেখে অধিপতির মুখ্য ভূমিকাও পালন করতে পারে। এ জন্যই আমরা এই ভূমণ্ডলে একই ভাষাভাষী কিংবা একই ধর্মাবলম্বী কিংবা জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে অভিন্ন শাসকের অধীনে লব্ধ অভিন্ন অভিজ্ঞতাসংবলিত জনগোষ্ঠিকে একটি একক রাষ্ট্র বা জাতিসত্তা হিসেবে প্রতিপন্ন হতে দেখি। মানুষ সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করতে গিয়ে তার বোধের প্রাণোদনা ও বিকাশের ফলে সৃষ্টির রহস্যকে উদঘাটন করে সত্যকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা চিরকাল অব্যাহত রেখেছে। এতে পর্যায়ক্রমে, ধাপে ধাপে, একেকটি রহস্য উন্মোচন করে মানুষ তার জিজ্ঞাসার উত্তর বের করে নিতে সক্ষম হয়েছে সত্য কিন্তু এই নিখিল জগতের বহু রহস্য এখনও যেমন অনুঘাটিত রয়ে গেছে, তেমনি তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও মানুষ অজ্ঞ থেকে গেছে।

আজকাল উদারনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ নিজেকে কেবলমাত্র ইহজাগতিকতার চৌহদ্দির মধ্যে স্থাপন করে তার বিশ্ববীক্ষা গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এ ধরনের মানুষদের কাছে ধর্ম একটি অসার বস্তু, ধর্মকে এসব মানুষ কুপমণ্ডুকতা প্রসারে সহায়ক ও অগ্রসরতার পথে বাধা বলেই গণ্য করে। কিন্তু সৃষ্টির রহস্য এত গূঢ় যে, এ সম্পর্কে যত গভীরভাবে আমরা অনুধ্যান করব, ততই একের পর এক বিস্ময় আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। নবজাত শিশু ক্ষুধার তাড়নায় যখন কেঁদে ওঠে, তখন মা তাকে স্তন্যদান করে। ক্ষিদে পেলে কাঁদতে হয়, শিশুটির এই আচরণ কিভাবে শিশুর মধ্যে জন্মাল? কিংবা কিভাবে মা মাতৃস্নেহ উজাড় করে দিয়ে শিশুটিকে সকল প্রতিকূল পরিবেশ এবং বিপদ-আপদ থেকে আগলে রাখেন? মনস্তাত্ত্বিকরা বা মনোবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়েও সৃষ্টির মূলে যে রহস্য কাজ করছে, তা উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এখানেই হচ্ছে ধর্মের গুরুত্ব। ধর্ম মানুষকে একটি পরিশীলিত,পরিশুদ্ধ নীতি ও নৈতিকতানির্ভর সামাজিক জীবনযাপনের, এমনকি, রাজনৈতিক সত্তাকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠা করার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাও দিয়েছে। তবে, মতলবী মানুষ এবং যারা হীনমন্যতায় ভোগে, পরজীবী মানুষ যারা সকল মানবিক গুণাবলী রহিত,যুগে যুগে ধর্মের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার করে তারা তাদের শাসন–শোষণ আধিপত্য, প্রাধান্য এবং নিয়ন্ত্রণকে নিরঙ্কুশ করার চেষ্টা করে গেছে। এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার, একই ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠি বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থান করতে পারে, এই এলাকাগুলো নিকটবর্তী, দূরবর্তী কিংবা ভৌগোলিকভাবে নিরবচ্ছিন্নও হতে পারে। কিন্তু শুধু ধর্মকে কেন্দ্র করে কোন জনগোষ্ঠি একটি একক অভিন্ন জাতিসত্তা হিসেবে বিকাশ লাভ করতে পেরেছে, তেমন কোন নজির ইতিহাসে নেই। গোটা ইউরোপ মূলত একটি খ্রিস্টীয় মহাদেশ। এখানে-সেখানে ছিটোফোঁটাভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট কিছু অঞ্চল রয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু খ্রিস্টান ইউরোপ তাদের অস্তিত্বকে সংকুচিত করার ব্যাপারে কখনো পিছপা হয়নি। অবশ্য আন্তর্জাতিক আইন ও জনমতের চাপে যখন নিগৃহীত-নির্যাতিত মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে,

www.pathagar.com

তখনও তারা দায়সারাভাবে মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলটিকে মেনে নিয়ে তাকে একটি প্রতিবন্ধী সত্তায় রূপান্তরিত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কসোভা, চেচনিয়া, ইংগুশেটিয়া এবং মিন্দানাও। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, গোটা ইউরোপ প্রধানত খ্রিস্টীয় সত্তা হলেও সেখানে উদ্ভব ঘটেছে অসংখ্য রাষ্ট্রের। এসব রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনসাধারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত ছিল। ওয়েস্ট ফ্যালিয়ার সন্ধির পর থেকে যে বিশ্ব ব্যবস্থাপনার পত্তন হলো, তাতে ধর্মীয় অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সংঘবদ্ধ জীবনের অপরাপর অভিজ্ঞতা একটি জনগোষ্ঠিকে যেভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে তাকে স্বীকার করে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতি দেয়ার সহমত সৃষ্টি হয় ঐ সন্ধির ফলে। অপরদিকে আমরা যদি মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার দিকে তাকাই, আমরা লক্ষ্য করব, সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের অভিন্ন ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। এতদসত্ত্বেও এখানে একটি অখণ্ড একক রাষ্ট্র গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। কারণ ঐ একটিই–রাষ্ট্রীয় চৌহদ্দির মধ্যে যে রাজনৈতিক জাতির বিকাশ ঘটে, তার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে ওই জনগোষ্ঠির সম্মিলিত উদ্যোগ। রাজনীতি ও অর্থনীতি দীর্ঘকালের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা-নিঃসৃত। অপরদিকে ধর্ম ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন এমনকি সামাজিকভাবে যৌথ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যে জনসমাজ গড়ে ওঠে, তার ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। ধর্ম মানুষকে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য শেখায়। কল্যাণ-অকল্যাণের পার্থক্য শেখায়। শ্রেয়বোধ, সুনীতিবোধ ও নৈতিকতাকে জীবন পরিচালনার নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে শেখায়। মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পরস্পরের মধ্য কুশলাদি বিনিময় এমনকি বস্তু বিশেষকে নিরীক্ষণ বা নামকরণের ক্ষেত্রেও ধর্মের রয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি সমাজের যোগ্য নেতৃত্বে গড়ে ওঠা নির্ভর করে ধর্মের এসব নির্দেশনা। সামাজিক বৈষম্য, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নির্যাতন, সাংস্কৃতিক দৈন্য এবং শিক্ষার দুর্দশা এসবকিছু লাঘবের ক্ষেত্রেও ধর্ম সূচনা থেকেই যে একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে তা ইতিহাসের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি।

প্রতিযোগিতামূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শ ও দর্শনের সংঘাত কখনও কখনও কোন জনগোষ্ঠির জাতীয়-রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বকে বিপন্নই করে তোলে না, ধরাপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্তও করে দেয়–এমন অসংখ্য নজির ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু ধর্মের যে শাশ্বত ও চিরন্তন আবেদন, তা মানুষকে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তি যোগায়, যা কোনভাবেই ধর্মের উৎপাটনকে সম্ভবপর করে তোলে না। মানব সভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষের সংঘাত ও সংঘর্ষের ফলে বহু রক্তাক্ত অধ্যায়ের কথা আমরা পাঠ করেছি। ক্রুসেড কিংবা রিফর্মেশন আন্দোলন–মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে জার্মান কৃষক বিদ্রোহ প্রটেস্ট্যাট আন্দোলনের ক্যালভিন, জুইংলি প্রমুখ ধর্মযাজক ও প্রচারকদের নেতৃত্বে ইউরোপব্যাপী আন্দোলন ইউরোপের রাষ্ট্রকাঠামো শুধু নয় সামাজিক ভিতকেও কাঁপিয়ে তুলেছিল। সে সময়েও কম রক্তপাত ঘটেনি। ক্যাথলিকদের প্রবর্তিত ইনকুইজিশন কিংবা অ্যাংকলিকান চার্চ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্যাথলিক পোপের আনুগত্য স্বীকারের অপরাধে অসংখ্য ক্যাথলিককে দাহ্য কাষ্ঠাদিতে বেঁধে আগুণ দিয়ে পুড়িয়ে মারার অমানবিক ও বর্বরোচিত ঘটনাও কম ঘটেনি। এতদসত্ত্বেও ধর্মের আবেদন আজও মানুষকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। জীবনাচারের ক্ষেত্রেও যে ধর্ম এক সুনির্দিষ্ট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে, কোন সমাজবিজ্ঞানী বা সমাজমনস্ক মানুষ তা অস্বীকার করতে পারেন না। আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা লক্ষ্য করব যে, মানুষকে সংঘবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে, সুনির্দিষ্ট একটি প্রণালীবদ্ধ জীবনযাপন করার ক্ষেত্রে এবং

www.pathagar.com

সভ্যতার গোড়াপত্তনেই ধর্ম মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এর কারণ, ধর্ম মানুষকে জীবনের অনুভূতি, অজ্ঞেয় সত্তা এবং প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব সংরক্ষণে সঞ্জীবনী শক্তি যুগিয়েছে এবং অভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর সমাজ গঠনে উদ্যোগী হয়েছে। রাষ্ট্রকে নিরুপদ্রব করার জন্য একটি অর্থবহ ও কার্যক্ষম রাজনৈতিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। ধর্ম অপরিহার্যতার এই শূন্যস্থান পূরণ করে এমন এক অনন্য বন্ধন সৃষ্টি করেছে যা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে সুস্থ, কল্যাণকর, স্থিতিশীল, ন্যায়ানুগ ও সুরুচিসম্পন্ন করে তোলার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। বস্তুত মার্কিন পণ্ডিত জন আর্মস্ট্রং তাঁর বিখ্যাত Nations Before Nationalism গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "Religion is a fundamental glue for the political order itself, because it helps establish and nurture the nations of self and collectivity. Thus, religion is a primary element in the development of nationalism and has been a crucial factor in political life throughout the world during the last two centuries."

বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় ,"এ কথা আপনারা সবাই জানেন যে, জীবে-জীবে জাতিতে-জাতিতে এমনকি ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মিলটা সত্য নয়, গরমিলটাই সত্য। কারণ, এটাই সত্তা। ঐটুকু দিয়েই এককে অন্য থেকে আলাদা করে চেনা যায়। 'আমি' ও 'তুমি'র মধ্যে একশ একটা মিল রয়েছে, তার তুলনায় গরমিলের সংখ্যা কত কম। তবু আমরা 'আমি' ও 'তুমি'র বিচার করি ওই গরমিলটুকু দিয়েই, মিলটুকু দিয়ে নয়। এমনকি মানুষে-পশুতে গরমিলের চেয়ে মিলের সংখ্যাই কি বেশী নয়? তবু ওই গরমিলটুকুকেই আমরা মানুষের বৈশিষ্ট্য বলে গর্ব করে থাকি। ---- সোজা কথায়, সমস্ত দুনিয়ার জীবজন্তু ও গাছপালার জন্য যেমন একই মাটি, একই আবহাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে না, তেমনি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্যও একই ধর্ম ও একই সংস্কৃতির ব্যবস্থা দেয়া যেতে পারে না। --- কাজেই সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্যও একই ধর্ম ও একই সংস্কৃতির বিশ্বজোড়া মাঠ তৈরি হবে–এ আশা যারা কচ্ছেন, তারা প্রকৃতি ও বিজ্ঞানকেই অস্বীকার কচ্ছেন। কাজেই , এ বাণী ভবিষ্যৎ বিশ্বের বাণী হতে পারে না, যদি তেমন চেষ্টা হয়, তবে সেটা হবে কালচারাল ফ্যাসিজম বা তমদ্দুনী জুলুমবাজি। তার চেয়ে বরঞ্চ বিভিন্ন অঞ্চল ও আবহাওয়ার মানবগোষ্ঠি নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির বুনিয়াদে আত্মবিকাশ করবে; প্রগতি ও কল্যাণের পথে তাদের ভেতর সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা; খোদার বিচিত্র দুনিয়ায় রচিত হবে কল্যাণমুখী বৈচিত্রের এক বাগিচা ঃ এটাইতো সহজ, এ-ইতো স্বাভাবিক; এ-ইতো বৈজ্ঞানিক সত্য। ----------

ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা এক জাতি নয়, তাদের সংস্কৃতিও এক নয়; এটা বোঝা গেল। কিন্তু হিন্দুরা বা মুসলমানরাই কি নিজেরা একেকটা আস্ত জাতি? অথবা তাদের সংস্কৃতি একেকটা আস্ত কৃষ্টি? তা নয়। আরবী-তুর্কী, আফগানরা একই মুসলমান হয়েও এক জাতি নয়। ইংরাজ ও ফরাসী, ইতালীয়, জার্মান খ্রিস্টান হয়েও এক জাতি নয়। এদের ধর্ম এক এক হলেও তমদ্দুন এক নয়। গাছ ও বীজের মধ্যে যা সম্পর্ক, ধর্ম-সংস্কৃতির সম্পর্ক তাই। ধর্ম থেকেই যেমন সংস্কৃতির জন্ম, তেমনি বীজ থেকেই গাছের জন্ম। আবার গাছের মধ্যেও বীজ রয়েছে। তবু গাছ ও বীজ এক নয়। ধর্ম ও সংস্কৃতি এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তমদ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না। বরঞ্চ সে সীমাকে আশ্রয় করেই সংস্কৃতির পরদায়েশ ও সমৃদ্ধি। এইখানেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরহদ্দ। এইখানেই পূর্ব পাকিস্তান একটা ভৌগলিক সত্তা। এইজন্যে পূর্বপাকিস্তানের বাসিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাতি থেকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় দাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র

www.pathagar.com

আলাহিদা জাত।" (১৯৪৪ সালের ৫ মে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ মিলনায়তনে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর মূল সভাপতির ভাষণ থেকে উদ্ধৃত)।

ধর্ম সোশ্যাল মবিলাইজেশন ঘটিয়ে সোশ্যাল রিপ্রেশনের বিরুদ্ধে জনসচেতনা সৃষ্টি করে মানুষকে অন্যায়, অবিচার এবং বৈষম্যের বিরুখে দাঁড়াবার প্রেরণা যোগায়। অপরদিকে প্রায় সকল ধর্মই মানুষকে সহিষ্ণু, সমমর্মী হতে এবং ভালবাসতে শেখায়। তমসাবাদী (obscurantist) ধর্মান্ধ ও ধর্মের অপব্যবহার এবং অসৎ ব্যবহারকারী ধর্ম ব্যবসায়ীরা এবং বিশেষ করে ইসলামের ছিদ্র সন্ধানীরা মানুষের মধ্যে হানাহানি, মারামারি,কাটাকাটি, হিংসা-বিদ্বেষ, অবজ্ঞা ও ঘৃণা, নারী-পুরুষের বৈষম্য, ভ্রষ্টাচার ও অযাচার, নাস্তিকতা এবং ধর্মের অবমাননা, অসূয়া ও পৈশুন্য ইত্যাদি দ্বারা সমাজের সংহতি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা এ যাবৎকাল পর্যন্ত কম হয়নি। বিশেষ করে ইহুদীবাদ, ক্যাথলিক গীর্জার আধিপত্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃষ্টীয় প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদ। সভ্যতা ও মানবতার যে অপমান ঘটিয়েছে, তা ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায়। অথচ ধর্ম মানুষকে সহিষ্ণু, মহানুভব এবং বিপন্ন মানবের পক্ষে দাঁড়াবার শিক্ষা দেয়। এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান এযাবৎকাল পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম হিসেবে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। কারণ ইসলাম পরস্পরের সাথে পরস্পর, একাকী এবং যৌথভাব কীভাবে আচরণ করতে হবে, শাসক এবং শাসিতের মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য সংরক্ষিত হবে, কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কী ধরনের আচার-ব্যবহার করা শ্রেয়, ইহজাগতকতার নিয়মাবলী সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করে ইহজাগতিক আধ্যাত্মিকতা ও পারলৌকিক পবিত্রতা লাভের বিধি-বিধান, অনুশাসন ও মঞ্জিলে-মকসুদে পৌছার সুনির্দিষ্ট পন্থা নিরূপণ করে দিয়েছে। ইসলাম বর্ণ, ভাষা, আকৃতি, প্রকৃতি ও পেশার ভিন্নতার কারণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদকে অস্বীকার করে সাম্যের ভিত্তিতে মানুষের এক ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রণোদনা যুগিয়ে এসেছে। এ পন্থা কঠোর কিংবা অসাধ্য পন্থা নয়। নিষ্ঠার ও একাগ্রতার সঙ্গে এসব প্রতিপালনে কোন নিবেদিতপ্রাণ মানুষকে তেমন কষ্ট বা ক্লেশ স্বীকার করতে হয় না। ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে যেমন স্বীকৃতি দিয়েছে, তেমনি কষ্ট বা ক্লেশ স্বীকার করতে হয় না। ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধকে নিষিদ্ধ করে সংঘবদ্ধ বা যৌথবাদী উদ্যোগকে উৎসাহদান করেছে। অপরদিকে মানুষকে বর্ণে বা শ্রেণীভিত্তিক বিত্ত কিংবা অন্য কোন পার্থিব যশ-খ্যাতির অধিকারী বলে ইসলাম ভেদাভেদ এবং পার্থক্য করতে শেখায়নি। এই জড়জগতে বিড়ম্বনা এবং হতাশার কারণে মানুষ যখন আত্মহননের পথ বেছে নেয়ার উপক্রম করে, তখন ধর্মের আবেদন তাকে কদর্য রাজনীতি এবং সমাজের কলুষিত অবস্থা থেকে গুটিয়ে নিয়ে ধর্মের শাশ্বত মূল্যবোধগুলোকে গভীর উপলব্ধি দ্বারা আমল করে সুনীতি, শ্রেয়নীতি অনুসরণের জন্য এবং পরম স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এক মহৎ দায়িত্ব সম্পাদনের সুযোগ করে দেয়। যা তাকে অমানবিক এবং অধঃপতিত জীবন থেকে পরিত্রাণের সন্ধান দেয়। জাতিগঠনের প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সহঅবস্থানে করলেও রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ থেকে শুরু করে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মূখ্য অথবা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে বাধ্য। কারণ, গণতন্ত্রের শিক্ষাই হচ্ছে এই যে, গরিষ্ঠের মতামত প্রাধান্য পাবে তবে গরিষ্ঠকে অবশ্যই সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতার পরিচয় দিতে হবে। আমাদের দেশে খুদকুঁড়োপুষ্ট একশ্রেণীর 'বুদ্ধির সওদাগর' এই বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করতে চান না। তারা যান্ত্রিকভাবে 'বিশ্বধর্ম' (যাকে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা সর্বধর্মভাবনার নামে ব্রাহ্মণ্যবাদকেই বুঝিয়ে থাকেন) ও 'বিশ্বসংস্কতির'র সর্বসাধারণের ওপর সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস চালিয়ে জবরদস্তির এক নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশে বুদ্ধি বিকিকিনির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকারী একশ্রেণীর খুদকঁড়োভোগী জ্ঞানপাপীদের মধ্যে

www.pathagar.com

ইসলামের নাম শোনা মাত্রই গাত্রদাহের উদ্রেক হয়। পৌত্তলিকতাকে এরা তাদের জীবনাচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলন থেকে শুরু করে নর-নারী নির্বিশেষে যখন কপালে রক্তচন্দন ঘষটে দেয়, তখন তারা এক ধরনের 'অলৌকিক' পুলকানন্দ অনুভব করে। অথচ বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে দেখা গেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকে যথাযথ সম্মান দিয়ে সংখ্যালঘুদের সহ্য করলেও তাদের রাষ্ট্রঘাতী আন্দোলনের পথ কোন রাষ্ট্রই প্রশস্ত করে দেয়নি।

বাংলাদেশ সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম, যেখানে অতি নগণ্য একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিদানকে চরম বিরোধিতা ও অপমান করতেও কার্পণ্য করে না। এদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে এ দেশের মুসলিম নামধারী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের উচ্ছিষ্টভোগী কতিপয় নিয়োগী ও চর। কিন্তু, ধর্মপ্রাণ মানুষ, যারা মনেপ্রাণে মানবতা ও মানবকল্যাণে বিশ্বাস করেন, তারা ইসলামের এতিহ্য অনুসরণ করে জবরদস্তির পথ সব সময় পরিহার করে এসেছেন, এমনকি ভিন্নধর্মাবম্বীদেরকে রক্ষা করেও এসেছেন এবং সমাজ-সংহতির স্বার্থে ধর্মীয় উচ্চারণ, প্রতীক চিহ্ন, অনুষ্ঠানাদি ও অনুশাসনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে ন্যায় ও শান্তির পথকে সুগম করেছেন। ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়। আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের অভিরুচি, আমাদের ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞানমনস্কতা ও শ্রেয়বোধ আমরা ইসলামের কাছ থেকেই লাভ করেছি ইসলাম বর্ণাশ্রম প্রথার ঘোর বিরোধী। ইসলাম মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বৈষম্য দূরীকরণের দিক নির্দেশক। ইসলামের প্রতিপক্ষরা ইসলাম সম্পর্কে যতো ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও কটূক্তিই করুক না কেন, তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হবেই। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রসার অমুসলিম দুনিয়ায় যে হৃৎকম্পন আমরা লক্ষ্য করছি, তা এ কারণেই। ধর্মের অনুশাসন অনুশীলন মানবাত্মাকে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করে তুলতে সাহায্য করে। সংস্কৃতি যে ধর্মবিশ্বাসনির্ভর, এটি আজ পাশ্চাত্যজগতসহ সর্বজনিবিদিত। পারিবারিক বন্ধন, নারী-পুরুষের সম্পর্কের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা, এবং ভাই-বোনদের মধ্যে স্নেহ ও মমত্বের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের জন্ম দেয় ধর্ম। সেই সঙ্গে সামাজিক ভূকম্পন ও বিঘটন যে ধর্ম রোধ করে তা অতি উদারবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিক ও পণ্ডিতেরাও আজ উপলব্ধি করে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। এক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত ব্যতিক্রম দক্ষিণ এশিয়ার একটি অতিকায় রাষ্ট্র তথা ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ভারত ধর্মনিরপেক্ষকতার বুলি আউড়িয়ে একধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে ব্রাহ্মণ্যবাদী নিপীড়ন ভারতের অহিন্দু জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে, তা ফ্যাসিবাদেরই ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্করণ। ধর্ম বিশ্বাস করে, হৃদয়ঙ্গম করে এবং আমল করে গ্রহণ করতে হয়। এটি হতে হয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে। ইসলাম এই পথটিকেই গ্রহণযোগ্য পথ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে,পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ্যবাদের জন্ম বর্ণাশ্রমভেদ এবং মানুষকে অপমান করে মানবেতর প্রাণী হিসেবে মানুষে মানুষে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করার জন্য।

www.pathagar.com

১৫ জুলাই, ২০০০

দেশ প্রেমের চেতনা

মাহবুব উল্লাহ :

জার্মান দার্শনিক জে জি ফিখ্‌টে (J.G Fichte)-এর জীবনকালটা ছিল ১৭৬২ সন থেকে ১৮১৪ সন পর্যন্ত। তরুণ বয়সে তিনি ছিলেন যেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৮০৮ সনে তিনি জার্মান জাতির উদ্দেশে বেশ কিছু ভাষণ দিয়েছিলেন। এরকম একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ "The present problem, the first task--- is simply to preserve the existence and continuance of what is German" অর্থাৎ বর্তমানের সমস্যা, বর্তমানের কর্তব্য হল, জার্মান বলতে যা বোঝায় তার অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব রক্ষা করা। বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যাটি কী? আমার মনে হয়, জোহান ফিখটে ১৮০৮ সনের দিকে জার্মান জাতিকে যা বলেছিলেন তা আজকের বাংলাদেশের জন্যও হুবহু প্রযোজ্য। ফিখটে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছিলেন একজন দার্শনিক। তাঁর দেশ-ভাবনা ছিল। ফরাসী বিপ্লব ছিল একটি জাতি কী অর্জন করতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে ফরাসীবাসী একক জাতীয়তা ও মর্যাদা অর্জন করেছিল। প্রজাকুল থেকে নাগরিকের পর্যায়ে ফরাসী জনগণের উত্তরণ ঘটেছিল। ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জার্মানরা তাদের ঐতিহাসিক নিয়তি সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন করে। জোহান ফিখটে জার্মানীর নবজাগৃতির তাত্ত্বিক রূপকার ছিলেন। ফিখটে প্রথমত ব্যক্তির ভেতরকার চেতনাবোধকে গুরুত্ব দিতেন। কারণ ব্যক্তির ভেতরকার এই চেতনাবোধই তার নৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে।

ফরাসী বিপ্লব মানবতার যে মুক্তি অর্জন করেছিল ফিখটে তাকে অভিনন্দিত করেন। যদিও ফ্রান্সের আগ্রাসী জাতীয় আকাঙ্খার প্রতি তার সমর্থন ছিল না। ফ্রান্স যখন জার্মানীর অধিকাংশ ভূখণ্ড দখল করে বসল, ফিখটের দৃষ্টিভঙ্গিতে আসল এক ব্যাপক পরিবর্তন। তিনি হার্ডারের Volks Geist মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এই মতবাদের মূলকথা হল, ব্যক্তির চেতনা নয়, সমগ্র জনগোষ্ঠির চেতনাই বিবেচ্য বিষয়। সমগ্র জনগোষ্ঠির চেতনা উৎসারিত হয় তাঁর আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য ও ইতিহাস থেকে। ফিখটে তাই বললেন জার্মান চেতনার কথা। এই চেতনা আরও অন্য যেসব চেতনা রয়েছে, তার মধ্যকার একটিই মাত্র নয়, সবক'টির মধ্যে প্রধানতম। ফিখটে যখন এই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন বার্লিনে ফরাসী সামরিক কমাণ্ডার তার এই বক্তব্যের তাৎপর্য সম্পর্কে তেমন কোন গুরুত্বারোপ করেননি। তিনি এই বক্তব্যকে একজন অধ্যাপকের নিছক একাডেমিক ভাষণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। ফলে এই ভাষণে প্রচার-প্রচারণায় কোনো সেন্সরশিপ বা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। অথচ এই ভাষণটি প্রুশিয়ার জনগণকে সচেতনভাবে সংগঠিত হবার প্রেরণা যুগিয়েছিল, প্রুশিয়ার সাধারণ 'Volk' ইংরেজী ভাষায় যাকে বলা হয় 'folk' অর্থাৎ সাধারণ মানুষ-তারা পরিণত হল রাজনৈতিক মানুষে এবং ফরাসীদের তাদের দেশের মাটি থেকে তাড়িয়ে দেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করল। দার্শনিক অধ্যাপক ফিখটের নজির টেনে আমরা আজ ঐ একই কথা বলতে পারি। কথাটি হচ্ছে-বাংলাদেশী জনগণের মধ্যে এমন এক রাজনৈতিক চেতনার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিতে হবে, যে চেতনা এদেশ থেকে সকল বৈদেশিক কর্তৃত্বকে চিরতরে সমূলে উৎপাটন করবে।

দৈনিক 'প্রথম আলো'র ৮ জুলাই ২০০০ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় 'দেশে অবৈধভাবে কর্মরত লক্ষাধিক বিদেশীর একজনকেও আট মাসে খুঁজে বের করা যায়নি'- এই শিরোনামে

www.pathagar.com

একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটির ভাষ্য চরম উদ্বেগজনক। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এনজিওতে অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত আট মাসেও কার্যকর হয়নি। উপরন্তু ভ্রমণ ভিসায় বিদেশী নাগরিকদের বাংলাদেশে আসা এবং অবৈধভাবে 'ওয়ার্ক পারমিট' নেয়া অব্যাহত রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা যায়, লক্ষাধিক বিদেশী নাগরিক অবৈধভাবে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। তারা ভ্রমণ ভিসায় বাংলাদেশ এসে দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও এনজিওতে চাকরি নিয়েছে এবং একই কাজ করে বাংলাদেশীদের চেয়ে দেড় থেকে দু'গুণ বেশী বেতন পাচ্ছে। অবৈধভাবে কর্মরতদের অধিকাংশই ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, চীন ও তাইওয়ানের নাগরিক। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এর আগে সরকারকে জানিয়েছিল, গত কয়েক বছর ধরে বিদেশী নাগরিকরা বাংলাদেশে আসছে এবং বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিচ্ছে। বর্তমানে তাদের সংখ্যা এক লাখের বেশি। এ রিপোর্ট পাওয়ার পরপরই সরকার গত বছরের অক্টোবরে এক জরুরী বৈঠকে বসে এবং অবৈধদের খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের বিশেষ শাখাসহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার প্রতি বিশেষ নির্দেশ দেয়।----- অবৈধ এই বিদেশী নাগরিকরা পোশাক শিল্প, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, বেসরকারী হাসপাতাল, গেস্ট হাউস, পরিবহন এবং নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন।------ সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশীদের খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত আট মাসেও কার্যকর হয়নি। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রথম দিকে কিছুটা তৎপরতা দেখালেও রহস্যজনক কারণে তারা থেমে গেছে'। গত দু'তিন বছর ধরে তথ্যভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের কাছে শুনেছিলাম, বাংলাদেশে বিদেশীরা বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের নাগরিকরা বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী দায়িত্বে ব্যাপকহারে নিযুক্ত হচ্ছেন। এ ব্যাপারে সরকারের কোন সুষ্ঠু নীতিমালা রয়েছে কিনা, আমাদের জানা নেই। অবৈধ অভিবাসীর সমস্যা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রয়েছে। তবে মোটা দাগে যে কথাটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এ ধরনের অবৈধ অভিবাসীরা খুবই স্বল্প মজুরির কাজের জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে নানা কসরত করে গমনাগমন করে। এর ফলে তারা অনেক সময়ে মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এমনকি মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু অন্য দেশ থেকে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে এসে কোন দেশের বড় বড় অর্থনৈতিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় নাগরিকদের চাইতে দু'তিনগুণ বেশী বেতনে নিয়োজিত হওয়ার ঘটনা সম্ভবত বাংলাদেশের মত অরক্ষিত এবং প্রায় সরকারবিহীন (সরকার থেকেও না থাকার শামিল) একটি দেশেই সম্ভব। ইতোমধ্যে অবৈধ কর্মরতদের সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে গেছে। এর ফলে সমযোগ্যতার বাংলাদেশী নাগরিকরা কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিদেশী নাগরিকদের পেছনে দ্বিগুণ-তিনগুণ অংকের বেতনে যোগাতে দেশের প্রচুর পরিমাণ অর্থও ব্যয়িত হচ্ছে। আরো আশ্চর্যের বিষয়, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে এসব লোকদের খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দেয়া হল, অথচ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাৎক্ষণিক কিছু তৎপরতা দেখিয়ে থেমে গেল। প্রশ্ন হল, থেমে যাওয়ার পেছনে কারও অনুচ্চারিত অথচ কঠোর কোন নির্দেশ ছিল কি? এদেশ কি তাহলে সবদিক থেকেই অরক্ষিত হয়ে গিয়েছে? যে কারণে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও বলা যায় একরকম নাচার হয়ে পড়েছে? বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এরা সচেষ্ট হলে করতে সক্ষম হয় না এমন কোন ঘটনা আজও বাংলাদেশে ঘটেনি। তাহলে প্রশ্ন, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পায়ে কারা শৃংখলের বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে? কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধু তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিলেন। তিনি ধানমন্ডিতে বেশ ভাল একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বসবাস করেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, তার বিপরীত দিকের ফ্ল্যাটের দরজাটি খোলা এবং সেখানে কতিপয় ব্যক্তি মেঝেতে বসে হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরে তাস খেলছে। এ ধরনের লোক সমাবেশ তাকে কৌতুহলী করে

www.pathagar.com

তোলে। কিন্তু অসৌজন্যমূলক হবে–একথা ভেবে তিনি লোকগুলোর কাছে তাদের পরিচয় জানতে চাননি। কিছুক্ষণ পর তার কাছে তারই এক বন্ধু আসলো। বন্ধুটি ব্যবসা করেন। সে বন্ধুটি কিছুক্ষণ পরপর পাশের ফ্ল্যাটের দিকে তাকাচ্ছেন। পাশের ফ্ল্যাটের প্রতি বন্ধুর কৌতুহল লক্ষ্য করে তাকে ওদিকে তাকানোর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে জানালো, ওই লোকগুলোর কাছেই সে এসেছে। ওরা একটি ভারতীয় কোম্পানীর লোক। তারা ওই ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছে থাকার জন্য। বাংলাদেশে আমার সেই বন্ধুটির বন্ধুর মতো এই কোম্পানীর ১২ জন এজেন্ট রয়েছে। মূলত ভারতীয় কোম্পানীর হয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজটা এরাই সম্পাদন করবে। তবে সবচেয়ে কৌতুহলবহ খবর হল এই যে, ওই ভারতীয়রা এই ১২ জনের প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা অগ্রিম দাবী করেছে। অগ্রিম দাবী করায় এদেশীয় এজেন্টরা বলার চেষ্টা করল, যে-ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল এজেন্টকে অগ্রিম দেবে, সেক্ষেত্রে উল্টো এজেন্টদেরকেই প্রিন্সিপালকে ফাইনান্স করতে হচ্ছে। কী অদ্ভুত ব্যবস্থা! কৈয়ের তেলে কৈ ভাজা। প্রিন্সিপালের বক্তব্য হলো–ভারতে যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রা অন্যদেশে স্থানান্তরে নানা বিধিনিষেধ আছে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেতে অনেক সময় লাগবে, সেহেতু এজেন্টদের কাছ থেকে আপাতত পাঁচ লাখ করে মোট ষাট লাখ টাকা না তুললে প্রজেক্টের কাজ শুরু করা যাবে না। প্রজেক্টের কাজ শেষ হলে বিল পাওয়ার পর এসব অগ্রিম সমন্বয় করা হবে। আর ইতোমধ্যে অগ্রিমের টাকা দিয়ে ভারতীয় কোম্পানীটি ঢাকায় তাদের অফিস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গড়ে তুলবে। এটিতো মাত্র একটি দৃষ্টান্ত। 'প্রথম আলো'র রিপোর্ট থেকে যা বোঝা গেল, এরকম ঘটনা আকছার ঘটছে।

মাঝে মাঝে সবকিছু দেখে মনে হয়, স্বাধীনতার জন্য এত ত্যাগ-তিতীক্ষার পরে শেষ পর্যন্ত একটি পরাধীন দেশেই কি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে? ব্রিটিশ শাসনামলে মওলানা মোহাম্মদ আলী পরাধীন ভারতে মৃত্যুবরণ করতে চাননি বলে ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে জেরুজালেম চলে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মওলানা মোহাম্মদী আলী তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এমন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হলে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থাকা দরকার তা আমাদের মত অনেকের ক্ষেত্রেই নেই। তাহলে কি আমাদের পরাধীনতার দিকে ক্রমধাবমান ক্ষয়িষ্ণু স্বাধীনতার দেশ বাংলাদেশের পরাধীন নাগরিকে পরিণত করা হবে? তখনতো আর আমরা নিজেদের 'নাগরিক' বলেও সত্যিকার অর্থে দাবী করতে পারবো না। সার্বভৌম দেশের বাসিন্দারাই 'নাগরিক' বা Citizen আর সার্বভৌমত্বহীন পরাধীন দেশের বাসিন্দারা হল, প্রজা বা Subjcect, আমরা কি তাহলে Citizen থেকে Subject হতে চলেছি? আমাদের এই ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতার দশা ঘুচিয়ে কোন নেতা আমাদেরকে জোহান ফিখ্‌টের ভাষায় 'জনগোষ্ঠিগত ঐক্যচেতনায়' সুদৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ করে তুলবে, যার ফলে আমাদের Citizen থেকে Subject হতে হবে না?

পৃথিবীর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দোদুল্যমানতা, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Vascillation, তাদের এই দোদুল্যমানতা অনেক সময়ে জাতির জন্য মহাদুর্ভোগ ডেকে নিয়ে আসে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে একটি কথার জোর প্রচারণা রয়েছে। কথাটি হল, ভারতীয় শাসকগোষ্ঠির আনুকূল্য না পেলে এদেশের শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করা সম্ভব নয়। তাই কোনও না কোনওভাবে ভারতীয়দের ছাড় দিয়েই ক্ষমতায় যেতে হবে। এই মানসিকতা দাসত্বের মানসিকতা, পরাভূতের মানসিকতা। এর মধ্যে কোনও ব্যক্তিত্ববোধ নেই, কোনও মর্যাদাবোধ নেই। বাংলাদেশের জন্য আজ এক কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। 'প্রথম আলো'র সংবাদ প্রতিবেদনটিই বলে দিচ্ছে, আমরা ইতোমধ্যে কি হারিয়েছি আর কী সব হারাতে বসেছি। আমরা চাই কি না চাই, আমাদের নেতৃত্ব উপলব্ধি করতে চান, কিংবা না চান, ইতিহাসের ভবিষ্যৎ বাস্তবতার কঠোর কঠিন আঘাতকে এড়িয়ে যাবার কোনও বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

বিদেশীরা একবার ষড়যন্ত্র করে যে নেতাকে ক্ষমতার মসনদ থেকে উচ্ছেদ করে, তাকে পুনরায় বন্ধু ভেবে ক্ষমতাসীন করবে, এমনটি ভাবা আর আহাম্মকের স্বর্গে বাস করা একই কথা। সুতরাং দোলুল্যমানতা নয়, একনিষ্ঠ দৃঢ়তার নিরাপস পথ গ্রহণই হচ্ছে সত্যিকার বিজয় অর্জনের পথ। ইন্দোনেশিয়ার সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাতীয় নেতা আহমদ সুকর্ণর দোদুল্যমানতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সেদেশে তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের পথ সুগম করে দেয়। ফলে ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় সুহার্তোর একনায়কত্বের দীর্ঘমেয়াদী শাসন ও ত্রাসন। সুহার্তো তাঁর ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করতে দশ লক্ষ ইন্দোনেশীয়'র রক্তে হোলি খেলেন। সুকর্ণ অপদস্ত হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং জীবনের শেষদিনগুলো বন্দীদশায় কাটান। দোদুল্যমানতার মূল্য এভাবেই দিতে হয়। তাই, অটোভন বিসমার্ক ১৮৬২ সালে তাঁর ভাষণে যেমনটি বলেছিলেন, "The great questions of the day will not be decided by speeches or by majority decisions, that was the mistake of 1848 and 1849, but, by blood and iron.' বাংলাদেশে আজ আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন, তা বিসমার্কের উপলব্ধি থেকে খুব ভিন্ন নয়। কথার ফুলঝুরিতে কিংবা 'বেশীরভাগ মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে' এ কথা ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। রক্তমূল্যে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চাই কঠিন প্রস্তুতি।

আফতাব আহমাদ :

প্রখ্যাত রাষ্ট্র-দার্শনিক প্লেটো তাঁর 'Epistles' গ্রন্থে বলেছিলেন, "Man was not born for himself, but for his country" অর্থাৎ মানুষ নিজের জন্য জন্মগ্রহণ করে না, দেশের জন্য জন্মগ্রহণ করে। প্রখ্যাত আরব লেখক ও চিত্রকর কাহলিল জিবরান তাঁর 'New Frontier' গ্রন্থে বলেছিলেন, "Are you a politician, who says himself : I will use my country for my own benefit?

---Or, are you a devoted patriot, who whispers in the ear of his inner self : 'I love to serve my country as a faithful servant.' অর্থাৎ তুমি কি সেই রাজনীতিক, যে নিজের কানে নিজেকে বলছে ঃ আমি আমার দেশকে আমার সুবিধার জন্যই ব্যবহার করব? অথবা তুমি কি সেই নিবেদিতপ্রাণ দেশপ্রেমিক, যে নিজের অন্তরাত্মার কানে কানে চুপিসারে বলে ঃ একজন বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে আমি আমার দেশকে সেবা করতেই ভালবাসি? এ কথাগুলো আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতার নিরিখে বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন। কারণ রাজনীতি এমন এক দুর্বিপাকে ঘুরপাক খাচ্ছে, যেখানে অর্থ আর বিত্তই একমাত্র নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে থমাস কার্লাইল 'অ্যারিস্টোক্রেসি অব দি মানিব্যাগ' বলে অভিহিত করেছিলেন। অর্থ এবং বিত্ত যখন রাজনীতির ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, আদর্শবাদিতা ও শ্রেয়বোধ তখন নির্বাসনে যেতে বাধ্য। এই পরিস্থিতিকেই ডি এইচ লরেন্স বলেছেন। "Money is our madness, our vast collective madness" তাই সংসদ সদস্যরা জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থের কথা ভাবার পরিবর্তে নির্বাচনী খরচসহ প্রভুত পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ কিভাবে পুঞ্জিভুত করতে হয়, সেদিকেই অধিক মনোনিবেশ করে থাকেন। আর তাই সকলের অলক্ষ্যে রাষ্ট্রঘাতী চক্র ও তার অনুচরেরা পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা সুনিপুনভাবে বাস্তবায়নের সুযোগ লাভ করে। রাজনীতিতে দোদুল্যমানতা এবং মতাদর্শের দোলাচল এমন এক পরিস্থিতির জন্ম দেয়, যে পরিস্থিতি সত্য ও বাস্তবতাকে আড়াল করে রাখে এবং মেধা, প্রজ্ঞা, শ্রমশীলতা-সবকিছুই অপাঙক্তেয় বলে বিবেচিত হয়। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে কৌলিন্য ও আভিজাত্য নিয়ে ছড়ি ঘোরাতে যাদের প্রায়ই দেখা যায় তাদের উদ্দেশে সপ্তদশ শতকে বাকিংহামের দ্বিতীয় ডিউক জর্জ ভিলিয়ার্স বলেছিলেন ঃ "The world is made up for the most part of fools and knaves " অর্থাৎ পৃথিবীটা

www.pathagar.com

প্রধানত বোকা এবং অপদার্থের জন্যই তৈরি হয়েছে। রাজনীতি যদি রাজার রাজ্য শাসনের নীতিশাস্ত্রের বাইরে আর কিছু হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, দেশের ব্যাপক জনসাধারণের হিতৈষণাই হচ্ছে রাজনীতির মূখ্য উদ্দেশ্য। অর্থের ঝুলি নিয়ে আভিজাত্যের যত প্রবল শক্তি সর্বসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করুক না কেন, তারা আসলে ভঙ্গুর এবং দুর্বল। জনরোষে ভস্মীভূত হয়ে যেতে এবং গণজোয়ারে খড়কুটোর মত ভেসে যেতে বাধ্য। মার্কিন দেশসেবক উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান ১৮৯৬-এ শিকাগোতে বলেছিলেন ঃ "The humblest citizen of all the land, when clad in the armor of a righteous cause is stronger than all the costs of error." অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত কারণে সজ্জিত দেশের সাধারণ নাগরিকরা ভ্রান্তির অসংখ্য উদগাতাদের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী। এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, আজ দেশ চরম বিপর্যয়ের মুখে। দেশের মানুষ চরম হতাশায় নিমজ্জিত। তবু মনে হয় আমাদের দেশের রাজনীতিকরা উটপাখির মত মরুভূমির বালুর ভেতর মুখ গুঁজে দিয়ে ভাবছেন, কোথাও কোন মরু সাইমুম বা বালুর ঝড় উড়ছে না। ক্ষমতাসীন দলের জবরদস্তিতে দেশব্যাপী নিরীহ নাগরিকদের জীবন যেভাবে সন্ত্রাসের কারণে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, তা আমরা দেখেও দেখছি না। প্রধানমন্ত্রীর নিকটাত্মীয়দের বাড়ীঘর দখল থেকে শুরু করে শিশু-কিশোর অপহরণ, পরস্পর পরস্পরের প্রতি গুলী ছোঁড়াছুঁড়ি, সর্বোপরি আন্তর্জাতিক আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে উৎকোচ গ্রহণ–এ সবকিছুই অবলীলাক্রমে বিনা প্রতিবাদে, বিনা প্রতিরোধে একে একে ঘটে চলেছে। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল, দায়িত্ববান দেশপ্রেমিক রাজনীতিকরা এসবকে এক একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু করে জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করে এমন এক দুর্বার গণআন্দোলনের জন্ম দেবে, যার ফলে এ ধরনের দেশদ্রোহী ও জাতিঘাতী কর্মতৎপরতা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আমাদের রাজনীতিকদের করার কিছুই নেই। মনে হয়, এ অবস্থাটিই যেন বিরাজ করছে না। আলডাস হাক্সলি বলেছিলেন ঃ "Facts do not cease to exist because they are ignored" সত্যকে আমরা যদি ভয় পাই এবং সত্যের মুখোমুখি হতে যদি শুধু পিছিয়েই থাকি, তাহলে সামনে এগুবার পথ অবধারিতভাবে রুদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। গণতন্ত্র ও নির্বাচনী রাজনীতির নামে এক ধরনের জনতুষ্টিবাদী রাজনীতি দেশে দেখা দিয়েছে, যা উদারতাবাদের জন্ম দিয়েছে, দাবী করা সত্ত্বেও অনুদারতাবাদী ইল্লিবারেল ডেমোক্রেসিকেই লালন করছে। সম্ভবত এ দৃশ্যপটটি মনে রেখেই প্রখ্যাত নাট্যকার ইবসেন বলেছিলেন, "The most dangerous foe to truth and freedom in midst is the compact majority. Yes, the damned, compact, liberal majority." এ ধরনের গরিষ্ঠের সামনে বাস্তবতা ও সত্য উচ্চারণ খুবই কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। কারণ নানান ঘাত-প্রতিঘাতে এমনই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যে পরিস্থিতিতে সত্য উচ্চারণকে শুধু অবিশ্বাসই করা হয় না, তা ভুল বোঝাবুঝিরও জন্ম দেয়। ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেক Proverbs of Itellaতে বলেছিলেন, "Truth can never be told so as to be understood not be believed." তবে তিনি এও হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন তাঁর Auguries of Innocence -এ যে, অসৎ উদ্দেশ্যে সত্য উচ্চারণ মিথ্যা আবিষ্কারকেও হার মানিয়ে যায়। "A truth that told with bad intent, beats all the lies you can invent." আজ দেশের এই পতনোন্মুখ পরিস্থিতিতে অনেককেই এ ধরনের বকধার্মিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে 'সত্য উচ্চারণ' করতে দেখি এবং বিরোধী দল–বিরোধী পত্র-পত্রিকায় সেগুলো ফলাওভাবে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক প্রচার লাভ করতেও দেখি। আমাদের সামনে যে প্রায় অসম্ভব ও দুঃসাধ্য কাজটি রয়ে গেছে, তাকে এক কথায় বলা যায়–হাঙ্গর এবং কুমিরের মাঝে দিয়ে সাঁতরে তীরে পৌছানো এবং আজ সাহস করে এই পথের দিশা যিনি দেখাতে পারবেন, তিনিই দেশ বরণ্যে মহোত্তম ব্যক্তি হিসেবে

www.pathagar.com

জনগণের অন্তরে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত হবেন। বকধার্মিকতা নয়, প্রয়োজন সেই সত্য উচ্চারণের যা মানুষকে মুক্তির দিশা দেবে। মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করবে এবং শেষ অবধি মুক্ত করবে। এ ধরনের ভয়ঙ্কর সত্য মানুষ সবসময় শুনতে চায় না, এড়িয়ে চলতে চায়। দেশনায়কোচিত বা রাষ্ট্রনায়কোচিত নেতৃত্বের কর্তব্য হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর সত্যটিকেই সামনে নিয়ে আসা, জনগণের সামনে উন্মোচন করে তোলা। আমেরিকান কবি Herbert Agar 'The time of greatness'-এ বলেছিলেন, "The truth which makes men free is for the most part the truth which men prefer not to hear." আজ চারদিকে অসৎ লোক সংঘবদ্ধ হয়েছে, সৎ লোকদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না। তাদের এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে লাখো শহীদের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বদেশ ঘৃণ্য মানবেতর কিছু প্রাণীর পদতলে বলি হয়ে যাবে। রক্ষণশীল হলেও বাগ্মী হিসেবে এডমন্ড বার্কের খ্যাতি সর্বজননিদিত। "Thougts on the cause of the present discontents.'-এ লিখতে গিয়ে তিনি তার স্বদেশবাসীর কাছে এই আহ্বান রেখেছিলেন ঃ "When bad men combine, the good must associate; else they will fall, one by one, and unpitted sacrifice in a contemptible struggle."আজ প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয়করণ, আত্মীয়করণ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বার্থসংরক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষমতাসীন দলের 'দেশ গঠনের' একমাত্র নীতি। কিন্তু এ অবস্থা চলতে দিলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা অর্জন, সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, গণতন্ত্র লালনের আকাঙ্খা সবই নস্যাৎ হয়ে যাবে। কাজেই, আজ চিহ্নিত শত্রুকে না চেনার ভান করে চুপ করে বসে থাকার কোন সুযোগ আর নেই। আজ একথা মনে রাখতে হবে, মৃত্যুভয়কে পায়ের ভৃত্য করে আমাদের গণআকাঙ্খাকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে বিজয়ী হতেই হবে।

Bernard Bee-এর ভাষায় বলবো "Let us determine to die here and we will conquer." গ্যারিবল্ডি, ম্যাৎজিনি এবং ইম্যানুয়েল যেভাবে ইটালিকে প্রণোদিত করেছিলেন এবং বহুধাবিভক্ত জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করতে গিয়ে যে প্রণোদনায় ইটালীয় ও জার্মান্ নাগরিক ও তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, আসুন, আমরা সেখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করি–আমাদের অবিভাজ্য জাতীয় চেতনাকে রক্ষার জন্য কর্মকুণ্ঠ না হয়ে সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শুধু কাজ আর কাজে আত্মনিয়োগ করি। দেশদ্রোহী, রাষ্ট্রঘাতী চক্র ও বিরোধী শিবিরে অবস্থানরত বর্ণচোরা নিয়োগী ও চরদের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার এখনই মহত্তম সময়। বিসমার্ক তরুণদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "To youth, I have but three words of counsel work, work, work."এ কাজ করতে গিয়ে সামাজিক দর্শন বিযুক্ত হয়ে অগ্রসর হওয়া অধঃপতিত জীবনের ইতর জড়বাদী পথে ধাবিত হওয়ারই শামিল হবে। তাই, সমাজ দর্শন, যা এদেশের গরিষ্ঠ মানুষকে যুগে যুগে প্রেরণা ও প্রণোদনা দিয়ে এসেছে, তাকে আমাদের আরও নিবিড়ভাবে ঐকান্তিকতার সঙ্গে ভালবেসে আঁকড়ে ধরতে হবে। ধর্মের নাম শুনলে যারা আঁতকে ওঠেন, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু নৈতিকতা, শ্রেয়বোধ এবং সত্যনিষ্ঠ মানবিকতার প্রতিষ্ঠা ধর্ম বিহনে সম্ভব নয়। সেকারণেই গভীরভাবে আমাদের দর্শন অধ্যয়ন করা উচিত। দর্শনশাস্ত্রের কথা শুনে আঁতকে ওঠার কোন কারণ নেই। ফ্রান্সিস বেকন স্বীকার করেছেন যে, একথা সত্য সামান্য দর্শন চর্চা মানুষকে নাস্তিকতার দিকে প্ররোচিত করতে পারে বটে, কিন্তু দর্শনের গভীরে যিনি অবগাহন করেছেন, তিনি পরম সত্য আবিষ্কার করেছেন, ধর্ম চর্চা ও ধর্মনিষ্ঠতার মধ্যে। পরিশেষে, ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেইককে উদ্ধৃত করে এদেশের দেশমনস্ক সকল কর্মবীর ও বিদ্বৎজনদের প্রতি এই বলে আহ্বান জানাতে চাই। আসুন, দাসানুদাসের বংশধরে পরিণত না হয়ে আমরা নিজেদের জন্য একটি ন্যায়ানুগ সমাজ গড়ে তোলার মহাকর্মযজ্ঞে ব্রতী হই। ব্লেইক বলেছেন ঃ "I must create a system, or be enslaved by another man's.' I will not

www.pathagar.com

reason and compare, my business is to create." বিরোধীদল-বিরোধী পত্র-পত্রিকার সূত্র ধরে আমরা যারা রাষ্ট্রঘাতী চক্রের এবং স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ইস্পাত দৃঢ় জাতীয় ঐক্যের সংগ্রামের সাফল্য কামনা করছি, আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের ধর্ম শিখিয়েছে, আমাদের স্রষ্টা শিখিয়েছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত এবং আজ ভারতের কৃপাপুষ্ট ক্রীড়নকদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অর্জিত জাতীয় ঐক্যে যারা ভাঙন ধরাতে চান, বা ঐক্যকে যারা দুর্বল করতে চান, এ ঐক্যের গতিকে যারা শ্লথ করতে চান, এ ঐক্যকে যারা কাগুজে ঐক্যে রূপান্তর করতে চান, তারা জাতীয় বেঈমানদের গর্ভেই জন্ম নিয়েছে–এ কথা অনস্বীকার্য। রাজা চার্লসের গর্দান নেয়ার সময় ইংরেজ বিচারক John Bradshaw বলেছিলেন, "Rebellion to tyrants is obedience to God" আজ বাংলাদেশের রাজনীতি সুস্পষ্টভাবে জাতির প্রতি যাদের ঈমান আছে, তারা এবং জাতীয় বেঈমান যারা, তারা-এ দু'টি শিবিরে বিভক্ত। ঈমানদারদের পক্ষে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ, আর জাতীয় বেঈমানদের সঙ্গে রয়েছে ইবলিস নামক শয়তান। এই শয়তান আমাদের প্রতিবেশী সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্যবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত। শত্রু সুকৌশলে এ অপশক্তিবিরোধী শিবিরের দোদুল্যমানতা ও দোলাচলের সুযোগ নিয়ে বিস্তৃত কর্মজাল সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক দলসহ নানা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থ্যায় নিয়োগী ও চরদের সম্মিলিত অপসংঘ ইখওয়ানুল শায়াতীনকে ভেঙে তছনছ করে দিতে কার্পণ্য করলে তাদের গোলামের গোলাম তস্য গোলামে পরিণত হতে হবে। অতএব, এখনও সময় আছে, যে যেখানে আছেন, প্রস্তুত হোন। আঘাত হানুন। শয়তানের আখড়ায় আঘাত হানুন। সম্প্রসারণবাদের ডেরায় আঘাত হানুন। আধিপত্যবাদীদের নিয়োগী ও চরদের মুখোশ উন্মোচন করে দিন। এটিই হচ্ছে–এখনকার সকল দেশপ্রেমিকের একমাত্র কাজ এবং একমাত্র লক্ষ্য। প্লেটোর ভাষায় বলবো ঃ "Blessed is he who has found his work : let him ask, ask no other blessedness." ভারসাম্যহীন ব্যবস্থার অপনোদনের জন্য, নয়া ব্যবস্থার জন্য কাজ করার এই হচ্ছে মহত্তম সময়।

১৯৭৫-এ ১৫ অগাস্ট এবং ৭ নভেম্বর যে জাতীয় চৈতন্যের উদ্বোধন হয়, আত্মমর্যাদা ও সার্বভৌ' যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে, তার পেছনে যে চৈতন্য ও প্রণোদনা কাজ করেছিলো, তা বিস্মৃত হয়ে 'মুক্তিবুদ্ধি'র নামে প্রগতিশীলতার নামে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' নামে সেই চেতনা থেকে বিচ্যুত হওয়া জাতিগতভাবে আত্মহত্যারই শামিল হবে। ইংরেজ কবি বায়রণের ভাষায় তাই রাজনীতি ও দেশমনস্ক কর্মবীরদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,

"He would not yield dominion of his mind
To sprite against whom he rebelled."

www.pathagar.com

২২ জুলাই ২০০০

দেহ ও মনের স্বদেশ

মাহবুব উল্লাহ :

শৈশবে যেসব ধ্যান-ধারণা মানুষের চেতনা ও মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সেই সব ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া প্রায় অসাধ্য। শৈশব থেকে জানি, উপমহাদেশের রাজনীতিতে সবচাইতে কঠিন সমস্যাটি হল, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের বিষয়টি। আমাদের প্রজন্মের বেশীরভাগ মানুষই ছোটবেলা থেকে এমন কথা শুনে এসেছেন যে, ব্রিটিশের ভাগ কর ও শাসন কর– ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Divide and rule policy-এ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির জন্ম দিয়েছে এবং পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রদায়িকতার পরিণতি যেহেতু বিভেদ, অনৈক্য, সংঘাত, সংঘর্ষ, ঘৃণা ও বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতায় উন্মত্ত মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে তাই যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে আমার বরাবরই কৌতূহল ছিল। বিশেষ করে সমকালীন রাজনীতির গতিপ্রকৃতি এবং উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক এই বিষয়টির প্রতি আমাকে আরও অনুসন্ধানী হতে অনুপ্রাণিত করেছে। না জেনে, না শুনে, কোন প্রকার অনুসন্ধান না করে কোন বিষয় সম্পর্কে শোনা কথায় আস্থা স্থাপন করা অত্যন্ত মারাত্মক এবং এভাবে বিনা প্রশ্নে কোনও বক্তব্যকে মেনে নিয়ে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য খুবই ক্ষতিকর হতে পারে।

কাজী আবদুল ওদুদ এদেশে একজন মনীষী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। শিখাগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা কাজী আবদুল ওদুদের চিন্তা-ভাবনার সাথে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই পরিচয় নেই। বাংলা একাডেমী ছয় খণ্ডে কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী প্রকাশ করেছে। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'মুসলমানের পরিচয়' প্রবন্ধে বলেছেন, "স্যার সুরেন্দ্রনাথ তাঁর *A Nation in Making* গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সূচনা স্বদেশী আন্দোলন থেকে, তার পূর্বে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক মধুর ছিল। এ ধারণা শুধু স্যার সুরেন্দ্রনাথের নয়, আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির... আপাত বলা যায়, কোনও কোনও অর্থে একথা সত্য, যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– "বিচ্ছিন্ন জিনিস জড়ের মত পড়িয়া থাকিলে তবু টিকিয়া থাকে, কিন্তু কোন উপায়ে কোন বায়ু বেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে। তার অভ্যন্তরের সমস্ত দুর্বলতা নানা মূর্তিতে জাগিয়া উঠিয়া তাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয় (দ্রঃ পথ ও পাথেয়)।" স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে রাজনৈতিক স্বার্থবোধ দেশে জাগল তার ফলে দেশের বিভিন্ন শ্রেনীর মধ্যে বিরোধ উত্তরোত্তর প্রবল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কাজী আবদুল ওদুদ আরও বলেছেন, "...কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে এদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ মধুর ছিল, ঐতিহাসিক সাক্ষ্য তার বিরুদ্ধে। এমনকি, দেশের এই দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অপরিচয়ের সম্বন্ধ ছিল এও বলা যায় না। মোগল শাসনের শেষভাগে গুজরাটে ও কাশ্মীরে যে দু'টি ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল, বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'সিয়ারুল মোতা আখেরীন–'এ তার উল্লেখ আছে এভাবে ঃ সম্রাট ফেরোক শিয়ারের সিংহাসনারোহণের বছরে আহমদাবাদে বিষম মাতামাতি হত। আঙিনা সংলগ্ন ও আঙিনার অল্প অংশের অধিকারী মুসলমান গৃহস্থেরা তাতে আপত্তি করলে। হিন্দু গৃহস্থ সে আপত্তি শুনল না। বলল, প্রত্যেকের তার নিজের বাড়ীতে সর্বময় কর্তৃত্ব আছে। পরের দিন পড়ল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) -এর মৃত্যুবার্ষিকী। সেই

www.pathagar.com

উপলক্ষে মুসলামান গৃহস্থেরা একটি গরু কিনে এনে সেই আঙিনায় জবাই করলে। এতে সেই অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করলে, মুসলমানরা পালিয়ে যে যার বাড়ীতে আশ্রয় নিলে। তখন সেই ক্ষিপ্ত হিন্দুজনতা গো-হত্যাকারী কসাইয়ের সন্ধান করলে; তাকে না পেয়ে তার চোদ্দ বছরের ছেলেকে গো-হত্যার স্থানে বলি দিলে। তখন শহরের সমস্ত বিক্ষুব্ধ মুসলমান ও আফগান সৈন্য কাজীর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলে। কাজী জানতেন, শাসনকর্তা দাউদ খাঁ পন্নী এ ব্যাপারে হিন্দুদের পক্ষ নিয়েছেন, তিনি এদের মুখের ওপরে দরোজা বন্ধ করে দিলেন। তারা উত্তেজিত হয়ে কাজীর সদর দরোজা ভাঙলে- হয়ত কাজীরই গোপন ইঙ্গিতে। তারপরে আরম্ভ করলে শহরের হিন্দু দোকানে আগুন দিতে। অচিরেই কাপুরচাঁদ নামক একজন রত্নবণিক লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের বাধা দিলে। কয়েকদিন এইভাবে গণ্ডগোল চলল। শেষে শাসনকর্তা মুসলমানদেরই বেশী দোষী সাব্যস্ত করলে।" এরপর কাজী আবদুল ওদুদ কাশ্মীরের একটি দাঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন। যে দাঙ্গাটি পূর্বোক্ত দাঙ্গার কিছুকাল পরে ঘটে। এই দাঙ্গার ঘটনাও 'সিয়ারুল মোতা আখেরীন'-এ বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখক কাশ্মীরের সেই দাঙ্গাকে একদল শয়তানের কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ মনে করেন, 'হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধে যারা বুঝতে চান, তাদের জন্য সেকালের এ দু'টি ঘটনাই খুব অর্থপূর্ণ। একালের কলকাতা, ঢাকা, কানপুর, চাটগাঁ প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সাথে এ সবের আশ্চর্য মিল রয়েছে।' আহমদাবাদের ঘটনাটি থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তা হল, ধর্মীয় সহনশীলতার অভাবই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের আশু কারণ। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সেখানকার মুসলমান শাসক হিন্দুদের পক্ষ নিয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমান কাজী মুসলমানের পক্ষ নিয়েছিল। এই ঘটনাটি থেকে আমরা যা বুঝতে পারি, তা হল ব্রিটিশ পূর্ব ভারতে মুসলমান শাসকেরা ঢালাওভাবে হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না, বরং রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রয়োজন বোধ করলে হিন্দুদের পক্ষাবলম্বন করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মূলে অত্যন্ত গভীর ও স্পর্শকাতর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো নিহিত আছে।

অনেকেই মনে করেন, আওরঙ্গজেবের শাসননীতি ভারতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের জন্ম দিয়েছে। ইতিহাসের ঘটনা কিন্তু অন্য কথা বলে। ১২২৬ সালে বার্তু নামে অযোধ্যার একজন হিন্দু শাসক এক লাখ বিশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করেন। এই হিন্দু রাজা মুসলমান সৈনিকদের প্রাথমিক বিজয়ের পর তাদেরকে নির্মূল করেন এবং তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতেন যে, ম্লেচ্ছদেরকে হত্যা করে আর্যাবর্ত্য অর্থাৎ আর্যদের আবাস প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু প্রতিরোধ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। যে সব হিন্দু সেনাপতিরা ইসলাম গ্রহণ করত, তাদেরকে মুসলমান শাসকরা দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতেন। কিন্তু তাদের অনেকেই তাদের পৈতৃক ধর্ম বিশ্বাসে ফিরে যেতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খসরু হরিহরা ও বুক্কার কথা উল্লেখ করা যায়। বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ছিল হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের আদর্শ। আওরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতির কারণে হিন্দু প্রতিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, একথা সত্য নয়। বরং যা সত্য, তা হল দীর্ঘদিনের চাপা হিন্দু ক্ষোভকে এই নীতি স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করেছিল মাত্র। শিবাজীর মারাঠা পুনর্জাগরণবাদ এরই একটি দৃষ্টান্ত। মারাঠাদের জঙ্গী স্লোগান ছিল, হিন্দু পাদশাহী অর্থাৎ হিন্দু শাসনের পুনর্জাগরণ। জাট সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানবিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকের ঘটনা। জাটরা একটি দুর্ধর্ষ কৃষক সম্প্রদায়। জাটদের মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত ছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যে মহামতি আকবরকে ইতিহাসে 'আকবর দি গ্রেট' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যে মোগল সম্রাট হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়ে দ্বীনই ইলাহী প্রচার করে ধর্মীয় সমন্বয়বাদ চালু করতে চেয়েছিলেন, সেই আকবরের সমাধিকে জাটরা অপবিত্র ও কলুষিত করেছিল। কারণ, আকবর হিন্দু নারীদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান শাসনামলে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের সবচাইতে অদ্ভুত

www.pathagar.com

ঘটনা হল, ১৩২০ সালে খসরু খানের সিংসাহন দখল এবং তার মোনাফেকী কাণ্ডকারখানা। এই খসরু খান গুজরাটের পারওয়ারী নামক অত্যন্ত নিম্নজাতের হিন্দু বংশোদ্ভূত ছিলেন। পারওয়ারীদেরকে বর্ণ হিন্দুরা চরম ঘৃণা করত। নগরীর মধ্যে বসতবাড়ী নির্মাণের অধিকার পারওয়ারীদের ছিল না। তাদেরকে গ্রামের চৌকিদার, কুলি ও পাহারাদার হিসেবে নিয়োগ করা হত। এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে খসরু খান কুতবউদ্দীন মোবারক খিলজীকে হত্যা করেন এবং শাসক পরিবারের সব পুরুষ শিশুকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। পারওয়ারীরা খিলজী নারীদের নির্বিচারে সম্ভ্রমহানি ঘটায়। কয়েকমাস ধরে তারা নানা ধরনের দুষ্কর্ম চালায়। মুসলিম কুলনারীদের দাসীতে পরিণত করা হয় এবং স্বয়ং খসরু খান নিহত প্রভুর স্ত্রীকে নিজ আওতাধীনে নিয়ে নেন। মসজিদের মিনারে মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং কোরআন শরীফকে বসবার আসনরূপে ব্যবহার করা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, ব্রাহ্মণরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই নিম্নবর্ণের পারওয়ারীদের কর্মকাণ্ডকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুদ্ধতা প্রদান করে। ঐতিহাসিক বারাণীর মতে, দিল্লীর হিন্দু জনগণ আবার হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আনন্দ উৎসব করেন। পারওয়ারীদেরকে পুনরায় হিন্দু ধর্মের আওতায় গ্রহণ করতে হিন্দু ব্রাহ্মণদের দ্বিধা ছিল না। রাজপ্রাসাদের হিন্দুধর্মীয় উৎসব ও আচারাদি পালন করার জন্য হিন্দু ব্রাহ্মণের অভাব ঘটেনি। ঐতিহাসিক শ্রী রাম শরণ শর্মার মতে, হিন্দু সমাজে এ ধরনের ঘটনা একটি বিপ্লবের সমতুল্য। ইতিহাসের পাতা থেকে এতগুলো নজির উল্লেখ করার পেছনে কারণ হল, এতদঞ্চলের সাম্প্রদায়িকতাকে বুঝতে গেলে শুধুমাত্র কলকাতা, বিহার, নোয়াখালী এবং পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কথা বলাটাই যথেষ্ট নয়। উল্লেখ্য, '৪৭-এ ব্রিটিশ শাসন অবসানের প্রাক্কালেই এসব এলাকায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিন্ম জনগোষ্ঠীর বিরোধ, মূল ভারতীয় জনগোষ্ঠী ও বিদেশ থেকে আগত জনগোষ্ঠীর বিরোধ নয়। যাঁরা মুসলমান হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের বেশীরভাগই ছিলেন ভারতে জন্মগ্রহণকারী এবং এখানকারই বাসিন্দা। ইরান-তুরান থেকে মুসলমানরা এসেছিল বটে। তবে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তাদের কোনক্রমেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

অতীতের ইতিহাস ভাল করে জানলে বর্তমানকেও বোঝা সহজ হয়। গত ১৪ জুলাই ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে হিন্দু সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ যেসব হুমকি উচ্চারণ করেছেন, তা চরম রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। তাদের উচ্চারিত কথাবার্তা শুনে মনে হয়, হিন্দুদের প্রতি যারপরনাই দুর্বল আওয়ামী লীগকেও কোন প্রকার ছাড় দিতে তারা নারাজ। 'গণেশ উল্টে যাবে' এ ধরনের হুমকিও উচ্চারণ করা হয়েছে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, দুর্ধর্ষ হিন্দু জাট সম্প্রদায় সম্রাট আকবরের সমাধিকেও অপবিত্র করতে পিছপা হয়নি। যদিও আকবর হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি প্রচণ্ড পক্ষপাতিত্ব করেছেন। আজকের আওয়ামী লীগ হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা সত্ত্বেও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্যপরিষদের নেতাদের কঠোর সমালোচনা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এটা ইতিহাসের এক বিরল ধারাবাহিকতা। পূজা উদযাপন কমিটির সভায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্যপরিষদের নেতা ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেছেন, "এই পূজা উদযাপন কমিটি শুধু পূজা অর্চনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটি একটি আন্দোলন। আর আমাদের এই আন্দোলনের ফলে আগে সারাদেশে যেখানে ৫ হাজার পূজা হতো, এখন সেখানে ১৫ হাজার পূজা হচ্ছে। পুরনো মন্দির সংস্কারের পাশাপাশি নতুন নতুন বহু মন্দির নির্মিত হচ্ছে। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি হচ্ছে। অনেকে সচিবসহ বড় বড় পদে সমাসীন হতে পারছেন। এভাবে বাকী দাবী-দাওয়াও আন্দোলনের চাপে আদায় করা হবে। এজন্য সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।" তিনি উল্লেখ করেন, "অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল হলে তা হবে আমাদের একটি বিরাট অর্জন। এরপর সংবিধানের পঞ্চম (বিসমিল্লাহ) ও অষ্টম (রাষ্ট্রধর্ম) সংশোধনীও বাতিল করানো

www.pathagar.com

হবে এবং বাতিল একদিন হবেই। কারণ, আন্তর্জাতিক সমর্থন আমাদের পেছনে রয়েছে। আমরা তাই বিনা চ্যালেঞ্জে কোনকিছু ছেড়ে দেব না।" নিম ভৌমিকের বক্তব্য থেকে যা প্রতীয়মান হয়, তা হল, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ৫০ লাখ হিন্দু ভারতে চলে যাওয়া সত্ত্বেও এ দেশে তাদের পূজা-অর্চনা ঘটা করে প্রসার লাভ করছে। সংখ্যালঘু জনসংখ্যা কমছে অথচ আনুষ্ঠানিক পূজার সংখ্যা ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজারে উন্নীত হয়েছে। এটা কি সাম্প্রদায়িক 'নিগ্রহ ও নির্যাতনের' যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ উচ্চপদে সমাসীন হচ্ছেন, কি সামরিক বাহিনীতে, কি বেসামরিক আমলাতন্ত্রে, এরপরও তাদের অভিযোগের অন্ত নেই। নিম ভৌমিক জানাবেন কি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে রাষ্ট্রীয় উচ্চতর পদে মুসলমানদের সংখ্যা কত? বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্কুল ও কলেজে মুসলমান অধ্যাপক ও শিক্ষকের সংখ্যা শতকরা কত জন? সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা লিখে দিলেই সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায় না। রাষ্ট্র সংখ্যালঘিষ্ঠ ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি উদার হয়ে যায় না। নিম ভৌমিক তার মনের লুকানো কথাটি অজান্তে প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "পূজা উদযাপন নিছক পূজা নয়, এটি একটি আন্দোলন।" কী অদ্ভুত ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য! বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০) হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের প্রথম দিককার প্রথমকালের নেতা। বাল গঙ্গাধর তিলক মনে করতেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি উচ্চবর্গীয় প্রতিষ্ঠান। সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই সংগঠন বেশীদূর এগুতে পারবে না। সাধারণ মানুষের (হিন্দু জনতার) রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তিলক গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবকে বেছে নিয়েছিলেন। গণেশ পূজাকে কেন্দ্র করে হিন্দুচেতনাকে জাগ্রত ও সমুন্নত করাই ছিল তিলকের লক্ষ্য। ভারতের চন্ডীগড়ের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. পুরুষোত্তম মেহরা (Dr. Parshotam Mehra) লিখেছেন, "Acutely conscious of the Government's policy of openly favouring the Muslims and inciting Hindu-Muslim clashes, as evidenced in the Bombay riots of 1893-4, he tried to arouse national pride and Hindu unity by revitalizing well-known religious festivals, and resurrecting forgotten national heroes. Thus in 1894, he revived in Ganapati festival and two years later the Shivaji festival... ... Ranade and his friends feared that the Ganapati festival by arousing the communal consiousness of Hindus was bound to provoke a reaction from the Muslim community. Tilak refused, however to be impressed by this line of reasoning and maintained that the Government was not holding the scales even between the two communities of such contentious issues as processions in public places; music before mosques and cow slaughter." (*A Dictionary of Modern Indian History : 1707–1947*, OUP, Delhi, 1985)

নিম ভৌমিকরা উগ্র হিন্দু জাত্যাভিমানী নেতা বলে গঙ্গাধর তিলকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পূজা উদযাপনকে তাদের মনের গোপন কুঠুরীতে লুক্কায়িত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আমাদের দেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে কঠোর নিন্দাবাণী উচ্চারণ করলেও হিন্দু ধর্মকে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তথা অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের হাতিয়ার রূপে বিবেচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। এর মধ্যে তারা কোন সাম্প্রদায়িকতা দেখতে পান না। উপমহাদেশের দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। এই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের মধ্যে বহু শতাব্দীর সন্দেহ, অবিশ্বাস, পৃথক অস্তিত্বের চেতনা ক্রিয়াশীল রয়েছে। এই দুই সম্প্রদায়ের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ককে এবং এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলোকে উপলব্ধি না করে এবং এই সম্পর্কের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে না বুঝে কেবলমাত্র অসাম্প্রদায়িকতার শূন্যগর্ভ উচ্চারণ

www.pathagar.com

কোনদিনই এই দুই সম্প্রদায়কে পরস্পরের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করবে না। দেহের খোরাকের জন্য বাংলাদেশ আর আত্মার খোরাকের জন্য ভারতমুখীনতার বৈপরিত্য যতদিন না ঘুচবে, ততদিন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে সামষ্টিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠবে না।

আফতাব আহমাদ :

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বিরাট অর্জন হচ্ছে, প্রকৃতিকে বশীভূত করে যুক্তিনির্ভর সর্বজনগ্রাহ্য একটি সহিষ্ণু সমাজ জীবনের বিকাশ সাধন। অন্ধত্ব, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা, হিংসা-বিদ্বেষ এবং মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার জন্ম কবে, কিভাবে ঘটেছিল, তা ইতিহাসের গভীর সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু। তবে, যুগে যুগে, কালে কালে মানুষের চিন্তার, বিশ্বাসের এবং দর্শনের বৈপরিত্য কিংবা বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সভ্যতার অগ্রগতি আলোকিত মানুষকে এ শিক্ষাই দিয়েছে, পরমতের প্রতি ধৈর্যের সঙ্গে পরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হয় এবং গরিষ্ঠের মতামতকে শ্রদ্ধা ও লালন করতে হয়। লঘিষ্ট যখন গরিষ্ঠের প্রতি উদ্ধত ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করার প্রয়াস পায় তখন এর কারণের মর্মমূলে অনুসন্ধান না করে সমস্যার সমাধান কখনোই সম্ভব হয় না। ইতিহাসে জাতি বা রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি, জাতিতে জাতিতে হানাহানি ও যুদ্ধবিগ্রহ এবং একই নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও শুধুমাত্র পৃথক জাতি রাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়ার কারণেই মানুষ মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বিষ ছড়িয়েছে। যার পরিণতিতে আমরা যদি ইতিহাসের অতীত পৃষ্ঠাগুলোর ওপর আলোকপাত করি, তাহলে চরম বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করব, ইতিহাসের অসংখ্য অধ্যায় রক্তের আখরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যুক্তি যেমন আরও অনেক পরিশীলিত ও পরিমার্জিত রূপ পরিগ্রহ করেছে, তেমনি মানুষের অন্তরাত্মার যে আকাঙ্ক্ষা তা পূরণের জন্য তার ইহজাগতিক সামাজিক মূল্যবোধ এবং পারলৌকিক বিশ্বাস ও তার চৈতন্যকে বিকশিত ও প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের দেহের পার্থিব চাহিদার বাইরেও অন্তরাত্মার যে আবেদন ও চাহিদা তা তার ধর্মবিশ্বাস তাকে দান করেছে। এখানে গোঁড়ামি বা ঔদ্ধত্য কোন আলোকিত মানুষকে প্ররোচিত করেনি। মহাজাগতিক রহস্য যা তার বোধের বহির্ভূত এবং জন্ম-মৃত্যু, জরা, ব্যাধিসহ মানুষের বেড়ে ওঠা এবং ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নেওয়া এসবই তার চৈতন্য এবং আত্মার বিরাট জিজ্ঞাসা। বিজ্ঞান এবং সৃষ্টির রহস্যভেদে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী যত সাফল্য এবং অগ্রগতি অর্জন করেছে তার সামনে তারপরও অবারিত হয়েছে সৃষ্টির বিপুলতর বিস্ময়। এ বিষয়ের সদুত্তর কেবলমাত্র ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই মানুষ খুঁজে পেয়েছে। ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যকার মনুষ্যসৃষ্ট বিদ্বেষ ও বিভেদ বলতে গেলে আজ বহু শতাব্দীর অতীতের কাহিনী। ইউরোপ, উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, কোরিয়া. চীন কিংবা পশ্চিম এশিয়া তথা আরব রাষ্ট্রসমূহ সহ আফ্রিকার ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা যা লক্ষ্য করি, তা হচ্ছে জনগণের সার্বভৌম অধিকার, জাতিরাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও অস্তিত্ব সংরক্ষণের প্রণোদনা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থসহ নানাবিধ স্বার্থের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব অনেক সময় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, দাঙ্গাসহ অমানবিকতার যে নৃশংস উদ্বোধন তা কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের মধ্যেই প্রাধান্য পেতে দেখি এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে এর যে বীভৎস রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তা মানবসভ্যতার সকল শ্রেয় অর্জনকে ম্লান করে দিয়েছে। একটি জনতুষ্টিবাদী (populist) ধারণা বহু ইতিহাসবিদ এবং সমাজমনসস্ক পর্যবেক্ষক আবেগতাড়িত হয়ে কিংবা মোহাবিষ্ট হয়ে এই বীভৎসতার পেছনে ব্রিটিশ শাসনের 'ভাগ করো শাসন করো' নীতিকেই দায়ী করে থাকেন। কিন্তু এর মধ্যে যে সত্যতা একেবারে নেই, তা নয়, তবে তার পরিমাণ তিলমাত্র, এর অধিক নয়। কারণ মানুষকে ঘৃণা করে, মানুষকে অপমান করে যে বর্ণাশ্রম প্রথা ভারতের বুকে জেঁকে বসেছিল. সেখান থেকে মানুষকে মুক্তির স্বাদ ও বাণী দিতে

www.pathagar.com

পেরেছিল একেবারে গোড়ার দিকে বৌদ্ধ দর্শন এবং তাও যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, ইসলাম মানুষের পার্থিব ও আত্মার মুক্তির শাশ্বত বাণী নিয়ে এগিয়ে আসে এবং বর্ণাশ্রমের ও ব্রাহ্মণ্যবাদের নিগড়ে নির্যাতিত ও নিষ্পিষ্ট অসহায় দলিত অবহেলিত মানুষকে প্রথমবারের মতো মুক্তিদান করে। এখানে কোনো জবরদস্তি ছিল না, কোন বল প্রয়োগ ছিল না। ছিল সাম্য, মৈত্রী এবং সৌভ্রাতৃত্বের যে মহান বাণী ইসলামের মর্মমূলে রয়েছে তার আবেদন ও আকর্ষণ। আর এ কারণেই বিপুল অহিন্দু জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মে দীক্ষা না নিয়েও মুসলমানের শাসনকে স্বতস্ফূর্ত ও আনন্দচিত্তে স্রষ্টার আশীর্বাদ হিসেবে বরণ করে নেয়।

প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানরা সুদীর্ঘকাল শাসন করা সত্ত্বেও যে আপেক্ষিক ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী ছিল, তার অসংখ্য নজির ইতিহাসের পরতে পরতে পাওয়া যাবে। মুসলমান শাসক হওয়া সত্ত্বেও রাজদণ্ডের বল প্রয়োগ করে কাউকে এ অঞ্চলে ধর্মান্তরিত করা হয়নি। কিন্তু মানুষের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যে বর্ণাশ্রম ও বিভেদের সমাজ বিনির্মাণ করেছিল, মুসলমান শাসনের ফলে তার একটি অংশ ভেঙে পড়ায় এবং বাকি অংশ বিপন্ন হয়ে পড়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এবং বর্ণভেদের 'মানবরূপী' 'মুণী' 'ঋষী'রা ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ অহর্নিশ ছড়ানোটাকেই একমাত্র পরম ধর্মজ্ঞান করেছে।

আমরা পৃথিবীর যে কোনো সভ্যদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জাতিসত্তার সংঘাতের বহু অধ্যায় প্রত্যক্ষ করব সত্য, (যার সঙ্গে জাতি রাষ্ট্র ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত) কিন্তু কেবল ধর্মবিদ্বেষের কারণে মানুষে মানুষে হানাহানি ও দাঙ্গার জন্য প্রাক-বৃটিশ আমলেই ভারতে প্রত্যক্ষ করা গেছে। এর পেছনে ইন্ধন যুগিয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মানববিদ্বেষী অশুভ তৎপরতা। আজ যে ভারতে গান্ধীর ওপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করা হয়, সেই গান্ধীও গর্ব করে বলতেন, "আমি বর্ণভেদ মানি ... মনুষ্য যোনিতেই মানুষ জন্মায়, এ জন্যই বর্ণ নির্দেশ করে।" (ইয়াং ইন্ডিয়া, ২১ জানুয়ারি ১৯২৬)। গান্ধীর কাছে দেশ বড় ছিল না, মানুষ বড় ছিল না, হিন্দুত্বই ছিল সবকিছুর উর্ধ্বে। গান্ধী বলতেন, "আমি সর্বপ্রথম হিন্দু, তারপর দেশপ্রেমিক।" (সুপ্রকাশ রায়, গান্ধীবাদের স্বরূপ, পৃষ্ঠা-৬)। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের এতো তীব্রবিরোধী ছিলেন যে, তাঁর মতে 'মুসলমানদের হৃদয় জয় করিতে হইলে আত্মশুদ্ধির জন্য আমাদিগকে তপস্যা করিতে যাইতে হইবে। ... [হিন্দু-মুসলমান ঐক্য] হইত ইতরপ্রকৃতির মানুষের সঙ্গে এক দঙ্গলের হাতে ভারতবর্ষকে সমর্পণ করার সমান। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের সেই চরম পরিণতি প্রত্যক্ষ করার জন্য আমি ১২৫ বছর পর্যন্ত বাঁচিতে ইচ্ছা করি না।" (সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুপ্ত)। হিন্দু ধর্মের অসহিষ্ণুতা, অবৈজ্ঞানিক ও অনাচারভিত্তিক বিভেদ নীতি সম্পর্কে খোদ হিন্দু গবেষকরাই বহু দৃষ্টান্ত ও নজির উত্থাপন করে বার বার প্রমাণ করেছেন যে, হিন্দুধর্ম হচ্ছে মূলত মানুষকে অপমান, অত্যাচার-নির্যাতন ও দুঃসহ জীবনের দিকে ঠেলে দেয়ার এক অভিশাপ। গান্ধী বলতেন, "সকল ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা নিয়েই হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার অনুভূতি ঠিক ... জানি, আজ বিখ্যাত হিন্দু মন্দিরগুলোতে কী পাপ ঘটছে, তবু এসব চূড়ান্ত ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমি তাদের ভালবাসি। ওগুলোতে যেমন আগ্রহ, তেমনটি অন্য কোন বিষয়ে নেই। ... মূর্তি পূজায় অবিশ্বাস নেই আমার। ... মানুষের স্বভাবের এক অঙ্গ হল মূর্তিপূজা। ... আমি মূর্তিপূজায় কোন দোষ দেখি না। (ইয়াং ইন্ডিয়া, ৬ অক্টোবর ১৯২১)। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর অশোক রুদ্র বলছেন, "আজকের দিনের হিন্দুমনকে বুঝতে ... গেলে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারাকে বোঝা প্রয়োজন ...। ... সমাজে শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতি-আচরণে যারা একেবারেই শীর্ষস্থানীয়, যারা নিজেদের খুবই আধুনিক মনের অধিকারী বলে মনে করে থাকেন, যাদের কেউ কেউ বা উগ্র রকমের পাশ্চাত্য বুর্জোয়া ভাবধারায় সিঞ্চিত, অপর কেউবা মার্কসবাদী সমাজ ও রাজনৈতিক দর্শনকে গ্রহণ করে নিয়েছে, এদের সবার মধ্যেই সন্ধান করলে একই মৌলিক মানসিক গঠন লক্ষ্য করা যায় ...।" (অশোক রুদ্র , ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন, পৃষ্ঠা-৯)। প্রফেসর রুদ্র

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ করে আরও দেখিয়েছেন, 'ভারতবর্ষীয় মানুষ জীবনের অধিকাংশ সময়েই যে নীতিবাদ অনুসরণ করেছে তা ... বর্ণভিত্তিক ধর্ম। এই ধর্ম ব্যক্তি মানুষকে নানাবিধ কর্তব্যের নির্দেশ করে কিন্তু গোষ্ঠীস্বার্থের উর্ধ্বে সমগ্র মানব সমাজের সব মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গলের কোন ধারণাই ধর্মে ছিল না। শুধু সমাজকল্যাণ নয়, বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কেও হিতাহিতের কোন ধারণাই এই ধর্মে স্থান পায়নি। ... ভারতীয় মানুষের মনে দুইটি নৈতিক প্রবণতাকে দৃঢ় ও গভীরভাবে প্রোথিত করা হয়েছিল। এই প্রবণতা দুইটি হল– বৈষম্যকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া এবং বশ্যতা স্বীকারের মনোভাব– যে কোনো অবস্থাকে বিনা প্রতিবাদে, বিনা প্রতিরোধ মেনে নেওয়া। (রুদ্র, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৫)। ইসলাম অশোক রুদ্র বর্ণিত এই দুই নৈতিকতা প্রবণতাকে উৎসাদন করে মানুষের কর্মযজ্ঞের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল এবং মানুষে মানুষে ভেদাভেদের অবসানের বাণী প্রচার করেছিল বলেই ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এত ক্ষীপ্ত হয়েছিল ও তীব্র ঘৃণা প্রচার করেছিল। অশোক রুদ্রের ভাষায় "ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যন্তরীণ সঙ্গতিহীনতা এবং তজ্জনিত হিন্দুমনের দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার আরেকটি ফল হয়েছে যুক্তির মধ্য কুযুক্তির ভেজালের ব্যাপক অনুপ্রবেশ।" (রুদ্র, প্রাগুপ্ত পৃষ্ঠা-২২)। "... হিন্দু ধর্ম চিন্তা ... অন্তর্দ্বন্দ্বে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে জীর্ণতাদশাপ্রাপ্ত হয়ে ধর্মের যা কাজ অর্থাৎ ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনকে ধারণ করা, তা করতে ব্যর্থ হয়েছে।" (রুদ্র, প্রাগুপ্ত পৃঃ১১৮)। শান্তিনিকেতনের এই বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপক একজন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ও আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ হিসাবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। অথচ ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা নশ্বর গান্ধীর ওপর দেবত্ব আরোপ করে 'মহাত্মা' জ্ঞান করে 'বাপুজী' বলে সম্বোধন করতেন। এহেন 'মহান' বাপুজী বলতেন, 'ব্রাহ্মণত্বের যে অবিসংবাদী অবস্থিতি; তার কারণ তার আত্মসংযম, অন্তরের পবিত্রতা, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন– এবং এ সবই জ্ঞানের আলোয় প্রদীপ্ত। [!!!] (ইয়াং ইন্ডিয়া, ৫ জানুয়ারী, ১৯২২)। গান্ধী আরও বলেছিলেন, "আমার কাছে ধর্মশূন্য কোনো রাজনীতি নেই। ... ধর্মবিরহিত রাজনীতি এক মৃত্যু ফাঁদ। তা আত্মাকে হনন করে। (ইয়াং ইন্ডিয়া, ৩ এপ্রিল, ১৯২৪)। বলাই বাহুল্য, গান্ধী রাজনীতিতে যে ধর্মকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন, তা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ। আজকের ভারতে যে হিন্দুত্ববাদের উত্থান, তার পেছনে গান্ধীর দর্শন ও ব্রাহ্মণ্যপ্রীতি যে প্রেরণা যুগিয়েছে, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। হিন্দু মৌলবাদের তথা হিন্দুত্ববাদের আরেকজন উদগাতা হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সম্পর্কে ভবানী প্রসাদ সাহু বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯৯৮) বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মূল্যবান অবদান রাখলেও তিনি ছিলেন হিন্দুত্বের তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদের এক প্রবল প্রবক্তা, অথচ তখন এদেশে মুসলিমদের সংখ্যা কম ছিল না। 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে Letters on Hinduism [তিনি] যেমন লিখেছেন, তেমনি 'আনন্দ মঠ'-এর মত... উপন্যাসেও চরম মুসলিম বিরোধিতার আগুন জ্বালিয়েছিলেন। ...মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানানো হয়েছে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'বন্দে মাতরম' গানটি তথা পরবর্তীকালের 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসটি ভারতীয় বিপ্লবীদের [!?] বিরাট অনুপ্রেরণা যোগালেও এগুলো ছিল হিন্দুত্ববাদী ভাবনায় সম্পৃক্ত। ...হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে মুসলিম বিরোধিতা আপেক্ষিকভাবে বেশী গুরুত্ব পায়। ...সাভারকরের দেয়া হিন্দু সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়েছে, হিন্দু হচ্ছে, 'এমন মানুষ যিনি সিন্ধু থেকে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষকে নিজের পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি এবং তার ধর্মের জন্মস্থান হিসাবে মনে করেন।'

...এই সংজ্ঞা অনুযায়ী খ্রিস্টান ও মুসলিম ভারতীয় নাগরিকদের সরাসরি অভারতবর্ষীয় হিসাবে অভিহিত করা যায়। কারণ, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষ নয়। অথবা তাদের স্বধর্মের পরিচয় ত্যাগ করে 'হিন্দু' হিসাবে পরিচিত হতে হবে এবং তবেই তাদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হবে। এই সংজ্ঞার আরও প্রসারিত তাৎপর্য হচ্ছে, যেসব মতাদর্শের সৃষ্টি ঘটনাচক্রে ভারতীয় ভূখণ্ডে হয়নি, সেসব মতাদর্শের অনুসারীরাও একইভাবে বিদেশী।" (ভবানী প্রসাদ সাহু, হিন্দু মৌলবাদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮-২০)।

www.pathagar.com

হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্ব সম্পর্কে এতসব বক্তব্যের অবতারনা করার কারণ একটিই- কি ভারতীয় হিন্দু, কি বাংলাদেশের হিন্দু- এদের প্রেরণা ও প্রণোদনার উৎস কোথায়, তাদের চৈতন্য ও মন কিসের দ্বারা ও কিভাবে আবিষ্ট হয়ে আছে, তা বোঝার জন্য। আমাদের দেশের হিন্দুরা কখনওই এদেশকে তাদের স্বদেশজ্ঞান করেছে কিনা তাতে গভীর সন্দেহ রয়েছে। কারণ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাববিজ্ঞানের অধ্যাপক রঞ্জিত কুমার দে তার এক প্রবন্ধে দাবী করেছেন, 'বাংলাদেশে চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, জাপান, থাইল্যান্ড ইত্যাদির কোটি কোটি দালাল যদি থাকতে পারে তাহলে মুক্তিযুদ্ধের পরীক্ষিত [?] প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের দালাল থাকতে আপত্তি কোথায়? বরং এদের সংখ্যাই তো সর্বাধিক হবার মত যাবতীয় কারণাদি বাস্তবে বিদ্যমান। অর্ধশতাব্দী ধরে [বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের বয়স মাত্র ২৯ বছর] ভারতের দালাল অপবাদ দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যেভাবে অপমানিত করা হচ্ছে, তা যদি তাদের কাছে একান্তই সত্য হয়ে যায়, তার ফলাফলও খুব একটা ভাল হবে না...।' (অধ্যাপক রঞ্জিত কুমার দে, ঐক্য পরিষদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গ নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। প্রকাশ্য হুমকি!! বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুদের অংশগ্রহণ ছিল নামমাত্র। ভারতীয় শরণার্থী শিবিরে এবং ভারতে বসবাসরত পুত্র-কন্যা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের নিরাপদ আশ্রয়ে ৯টি মাস অতিবাহিত করাটাকেই তারা শ্রেয়তর প্রথা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। তারা আরও ভেবেছিল পাকিস্তান খণ্ডিত হয়ে যাবার পর বাংলাদেশ ভারতের পেটের ভেতর হজম হয়ে যাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে এদেশের লড়াকু মানুষের সশস্ত্র ইস্পাতকঠিন ঐক্যের কারণে এবং শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের আতিথেয়তা গ্রহণের পরিবর্তে পাকিস্তানের কারান্তরালে থাকার কারণে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১-এ বাংলাদেশ গ্রাস করার সামান্যতম সাহস দেখাতে পারেননি। কিন্তু ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকচক্র ১৯৪৭-এর ব্রিটিশ-ভারত বিভাজনকে যেমন মেনে নেয়নি, তেমনি বাংলাদেশকে গ্রাস করার লোভও কখনও পরিহার করেনি। খোদ ভারতীয় পত্রপত্রিকা এবং ভারতীয় লেখক ও গবেষকদের নানা রচনার মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও যেসব ইহুদী প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রে বিশ্বাস করে, সেসব ইহুদী এমন কি খ্রিস্টানও আরব মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে PLO-কে সমর্থন করে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের নামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চর ও নিয়োগীরা এদেশে যে 'ঐক্য পরিষদ' গঠন করেছে তা যে ভারতের পরামর্শে ও অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হয়, তা আজ প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। একই কথা প্রযোজ্য পূজা উদযাপন পরিষদ সম্পর্কেও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিমচন্দ্র ভৌমিক দম্ভের সাথে ঘোষণা করেছেন যে, পূজা উদযাপন পরিষদ নেহাত পূজা অর্চনার একটি প্রতিষ্ঠান নয়- এটি একটি আন্দোলন। নিমচন্দ্র দাবী করেছেন, তাদের আন্দোলনের ফল হিসেবে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্পর্শকাতর সংস্থাসমূহ উচ্চতর পদে বর্তমানে হিন্দুরা পদোন্নতি লাভ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌলিন্য অর্জন করেছে। নিমচন্দ্ররা হুমকি দিয়েছে, তাদের দাবী যদি মানা না হয়- সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম যদি বাদ দেয়া না হয় এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এই বিধান যদি উচ্ছেদ করা না হয়, তাহলে তারা আন্তর্জাতিক মদদ, সাহায্য ও সহযোগিতায় বাংলাদেশকে খণ্ডবিখণ্ড করে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। এই দেশদ্রোহী ও রাষ্ট্রঘাতী চক্রের মূল প্রেরণা ব্রাহ্মণ্যবাদ, অখণ্ড ভারত, বঙ্কিম, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বাহ্যত ও আপাতদৃষ্টিতে যত অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে অনেকের কাছে চিহ্নিত হয়ে থাকুন না কেন, পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের কৃষকপ্রজাদের শোষণ ও দোহন করে জোড়াসাঁকো ও পৈতৃক জমিদারীর ঠাঁটবাটের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ তথা রাঢ়াঞ্চলের কেউ তাকে কন্যাদান করতে যখন অস্বীকার করে, এবং বাংলাদেশের মেয়েকেই যখন স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হন, তারপরও তার অন্তরাত্মা হিন্দুত্বের মহিমাকীর্তনেই অনুরণিত হত। যতই তিনি ব্রাহ্মধর্ম পালন করে থাকুন না কেন,

www.pathagar.com

অস্থিমজ্জায় তিনি ছিলেন হিন্দুত্ববাদী। তাঁর স্বপ্ন ছিল রামরাজ্যের স্বপ্ন। তাই 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় তিনি সদম্ভে উচ্চারণ করেছিলেন,

"অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন–'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
... সেই মত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব-ভারতে
কী অপূর্ব হেরী,
বঙ্গের অঙ্গন দ্বারে কেমন ধ্বনিল কোথা হতে
তব জয়ভেরী। ... সেদিন শুনিনি কথা– আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিব সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবাসন...
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে ভারত' এ মহাবচন
করিব সম্বল।
মারাঠীর সাথে আজি হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজী'
মারাঠীর সাথে আজি হে বাঙালী, এক সাথে চল
মহোৎসবে সাজি।"

'বঙ্গভূমি আন্দোলন' যে মিথ্যা নয়, তা আজ নিমচন্দ্রদের দাম্ভিক উচ্চারণে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। পঞ্চম বাহিনী হিসেবে, ভারতীয় চর বা নিয়োগী হিসেবে বাংলাদেশকে ভারতভুক্তির দিবাস্বপ্ন যারা দেখে, তাদের সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই, এদেশের মানুষের অবিনাশী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করো না, এদের কাছে যুগে যুগে কুচক্রী এবং অশুভ শক্তি চরম পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে নিয়েছে। বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে যে দেশ আমরা অর্জন করেছি, তা ভারতীয় চর ও বেতনভুক্ত নিয়োগীদের ভোগ ও আস্ফালনের জন্য নয়। কসম শহীদের রক্তের, কসম যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের, কসম এদেশের পুণ্য মাটির, এখনও সময় আছে, ষড়যন্ত্রকারী ও পঞ্চম বাহিনী সাবধান হয়ে যাও, তা না হলে ইতিহাসের অমোঘ বিধানে তোমাদের জন্য যে নিয়তি অপেক্ষা করছে, তা থেকে তোমরা কোনভাবেই পরিত্রাণ পাবে না।

www.pathagar.com

২৯ জুলাই ২০০০

সন্ত্রাস, সুশাসন ও রাষ্ট্র

মাহবুব উল্লাহ :

দেশ কোন পথে চলেছে-এ প্রশ্ন আজ সবার। কি ছাত্র, কি যুবক, কি সরকারী আমলা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সামরিক-বেসামরিক আমলা, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি- সকলেরই এক প্রশ্ন-দেশে কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, আর কী হতে যাচ্ছে? বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, যাদের বেশীরভাগই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, যেসব মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে কিছু উপরে অবস্থান করে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে, আর যারা অঢেল বিত্তবৈভবের মালিক- সকল স্তরের, সকল শ্রেণীর মানুষের মনে আজ শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, নিরাপত্তা নেই। গৃহের অভ্যন্তরেও পৈতৃক প্রাণটি দুর্বৃত্তের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে কিনা, এ কথা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারব না। সাধারণভাবে বলা যায়, দেশে এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্য অপশাসন বা Bad Governance-ই দায়ী। এই অপশাসনের মূলে রয়েছে আইনের শাসনের প্রতি এবং আইনের প্রতি ক্ষমতাধরদের অশ্রদ্ধা।

আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক আমল থেকে বিচার ব্যবস্থা কখনোই স্বাধীন ছিল না। বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা দেয়ার জন্য রাজনীতিবিদেরা বহুবার শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার কথা বলেছেন। বিশেষ করে কোন রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতার বাইরে থাকে, তখনই বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগকে পৃথক করার প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে, কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর এই প্রতিজ্ঞার কথা তারা ভুলে যায়। কারণ, বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকলে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো শাসনকার্য চালানো যায় না। শাসকরা বিচার বিভাগের মাধ্যমে জবাবদিহি করে থাকেন। সে কারণেই ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণের আশ্বাস ও অঙ্গীকার বিস্মৃত হওয়াই শাসক দলের জন্য সুবিধাজনক। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের উচ্চ আদালতগুলো বিশেষ করে হাই কোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট প্রতিকূলতা ও চাপের মুখে নিজস্ব স্বাধীনতা ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, উচ্চ আদালতগুলোও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হয়েছে। এরশাদের আমলে কোন কোন বিচারপতি চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন। শেখ মুজিবও চতুর্থ সংশোধনী করে বিচার বিভাগকে, বিশেষ করে উচ্চ আদালতকে নিজ আজ্ঞাবহে পরিণত করেন। বিচারপতির চাকরিতে থাকা না থাকা নির্ভর করতো রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতাধর ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর। জিয়াউর রহমান এই অবস্থার সংস্কার সাধন করেন। বিচারপতিদের নিয়োগ এবং অব্যাহতি ব্যক্তির খেয়াল-খুশির পরিবর্তে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে নিয়ে আসেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী হবার পর উচ্চ আদালতের প্রতি অসৌজন্যমূলক মন্তব্য উচ্চারণ করতে থাকেন। সুপ্রীম কোর্টের ফুলবেঞ্চ একজন আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে তিরস্কৃত করেন এবং তাঁকে কথা বলার ক্ষেত্রে সংযমী হতে পরামর্শ দেন। উচ্চ আদালতকে আইনের মাপকাঠি ব্যবহার করেই বিচার সম্পন্ন করতে হয়। মামলার সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের ব্যাপারে শৈথিল্য থাকলে সেক্ষেত্রে আদালতের কিছুই করার থাকে না। আদালত বিচারের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে অভিযুক্তকে অভিযোগ থেকে রেহাই দিতে বাধ্য হয়। দুর্বল সাক্ষ্য-প্রমাণের কারণে হাই কোর্টের একটি বেঞ্চ কিছুদিন আগে একটি মামলার আসামীদেরকে খালাস দেয়। কিন্তু ঐ বেঞ্চ অনুভব করে,

www.pathagar.com

ন্যায়বিচার করা সম্ভব হয় নি। কারণ মামলার তদন্ত যথাযথভাবে করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী যাতে এ ব্যাপারটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন, সেজন্য বিচারকরা মামলার রায়টি মন্তব্যসহ প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। সীমা হত্যা মামলায় একইভাবে বিচারক অভিযুক্তদের রেহাই দিতে বাধ্য হন। যদিও বিচারক অনুভব করেন, পুলিশ বিভাগ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি। এজন্য পুনর্তদন্ত অনুষ্ঠানেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী থেকে মন্ত্রী পরিষদের অনেক সদস্যই এরূপ মন্তব্য করেন যে, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার পর উচ্চ আদালত জামিন দেয় বলে দেশে সন্ত্রাস বন্ধ হচ্ছে না। বরং সন্ত্রাস বেড়েই চলেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার হত্যার ঘটনাকে উল্লেখ করে প্রায়শই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, এই হত্যার বিচার না হলে হত্যাকাণ্ডতো ঘটবেই। এই কথা বলে প্রকারান্তরে সন্ত্রাসীদেরকেই হত্যাকান্ডে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। হাই কোর্টে শেখ মুজিব হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্সের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যেভাবে লাঠি মিছিলের মহড়া ও বিচারপতিদেরকে অত্যন্ত বিগর্হিতভাবে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করা হলো এবং তাঁদের নির্ধারিত ও তাঁদের পছন্দনীয় রায় না হলে লাঠি কোথায় মারতে হবে, তা তাদের জানা আছে বলে বিচারকদেরকে যে রকম বর্বরভাবে শাসানো হলো, তাতে আর যাই হোক একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, দেশ গণতন্ত্রের পথে নয়, অসভ্য স্বৈরতন্ত্রের পথেই অগ্রসর হচ্ছে।

দেশে আইন সকলের জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় না। সরকারী দলের লোক হলে সাত খুন থেকেও রেহাই পাওয়া যায় আর সরকার বিরোধী ব্যক্তিরা পান থেকে চুন খসার অপরাধে চরম নির্যাতন ও হয়রানি ভোগ করেন। ঢাকার কলাবাগানের একটি বাড়ী জবরদখল করে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের এক সন্তান ক্ষমতার যে দম্ভ দেখিয়েছে, তা ভাবতেও অবাক লাগে। আরেক মন্ত্রীপুত্র ঢাকার অভিজাত এলাকায় জমি দখল করে মার্কেট তৈরী করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। তার ভয়ে এলাকার কোন লোক প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। শিক্ষা ভবনে গিয়েও সরকারী ছাত্র সংগঠনের কতিপয় ক্যাডার সাধারণ কর্মচারীদের ওপর যে সন্ত্রাস করেছে, তার ফলে তাদেরকে জনতার রুদ্ররোষের কবলে পড়ে গণধোলাই খেতে হয়েছে। পুলিশ আহত এই 'সোনার ছেলে'দেরকে জনরোষের কবল থেকে উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তারা যে অস্ত্র বহন করছিল, সে ব্যাপারটিকেও ধামাচাপা দিতে উদ্ধারকৃত অস্ত্র পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে পুলিশ রেকর্ড করেছে। সরকার সমর্থক সংবাদপত্রসমূহ পাঠ করে দেশবাসী জানতে পেরেছে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এইসব সন্ত্রাসীরা কিভাবে জামাই আদরে অবস্থান করছে। মোদ্দা কথা, পুলিশ আজ পুলিশের মতো দায়িত্ব পালন করছে না। পুলিশের দুর্নীতি ও যথেচ্ছাচার নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। তারপরেও এ কথা বলা যাবে না, পুলিশ বিভাগে সকলেই অসৎ বা দুর্নীতিপরায়ণ। পুলিশকে পুলিশ কোড অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতা দিলে ও তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করলে এবং সাহসী কাজের জন্য পুরস্কৃত করলে পুলিশ সন্ত্রাস দমনে কিছু সাফল্য দেখাতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু পুলিশকে যদি বদলী ও পোস্টিংয়ের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয়, ক্ষমতাসীন মহলের মর্জিমাফিক মামলা গ্রহণ কিংবা অগ্রহণ করতে হয়, তাহলে দেশে আইনের শাসন থাকবে কী করে? দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই বা সম্ভব হবে কী করে?

দুর্নীতি আমাদের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা। দুর্নীতির কারণে জাতীয় উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মতে, বাংলাদেশ পৃথিবীর পাঁচটি চরম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের একটি। এই দেশে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সর্বোচ্চ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিদেশে কোটি কোটি ডলার পাচার ও আন্তর্জাতিক লেনদেন থেকে প্রচুর আর্থিক সুবিধা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই এ ধরনের অভিযোগ তীব্রতর হচ্ছে। সম্প্রতি বিমানবাহিনীর জন্য মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান ক্রয় ও নৌবাহিনীর জন্য ফ্রিগেট ক্রয়ের ব্যাপারে

www.pathagar.com

তথ্যভিজ্ঞ মহলের কাছ থেকে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এখন শোনা যাচ্ছে, সরকার প্রধানের ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ বিমান ক্রয় করা হবে, যাতে থাকবে সর্বাধুনিক বিলাসব্যসন ও সুযোগ-সুবিধা। এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নিজে দুর্নীতি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, পয়সা না দিলে কোনো কাজ হয় না। কোন চাকরি হয় না। এমনকি তিনি স্বয়ং সুপারিশ করলেও নয়। প্রশ্ন হলো, প্রধানমন্ত্রী আদৌ সুপারিশ করবেন কেন? রাষ্ট্রের প্রধান কার্যনির্বাহী হিসেবে তাঁর সুপারিশ অবশ্য পালনীয় আদেশতুল্য। প্রধান কার্যনির্বাহীর আদেশ অবজ্ঞা করা তাঁকে অবজ্ঞা করার শামিল। তাহলে তো বলতে হয়, অবস্থা আজ এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রীর আদেশও কেউ কর্ণপাত করে না। তাঁর আদেশ-নির্দেশ এদেশে এখন অকার্যকর। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে পদত্যাগ করাই কি শ্রেয় নয়? সার্বিকভাবে দেশের পরিস্থিতি যখন এরকম অবনতির দিকে ধাবমান, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটলো চট্টগ্রামে আট খুনের ঘটনা। চট্টগ্রামে যখন এই আট খুনের ঘটনা ঘটে, তার একদিন আগে ফটিকছড়িতে অন্তর্দ্বন্দ্বে শাসক দলের তিন 'ক্যাডার' নিহত হয়। এমনিতেই চট্টগ্রামে বেশকিছু দিন ধরে শাসক দলের তিন গ্রুপ ক্যাডারের মধ্যে হানাহানি ও রক্তপাত ঘটে চলেছে। যে কারণে চট্টগ্রামে শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের কমিটিও নেই। চট্টগ্রামের রক্ত না শুকাতেই যশোরে নিহত হলেন সাংবাদিক শামছুর রহমান। জনকণ্ঠের যশোরস্থ এই প্রতিনিধি যখন রাত আটটায় নিজ অফিসে কাজ করছিলেন, তখন তিন অজ্ঞাতনামা আততায়ী তাঁকে গুলী করে হত্যা করে। সারাদেশে নেমে আসে শোকের ছায়া। প্রতিবাদে সকল রাজনৈতিক দলের আহবানে যশোরে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনেকের ধারণা সন্ত্রাস, চোরাচালান, অবৈধ মাদক ব্যবসা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সাংবাদিক শামছুর রহমান যেসব অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, সেটাই তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। শামছুর রহমান নিহত হবার পর কোনো সাংবাদিক নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে পারবেন কিনা, এটাই আজ সবার প্রশ্ন। গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষাকবচ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এভাবে সন্ত্রাসীর বুলেটে অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। সুতরাং গণতন্ত্রও যে অচিরে অস্তিত্ব হারাবে, তা এক রকম নিশ্চিত করেই বলা যায়। চট্টগ্রামের মর্মন্তুদ ঘটনার পর খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রী আবদুল মান্নান এবং পুলিশের আইজি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য চট্টগ্রামে যান। এর পরপরই প্রধানমন্ত্রী নিজে চট্টগ্রামে যান এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের হাতে সাহায্যস্বরূপ এক লাখ টাকা করে প্রদান করেন। নিহতদের প্রতি রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ব্যাপারেও দলীয়তা পরিলক্ষিত হলো। চট্টগ্রামের ৮ খুনের ঘটনার পর শাসকদলীয় অঙ্গসংগঠনগুলো যে সন্ত্রাস ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, তার ফলে আন্দরকিল্লায় এক তরুণ কম্পিউটার ব্যবসায়ী নির্মমভাবে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাহায্যের হস্ত প্রসারিত হয়নি। তার অপরাধ, তিনি নাকি জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে কোনো এক সময়ে সম্পর্কিত ছিলেন। এক যাত্রায় দুই ফল এদেশেই সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চট্টগ্রামে যেসব হুমকী উচ্চারণ করেছেন, তাতে কোনো নাগরিকই শত নির্দোষ হলেও নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারেন না। স্বরাষ্ট্র ও ডাকমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম চট্টগ্রামে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে, বিশেষ করে পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেছেন, "চট্টগ্রামে জামায়াত-শিবিরের নারকীয় হত্যাকান্ডকে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। আমি কোনো কৈফিয়ত শুনতে চাই না, ওদেরকে ধরুন দয়ামায়াহীনভাবে। ওদের না পেলে ওদের অভিভাবকদের ধরে আনুন। এজন্য যত জবাবদিহি করতে হয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তা আমি করবো।" 'দয়ামায়াহীনভাবে' ধরার একটি অর্থ হতে পারে, প্রয়োজনে গুলী করে আহত বা নিহত অবস্থায় ধরা। অন্যদিকে ওদের না পেলে ওদের নিরপরাধ অভিভাবকদের ধরে আনা প্রজাতন্ত্রের কোন আইনে সিদ্ধ তা মেহেরবানি করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? তিনি নিজে জবাবদিহি করবেন, এরকমটি বললেও এই মর্মে কোনো লিখিত আদেশ দিয়েছেন কিনা

www.pathagar.com

তা আমরা জানি না। মৌখিক উদ্ধত উচ্চারণকে পুলিশের লোকেরা কতটা সিরিয়াসলি নেবে, বলা মুশকিল। আমাদের দেশের পুলিশ জানে, এরশাদ আমলে চট্টগ্রাম হত্যাকান্ডের জন্য পুলিশ কর্মকর্তা মীর্জা রকিবুল হুদা ও তাঁর দুয়েকজন সহকর্মীকে কিভাবে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। দেশবাসী কি কোনদিন জানতে পারবে, কী কারণে ও কিভাবে সেদিন 'চট্টগ্রাম হত্যাকান্ড' অনুষ্ঠিত হয়েছিল? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমকে যথানিয়মে অতিক্রম করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ জনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেছেন, "চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতারা কি শাড়ি-চুড়ি পরেন? তারা কি মরে গেছেন? আর যদি একটা লাশ পড়ে, তবে দশটা লাশ পড়বে।" এরই পরিপ্রেক্ষিতে দৈনিক প্রথম আলো ২১ জুলাইয়ের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেছে, "...এর অর্থ কি এই নয় যে, এই সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে বলে যে আত্মতৃপ্তিপূর্ণ প্রচারণা চালায় তা অন্তঃসারশূন্য বুলিমাত্র? এর অর্থ কি এই নয় যে, এই সরকার তার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যথাযথ দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে পারেনি?" প্রথম আলোর সম্পাদক বন্ধুবর মতিউর রহমানকে এই বলে সাধুবাদ দিতে হয় যে, তিনি ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ই মুক্তিযুদ্ধের অভিন্ন চেতনায় বিশ্বাসী ও উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই প্রধানমন্ত্রীর সরকারকে সম্পাদকীয়ভাবে তিরস্কার করতে বিরত হননি। তবু প্রশ্ন থেকে যায়। চট্টগ্রামের ভয়াবহ ও মর্মন্তুদ ঘটনার পর দেশে কয়টি সংবাদপত্র সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছে? ঘটনার আকস্মিকতার জন্যই হোক, অথবা নজিরবিহীনতার কারণেই হোক, যেভাবে কোনো প্রকার তদন্ত অনুসন্ধান এবং সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ছাড়া একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহলকে এজন্য বিশাল হরফে হেডলাইন দিয়ে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করা হরো, সেটা কি সুস্থ সাংবাদিকতার পরিচায়ক। যদি তারা লিখতেন, শাসক মহলের অভিযোগের বরাত দিয়ে, তাহলেও একটা অর্থ হতো। যে মহলটিকে দোষী করা হয়েছে, তারা কোনো দোষ করতে পারে না, এরকম বলার অভিপ্রায় আমার নেই, তবে বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাদের এই হীন অপরাধ করার সম্ভাবনা কতটুকু সে ব্যাপারে সাংবাদিক শেফিক রেহমান যায়যায়দিনের ২৫ জুলাই সংখ্যায় বেশ কিছু সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এমনকি প্রথম আলো'র সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে সংবাদ পরিবেশনায় বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তাদের এই পত্রিকার শিরোনাম দেখে পাঠক যেমন বিশেষভাবে প্রভাবিত হবেন ঠিক তেমনি সংবাদের ভেতরটা পাঠ করে বিপরীত সিদ্ধান্তেও আসতে পারেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা কত বেশী প্রয়োজন, চট্টগ্রামের ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়টি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চট্টগ্রামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী আরো যেসব মারাত্মক উক্তি করেছেন, তার একটি হলো 'অপরাধীদের ধরতে গিয়ে দু-চারটা লাশ পড়ে গেলেও কোনো অপরাধ হবে না'। তিনি আরো বলেছেন, 'সন্ত্রাস বন্ধ করা না গেলে দলকে আমি কী জবাব দেবো? আপনারা (পুলিশ) ব্যর্থ হলে দল ব্যবস্থা নেবে। তারা অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হবে।' এর পরেও কি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে, দেশ আজ নৈরাজ্যের কোন প্রান্তসীমায় উপস্থিত? খোদ প্রধানমন্ত্রী যখন নিজের দলকে অস্ত্র হাতে নেবার উস্কানি দেন, তখন একটি গৃহযুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে কী অবশিষ্ট থাকে? প্রধানমন্ত্রীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে খুলনায় এক জনসভায় নকশাল দেখামাত্র গুলী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরই প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী পল্টনের জনসভায় বলেছিলেন, নকশাল কি কারও গায়ে লেখা থাকে যে, দেখামাত্রই গুলী করবে? যাহোক, ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য উচ্চারণে পুত্রী পিতার সুযোগ্য সন্তানের পরিচয় বহাল রেখেছেন।

চট্টগ্রামের ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিরোধীদলীয় কার্যালয় ও নেতৃবৃন্দের বাসগৃহে হামলা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের জনসভায় তিন বিরোধী নেতা– বেগম খালেদা জিয়া, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও গোলাম আযমকে নারায়ণগঞ্জে

www.pathagar.com

অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন সংসদ সদস্য শামীম ওসমান। বেগম খালেদা জিয়া যখন পার্বত্য চট্টগ্রামে লংমার্চে গিয়েছিলেন, তখন কাচপুর ব্রীজের নিকট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগ শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিবন্ধকতা টেকেনি। বেগম খালেদা জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে লংমার্চ শেষ করে রাজধানীতে ফিরে আসেন। বিরোধী রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘটনাটি ছিল এক প্রশংসনীয় সাফল্য। চট্টগ্রাম ও যশোরের ঘটনা যখন সারাদেশকে আলোড়িত করছে, ঠিক তখনই দেশবাসীকে বলা হলো গোপালগঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে হেলিপ্যাডের দশ গজ দূরে কে বা কারা সত্তুর কেজি বিস্ফোরক ভর্তি একটি ড্রাম মাটির নিচে পুতে রেখেছিল। সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার উদ্দেশ্যেই এরূপ বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ মাটির নিচে পোতা হয়েছিল। এর পরপরই কোটালিপাড়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের সময়ে আরো একটি বোমা আবিষ্কৃত হয়। বারবার একই কথা, 'প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।' কখনও তথাকথিত রকেট লাঞ্চার উদ্ধার হয় আবার কখনও তামিল হন্তারক মহিলারা ছদ্মবেশে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার জন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে। কখনও মারাত্মক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী (?) নূরুল আবছার গ্রেফতার হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র কিছু নিরীহ মানুষ হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সবিনয় নিবেদন, যদি সত্য সত্যই আপনাকে হত্যা করার জন্য কোনো জঘন্য ষড়যন্ত্রকারী অপচেষ্টা চালায় তাহলে আপনার আয়ত্তাধীন যত গোয়েন্দা সংস্থা আছে, তাদের নিয়োগ করে ষড়যন্ত্র উদঘাটন করে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিন। তাতে দেশবাসীর কিছু বলার থাকবে না। বিরোধী দলগুলোও এসব ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চায়, সে-মতে তদন্ত হলে আপনার আপত্তি কোথায়? কিন্তু দেশবাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবার জন্য বারবার অজুহাত সৃষ্টি করা মোটেও কাম্য নয়। কারণ এতে সরকারের প্রতি জনগণের যদি কোনো আস্থা থাকে তার ভিতও টলমল করে ওঠে। গত কয়দিনে যেসব ঘটনা ঘটেছে, যা ঘটেছে বলে দেশবাসীকে শোনানো হয়েছে তা থেকে যে কোনো বিবেকবান চিন্তাশীল নাগরিকের প্রশ্ন– (১) দেশ কি গৃহযুদ্ধের পথে এগিয়ে চলেছে? (২) সময়মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে কি? (৩) আগামীতে যথাসময়ে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কি? (৪) দেশে ১৯৯১ সাল থেকে গণতন্ত্রের যে দুর্বল প্রয়াস শুরু হয়েছে, তাতেও ছেদ পড়বে কি? (৫) অব্যাহত অস্থিরতা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, নৈরাজ্য, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, আইন-শৃংখলার নজিরবিহীন অবনতি ও সরকারের অকার্যকারিতা এবং বিরোধী মতের প্রতি চরম অসহিষ্ণুতা– সবকিছু একাধারে জট পাকিয়ে দেশের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে ফেলবে কি?

আফতাব আহমাদ :

বাংলাদেশ আজ এক চরম ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌঁছেছে। দেশ সুস্পষ্টভাবে দু'ভাবে বিভক্ত। লঘিষ্ঠ অংশে রয়েছে ভারতের দালাল, বেতনভুক নিয়োগী ও চরেরা। আর সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশে রয়েছে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত বিপুল জনসাধারণ। দেশমাতৃকার প্রতি অঙ্গীকার রয়েছে এমন খাঁটি মুক্তিযোদ্ধারা এবং ডান-বাম নির্বিশেষে একাত্তরে যারা রাজনৈতিক কর্তব্য পালনে সক্রিয় ছিল তারা সবাই জাতীয় অস্তিত্ব ও প্রাণের তাগিদে বাংলাদেশের আযাদী, অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা ও সংহতি সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। পরম স্রষ্টা আল্লাহ তাবারাক তায়ালা তাদের সহায় এবং এদেশের অকুতোভয় লড়াকু মানুষ তাদের শক্তি ও ভরসা। আজ সারাদেশে এক নৈরাজ্যকর তমসাচ্ছন্ন সহিংস সন্ত্রাসবাদী গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ভারতের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ, অর্পিত ও ন্যস্ত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ পরিষদ এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-এর পরামর্শে ও অর্থানুকূল্যে গঠিত সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা ফ্রন্ট মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মৌরুসি পাট্টা

www.pathagar.com

করে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবেই এদেশের মানুষকে দেখাবার চেষ্টা করছে। এরা ব্রাহ্মণ্যবাদী, আধিপত্যবাদী, সম্প্রসারণবাদী বর্ণাশ্রমের উদগাতা ভারতীয় শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত সেবক হিসেবে বাংলাদেশের মূল চেতনায় আঘাত হেনে নানা ধরনের ধ্বনি উচ্চারণ করে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বাংলাদেশের liquidition এরই সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এদের বিষ দাঁত এখনই ভেঙে দেয়া না হলে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব শুধু বিপন্নই হবে না, বিলীনও হয়ে যাবে। এদেশের মানুষ দেহে শেষ রক্তবিন্দু ও নিঃশ্বাস থাকতে তা কখনোই হতে দেবে না। বিরোধীদল বিরোধী পত্রিকা সমেত সরকারী অর্থানুকূল্যে পরিচালিত পত্রিকা এখন পাঠ করলে যে কোন দেশদরদী মানুষ চরম হতাশ, বিভ্রান্ত ও কর্তব্যবিরহিত হয়ে পড়বে। এসব পত্রপত্রিকায় প্রতিদিন ছাপা হয় খুন-রাহাজানি, হত্যা-ধর্ষণ, ডাকাতি, ছিনতাই ও ঘরবাড়ী লুটপাটের মর্মন্তুদ কাহিনী। কোন সুস্থ মানুষের এ ধরনের সংবাদ পাঠে সুস্থ থাকাতো দূরের কথা, সামান্যতম স্বস্তি বোধ করার কোন কারণ নেই। ঘটনাচক্রে এসব দুর্বৃত্তমূলক দুষ্কর্মের হোতা হচ্ছে ক্ষমতাসীনদের বড় বড় চাঁইরা। কোথাও আমরা লক্ষ্য করি মন্ত্রী-এমপিদের দাপট, কোথাও লক্ষ্য করি তাদের সন্তান-সন্ততিদের দাপট। আবার কোথাও লক্ষ্য করি পূর্বে বর্ণিত ব্যক্তিদের নিকট-কুটুম্বদের দাপট। কেউ বাড়ীঘর দখল করছে। কেউ এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে রাস্তার আশপাশে অপেক্ষমাণ যানবাহন থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে টোল বা পার্কিং চার্জ সংগ্রহ করছে। সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের সেবা প্রদান করার পরিবর্তে আজ টেন্ডারবাজির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ক'দিন আগে মানবজমিনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গেল, সিটি কর্পোরেশনের সকল সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ডে আওয়ামী পাঁচ মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারকে খুশী বা তুষ্ট করতে না পারলে সেখানে কাজ পাওয়া দুঃসাধ্য। এইতো সেদিন শিক্ষাভবনে টেন্ডারবাজির নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজিববাদী ছাত্রনেতা শফিকসহ তার পান্ডারা সাধারণ কর্মীদের হাতে গণপিটুনী খাওয়া সত্ত্বেও তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিশেষ কেবিনে পুলিশ পাহারায় রাজকীয় হালে রাখা হয়েছে। মেডিকেল কলেজের জনৈক কর্মকর্তা সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদককে বলেন, 'I don't care' আপনারা যা খুশী লিখতে পারেন, ওরা এভাবেই থাকবে। আর তাছাড়া আগামী সংসদ নির্বাচনে আমি আওয়ামী প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা রাখি, তাই আওয়ামী লীগের কোন উপদলীয় গোষ্ঠীর সাথেই আমি কোন ধরনের ঘাঁটাঘাঁটিতে যেতে চাই না।' কী চমৎকার ভোটের আর গণতন্ত্রের এই রাজনীতি!!! একজন সরকারী কর্মকর্তা হয়েও ওই মেডিকেল কর্মকর্তাটি তার মনের বাসনা যে তার অজান্তেই বেফাঁস প্রকাশ করে ফেলেছেন সেজন্য তাকে সাধুবাদ জানাবার ভাষা আমাদের জানা নেই।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্তমানে বলা হয় সবচেয়ে শান্ত এবং নিরুপদ্রব। হ্যাঁ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের শান্তি বিরাজ করছে। বিরুদ্ধবাদীদের অস্ত্রের মুখে হলগুলো থেকে উচ্ছেদের কাজটি সুচারুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। ওখানে যা বিরাজ করছে, তাকে এক কথায় বলা যায়, 'কবরের শান্তি'। এই কবরের শান্তিও মাঝে মাঝে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে যখন মুজিববাদী ছাত্রলীগের শরীয়তপুর-মাদারীপুর, রাজ্জাক বাহিনী ও আমু বাহিনী-সব মুজিববাদী সন্ত্রাসীরা একে অপরের প্রাণ সংহারের জন্য সশস্ত্র সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ ব্যাপারে মৌনব্রত পালন করাটাকেই শ্রেয় ধর্মজ্ঞান করেছেন।

রাজপথে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ পরস্পরকে অস্ত্র দিয়ে তাড়া করে এবং সুযোগ ও সময়মত হত্যা করে। তারপর এই অভিযোগ বিরোধী পক্ষের ওপর চাপিয়ে বিরোধীদলের ওপর নির্মম নির্যাতন শুরু করে দেয়া হয়। চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনা তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

চট্টগ্রামের মেয়র আলহাজ এবিএম মহিউদ্দীন চৌধুরী একদা রাজিয়া মতিন চৌধুরী এমপির বেয়াই আখতারুজ্জামান বাবুর চরম শত্রু ছিলেন। বাবুর হাতে মানুষ হয়ে, বাবুর

www.pathagar.com

হাতের বাটিতে দুধপান করে যে মনুষ্যরূপী দানব আ. জ. ম. নাসির আজ চট্টগ্রামে তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার নৃশংস যজ্ঞ শুরু করেছে তার পরিণতিতে মেয়র মহিউদ্দীন চৌধুরী এবং আখতারুজ্জামান বাবু পরিস্থিতিগত কারণে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের সম্পর্ক ও নৈকট্য গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে প্রতিদিন। তারা এই ফ্র্যাংকেনস্টাইনীয় দানব নাসিরকে মোকাবিলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। নাসিরও বসে নেই। সেও পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে চট্টগ্রামে মহিউদ্দিন বাবুর নেতৃত্বকে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ করে সহিংসতা ও সন্ত্রাসের এক বিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়েছে। যার পরিণতিতে সাম্প্রতিককালে চট্টগ্রামে ৮ জনকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। মহিউদ্দিন-বাবুরা কোনদিন ভাবতে পেরেছিলেন যে, 'তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে?'

এ প্রসঙ্গে ১৯৭৪-এর জরুরী আইন ঘোষণা হওয়ার মাস দেড়েক আগের একটি ঘটনার কথা আমার এখন মনে পড়ছে। বলা বাহুল্য, ওই বছরই এপ্রিল মাসে রাজ্জাক-তোফায়েল গ্রুপের আশীর্বাদপুষ্ট মুজিববাদী সন্ত্রাসী এক চক্র শেখ মনির আশীর্বাদপুষ্ট নিবেদিতপ্রাণ কর্মীকে মহসিন হলের টেলিভিশন কক্ষের সামনে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্বও প্রথমে বিরুদ্ধবাদী প্রতিপক্ষের ওপর চাপানোর কম চেষ্টা হয়নি। কিন্তু সব গোয়েন্দা সংস্থার একধর্মী রিপোর্টের কারণেই তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। জুলাই ১৯৭৪-এ শেখ ফজলুল হক মণি বাংলার বাণীতে এক বিবৃতির মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ চরম দুর্নীতিতে লিপ্ত এবং আওয়ামী লীগের এই দুর্নীতি ও লুটপাটের সঙ্গে যুবলীগের কোন সম্পর্ক নেই। গণতন্ত্রের অন্যতম সবক হচ্ছে আইনের শাসন। শেখ মণি তা বিস্মৃত হয়ে ঘোষণা দিলেন– "দেশ আইনের শাসন চায় না, চায় মুজিবের শাসন।" গণতন্ত্রের কী অসাধারণ ব্যাখ্যা! যে কথা বলছিলাম– দেশে জরুরী অবস্থা জারির মাস দেড়েক আগে শেখ মণি আজকের যোগাযোগমন্ত্রী তৎকালীন ইত্তেফাকের সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জুসহ দুপুরবেলা মধ্যাহ্নভোজের সময় জাতীয় প্রেসক্লাবে পদার্পণ করলেন। ওই সময় আমরা অনেকেই মধ্যাহ্নভোজ পর্বটি শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলাম। শেখ মণি ও মঞ্জুর আগমনে প্রেসক্লাবে হৈচৈ পড়ে গেল। (বর্তমান ভবনটি নয়, পুরনো ভবনে)। তখন দু'টি টেবিলকে একত্রিত করে চারদিকে মুজিবভক্ত ও মুজিববিরোধীরা শেখ মণি ও মঞ্জুকে ঘিরে ধরেছিল। তাদেরকে কিছু খাওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা কোন কিছুই গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত মরহুম নাজিমউদ্দীন মানিকের প্রস্তাবে কোমল পানীয় গ্রহণে তাঁরা সম্মতিজ্ঞাপন করেন। আলোচনার টেবিলে যাঁরা বসে ছিলেন, তাদের মধ্যে যাদের নাম আজও আমার মনে পড়ে, তাঁরা হচ্ছেন– যথাক্রমে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, এহ্‌তেশাম হায়দার চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, কামাল লোহানী, নির্মল সেন এবং সর্বোপরি আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন সুরুচিবোধের অধিকারী মরহুম সাইয়েদ আতীকুল্লাহ। উল্লেখযোগ্য যাদের নাম এখানে স্মরণ করে উল্লেখ করতে পারলাম না, আশা করি তারা আমাকে মার্জনা করবেন। তরুণ থেকে শুরু করে প্রবীণ সাংবাদিকরা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্নবাণে শেখ মণিকে জর্জরিত করে তুলছিল। বলাই বাহুল্য, তখন লোকসমাজে জোর গুজব– শীঘ্রই দেশে জরুরী অবস্থা জারি করা হবে ও সরকারপদ্ধতির পরিবর্তন হবে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে সর্বময় ক্ষমতা তুলে দিয়ে একদলীয় একক একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম দেয়া হবে। প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে শেখ মণি এতটুকু বিচলিত হলেন না। তিনি শুধু বললেন, "দেশে আজ যে অবস্থা চলছে, তা চলতে দেয়া যায় না। তার একটি আশু সমাধান প্রয়োজন। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয় অর্জন করে একটি মানচিত্র ও পতাকা লাভের স্বাধীনতা পেয়েছি মাত্র। গণমানুষের সত্যিকার স্বাধীনতা ও মুক্তি আজও আসেনি। তাই প্রয়োজন একটি দ্বিতীয় বিপ্লবের"। এটুকু বলে থামার পর সাইয়িদ আতীকুল্লাহ প্রশ্ন করেছিলেন, "যে কোন পরিবর্তনকেই সবাই বিপ্লব

www.pathagar.com

বলেই আখ্যায়িত করে থাকে। তোমাদের বিপ্লবের স্বরূপটা কী, একটু বল।" শেখ মণি হেসে বলেছিলেন, "কেন, পত্রিকায় আমার বিবৃতি দেখেননি? আমি তো বলেছি, দেশ আজ আইনের শাসন চায় না; দেশ চায় মুজিবের শাসন। এই বাক্যটির মধ্যেই আমাদের পুরো সমাজদর্শন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা encapsuled হয়ে আছে। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ বললেন, "তোমরা যাকে বিপ্লব বলছ, তাকে তো অন্যরা প্রতিবিপ্লবও বলতে পারে। আর তাছাড়া তোমরা সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে যে কর্তৃত্ববাদী শাসন এ দেশে প্রবর্তন করছ, তাকে তো প্রতিবিপ্লবই বলা শ্রেয়।" প্রত্যুত্তরে শেখ মণি বলেছিলেন, "বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবে আমি ভয় পাই না, আতিক ভাই। আমরা ব্যর্থ হলে অন্যরা রয়েছে। আমার বন্ধু-বান্ধবরা রয়েছে। আগামীদিনের প্রজন্ম রয়েছে। আমি জানি, দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা আমরা এমন একসময়ে করতে যাচ্ছি, যা পরিবেশগতভাবে এবং সামাজিক আনুকূল্যের দিক থেকে আমাদের জন্য বৈরী। তাই বড় ভয় হয় আমাদের আগে অন্য কেউ যদি বিপ্লব করে ফেলে–। অবশ্য ঘাবড়াবার তেমন কোন কারণ নেই। ফরহাদের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি যদি বিপ্লব করে, আমার সন্তান-সন্ততি তো বেঁচে থাকবে, আমার স্ত্রী তো ধর্ষিত হবেন না। আমি শুধু গ্রেফতার হব। ফরহাদরা আমার পরিবারকে দেখবে। কাজী জাফরের দল যদি বিপ্লব করে, তাও একই অবস্থা হবে। আমি গ্রেফতার হব। আমার সন্তানাদি ও স্ত্রীকে কাজী জাফর হেফাজত করবে। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে যদি বিপ্লব হয় তাহলে তো ভয়ের কোন কারণই নেই। সিরাজ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে তো তার ভাবীকে রেপড হতে দিতে পারে না। আর সিরাজ দার পরিগ্রহ করেনি; আমার সন্তানদের সে নিজ সন্তানের মতই গড়ে–পিঠে লালন-পালন করবে। কমরেড হক ভাইয়ের সঙ্গেও আমার একটা যোগাযোগ হয়েছে। মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত ভাল। দেরিতে হলেও বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিয়েছেন। মগর সিরাজ সিকদার? ওকে তো আমি চিনি না। ওর সাথে তো আমার কখনও কোথাও পরিচয় ঘটেনি। সে কেমন মানুষ, তাও আমি জানি না। সে (সিরাজ সিকদার) যদি বিপ্লব করে, তাহলে আমার স্ত্রী নির্ঘাত রেপড্ হয়ে বেয়নেটেড হবে এবং আমার সন্তানরা বুলেটবিদ্ধ হয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। আতীক ভাই, আপনি কি আমাকে সিরাজ সিকদারের ঠিকানা দিতে পারেন? আমি তার সাথে একটু যোগাযোগ করতে চাই। তাকে আমি বলব, আমাকে যা কিছু কর, কিন্তু আমার পরিবার-পরিজনের গায়ে হাত দিও না।" সাইয়িদ আতীকুল্লাহ স্মিত হেসে ডলফিন মার্কা একটি ম্যাচের ওপরে একটা আঙুল বারবার টোকা দিতে দিতে শুধু বললেন, "মণি, রাজনীতিতে তোমাদের বন্ধ্যাত্ব এসে গেছে এবং তোমরা দীনতায় ভুগছো। তুমি এতক্ষণ যা কিছু বললে, আমি মনোযোগ সহকারেই সব শুনলাম। আমি তোমাকে একথা বলতে পারি, এরা কেউই বিপ্লব করতে পারবে না। আর এদের মধ্য থেকে যদি কেউ বিপ্লব করে, তার জন্য তোমার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। বিপ্লবীরাও মানুষ, তাদের মধ্যেও মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা কাজ করে। তবে একটা কথা ভুলে যেয়ো না, তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। তোমাদের পাপাচার ও দুরাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কার তূণে যে কী তীর তোমাদের প্রান সংহারের অপেক্ষায় আছে, তা তোমরা সামান্যতম আঁচ করতে পারবে না। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি সবই জানেন। তোমাদের হাতে সময়ও বেশী নেই। যত পার নিজেদের শুধরে নাও এবং জনতার কাছে মার্জনা চেয়ে নাও। তাতেই মঙ্গল নিহিত।" এর পর আসর আর বেশীক্ষণ জমেনি। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু শ্রোতা হিসেবেই শুধু বসা ছিলেন, কোন মন্তব্য করেননি। তারপর তাঁরা প্রেসক্লাব প্রস্থান করলেন।

১৯৭৪-এর শেখ মণি এবং সাইয়িদ আতীকুল্লাহর মধ্যকার দীর্ঘ এ আলাপচারিতা এখানে উদ্ধৃত করার আমার সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। ১৯৯৬ থেকে যেদিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, সেদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার নানা

www.pathagar.com

কল্প কাহিনীর ছড়াছড়ি ও প্রচার। হাসিনা-তোফায়েল বিরোধ আজ এদেশবাসীর কাছে কোন গোপন বিষয় নয়। কথায় কথায় কল্পিত মৌলবাদ, কল্পিত স্বাধীনতাবিরোধী ও কল্পিত সাম্প্রদায়িক শক্তি আবিষ্কার করে ভারতীয় নিয়োগী ও চরেরা বাংলাদেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়ার যে ষড়যন্ত্র করছে, তা আজ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। নিমচন্দ্র ভৌমিক বাংলাদেশকে খণ্ডবিখণ্ড করে ভারতীয় (?) সাহায্যে পৃথক হিন্দুরাষ্ট্র (?) প্রতিষ্ঠারও হুমকি দিয়েছে। এমনকি ভবিষ্যতে হাসিনা সরকারকে উচ্ছেদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে, 'গণেশ উল্টেও যেতে পারে'। এই ধৃষ্টতা, এই ঔদ্ধত্য, এই রাষ্ট্রঘাতী আস্ফালানের উৎসমূলে এখনই যদি কুঠারাঘাত করা না হয় তাহলে বড্ড দেরী হয়ে যাবে।

শেখ হাসিনা ওয়াজেদ, আপনার যতই ভারতপ্রীতি থাকুক না কেন আপনি যদি আপনার পিতার সন্তান হয়ে থাকেন, সময় এসেছে ভারতের সাথে যে গাঁটছড়া বেঁধেছেন– সেই গাঁটছড়াকে ছিন্ন করার মহামতী আলেকজান্ডার কিংবদন্তীর Gordian knot কে খুলতে না পেরে তরবারির এক কোপে তা দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে দিগ্বিজয়ে বেড়িয়ে পড়েন। আপনি বহুবার এদেশের মানুষের সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রানুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং বিরাধীদলসহ সকল দেশপ্রেমিক নাগরিককে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অপমান করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে একজন বেগানা পুরুষের হাতে আপনার কপালে 'মঙ্গল' চিহ্ন ও লাল-হলুদ-সাদা চন্দন চর্চন করিয়েছেন। এদেশের মানুষ এটাকে স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। আপনার ধার্মিকতা, পরহেজগারী ভাব, তসবী টেপা– এ সব কিছুকেই মানুষ এখন ফেরেপবাজী বলে মনে করে আপনাকে মক্কর গণ্য করে। মুজিবদুহিতা হিসেবে আপনার মধ্যে মুজিবের কোন গুণের সামান্যতম লেশ যদি থাকে, আপনার পিতার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের যে চিন্তাভাবনা ছিল, (বদরুদ্দীন উমরের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) তা আঁকড়ে ধরে, তাকে পরিপুষ্ট করে আপনার গত ৪ বছরের দুঃশাসন ও নিপীড়নের ফলে এদেশের মানুষের জীবনে যে অভিশাপ নেমে এসেছে, তার জন্য আল্লাহ সোবহানু ওয়াতালার কাছে তওবা করুন। প্রতিদিন মৃতদের প্রতিচ্ছবি দেখে আপনার যে মনোবৈকল্য ঘটেছে, তার মুক্তি প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসায় নয়। বিরোধী দলকে স্তব্ধ করতে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে আপনি নিজে হয়ত কখন স্তব্ধ হয়ে যাবেন, তা আপনি কখনো ঠাহর করতে পারবেন না। সকলের অলক্ষ্যে পরম সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেকের নিয়তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। নশ্বর মানুষ সে অলংঘনীয় নিয়ম আজ পর্যন্ত পরাভূত করতে পারেনি। ভারতীয় সংবিধানে অর্পিত সম্পত্তি আইন ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ৩৬৮ এবং ২৫৮(ক) অনুচ্ছেদসমূহে সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সম্প্রদায় বিশেষকে তোষণের নামে, ভোট ব্যাংকের ব্লক ভোট কব্জা করার নামে আপনি ও আপনার সরকার যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন, তা এক রাষ্ট্রঘাতী নীতি। পানিচুক্তির কথা নাই বা বললাম। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ক্যান্টনমেন্ট বা সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার হবে জাতীয় বেঈমানীর সমতুল্য। এ জাতি আজ অবধি কোন জাতীয় বেইমানকে ক্ষমা করেনি। সাধারণ মানুষকে কিছুই করতে হবে না, আমরা যারা লিখিজুখি, আমাদেরকেও কিছু করতে হবে না– সৃষ্টিকর্তার অমোঘ বিধানেই সবকিছু সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে। পরিশেষে পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ঃ 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'। অহেতুক Witch Hunting করে বিরোধী দলের ওপর দোষ চাপিয়ে আপনি যদি উটপাখীর মত ভেবে থাকেন যে, বালুর ভেতর মাথা লুকিয়ে থাকলে মরু সাইমুম তথা আরবের ঝড় উঠবে না, তাহলে মারাত্মক পরিণতি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার আত্মীয়করণ, পারিবারিকীকরণ, দলীয়করণ যথেষ্ট হয়েছে, মানুষের ধৈর্যের সীমার বাঁধ ভেঙ্গে যাবার উপক্রম। জাগ্রত মানুষের রোষানলে যে কোন ক্ষমতাদর্পী ভস্মীভূত হয়ে যেতে বাধ্য– আপনিও তার ব্যতিক্রম নন।

www.pathagar.com

৫ আগস্ট ২০০০

ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব ও সরকারের দায়িত্ববোধ

মাহবুব উল্লাহ :

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজধানী শহর ঢাকার মানুষ ডেঙ্গু আতঙ্কে ভুগছে। দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা খুললেই ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা, এ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা এবং ডেঙ্গুজ্বরজনিত কারণে মৃতের সংখ্যা আমরা দেখতে পাই। পত্রপত্রিকা ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু অতীতের সরকারগুলোর মত বর্তমান সরকার স্বীকার করতে চাইছে না যে, ডেঙ্গুজ্বরের সংক্রমণ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে গেছে এবং একে মহামারীরূপে গণ্য করা উচিত। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে, রাষ্ট্র ক্ষমতায় না থাকলে রাজনৈতিক দলগুলো খাদ্যসংকট দেখা দিলে সরকারের নিকট দুর্ভিক্ষাবস্থা ঘোষণার দাবী জানায়, কলেরা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড ব্যাপকহারে দেখা দিলে মহামারীর অবস্থা ঘোষণার দাবী জানায়। আবার ঝড়-ঝঞ্ঝাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলহানি হলে নির্দিষ্ট অঞ্চলকে দুর্গত এলাকা ঘোষণার দাবী জানায়। কিন্তু যে দল ক্ষমতার বাইরে থাকতে এরকম দাবী জানায় সে দল ক্ষমতাসীন হলে কোন সংকট বা বিপর্যয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই নারাজ। বর্তমানে ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাবে এরকম একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, সমস্যা আশংকাজনক নয় এবং মহামারী ঘোষণা দেয়ার মত পরিস্থিতিও উদ্ভব হয়নি। মহামারী হলে তো হাসপাতালগুলোর বারান্দাও রোগীতে ভর্তি হয়ে যেত। জনমনে আশংকা, উদ্বেগ প্রশমন যেমন জরুরী, তেমনি জনগণের সামনে অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা বাঞ্ছনীয়। তাহলে মানুষ যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করে বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো বা বন্যায় জীবন ও সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ প্রকাশেও সরকারের অনীহা থাকে। কিন্তু এই অনীহার পেছনে যে মানসিকতা কাজ করে, তা বুঝে ওঠা কঠিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ-মহামারী সরকার সৃষ্টি করে না, কাজেই এসবের প্রাদুর্ভাবের জন্য সরকারকে দোষী বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত নয়।কিন্তু এ ধরনের বিপর্যয় দেখা দিলে সরকার যদি ঔদাসীন্য ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়, তাহলে সরকারকে দায়ী করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা থাকে। এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে বোমা পাতার ঘটনা যেভাবে ফলাও করে সচিত্র প্রতিবেদন আকারে টেলিভিশনে বারংবার প্রচার করে জনগণের মধ্যে বিরূপ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির চেষ্টা যেভাবে অব্যাহত রাখা হয়েছে, সেই তুলনায় ডেঙ্গুজ্বর সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রশ্নে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে ততটা তৎপর মনে হচ্ছে না।

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ভারতের মহারাষ্ট্র অঞ্চলে প্লেগ দেখা দিয়েছিল। প্লেগ অত্যন্ত ভয়াবহ রোগ, অতিদ্রুত এই রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে এবং শত-সহস্র লোক রোগ নির্নীত হবার আগেই মৃত্যুবরণ করে। সে সময়ে সরকার বাংলাদেশে প্লেগের সংক্রমণ বিস্তার রোধে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিল। এর মধ্যে একটি ছিল ভারত থেকে আগত যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং সন্দেহ হলে সুনির্দিষ্ট যাত্রীকে কোয়ারেন্টাইন বা বিচ্ছিন্ন করে রাখা। এছাড়া প্লেগের লক্ষণ, প্লেগের চিকিৎসা সম্পর্কে খুব গুরুত্ব সহকারে বেতার ও টেলিভিশনে শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, সেবার বাংলাদেশে প্লেগ ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

www.pathagar.com

কথায় বলে, Prevention is better than cure. রোগ প্রতিরোধ রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা উত্তম। ডেঙ্গুজ্বরের বেলায়ও একই কথা বলা যায়। ডেঙ্গুজ্বর এডিস মশার মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এর কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাও নেই। তবে রোগের লক্ষণ ও সংক্রমণের তীব্রতা দেখে চিকিৎসা নিলেই অনেক সময় রোগী বেঁচে যায়। ১৯৯১ সালে এক নজিরবিহীন সাইক্লোন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দক্ষিণ বাংলায় বিশেষ করে চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলে কয়েক লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। ঘরবাড়ী, ফসল, গবাদিপশু ও কল-কারখানার মারাত্মক ক্ষতি হয়। মৃত পশু ও মানুষের দেহ যাতে পচে-গলে রোগ-মহামারী ছড়াতে না পারে, তার জন্য এগুলো যথাযথভাবে অপসারণ ও সৎকারের ব্যবস্থা করা সরকারের জন্য এক কঠিন চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল। তদুপরি সমুদ্রের নোনাপানি ওঠায় খাবার পানি কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। যারা বেঁচে ছিলেন, তাদের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা এক দুরূহ কাজ ছিল। এই বিশাল বিপর্যয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাহায্যও এসেছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে মার্কিন নৌবাহিনীর একটি বহর জেনারেল স্টেকপোলের নেতৃত্বে উদ্ধারকারী মিশন হিসেবে এসেছিল। তারা এদেশে ১৫ দিন অবস্থান করে পরিস্থিতি সামাল দিতে বিরাট সহায়তা প্রদান করে। এত বড় বিপর্যয়ের পর সরকারের কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তৎসত্ত্বেও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, পানি সরবরাহ, বন্দরের পুনর্বাসন প্রভৃতি কর্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু সরকার বিরোধী দলের বিশেষ করে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কঠোর সমালোচনার চাবুকের কষাঘাত থেকে রেহাই পায়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিলে রাজনীতিতে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, সেটা আমরা ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় যে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তা থেকে উপলব্ধি করতে পারি। সেবারের সাইক্লোনে যখন দশ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, সেই সময়টাতে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান চীন সফর করছিলেন। কিন্তু দেশে ফেরার পরেও তিনি এই বিপর্যয়কে গুরুত্ব দেননি। মওলানা ভাসানী তখন ঢাকার একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি প্রকৃতির এই ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা উপলব্ধি করে সমস্ত রোগ-যন্ত্রণাকে ভুলে গিয়ে দক্ষিণ বাংলায় ছুটে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে পল্টন ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক ও বেসামরিক নেতৃবৃন্দের চরম হৃদয়হীনতার কথা পল্টনের জনতার কাছে তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, 'ওরা কেউ আসেনি'। এই সভা থেকে তিনি 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের' ধ্বনি উত্থাপন করেছিলেন। মওলানা ভাসানী দক্ষিণ বাংলায় বিপর্যয়ের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমি সেখানে একটি ঘুঘু পাখিও দেখতে পাইনি।' কারও সর্বনাশের কথা বলতে গিয়ে ভিটায় ঘুঘু চরবার কথা বলা হয়। মওলানা ভাসানীর এই আগুনঝরা অথচ কাব্যিক আবেগ মণ্ডিত ভাষণ শ্রবণের পর কবি শামসুর রাহমান মওলানা ভাসানীকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'সফেদ পাঞ্জাবি' রচনা করেছিলেন। আসাদের শাহাদত এবং দক্ষিণ বাংলার ঝড়– এই দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবি শামসুর রাহমানের কবিতার ক্ষেত্রে বিরাট এক পরিবর্তন আসে। রোম্যান্টিকতার পরিবর্তে জীবনঘনিষ্ঠ কবিতা রচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন। কবি শামসুর রাহমানের আজ যা খ্যাতি বা অখ্যাতি তার সূচনা ঘটেছিল সেই সময় থেকেই। পঞ্চাশ সাল থেকেই তিনি কবি হিসেবে পরিচিত হলেও সাধারণ মানুষের কাছে নন্দিত বা নিন্দিত হওয়ার শুরুটা তারও প্রায় ২০ বছর পর। দক্ষিণ বাংলার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের উদাসীনতা তৎকালীন পূর্ববাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের যৌক্তিকতা সৃষ্টি করে আবেগতাড়িত ক্রোধের উদ্রেক ঘটিয়েছিল। সুতরাং কোন শাসক যদি জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি অমানবিক ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহলে তার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে ও মওলানা ভাসানীর ডাকে সংঘটিত ভুখমিছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আবু হোসেন সরকারের পতন ঘটিয়েছিল।

www.pathagar.com

রাজনীতিতে জনদরদী হবার বিষয়টি অনেক সময়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোরাকও হতে পারে। আমার মনে আছে, ১৯৫৭ সালে কুমিল্লার বুড়িচঙে প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচন হচ্ছিল। তখন সবেমাত্র আওয়ামী লীগ ভেঙে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হয়েছে। বুড়িচঙ উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সরাসরি লড়াই। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রার্থী ছিলেন শেষ জীবনে জাতীয় লীগ নেতা মরহুম অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে কুমিল্লা ঈদগাহ ময়দানে তিনি কলিকাতার উর্দু ও বাংলা মিশ্রিত ভাষণ দিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সেই সভায় মওলানা ভাসানীকে কটাক্ষ করে জনতার উদ্দেশে বললেন, 'দেখবেন, আগামীকাল লুঙ্গী ও কুর্তা পরে মওলানা ভাসানী বুড়িচঙে আসবেন এবং গ্রামের ঘরে-ঘরে গিয়ে হাঁড়ির ঢাকনী উল্টিয়ে দেখবেন গৃহস্থের হাঁড়িতে ভাত আছে কিনা। আমি এ ধরনের সস্তা রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না।' এ ঘটনা অনেক বছর আগের। ইতোমধ্যে জনগণের মনমানসিকতায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। মানুষ হয়তো এখন মওলানা ভাসানীর মতো হাঁড়ির ঢাকনী উল্টিয়ে দেখার নেতার খোঁজ করে না। কিন্তু তাই বলে রাজনীতিতে মানুষের প্রতি দরদহীন, সহযাত্রীদের প্রতি ভালোবাসাহীন এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় নিরুদ্বিগ্ন, এমন নেতাকে এখনও তারা পছন্দ করে না। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আসাম মুসলিম লীগের তৎকালীন সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ও মুসলিম লীগের অবিসংবাদিত নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে করাচীতে সাক্ষাৎ করতে যান। মওলানা ভাসানী জিন্নাহ সাহেবের কাছে বাংলা ও আসামের কৃষকদের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হুহু করে কেঁদে ফেলেন। জিন্নাহ সাহেব মওলানা ভাসানীর এই আবেগকে গুরুত্ব দেননি। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'এ ধরনের আবেগপ্রবণ নেতা দিয়ে রাষ্ট্র চালানো যায় না।' মওলানা সাহেব কখনো রাষ্ট্র চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। কিন্তু যারা রাষ্ট্র চালিয়েছে, তাদের ক্ষমতায় যাওয়া অথবা ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার ঘটনায় তিনি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছেন। জিন্নাহ সাহেবের চোখে মওলানা ভাসানীর এই আবেগপ্রবণ হাহুতাশের কাহিনী আইয়ুব খানের আত্মচরিত 'Friends, Not Masters' বা 'প্রভু নয়, বন্ধু' গ্রন্থের পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে। এ কাহিনী থেকে আমরা উপমহাদেশে এলিট ও মাসলীডারের চরিত্রগত পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারি। এই বিবেচনায় জিন্নাহ ও সোহরাওয়ার্দী এক সারিতে এবং মওলানা ভাসানীর অবস্থান ভিন্ন সারিতে। এদিক থেকে ফজলুল হক মওলানা ভাসানীর কাছাকাছি।

যাই হোক, ডেঙ্গুর প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে রাজনীতির কথা এসে গেলো।

১৯৯৮ সালে যখন বাংলাদেশে স্মরণকালের সবচাইতে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা হয়, তখন বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরপরই দূরদর্শী বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হবে বলে আশংকা করেছিলেন; কিন্তু সরকার তাদের কথায় কান দেননি। আজ যখন সত্যি সত্যি ডেঙ্গু রাজধানীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন দেখা গেলো, এই মহামারী প্রতিরোধে আমাদের যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নেই। ডেঙ্গুরোগীর জীবন বাচাতে রক্ত প্রয়োজন। ব্লাডব্যাংকগুলোতে রক্তের প্রচন্ড অভাব। রক্ত কিনতে আসা মানুষের ভিড় সামলাতে রেড ক্রিসেন্টের ব্লাডব্যাংক কর্তৃপক্ষ হিমশিম খাচ্ছে। বিশৃংখলা ঠেকাতে পুলিশ নিয়োগ করতে হয়েছে। আরও দুঃখজনক, ডেঙ্গুজ্বর চিকিৎসায় রক্তের এক বিশেষ উপাদান, যাকে বলা হয় প্ল্যাটিলেট বা অনুচক্রিকার প্রয়োজন হয়। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর রক্তে অনুচক্রিকা আশংকাজনক হারে হ্রাস পায়, ফলে রোগীর রক্তে অনুচক্রিকার যোগান দিতে হয়। সংগৃহীত রক্ত থেকে অনুচক্রিকা পৃথক করার যন্ত্র সরকারী হাসপাতালগুলোতে নেই, ফলে রক্ত পাওয়া গেলেও রক্তের যে উপাদানটি ডেঙ্গুজ্বরের চিকিৎসায় প্রয়োজন তা রোগীকে দেয়া যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

অন্যদিকে মশক উচ্ছেদ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। নগরবাসী রসিকতা করে মশকের নতুন নাম দিয়েছেন 'হানিফ'। ৯৮-এর বন্যার পরেই মশক উচ্ছেদের জন্য তৎপর হওয়া উচিত ছিল। এর জন্য বিশাল অংকের অর্থের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন আন্তরিকতা ও সর্বাত্মক জনসচেতনতা। এক সময়ে মশক নিধনের জন্য ডিডিটি ব্যবহার করা হতো। এর ফলে ম্যালেরিয়া ইরেডিকেশন প্রোগ্রামের অধীনে ষাটের দশকে মশক উচ্ছেদ হয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশ প্রায় ম্যালেরিয়ামুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডিডিটি পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, যে কারণে মশক নিধনে ডিডিটির মত শক্তিশালী ও কার্যকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। বিবিসির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠান থেকে জানতে পেরেছি, ডাক্তাররা এখন বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়ার প্রত্যাবর্তনের ফলে লাভ ও ক্ষতির বিবেচনায় ডিডিটি ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান দাবী করার কথা ভাবছেন। এ ছাড়া পরিবেশসম্মত উপায়ে মশক নিধনের গবেষণাও চলছে। IDRC (International Development Research Centre)-এর গবেষণা সংক্রান্ত রিপোর্ট থেকে এই উদ্যোগের খবর পাওয়া যায়।

বর্তমান পৃথিবীতে ম্যালেরিয়ার পাশাপাশি ডেঙ্গুজ্বর, ফাইলেরিয়া (গোঁদ), যক্ষ্মা এবং মরণব্যাধি এইডস অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এই ব্যাধিগুলো বিশেষ করে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও যক্ষ্মা পুরাতন ধরনের ওষুধে নিরাময় হতে চায় না। এগুলো রোধ করার জন্য আরও শক্তিশালী ও কার্যকর ওষুধের প্রয়োজন। সারাবিশ্বে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে বিপ্লবাত্মক উন্নয়ন ঘটেছে তার ফলে সংক্রামক ব্যাধি এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে কয়েক ঘন্টা থেকে একদিন সময়ই যথেষ্ট। এ জন্য যে ধরনের তৎপরতা, প্রস্তুতি, সতর্কতা প্রয়োজন, আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তা নেই বললেই চলে। শিশুদের মধ্যে কতগুলো সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ইপিআই প্রোগ্রাম মোটামুটি সফলতার সঙ্গে চলছে। তবে তার পাশাপাশি সেলিব্রাল ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, যক্ষ্মা ও এইডসের মত ভয়াবহ রোগগুলোর ব্যাপারে এখনই সতর্ক হতে হবে। এদেশে প্রবাদ আছে, কারও পৌষ মাস, আর কারও সর্বনাশ। ছিনতাই, দখলকারী ও প্রতাপের রাজনীতির এই সময়ে ডেঙ্গুজ্বরকে উপলক্ষ করে মতলবী লোকেরা বৃক্ষ ছিনতাই কর্মে লিপ্ত হয়েছে। গাছ কেটে ফেললে এডিস মশা দূর হবে- এই অজুহাতে একদল মতলবী লোক গাছ কেটে সাবাড় করছে। এসব প্রতিহত করার কোন ব্যবস্থা নেই। দেখভাল করারও কোন লোক নেই। সকল ধরনের বিপর্যয় থেকে মুনাফা লোটা যেন আমাদের জাতীয় পেশায় পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রেও সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত একটি সুষ্ঠু স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করা হয়নি। বিষয়টি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। প্রতিরোধযোগ্য রোগের প্রতিরোধের ব্যবস্থা, ব্যয়বহুল চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ সম্ভব- এসব ব্যাধির জন্য সহজসাধ্য ইন্সুরেন্স ব্যবস্থা, রোগ নির্ণয়ের প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর মান নির্ণয় ও তদারকি ব্যবস্থা, মহামারী নিরোধ ব্যবস্থা, ভুল চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, সাধারণ স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রভৃতি সকল ধরনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাকে চিহ্নিত করে একটি বিজ্ঞানসম্মত ও ব্যয় সংকুলান সাধ্য স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। বিদেশে চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ভারতসহ অন্যান্য দেশে চলে যায়। অন্যান্য দেশের চিকিৎসকদের যে রকম পড়াশোনা ও শিক্ষার মান, আমাদের দেশের ডাক্তাররাও তার তুলনায় কম নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রোগ নির্ণয়ে ভুল-ভ্রান্তি, ভুল চিকিৎসা ও অপ্রয়োজনীয় ইনভেস্টিগেশনের বোঝায় রোগীরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। জাতি হিসেবে আমরা কি এসব নিয়ে গঠনমূলক কিছুই করতে পারি না? আমরা অতীত নিয়ে নিমগ্ন আছি। আমাদের রাজনীতিতে অতীত নিয়ে যত বিতর্ক হয়, বর্তমানের সমস্যা নিয়ে তার শতভাগের একভাগও

www.pathagar.com

হয় না। দেশে মহামারী আকারে ডেঙ্গুজ্বর ছড়িয়ে পড়ল, সরকার উদাসীন রইল, ব্যস্ত রইল কথিত প্রধানমন্ত্রী হত্যার ষড়যন্ত্রে নিরীহ লোকদের ফাঁসিয়ে হয়রানি করতে। কিন্তু বিরোধী দলগুলোই বা কী করেছে। সমস্যা যখন প্রকট আকার ধারণ করেছে, তখন শুধু একটি বিবৃতিই কি যথেষ্ট? ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে যেমন অসহযোগ হয়েছিল, তেমনি ন্যাশনাল মেডিকেল ডাক্তার ও ইউনানী চিকিৎসার বিকল্পও সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল। রাজনীতি আজ ভয়ানকভাবে দয়ামায়াহীন, স্নেহ ভালবাসাহীন, সংগ্রামের সাথীর প্রতি সহানুভূতিহীন, মহৎ উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে পড়েছে। নীচতা, হীনতা, স্বার্থপরতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, উপদলীয় কোন্দল চলমান রাজনীতির উপজীব্য হয়ে পড়েছে। মহৎ কিছু অর্জনের লক্ষ্য নেই, পঙ্কিলতার পঙ্কশয্যায় রাজনীতি আজ শায়িত। এক কথায় বলা যায়, রাজনীতি আজ ইতর হয়ে উঠেছে। একে ভদ্র, সভ্য শোভন ও মানববান্ধব করে তুলতে না পারলে আমাদের নিষ্কৃতি নেই, মুক্তি নেই।

আফতাব আহমাদ :

এ যেন এক নিরুত্তাপ, নিস্তেজ, নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চল অবস্থা বাংলাদেশকে গ্রাস করে বসেছে গত কয় মাস ধরে। বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বাংলাদেশ সফর করে যাওয়ার পর বিরোধী শিবিরে এক বিস্ময়কর নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জাতির মর্যাদা ও সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে বলতে গেলে ক্লিনটনের ব্যক্তিগত গৃহপরিচারিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার মত কলংকজনক ঘটনা ঘটার পর এবং সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনসহ মার্কিন প্রতিনিধিরা অধিক সময় ব্যয় করেছেন– এই আত্মপ্রসাদে বিরোধী দলের উল্লাসে আটখানা লক্ষ্য করা গেলেও দেশের সংকট আরও গভীরতর ও গাঢ়তর হয়েছে। আজ চারিদিকে যে নিশ্চল নিস্তব্ধতা, তা কি কোন সর্বগ্রাসী প্রলয়ংকরী ঝড়ের পূর্বাভাস– এটি আজ যে কোন সমাজমনস্ক ব্যক্তির কাছেই এক বিরাট জিজ্ঞাসা। প্রকৃতির নিয়মে পরিবর্তন অনিবার্য, কিন্তু সে পরিবর্তন কোন রূপ পরিগ্রহ করে, তা নির্ভর করে সামাজিক শক্তিসমূহের বিন্যাস ও আসঞ্জনের মধ্যে। আজ ডেঙ্গুজ্বর নামে দেশে যে মহামারী দেখা দিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে হাসিনা সরকারের আমলে এটিই প্রথম দুর্যোগ নয়। প্রতিটি দুর্যোগের সময়ে একদিকে হাসিনার রাষ্ট্রঘাতী সরকারকে উদাসীনতা ও অবহেলা করতে দেখা গেছে এবং মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে বাস্তবতাকে ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা করতে দেখা গেছে। অপরদিকে বিরোধী দলসমূহ কেবলামুখী হয়ে কেবল এই মুনাজাতই করেছে যে, বোধ হয় এসব দুর্যোগই সরকারের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে এবং সংক্ষুব্ধ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরকার উৎখাতের আন্দোলনে গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দেবে। এর জন্য কোন পূর্বপ্রস্তুতি, পরিকল্পনা কিংবা সাংগঠনিক প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। এ দেশের মানুষ দীর্ঘকাল ত্রাণমুখাপেক্ষী হয়ে এবং একের পর এক রাজনৈতিক দল ও সরকারগুলোকে তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে দেখে জীবনের তাগিদ এবং তাড়নায় প্রিজার্ভেশনের সেলফ ইন্সটিংক্ট তাদেরকে ইনোভেটিভ করে তুলেছে। ঘুষ, জোচ্চুরি, উৎকোচ, বাটপারি, চোরাচালান ও চোরাকারবার এসব উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিবিরোধী কর্মকাণ্ডে যারা সিদ্ধহস্ত, রাজনীতি আজ তাদের হাতের মুঠোয়– রাজনৈতিক দলগুলো আজ তাদেরই পায়রবি করে। এ দেশে একটি রাজনৈতিক দলও পাওয়া যাবে না, যে দলের কোষাধ্যক্ষ বা কোষাগারিক প্রকাশ্যে সংগঠনের সদস্য, কর্মী ও সমর্থকদের সামনে সংগঠনের আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট পেশ করতে পারেন। বস্তুত ওই পদটি একটি আলংকরিক পদ মাত্র। রাজনৈতিক দলসমূহের অর্থের উৎস সম্পর্কে সংগঠনের সদস্য, কর্মী, সমর্থকদের কাছে জবাবদিহিতার কোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতি আমাদের গড়ে ওঠেনি বিধায় আমরা বেপরোয়া এবং কলাকৌশল নিরূপণের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার কাজে অহর্নিশ ব্যস্ত থাকি। এটি শুধু যে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা-ই নয়, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত

www.pathagar.com

অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা সম্প্রসারণবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের আধিপত্য ও আগ্রাসী নীতিকে প্রতিহত করার জন্য একদিকে সোচ্চার হই, কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্তগুলো অবলীলাক্রমে না জানার ভান করি। রেল দুর্ঘটনার জন্য ভারতের তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে পদত্যাগ করার নজির আমরা দেখেছি। ফকল্যান্ডস যুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন নট্ পদত্যাগ করেছিলেন। এ ধরনের বিভিন্ন দেশের অজস্র দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশটিই হলো 'সকল দেশের সেরা, এমন দেশটি কোথাও তুমি খুঁজে পাবে নাকো তুমি'। এখানে রেল দুর্ঘটনা ঘটলে পয়েন্টসম্যান, স্টেশনমাস্টার কিংবা গার্ডের চাকরি তাৎক্ষণিক চলে যাবে। কিন্তু রেলমন্ত্রীর কিছু হবে না। থানার কনস্টেবল অপরাধ করলে তাকে ক্লোজ করা হবে, ওসি সাসপেন্ডেড হবে না। ওসি অপরাধ করলে এসপি, ডিআইজি এমনকি আইজিকেও জবাবদিহি করতে হয় না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো দূরের কথা। আর হাসিনা সরকার প্রকাশ্যে পুলিশ এবং আওয়ামী লাঠিয়ালদের খুন ও বেধড়ক মারধর করার প্রকাশ্য লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছে। হাসিনার মতে, 'একটি লাশ পড়লে [কোন পক্ষের লাশ তা অবশ্য তিনি বলেননি] দশটি লাশ পড়বে'। এটি আইনের প্রতি এবং আইনের শাসনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন ও বৈরিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'বিচারকদের মাথা ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত লাঠি মিছিল চলবে'। নিজ দলের উপদলীয় কোন্দলে ও ষড়যন্ত্রে একের পর এক যে খুন, হত্যা এবং রক্তাক্ত ঘটনা ঘটে চলেছে, তা বিরোধী দলের ঘাড়ে চাপিয়ে হাসিনা ও তার সরকার পরিত্রাণ পেতে চায় এবং এ উপলক্ষে নিরীহ লোক যখন গ্রেফতার হয় এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ করাতো দূরের কথা, চার্জশীট প্রণয়নের ন্যূনতম উপাদানও খুঁজে পায় না, আদালত তখন বাধ্য হয় ওইসব দুর্ভাগা নিরীহ আইনানুগ নাগরিকদের জামিন মঞ্জুর করতে। আর অমনি শেখ হাসিনা ফোঁস করে উঠে আদালতকে অবমাননা করে মন্তব্য করে বসেন যে, পুলিশ 'খুনী'দের ধরে আনার পর আদালত জামিন দিয়ে দিলে সন্ত্রাস কীভাবে নির্মূল হবে? ভাবখানা এমন যে, পুলিশ যাদের ধরেছিল তারা সন্দেহাতীতভাবেই অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। হাসিনার এই ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতাকে এক সময়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট তিরস্কার করে তাকে 'wrong headed' আখ্যায়িত করেছিল। এই 'রং হেডেড' প্রধানমন্ত্রীর অথর্ব, অপদার্থ ও অযোগ্য একজন মন্ত্রী হলেন তারই ফুফাতো ভাই শেখ ফজলুল করিম সেলিম। ছাত্রলীগের পেছনের সারির অজ্ঞাত একজন সাধারণ কর্মী হওয়া সত্ত্বেও মুজিবের ভাগ্নে মনির ছোট ভাই হিসেবে ছাত্রলীগের ওপর বহুবার প্রতাপ খাটাবার চেষ্টা করেও প্রত্যেকবার ব্যর্থ হয়েছিলেন সেলিম। শেখ মনির সম্পত্তি [যার প্রকৃত উৎস জানা নেই] গ্রাস করার লোভও এই সেলিম সংবরণ করতে পারেননি। কিন্তু শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে মনির পুত্র তাপস শেষ পর্যন্ত 'বাংলার বাণী'র মালিকানা ফিরে পেয়েছেন। ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনের পর থেকেই শেখ সেলিম প্রচণ্ড রকমের চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন হাসিনার ওপর তাকে ক্যাবিনেটে নেয়ার জন্য। বহু চাপ সহ্য করার পর অবশেষে এই সাম্প্রতিককালে সেলিমকে ক্যাবিনেটে ঠাঁই দেয়া হয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। মন্ত্রণালয় চালানোতো দূরের কথা, ইউনিয়ন পরিষদ চালানোর যোগ্যতা এই ভদ্রলোকের আছে কিনা তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। আজ দেশব্যাপী মহামারী আকারে যে ডেঙ্গুজ্বর ছড়িয়ে পড়েছে, তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বর্তায় শেখ সেলিমের ওপর। আর রাজধানী ঢাকা শহরের জন্য ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফও কোন অবস্থাতেই দায়মুক্ত হতে পারেন না। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, মুদ্রণ মাধ্যম এবং ত্বড়িতনিক মাধ্যমে জনসাধারণকে ডেঙ্গুজ্বরের ধরন, স্বরূপ– এ ব্যাপারে কী সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, এবং কী ধরনের চিকিৎসা পরামর্শ প্রয়োজন তার কোনো প্রচার আমরা লক্ষ্য করিনি। ত্বড়িতনিক মাধ্যমে কেবল দেখতে পাই শেখ হাসিনাকে হত্যা

www.pathagar.com

করার জন্য চারদিকে শুধু বোমা আর বোমা তৈরী হচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোথাও একটি বোমাকে ফুটতেও দেখা গেল না। হিটলার জনগণকে প্রতারিত করে 'গণতান্ত্রিকভাবে' নির্বাচিত হয়ে যখন কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিরোধীদলকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ঘৃণ্য পরিকল্পনা আঁটেন তখন তারই নাৎসী পার্টির সন্ত্রাসী গুন্ডা-বদমাশরা জার্মান সংসদ ভবন রাইটস্ট্যাগে আগুন ধরিয়ে সে দোষ বিরোধীদলের ওপর চাপিয়ে সারা দেশব্যাপী নিপীড়ন, নির্যাতনের এক নজিরবিহীন নৃশংস ইতিহাস রচনা করেছিলেন। শেখ হাসিনা পিতার ভুল পদক্ষেপ ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-এর ষড়যন্ত্রের গভীরতা ও মর্মবস্তু উপলব্ধি না করেই সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য নিজেকে যেভাবে Victim of probable assasination হিসেবে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করছেন, তাতে তিনি সহানুভূতি পাওয়ার পরিবর্তে হাসির খোরাকে পরিণত হচ্ছেন। দেশ চালাতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে দেশের স্বার্থকে বিদেশের ঠাকুরের পদতলে অর্ঘ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বয়ম্ভর, রোগমুক্ত ও সুস্বাস্থ্যের দেশ হিসেবে গড়ে তোলা যাবে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শেখ সেলিম স্বাস্থ্য মহাপরিচালকের পদত্যাগ দাবী করে বসেছেন। কী কারণে? আইনত এবং নৈতিকভাবে দেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির জন্য দায়ী হচ্ছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ডেঙ্গুজ্বরের মহামারীর জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে এবং যদি কাউকে পদত্যাগ করতে হয়– তিনি হচ্ছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শেখ সেলিম।

এবার জনসাধারণের হিতার্থে ডেঙ্গুজ্বর সম্পর্কে দু'একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ডেঙ্গু এখন একটি মহামারীরূপে বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, সেই সাথে এর প্রতিবিধান ও প্রতিষেধকেরও ব্যবস্থা দেশে নেয়া হচ্ছে। ডেঙ্গু দু'ধরনের– একটাকে বলা হয় ডেঙ্গুজ্বর বা ডেঙ্গু ফিভার (DF), আরেকটি হলো ডেঙ্গু হ্যামোরেইজিক ফিভার (DHF). ডেঙ্গুজ্বরের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, হঠাৎ মাত্রাতিরিক্ত জ্বর দেখা দেবে, প্রচণ্ড মাথাব্যথা হবে, চোখের পেছনে ব্যথাবেদনা অনুভূত হবে এবং দেহের বিভিন্ন মাসল ও জয়েন্টে ব্যথা অনুভূত হবে। ডেঙ্গু হ্যামোরেইজিক ফিভারের ক্ষেত্রে অবস্থা আরও চরম আকার ধারণ করে এবং এ ধরনের জ্বরেই ব্লিডিং এবং অনেক সময়ে শক্ ঘটতে পারে, যার ফলে মৃত্যু অবধারিত। শিশুদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত মারাত্মক। ব্লিডিংয়ের সিম্পটম জ্বরের দু'তিন দিন পরে সাধারণত দেখা দেয়। আর জ্বরের মাত্রা একটু কমে আসলেও জ্বর আবার বাড়তে পারে। ডেঙ্গুজ্বর বা DF-কে চেনার উপায় হচ্ছে, হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর, মারাত্মক মাথাব্যথা, বিশেষ করে কপালের সামনের দিকটায় চোখের পেছনের দিকটায় ব্যথা এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে, চোখের সঞ্চালন ব্যাহত হয়। সারা শরীর ব্যথা করতে থাকে এবং জয়েন্টগুলোতে তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হতে থাকে, বমির ভাব বা বমির উদ্রেক হতে পারে। ডেঙ্গু হ্যামোরেইজিক ফিভার এবং শক চিনতে হলে– ডেঙ্গু ফিভারের যে সমস্ত প্রলক্ষণের কথা বলেছি, সেসব তো আছেই, তার সঙ্গে নিম্নের যে কোন একটি বা সবক'টি একসাথে যুক্ত হতে পারে (ক) তলপেটে প্রচণ্ড এবং অব্যাহত যন্ত্রণা, (খ) নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে এবং মাড়ি দিয়ে ব্লিডিং অথবা চামড়া ছিড়ে যাওয়া, (গ) ঘন ঘন বমি (রক্তসহ কিংবা রক্ত ছাড়া), (ঘ) আলকাতরার মতো কালো পায়খানা, (ঙ) মাত্রাতিরিক্ত তৃষ্ণাবোধ এবং মুখগহ্বরের শুষ্কতা, (চ) ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া এবং চামড়া শীতল হয়ে যাওয়া। যেসব রোগী DF বা DHF-এ ভুগছে তাদেরকে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে এবং Aspirin ও Brufen ডিএফ বা ডিইএচএফ রোগীকে দেয়া যাবে না। কারণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা গেছে যে, এ দু'টি ওষুধ ব্লিডিংয়ের প্রবণতা বাড়াতে পারে এবং গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্যারাসিটামল দেয়া যেতে পারে। যাতে তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা, বিশেষ করে আলকাতরার মতো পায়খানা যাদের হচ্ছে, যাদের চামড়া, নাক বা মাড়ি থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, যাদের প্রচণ্ড ঘামাচ্ছে এবং যাদের চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে, মনে করতে হবে এগুলো বিপদের প্রলক্ষণ। এর যে কোন একটি লক্ষ্য করা গেলে রোগীকে সাথে সাথে

www.pathagar.com

হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে এবং রোগীকে হাসপাতালের স্থানান্তরের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পানি বা যে কোন তরল পানীয় পান করাতে হবে।

ডেঙ্গু ছড়ায় কীভাবে? এক ধরনের মশা আছে– (ঢাকা শহরে সবাই এদেরকে 'হানিফ' বলে ডাকে)। অযোগ্য, অথর্ব, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি হানিফ আর মশক হানিফের মধ্যে তফাৎ খুব একটা বেশী নেই; এরা উভয়েই মানুষ এবং সমাজের জন্য ভয়াবহ আতঙ্কস্বরূপ। এডিস এজিপটি (Aedes aegypti) নামক ইনফেকটেড একটি মশা যখন অন্য কোন ব্যক্তিকে কামড় দেয়, তখনই সেই ব্যক্তির দেহে ডেঙ্গুর ভাইরাস প্রবেশ করে। তবে রোগের লক্ষণ তৎক্ষণাৎ দেখা যায় না। কামড়ের ৫/৭ দিন পর এই লক্ষণ সাধারণত দেখা দিয়ে থাকে। এ ধরনের মশক সাধারণত ঘরের ভেতরে ক্লসেটে এবং অন্যান্য অন্ধকার স্থানে অবস্থান করে। ঘরের বাইরে যে জায়গাটা তুলনামূলক ঠাণ্ডা ও ছায়াবৃত, সেখানেই এই মশককুল বসবাস করে। জমিয়ে রাখা পানি বা খোলা পাত্রে রাখা পানিতে এডিস এজিপটি মশককুল দ্রুত প্রজনন করে। এদের প্রজননের সবচেয়ে প্রিয় স্থানগুলো হচ্ছে, ব্যারেল, ড্রাম, পানির পাত্র, পট, বালতি, ফুলদানি, ফুলের টবের নিচে রাখা তস্তরী, পুকুর, ডোবা, পরিত্যক্ত বোতল ও টিন, টায়ার, ওয়াটার কুলার ইত্যাদি। এছাড়া আরো অনেক স্থান– যেখানে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে পারে, বা জমিয়ে রাখা হয়।

এই মশককুলকে নিধন করার জন্য ঢাকাসহ সারাদেশের মানুষ তারস্বরে বহু অনুনয়-বিনয়, আবেদন-নিবেদন করেছে, করা সত্ত্বেও চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী– ব্যক্তি হানিফ চোখে দিয়েছেন ঠুলি, কানে দিয়েছেন তুলো, পিঠে বেঁধেছেন কুলো এবং এভাবে তিনি মশক হানিফে রূপান্তরিত হয়ে রাজধানীতে গত সাত বছর ধরে যেভাবে মানুষকে কামড়ে, রক্ত শোষণ করে এবং এ ভাইরাস ছড়িয়ে সমাজে আজ এক মহামারীর জন্ম দিয়েছেন, তার দায়-দায়িত্ব থেকে তিনি অব্যাহতি পেতে পারেন না। যুগপৎভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, তাদের কর্তব্য কে কতটুকু পালন করেছে সে বিষয়ও জনসাধারণের মধ্যে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ তদন্ত করে অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সার্ভিস রুল অনুযায়ী যথোচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করা হোক। এটিই আজ জনগণের দাবী। তবে সর্বাগ্রে ভোটের রাজনীতির নামে জনগণকে প্রতারিত করে যারা ক্ষমতা চর্চা করছেন, সেই মেয়র হানিফ এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শেখ সেলিমের অনতিবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। অবশ্য, বলাই বাহুল্য, এই সরকারটাই যেখানে গণবিরোধী, দেশদ্রোহী ও রাষ্ট্রঘাতী, তার লাল্লুপাঞ্জুরা পদত্যাগ করে গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাবেন, সে আশা করাটাই উলুবনে মুক্তো ছড়ানোর সমতুল্য। তবু যেহেতু গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকুক– এই মতাদর্শে বিশ্বাস করি, সেহেতু অযোগ্য ও নিষ্কর্মা ব্যক্তির পদত্যাগ জনগণের পক্ষ থেকে আমি দাবী করছি।

www.pathagar.com

১২ আগস্ট ২০০০

এখন গ্রহণের কাল

মাহবুব উল্লাহ :

১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসকরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যায় এবং এর ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। পাকিস্তানের ভৌগোলিক গঠন ছিল অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব তার দুটি অংশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল ১০০০ মাইলেরও বেশী। মাঝখানে বৈরী রাষ্ট্র ভারতের অবস্থান। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভারতের মাঝখান দিয়ে করিডোরের দাবী ভারতীয় কংগ্রেসী শাসকরা মেনে নেয়নি। ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম বন্দর ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এ রকম একটি অনুন্নত ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোবিহীন বন্দরের মাধ্যমে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। কারণ পূর্ববঙ্গ যখন বৃটিশ শাসনাধীন ছিল তখন এ অঞ্চলের বাণিজ্য পরিচালিত হতো কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে। পূর্ববঙ্গের পাট ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রফতানী করা হতো। সেই সময় পূর্ববঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প কারখানা ছিল না। পূর্ববঙ্গ ছিল কলকাতার পশ্চাৎভূমি। পূর্ববঙ্গের ভূমিহীন ও আধা ভূমিহীন কৃষকরা শ্রমিক হিসাবে হুগলী নদীর তীরবর্তী জুটমিলে অথবা কলকাতা বন্দরে মজুর হিসাবে কাজ করতো। পূর্ববঙ্গ ছিল মূলত খাদ্যশস্য ও পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের আবাসভূমি। অন্যদিকে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিক্ষিত শহরমুখী 'ভদ্রলোকদের' (বাবুদের) আবাসভূমি। বৃটিশ শাসন এইভাবে সমগ্র বঙ্গদেশে এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দ্বৈততার (dualism) সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করার স্বার্থে কলকাতা বন্দর ৬ মাস ব্যবহারের জন্য ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর কাছে অনুমতি চাওয়া হল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের তৎকালীন উগ্র জাত্যাভিমানী নেতারা ৬ মাস তো দূরের কথা ৬ ঘন্টার জন্যও কলকাতা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিতে রাজি হল না। ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর এই অসহযোগিতার মনোভাব সদ্যজাত পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রত্যয় সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলার প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অনেকে সে সময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান চিরদিন অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু থেকে যাবে, এই রাষ্ট্র আদৌ টিকে থাকবে না। কারণ এর কোন Economic Viability নেই। ডাকসাঁইটে একজন ভারতীয় হিন্দু অর্থনীতিবিদ, Economic Consequences of Partition, শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে টেকসই নয়, কারণ, পার্টিশনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আসামের খনিজ ও বনজ সম্পদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক হওয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বহু শ্রমজীবী মানুষ কলকারখানার কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়বে। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প কারখানা নেই এবং খনিজ সম্পদও নেই সেইহেতু পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মৃত্যুর আগেই অর্থনৈতিক মৃত্যু ঘটবে।

অর্থনীতিতে অভারসাম্যমূলক উন্নয়নে বা Unbalanced development-এর একটি তত্ত্ব রয়েছে। তাঁব কাঁটা বের হয়ে থাকা চেয়ারে বসতে গেলে মানুষ যেমন ঘা খেয়ে লাফিয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়ায়, অভারসাম্যমূলক উন্নয়ন তেমনি একটি ব্যাপার। '৪৭ এর উত্তরকালে প্রথম ক'বছর পূর্ব পাকিস্তানীরা এভাবেই নানারকম ঘা খেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। খোদ জিন্নাহ সাহেব তৎকালীন পাকিস্তানের অবস্থাকে বর্ণনা করেছিলেন 'Moth eaten and turncated Pakistan' বলে। ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তান Economic Viability অর্জন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যনীতির কারণে অচিরেই পূর্ব পাকিস্তানেও সদ্য অর্জিত স্বাধীনতার উদ্দীপনা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে এবং এরই পরিণতিতে ১৯৭১-এ রক্তক্ষরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশের উদ্ভবের পর অনেক বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত কিছু শিক্ষিত মানুষ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে না কিংবা থাকলেও এ রাষ্ট্রটিকে ভারতের উপর নির্ভরশীল একটি প্রতিবন্ধী রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে হবে– এ ধরনের প্রচার প্রোপাগান্ডা চালাতে থাকে। এরা এমন ধরনের মানুষ যারা কলকাতার বইমেলায় আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে যখন মুখ্যমন্ত্রী সম্বোধন করা হয় তখন তারা এই ঘটনা চোখ বুজে মেনে নেয় অথবা একে প্রকাশভঙ্গিতার মামুলি বিচ্যুতি হিসেবে দেখে। একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের কিছু কুলাঙ্গার রাজনীতিবিদ ইন্দিরা গান্ধীর নিকট বাংলাদেশকে ভারতভুক্ত করে নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলো। তাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে একশ্রেণীর ভারতীয় রাজনীতিকও কণ্ঠ মিলিয়েছিলো। বাংলাদেশীরা স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় প্রশাসন চালাতে সক্ষম হবে না এ অজুহাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ভারতীয় পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছিল। ভারতের পক্ষ থেকে জেনারেল বি এন সরকার এসব বিষয় দেখভাল করার দায়িত্বে ছিলেন। বাংলাদেশে দেশরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী গড়ে না তোলার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এরকম আরো কিছু মারাত্মক শর্ত জুড়ে দিয়ে প্রবাসী সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের ৭ দফা গোপন চুক্তি হয়েছিল বলে বিজ্ঞজনদের মধ্যে প্রবল সন্দেহ বিদ্যমান। মওলানা ভাসানী তাঁর সাপ্তাহিক 'হক কথার' মাধ্যমে দেশবাসীকে এসব রাষ্ট্রঘাতী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ উদ্ভবের অব্যবহিত পরে আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমেও বাংলাদেশ টিকবে না– এমন কথা প্রচার করা হয়েছিল। আন্তর্জতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যা পেয়েছিল, এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ছিল বন্যা-ক্ষরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষের দেশ হিসাবে। অস্বীকার করার উপায় নেই বাংলাদেশের অর্থনীতি এদেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যোগের ফলে আজ বহুলাংশে প্রথম দিককার বিরূপ ভাবমূর্তি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের সংকট কাটছে না, বরং দিনের পর দিন এই সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করছে। একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে এর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত প্রতিষ্ঠানগুলো কত শক্তিশালী তার উপর। আজ বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বিপর্যস্ত। স্বাধীনতার পর প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারীতে শহীদ মিনারে রাত ১২-০১ মিনিটের পর যেভাবে নারীর সম্ভ্রম হরণ করা হয়েছিল তা দেখে এ কথা কি ভাবা গিয়েছিল এ জাতি মাত্র দু'মাস আগেও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবনবাজি রেখেছিল? হায়নাদের হাতে মা-বোনের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছিল সেদিন। শহীদ দিবসের পবিত্র অঙ্গন কারা কলুষিত করেছিল তাদের পরিচয় জাতির অজানা নয়। জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের শহীদ মিনারের প্রতীকী গুরুত্ব কী অপরিসীম তা ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা স্বাধীন হয়েছি বলেই একুশে ফেব্রুয়ারীতে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পাকিস্তান আমলে এটা ভাবা যেত না। কিন্তু আজ শহীদ দিবস উদযাপনের কি দৃশ্যইনা আমরা দেখতে পাই! কয়েক বছর ধরে সেখানে ছবি টাঙানোর কুৎসিত প্রতিযোগিতা চলেছে। শহীদ মিনারে শহীদ দিবসে

www.pathagar.com

বোমাবাজি, সশস্ত্র সংঘাত নিত্য বছরের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার শহীদ দিবস উদযাপনের নামে চলে জঘন্য চাঁদাবাজি। এরকম একটি সুন্দর ও পবিত্র দিবসকে কারা কদর্য করে তুলছে? কী তাদের অভিপ্রায়? শিক্ষঙ্গনের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। স্বাধীনতার পরপর মহাকলেবরে পরীক্ষায় নকলবাজির যে মচ্ছব সূচিত হয়েছিল বর্তমান সরকারের আমলে তাকে মচ্ছবের চাইতেও অনেক বড় আকারের কোন্ যজ্ঞের সাথে তুলনা করব ভেবে পাই না। ওদিকে শিক্ষামন্ত্রী নিজ ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়ে 'একটু-আধটু নকলতো হবেই' এ কথা বলে সাফাই গাইতেও লজ্জাবোধ করেন না। ভুয়া ডিগ্রী, ভুয়া সার্টিফিকেট আজ এক মামুলি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের সেঞ্চুরী উদযাপন করা হয়। কিছু কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধেও ছাত্রী-নিপীড়নের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। দুর্নীতি আজ সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করেছে। ঘুষ না দিলে অফিস-আদালতে কোন কাজ হয় না। খোদ প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি সম্পর্কে নিজের ক্ষোভের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর সুপারিশেও কারো চাকরি হয় না, সরকারী চাকরিতে নিয়োগের নিয়মকানুন থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে কারো জন্য কেন সুপারিশ করবেন তা বোধগম্য নয়– এটাও কি এক ধরনের দুর্নীতি নয়? এছাড়া বিমান বাহিনীর জন্য মিগ বিমান কেনা, নৌবাহিনীর জন্য ফ্রিগেট কেনা নিয়ে অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারির কাহিনী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ক্ষমতাসীনদের আর্থিক সুবিধা গ্রহণেরও অভিযোগ উঠেছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন *Corruption in Bangladesh–Costs and Cures*, ১৯৯৬ সালের Transparency International-এর এক জরিপ উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে ৭৪%, হাসপাতালে ভর্তির জন্য ৭১%, বিচার ব্যবস্থায় ৮৯%, পুলিশের ক্ষেত্রে ৯৬%, জমি বেচাকেনায় ৭১%, আর্থিক খাতে ৭৪%, পানির সংযোগ দেয়ার জন্য ৬০%, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ৭০%, ট্রেড লাইসেন্স-এর জন্য ৬৫%, সরকারী পরিবহন ক্ষেত্রে ৭৩% ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে ৮৪% অবৈধ লেনদেন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উদঘাটিত হয়েছে।

এছাড়াও বিশ্বব্যাংকের এই প্রতিবেদনে বেশ কিছু মারাত্মক মন্তব্য করা হয়েছে, যেমন :

(i) In the education sector, parents complain about the quality of education; most parents have to make donations or use political pressure to get their children admitted to school.

(ii) In the health sector, there is considerable leakage of medical and surgical supplies; the poor have to pay for medicines that are supposed to be free.

(iii) In the financial sector, insider lending and fraudulent behavior remain rampant and kickbacks are common place.

(iv) Corruption is pervasive in revenue administration where tax offecials enjoy substantial discretionary authority and monopoly powers.

(v) Corruption in procurement mops Bangladesh of hundreds of millions of dollars annually. The people pay for this corruption either through increased cost or inferior quality of goods and services.

(vi) As Bangladesh begins to exploit its supplies of natural gas this is a key time for efforts to limit corruption and self dealing. Evidences from around and world suggests that natural resource windfalls must be managed carefully.

www.pathagar.com

পুলিশের কাজ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। কিন্তু বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, আইনবহির্ভূত নির্যাতন ও নিপীড়ন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এই পুলিশ বাহিনীর লোকেরা এক সময় স্বাধীনতার জন্য রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অকাতরে আত্মাহুতি দিয়েছিল। সেই পুলিশের বিরুদ্ধে আজ কত অভিযোগ। কেউ কেউ বলবেন, একাত্তরে যারা পুলিশ বাহিনীতে ছিলেন তাদের অনেকেই শহীদ হয়েছেন, স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। কাজেই একাত্তরের পুলিশের গৌরবজনক ভূমিকার স্মৃতিচারণ অর্থহীন। তারপরেও কথা থেকে যায়। পাকিস্তান আমলেও পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অনাচারের অনেক অভিযোগ শোনা যেত; কিন্তু তা আজকের মত সর্বব্যাপক ছিল না। তারপরেও এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সৎ ও দক্ষ পূর্বসূরি পুলিশ কর্মকর্তাদের কোন প্রভাবই কি উত্তরসূরিদের উপর কার্যকর হয়নি? খোদ প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ তুলেছেন, পুলিশ বাহিনীতে যারা অপকর্মের সাথে যুক্ত তারা নাকি বিএনপি আমলে নিযুক্ত পার্টি ক্যাডার। প্রধানমন্ত্রী যেহেতু এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন সেইহেতু তার কর্তব্য হল বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে যথাযথ তদন্ত করে এসব অপকর্মের হোতাদের পুলিশ বাহিনী থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। তবে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, এই আমলে যারা পুলিশ বাহিনীতে নিযুক্ত হচ্ছে তারা কোন দলের ক্যাডার। আজ গ্রাম থেকে যেসব আত্মীয়স্বজন আসেন তাদের কাছে জানতে পারি পুলিশের অনেক লোক গ্রামে ডাকাতি-রাহাজানিতে জড়িয়ে পড়েছে। তাহলে দেশে শান্তি থাকবে কিভাবে?

বাংলাদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে যেমন, ফেনী, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল ও কিশোরগঞ্জে স্থানীয় Warlord-এর উৎপত্তি ঘটেছে। সেসব জায়গায় স্থানীয় প্রশাসনের লোকেরা এসব Warlord-দের হাতে জিম্মি। অবাক হবার কথা নয়, হয়তো অচিরেই বাংলাদেশ সোমালিয়ার মত পরস্পরবিরোধী যুদ্ধবাজ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় পরিণত হয়ে পড়বে। আজ বিচার বিভাগও চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আইন-আদালতের মর্যাদা নিয়ে অসংযত ও অসংলগ্ন মন্তব্য বর্ষণ করা হচ্ছে যখন-তখন। উচ্চতর আদালতের বিচারকরা বিপন্নবোধ করেন বলেই বিব্রত হওয়ার কথা বলেন। মফস্বল শহরের বেশকিছু স্থানে টিএনও, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ডেপুটি কমিশনার ও চিকিৎসকরা শাসক দলের ক্যাডারদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন, এদের মধ্যে মহিলা কর্মকর্তাও রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব যে পুলিশ কর্মকর্তাটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে গেছেন তাকেও ক্লোজ করা হয়েছে। কারণ দায়িত্ব পালনের সময় ঐ কর্মকর্তাকে অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে শাসক দলের মাঝারি গোছের নেতার উপর এ্যাকশন নিতে হয়েছে। তিনি কি জানতেন ঐ ব্যক্তিটি শাসক দলের সদস্য? একদিকে তারস্বরে বলা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর জীবন ভয়ানক হুমকির সম্মুখীন, অন্যদিকে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গেলেও হয়রানির শিকার হতে হয়। এখন পুলিশ কি করবে? আমরা যতই আলোচনা করি ততই দেখতে পাই, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান বা ইনষ্টিটিউশন আজ ভেঙে পড়েছে। ইনস্টিটিউশন ভেঙে পড়লে রাষ্ট্রের থাকে কি? ঘটনাদৃষ্টে মনে হয়, একটি সুচতুর বহির্দেশীয় মহল তাদের দেশীয় সহযোগীদের সহায়তায় অত্যন্ত নিপুণভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিটি ইনস্টিটিউশনের উপর জনগণের আস্থায় চরমভাবে চিড় ধরিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে Unviable প্রমাণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

আফতাব আহমাদ :

বাংলাদেশ দখলদার মুক্ত হওয়ার পরপরই বিশিষ্ট পণ্ডিত ও কথাশিল্পী সৈয়দ মুজতবা আলী রাঢ়াঞ্চল ছেড়ে বাংলাদেশে এসে বসবাস করা শুরু করেন। যে বাংলাদেশ থেকে ১৯৪৯ সনে এক ধরনের বিতাড়িত হয়েই তাঁকে রাঢ়াঞ্চলে চলে যেতে হয়েছিল (৮ আগস্ট, ১৯৪৯)।

www.pathagar.com

সেই রাঢ়াঞ্চল ত্যাগ করেই তিনি বাংলাদেশে এসে বসবাস করা শুরু করেন। ঐ সময়টি ছিল বাংলাদেশের চরম দুঃসময়। একদিকে ছিনতাই, খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, ধর্ষণ, আরেকদিকে শাসক দলের বিরুদ্ধবাদীদের নির্মম ও পৈশাচিক পন্থায় হত্যা ও দলন। অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছিল, মুদ্রাস্ফীতি ছিল আকাশ ছোয়া আর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ছিল ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। রাষ্ট্রীয়করণের নামে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে লুণ্ঠন ও তসরুফের এক নজিরবিহীন অর্থনীতি প্রবর্তিত হয়েছিল বাংলাদেশে। ইংরেজীতে আওয়ামী লীগকে সংক্ষেপে বলা হয় AL। আওয়ামী লীগের সীমাহীন লুটপাট কল-কারখানাকে যেভাবে মিসমার করে দিচ্ছিল তা দেখে দাতা দেশগুলো ও বিদেশী সাংবাদিকরা আওয়ামী লীগকে অভিহিত করত Association of Looters হিসাবে। মওলানা ভাসানী এর নাম দিয়েছিলেন 'লুটপাট সমিতি'। দেশের অর্থনীতি দেশীয় পুঁজি, দেশীয় কাঁচামাল ধ্বংস করে কীভাবে এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত রাতারাতি পুঁজির মালিক হয়ে বসেছিল তা কেবল 'আরব্য রজনী' উপন্যাসের ঘটনার সাথেই তুল্য। 'ওলটপালট করে দে মা লুটেপুটে খাই' এই ছিল আওয়ামী তস্করদের জীবনের একমাত্র ব্রত। সেই সময় সৈয়দ মুজতবা আলী হোটেল পূর্বাণীতে আল-মাহমুদ, শহীদ কাদরী, ফজল শাহাবুদ্দিন ও শামসুর রাহমানসহ আমাদেরকে বলেছিলেন, কিছুদিন আগে একজন নাস্তিক দার্শনিক বাংলাদেশ পরিভ্রমণে এসেছিলেন। বিদায়কালে তাঁকে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বলা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, আমি একজন নাস্তিক ছিলাম, ঈশ্বর বা আল্লাহ'য় আমার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশ দেখার পর এখন আমি পরিপূর্ণ আস্তিকে পরিণত হয়েছি। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ ছাড়া বাংলাদেশ এভাবে চলতে ও টিকে থাকতে পারত না। মুজতবা আলীর বর্ণিত এই গল্প থেকে আওয়ামী শাসক গোষ্ঠীর পর্বতপ্রমাণ অথর্বতাই প্রমাণিত হয়।

মুজিবী দুঃশাসনের সময়ও আমরা লক্ষ্য করেছি, বাম রাজনীতিকে প্রতিহত করার জন্য মুজিবের নেতৃত্বে ধর্মের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার। বায়তুল মোকাররম থেকে সরাসরি মিলাদ মাহফিল, রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে মুজিবের উপস্থিতিতে প্রচার করা এবং রেডিও টেলিভিশনে সীরাতুন্নবী উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা– এ সবকিছুর পেছনে যে উদ্দেশ্য ও প্রণোদনা মুজিবের মধ্যে কাজ করেছে তা হল নিজেকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করে তার বাম প্রতিপক্ষকে নাস্তিকতার অভিযোগে বেকায়দায় ফেলে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করা। মুজিবের বিশিষ্ট সহযোগী ও অনুরাগী সুসাহিত্যিক আবুল ফজল যখন টেবিল চাপড়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অব্যাহত রাখার এবং মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে সরকারী অর্থ বরাদ্দবৃদ্ধির জোরালো দাবী উত্থাপন করেন তখন কবীর চৌধুরী, সৈয়দ হাসান ইমাম, শামসুর রাহমান, কামাল লোহানী, একাত্তরের লন্ডনে পাকিস্তানের কলাবরেটর সৈয়দ শামসুল হক কিংবা রামেন্দু কৃষ্ণ মজুমদার সেদিন টুঁ-শব্দটি করার সাহসটুকু পায়নি। শুধু তাই নয়, মুজিব অধ্যাপক আবুল ফজলের সঙ্গে একমত পোষণ করে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা 'ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী'দের থোড়াই পাত্তা দিয়েছিলেন। এ জাতি আরেকটি বিষয়ে অধ্যাপক আবুল ফজলের কাছে গভীরভাবে ঋণী এবং এ ঋণ কখনো শোধ হবার নয়। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যখন ঐতিহ্যবাহী সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে 'মুসলিম' শব্দ বিতাড়িত করে, এমনকি জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম বাদসহ দেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে আরবী হরফে খচিত 'রাব্বী জিদনী ইলমা' এই মহান উক্তিটি বাদ দিয়ে দেয়া হয় তখন কেবল অধ্যাপক আবুল ফজলের একতরফা চাপের মুখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 'রাব্বী জিদনী ইলমা' এই মহান উক্তিটি বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে ল্যাটিন হরফে বাইবেলের নানা উক্তি উদ্ধৃত থাকে। সে কারণে তাদের কেউ সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হচ্ছে, রাজনীতি ধর্মভিত্তিক হবে কি হবে না তা নিয়ে। কারণ, আমাদের সকল মূল্যবোধ, আমাদের সকল কৃষ্টি, আমাদের সকল ঐতিহ্য আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যাকে কখনই কোন দক্ষ শল্যচিকিৎসকের অস্ত্র ব্যবচ্ছেদ করতে পারবে না। এ শুধু আমাদের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। মানব সভ্যতার সকল জনগোষ্ঠী ও জাতিকতার ক্ষেত্রে এটি এক অমোঘ সত্য। তাই প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মকে জীবনাচার এবং রাষ্ট্রচার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্বাসন দেয়া কেন হয়? প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্মের ব্যবহারের স্বরূপটি আমাদের নিত্যদিনে নিত্যকর্মে কোন ধরনের? আমরা অহেতুক ধর্মকে টেনে এনে ধর্মের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার করছি কিনা সেটি হচ্ছে বড় প্রশ্ন এবং আসল প্রশ্ন। কে অস্বীকার করতে পারে যে, আমার ধর্মীয় বিশ্বাস ও চেতনা, আমার নাড়ী ও হৃদস্পন্দনের সাথে একটি নিরবচ্ছিন্ন Symbiotic (মিথোবৃত্তিক) সম্পর্ক বজায় রাখে। বাংলাদেশে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নামে কতিপয় মতিভ্রষ্ট ব্যক্তি একত্রিত হয়ে আলোচনার আর কোন বিষয়বস্তু আজ খুঁজে পাচ্ছে না। সীমান্তে যখন ভারতীয় হানাদারদের আক্রমণের ফলে আমাদের ভূখণ্ড ভারতীয় দখলদার সৈন্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় কিংবা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে যখন বাংলাদেশ বঞ্চিত হয় তখন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের এসব ব্যক্তিবর্গকে কোন উচ্চবাচ্য করতে দেখি না। শামসুর রাহমান ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বাণী প্রেরণ করেছিলেন, কবীর চৌধুরী মোনেম খাঁর কদমবুসী করে আনন্দমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন (পিএ নজিরের আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য) এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান আইয়ুব খাঁর বিএনআর-এর পরিচালকের পদটির শোভাবর্ধন করেছিলেন, সৈয়দ হাসান ইমাম ধর্মনিরপেক্ষ ভারত থেকে ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করেছিলেন, সৈয়দ শামসুল হক 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' লিখে নিজের পাপমোচন করতে গিয়েও নিজেরই অজান্তে রাজাকারকেই তাঁর গীতিনাট্যের প্রিন্সিপ্যাল হিরোতে পরিণত করেছেন–এদের মসীলিপ্ত অন্ধ বিবরের ক্লেদাক্ত কাহিনীর বয়ান করে পাঠককে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। কিন্তু এটি অত্যন্ত স্পষ্ট উঞ্ছ বৃত্তিতে এদের জুড়ি নেই। খুদকুঁড়াপুষ্ট এসব ব্যক্তিরা আজ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ইশারায় লম্পঝম্প করছে কিসের উদ্দেশ্যে তা এদেশের মানুষ সম্যক জ্ঞাত আছেন। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার কোন অধিকার ও ক্ষমতা এদেশের মানুষ কখনই ধর্মনিরপেক্ষতার মতাদর্শ বিশ্বাসীদের দেয়নি। এদেশের মানুষ চিরকাল ধর্মসহিষ্ণুতাকে তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং সকল আচার-অনুষ্ঠানে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে মর্যাদাসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। একদা যখন কমিউনিস্ট বিশ্ব পুজিবাদী বিশ্বকে থরথর করে কাঁপিয়ে তুলছিল তখনো সবক'টি কমিউনিস্ট দেশের সংবিধানেও ধর্মের পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রচারের পূর্ণ অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। একমাত্র আলবেনিয়া ছিল ব্যতিক্রম। আলাবেনিয়া সাংবিধানিকভাবে নিজেকে একটি নাস্তিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেছিল। সেখানে মসজিদগুলোকে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু আজ কোথায় সেই আলবেনিয়া? সাবেক কমিউনিস্ট বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে আলবেনিয়ায় আজ ইসলামের চর্চা সর্বাধিক। মানুষের অন্তরের যে ক্ষুধা, চাহিদা, আধ্যাত্মিকতার যে প্রণোদনা, তা পার্থিব জগতের ইতর বস্তুবাদ কখনও পূরণ করতে পারে না। অর্ধশিক্ষিত ও অপশিক্ষিত সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ভাঁড়েরা জীবনের বাস্তবতাকে এমনিভাবে অস্বীকার করতে চায়।

হ্যাঁ, এই ভাঁড়দের পিতা শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে জাতীয় পুনসর্ম্ভাবের রাজনীতি এদেশে প্রবর্তন করতে যেয়েও ক্ষমতার লিপ্সা, একনায়কতন্ত্র এবং একদলীয় ব্যবস্থার মোহ তাঁকে এমনি অন্ধ করে যে, তিনি দেশ, জাতি ও জনগণ থেকে

www.pathagar.com

এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অবধারিত ও অনিবার্য নিহত হবার ঘটনায় এদেশের কোন মানুষই ইন্নালিল্লাহ পর্যন্ত পড়েনি। লাহোরে ১৯৬৬ সালের সম্মিলিত বিরোধীদলের সভায় যে মালেক উকিল সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং ৫ ফেব্রুয়ারী বিরোধীদলীয় ওই সভায় শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমবারের মতো ৬ দফা কর্মসূচী পেশ করেছিলেন, সেই মালেক উকিল লন্ডনে বাংলাদেশীদের উদ্দেশে মুজিবের নিহত হওয়ার ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ শোকর আলহামদুলিল্লাহ। দেশ ফেরাউনের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে।

আসলে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী কোন রাজনৈতিক দল নয়। এটি লুটেরাদের ও দুর্বৃত্তদের একটি মোর্চা মাত্র। এক ধরনের সংহতি সঞ্চার করার জন্য 'লন্ডন ষড়যন্ত্রের' মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে নেতৃত্বের আসনে বসানো হয়েছে। বলা বাহুল্য 'লন্ডন ষড়যন্ত্র' ও বাংলাদেশকে ঘিরে Raw-এর যে পরিকল্পনা তার একটি চমৎকার Convergence ঘটেছে। হাসিনা প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের খড়গ নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে পদার্পণ করেছেন। এদেশের এবং দেশবাসীর কি হল না হল তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। একটি একটি করে দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত হাসিনার প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা অবদমিত হবে না। হাসিনা বুঝতে চান না যে পিতা নিজেই নিজের মৃত্যু পরোয়ানা দস্তখত করে গিয়েছিলেন তাঁকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারত না। কিন্তু ব্যক্তি মুজিব যে ব্যক্তিবাদ বাংলাদেশে প্রবর্তন করেছিলেন তা শিরকের সমতুল্য পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। 'একনেতা একদেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'– আর সকল দাম্ভিকের কঠোর শাস্তিদাতা আল কাহহারু আল্লাহ তাবারাকু ওয়া তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন 'রাত না পোহাতে সব শেষ'।

আজ মুজিব দুহিতা হাসিনা এদেশের বিচার বিভাগকে তছনছ করে লাঠি মিছিল আর রক্তচক্ষু দেখিয়ে এবং বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার অজুহাত সৃষ্টি করে তার পিতৃহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে নিম্ন আদালতে যাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে, আইনের কোন তোয়াক্কা না করে তা গায়ের জোরে কার্যকর করতে চান। এ কারণেই বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে তাঁর এত বিষোদগার। অতি সাধু এবং নিষ্পাপ ভাব নিয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা তুলে ধরে বিচার বিভাগকে এই বলে ধোলাই করেছেন যে, পুলিশ খুনীদের ধরে আনার পর আদালত তাদের জামিন দিয়ে দেয়। গত ৮ আগস্ট প্রথম আলোতে রাজধানীর খিলগাঁও-সবুজবাগ এলাকার পাঁচ খুনের আসামী ও শীর্ষ সন্ত্রাসী বদরুল আলম কীভাবে জামিন পেয়েছিল তার বিশদ বিবরণ দিয়েছে। হাসিনার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও পারিবারিকীকরণের সকল সীমা ও রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিনের সময় দলবাজ পিপিরা আদালতে উপস্থিত থাকে না এবং পুলিশ নথিতে অন্য মামলার কথা উল্লেখ করে না। এমতাবস্থায় একজন হাকিমের পক্ষে জামিন দেয়া ছাড়া আর কি কোন গত্যন্তর আছে। আসলে গোটা বিচার বিভাগটাকে ধ্বংস করার জন্য হাসিনা একদিকে দলবাজ উকিলদের বিচারক ও অপরদিকে জেলা পর্যায়ে পিপি নিয়োগ করেছে। অভিযুক্ত ক্ষমতাসীন দলের হলে কী ধরনের আচরণ হাসিনার সরকার করে থাকে তা ৮ আগস্টের প্রথম আলো পড়লেই বোঝা যায়। আবার চট্টগ্রামের এইট মার্ডার কেইস যেটি দলের ভেতরকার সশস্ত্র প্রতিহিংসার নৃশংস রূপ সেটা ধামাচাপা দেবার জন্য নিরীহ নিরপরাধীদের গ্রেফতার করে পুলিশ চার্জশীট তৈরী করাতো দূরের কথা ন্যূনতম প্রমাণও হাজির করতে ব্যর্থ হয়। তখন হাকিমের সামনে অভিযুক্তদের জামিন দেয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিচার বিভাগকে তাঁর পদানত করে দাসানুদাসে পরিণত করতে চাইছে। এটা হতে দেয়া যায় না। দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য ভারত থেকে অবাধে অস্ত্র প্রবেশ এবং ভোটার তালিকায় ভারতীয় নাগরিকদের ভুয়া বাংলাদেশী সাজিয়ে তালিকাভুক্ত করার পরিণতি শুভ হবার নয়। বিশ্বের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় দেশকে বিভক্ত করার জন্য অতীতের ঘাকে শুকোতে না দিয়ে খুঁচিয় খুঁচিয়ে স্থায়ী রক্তক্ষরণের পথ যারা বেছে নেয় তারা দেশ ও জাতির হিত কামনা করা তো দূরের কথা দেশ ও জাতির বিলুপ্তির জন্যই কাজ করে। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও চিলিতে জাতীয় পুনর্সম্ভাবের যে ইতিবাচক ও গঠনমূলক রাজনীতি ও তার সুফল আমরা লক্ষ্য করছি তা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। লাশের ব্যবসা কবির চৌধুরীরা অনেক করেছেন। উচ্চ মধ্যবিত্ত জাহানারা ইমামই একমাত্র শহীদ জননী নন। এদেশে তারামন বিবি ও কাঁকন বিবিরা শুধু স্টান্ট পাবলিসিটির খোরাক জোগায়। ভারত কবলিত আমাদের দেশীয় এই বৈরী প্রচার মাধ্যম সমাজে তাদের সম্মানজনক ঠাঁই করে দেয় না। এটি আজ আমাদের সবাইকে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। একদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার জন্য সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আস্ফালন আরেকদিকে বিচার ব্যবস্থাকে সামাজিক ভূকম্পনের মাধ্যমে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করে গায়ের জোরে মুজিব হত্যার প্রতিশোধ নেয়া একই সূত্রে গ্রোথিত। এভাবে সামাজিক সংহতি, স্থিতি ও ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সূত্র বলে প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণাভরে পরিহার করে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই প্রকৃতির শূন্যতা পূরণ হয়ে যায়। আজ আমাদের দেশে যে গ্রহণের কাল আমাদের সকল সুস্থ ও শ্রেয় চিন্তাকে এবং শ্রেষ্ঠতম অর্জনকে গ্রাস করতে বসেছে তার ফলে সৃষ্ট সীমা লঙ্ঘনকারীরা প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে পরিত্রাণ পাবে কি?

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট নেতৃবৃন্দ এবং শেখ হাসিনা ইতিহাসের প্রহসনমূলক পুনরাবৃত্তি ঘটাতে যাবেন না। দেয়ালের লিখন পাঠ করুন।

www.pathagar.com

১৯ আগস্ট ২০০০

বিপন্ন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব

মাহবুব উল্লাহ :

গত সপ্তাহের আলোচনায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ইনস্টিটিউশনগুলোর ওপর জনগণের আস্থার প্রচণ্ড চিড় ধরিয়ে রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব মুছে ফেলার এক জায়মান ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছিলাম। এ সপ্তাহে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আরেকটি দিক উন্মোচন করতে চাই। একথাগুলো বারবার নানা আঙ্গিকে ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে জনগণের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী মনে করছি। কারণ যারা ক্ষমতার রাজনীতি করেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মোটা দাগে এসব প্রসঙ্গ তুলে ধরলেও সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করতে চান না এবং সে অনুযায়ী জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করতে হয় অপারগ অথবা অনিচ্ছুক। কারণ, রাজনীতির এই কঠিন পথটি গ্রহণের মধ্যে প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে। এমনকি প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা আছে। তদুপরি, এ বিষয়গুলো নিয়ে আন্তরিকভাবে রাজনীতি চর্চার ফলে ক্ষমতার মসনদ থেকে বঞ্চিত থাকার সম্ভাবনাকেও বাড়িয়ে তোলে।

একটি সরকারের জন্য ক্ষমতা ও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার কীভাবে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তার ওপর নির্ভর করে জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা। পাকিস্তান রাষ্ট্রটির কথাই ধরুন না কেন, পাকিস্তানের জন্মলগ্নের পর পাকিস্তানী শাসকরা শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে গলাটিপে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা বলতো। তাদের এই বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল নবগঠিত রাষ্ট্রে যে কোন প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দেশ ধ্বংসের আন্দোলনরূপে চিহ্নিত করা। সদ্যজাত শিশু যেমন কঠিন কিছু সইতে পারে না, তেমনি সদ্যজাত পাকিস্তানের পক্ষেও কোন প্রকার আন্দোলন ও প্রতিবাদের চাপ সহ্য করা সম্ভব নয়। এটাই ছিলো শাসকগোষ্ঠীর বক্তব্য। অন্যদিকে যারা বিরোধী শিবিরে রাজনীতি করতেন, বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে– তারা এর প্রতিবাদে যে বক্তব্য হাজির করতেন সেটি হলো ইসলামের দোহাই তুলে, পাকিস্তানের বিপন্নতার কথা বলে, ভারতীয় ষড়যন্ত্রের অজুহাত দিয়ে শাসকগোষ্ঠী জনগণের ন্যায্য আন্দোলন দাবিয়ে রাখতে চাইছে। এক্ষেত্রে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী প্রচণ্ড মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। কারণ, তারা যে ভাষায় প্রতিবাদী আন্দোলনের সমালোচনা করতেন, তা যুক্তির দিক থেকে ছিলো অত্যন্ত দুর্বল। এর পাশাপাশি বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ তো ছিলোই। ফলে শাসকগোষ্ঠীর বক্তব্য জনগণের কাছে ক্রমান্বয়ে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে বিরোধী পক্ষের বক্তব্য জনগণকে বিশেষ করে জনগণের অগ্রণী অংশ শিক্ষিত সমাজকে শাসকগোষ্ঠীর ইসলামের প্রতি দরদকে একটি মেকী অজুহাত বলে গণ্য করতে অভ্যস্ত করে তোলে। এমনকি কিছু কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইসলাম প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ন্যায্য দাবীগুলো সম্পর্কে ভারতীয় ষড়যন্ত্র এবং বিরোধী পক্ষ কর্তৃক একে পুরোপুরি নাকচ করে কেবল মাত্র শাসকগোষ্ঠীকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হিসেবে গণ্য করায় রাজনীতিতে ভারত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কিছুটা শিকড় গাড়তে সক্ষম হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যেসব আন্দোলন সংগটিত হয়েছে, সে সব আন্দোলনের বাস্তব যৌক্তিকতা ছিলো একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু জনগনের অজান্তে এসব আন্দোলনে ভারতীয় পঞ্চম বাহিনী ঢুকে পড়েছিলো, সে সব তথ্য আজ কিছু কিছু করে হলেও জনগণের কাছে ধরা পড়ছে। ১৯৬২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের আগরতলা গমন এবং আগরতলা গমনের অভিজ্ঞতা মমিনুল হক খোকা তার 'অন্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জ্বল ঃ বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও আমি' স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। খোকা শেখ

www.pathagar.com

মুজিবুর রহমানের জ্ঞাতি ভাই এবং শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারারুদ্ধ হতেন এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হতেন তখন এই মানুষটি মুরগী যেমন তার ছাগুলোকে আকাশে বাজপাখি দেখলে ডানার নিচে আগলে রাখে ঠিক তেমনি শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের দেখাশোনা করতেন। এ জন্য প্রবল ঝুঁকি নিতেও তিনি পিছপা হতেন না।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কীভাবে প্রবাসী সরকারের সমান্তরালে একটি ভিন্ন শক্তি হিসেবে মুজিব বাহিনীকে দাঁড় করিয়েছিলো, তার চমৎকার বিবরণ মরহুম তাজউদ্দীন আহমদের ব্যক্তিগত সচিব ও অত্যন্ত আপনজন মঈদুল হাসান তাঁর 'মূল ধারা- ৭১' গ্রন্থে সবিস্তারে তথ্যপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন। RAW-এর প্রাক্তন কমৃকর্তা অশোক রায়না তার INSIDE RAW গ্রন্থে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ও দিল্লীর ইচ্ছামাফিক পরিচালনা করতে গিয়ে ১৯৪৮ সাল থেকে যা কিছু করা হয়েছে, তার বর্ণনা দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ভারত সরকার অস্বীকার করেনি। একটি প্রতিবেশী দেশের গণঅসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে শক্তিধর প্রতিবেশী রাষ্ট্র রাজনৈতিক অস্থিরতায় ইন্ধন জোগাতে পারে ও পরিশেষে নিজস্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে, বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনদিককার ঘটনাপ্রবাহ তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। এ ধরনের ঘটনা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই ঘটেনি, পৃথিবীর আরও অনেক দেশের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA-ইরানের মোসাদ্দেক সরকারকে উৎখাত করতে গিয়ে কী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছে, সে কাহিনী কিছুদিন আগে মার্কিন কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন এবং এসব কার্যকলাপকে দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এ দেশের সাধারণ নিরীহ মানুষ ছাড়াও এলিট সমাজের অনেকেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে জীবন রক্ষার জন্য ভারতে গিয়েছিলেন। সীমান্ত পাড়ি না দেয়ার বিকল্প হয়তো অনেকেরই ছিলো না, কিন্তু সেখানে ৯ মাস অবস্থানকালে এসব এলিটরা তথা শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতাকর্মী, আমলা, ব্যবসায়ী ও সামরিক কর্মকর্তা কীভাবে কতটুকু ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAWসহ অন্যান্য সংস্থার সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, সে সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করা কঠিন। কিন্তু এদের অনেকেই যে আত্মবিক্রয় করে ফেলেছিলেন, তা হীনমন্যতার জন্যই হোক কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই হোক কিংবা আদর্শগত বিভ্রান্তির জন্যই হোক– এ ব্যাপারে খুব সন্দেহ করা যায় কি? '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে প্রথম 'আত্মসমর্পণকারী রাজাকার' বলে উল্লেখ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান নিজে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি সেদিন ধরা না দিলে ওরা আমাকে খুঁজে বের করার নামে সারা বাংলাদেশকে তামা করে ফেলতো।" এটা একটা হাইপোথিটিক্যাল কথা বটে। তার পাকিস্তানীদের কাছে স্বেচ্ছায় গ্রেফতারী বরণের কারণ হিসেবে এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। আজ দীর্ঘকাল পর আমার মনে হয়, সেদিন যদি তিনি সীমান্ত পার হয়ে কলকাতায় যেতেন, তাহলে তার ভাগ্যে কী ঘটতো তা আমরা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি কি? চাকমা নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যেভাবে ভারতের আশ্রয় শিবিরে নিহত হয়েছিলেন, শেখ মুজিবের ভাগ্যে তেমনটি ঘটতো না তা জোর দিয়ে বলা যাবে কি? ভারত সরকার একাত্তরের শেষ দিকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ৭ দফা গোপন গোলামী চুক্তি সম্পাদন করেছিলো বলে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। কথা আছে মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই চুক্তিতে সই করার পর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। চুক্তির শর্তাবলী নিছক অধীনতামূলক মিত্রতা ছাড়া আর কিছু নয়, এটা মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম বুঝতে পেরেও অসহায়ত্বের কারণে রোধ করতে পারেননি। এখন ভাবুন, সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান কলিকাতায় উপস্থিত থাকলে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাকেই এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করতে হতো। আর তিনি যদি নিজ বিশ্বাসের কারণে তা করতে অস্বীকার করতেন, তাহলে তাঁকেও হয়তো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভাগ্যবরণ করতে হতো। ওই রকম বিয়োগান্ত ঘটনার পর ভারত সরকার হয়তোবা প্রচার করতো পাকিস্তানের

www.pathagar.com

আইএসআইয়ের এজেন্টরা তাঁকে হত্যা করে গেছে। আমরা যদি উপর্যুক্ত যুক্তি বিন্যাসে একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবের পাকিস্তানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রসঙ্গটি রাজনৈতিক আবেগকে দূরে ঠেলে রেখে বুঝবার চেষ্টা করি, তাহলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সেদিন তাঁর নিঃশব্দে পাকিস্তানীদের কাছে ধরা দেয়ার সিদ্ধান্তটি পলিটিকাল ক্যালকুলাসের বিচারে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ছিলো না। ভেবে দেখুন, শেখ মুজিব নিজের হাতে ৭ দফা গোপন চুক্তির মতো একটি গোপন চুক্তি অনুমোদন করার জন্য উপস্থিত থাকলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আজ কতটা থাকতো? তাই, আমার ভাবনায় বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্বের সমস্যাটি '৭১-এই সূচিত হয়েছিলো। পৃথিবীর বহুদেশেই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও আলজেরিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এসব সশস্ত্র সংগ্রাম যারা করেছেন, তাঁরা সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক ও অন্যান্য বৈষয়িক সমর্থন গ্রহণ করলেও অন্য রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি অনুমোদন করেননি। এমনকি তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটিও দেশের ভেতরেই ছিলো। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুক্তি যোদ্ধাদের পরিচালিত করা হতো ভারত থেকে এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনী মার্চ করেই পাকিস্তানী বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। এর ফলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ জয়ের গৌরব হারিয়ে ফেলে এবং ভারত অদ্যাবধি ১৬ ডিসেম্বরকে 'ইস্টার্ন কমান্ড দিবস' হিসেবে পালন করে। একটি রাষ্ট্রের উদ্ভবের ইতিহাস এবং এর সংগ্রামের নানা জটিলতা সেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বুনিয়াদ কতটুকু দৃঢ় হবে তা নির্ণয় করে। বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। আজ বাংলাদেশে যা ঘটছে তাকে ১৯৭১-এর Spill-over effet হিসেবেই দেখা যায়। আর এটাই হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের সমস্যা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পূর্ব ইউরোপের যেসব দেশ সভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনীর হিটলারের নাজিবাহিনী বিরোধী কাউন্টার অফেন্সিভের ফলে ফ্যাসিবাদমুক্ত হয় সেসব দেশে যুদ্ধ শেষ হবার পর সভিয়েত বাহিনী থেকে গেলো এবং সে দেশগুলো সভিয়েত বলয়ে ওয়ারসো জোটভুক্ত হয়ে গেলো। হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশ সভিয়েত বলয়ে অত্যন্ত সীমিত সার্বভৌমত্ব ভোগ করতো। '৫৬ সালে সভিয়েত রাশিয়ার রেড আর্মি ট্যাংক মার্চ করিয়ে ইমরে নাগির নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহ দমন করেছিলো। ১৯৬৮ সালে ডুবচেকের নেতৃত্বে বিখ্যাত Prague Spring (প্রাগের বসন্ত) গুঁড়িয়ে দিতে সভিয়েত রেড আর্মি অভিযান চালিয়েছিলো। এ সব হস্তক্ষেপ সর্বহারা একনায়কত্ব তথা সমাজতন্ত্র রক্ষার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত নস্যাৎ করার নামে করা হলেও মূলত এসব দেশের স্বাধীনতার স্পৃহাকে দমন করার জন্য করা হয়েছিলো। তাই আমরা বলতে পারি, সামরিক হস্তক্ষেপ যে পবিত্র আদর্শের দোহাই দিয়ে জায়েজ করার চেষ্টা করা হয়েছিলো, তা মূলত কয়েকটি জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকেই দমনের প্রয়াস ভিন্ন আর কিছু ছিলো না। সে কারণেই ওয়ারসো জোট ভেঙে গেছে। সোভিয়েত পরাশক্তির মৃত্যু ঘটেছে। পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক ব্যবস্থা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলো তা বহাল থাকেনি।

আজকের বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে অনেক আন্তরিকভাবে সচেতন দেশপ্রেমিক বলে ওঠেন, বাংলাদেশের মানচিত্র শেষ পর্যন্ত থাকবে কি? হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উষ্কানীর ফলে চরম সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সঙ্কট যদি বেধে যায় এবং তার অজুহাতে ভারতীয় বাহিনী সংখ্যালঘু নাগরিকদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার নামে যদি হস্তক্ষেপ করে বসে তাহলে দেশের অস্তিত্বের কী হবে? অপরদিকে বাংলাদেশ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ ভারতের অভ্যন্তরে অভিযান চালাচ্ছে, এরূপ একটি অভিযোগ দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে। আরও অভিযোগ, কট্টর মৌলবাদী গ্রুপগুলো পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা ISI-এর ইন্ধনে বাংলাদেশকে ব্যবহার করে ভারতবিরোধী নাশকতামূলক তৎপরতা চালায়। এইসব অভিযোগকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তি বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ

www.pathagar.com

নির্মূলে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশের এলাকা বিশেষের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। ভারতের একটি সুবিধা হলো এই যে, বৃহৎ রাষ্ট্র হবার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন বৃহৎ শক্তি ভারতকে তোয়াজ করে চলে। ভারত জাতিসংঘের কাঠামো বিন্যাস সাপেক্ষে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে আগ্রহী। এ প্রশ্নে ভারতের পক্ষে কোনো কোনো বৃহৎ শক্তির মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়ার উদাহরণ রয়েছে। এছাড়া UN System, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, ডাব্লিউ টি ওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভারতের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা চাকরিরত আছেন। এরা এসব সংস্থার নীতি-নির্ধারণে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন। সেটাও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজ করে। বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয় এমন ধরনের একটি ধারণাও ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা আইএফসির মাধ্যমে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতিপক্ষ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অত্যন্ত শক্তিধর। বাংলাদেশের জন্য শক্তির উৎস হলো এর দেশপ্রেমিক জনগণ। এই জনগণকে উদ্বুদ্ধ, সচেতন ও সংগঠিত করতে পারলে আনবিক বোমার চাইতেও শক্তিশালী ক্ষমতার অধিকারী হওয়া বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু জাতীয়তাবোধের এজেন্সী নিয়ে যদি কেউ মনে করেন, সংগোপনে ভারতের সঙ্গে সমঝোতা করে রাষ্ট্রঘাতী আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে ক্ষমতার মসনদে বসা যাবে তাহলে বিরাট ভুল করা হবে। ১২ অগাস্টের 'প্রথম আলো' বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়াসহ যেসব নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এই সরকারের আমলে দুর্নীতির মামলা দায়ের করা হয়েছে সে সব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হচ্ছে বলে খবর বেরিয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচনের আগেই প্রতিপক্ষকে কারাবন্দী করার পাঁয়তারা চলছে। এমন ঘটনা ঘটলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন আদৌ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয়ের কারণ আছে। আর সে রকম কিছু ঘটলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আরও নাজুক হয়ে পড়বে তা বলাই বাহুল্য। কারণ, যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হবে তাকে রোধ করার কোনো legitimate কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বহাল থাকবে না। সাংবিধানিক শূন্যতা উদ্ভবেরও আশঙ্কা আছে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নিরাপত্তা খুব নাজুক হয়ে পড়বে।

আফতাব আহমাদ :

গত ১২ অগাস্ট শেখ হাসিনার 'ঐকমত্যের' সরকারের অন্যতম মন্ত্রী এবং দৈনিক ইত্তেফাকের অন্যতম স্বত্বাধিকারী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত নির্বাচন হবে কিনা, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশে নির্বাচন হওয়া না হওয়া বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ, বর্ণাশ্রমভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় তার সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা এবং আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ করার জন্য ছোট ছোট প্রতিবেশী দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতা এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা জিইয়ে রাখাটাকে তার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। ভারতীয় শাসকচক্র আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখে আসছে, তাতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোনো সুযোগ নেই। একটি কথা মনে রাখা দরকার, ভারত কখনই আগ বেড়ে সিকিমের মত বাংলাদেশকে হয়তো গ্রাস করবে না। অথচ বাংলাদেশকে গিলে খাওয়ার পুরা ইচ্ছেটাই তার রয়েছে। কিন্তু এ কাজটি ভারতীয় শাসকবর্গ এমনভাবে সারতে চায় যে, ভারতকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হরনের অভিযোগে যাতে অভিযুক্ত করতে না পারে। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকচক্র চায়, বাংলাদেশটি পাকা বেলের মত ঝুপ করে তার কোনে পড়ে ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গীভূত হয়ে যাবে। বিষয়টি আর একটু খোলাসা করে বলি–পহেলা মার্চ ১৯৭১-এর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের কাছে 'জয়বাংলা' ধ্বনি 'জিয়ে সিন্ধু' ধ্বনির সমার্থক ছিলো– 'জয়বাংলা'র দ্বারা সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশকে বোঝাতো না। পহেলা মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যখন অনির্দিষ্টকালের জন্য ইয়াহিয়া স্থগিত ঘোষণা করলো, তখন রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষুব্ধ জনতাকে এবং রিকশাচালকদের পেডেলে চাপ দেয়ার সময় শোনা যেতো 'জয় স্বাধীন বাংলা'। এই ধ্বনি থেকেই বিষয়টি কি স্পষ্ট নয় যে, 'জয়বাংলা' ধ্বনি দ্বারা সাধারণ মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকে বোঝাতো না? পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করার পর শেখ মুজিব আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন রাশ টেনে ধরার জন্য এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে একটি আপস মীমাংসায় পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। অথর্ব পাকিস্তানীদের অবিমৃশ্যকারিতার ফলেই নিরীহ নিরস্ত্র জনাসাধারণের উপর একটি গণহত্যা চাপিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ইতিহাসের অনিবার্যতা দান করা হয়। ২৫ মার্চের সেই ভয়াল কালো রাতের গণহত্যা শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের বাঙালী মুসলমান দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি হিন্দু ভারতে প্রান বাঁচাবার জন্য আশ্রয় নিতে হবে এবং বাঙালী হিন্দুদের করুণা প্রার্থী হতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, পরবর্তী নয় মাস ধরে বাঙালী মুসলমান ও বাঙালী হিন্দু ভারতীয়দের মধ্যে শুধু একটি সখ্য গড়ে ওঠেনি, আমাদের বহু বিদূষী মহিলাকে জায়নামাজে বসে দু'হাত তুলে এমনও প্রার্থনা করতে দেখা গেছে যে, ভারতীয়রা যদি বাংলাদেশের সত্যিকার মিত্রই হবে তাহলে তারা অতি সত্তর পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে না কেন এবং পাকিস্তানী সেনা অবস্থানের ওপর বোমাবর্ষণ করছে না কেন? বলাবাহুল্য, ওই একই গোষ্ঠীর মহিলারা ১৬ ডিসেম্বরের পর চরম উত্তেজনায় এও আক্ষেপ করেছেন, ভারতীয়রা বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছে না কেন?

ভারত ঠিক এমনি একটি পরিস্থিতির অপেক্ষায় আছে। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা চায়, বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে আরও অনেক চৌধুরী জন্মাক, আরও অনেক তসলিমা নাসরিন জন্মাক এবং আরও অনেক রামেন্দু কমল কৃষ্ণ মজুমদার জন্মাক। যাতে বাংলাদেশী মুসলমান এক সময়ে আওয়াজ ওঠাবে, কী প্রয়োজন এই সীমান্তের, কী প্রয়োজন এই পৃথক অস্তিত্বের? শেষ বিশ্লেষণে আমরা তো ভারতীয়ই। বাঙালী জাতীয়তাবাদের নামে আজ যে রমরমা মহোৎসব আমরা লক্ষ্য করছি,এর প্রতীক বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, সূর্য সেন ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত– এখানে পৌত্তলিকতা ছাড়া একশ্বরবাদের সাম্য ও ন্যায়ের কোনো উপস্থিতি নেই। অথচ রোমাঞ্চকর শিহরণমূলক ও চরম উত্তেজনার এক ধরনের বটিকা গলাধঃকরণ করানো হচ্ছে। এই বাঙালী জাতীয়তাবাদ কল্পলোকে বিরাজ করে, বাস্তবে অস্তিত্বহীন।

মুজিব হত্যা ষড়যন্ত্রের সকল তথ্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়রা মুজিবকে রক্ষার কোনো চেষ্টাই করেনি। তার কারণ, মুজিবের পতনের মধ্য দিয়ে তারা বাংলাদেশে একটি বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল অবস্থা দেখতে চেয়েছিলো। ভারতীয় সূত্র মতে, জিয়াউর রহমানের হত্যার পেছনেও সক্রিয় ছিলো ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা। উদ্দেশ্য ওই একই। ১৯৯১-এর নির্বাচনে ভারতের কৃপাপুষ্ট আওয়ামী লীগই বিজয়ী হবে এবং সানন্দায় দেয়া হাসিনার সাক্ষাৎকার অনুযায়ী বিএনপি ১০টার বেশী সীট পাবে না– এই ধারণা যদি তাদের বদ্ধমূল না হতো, তাহলে যে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পেরেছিলো এবং যার মধ্য দিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলো, তা ভারতীয়রা ও তাদের এদেশীয় চর ও নিয়োগীরা কিছুতেই হতে দিতো না। পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ তাই প্রমাণ করে। নির্বাচনের পরপরই হাসিনা দলকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, বিএনপি ও তার সরকারকে একদিনের জন্যও স্বস্তি দেয়া যাবে না। স্বস্তি তারা দেয়নি এবং ১৯৯৪-এর শেষ দিক থেকে যে সহিংস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আন্দোলনের নামে এদেশ ও দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, তা বৃহত্তর রাষ্ট্রঘাতী এক পরিকল্পনার অংশ ছিলো। এই অংশের প্রধানতম লক্ষ্য ছিলো আগে ভারতের অনুগ্রহপুষ্ট আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসাতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে পৃথক পৃথক ছোট-বড় চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে এমন এক অধীনতামূলক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া,

www.pathagar.com

যেখানে তার সার্বভৌম কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে। পাশাপাশি রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহে এমনভাবে অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে, যাতে পাকাপোক্তভাবে রাষ্ট্রীয় কৌলীন্যে একটি পঞ্চম বাহিনী গড়ে ওঠে।

দেশে আইন-শৃঙ্খলা বলতে আজ কিছু নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী এমন সব উক্তি করে বেড়াচ্ছেন, যা কখনই একটি সুশৃঙ্খল স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ আইনের শাসনাধীন সমাজ সৃজন করে না। আজ রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে মারমুখী অবস্থান গ্রহণ করেছে। এটি সুস্থতার লক্ষণ নয়। একটি viable state-এর আচরণ এমন হতে পারে না। পুলিশ বাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন অংশকে দলীয়করণের যে অভিযোগ জনসমাজ থেকে উত্থাপিত হচ্ছে, তারও স্বচ্ছ কোনো সদুত্তর সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। কালো টাকার দৌরাত্ম্যে বনেদী সমাজপতিরা বিপন্ন ও বিব্রত। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রের বল প্রয়াগকারী ক্ষমতাকে বর্ধিত করার নামে, সামরিক শক্তিকে আধুনিকায়নের নামে সামরিক খাতে যেসব কেনাকাটা চলছে, তাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আত্মসাতেরও অভিযোগ উঠেছে। ভারতকে নানাবিধ সুবিধা দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যার ম্যান্ডেট এই সরকারের ছিল না। গঙ্গার পানি বন্টনের প্রশ্নে তিরিশ বছর মেয়াদী চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র উপপ্লব নিরসনের নামে সম্পাদিত 'শান্তি চুক্তি', মুহুরীর চরের এক বিরাট অংশকে ভারতের ভূখণ্ড বলে স্বীকার করে নেয়া ইত্যাদি জাতীয় স্বার্থবিরোধী সব কাজই বলতে গেলে এক ধরনের নির্বিঘ্নেই হয়ে গেছে। বিরোধী দলসমূহকে বিরোধিতা করতে হবে, তাই বিরোধী মতের উচ্চারণই শুধু শোনা যায়, কিন্তু দেশদ্রোহী সরকারের রাষ্ট্রঘাতী নীতিকে প্রতিহত করার কোন যথার্থ পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত গৃহীত হতে দেখা যায়নি। অন্যদিকে ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্টের নামে বাংলাদেশের বুক চিরে ভারতকে মিলিটারি করিডর দেয়ার সব আয়োজন সুসম্পন্ন করে আনা হয়েছে, এখন বাকি আছে তেল, গ্যাস এবং পাওয়ার গ্রীডের প্রশ্নে ভারতীয়দের পরিকল্পনা মাফিক সমঝোতায় উপনীত হওয়া।

বাংলাদেশের দিকে এখন তাকালে একটি Failed state বা collapsed state-এর সকল প্রলক্ষণ দৃষ্টিগ্রাহ্য। অথচ আমরা সকলে হাত-পা গুটিয়ে একটি পাতানো খেলার মত প্রতিযোগিতায় ক্রীড়ামোদীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি।

দেশের প্রচলিত আইনকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে বিচার বিভাগের স্বকীয়তাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য হরণের বাকশালী আয়োজন প্রায় সুসম্পন্ন– বিচারকদের উদ্দেশে অশ্রাব্য ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে লাঠি মিছিলও রাজধানী প্রদক্ষিণ করেছে।

আমরা এতোদিন দাবী করে এসেছি যে, আমরা পরম সৌভাগ্যবান– বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের মত একজন নির্মোহ, সৎ ও বিবেকবান ব্যক্তি আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি অলঙ্কৃত করে আছেন। কিন্তু তার বহু আচরণ আজ আমাদের রুঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি এনে অনেক প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তুলেছে। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পর সুয়োমোটো কেইস করার সাহস প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলেও সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর একাংশের বিরুদ্ধে আনীত রীট মামলায় বিচারপতি সাহাবুদ্দীন যে রায় দিয়েছিলেন, সেই রায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, রাষ্ট্রের মৌল কাঠামো সংশোধনীর দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না। বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, তাই এখানে এমন কোন উপাদান আমদানী করা যাবে না, যা তার এই এককেন্দ্রিক চরিত্র বিনষ্ট করতে পারে। কিন্তু আমরা দেখলাম, দেশের এককেন্দ্রিক চরিত্রকে বিনষ্টকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক চুক্তিটি তিনি অবলীলাক্রমে অনুমোদন করেছেন। প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে ১৯৯২ সালে তিনি স্থানীয় সরকার দ্রুত গঠনের নির্দেশনা দিয়ে যে রায় দিয়েছিলেন, সেই রায়ের মর্যাদাহানি করে সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী জেলা পরিষদ আইন তিনি

www.pathagar.com

অনায়াসে অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছেন। গনতন্ত্রের চর্চা ও পরমতসহিষ্ণুতার কথা বারংবার জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও জাতি যখন তাঁর কাছে জননিরাপত্তা আইনে স্বাক্ষর না দেয়ার আবেদন জানাল তখন তিনি তাতে সর্বাংশে সাড়া দিতে পারেননি।

আজ যখন বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে নির্বাহী বিভাগ এবং তার প্রধান কর্তা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বারংবার প্রকাশ্যে আক্রমণ চালাচ্ছেন, তখন কোন এক অজানা অব্যক্ত রহস্যজনক কারণে জাতির বিবেক বলে যাকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি, সেই রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পরম সংযমের সঙ্গে মৌনব্রত পালন করছেন। এর হেতু কী? যিনি এতো স্পষ্টবাদী এবং খোলামেলাভাবে দেশের বহু সমস্যার মর্মমূল উদঘাটন করে দেশ ও জাতিকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার বহু চেষ্টা করেছেন, তাঁর নৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন– আজ কী কারণে তিনি হঠাৎ নির্বাক ও নীরব? তাহলে কি সত্যিই দেশে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত নির্বাচন হচ্ছে না? আলামত বহু প্রকারের। নেতিবাচকসহ বেশী। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চে যে রীটটির শুনানি চলছে, এই রীটটি ক্ষমতাসীন দলের একটি মহল দ্বারা অনুপ্রাণিত। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেই যে, সুপ্রীম কোর্টের কষ্টিপাথরে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী টিকেও যাবে, তাহলেও আগামীতে একটি যথার্থ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নিরুপদ্রুপ নির্বাচনের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। এ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন CPD'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান এবং অর্থনীতি সমিতির বিদায়ী সভাপতি অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিরাজ করছে এবং দলসমূহের মধ্যকার অসহিষ্ণুতা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যেতে বাধ্য, যেখানে রাষ্ট্রপতিকেই প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার নিতে হতে পারে। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যে অজিয়ান স্টেবল বা অজিয়ান আস্তাবল সাফ করতে হবে– তার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন, সেই সময়ের দাবী এমনভাবে মুখ্য হয়ে উঠবে, যার ফলে জরুরী বিধানাবলীর নামে কিংবা অ্যাক্ট অব প্রভিডেন্সের নামে নির্বাচনকে বেশকিছু কালের জন্য পিছিয়ে দিতে হতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুরুব্বী যারা, বিশেষ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, সউদী আরব, নেদারল্যান্ড এবং নরওয়েসহ বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এসব দেশের সঙ্গে ও দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে আঞ্চলিক রাজনীতির প্রশ্নে ভারতের কী সমীকরণ নির্ণীত হবে, তাই বলে দেবে, ভারত এ বিষয়ে কোন ধরনের রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করবে। আমার ধারণা, ভারত এই সুযোগটিকে দীর্ঘায়িত হতে দেবে না এবং বিরুদ্ধ শিবিরে লালিত-পালিত তার পোষ্যদের, চরদের ও নিয়োগীদের চমৎকার একটি গণআন্দোলনে শরীক করিয়ে আরো দুর্বলতর বাংলাদেশের বিকাশকে নিশ্চিত করবে। এই ফাঁদ থেকে আমাদের বেরুবার পথ একটিই– ক্ষমতায় যাবার জন্য ভারত তোষণনীতি বিসর্জন দিয়ে জনগণের সচেতনতাকে আরও সমৃদ্ধ করে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুসমন্বিত কর্মসূচী প্রণয়ন। যে কর্মসূচী যুগপৎভাবে আস্তাবল সাফ করবে এবং মানুষের সৃজনী ক্ষমতার ওপর আস্থা স্থাপনে উৎসাহ ও প্রণোদনা দেবে।

মাহবুব উল্লাহ :

অতীব পরিতাপের বিষয়, ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর এবং পরবর্তীকালে একাত্তরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত এই ৫৩ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কি পাকিস্তানে অথবা বাংলাদেশে কখনোই শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতন্ত্রের প্রথা প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একটি শক্তির হাত থেকে অন্য শক্তির হাতে যায়নি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে জীবনের শেষ দু'টি বছর খুব কষ্ট পেয়েছেন। আজ বিভিন্নজনের স্মৃতিকথা থেকে যা জানা যাচ্ছে, তাহল মরণব্যাধিতে আক্রান্ত

www.pathagar.com

জিন্নাহ সাহেবের সেবা পরিচর্যা যথাযথভাবে হয়নি। লিয়াকত আলী সাহেব আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর হত্যা রহস্য উদঘাটিত হয়নি। এছাড়া '৫৮'র সামরিক আইন, '৬৯-এর সামরিক আইন, একাত্তরের ঘটনাপ্রবাহ, পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, '৮১-তে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যা, '৯০-তে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের পতন, '৯৬-তে বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর- এর সবগুলোর মধ্যেই সংবিধান বহির্ভূত উপাদান ছিল। সুতরাং একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এদেশে নিয়মতান্ত্রিক Succession of power-এর ঐতিহ্য আমরা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছি। অতীতে এই কলামে আমরা বিষয়টির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমাদের এই আশঙ্কা আরও দৃঢ় করলেন যোগাযোগমন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু কত বড় জনপ্রিয় নেতা, এটা বিবেচ্য বিষয় নয়, তবে তিনি মরহুম মানিক মিয়ার পুত্র এবং সেই সুবাদে তিনি রাজনৈতিক মহলে এখনো গুরুত্ব পান। জনাব মঞ্জু আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। তার এই রেকর্ড তাকে একাডেমিক মর্যাদাও দিয়েছে। গত ১৩ আগস্ট 'দি ডেইলি স্টার' পত্রিকার প্রধান শিরোনামে জনাব মঞ্জুর একটি বক্তব্য বেরিয়েছে। এছাড়া ইংরেজী দৈনিক 'দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট'ও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে মঞ্জুর এই বক্তব্য প্রকাশ করেছে। তবে ডেইলি স্টার যেভাবে তার বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়েছে, অন্য কোন দৈনিক এতোটা গুরুত্ব দেয়নি। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাথে এক সাক্ষাৎকারে জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, "I have doubts about holding of the national election as we are yet to ensure that polls would be held in the country after every five years. There was always such apprehension in the past and it still persists because, we have failed to establish constitutional politics in the last 50 years."

জনাব মঞ্জু "বিরোধী দলের পার্লামেন্ট বর্জন, প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের চেষ্টা, দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের গোপন হত্যাকাণ্ডের কথা" উল্লেখ করে সোমবার বাসস'র নিকট দেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সংবাদটি ১৫ আগস্ট দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়। জনাব মঞ্জু যে সব কারণ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে বিরোধী দলের পার্লামেন্ট বয়কট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের চেষ্টা পুরনো কথা। তবে অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ হচ্ছে, 'দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের গোপন হত্যাকাণ্ডের' কথা। আল্লাহ রক্ষা করুন, এরকম ঘটনা ঘটলে বাংলাদেশের অস্তিত্বের ভিত্তি কেঁপে উঠবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের প্রাণনাশের কথাটি নিছক ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়। ঘটতে পারে এমন বিষয়। সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী যখন এ ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করেন তখন এ বক্তব্যকে নিছক একাডেমিক বক্তব্য বলে হালকাভাবে গ্রহন করা যায় না। কারা এসব হত্যাকাণ্ডের পাঁয়তারা করছে, তা উদঘাটিত হওয়া উচিত। দেশবাসীর বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়ার অধিকার আছে। বাংলাদেশে আমরা যদি সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে Succession of power নিশ্চিত করতে না পারি, তাহলে এই রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। Succession of power-এর জন্য প্রয়োজন জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন। এ ধরনের একটি নির্বাচন নিশ্চিত করার দায়িত্ব সকল মহলের। সরকার যে পথে এগুচ্ছে, তাতে এরকম একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কিনা, তাতে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

www.pathagar.com

২৬ আগস্ট ২০০০

বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের অপেক্ষায়

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের ইতিহাস এখন রাজনীতির অন্যতম প্রধান উপজীব্য। এদেশের রাজনৈতিক সংঘাত ও বিতর্কের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ইতিহাস, তাও আবার সমকালীন ইতিহাস। ইতিহাস নিয়ে রাজনীতির যে কূটতর্ক বা কুতর্ক চলছে; তাকে কেউ কেউ আমাদের রাজনীতির অতীতমুখী চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অতীত নিয়ে রাজনীতিকদের নিরর্থক আচ্ছন্নতা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনার সুযোগ ও প্রয়াসকে সীমিত করে দিচ্ছে। ইতিহাসের এই বিতর্কের একটি সর্বাধিক উচ্চারিত প্রতিপাদ্য হল 'ইতিহাসের বিকৃতি'। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বিকৃতি ক'বছর আগের ঘটনাবলীর বিবরণের বিকৃতি? বড়জোর ২৫/৩০ বছর আগেকার ঘটনা নিয়ে আমাদের রাজনীতির অঙ্গন টালমাটাল হয়ে উঠেছে। চায়ের পেয়ালায় ঝড় উঠছে। পত্রিকার কলামে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের কষাঘাত হানা হচ্ছে। নামীদামী ব্যক্তিরা অশোভন খিস্তি খেউড়ে মেতে উঠছেন। ফলে কেউ বা হচ্ছেন বিরক্ত, আবার কেউ বা হচ্ছেন বিভ্রান্ত। নীট ফল শূন্য। তবু ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তাকে কখনই অস্বীকার করা যাবে না। কারণ, বর্তমানকে বুঝতে হলে ও ভবিষ্যতের চলার পথ নির্দিষ্ট করতে হলে অতীতকে জানতেই হবে। ইতিহাসবিদরা ইতিহাসকে কালানুক্রমিকভাবে শ্রেণীকরণ করেছেন। যেমন- প্রাচীনকালের ইতিহাস, মধ্যযুগের ইতিহাস ও আধুনিক যুগের ইতিহাস। সর্বকালের ইতিহাস রচনাতেই বিভ্রান্তি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা রয়েছে। চূড়ান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা একেবারেই অসমম্ভব। আধুনিককালের ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত অধ্যায় হল, সমসাময়িক কালের ইতিহাস। বাংলাদেশে আমরা সমসাময়িক কালের ইতিহাসের ঘূর্ণিপাকে হাবুডুবু খাচ্ছি। সমসাময়িককালের ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে প্রতিটি ব্যক্তি নিজের লালিত বিশ্বাস, মতাদর্শ, সংকীর্ণতা, প্রীতি, অসূয়া ও বিদ্বেষের অশুভ প্রভাবে প্রভাবিত। রজনী পাম দত্ত Problems of Contemporary History নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি লন্ডনের লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট পাবলিশিং হাউস ১৯৬৩ সালে প্রকাশ করেছে। ১৯৬২ সালের এপ্রিল ও মে মাসে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট অব হিস্টরি ডিগ্রী প্রদানের সময়ে তিনি যেসব লেকচার দিয়েছিলেন, তারই সংকলিত রূপ হল এই বইটি (আমাদের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এ পর্যন্ত ৮টি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছেন, এর জন্য অবশ্য কষ্ট করে তাঁকে কোন একাডেমিক লেকচার দিতে হয়নি। কারণ, তিনি এখন ভ্রাম্যমাণ বিদ্রাকল্পদ্রুম হয়ে পড়েছেন)। রজনী পাম দত্ত তার Problems of Contemporary History গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন ঃ "Contemporary history is a dangerous subject to handle. It is full of explosive material. Much essential information will not be known until many years later, as documents are released and memories published. Passions and partisanship can obscure objective judgement. Anyone who attempts to write contemporary history in any more durable form than a current journalistic article is laying his head on the block for the executioner."

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব সমসাময়িক কালের ইতিহাসেরই বিষয়। তাই পণ্ডিত প্রবর রজনী পাম দত্ত সমসাময়িক কালের ইতিহাস রচনার যে সমস্যা চিহ্নিত করেছেন, তা

www.pathagar.com

বাংলাদেশের উদ্ভব ও এতদসংশ্লিষ্ট নানা প্রশ্ন ইতিহাসের এই সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবকে কেন্দ্র করে ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে আমরা নানা প্রশ্নের অবতারণা করতে পারি। প্রশ্নগুলো আবার দু'রকমের। প্রথমত রয়েছে ঘটনাপ্রবাহ সংক্রান্ত প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত রয়েছে এর Historiography সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন। ঘটনাবলী নিয়ে যদ্দুর সম্ভব নির্ভুলতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য বহু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এসব তথ্যের মধ্যে দলিল-দস্তাবেজ, দৈনিক সংবাদপত্র, সমসাময়িক ঘটনার ওপর বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা ও প্রতিবেদন যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান, তেমনি নেপথ্যের ঘটনা জানার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শ্রুতিকথা, রাষ্ট্রীয় গোপন দলিল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রশ্নে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংরক্ষিত রেকর্ডপত্র সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর রেস্তরাঁয় চায়ের টেবিলের উত্তেজিত বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা কিংবা গভীর রাতে ছাত্রাবাসের প্রকোষ্ঠে বসে সমমনা কয়েকজনের বিশ্লেষণধর্মী আলাপ-আলোচনা, গ্রাম্য কবির গঞ্জে-হাটে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির পর বিক্রয়কৃত কবিতার বই, গোয়েন্দা সংস্থার গোপন দলিল, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিবরণ– কোন কিছুকেই এই ইতিহাস রচনার উপাদান থেকে বাদ দেয়া যাবে না। যত ব্যাপক ও গভীরভাবে এসব উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, ইতিহাস ততই বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এসব উপাদানের সঙ্গে যোগ করতে হবে প্রাসঙ্গিক পত্রালাপ ও গোপন দূতের মাধ্যমে মতের আদান-প্রদানের মত অজানা বিষয়গুলোও। সত্যিকারের ঘটনাভিত্তিক ইতিহাস রচনা করতে গেলে শুধু তথ্যের স্তূপ সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন এসবের প্রামাণ্যকরণের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও। শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে মার্চের দিনগুলোতে যে সংলাপ হয়েছিল এবং এর পাশাপাশি উভয়ের পরামর্শদাতারা যেভাবে তাঁদের সংলাপে সহায়তা করেছিলেন, তার কোন প্রামাণ্য ট্রান্সক্রিপ্ট আমরা পেয়েছি কি? না পেলে আমরা কী করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখব? শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির বাড়ীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রায় দু'ডজন রাষ্ট্রদূত তার সঙ্গে একান্ত আলাপে সেই মার্চের দিনগুলোতে মিলিত হয়েছিলেন। কী আলাপ হয়েছিল, তা জানানোর জন্য তিনি আজ বেঁচে নেই। কিন্তু সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো আছে। তাদের আর্কাইভগুলোও আছে। সেসব রাষ্ট্র থেকে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলোর প্রেরিত প্রতিবেদনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর কতটুকুই বা আমরা জানি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি তার ক্লাসিফাইড ডকুমেন্টগুলোকে উন্মুক্ত করা শুরু করেছে। ১৯৭৩ পর্যন্ত এসব দলিলের বেশকিছু অংশ এখন ছাপার হরফেও পাওয়া যাচ্ছে। এসব দলিলের প্রকাশনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনাকে অনেকখানি এগিয়ে নেবে। ভারত সরকারের কাছে অনেক প্রাসঙ্গিক দলিল-দস্তাবেজ ও তথ্যসামগ্রী রয়েছে। ভারত সরকার সেসব দলিল-দস্তাবেজ উন্মুক্ত করে না দিলে প্রকৃত ইতিহাসের ৯ ভাগের ৮ ভাগই হিমশৈলের মত লুক্কায়িত থেকে যাবে। ইতিহাস রচনার এই শ্রমনিষ্ঠ ও প্রচণ্ড অধ্যবসায়ী কাজ না করে ইতিহাসের নামে সস্তা পাবলিসিটি ও প্রোপাগাণ্ডা আমাদের রাজনীতিকে বিষায়িত করে দিচ্ছে, জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করছে এবং নব প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করছে। তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ফায়দা লোটা ছাড়া এর আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই। যারা এই স্থূল, অপরিণামদর্শী ও উদ্দেশ্যমূলক তর্ক-বিতর্কের ঝড় সৃষ্টি করছেন, তাদের কোন মহৎ লক্ষ্য নেই। উদ্দেশ্য একটাই– দেশী-বিদেশী কায়েমী স্বার্থের গোপন অভিলাষ চরিতার্থ করা। এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে কোনক্রমেই উৎসাহিত করা যায় না এবং যাঁরা উৎসাহিত করছেন, তাঁদের সম্পর্কে জাতিকে সাবধান হতে হবে।

সম্প্রতি লন্ডনের এক আদালত ডেভিড আরভিং নামে একজন সংশোধনবাদী ইতিহাসবিদের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেছে। আদালতের এই মামলাটির প্রতিপাদ্য কী ছিল? ডেভিড আরভিং প্রকাশনী সংস্থা পেঙ্গুইন বুকস ও মার্কিন পণ্ডিত ডেবোরা লিপস্টাড-এর বিরুদ্ধে এই মামলায় তাঁদের একটি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরোধিতা করেছিলেন। এই

www.pathagar.com

গ্রন্থে ডেভিড আরভিংকে হলোকস্টের অস্বীকৃতি জ্ঞাপক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ডেভিড আরভিং সন্দেহ উত্থাপন করেছিলেন– নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদী নিধনযজ্ঞ পরিচালিত হয়নি। লন্ডন হাইকোর্ট রায় দিয়েছে, ডেবোরা লিপস্টাড তার গ্রন্থে যুক্তিসঙ্গত কথাই লিখেছেন এবং ডেভিড আরভিংকে মামলার খরচ বাবদ ৯ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ডেভিডের ভুল ছিল, তিনি ইতিহাসকে বিজয়ীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার সম্পর্কে যে অপবাদ রটেছিল, তাও ছিল যথার্থ। ইতিহাসের বিরুদ্ধাচরণের অনেক ঘটনা আছে। টোকিওর লেখক রাজনীতিবিদ গভর্নর সিন্তারো ইশিহারা ১৯৯০ সালে এক বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন। তিনি দাবী করেছিলেন, চৈনিক ঐতিহাসিকরা পানজিংয়ে জাপানী সৈন্যদের হাতে চীনা নাগরিকদের হত্যাকাণ্ডের যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তা সর্বৈব মিথ্যা। ইতিহাস অবশ্যই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তাড়িত হয় এবং যখন আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত ইতিহাসকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করার চেষ্টা করি, তখন আমরা ইতিহাসের স্ববিরোধিতার মুখোমুখি হই। তারপরও যে মারাত্মক সমস্যায় আমরা পড়ি, তাহল– ইতিহাস বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিজয়ীদের দ্বারা রচিত। পরাজিতদের কাহিনী ও দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসে স্থান পায় না বললেই চলে। যে কারণে টিপু সুলতান, সিরাজউদ্দৌলা কিংবা তিতুমীরের সঠিক ইতিহাস আজও অজানা রয়ে গেছে। ব্রিটিশ শাসকরা ইতিহাসের এসব পরাজিত অথচ মহান নায়কদের যে কাহিনী রচনা করেছে, তাকে ভিত্তি করেই এতকাল এদের সম্পর্কে ইতিহাসের গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এই ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে Colonial দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত। সাম্প্রতিককালে নতুন করে এদের সম্পর্কে ইতিহাস বিনির্মাণের চেষ্টা চলছে। কাজেই ইতিহাসের কাজটা একদিক থেকে deconstruction-এর আবার অন্যদিকে reconstruction-এর। বার্টোমালমো ডি রায়কাসাস নামে জনৈক স্পেনীয় ধর্মযাজক ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সমুদ্র যাত্রার বিবরণ তার ডায়রী থেকে লিখতে গিয়ে লিখেছেন, এই নাবিক দাস ব্যবসার সূত্রে ঈশ্বরের দোহাই পেড়েছেন। এতে লেখা হয়েছে– কলম্বাস বলছেন, Let us in the name of Holy Trinity go on sending all the slaves that can be sold." আর এভাবে কলম্বাসের মত একজন জঘন্য দাস ব্যবসায়ী, যিনি আরাওয়াক রেড ইন্ডিয়ানদের নির্মূল করেছেন, তাকে নতুন বিশ্ব তথা আমেরিকার আবিষ্কারক হিসেবে 'মহান'রূপে ইতিহাসে স্থান দেয়া হয়েছে। একবার ভেবে দেখুন, আরাওয়াক রেড ইন্ডিযানদের মধ্যে কেউ যদি আজও বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাকে আরাওয়াক রেড ইন্ডিয়ানদের সেই বংশধর কী নামে আখ্যায়িত করতেন? বস্তুত পক্ষে, আজ বিশ্বজুড়ে যে ইতিহাস প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, সে ইতিহাস ইউরোপকেন্দ্রিক, তাতে অন্যজাতির কৃতিত্ব অনুপস্থিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক গৌতম ভদ্র 'ইমান ও নিশান– বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায়' গ্রন্থে লিখছেন, "বাংলাদেশের ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহের যে অল্প কয়েকজন নেতা অবহেলিত নন, তাঁদের মধ্যে তিতুমীর একজন। স্কুল পাঠ্য ইতিহাসের বইতে তাঁর জায়গা আছে, তাঁকে ঘিরে লেখা হয়েছে নাটক, উপন্যাস। তবে, একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখতে পাব যে, তিতুমীর সম্পর্কে জানি আমরা সবচেয়ে কম। সরকারী নথিপত্র আর সমসাময়িক কাগজের বাইরে দুষ্প্রাপ্য ফার্সি পাণ্ডুলিপি আর রহস্যাবৃত একটি গাঁথা কাব্য ছাড়া তিতুমীরের পক্ষজাত তথ্য বিশেষ কিছু বলে এখন পর্যন্ত জানা যায় না। অথচ উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে গত বছর পর্যন্ত তিতুমীর সম্পর্কে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা, মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা কৃষক বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে নানা আলোচনায় তাঁর ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহ বারবার উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে। ফলে একই তথ্য নানাভাবে পরিবেশিত হয়েছে, বোনা হয়েছে নানা রঙের তিতুমীর: মুজাহিদ তিতুমীর, শহীদ তিতুমীর বা কৃষকরাজ স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর তিতুমীর।' প্রশ্ন হল, এই বিচিত্র তিতুমীরের

www.pathagar.com

মধ্যে কোন্ তিতুমীর সত্য? কিংবা তিতুমীরের সকল চিত্রই সত্য? কিংবা Colonial ইতিহাস তিতুমীরকে যেভাবে চিত্রিত করেছে,তাই কি সত্য? ইতিহাসে তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে সর্বপ্রথম রচিত যে দলিল পাওয়া যায়, সে দলিলে তিতুমীরের নাম নেই। এই দলিলটিকে তিতুমীরের বিদ্রোহের ইতিহাস রচনায় বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। এর রচয়িতা ইছামতি নদীর তীরে বসবাসরত এক ভয়ার্ত নীলকুঠি কর্মচারী। কলকাতার সদর দপ্তরে তিনি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন- "আমি এক মুহূর্ত দেরী না করে আপনাকে জানাচ্ছি যে, এই অঞ্চল এক ভয়ঙ্কর টালমাটাল অবস্থায় আছে। কারণ, ৫০০ মুসলমানের একটা দল নিজেদের নতুন সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে, মৌলভী নাম নিয়েছে এবং সব রকমের লুটতরাজ ও জুলুমবাজি করছে। জনগণকে তাদের পূজাবিধিতে দীক্ষিত করার অছিলায় তারা দিনের বেলায় গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে, কিন্তু ইতোমধ্যে তারা সবকিছু লুট করেছে আর বেশ কিছু খুন করেছে। তলোয়ার, ঢাল, বর্শা, তীর ধনুক ও লাঠিতে তারা সকলে সজ্জিত। সবকিছু ঘটনা জানিয়ে আমি বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি লিখেছি এবং তাঁকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি; নতুবা ফলাফল গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে" (সূত্র ঃ গৌতম ভদ্র)। তিতুমীর সম্পর্কে নীলকুঠি কর্মচারীর এই চিঠি তিতুমীরকে লুটতরাজকারী ও জুলুমবাজ হিসেবে চিত্রিত করেছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব 'দৃষ্টান্ত' হিসেবে ও একটি 'শিক্ষণীয় কাহিনী' হিসেবে তিতুমীরের কাহিনীকে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি তিতুমীরের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ইংরেজ শাসকদের চক্ষু উন্মিলন ঘটাতে বলতে চেয়েছেন, ইংরেজ শাসনাধীনে মুসলিম রায়তরা কত বিক্ষুব্ধ। অর্থাৎ, ইংরেজ শাসন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তিতুমীরের বিদ্রোহের ঘটনা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। বিহারী লাল সরকার নামে ইংরেজ রাজভক্ত তিতুমীরের জীবনীকার ১৮৯৭ সালে লিখেছেন, 'হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক, শিখ হোক, পারসিক হোক, তিতুর ন্যায় যদি কখনও কাহারও দুর্বুদ্ধি হয়, ভ্রান্তি হয়, তিতুর দৃষ্টান্তে নিশ্চিতই তাহার চৈতন্য হইবে....তাহাদের চৈতন্য উদ্রিক্ত করার জন্য তিতুর জীবনী প্রকাশিত হইল।' তিনি আরও লিখেছেন, 'তিতুর জীবনী কেবল মুসলমানের নহে, কি হিন্দু, খ্রিষ্টান, শিখ, পারসিক- সকল জাতির পাঠ্য। পাঠ্য কেন, শিক্ষণীয় বলিয়া তিতুর জীবনে উদভ্রান্তির ভ্রান্তি কাটে, অশান্তের শান্তি আসে, উন্মাদের প্রলাপ ছোটে, মূঢ়ের মোহ টোটে।' লেখকের উদ্দেশ্য হল এ কথা প্রমাণ করা যে, ধার্মিক হওয়া যথেষ্ট নয়, সেই ধর্মকে রাজভক্তির সঙ্গে মেলালে তা যথার্থ পথগামী হয়। লোকসমাজে তিতুমীরকে কোন দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে? সাজন গাজীর পুঁথিতে বলা হচ্ছে ঃ

"হদরপুর ঘর তার নাম তিতুমীর।
মক্কা-মদীনায় গিয়ে হইল হাজির।।
...নামাজ-রোজা শেখাত রাখতে বলত দাড়ি।
দীনের তরিক শিকায়ে ফের বাড়ী বাড়ী।।
পাপ বোনা বদকাম তাও করে মানা।
বাংলায় জারি করে আরবের কারখানা।।"

আবার আরেকটা গানে জানা যায় ঃ

'নারিকেল বেড়ে গাঁয়েতে
একজন ছিল তিতুমীর,
সরা শরীয়ত তিনি করিলেন জাহির।
পীর-পয়গম্বর কুতুব-অলি
কিছুই তিনি মানিতেন না।'

গৌতম ভদ্র'র মতে. "এই ছত্র কয়টিতে লৌকিক মানসে তিতুমীরের প্রচারের সব লক্ষণই ধরা পড়েছে। মক্কা থেকে ফিরে এসে বাড়ী বাড়ী ঘুরে দ্বীনের প্রচার করা. মুসলিম

www.pathagar.com

আচার-অনুষ্ঠানের ওপর জোর দেয়া, সাধু জীবন-যাপন করা আর পীর-কুতুব-অলি ইত্যাদি নানা মুসলিম গুরু আর সন্তদের বাতিল করার মধ্য দিয়ে তৌহিদের তত্ত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠিতও করেছিলেন। আর এসবের পেছনে হায়দরপুর বা বারাসত ছাপিয়ে আছে মক্কা আর মদীনার কথা। বলা হয়েছে যে, বাংলায় ঘোষিত হয়েছে আরবের কথা। অর্থাৎ তার আঞ্চলিক সত্তাকে ছাপিয়ে বাংলার গ্রামাঞ্চল বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। মক্কা-মদীনা আর আরবের জগত কৃষকের চৈতন্যে বিবৃত হয়েছে। এই জগতের ভৌগোলিক অস্তিত্বের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তার আদর্শগত অস্তিত্ব। আরবের কারখানায় ইসলামের বিশুদ্ধতাই মূল কথা। এই অস্তিত্বের অবস্থিতি মানচিত্রে নয় বরং মুরীদের ধর্মাশ্রয়ী চৈতন্যে।"

নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা তিতুমীরের অনুসারীদের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। তিতুমীরের অনুসারীরা বেশীরভাগই ছিলেন জাতিতে জোলা আর কৃষক। এদের অনেকেরই উপাধি কারিগর। এদের মধ্যে অনেকে তাঁত বুনত আর নগণ্য রায়ত ছিল। মুসলমান সমাজের অন্তঃসংযোগের মধ্যে তিতুর প্রচার কার্যকর হয়েছিল। তিতুর অনুসারীদের মধ্যে অবস্থাসম্পন্ন মানী লোকের সংখ্যা নেহায়েতই হাতেগোনা যায়। তারাও আবার থানা বা আদালতের নগণ্য কর্মচারী বা ছোটখাটো আইনজীবী। কলভিন সাহেব স্পষ্ট বলেছেন, যাদের কিছু হারাবার আছে (None with anything to lose) তারা এই ব্যাপারে যোগ দিয়ে বিনষ্ট হবার কোন ঝুঁকি নেয়নি। সোজা কথায় দরিদ্র সর্বহারারাই তিতুমীরের অনুসারী ছিল। সাজন গাজীর পুঁথিতে তিতুমীরের লোকদের 'দেড়ে' বলা হত। তিতুর মিত্র ও শত্রু সবাই দাড়িকে নিশানা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। নারকেল বাড়িয়ার জমিদারের চক্ষুশূল ছিল দাড়ি রাখা। দাড়ি ছিল নিপীড়িত ও তৌহিদের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসীদের ক্ষমতা ও শক্তির প্রতীক। এই প্রতীকই একদিন হয়ে দাঁড়ায় তিতুর জং বা লড়াইয়ের rallying symbol. তিতুকে নিয়ে যেসব বক্তব্যের অবতারণা করা হল, তা থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তিতু পরস্পরবিরোধী বহু পরিচয়ে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন। এর কোন্‌টি সঠিক ইতিহাস, আর কোন্‌টি ইতিহাসের বিকৃতি, তা নির্ভর করে যারা ইতিহাসের রচয়িতা, তাদের দৃভিভঙ্গির ওপর। তৎসত্ত্বেও বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যুক্তির কষ্টিপাথরে একটি মাত্র দৃষ্টিভঙ্গিই সঠিক ইতিহাসের কাছাকাছি বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন সমাপ্ত প্রায়, মিত্রপক্ষের বিজয় যখন অনিবার্য, জাপানের আত্মসমর্পণ যখন দিন বা ঘন্টার প্রশ্নমাত্র, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে লাখ লাখ নিরীহ মানুষের জীবনে যে প্রলয় নেমে আসবে, সে সম্পর্কে ট্রুম্যান ছিলেন নিরুদ্বিগ্ন। একদা তিনি বলেছিলেন যে, দু'টি জাপানী শহরে বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর একরাতের জন্যও তার নিদ্রা বিঘ্নিত হয়নি। কী ভয়ানক কথা! এরকম একজন শক্তিশালী, নিজ সিদ্ধান্তে অনড় এবং কঠোরতম সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে হিরোশিমা ও নাগাসাকিবাসীদের মূল্যায়ন কী হবে? ঠিক তেমনি যে শেখ মুজিব বাংলাদেশের আত্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কারাবরণ করেছেন, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, যেদিন সিরাজ সিকদার বন্দীদশায় তারই আজ্ঞাবহ কর্মকর্তাদের হাতে খুন হয়েছিলেন, সেদিন তিনিও কি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের মত নিরুদ্বিগ্নচিত্তে ঘুমুতে পেরেছিলেন? ট্রুম্যানের মত ঘুমের ব্যাপারে তার কোন স্বীকারোক্তি নেই, তবে সংসদের পবিত্র মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে হুংকার দিয়েছিলেন 'কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?' সুতরাং ইতিহাসের বিকৃতি নিয়ে আজ যত কূটতর্ক, সে তর্ক বুঝতে হলে জানতে হবে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসব লেখা হচ্ছে? কোন্ মতলবে লেখা হচ্ছে? আমার কথা হল, সব ঘটনা অন্ধকার থেকে আলোকে আসুক। চলতি সময়ের সব আবেগ উত্তেজনা থিতু হোক, তখনই কেবলমাত্র গবেষকরা নিরাসক্ত মন নিয়ে ইতিহাস রচনা করলে সেই ইতিহাস জাতির প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। ক্ষমতার মসনদ থেকে ইতিহাসের নামে

www.pathagar.com

কল্পকাহিনী রচনা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস থেকে সকল মহলের বিরত থাকা উচিত। অন্যথায়, তা হবে জাতিকে বহুধাবিভক্ত করার এক গর্হিত অপচেষ্টা।

বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার কল্যাণে একশ্রেণীর লেখক ও কলামিস্টের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা একশ্রেণীর পাঠককে তোষণ করতে গিয়ে যে ধরনের প্রচারধর্মী কলাম লেখেন, তাকেই ইতিহাস বলে জ্ঞান করেন। আমাদের ভেবে আরও দুঃখ লাগে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যেসব শিক্ষক ইতিহাস পড়িয়ে থাকেন, তাঁদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ এই কলাম রচনার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন। দুর্ভাগ্য আমাদের এবং দুর্ভাগ্য ইতিহাসের যে, সমসাময়িক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে পত্রিকার সম্পাদক, প্রতিবেদক বা কলাম রচয়িতারা যাই করুন না কেন, তা প্রকৃত ইতিহাস রচনায় সহায়তার চাইতে বিভ্রান্তিই বেশী সৃষ্টি করে। তবে জনতুষ্টিতাবাদী যেসব লেখা এ ধরনের সময়ে লেখা হয়ে থাকে, তা সাধারণত ক্ষমতাধরকে তুষ্ট করার জন্য এবং ক্ষমতাধরদের শীর্ষ নেতার স্তব ও স্তুতির জন্য করা হয়ে থাকে। একে ইতিহাস বলে চালিয়ে দেয়া এক চরম পাপ।

আফতাব আহমাদ :

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ২১ বছর আগ পর্যন্ত এদেশে 'ইতিহাসের বিকৃতি'ই কেবল ঘটানো হয়েছে বলে আওয়ামী লীগ, তার সমর্থক গোষ্ঠী ও আওয়ামী ঘরানার যত তাত্ত্বিক আছেন, সকলে সমস্বরে দাবী করছেন। ইতিহাসের কোন্ বিষয়টি বিকৃত করা হয়েছে, তা কিন্তু এসব লোকজন কখনোই উল্লেখ করেন না। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ মাত্র ২৯ বছর হল। বলা হয়ে তাকে,কোন দেশের, কোন জনগোষ্ঠীর, কোন জাতির নির্মোহ, নৈর্ব্যাক্তক ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহের কাজটি ঘটনা ঘটে যাবার কমপক্ষে ৫০ বছর পর শুরু হয়। কারণ, এর আগে এই কাজটি করতে গেলে পক্ষপাতিত্বের ও মহলবিশেষের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবার সমূহ সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই উত্তাপ, উত্তেজনা রহিত অবস্থায় এবং ঘটনার নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বিরহিত হলেই একজন ইতিহাসবিদের পক্ষে সম্ভব হয় ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ উদঘাটন করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকল উপাদান সংগ্রহ করা। আর এর জন্য সময়ের প্রয়োজন। এ সময় যত দীর্ঘ হবে, ইতিহাস রচয়িতার পক্ষে দায়িত্ব সম্পাদন করা তত সাবলীল হবে। হুড়োহুড়ি করে, হুজুগের মাতমে তাল মিলিয়ে যা কিছু লেখা হয়, তা আর যাই হোক, ইতিহাস নয়।

বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার কল্যাণে একশ্রেণীর লেখক ও কলামিস্টের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা একশ্রেণীর পাঠককে তোষণ করতে গিয়ে যে ধরনের প্রচারধর্মী কলাম লেখেন, তাকেই ইতিহাস বলে জ্ঞান করেন। আমাদের ভেবে আরও দুঃখ লাগে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যেসব শিক্ষকরা ইতিহাস পড়িয়ে থাকেন, তাঁদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ এই কলাম রচনার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেকে শ্রেষ্ট ইতিহাসবিদ হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন। দুর্ভাগ্য আমাদের এবং দুর্ভাগ্য ইতিহাসের যে, সমসাময়িক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পত্রিকার সম্পাদক, প্রতিবেদক বা কলাম রচয়িতা যাই করুন না কেন, তা প্রকৃত ইতিহাস রচনায় সহায়তার চাইতে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করতে পারে। তবে জনতুষ্টিবাদী যেসব লেখা এ ধরনের সময়ে লেখা হয়ে থাকে, তা সাধারণত ক্ষমতাধরকে তুষ্ট করার জন্য এবং ক্ষমতাধরদের শীর্ষ নেতার স্তব ও স্তুতির জন্য করা হয়ে থাকে। একে ইতিহাস বলে চালিয়ে দেয়া এক চরম পাপ। এ ধরনের ইতিহাসের সমর্থনে নেপোলিয়নের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে, "History is writen by sabres" অর্থাৎ ইতিহাস রচিত হয় তরবারি দ্বারা। এখনকার যুগ নেপোলিয়নের যুগ নয়। এখন তরবারি বা তার প্রতীক হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতার চাপের বাইরেও রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অধিপতি গোষ্ঠীর

www.pathagar.com

ছড়ানো-ছিটানো খুদকুঁড়ো অবাধে কুড়িয়ে অনেকেই এক ধরনের গালগল্প লিখে ইতিহাস বলে চালিয়ে দিচ্ছে। একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গেই আলোচনা করা যাক। জিয়াউর রহমানের বেতার ঘোষণা এদেশের মানুষকে কীভাবে উদ্দীপিত ও সঞ্জীবিত করেছিল, তা '৭১-এর অগ্নিঝরা দিনগুলোতে যারা বাংলাদেশের মুক্তিপাগল মানুষের শ্রেষ্ঠতম অর্জনগুলো বিনির্মাণে দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেছেন, কেবলমাত্র তারাই জানেন। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। আমরা এক শ্রেণীর দলবাজ ও স্তাবকদের লক্ষ্য করি, মুজিবের মুখোমুখি জিয়াকে দাড় করিয়ে দিয়ে অনেকে বলার চেষ্টা করেন যে, মুজিব স্বাধীনতা চাননি বা বলতে গেলে, স্বাধীনতার জন্য জনতাকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর বিশাল অবদানকে খাটো বা অস্বীকার করে কেবলমাত্র জিয়াউর রহমানের বেতার ঘোষণাকেই ইতিহাসের মুখ্য ঘটনা হিসেবে তুলে ধরেন। জিয়াউর রহমান নিজে কিন্তু এ ধরনের দাবী কখনোই করেননি। যদিও তার ভূমিকার কারণেই হতাশায় নিমজ্জিত বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত ও হাল ছেড়ে দেয়া জাতি সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল এবং পাকিস্তানী সৈনিকদের হামলাকে বীরত্বের সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছিল। অপরদিকে, মুজিবের স্তাবকেরা হাজার রকমের কাঠখড় পুড়িয়ে একথাটিই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন যে, ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ দিবাগত রাত অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। তাও আবার ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সে ঘোষণা তিনি চট্টগ্রামে প্রেরণ করেছেন। রাজনীতিতে তাঁর দলের এতো বিশ্বস্ত শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ থাকা সত্ত্বেও মুজিবকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামে বার্তা পাঠাতে হয় কেন? মুজিবের সহধর্মিনী ফজিলতুন নেসা দৈনিক বাংলাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে– যা ১৯৭২-এর ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়, সেখানে কোথাও শেখ মুজিবের এ ধরনের ওয়্যারলেস বার্তা পাঠাবার বা স্বাধীনতা ঘোষণা করার কথা তিনি উল্লেখ করেননি। স্বয়ং শেখ মুজিবকে একটি বিষয়ে সাধুবাদ দিতেই হয়। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত যে গণপরিষদ বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেছে, সেই সংবিধানের প্রস্তাবনায় কোথাও শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার একক কৃতীত্বতো দাবী করেনইনি, কোথাও তিনি যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, তাও উল্লেখ করেননি, বরং তার নেতৃত্বাধীন গণপরিষদ যে সংবিধান প্রণয়ন করে, তার প্রস্তাবনায় বলা হয়, "আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ....।" বস্তুনিষ্ঠার জন্য এ ব্যাপারে শেখ মুজিবকে অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হয়। কেননা, এটিই হচ্ছে ইতিহাসের বাস্তব তথ্য। এই ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের জনগণের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করা ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না। অথচ, ড. মোহাম্মদ হান্নান নামক জনৈক আমলাসহ আওয়ামী ঘরানার বহু প্রোপাগ্রান্ডিস্ট নানা যুক্তিহীনভাবে এ বিষয়টি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী সেনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার আগ মুহূর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এলান করে গিয়েছিলেন। এইসব মুঢ় মূর্খদের রচিত তথাকথিত ইতিহাস পাঠ করা অজ্ঞানতার ও অপজ্ঞানের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার সমতুল্য।

সম্প্রতি প্রখ্যাত মার্কিন গবেষক ও জীবনীকার প্রফেসর স্ট্যানলি উলপার্টকে বাংলাদেশে ঘটা করে দাওয়াত দিয়ে আনা হয়েছিল। তিনি ধানমন্ডির ৬৭৭ নম্বর বাড়ীর দেয়াল সংলগ্ন মুজিবের বাসস্থানেও গমন করেছেন। সেখানেও তিনি অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। আমাদের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীও ঘোষণা করেছেন যে, প্রফেসর স্ট্যানলি উলপার্ট শেখ মুজিবের জীবনী রচনা করবেন। স্ট্যানলি উলপার্টও সাংবাদিকদের কাছে এ বিষয়ে হ্যাঁ সূচক মন্তব্য করেছেন। উল্লেখ্য, উলপার্ট বর্তমানে মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীর জীবনী রচনায় ব্যস্ত, তাঁর বয়স ৭৩ বছর। গান্ধীর জীবনী রচনা শেষ করার পর উলপার্ট মুজিবের জীবনী রচনায় হাত দেবেন এবং যদি পরম স্রষ্টার কৃপায় তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেন, তাহলে তিনি মুজিবের জীবনী রচনা সমাপ্ত করে যেতে পারবেন। উল্লেখ্য, প্রফেসর স্ট্যানলি

www.pathagar.com

উপলপার্টের রচিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ- 'Nine Hours of Rama' এবং নেহরুর জীবনীটি ভারতে নিষিদ্ধ ও বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। উলপার্ট বাল গঙ্গাধর তিলক এবং গোখলের ওপরে যে দু'টি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন, সেদু'টি অবশ্য ভারতে বেআইনী কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। গান্ধীর জীবনীর ভাগ্যে কী আছে, এখনো আমরা জানি না। স্ট্যানলি উপলপার্ট পাকিস্তানের স্থপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ওপরে Jinnah of Pakistan নামে একটি অসাধারণ জীবনীগ্রন্থ রচনা করার পর জুলফিকার আলী ভুট্টোর জীবনী নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম হচ্ছে Zulfi Bhutto of Pakistan : His life and times. এই গ্রন্থের ১৭৩ থেকে ১৭৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শেখ মুজিবকে পাকিস্তানী অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভুট্টো এবং শেখ মুজিবের মধ্যে যে আলাপচারিতার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা যে কোন পাঠককে চমকে দেবে। এ পর্যন্ত এই আলাপচারিতার বিরোধিতা করে আওয়ামী তরফ থেকে কিংবা শেখ হাসিনার তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ তো দূরের কথা, উচ্চবাচ্য পর্যন্ত হয়নি। উপরন্তু, হাসিনার সরকার প্রফেসর স্ট্যানলি উপলপার্টকে দাওয়াত দিয়ে এনে রাজকীয়ভাবে আপ্যায়ন করে ঘটা করে সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করেছে যে, প্রফেসর উলপার্ট হাসিনার পিতার জীবনী লিখতে সম্মত হয়েছেন।

এবার Zulfi Bhutto of Pakistan গ্রন্থে মুজিব-ভুট্টোর আলাপচারিতার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার স্বার্থেই এটি খুব জরুরী : "Then Zulfi told him (Mujib) of the transfer of power in Pindi. 'I am happy', Mujib responded. 'Believe me, I am happy. Tell me what is the condition of Bengal? I am very perturbed. 'Bhutto explained that India's army 'occupying' Dacca, had moved in with Soviet guns and trucks under the cover of Soviet warships and planes. 'That means they have killed us', Mujib cried. 'Bhutto, they have killed us............ you'd better get me to Dacca....... [y]ou have to promise one thing to me that I will be having your help, if the Indians put me in Jail, you will have to fight for me.' 'We will fight together, Mujib'. Zulfi Promised." "জুলফি তাঁকে [মুজিবকে] পিন্ডিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাটি জানালেন। 'আমি খুশি', মুজিব প্রত্যুত্তরে বললেন, 'বিশ্বাস করুন, আমি খুশী। বাংলার অবস্থা কী, আমাকে বলুন, আমি খুবই বিচলিত।' ভুট্টো ব্যাখ্যা করে বললেন; 'ঢাকা ভারতীয় সেনাদল কর্তৃক 'অধিকৃত' এবং ভারতীয় সেনাদল সভিয়েত যুদ্ধজাহাজ ও বিমানের ছত্রছায়ায় সভিয়েট কামান ও ট্রাক নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢাকায় ঢুকে পড়েছে।' 'তার অর্থ- তারা আমাদের হত্যা করেছে।' মুজিব চিৎকার করে বললেন- 'ভুট্টো, তারা আমাদের হত্যা করেছে......... আপনি আমাকে ঢাকায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন.... আপনি ওয়াদা করুন যে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, ভারতীয়রা যদি আমাকে জেলে ঢোকায়, আমার জন্য আপনাকে লড়তে হবে। 'আমরা একসঙ্গে লড়বো, মুজিব' ভুট্টো প্রতিশ্রুতি দিলেন।")

"...... No. no. Mujib replied, ... I have to settle matters there .... the occupation army is there, that I am sure. Awami League cannot move them, that I am sure. The world will understand...... I want your help .... Believe me, I never wanted the Indians. You don't believe me?" I believe you, Bhutto said."

("...... না, না, মুজিব উত্তরে বললেন, 'আমাকে সেখানকার অবস্থা ঠিকঠাক করতে হবে। দখলদার [ভারতীয়] সেনাবাহিনী সেখানে আছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগ তাদের তাড়াতে পারবে না, এ বিষয়েও আমি নিশ্চিত– দুনিয়া ব্যাপারটা বুঝবে........ আমি আপনার সাহায্য চাই ...... বিশ্বাস করুন, আমি কখনোই ভারতীয়দের চাইনি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না?' 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি; ভুট্টো বললেন।")

"...... On the 27th [December, 1971] you said that we can have two or three things together, 'Zulfi reminded Mujib as soon as they were alone again, defence, foreign affairs and currency .... 'Before that, you have to allow me to go; Mujib replied nervously. 'But I don't mind, confederation [however] loose it is, Zulfi insisted, pressing him for some minimal commitment, 'No, no, ... I have already told you that we can wait ..... Some sort of arrangements we can make. I told you, it will be confederation. This is absolutely between you and me. I know that you have not told anybody?'No, why should I tell', muttered Bhulto. I'll keep it absolutely confidential' 'You leave it to me; Mujib insisted, 'absolutely leave it to me trust me'. I trust you', Zulfi told him, They 'trusted' each other."

("... . 'সাতাশে [ডিসেম্বর ১৯৭১] আপনি বলেছিলেন যে, আমরা দু'টি বা তিনটি বিষয় একসঙ্গে রাখতে পারি', জুলফি মুজিবকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, যখন তাঁরা আবার একান্তে বসলেন, 'প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা .... 'কিন্তু তার আগে আমাকে ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আপনাকে দিতে হবে'– বিচলিতভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন মুজিব। 'কিন্তু যতো শিথিলই হোক না কেন, কনফেডারেশণ হলেও আমি আপত্তি করবো না', জুলফি সনির্বন্ধভাবে বললেন। ন্যূনতম অঙ্গীকার আদায়ের জন্য তিনি [জুলফি] তাঁর [মুজিবের] ওপর [এভাবেই] চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন। 'না, না .... আমি ইতোমধ্যেই আপনাকে বলেছি যে, আমরা অপেক্ষা করতে পারি।....... কোনো এক ধরনের একটা ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো। আমি তো আপনাকে বলেছি, এটা কনফেডারেশন হবে। কিন্তু বিষয়টি [মনে রাখবেন] সম্পূর্ণ আপনার আর আমার মধ্যে। আমি জানি, আপনি এ বিষয়ে কাউকে বলেননি।' 'না, কেন আমি বলতে যাবো।' বিড়বিড় করে বললেন ভুট্টো, 'আমি এটি সম্পূর্ণ গোপন করেই রাখবো'। এটি আমার ওপর ছেড়ে দিন।' মুজিব জোর দিয়ে বললেন, 'সম্পূর্ণভাবে আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমাকে বিশ্বাস করুন।' 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি', জুলফি তাঁকে [মুজিবকে] বললেন। তাঁরা একে-অপরকে 'বিশ্বাস' করলেন")

"..... 'I told you, there is no objection', Mujib replied. My idea was that we will live together and we will rule this country .... 'But we have to put the things right', Zulfi reminded him, we have to try' Mujib conceded, But you know the roule. I have to go I have to cope .... [y] ou know the occupation army is there .... [o] ur army .... massacred .... as in Indonesia .... Another point is there, I tell you frankly .... the West Bengalees I have to take them out form Bengal and crush .... My difficulties 'yes' understand you it is very difficult; Zulfi agreed."

("....... 'আমি আপনাকে বলেছি, এতে আমার কোন আপত্তি নেই। মুজিব উত্তরে বললেন, 'আমার ধারণা ছিলো আমরা একসঙ্গে বসবাস করবো এবং একসঙ্গে আমরা এই দেশ শাসন করবো ....।' 'কিন্তু এখন আমাদের এসব ঠিকঠাক করে নিতে হবে', জুলফি তাঁকে (মুজিবকে) স্মরণ করিয়ে দিলেন' আমাদের চেষ্টা করতে হবে, মুজিব স্বীকার করলেন।' কিন্তু এ পথটাও আপনার জানা আছে। আমাকে আগে যেতে হবে, আমাকে

www.pathagar.com

সামাল দিতে হবে ...... আপনি জানেন, সেখানে (ভারতীয়) দখলদার সেনাবাহিনী আছে ..... আমাদের সেনাবাহিনী ..... নির্বিচারে হত্যার শিকার হয়েছে ..... যেমনটি ইন্দোনেশিয়ায় ....। আরেকটি বিষয় রয়েছে, আমি খোলামেলাভাবেই বলছি .... পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের .... বাংলাদেশ থেকে আমাকে তাড়াতে হবে এবং ধ্বংস করতে হবে .... আমার অসুবিধাগুলো আপনি বুঝতে পারছেন ......। 'হ্যাঁ, খুবই কঠিন ব্যাপার।' জুলফি একমত হলেন। (স্ট্যানলি উলপার্টের Zulfi Bhutto of Pakistan গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৭৪ -১৭৫ দ্রষ্টব্য)।

গত ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ একটি অভিনব বক্তব্য রেখেছে। তারা বলছে, তাদের নেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা যারা দায়ের করেছে, তারা দেশটিকে পাকিস্তান বানাতে চায়। প্রথমত হাসিনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা এটিই প্রথম নয়, এর আগের মামলায় সুপ্রীম কোর্ট হাসিনাকে তিরস্কার করে সতর্ক করে দিয়েছিলো এবং হাসিনার আচরণকে "Wrong headed"-এর আচরণ বা মনোবৈকল্যের আচরণ বলে অভিহিত করা হয়েছিল। বর্তমানে হাসিনা ও তার সমর্থকরা হাসিনার পক্ষ সমর্থনের নামে বলার চেষ্টা করে যে, তিনি যা কিছু বলেছেন, তা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে না, আদালতের সমালোচনার পর্যায় পড়ে। এ বক্তব্যও এসেছে যে, মামলা দায়েরের পরে সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যরিস্টার মইনুল হোসেনের নেতৃত্বে আইনজীবীরা একটি আপস-রফায় পৌছতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হাসিনার "Wrong headed" স্বভাব অর্থাৎ একগুঁয়েমি ও মনোবৈকল্যের কারণে তা সম্ভব হয়নি। এখন হাসিনা সমর্থকরা অভিনব ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছে যে, পাকিস্তানের সমর্থকরা হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এই ধুয়া তুলে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' দোহাই পেড়ে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চলছে।

এ দেশের মানুষ নিরক্ষর হতে পারে, অশিক্ষিত নয়। তাদের রাষ্ট্রক্ষমতার দাপটে আটটি ডক্টরেট ডিগ্রী কেনা না থাকাতে পারে, কিন্তু সাধারণ জ্ঞানটুকু আছে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে যে দেশের আজাদী অর্জিত হয়েছে, সে দেশ যেমন ভারতের গোলামী করবে না, তেমনি পাকিস্তানেরও করবে না। তবে, পাঠকগণকে শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান অর্জনের আন্দোলনে একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মীই শুধু ছিলেন না (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবের প্রদত্ত জবানবন্দী পাঠ করলে তাঁর চেয়ে বড় পাকিস্তানী আর কাউকে মনে হয় না), স্ট্যানলি উলপার্টের Zulfi Bhutto of Pakistan গ্রন্থটির প্রাসঙ্গিক যে অংশ আমি উদ্ধৃত করেছি, তা থেকে কি এটি স্পষ্ট নয় যে, মুজিব মুক্তিযুদ্ধের বিষয় সম্পর্কে তেমন কোনো কিছুই জানতেন না এবং ভুট্টোর কাছে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন? শুধু তাই নয়, এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল একটিই– Union of Pakistan or Confederation of Pakistan or Federal Republic of Pakistan যে নামেই হোক, অখণ্ড পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখা। আর এর হোতা ছিলেন হাসিনার পিতা স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান। অতএব, এসব অভিযোগ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আওয়ামী গোষ্ঠীর শোভা পায় না। বিবিসি'র প্রবীণ সাংবাদিক সিরাজুর রহমানের কাছ থেকে শোনা ঘটনা– লন্ডনে মুজিবকে যখন সাংবাদিকরা 'ইউর এক্সিলেন্সি' সম্বোধন করছিলেন, তখন মুজিব বিস্ময় প্রকাশ করলে সিরাজুর রহমানসহ অন্যান্য ঘনিষ্ঠজনরা তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানকে কূটনৈতিক শিষ্টাচারে 'ইউর এক্সিলেন্সি' বলেই সম্বোধন করা হয়। প্রত্যুত্তরে মুজিব নাকি বলেছিলেন, 'অ্যা...... আমরা না অটোনমি চাইছিলাম......।'

www.pathagar.com

আমরা আজও জানি না, মিয়ানওয়ালীতে মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার যে মামলা ইয়াহিয়া রুজু করেছিলেন, সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থন করে মুজিব কী জবানবন্দী দিয়েছিলেন। আমরা এও জানি না, ওই একই মামলায় ড. কামাল হোসেন একজন অভিযুক্ত ছিলেন কিনা, কিংবা মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে কামাল হোসেনের অবস্থান ও ভূমিকা কী ছিল। কারণ এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে তিনি মার্কিন কনসুলেট থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস এমআর আখতার মুকুলের চরমপত্রে ড. কামাল হোসেনকে 'রাজাকার কামাইল্যা' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। তার এবং মুজিবের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ওই ৯ মাসে সম্পর্ক কী ছিল, তা আমরা আজও জানি না। কিন্তু মুজিব স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে কামাল হোসেনকেই আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান করেছিলেন। মুজিবের কৌসুলী আল্লাবকস ব্রোহীর মাধ্যমে মুজিব মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা ও মুজিবনগরের খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের উপদলীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, এখন তা Declassified American Papers প্রকাশিত হওয়ার পর অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে গেছে। অতএব, মুক্তিযুদ্ধ চলাকলীন সময়ে খন্দকার মোশতাক বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানের সঙ্গে আপস করতে চেয়েছিলেন– এই তথ্যটি ধোপে টেকে না। মোশতাকের ওপর মুজিবের আস্থা ও বিশ্বাস এত প্রগাঢ় ছিল যে, বাকশালী একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির অন্যতম শক্তিধর সদস্য ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। তাজউদ্দীন আহমদ ওই কমিটি তো দূরের কথা, বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটিতেও ঠাঁই পাননি। এ অংক কে মেলাবে? আজ শুধু কি বললেই হবে যে, বাইরের ষড়যন্ত্রের কারণে মুজিব নিহত হয়েছিলেন? দলের ভেতরকার কলহ, অন্তর্দ্বন্দ, চক্রান্ত এবং ব্যক্তি ভাবমূর্তির সংঘাত, শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বাধীন উপদলীয় কোন্দল ইত্যাদি নতুন আলোকে, নতুনভাবে বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করে শেখ মুজিবুর রহমানের যে Pathetic পরিণত হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে।

ইতিহাস রচনা করা চাট্টিখানি কথা নয়। আর Historiography সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা যার নেই, তিনি Deconstruction বা Reconstruction কোনো কিছুতেই হাত দিয়ে ইতিহাসের আলোচিত, অনালোকিত ও অনুদঘাটিত অধ্যায় বোঝা তো দূরের কথা, সে সম্পর্কে তার মন্তব্যও করা উচিত নয়। আমরা সময়ের অপেক্ষায় আছি। ইতিহাস নিজেই সত্য ও বাস্তবতার উচ্চারণ যথাসময়ে করবে।

www.pathagar.com

২ সেপ্টেম্বর ২০০০

আওয়ামী ফ্যাসিবাদের স্বরূপ

মাহবুব উল্লাহ :

আমাদের মত দেশে যখন স্বেচ্ছাচার, স্বৈরাচার অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখনই আমরা হিটলার মুসোলিনীর দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি। এডলফ হিটলারের কথাটাই বিবেচনা করা যাক। অবাক ব্যাপার হলো, ক্ষমতায় আসার এক বছর কি দু'বছর আগেও হিটলার জার্মান নাগরিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন জার্মান–অস্ট্রিয়ান। যুদ্ধের সময় তিনি খুবই নিম্ন পদমর্যাদা থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জার্মান প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের দায়ে তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি সদয় হন এবং তাঁকে মুক্তি দেন। এরপর তিনি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন। যে নাজী জার্মানীর কথা আমরা বলে থাকি, সেই নাজী শব্দটি এসেছে National এর NA (না) ও Sozialist এর ZI (জী) থেকে। যদিও দলের নামের সঙ্গে Socialist শব্দটি যুক্ত ছিল তৎসত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। সাধারণভাবে জনগণ হিটলারকে সমাজতন্ত্রের মহাশত্রু হিসেবে বিবেচনা করত। হিটলারের প্রতীক ছিল সোয়াস্তিকা। সোয়াস্তিকা শব্দটি সংস্কৃত এবং প্রাচীনকাল থেকে আর্যরা একে মঙ্গলের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। হিটলারের নাজী পার্টি একটি লড়াকু বাহিনী হিসেবে ঝটিকা বাহিনী সংগঠিত করেছিল। এই বাহিনীর সদস্যরা বাদামী রঙের পোশাক পরত। কাজেই, নাজীদের অনেক সময় ব্রাউন শার্টস বলা হতো। অপরদিকে ইতালীয় ফ্যাসিস্টদের বলা হতো 'ব্ল্যাক শার্টস।' নাজীদের কোনো স্পষ্ট ও ইতিবাচক কর্মসূচী ছিল না। নাজীরা উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করত এবং দাবী করত, জার্মান জাতি ও জার্মান রাষ্ট্রই হচ্ছে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। নানা ধরনের নেতিবাচক কর্মসূচী নিয়ে নাজীরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল। ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে জার্মান জাতি যেভাবে অপমানিত হয়েছিল, তার অপনোদন ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছিল নাজীরা। এর ফলে বিপুলসংখ্যক জার্মান নাজী পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়। মার্কসবাদ, কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর তথা ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধিতা করা ছিল নাজীদের অন্যতম উদ্দেশ্য। নাজীরা ছিল ইহুদী বিরোধী কারণ, তারা ইহুদীদের ভিনদেশী জাতি হিসেবে বিবেচনা করত এবং ইহুদীদের কারণে জার্মান জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে তারা প্রচার করত। নাজীরা পুঁজিবাদের এক ধরনের অস্পষ্ট বিরোধিতাকারী ছিল। মুনাফাখোর ও ধনীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে তারা সরলপ্রাণ সাধারণ মানুষের সমর্থন অর্জনের প্রয়াস পায়। তাদের দর্শনে সমাজতান্ত্রিক কোনো উপাদান যদি বিদ্যমান থেকে থাকে, তা ছিল অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ চালু করা।

এডলফ হিটলারের নেতৃত্বে হিটলারের এইসব পরস্পরবিরোধী ও জনতুষ্টিবাদী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী কর্মসূচীর পেছনে ছিল হিংসা ও বল প্রয়োগের দর্শনের বিকট প্রভাব। বল প্রয়োগকে শুধু উৎসাহিত এবং প্রশংসাই করা হতো না, এটাকে একজন মানুষের সর্বোচ্চ নৈতিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হতো। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক অসওয়াল্ড স্প্যাংগলার এই দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ হলো একটি শিকারী পশু, যা সাহসী, চতুর এবং নিষ্ঠুর। আদর্শবাদ কাপুরুষতারই নামান্তর। একটি শিকারী পশু চলমান জীবনের সর্বোচ্চ রূপ। মানুষ হবে সিংহের মতো। সিংহ কখনই তার গুহায় তার সমকক্ষ কাউকে সহ্য করে না। মানুষ কখনো গবাদিপশুর মতো নিরীহ হবে না। গবাদিপশু পাল বেঁধে চলে এবং এদের যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে তাড়িয়ে নেয়া যায়। কিন্তু সিংহরূপী মানুষের জন্য সর্বোচ্চ পেশা ও আনন্দের উৎস হলো যুদ্ধ। অসওয়ালড স্প্যাংগল্যারের বই পড়লে বোঝা যায়, তিনি কত বড় পণ্ডিত ছিলেন। অথচ এই বিশাল পাণ্ডিত্যকে ভর করে তিনি

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত মারাত্মক ও ঘৃণ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। অসওয়াল্ড স্প্যাংগ্লারকে জানলে এডলফ হিটলারের মন-মানসিকতা অনেকখানি বোঝা যায়। হিটলার ছিলেন একজন শক্তিশালী বক্তা। হাজার হাজার শ্রোতার আবেগকে ধারণ করে হিটলার জার্মানীর সকল দুঃখ-দুর্দশার জন্য মার্কসবাদী ও ইহুদীদের দায়ী করতেন। ফরাসী কিংবা অন্য কোনো বিদেশী শক্তির হাতে জার্মানীর অবমাননার প্রতিটি ঘটনা নাজী পার্টিতে উত্তরোত্তর অধিকতর হারে জার্মানদের সমবেত হতে উৎসাহিত করত। অর্থনৈতিক সংকট যতই তীব্র হতো ততই লোকজন নাজীদের সঙ্গে যোগ দিত।

বাংলাদেশে শাসক দল আওয়ামী লীগকে হিটলারের নাজী পার্টির সঙ্গে প্রায়শই রাজনৈতিক সভা-সেমিনারে তুলনা করা হয়। এরকম তুলনা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? আওয়ামী লীগ কি উগ্র জাতীয়তাবাদের দর্শনে বিশ্বাস করে? আওয়ামী লীগ কি বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করে? আওয়ামী লীগ কি পশুরাজ সিংহের মর্যাদা ও অসহিষ্ণুতায় মানুষকে অভ্যস্ত করতে চায়? আওয়ামী লীগ কি সহনশীলতাকে কাপুরুষতা ও দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে বিচার করে? বিদেশী শক্তির হাতে বাংলাদেশের যখন স্বার্থহানি ঘটে, জাতি হিসেবে বাংলাদেশ যখন অপমানিত হয়, তখন আওয়ামী লীগ কি বৈদেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সমবেত করার প্রচেষ্টা চালায়? একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে এ ধরনের বহু প্রশ্ন উত্থাপন করা সম্ভব, যার নিরিখে আওয়ামী লীগের মধ্যে কতটা হিটলারী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বা অনুপস্থিত তা মূল্যায়ন করা সম্ভব।

আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছিল মুসলিম লীগের স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা করে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এই দলের গোড়াপত্তন ঘটিয়েছিলেন। জন্মলগ্নে আওয়ামী লীগের দর্শন ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সত্তার ওপর মুসলিম লীগের একচেটিয়া মৌরসী পাট্টা দাবীর যৌক্তিকতা ভ্রান্ত-এই প্রপঞ্চটি প্রমাণ করা। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র কর্তৃক বঞ্চিত অঞ্চলগুলোর বঞ্চনার ক্ষোভকে তীব্র করে তোলা। তৃতীয়ত, সাধারণ গরীব ও মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলা অথচ এর বিজ্ঞানসম্মত অর্জনের পথ নির্ধারণ করতে অস্পষ্টতায় ভোগা। এক পর্যায়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার অংশীদার হয়। সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হয়েই বলতে শুরু করলেন, "স্বায়ত্তশাসনের দাবী একটি রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। পূর্ব বাংলা শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছে।" মওলানা ভাসানী-এর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি আলাদাভাবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। এই দল গঠন করতে গিয়ে তিনি ও তাঁর সমর্থক সহযোগীরা আওয়ামী লীগের ঝটিকা বাহিনীর হাতে অপদস্ত হয়েছেন। এই পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গেই থেকে যাওয়া শ্রেয় মনে করলেন। কিছুকাল পরেই ১৯৫৮ সনের অক্টোবরে সামরিক শাসন জারি হলো। আইয়ুব খান পাকিস্তানের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বামপন্থীরা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হন। মওলানা ভাসানী কারারুদ্ধ হলেন। শেখ মুজিবও এক পর্যায়ে গ্রেফতার হলেন। সবশেষে '৬২ সনে সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিজেই গ্রেফতার হলেন। সামরিক শাসন প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন হলো। সোহরাওয়ার্দী মুক্তির পর তিনি বেশ কিছু দিন আইয়ুব প্রদত্ত শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়নের জন্য আন্দোলন করলেন। কিন্তু সেই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য তিনি বেঁচে থাকেননি। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আইয়ুবী শাসনের আওতায় রাজনৈতিক দলগুলোর পুনরুজ্জীবনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং এর নেতৃত্বের হাল ধরেন। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপিত হয়নি। বরঞ্চ এ ব্যাপারে বামপন্থীরা চাপ দিলে এ দাবী এড়িয়ে যাওয়াই ছিল আওয়ামী লীগের কৌশল। ১৯৬৬ থেকে ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে শেখ মুজিবুর রহমান একটি কর্মসূচী উত্থাপন করেন। ৬ দফাতে যেভাবে স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছিল তা এতকাল আওয়ামী লীগ অনুসৃত নীতির ছিল সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বর্গ-মর্ত্যে কী পরিবর্তন ঘটলো, যে কারণে আওয়ামী লীগ তার অতীত স্বায়ত্তশাসন বিরোধী নীতি থেকে ১৮০ ডিগ্রী বিপরীতে ঘুরে দাঁড়ালো? এই পরিবর্তন কি আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

প্রভুদের নির্দেশনার ফলে পরিবর্তন? নাকি দেশের অভ্যন্তরে আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে যে দাবী অনিবার্য হয়ে ওঠে, তারই পরিস্ফুটন? ইতিহাসের এই ধাঁধার আজও সমাধান হয়নি। তবে, উগ্র জঙ্গি জাত্যাভিমানী শ্লোগান আওয়ামী লীগের সভা-সমাবেশকে মুখরিত করে তোলে। 'জাগো জাগো, বাঙালী জাগো।' 'পাঞ্জাব, না বাংলা? বাংলা বাংলা।' 'পিণ্ডি, না ঢাকা? ঢাকা, ঢাকা' এবং সবশেষে 'জয়বাংলা' শ্লোগানের মধ্যদিয়ে বাঙালিত্বের জাত্যাভিমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। এই পর্যায়ে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কলাকৌশলের সঙ্গে এডলফ হিটলারের নাজী পার্টির কলাকৌশলেরও একটা মিল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আওয়ামী নেতৃত্বে সম্ভবত অসওয়ালড স্প্যাংগলারের মতো বাঙালী জনগণ পশুরাজ সিংহের আচরণ পরিগ্রহ করুক, তা বিশ্বাস করতো না। আর বিশ্বাস করতো না বলে জাতীয় নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে পরাশ্রয়, পরানুগ্রহকামী হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং ক্লাসিকাল অর্থে আওয়ামী লীগকে নাজী বা ফ্যাসিস্টদের সমগোত্রীয় বিবেচনা করা যাবে না। নাজীরা যেখানে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা তুলে ধরতে গিয়ে ধ্বংস বরণ করলো, আওয়ামী লীগ সেখানে জাতীয়তার নামে জাতীয়তারই চরম অবমাননা ঘটালো। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে গঙ্গার পানিচুক্তি করে ও পার্বত্য শান্তিচুক্তি করে আওয়ামী লীগ প্রমাণ করলো ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারা যে মেজাজে জাতীয়তাবাদকে উত্থাপন করে, ক্ষমতায় আসার পর সেই জাতীয়তাবাদই তাদের বিশ্বাসঘাতকতার বলি হয়।

১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারী বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট হিন্ডেন বুর্গ হিটলারকে জার্মানীর চ্যান্সেলর নিযুক্ত করেন। চ্যান্সেলরের মর্যাদা ছিল রাষ্ট্রের প্রধান কার্যনির্বাহীর সমতুল্য। ঐ সময়ে নাজী পার্টি ও জাতীয়তাবাদীরা মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠলো, নাজীরা ছাড়া আর কোন দলই গণনাযোগ্য নয়। সাধারণ নির্বাচনে নাজী ও জাতীয়তাবাদীরা রাইখ স্ট্যাগে (জার্মানীর সংসদ) সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও নাজীদের কিছু আসতো-যেতো না। কেননা, নাজীরা সকল বিরোধীকে জেলে পুরে দিয়েছিল। রাজনৈতিক দৃশ্য থেকে কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা অপসারিত হলো। এমন সময় রাইখ স্ট্যাগ ভবনে আগুন ধরলো। হিটলার এর জন্য কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রকে দায়ী করলে কমিউনিস্টরা এই অভিযোগ দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করলো এবং বলতে চাইলো, হিটলারই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়ে কমিউনিস্টদের ওপর হামলা চালানোর একটা মওকা পেয়েছে। জার্মানীতে শুরু হলো নাজী বা বাদামী সন্ত্রাস। পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়া হলো। রাষ্ট্রের সমুদয় ক্ষমতা হিটলার ও তার মন্ত্রিসভার ওপর অর্পিত হলো। তারা তাদের ইচ্ছামতো আইন প্রণয়ন করতে পারতো। জার্মান প্রজাতন্ত্রের weimar constitution রদ করা হলো এবং প্রকাশ্যে সকল প্রকার গণতন্ত্র চর্চা নিষিদ্ধ করা হলো। সেই সময়ে জার্মানী ছিলো একটি ফেডারেশন। কিন্তু এই ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা বার্লিনে কেন্দ্রীভূত করা হলো। সর্বপর্যায়ে একজন করে ডিক্টেটরের নিয়োগ প্রদান করা হলো, যিনি উচ্চতর স্তরের ডিক্টেটরের কাছে দায়ী থাকতেন। আর হিটলার হলেন সর্বপ্রধান ডিক্টেটর। নাজী ঝটিকা বাহিনী সর্বত্র নির্বিচারে আক্রমণ চালাতে শুরু করলো। দেশ জুড়ে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হলো। নাজীদের প্রতিপক্ষ বলতে কেউ রইলো না এবং কোনো যুক্তিগ্রাহ্য সমালোচনাকে গ্রাহ্য করারও কোনো প্রয়োজন রইলো না। সরকারের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নাজীদের হাতে। দেশে কোনো সশস্ত্র প্রতিপক্ষ দাঁড়াতে পারলো না। বাদামী সন্ত্রাস নিছক কোনো আবেগ-উত্তেজনার ফসল ছিলো না। এই সন্ত্রাস ছিলো অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় বুঝে-শুনে সন্ত্রাস চালিয়ে সকল প্রতিবাদ ও সকল প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দেয়া। নাজীদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে কারো রক্ষা ছিলো না। বাংলাদেশোত্তরকালে রক্ষীবাহিনীসহ বিভিন্ন ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর নিপীড়ন, নির্যাতন, হত্যাকান্ড, সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশাল গঠন করে ভিন্ন সকল দলের অস্তিত্ব বিলোপ, চারটি সংবাদপত্র ভিন্ন অন্য সকল সংবাদপত্রের বিলুপ্তি, শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ এবং জেলা গভর্নর নিয়োগের মাধ্যমে হিটলারী কায়দায় প্রতি জেলায় একজন করে ডিক্টেটর নিয়োগ হিটলার যেভাবে জার্মানীতে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাকেই মনে করিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

বর্তমান আওয়ামী সরকারের আমলে এক ভিন্ন কৌশলে হিটলারী শাসন প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা চলছে। বিরোধীদলের কর্মকান্ড স্তব্ধ করা, বিরোধী কর্মীদের কারাগারে নিক্ষেপ করা, হত্যা, খুন-খারাবীর মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক ভিন্নমত পোষণকারীদের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসারিত করা, আইনের শাসনের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞ আদালতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস, পিতৃবন্দনার মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক অবতারবাদ প্রতিষ্ঠা- সবই হলো হিটলারের প্রেতাত্মার কর্কশ চিৎকার, যা আজ বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আজ সর্বত্র একটা ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশ ছড়িয়ে পড়ছে। পুস্তক ব্যবসায়ীরা ভিন্নমতাবলম্বী অথচ জাতীয় চেতনার প্রধান ধারার বই-পুস্তকগুলো নিজ দোকানের তাকে প্রদর্শন করতে সাহস পায় না। এ কেমন গণতন্ত্র? এ কেমন শাসন? গণ্যমান্য নাগরিকরা প্রাণনাশের ভয়ে প্রতিটি মুহূর্ত দোয়া-কালাম পড়ে দিনাতিপাত করছেন। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের মতো বিশিষ্ট নাগরিকও ভীতি ও আশংকার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। যতদিন তিনি আওয়ামী প্রশাসনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেননি (বর্তমানেও করছেন না, কেবলমাত্র আদালতে প্রধানমন্ত্রীর উক্তি আদালতের অবমাননাসূচক কিনা, তার ব্যাখ্যা চেয়েছেন) ততদিন তাঁর ২২ দূতাবাস রোডের বাড়ীটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু যেই মুহূর্তে তিনি কিছুটা মাথানত করতে অস্বীকার করলেন তখন প্রশ্ন উঠলো, এ বাড়ীর প্লট তিনি অনৈতিকভাবে অর্জন করেছেন, ইত্তেফাকের জন্য নিয়াজীর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং প্রগশ নামক একটি দলভুক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ দ্বিমত পোষণ করলেই আপনি পাপী, নতুবা আপনি ফেরেশতা। এটাই হচ্ছে বর্তমান শাসক দলের অনুসৃত নীতি। আজ সমগ্র বাংলাদেশ এক পোড়ো জমিতে পরিণত হয়েছে। বন্দনাকারী, তোষামোদকারী ও চাটুকাররা ভিন্ন আর কারো এদেশে ঠাঁই হবে না। শৃগাল ও সিংহের রূপ একসঙ্গে ধারণ করে ক্ষমতার মসনদকে চিরকালের জন্য পাকাপোক্ত করার যে আয়োজন চলছে, তাকে প্রতিরোধ করবে কোন শক্তি? এরাতো বিশ্বাস করে, 'আমাদের পরে আর কেউ নয়, অন্যথায় বাংলাদেশ তলিয়ে যাক।'

আফতাব আহমাদ :

১৯৯০-এর গণসংগ্রামের সাফল্যের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে একটি আশার সঞ্চার হয়েছিল যে, মানুষ এবার বোধ হয় সত্যিকার গণতন্ত্রের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। ১৯৯১-এর নির্বাচনে বিএনপি ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত হবে। আওয়ামী লীগ নেত্রী হাসিনা ভারতীয় পাক্ষিক সানন্দাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে দম্ভ করে বলেছিলেন, বিএনপি জাতীয় সংসদে দশটার বেশী আসন পাবে না। দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের অতীত ভূমিকা এবং ভারত তোষণনীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য বিএনপির ঝুড়িতেই অধিক ভোট দিয়ে দল হিসেবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সহায়তা করেছিল। তাই '৯১-এ গণতন্ত্রের পথে জাতি যে নবযাত্রা শুরু করে সেই নবযাত্রা ভণ্ডুল করে দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ নেত্রী হাসিনা দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'বিএনপিকে একদিনের জন্যও স্বস্তি দেয়া যাবে না।' হাসিনা তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামসের গণতন্ত্র সম্পর্কে যে ধারণা সেকালে জন্মেছিল, তার বাস্তব রূপদান করেছিলেন। জন অ্যাডামস ১৮১৪ সালের ১৫ এপ্রিল জন টেইলরের কাছে লিখিত এক পত্রে বলেছিলেন, "Democracy never lasts long, if soon wastes, exhausts, and murders ifself. There never was a democracy, that did not commit suicide." ১৯৯১-এ বিএনপি ক্ষমতা লাভের পর সেই ক্ষমতাকে সংহত ও প্রাতিষ্ঠানিকায়নের ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয় বলেই আওয়ামী লীগ সহিংস সন্ত্রাসী রাষ্ট্রঘাতী তৎপরতা শুরু করার সুযোগ লাভ করে। মনে রাখতে হবে, রাজনীতি এমন একটি বিষয়, যা বহুলাংশে মানুষের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কিংবা নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে যায়। রাজনীতি অনুশীলনের সময় একজন ব্যক্তি সাদামাটা রাজনীতিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, না দেশনায়কোচিত পদক্ষেপ নেবেন, তা নির্ভর করে ব্যক্তির মাপের ওপর এবং পুরো বিষয়টির যথার্থতা অনুভব করার ওপর। জার্মান জাতিকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র

www.pathagar.com

যিনি উপহার দিয়েছিলেন সেই বিখ্যাত জার্মান দেশনায়ক অটোফন বিসমার্ক ১৮৬৭-এর এক আলাপচারিতায় বলেছিলেন, "Politics is the art of the possible", অসম্ভবকে কোনো রাজনীতিবিদ আবাহন করতে চান না। কারণ বিসমার্কের ভাষায় "Man cannot create the current of events. He can only float with it and steer",

আওয়ামী ক্ষমতালিপ্সু রাষ্ট্রঘাতী চক্র কোন ঘটনার জন্ম দিতে পারেনি বিএনপি শাসনামলে। কিন্তু ফিলিস্তিনের হেবরন মসজিদে ইসরাইলী বর্বরোচিত হামলাকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংসদে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা যে উক্তি করেছিলেন, তার সূত্র ধরেই আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জনের সুযোগ লাভ করে। রাজনীতিতে Mending of fences বলে যে একটি কথা আছে, তা বিএনপি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে গেল। এর সঙ্গে যখন যুক্ত হলো মাগুরার উপনির্বাচনের ঘটনা, অর্থাৎ আওয়ামী প্রার্থীর নিশ্চিত পরাজয়– তখন থেকেই আওয়ামী লীগ অব্যাহিত সহিংস সন্ত্রাসী আন্দোলন দ্বারা গণতন্ত্রের চারা উপড়ে ফেলার রাষ্ট্রঘাতী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ঘটনাপঞ্জিকে আওয়ামী লীগ যথার্থভাবে steer করে তার অনুকূলে এমন এক পরিস্থিতির জন্ম দেয়, যে পরিস্থিতিতে ক্ষমতার মঞ্চ থেকে বিএনপিকে বিদায় নিতে হয়।

১৯৭২-এর সম্পাদিত ২৫ বছর মেয়াদী গোলামী চুক্তির অবসান হওয়ার বছর ছিল ১৯৯৭। তার আগেই বাংলাদেশকে একটি প্রতিবন্ধী রাষ্ট্রে পরিণত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধীনতামূলক চুক্তির বেড়াজালে বন্দী করে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিজয়কে নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ভারত আগ্রহী ছিল তার অনুগ্রহপুষ্ট একটি সরকারকে ঢাকায় অধিষ্ঠিত করতে। এই সুযোগটি অজ্ঞাতে ও অসতর্কভাবে বিএনপিই তৈরী করে দিয়েছিল। ক্ষমতা লাভ করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়, কিন্তু ক্ষমতা ধরে রাখা এবং সংহতভাবে ধরে রাখা শুধু কঠিন কাজই নয়, একটি দুরূহ কাজও বটে। আওয়ামী লীগ ভারতীয়দের সঙ্গে যে গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও অঙ্গীকার করে ক্ষমতা লাভ করেছে, তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নও করে চলেছে।

গ্যারান্টিক্লজ ও আরবিট্রেশন ক্লজবিহীন ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি সংক্রান্ত ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপপ্লব নিবারণের নামে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি, সীমান্তে নাশকতা ও সশস্ত্র ভারতীয় বৈরীদের ঠেকানোর প্রশ্নে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ইত্যাদি সুদূরপ্রসারী ভারতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপমাত্র। জনসংখ্যার তুলনায় প্রশাসনের সর্বস্তরে এমনকি জাতীয় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার খাতগুলোতেও বিশেষ ধর্মাবলম্বীর আধিক্য ও কর্তৃত্বকে সুনিশ্চিত করে এ দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদের শৃংখলকে পাকাপোক্ত করার যে অঙ্গীকার হাসিনা সরকার দিল্লীর কাছে করেছিল, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। এক্ষেত্রে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজালের বাছাই করা ব্যক্তিদেরকেই অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বোর্ড অফ ডাইরক্টরসদের মধ্যে এমন একজন বিশেষ ধর্মাবলম্বীকে নিয়োগদান করা হয়েছে, যার ব্যাংকিং, ফিন্যান্স, ট্রেড কিংবা ইকনমি সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই এবং যিনি ঢাকায় বসবাসরত বিশেষ ধর্মবিশ্বাসী সমাজপতিদের মধ্যকারও কেউ নন।

পাশাপাশি '৭২ থেকে '৭৫-এ আওয়ামী লীগ যেসব বিষয়ে নজর দেয়া জরুরী মনে করেনি বা লুটপাটে ম্যাচুইরিটির পরিচয় না দিয়ে শুধুমাত্র 'খাও, পিও; জিও'তে ব্যস্ত ছিল, তারা এবার সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চায় না এবং সে কারণেই তেজগাঁওর দপ্তর এবং ধানমন্ডি দু'নম্বর সড়কের সদনটির সঙ্গে নিবিড় ও সংগোপন যোগাযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

হাসিনা সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য হিন্দু সমাজের অধিপতিগোষ্ঠী কোনো রাখ-ঢাক না রেখেই প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদের প্রচারণায় উৎসাহ যোগাচ্ছে এবং হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হুমকি দিচ্ছে। হাসিনার উদ্দেশ্যে কপট সাবধানবাণী উচ্চারণ করে এও বলা হচ্ছে যে, আগামীতে প্রয়োজনে, 'গণেশ উল্টেও যেতে পারে।' স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের যে অভিযোগ হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে এযাবতকাল উত্থাপিত হয়ে এসেছে, তা বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সম্মেলনে নিমচন্দ্র ভৌমিক গয়রহের লক্ষঝক্ষ ও উচ্চারণে অকাট্যভাবে

www.pathagar.com

প্রমাণিত হয়েছে। এদিকে প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য পুলিশ-বিডিআর, আনসারসহ বিভিন্ন বল প্রয়োগকারী সংস্থায় নির্লজ্জ দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও পারিবারিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে। শুধু তাই নয়, একের পর এক গণবিরোধী নিবর্তনমূলক আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে, যার সর্বশেষটি হচ্ছে জননিরাপত্তা আইন তথা আওয়ামী গদিরক্ষা আইন। ব্রিটিশ বাগ্মী এডমন্ড বার্ক বলেছেন, "The greater the power, the more dangerous the abuse", ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার করে সকল শিষ্টাচারকে বিসর্জন দিয়ে হাসিনা তাই এ ধরনের বর্বরোচিত উক্তি করতে পারলেন, 'একটি লাশ পড়লে দশটি লাশ ফেলতে হবে।' দেশে আজ বল্গাহীনভাবে লাশ ফেলার রাজনীতি শুরু হয়েছে। অতি সম্প্রতি যে দুটি লাশ ফেলা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে সূত্রাপুরবাসী আইনজীবী হাবিবুর রহমান মণ্ডলের। ইনি হাসিনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা মামলার অন্যতম উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় বিএনপি নেতা। দ্বিতীয় যে লাশটি পড়েছে, সেটি হচ্ছে বাগেরহাটের আইনজীবী কালিদাস বড়ালের। ইনি আওয়ামী লীগের স্থানীয় একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক ও জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি। আওয়ামীপন্থী পত্রপত্রিকায় এবং বিরোধী দলবিরোধী পত্র-পত্রিকায় এ যাবতকাল কালিদাস বড়ালের হত্যা সংক্রান্ত যেসব রিপোর্ট বেরিয়েছে, তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টি ঘটেছে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কেন্দ্র করে। এসব পত্র-পত্রিকা কালিদাস বড়ালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় চেপে গেছে। কালিদাস বড়াল স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, সীমান্তের এপার-ওপার অবাধ যাতায়াতের মাধ্যমে তিনি অস্ত্রসহ বহু নিষিদ্ধ পণ্যের চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এসব তথ্য চেপে গিয়ে কেবলমাত্র প্রাধান্য ও নেতৃত্বের কোন্দল বা উপদলীয় চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ঘটনাটিকে যে মহল প্রতিপন্ন করতে চাইছে, তাদের স্মরণে রাখা উচিত যে, আগুন নিয়ে খেলতে নেই। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের মুসলমানের দেশে ভারতীয়দের সহায়তায় হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অলীক স্বপ্নে যারা বিভোর এবং তাদের মদদদাতা যারা গৃহযুদ্ধের আস্ফালন করছে, তাদের মনে রাখা উচিত, আওয়ামী লীগ যতই লুটপাট সমিতির ভূমিকায় থাকুক না কেন, সম্প্রদায় ভাবনায় মুসলমানের পক্ষাবলম্বন করা ছাড়া তার কোন গত্যন্তর বা ভবিষ্যৎ নেই। অতএব, তৃণমূল বিচ্ছিন্ন যে পরজীবী নেতৃত্ব ভারতের বরাভয়ে এ দেশে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে ভারতীয় সৈন্য ও দখলদার বাহিনীকে আমন্ত্রণ করার পাঁয়তারা করছে ও অজুহাত খুঁজছে, সময় থাকতে তারা যেন সাবধান হয়ে যায়। এ দেশ পিণ্ডির গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করেছে দিল্লীর গোলামীর জিঞ্জিরকে মণিহার হিসেবে পরিধান করার জন্য নয়। সাবধান! বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তা এবং স্বাধীনতা নিয়ে কেউ যেন খোঁচাখুঁচি করার বিষয়ে প্রলুব্ধ হয়ে না ওঠে। আমাদের অবিনাশী যে সম্মিলিত শক্তি তা পরাভব মানতে শেখেনি। ইটালীর মহান দেশপ্রেমিক জিউসেপ গুয়েরজোনি গ্যারবল্ডির চেতনায় এ দেশের মানুষও উজ্জীবিত। গ্যারিবল্ডি বলেছিলেন "Any one, who wants to carry on the war against the outsiders come with me, I can offer you, neither honours nor wages; I offer you, hunger, thirst, forced marches, battles and death. Anyone who loves his country follow me" এক সাগর রক্তের বিনিময়ে যে দেশ আমরা অর্জন করেছি, তা কতিপয় চর, নিয়োগী ও পঞ্চম বাহিনীর সদস্যদের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী, সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদীদের হাতে তুলে দেয়া হবে, এটি একটি দিবাস্বপ্ন মাত্র। দিবা স্বপ্ন দিবাস্বপ্নই। এর সঙ্গে বাস্তবতার কোন সংশ্লেষ নেই। আমাদের অকুতোভয় অবিনাশী অতন্দ্র জনতা আমাদের একমাত্র ভরসা।

www.pathagar.com

৯ সেপ্টেম্বর ২০০০

মানুষ যখন অমানুষ

মাহবুব উল্লাহ :

আদিমতার সঙ্গে বর্বরতার সহাবস্থানের কথা সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন। বাংলাদেশের সমাজকে কোনো সমাজবিজ্ঞানীই আদিম সমাজ বলবেন না, বরং জাতীয়তা নিয়ে আমরা যারা গর্ব করি, তারা সকলেই আমাদের হাজার বছরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কথা বলি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই সমাজ আদিম সমাজের চাইতেও বর্বর। নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা, ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্বেষ এই সমাজের এর বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে আছে। আমাদের সমাজে সন্ত্রাস যে কত বড় সমস্যা, তা বিশদ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ করি, তার একটা বড় কারণ সম্ভবত বেকারত্ব। আমাদের যুবক সমাজ প্রচণ্ড লক্ষ্যহীনতা ও হতাশায় ভুগছে। এই লক্ষ্যহীনতা, হতাশা যুবক সমাজের বিপুল অংশকে মাদকাসক্তি, ছিনতাই, রাহাজানিসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক তৎপরতায় জড়িয়ে পড়তে উৎসাহিত করছে। কিন্তু, ব্যক্তি জীবনে কিংবা পারিবারিক জীবনে এমন সব নৃশংস ঘটনার কথা সংবাদপত্রের পাতায় আমরা দেখতে পাই, যার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আমরা দাঁড় করাতে পারি না।

সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বাংলাদেশের সমাজে ভায়োলেন্সের উৎস মূলত দু'টি। এর একটি হচ্ছে, বিষয়সম্পত্তি এবং অপরটি নারী নিয়ে বিরোধ। কিন্তু এর পরেও মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতির ব্যাপারটিকেও বাদ দেয়া যায় না। যতই দিন যাচ্ছে, ততই আমরা যেন মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছি। সম্প্রতি রাজধানীর বুকে সংঘটিত দু'টি ঘটনা তারই ইঙ্গিতবহ। গত ২ সেপ্টেম্বর শনিবার জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রথম পাতায় 'চোখসহ সারা শরীরে সিগারেটের ছ্যাকা দেয়া হতো ঃ মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতনে গৃহ পরিচারিকার ৫ বছরের মেয়ের মৃত্যু' এরকম একটি শিরোনাম ঠাঁই পেয়েছে। খবরে প্রকাশ, রাজধানীর শ্যামপুর এলাকার একটি বাসায় মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালিয়ে ঐ বাসার পরিচারিকার সাড়ে পাঁচ বছরের মেয়ে নিশিকে হত্যা করা হয়েছে। নির্যাতন চালাতে গিয়ে নিশির দুই চোখের মণি ও যৌনাঙ্গসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জ্বলন্ত সিগারেট ঠেসে ধরে ঝলসে দেয়া হয়। গত ৬ মাস ধরে তার ওপর প্রায় প্রতিদিন এভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছিলো। কিন্তু গতকাল সকালে নির্যাতনের ফলে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ধানমন্ডি গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুপুরের দিকে সে মারা যায়। সে সময় নিশির মা শিরিন আরা বেগমের বুক চাপড়ানো আহাজারীতে হাসপাতালের পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। শিরিন আরার কাছ থেকে জানা যায়, গত কোরবানির ঈদের সময় থেকে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে তিনি শ্যামপুরের কদমতলি পুনর্বাসন এলাকায় এই বাসায় কাজ নেন। নিশিকে নিয়ে তিনি এ বাসাতেই থাকতেন। তার আরেক মেয়ে দশ বছরের ববিতা অন্যত্র কাজ করে। এর মাঝে গৃহকর্তা আনোয়ারের এক ভাই তাকে ধর্ষণ করলে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। পরে তার গর্ভপাত করানো হয়। এ ঘটনা তিনি যাতে বাইরে ফাঁস করে দিতে না পারেন, সেজন্য তাকে বাসার বাইরে বের হতে দেয়া হত না। কাজের সামান্য এদিক-ওদিক হলে তাকে মারধর করা হত। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আনোয়ার ও তার স্ত্রী আগুনের ছ্যাঁকা দিয়েছে (তিনি ক্ষতচিহ্ন দেখান)। একবার মার খেয়ে তার একটি হাতও ভেঙে যায়। মায়ের ওপর নির্যাতন চালাতে দেখে নিশি কাঁদলে ওরা তাকেও মারধর করতো। নিশি ঐ বাসার কোন জিনিস খেলার ছলে ভেঙে ফেললে বা মেঝেতে প্রস্রাব করলে অথবা ক্ষুধায় কান্নাকাটি করলে তার শরীরে সিগারেটের আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়া হত। তিনি বলেন, নিশি কাঁদলে তার চোখে সহজে পানি আসত না। তাই,

www.pathagar.com

আনোয়ারের স্ত্রী নিশির চোখে মরিচের গুঁড়া ঢেলে দিত। আর তার চোখে সিগারেটের আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দিত আনোয়ার। এ ধরনের নির্যাতনে অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার দেখাত না। এমনিতেই বাইরে থেকে ওষুধ এনে দিত। শিরিন আরা জানান, বাবা-মার পাশাপাশি আনোয়ার হোসেনের ছেলে আউয়ালও নিশিকে মারধর করত। গতকাল সকালে স্বামী-স্ত্রীর নির্যাতনে নিশি জ্ঞান হারালে তিনি গৃহকর্তার পা ধরে কান্নাকাটি করেন। এক পর্যায়ে তাকে গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়। দুপুর একটার দিকে নিশি মারা যায়।

পুরো ঘটনাটি আবারও পাঠকের নজরে আনার তাগিদ অনুভব করলাম এই কারণে যে, আমাদের সমাজে নিষ্ঠুরতা কোন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য। এ সমাজকে নিছক অসুস্থ ও রুগ্ন বলা হলে যথার্থ পরিচয় দেয়া হবে না। এ সমাজ এক দিকে যেমন অসুস্থ ও রুগ্ন, অন্যদিকে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, নিষ্ঠুর, দয়া-মায়া ও অনুকম্পাহীন এবং এমনকি পশু সমাজেও যেসব মমত্ববোধের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়, সেইসব দৃষ্টান্তও সম্ভবত এই সমাজ থেকে অপসৃত হতে চলেছে। অপরাধ বিজ্ঞান বলে, মানুষ একটি অপরাধকে আড়াল করতে গিয়ে অন্য অপরাধের আশ্রয় নেয়। অবোধ শিশু নিশির জীবনে যে দুঃখ-যাতনা এবং পরিশেষে মৃত্যু নেমে এসেছে, তার পেছনেও ছিল কৃত অপরাধকে ঢাকা দেয়ার অমানবিক মহড়া। নিশির মা গৃহকর্তার ভ্রাতার যৌননিপীড়নের শিকার হয়েছিল। সেই ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে গিয়ে অন্যসব করুণ ও মর্মন্তুদ ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজের সংঘটিত যে নারী সংশ্লিষ্ট ভায়োলেন্সের কথা বলেছেন, নিশির মর্মান্তিক মৃত্যুর মূলে সে ধরনের ভায়োলেন্সই নিহিত আছে। হতভাগিনী নিশির জীবন যে করুণ পরিণতির দিকে গড়ালো, তার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য ও সহায় সম্বলহীনতা। হতদরিদ্র না হলে নিশির মা কেনইবা পরের বাড়ীতে গৃহপরিচারিকার কাজ করতে যাবে? কেনই বা দশ বছরের শিশুকন্যাকে অন্যের বাড়ীতে কাজ করতে দেবে? যখন তার স্কুলে যাবার বয়স কিংবা সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে খেলাধুলা করার বয়স। আমাদের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিককে অধিকার দেয়া হয়েছে দেশের যে কোনো স্থানে গমনের এবং কাউকেই বেআইনীভাবে কোথাও আটকে রাখা যাবে না– এমন বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। তৎসত্ত্বেও নিশির মাকে ঘরের বাইরে যেতে দেয়া হত না– যদি দৈবাৎ তার ওপর যৌন নিপীড়নের ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। এই মহিলাকে ঘরে আটকে রাখাই ছিল মারাত্মক ধরনের ভায়োলেন্স। তার ওপর তার অবুঝ সন্তান এবং তার নিজের ওপর মাসের পর মাস যে তাণ্ডবতা ও বর্বরতা নিয়ে নির্যাতন চালানো হয়েছে, সেই ভায়োলেন্সের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার কোনো বিশেষণ বাংলা ভাষার অভিধানে আছে কিনা, আমার জানা নেই। রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখ করে লিখেছিলেন, 'সময় যেন ইতর হইয়া উঠিয়াছে'। কবির দুঃখ, আজকাল নগর-নগরী ও নদ-নদীর নাম প্রাচীনকালের মত কাব্যিক সুষমামণ্ডিত নয়। উজ্জয়নী, বেত্রবতীর মত চমৎকার নাম এখন আর দেখা যায় না। সে কারণেই কবির দুঃখ, 'সময় যেন ইতর হইয়া উঠিয়াছে'। অবোধ শিশু নিশির যে করুণ পরিণতি হল স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের হাতে, তা দেখে কবি এই মানুষ, এই সময় ও একাল সম্পর্কে কী মন্তব্য করতেন? পাঁচ বছরের শিশু নিশির মৃত্যুর ঘটনাটি যাদের মধ্যে ন্যূনতম মনুষ্যত্ববোধ আছে, তাদের প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেবে, সন্দেহ নেই। নিশির মত মানুষকে সংবিধান, মানবাধিকার সংস্থা কিংবা রাজনৈতিক দলগুলো রক্ষা করতে পারে নি। আমাদের রাজনীতিতে স্বাধীনতার সপক্ষ-বিপক্ষ বলে একটা বিরাট মল্লযুদ্ধ চলছে। কিন্তু, এই যুদ্ধে নিশি কিংবা তার মায়েদের কী বা আসে যায়? এই সমাজে অভিভাবক হিসেবে পিতার নামের পাশে মায়ের নাম যোগ করলেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে কি? সাংবিধানিকভাবে মানবাধিকারের নিশ্চয়তা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গভেদে বৈষম্যের নিরসন ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিপীড়ন ও বৈষম্য অবসানে এ ধরনের পদক্ষেপ কেবলমাত্র প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচিত হবে। আমরা সকল মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সুযোগের সাম্য তথা equality of opportunities-এর কথা বলি। আমার মনে হয়, কেবল এই সুযোগের সাম্যই সকল মানুষের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করে না। এর জন্য প্রয়োজন equality of conditions অর্থাৎ

www.pathagar.com

বৈষয়িক পরিস্থিতির সাম্য। যে বৈষয়িক পরিস্থিতির কারণে নিশির মা শিরিন আরা গৃহপরিচারিকার কাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়, যৌন নিপীড়নের শিকার হতে বাধ্য হয়, সে অবস্থার পরিবর্তন ভিন্ন এ ধরনের অমানবিকতার অবসান ঘটা সম্ভব নয়। একটা সময় ছিল, যখন আমাদের শিক্ষাদীক্ষা আমাদের মনন ও চেতনায় সুস্থ মূল্যবোধ ও সৎ বিবেচনার সঞ্চার ঘটাত। আজ যে যত বেশী শিক্ষিত, সে বোধ হয় তত বেশী মতলববাজ, সুযোগসন্ধানী এবং যে কোন মূল্যে সুযোগের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে তৎপর। এই শিক্ষা মানুষের প্রতি মমত্ববোধ উদ্দীপ্ত করে না, পাশের মানুষটির প্রতি বিবেচনা বোধ জাগ্রত করে না। বিকৃত ইহলৌকিকতা সমস্ত সুকুমারবৃত্তিকে ধ্বংস করে। চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, এদেশের রাজনীতিবিদরাও ভাবেন না, কিভাবে এ ধরনের অমানবিক পরিস্থিতির অবসান ঘটতে পারে এবং মানুষে মানুষে মিলে এই ধরাপৃষ্ঠে একটি সুখনীড় রচনা করতে পারে। এখনই তার অন্বেষায় নিবেদিত হতে হবে।

আফতাব আহ্মাদ :

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ চালু আছে ঃ Time is the best heeler অর্থাৎ, 'সময়ই নিরাময়ের শ্রেষ্ঠ উপায়।' এ প্রবাদ বাক্যটি অন্তত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আর প্রযোজ্য বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে যদিও বলেছেন, 'সময় ইতর হইয়া উঠিয়াছে'– বাংলাদেশে সময় কখনও ইতর, কখনও বা নির্বিকার, কখনও বা মতলবি হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাহাবা নিতে পারে। কিন্তু ও পর্যন্তই। পুরো ব্যাপারটিই প্রসাধনী ও আলঙ্কারিক। বাস্তবতা এবং অস্তিমান সমাজকাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে পৈশাচিকতা সুপ্ত থেকে জাগ্রত দানবে পরিণত হয়েছে, তা শিশু নিশির নিশি পাড়ি দেয়ার করুণ বাস্তবতা থেকে সুস্পষ্ট। নিশির মত আরও অসংখ্য শিশু-কিশোর, অসহায় নারী নিত্য অমানবিকতার শিকার হচ্ছে; তার যৎসামান্যই পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় সংবাদ হয়ে ভেসে ওঠে। সাম্প্রতিক ঘটনার কথা যদি উল্লেখ করি, তাহলে বুশরা ও শিপু হত্যার কথা বলা যায়, যার সাথে রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তির যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সাড়ে তিন বছরের শিশু তানিয়াকে আইনী রক্ষা ও শিশুর নিরাপত্তা দেয়ার জন্য সমাজ যে পুলিশের জন্ম দিয়েছে, সেই পুলিশ ধর্ষণ করে এবং জনতার রুদ্ররোষ থেকে বাঁচার জন্য নিরীহ নিরাপত্তা রক্ষীদের ফাঁসিয়ে পুলিশ এক পৈশাচিক আনন্দ ও তৃপ্তি ভোগ করে। পতিতালয় উচ্ছেদের নামে নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে সেখানকার 'গডফাদার' যে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে, তা রোধ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ অসহায় ও অসাড়। টানবাজারের প্রসঙ্গটি আসতেই শবমেহেরের ঘটনাটি মনে পড়ে যায়। শবমেহের নামের যে অসহায় মেয়েটিকে টানবাজারে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার জন্য উপর্যুপরি নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, তা ক্ষণিকের জন্য হলেও আমাদের একটু নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু দিনের শেষে হিসেবের খাতা মেলাতে গেলে দেখি, যে জীবিত শবমেহেরকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করানো যায়নি, সেই শবমেহেরের মৃতদেহই ভোগবাদী এ সমাজের চটকদার প্রচার ও বিপণনের পণ্যে পরিণত হয়ে এক ধরনের পরোক্ষ পতিতায় রূপান্তরিত হয়। শবমেহেরকে নিয়ে শর্টফিল্ম বানিয়ে আমরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছি। নারী অধিকারের নামে কয়েকটি নারী সংগঠন চড়া গলায় কথা বলে পরিচিতি অর্জন করেছে। আর এনজিওজীবীরা নারায়ণগঞ্জের পাটের দালালের মতই শবমেহেরের পক্ষে দাঁড়াবার নামে বিদেশী দাতাদের কাছ থেকে বেশ কিছু নগদনারায়ণ হাতিয়ে নিয়েছে। আসলে, গোড়াতে যে কথা বলছিলাম– ইতরতার সাথে নির্বিকার ও নির্লিপ্ত ভাবের যোগ আমাদের অনেককেই মতলবি করে তুলেছে। তাই, সময় এই সমাজকে নিরাময়ের পথের সন্ধান না দিয়ে নানাভাবে কেবল বিভাজনের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের দেশে প্রতিবছর ঘটা করে শিশু দিবস, নারী দিবস, মাতৃদিবস ইত্যাদি দিবস পালন করা হয়। সংবাদপত্রগুলো এসব দিনে শিশু, নারী বা মাতার সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে যত না বেশী আগ্রহী থাকে, তার চাইতে বিজ্ঞাপন বাগাবার কাজে বেচাইন থেকে 'ক্রোড়পত্র' প্রকাশের কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। একই যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ায় নানা ধরনের শিশু সংগঠন, নারী সংগঠন ও মহিলা সংগঠন, নানাধর্মী এনজিও এসব দিবস উদযাপনের নামে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, চাকচিক্যশোভামণ্ডিত সমাবেশ

www.pathagar.com

ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন সুচারুভাবেই সম্পন্ন করে থাকে। উদ্দেশ্য কিন্তু শিশুর অধিকার সংরক্ষণ, নারীর অধিকার সংরক্ষণ, মাতৃমর্যাদার সমুন্নয়ন নয়- সচেতনতা সৃষ্টিও উদ্দেশ্য নয়। সরকারী বিভিন্ন সংস্থা থেকে, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে এবং দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে নগদনারায়ণ হাতিয়ে নেয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। এখানে 'অধিকার সংরক্ষণ' বা অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ- সবই গালভরা কথামাত্র।

এমনটি কেন হল? আমাদের দেশের ঐতিহ্য বা অতীত ইতিহাস তো এ সাক্ষ্য বহন করে না। সমমর্মিতা, সহৃদয়তা এবং স্নেহঝরা মানবিক সম্পর্কে অত্যুজ্জ্বল আমাদের দেশের ঐতিহ্য বা অতীত ইতিহাস তো এ সাক্ষ্য বহন করে না। সমমর্মিতা, সহৃদয়তা এবং স্নেহঝরা মানবিক সম্পর্ক অত্যুজ্জ্বলভাবে যুগে যুগে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে ও এগিয়ে নিয়েছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কিংবা 'পূর্ববঙ্গের গীতিকা'র লোকজ কাহিনীগুলো আমরা যদি একটু যাচাই করে দেখি, সেখানে অমানবিকতা, ক্রূঢ়তা ও পৈশাচিকতার পাশাপাশি মানবিকতার জয়গান, হৃদয়গ্রাহিতা, জ্যোৎস্নাভরা চাঁদের ভালবাসা- এসব কিছু আমাদের চৈতন্যকে এমনভাবে আপ্লুত করে এবং করে এসেছে যে, শেষ বিশ্লেষণে মনুষ্যত্বের জয়কে অস্বীকার করার কোন মতলবই মানুষের হৃদয়কুহরে ঠাঁই পায়নি।

যে অস্বাভাবিকতা, দ্রুততা এবং পেশীশক্তির অশিষ্ট প্রয়োগ আমাদের মানুষগুলোকে এবং সমাজকে ব্রুটালাইজ করেছে, তা শেষ পরিণতিতে ক্রিমিনালাইজও করেছে। ব্রুটালাইজেশন আমাদের মধ্যে নির্লিপ্ততা ও নির্বিকারচিত্ততাকে প্রসারিত করেছে। ক্রিমিনালাইজেশন আমাদের মতলবী করে তুলেছে। তাই সময় বাংলাদেশে শুধু ইতর হয়ে ওঠেনি, নির্বিকার ও মতলবীও হয়ে উঠেছে।

নিশির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সমাজের বিবেকবান কোন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তেমন কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। রাজনৈতিক দলগুলোরও যেহেতু এ থেকে তেমন তাৎক্ষণিক ফায়দা পাওয়ার কিছু নেই, তাই বোধগম্য মৌনতা পালন করেছে। আর অধিকার সংরক্ষণ, 'সচেতনতা সৃষ্টি' সম্পর্কিত নানা সংগঠনের ও এনজিওজীবীদের তৎপরতা এক্ষেত্রে অনুভবও করা যায় না। দৃশ্যমানও নয়। এই যে আত্মোন্নয়নের জন্য সুযোগের সন্ধানে থাকার মতলবী বৃত্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, তার পেছনে ব্রুটালাইজেশন থেকে ক্রিমিনালাইজেশনের মাধ্যমে রাতারাতি ধন-সম্পদ, বিত্তবৈভব, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ইত্যাদি করায়ত্ত করার যে সহজ পন্থার সন্ধান মূল্যবোধ বিপর্যস্ত একাত্তর-উত্তর বাংলাদেশে আমরা পেয়েছি, তা এখনও আমাদের প্রবলভাবে প্রলুব্ধ করে। তাই, সুবচন, সুনীতি এবং শ্রেয়কার্য সম্পর্কে লৌকিকতা দেখিয়ে মানুষ ঠকানোর এক অভিনব বৃত্তির প্রসার ঘটিয়েছি আমরা, যা কলাবিদ্যা অর্থে এবং ব্যবসার অর্থে উভয় ক্ষেত্রে 'শিল্পে' রূপান্তরিত হয়েছে।

একেবারে সমাজের গোড়ার দিকে তাকিয়ে যদি আমরা শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে সমাজকে নাড়া দেয়ার কথা না ভাবি, তাহলে বুলি কপচানো আর পরিবর্তনের মেকী ধ্বনি উচ্চারণ শুধু একটি প্রসাধনী আচ্ছাদন হিসেবে কাজ করবে। আমাদের ফিরে যেতে হবে আমাদের লোকজ সমাজের সেই ঐতিহ্যে- যেখানে আর সবকিছুকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করে জীবন সর্বঅর্থে প্রেমময় হয়ে ওঠে। মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক তেমনি প্রেমময় করে তুলতে হবে। অসূয়া, পৈশূন্য এবং বিদ্বেষ ও গরলকে সমাজদেহ থেকে যদি আমরা নিষ্কাশন করতে চাই, তাহলে আমাদের ফিরে যেতে হবে নৈসর্গিক সাম্য ও মানবতার যে সমাজ আমরা পূরাকালে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সেখানে।

মাহবুব উল্লাহ :

মানব প্রকৃতি নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক আছে। একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, মানুষ স্বভাবতই ভাল। আরেক দল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, মানুষ স্বভাবজাতভাবেই অপরের অনিষ্টকারী। এই দুই মতের মধ্যে কখনই আপস হবে না। তবে, এই পরস্পরবিরোধী মতবাদকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা সংক্রান্ত মতবাদ। মানুষ যদি

www.pathagar.com

স্বভাবজাতভাবে ভাল হয় এবং অপরের হিতার্থী হয়, তাহলে রাষ্ট্রের আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠান, বিচার-আচার যেরূপ পরিগ্রহ করবে তা মানুষ যদি স্বভাবজাতভাবে অনিষ্টকারী এবং অপরের অহিতার্থী হয়, তাহলে এসবের গড়ন হবে সেসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, মানুষ যখন জন্ম নেয়, তখন সে যেমন ফেরেশতা থাকে না, তেমনি সে শয়তানও হয় না। সমাজই মানুষকে ফেরেশতা বা শয়তানতুল্য করে তোলে। আজকাল আবার জিনের গঠন নিয়ে কথা উঠেছে। জিনের গঠনের মধ্যেই মনুষ্য সন্তানের চারিত্রিক প্রবণতাগুলো নিহিত থাকে। নতুন শতাব্দীতে আগামী ক'বছরের মধ্যেই প্রতিটি মানুষের জিনের গঠন বিন্যাস জানা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর ফলে প্রতিটি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হবে। এমনও হতে পারে, কর্মক্ষেত্রে চাকরি প্রার্থীদের জিন বিন্যাসের সার্টিফিকেট দেখাতে হতে পারে। এর ফলে অপরাধপ্রবণ, কাজে ফাঁকিবাজ, অমনোযোগী ও উৎসাহহীন জিনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিরা চাকরিতে নিয়োগ পাবে না। এর ফলে যে নৈতিক প্রশ্নটি উত্থাপিত হবে, তা হল জিন বৈশিষ্ট্যের মত একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো জনসমক্ষে জ্ঞাপন করার বাধ্যবাধকতা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত?

যা হোক, এসব ভবিষ্যতের সমস্যা। কিন্তু এখনকার মত একথা ভেবে আশ্বস্ত হতে চাই যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, খারাপ কাজ করার জন্য নয়, অমানুষ হবার জন্য নয়। এখন প্রশ্ন হল, মানুষকে কিভাবে অমানুষে অধঃপতিত হওয়া থেকে বিরত করা যায়। এটা কি জেলের ভয় দেখিয়ে, মৃত্যুদণ্ডের বিভীষিকার দৃশ্য প্রদর্শন করে, ফায়ারিং স্কোয়াডের আতঙ্কের কথা বলে, নাকি অন্য কোন উপায়ে? পাশ্চাত্য সমাজকে আমরা সভ্য সমাজ বলি, কিন্তু সে সমাজ কতটুকু সভ্য, তা কয়েক মিনিটের বিদ্যুৎ বিভ্রাটজনিত দুর্ঘটনা ও দুরাচার থেকেই বোঝা যায়। পাশ্চাত্য সমাজেই মায়ের হাতে সন্তান নিগৃহীত হয়, শুধুমাত্র যৌনতাড়নার কারণে, নবলব্ধ বন্ধুর তথাকথিত প্রীতি ও ভালবাসা অর্জনের পাশব আকুতির কারণে। পাশ্চত্য সমাজ পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থায় কড়াকড়ি সৃষ্টি করে এসব প্রবণতাকে রুখতে চেয়েছে, কিন্তু নিবৃত্ত করতে পারেনি। সম্প্রতি গত ক'বছরে পোপ জন পল (দ্বিতীয়) মানুষের নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার জন্য বারংবার আবেদন জানিয়েছেন। তাতে কিছু ফলও হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে পোপের প্রভাব এখন খানিকটা হলেও অনুভব করা যায়। মুসলিম বিশ্বে Papacy' এর (খ্রিষ্টীয় যাজকবাদ) মত প্রতিষ্ঠান নেই, তবে OIC-র মত আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে– এ সংস্থা যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মুসলিম বিশ্বের জন্য একজন আধ্যাত্মিক অভিভাবক নিযুক্ত করতে পারে। যার কাজ হবে মুসলিম দেশসমূহে নৈতিকতাবোধ প্রসারের জন্য এবং মানুষ যাতে অমানুষ না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমাদের দেশের আলেম সমাজের অনেককেই দেখা যায়, মানুষকে দোজখে কত রকমের শাস্তির বিধান আছে সে ভয় দেখিয়ে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ প্রদান কিংবা ওয়াজ-নসিহত করতে । কিন্তু সত্যিকারের খোদাভক্ত মানুষ দোজখের ভয় কিংবা স্বর্গসুখের জন্য আল্লাহর প্রতি অনুগত ও তাঁর নির্দেশিত পথে থাকার কথা ভাবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তার কাম্য। রাবেয়া হাসান বসরী (রাঃ) এ কথাই বলতেন। আমাদের দেশের আলেম সমাজ ওয়াজ-নসিহতের সময় কিংবা জুমআর নামাজের খুতবায় মানুষের মনুষ্যত্ব গুণ অর্জন তথা সত্যিকার অর্থে পৃথিবীতে আল্লাহতা'লার প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখলে বেশ সুফল পাওয়া যেতে পারে। শবমেহের, তানিয়া, মৌসুমী, সীমা চৌধুরীসহ অগণিত আদম সন্তান পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ আমাদের ভোগবাদী মূল্যবোধ। বৈষয়িক লাভকে আমরা পরম পাওনা বলে গণ্য করি। কিন্তু পাশের মানুষটির কিংবা প্রতিবেশীর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে মানুষ যে এই পৃথিবীতেই স্বর্গের আনন্দ লাভ করতে পারে এবং এরকম আনন্দ লাভের মাধ্যমে যা পাওয়া যায় তা বহুমূল্য মণিমানিক্যের চেয়েও মূল্যবান, সেই বোধ জাগ্রত করতে হবে। আজকাল পরিবেশবাদীরা যে কথা বলছেন, তার মূলেও রয়েছে এই একই ধরনের পরিতৃপ্তি অর্জনের প্রেরণা। আত্মস্বার্থ অর্জনের পরিধিকে সীমিত করে পরার্থপরতায় যে অর্জন হয়, তা নিছক জৈবিক প্রতিযোগিতা লব্ধ অর্জনের চেয়েও অনেক মূল্যবান ও অনেক সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে– যে

www.pathagar.com

কথা প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়তন্ত্রীতে পৌঁছে দিতে হবে। এক সময়ে ইসলামী দুনিয়ায় খলিফাকে হতে হত সকলের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। রাজনীতিতে আমরা যতদিন সে রকম অনুসরণীয় ও আদর্শবাদী ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটাতে না পারব, ততদিন এ সমাজে নিশির মত অবোধ শিশুরা জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা খেতে খেতে মর্মান্তিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

আফতাব আহমাদ :

আসলে আমাদের অভিনিবেশ সহকারে একটি ইবাদতই করতে হবে- মানুষের শ্রেয় বোধকে জাগ্রত করার ইবাদত। আমাদের অকালে মৃত্যুবরণকারী একজন তরুণ কবি গোলাম সাফদার সিদ্দিকীর একটি কবিতার নাম 'আমি 'শিশু, যীশু, পশু'। নাম থেকেই বোঝা যায় মানুষের মধ্যে 'সু' ও 'কু' প্রবৃত্তির সমাবেশ কীভাবে ঘটতে পারে। পাশ্চাত্য জগতের কড়া আইন এবং বিধি-নিষেধ মানুষকে দুষ্কর্ম করা থেকে নিবৃত্ত করে; এটা এক অর্থে যেমন সত্য, আবার সর্বাংশে সত্যও নয়। আমাদের দেশে যারা পাবলিক ফিগার, তারা বহু অনাচার, পাপাচার করেও পার পেয়ে যায়, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের পাবলিক ফিগাররা লোকচক্ষুর আড়ালে যত পাপাচার ও অনাচারই করুক না কেন, ব্যাপারটি একবার ফাঁস হয়ে গেলে তাকে পাবলিক স্ক্রুটিনির সম্মুখীন হতে হয় এবং এক ধরনের জবাবদিহিতা করতে ও লোকলজ্জার কারণে পাবলিক ফিগারদের সংযমী হতে হয়। আমাদের আলেম সমাজ পাপকর্মের জন্য কেবল দোজখের ভয় দেখিয়ে বাকি কাজটুকু সারেন না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লা যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি জানেন, মানুষের মধ্যে 'সু' এবং 'কু' এই দু'টি প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব মানুষকে কীভাবে ক্ষতবিক্ষত করবে। আর সেজন্যই আল্লাহর নির্দেশিত পরিপূর্ণ বিধানে নেকী এবং গুনাহর সীমারেখা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আল্লাহ এও বলেছেন, কুল মখলুকাতে তার সকল সৃষ্টি মানুষেরই জন্য। কিন্তু মানুষ আল্লাহর নিয়ামতকে কদর করতে ব্যর্থ হয়ে পাপের পথে যাতে না এগোয় সেজন্য আল্লাহ বারবার সাবধান করে দিয়েছেন। পাপের পথে গেলে শাস্তির কঠোরতাও তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছেন। মানব সৃষ্ট সমাজ আল্লাহর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করতে পারবে বলে ভাবাটা অকল্পনীয়। মানুষকে তার কুপ্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করার জন্য একদিকে যেমন কঠোর জাগতিক বিধানের প্রয়োজন, তেমনি এর পাশাপাশি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুশীলন করাও প্রয়োজন এবং সবচেয়ে বড় কথা হল, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ যে শ্রেয়বোধ দিয়েছেন, তাকে যথোচিতভাবে ব্যবহার করার জন্য মানুষ যেন সকল উদ্যোগ গ্রহণ করে। একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার, মানুষের দায়বদ্ধতা শুধু সমাজের কাছে নয়, আল্লাহর কাছেও বটে। সবকিছুর ওপরেই একমাত্র কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব হচ্ছে আল্লাহর। মানুষ অনেক সময়ে এ বিষয়টি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং নিজেকে অতি প্রাকৃতিক সত্তা ভেবে মানুষের ওপরই মনুষ্যত্ব বিবর্জিত অমানবিক আচরণ করে। এ আচরণ কখনোই আল্লাহ্ বরদাশত করতে পারেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির বিধান। এই উপলব্ধি এবং এই অনুভূতি সঞ্চারিত করে নৈতিকতার ও প্রেমময়তার একটি নবপ্রাণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেই আমরা নিশি, মৌসুমী, তানিয়া, শবমেহেরসহ সকলের প্রতি যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে আসছি, তা পরিহার করতে পারব। চমক সৃষ্টি করার জন্য সময়ে সময়ে- যেমন মেধাবী ছাত্র রুবেলের হত্যাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন করার নামে যেভাবে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছি ফায়দা লোটার কারণে- তা আমরা উপলব্ধি করলেই আমাদের মধ্যে যে ভণ্ডামি রয়েছে, তা বিদূরিত হবে।

মাহবুব উল্লাহ :

মানুষ হিসেবে যখন জন্মগ্রহণ করেছি তখন পদস্খলন হবে না, এ কথা তো আমরা জোর দিয়ে বলতে পারব না। তবে যদি প্রকৃতই আমরা অনুতপ্ত হই, আত্মবীক্ষণে সমর্থ হই, তাহলেই এ পৃথিবীকে আমরা মানুষের জন্য নিরাপদ করে তুলতে পারব। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন মানুষ সৃষ্টি করা, যে মানুষ অনুতপ্ত হয়, আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ হয়।

www.pathagar.com

১৬ সেপ্টেম্বর ২০০০

শেখ হাসিনার দেশদ্রোহিতা?

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিছু গৎবাঁধা বুলি চালু আছে। বছরে এমন কোন দিন নেই, যেদিন রাজনীতিকরা তাদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে এই বুলিগুলো ব্যবহার করেন না। এগুলোর মধ্যে রয়েছে–'স্বাধীনতার সপক্ষ-বিপক্ষ শক্তি', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা', 'রাজাকার-আলবদর', 'মৌলবাদী গোষ্ঠী', 'দেশদ্রোহী', 'রাষ্ট্রঘাতী', 'দেশঘাতী', 'পাকিস্তানের দালাল', 'ভারতের দালাল', 'তাঁবেদার', 'পরাজিত শক্তি', 'ঘাতক-দালাল', 'সাম্প্রদায়িক অপশক্তি', 'ইসলামবিরোধী' এবং আরও কত কি। যারা এসব বচন ব্যবহার করেন, তারা এগুলোর মর্মার্থ কতটুকু উপলব্ধি করেন, সে ব্যাপারে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। অনেক সময় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা, প্রতিপক্ষের ওপর অপবাদ দেয়া এবং প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই এসব বচন ব্যবহার করা হয়। তবে, সব সময় নিরর্থকভাবে এগুলো ব্যবহার করা হয় এমন কথা বলা যাবে না। 'রাজাকার' শব্দটির একটি সাম্প্রতিক সংস্করণ হচ্ছে 'নব্য রাজাকার'। যারা একাত্তর সালে দেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এমনকি স্বাধীনতা যুদ্ধের 'সোলএজেন্ট' আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং সে সময় মনে-প্রাণে আওয়ামী রাজনীতির বক্তব্যগুলো বিশ্বাস করতেন, এমনকি সে সময়কার একটি জনপ্রিয় স্লোগান 'জয় বাংলা'র Coining করেছিলেন– তাঁরা যখন দেখতে পেলেন, আওয়ামী লীগ জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করছে না, এবং জন্মলগ্ন থেকে এর প্রচারিত আদর্শ গণতন্ত্র থেকে সরে এসে একদলীয় কর্তৃত্বপরায়ণ বাকশালী শাসন কায়েম করে এবং বহু মুক্তিযোদ্ধার প্রাণনাশ ঘটায়, তখন এদের মোহভঙ্গ ঘটে এবং এরা আওয়ামী বিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। আর যায় কোথায়– যেই মুহূর্তেই আওয়ামী বিরোধিতা, সেই মুহূর্তেই তকমা জুটলো 'নব্য রাজাকার'। ওদের সাথে যেসব 'রাজাকার' শামিল থাকেন, তারা হয়ে ওঠেন 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র বর্তিকাবাহী; অন্যদিকে খাঁটি মুক্তিযোদ্ধাও হয়ে যান আওয়ামী বিরোধিতার কারণে 'নব্য রাজাকার'। আওয়ামী লীগ গোলাম আযমের জামায়াতে ইসলামী ও এরশাদের জাতীয় পার্টির সাথে একাট্টা হয়ে '৯১-এর সর্বমহলে প্রশংসিত নির্বাচনে জয়লাভকারী বিএনপির বিরুদ্ধে যখন আন্দোলনের নামে জ্বালাও পোড়াও করে ও বন্দর স্তব্ধ করে দেয়, রাজপথ-রেলপথে অবরোধ রচনা করে, ব্যাংকে অগ্নিসংযোগ করে, বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত সরকারী স্থাপনাগুলো ভাঙচুর করে, রাজপথে পথচারীকে দিগম্বর করে মানবতার সবচেয়ে জঘন্য লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটায়, তখন তা নীতিবিরুদ্ধ নয়; সেটা হল 'জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার' প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

১৯৯৬ সালে দীর্ঘ একুশ বছর পর জাতীয়তাবাদী শক্তির রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ে জাতীয়-আন্তর্জাতিক কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হবার পর চারদিকে নাশকতামূলক তৎপরতা আবিষ্কার করছে। কখনও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে ফেলার ষড়যন্ত্র, কখনও রকেট লাঞ্চার যোগাড় করে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র, কখনও নূরুল আবছার নামে বিদেশে চাকরিরত নির্দোষ যুবককে ভয়ানক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হিসেবে গ্রেফতার ও হয়রানি, কখনও হরকাতুল জেহাদের কথিত সশস্ত্র মহড়ার কাহিনী, কখনও ছিয়াত্তর কেজি ওজনের বোমা উদ্ধার, কখনও সরকারপন্থী পত্রিকার কার্যালয়ে ব্রিফকেস বোমা উদ্ধারের কাহিনী– সবই যেন একই সূত্রে গাঁথা। এতসব মারাত্মক অপরাধের আলামত পাওয়া যাচ্ছে অথচ সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের টিকিটিরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না; এ কেমন কথা? ফ্যাসিস্টরা নিজেরাই নানারকম নাশকতামূলক কাজ করে তার দায় তাদের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল প্রতিপক্ষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে হত্যা ও

www.pathagar.com

নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে যেমন মওকা খুঁজতো এবং বাস্তবেও তা করেছিল, এমন ঘটনা আমরা ইতিহাস থেকে জানি। পূর্ববর্তী 'সরাসরি' পাতার এক সংখ্যায় হিটলার কী করে জার্মানীর পার্লামেন্ট রাইখস্ট্যাগে অগ্নিসংযোগ করে কমিনিউস্টদের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা বলে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে অসংখ্য কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রীদের নির্মূল করেছিলো সে ঘটনা আমরা বিবৃত করেছি।

আমাদের এই বাংলাদেশে সংসদ ভবনে অগ্নিসংযোগের মত মারাত্মক ঘটনা না ঘটলেও সরকারের বিরোধী মতের এক রাজনীতিকের বাড়ীর চূড়ায় গত ১৪ আগস্ট পাকিস্তানী পতাকা উড়তে দেখা গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর পতাকা যখন উড়লো সেই মুহূর্তে পুরাতন ঢাকার ঐ ভবনটির ছবি তোলার জন্য প্রেস ফটোগ্রাফার যেন দাঁড়িয়েই ছিলেন। একটি স্বাধীন দেশে আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা ব্যতিরেকে বিদেশী পতাকা উড্ডয়ন করা হবে, এমনটি ভাবা যায় না। বিদেশী দূতেরা তাদের গাড়ীতে তাঁদের জাতীয় পাতাকা ব্যবহার করতে পারেন। বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানরা এদেশ সফরে আসলে তাঁদের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে পারেন। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার উদ্দেশে গঠিত মৈত্রী সমিতিগুলোও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে নিজ দেশ ও অন্যদেশের পতাকায় মঞ্চ শোভিত করতে পারে। বিদেশ থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথিরা এলে স্কুলের বাচ্চারা সেই দেশের ও নিজ দেশের পতাকা নেড়ে অন্যের অতিথিকে সংবর্ধনা জানায়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই এসব আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়। তবে কোন প্রাইভেট সিটিজেন তার বাড়ীতে অন্য রাষ্ট্রের পতাকা ওড়াবেন, এমনটি কাম্য নয় এবং ধৃষ্টতাও বটে। তবে, কেউ যদি ঐ ব্যক্তিকে ঝামেলায় ফেলার জন্য এমনটি করে থাকেন, তাহলে সে ঘটনাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই ধরে নিতে হবে। দেশে আজ একের পর এক উদ্ভট ঘটনা ঘটছে। চট্টগ্রামে ৮ জন খুন হল, যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণে বহু লোক মারা গেল। উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের আগে কোন একজনকে দেখা গেছে সেই অনুষ্ঠানের অতিথি হাসান ইমামের কানে কানে কিছু বলতে। এ ঘটনার পরপরই হাসান ইমাম অনুষ্ঠান ত্যাগ করে চলে যান এবং মর্মান্তিক বিস্ফোরণটি ঘটে। এ নিয়ে তদন্ত চলেছে, মামলাও দায়ের হয়েছে। এখন বিচারের অপেক্ষা। পার্বত্য চুক্তি যখন করা হয়, তখন ঢাকার এক দর্জির দোকান থেকে ভারতীয় পতাকা উদ্ধার করা হয়েছিল এবং টেলিভিশনে এগুলো তৈরীরত জনৈক ব্যক্তির ভিডিও ছবিও দেখানো হয়েছিল। তখন সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, বিরোধী দল পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শান্তি চুক্তি'কে কেন্দ্র করে এসব ভারতীয় পতাকা উত্তোলনের ষড়যন্ত্র করেছিল সরকারকে অপ্রস্তুত করার জন্য। কিন্তু এর পর অদ্যবধি ভারতীয় পতাকা যে বা যারা তৈরী করছিল, তাদের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তা জানা যায়নি। হিটলার-মুসোলিনীর কিছু কিছু কৌশল আওয়ামী লীগ যে চমৎকারভাবে করায়ত্ত করেছে, এসব তারই দৃষ্টান্ত।

গোয়েন্দা বিজ্ঞানে Disinformation campaign বলে এক ধরনের কৌশলের উল্লেখ আছে। এর অর্থ হল– মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে প্রতিপক্ষকে অপ্রস্তুত করা ও বেকায়দায় ফেলা। যুদ্ধের সময়ে এ ধরনের কৌশল নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়। এর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হল প্রতিপক্ষের মনোবল ভেঙে দেয়া। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে মার্কিন প্রচার মাধ্যমগুলো প্রায় প্রতিদিনই মার্কিনীদের হাতে কতজন ভিয়েতকং গেরিলা নিহত হয়েছে, তার সংখ্যা প্রচার করত। এরকম সংখ্যা যোগ করে দেখা গেল, ভিয়েতনামে কোন মানুষেরই বেঁচে থাকার কথা নয়।

Disinformation campaign-এর বুজরুকী অনেকটা এই ধরনের। হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস বলতেন, "একটা মিথ্যাকে শতবার উচ্চারণ করলে তা মানুষের কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়"। বর্তমান সরকারের আমলে মিথ্যা প্রচারের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে জনমতকে নিজেদের পক্ষে রাখা– নিদেনপক্ষে Confuse করে দেয়ার একটা নোংরা কৌশল অনুসৃত হচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের স্বচ্ছতার নীতির চূড়ান্ত বরখেলাপ। পুরাতন ঢাকার রাজনীতিক জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল এখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কারাগারে আছেন। কারণ, 'তার বাড়ীতেই পাকিস্তানী পতাকাটা উড্ডয়ন করা হয়েছিল'।

www.pathagar.com

বাংলায় যাকে আমরা বলি রাষ্ট্রদ্রোহিতা, ইংরেজীতে তাকে বলা হয় Treason. Treason সম্পর্কে Encyclopaedia of the Social Sciences (ত্রয়োদশ মুদ্রণ ১৯৫৯, প্রকাশক Mac Millan Company) গ্রন্থে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে ঃ "Treason is essentially a violation of allegiance to the community; it is the one natural crime, punishable at all times and in all types of social organization. In early history the concept of treason was sufficiently broad to include along with betrayal to an external enemy any act which threatened the safelty of the group." Treason সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে নানামুখী ব্যাখ্যা রয়েছে। English law অনুসারে Treason-এর ব্যাখ্যা ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে ভিন্ন ধরনের। তার একটা কারণ Treason-এর সংজ্ঞা ইংল্যান্ডে অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ আগে নির্ধারিত হয়েছিল। রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময়ে ১৩৫০ সালে Statute of Treason পাস করা হয়েছিল। এটাই সেদেশে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা Treason-এর ভিত্তি। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল King's Court যাতে খামখেয়ালিভাবে রাজার মনঃপুত নয়, এমন কাজকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে চিহ্নিত করার অবকাশ না পায়। এই আইন অনুসারে ঘোরতর রাষ্ট্রদ্রোহিতা হল– Lord the King অথবা Our Lady, His Queen, অথবা Their eldest son and heir-এদের মৃত্যু ঘটানো অথবা মৃত্যুর কল্পনা করা, রাজা ও তার রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া; রাজার শত্রুদের স্বার্থসিদ্ধি করা, রাজার সীলমোহর ও মুদ্রা জাল করা, দেশে জাল টাকা আমদানী করা, চ্যান্সেলরকে হত্যা করা, ট্রেজারারকে হত্যা করা অথবা রাজার বিচারকমন্ডলীর কাউকে হত্যা করা, রাণীর অথবা রাজার অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ কন্যার শ্লীলতাহানি করা অথবা রাজার জ্যেষ্ঠ্যপুত্রের স্ত্রীর ও তাদের উত্তরাধিকারীদের শ্লীলতাহানি করা। মামুলি রাজদ্রোহিতার অপরাধের মধ্যে ছিল– চাকর কর্তৃক মুনিবকে হত্যা করা, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে হত্যা করা এবং বিশপ বা তদকর্তা উচ্চপদস্থ খ্রীস্টীয় যাজককে একজন ধর্মনিরপেক্ষ বা ধার্মিক ব্যক্তি কর্তৃক হত্যা করা। এই Statute-এ রোমান ও জার্মান উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। রাজা এখানে রাষ্ট্রের সাথে একাত্ম। সুতরাং তাকে আক্রমণ করা, তার মুদ্রা জাল করা, তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হত্যা করার অপরাধের মধ্য দিয়ে আমরা রোমান প্রভাব লক্ষ্য করি। অন্যদিকে ঘোরতর ও মামুলি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা জার্মান প্রভাব প্রত্যক্ষ করি। এর মর্মার্থ হল– রাজা ছাড়াও কোন ব্যক্তি অন্য কোন মানুষের অনুগত হতে পারে। আর এই আনুগত্য লংঘন করা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। মামুলি রাষ্ট্রদ্রোহিতার আইন ১৮২৮ সালে রহিত করা হয়। রাজকীয় নারীকূলের সম্ভ্রমহানির উপাদানটিও এসেছে জার্মান ও সামন্তবাদী উৎস থেকে। এরকম কাজ রাজা ও উর্ধ্বতন প্রভুদের প্রতি কর্তব্যে অবহেলার নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত। এডওয়ার্ডের Statute-এ রাজাকে আহত করা, বিকলাঙ্গ করা, ক্ষমতাচ্যুত করা অথবা বন্দী করা অথবা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করা উল্লিখিত হয়নি। এই Statute-এ দেশের ভেতরে রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটান কিংবা বিদেশী শত্রুর সহযোগিতায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মধ্যে সীমারেখা টানা হয়নি। যাই হোক, বিভিন্ন সময়ে এই Statute-এর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

আমাদের দেশে Penal Code-এ রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারাটি আমরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক Penal Code-এর সুবাদে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। ১৯৭১-এর মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে পাকিস্তানী পতাকা পোড়ানো হয়েছিল। পাকিস্তানী রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাজ ছিল জঘন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা। আর স্বাধীন বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে কাজটি অত্যন্ত বৈপ্লবিক। তেমনি পাকিস্তান রাষ্ট্র বহাল থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডয়ন ছিল তৎকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার দৃষ্টিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতা। মজার ব্যাপার হল, একজন রাষ্ট্রদ্রোহী যখন রাষ্ট্রদ্রোহিতা করে তার উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হন, তখন তাকে জয়মাল্যে ভূষিত করা হয়। আর যখন সে ব্যর্থ হয়, তখন তার গ্রীবাদেশে ফাঁসির রুজ্জু পরানো হয়। অথবা ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানো হয়। একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু ছাত্র তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মার্কিন পতাকাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল। এ নিয়ে মার্কিন বিচার বিভাগ শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

পতাকা ভস্মকারীদের নিরপরাধ গণ্য করেছিল। রাষ্ট্রের অবস্থা ও তার প্রতি হুমকি কত মারাত্মক তার ওপর নির্ভর করে কোন্ কাজ রাষ্ট্রদ্রোহিতা, আবার কোন্ কাজ রাষ্ট্রদ্রোহিতারূপে বিবেচিত হবে না। আমি বাংলাদেশের একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক, বাংলাদেশের পতাকা ও এর রাষ্ট্রীয় প্রতিকৃতির সম্মান অম্লান থাকুক তা মনেপ্রাণে কামনা করব এবং কারুর দ্বারা এর অসম্মান হোক, তা কখনই অবচেতন মনেও কামনা করব না। বাংলাদেশ গুনান মির্ডালের ভাষায় একটি Soft State বা কোমল রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্বের ভিত এখনও দৃঢ়মূল হয়নি। সুতরাং এই রাষ্ট্রের প্রতি যে কোন প্রকার অবজ্ঞা, অবহেলা, আনুগত্যের দোদুল্যমানতা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক বলেই বিবেচিত হবে এবং এ ধরনের কোন কাজকে ignore করা সুবিবেচনাপ্রসূত হবে না। তবে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাউকে ঘায়েল করা হলে সেটাও হবে জাতীয় সংহতির জন্য ক্ষতিকর।

আমেরিকায় কেউ জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে আমেরিকার মত গণতান্ত্রিক ও বহুত্ববাদী সমাজে রেহাই পেতে পারে মূলত গণতান্ত্রিক ঔদার্য ও সহনশীলতার কারণে। আমেরিকা Soft State নয়, কাজেই আমেরিকা অনেক লঘু রাষ্ট্রদ্রোহিতাস্বরূপ কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব না দিয়েও এর সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্বের প্রশ্নে নির্বিকার থাকতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের অতটা উদার হওয়ার সুযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিএনএন-এ একটি জীবন্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারে দু'জন ভারতীয় নাগরিক অত্যন্ত আপত্তিকর দু'টি প্রশ্ন রেখেছিল। এর একটি হল– আগের অঙ্গীকার মোতাবেক বাংলাদেশ কখন ভারতের সঙ্গে অঙ্গীভূত হবে? আর দ্বিতীয়টি হল– ভারত ও বাংলাদেশ কখন অভিন্ন মুদ্রা চালু করবে? প্রথম প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি করেননি। আমার দেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে যদি এই ধরনের চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়, তাহলে একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে আমি স্বভাবতই আশা করব, আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে এ ধরনের প্রশ্নকারীদের ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের জন্য কঠোরতম ভাষায় retort করবেন। আমি আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাধীন-সার্বভৌম, আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরূপেই দেখতে চাই। দেশে ফিরে তিনি বললেন, তিনি নাকি 'কূটনৈতিক কাদায়' এই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছেন। আমার দেশকে অন্যদেশের অঙ্গীভূত করার ধারণাকে 'কূটনৈতিক কায়দায়' এড়িয়ে যাওয়া ও তিরস্কার না করা হয় অর্বাচীনতা, নতুবা দেশদ্রোহিতা। এখন প্রশ্ন হল, এদেশের কোন আদালত কি এই আচরণকে দেশদ্রোহিতা হিসেবে আমলে নেবে? আমাদের বিচার বিভাগ কতটা স্বাধীন? উল্লেখ্য, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণের সময় অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি এই দেশ ও সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকবেন।

আফতাব আহ্‌মাদ :

জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে হাসিনার সরকার একটি বিরাট চমক সৃষ্টি করেছে। স্বীকার করতেই হবে, ভদ্রমহিলা জাতিকে তার দেয়া বচন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন। বিরোধী দল থেকে সংসদ সদস্য ছিনতাইয়ের পালা যখন তিনি শুরু করেন, তখনই, তিনি জাতির কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন; 'এ কী দেখেছেন? এর চাইতেও বড় চমক আরো আছে। যথাসময়ে জাতিকে একের পর এক চমক উপহার দেয়া হবে।' তাঁর অঙ্গীকার পালন করতে কিনা, জানিনা, তবে জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ দায়ের করে দেশপ্রেমের প্রতিযোগিতায় হাসিনার সরকার সত্যিই অত্যাশ্চর্য চমক সৃষ্টি করেছেন। কথায় বলে, 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।' দেশপ্রেম এবং আওয়ামী লীগ– এ দুটি কখনোই একসঙ্গে যেতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ একাত্তর থেকে পঁচাত্তর এবং '৯৬ থেকে আজতক আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রঘাতী, দেশদ্রোহী এবং গণবিরোধী ভূমিকা দেখে এ বিষয়ে অন্তত নিশ্চিত হতে পেরেছে যে, রাষ্ট্রক্ষমতায় আওয়ামী লীগকে অধিষ্ঠিত রাখা আর বাংলাদেশকে ভারতের কাছে সরাসরি বন্ধক দেয়া সমার্থক। এ যদি অসত্য হবে, তাহলে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের প্রধানমন্ত্রী কী করে আরেকটি দেশের একটি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নির্লজ্জভাবে প্রধান অতিথি হয়ে গমন করতে

www.pathagar.com

পারেন? শুধু তাই নয়, ঐ বইমেলায় যখন বারংবার হাসিনাকে বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলে সম্বোধন করা হয়, তখন একবারের জন্যও প্রতিবাদ করাতো দূরের কথা হাসিনার মুখে অক্ষুণ্ণ ছিল বেহায়ার হাসি। দেশে ফিরে এসে ভারতীয়দের সমর্থনে সাফাই গেয়ে তাঁর এই বেহায়াপনার চরম চমক সৃষ্টি করেন। রাষ্ট্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার অপরাধে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে ব্যঙ্গ করার অপরাধে এবং প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্য এদেশের কোন সুনাগরিক কোন মামলা রুজ্জু করেননি এবং সুপ্রীম কোর্টও কোন সুয়োমোটো মামলা দায়ের করেনি।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংসদ বা ক্যাবিনেটে আলোচনা করার পরিবর্তে পারিবারিক কুচক্রীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে যারা জাতীয় নীতি নির্ধারণ করে থাকে, তাদের মুখে আর যা-ই শোভা পাক দেশপ্রেমের ধ্বনি শোভা পায় না। জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যসত্য সম্পর্কে আমরা এখনই মন্তব্য করতে চাই না; তবে লক্ষ্যণীয় বিষয়, তিনি হাসিনার নেতৃত্বাধীন 'ঐকমত্যের' সরকারের অন্যতম শরীক দল জাতীয় পার্টির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। জাতীয় পার্টি এরশাদের নেতৃত্বে (এবং জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল এরশাদকেই নেতা মান্য করেন) 'ঐকমত্যের সরকার' থেকে বেরিয়ে এলে হাসিনার সমস্ত ক্রোধ মাত্রাজ্ঞান ছাড়িয়ে জাতীয় পার্টির ওপর নেমে আসে।

তিরিশ বছরের চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গাকে ভারতীয় নদীতে পরিণত করা কি দেশদ্রোহিতা নয়? ঐ মামলা কে ঠুকবে? চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি আনয়নের নামে ভারতের সঙ্গে অলিখিত চুক্তির দ্বারা শরণার্থীদের বাইরেও যেসব ভারতীয় সামরিক প্রশিক্ষিত চাকমাদের বাংলাদেশের ঠাঁই দেয়া হলো, এটা কি রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়? এই জঘন্য অপরাধের বিচার কে করবে?

হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭৪-এ অর্পিত অনাবাসী সম্পত্তি আইন প্রণয়ন করেন। মুজিবের কন্যা হয়ে হাসিনা কী করে তাঁর মন্ত্রীদেরকে পিতার এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে হুংকার ছোঁড়ার জন্য লেলিয়ে দিতে পারেন? হাসিনা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চান ভাল কথা, কিন্তু তিনি নিজে মুজিবের যা কিছু অর্জন ও কৃতিত্ব, তা হত্যা করার দুঃসাহসী প্রণোদনা পান কোন্ কাশিমবাজারের কুঠি থেকে?

ভারতীয়দের তুষ্ট করতে গিয়ে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পদলেহন করতে গিয়ে নিজের মান-মর্যাদার কথাই যে তিনি শুধু বিস্মৃত হয়েছেন তাই নয়, এদেশের মুসলমান নারীর সম্ভ্রম ও আব্রু বিসর্জন দিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। তা না হলে শান্তি নিকেতনে 'দেশিকোত্তম' উপাধি গ্রহণ করার নামে বেগানা পুরুষের হাতে সীমন্তে এবং ললাটে সিঁদুর এবং চন্দন কী করে চর্চন করতে দেন?

সম্প্রতি এদেশের কিছু লোক, যাদের দেহ পড়ে আছে এখানে, কিন্তু প্রাণ রয়েছে ভারতে, তাদের বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ করে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-এর অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কয়েকটি সংগঠনের তরফ থেকে প্রকাশ্যে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট অঞ্চল নিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের হুমকি দেয়া হয়েছে। হুমকিদাতাদের প্রত্যেকের নাম ভারতীয় অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত ও সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে ত্বরিতবেগে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ দায়ের করতে হাসিনার সরকারকে তৎপর হওয়াতো দূরের কথা, উচ্চবাচ্য করতেও শোনা যায়নি। এর ফলে বিজেপির প্রেতাত্মা, এদেশীয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর আস্ফালন সকল সহ্যসীমা অতিক্রম করে গেছে। আসকারা পেয়ে এরা এখন ভারত থেকে, পঞ্চাশ লাখ হিন্দুকে বাংলাদেশে এনে পুনর্বাসনের আবদার করার নামে হাসিনাকে সরাসরি হুমকি দিচ্ছে– 'আগামীতে গণেশ উল্টেও যেতে পারে'। হাসিনার সরকারকে এ ব্যাপারে টুশব্দটি করতে এখন পর্যন্ত শোনা যায়নি।

হাসিনার সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে জাতীয় নিরাপত্তাজনিত স্পর্শকাতর পদসমূহে ঢালাওভাবে একটি সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়োগ এবং নীতিনির্ধারণী পদসমূহে সেই সম্প্রদায়ের লোকদের দ্রুত পদোন্নতি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নাশকতা এবং অন্তর্ঘাতকে উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে। এই রাষ্ট্রদ্রোহী ও রাষ্ট্রঘাতী কার্যকলাপের জন্য হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে দণ্ড দেবে কে?

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংকের মত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে ঢাকার বাইরে থেকে একটি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যার ব্যাংকিং, মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতি সম্পর্কে 'ক' অক্ষর জ্ঞানও নেই। কিন্তু ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-এর সঙ্গে তাঁর নিবিড়সম্পর্কের বহু পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেশের মুদ্রাব্যবস্থা ও পুঁজির বাজার ধ্বংস করার জন্য এই দেশদ্রোহী পদক্ষেপই কি যথেষ্ট নয়?

সম্প্রতি নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘ অধিবেশনে যোগদান করতে গিয়ে সিএনএন-এর এক অনুষ্ঠানে হাসিনা যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে, একটি সুগভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এবং একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৬-এ হাসিনার নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রঘাতী চক্রটিকে এদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। এতদিন যা ছিল মানুষের আঁচ-অনুমান ও জল্পনা-কল্পনার আওতাভুক্ত, সিএনএন তা থলি থেকে বের করে সর্বসমক্ষে হাসিনার মুখোশটি ছিঁড়ে ফেলেছে। হাসিনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে অভিন্ন মুদ্রা চালু করার কথা ছিল, তার কী হল? হাসিনা যে উত্তর দিয়েছেন, তা এখানে আলোচনা করা নিরর্থক; প্রশ্নের ধরন থেকেই বোঝা যায় যে, ক্ষমতায় আসার আগেই কোন এক 'কাশিমবাজারের কুঠি'তে ভারতীয় প্রভুদের সঙ্গে হাসিনার একটি গোপন সমঝোতা হয়েছিল। হাটে হাঁড়ি ভেঙে ক'দিন আগেও চাকমা নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমাও দাবী করেছিলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে তার এবং হাসিনার মধ্যে দুটি চুক্তি সম্পাদিত হয়– একটি লিখিত এবং একটি অলিখিত। সিএনএন-এর প্রশ্নের ধারা থেকেও এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভারতীয়দের কাছে রাষ্ট্রঘাতী মুচলেকা দিয়েই হাসিনা ক্ষমতাভোগের পাকা বন্দোবস্ত করেছিলেন। সিএনএন-এর দ্বিতীয় প্রশ্নটি আরও বিস্ময়কর এবং গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। হাসিনা ক্ষমতায় আসার আগে এদেশবাসী সিঙ্গাপুর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ভাসাভাসাভাবে যৎকিঞ্চিত শুনেছিল এবং আমরাও দুয়েকটি মুদ্রিত দলিলের সন্ধান পেয়েছিলাম, যেখানে লক্ষ্য করা যায় যে, হাসিনাচক্র ভারতের কাছে বাংলাদেশকে তুলে দেয়ার নানান ধরনের অঙ্গীকার করেছিল। ওই অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতা ধরেই ট্রানজিটের নামে ভারতকে মিলিটারী করিডর দেয়ার প্রসঙ্গটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয় এবং চট্টগ্রাম বন্দরটি ভারতের কাছে ইজারা দেয়ার কথাবার্তা চলে। 'উন্নয়ন চতুর্ভুজ', 'উন্নয়ন ত্রিভুজ' ইত্যাদি উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার বলয় সৃষ্টির নামে বাংলাদেশকে ভারতের ইউনিয়নভুক্ত করার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে যোগাযোগ কর্মজালের সমুন্নয়ন, প্রসার ও পুনর্বিন্যাসের যে উদ্যোগ আমরা বারংবার লক্ষ্য করি, তারও উদ্দেশ্য একই– বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গীভূত করে ফেলা। সিএনএন-এর প্রশ্নটি এই সূত্র ধরেই হাসিনাকে সরাসরিভাবে করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশ কবে নাগাদ ভারতীয় ইউনিয়নভুক্ত হবে? এ ধরনের চরম আপত্তিকর ও রাষ্ট্রঘাতী প্রশ্নের বিষয়ে আপত্তি তোলা বা প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে হাসিনা কৌশলে প্রশ্নটি এড়িয়ে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বিরাজমান সম্পর্ক অত্যন্ত মধুময় ও সুখকর। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা যদি কারও বিরুদ্ধে করতে হয়, আজ সে মামলা করা উচিত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। সংবিধান সংরক্ষণ, সমর্থন ও প্রতিপালনের অঙ্গীকার নিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বটা যারা গ্রহণ করেছে, আজ প্রকাশ্যে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ধীর সন্তর্পণে বাংলাদেশের অস্তিত্বকে লুপ্ত করে দেয়ার যে হীন ও দেশদ্রোহী পরিকল্পনাভিত্তিক ষড়যন্ত্র চলছে, তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে জনতার ইস্পাত কঠিন প্রতিরোধ ও জঙ্গী জাতীয় ঐক্য। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, চোরের মার বড় গলা। দেশকে যারা কুমড়ো, তরমুজ এবং আনারসের মত ফালি ফালি করে দেশের দুশমনদের কাছে কিস্তিতে কিস্তিতে পালাক্রমে বিক্রয় করার কবিরাহ গুনাহ সমতুল্য দায়িত্ব নিয়েছে তাদেরকে এদেশের পুণ্যমাটি থেকে সমূলে সমুৎসাদন করা না হলে এদেশের মানুষ এবং পরম স্রষ্টাও আমাদের কোন দিন ক্ষমা করবে না। তাই, আসুন সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জাতীয় পুনর্সম্ভাবনার রাজনীতির ওপর ভর করে এদেশ থেকে রাষ্ট্রঘাতীদের আগাছা ও জঞ্জাল সাফ করার কাজে এখনই ব্রতী হই।

www.pathagar.com

২৩ সেপ্টেম্বর ২০০০

নতুন শতাব্দীর জন্য প্রস্তুতি

মাহবুব উল্লাহ :

১৯৬২ সালে মাস কমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞ ম্যাক লুহান পরিভাষার ক্ষেত্রে একটি নতুন শব্দ চয়ন করেছিলেন। শব্দটি হলো Global village অর্থাৎ পৃথিবীটা যেন একটি গ্রাম। একটি গ্রামের গণ্ডি যেমন সীমাবদ্ধ, সেখানে যারা বসবাস করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তেমনি নিবিড়। সবাই সবার পরিচিত। সকলে সকলের যেন আত্মীয়। টেলিভিশন খুললেই বিমানের বিজ্ঞাপনে প্রচারিত হয়– 'ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী'। পৃথিবীর এই ছোট হয়ে আসাটা তার পরিসরের ছোট হয়ে আসা নয়; উন্নত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার ফলে পৃথিবীর এই ছোট হয়ে আসার প্রক্রিয়াটি গত ৫০০ বছর ধরে অব্যাহত আছে এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ছোট হয়ে আসাটা ত্বরান্বিত হচ্ছে। আর সে কারণেই পৃথিবী যেন গ্রামসদৃশ হয়ে পড়ছে। আমরা নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করছি, প্রবেশ করছি নতুন সহস্রাব্দে। নতুন শতাব্দীতে, নতুন সহস্রাব্দে আমাদের এই পৃথিবীতে আসবে এক বিশাল ও ব্যাপক পরিবর্তন। প্রযুক্তি ও মানবজাতির ক্রমবর্ধিষ্ণু জ্ঞানভাণ্ডারই হবে এই নতুন দিনের চালিকাশক্তি।

আমাদের এই বাংলাদেশে নতুন শতাব্দীর অর্গল যখন অবারিত হচ্ছে, তখন আমরা সময়ের এই নতুন দিগন্তে প্রবেশ করার জন্য কতটা প্রস্তুত? কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় এবং মানব নিরাপত্তাসহ কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের সাফল্য উল্লেখ করবার মতো নয়। আমাদেরকে অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে, উন্নত বিশ্বের কাছাকাছি পৌছাতে হলে শতবর্ষের পশ্চাদপদতাকে অতিক্রম করে উর্ধ্বশ্বাসে প্রগতি ও অগ্রগতির পথে ছুটতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, এ কোনো চেনা পথ নয়। যে পথে আমরা পা ফেলতে যাচ্ছি, তা অতীতের পদচিহ্ন আঁকা কোনো পরিচিত পথের সঙ্গে মোটেও তুলনীয় নয়। সে কারণে এর জন্য নিতে হবে সচেতন প্রস্তুতি। প্রতিষ্ঠা করতে হবে যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম, এমন নেতৃত্বের ভূমিকা।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চশিখরে যেসব দেশ পৌঁছেছে, সেসব দেশ এই উন্নতি অর্জন করেছিলো জমি, পুঁজি ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই উৎপাদনের এসব প্রচলিত উপাদান গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। পৃথিবী ছোট হয়ে আসার কারণে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খাদ্যসামগ্রী, পুঁজি ও অন্যান্য পণ্যের প্রবাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বাধামুক্ত হওয়ার ফলে পরিস্থিতির এই গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক পুঁজির বাজারে লাভজনক প্রকল্পের জন্য পুঁজির সরবরাহ বিদ্যমান। প্রধানত প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়, তা আজ মধ্যপ্রাচের দেশগুলোসহ কয়েকটি দেশের মধ্যেই সীমিত। বস্তুগত সম্পদের পরিবর্তে পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে গুণগত সম্পদ দৃষ্টিগ্রাহ্য গুরুত্ব অর্জন করেছে। Quality. Organisation. Motivation এবং Sense of discipline এখন উৎপাদনের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর গুরুত্ব অর্জন করছে। মানবিক দক্ষতা এখন শিল্প খাত, ব্যক্তিগত খাতভিত্তিক সার্ভিস এবং সরকারী খাতের সাফল্যের জন্য অতি আবশ্যিক অনুঘটক। এদিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশে আমরা কেবল পিছিয়ে নেই, আমাদের অস্তিত্বই অনুভূত হয় না। উৎপাদন ও সৃজনশীল খুব কম কাজই আছে, যে ক্ষেত্রে আমরা গুণগত উৎকর্ষের দাবী করতে পারি। এ দেশের বাজারে নতুন যেসব Product আসে, প্রথম দিকটায় মানের দিক থেকে এগুলো তেমন খারাপ থাকে না। ক্ষেত্রবিশেষে বিদেশী পণ্যের সাথে এগুলোর গুণগতমান তুলনীয়। কিন্তু একটু বাজার পেলেই গুণগতমানে ধস নামে। অথচ অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেসব দেশ সফল সেখানে জনগণের ব্যবহার্য প্রতিটি

www.pathagar.com

জিনিস যেদিন বাজারে ছাড়া হয়, সেদিন থেকে ক্রমাগত উৎকর্ষ অর্জন করে। গুণগতমান ছাড়াও সংগঠন, মোটিভেশন ও শৃংখলাবোধের ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ হতাশাব্যঞ্জক। আমাদের দেশের যে শ্রমিক কাজে মনোযোগী নয়, সেই শ্রমিক বিদেশে গেলে প্রাণপাত মেহনত করে ও নিয়োগকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় আত্মনিবেদিত হয়। তাহলে সমস্যাটা মানুষকে নিয়ে নয়, সমস্যাটা মানুষ যে পরিবেশে কাজ করে সেই পরিবেশের মধ্যেই নিহিত। এখানে ছাত্ররা লেখাপড়ায় মনোযোগী না হয়ে সার্টিফিকেট পেতে চায়। পরীক্ষায় অত্যন্ত অনৈতিকভাবে নকলবাজিতে লিপ্ত হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অনেক সময় এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষক ও অভিভাকদের সহায়তা করতে দেখা যায়। এ দেশে চিকিৎসকরা মনোযোগ দিয়ে রোগীর রোগ নির্ণয় করে ব্যবস্থাপত্র দেন না। একই দিনে বহুসংখ্যক রোগী দেখে টাকা-পয়সা রোজগারই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকরা নিয়মিত হাজির থাকেন না। আর শিক্ষক নিয়োগ নিয়েও চলে প্রচণ্ড দুর্নীতি। রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিকৃতি ও বৈকল্যের জন্ম দিয়েছে। অফিস-আদালতে ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। এখানে পুলিশ রক্ষক না হয়ে প্রায়শই ভক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ক্ষমতার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ আছে। এ দেশে আইনগত জটিলতার কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার মামলা-মোকদ্দমা হয়, বিচারপ্রক্রিয়া প্রলম্বিত হয় এবং মামলার বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষই অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজ যে বিশাল পরিমাণ অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত উৎপাদনের কাজে বিনিয়োগ করতে পারতো, তা মামলা-মোকদ্দমার বিরোধে জড়িয়ে কর্পূরের মতো উবে যায়। পরিস্থিতি যে কতটা উদ্বেজনক, তা ফিরিস্তি দিয়ে শেষ করা যাবে না। Life, liberty, property এবং Peace of mind এগুলো হলো মানব কল্যাণের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশে এই কল্যাণ আমরা কতটুকু নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি? অথচ এসব ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না গেলে বৈষয়িক কোনো ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হবে না।

'৮০ ও '৯০ -এর দশক থেকে শিল্প খাতের Mass Production ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব হারাতে শুরু করেছে। সাদামাঠা চোখে দেখলে মনে হবে, Mass Production-এর বৈশিষ্ট্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। W. W. Rostow উন্নয়নের স্তর নির্দেশ করতে গিয়ে সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে State of Mass Consumption এর স্তরটি নির্ধারণ করেছিলেন এবং এই স্তরে উত্তরণ সম্ভব হবে Mass Production -এর ফলেই। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যায় ও বিপুল পরিমাণে বিপুল চাহিদা পূরণের জন্যই উৎপাদন। এই পরিমাণে উৎপাদন করতে হলে এবং এসব সামগ্রীকে বৃহত্তর সংখ্যক ক্রেতার ক্রয়সীমার মধ্যে আনতে হলে প্রযোজ্য হয় economies of scale বা বেশী উৎপাদনের মাধ্যমে সম্পদের একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনার সূত্র। এ কাজটা বিশ্বপরিসরে শিল্পায়নের যুগে সাধন করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ দু'টি শিল্প হলো– মোটরগাড়ি নির্মাণ ও ইলেক্ট্রনিক পণ্যসামগ্রী, যেমন– টিভি, ফ্রিজ ও গৃহস্থালীতে ব্যবহার্য নানা সরঞ্জাম। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক কারখানাগুলো এখন পূর্ব এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে। এসব শিল্পসামগ্রীর যন্ত্রাংশগুলোকে যেভাবে জুড়ে দিয়ে একটা পরিপূর্ণ সামগ্রী তৈরী করা হয়, সেই প্রক্রিয়ায় তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে কারখানাগুলোর ভেতরে অনেক পরিবর্তন এসেছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে একই কাজ যখন বারবার করতে হয় তখন সেসব কাজ মনুষ্যশ্রমের দ্বারা সম্পন্ন করা হয় না। মোটর শিল্পের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন খুবই লক্ষণীয়। প্রতি বছর লাখ লাখ মোটরগাড়ি তৈরী হচ্ছে, অর্থাৎ মোটরগাড়ীর Mass production হচ্ছে। এ ধরনের উৎপাদনের কাজে যেসব স্তরে প্রচণ্ড যত্ন ও সাবধানতার প্রয়োজন হয়, সেসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। সুতরাং শ্রম প্রয়োজন হয়– এমন কাজেও কী ধরনের লোক নিয়োগ করা হবে, তাতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। যেসব কাজ বারবার করতে হয় সেগুলোকে রোবটের সাহায্যে সম্পাদন করা হয়। অথচ রোবট সচল রাখার জন্য যে সার্ভিসিংয়ের প্রয়োজন হয়, তার জন্য উচ্চ প্রযুক্তির জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীর দরকার হয়। ক্রেতারা আজ-কাল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দাবী করেন। তাদের

www.pathagar.com

রুচিও দ্রুত পরিবর্তনশীল। কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্রেতার রুচি, আগ্রহ ও চাহিদা সম্পর্কে তথ্য বিদ্যুৎগতিতে ফ্যাক্টরীতে পৌঁছে যায়। এর ওপর ভিত্তি করে জিনিস তৈরী করতে হয়। আমরা মধ্যযুগের কারুশিল্পের উৎকর্ষ অর্জনের কাহিনী সম্পর্কে অবগত। সেকালে দক্ষ, কুশলী কারুশিল্পীরা ক্রেতার পছন্দসই জিনিস তৈরী করতে প্রচণ্ড শ্রম ও অধ্যবসায় নিয়োগ করত। ব্রিটিশ-পূর্ব বাংলাদেশে মসলিন বস্ত্রের যে সুনাম অর্জিত হয়েছিল, তার পেছনে ছিল কুশলী কারুশিল্পীদের হাতের সূক্ষ্ম কাজ। বর্তমান বিশ্বে মানুষের রুচি ও পছন্দ এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যখন মানুষ কারুশিল্পের সৌন্দর্যে মণ্ডিত পণ্যসামগ্রী সামান্য Production cost এ পেতে চায়। এটাই এ যুগের বৈশিষ্ট্য। খবরের কাগজে আমরা অনেক সময় পড়ে থাকি একটা বোয়িং বিমান কিনতে হলে তার জন্য দু' তিন বছর আগেই অর্ডার দিতে হয়। তার কারণ, একদিকে বোয়িং বিমান নির্মাণের প্রযুক্তিগত জটিলতা, অন্যদিকে যারা এই বিমান ক্রয়ে ইচ্ছুক তাদের পছন্দমাফিক সুযোগ-সুবিধাও বিমানে সন্নিবিষ্ট করতে হয়। ব্যাপারটা আর বিমানে সীমাবদ্ধ নেই, এখন মোটর গাড়ীর মত Consumer durables -এর ক্ষেত্রেও ক্রেতা গাড়ীর ভেতরকার সুযোগ-সুবিধাগুলো নিশ্চিত করতে চায়। সুতরাং Mass production -এর সঙ্গে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নতুন যাত্রা সংযোজিত হয়েছে। আজকাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীগুলোতে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন টিমের প্রয়োজন। এখন লাইন ওয়ার্কারের চাহিদার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

এখন অনেক দিন টেকে, এমন পণ্যের চেয়ে কম সময় স্থায়ী হয় এমন সব পণ্যই উৎপাদন করা হয়। কেননা ভোক্তার রুচি নিয়ত পরিবর্তনশীল। এখন শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ডিজাইন ও বাজারজাতকরণের ব্যাপারগুলো অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং কেবলমাত্র জিনিস তৈরী করার হেকমতই নয়, এগুলো কী করে ক্রেতার মন কাড়ার মত তৈরী করা যায় সে ভাবনা অনেক বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে। এখন উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনে একজিকিউশনের চেয়ে কনসেপশনের গুরুত্ব অনেক বেশী। মোটা বুদ্ধি ও সৃজনী প্রতিভাহীন হলে এবং নতুন নতুন কল্পনায় সৃষ্টিশীল না হলে এখনকার বাজারে টিকে থাকা দায়। এগুলোই হল বিশ্বায়নের এই যুগে নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দের সূচনালগ্নে আমাদের সামনে উন্নয়ন ও উপাদনের জগতে প্রবেশ করার চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। ১৯৫৬ সালে সভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করে বলেছিলেন, কমিউনিজম শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই নিজেকে পুঁজিবাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করবে। এক্ষেত্রে সভিয়েত ইউনিয়ন কিছু সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, তা নয়। পরের বছর ১৯৫৭ সালে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক প্রেরণ করে সভিয়েত ইউনিয়ন দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো। আমেরিকানরা নিরীক্ষণ করে দেখল তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা সেকেলে রয়ে গেছে। গণিত ও প্রযুক্তিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব কোর্স পড়ানো হয়, সেগুলো সমৃদ্ধ ও উন্নত নয়। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোই হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশু লক্ষ্য। কারণ, জ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পরিবর্তিত হলে তার সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরও পরিবর্তন হয়। এজন্য প্রত্যেক প্রেসিডেন্টের নতুন টার্মে তিন হাজার অতিযোগ্য ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। এভাবেই মার্কিন গণতন্ত্র বহাল আছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে পাশে পেয়ে আশ্বস্ত বোধ করেন। আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তিত হলে এরকম New set of people পাওয়া যে কত দুরূহ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনুগত লোক নিয়োগ করে অনুসারীদের তৃপ্ত রাখা যায়, কিন্তু দেশের কাজ হয় না। দেশের জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন উচ্চ যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি, তেমনি প্রয়োজন আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তি। চীন দেশে এক সময়ে Red and expert -এর সমন্বয়ের কথা বলা হত। গণতান্ত্রিক দেশেও এরকম সমন্বয় প্রয়োজন। অন্যথায় দক্ষ প্রশাসন সম্ভব নয়। নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করতে গিয়ে আমরা যেক্ষেত্রে নিজেদেরকে সবচেয়ে অপ্রস্তুত মনে করছি সেটি হল মানব সম্পদের ক্ষেত্রটি। এদেশে অনেক মানুষ আছে, কিন্তু কাজের মানুষ নেই। কাজের মানুষ বলতে দক্ষ ও পরিশ্রমী মানুষকেই বুঝি। এ ধরনের

www.pathagar.com

মানুষ গড়ার কারিগর যে শিক্ষকের প্রয়োজন, তাও আমাদের দেশে নেই। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে শিক্ষা আজ বিপর্যস্ত। নেতা-নেত্রীরা সবকিছুর মূল্য বুঝলেও শিক্ষার মূল্যটা কতটা বোঝেন তা নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। তা না হলে তাদের সমর্থক, ছাত্র-শিক্ষকরা সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়েন কেন? আর সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ে রেহাই-ই বা পান কেন? সুতরাং নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে শুধুমাত্র এই একটি ক্ষেত্র অর্থাৎ মানব সম্পদ তথা মানবিক পুঁজি সৃষ্টি করতে পারলে আমরা সেই সম্পদকে দেশের ভেতর ব্যবহার করে ও দেশের বাইরে, যেখানে এই সম্পদের চাহিদা আছে সেখানে রফতানী করে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হব। এখানে কথা প্রসঙ্গে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পার্থক্যের কথাটি এসে যায়। কোন সমাজ ব্যবস্থার পক্ষেই সকলকে গণহারে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেয়া সম্ভব নয়। তবে বিপুলসংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী সৃষ্টি করা সম্ভব। তাই সুশিক্ষিতের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত কর্মী প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের এমনকি প্রাচ্যেও ম্যাগডোনাল্ডের চেইন রেস্তরাঁগুলোতে প্রশিক্ষিত অথচ অল্পশিক্ষিত কর্মী দিয়ে হাই কোয়ালিটি Mass production করা সম্ভব হচ্ছে। এখন সার্ভিস সেক্টরের বহু ক্ষেত্রেই এই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ যথাযোগ্য মাত্রায় সমন্বিত করতে হবে।

জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও হুমকির মাত্রা ও চরিত্র নতুন শতাব্দীতে দ্রুত পাল্টে যাবে। কম্পিউটার বাগ ঢুকিয়ে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেয়া, শেয়ারবাজারে কৃত্রিম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে শেয়ারবাজারে ধস নামানো, নেশার দ্রব্য চালান দিয়ে যুব শক্তিকে মাদকাসক্ত করে তোলা, কমিউনিকেশন চ্যানেলের মাধ্যমে বিজাতীয় ভাবধারার সংক্রমণ ঘটানো, মুদ্রা বাজারে সংকট সৃষ্টি করা– সবই এই সহস্রাব্দের জাতীয় নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ। উদারীকরণ ও গণতন্ত্রায়নের সুযোগে রাষ্ট্রের বৈরীশক্তি তাদের অশুভ চর্চায় মেতে ওঠার সুযোগ পাবে। বিশ্ব ক্ষমতাবিন্যাসের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হওয়ায় আজ ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত গোষ্ঠী সার্বদের আহবান জানাতে পারছে, সামনের নির্বাচনে স্লভোদান মিলোসেভিচকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারলে প্রভূত পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করা হবে এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাসমূহ প্রত্যাহার করা হবে। ইরাকের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটিও একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সেখানে সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে মার্কিনীরা বৈরীদের সমর্থনে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। আর আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে যে দল বা যে নেতৃত্ব মার্কিনীদের হাতে গ্যাস সম্পদের চাবিকাঠি তুলে দেবে, তাদের ক্ষমতার ভিত যে পাকাপোক্ত হবে, সে ব্যাপারে এদেশে অনেকেরই সন্দেহ নেই। তাছাড়া প্রকাশ্যে, কাগজে-কলমে রাষ্ট্রদ্রোহী চর্চাও শুরু হয়ে গেছে। ক'দিন আগে জনৈক পাঠক দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট -এ পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব রেখেছেন। এসব পত্র লেখকদের সম্পর্কে কবি আবদুল হাকিমের ভাষায় শুধু বলা যায়, 'ইহাদের জন্ম নির্ণয় ন জানি'। সাঁওতাল নেতা আলফ্রেড সরেনকে একজন মুসলমান জোতদার ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান হাতেম এবং অপর হিন্দু জোতদার শীতেশ চন্দ্র ওরফে গদাই কর্তৃক হত্যা ও তাদের লোকজনদের হাতে কিছু সাঁওতাল বস্তি জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অহর্নিশ বিবৃতি ও প্রতিবাদের ঝড় উঠছে। আলফ্রেড সরেনের যে ট্রাজেডি, তাতে যে কোন মানবপ্রেমিক দুঃখ পাবেন, শোকাহত হবেন। জোতদারের হাতে কৃষক হত্যা এদেশে নতুন কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু সেই সব হত্যাকাণ্ড নিয়ে এমন প্রতিবাদের ঝড় উঠতে দেখি না। কিন্তু যখনই সাঁওতাল, গারো, হাজং অথবা মনিপুরী সম্প্রদায়ের কেউ এভাবে নিপীড়িত হন তখন রং চড়িয়ে আদিবাসী নিপীড়নের কথা বলা হয়। আর এভাবেই তথাকথিত আদিবাসী ও সাধারণ জাতের মানুষের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করে দেশটাকে Destabilize করার চেষ্টা হচ্ছে। ঘটনাচক্রে এসব তথাকথিত আদিবাসী এলাকাগুলো সীমান্ত সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশটাকে ধ্বংস করতে হলে সীমান্ত অঞ্চলেই অসন্তোষের আগুন দ্বিগুণ জ্বালাতে হবে। তাই পাঠককে বুঝতে হবে, কেন এসব সীমান্তবাসী নিয়ে এত হৈচৈ। সাঁওতাল, গারো, হাজং ও মনিপুরীরা নির্যাতিত ও বঞ্চিত হলে দেশের প্রচলিত আইনে সমুচিত শাস্তি বিধান করা হউক– এটা সকলের দাবী। কিন্তু মানবাধিকারের এ ধরনের লংঘন কি কেবল এসব নৃগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকজন প্রতিনিধি সম্প্রতি

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন, বাঙালীদের সমতলে প্রেরণ ও সেনাক্যাম্প নিয়ে কিছু অযাচিত মন্তব্য করেছেন। সার্বিয়ায় তারা যা করছেন, তা থেকে বাংলাদেশে তাদের আচরণ ভিন্ন কোথায়? তাই নতুন শতাব্দীতে এমন নেতৃত্ব চাই, যে নেতৃত্ব ১৩ কোটি মানুষকে ইস্পাতের বর্মে পরিণত করে দেশের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে এ মাটির, এ জনপদের নিরাপত্তাকে সমুন্নত করবে। কোথায় সেই নেতৃত্ব? কে দেবে সেই নেতৃত্ব? জাতির সামনে এটাই এই মুহূর্তের চ্যালেঞ্জ।

আফতাব আহমাদ :

দীর্ঘ পরিক্রমার পর মানবসমাজ নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে শুধু একটি নতুন শতাব্দীতেই প্রবেশ করছে না, একটি নতুন সহস্রাব্দেও প্রবেশ করছে। সভ্যতার যে উৎকর্ষ ইতোমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি, তা বিগত সহস্রাব্দের অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী জুড়ে বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের সমুন্নয়ন, ভৌগোলিক আবিষ্কার, কারিগরি উদ্ভাবনা ইত্যাদির ঘনীভূত বহিঃপ্রকাশ। মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনযাপন ওপর ভিত্তি করেই সামাজিক শক্তিসমূহের কাঠামো ও বিন্যাস নির্ণিত হয়। মানুষ নিজেকে সংগঠিত করতে গিয়ে তার সৃজনশীল ক্ষমতাকে সুসংহত করে। নব নব অর্জন ও সাফল্য অতিক্রম করে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রকে আবাহন করতে গিয়েই সে নিজের সৃজনশীলতাকে বহুমাত্রিকতা প্রদান করে। লক্ষ্য করার বিষয়, শ্রম বিভাজন এক্ষেত্রে যেমন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি শ্রম বিভাজনের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ও মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খল উভয়ই আরোপ করেছে। অবাধ অর্থনীতি বা অধুনা প্রচলিত মুক্ত অর্থনীতির কথা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে বাজারের প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে অর্থনীতির বিকাশ এবং শ্রম বিভাজনের অত্যাবশ্যকীয়তা যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তেমনি একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, জাতীয় সীমারেখা বা সীমান্ত বাজারের চৌহদ্দী নির্ণয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিগত সহস্রাব্দের শেষ দশকে বিশেষ করে বাজার, বাজার সম্পর্কিত ধারণা, অবাধ অর্থনীতি ও মুক্ত অর্থনীতির ধারণাসমূহ ব্যাপক গুণগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। এই রূপান্তরের ফলে এখনকার বহুলালোচিত কনসেপ্ট হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন (ভূমণ্ডলায়ন), যার স্পর্শ থেকে কোন দেশই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না এবং দূরবর্তী অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না। বিশ্বায়ন বা ভূমণ্ডলায়নের ধারণাটি কোন নতুন ধারণা নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিময়কে কেন্দ্র করে অর্থনীতির যে বিকাশ, তা পরস্পর প্রতিযোগী বিভিন্নধর্মী বাজারের বিকাশের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এক্ষেত্রে জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয় একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে।

ট্রিটি অব ওয়েস্ট ফ্যালিয়ার মধ্য দিয়ে যে বিশ্ব ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়, তা এই সেদিন পর্যন্ত প্রতাপের সঙ্গে নিজের অবস্থানে অটল ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের বৈরী শিবির বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে বিলীন হওয়ার মুখে বিশ্বায়ন বা ভূমণ্ডলায়ন একটি নবতর মাত্রা বা রূপ পরিগ্রহ করে। তাই অনেকের কাছে গ্লোবাইজেশনের বিষয়টি মনে হয় নতুন, অভিনব কিছু। আসলে পূর্বে প্রচলিত গ্লোবালাইজেশনের যে নবতর সংস্করণের কথা এখন আওড়ানো হচ্ছে, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত ব্রেটন উড ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন সঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করে গড়ে ওঠা একটি নতুন বাজার অর্থনীতির রূপ মাত্র। ব্রেটন উড ব্যবস্থা তথা বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, আইএফসি ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা অর্থনীতির যে বুনিয়াদ দেশে দেশে রাষ্ট্রের সার্বভৌম সত্তাকে খর্ব করে এক নিয়ামক কেন্দ্রীয় সত্তায় পরিণত হয়, তা শেষ বিশ্লেষণে ধনবাদী অর্থনীতির হৃদদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিপত্যের ওপর নির্ভরশীল। একেই বলা হয় ওয়াশিংটন কনসেনসাস। ওয়াশিংটন কনসেনসাস দ্বারা বোঝানো হয়, সমাজ ও অর্থনীতিকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাজারের ভূমিকা নিয়ামক ও চূড়ান্ত এবং এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভাবিত নীতিমালা বিশ্বব্যাপী বিপণনকে প্রণোদিত করার ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে। ওয়াশিংটন কনসেনসাস অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর ওপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যস্থতা করার ভূমিকাকে অস্বীকার করে সমাজের এমন সব কতিপয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করে যা এই নতুন ধরনের গ্লোবালাইজেশনকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরই ওয়াশিংটন কনসেনসাসে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা

www.pathagar.com

যায়, তা প্রণিধান করার বিষয়। প্রথমত, এক ধরনের বিজয়ের সুখানুভূতি, মতাদর্শিক সাফল্য যা এর আগে ছিল অনিশ্চিত, তা প্রভূত সুখোচ্ছ্বাস সঞ্চার করে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ছাড়িয়ে সমাজের ব্যাপকতর কর্মকাণ্ডে বাজার ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে নিশ্চিত করে। এর ফলে সকল সমাজ-ক্রান্তিকালীন সমাজসহ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন বা কমান্ড ব্যবস্থায় পরিচালিত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সংগঠিত অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ভর সমাজের ওপর অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর ছাড়াও অন্যান্য ফ্যাক্টরের নির্ণায়ক ভূমিকা বিচার করার বিষয়ও বিবেচনায় চলে আসছে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অসংখ্য উপায়ের মধ্যে বাজার অন্যতম উপায়। এটিই শুধু স্বীকৃত হয়নি, বরং একমাত্র উপায় সেই স্বীকৃতিটাই লক্ষ্য করার বিষয়। অর্থাৎ বাজার একটি অটোনমাস ফ্যাক্টর হিসেবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় সীমান্ত যেভাবে গড়ে উঠেছে, তাকে অস্বীকার করে নিজেই নিজের পথ করে নেয় এবং বাজার কোন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বা জনসমাজের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে না এবং বাজার নিজেই নিজের বিধি ও নিয়ম প্রবর্তন করে। অবস্থাটা অনেকটা এমন ধরনের ফুটবল প্রতিযোগিতা যে প্রতিযোগিতায় রেফারীর পরিবর্তে খেলোয়াড়রাই নিয়মনীতি নির্ধারণ করে থাকে এবং রেফারীরা কোন স্বাধীন কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে খেলোয়াড়দের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে– এক কথায় বাজারের সর্বাধিপত্য এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যেখানে বাজারই মুখ্য আর সবকিছু গৌণ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তৃতীয়ত, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং অর্থায়নের যে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, তার সকল চৌহদ্দী যা ইতোপূর্বে রাষ্ট্র দ্বারা নির্ণিত হত, তা ধুলিসাত করে দিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নিরাকরণ বাজার এমনভাবেই ঘটায় যে, সেখানে জাতিরাষ্ট্র ও জাতীয় বাজার বলে নিয়ন্ত্রণকারী কোন সার্বভৌম সত্তার অস্তিত্ব আর থাকে না। বাজারই একটি সার্বভৌম রূপ পরিগ্রহ করে। ওয়াশিংটন কনসেনসাসের এই ত্রিবিধ মাত্রায় প্রথম ফাটল ধরতে আমরা দেখি যখন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) GATT -এর স্থলাভিষিক্ত হয়। WTO একটি নীতিকেই বৈধ হিসেবে স্বীকার করে, সেটি হচ্ছে ব্যবসায়িক। দেশে দেশে বিনা বাধায় সংশ্লিষ্ট দেশের ভেতরে এবং সীমান্ত ছাড়িয়ে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস অবাধে চলাচল করতে পারবে, এটিই WTO র মূলনীতি। জাতিরাষ্ট্রসমূহের পরিবেশ বিষয়ক আইন বা শ্রম বিষয়ক আইনকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থকে লক্ষ্য সাব্যস্ত করে WTO র যাত্রা জাতিরাষ্ট্রসমূহের কর্তৃত্ব ও সীমারেখার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রাথমিক সূচনা ঘটায়। এর ফলে তৃতীয় বিশ্ব ও তার স্বার্থ যতই উপেক্ষিত ও অবজ্ঞার বিষয়বস্তুতেই পরিণত হোক না কেন, উন্নত বিশ্বের জাতি রাষ্ট্রসমূহের যে কায়েমী স্বার্থ, তা সংরক্ষণের তাগিদ থেকেই পরিবেশ ও শ্রম আইনের প্রাসঙ্গিকতা গোটা বিষয়টিকে আলোড়িত করে তোলে। ফলে গ্লোবালাইজেশনের যে যাত্রা আমরা বিশেষ করে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে লক্ষ্য করেছি, সেই গ্লোবালাইজেশনের ধারণা একটি নতুন মাত্রা অর্জন করে। তৃতীয় বিশ্বের অবস্থান এবং নিয়ন্ত্রণের সমস্যা বিবেচনায় না নিয়ে স্ট্রাকচারাল রিঅ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য পীড়াপীড়ি, মার্কেট লিবারাইজেশনের জন্য ট্যারিফ প্রাচীরকে আরও অবনত করে বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবার জন্য যে চাপ এই গ্লোবালাইজেশনের হিড়িকে সৃষ্ট হয়, তা তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। মাল্টিল্যাটারাল এগ্রিমেন্ট অব ইনভেস্টমেন্ট যখন ১৯৯৮ এ চালু করা হয় তখনই এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, জাতীয় সার্বভৌমত্বকে সীমিত করার এটি একটি বিকল্প উদ্যোগ মাত্র। এই এগ্রিমেন্টের স্বাক্ষরদাতারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন বিদেশী বিনিয়োগের পথে বাধা হিসেবে স্বাস্থ্য, শ্রম, পরিবেশ ও Saefty সংক্রান্ত জাতীয় যে কোন আইনকে রহিত করে বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে। অর্থাৎ গ্লোবাইলাইজেশনের এই নবযাত্রা জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে জাতীয় নিরাপত্তার ওপরই চূড়ান্ত আঘাত হানার একটি আয়োজন। কিন্তু, শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের ওপর স্বীয় নিয়ন্ত্রণ ও সর্বাধিপত্য নিশ্চিত করার জন্য একদিকে যেমন উদগ্রীব, অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী গণ্য করায় জাতিরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হারাতে রাজি নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাস্ট এবং ইউরোপে কার্টেলের উদ্ভবের মধ্যদিয়ে আপাতদৃষ্টিতে যতই মনে হোক রাষ্ট্রের ভূমিকা নেতিবাচক, একথা

www.pathagar.com

অস্বীকার করার উপায় নেই, ট্রাস্ট ও কার্টেলকে সংহত করার ক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বাজারের বিকাশ সম্প্রসারণ ও সমুন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রয়েছে সমরাস্ত্রের শিল্পোন্নয়ন। সমরাস্ত্র বিপণন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উত্তেজনা, চাপ ও অস্থিরতা কিংবা সামাজিক অস্থিতিশীলতা, সহিংসতা ও সন্ত্রাসের কারণে তৃতীয় বিশ্বের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর ও নাজুক। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে যে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদ শিল্পোন্নত দেশগুলো অনুভব করেছে, তাদের দিকে তাকালেই একটি বিষয় স্পষ্ট- তারা নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে Unidirectional flow of goods and services to the third world নিশ্চিত করতে চায়। তৃতীয় বিশ্বকেও অনুরূপভাবে নিজেদের সচেতন হয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তাজনিত বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। চটকদার এবং জনতুষ্টিবাদী কথা দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ ঢালাওভাবে বাজার অর্থনীতির নামে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ডাম্পিং গ্রাউণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকলে গ্লোবালাইজেশনের নামে Neo imperialism এর জন্ম হতে বাধ্য। তৃতীয় বিশ্বের একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে কিন্তু আজকে বিবেচনা করতে হবে যে, বাজার অর্থনীতি যেমন অভিনব কিছু নয়, তেমনি এর গভীরতার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। বাজার অর্থনীতি বা মার্কেট ইকোনমিকে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা ফ্রি ইকোনমি বা অবাধ অর্থনীতি এবং ওপেন ইকোনমি বা খোলা তথা মুক্ত অর্থনীতি হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন দুই মাত্রায় বিবেচনা করেছেন। অবাধ অর্থনীতি কতটুকু অবাধ, তা যেমন প্রশ্নসাপেক্ষ একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, অবাধ অর্থনীতি মুক্ত অর্থনীতি নাও হতে পারে। আবার মুক্ত অর্থনীতির অর্থ এই নয় যে, ইমপোর্ট লিবারালাইজেশনের নামে এক্সপোর্টের সম্ভাবনাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিতে হবে। আমাদের মনে রাখা দরকার, কোন দেশই রাতারাতি রফতানীমুখী দেশে পরিণত হতে পারে না- বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহ। রফতানী ক্ষেত্রে একটি দুর্বল অবস্থান থেকে বাংলাদেশ ইমপোর্ট লিবারাইজেশনের নামে যে নীতি অনুসরণ করছে তা অভ্যন্তরীণ বাজারে তার সীমিত স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলছে। এক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য বা ফ্রি ট্রেডের পরিবর্তে মুক্ত বাণিজ্য বা ওপেন ট্রেডের পার্থক্যটি অনুধাবন করে আমদানী-রফতানী নীতি নির্ধারণ করা খুবই জুরুরী। ফ্রি ট্রেডের পরিবর্তে ওপেন ট্রেড যদি প্রাধান্য পায়, তাহলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যেই সঙ্গত যুক্তি ও কারণে ট্যারিফ রেজিম নির্ণয় করা সম্ভব এবং প্রয়োজনে আপেক্ষিকভাবে দুর্বল ও সীমিত অভ্যন্তরীণ পণ্যকে সংরক্ষণের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। মার্কেট ইকোনমি মানে ফ্রি ট্রেড নয়। মার্কেট ইকোনমি মানে ওপেন ট্রেডও বলা যায়। অবস্থা বিশেষের ওপর এক একটি দেশ ফ্রি ট্রেড অপশন গ্রহণ করবে, না ওপেন ট্রেড অপশন গ্রহণ করে বাজার অর্থনীতির প্রচলন ঘটাবে, তা নির্ভর করে। বাংলাদেশ ভারতবেষ্টিত একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং বাংলাদেশের প্রতি ভারতের রয়েছে বৈরী মনোভাব। এমতাবস্থায় তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ঢালাওভাবে বাজার অর্থনীতির স্লোগান বা জিগির তোলা জাতীয় নিরাপত্তা ও অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান উভয়ই বাজার অর্থনীতির বড় প্রবক্তা এবং একই সঙ্গে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। বাজার অর্থনীতির নামে অবাধ অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রসার ঘটিয়ে জাপান মার্কিনীদের কাছে নিজেকে বন্ধক দেয়নি। মুক্ত অর্থনীতির টার্মস অ্যাণ্ড কন্ডিশন্সের মাধ্যমে নিজের ডোমিস্টিক প্রোডাক্টকে ইনসুলেট করার কৌশলটি জাপানের কাছ থেকে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো আয়ত্ত করতে পারে। আর এভাবেই বাজার অর্থনীতিতে শরিক হয়েও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখা যেতে পারে।

www.pathagar.com

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০০

অকৃতজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের কথা

মাহবুব উল্লাহ :

আমি আমার প্রতিদিনকার চিন্তায় ও কর্মে আমার সত্তা থেকে বাংলাদেশ পৃথক করে ভাবতে পারি না। আজকের যে বাংলাদেশ, একাত্তর পূর্বকালে যে ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান, সেই ভূখণ্ডকে নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন ১৯৬২ থেকে অন্তরে অন্তরে লালন করতাম। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক নীতিই সেই তরুণ বয়স থেকে এই স্বপ্ন আমাকে তাড়িত করেছিল। যে পরিবারে আমার জন্ম, সে পরিবারে ইসলামী উদার মনোভাবাপন্ন আবহাওয়া বিরাজ করত। আমার পিতা মরহুম হাবীব উল্লাহ শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা ছিলেন; তিনি প্রায়ই বলতেন ১৯৪৬-এ স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি শিক্ষকদের মধ্যে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য অনুকূল মনোভাব তৈরী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। আমার সেই পিতাই ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী ঘোষিত হবার পর রাতের খাবারের সময় আমাদের সবাইকে ডেকে দ্রুত খাবার সেরে নেবার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, আর দেরি নয়, দেশে এখন জনতার সরকার কায়েম হয়েছে। আজ থেকে আমরা সবাই আজাদ। আমার সেই পিতাই ১৯৭১ এ অস্ত্র রাখার সহযোগিতা করার অভিযোগে ও বিচ্ছিন্নতাবাদী দুই পুত্র সন্তানের জনক হওয়ায় গোয়েন্দা বিভাগের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ভাগ্য ভাল, বাঙালি গোয়েন্দা কর্মকর্তাটি আপত্তিকর রিপোর্ট দেননি বলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। এই মানুষটিকেই আমি লক্ষ্য করেছি, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনের দিন ট্রানজিস্টার শুনে ফুঁপিয়ে কাঁদতে, আবার এই মানুষটিই সিরাজ সিকদার নিহত হওয়ার সংবাদ পত্রিকায় ফার্স্ট লিড হওয়া সত্ত্বেও তা বিশ্বাস করতে চাননি। পরে যখন তিনি বুঝলেন, সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, তখন তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'এ দেশের কি আর ভরসা নেই? তোরা দেখবি, মুজিবেরও এমন পরিণতি হবে'। আমার বাবা সরকারী চাকুরে ছিলেন, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার কোন অবকাশ তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর মত একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিও দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে আলোড়িত হতেন। এটাই সম্ভবত ত্রিশ-চল্লিশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত একজন মুসলমান বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মানসলোকের যথার্থ প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা। তিনি আদর্শবাদী ছিলেন, জীবনে সব সময় ঘুষ-দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণের দূরবর্তীতম সম্ভাবনাকেও এড়িয়ে চলেছেন। তাঁর কথা এক সময়কার আওয়ামী লীগ নেতা ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মরহুম কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর 'বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি আমার সম্পর্কেও এক প্যারাগ্রাফ লিখেছেন। ১৯৭০ সনে পূর্ববাংলার স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করায় সামরিক আদালতে আমার সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। আমার পিতা কারাগারে আমাকে এক পত্রে মাথা না নোয়াতে উপদেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য সেই উপদেশ বাণীটি সেন্সরের কালো তুলিকায় মুছে দেয়া হয়েছিল। আমি অনেক কষ্টে সূর্যের আলোয় সেন্সরে মুছে দেয়া বাক্যটি উদ্ধার করেছিলাম। এসব ব্যক্তিগত কথা ইতোপূর্বে কখনও লিখিনি। কিন্তু আজকাল দেশের ইতিহাস নিয়ে যে সন্ত্রাস শুরু হয়েছে, তাতে মনের আবেগকে রুদ্ধ করতে না পেরে এসব লিখতে হল।

বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে কখনোই একটি সুস্থ সাবলীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। কিন্তু গত ছয় মাস থেকে এক বছরে দেশের পরিস্থিতি যে মারাত্মক অবনতির দিকে গেছে তা কল্পনাতীত। সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যা, এডভোকেট হাবিবুর রহমান মণ্ডল হত্যা, বাগেরহাটে কালিদাস বড়াল হত্যা, খুলনার এস এম এ রব হত্যা, চট্টগ্রামে একের পর এক খুনের ঘটনা এবং সারাদেশে নৃশংস খুন-খারাবি, ছিনতাই, ডাকাতি, ধর্ষণ এমনকি পুলিশ কর্তৃক ছিনতাই,

www.pathagar.com

পুলিশের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সদস্যের মামলা দায়ের– সবই এক অশনি সংকেত দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা প্রচেষ্টার কথিত অভিযোগের কথা আগেও উল্লেখ করেছি। অপরদিকে বিরোধীদলীয় নেত্রী বিবিসির কাছে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নাকি তাঁকে হত্যার পরিকল্পনায় ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। আমরা দেশবাসী কোথায় যাব, কার কাছে যাব– যে দেশে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর মধ্যে এ রকম অভিযোগের পাল্টাপাল্টি হয়। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম সাহেব পুলিশকে চরম নিষ্ঠুর হতে বলেছেন। কিন্তু দায়িত্বশীলতা ও যত্নসহকারে আইন প্রয়োগের উপদেশ দেননি। অপরদিকে বহু আগে দেশত্যাগী ৫০ লাখ হিন্দুকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার হুমকি দেয়া হচ্ছে। পৃথক হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের আওয়াজ তোলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সিএনএন সাক্ষাৎকারে পূর্বপ্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গীভূত করে নাগাদ করা হবে– সে প্রশ্নে নিরুত্তর থাকেন। শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশনা উৎসবে ড. আতিউর রহমান পাকিস্তান সৃষ্টিকে একটি পাপ বলে উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টি না হলে দিনমজুরের ছেলে (নিজের জবানীতে ভোরের কাগজে প্রকাশিত) আতিউর রহমান ক্যাডেট কলেজে পড়ার সুযোগ পেতেন কি? পাকিস্তানের অংশ পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ না হলে তিনি কি কমনওয়েলথ স্কলারশীপ পেতেন? তিনি কী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভক্ত বিআইডিএস-এর এক সময়কার রিসার্চ ডাইরেক্টর ও বর্তমানে এফএও-তে কর্মরত ড. মুহিউদ্দীন আলমগীরের দৃষ্টি ধন্য হতে পারতেন? তাঁর আনুকূল্য কি তিনি পেতেন? তিনি কি করে বিস্মৃত হলেন, তাঁর গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব গ্রামের হাটে মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে তাঁর ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হওয়ার খরচ যুগিয়েছিলেন? শুধু তা-ই নয়, দারিদ্র্যের কারণে, ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হওয়ার পরও কলেজ কর্তৃপক্ষের আর্থিক আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। সে সুবাদেই তিনি আজ এত্ত বড় ইকোনমিস্ট! বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জনৈক ব্যক্তি যখন অনুযোগ করে বলেছিলো, অমুক আমার নিন্দা করিতেছে– বিদ্যাসাগর তার এই প্রশ্নের আলোকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি তাহার কোন উপকার করিয়াছ? যে পাকিস্তান সৃষ্টি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের আশানুরূপ না হলেও আর্থসামাজিক উত্তরণের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল, সেই পাকিস্তানকে একটি পাপ হিসেবে উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর উল্লিখিত সেই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ড. আতিউর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং পাকিস্তানের অন্যতম কর্মবীর। ড. আতিউর রহমান কি তার সেই 'পিতা'কেও অস্বীকার করবেন? এসব কথাবার্তা বলা আজকাল প্রগতির লেবাসধারীদের একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রভুদের তুষ্ট করাই এর উদ্দেশ্য। গত ১৮ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এ জনৈক নূরুল বাশার 'United Sub-Continent!' এই শিরোনামে সম্পাদক সমীপে লিখিত এক পত্রে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে একক রাজধানী দিল্লীর আওতায় নিয়ে আসার আবেদন রেখেছেন। তাঁর মতে, ৫৩ বছরের বৈরিতা কোন সুফল আনেনি। এই ৫৩ বছরের বৈরিতার জন্য কে দায়ী, কারা দায়ী, পত্রে সে কথা উল্লেখ নেই; তবে সিএনএন-এ প্রধানমন্ত্রীকে যখন বাংলাদেশ ভারতের অঙ্গীভূত হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তারই পাশাপাশি একজন ঢাকাবাসী মুসলমান নাগরিক এমন একটি চিঠি লিখে কোন ঐকতান সৃষ্টি করতে চান? দেশকে কোথায় নিয়ে যেতে চান, সেটাই আজ দেশবাসীর প্রশ্ন। যারা আজ বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিংবা অভিন্ন বাঙালি জাতীয়তাবাদের বক্তব্য হাজির করছেন, তাদেরকে বিবিসির সাবেক দক্ষিণ এশিয়া প্রতিনিধি মার্ক টালীর সঙ্গে জ্যোতি বসুর এক সাক্ষাৎকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ১৯৯৪ সালের আগষ্ট মাসে জ্যোতি বসু এই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। মার্ক টালী জ্যোতি বসুকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি রিপাবলিক অব ওয়েস্ট বেঙ্গল চান?' জবাবে জ্যোতি বসু বললেন, 'না, কখনো নয়। আমি এই ভাগাভাগির বিরুদ্ধে।' (সূত্র ঃ ভোরের কাগজ ১৮-৯-৯৪)।

১৯৭২ সালে মওলানা ভাসানী বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য রাখতেন, 'বাংলাদেশ অসম্পূর্ণ। এখনো ১৪টি জেলা বাংলাদেশের বাইরে রয়ে গেছে। একদিন এসব জেলা বাংলাদেশে আসবে'। এ ব্যাপারে আমি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে একই বছরের নভেম্বরের শেষ দিকে তার কার্যালয়ে এ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলাম। জবাবে তিনি

www.pathagar.com

বলেছিলেন, 'এটা একটা Premature শ্লোগান, আগে ওদের দিল্লী থেকে বের হয়ে আসতে দে। তারপর আমরা ভেবে দেখব, ওদের নেয়া যায় কিনা'। স্পষ্টতই দিল্লী থেকে বের হয়ে আসার পর বাংলাদেশে এদের অন্তর্ভূক্তি নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের খুব একটা আপত্তি ছিল না। তবে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা জ্যোতি বসু যে দিল্লী থেকে বের হয়ে আসার ভাবনাটি কখনো হৃদয়-কন্দরে ক্ষুদ্রতম স্থানও দেন না, মার্ক টালীর সঙ্গে জ্যোতি বসুর সাক্ষাৎকারই তার প্রমাণ। '৪৭-এ বাংলা ভাগের জন্য কারা দায়ী সে কথাটি আতিউর রহমান সাহেবদের মত বুদ্ধিজীবী জানেন না? বিদেশী অর্থপুষ্ট এনজিওর আনুকূল্যে প্রকাশিত গ্রন্থে রাষ্ট্রঘাতী তথ্য তুলে ধরার অনুষ্ঠানে পিতৃপরিচয় যারা অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখান, তারা কি সেই সিএসপি আমলার সঙ্গে তুলনীয় নন, যে আমলা সম্পর্কে গল্প আছে– গ্রাম থেকে আগত তার লুঙ্গি পরিহিত পিতার পরিচয় সে দিয়েছিল বাড়ির চাকর হিসেবে? এখন তো দেখি ঘটনা তার চেয়েও মর্মন্তুদ। পিতাকে চাকর হিসেবে উল্লেখ করা দূরে থাকুক, পিতা বলে কেউ ছিল, এটাও মানতে নারাজ। তাহলে কি কবি আবদুল হাকিমের ভাষায় বলব, ইহাদের "জন্ম নির্ণয় ন' জানি?" আমি ভদ্রতা ও শালীনতা রক্ষার জন্য আবদুল হাকিমের বক্তব্যটি এক শব্দে প্রকাশ থেকে বিরত থাকলাম। শত হলেও অগ্রজতুল্যদের অনুজপ্রতিমদের ওপর অকহতব্য ভাষা প্রয়োগ কাঙ্ক্ষিত নয়। এই শালীনতাবোধে আমি স্থির থাকতে চাই। সম্প্রতি ঢাকার নিউ মার্কেটে এক বইয়ের দোকানে এক বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত ও বিদগ্ধ সরকারী কর্মকর্তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তিনি হেগেলের লেখা নন্দনতত্ত্বের ওপর একটি বই বেশ কিছুদিন ধরে খুঁজছেন। কিন্তু পাচ্ছেন না বলে তাঁর প্রচণ্ড আক্ষেপ। আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম, 'আপনি যখন এত অর্থ ব্যয় করে বই কেনার অভ্যাসটি লালন করছেন, আপনার উচিত হবে একটা ইন্টারনেট কানেকশন নেওয়া। ফলে আপনি প্রয়োজনীয় অনেক তথ্যই হাতের কাছে পেয়ে যাবেন। তিনি দুঃখ করে বললেন, 'কেমন দেশ! এ দেশে লেখাপড়ার কোন কদর নেই। এ রকম দেশের ভবিষ্যৎ কী?' আমি তাকে আশাবাদী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করার প্রয়াস পাওয়া মাত্রই তিনি বললেন, 'ছয় মাস আগেও দেশ সম্পর্কে আমি এত হতাশ ছিলাম না। আমার পুত্র সন্তানটিও হতাশ ছিল না। সে আমেরিকার পরিবর্তে দেশে থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা পোষণ করত। আমিও তার সঙ্গে একমত ছিলাম। কিন্তু এখন আমি তাকে বলি, বাবা, যে করেই পারো এ দেশ ছেড়ে চলে যাও। এ দেশের কোন ভবিষ্যৎ নেই।' আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আপনার সন্তান না হয় গেল, কিন্তু ১৩ কোটি লোকের কী হবে? আমরা আমাদের দেশের কথা যতই বিপর্যস্ত ভাবি না কেন, ততটা হতাশ হওয়ার মত নয়। কেন নয়, সে কথাও বলার চেষ্টা করলাম। তিনি বললেন, 'আসল সমস্যাটা, আমরা সংগঠিত নই। আমরা ঐক্যবদ্ধ নই এবং আমাদের সামনে যোগ্য নেতৃত্বও নেই'। আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলাম, দেশের প্রতি এমন অনুরক্ত মানুষটি কী কারণে গত ছয় মাসে এতটা হতাশায় নিপতিত হলেন? আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতা ও সংগঠনসমূহের কাছ থেকে জানতে ইচ্ছে করে, তারা কি উপলব্ধি করেন সাধারণ দেশপ্রেমিক মানুষ বড্ড হতাশায় ভুগছে। তারা কি জানেন, এই হতাশা কাদের দুর্বলতা ও আদর্শহীনতার কারণে?

আফতাব আহমাদ :

আমি হতাশাবাদী নই। আমি চির আশাবাদী। চরম সংকটকালেও আমি আশাবাদ পোষণ করেই নিজ সংকল্পে অটল থাকতে সচেষ্ট হই। আমার চারপাশের প্রতিকূলতা ও বৈরিতার যথার্থ ব্যাখ্যা ও বিন্যাস আমার কাছে স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়। আর তাই, আমি জানি, মানুষ পরাভব মানতে শেখেনি। ইতিহাসের নানা মোড়ে ও বাঁকে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমাদের জনগণ আজ যে ঘূর্ণিপাকে খাবি খাচ্ছে, তা একটি সাময়িক উপদ্রপ মাত্র। কালের বিচারে এর পরিধির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমি নিশ্চিত না হলেও আমি পরম আশাবাদী। শুধু একটি বিষয়ই এখানে অতি প্রয়োজন, আর তা হচ্ছে বাস্তবতার নিরিখে আমাদের যার যা উপলব্ধি তা পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত করে জনগণের অজেয় ও অবিনাশী শক্তিকে আরও প্রখর ও পরিপুষ্ট করে তোলা।

www.pathagar.com

কিছু আপ্তবাক্য ও কিছু বুলি না কপচালে অনেকের পেটের ভাত হজম হয় না। বিশেষ করে যে ভাতের যোগান দেয় ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় প্রভুরা। প্রগতিশীল হতে হলে, অসাম্প্রদায়িকতার নামে ধর্মনিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে হলে স্বীয় সম্প্রদায়কে কষে গাল দিতে পারাটাই হচ্ছে বীরোচিত কাজ। শুধু তাই নয়, স্বাতন্ত্র্য, অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যা কিছু আছে, তাকে অস্বীকার করে ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারায় অবগাহন করাটাই একশ্রেণীর লোক শ্রেয়জ্ঞান করে। আর তাই তারা ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে এক ধরনের অনির্বচনীয় চিত্তসুখ লাভ করে।

আজ যারা কথায় কথায় ১৯৪৭ -এর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পাপের ফল হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে তাদের জন্ম কোন পাপের গর্ভে, তা যদি আমরা একবার খোলামেলাভাবে অবলোকন করার চেষ্টা করি, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, এরা কাদের ভাড়াটে। আমাদের দেশে অধুনা বিদ্বৎজ্জনদের সম্পর্কে যে ধারণা জন্মেছে তা হচ্ছে ইনিয়ে-বিনিয়ে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ও ফেনিয়ে যিনি যত দীর্ঘ কলাম লিখে কলামিষ্ট সাজতে পারেন তিনিই তত বড় বুদ্ধিজীবী এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইতিহাসবিদ। এ ধরনেরই অন্ধকারের এক বাসিন্দা হচ্ছেন মুনতাসীর উদ্দিন খান মানুন ওরফে মুনতাসীর মামুন। খান পরিবারের বিশেষ খ্যাতি অর্জনকারী বিশিষ্ট 'কলামিস্ট' এবং সেই সুবাদে বিশিষ্ট 'ইতিহাসবিদ'। মুনতাসীর মামুন গয়রহ্ কথায় কথায় পাকিস্তানের প্রসঙ্গ তুলে '৪৭-এর পাকিস্তান অর্জনকে যখন ঢালাওভাবে কটাক্ষ করেন, তাঁরা বিস্মৃত হয়ে যান যে, এই কটাক্ষের মধ্য দিয়ে তাদের 'পিতা' শেখ মুজিবুর রহমানকেও অস্বীকার করে বসছেন। আসলেই কি তারা এই বিষয়টি বিস্মৃত হয়ে যান? মোটেও না। এরা না অ্যামনেশিয়ায় ভুগছেন, না জ্ঞানপাপী। জ্ঞান যে এদের অতি সীমাবদ্ধ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই পত্রিকার কলামই এদের শেষ আশ্রয়স্থল। আর অ্যামনেশিয়ায় যে তারা ভোগেন না তা বোঝা যায়, রুটির কোন্ দিকটায় মাখন লাগানো হয় তা অনায়াসেই বুঝতে পেরে বোল এবং ভোল পাল্টাবার ক্ষেত্রে তারা যে নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তা দেখে। ক'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক লাউঞ্জে কয়েকজন সহকর্মীর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল– বিষয়বস্তু ছিল আওয়ামী বুদ্ধিজীবী কারা? যারা আওয়ামী বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত তাদের একজনও কি গোড়া থেকে আওয়ামী ধারার রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিংবা সম্পৃক্ত ছিলেন? আমার সহকর্মীরা সকলেই একমত হয়েছেন যে, এরা বিপুল সংখ্যায় রুশপন্থী কমিউনিষ্টদের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত এবং বিভিন্ন সংস্থার আনুকূল্য পেয়ে বেড়ে ওঠা ব্যক্তিবর্গ। আমি অবশ্য এ বিষয়ে একটু ভিন্নমত পোষণ করি। আসলে আওয়ামী ঘরানার চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীদের কেউই কমিউনিস্ট মতাদর্শ কিংবা কমিউনিজমের প্রতি ন্যূনতমভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন না। এদের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে এরা মতলবি-ধান্ধাবাজ। এদের জীবনের মূল নীতি হচ্ছে 'ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল'। যেমন মুনতাসীর মামুন আজকাল বাংলাদেশেল মুক্তি সংগ্রামের পটভূমি যেভাবে ব্যাখ্যা করেন, তা যদি মানতে হয়, তাহলে এ প্রশ্ন করাটাও সঙ্গত– বাংলাদেশের মানুষের চেতনা ও আকাঙ্খার প্রতি সঙ্গতি রেখে তাঁর সামাজিক অবস্থানটি তোলপাড় ও উথাল-পাথালের দিনগুলোতে কোথায় ছিল? শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে যখন ৬ দফা কর্মসূচী উপস্থাপন করেন তখন মুনতাসীর মামুন শিশু-কিশোরদের জন্য গল্প রচনা প্রতিযোগিতায় আইয়ুব খান প্রদত্ত স্বর্ণপদকটি লাভ করেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর পিতা চট্টগ্রাম বন্দরের একজন সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন ও আইয়ুবভক্ত ছিলেন এবং তাঁর চাচা যিনি এখন নিজেকে একজন বিশাল দিগ্‌গজ ভাবেন, তিনি গভর্নর মোনেম খাঁর এপিএস ছিলেন। এহেন ব্যক্তিবর্গ যার অভিভাবক, তাঁরই পুত্র যে আইয়ুবের দেয়া মেডেলটি পাবেন, তা কি অস্বীকারের কোন পথ আছে? মুনতাসীর মামুন তার জীবনের এই ঘটনাটি কখনোই উল্লেখ করেন না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য তিনি যে দরখাস্ত করেছিলেন সে কথাটিও উল্লেখ করেন না। অবশ্য এগুলোকে আমি তার বড় পাপ বলে মনে করি না। কারণ, পাকিস্তান ছিল আমাদের অর্জিত একটি রাজনৈতিক ফসল এবং আমাদের জীবনের বাস্তবতা। আইয়ুব-মোনেম খাঁর দ্বারা আমরা শাসিত হয়েছি, এটি ইতিহাসের ঘটনা এবং ঐ সময়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়

www.pathagar.com

আনুকূল্যে এদেশের বহু নাগরিক বহু ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন। এতে কোন অন্যায় আমি দেখি না। কিন্তু অন্যায় এবং পাপ আমি সেখানেই দেখি, যখন তাকে অস্বীকার করে, বেমালুম চেপে গিয়ে অহেতুক পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে গালমন্দ করে নিজেকে পুণ্যাত্মা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা কেউ করেন। এদেশে যখন মানুষ জীবনকে বাজি রেখে কারফিউ লঙ্ঘন করে রাস্তায় সামরিক নৃশংসতার মধ্যে বিরুদ্ধে লড়ছিল, তখন মুনতাসীর মামুনরা কোথায় ছিলেন, তা কি একবারও আমাদের জানাবেন না? গাছেরটা খাওয়া এবং তলারটাও কুড়ানো যাদের অভ্যাস, তাদের কাছ থেকে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ইতিহাসের নব বাখ্যা আমরা জানতে চাই না।

১৯৪৭ এ ব্রিটিশ-ভারত ভাগ হওয়ার সময় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে নেহরু আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, আবেগ যখন থিতিয়ে আসবে, উত্তেজনা যখন প্রশমিত হবে, তখন পুনরেকত্রীকরণ ও ঐক্যবদ্ধ হবার চেতনা নতুন করে বিকশিত হবে। বস্তুত্ব ভারতের সমরকুশলবিদরা এবং গোয়েন্দা কর্মজালের নীতি-নির্ধারক ও পরিকল্পকগণ ১৯৪৭ থেকে আজ অবধি ঐ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাদের কর্মকাণ্ডকে বিন্যস্ত করেছেন। ১৯৭১ -এর ২৫ মার্চের গণহত্যা সূচনার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের মুসলমান দুঃস্বপ্নেও যেমন ভাবেনি তাদের হিন্দুভারতে আশ্রয় নিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন প্রার্থনা করতে হবে, ঠিক তেমনি আজ অনেকের কাছেই এ কথা ভাবতে কষ্ট হবে যে, বাংলাদেশকে গ্রাস করার ভারতীয় অভিলাষ চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে প্রত্যক্ষ ভারতীয় হামলা নয় বরং আসবে ভারতের ক্রীতদাস এদেশীয় কিছু মুসলমানের ভারতভুক্তির আবদারের মধ্য দিয়ে। এর প্রলক্ষণ আমরা ইতোমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি। উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন, উপমহাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ইশতেহার, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল আন্দোলন এবং দৈনিক ইনডিপেন্ডেন্টে জনৈক নূরুল বাশারের লেখা 'United Sub Continent' শিরোনামের পত্রটি সেই তাৎপর্যই বহন করে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী CNN -এর অনুষ্ঠানে ভারতীয় নাগরিকের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের ভারতভুক্তির প্রসঙ্গে প্রতিবাদ ও আপত্তি না তুলে এড়িয়ে গেছেন মাত্র। আর, দেশের মাটিতে পদার্পণ করেই হুংকার ছেড়েছেন যে, এদেশে কিছু লোক এখনও এদেশটিকে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ বানাতে চায়। কথায় বলে, চোরের মা'র বড় গলা। হিন্দু সমাজে প্রচলিত প্রবাদবাক্যটি হচ্ছে, 'ঠাকুর ঘরে কেরে? আমি কলা খাই না'। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পিতা যখন ১৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশকে সম্মানজনকভাবে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে রাখার জন্য পাকিস্তানী সামরিক চক্রের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করছিলেন, তখন আমরা ২৩ মার্চ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে বাধ্য করি তার বাসভবন থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়াতে। মুনতাসীর মামুন বা আতিউর রহমানের ভূমিকা সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে কী ছিল, তা মনগড়া গল্প বানিয়ে আজ যতই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করুন না কেন, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।

এ কথা আজ মোটামুটি আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারছি যে, ভারত চিরকাল বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাবই পোষণ করে এসেছে। ১৯৭১-এ সহানুভূতির ভাবমূর্তি ধারণ করে ভারত ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল মাত্র। এদেশের মানুষের মধ্যে তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের দৃঢ়তা লক্ষ্য করে ভারত প্রথমে বিস্মিত ও পরে স্তম্ভিত হয়ে গেলেও হাল ছেড়ে দেয়নি। নানা রন্ধ্র দিয়ে খুদকুঁড়ো ছড়ানো হচ্ছে এবং সামাজিক নৈরাজ্য, অস্থিরতা, সহিংসতা, নৃশংসতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে চরম হতাশার চাষ এত নিবিড়ভাবে করা হচ্ছে যে, মানুষ পরিত্রাণের উপায় হিসেবে হয়তো বাধ্য হবে একটি মাত্র বিকল্পকেই বেছে নিতে, আর তা হল বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গীভূত করে ফেলা। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত বাংলাদেশে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার পরিবর্তে বাংলাদেশী মুসলমানেরই একটি ক্ষুদ্রাংশ পঞ্চম বাহিনীর বেশে ভারতকে ডেকে আনবে এবং বাংলাদেশ পাকা বেলের মতো ভারতের কোলে টুপ করে বসে পড়বে। ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্টের নামে ভারতকে সামরিক করিডর প্রদানের উদ্যোগ, উপআঞ্চলিক

www.pathagar.com

জোট গঠনের নামে উন্নয়ন ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ গঠনের উদ্যোগ, চট্টগ্রাম বন্দরকে ভারতীয়দের কাছে ইজারা দেয়ার উদ্যোগ এবং বাংলাদেশের পুঁজি ও মুদ্রাবাজার ভারতীয়দের হাতে তুলে দেয়ার উদ্যোগ এ কথাই প্রমাণ করে যে, একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের জনগণকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির ওপর আস্থাহীন করে তোলা হচ্ছে। সেনাবাহিনীতে রাজনীতিকায়নের যে আত্মঘাতী পদক্ষেপ বর্তমানে অনুসৃত হচ্ছে তার লক্ষ্য একটিই- দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হেফাজতের শেষ অবলম্বনটিও যেন অকার্যকর হয়ে পড়ে। এদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজালের অনুপ্রবেশ ঘটেছে- রাজনৈতিক দলগুলো এর বাইরে নেই। নীলনকশা অনুযায়ী জাত-জুয়াড়িরা বাজির কোন একটি ঘোড়া মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেও পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচার জন্য বিজয়ের সম্ভাবনা যে সব ঘোড়ার রয়েছে, সেগুলোর ওপরও বাজি ধরে রাখে। এদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করতে যারা কৃৎসংকল্প, তাদের মনে রাখা উচিত যে, ভারতকে তোষণ করে এবং ছাড় দিয়ে ক্ষমতায় এসে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো একটি অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়বে। কারণ, ততদিনে লখিন্দরের লোহার বাসর ঘরে সূচ পরিমাণ ছিদ্র দিয়ে বিষধর সর্পের প্রবেশ ঘটে যাবে- ঐ ছোবল থেকে রেহাই পাওয়া তখন দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে কেউ যখন 'মুখ্যমন্ত্রী' সম্বোধন করে কিংবা আমাদের কোন নেত্রী ভারতের মাটিতে নেমে যখন বলেন, এদেশ থেকে প্রতিদিন হিন্দুরা পাড়ি জমাচ্ছে তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আমরা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছি। তবে আশার কথা, এদেশের মানুষ এসব দুরভিসন্ধিমূলক তোড়জোড় বেশ ভালভাবেই অনুধাবন করতে পারছে এবং হাসিনার সমর্পণবাদী এই গ্লানিকর ভূমিকাকে ধিক্কার জানাচ্ছে। '৪৭ এবং '৭১ -এর সংগ্রামের মধ্যদিয়ে এদেশের মানুষের মধ্যে যে জাতিসত্তা বোধের জন্ম হয়েছে, তাকে উপেক্ষা করে যারা ভাবে যে, বাংলাদেশকে ব্রাহ্মণ্যবাদী স্রোতে নিমজ্জিত করা সম্ভব, তারা ইতিহাসের চালিকা শক্তির বিপরীতে অবস্থান নিয়ে অবিমৃশ্যকারতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ইসলাম আমাদের শুধু একটি পৃথক পরিচয়ই প্রদান করেনি, আমাদের একটি পৃথক সত্তা ও বোধও প্রদান করেছে। আগ্রাসী শক্তিকে রুখে দাঁড়াবার একটি যথার্থ যোগ্য ঢালও প্রদান করেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী অপশক্তি এ বিষয়টি খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করে, আর তাই এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক সংস্কৃতি নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা, পরিহাস করা, তাচ্ছিল্য করা, ক্ষেত্রবিশেষ অস্বীকার করা ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের এদেশীয় নিয়োগীদের একটি নিত্যকর্মে পরিণত হয়েছে। ইসলামের শ্রেষ্ঠ অর্জনসমূহ এবং মুসলিম ঐতিহ্য থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে গয়া, মথুরা, বৃন্দাবনের মুখাপেক্ষী কত দ্রুত হয়ে উঠতে পারি সে দীক্ষা দেয়ার জন্য এদেশের সঙ্গীত-নৃত্যসহ ললিত কলার নানা শাখা-প্রশাখায় ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী চরেরা তৎপর। তারপরও বলব, তারা সাময়িক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও মানুষকে চূড়ান্তভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়নি। আর হয়নি বলেই আজও প্রতিবাদ আছে, প্রতিরোধ আছে। একে তীব্র থেকে তীব্রতর রূপদান করা আজ সকল দেশপ্রেমিক মানুষের কর্তব্য। 'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও' এই নীতিকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের সকল কর্মে, সকল চিন্তায় আগামী প্রজন্মের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে অগ্রাধিকার দিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বাঁচতে হবে আমাদের নিজেদের বর্তমানের জন্য নয়, আমাদের বাঁচতে হবে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের জন্য। অনুরূপভাবে আমাদের লড়তেও হবে নিজেদের প্রাপ্তির জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের ভুবন নির্মাণের জন্য।

www.pathagar.com

৭ অক্টোবর ২০০০

বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা

মাহবুব উল্লাহ :

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, কথাটি আমরা ছোটবেলা থেকেই জেনে আসছি। অথচ আমাদের এই বাংলাদেশে শিক্ষা সবচেয়ে অবহেলিত। প্রতিবছর অর্থমন্ত্রী যখন সংসদে বাজেট পেশ করেন, তখন দাবী করা হয় শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু দিনের পর দিন এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার মানে প্রচণ্ড ধস নেমেছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ নৈতিক অবক্ষয়ের পঙ্কে জর্জরিত। অধিকাংশ ছাত্রের লক্ষ্য পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়গুলো ভালভাবে রপ্ত না করে সার্টিফিকেট অর্জন করা। এজন্য তারা সকল প্রকার শর্টকাট পদ্ধতি অনুসরণ করে। মূল পাঠ্যবই না পড়া, পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত অনুশীলনী চর্চা না করা, এমনকি পাঠ্যবইয়ে কী আছে তাও না জানা এক একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে নোটবই ও গাইডবুকের দেদার ব্যবহার হচ্ছে। লেখাপড়াটা যেন কিছু ট্যাবলেট গলাধঃকরণের মত একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া নকলবাজিতো রয়েছেই। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে অভিভাবক, সুহৃদ শিক্ষক, ছাত্রনেতা ও রাজনীতির কুপ্রভাব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। প্রায় সব এমপিই চান, তাঁর বসতবাড়ির সন্নিকটস্থ স্কুল বা কলেজে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হোক। স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডিতে নির্বাচিত হওয়ার জন্য চলছে অসুস্থ প্রতিযোগিতা। শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষাদানের যোগ্যতার চেয়ে দলীয় আনুগত্যই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা এখন আর প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে সীমাবদ্ধ নয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উচ্চতম বিদ্যাপীঠেও অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে। যে কোন ভাল শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য চাই উন্নত নৈতিকমান ও একাডেমিক যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষক। একজন শিক্ষক যদি নৈতিকতাবিবর্জিত হন, জ্ঞানচর্চাবিমুখ হন, তাঁর দায়িত্বের প্রতি যত্নবান না হন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে কী আশা করা যায়? অযোগ্য, অদক্ষ শিক্ষকই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস নামার একটি বড় কারণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট একটি বড় সমস্যা। চার বছরের ডিগ্রী কখনোবা ৭ থেকে ৮ বছরে নিতে হয়। এর ফলে মূল্যবান সময় ও সম্পদের অপচয় ঘটে। চাকরিতে কিংবা পেশায় নিয়োজিত হয়ে অর্থ উপার্জন কিংবা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার সময় অনেক পিছিয়ে যায়। সেশনজটের বহুবিধ কারণ আছে। সময়মত ভর্তি কার্যক্রম সমাপ্ত না হওয়া, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণে অনির্ধারিত ছুটি থাকা, পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব ও জটিলতা, আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা না থাকার ফলে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে না পারা-এর সবকিছুই সেশনজটের কারণ। সেশনজটের সমস্যাটি আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি, সেই বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত প্রকট। আইয়ুব খানের আমলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নগরকেন্দ্র থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়েছিল। মনে করা হয়েছিল, শহর থেকে অনেক দূরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে ছাত্ররা আন্দোলন করে রাজনৈতিক উপদ্রব সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এই অনুমান মোটেও সত্য নয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে চলে গেছে একটি জাতীয় মহাসড়ক, ফলে কোনো বিরোধ বা সংঘাত দেখা দিলে ছাত্ররা সড়ক অবরোধ করে বসে ও যাতায়াত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অচল করে দেয়। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের যাতায়াতের জন্য রয়েছে শাটল ট্রেনের ব্যবস্থা। শিক্ষকদের জন্য রয়েছে শিক্ষক বাসের ব্যবস্থা। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বাসে

www.pathagar.com

যাতায়াতের সুবিধা রয়েছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে যে কোন ছাত্র সংগঠন খুব সহজেই অবরোধ সৃষ্টি করতে পারে। শাটল ট্রেনের ড্রাইভারের কাছ থেকে ইঞ্জিনের চাবিটা ছিনিয়ে নিতে পারলে অথবা শিক্ষক বাসে এক টুকুরো ইষ্টক নিক্ষেপ করে বাসের কাচ ভেঙ্গে দিতে পারলেই ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের পরিস্থিতি অনেকবারই সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মাসের পর মাস বন্ধ থেকেছে। শাটল ট্রেনের খরচ যোগাতে ও বাস চালু রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়কে যাতায়াত খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। ফলে ফ্যাকাল্টি ভবন নির্মাণ, গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরী উন্নয়নের জন্য অর্থ পাওয়া যায় না। শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত ক্লাসরুমের অভাবে অধিক পরিমাণে ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না। সবকিছু থেমে থাকলেও শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয় না। কারণ, এতে দল ভারী করা যায়। '৭৩-এর আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে ক্ষতিকর দল চর্চার সুযোগ দিয়েছে, তা বেশ ভালভাবেই চলছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার আছে, কিন্তু সেই গ্রন্থাগার দুপুর ২টার পরে খুব একটা ব্যবহৃত হয় না। কারণ, ছাত্র-শিক্ষক সবারই বাড়ী ফেরার তাগাদা থাকে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে দেখেছি, রাত ৯টা ১০টা পর্যন্ত ক্লাস চলে, গ্রন্থাগার রাত ১২টা অব্দি খোলা থাকে, আর সেমিস্টার পরীক্ষার সময়ে সারারাতই খোলা থাকে। গবেষণা-ছাত্রদের জন্য গ্রন্থাগারে ক্যারলের ব্যবস্থা আছে। সেই প্রকোষ্ঠে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বইপত্র নিরাপদে রাখা যায়। প্রয়োজনে সেখানে পড়তে পড়তে নিদ্রার কোলেও আশ্রয় নেয়া যায়। এভাবেই উন্নত দেশে সময় ও সম্পদের সদ্ব্যবহার হয়। আর আমাদের দেশে শিক্ষক থাকলেও ক্লাস নেয়া যায় না ক্লাসরুম ও গবেষণাগারের অভাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব দালান-কোঠা নির্মাণ করা হয়, সেগুলোর স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য সাধারণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত দালান-কোঠার চাইতে ভিন্নতর হয়। বিল্ডিং স্পেসকে নানামুখী ব্যবহারের উপযোগী করতে হয়। এর ফলে দালান-কোঠারও সুষ্ঠু ব্যবহার হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নির্মিত স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণে স্থাপত্যকলার এই কৌশলটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। তার পাশাপাশি রয়েছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট। সুতরাং, রাতের বেলা কিংবা আকাশ অন্ধকার হয়ে আসলে ক্লাশ নেয়াও দুরূহ হয়ে পড়ে। ভবন নির্মাণে পুকুর চুরির মত দুর্নীতির ফলে ছাদে ফাটল ধরা, ছাদ দিয়ে পানি পড়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মৌসুমী বর্ষণকবলিত এই দেশে বর্ষার সময় বা প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় এ কারণে ক্লাস নেয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে।

কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সেশনজট নিরসনকল্পে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরদের নিয়ে এক সভা করেছে। সভায় এবার যারা এইচএসসি পাস করল, তাদের বসিয়ে না রেখে দ্রুত ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর ফলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে যুগপৎ একাধিক ব্যাচ পাঠ গ্রহণ করবে। কিন্তু আমি এই প্রয়াসের সার্থকতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দিহান। সেশনজট কাটিয়ে উঠতে হবে। কিন্তু, সেশনজট কাটিয়ে ওঠার নামে কোন গোঁজামিল সুফল বহন করবে না। একাধিক ব্যাচকে পড়ানোর জন্য নিরন্তর বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা যাবে কি? যেসব বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে দূরে, সেখানে যানবাহনের বহর বাড়ানো যাবে কি? অতিরিক্ত ব্যাচ পড়ানোর জন্য যোগ্য শিক্ষকের ঘাটতি কিভাবে স্বল্প সময়ে পূরণ করা সম্ভব হবে? আর সবচেয়ে বড় কথা, যে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের জন্য মূল সমস্যার উদ্ভব, সেই সমস্যার সমাধান করতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব আগ্রহী কি? অনেকে মনে করেন, কিছু অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক শিক্ষককে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার জন্য ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশ্ন হল, এতে অর্থের ভাগাভাগি হলেও জ্ঞান বিতরণে কতটা ভাগাভাগি হবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ফলে বরাদ্দকৃত অর্থ অপচয়ের সম্ভাবনাই সমধিক। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সেশনজট নিরসনের জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার, অন্যদিকে প্রয়োজন আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা কাটিয়ে ওঠা। অন্যথায়, সেশনজট নিরসনের মত একটি মহতী উদ্যোগ নির্বাচনকে সামনে রেখে স্টান্টবাজি ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না।

www.pathagar.com

ইদানীং শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার জন্য অর্থ বরাদ্দ দিতে গিয়ে পরীক্ষায় পাসের হারকে একটি অন্যতম প্রধান নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছে। এর ফলে শিক্ষকরা ভাল ফল দেখানোর জন্য পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে ছাত্রদের সহায়তা করতে উৎসাহিত হচ্ছেন। বস্তুত শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যবহৃত এই চাবুকটি পাঠদান কার্যক্রমকে দক্ষ করার পরিবর্তে নকলবাজির দক্ষতা বৃদ্ধি করছে। এর ফলে শিক্ষা আরও রসাতলে যেতে বসেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের অন্যতম একটি দাবী হলো, সরকারকে শিক্ষক বেতনের শতকরা ১০০ ভাগ বহন করতে হবে। শিক্ষকরা সমাজের পূজনীয় ব্যক্তি। তাদের জীবনযাত্রা দুর্বিসহ হলে শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হবে– এ কথা যেমন সত্য, তেমনি বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অর্থায়ন সরকার বহন করবে এটাও খুব যুক্তির কথা নয়। আমরা জানি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নানা ধরনের ব্যবস্থার অবকাশ আছে। একটি বিদ্যালয় যেমন শতকরা ১০০ ভাগ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন ও দায়িত্বাধীন হতে পারে, ঠিক তেমনি একটি বিদ্যালয় শতকরা ১০০ ভাগ বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হতে পারে। কিংবা একটি বিদ্যালয় সরকারী ও বেসরকারী এই মিশ্র ব্যবস্থাপনায়ও চলতে পালে। ধরা যাক, একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য কমিউনিটি জমি দান করলো, ঘরবাড়ি নির্মাণ করলো, কিন্তু কমিউনিটির পক্ষে বিদ্যালয়ের চলতি ব্যয়সমূহ যেমন বেতন-ভাতা ও শিক্ষা উপকরণের খরচ বহন করা সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র আংশিক ভর্তুকি দিতে পারে। এমনকি, শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তুকিও দিতে পারে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে যেহেতু শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ব্যয় নির্বাহ করতে হবে, সেহেতু এই অর্থ কী ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের পেছনে ব্যয় করা হবে, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষক নির্বাচনের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মত কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই কমিশনের কাজ হবে, শিক্ষক নির্বাচনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেয়া এবং এই পরীক্ষা যাতে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য হয়, তার জন্য কঠোর নিয়মনীতি প্রণয়ন করা। এই ব্যবস্থা না করে কেবল অর্থ বরাদ্দ বাড়ালে জাতির কোন মঙ্গল হবে না। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার পর্যায়ে যে বোর্ডের ব্যবস্থা আছে, সেখানেও দুর্নীতি প্রবলভাবে বাসা বেঁধেছে। কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম ও অষ্টাদশ স্থান অধিকারকারী দু'জন ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল দুর্নীতির অভিযোগে বাতিল করা হয়। ভাবতে অবাক লাগে, শিক্ষা বোর্ডের রেজাল্টও টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা যায়। এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি দেশে ও বিদেশে কারোরই আস্থা থাকার কথা নয়। যে কারণে আজকাল বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়াটা বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠেছে। এমনকি, এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা GCE 'O' লেভেল এবং 'A' লেভেল পাস করে তাদের ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে, দেশে রাজনৈতিক হাঙ্গামা, সন্ত্রাস ও সেশনজটের কারণে অনেক অভিভাবকই তাদের সন্তান ও পোষ্যদের ভারতে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠাচ্ছে। এতে দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে, এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিজাতীয় ভাবধারায় মগজ ধোলাই হয়ে নিজ ঐতিহ্য ও শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ফলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই সংকটাপন্ন। এরকম বিজাতীয়কৃত নাগরিক দিয়ে কোন জাতি রাষ্ট্রই জাতীয় কল্যাণ আশা করতে পারে না। মনে হয়, এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আস্থা চূর্ণ করে দিয়ে আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের ভারতমুখী করে তোলার এক মহা আয়োজন চলছে। অথচ এদিকে কারো নজর নেই। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্বাসিত করে শিক্ষার্থীদের দেশমুখী করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কোন পরিকল্পনা নেই। রাজনৈতিক নেতারা রাজনীতি ব্যবসা দ্বারা অর্জিত অর্থে নিজ সন্তান-সন্ততিদের ব্রিটেন, আমেরিকায় পড়াশোনা করতে পাঠান। তাদের সন্তানদের মানুষ হওয়াটা তো তাদের জন্য কোন সমস্যা নয়। সাধারণ দেশবাসীর সন্তানেরা গোল্লায় গেলে, অধঃপতিত হলে, ফেনসিডিল-গাঁজাখোর হলে, সন্ত্রাসী হলে এবং একদিন অন্য সন্ত্রাসীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে খুন হলে তাদের কিছু যায়-আসেনা। তারা শুধু কিশোর ও তরুণদের কাছে একটা জিনিসই আশা

www.pathagar.com

করেন, তাহলো নির্বাচনের সময়ে পেশীশক্তি ব্যবহার করে তাদের পক্ষে ভোটের বাক্স বোঝাই করা। এই রাজনীতি একদিকে যেমন নির্মম, অন্যদিকে সকল অর্থে দেশ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। প্রয়োজন এই নীতিহীন রাজনীতির চূড়ান্ত অবসান।

সম্প্রতি শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি নতুন উপদ্রব যুক্ত হয়েছে। যেটা হচ্ছে কোন বিদেশী খ্যাত বা অখ্যাত ইনস্টিটিউট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ প্রয়াসে দেশের মধ্যে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নামে ডিগ্রী দেয়ার ব্যবস্থা করা। বিজনেস অ্যাডমিনস্ট্রেশন, কম্পিউটার সায়েন্স ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায় ডিগ্রী অর্জনের জন্য এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এসব দেশী-বিদেশী জয়েন্ট ভেঞ্চার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিভাবদের বিশাল অংকের ফী'র বোঝা বহন করতে হয়। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান বিতরণের মান সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এগুলোর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার ব্যাপারেও সরকারের কোন তাগিদ আছে বলে মনে হয় না। আবার, সরকারকেও তদারকি করতে বলা নিরর্থক। কারণ এতে সর্ব পর্যায়ের আমলাদের দুর্নীতির সুযোগই বাড়বে। দেখা যাবে, যাদেরকে অনিয়ম-বেনিয়ম নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, তারাই অনিয়ম-বেনিয়মকারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ছেন। গ্রামে একটি প্রবাদ আছে- বেড়া যদি খেত খায়, তাহলে ফসল রক্ষা করবে কে? আজ বাংলাদেশে বেড়াটাই ফসলের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হবে না এবং রাজনৈতিক দলের কাছে এই সমস্যার সমাধান আশা করাও বৃথা। যারা প্রকৃত Stake holder অর্থাৎ যারা একদিকে দায় বহন করেন, অন্যদিকে ফলও ভোগ করেন– আজ তাদেরই সংগঠিত হতে হবে। অর্থাৎ সিভিল সোসাইটির সংগঠন। এর অর্থ এনজিও সংগঠন নয়। এনজিও পরিচালিত স্কুলগুলোর শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংকের জরিপের ফলাফল মোটেও সন্তোষজনক নয়। তদ্‌সত্ত্বেও এনজিওরা এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট দায়িত্ব ও সম্পদের ভাগিদার। আজ সময় এসেছে এনজিও কর্মকাণ্ড কস্ট-বেনিফিট এনালাইসিসের কষ্টিপাথরে মূল্যায়ন করার। এনজিওরা শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয়সহ সকল ব্যাপারেই বিষফোঁড়ার মত আমাদের ওপর চেপে বসেছে। অনেক এনজিও ব্যবসায়িক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়েছে। কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, অথবা প্রতিষ্ঠা করেছে। আমি এক এনজিও নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানি, যেখানে সেই এনজিও কর্তা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কী হচ্ছে তাও দেখে দেয়ার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেছে। এ কারণে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, যিনি ঐ কর্মকর্তার ব্যক্তিগত বন্ধুও বটে, তিনি বন্ধুত্বের সম্পর্কে যাতে অবনতি না হয়, তার জন্য নিজ পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন অতীতে উপাচার্যের দায়িত্ব পালনকারী ও র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমে বিশ্বাসী ইংরেজী সাহিত্যের একজন প্রবীণ অধ্যাপক। তাঁর মত মানুষ এরকম পরিবেশে দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন, তা ভাবতেই অবাক লাগে।

পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা রোধ করার জন্য ও ছাত্রদেরকে পাঠ শিক্ষায় উৎসাহী করার জন্য গত বছর থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছু অভিনবত্ব আনা হয়েছে। পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধ ও যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে ছাত্রদের উৎসাহী করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নপত্র পূর্বাহ্নেই যাতে অনুমান না করা যায়, তার একটা ব্যবস্থা থাকা অতি জরুরী। কিন্তু পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেখে প্রশ্নপত্রে অভিনবত্ব চালুর কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছি। বিজ্ঞাপনে দেখলাম, কোন এক প্রকাশক 'অসম্ভব সম্ভব' গাইড বুকের সিরিজ বের করেছে। সুতরাং অভিনব প্রশ্ন আর সমস্যা থাকছে না। এ কারণে প্রশ্নপত্রে অভিনবত্ব একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া হতে হবে। মুখস্থ করার পরিবর্তে জানতে, বুঝতে ও বিশ্লেষণে সক্ষম হতে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য ছাত্র শিক্ষক উভয়কেই বাধ্য করতে হবে। অন্যথায় যে কোন সাময়িক চমক ক্ষণিকের সুফল দিলেও দীর্ঘস্থায়ী কোন সুফল দেবে না।

ইটিবির এক অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষার অধ্যাপক মুস্তাফা নূর উল ইসলাম ইংরেজী ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জনের গুরুত্বকে খাটো করে দেখাতে চেয়েছেন। এই ধরনের সাহিত্যের অধ্যাপকরাই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ না হলেও ৫০ ভাগ দায়ী। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলন করায় মাতৃভাষার কোন

www.pathagar.com

উৎকর্ষ হয়নি। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা ধ্বংস হয়ে গেছে। ইংরেজীর মত একটি বহুল প্রচলিত আন্তর্জাতিক ভাষা আয়ত্ত না করে উচ্চ শিক্ষায় কোন রূপ পাঠগ্রহণ অবাস্তব ও অসম্ভব। সে কারণে আমরা সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। ইনফরমেশন টেকনোলজির এই যুগে ইংরেজী ভাষাকে অবজ্ঞা করার কোন অবকাশ নেই। চীনা ও জাপানীরাও ইংরেজীর ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করেছে। এক সময়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার পক্ষে ওকালতকারীরা চীন ও জাপানের দৃষ্টান্ত দিতেন, এখন অবশ্য ইংরেজীর গুরুত্ব সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে ঐকমত্যের অভাব নেই। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজী অবশ্য পাঠ্য হয়েছে। কিন্তু প্যাকেজ সিস্টেমের এডুকেশন চালু থাকলে নোট বই প্রণেতা, প্রাইভেট টিউটর ও কোচিং সেন্টারগুলোরই রমরমা ব্যবসা হবে, শিক্ষার কোন গুণগত পরিবর্তন হবে না। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এবং জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের নেতৃবর্গ দেশবাসীকে জানাবেন কি, শিক্ষার জন্য তাঁরা কী কর্মপন্থা অবলম্বন করতে যাচ্ছেন? আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে এক এক সময় এক একটি ইস্যু গুরুত্ব পায়। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন স্বাস্থ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের জাতির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার ইস্যুটিকে আমাদের দুই নেত্রী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কীভাবে দেখছেন তা জাতি জানতে চায়।

আফতাব আহমাদ :

অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে খাতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, সেটি হচ্ছে শিক্ষা খ্যাত। নানা ধরনের চটকদার বক্তব্য ও জনতুষ্টিবাদী বুলি কপচিয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই দেখা গেছে, জনসাধারণকে চমক দেখানোর জন্য শিক্ষা খাতে বেশ মোটা অংকের অর্থ ক্ষেত্র বিশেষে বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু এর যথোচিত ব্যবহার হতে কদাচিৎ দেখা যায়। যেসব দেশে শিক্ষা খাতে লোক দেখানো অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেসব দেশে ততোধিক অর্থের অপচয়, অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশেও শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়ার নামে, শিক্ষা উন্নয়নের নামে এবং শিক্ষার ভৌত কাঠামো ব্যাপক বিনির্মাণের নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ যেভাবে অর্থের শ্রাদ্ধ করছে, তাতে শিক্ষার উন্নয়ন তো দূরের কথা, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে এবং আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়েছে। এরই পাশাপাশি শিক্ষক বহাল, নিয়োগ ও শিক্ষকদের পদোন্নতি দানের নামে আমাদের দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়া হয়েছে, তাতে প্রধান ক্যাজুয়ালটি হচ্ছে বিদ্যা ও জ্ঞান।

আমরা একটি বহুল উচ্চারিত প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে পরিচিত– 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে, উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহে বিশেষ করে বাংলাদেশে এই মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে একটি প্রতিবন্ধী সমাজ গড়ে তোলার কাজেই আমরা ব্যতিব্যস্ত। এক একবার এক এক দল ক্ষমতায় আসে কিংবা একেক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসে এবং বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করে শিক্ষার প্রতি সরকার ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব দায়সারাভাবে সারা হয়। শিক্ষা কী উদ্দেশ্যে দেয়া হবে, শিক্ষার্থী কী উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমনাগমন করবে, শিক্ষক কোন যোগ্যতা বলে এবং কী উদ্দেশ্যে শিক্ষাদানের ব্রত পালন করবে– এ বিষয়ে রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সমাজের সবচেয়ে শক্তিধর ব্যক্তিও সম্পূর্ণ উদাসীন। সময়ে সময়ে বাহবা কুড়ানোর নামে শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'ঢেলে সাজানো'র চিত্তাকর্ষক আয়োজনের আহবান জানানো হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে, দুর্নীতি, অথর্বতা, পরিকল্পনাহীনতা ও লক্ষ্যহীনতা আমাদের কীটদষ্ট শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। আজ কি শিক্ষকের মান, কি শিক্ষার্থীর মান– যা-ই আমরা বিচার করি, তার হিসাব মেলানো ভার। নৈতিক অধঃপতন, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অভিরুচির বিকৃতি আমাদের এই গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় যে ধস নামিয়েছে, তার যথার্থ মূল্যায়ন যদি আমরা এখনই না করি, তাহলে জাতি হিসেবে বিশ্বসমাজে মাথা গোঁজার ঠাঁই আমরা পাব না। বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষকরা শিক্ষাদান থেকে বিরত থেকে ধর্মঘট পালন করছেন, এঁদের অনেক দাবীর মধ্যে একটি দাবী

www.pathagar.com

হচ্ছে, বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে এবং শিক্ষকদের জীবন-জীবিকার ব্যয়সূচকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতন প্রদান করতে হবে। আপাত দৃষ্টিতে এ ধরনের দাবীর মধ্যে অন্যায্য কিছু আছে বলে মনে হবে না। কিন্তু আমরা যদি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে জানতে চাই, কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষকতায় নিয়োগ করা হচ্ছে, নিয়োগকর্তা কারা এবং কোন শর্তাধীনে এই নিয়োগ দেয়া হচ্ছে– এটি কি বেশি জানতে চাওয়া হয়? আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় সম্মানজনক ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি লাভের যোগ্যতা রাখেন না। অথচ এঁদের হাতেই আমরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ সপে দিচ্ছি। আর এঁরাও বেশ মজা উপভোগ করছেন। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের কাছ থেকে কলাটা, মূলাটা, লাউটা নেয়া ছাড়াও সাম্প্রতিককালে অর্থের বিনিময়ে পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশনের নিশ্চয়তা প্রদান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষকের বিদ্যার দৌড় এবং শিক্ষকতার যোগ্যতা নিয়ে যত কম আলোচনা করা যায়, ততই ভাল। অন্যদিকে শিক্ষাকে একটি মামুলি পণ্যে পরিণত করে বিত্ত-বৈভবের মালিকরা ও কালো টাকার অধিকারীরা সামাজিক মর্যাদা ও কৌলীন্য অর্জনের জন্য বেসরকারী খাতে ব্যাঙের ছাতার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছেন এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠানে বিপুল হারে স্বগোত্রীয়দের সন্তানদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অপশিক্ষার মহামারী আকারে বিস্তার ঘটাচ্ছে। কোন সৃজনশীল জাতির জন্য এটি কখনই কাঙক্ষিত ও মঙ্গলজনক হতে পারে না।

কেবল প্রাথমিক শিক্ষার কথাই বা বলি কেন– মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাসহ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা এই আত্মবিনাশী প্রবণতা প্রত্যক্ষ করছি। তদুপরি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে শিক্ষার বাণিজ্যিকায়ন যে অধঃপতিত রূপ ধারণ করেছে, তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এখনই কিছু প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা যদি নেয়া না হয়, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে আবর্তিত হবে।

আমাদের দেশে একটি জনতুষ্টিবাদী কথা চালু আছে যে, 'শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার' এবং 'গণমুখী শিক্ষা'র নামে সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনের অধিকার পাবে। প্রকৃত প্রস্তাবে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত হওয়া হচ্ছে একটি সার্বজনীন অধিকার। স্তরভেদে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের সমসুযোগ পাবার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু সেই অধিকার ভোগ করার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে মেধার যোগ্যতা। আমাদের দেশে আমরা মেধা বিবর্জিত অপদার্থদের উচ্চতর শিক্ষার অধিকার দেয়ার নামে চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে দীনতার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ সাধনে ব্যস্ত রয়েছি। তদুপরি, সকলেই আমরা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী পেতে চাই। কারিগরি ও কৃৎকৌশলজনিত শিক্ষাকে আমরা সযত্নে পরিহার করে অনগ্রসর পশ্চাৎপদ ও কূপমণ্ডূক থাকার এক ধরনের বিলাসী প্রবণতা লালন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেতো আমরা অবজ্ঞার চোখে দেখতে অভ্যস্ত। অথচ আজকের অর্থনৈতিক টানাপোড়েন এবং সংকুচিত কর্মসংস্থানের কষাঘাতে এমএ, এমএসসি পাস অনেকেই বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি জমাচ্ছি।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের উপলব্ধি করার আছে যে, এ যাবৎকাল পর্যন্ত আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের যে মূল্যবোধে শিক্ষিত করে তুলছি, সেখানে সবচেয়ে উপেক্ষিত হচ্ছে শ্রমের মর্যাদা। জীবিকার তাড়নায় আজ আমাদের ঠুনকো আত্মমর্যাদার লেবাস ছেড়ে দিয়ে আমরা যে কোন শ্রমে নিয়োজিত হতে প্রস্তুত হয়ে উঠেছি। তাহলে এ বিষয়টি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার গোড়া থেকেই কেন গুরুত্ব পেয়ে আসছে না? এ প্রশ্নটি উত্থাপন করা কি স্বাভাবিক নয়?

শিক্ষাকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও কার্যকর করার জন্য একের পর এক বহু সরকার নতুন নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করে সময়, অর্থ ও সম্পদের কম অপচয় করেনি। এর পাশাপাশি দুরভিসন্ধিপরায়ণ রাজনীতিক ও কূপমণ্ডুকতার আবিলে নিমজ্জিত রাজনৈতিক দলগুলোর উসকানিতে ছাত্ররা একের পর এক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশকে শুধু প্রত্যাখ্যান করে যায়নি, সেই সাথে চটকদার

www.pathagar.com

গালভরা কিছু বুলি সংবলিত দাবীও তারা উত্থাপন করতে কসুর করেনি– যেমন 'গণমুখী', 'বিজ্ঞানভিত্তিক', 'উৎপাদনমুখী', 'বৈষম্যরহিত', 'সেকুলার' শিক্ষা ব্যবস্থা চাই– এ ধরনের চটকদার ধ্বনি দ্বারা আমাদের ছাত্রসমাজ কী বোঝাতে চেয়েছে বা চায় তা আজ কারো কাছেই স্পষ্ট নয়। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা নিজেরা যখন সত্যিকার অর্থে পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ করে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হবার অপেক্ষায় রয়েছে, সে অবস্থায় কীভাবে নিজেরা শিক্ষানীতি প্রণয়নের নীতিগত সিদ্ধান্তগ্রহণের দুরূহ সুপারিশ উত্থাপন করতে পারে তা বোধগম্য নয়। এমন উদ্ভট কাজ সম্ভবত আমাদের দেশেই সম্ভব। যে কারণেই দিনে পর দিন আমাদের শিক্ষার মান ক্রমাগত নিম্নগামী।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির দুষ্ট অপচক্র যে কর্মজাল বিস্তার করেছে, তার ফলে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত তাদের থেকে শুরু করে শিক্ষাদানের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত সকলের মধ্যেই লক্ষ্য করি কলসভর্তি মূর্খতার দাপট আর এই দাপটে আমাদের সমাজের সকল সুনীতি, শ্রেয়বোধ ও সুবচন শুধু অকার্যকরই হয়ে পড়ছে না, চিরস্থায়ীভাবে নির্বাসিত হয়ে পড়ছে।

সমাজ বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন দক্ষ কারিগর, প্রয়োজন মেধা ও মননের উৎকর্ষ, প্রয়োজন প্রতিভার বিকাশ। সমাজের সর্বোচ্চ সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এর অনুকূলে কাজ করা। কিন্তু আমরা গোড়াতেই সমাজকে তার কাঠামোচ্যুত করে রাষ্ট্রকে প্রতিবন্ধী সত্তায় পরিণত করেছি। আর এ কারণেই সস্তা বুলি, জনতুষ্টিবাদী বচন এবং মেধাবান ও প্রাকৃতজনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় না করে সবকিছুকে গুলিয়ে একাকার করে 'চরম গণতন্ত্র' অনুশীলনের নামে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছি। গদবাঁধা প্রশ্ন, তোতা পাখির মত নির্দিষ্ট কয়েকটি কেতাব মুখস্থ এবং যেনতেনভাবে সার্টিফিকেট অর্জনের অলিম্পিকসম প্রতিযোগিতার যে আয়োজনের আমরা জন্ম দিয়েছি, তাতে সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক উৎকর্ষতা দূরের কথা, সমমর্মিতা ও আন্তরিকতার পরশে সিক্ত মানবীয় গুণাবলীসম্পন্ন একটি সমাজ বিনির্মাণ ও সংরক্ষণেও আমরা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আর তাই কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আজ আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত। শিক্ষাকে পণ্যে রূপান্তর, শিক্ষাব্যবস্থার বাণিজ্যিকায়ন এবং সস্তা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে শিক্ষক নিয়োগ ও তার সংখ্যা বৃদ্ধির যে জাতিবিনাশী ও আত্মবিনাশী প্রকল্প আমাদের সমাজে চালু রয়েছে তা সমূলে সমুৎসাদন করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে নৈতিকতা, বিশেষ করে ধর্মাশ্রিত নৈতিকতা এবং মানবিক সত্তার উৎকর্ষ সাধনে ইতিবাচক যে সামাজিক মূল্যবোধ আমাদের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাকেও শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে। ইউরোপে আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রত্যেক দেশেই মাতৃভাষার বাইরে দু'টি মহাদেশীয় ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার্থীদের শিখতে হয় এবং ধর্মীয় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যাতে শিক্ষার্থীর কুপ্রবৃত্তির অবদমন করে, তার মধ্যে সুপ্রবৃত্তি, শ্রেয়বোধ ও সুনীতির বিকাশ ঘটায়– শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষাকে সেভাবেই সমন্বিত করা হয়েছে। এসবের কারণে ইউরোপ কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন পণ্ডিত তো দূরের কথা, কোন ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শোনা যায় নি, কোমলমতি বালক-বালিকাদের ওপর একাধিক ভাষার বোঝা হিসেবে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, যার ফলে আমাদের জ্ঞানাহরণের বিঘ্ন ঘটতে পারে, কিংবা বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষার কারণে তারা তমসাবাদী বা মৌলবাদী হয়ে পড়ছে। এসব মুখরোচক, জ্ঞানবিবর্জিত শ্লোগান ও বুলি কেবলমাত্র আমাদের দেশেই শোনা যায়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জবাবদিহিতা ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে পরিধারণের (মনিটরিংয়ের) কোন পন্থা আজ পর্যন্ত আমরা উদ্ভাবন করিনি। এ বিষয়ে যারাই কথা বলতে চেয়েছেন, তাদের আমরা নানা অপবাদে ধিকৃত করে নিন্দা জ্ঞাপন করেছি মাত্র।

আজ সময় এসেছে এসব সেকেলে, আত্মঘাতী এবং চটকদার বুলির কর্মজাল ছিন্নভিন্ন করে বাস্তবতাকে চিনে নেয়ার এবং নিজেদের প্রতিশ্রুতিশীল, সৃজনশীল, যোগ্য ও দক্ষ জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর করার উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করার। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এখন যেভাবে শিক্ষকদের রিক্রুট করা হয়, তা শুধু ত্রুটিপূর্ণই নয়,

www.pathagar.com

মারাত্মকভাবে দুর্নীতিগ্রস্তও বটে। স্কুলে বিশেষ করে বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের যে পদ্ধতি চালু রয়েছে, তা গোড়াতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে রাখার জন্য যথেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের নামে সকল নিয়ম-নীতির মাথা খেয়ে বলগাহীন দৌরাত্ম্যে যেভাবে শিক্ষকদের নিয়োগ দান করা হয়, তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর জ্ঞানপীঠ হিসেবে বিকশিত হওয়ার পরিবর্তে অপশিক্ষা ও পেশীশক্তিকে বলীয়ানদের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট খোলামেলা নীতি প্রবর্তন করা আজ অত্যাবশ্যক। একটি পৃথক টিচিং সার্ভিস কমিশনের অধীনে স্কুল ও কলেজের শিক্ষদের নিয়োগদানের বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে ইউনিভার্সিটি সার্ভিস কমিশনের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগদানের বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। শিক্ষকতার সকল স্তরে পৃথক কিন্তু অভিন্ন বেতন কাঠামো প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইতোমধ্যে যেসব অযোগ্য ও অপশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকরা নিয়োজিত রয়েছেন, তাদেরকে একটি স্ক্রিনিং কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাঁটাই করা প্রয়োজন। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাসস্টার্স ডিগ্রী হওয়া শ্রেয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের নিযুক্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা নৈতিকতা ও শ্রেয়বোধের বিকাশ ঘটানোর জন্য বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য। বর্তমানে যে তিন স্তরবিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা সুপারিশ করা হয়েছে, তা আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমার মতে, সাধারণ শিক্ষার একটি গুণগত পরিবর্তন সাধন করে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন সাধন করে সাধারণ শিক্ষার সামনুপাতে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে এখন যে দুস্তর ব্যবধান ও বৈষম্য রয়েছে, তার অবসান ঘটানো প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে একটি পৃথক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক অনুষদ স্থাপন করে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও তুলনামূলক ধর্মশিক্ষার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা যেতে পারে, যা সমাজে নীতিবোধ ও নৈতিকতাকে বিকশিত করবে এবং তার উৎকর্ষ সাধন করবে। একই সঙ্গে ধর্মকে কেন্দ্র করে উগ্রতা, মানবতাবিরোধী কূপমণ্ডুকতা ও সংকীর্ণতা এভাবেই দূরীভূত হতে পারে।

আমাদের দেশের তথাকথিত 'প্রগতি'কামী কোনো পাঠক আমার এই অভিমত বা ব্যবস্থাপত্র দেখে আমাকে পশ্চাৎপদ চিন্তার বিকাশে উৎসাহ যোগাচ্ছি– এই অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারেন। এই অভিযোগ যদি কেউ উচ্চারণ করেন, তাতে আমি আদৌ সংকোচ বা কুণ্ঠাবোধ করব না। পাশ্চাত্য জগতের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন ও গমনাগমনের সুযোগ ও সৌভাগ্য আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন এবং আমি সেখানে জেনেছি মানুষের আধ্যাত্ম্য চেতনা ও জাগতিক চেতনার মধ্যে সমন্বয় ও সংশ্লেষ ঘটাতে না পারলে মানুষের মধ্যে ইতর প্রাণীর প্রবৃত্তিগুলোই প্রখর রূপ ধারণ করে মানবতা, সভ্যতা ও সমাজকে সংহার করতে উদ্যত হয়। আজ আমরা যে অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছি, তার মূলে রয়েছে ইতর বস্তুবাদী জগতের অধঃপতিত জীবনের প্রতি মোহ ও আকর্ষণ। বিদ্যা ও জ্ঞানবিবর্জিত শিক্ষার তকমা ধারণ করে সমাজের মানুষকে ঠকানোর কুপ্রবৃত্তি এবং মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত পাশবিকতা নিহিত, তাকে একটি ভয়ংকর রূপ দেয়া– এর অবসান কামনাই হচ্ছে আমাদের জীবনাচারের মূল লক্ষ্য। ইনসানিয়াত ও ইনসাফ সুনিশ্চিত করতে হলে আমাদের অবশ্যই সমন্বিত শিক্ষার কথা চিন্তা করতে হবে, যে শিক্ষার দ্বারা আমরা শুধু পার্থিব উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করব না, হক্কুল্লাহ আদায় করে হক্কুল এবাদও আদায় করতে পারবো। এ পথেই মানুষ বা ইনসানের সত্যিকার নাজাত তথা মুক্তি নিহিত রয়েছে।

www.pathagar.com

২১ অক্টোবর ২০০০

বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ ও জাতীয় নিরাপত্তা

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ জনবহুল একটি দেশ। ৫৬ হাজার ১২৬ বর্গমাইল এলাকার ওপর ১৩ কোটি মানুষের ভয়াবহ চাপ এই দেশে। যে কোন দেশের শিল্পায়ন ও উন্নয়নের জন্য জ্বালানি সম্পদ অপরিহার্য পূর্বশর্ত। জ্বালানি সম্পদের দিক থেকে বাংলাদেশ অত্যন্ত দরিদ্র। বাংলাদেশের মাটির নিচে আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে পেট্রোলিয়ামের উৎস আবিষ্কৃত হয়নি। বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগও অত্যন্ত সীমিত। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, তা দেশের বিদ্যুৎ চাহিদার সামান্যতম অংশই পূরণ করে। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনশ' চৌষট্টি বর্গমাইল এলাকা প্লাবিত হয়ে একটি মানবসৃষ্ট হ্রদের উদ্ভব হয়। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা বসতবাড়ি ও চাষের জমির দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বাস্তুচ্যুত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে দেশী-বিদেশী শক্তির যোগসাজশে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় বিদ্রোহের সূচনা হয়। এতে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনীতির ওপর প্রবল চাপ পড়ে। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের জন্য ক্ষতিকর শর্তে চাকমাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য বিদ্রোহের আশংকা কেটে যায়নি। এখনও প্রীতি চাকমা গ্রুপ পার্বত্য ত্রিপুরায় অবস্থান করে নতুন বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাঙ্গু নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কাপ্তাই প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে সেই প্রকল্প কখনও হাতে নেয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া বাংলাদেশে অন্য যেসব নদী বিদ্যমান, সেগুলো সমতল এলাকায় অবস্থিত বলে সেগুলো থেকেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন সম্ভাবনা নেই। পাকিস্তান আমলে ঈশ্বরদীর নিকট রূপপুরে একটি আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এজন্য প্রয়োজনীয় ভূমিও অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সে পর্যন্তই। অদ্যাপি সেই প্রকল্প বাস্তবায়নের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কারণ, আণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে ইউরেনিয়ামের দরকার, তা বাংলাদেশে নেই এবং পৃথিবীর কোন বড় শক্তি বাংলাদেশকে এজন্য ইউরেনিয়াম সরবরাহ করবে না। এর কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম রাষ্ট্র ইউরেনিয়াম হাতে পেলে পাকিস্তানের মতো আরেকটি 'ইসলামিক বোমা' তৈরী করে ফেলতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো সন্দেহ পোষণ করে যে, বাংলাদেশ নিজে ইউরেনিয়াম আণবিক বোমা তৈরীর জন্য ব্যবহার না করলেও এর পাচার বা চুরি প্রতিরোধ করার মতো শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধিকারী নয়। পাঠক অবগত আছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়া কিছু কিছু প্রজাতন্ত্রের আণবিক সক্ষমতা থাকার ফলে এগুলো যে কোন মুহূর্তে ইরান, লিবিয়া, উত্তর কোরিয়া বা পাকিস্তানের হাতে চলে যেতে পারে বলে পরাশক্তিগুলো প্রতিনিয়ত উদ্বিগ্ন থাকে। আণবিক বোমার অধিকারী বৃহৎ শক্তিগুলো কখনোই চায় না যে, এই মারণাস্ত্রের ওপর অন্য কোন রাষ্ট্রের, বিশেষ করে, মুসলিম রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক এবং তাদের একচেটিয়া ক্ষমতা বিলুপ্ত হোক। বাংলাদেশে খনিজ জ্বালানি শক্তির প্রধানতম এবং একমাত্র উৎস হলো গ্যাস। গাছ-গাছড়া ও বনভূমি থেকে যে ট্রেডিশনাল জ্বালানি শক্তি পাওয়া যায়, সেই গাছ-গাছড়া ও বনভূমিও নগরায়ন, জনশক্তির চাপ ও ধনিক শ্রেণীর কারসাজিতে বিলুপ্ত হওয়ার পথে। এতে বাংলাদেশের পরিবেশ বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে। যেখানে একটি দেশের ভূমির ২৪ শতাংশ বনভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকার কথা, সেখানে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ৬ শতাংশ বনভূমিও নেই। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন আজ হুমকির মুখে। ফারাক্কায় বাঁধ দেয়ার ফলে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় সুন্দরবনের বৃক্ষরাজি বিলুপ্ত হবার পথে। অন্যদিকে, সুন্দরবনের একটি

www.pathagar.com

ব্লককে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ফলে, গ্যাসকূপের যে কোন বিস্ফোরণে যে কোন সময়ে সুন্দরবন জ্বলে যেতে পারে। অক্সিডেন্টাল কোম্পানী সিলেটের মাগুড়ছড়ায় গ্যাসকূপ খনন করতে গিয়ে যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থার প্রশ্নে অবহেলা করায় যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছিল, তার ফলে গ্যাসকূপটি পরিত্যক্ত হয় এবং চারপাশের বিশাল এলাকায় জমি চাষ-বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এছাড়া, তেজস্ক্রিয়তার বিপদ সম্পর্কে অনেকে আশংকা প্রকাশ করেছেন। গ্যাস এদেশের জ্বালানির একমাত্র প্রধান সূত্র হওয়া সত্ত্বেও জনবহুল এই দেশে গ্যাস উত্তোলনে 'কেন সাবধানতার প্রয়োজন', তা মাগুরছড়ার ঘটনা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

সমগ্র বাংলাদেশকে গ্যাস উত্তোলনের জন্য ২৩টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। সরকার তড়িঘড়ি করে এইসব ব্লকগুলো আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলোর কাছে লীজ দিতে যাচ্ছে। এজন্য প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতিবেশী ভারতে গ্যাস রপ্তানী করার জন্য আমেরিকা বাংলাদেশের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ হোলজম্যান এ নিয়ে বহু দেনদরবার করেছেন ও প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছেন এবং সেমিনার, ওয়ার্কশপে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশের গ্যাস মাটির নিচে থেকে গেলে এর কোন মূল্য নেই। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মাটির নিচ থেকে গ্যাস তুলে বিদেশী কোম্পানীগুলোর বিনিয়োগকৃত পুঁজি অতীব দ্রুতহারে তুলে নেয়া ও তাদের মুনাফার স্বার্থে এই গ্যাস ভারতে রপ্তানীর জন্য চাপ সৃষ্টি কোনক্রমেই বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের সহায়ক নয়। বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি যেমন বাংলাদেশের প্রাণ, ঠিক তেমনি যে সামান্য পরিমাণ গ্যাস বাংলাদেশে আছে সেটাও বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য রক্ত প্রবাহের একমাত্র উৎস। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত বিপ্লবের পর লেনিন বলেছিলেন, তার বলশিভিজম বা সমাজতন্ত্রের অর্থ হল মার্কসবাদ ও বিদ্যুতের যোগফল। যে কোন পশ্চাদপদ সমাজে বিদ্যুৎ অন্ধকারকে অপসৃত করে, কলকারখানার চাকা ঘোরায় ও সেচযন্ত্র চালায়। এ কারণে বিদ্যুৎ আধুনিকায়ন ও শিল্পায়নের প্রধানতম অনুঘটক। এছাড়া অন্ধকার গ্রামে বিদ্যুতের আলো ভূতপ্রেতের ভয়ভীতি দূর করে মানুষকে সংস্কারমুক্ত ও আধুনিকতা মনস্ক করে। বাংলাদেশে এখন যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, তার শতকরা ৯৭ ভাগ গ্যাস থেকে উৎপাদিত হয়। গ্যাসের পরিবর্তে কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন পোড়া কয়লার কালো ধোঁয়ায় বায়ু দূষণ ঘটে। পানিশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে জলমগ্নতার সৃষ্টি হয়; বনভূমি উজাড় হয় ও জনপদ লুপ্ত হয়। সুতরাং গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সর্বাধিক কাম্য। আজ আমাদেরকে বলা হচ্ছে, এই মূল্যবান সম্পদটি বিদেশে, বিশেষ করে ভারতে রপ্তানী করতে দিতে হবে। অন্যথায় কোন বিদেশী কোম্পানী মাটির নিচ থেকে এটা উত্তোলন করার জন্য এগিয়ে আসবে না। বাংলাদেশে কী পরিমাণ গ্যাসের রিজার্ভ আছে, তা আমরা ভালো করে জানি না। অথচ ইউএস জিওলজিকেল সার্ভে বলছে, সম্ভাব্য গ্যাসের রিজার্ভ ৫০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিটের মতো। কেবলমাত্র উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এই হিসাব দেয়া হচ্ছে, যা মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। এই স্ফীত হিসাব দেখানোর একমাত্র কারণ হলো গ্যাস রপ্তানীর প্রশ্নে বাংলাদেশের জনমতকে বিভ্রান্ত করা। ভারতীয় লোকসভায় জনৈক সদস্যের প্রশ্নের জবাবে ভারতের জ্বালানি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতে গ্যাস রপ্তানীর বিষয় সম্পর্কে তিনি অবগত নন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্যকে সুধরে দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী লোকসভার সদস্যদের জানালেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতে গ্যাস আনয়নের প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান চৌধুরী মৃদু আপত্তি জানালেও অটল বিহারী বাজপেয়ীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেননি। তার বক্তব্য যে সর্বৈব মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর সেটাও স্পষ্ট করেননি। সুতরাং দেশবাসী ইতোমধ্যেই ভাবতে শুরু করেছে, গোপনে গোপনে রাখঢাক গুড়গুড় করে সরকার কিন্তু গ্যাস রপ্তানীর ব্যাপারে মনঃস্থির করে ফেলেছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী সরকার বাংলাদেশের জীবন-মরণ গ্যাসের প্রশ্নে প্রচণ্ড শঠতা, গোপনীয়তা ও অস্বচ্ছতার আশ্রয় নিয়েছে। মার্কিন জ্বালানি সংক্রান্ত ডেপুটি এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হামফ্রে সাহেব কদিন আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে গ্যাস নিয়ে কথা বলে দেশে ফেরার পথে

www.pathagar.com

ব্যাংকক গিয়ে দ্বিতীয় দফা আলোচনার জন্য বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন। বোঝা যাচ্ছে, মার্কিন সরকার প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। জাতি যখন কোন বিদেশী শক্তির তরফ থেকে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত চাপের সম্মুখীন হয়, তখন ক্ষমতাসীন সরকার বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে চাপ প্রতিহত করার চেষ্টা চালায়। পৃথিবীর বহু দেশে এমন নজির আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশে তা হবার নয়। বরং কুৎসিৎ, কটূ মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে প্রচণ্ড দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কোন সভ্য, সুশীল মানুষ কী অন্য মানুষের দৈহিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে ফোড়ন কাটে? একজন মহিলা যিনি আবার 'জাতির পিতার কন্যা, কি করে অন্য একজন মহান মুক্তিযোদ্ধার সহধর্মিনী সম্পর্কে উক্তি করতে পারেন যে, তিনি এল. ও. ভি.ই- লাভে বিশ্বাস করেন? এদিকে এই প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনের প্রয়োজনে বেগম খালেদা জিয়ার পূর্বাণী হোটেলে অবস্থান করা নিয়েও অত্যন্ত নোংরা মন্তব্য করেছেন। হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতির-সভ্যতার-ভব্যতার ইতিহাসে এমন কালিমা অতীতে কোন শাসক বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তি লেপন করেছেন কি? এ কারণেই আজ জাতীয় কোন সমস্যা ও সংকট নিয়ে সহমত প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না, গ্যাসের ব্যাপারে তো নয়ই।

১৯৬০ সাল থেকে গ্যাস দেশীয় জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বছর ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে জ্বালানি শক্তি হিসেবে গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে গ্যাস গ্রহস্থালীর রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। ১৯৬১ সাল থেকে ফেঞ্চুগঞ্জে অ্যামোনিয়া ইউরিয়া সার কারখানায় গ্যাস উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ, সার, শিল্পকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গৃহস্থালীতে গ্যাস ব্যবহৃত হয়। সার কারখানাগুলো প্রতিষ্ঠিত হবার পর গ্যাসের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত ১৭৫ এমএমএসসিএফডি (MMSCFD) পরিমাণ গ্যাস সার খাতে ব্যবহৃত হয়েছে। সার কারখানাগুলো ১৯৮৬, ১৯৮৯, ১৯৯৬ সনে দৈনিক ১০৩, ১৫৪, ২১৩ এমএমএসসিএফডি গড় হারে গ্যাস ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ খাতে ১৯৮৬-৮৯ সময়কালে ১ হাজার ৭৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজিত হয়েছে। ১৯৯৬ থেকে ৯৯ সময়কালে আরও ৬৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজিত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১৯৮৫, ১৯৮৬, ১৯৮৯ এবং ১৯৯৬ সালে দৈনিক গড়ে যথাক্রমে ১০৯, ১৪২, ২০৩ ও ৩০৩ এমএম এসসিএফডি হারে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ১৯৯৯ সালের মে মাসে সর্বোচ্চ দৈনিক গ্যাসের চাহিদা ছিল ৯১৫ থেকে ৯৩০ এমএমএসসিএফডি।

এবার গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে আসা যাক। ১৯১০ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সীতাকুণ্ড এলাকায় গ্যাস আবিষ্কারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। ১৯১০ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ৮৯ বছরে ৬১টি গ্যাসকূপ খনন করা হয়। এর ফলে একটি তেলক্ষেত্র ও ২১টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এর মধ্যে দুটি ক্ষেত্র সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। ১৯৭২ থেকে ৯৯- এই সময়কালে পেট্রোবাংলা ১৯টি আবিষ্কারমূলক তেলকূপ খনন করে এবং ৯টি গ্যাসক্ষেত্র ও ১টি তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। বাংলাদেশ হবার পরে বাংলাদেশকে ২৩টি ব্লকে ভাগ করে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীগুলোর মাধ্যমে উৎপাদন-বন্টন চুক্তির ভিত্তিতে তেল ও গ্যাস আহরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। '৭০ দশকের প্রথমদিকে ৬টি আন্তর্জাতিক কোম্পানীকে ৭টি ব্লকে গ্যাস, তেল অনুসন্ধানের জন্য সুযোগ দেয়া হয়। '৭৬-৭৭ সালে সমুদ্র উপকূলের অদূরে ৭টি কূপ খনন করা হয় এবং কেবলমাত্র কুতুবদিয়াতেই একটি গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হয়। ১৯৮৮ সালে শেল ও সিমিটার কোম্পানীকে ৪টি ব্লকের ইজারা দেয়া হয় এবং এরা ৩টি কূপ খনন করে একটি গ্যাসক্ষেত্র (সিলেটের লাকাতুরা) আবিষ্কার করে। '৯০-এর দশকের, প্রথমদিকে ৪টি আন্তর্জাতিক কোম্পানীকে ৮টি ব্লক ইজারা দেয়া হয়। এর ফলে ৬টি কূপ খনন করে মাত্র দুটি গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হয়। এর মধ্যে আবার একটি মাগুরছড়া বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিটের বেশী গ্যাস নেই বলে দেশীয় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এমনকি, বিদেশী কোম্পানী আবিষ্কৃত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে ৪.৫০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিটের গ্যাস রিজার্ভ রয়েছে বলে দাবী করা হলেও এটা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এই রিজার্ভের পরিমাণ দাবীকৃত পরিমাণের অর্ধেকের কিছু বেশি হতে পারে। সুতরাং আজ আমাদের সঠিকভাবে

www.pathagar.com

জানা প্রয়োজন, বাংলাদেশে গ্যাস মজুদের প্রকৃত পরিমাণ কত? এই মজুদ যাচাইয়ের জন্য দেশী-বিদেশী একাধিক সূত্র ব্যবহার করতে হবে। শুধুমাত্র মার্কিন হিসাবের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের একটি সেল গঠন করে বৈদেশিক সূত্রগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যসহ তৃতীয় বিশ্বের যেসব এলাকায় পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস সম্পদ রয়েছে, সেসব এলাকায় যুগ যুগ ধরে সাম্রাজ্যবাদীরা লুণ্ঠন চালিয়েছে। আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ফলে এই লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে স্থানীয় শক্তি মাথা তুলে দাঁড়ায়। লিবিয়ার গাদ্দাফীর প্রেরণায় 'ওপেক' গঠিত হয়। আজ যখন তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি ৩০ ডলারেরও বেশি হয়ে পড়েছে, তখন পশ্চিমা বিশ্বের নাভিশ্বাস উঠেছে। ট্রাক ও লরি চালকরা ইউরোপে অবরোধ সৃষ্টি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব সাবধানতার সঙ্গে নিজস্ব পেট্রোলিয়াম মজুদ করে রাখছে এবং বিদেশ থেকে আমদানী করে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করছে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পেট্রোলিয়াম মজুদ করে রাখছে।

পেট্রোলিয়াম ও গ্যাসের বিকল্প জ্বালানি শক্তি আবিষ্কারের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যে হনুজদুরস্ত, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে আর কোন্ দেশ ভালো করে জানে? সেই মার্কিনীরাই আমাদের নসিহত করছে, আমরা গ্যাস রপ্তানী করে একটি মধ্যম আয়ের (মাথাপিছু ৭০০ থেকে ১০০০ ডলার) দেশে পরিণত হতে পারবো। ম্যাক্সিকো বহু বছর ধরে তেল রপ্তানী করেও আজ দেউলিয়া রাষ্ট্র। নাইজেরিয়ার তেল সম্পদ শূন্য হয়ে মাথাপিছু আয়ের দিকে থেকে বাংলাদেশেরও পেছনে পড়ে গেছে। অথচ একটা সময়ে নাইজেরিয়ায় বিত্তশালীদের রমরমা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। বিদেশে তেল রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে দামী গাড়ীসহ অনেক বিলাসদ্রব্য আমদানী করা হয়েছিল। দেশের শিল্পায়নের জন্য সেই অর্থ নাইজেরিয়ার এলিটদের অলিগার্কি ব্যবহার করেনি। তেল সম্পদের বখ্‌রায় সামরিক অধিকর্তারা ও তাদের চেলা-চামুণ্ডারা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। তাদের এই অপচয়ধর্মী বিলাসিতাকে জনগণ যাতে প্রতিহত করতে না পারে, তার জন্য গণতন্ত্রের পরিবর্তে মারাত্মক স্বৈরতন্ত্র চালু করা হয়েছিল। আবিওলার মতো জনপ্রিয় নেতাকে স্বৈরশাসকের নির্যাতন ও নিপীড়নের ফলে প্রাণ দিতে হয়েছে। মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ রপ্তানী করে হঠাৎ অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় অপচয়ের অর্থনীতি ও স্বৈরশাসনের সংমিশ্রণকে অর্থনীতিবিদরা ডাচ ডিজিজ (ওলন্দাজ রোগ) নাম দিয়েছেন। ১৯৯৮ সালে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে নর্থ ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জন এডামস বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামের সুধীমহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন ও ব্যক্তিগত পর্যায়েও আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি গ্যাসের রপ্তানীর প্রশ্নে এই ডাচ ডিজিজের বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন। একজন মার্কিনী অধ্যাপক হিসেবে বাংলাদেশ থেকে গ্যাস রপ্তানীতে তার আপত্তি ছিল না; তিনি শুধু এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন মাত্র।

গ্যাস ডাল-ভাত, ফলমূলের মতো ভোগ্যপণ্য নয়। গ্যাসসহ মাটির নিচে অনবায়নযোগ্য যে সম্পদ, তার চরিত্র ক্যাপিটাল বা পুঁজির মতো। অর্থনীতিতে পুঁজির ভূমিকা হলো, উত্তরোত্তর উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হওয়া, অর্থাৎ বেশ সময় ধরে স্রোতের আকারে অন্য পণ্যের প্রবাহ সৃষ্টি করা। তবে, ব্যবহারের ফলে এক সময় Capital asset-টিও নিঃশেষ হয়ে যায়। গ্যাস, পেট্রোলিয়াম বা কয়লা তেমনিভাবে অন্য পণ্যসামগ্রী বা ভিন্ন ধরনের জ্বালানির যোগান দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। যে খনি একবার নিঃশেষ হয়, তা কোটি কোটি বছরেও পৃথিবীতে মানবকুলের জন্য ফিরে আসবে না। বিজ্ঞানের Entropy Law-এর এটাই নিয়ম। একটি গ্যাসক্ষেত্র বা তেলক্ষেত্র পুঁজিবাদী কোম্পানীকে লীজ দেয়া হলে সেই কোম্পানী চাইবে, অতিদ্রুত তার বিনিয়োজিত অর্থ উদ্ধার করে সর্বাধিক সম্পদ খাজনা (Resoure Rent) আদায় করতে। এতে দেশবাসীর কোন কল্যাণ হবে কিনা, তা তাদের বিবেচনায় কখনোই স্থান পায় না। যেহেতু গ্যাস বা তেলক্ষেত্রগুলো জনগণের সম্পদ, সেহেতু কালের প্রবাহে সেইসব উৎস থেকে শক্তি সম্পদ উত্তোলন করে জনগণের ভোগপ্রবাহের যোগফল সর্বাধিকরণই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাম্য। প্রযুক্তি ও অর্থসম্পদের স্বল্পতার ফলে বাংলাদেশকে তার গ্যাস সম্পদ আহরণের জন্য বিদেশী কোম্পানীর দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। এর ফলে জাতিকে চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। বিশ্বায়নের এই যুগে আন্তর্জাতিক ফাইনান্সিয়াল মার্কেট থেকে

www.pathagar.com

ঋণ নেয়া আজকাল সম্ভব। আমরা যদি একটু ধৈর্য ধরে আগামী পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে কিছু উচ্চমানের দেশপ্রেমিক প্রযুক্তিবিদ, ভূ-তাত্ত্বিক এবং এনার্জি ইকোনমিস্ট সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে World finance market থেকে ঋণ নিয়ে দেশীয় কৃথবিদ্য মানুষের সমন্বয়ে নিজেদের সম্পদ নিজেরাই আহরণ করতে পারবো। প্রয়োজনে একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে negotiate করে দেখতে পারি। এছাড়া এসব ব্যাপারে South-South সহযোগিতারও অবকাশ আছে। কোন কোন আরব দেশ থেকেও প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। এসব করার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা। জাতীয় নেতৃত্বের দৃঢ় অঙ্গীকারই জাতিকে। মনজিলে মাকসুদে পৌঁছাতে পারে, জাতীয় নেতৃত্ব মীরজাফর হলে আমরা হয়ত কখনোই তা করতে পারবো না। তবু আশা আছে জনগণ একদিন না একদিন তাদের মুক্তির পথ খুঁজে নেবে।

রাজীব গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে শ্লোগান দিলেন, ভারতকে তিনি একবিংশ শতাব্দীর জন্য প্রস্তুত করবেন। এ জন্য সবচাইতে বেশী গুরুত্ব তিনি আরোপ করলেন যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির ওপর। তিনি আমেরিকা সফরে গিয়ে ভারতীয় টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তিবিদ স্যাম পিরতোদাকে বগলদাবা করে সঙ্গে নিয়ে আসলেন। পিরতোদাও প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাসিক মাত্র ১ রুপি টোকেন বেতনে কাজ করতে রাজি হলেন। ভারতের জংধরা, সেকেলে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসল। আজকাল সেখানে তিন হাজার রুপির বিনিময়ে তিনদিনের মধ্যে টেলিফোন সংযোগ পাওয়া যায়। আরেকটু বেশী আর্জেন্ট ফি দিলে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই পাওয়া যায়। আর আমাদের বাংলাদেশে? সে কথা না বলাই ভাল। টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত এই উন্নতিই ভারতকে IT অর্থাৎ ইনফরমেশন টেকনোলজি শিল্পে পৃথিবীর অন্যতম প্রথম সারির দেশে পরিণত করেছে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ভারত সফরে এসে দেখতে গেলেন ভারতের সিলিকন ভ্যালি। IT খাত থেকে ভারত আজ কোটি কোটি ডলার বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করছে। ভারতের আইটি শিল্প বাংলাদেশকে পশ্চাৎ ভূমি হিসেবে ব্যবহার করছে। যদিও বফোর্স কেলেঙ্কারির জালে জড়িয়ে ও 'গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়' জনতার এই শ্লোগানে রাজীব ক্ষমতার মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে তামিল ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন; তৎসত্ত্বেও রাজীবের এই দূরদৃষ্টি ভারতীয় জনগণ স্মরণ করবে। আমাদের কোন নেতা-নেত্রী কি রাজীবের এই ভাল দিকটি অনুসরণ করার কথা ভাববেন? এক রুপি বেতনে স্যাম পিরতোদার মতো মানুষ না পাওয়া গেলেও একই যোগ্যতার কিছু দেশীয় বিশেষজ্ঞকে আন্তর্জাতিক কনসালটেন্টদের যে হারে সম্মানী বা বেতন দেয়া হয়, তা প্রদান করে জাতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী সুফল বয়ে আনতে আপত্তি কোথায়? এসব ক্ষেত্রে আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয়কে ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক অনুপ্রাণিত একাউন্টিং মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। অর্থমন্ত্রী হয়ে প্রধানমন্ত্রীর ওপর সুপার প্রধানমন্ত্রী হওয়া চলবে না। জাতিকে আজ বাংলাদেশের একমাত্র জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পদ গ্যাস নিয়ে সকল দেশী-বিদেশী অপশক্তির ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে। শুধুমাত্র এই একটি ইস্যুতে সকল দেশপ্রেমিক দল ও শক্তির সমন্বয়ে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যদি একটি জাতীয় কনভেনশনের ডাক দেন, তাহলে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সর্বোত্তম জাতীয়তাবাদী ভূমিকা পালন করা হবে।

আফতাব আহমাদ :

আজ আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি, আজ থেকে ২১ বছর আগে সংঘটিত ভুবন কাঁপোনো ইরানের ইসলামী বিপ্লবের কথা। আমি তখন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শেষ ব্রিটিশ শাসক লর্ড মাউন্ট বেটেনের অন্যতম উপদেষ্টা প্রফেসর মরিস জোন্সের তত্ত্বাবধানে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের গবেষণায় রত ছিলাম। একথা সর্বজনবিদিত যে, লন্ডন যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশের ও জাতির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার একটি আন্তর্জাতিক নিরাপদ কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। দক্ষিণপন্থী থেকে শুরু করে বামপন্থী, নৈরাজ্যবাদী থেকে শুরু করে তমসাবাদী– সব রকমের মতাদর্শে দীক্ষিত সক্রিয়বাদীরা লন্ডনে প্রকাশ্যে কিংবা সংগোপনে সবসময়ই তৎপর ছিল। ইউরোপের নানা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে কমিউনিজমের জনক কার্লমার্কসের শেষ আশ্রয়স্থলও

www.pathagar.com

ছিল এই লন্ডন শহর। লন্ডনের হাইগেটের সমাধিক্ষেত্রে মার্কস সমাধিস্থ রয়েছেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে ডান-বামের রাজনীতির বিরোধের চাইতেও লন্ডনের প্রগতিশীল সক্রিয়বাদীদের মধ্যে যে বিষয়টি প্রশ্ন আকারে দেখা দিয়েছিল– জাতিসত্তার স্বরূপ কী, জাতিরাষ্ট্রের যৌক্তিকতা কী এবং আন্তর্জাতিক সংহতি ও সখ্য বজায় রেখেও একটি রাষ্ট্রকে কেন বারবার তার জাতীয় নিরাপত্তার কথা ভাবতে হয়? এসব বিষয় নিয়ে অগ্রগামী জ্ঞান অন্বেষী বিদ্যুৎজনরা নানা ধরনের তর্ক-বিতর্কে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করতেন। ঐ সময়টায় ইন্দোচীনে কাম্পুচিয়া (ক্যাম্বোডিয়া) এবং ভিয়েতনামের সম্পর্কে এত নেতিবাচক হয়ে পড়েছিল যে, বাম ঘরানার বিদ্যাৎজনের কোন্ পক্ষে অবস্থান নেবেন, তা নিয়ে মহাসংশয়ে পড়েছিলেন। খেমাররুজরা যখন পনমপেনে ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং ভিয়েতনাম বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট ভিয়েতনামপন্থী কাম্পুচীয় কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় যখন অধিষ্ঠিত হয়, তখন দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ক্ষত-বিক্ষত কাম্পুচিয়ার রাজধানী পনমপেন একটি প্রেতপুরীতে পরিণত হয়। আমার আজও মনে পড়ে, কাম্পুচিয়া-ভিয়েতনাম সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ইন্দোচীনে সৃষ্ট এই সংকটকে প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করে যথোচিত দিক নির্ণয়ের জন্য সরেজমিন বিষয়টি খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আফ্রিকান স্টাডিজের প্রবীণ শিক্ষক, বিশিষ্ট পণ্ডিত ম্যালকম কল্ডওয়েল পণমপেন সফরে গিয়েছিলেন। এর আগে তিনি ভিয়েতনাম তথা ইন্দোচীন যুদ্ধের সময়ে মার্কিনীদের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের মুক্তিকামী জনতার সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বহুবার লন্ডনের রাজপথ কাঁপিয়ে তুলেছিলেন এবং হাউজ অব কমন্সকে তীব্রভাবে ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন। সেই পণ্ডিতপ্রবর ম্যালকম কর্ল্ডওয়েল পনমপেনের একটি হোটেল কক্ষে রহস্যাবৃত পরিবেশে গভীর নিশীতে নিহত হন। ক্যাম্পুচিয়ায় ক্ষমতা বদলের পরপরই To teach Vietnam a lesson' চীন দেশের সশস্ত্র বাহিনী ভিয়েতনাম আক্রমণ করে ভিয়েতনামের বেশ অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং ভিয়েতনামের প্রভূত ক্ষতিসাধান করে। চীনদেশ একতরফাভাবে নিজ সৈন্যদল প্রত্যাহার করে আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা বরাবর ফিরে যায়। লন্ডনে বসে তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক হিসেবে আমি এবং আমার মত আরও বহুজনের কাছেই গোটা বিষয়টি শুধু বিস্ময়করই ঠেকেনি, কৌতূহলউদ্দীপকও মনে হয়েছে। এরই পাশাপাশি বোদ্ধা সমাজের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের তোলপাড় চলছিল ইরিত্রিয়ার মুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। আলজেরিয়ার ইসলামী বিপ্লবী দল 'ফ্রন্ট ইসলামিক দু সাল্যুট' তথা FIS-এর তৎপরতা নিয়ে গভীর উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস প্রবাসী আলজেরীয় ও আফ্রিকান বন্ধুদের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে। এ সময়ে সুদানও একটি সামাজিক আলোড়নের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। আর ইরানের কথাতো বলাই বাহুল্য। আয়াতুল্লাহ খোমেনী তখন কেবলমাত্র ইসলাম কিংবা ইরানের নেতা হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেননি, তাকে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার প্রাণপুরুষ ও প্রতীক হিসেবেও দেখা হত।

মনে পড়ে আজ, ১৯৫১ সালে ইরানের জাতীয়তাবাদী নেতা মোহাম্মদ মোসাদ্দেক-এর নেতৃত্বে কীভাবে অ্যাংলো ইরানিয়ান তেল কোম্পানীগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল এবং আবাদানের গণঅভ্যুত্থানের পর রেজা শাহ পাহলভী কীভাবে বাধ্য হয়েছিল মোসাদ্দেককে ইরানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করতে। কিন্তু সেদিন ব্রিটিশ বহুজাতিক তেল কোম্পনীগুলো বিষয়টিকে যেমন স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি, তেমনি বিশ্ব পুঁজিবাদের মুরুব্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপারটিকে নেক নজরে দেখেনি। বস্তুত CIA'র বিশেষ লক্ষ্য ছিল মোসাদ্দেককে কীভাবে উৎখাত করা যায়, তার কৌশল উদ্ভাবন করা। মোসাদ্দেকের জাতীয়তাবাদী সরকার ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত একের পর এক বহুজাতিক কোম্পানী বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতি যখন অনুসরণ করে চলছিল তখন আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ, বহুজাতিক কোম্পানী এবং সাম্রাজ্যবাদ এই তিন কালো পাহাড়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও নিবিড়তর জাতীয় গণ ঐক্য গঠন করার কৌশল অবলম্বন করতে ব্যর্থ হওয়ায় মোসাদ্দেক এক ঘরে হয়ে পড়েন। অনেকটা ১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের দশা হয়েছিল মোসাদ্দেকের সরকারের। গোড়ার দিকে জনসমর্থন মোসাদ্দেকের প্রতি এত ব্যাপক ও প্রগাঢ় ছিল যে, ইরানের শাহেনশাহকে এক পর্যায়ে তেহরান ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। তার কারণ তিনি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বারবার মোসাদ্দেকের সংস্কার কার্যক্রমে অহেতুক বাধাদান করছিলেন। কিন্তু

www.pathagar.com

ঐ যে বললাম, প্রাসাদচক্রী ও সাম্রাজ্যবাদসহ তিন কালো পাহাড়ের চক্রান্তে এবং মোসাদ্দেকের ভুলের পুনরাবৃত্তির কারণে CIA একটি উপযুক্ত সময় বেছে নিয়ে রীতিমত বাক্সভর্তি ক্যাশ ডলার নিয়ে বিমানে করে তেহরান বিমানবন্দরে অবতরণ করে এবং CIA-র রুজভেল্ট সাহেব ও তেহরানে নিযুক্ত চরেরা তেহরানের কসাইপাড়ার। অন্ধগলিতে প্রকাশ্যে খোলামেলাভাবে ডলার নোট বিতরণ করে। জাতীয় বেঈমানদের প্ররোচনায় এবং CIA-র ইন্ধন ও যোগসাজশে তেহরানে সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় মোসাদ্দেকবিরোধী এক কৃত্রিম অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। মার্কিন বিশেষ বিমানে করে ইরানের শাহ তেহরান প্রত্যাবর্তন করেন। মোসাদ্দেক সরকারকে বরখাস্ত করে মোসাদ্দেককে গৃহে অন্তরীণ করে রাখার নামে গ্রেফতার করা হয়। এ সব ঘটনাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু এবং এগুলো সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক ছাড়া সবার কাছেই স্পষ্ট ছিল। এতদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র '৫৩ সালে তেহরানে যে সাজানো অভ্যুত্থান ঘটান হয়েছিল তার দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে এলেও সাম্প্রতিককালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইট ১৯৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও CIA জড়িত থাকার ঘটনাটি স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে, এটি ছিল একটি অন্যায় পদক্ষেপ এবং ইরানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ। অলব্রাইট এও স্বীকার করেছেন যে, মোসাদ্দেক একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবদী ছিলেন এবং তার প্রতি যে আচরণ করা হয়েছিল তা অত্যন্ত আপত্তিকর, অন্যায় ও গর্হিত। অলব্রাইটের এই স্বীকারোক্তির পেছনেও অবশ্য মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের স্বার্থ কাজ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিককালে ইরানের সঙ্গে পূর্বতন ঝগড়া মিটমাট করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন সমীকরন প্রতিষ্ঠায় বেশ উদগ্রীব। মার্কিনবিরোধী জঙ্গী ইরানীদের মনকে নমনীয় ও কোমল করে তোলার জন্য অলব্রাইট ১৯৫৩ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে পাপাচার করেছে, তা অকপটে স্বীকার করে এখন ইরানীদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা চাইছেন।

১৯৭৯-তে ইরান বিপ্লবের বিজয়োল্লাসে লন্ডন নগরী যখন টগবগ করছিল, সে সময়ে ফিলিপাইনের নিউ পিপলস আর্মির একজন মহিলা গেরিলা, যিনি এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন, তিনি ইউরোপে ঝটিকা সফরে বেরিয়ে পড়েছিলেন নিউ পিপলস আর্মি এবং মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের পক্ষে যুগপাৎভাবে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার জন্য। তারিখটি এখনও আমার মনে পড়ে- ৫ মে ১৯৭৯। ৫ মে হচ্ছে কার্ল মার্কসের জন্মদিন, সেই উপলক্ষে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর একটি সেমিনারকক্ষে ফিলিপাইনের অভিশাপ 'বহুজাতিক কর্পোরেশন ও শোষিত ফিলিপিনো জনগণের মুক্তির পথ' শীর্ষক একটি সেমিনারে প্রধান ও একক বক্তা হিসেবে সেই অধ্যাপিকা প্রায় দু'ঘন্টাব্যাপী যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তা শোনার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ঐ সেমিনারে সেই মহিলা গেরিলা অধ্যাপক (তাঁর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এখনো আমি তার নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম) হেড প্রজেক্টার দিয়ে বিভিন্ন স্লাইডের সাহায্যে ফিলিপাইনের দারিদ্র্য ও জনগণের দুঃসহ যাতনার মর্মন্তুদ কাহিনী তুলে ধরেছিলেন। তিনি বিবৃত করলেন, কীভাবে ফিলিপাইনে (যার প্রাচীন নাম ছিল মাহারলিকা) স্প্যানিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সুবাদে মধ্য আমেরিকা বিশেষ করে ম্যাক্সিকোসহ দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ফিলিপাইনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাত হাজার দ্বীপপুঞ্জের একটি দেশ, যা এক সময়ে চীন দেশের ইউনান প্রদেশের জনসাধারণের অভিবাসনের কারণে মনুষ্যবাস উপযোগী হয়ে ওঠে, তা কালানুক্রমে ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতে স্প্যানিশদের দখলে চলে যায়। ১৫৪৩-এ স্পেনের তৎকালীন যুবরাজ যিনি পরবর্তী পর্যায়ে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন, তাঁর নামানুসারে ৭ হাজারেরও অধিক দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্রটির নামকরণ করা হয় ফিলিপাইন। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনের বিরুদ্ধে সাত বছরব্যাপী যুদ্ধে ব্রিটেন ম্যানিলাকে দু'বছরের জন্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়। বলাই বাহুল্য, স্প্যানিশ প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ফিলিপাইনে খ্রিস্টীয় যাজকদের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষ করে ডমিনিকান্স, ফ্রান্সিসকান্স এবং অগ্যাস্টিনিয়ান্স শুধু তৎপরই ছিল না, স্প্যানিশ সশস্ত্র বাহিনীর সাথে ধর্মযাজকরা হাত মিলিয়ে ফিলিপিনো জনসাধারণের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার ও জনসাধারণের ওপর অকথ্য নির্যাতন অব্যাহত রাখে। ১৮৯৬ সালে হোসে রিজালের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে স্প্যানিশ উপনিবেশবাদী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রথম জাতীয়তাবাদী গণবিদ্রোহ সূচিত হয়। ১৮৯৮-এ স্প্যানিশ অ্যামেরিকান যুদ্ধ সূচিত হওয়ার পর জেনারেল এমিলি ও এগুইনালডো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সমর্থন নিয়ে ফিলিপাইনের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্পেনের পরাজয়ের পর জাতীয়তাবাদীরা দেখল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বাধীনতার স্পৃহা ও চেতনাকে সম্মান করা তো দূরের কথা, ফিলিপাইনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন অস্তিত্বকেই স্বীকার করতে রাজি ছিল না। ১৮৯৯ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়, যে লড়াইয়ে দুর্ভাগ্যবশত ফিলিপাইনের দেশপ্রেমিক জনসাধারণ পরাজয়বরণ করে এবং ফিলিপাইন সম্পূর্ণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ফিলিপাইন জাপানের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৪৬-এ ফিলিপাইন একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু ফিলিপাইনের রণকৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে গড়ে ওঠে দুর্ভেদ্য মার্কিন সামরিক স্থাপনা ও ঘাঁটি। এই সময়ে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো একের পর এক ছুটে আসে পুঁজি বিনিয়োগের নামে ফিলিপাইনের খনিজ সম্পদ লুট করার জন্য। ফিলিপাইন কয়লা, আকরিক নিকেল, তামা, ক্রোমাইট, লোহা এবং রৌপ্যসহ খনিজ সম্পদে ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। কিন্তু তাদের ছিল না একটি স্বাধীন সরকার। ছিল না একটি অর্থবহ খনিজনীতি এবং ছিল না যথোপযুক্ত কারিগরি দক্ষতা ও প্রযুক্তি। এসব দুর্বলতা ও লুটেরা দুর্বৃত্তদের যোগসাজশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের নামে যে কিম্ভুতকিমাকার এক বিকৃত পুঁজিবাদ ফিলিপাইনে গড়ে উঠল মার্কিনী সমর ছত্রছায়ায়, তারই নামই হচ্ছে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম। আমাদের সেই মহিলা গেরিলা বন্ধুটি সজল নয়নে হেড প্রজেক্টারের মাধ্যমে গোটা ফিলিপাইনের মানচিত্র তুলে তার লাল পয়েন্টার লাইট দিয়ে ধারা বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন– ফিলিপাইনের এই অঞ্চল তুমুক বহুজাতিক কর্পোরেশনের আর এই অঞ্চল অমুক বহুজাতিক কর্পোরেশনের। পয়েন্টার লাইট দিয়ে একের পর এক তিনি ফিলিপাইনের ইঞ্চি ইঞ্চি জমিও দর্শক-শ্রোতাদের সামনে দেখাচ্ছিলেন আর উপসংহার টেনে ডুকরে কেঁদে উঠে বলছিলেন, ফিলিপিনে জনগণ আজ এক ইঞ্চি জমিরও মালিক নয়, সমগ্র ফিলিপাইনের ওপর মার্কিন সামরিক ছত্রছায়ায় বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহের সর্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বললেন, আজ আমাদের বাঁচার একটিই পথ 'হয় আমাদের মরতে হবে, না হয় তাদের মারতে হবে'। তিনি এও বললেন '১৯৭২ থেকে মার্কোসের সামরিক শাসন সামগ্রিকভাবে ফিলিপাইনের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চাপিয়ে দেয়া ছাড়াও জাতিবিদ্বেষ সৃষ্টি করে অঞ্চলে অঞ্চলে জাতিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা জিইয়ে রেখেছে, এমনকি মিন্দানাও-এ মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট খ্রিস্টীয় বর্বরতা থেকে মুসলিম স্বকীয়তা সংরক্ষণের যে সংগ্রাম করছে, তার ওপর নিপীড়নের মাত্রা এমনভাবে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী উথাপন ছাড়া মুসলমানদের সামনে মুক্তির আর কোন বিকল্প পথ নেই'। সেই সেমিনারের প্রত্যেক শ্রোতার গণ্ডদেশ বেয়ে অঝোরে নেমেছিলো চোখের পানি। আমার সেই বান্ধবী আমাদের বললেন, 'আমাকে ফিরে যেতেই হবে আমার প্রিয় মাতৃভূমিতে। তবে লোকালয়ে আমার পক্ষে বিচরণ করা সম্ভব নয়। গহীন অরণ্যে খুঁজে নিতে হবে আমাকে নতুন আবাস। আর সহযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মার্কোস ও তার ক্রোনিদের বিরুদ্ধে মরণ আঘাত হানার প্রস্তুতি নিতে হবে। জানি, হয়তো আমি বেঁচে থাকব না, আমার অবিমুক্ত জনসাধারণ কিন্তু মুক্তির নিঃশ্বাস নেবে। তবে আমি নিশ্চিত আমাদের মুক্তি পাগল মানুষের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে স্পন্দিত হবে আমার আত্মা'।

ফিলিপাইনের সেই অধ্যাপক গেরিলা বান্ধবীর কথা আজ বড্ড মনে পড়ে। বিশেষ করে মনে পড়ে, তিনি লাল পয়েন্টার লাইট দিয়ে ফিলিপাইনের মানচিত্র আমাদের সামনে মেলে ধরে বলেছিলেন, 'এর এক ইঞ্চি জমির ওপরও পা ফেলার স্বাধীনতা আমাদের নেই'।

বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ তেল এবং গ্যাসের ওপর ভাসছে। বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ এই তেল ও গ্যাস রফতানী করে রাতারাতি শিল্পোন্নত ধনাঢ্য দেশে পরিণত হতে পারে। বলা হচ্ছে, ইকনমি অব ট্রেডের স্বার্থে ভারতের কাছে গ্যাস এবং তেল পাইপ লাইনের মাধ্যমে রফতানী করা সর্বোত্তম। এসবই বলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ভারত তো অবশ্যই চাতক পাখির মত তাকিয়ে আছে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের গ্যাস এবং তেল লুট করার জন্য)। ১৯৭১-এ এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি ছিল ভারতের স্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আজ তাদের স্বার্থ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স গ্যাসের অনুসন্ধান, আবিষ্কার, উত্তোলন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সাফল্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। ১৯৭৬ থেকে এ পর্যন্ত নিজস্ব জনবল ও প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা ১৯টি কূপ খনন করে ৯টি গ্যাসক্ষেত্র এবং ১টি তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করে। তাদের সাফল্যের পরিমাণ ১ অনুপাতে ২-এর সামান্য বেশী। পরিসংখ্যানের দিক থেকে বিশ্ব মানদণ্ডে এটি নিঃসন্দেহে একটি ঈর্ষণীয় অনুপাত। তেল-গ্যাস শিল্পে দুটি কূপ খনন করে একটিতে কৃতকার্য হওয়া আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি উৎকর্ষের স্বাক্ষর ও প্রমাণ বহন করে। তাদেরই আবিষ্কৃত ক্ষেত্রসমূহকে ২৩টি ব্লকে ভাগ করে বহুজাতিক কোম্পানীর নামে বিদেশের শকুনদের কাছে উন্মুক্ত করার আত্মঘাতী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এই দেশে। সবকটি ব্লকের জন্য আন্তর্জাতিক নীলাম ডাকা হয়েছে। অথচ বাপেক্সের জন্য একটি ক্ষেত্রও সংরক্ষিত রাখা হয়নি এবং তাকে দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। ফিলিপাইনের মতই যদি একদিন বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি জমি এসব শকুনদের কব্জায় চলে যায়, তাহলে বিস্মিত হওয়ার কিছুই থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা, যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নিই যে, আমাদের প্রভূত পরিমাণ তেল-গ্যাসের মওজুদ রয়েছে, তারপরও মনে রাখতে হবে, একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ বিশ্বব্যাপী ফসিল জ্বালানির সঙ্কটের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আর একারণেই বিশ্বব্যাপী শিল্পোন্নত ধনাঢ্য দেশগুলো নিজেদের তেল এবং গ্যাস কনজার্ভ করে, (অর্থাৎ, ব্যবহার না করে সংরক্ষিত মওজুদ রেখে) অন্যান্য দেশ থেকে তেল-গ্যাস আমদানী করার ওপর জোর দিচ্ছে।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশসহ তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশগুলোর সম্পর্কের ট্র্যাক রেকর্ড খুব ভালো নয়। উপরন্তু ভারত একটি আধিপত্যকামী, ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি। ভারত ১৯৪৭-এর বিভাজনকে স্বীকার করতে চায় না এবং সামান্যতম সুযোগ পেলেই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বকে লুপ্ত করে দিতে পরোয়া করে না। তাই যুক্তির খাতিরে যদি একথা মেনেও নেয়া হয় যে, বাংলাদেশের রফতানীযোগ্য বাড়তি গ্যাস ও তেল রয়েছে (যা আদৌ সত্য নয়) এবং তা পাইপ লাইনের মাধ্যমে ভারতের রফতানী করাটা লাভজনক হবে, তাহলেও এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও রাষ্ট্রঘাতী হতে বাধ্য। জাতীয় নিরাপত্তার দিক থেকে যদি বিষয়টি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে গ্যাস ও তেলের প্রবাহ অব্যাহত রাখার নামে যে কোন অজুহাতে ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করতে পারে এমনকি সৈন্যও মোতায়েন করতে পারে। সে সময়কার দেশের সরকার যদি আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানাবারও চেষ্টা করে, তাহলে সেই সরকারকে ১৯৫৩'র ইরানের মোসাদ্দেকের সরকারের ভাগ্য বরণ করে নিতে হবে কি-না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে? উপরন্তু, এদেশে সক্রিয় রয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজালের চর ও নিয়োগীদের তৎপরতা। অতএব, সাধু সাবধান। কোন অবস্থাতেই গ্যাস কিংবা তেল রফতানী করার কোন রাষ্ট্রঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে না। প্রয়োজনে এ বিষয়ে ন্যাশনাল কনভেনশন ডেকে এবং ইউরোপে অবস্থিত সহানুভূতিশীল জরিপ কোম্পানীগুলোর সহায়তায় তেল ও গ্যাসের মোট মওজুদের পরিমাণ নির্ণয় করে আমাদের শিল্পায়নের ও আমদানী-রফতানী নীতি-নির্ধারণ করতে হবে। তেল ও গ্যাস রফতানীর তো প্রশ্নই ওঠে না। অতএব এ সমুদয় মওজুদ দেশের জন্য কাজে লাগানো কীভাবে যায়, তার একটি দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবানুগ পরিকল্পনা আমাদের এখন থেকেই প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক।

www.pathagar.com

২৮ অক্টোবর ২০০০

চাঁদাবাজির রকমফের ও রাষ্ট্রের খন্ডিকরণ

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশে চাঁদাবাজি, তোলাবাজি, চোরাপণবাজি সর্বকালের চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে কিনা, তা একজন অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে বলতে পারব না; কারণ, এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান কোন সংস্থা বা কোন ব্যক্তি কালানুক্রমিকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেনি। অর্থনীতির ছাত্ররা কিংবা কোন সাবধানী লেখক বা গবেষক সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য ছাড়া অতিশয়োক্তি করতে চান না। তবে, বাংলাদেশে এই শ্রেণীর অপরাধ যে একটা মারাত্মক জাতীয় বিপর্যয়ের উদ্ভব ঘটিয়েছে– এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আজ এ বিষয়ের ওপর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পেছনে একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কারণ হিসেবে কাজ করেছে। গত সপ্তাহে রাত্রিকালীন কোচযোগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম। কোচটি যাত্রাবাড়ীতে আসা মাত্রই ওটাকে জনৈক ব্যক্তি হাত দেখিয়ে থামালেন। তারপর বাসের সুপারভাইজারকে বললেন, আপনাদের গাড়ীটা সাইড করে রাখুন। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম, আমার বোধ হয় যাত্রাভঙ্গ হতে চলেছে। গাড়ীর সমস্ত যাত্রীরা নিশ্চুপ তাকিয়ে রইলেন। ড্রাইভার কোন প্রতিবাদ না করেই গাড়ি সাইড করলো, তারপর এক যুবক একটা রেজিস্ট্রি খাতা হাতে এগিয়ে এসে বললো, আপনাদের কোম্পানীর বাস গত ১৪ তারিখে টাকা না দিয়ে চলে গেছে। সুতরাং ১৪ তারিখসহ আজকের পাওনা পরিশোধ না করলে গাড়ী যাবে না। বাসের বাইরে সুপারভাইজার ও ওই ব্যক্তির মধ্যে কী বাক্য বিনিময় হয়েছে, শুনিনি। এরপরই শুনলাম লোকটি বলছে, দরকার হলে রসিদ দিয়ে দেব, আপনাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়। বোঝা গেল, একটা রফা হয়েছে। আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার টাকা পরিশোধ না করা গাড়ীর ড্রাইভারকে বেয়াক্কেল বলে লোকটিকে খুশী করার জন্য কিছু গালিগালাজও করল। যা হোক, গাড়ীর দরজা বন্ধ হল, গাড়ী চলতে শুরু করল। সুপারভাইজার ও গাড়ীর গতিরোধকারী যুবকের কথোপকথন থেকে এইটুকু জানা গেল, এ রকম একটি রাত্রিকালীন ট্রিপের জন্য প্রদেয় ১২০ টাকা। গাড়ী চলা শুরু করলে আমার পাশের আসনের যাত্রীটি, যিনি এতক্ষণ নির্বাক ছিলেন, সবাক হলেন। ভদ্রলোক মাথায় টুপি পরেছেন, কিন্তু মুখমণ্ডল শ্মশ্রুহীন। তিনি খুব খেদের সঙ্গে বললেন, দেখলেন ঘটনা! এই রকম খোলামেলা চাঁদাবাজি! একটা গাড়ী থেকে দৈনিক ১২০ টাকা চাঁদা তোলা হলে এখন ভেবে দেখুন, মোট কত টাকা দৈনিক এ জায়গায় চাঁদা তোলা হয়। এ টাকা কারা পায়, কোথায় যায়, তার হদিস কে দেবে? আরও মারাত্মক বিষয় হচ্ছে, যুবকটি বলছিল, রসিদ দিয়ে দেবে। অবশ্য, এটা পাকা রসিদ না তথাকথিত টোকেন, বোঝা যায়নি। এরপর আমার সহযাত্রী ভদ্রলোক বললেন, এদের ওপর আল্লাহর গজব পড়বে। এরা দেখবেন একদিন নিশ্চিহ্ন হবে। ভদ্রলোক কার দিকে কি ইঙ্গিত করছিলেন, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম। তবে কারও মনের কথা জানা অত্যন্ত কঠিন। ভদ্রলোক জানালেন, তিনি গান ও নাটকের জগতে আছেন। মাঝে মাঝে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের মনের খোরাক পূরণের জন্য দেশের বাইরেও অনুষ্ঠানাদি করে থাকেন। চমৎকার বাংলা, ইংরেজী ও উর্দুতে কথা বলতে পারেন। তিনি যে একজন পরিশীলিত ব্যক্তি, সেটা বোঝা গেল। কিন্তু, তাঁর মুখ থেকে যে বাক্যটি নির্গত হল, তার মধ্যে এক ধরনের অসহায়ত্ব আছে। মানুষ যখন পরিত্রাণের কোন পথ দেখে না, তখনই আল্লাহর বিচারের অপেক্ষায় থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে যাদের কাছ থেকে মানুষ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আশা করে এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সংগ্রামে নেতৃত্ব কামনা করে, তাদের ব্যর্থতাই উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে ভদ্রলোক দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত বাংলাদেশকে ঘিরে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-এর তৎপরতা সংক্রান্ত সিরিজের দিকেও আমার

www.pathagar.com

•দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, এসব প্রতিবেদন সম্পর্কে আমার ধারণা কী? ভদ্রলোক আরও বললেন, কি মারাত্মক ঘটনা। আর্মির বড় বড় অফিসার যেসব কথা বলেছেন, তা তো মিথ্যে হবার কথা নয়। তাহলে বলুন, বাংলাদেশের অবস্থাটা কী? RAW-এর চক্রান্ত সম্পর্কে আলোচনা আমাদের আজকের বিষয় নয়। সুতরাং সে প্রসঙ্গে যাব না। আমি চাঁদাবাজি প্রসঙ্গটি নিয়েই আলোচনা করতে চাই। কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশে যে আইনী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, তার সমান্তরালে একটি বেআইনী বা কালো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বিদ্যমান। এই কালো অর্থনীতির পরিসর বাংলাদেশের আইনী অর্থনীতির ভিত্তিতে যে GDP বা মোট দেশজ উৎপাদন পরিমাপ করা হয়, তার চাইতে কোন অংশে কম নয়, বরঞ্চ বেশী হবারই সম্ভাবনা। গত ক'দিনে কমলাপুর রেল স্টেশনে কনটেইনার ডিপোতে যে পরিমাণ চোরাই বিদেশী সিগারেট উদ্ধার হয়েছে, তার মূল্য ছয় কোটি টাকারও বেশী। এসব চোরাই মালামাল বিদেশী দূতাবাসের নাম ব্যবহার করে দেশীয় ক্ষমতাধররাই আমদানী করে থাকে বলে সংবাদপত্রে রিপোর্ট বেরিয়েছে। আমরা জানি, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যে পরিমাণ স্বর্ণ কিংবা সিগারেট উদ্ধার করে, তা বেআইনী পথে আনা পণ্যের মূল পরিমাণের এক শতাংশও হবে কিনা সন্দেহ আছে। কালো অর্থনীতিরই একটি অংশ হল চাঁদাবাজি, তোলাবাজি ও চোরাপণবাজি। বেশ কিছুদিন ধরে বিত্তশালী, ধনী পিতা-মাতার স্কুলগামী সন্তানদের অপহরণ করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবী করার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে।

ক্ষেত্রবিশেষে কেউ মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করে ছাড়া পাচ্ছে, আবার কেউ দিনের পর দিন নিখোঁজ থাকছে– পুলিশ কোন সাহায্য করতে পারছে না। খুব কম ক্ষেত্রেই পুলিশ সাফল্য দেখাতে পারে। এক কথায়, দেশে আজ মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী আছে– সচিব, আইজি, ডিআইজি, ডিসি-এসপি আছে, কিন্তু কোন সরকার বা শাসন আছে বলে মনে হয় না। বছর তিনেক আগে ঢাকার সর্বত্র দেয়াল লিখন দেখা গিয়েছিল। ওতে বলা হয়েছিল, পিস্তল ঠেকিয়ে অর্থ আদায় করা যদি সন্ত্রাস হয় তাহলে ফাইল ঠেকিয়ে ঘুষ আদায় করা কি সন্ত্রাস নয়? এই লিখনের মধ্যে প্রকারান্তরে ছিনতাইকে এক ধরনের নৈতিক সমর্থন যোগানোর প্রয়াস ছিল। ফাইল জব্দ করে ঘুষ খাওয়া এদেশের অফিস-আদালতে নিত্যদিনের ঘটনা। কোন অফিসে গেলে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক উক্তি হল, আপনার ফাইলটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু যে মুহূর্তে ভুক্তভোগী ব্যক্তি কিছু উপরি দিতে রাজি হন, সেই মুহূর্তে আলাউদ্দীনের দৈত্যরা ফাইল নিয়ে হাজির হয়। বলে, 'বান্দা হাজির। গোস্তাকী মাফ কি জিয়ে'। মানুষের সন্তানকে পনবন্দী করা ও ফাইলপত্র পণবন্দী করার মধ্যে বেশ কৌশলগত মিল থাকলেও ভয়াবহতার দিক থেকে নিঃসন্দেহে পার্থক্য আছে। তবে, এর কোনটাকেই সমর্থন তো করাই যায় না, বরং এসব অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যত কঠোর হওয়া যায় ততই মঙ্গল।

চাঁদাবাজির প্রকার-প্রকরণ অনেক ধরনের। কিছু চাঁদাবাজি একেবারে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে গেছে। যেমনটা করে ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক নেতারা। চট্টগ্রামে বন্দরে ডক সিরাজ নামে জনৈক-শ্রমিক নেতার চাঁদাবাজির খবর দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি নাকি যখন যে সরকার আসে, তার দলাশ্রিত হয়ে পড়েন। বহু অসৎ কর্ম, যেমন, সরকারী জায়গায় মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠার মত মহৎ কাজের নামেও চাঁদা আদায় করা হয়। ডক সিরাজ সাহেবের মাসিক আয় কয়েক লাখ টাকা। এছাড়া বাস ডিপো, বেবিট্যাক্সি স্ট্যান্ড প্রভৃতি থেকেও চাঁদাবাজি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাও এক ধরনের পরোক্ষ চাঁদাবাজিতে লিপ্ত। টিচারের কাছে টিউশনি না নিলে পরীক্ষার ফলাফল প্রভাবিত হয়। নামীদামি কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে যে পরিমাণ ফি আদায় করা হয়, তার সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাইনে বা বেতনের কোন সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না। কমিশনের বিনিময়ে বই পাঠ্য করাও এক ধরনের চাঁদাবাজি। অপ্রয়োজনীয় প্যাথলজিক্যাল টেস্টের নামে এবং প্রয়োজনীয় প্যাথলজিক্যাল টেস্টের ওপর ডাক্তাররা যে পার্সেন্টেজ পান, (কোন কোন সূত্রমতে কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ) সেটাও এক ধরনের চাঁদাবাজি। আজ দেশটার অবস্থা এমন হয়েছে, প্রায় সকল পেশাতেই চাঁদাবাজির উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়। পুলিশের চাঁদাবাজির কথা না বলাই শ্রেয়। সংবাদপত্রেই খবর বেরিয়েছে, গোটা

www.pathagar.com

থানা এলাকা ইজারা দেয়া হয়। এই ইজারা প্রদান ব্যবস্থার সঙ্গে অনেক পক্ষই জড়িত। রাজধানী থেকে গ্রামবাংলার প্রতিটি মার্কেট, প্রতিটি হাটবাজার, প্রতিটি জাহাজঘাট, নৌকাঘাট চাঁদাবাজদের নিয়ন্ত্রণে। বাজার অর্থনীতিতে লেনদেন আদান-প্রদান নির্বিঘ্নে না করা গেলে অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়ন আশা করা বৃথা। এরকম পরিবেশে ব্যক্তি উদ্যোগ ও বিনিয়োগ একেবারেই সম্ভব নয়। বাংলাদেশে কৃষি সেক্টর এখনও আপেক্ষিকভাবে চাঁদাবাজমুক্ত বলে কৃষকরা চমৎকার সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু শিল্প, ব্যবসা ও সেবা খাতে সে রকম কোনো সাফল্য লক্ষ্য করা যায় না। বরঞ্চ, কিছু কিছু শিল্পপতি নিজেরাই চাঁদাবাজ। ওরা ঋণখেলাপী হয়ে রাষ্ট্রের ওপর চাঁদাবাজি করে এবং সহযোগী হিসেবে পায় দুর্নীতি আশ্রয়ী পলিটিশিয়ান ও আমলাদের। এক কথায় বলা যায়, এখানে এখন State টাই প্রাইভেটাইজড হয়ে গেছে। তবে, সত্যিকার প্রাইভেটাইজেশন থেকে যেসব সুফল পাওয়া যায়, রাষ্ট্রের এই প্রাইভেটাইজেশন তার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। টি অ্যান্ড টি, ওয়াসা ও ডেসার কর্মচারী-কর্মকর্তারাও মারাত্মক চাঁদাবাজিতে লিপ্ত। খবর বেরিয়েছে, একটি এলাকার বাসিন্দারা নিজেরাই ৫০ হাজার টাকা চাঁদা তুলে বিস্ফোরিত ট্রান্সফর্মার মেরামত করার জন্য ডেসার কর্মচারী ও লাইনম্যানেদের উৎকোচ প্রদান করেছে। মানুষ আজ কত অসহায়। বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখার দায়িত্ব ডেসার। বিদ্যুৎ ভোক্তাদের দায়িত্ব মাসের শেষে হিসাব অনুযায়ী বিল পরিশোধ করা। একজন খাঁটি ভোক্তা কখনোই ট্রান্সফরমার মেরামতের খরচ এবং মেরামতের জন্য কর্মচারীদের অর্থ দিতে বাধ্য নন। তবু দিতে হয়। কারণ আজকের দিনটির জন্য তো বাঁচতে হবে। দেশের রাজনৈতিক কালচারের এটা এক ভয়াবহ চিত্র। এই অন্যায়ের প্রতিকারে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন এগিয়ে আসেনি। আর অসহায় মানুষরা নিজেরাও প্রতিরোধের কথা ভাবেনি। বরঞ্চ সুবোধ বালকের মতো ডেসার অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদরপূর্তি করতে সায় দিয়েছে। এভাবে আজ দেশের প্রতিটি মানুষ (গুটিকয় ভাগ্যবান বাদে) এক প্রতিকারহীন অন্যায় অত্যাচারের শিকার। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ রঙ বেরঙের চাঁদাবাজিতে যে সম্পদ সংগৃহীত হয়, সেটা কিভাবে বিনিয়োগ হয়, কী কাজে ব্যবহৃত হয় কিংবা কী উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়, সেটা জানতে পারলে এই বাধাহীন চাঁদাবাজিরও একটা প্রতিবিধান করা সম্ভব হবে। তবে, অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে যেটুকু বুঝি, চাঁদাবাজির জন্যও কিছু সম্পদ বা অর্থ ব্যয় করতে হয়। অর্থনীতির বর্তমান মুহূর্তে এ ধরনের বিনিয়োগ সবচেয়ে লাভজনক এবং সম্ভবত সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ, তাই চাঁদাবাজির আজ এরম একটা রমরমা অবস্থা। চাঁদাবাজি যেন বেড়েই চলেছে। এর সংকোচনের কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না।

আফতাব আহমাদ :

শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে সরাসরিতে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষকতার পদ সাবলেট করার বিষয়টি উল্লেখ করেছিলাম এক সময়ে। অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রীধারী কজন বেকার যুবকের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে প্রাইভেট কলেজের কোনো কোনো বিশিষ্ট শিক্ষক নিজে সরাসরি শিক্ষকতা না করে ঠিকাদারী ও তেজারতীতে অতি ব্যস্ত থেকে মাস্টার ডিগ্রীধারী একজন বেকার যুবককে তাঁর পাঠদানের কার্যটি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে রাখেন। বিনিময়ে ঐ যুবকটি যৎসামান্য পারিশ্রমিক লাভ করে থাকে। এটাও এক ধরনের চাঁদাবাজি। প্রাইভেট কলেজের গর্ভনিং বডিতে ভাইস চ্যান্সেলরের মনোনীত সদস্য হিসেবে এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি, ক্ষেত্রবিশেষে সফল হয়েছি, ক্ষেত্রবিশেষে ভর্নিগং বডির অপরাপর সদস্যের অসহযোগিতার ফলে ব্যর্থও হয়েছি। এ সময়ে আমার আরেকটি অভিনব অভিজ্ঞতা হয়। বিএ (পাস) ডিগ্রী পরীক্ষার আগে প্রচুর ছেলেমেয়ে তাদের পছন্দসই কলেজে গিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে চায়। এই পছন্দ অবশ্য নকল করার অবাধ সুযোগ কতটুকু কলেজটিতে পাওয়া যাবে, তার ওপরই নির্ভর করে। এ সময়ে কলেজ ছাত্ররা ছাত্র সংসদের নির্বাচিত কিংবা অনির্বাচিত কর্তা, কলেজের হিসাব বিভাগ ও কেরানীকুলের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীর যোগসাজশে ব্যাকডেটে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা সুচারুভাবে সম্পন্ন করে। এর জন্য পরীক্ষার্থী ছাত্র বা ছাত্রীকে বেশ মোটা অংকের অর্থ প্রদান করতে হয়। যার সিংহভাগই ওই বখে যাওয়া ছাত্রনেতাদের পকেটস্থ হয়।

www.pathagar.com

বিষয়টি কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদেরও জানা। কিন্তু জেনেশুনেও তারা ছাত্র সংসদের এসব চাঁদাবাজ ছেলেদের প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন এবং তাদের কার্যক্রমে কোন ধরনের বাধাদানকে শ্রেয় মনে করেন না। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, চাঁদাবাজ ছাত্রদের বিভিন্ন দল-উপদলকে প্রিন্সিপাল সাহেবরা অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। এতো গেল এক ধরনের চাঁদাবাজি। শহরে বেরুলেই যে কোন যানবাহনে ওঠার সময়ে সশরীরে আপনার সামনে একজন চাঁদাবাজ এসে দাঁড়াবে। অবশ্য, ঠিক আপনার কাছে নয়, যানবাহনের চালকের কাছে। আমি শহরের পার্কিং পরিস্থিতি সম্পর্কে বলছি, পরিকল্পনাবিহীনভাবে বেড়ে ওঠা আমাদের রাজধানীসহ সবকটি শহরে পার্কিংয়ের কোন সুবন্দোবস্ত নেই। দুয়েকটি বাণিজ্যিক এলাকায় দুয়েকটি সংরক্ষিত পার্কিং ব্যবস্থা পরিস্থিতির ব্যতিক্রম মাত্র। আমি যে জায়গায় থাকি, এটি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। এর সংলগ্ন যে সুপার মার্কেটটি রয়েছে, এটিও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সম্পত্তি। অথচ একদল পেশীধারী এই প্রাঙ্গণটি নিয়ন্ত্রণ করে এবং রিকশা, বেবিট্যাক্সী, গাড়ী– এগুলো থেকে পার্কিংয়ের নামে চাঁদা তোলে। কেউ এই চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তাকে মোটাসোটা একটি বাঁশের লাঠি প্রদর্শন করে লাঠ্যৌষধ প্রয়োগের হুমকি দেয় হয়। অদূরে কোন পুলিশ যদি দাঁড়ানো থাকে, নির্বিকারভাবে অবস্থান গ্রহণ করে নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে যেন হঠাৎ কাব্যিক হয়ে যায়।

চাঁদাবাজি আজ একাধারে একটি আর্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। সামনে রমজান আসছে, আরেক ধরনের চাঁদাবাজির অত্যাচারে নাগরিকগণ জর্জরিত হবেন। এককালে কাসিদা গেয়ে সেহরির জন্য পাড়া-প্রতিবেশীকে সজাগ করে দেয়ার একটি সমাজসেবা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম ছিল। পড়শীরা সন্তুষ্টচিত্তে এর জন্য বাসিন্দা গায়কদের পুরস্কৃত করতেন। কিন্তু এখন দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় প্রতিটি মহল্লায়ই এই উদ্যোগটি চাঁদাবাজদের হাতে চলে গেছে এবং রোজাদারদের ওপর এক ধরনের জুলুম ও জবরদস্তি শুরু হয়েছে।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি গালভরা পদ রয়েছে। কোথাও এই পদের পরিচিতি ট্রেজারার, কোথাও কোষাধ্যক্ষ, কোথাও কোষাগারিক, আবার কোথাও অর্থ সম্পাদক। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো কোথা থেকে, কার কাছ থেকে এবং কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করে, সেই হিসাব এসব ট্রেজারার বা অর্থ সম্পদকরা দিতে অপরাগ। আজ পর্যন্ত শুনিনি, কোন রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে সংগঠনের আয়-ব্যায়ের অডিট রিপোর্ট পেশ করতে। সংগঠনে নেতৃস্থানীয় পদ যাঁরা অলঙ্কৃত করে আছেন, এরা যার যার মত করে চাঁদা তোলেন এবং যার যার খেয়াল-খুশিমত সেই অর্থ ব্যয় করেন। জবাবদিহিতার বালাই নেই। অনেক সময় দলের মূল নেতার কাছে খুচরা নেতারা বাধ্যবাধকতায় পড়ে চাঁদার অংকের মিথ্যা পরিসংখ্যান পেশ করেন। খোদ দলের ভেতরে আরও অভিনব রকমের চাঁদাবাজি চালু রয়েছে। পোস্টার-লিফলেট ছাপাবার নামে ও সেসব বিতরণের নামে দলীয় সদস্য নামধারী চাঁদাবাজরা দলীয় প্রধানের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ নিয়ে কাজটি নামকাওয়াস্তে এক লাখ পোস্টার-লিফলেটের পরিবর্তে হাজার দশেক ছেপে দলীয় প্রধানের গমনাগমনের পথে দৃষ্টিগোচর স্থানে সেঁটে দেয় বা বিতরণ করে। বাকি অর্থ বেমালুম হজম করে ফেলে। রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে চাঁদাবাজির আরও কিছু উদ্ভাবনী প্রতিভাপ্রসূত পদ্ধতি চালু রয়েছে। মিটিং-মিছিলের জন্য 'আদম সাপ্লাই'-এর ঠিকা নিয়ে নানা কারচুপি ও গোঁজামিলের ঘটনাও ঘটে। মাথাপিছু নির্দিষ্ট একটি অংক কষে নির্দিষ্ট সংখ্যক আদম সাপ্লাইয়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অর্থ তসরুফ করা এখন একটি নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের দলগুলোর ভেতরে যেহেতু গণতন্ত্র অনুপস্থিত, কোন্দল ও উপদলীয় চক্রান্ত সেহেতু সব সময় তুঙ্গে থাকে। কেন্দ্রীয় নেতার আশীর্বাদ বা বরাভয় লাভের উদ্দেশ্যে জেলা-উপজেলা, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এক তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। এই কামড়া-কামড়িতে বিভিন্ন স্তরে পাল্টাপাল্টি কমিটি গঠন দলের ভেতরে মহামারীরূপ পরিগ্রহ করেছে। কেন্দ্রীয় দফতরে একশ্রেণীর দলীয় লুম্পেন কর্মী সদা তৎপর থাকে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন স্তরের কমিটিকে অনুমোদন বা স্বীকৃতি আদায় করে

www.pathagar.com

দেয়ার লবিং নিয়ে। দেখা গেছে, কমিটি অনুমোদিত হয়ে যাওয়ার পরও কোন নির্দিষ্ট কমিটিতে নাম অন্তর্ভুক্তির বিনিময়ে কোন কোন প্রভাবশালী নেতা বা তার চাই মোটা অংকের চাঁদা নিয়ে থাকেন। এই যদি হয় রাজনৈতিক দলের ভেতরের অবস্থা, তাহলে সে ধরনের দল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ভার লাভ করলে কী ধরনের লুটপাট, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজিতে লিপ্ত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আন্দোলন না করার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে খোদ কর্তাব্যক্তি কিংবা সরকারী এজেন্সীর কাছ থেকে বস্তা বস্তা টাকা নিয়ে বাথরুম ভর্তি করার ঘটনাও এদেশে ঘটেছে। এরশাদ আমল সম্পর্কে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের গ্রন্থ এবং সাম্প্রতিককালে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও নিষিদ্ধ ঘোষিত অপর একটি গ্রন্থে এ কাহিনীর বিবরণ আছে বলে জানা যায়। এসব ঘটনা ঘুরে ফিরে যদি ঘটতে থাকে তাহলে এ জাতির দুঃখ-দুর্দশার অমানিশার অবসান আসা করা যায় কি?

মাহবুব উল্লাহ :

ট্যাক্স বা ফী আদায় করা রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া অধিকার। সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিস্থিতিতে বিদ্রোহীরা সমান্তরাল রাষ্ট্রযন্ত্র কায়েম করতে গিয়ে জনগণের কাছ থেকে তোলা ও খাজনা আদায় করে, তবে এ ধরনের পরিস্থিতি একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র অভ্যুত্থানেই সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী এভাবে চাঁদা বা তোলা আদায় করতো–এখনও করছে বলে খবর পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র দেশটা তো পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে যায়নি। সারাদেশে বিদ্রোহাত্মক পরিস্থিতিও বিরাজ করছে না। তাহলে রাষ্ট্রক্ষমতার সমান্তরালে ক্ষুদে আঞ্চলিক রাষ্ট্রক্ষমতার অনুরূপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যদি চাঁদাবাজি চলে, তাহলে এ ব্যাপারে যারা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে কিংবা চোখ বুজে থাকছে, তারা কি বাংলাদেশের ধ্বংস ডেকে আনছে না?

তোলা বা চাঁদা আদায় করার জন্য নিরঙ্কুশ প্রপার্টি রাইট থাকতে হয়। প্রপার্টি রাইট প্রতিষ্ঠা করতে হলে কোন না কোনভাবে অস্ত্রবলের আশ্রয় নিতে হয়। এভাবেই বিভিন্ন গ্রুপ যেমন ফাইভস্টার, সেভেনস্টার গ্রুপ বিভিন্ন নগর ও শহরে নিজ কর্তৃত্বাধীন এক্সক্লুসিভ জোন গড়ে তুলেছে। অনেকটা রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্রের মত। তাই রাষ্ট্র আজ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। আশানুরূপ রাজস্ব আদায় না হওয়ার জন্যও চাঁদাবাজির একটা ভূমিকা রয়েছে। দল ও মত নির্বিশেষে, পেশা ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে তকমা ও পদ নির্বিশেষে, নামী-দামী, কমদামী সকলস্তরের দুর্জনরা এই সর্বব্যাপক চাঁদাবাজিতে লিপ্ত। এদের ক্ষুধার শেষ নেই। কিছুতেই এদের খায়েশ মেটে না। জনগণকে জাগতে হবে, এদেরকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য। তবে এদেশের ইতিহাসে চাঁদাবাজির একটা ঐতিহ্য আছে। মোগল সুবাদার, মনসবদার এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার, তালুকদার, হাওলাদার, চাকলাদার, আজমাদার, পত্তনিদার, দার পত্তনিদার, সে পত্তনিদার সবাই মিলে প্রজাদের ওপর চাঁদাবাজি করতো। ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেবরাও চাঁদাবাজি করতো। রাষ্ট্রীয় আইন বহির্ভূত উপায়ে জনগণের কাছ থেকে যা কিছুই আদায় করা হয়, সেটাই তো চাঁদাবাজি। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' গ্রন্থে লিখেছেন, "রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাহাদিগের লাভ থাকিবে....। ইহাতেই জমিদারির সৃষ্টি এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি।" কর্নওয়ালিশ এই 'রাজস্বের কন্ট্রাক্টরদিগকে ভূস্বামী করিলেন'। তাতে প্রজাদের আরও সর্বনাশ হল। 'প্রজাদের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লোপ হইল' এবং প্রজাদের মঙ্গলের জন্য যেসব আইন প্রণয়ন করবেন বলে কর্নওয়ালিশ আশ্বাস দিয়েছিলেন, তার কোনটিই করলেন না। বরং নতুন নতুন আইন দ্বারা জমিদারের 'দস্যুবৃত্তিকে' আইনসঙ্গত করা হল। সেই 'দস্যুবৃত্তি' আজ আবার চাঁদাবাজির অভিশাপরূপে জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছে। জননিরাপত্তা আইন পাস করা হল, কিন্তু চাঁদাবাজ দস্যুরা নিবৃত্ত তো হলই না, বরং তাদের আস্ফালন ও ঔদ্ধত্য বলগাহীনভাবে বেড়ে চলছে।

www.pathagar.com

৪ নভেম্বর ২০০০

১৫ই আগস্ট থেকে ৭ই নভেম্বর, ১৯৭৫

মাহবুব উল্লাহ :

নভেম্বর মাসটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এ মাসেই ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক বিরাট গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। যদিও এর আগে ১৫ অগাস্ট এক সফল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একদলীয় বাকশালী স্বৈরাচারীর পতন হয় এবং আওয়ামী লীগেরই অন্যতম নেতা ও প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিপরিষদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তার নবগঠিত সরকারের যাঁরা মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগের সদস্য এবং শেখ মুজিবুর রহমানের অতি ঘনিষ্ঠ। ১৫ অগাস্ট প্রত্যুষে যখন রেডিও থেকে ঘোষণা করা হল– সেনাবাহিনী খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে, তখন আমরা নিজের কাছেই মনে হয়েছিল, এটা আবার কোন ধরনের সামরিক অভ্যুত্থান, যার নেতৃত্বে আছেন একজন বেসামরিক নেতা এবং তারই নেতৃত্বে তারই দলনেতা ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছে? ১৫ অগাস্টের অভ্যুত্থানের প্রতি সেদিন সকাল ৯টার মধ্যে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহসহ সকল বাহিনী প্রধান ও পুলিশ প্রধান বেতার মারফত আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। অতএব, বোঝা গেল, পরোক্ষভাবে হলেও সেনাবাহিনী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই অভ্যুত্থানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। একভাবে দেখলে এটাকে 'মুষ্টিমেয় বিপথগামী' সেনাকর্মকর্তাদের অ্যাডভেঞ্চার মাত্র মনে হয়। কিন্তু, আদতে যে তা নয়, এটা বোঝা গেল মেজর জেনারেল শফিউল্লাহসহ অন্যান্যের জ্ঞাপিত সমর্থনের ফলে। মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ বর্তমানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের একজন এমপি এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান। আজ যারা এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেন, তাদের বক্তব্য হচ্ছে, সেদিন রক্তপাত এড়াতে তাদের নিষ্ক্রিয় থাকতে হয়। অন্যথায়, রাষ্ট্রের প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটত।

খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকার প্রথম থেকেই নানা প্রকার হুমকির সম্মুখীন হচ্ছিলেন। ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেন কয়েকদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে দেখা করলেন। খন্দকার মোশতাক তাকে আশ্বস্ত করলেন, সংবিধানের ৪ মূলনীতি– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা বহাল থাকবে। ভারতীয় শাসকবর্গ সেই সময়ে আশঙ্কা করছিলো, বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হবে। খন্দকার মোশতাক ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছিলেন। অপরদিকে, মস্কোতে পাঠানো হল মোশতাক সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে আওয়ামী লীগেরই প্রবীণ সদস্য জনাব মহিউদ্দীন আহমেদকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য। মরহুম মহিউদ্দীন আহমেদ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে খন্দকার মোশতাকের হয়ে তৎকালীন অন্যতম সুপার পাওয়ার সভিয়েত ইউনিয়নে তার দূতিয়ালীর কাজ নিষ্পন্ন করেছিলেন। ইতোমধ্যে সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন মহলে চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে পড়েছে– এই অজুহাতে বিদ্রোহী কর্নেল ও মেজরদের যথাস্থানে বহাল করার দাবী উঠল। এই দাবীর পেছনে সব উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সমর্থন ছিল– একথা বলা যাবে না। খন্দকার মোশতাক বাকশালীদের নিয়ে গঠিত সংসদও বহাল রাখলেন। তবে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাকশালকে রহিত ঘোষণা করলেন। বঙ্গভবনে সংসদ সদস্যদের বৈঠক ডাকা হল এবং কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ হল। অক্টোবর মাসের প্রথমদিক থেকে গুজব শোনা গেল, নবনিযুক্ত সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের দ্বন্দ্ব তুঙ্গে উঠেছে। এমনকি, একথা শোনা গেল, জিয়াকে আর একপাও এগুতে দেবেন না ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। কারণ, জিয়া খালেদের দাবী অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চেইন

www.pathagar.com

অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। বস্তুত, চেইন অব কমান্ড পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবীটি ছিল একটি কৌশলমাত্র। এই দাবীর আড়ালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তা রহিত করে পুরাতন ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ ইন্দোসোভিয়েত বলয়ে বাংলাদেশকে ফিরিয়ে নেয়ার প্রয়াস বৈ অন্য কিছু ছিল না। এদেশের রাজনীতির একটি দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, যখনই যে কোন শক্তি বাংলাদেশকে রুশ-ভারত বলয়মুক্ত করার চেষ্টা করেছে অথবা করার অঙ্গীকার করেছে, তারাই আবার নানা মাত্রায় রুশ-ভারত অক্ষ, বিশেষ করে ভারতকে তুষ্ট করতে চেয়েছে। তাদের বিচারে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আচরণ যদিও বন্ধুসুলভ নয়, কিন্তু শক্তিধর ভারতকে চটিয়ে কিছু করা যাবে না। এসব রাজনীতিকরা যে বিষয়টি উপলব্ধি করেন না, সেটা হল– নিয়ত ঠিক না থাকলে বস্তুত কিছুই অর্জন করা সম্ভব হয় না এবং যাদের রোষ পরিহার করার জন্য তুষ্ট করার নীতি গ্রহণ করা হয়, তারা এদের কখনই ক্ষমা করে না।

খন্দকার মোশতাক লাইলাতুল কদরের ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি এক বছরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন দেবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। তার এই ভাষণ শোনার জন্য রেডিও টেলিভিশনের সামনে প্রকাশ্য স্থানসমূহে প্রচুর মানুষের ভিড় দেখা গিয়েছিল। মানুষের কৌতূহল ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু আস্থা তেমন ছিল না। ইতোমধ্যেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সঙ্গে যেসব মুক্তিযোদ্ধা ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাদের কাছেই জানা গেল, আরেকটি অভ্যুত্থান অত্যাসন্ন। অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানের গুজবে দেশপ্রেমিকদের মনে দুশ্চিন্তার উদ্রেক হল। কিন্তু, সবই যেন ছিল গ্রীক ট্র্যাজেডির নিয়তির মত অপ্রতিরোধ্য। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের ঘটনা নিয়ে সাম্যবাদী দলের নেতা প্রয়াত কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা আমাকে যে কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন, তা খুবই চমকপ্রদ। সাম্যবাদী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনৈক সামরিক কর্মকর্তা তোয়াহা সাহেবকে অবহিত করেছিলেন যে, আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে। জনাব তোয়াহা এই অভ্যুত্থানের সাফল্য সম্পর্কে খুবই সন্দিহান ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ইতোমধ্যেই জনমনে খন্দকার মোশতাক সম্পর্কে এমন একটি ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে যে, তিনি ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী। সুতরাং তার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যে কোন অভ্যুত্থানই ভারতপন্থী বলে বিবেচিত হবে এবং জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করবে। সাম্যবাদী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই সেনাকর্মকর্তাটি জনাব তোয়াহাকে জানিয়েছিলেন, তাদের অভ্যুত্থানের নেতা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। খালেদ মোশাররফের নাম শুনতেই জনাব তোয়াহা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, "ওতো ইন্ডিয়ান লবির লোক। তাকে নিয়ে তোমাদের এই অভ্যুত্থান চরম মার খাবে"। সেনাকর্মকর্তাটি জানালেন, খালেদ মোশাররফ ঠুঁটো জগন্নাথ মাত্র। রাষ্ট্রের চাবিকাঠি থাকবে তাদের হাতে। তোয়াহা সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, "রথযাত্রায় ঠুঁটো জগন্নাথকেই আসল দেবতা মনে করে লোকজন প্রণাম করে। সুতরাং মানুষের চোখে এই ঠুঁটো জগন্নাথটি আসল জগন্নাথ হিসেবে প্রতিভাত হবে এবং তোমাদের অভ্যুত্থান বিয়োগান্ত পরিণতিতে পর্যবসিত হবে"। জনাব তোয়াহা এই অভ্যুত্থান প্রক্রিয়া বন্ধ করে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায় কিনা, সেটা জানতে চাইলেন। জবাবে সেনাকর্মকর্তাটি বললেন, সেনাবাহিনীতে একবার কমান্ড জারি হলে তা প্রত্যাহার করা যায় না। বিশেষ করে যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে সাবধান হতে পরামর্শ দিয়ে তোয়াহা সাহেব বিদায় করলেন। সেই সময়ে একটি গোপন দল হিসেবে সাম্যবাদী দল মোটামুটি সংগঠিত ছিল। অপরদিকে, এই অভ্যুত্থানের প্রতি প্রকাশ্যে রেডিও-টেলিভিশনে সংহতি ঘোষণা করে কে বক্তব্য রাখবেন, এমন কাউকে খুঁজে বের করার জন্য অভ্যুত্থানকারীরা নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক চালাতে লাগলেন ইস্কাটনের একটি বাড়ীতে। এরকম একটি বৈঠকে অংশগ্রহণকারী জনৈক বিমানবাহিনী অফিসার জানিয়েছেন, ঐ বৈঠকে কমরেড আবদুল হকের নামও প্রস্তাবিত হয়েছিল। তিনিও নাকি ভাষণ প্রদানে সম্মত ছিলেন। কিন্তু বৈঠকে অংশগ্রহণকারী অনেকে আপত্তি তুললেন এই কথা বলে যে, যেই মুহূর্তে কমরেড আবদুল হক বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দেবেন, সেই মুহূর্তে ভারতীয় বিমান হামলা শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং তাঁকে নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই।

৩ নভেম্বর সকালবেলা ঢাকার আকাশে জেট প্লেন উড়তে দেখা গেল এবং এই জেট প্লেনগুলো রেসকোর্স ও বঙ্গভবনে মোতায়েন ট্যাংকগুলোর ওপর হুমকি প্রদর্শন করে অভ্যুত্থানের সূচনা করলো।

www.pathagar.com

অভ্যুত্থানের সূচনাতেই সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে নজরবন্দী করা হল এবং তার বাসার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হল। অথচ রেডিও টেলিভিশন থেকেও কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা আসছিল না। খালেদ মোশাররফের সমর্থনে রাজধানীর বাইরে থেকেও কিছু সৈন্যদল ঢাকায় এসেছিল এবং সংসদ ভবনসহ ঢাকার কয়েকটি ভবনে এরা অবস্থান নিয়েছিল। প্রথম থেকেই খালেদ মোশাররফ দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন, এটা স্পষ্ট। তিনি সেনাপ্রধান হওয়ার প্রক্রিয়া নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এর জন্য তিনি নিয়মতান্ত্রিক পন্থা খুঁজছিলেন। পদোন্নতিটা যেন প্রেসিডেন্ট মোশতাকই করেন, এটাই ছিল তার প্রত্যাশা। শেষ পর্যন্ত তার প্রত্যাশা পূরণ হল। বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকায় নৌবাহিনী প্রধান রিয়াল এডমিরাল এমএইচ খান ও খন্দকার মোশতাক নিয়োজিত বিমানবাহিনী প্রধান এমজি তাওয়াব ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেলের র‍্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন– এরকম একটি ছবি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। তবে উল্লেখ্য যে, অন্য কোন সংবাদপত্রে এই ছবি প্রকাশিত হয়নি। সে সময়ে এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সাপ্তাহিক হলিডে খ্যাত জনাব এনায়েত উল্লাহ খান।

৪ নভেম্বর দুপুরের দিকে বাংলাদেশ টাইমসের সম্পাদক জনাব এনায়েত উল্লাহ খানের কাছ থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য তারই কার্যালয়ে গিয়েছিলাম। এরই মধ্যে নানাদিক থেকে নানা প্রকার খবর আসতে লাগল। স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব এনায়েত উল্লাহ খানকে টেলিফোনে জানালেন, মনে হচ্ছে, একটা প্রো-সভিয়েট টিল্ট ঘটতে যাচ্ছে। তবে কিছুই এখনও স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে জেলে নিহত ৪ নেতার লাশ জাতীয় তিন নেতার মাজার এলাকায় সমাহিত করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ। খালেদ মোশাররফ তার কোন এক আত্মীয় অথবা সুহৃদের পরামর্শে এদের লাশ যেন সেখানে দাফন না করা হয়, সে জন্য কিছু অনুগত সৈনিককে পাঠান। ফলে সেখানে দাফনকার্য সম্ভব হয়নি। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশ থেকে শেখ মুজিবের 'হত্যাকারীদের' ফাঁসি দাবী করা হয়। এনায়েত উল্লাহ খান হয় তো ভুলে যাননি, সেই সমাবেশে তারও ফাঁসি দাবী করা হয়েছিল। এরপর এক শোভাযাত্রা বের হয়, যা ৩২ নম্বর সড়কে শেখ মুজিবের বাসভবনের দিকে অগ্রসর হয়। খালেদ মোশাররফের ভাই, বর্তমান ভূমি প্রতিমন্ত্রী জনাব রাশেদ মোশাররফ এবং তাদের মা এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় শোভাযাত্রার ছবি এবং মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের নাম প্রকাশ করা হয়। এর পাশাপাশি আরেকটি খবর ছাপা হয়, যার বিষয়বস্তু ছিল– রাতারাতি চালের মূল্য বৃদ্ধি। সময়ের একটি সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে কী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সেদিনের ইত্তেফাকের সেই খবর তারই প্রমাণ। জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে খালেদ মোশাররফকে আওয়ামী লীগ ও রুশ-ভারতের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট বলে ধরে নিল। খালেদ মোশাররফ এই কালিমা মোচন করার জন্য প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে নিয়ে আসলেন। জনাব সায়েম দায়িত্ব গ্রহণের দিন সন্ধ্যায় বেতার ভাষণে সংসদ বাতিল ঘোষণা করলেন। এই সংসদের ষোলআনাই ছিল বাকশালের সদস্য। এতকিছুর পরেও খালেদ মোশাররফ সম্পর্কে যাঁরা সহানুভূতিশীল, তারা তাকে ভারতীয় এজেন্ট মনে করেন না। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের কোন গোয়েন্দা সংস্থা কোনরূপ তদন্ত চালিয়েছিল কিনা তা আমার জানা নেই। তবে বহু বছর পর সে সময়ের ঘটনাবলী নিয়ে লিখতে গিয়ে বাংলাদেশে প্রথম ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার মি. জে এন ডিকশিট তার Liberation and Beyond গ্রন্থে লিখেছেন,....."Khaled was close to the Indian military and intelligence agents during the liberation war and in its aftermath."

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নায়ক খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেননি। বঙ্গভবনে তার অবস্থান ৭২ ঘন্টার বেশী ছিল না। প্রকৃত ক্ষমতাও তার হাতে আসেনি। বস্তুত ৩ থেকে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ বাংলাদেশ সরকারবিহীন অবস্থায় পতিত হয়েছিল। ইতিহাস খালেদ মোশাররফের মূল্যায়ন করবে। তবে এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি, খালেদ মোশাররফ মুক্তিযুদ্ধে যেমন একজন বীরযোদ্ধা ছিলেন, ক্ষমতার উদগ্র বাসনায় তিনি ভারতীয় আধিপত্যবাদের সঙ্গেও যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছিলেন। মি. জে এন ডিকশিট সেই সাক্ষ্যই দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা

www.pathagar.com

খালেদ মোশাররফকে শ্রদ্ধা করি, আর পথভ্রষ্ট খালেদ মোশাররফকে ধিক্কার না দিলেও করুণা করা ছাড়া আর কী বা করার আছে? সাময়িকভাবে দেশপ্রেমিক হওয়া যায়, কিন্তু আমৃত্যু দেশপ্রেমিক থাকাটা যে কত কঠিন, খালেদ মোশাররফই তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

আফতাব আহমাদ :

ক্ষমতার দাবা খেলায় খালেদ মোশাররফ ব'ড়ে হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলেন কিনা, তা সুনিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও তাঁর কার্যকলাপই প্রমাণ করে যে, তার উচ্চাভিলাষ ছিল আকাশচুম্বী এবং লাগামহীন। চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সংগঠিত প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানটি আসলে বাংলাদেশকে ভারত-সভিয়েত অক্ষশক্তির পক্ষপুটে স্থায়ীভাবে আটকে রাখারই একটি প্রয়াস ছিল। ৪ নভেম্বর খালেদের মা এবং তার ভাই রাশেদ মোশাররফসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলা থেকে যখন ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত মুজিবের বাড়ী অভিমুখে শোভাযাত্রাটি যাচ্ছিল তখন এদেশের সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের হৃদয়তন্ত্রী দুমড়ে-মুচড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর আমাদের অসংখ্য শহীদের এবং অকুতোভয় বীর যোদ্ধাদের ত্যাগে মহীয়ান মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ভারতীয়রা ছিনতাই করে নেয়ার পর বাংলাদেশের মানুষ যেমন মূহ্যমান হয়ে পড়েছিল অপমানে, তেমনি ৪ নভেম্বর মুজিববাদী বাকশালপন্থীদের আস্ফালনে এদেশের মানুষ প্রাথমিকভাবে স্তম্ভিত হয়ে গেলেও গা ঝাড়া দিয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে, "শির দে গা, নেহি দেগা আমামা"। ৪ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর দেশের প্রতিটি সেনাছাউনিতে সিপাহীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘবদ্ধ হওয়া শুরু করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এ দেশের মানুষের বুকে বাকশালী প্রেতাত্মা পুনরায় জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসতে পারে এবং এই অভীষ্ট অর্জনের জন্য একশ্রেণীর সেনাকর্মকর্তা খুদ-কুঁড়োর বিনিময়ে শুধু স্বীয় আত্মাই বিক্রি করতে প্রস্তুত নয়, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বও বিকিয়ে দিতে পিছিয়ে থাকবে না। এই উপলব্ধি সিপাহীদের দেশপ্রেমকে শাণিত করে তোলে, তাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক আরও নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয় এবং আধিপত্যকামী, সম্প্রসারণবাদী, ব্রাহ্মণ্য ক্ষমতাদর্পীদের বিরুদ্ধে মারণাঘাত হানার জন্য সন্তর্পণে প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে বহু ত্যাগী কর্মীদের নিয়ে গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে সযত্নে লুকায়িত ও লালিত ছিল উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভারতীয় পঞ্চম বাহিনীর চরেরা। এসব চর সেনা ছাউনির ভেতরকার নাড়ির স্পন্দন টের পেয়ে সিপাহীদের অভ্যুত্থানকে অফিসার নিধনযজ্ঞে রূপান্তর করার জন্য এক নীল নকশা প্রণয়ন করে। এই নীল নকশার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বহু নিরীহ ও নিরপরাধ দক্ষ সেনা কর্মকর্তা তথাকথিত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার প্রতিবিপ্লবী তৎপরতায় প্রাণ দিতে বাধ্য হয়। জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা হাওয়া দেখে ঝোপ বুঝে কোপ মারার উসিলায় দেশপ্রেমিক সিপাহীদের গণঅভ্যুত্থানের স্রোতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। আর ৭ নভেম্বর যখন সাধারণ সিপাহীরা জেনারেল জিয়াউর রহমানসহ দেশপ্রেমিক অফিসারদের মুক্ত করে সেনা ছাউনি ছেড়ে রাজপথে বেরিয়ে আসে এবং সাধারণ জনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে, তখন যে বাধভাঙা আনন্দ-উল্লাস রাজধানীর প্রতিটি অলিতে-গলিতে প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা প্রকাশের ভাষা সেদিন কোন সাংবাদিক খুঁজে পাননি। আমার কাছেও আজ সে ভাষা নেই। এই সুখ, এই উল্লাস, এই পরমানন্দ ভাষায় ব্যক্ত করার বিষয় নয়, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার বিষয়। ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতা এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল– জাতিকে আশ্বস্ত করেছিল। যখন দেশের সকল প্রতিষ্ঠান, সকল রাজনৈতিক দল নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল এবং মানুষ চরম হতাশায় নিমজ্জিত ছিল, তখন আমাদের অতন্দ্র সিপাহী ও দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী তাদের ওপর ন্যস্ত জাতি রক্ষার গুরু দায়িত্ব যথোচিতভাবে সম্পাদনে এগিয়ে আসে। অসহায়ত্বের অনির্বচনীয় পরিস্থিতিকে পাল্টে দিয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের যে সাহস সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান যুগিয়েছে, তা আমাদের ইতিহাসে বিরল। এদিন সিপাহী-জনতার মধ্যে শুধু একাত্মতার ঐক্যসূত্রই গ্রথিত হয়নি বরং এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত করেছে যে, আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষাকবচ হচ্ছে একটি সুশৃঙ্খল, সর্বাধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত যুগোপযোগী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী।

www.pathagar.com

৭ নভেম্বরের ঘটনাবলী জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসে এবং সমগ্র জাতি জিয়াকে নেতৃত্বে বরণ করে স্বস্তিবোধ করে। কিন্তু ভারতীয় পঞ্চম বাহিনী, তাদের দোসররা, তাদের নিয়োগী ও চরেরা একে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই সেনা অফিসার নিধনের নামে একের পর এক সেনাছাউনিতে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীর কার্যক্ষমতা বিনষ্ট ও পর্যুদস্ত করার রাষ্ট্রঘাতী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। একই সঙ্গে তারা জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধেও মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বিদ্রোহের উসকানি দিতে থাকে। এ সময়ে জাসদের অপপ্রচার, নাশকতামূলক তৎপরতা ও ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের গৌরব ছিনতাই করার অপচেষ্টা তাদেরকে মরিয়া করে তোলে। কিন্তু জিয়াউর রহমানের দ্রুত ক্ষিপ্র পদক্ষেপের ফলে যে সময়োপযোগী ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই সেনাবাহিনীর শৃংখলা ফিরে আসে। জাসদ ও ভারতীয় পঞ্চম বাহিনীর চরেরা একঘরে হয়ে পড়ে।

অপপ্রচারের মাধ্যমে জাসদ আপ্রাণ চেষ্টা করে ৭ নভেম্বরের সকল কৃতিত্ব তাদের বলে দাবী করতে। এ ব্যাপারে জিয়াউর রহমানকে খাটো করে দেখাতেও তারা কুণ্ঠা করেনি। অথচ জাসদের হয়ে কর্নেল তাহের বহুবার জিয়াকে এককভাবে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান সেই প্রলোভনের ফাঁদে পা দেননি। তিনি তার একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সততা ও অবিচল দেশপ্রেমের কারণে জাতির কাণ্ডারী হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি অর্জন করেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ আমরা আমাদের গৌরব ছিনতাই হবার কারণে যেভাবে বেদনাবিধুর হয়ে পড়েছিলাম, তার চেয়ে শত সহস্র গুণ গৌরববোধ করেছে এ দেশের মানুষ ৭ নভেম্বর ১৯৭৫-এ। এ দিন ভারত-সোভিয়েত অক্ষশক্তির পরাজয় ঘটে। বাংলাদেশে সত্যিকারের একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা হয় এবং দেশ ও দেশের মাটির প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সেনাবাহিনী ও জনতা এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নয়া সংহতি রচনা করে। এজন্যই ৭ নভেম্বর এ দেশের পুনর্জন্ম বলেও অনেকে ভাবে।

৭ নভেম্বরের পথ বেয়ে জিয়াউর রহমান শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের অবিসংবাদিত জাতীয় নেতায় পরিগণিত হন। জিয়াউর রহমান জাতীয় পালন পুনর্সম্ভাবনার রাজনীতি অনুসরণ করে জাতীয় পুনর্গঠনের গুরুদায়িত্ব অর্জন করতে চেয়েছিলেন। বিভেদাশ্রেয়ী, পরজীবী রাষ্ট্রঘাতী চক্র সেজন্য প্রথম দিন থেকেই, অর্থাৎ ৭ নভেম্বর থেকেই রাষ্টঘাতী রাজনীতি অনুশীলন করে আসছে এবং সকল প্রকার দেশপ্রেমিক কর্মসূচী ও পদক্ষেপসমূহ বানচালের জন্য তৎপরতা চালিয়ে আসছে। এই তৎপরতারই একটি পরিণতি আমরা দেখি জিয়াউর রহমানের শাহাদত বরণের মধ্য দিয়ে এবং আরেকটি পরিণতি আমরা লক্ষ্য করি আওয়ামী ফ্যাসিস্ট পৌত্তলিকতাবাদীদের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে। আওয়ামী তস্কররা ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৭ নভেম্বরকে মসিলিপ্ত করা শুরু করে এবং জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে এ দেশের মানুষ প্রতিবছর যেভাবে ৭ নভেম্বরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে, তারা তা নস্যাৎ করার জন্য এ দিনের জাতীয় ছুটি বাতিল করে দেয়। এ বছর আওয়ামী রাষ্ট্রঘাতীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করার জন্য যখন চার দলের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে এবং ৭ নভেম্বর ঢাকায় এক সর্বদলীয় সমাবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন চিরাচরিত ফ্যাসিস্ট কায়দায় আওয়ামী সরকার নির্দিষ্ট স্থানে সমাবেশ অনুষ্ঠানের অনুমতিদানে অস্বীকার করে। উদ্দেশ্য একই। ৭ নভেম্বরের চেতনা মানুষকে যাতে আরও নতুন করে প্রেরণা ও প্রণোদনা না যোগায়, মানুষ যাতে ৭ নভেম্বরের চেতনায় নিজেকে শাণিত করে আওয়ামী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ও প্রতিকারের রাজনীতির বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে না পারে। কিন্তু ক্ষমতাদর্পীরা একটি কথা সব সময় ভুলে যায়– দলন, পীড়ন ও নির্যাতনের মাধ্যমে কোন জাগ্রত জনতাকে অবদমিত করে রাখা সম্ভব নয়। দেশে আজ যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাকে এক কথায় বলা যায় বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি। বিরোধী দল এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে ইতিবাচক রাজনীতির স্বার্থে তার সদ্ব্যবহার করতে যদি ব্যর্থ হয় তাহলেও এই জাগ্রত জনতা নিষ্ক্রিয় থাকবে না। বিজ্ঞানের স্বাভাবিক সূত্র ধরে, সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে পরাশ্রয়ী আওয়ামী দুর্বৃত্তদের শাসনের অবসান ঘটতে বাধ্য। কারণ, জনরোষ থেকে কোন দুঃশাসক পরিত্রাণ পেয়েছে ইতিহাসে তেমন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

১১ নভেম্বর ২০০০

আমলাতন্ত্র, দুর্নীতি ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন

মাহবুব উল্লাহ :

আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমলাতন্ত্র নেই, এমন রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে আমলাতন্ত্রের বিষয়টি অন্যতম নির্বাচনী ইস্যু হিসেবে এসেছে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জর্জ ডব্লিউ বুশ সরকারের আকার ছোঁট করার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। সরকারের আকার ছোট করার অর্থ প্রশাসনিক কাঠামো কাটছাঁট করা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কাজ আছে, যার জন্য আমাদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বারস্থ হতে হয়। একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা করবেন, তার জন্য চাই ট্রেড লাইসেন্স। এই ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করবেন একজন আমলা। কেউ জমি বিক্রি করবেন, তার জন্য তাকে সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে যেতে হবে এবং সাব রেজিস্ট্রারের সামনেই দলিলদস্তাবেজ স্বাক্ষর ও সাক্ষীসাবুদসহ রেজিস্ট্রেশন নিষ্পন্ন করতে হবে। সাব-রেজিস্ট্রার সাহেবের বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হলে দলিল রেজিস্ট্রি হবে না। আর এ কারণে ঝামেলা এড়াতে দলিলদাতা-গ্রহীতাকে সাব-রেজিস্ট্রার সাহেবকে একটু খুশি করতে হয়। আর এভাবেই বাংলাদেশে সৃষ্টি হচ্ছে সম্পত্তি মালিকানা, সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ নিয়ে বিরোধ-সংঘাত, মামলা-মোকদ্দমা। একজন সামান্য সরকারী কর্মচারী হিসেবে সাব-রেজিস্ট্রারদের কোন সঞ্চয়ই থাকার কথা নয়। তারপরও এদেশে যারা সরকারী চাকরি করেন, সেসব, ভাগ্যবানের মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রাররা অন্যতম। এছাড়া রয়েছে কাস্টমস, পুলিশ, ট্যাক্সেশনসহ বিভিন্ন সরকারী বিভাগ। এসব ডিপার্টমেন্টে চাকরি করা খুবই লাভজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী তরুণ লেকচারার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রত্যাহার করে শেষ পর্যন্ত বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে কাস্টমস সার্ভিসে ঢুকেছে, এমন নজির এদেশে আছে। বিষয়টি নিয়ে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ অনেকেই লিখেছেন। এই ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, শিক্ষকতার মহান ব্রতে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং অক্সফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর বি. ফিল ডিগ্রীর জন্য পড়াশোনা করে চূড়ান্ত পরীক্ষা না দিয়ে দেশে ফিরে এসে বিসিএস পরীক্ষা দেয়ার হেতু কী? জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমার বড় ভাই একটি মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশনে কর্মরত। তিনি প্রায় লাখখানেক টাকা বেতন পান। এছাড়া অন্য সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে। আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত। সুতরাং আমি চাই না, আমার স্ত্রী তাঁর সামনে ছোট হয়ে যাক এবং এ কারণেই আমি ফার্স্ট চয়েস হিসেবে কাস্টমস সার্ভিস চেয়েছি। এদেশের আমলাতন্ত্র আপদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল গত ৬ মাসে বাংলাদেশে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছে, দুর্নীতির আসল পরিমাণ আরও অনেক বেশী, যা প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। ব্রিটিশ শাসনামলে বলা হতো, In India from Viceroy to Chowkidar, everybody is corrupt. ব্রিটিশ চলে গেছে, আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি একচুলও কমেনি; বরং, তা শত সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্নীতির দৌরাত্ম্য কমানোর জন্যই আজকাল সরকারের আকার ছোট করার কথা বলা হয়। বলা হয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তার কথা। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কিভাবে নিশ্চিত করা যায়, তার আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কী হবে, তা নিয়ে জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ, আইন বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদরা অনেক কিছু বলছেন ও ভাবছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে সরকারের আকার ছোট করার প্রসঙ্গটি

www.pathagar.com

উত্থাপিত হয়েছে এই যুক্তি দেখিয়ে যে, সরকারের আকার ছোট হলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও কর্মোদ্যোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে অর্থনীতির ওপর শুভ প্রভাব সৃষ্টি হবে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কত মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমার একজন মার্কিনী অধ্যাপক একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। সেই অধ্যাপকের নাম লিরয় জোন্স। সময়টা ছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনামল। সে সময়ে এক মারাত্মক বিস্ফোরণের ফলে ঘোড়াশাল সার কারখানা দীর্ঘ ছয় মাস বন্ধ থাকে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হওয়ার ফলে এই সার কারখানাটি কিভাবে মেরামত করা হবে, তার জন্য আন্তর্জাতিক কনসালটেন্ট নিয়োগের টেন্ডার কিভাবে হবে এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিভাবে সংগ্রহ করা হবে, এসব নির্ধারণ করতে বিরাট সময়ক্ষেপণ হয়েছিল। অথচ কারখানাটি যদি ব্যক্তিমালিকানাধীন হত, তাহলে মালিক স্বউদ্যোগে ও নিজ দায়িত্বে এসব সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করতে পারতেন এবং কারখানা বন্ধ থাকার বিশাল ক্ষতিও এড়াতে পারতেন। এ কারণে অধুনা প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস করার দাবী উঠেছে, টেবিলে টেবিলে ফাইল নোটিংয়ের জটিল ও সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি কিভাবে সংক্ষিপ্ত করা যায় তা নিয়ে কথা হচ্ছে এবং ব্যক্তির কাছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ববোধ ও কর্মোদ্যোগকে কাজে লাগানোর কথা হচ্ছে। বাংলাদেশেও দাতাগোষ্ঠী সরকারের আয়তন ছোট করার পক্ষে ওকালতি করে আসছে।

আধুনিক বাজার অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল লেনদেনের আনুষ্ঠানিকতা। লন্ডন বা নিউইয়র্কের, এমনকি এশিয়ার সিঙ্গাপুর, ও হংকংয়ের যে কোন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গেলে জিনিসপত্র সংগ্রহ করার পর ক্যাশ কাউন্টারে আসলে সেলসগার্ল সহাস্যবদনে পণ্যের দাম সংক্রান্ত একটি বিল ক্যাশ রেজিস্ট্রার থেকে চটপট বের করে দেবেন। এ ধরনের আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অধিকাংশ লেনদেনই হয় কাগজে-কলমে। ব্যাংকের চেক এক ধরনের কাগজ বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু সেটাও মুদ্রার কাজ করছে এবং লুটতরাজ ও খোয়া যাওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করছে। অন্যদিকে, একটি অনগ্রসর, সনাতনী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বেশিরভাগ লেনদেন হয় অনানুষ্ঠানিকভাবে, মুখোমুখি দরকষাকষির মাধ্যমে এবং সর্বোপরি, কোনরকম কাগজপত্র ছাড়া। এরকম লেনদেন নিষ্পন্ন হলে সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আমরা ইনফর্মাল ইকনমি বলে থাকি। তাই অনুন্নত অর্থনীতিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেখানে কাগজপত্রের বালাই নেই, সেখানে উন্নত অর্থনীতিতে কাগজপত্রের পাহাড় স্তূপিকৃত হচ্ছে। আর এজন্যই কম্পিউটারের সাহায্যে পেপারলেস (কাগজপত্রবিহীন) ছিমছাম অফিস দপ্তর চালু করা হচ্ছে। এর ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীর বোঝা কমে আসছে। তৎসত্ত্বেও কর্মকর্তা-কর্মচারীবিহীন রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। কিভাবে আমলাতন্ত্র তথা ব্যুরোক্রেসি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে, সে সম্পর্কে ব্যাপক ঐকমত্য রয়েছে। ব্যারন ডি গ্রিম নামে একজন ফরাসী দার্শনিক ১৭৬৪ সালে এম ডি গোর্নের এক চিঠির বরাত দিয়ে সরকারের চতুর্থ বা পঞ্চম রূপ হিসেবে 'ব্যুরোক্রেসি'র কথা বলেছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ফরাসী ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদের ব্যবহৃত শব্দটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিভাষায় ব্যবহৃত হতে থাকল। ইতালীতে বলা হল 'ব্যুরোক্রেজিয়া'। জার্মানীতে বলা হল ব্যুরোক্রেটি আর ব্রিটেন ব্যুরোক্রেসি। কিন্তু, এই সমার্থক শব্দগুলোর আসল অর্থ কী, তা নিয়ে স্পষ্টতা এবং ঐকমত্যের অভাব রয়েছে। 'ব্যুরোক্রেসি' শব্দটির সঙ্গে আবেগমিশ্রিত খেদ ও ক্ষোভ লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, 'আমলা' কথাটির অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। আমলাতন্ত্র যেমন প্রশাসনিক দক্ষতার প্রতীক, ঠিক তেমনি এটি অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও দুর্নীতিরও প্রতীক। সোজা কথায়, এটা একদিকে যেমন সিভিল সার্ভিসের সমার্থক, অন্যদিকে এটা আধুনিক রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের জটিল রূপকেও বুঝিয়ে থাকে। আমলাতন্ত্র বলতে যেমন কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দকে বোঝায়, আবার তেমনি জনপ্রশাসনের রীতি ও নিয়ম-কানুনকেও বোঝায়। ভিন সেন্ট ডি গোরনে যখন প্রথম ব্যুরেক্রেসি শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন গ্রীক ভাষার স্টাইলে ডেমোক্রেসি ও অ্যারিস্টোক্রেসির মত 'ব্যুরো' শব্দের সাথে 'ক্রেসি' অনুসর্গটি যোগ করলেন। 'ব্যুরো' কথাটির অর্থ হল, যেখানে সরকারী কর্মচারীরা তাদের কাজকর্ম

www.pathagar.com

চালায়। হ্যারল্ড লাস্কিও ১৯৩০ সালে একই অর্থে এনসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যাল সায়েন্সে 'ব্যুরোক্রেসি' শব্দটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। ম্যাক্সভেবার ব্যুরোক্রেসিকে দেখেছেন এমন একটি সংগঠন হিসেবে, যা আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য সবচাইতে উপযোগী। আইনানুগ শাসন বা কর্তৃত্ব বলতে আইনের শাসন বোঝায়, ব্যক্তির শাসন নয়। ব্যুরোক্রেসিও ব্যক্তি নয়, পদ সোপান ও পদমর্যাদাভিত্তিক সংগঠন। এই সংগঠনে ক্ষমতা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা থাকে। সংগঠনের কর্মকর্তাদের সকল কাজকর্ম ফাইলে লিপিবদ্ধ থাকে। আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে রিক্রুট করা হয়। কর্মকর্তাদের নিজস্ব বলতে কোন মর্যাদা বা ক্ষমতা নেই। সংগঠনের সাথে তাদের সম্পর্ক কাজের চুক্তি, বেতন ও পেশাগত কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত হয়। ব্যুরোক্রেসি তাই অফিসিয়ালের শাসন নয়, অফিসের শাসন। অর্থাৎ প্রত্যেকটি অফিসের সাথে তার নির্ধারিত ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব ও নিয়মকানুন প্রদত্ত থাকে। ব্যুরোক্রেসি Dangerously efficient অথবা Hopelessly inefficient হতে পারে। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্যের একটি অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে, Discretionary power. আমলারা আইনের অপব্যাখ্যা করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আইনী শূন্যতার সুযোগ নিয়ে মানুষকে ভোগায় ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ব্রিটিশ আমলে আইসিএস বা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে বলা হত, Neither Indian, nor civil, nor service, অর্থাৎ, ভারতীয়ও নয়, সুশীলও নয় এবং সেবাদানকারীও নয়।

রাজনীতিবিদরা নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে আমলাতন্ত্রকে দায়ী করেন আর অন্যদিকে আমলারা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের দোহাই পাড়েন। আমরা প্রায়ই খবরের কাগজের পাতায় দেখি, পুলিশ উপরের নির্দেশের দোহাই দেয়। সম্প্রতি একটি জেলার ডেপুটি কমিশনার নিজেকে ষাট ভাগ আওয়ামী লীগার ও ৪০ ভাগ ডিসি দাবী করেছেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুনতে পাই, গোপালগঞ্জের অফিসাররা নাকি অত্যন্ত প্রতাপশালী। কারণ, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ী গোপালগঞ্জে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে সকলেই দলীয় প্রভাবমুক্ত আমলাতন্ত্র কামনা করেন। কিন্তু আমাদের দেশে ক্ষমতায় যাওয়ার পর দলগুলোর লক্ষ্য থাকে ক্ষমতাকে চিরন্তন করা, আর এ জন্য প্রয়োজন প্রশাসন, পুলিশ ও বিচার বিভাগের ওপর প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণ। স্পষ্টতই আইন-কানুন বা নিয়ম-নীতি দিয়ে এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। তার জন্য চাই আইনবহির্ভূত ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধা। এর জন্য চাই একটি অনুগত আমলাতন্ত্র। এই আমলাতন্ত্র নিয়মের প্রতি অনুগত নয়, এরা দল ও ব্যক্তির প্রতি অনুগত। তাই আজ দুর্নীতি ও অদক্ষতার পাশাপাশি এদেশের আমলাতন্ত্রের আরেকটি মারাত্মক ক্রটি হল দলীয়তা। শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে ও তৎকালীন যুব লীগের সভাপতি শেখ ফজলুল হক মনি একবার উক্তি করেছিলেন, এদেশে আইনের শাসন নয়, মুজিবের শাসন চাই। যাদের অস্থিমজ্জায় এরকম মারাত্মক চিন্তা-ভাবনা মিশে আছে, তারা আর যাই হোক, গণতন্ত্রী নন। বরং বলা যায়, চরম স্বৈরাচারী।

আমাদের সংবিধানে দল, ব্যক্তি স্বার্থ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তভাবে কর্ম পরিচালনার জন্য কিছু সংস্থার বিধান রাখা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের পদগুলো রয়েছে। এছাড়া, অমবুডসম্যান বা ন্যায়পালেরও বিধান রয়েছে। অবশ্য, আজ পর্যন্ত কোন অমবুডসম্যান বা ন্যায়পাল নিযুক্তি হয়নি। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য এবং কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলকে ন্যায়ানুগ আচরণের শপথ নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এই শপথের উদ্দেশ্য হল, দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে তারা নিরপেক্ষ ও আইনের প্রতি অনুগত থাকবেন। সরকারের কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তি কোন প্রকার রক্তচক্ষু বা প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে দায়িত্ববোধ ও নীতিবোধ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সরকারের আমলে যাঁরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন, তারাও দলীয় আনুগত্যের অভিযোগে অনেক মহলেই চিহ্নিত হয়েছেন। এবার ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে যে কেলেংকারি ঘটল, তা একটি স্বাধীন ও সভ্য জাতি হিসেবে আমাদের মাথা হেঁট করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, আবদুল্লাহ মামুন নামে একজন মেধাবী তরুণ জানান যে, ২০তম বিসিএস পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'বাংলাদেশের স্থপতি কে'? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'। তাতেও পরীক্ষাকরা সন্তুষ্ট হননি। মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের একজন তাকে সাথে সাথে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'তমিজের সাথে বলতে হয়। তোমাকে বলতে হবে, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'। আবদুল্লাহ মামুন বললেন, 'তখনই বুঝতে পারছিলাম, আমার চাকরিটা হচ্ছে না'। আসলে সবচেয়ে বড় বেতমিজ হচ্ছেন মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের সেই সদস্যটি, যিনি পরীক্ষার্থীকে তমিজ শেখাতে চেয়েছিলেন। কারণ, এই ব্যক্তির নিরপেক্ষতা, আইন ও যোগ্যতার প্রতি যে তমিজ থাকার কথা, তা তার নেই। সর্বোপরি, বাংলাদেশের স্থপতি কে, এ ধরনের প্রশ্ন কারও মেধা বা জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য একটি হাস্যকর প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এরকম প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য একটিই, আর তা হল– আওয়ামী লীগ যে ভাষায় মুজিব বন্দনা করে, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীও সে ভাষায় মুজিববন্দনা করতে মানসিকভাবে নিবেদিত কিনা, সেটাই যাচাই করা। ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় অনিয়মের বিরুদ্ধে রাজধানীতে মানববন্ধন হয়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকে এ যাবৎকাল অতীতে কোন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিয়ে এ ধরনের গণপ্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়নি এবং তা নজিরবিহীনও বটে।

১৯৭৩ সালে যেভাবে তোফায়েল ক্যাডার নির্বাচিত করা হয়েছিল, আজও তা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে এবং প্রশাসনকে পঙ্গু, অদক্ষ, দুর্নীতিপরায়ণ ও দলীয় আনুগত্যের দোষে দুষ্ট করে ফেলেছে। এই দেশে মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতার কোন দাম নেই। একমাত্র মূল্য হল– কে কত বেশী বিশেষ দলের প্রতি অনুগত। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবার যে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করল, তার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে সকল সংশ্লিষ্ট সদস্যদের একযোগে পদত্যাগ করাই বিবেকবানের কাজ হবে। আর তা না করলে ভবিষ্যতের যে কোন ন্যায়ানুগ ও গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব হবে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের সমন্বয়ে এসব অনিয়ম ও অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তদন্ত করা ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা। ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে প্রচণ্ড কালক্ষেপণ ও বিভিন্ন সার্ভিসের ঘোষিত কোটা পরিবর্তন করে পুলিশ ও প্রশাসনের মত সার্ভিসগুলোর কোটা বৃদ্ধি কার্যত অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এদেশের প্রশাসনকে চূড়ান্ত আওয়ামীকরণেরই এক মারাত্মক প্রহসন।

আফতাব আহ্মাদ :

নিয়ম-নীতি ও সুশাসন এবং আওয়ামী লীগ একসঙ্গে যেতে পারে না– এটি যে ধ্রুব সত্য, আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় পালার শাসনামল অক্ষরে অক্ষরে তা প্রমাণ করছে। শিষ্টাচার, সুরুচিসম্পন্ন আচরণ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া– এ সবকিছু আওয়ামী সংস্কৃতির অভিধানে অনুপস্থিত। দুরাচারী, দুরাত্মা, দুর্বৃত্তপরায়ণতার অপর নাম আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থক, নেতা-নেত্রীরা এই হীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনে ন্যূনতম কুণ্ঠা ও লজ্জাবোধ করে না। বরং সদম্ভে বুক চাপড়ে বলে, দুর্নীতি যদি করতেই হয়, আস্থা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে করতে হবে। বস্তুত ১৯৯৬-এর জুনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ দেশ থেকে আইনের শাসন নির্বাসিত হয়েছে। শ্রেয়বোধ ও সুনীতি দলীয়করণের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে। আত্মীয় তোষণ ও স্বজনপ্রীতি নিত্যদিনের একটি আহলাদ মাত্র। পরিবারতন্ত্র জাতীয় মূলমন্ত্রে পরিগণিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পিতাকে সিজদা করা এবং প্রধানমন্ত্রীর পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা জাতীয় ধর্মে পরিগণিত করার পৌত্তলিক প্রয়াস শুরু হয়েছে। যেদিকেই তাকাই না কেন, মুজিববাদী ও নব্য মুজিববাদী ঠকদের আস্ফালন, লম্ফঝম্ফ ও পদ দখলের নোংরামী পরিদৃষ্ট হয়। চাকরি-বাকরি, ব্যবসাপাতি, ঠিকাদারী, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্রসহ যে কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ কিংবা আনুকূল্য

www.pathagar.com

পাওয়ার একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে দলীয় লাঠিয়াল, মস্তান, সন্ত্রাসী, নিদেনপক্ষে চামচা হওয়া। পরিবার ও বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা নিরঙ্কুশ করার জন্যই শেখ হাসিনার আবির্ভাব ঘটেছে। এর সর্বশেষ নিদর্শন হচ্ছে ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল কেলেংকারি।

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন নামক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি এখন আওয়ামী নওকরদের আঁখড়ায় পরিণত হয়েছে। অত্যন্ত নিম্নমানের লোকজনদের নিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়েছে। এখানে এমনও লোক নিয়োগ পেয়েছেন, যার ডক্টরেট ডিগ্রী নেই। কিন্তু নামের আগে বাহারি কায়দায় 'ড.' ব্যবহার করেন। প্রকাশ্যে অর্থের লেনদেন এবং অন্যান্য উৎকোচ গ্রহণ এদের জন্য আজ আর কোন লজ্জার বিষয় নয়। সম্ভবত অধ্যাপিকা নাইয়ার সুলতানা একমাত্র সম্মানজনক ব্যতিক্রম, যিনি, দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে যতদূর সম্ভব নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব সম্পাদনের চেষ্টা করছেন। বাদ বাকিরা ক্ষমতাসীনদের পদলেহন করে সাংবিধানিক দায়-দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হয়েছেন। অবশ্য হবারই কথা। অযোগ্য, অথর্ব, অপদার্থ লোকজনদের নিয়ে এ ধরনের দায়িত্ব দেয়া হলে সে দায়িত্ব যে যথোচিতভাবে পালিত হবে না, তা বলাই বাহুল্য।

২০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হয় জুন ১৯৯৮-এ, ফলাফল প্রকাশিত হয় এ বছরে ২৯ অক্টোবর। পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়েছে ২ হাজার ৪০জনকে। চরম দুর্নীতি ও নজিরবিহীন দলীয়করণের মধ্য দিয়ে এই ফলাফল চূড়ান্ত করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০তম বিসিএস-এর আবেদনপত্র গ্রহণের সময়ে প্রশাসন ক্যাডারে ১০০টি পদ এবং পুলিশ ক্যাডারে ৬৬টি পদ বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। কিন্তু ফল প্রকাশের সময়ে দেখা গেল, প্রশাসন ক্যাডারে ৩০০ জন প্রার্থীকে বাছাই করা হয়েছে এবং পুলিশ ক্যাডারে বাছাই করা হয়েছে ১১৬ জনকে। এ ধরনের কাজ সকল নিয়ম-নীতি রীতি ও সরকারী রুলস অব বিজনেসের পরিপন্থী। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাজ হচ্ছে পাবলিক এগজামিনেশনের মাধ্যমে সৃষ্ট বা বিজ্ঞাপিত পদ পূরণের ব্যবস্থা করা। পদ সৃষ্টি তার কার্যকলাপের এখতিয়ারে পড়ে না। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী পদ সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি ও পন্থা রয়েছে। যেমন– পুলিশ ক্যাডারে যদি পদ সৃষ্টি করতে হয় তাহলে তা গোড়াতে স্ট্যাবলিশমেন্ট ডিভিশনের 'ও এন্ড এম' উয়িং-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনকারেন্সসহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্যাংশন ছাড়া পদ সৃষ্টি সম্ভব নয়। অদ্রূপ প্রশাসন ক্যাডারে পদ সৃষ্টি করতে হলে স্ট্যাবলিশ ডিভিশনের অনুমোদন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্যাংশন ব্যতিরেকে তা করা সম্ভব নয়। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভূমিকা সংবিধান সংরক্ষণ, প্রতিপালন ও সুরক্ষা করার পরিবর্তে দলানুগত হয়ে শুধু সংবিধানকেই অগ্রাহ্য করেনি, পিএসসি ও জাতীয় ভাবমূর্তিকে মসিলিপ্ত করেছে। ২০তম বিসিএস-এর পররাষ্ট্র ক্যাডারের মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছে পুলিশের লোক আর মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা নিয়েছে ইতিহাসের শিক্ষক। এই তথ্য প্রদান করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাবলিক সার্ভিস কমিশনেরই কোন এক সদস্য। অতীতে পৃথক পৃথক ভাইভা বোর্ডের মাধ্যমে পৃথক পৃথক ক্যাডারদের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় ঢালাওভাবে সকলের জন্য একটি বোর্ডই গঠন করা হয়। এই বোর্ডে ভাইভা চলাকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের আতিপাতি নেতারা সংশ্লিষ্ট কামরায় সদম্ভে আসা-যাওয়া করেছে, এমনকি বোর্ড সদস্যদের সঙ্গে পাশাপাশি আসনে উপবেশনও করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রকাশ্যে বিভিন্ন দলীয় নেতাদের স্বহস্তে লিখিত চিরকুট বিভিন্ন সদস্যের কাছে খোলামেলাভাবেই প্রদান করা হয়, এমন অভিযোগও অনেক প্রতিযোগী করেছে। প্রকাশ, লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণের ক্ষেত্রে দলীয় লোকজনই প্রাধান্য পেয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ সদস্যের মতে, কারচুপির মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়েই কমিশনের দায়িত্ব প্রাপ্তরা ক্ষান্ত থাকেনি। তারা নিজ উদ্যোগে 'সবকিছু খামু' নামে পরিচিত জনৈক মন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের শীর্ষ স্থানীয়দের পছন্দনীয় প্রার্থীদের পৃথক পৃথক তালিকা সংগ্রহ করে এবং একজন বড় কমকর্তার ঢালাও নির্দেশ ছিল, এদের মৌখিক পরীক্ষায় যত সম্ভব অধিক পরিমাণ নম্বর

www.pathagar.com

দিয়ে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ করাতে হবে। পহেলা নভেম্বরের ইত্তেফাকের মতে, ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় ছাত্রলীগের এক নেতাকে ১৮২ নম্বর পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। ৪ নভেম্বরের জনকণ্ঠে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভাইভা বোর্ডের এক সদস্য কুণ্ঠিতভাবে বলেন, 'প্রার্থী নির্বাচনে ঢালাও অনিয়ম হয়নি, সূক্ষ্মভাবে কিছু কিছু অনিয়ম হয়েছে। বিশেষ করে মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।' তিনি এও বলেন, 'মৌখিক পরীক্ষা এমন একটি পরীক্ষা যার রেকর্ড থাকে না'।

এবারই প্রথমবারের মত মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্যদের কোটা নির্ধারিত হয় এবং সে কোটা পূরণও হয়। ১৯৭২-৭৩-এর মত এবারও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেটের অভাব হয়নি। খবরে প্রকাশ, এবার ১৭৮টি মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট জমা পড়েছিল। তার মধ্যে ১৭৫ জনকেই নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর সবই আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের অযোগ্য, অর্ধশিক্ষিত, অথর্ব কিন্তু তেজীয়ান উগ্রচণ্ডী সদস্য। ছাত্রলীগের সূত্রে প্রকাশ, দলের এমন সন্ত্রাসী ক্যাডারও এবারের ২৯তম বিসিএস বাছাই হয়েছে যারা এমনই ব-কলম যে, কারচুপির মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৌখিক পরীক্ষায় ঢালাও নম্বর জোগাড় করে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ছাত্রলীগের ঐ সূত্র মতে, পুলিশ ক্যাডারে ৬৬ পদের পরিবর্তে যে ১১৬টি পদ বেআইনীভাবে সৃষ্টি করা হয়, তাতে কেবল মাত্র ১৬ জন মেধার ভিত্তিতে সত্যিকারভাবে উত্তীর্ণ হন। আসলে বিসিএস পরীক্ষায় মেধার কোন মূল্যই নেই বলতে গেলে চলে। কোটা ব্যবস্থার নামে জটিল জাল সৃষ্টি করে আর দলানুগতদের দিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করে প্রকৃত মেধা ও যোগ্য ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে নিয়োগ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিসিএস পরীক্ষায় বর্তমানে চালু রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্যদের কোটা ৩০ শতাংশ, মহিলা কোটা ১০ শতাংশ, উপজাতি কোটা ৫ শতাংশ, জেলা কোটা ১০ শতাংশ। অবশিষ্টরা মেধা কোটার আওতাধীন। কোটার বৈতরণী পার হওয়ার পরও ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের দলবাজ, অধিকর্তাদের তুষ্ট করতে না পারলে বিড়ম্বিত ভাগ্যের শিকার হতে হয়।

২০তম বিসিএস পরীক্ষায় ছাত্রলীগের ক্যাডারদের অনেকেই কোন না কোন বিসিএস ক্যাডারে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। পহেলা নভেম্বরের ইত্তেফাকের মতে, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-পাঠাগার সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ রহমান হল শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সৈয়দ নূরুল ইসলাম এএসপি পদে নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়াও এএসপি পদে নির্বাচিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সদস্য নজরুল ইসলাম, হারুনুর রশীদ ও লিটন। প্রশাসন ক্যাডারে ম্যাজিস্ট্রেট পদে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য জয়, মোর্শেদ, বনি প্রমুখ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে। ইত্তেফাক এবং জনকণ্ঠ সরকার সমর্থক ও সরকার ঘনিষ্ঠ পত্রিকা। এই পত্রিকাদ্বয় প্রকাশিত রিপোর্টসমূহের একআনাও যদি সত্য হয়, তাহলে জাতির কপালে দুর্ভোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে 'ফেয়ার বিসিএস মুভমেন্ট' নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়েছে। কোটা পদ্ধতির নামে দেশের প্রকৃত মেধাবী চাকরি প্রার্থীরা বঞ্চিত হয়েছে। শুধু উপজাতি কোটা রেখে সকল প্রকার কোটা বাদ দিতে হবে। যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে। গণতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের সভাপতি নূরুল হক মেহেদীসহ আরও অনেকে ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফল এবং কোটা প্রথা বাতিলের দাবী জানিয়েছেন।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দলীয় অনুগতদের নিয়োগ করেই ক্ষমতাসীন দল ক্ষান্ত হয়নি, সেখানে পরীক্ষাসহ সার্বক্ষণিক দলীয় নেতা-কর্মীরদের অবাধে সদম্ভ বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। ভাইভা বোর্ডে কোন কোন সদস্য যে ধরনের বেতমিজের মত আচরণ করেছে, তার প্রতিবিধান করা অত্যন্ত জরুরী। আওয়ামী রাজত্বে এটা যে সম্ভব নয়, তা অতীব স্পষ্ট। আওয়ামী শাসনের অবসানের পরপরই পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে খোলনলচেসহ বদলাবার ব্যবস্থা করে একটি সৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করে অপরাধীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক কঠোরতম শাস্তির বিধান করতে হবে।

www.pathagar.com

২৩ নভেম্বর ২০০০

বাঙালি জাত্যাভিমান ও রাষ্ট্রীয় সংহতি

মাহবুব উল্লাহ :

১৯৯৭-এর ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য শান্তিচুক্তি নামে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির পক্ষে এই সংগঠনের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা ও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী জনসংহতি সংগঠনের ক্যাডাররা অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে এবং এর জন্য প্রত্যেককে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করারও শর্ত রয়েছে। খাগড়াছড়িতে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে সশস্ত্র জনসংহতি সমিতির সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ঘটনাটিকে জনসংহতি সমিতি তাদের সংগ্রামের প্রাথমিক বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক–এ বিজয় যদি প্রাথমিক বিজয় হয়, তাহলে চূড়ান্ত বিজয়টা কী? এছাড়া, অস্ত্র সমর্পণ যতো না বাস্তব, তার চাইতে অনেক বেশী নাটকীয়। কারণ, অনেক মহলই প্রশ্ন করেছে, জনসংহতি সমিতি তাদের সমুদয় অস্ত্র সমর্পণ করেছে কি? নব পর্যায়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসের সূচনা করার জন্য তারা বেশ পরিমাণ মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের ভাণ্ডারে রেখে দিয়েছে কি? এছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প প্রত্যাহার করা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কাউন্সিলগুলোর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে কোন প্রকার আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না বলেও এই চুক্তিতে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। বিদ্রোহী জনসংহতি সদস্যদের পুনর্বাসনের জন্য পুলিশ বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জমিজমার মালিকানা নিয়ে পাহাড়ী ও সমতলবাসীদের মধ্যে এবং সরকারের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে তা নিরসনের জন্য একটি ল্যান্ড কমিশন গঠনেরও বিধান এই চুক্তিতে রয়েছে। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন। পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর দলে দলে পার্বত্য শরণার্থীরা ভারতের আগরতলা থেকে ফিরে আসতে শুরু করে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, যেসব শরণার্থী ফিরে এসেছেন, তারা কি সবাই বাংলাদেশের নাগরিক? কেননা, ১৯৬২ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হওয়ার পর পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় ৩৬৪ বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন হয়ে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়। সে সময়ে ঐসব এলাকার প্রায় ১০ হাজার অধিবাসী ভারতের মিজোরামে চলে যায়। বর্তমানে এদের সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশী।

১৯৭২-এর ৮ ফেব্রুয়ারী ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত প্রটোকল অনুযায়ী ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতের আগে যেসব নাগরিক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে গিয়েছিল তাদের ব্যাপারে বাংলাদেশের কোন দায়দায়িত্ব নেই বলেই উভয় পক্ষ সম্মত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পার্বত্য শান্তিচুক্তির আড়ালে ঐ সময়ের আগে যেসব পাহাড়ীরা ভারতে চলে গিয়েছিল. তাদের অনেকেই জমির লোভে এবং সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে বিদ্রোহী তৎপরতায় অংশগ্রহণের মতলবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরে আসা শরণার্থী হিসেবে ভিড় জমায়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সৃষ্টির এতোকাল পরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম, ভারতের মিজোরাম ও পার্বত্য ত্রিপুরার সঙ্গে বিশাল সীমান্ত অঞ্চল অরক্ষিত। একথা খোদ বর্তমান সরকারের আমলেই স্বীকার করা হয়েছে। সরকার এই সীমান্তে বিডিআর দিয়ে সীমান্ত নিরাপত্তা বিধানের চিন্তা-ভাবনা করছেন বলেও পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। পার্বত্য চুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত হল, চুক্তির পর কোন

www.pathagar.com

সমতলবাসীকে সেখানে বসতি স্থাপন বা জমি ক্রয় করতে দেয়া হবে না এবং সত্যিকারের পার্বত্য বাঙালী অধিবাসীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হবে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষী নাগরিকেদের প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হয়। এদের অনেকেই সেখানে আজ মানবেতর জীবন যাপন করছে। তদুপরি পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সমতলবাসী আর জমি ক্রয় বা বসতি স্থাপন করতে পারবে না সংক্রান্ত বিধানটিও বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। সরকার এক পর্যায়ে বিরোধীদলের অনুপস্থিতিতে সংসদে এই চুক্তি অনুমোদন করে নেয়। এই চুক্তির বিরুদ্ধে আনীত বিরোধী দলের প্রায় সাড়ে তিন হাজার সংশোধনী প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যের জোরে নাকচ করে দেয়া হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি জাতীয় সংহিতর ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সমস্যা। একে হালকা বা লঘু করে দেখার কোন অবকাশ নেই। বাংলাদেশের যে কোন সরকারই চাইবেন এরকম একটি সমস্যার ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ সমাধান হোক। এ কারণেই এরশাদ আমলে সমস্যাটি সমাধান কল্পে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় এবং সমঝোতার জন্য আলাপ-আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময়কার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় এবং Times of India সহ ভারতের বিভিন্ন দৈনিকে এ নির্বাচনে পার্বত্য অধিবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের খবরও ছাপা হয়। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হওয়ার পরও শান্তি উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। যে কমিটিতে তৎকালীন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত হন। এই পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সরকারের প্রতিনিধি দলের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী প্রতিনিধি দলের সদস্যরা পার্বত্য ত্রিপুরায় শরণার্থী ক্যাম্পগুলো পরিদর্শনে যান এবং সেখানে শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র উইং 'শান্তিবাহিনী' শরণার্থীদের জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশাকে পুঁজি করে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালাতে থাকে। ১৯৯৫ সাল থেকে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়ায় এই পর্যায়ে সমঝোতা প্রচেষ্টা সফল হতে পারেনি। কিন্তু শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার দেড় বছরের মাথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে অনেক ছাড় দিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হল এবং শেখ হাসিনা 'শান্তির দেবী' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন।

এই সরকার বলে থাকে, এই চুক্তি সম্পাদন তাদের সবচেয়ে মহিমাময় কীর্তি, যা অতীতের কোন সরকার করতে পারেনি। অথচ শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন রাঙামাটির এক সভায় পার্বত্য অধিবাসীদের বাঙালী হয়ে যাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। পার্বত্য অধিবাসীরা চাকমা, মারমাসহ ১৩টি জাতিসত্তায় বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে বাঙালী বলায় তাদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এছাড়া ১৯৭২ সালে নাগা, মিজো বিদ্রোহী ক্যাম্প উচ্ছেদের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারত ও বাংলাদেশের সম্মিলিত অভিযান চালানো যা ছিল মূলত একটি ভারতীয় অভিযান, সেই অভিযানে চাকমাসহ বিভিন্ন পার্বত্য জাতিসত্তার অন্তর্গত নাগরিকরা নির্যাতিত হয়। তাদের নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চলে। সংবিধান রচনার সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র লারমা সংবিধানে তাদের পরিচিতি অন্তর্ভুক্তির দাবী জানান। আওয়ামী লীগ সরকার মানবেন্দ্র লারমার দাবী জাত্যাভিমানের সুরে প্রত্যাখ্যান করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের যেসব অসন্তোষ, তার যেমন বাস্তব ভিত্তি আছে, অন্যদিকে এই অসন্তোষকে পুঁজি করে ভারত বাংলাদেশে নাশকতামূলক তৎপরতা জোরদার করে বাংলাদেশের ওপর সম্প্রসারণবাদী খবরদারী করার জন্য গোড়া থেকেই তৎপর থেকেছে। এই তৎপরতার আসল উদ্দেশ্য হল চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর ভারতের কর্তৃত্ব স্থাপন এবং

www.pathagar.com

চট্টগ্রামে থেকে খাগড়াছড়ি হয়ে সহজ পথে মিজোরাম ও পার্বত্য ত্রিপুরায় পৌঁছানোর জন্য করিডোরের সুবিধা অর্জন এবং অনাগত ভবিষ্যতে এই সুবিধাকে ব্যবহার করে পুরো চট্টগ্রাম অঞ্চলকে ফেনী নদী পর্যন্ত প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। আর এভাবেই তারা অখণ্ড ভারতের স্বপ্নসাধ পূরণের লক্ষ্যে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যাসিফিকেশন বা শান্তকরণ প্রয়াস যখন প্রায় সাফল্যের মুখ দেখতে যাচ্ছিল এবং সন্তু লারমারা যখন চরম হতাশায় নিমজ্জিত, তখনই শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে বাংলাদেশবিরোধী শক্তিকে অধিকতর শক্তি ও সাহস সঞ্চয়ের জন্য সময় দেয়া হল। ইদানীং সন্তু লারমা ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যেসব বাক্যবাণ বিনিময় হয়েছে, তাতে মনে হয় বিরোধটি নবতর মাত্রা অর্জন করছে। একদিকে যখন সন্তু লারমা বলছেন, চুক্তির ৯৮ ভাগই কার্যকরী হয়নি, তখন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ৯৮ ভাগই কার্যকরী হয়েছে। এই বিরোধটাকে মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামকে আওয়ামীকরণ ও অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তাকে একত্রিত করে জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার বিরোধ হিসেবেই দেখতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমানের সময়েও বিরোধের চরিত্র এ রকমটাই ছিল। '৯৬-এর নির্বাচনে পার্বত্যরা আওয়ামী প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিল এই আশায় যে, নির্বাচনের ফলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে তাদেরকে অনেক ছাড় দিয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হবে। অপরদিকে পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যেও নতুন রাজনৈতিক বিরোধ দানা বেঁধে উঠেছে। এদের একদল চুক্তিপন্থী এবং অপর দল চুক্তিবিরোধী হিসেবে পরিচিত। এই দুই পক্ষের মধ্যে প্রায়শই সংঘাত এবং পারস্পরিক অপহরণ ও পণবন্দী করার ঘটনা ঘটে। কখনও কখনও এসব সংঘাত হত্যা ও রক্তপাতে পরিণত হয়। সরকার ইতোমধ্যেই সন্তু লারমার আবদার অনুযায়ী ৭৯টি সেনা ক্যাম্প ভেঙে দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের সেনাবাহিনী বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে প্রায় বন্দী হয়ে পড়েছে। সৈনিকরা বাজার-সওদা করতে গেলে পাহাড়ীরা তাদের উত্যক্ত করে এবং এমনকি তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা নারী নির্যাতনের অভিযোগ আনে। এভাবে তারা বাংলাদেশের জাতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে নতুন করে সংঘাত সূচনার মওকা খুঁজছে।

তবে, সবকিছুর পরেও যে কথাটি থেকে যায়, তাহল– বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতি অর্জনের জন্য চাকমা, মারমাসহ সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে দেশের সমাজ ও রাজনীতির মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সর্বতোভাবে বিপদমুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলার জন্য বঙ্গভূমি, হাজং, সাঁওতাল, মনিপুরীসহ বিভিন্ন জাতিসত্তার নামে উস্কানিমূলক তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে নিজেদের জাতীয় মর্যাদা অর্জনের জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়াই করেছে, জাতীয় নিপীড়ন কতটা মানবতাবিরোধী হতে পারে, তা এদেশের মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। সুতরাং ভিন্ন কোন জাতিসত্তা, তা যত ক্ষুদ্রই হোক, তার সঠিক পরিচয় ও অধিকারের স্বীকৃতি দিতে এদেশের মানুষ কুণ্ঠিত নয়। তবে তা হতে হবে অবশ্যই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, একাত্তরের জন্মলগ্ন থেকে এদেশে একাধিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু দেশের প্রতিরক্ষানীতি, পররাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, জ্বালানী সম্পদ নীতিসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে গবেষণাভিত্তিক এবং সুচিন্তিত নীতি প্রণয়নের আন্তরিক প্রয়াস চালানো হয়নি। এসব নীতির নামে যা কিছু করা হয়েছে তা ছিল তাৎক্ষণিক চরিত্রের এবং গভীরতাবিবর্জিত। এসব নীতিতে ভাল কিছু থাকলেও তা কার্যকরী করতে প্রচণ্ড দোদুল্যমানতা লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রের এসব সমস্যার পাশাপাশি অন্যতম বড় সমস্যা হল, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কিভাবে নির্ণিত হবে তার জন্য কখনোই কোন পরিশ্রমী ও সুচিন্তিত অনুশীলন করা হয়নি। বড় রাজনৈতিক দলের নেতারা বিদেশী প্রতিনিধিদের কাছে যেমন–তেমনভাবে তাদের নীতি ব্যাখ্যা করেন এবং এসব ব্যাখ্যার পেছনে কোন প্রকার অনুশীলন ও অনুসন্ধান আছে বলে বিদেশীরাও মনে করেন না।

www.pathagar.com

আফতাব আহমাদ :

ক্ষমতাসীন দল পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তি সম্পাদন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে ভেবে যতই আহ্লাদিত হোক না কেন এবং বাহাবা নেয়ার চেষ্টা করুক না কেন, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ওই চুক্তি পার্বত্যবাসীদের জন্য কোনো সমাধান এনে দিতে পারেনি। বরং এটা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালিদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। সর্বোপরি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংহতি আজ নানা দিক থেকে আক্রান্ত। আমাদের জনগণের সর্বজনগ্রাহ্য একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা আজও আমরা গড়ে তুলতে পারিনি।

এ দেশে সংসদীয় ব্যবস্থার নামে যা চালু আছে, তা এক বিকৃত কর্তৃত্ববাদী সরকারেরই মুখোশ মাত্র। আসলে দেশের স্থিতিশীলতা, জাতীয় ঐকমত্য, রাজনৈতিক সংহতি এবং সহিষ্ণুতার একটি প্রতিবেশ তখনই সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে, যখন গোটা রাজনীতিটি আদর্শিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপরে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ আন্দোলনটি ছিল অ্যাডহকিজমের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে প্রতিরোধের আন্দোলনে রূপান্তর প্রক্রিয়া। এই রূপান্তরও সুষ্ঠুভাবে শ্রেয়বোধ ও সুনীতি সঞ্চারিত কোনো রূপান্তর নয়। আমাদের বিদ্বৎজ্জনদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক পাওয়া যায়, যারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদই হচ্ছে বাংলাদেশের আদর্শিক ভিত্তি। এই শ্রেণীভুক্ত লোকজন ব্যক্তিপর্যায়ে এক সময়ে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদের মতাদর্শিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। অতএব, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ বিযুক্ত এসব স্বার্থান্ধ লোকজনের বাঙালি জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা যে ভুয়া দর্শনের ওপর ভিত্তি করে রচিত, তা বলাই বাহুল্য।

একবার ভেবে দেখুন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানোত্তর কালে পাকিস্তানের বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেসব চটুল স্লোগান উচ্চারিত হতে শোনা গিয়েছিল, সে সময়ে সেসব কী পরিমাণ স্থূল ও অরাজনৈতিক ছিল– 'একটা-দুইটা মাওড়া ধরো, সকাল-বিকাল নাশতা করো'। এ ধরনের স্থূল ও উগ্র জাত্যাভিমানী স্লোগান যে বর্ণবাদ ও ফ্যাসিবাদেরই বহিঃপ্রকাশ, তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন? এই যদি বাঙালি জাতীয়তাবাদের দর্শন হয়, তাহলে সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্য কোনো জাতিসত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা তো দূরের কথা, বরদাশত করারও প্রশ্ন ওঠে না। আর ঠিক এ কারণেই শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়িদের শুধু বাঙালি হয়ে যাওয়ার নির্দেশই দেননি, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে এই বলেও হুমকি দিয়েছিলেন যে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে লাখ লাখ বাঙালি পাহাড় সয়লাব করে ফেলবে। এ শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করারই সমতুল্য নয়, তাদের জন্য চরম অপমানও বটে। আর এরই মধ্যে জন্ম হয় বাংলাদেশের সমতলবাসীদের সাথে মনস্তাত্ত্বিক বিরোধের। বুঝে না বুঝে একদিকে র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদকে বাস্তব মেনে নিয়ে তার ভিত্তিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করে পরমুহূর্তেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বিস্মৃত হয়ে একক বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে চাকমা, মারমা, বোম, পাংখো, খিয়াং, ম্রো, সাঁওতাল, হাজং, গারো প্রভৃতি জাতিসত্তাকে অস্বীকার করে তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে অবদমিত করে উগ্র জাত্যাভিমানী শাসন কায়েম করার অর্থ যে জাতিগত ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা, তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রের কাছে অত্যন্ত প্রাঞ্জল।

শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় যে সমস্যার জন্ম, সেই সমস্যাকেই আরও শতগুণ বাড়ানোর পেছনে মুজিবের দল আওয়ামী লীগের ক্ল্যানিশ পলিটিক্স অনেক বেশী দায়ী। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই জটিল সমস্যাটির বিভিন্ন মাত্রা যে বুঝতেন না তা নয়, কিন্তু মুজিবী ফ্যাসিজমের তাড়া খেয়ে অনন্যোপায় হয়ে এক পর্যায়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ভারতীয়রা পরবর্তী পর্যায়ে যখন আবিষ্কার করে যে, মানবেন্দ্র নামরায়ণ লারমা একজন সাচ্চা বাংলাদেশী দেশপ্রেমিক, তখন ভারতীয় চর প্রীতিকুমার চাকমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির ভেতরে সৃষ্ট একটি ঘাতক দলকে

www.pathagar.com

দিয়ে মানবেন্দ্র, তার বড় ভাই শুভেন্দুসহ দশজন নিষ্ঠাবান অনুগামীকে হত্যা করা হয়। বিষয়টি সন্তু লারমার অজানা নয়। এবং সে জন্যই সন্তু লারমাকে ভারতপন্থীদের সাথে বাধ্য হয়ে এক ধরনের তাল মিলিয়ে চলতে হয়। সবচেয়ে পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, জনসংহতি সমিতির সাথে হাসিনার ফুফাতো ভাই আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও প্রীতিকুমার চাকমা বাংলাদেশে আসতে অস্বীকার করেন এবং এখনও ভারতীয়দের সামরিক আতিথেয়তা ভোগ করছেন। অপরদিকে, তারই ভগ্নিপতি এস এস চাকমাকে হাসিনা ভুটানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছেন। এ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের প্রশ্নে ভারতীয়দের সাথে হাসিনার সুনির্দিষ্ট বোঝাপড়া ও লেনদেন যে হয়েছিল, তা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

এ দেশের অপরাপর রাজনৈতিক দলের সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে সন্তু লারমা কেবল আওয়ামী লীগ ও তার ভাইয়ের ঘাতকদের পৃষ্ঠপোষকদের ওপর ভর করে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, তাতে তিনি এখন সন্তুষ্ট থাকতে পারছেন না। একবার বলছেন হাসিনার সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছে দু'ধরনের– লিখিত ও অলিখিত; আবার বলছেন, চুক্তির যে মূল স্পিরিট তা হাসিনা ভণ্ডুল করে দিয়েছেন। অভিমান ও বিক্ষোভে মাঝে মাঝে এও বলছেন যে, প্রয়োজনে তিনি ও তাঁর দল আবার জঙ্গলে ফিরে যাবেন, আবার অস্ত্র তুলে নিয়ে বাংলাদেশ বাহিনীকে মোকাবিলা করবেন। সন্তু লারমার নিশ্চয়ই মনে আছে জিয়াউর রহমান তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেয়ার পর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাকে শান্তিবাহিনীর প্রধানের পদে পুনর্বহাল করার কারণে দলের মধ্যে মতপার্থক্য ও উপদলীয় কোন্দলের জন্ম হয় এবং এর সবটার পেছনে ছিল ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজালের ইন্ধন। পরিণতিতে সন্তু লারমার বড় ভাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রীতিকুমার চাকমার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ঘাতকদের হাতে নি ত হন। মানবেন্দ্রের অপরাধ ছিল তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই চেয়েছিলেন এবং ভারতের ক্রীড়নক হতে কখনই প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯৯৭ সালের ২৪ জুন সন্তু লারমা নিজেও এমনি একটি ঘাতক দলের সশস্ত্র হামলা থেকে দৈবক্রমে অল্পের জন্য রক্ষা পান। সন্তু লারমাকে গোটা পরিস্থিতি অনুধাবন করতে হবে, বুঝতে হবে এবং দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও সহিষ্ণু। সম্প্রীতি ও সৌহার্দের মধ্যে যুগ যুগ ধরে এ দেশের মানুষ বসবাস করে আসছে। আজ যারা এই সম্প্রীতি, সৌহার্দ, সহিষ্ণুতা ও শান্তির বিঘ্ন ঘটাতে চায় তাদের চিহ্নিত করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার কোন সুযোগ যেন তারা না পায় তাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাভাষীদের জাত্যাভিমানী উগ্রতাকে উসকে দিয়ে যারা বাংলাদেশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক একটি একক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের মধ্যে সততার অভাব রয়েছে, মতলবি উদ্দেশ্য রয়েছে। বাস্তবতাকে অস্বীকার করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংহতিতে চিড় ধরাতে চায় তারা। আজকের যুগে এক ভাষা, এক মন, এক সত্তাভিত্তিক একক জাতিরাষ্ট্রের কথা কল্পনার বিষয় মাত্র। নৃবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ভৌগোলিক অভিবাসনের মানদণ্ডে যেভাবেই বিচার করি না কেন, বাংলাভাষী বাঙালীদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ একটি বহুজাতিক জাতিরাষ্ট্র (Multi Ethnic Nation State). পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন জাতিসত্তা, যা প্রায় আঠারোরও অধিক হবে, তারা যদি বাংলাদেশকেই তাদের আবাসস্থল ও রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস দাবী করে, তাহলে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার একটা পথ অবশ্যই আছে। কিন্তু ভারতের ক্রীড়নক হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে যদি তারা পা বাড়ায়, সে পথে যে তাদের মঙ্গল নিহিত নেই তা বলাই বাহুল্য।

আমাদেরও উপলব্ধি করতে হবে, একটি বর্ন্যাঢ্য ও বহুমুখী বিচিত্রতার দেশে আধিপত্য ও নির্যাতন ছাড়াও ঐক্য কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়, জাতিসত্তাসমূহ যাতে স্বাধীন ও সাবলীলভাবে বিকশিত হতে পারে, সেজন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন। সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন কীভাবে

www.pathagar.com

স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টি, লালন ও সংরক্ষণ করতে পারে– তা বোঝার জন্য ও সামাল দেয়ার জন্য গভীর অভিনেবেশ সহকারে গবেষণার প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে আমাদের জনসমাজের কেউই এমনকি বিদ্বৎজ্জনদের মধ্য থেকেও কেউ এ বিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসেনি। শ্রীলংকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইন্টরন্যাশনাল সেন্টার ফর এথনিক স্টাডিজ'। এ ধরনের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আজ বাংলাদেশে অত্যন্ত জরুরী। যত দ্রুত এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে, ততই দেশের মঙ্গল হবে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সম্ভবত জিয়াউর রহমান এ বিষয়টির গুরুত্ব কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর সে কারণেই তার আমলে বেশ কিছুসংখ্যক ট্রাইবাল কালচারাল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে সমন্বিতভাবে জাতিক সমস্যা ও নৃতাত্ত্বিক বিষয়-আশায় নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা করার একটি প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক। আজ দলমত নির্বিশেষে আমরা যদি এ বিষয়ে একমত হই যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক সংহতি বজায় রেখে জাত্যাভিমান ও জাতিক আধিপত্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করব, তাহলে পাহাড়ী ও সমতলবাসী– এই বিভাজন ভুলে গিয়ে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে ক্ষমতা বিন্যাসের সমীকরণ কেমন হতে পারে তা ভাববার প্রয়োজনীয়তা সবচাইতে বেশী। এ পথেই বাংলাদেশের মুক্তি এবং বাংলাদেশের সকল জাতিসত্তা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে।

মাহবুব উল্লাহ :

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মূল অতীত ইতিহাসের গর্ভে নিহিত। ব্রিটিশরা হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন প্রণয়ন করেছিল ১৯০০ সালে। '৪৭-এর ১৪ আগস্ট যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় তখন স্নেহ কুমার চাকমার নেতৃত্বে একদল উপজাতি রাঙামাটিতে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে। অপরদিকে বান্দরবানে আরেক দল উপজাতি বর্মী পতাকা উত্তোলন করে। এদের এই বিদ্রোহ তিন দিনের বেশী টেকেনি। একদিকে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন আর অন্যদিকে বার্মার পতাকা উত্তোলন থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে, চাকমা ও মার্মারা আত্মপরিচয়ের দিক থেকে তাদের নৈকট্য সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে না।

তাই সমস্যাটিকে সম্যক উপলব্ধি করা দরকার। ১৯৭৮ সালে যখন আমি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, সে সময়ে এক সন্ধ্যায় আমার এক সহপাঠীর বাড়িতে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম এবং একমাত্র ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রফেসর নূরুল ইসলাম ও বাংলাদেশের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব মনজুরুল করিমের সাথে এক নৈশভোজে আমার একত্রিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র সচিবকে বিদেশের মাটিতে অন্তরঙ্গ পরিবেশে পাওয়ার সুবাদে আমি জনাব মনজুরুল করিমের নিকট জানতে চেয়েছিলাম পার্বত্য চট্টগ্রামে, সে বছর সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী ৩৫ কোটি টাকার জ্বালানি তেল পুড়িয়েছে, এ কথার সত্যতা কতটুকু? জনাব মনজুরুল করিম কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনি কি চাইবেন আপনার দেশের একটি অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক'? আমি স্পষ্ট করে জানালাম, 'সে রকম কোন অঘটন আমার কল্পনার অতি দূরতম স্থানেও নেই। তবে সমস্যাটিকে বুঝবার চেষ্টা করছি'। সে সময়ে আমি বলেছিলাম, পার্বত্যবাসী বিশেষ করে চাকমাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া থেকে জাত। রাষ্ট্র চাকমাদের লেখাপড়া করার সুযোগ দিয়েছে। অধ্যাপক, ডাক্তার, আইনজীবী ও প্রশাসক হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। উন্নত জীবনের সাথে পরিচয় তাদেরকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে। তাদেরকে লেখাপড়ার সুযোগ না দিলে বোধ হয় এসব রাজনৈতিক প্রশ্ন উঠতো না। তবে কোন সভ্য মানুষ এরকম দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হবেন না।

প্রফেসর নূরুল ইসলাম আমার বক্তব্যের ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন, তুমি একটা চমৎকার কথা বলেছ। আধুনিক সমাজের সংস্পর্শে আসলে মানুষের বঞ্চনাবোধ বেড়ে

www.pathagar.com

যায়। এই মুহূর্তে শিক্ষাদীক্ষায় চাকমারাই তুলনামূলকভাবে অগ্রসর। আর তারাই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন। প্রফেসর আঁদ্রে বেতেই উপজাতীয়দের সমস্যা সম্পর্কে মুসলিম সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত চমৎকারভাবে সারসংক্ষেপ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইসলামীয় দেশগুলোতে কিভাবে উপজাতি ও রাষ্ট্র পাশাপাশি থেকেছে, সে প্রসঙ্গ ইবনে খালদুন থেকে শুরু করে অনেকেই লিখেছেন। তাঁদের লেখায় যে বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে, সেটা শুধুমাত্র পাশাপাশি থাকার ঐতিহ্য নয়, পরস্পরের দেওয়া-নেওয়ার ঐতিহ্যও। মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা নিয়ে অধ্যয়ন, একজনের মতে, উপজাতি-সমাজ রাষ্ট্রের অঙ্গ, আবার নিজেদের ঐতিহ্যের সংরক্ষক'। এর ব্যতিক্রম ইরান। ইসলামীয় দেশগুলোর জন্য থেকে প্রগতির ক্ষেত্রে উপজাতিদের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই এই উপজাতিগুলোর মধ্যে শুধু গৌণ সত্তা আছে মনে করা ভুল হবে। আমরা ইবনে খালদুনের সময়ের কথাই বলি না কেন, এ কথা একইভাবে প্রযোজ্য। এবং একই কারণে উপজাতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার দুটি ভিন্ন ধারা মনে করাও ভুল।' [দ্রষ্টব্য ঃ আন্দ্রে বেতেই, 'ভারতের উপজাতির সংজ্ঞা এবং কিছু সমস্যা,' ভেলাম ভান সেন্দেল ও এলেন বল (সম্পাদিত) **বাংলার বহুজাতি : বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ**, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লি, ১৯৯৮]

বাংলাদেশের পার্বত্য জাতিসত্তাগুলোকে মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে তাদের ভাগ্য বাংলাদেশের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে চাকমা ছাত্রছাত্রী ও বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রীদের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করি, তখন বুঝি না বিভেদটা কোথায়। আমি নিজে অনেক উপজাতীয় ছাত্রকে পড়িয়েছি। তাদেরকে কখনও ভিন্ন চোখে দেখিনি- তারাও আমাকে তেমনভাবে দেখেনি। তাহলে আমাদের সবাই মিলে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে অংশীদার হতে আপত্তি কোথায়? ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরাই কি আমাদের পরস্পরের মাঝে বার বার বিভেদের দেয়াল রচনা করছে?

আফতাব আহমাদ :

আবদুল্লাহ-লারমা চুক্তির অসারতা আজ প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। একথা সত্য যে, ওই চুক্তির পেছনে পাহাড়ের সকল জাতিসত্তা এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন ও অনুমোদন ছিল না। আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে গভীর নিশিথে মহিউদ্দিন খান আলমগীরের পকেট থেকে চুক্তির যে খসড়া উপস্থাপন করা হয়, জনান্তিকে প্রকাশ, তার মূল মুসাবিদা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের। উল্লেখ্য, মহীউদ্দিন খান আলমগীর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান কল্পে গঠিত কমিটির কেউ ছিলেন না। অতএব আজ নতুন করে ভাববার একটি সুযোগ এসেছে। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, বিচার কার্য সম্পাদন ও নির্বাহী কর্তৃত্বের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতাকে যে চুক্তি সংকুচিত বা হ্রাস করে তা সেই রাষ্ট্র ও জনগণের মঙ্গল সাধন করতে পারে না। রাষ্ট্রের অবিভাজ্যতার প্রতি নিষ্ঠাবান ও অনুগত থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী পাহাড়িসহ অপরাপর অঞ্চলের জাতিসত্তাসমূহের গণতান্ত্রিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করার জন্য পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া আমাদের অতি দ্রুত শুরু করা জরুরী। সময় পেরিয়ে যাবার আগে পরিবেশ যতটা ঘোলাটে হয়েছে, তাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে, বৈরিতার অবসান ঘটানো সম্ভব। গভীরভাবে বাংলাদেশের সমাজ ও জাতিসত্তাসমূহ অধ্যয়ন করে সুচিন্তিতভাবে আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

www.pathagar.com

৩০ নভেম্বর ২০০০

বিচার বিভাগের বিপন্ন স্বাধীনতা

মাহবুব উল্লাহ :

সময়মত নির্বাচন হলে আর ১১ মাস পরে নির্বাচন হওয়ার কথা। তবে, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসারে নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে বলে ক্ষমতাসীন সরকারের জন্য ৮ মাস সময় হাতে আছে। সরকার ও বিরোধী শিবির উভয়পক্ষই নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে নির্বাচনী অফিসও খুলে বসেছে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচনী কর্মকাণ্ড তদারক ও পরিচালনা করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে অর্থমন্ত্রী জনাব শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ওপর। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি বনানীতে একটি ভিন্ন দফতর খুলেছে। এই দফতরে সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে ও প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির পার্থক্য হল– আওয়ামী লীগ থেকে যেভাবে সুনির্দিষ্টভাবে নির্বাচনের কর্মকাণ্ড দেখভাল করার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, বিএনপির পক্ষ থেকে সেরকম সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব কাউকে দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, চারদলীয় জোট যেভাবে ভোটের পাটিগণিত চয়ন করছে, নির্বাচনের ফলাফল সে রকমটি হবে না। আওয়ামী লীগ অবশ্যই আগামীবার ক্ষমতায় আসবে। জনগণ বিরোধী দলগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই আত্মপ্রত্যয়ের কারণ কী? আওয়ামী লীগের জন্য সর্বনিম্ন যা প্রয়োজন, তাহল, একটি সরকার গঠনে সক্ষম হওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসনে জয়লাভ করা। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, '৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৫১টি আসন না পেয়েও সরকার গঠন করেছে। সরকার গঠনের সময় প্রকাশ্যে ও গোপনে, দেশী ও বিদেশী মহলের মধ্যস্থতায় শেষ মুহূর্তের যে খেলা হয়, তার ওপরই সরকার গঠনের বিষয়টি নির্ভর করে। কেউ কেউ মনে করেন আওয়ামী লীগের লক্ষ্য হল, সম্ভব হলে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়া এবং এর জোরে নিজেদের মনমত সাংবিধানিক পরিবর্তন আনা। তবে, বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে এই পরিমাণ আসন সংগ্রহ করলে সেটা ভারী বেমানান দেখাবে আর সে কারণেই আওয়ামী লীগ হয়তো এই কাজটি করবে না।

১৯৭৩-এর নির্বাচন সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গিয়ে জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক শেখ মুজিবুর রহমানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন– সংসদে বিরোধী দলের অস্তিত্ব আছে, এমনটাই যেন নির্বাচনের ফলাফল হয়। এ ধরনের ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ না করারও পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবীণ অধ্যাপকের সেই সুচিন্তিত পরামর্শও আমলে নেননি। তিনি বলেছিলেন, একটি আসনও যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে সেটা আমার জন্য হবে চরম অপমান।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, একটি জাতীয় নির্বাচনে বিরোধী দলের কতগুলো আসন পাওয়া উচিত, সেটা নির্বাচনের আগেই নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা ১৯৭৩-এর আওয়ামী জামানাতেই শুরু হয়েছিল। '৭৩-এর নির্বাচনে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তা বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই জানে না। ডঃ আলীম আল রাজী, মেজর এম এ জলিল, ইঞ্জিনিয়ার আবদুর রশিদসহ বেশকিছু বিরোধী প্রার্থীকে জবরদস্তিমূলকভাবে পরাজিত করা হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ার আবদুর রশিদকে পরাস্ত করার জন্য হেলিকপ্টারে করে ব্যালটবক্সগুলো বঙ্গভবনে নিয়ে আসা হয়েছিল। পরিণতিতে যিনি জয়ী হলেন, তিনি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার নায়ক, সেটা নিশ্চয়ই আর কেউ না জানলেও শেখ হাসিনা তো অন্তত জানেন। রাজনীতিতে নীতিবোধ না থাকলে পরিণতি যে কত ভয়াবহ ও বিয়োগান্ত

www.pathagar.com

হতে পারে এ ঘটনা তারই দৃষ্টান্ত। এসব ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ এর কাছ থেকে কতটুকু শিখেছে, জানি না। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে ১৯৯৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন করতে গিয়ে বিএনপির যে কোন হোমওয়ার্ক ছিল না, সেটা তো স্পষ্ট। নিজের দলকেই শৃংখলার মধ্যে রাখা সম্ভব হয়নি। শৃংখলা না থাকার কারণেই সম্প্রসারণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের এদেশীয় দোসরদের ষড়যন্ত্র সফল হয়। একথাগুলো বলছি এ কারণে যে, মন্দ কাজে আওয়ামী লীগের পারদর্শিতা বিএনপিওয়ালাদের চেয়ে বেশী। অনেক হিসাব-নিকাশ কষে ওরা মাঠে নামে। এর জন্য ওদের দেশী-বিদেশী ঝানু পরামর্শদাতারও অভাব নেই।

তাই আগামী নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করার তুলনায় আওয়ামী লীগের লক্ষ্য থাকবে সরকার গঠনে সমর্থ হওয়া। পরপর দুই কিস্তিতে শাসন ক্ষমতায় থাকলে শেখ হাসিনা তার সকল আরদ্ধ কর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। যমুনা সেতুর সঙ্গে 'বঙ্গবন্ধু'র নাম জুড়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু'র নামে হল ও ভবন স্থাপন করা হচ্ছে এবং তার ভাস্কর্য নির্মাণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন প্রচলিত নোটে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ছাপানো হচ্ছে এবং সেনানিবাসে 'বঙ্গবন্ধু জাদুঘর', প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে 'বঙ্গবন্ধু' নভো থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এরকম ফর্দ দিলে এ বিবরণকে আরও দীর্ঘ করা সম্ভব। শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এ দেশের কোন স্থাপনার নামকরণ করা উচিৎ কিনা সে বিতর্কে প্রবেশ করার ইচ্ছা আমার নেই। তবে, সবকিছুই তার নামে আত্মসাৎ করার আগ্রাসী মনোভাব (তা জমি দখল করার খারাপ কাজেই হোক অথবা তার স্মৃতিকে রক্ষা করার 'মহৎ' উদ্দেশ্যেই হোক) মোটেও কাঙ্খিত নয়। এদিকে আবার প্রথম শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে বিপুল পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্র বিরোধী চিন্তা-ভাবনা যাতে মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে, সে জন্য পাঠ্যসূচী, প্রচার মাধ্যমসহ সকল প্রতিষ্ঠানেই এক বা একাধিক নেতার নামে ঐকতান সৃষ্টি করা হয়। রাশিয়ায় লেনিন, চীনে মাও, উত্তর কোরিয়ায় কিম ইল সুং, ভিয়েতনামে হো চি মিনের নাম এরই দৃষ্টান্ত। এসব নেতার বিশাল বিশাল প্রস্তর ও ধাতবমূর্তি বিভিন্ন স্কয়ার ও নামীদামী প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছে। চীন, ভিয়েতনাম ও উত্তর কোরিয়ায় এখনও তাদের নেতাদের আবক্ষমূর্তি ধুলায় গড়াগড়ি যায়নি। যেহেতু এসব দেশে কমিউনিস্ট পার্টি এখনও ক্ষমতায়। তবে, রাশিয়ায় এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে লেনিনের মূর্তি যেভাবে ক্রেন দিয়ে অপসারণ করা হয়েছে, সেটাও সবার বিবেচনায় রাখা উচিত। জনগণ কোন বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না। খোদ মাওয়ের কথা শুনেছি, প্রখ্যাত সাংবাদিক এডগার স্নোকে তিনি বলেছিলেন, তিয়েন ইয়েনমান স্কয়ারে তার মূর্তিটি দেখে তার বড্ড করুণা হয়। কারণ সময়-অসময়ে কাকপক্ষীরা ওটার ওপর বিষ্ঠা ত্যাগ করে। ভেবে চিন্তিত হই, শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মা পরপার থেকে তার মূর্তিগুলোর ওপর পাখিদের বিষ্ঠা ত্যাগ করার দৃশ্য দেখে কী শান্তি পাচ্ছে?

শেখ হাসিনা তার মরহুম পিতার বিদেহী আত্মার জন্য কত অশান্তি সৃষ্টি করছেন, তা কি তিনি আদৌ ভাবেন? যা হোক, মোদ্দাকথা হল, শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ চাইছে তাদের এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং তার জন্য প্রয়োজন নির্বাচনে জয়লাভ। বুদ্ধিমান হলে, এই বিজয়কে বিশ্বাসযোগ্যতার আবরণে তারা উপস্থাপনও করতে চাইবেন। নির্বাচন কমিশনে তাদের লোক আছে। সরকারী কর্মকর্তারা, যারা নিরপেক্ষ, তাদের নির্বাচনের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এমন সব নিয়োগ ও পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। ভোটার তালিকায় কারচুপি করার অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। এসব করার লক্ষ্য হল, বিজয় সুনিশ্চিত করা। কিন্তু এতকিছুর পরও ভোটের পাটিগণিত থেকে যদি বোঝা যায়, নির্বাচনে ক্ষমতা বিরোধী জোটের হাতে চলে যাবে, তাহলে সেই নির্বাচন ক্ষমতাসীনরা চাইবেন কেন? আগামী নির্বাচন সম্পর্কে অনেকেই আশঙ্কা পোষণ করেন, চিহ্নিত ভোটারদের ভোটকেন্দ্রেই যেতে দেয়া হবে না। নির্বাচনে কারচুপির জন্য ব্যালটবক্স হাইজ্যাক করার দরকার নেই, বুথ দখল করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হবে শুধু সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অপছন্দের ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে না

www.pathagar.com

দেয়া। মোটামুটি এসব কলাকৌশল প্রয়োগ করে নির্বাচনে জেতার একটা নীল-নকশা বেশ সুনিপুণভাবেই তৈরী করা হচ্ছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। তবে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকলে নির্বাচন যাতে না হয়, সে রকম পরিকল্পনাও আছে বলে অনেকেই মনে করেন।

মাস তিনেক আগে শেখ হাসিনার ক্যাবিনেটের অন্যতম মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু নির্বাচন হবে না বলে একটি তাত্ত্বিক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এ কথাটিও ফাঁস করে দিয়েছিলেন যে, দেশে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রাণনাশেরও একটি পরিকল্পনা আছে। জনাব মঞ্জুর সেই আশঙ্কাকে আবারও ভিন্ন ভাষায় পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন, তার জাতীয় পার্টি ফ্যাকশনের চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে তার দলের অঙ্গ-সংগঠন জাতীয় যুব সংহতির সম্মেলন ২০০০-এ জনাব মিজান চৌধুরী বলেছেন, '১৯৯৬ সালে সৃষ্ট গণতান্ত্রিক সরকারকে এখন পরিবর্তনের জন্য সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার বাইরেও প্রচেষ্টা চলছে'। ৯৬ সালে সরকার পরিবর্তন আপাতদৃষ্টিতে ভোটের মাধ্যমে হলেও আমলা-বিদ্রোহ এবং জেনারেল নাসিমের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার হাত বদলকে প্রশ্নসাপেক্ষ করে ফেলেছে।

এই নিয়ে তৃতীয়বারের মত দেশের উচ্চ আদালত ভয়াবহ বিতর্কের সম্মুখীন। দৈনিক যুগান্তর ১৯ নভেম্বর ২০০০ সংখ্যায় ফার্স্ট লিড করে খবর ছেপেছে, 'আদালতের দিকে এখন সবার চোখ-রাতে কোর্ট বসিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলায় আসামীর জামিন, ক্যাসেট নিয়ে খবর, ১৬ সম্পাদকের বিবৃতি, সংসদে বিচার বিভাগ নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব, বিরোধীদলীয় নেত্রীর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া, সব মিলিয়ে আদালতের দিকেই সবার চোখ'। দৈনিক যুগান্তর আরো বলে, যেসব কারণে আদালতের দিকে জাতি তাকিয়ে আছে, যেমন- শেখ মুজিব হত্যা বিষয়ক ডেথ রেফারেন্স মামলা এবং সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর সাংবিধানিক বৈধতা মামলা সেগুলো শিরোনামে উল্লেখ করেনি। ভাগ্য ভাল, উচ্চ আদালত প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আদালত অবমাননা বিষয়ক মামলার রায়ে উত্তাপ পরিহারের পথই বেছে নিয়েছে। তা না হলে এ ব্যাপারটিও উচ্চ আদালতের নজর কাড়ার কারণ হত।

দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। প্রতিদিনই সংবাদপত্রে খুন-খারাবীর বীভৎস সংবাদ ও ছবি ছাপা হচ্ছে। ইতোমধ্যে শেখ হাসিনা অভিযোগ তুলেছেন, অন্য দল থেকে লোকজন আওয়ামী লীগে ঢুকে আওয়ামী লীগারদের খুন করছে। এ কথাই যদি সত্য হয়, তাহলে এসব ভয়ঙ্কর লোকদের দলে ভেড়ানোর পেছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করেছে? ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল নিয়েও একটি সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। পাকিস্তানে জিয়াউল হকের সামরিক শাসন অবসানের পর নির্বাচন হয়েছিল। বেনজীর ভুট্টো ও নওয়াজ শরীফ পালাক্রমে ক্ষমতায় এসেছিলেন। সেদেশেও উচ্চ আদালত নিয়ে বিরাট সংকটের সৃষ্টি করেছিলেন নওয়াজ শরীফ। শেষ সংকট সৃষ্টি করলেন তিনি সেনাপ্রধানকে বরখাস্ত করে। একটি রাষ্ট্রে ক্ষমতার একাধিক কেন্দ্র থাকে। দক্ষ রাষ্ট্র নায়কদের মত ক্ষমতার বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে ভারসাম্য তিনি রক্ষা করতে পারেননি। তদুপরি, তাঁর দেশপ্রেম নিয়েও সেনাবাহিনীতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ করে- কারগিল যুদ্ধে তার ভূমিকা নিয়ে। বাংলাদেশেও উচ্চ আদালতকে বিতর্কিত করার আড়ালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিধ্বস্ত করার কোন নীল-নকশা আছে কি-না, তা হলফ করে বলা যাবে না, তবে আদালত যে ক্ষমতার সংঘাতের ফলে সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে, তা মোটামুটি নিশ্চিত।

দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলায় আদালতের জামিন প্রদানের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সংসদে ও সংসদের বাইরে এতবড় তুলকালাম কাণ্ড ঘটবে, তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এই দৈনিকটির সরকারবিরোধী ভূমিকার কারণে সরকার বাড়াবাড়ি করছে বলে অনেকেই মনে করেন। এই পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করা হয়েছে, সেটা তো বহাল আছেই। জামিন পেলেই সম্পাদক রেহাই পেয়ে যান না। বিচার তাকে মোকাবিলা করতে হবেই। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে বিতর্কিত করার প্রয়াস এবং অতীতেও একই ধরনের প্রচেষ্টা আজ কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে, এটাই সবার প্রশ্ন। অভিযুক্তদের পক্ষে সমর্থন করার কথিত অপরাধে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সনদ বাতিলের

www.pathagar.com

মত অগণতান্ত্রিক দাবীও উত্থাপন করা হয়েছে। যে কোন সভ্য বিচার ব্যবস্থায় অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন একটি অতি স্বাভাবিক অধিকার। ন্যুরেমবার্গে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারেও কেউ প্রশ্ন তোলেননি অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা নিয়ে। কী অদ্ভুত দেশে আমরা বাস করছি যেখানে আইনজীবীরা অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করতে পারবেন না। এমন আবদারও এ দেশের তথাকথিত শিক্ষিত মহলের একাংশ থেকে করা হয়। জানি না, এদেশে সবার কবে সুমতি হবে। তবে, ঈশান কাণে মেঘ জমেছে, তা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এখন ঝড়ের অপেক্ষা। এ ঝড়ে ছোটখাটো গাছ-গাছালির পাশাপাশি কটা বটবৃক্ষ উৎপাটিত হয়, তা ভেবেই শঙ্কিত হই। কারণ, বটবৃক্ষ না থাকলে ছায়া পাব কোথায়?

আফতাব আহমাদ :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের বিচার বিভাগ এবং সংবাদপত্র সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করছে। এই কথাটি যদি বাস্তবে সত্য হত, তাহলে নিন্দুকেরাও শেখ হাসিনার প্রশংসা না করে পারবে না। কিন্তু বাস্তবটি একটু ভিন্নধর্মী এবং অত্যন্ত রূঢ়। বিচার বিভাগ তার স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অ্যাসার্ট করার জন্য নির্বাহী বিভাগের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ, চাপ ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে। অপরদিকে, বিশ্বে নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করে গোটা দুয়েক পত্রিকা ছাড়া ঢাকাকেন্দ্রিক প্রায় সবকটি জাতীয় দৈনিক বিরোধীদল-বিরোধী পত্রিকায় পর্যবসিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বিরোধীদলের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে কিংবা সরকারী দলের দুর্নীতি, গণবিরোধী ও রাষ্ট্রঘাতী তৎপরতার সমালোচনা করে যে দুয়েকটি পত্রিকা জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভালবাসা পেয়েছে, তার মধ্যে ইনকিলাব শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা। ইনকিলাবকে নাজেহাল করার জন্য সরকার কোন কিছুই বাদ রাখেনি। দেশের অন্যতম সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক হওয়া সত্ত্বেও ইনকিলাব সরকারী বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত। ইনকিলাবকে তীব্র নিউজপ্রিন্ট সংকটেও ভুগতে হচ্ছে। যে যৎসামান্য বেসরকারী বিজ্ঞাপন ইনকিলাব পায় সে বিজ্ঞাপনদাতারাও সরকারী হুমকি ও রোষানলে পতিত হচ্ছেন। তদুপরি, সার্কুলেশন সংক্রান্ত চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মনগড়া পরিসংখ্যানের কারণে বেসরকারী বিজ্ঞাপনের রেটও অনেক কম পাচ্ছে ইনকিলাব।

দেশের বিচার বিভাগ এত চমৎকার স্বাধীনতা ভোগ করছে যে, ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে বিচারকদের শাসিয়ে যখন লাঠি মিছিল বের করা হয় এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আগ বাড়িয়ে যখন বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন, তখন সহজেই অনুমান করা যায়, বিচার বিভাগ কী ধরনের স্বাধীনতার স্বাদ-আস্বাদন করছে। এ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ এত অসহায় বোধ করে যে, সর্বোচ্চ আদালতকে অবজ্ঞাকারীদের অপরাধ বিচার্য বিষয় হিসেবে গণ্য করার জন্য সুয়োমোটো কেসও করতে পারছে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগে জামিন দেয়ার 'অপরাধে' একজন বিচারকের অপসারণ দাবী করে বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে সরাসরি যে হুমকি দিয়েছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বার এসোসিয়েশনের তৎকালীন সভাপতি বিচারপতি হাবিবুল ইসলাম ভুঁইয়া প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট সর্বসম্মতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে 'রং হেডেড' সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন ও সংযমী হতে পরামর্শ দিয়ে তিরস্কার করে। তারপরও হাসিনা এবং নির্বাহী বিভাগের ক্রোধ প্রশমিত হয়নি। সুযোগ পেলেই প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের ছোট বড় চাঁইয়েরা বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে কষে গাল দিতে নেমে পড়েন। এ সময়ে আমাদের প্রবীণ আইনজীবীরা তাদের প্রতিক্রিয়া খুব একটা ব্যক্ত করেন না। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, বিচার বিভাগকে শাসিয়ে যখন আওয়ামী গুণ্ডা-মস্তানদের লাঠি মিছিল রাজধানী প্রদক্ষিণ করে, তখন ডঃ কামাল হোসেন কিংবা ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদের মত ব্যক্তিরা অজ্ঞাত অথচ রহস্যজনক কারণে মৌনতা পালন করেন।

ইনকিলাবের সম্পাদককে মধ্যরাতে জামিন দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চারদিকে পরিকল্পিতভাবে যে ঝড় তোলার চেষ্টা হচ্ছে, তার লক্ষণ ভাল নয়। বলাবাহুল্য, যেসব দেশে

www.pathagar.com

আইনের শাসন বলবৎ রয়েছে এবং বিচার বিভাগ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে, সেসব দেশসহ বাংলাদেশের সংবিধান মোতাবেক বিচার বিভাগকে রক্তচক্ষু দেখানো বা নসিহত করার কোন অধিকার কারো নেই। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা দম্ভোক্তি করেছেন, 'সংসদ সার্বভৌম এবং বিচার বিভাগ সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য'। এটি একটি একদলীয়, ফ্যাসিস্ট বা কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থায় সম্ভব হলেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অচল। যেসব দেশের লিখিত সংবিধান রয়েছে, সেসব দেশে সংবিধানের রক্ষণ, ব্যাখ্যা ও ভাবসম্প্রসারণের এখতিয়ার একচ্ছত্রভাবে বিচার বিভাগকেই প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংসদের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমিত এবং সংবিধানে বিন্যস্ত মৌলিক চরিত্র ও কাঠামোর অধীনস্থ। এই ধরনের ব্যবস্থায় আইন প্রণেতারা যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অসাংবিধানিক Tyranny জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে না পারে, বিচার বিভাগ সে জন্য অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে বিচারক যেখানে অবস্থান করেন এবং যে সময়ে অবস্থান করেন, সেই স্থান ও কাল বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য যথোপযুক্ত। অথচ ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ মধ্যরাতের জামিন দেয়ার ঘটনা উল্লেখ করে যে ধরনের শঙ্কা প্রকাশ করছেন, তা অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। জনসাধারণ এই কথা ভুলে যায়নি, ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ মুজিব সরকারের আমলে কিছুকাল এটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরশাদ আমলে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর হাই কোর্ট বেঞ্চ বিষয়ক অংশটিকে কেন্দ্র করে তিনি যে রীট মামলায় লড়েছিলেন সেই মামলার রায়ে আজকের রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের তৎকালীন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছিলেন যে, চতুর্থ সংশোধনী মূলত সংবিধানবিরোধী একটি পদক্ষেপ ছিল এবং রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো পরিপন্থী। কিন্তু যেহেতু সেদিন কেউ ওই সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেনি, সেহেতু আদালতেরও কিছু করার ছিল না। বলাবাহুল্য, যে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং বিচারকদের মধ্যে যে ভীতিসঞ্চার করে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীটি পাস করা হয়, তাতে কোনো আদালতের পক্ষেই অ্যাসার্ট করার মত অবস্থা ছিল না।

যারা আজকে খোড়া যুক্তি দাঁড় করাচ্ছেন যে, আমাদের দেশের বিচারকরা সামরিক বাহিনীর প্রতি আনুগত্য পোষণ করে ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছেন এবং সংবিধানকে সামরিক আইনের অধীনস্থ করার ক্ষেত্রে সামরিক কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাদের উদ্দেশে বিনীতভাবে নিবেদন করতে চাই যে, ভারসাম্যহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রহিত অবস্থায় বিচারকরা যে কত অসহায়বোধ করেন তা কি চতুর্থ সংশোধনী প্রমাণ করেনি? ওই সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ও চরিত্র পাল্টে ফেলা হয়, যে কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ওই ঘটনাটিকে 'পার্লামেন্টারী ক্যু' বলে অভিহিত করেন। চতুর্থ সংশোধনীর আওতায় সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে সকল বিচারকের চাকরি নির্ভরশীল ছিল রাষ্ট্রপতির খেয়াল-খুশি, মর্জি ও কৃপার ওপর। বস্তুত এ অবস্থা থেকে বিচারকগণ এবং বিচার ব্যবস্থাকে একজন সমরনায়কই মুক্ত করে এনেছিলেন। রাজনীতিবিদদের জন্য এটা কি যথেষ্ট ধিক্কারের বিষয় নয়? সেদিন ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ ও অন্য প্রবীণ আইনজীবীরা কোথায় ছিলেন?

আজ এ দেশের রাজনৈতিক শব্দ ভাণ্ডারে দুটি বহুল প্রচারিত অভিব্যক্তি হচ্ছে ভোট ডাকাতির নির্বাচন ও মিডিয়া ক্যু'র নির্বাচন। এ ব্যাপারেও আওয়ামী লীগই ছিল পথিকৃৎ। আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর রওনক জাহানের ১৯৭৩-এর নির্বাচনের ওপর 'এশিয়ান সার্ভে' নামক জার্নালে প্রকাশিত আর্টিকেলে ভোট ডাকাতির নির্বাচন ও মিডিয়া ক্যুর নির্বাচনের বিশদ বিবরণ রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ওই জার্নালে প্রকাশিত আর্টিকেলটি ঢাকার ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) থেকে প্রকাশিত 'Bangladesh : Problems and Issues' গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে পারেন।

www.pathagar.com

এতসব কথা আলোচনায় না আনলেও চলত। কিন্তু আনতে হচ্ছে আওয়ামী লীগের অভিপ্রায় বোঝার জন্য। চারদিকে শোরগোল সৃষ্টি করে জাতিকে বেহাল অবস্থায় নিপতিত করাই আওয়ামী লীগের মূল উদ্দেশ্য এবং ওই ধরনের পরিস্থিতিতে চকিত নির্বাচন কারচুপিতে সিদ্ধহস্ত আওয়ামী লীগের অনুকূলেই অনুষ্ঠিত হবে। আমলা প্রশাসন থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনীতে আত্মীয়করণ ও দলীয়করণের মাধ্যমে যে চরম দুর্নীতি ও দলবাজি হাসিনা চালু করেছেন, তার কর্মজালের আওতায় কখনোই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগের নোংরা রন্ধণশালায় পরিণত হয়েছে। এহেন নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে কোন সুষ্ঠু অবাধ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। পুলিশ বাহিনীতে যেভাবে দলীয় মস্তানদের নিয়োগ অব্যাহত রয়েছে এবং ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল কেলেঙ্কারি যদি আমরা বিবেচনায় নিই তাহলে এটি দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, হাসিনা এ দেশকে তার পৈতৃক তালুক মৌরসীপাট্টা বলেই মনে করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের সকল সংস্থার ওপর থেকে হাসিনা প্রশাসনের অপচ্ছায়া অপসারণ না করা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারই হোক, আর অন্য যে কোন সরকারই হোক, তার কাছ থেকে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন কামনা করা আর কাঁঠালের আমসত্ত্ব ভাবা সমর্থক।

আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় যে ধস নেমেছে আওয়ামীপন্থী পত্রপত্রিকা কিংবা বিরোধী দল বিরোধী পত্রপত্রিকা পাঠ করলেই তা সহজে অনুমেয়। মন্ত্রীর পুত্র, প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞাতি ভাই, সরকারদলীয় এমপি ও এমপিদের পুত্ররা সারাদেশে খুন, রাহাজানি, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তা হাসিনার প্রতি সহানুভূতিশীল ওইসব পত্রপত্রিকা আর ধামাচাপা দিতে পারছে না। এমনই অবস্থায় মানুষের শেষ আশা-ভরসার স্থল হচ্ছে বিচার বিভাগ।

এই বিচার বিভাগেও ক্ষমতাসীন দলের নোংরা দলবাজির সংক্রমণ ঘটেছে। বিচারপতি শফিউদ্দীন আহমদ শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেছেন আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে। তাঁকে তিন-তিনবার ডিঙিয়ে জুনিয়র বিচারকদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। বিচারপতি মোজাম্মেল হককেও অনুরূপভাবে ডিঙিয়ে তাঁর জুনিয়রদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। উপরন্তু নতুন বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানে বর্ণিত শর্তাবলী পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগকে যাঁতাকলে পিষে স্বীয় প্রতিশোধপরায়ণতাকে চরিতার্থ করতে চাইছে। এই পরিস্থিতিতে ইনকিলাবের সম্পাদকের আগাম জামিনের ঘটনাকে বিচার করতে হবে। ইনকিলাবের অন্যতম পরিচালক তার অনুজ মোহাম্মদ মঈনউদ্দীনকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্টের অধীনে ৩০ দিনের ডিটেনশন দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারটি ইশতিয়াক আহমদের মত প্রবীণ আইনজীবীদের বিবেককে দংশন করে না। তাহলে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, সব জেনে শুনেও আগাম জামিনের সমালোচনা করে যে জ্ঞানপাপির ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ হচ্ছেন, তা কোন উদ্দেশে হাসিলের জন্য?

আমরা মনে করি শত বাধা ও ভ্রূকুটি বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও আমাদের সংবিধান বিচার বিভাগকে যতটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে, বিচার বিভাগ তা এখনও পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আসছেন। তবে তারপরও তাঁরা তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে দৃঢ়ভাবে সচেষ্ট থাকুক, এটাই সকল বিবেকবান নাগরিক প্রত্যাশা করেন। সামনে যে সাংবিধানিক সংকট ও জটিলতা আমাদের ঘাড়ে চেপে বসতে যাচ্ছে, সেখান থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে নির্বাহী বিভাগ যাতে বিচার বিভাগ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করতে পারে, সে ব্যাপারে সোচ্চার হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। যারা বিচার ব্যবস্থাকে সংসদের অধীনস্থ করতে চায় ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় তাদের অসৎ মতলব অত্যন্ত স্পষ্ট। ইতিহাসের চাকা পেছন দিকে ঘুরিয়ে বাংলাদেশকে বাকশালী যুগে ফিরিয়ে নেয়ারই এটি একটি অশুভ প্রয়াস। ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর এই জাতিকে যে অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস যুগিয়েছে, সেই সাহসে বলিয়ান হয়ে জাতি পুনরায় বাকশালী প্রেতাত্মাকে গহবরে লুকাতে দেবে না।

www.pathagar.com

৭ ডিসেম্বর ২০০০

আক্রান্ত ইনকিলাব

মাহবুব উল্লাহ :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত যে, গণতন্ত্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। এই ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। যেহেতু দেশের কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে একটি শাসন ব্যবস্থা দাঁড় করানো সম্ভব নয়, সেহেতু একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। মোটা দাগে এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপটি হল একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে, যারা সাধারণভাবে জনপ্রতিনিধি বা সংসদ সদস্য হিসেবে পরিচিত। জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে যে সংসদীয় কাঠামোটি গঠিত হয়, তাতে সাধারণত কোন বিশেষ একটি দল বা মতাদর্শের ষোলআনা আধিপত্য থাকে না। একশ' ভাগের মধ্যে একান্নভাগ প্রতিনিধি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে মনে করা হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কখনও কখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, সংখ্যালঘু সমর্থনপুষ্ট হয়েও কোন সরকার কাজকর্ম চালাতে পারে। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে দেবগৌড়া ও চন্দ্রশেখর সরকার এমনি ধরনের সংখ্যালঘু সরকার ছিল। বর্তমান বিজেপি সরকারের নিজস্ব দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, তৎসত্ত্বেও কোয়ালিশনভুক্ত দলগুলোর সমর্থনপুষ্ট হয়ে বিজেপি বেশ টেকসই সরকার গঠন করেছে। সরকাব যেভাবেই গঠিত হোক না কেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার গঠনের জন্য নির্বাচন একটি অপরিহার্য শর্ত। আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নির্বাচনের কোন সার্থক বিকল্প দিতে সক্ষম হননি।

কিন্তু নির্বাচন সত্যিকার অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনের যথার্থ হাতিয়ার কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মার্কসবাদীরা বলেন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বুর্জোয়ারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও আধিপত্যের জোরে তাদের শ্রেণীস্বার্থের অনুকূল জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করিয়ে নিতে পারে। আর দেশটা যদি বাংলাদেশের মত অনুন্নত বিশ্বের একটি দরিদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র হয়, তাহলে বাইরের শক্তিও নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে কলকাঠি নেড়ে থাকে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা গল্পচ্ছলে আমাকে জানিয়েছিলেন, '৯১-এর নির্বাচনের আগে প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে একটি প্রস্তাব এসেছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির এজেন্টরা তাকে বলেছিল, রাজনীতিতে পাকাপোক্ত আসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদে তার অনুগত কিছু এমপি থাকা প্রয়োজন। এজন্য তার পছন্দসই ব্যক্তিদের নির্বাচনে জিতিয়ে আনতে হবে। নির্বাচনে জেতার জন্য প্রয়োজন অর্থের। প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাঁকে নাকি ৩০ কোটি টাকা দিতে রাজি ছিল। এই রাজনীতিবিদ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এই লোভনীয় অফারটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে দাবী করেছেন। আমরা যেমন তাকে আসলেই এমন কোন অফার দেয়া হয়েছিল কি-না তা প্রমাণ করতে পারব না, ঠিক তেমনি তিনি এত বড় প্রলোভন ত্যাগ করতে পেরেছিলেন কি-না তাও প্রমাণ করতে পারব না। তবে দেশে-বিদেশে ভোটের রাজনীতিতে এ ধরনের কেলেংকারি ঘটেই থাকে। কয়েক বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে চীন নির্বাচন প্রার্থীদের অর্থের যোগান দিয়েছিল, এরকম একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যমে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থনীতি ও প্রযুক্তির দিক থেকে অনগ্রসর চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

www.pathagar.com

সরকার কাঠামোকে প্রভাবিত করার জন্য অর্থ ব্যয় করে কী ফায়দা ওঠাতে পারে? যারা অভিযোগ করেছিলেন, তাদের বক্তব্য ছিল, চীন তার অনুকূলে মার্কিন প্রশাসনের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী লবি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। জনান্তিকে কথা আছে, ভারতের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, যিনি এখন উপমহাদেশে শান্তির দূত হিসেবে পরিচিত– তিনি নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য পাকিস্তানের নওয়াজ শরীফের কাছ থেকে আর্থিক মদদ লাভ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক শক্তির টানাপড়েনে নির্বাচন ও গণতন্ত্র কী মারাত্মক প্রহসনে পরিণত হতে পারে, এসব ঘটনা তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বাংলাদেশে ২০০১ সালে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা আছে। এই নির্বাচন সত্যিকার অর্থে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কতটা প্রতিফলন ঘটাবে, তা নিয়ে প্রবল সন্দেহ ও আশঙ্কা আছে। এই সন্দেহ-আশঙ্কা যে কতটা সঠিক তা আমরা বুঝি–যখন আমরা দেখি, ফেনীর মূর্তিমান মৃত্যুদূতরূপে পরিচিত ব্যক্তিটি বেগম খালেদা জিয়াকে তিনটি আসনে মোকাবিলা করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। ফেনী এখন এক ভয়াল মৃত্যুপুরী। ফেনী ও সোনাগাজী থেকে প্রতিদিন খুন-খারাবির খবর আসছে। এই ফেনীতেই ড্রিল মেশিন দিয়ে যুবদলের এক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল। শুধু ফেনীই নয়, সমগ্র বাংলাদেশে এরকম বেশ কিছু মৃত্যুপুরী রয়েছে। লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, গফরগাঁও, বাগেরহাটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ভয়াল জনপদের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এসব এলাকার পুরুষ ও যুবকরা ঘরছাড়া। নারীরা সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে প্রতিনিয়ত ভীত-সন্ত্রস্ত। নির্বাচনের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, সন্ত্রাস ততোই ব্যাপকতর হচ্ছে। আমরা ইতোপূর্বে বলেছি, আগামী নির্বাচনে ব্যালেট পেপারে সীলমেরে বা বুথ দখল করে কারচুপি হবে না, এবারের কারচুপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে, ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবে না। ফলে বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের চোখে নির্বাচনে কারচুপির এই রূপটি আদৌ উদঘাটিত হবে না। বিরোধীদল যতই চিৎকার করুক, তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। অন্যদিকে '৯৬-এর নির্বাচনে যে কারচুপি হয়েছিল তা প্রমাণ করার জন্য দলিল দস্তাবেজ, সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে বিরোধী দলের পর্বতপ্রমাণ অদক্ষতার আলোকে একথা মনে করা অমূলক হবে না যে, ভবিষ্যতেও তাদের এই অদক্ষতা সমানভাবেই বহাল থাকবে। সবকিছু মিলিয়ে দেশের জনমতের প্রধান অংশ বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও একে কতটা কার্যকর ও সক্রিয়ভাবে বিরোধীদলীয় জোট নিজেদের পক্ষে নিতে পারবে, তা নিয়ে নানাবিধ সন্দেহ জনমনে হতাশার ছায়া ফেলছে। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, আওয়ামী লীগ আরেকবার যে করেই হোক ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করবে এবং এবার ক্ষমতায় এসে তারা যেসব কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি, তা সম্পন্ন করে ছাড়বে। শেখ হাসিনা তার দলের কর্মকর্তা ও সমর্থকদের কাছে প্রতিটি আসন লাভের জন্য প্রচণ্ড তাগাদা দিচ্ছেন। এখন সকল হতাশার মধ্যে যারা কিছুটা আশাবাদী হতে চান, তারা ভাবছেন, বাংলাদেশে হয়ত বা ফিলিপাইন কিংবা যুগোশ্লাভিয়ার দৃশ্য পুনর্মঞ্চস্থ হবে। এমনকি পেরুর মত ঘটনাও ঘটতে পারে। সে রকম কিছু ঘটবে কিনা, কেবল ভবিতব্যই তা বলতে পারে। ও রকমভাবে যারা আশাবাদী হতে চান, তারা যে অসহায় ডুবন্ত মানুষের মত খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছেন, তা বলাই বাহুল্য।

আফতাব আহমাদ :

দেশের অবস্থা যাই হোক না কেন, শেখ হাসিনার প্রশংসা না করে পারা যায় না। শেখ হাসিনার জুড়ি পাওয়া ভার। শেখ হাসিনার তুলনা কেবলমাত্র শেখ হাসিনাই। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের রাজনীতিতে একটি কথা চালু হয়ে এসেছে–কেউ কথা রাখে না। এ অপবাদ অন্তত শেখ হাসিনার বেলায় যিনিই দিতে চাইবেন, তাকে দ্বিতীয় চিন্তা করতে হবে। হাসিনার শাসনের স্টাইল, হাসিনার দলের হাবভাব এবং মুজিবপন্থীদের বাগাড়ম্বরে অনেকে বিস্মিত হলেও সমঝদারদের বিস্মিত হওয়া তো কিছু নেই। বোঝার ভুল হতে পারে। সে ভুল থেকে স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল হতে পারে। তা নইলে কর্ম ও নীতিতে আওয়ামী লীগ ও

www.pathagar.com

হাসিনা জনতার ভেতরে-বাইরে অভিন্ন অবস্থান নিয়ে অটল থেকেছে। আওয়ামী লীগ পরমত সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করে না এবং তার এই অবস্থানকে ক্যামোফ্লেজ করার জন্য কখনও একুশের চেতনা, কখনও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, কখনও মুজিবাদর্শের চেতনা এবং কখনও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির নামে আওয়ামী লীগের বিপরীতে যে কোন অবস্থানকেই গণবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী ও ঘাতক-দালালদের তৎপরতা বলে চিহ্নিত করা হয়। বিশ্বের তাবৎ দুষ্কর্ম করে আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় মাথা গুঁজলেই খাঁটি মানুষটি হওয়া যায়। আর এ দলটির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এখন হাসিনার হাতে। হাসিনার নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে দলের মধ্যে শত উপদলীয় কোন্দল করলেও হাসিনার তাতে কিছু যায় আসে না। সাম্প্রতিককালে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বিভিন্ন জেলায় ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে যে মারদাঙ্গা সম্পর্ক বিরাজ করছে এবং রক্তপাতের মধ্য দিয়ে যা প্রায়ই মীমাংসার পথ খুঁজছে, তা কিন্তু শেখ হাসিনাকে একচুলও বিচলিত করতে পারেনি। হাসিনা বিশ্বাস করেন যে, তার পিতার হত্যার জন্য এদেশের সকল মানুষ দায়ী, তাই এদেশের মানুষের সমুচিত শিক্ষা প্রয়োজন। একই সঙ্গে হাসিনা বিশ্বাস করেন, মুজিব না হলে এদেশটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারত না, তাই এদেশের সাড়ে ১২ কোটি মানুষকে হাসিনা মুজিবের বাচ্চা বানিয়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর। এই প্রত্যয় এবং প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা থেকে যে জিঘাংসার জন্ম, তাই বাংলাদেশে নব্য-পৌত্তলিক সংস্কৃতি রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এ বিষয়ে হাসিনার পক্ষ থেকে কোন ধরনের সংশয়-সংকোচ কিংবা দোদুল্যমানতা লক্ষ্য করা যায়নি। তিনি কথা ও কাজে একই নীতি অনুসরণ করে পরম নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের সকল অর্জনকে আত্মসাৎ করে নিয়ে পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন বলে অভিহিত করে তিনি নয়া ইতিহাস রচনার যে ফরমান জারি করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে।

এদেশের বিরোধীদলীয় রাজনীতিকরা গোড়ার দিকে শেখ হাসিনাকে সিরিয়াসলি নেননি এবং তারা ভেবেছিলেন, হাসিনার কায়দায় লম্ফঝম্ফ দিলেই হাসিনা ঘাবড়ে যাবেন। কিন্তু হাসিনা যে দমবার পাত্রী নন, তা তারা ঠাওরে উঠতে পারেননি। আন্দোলনের নামে বিরোধী দলসমূহ যখন আন্দোলনের প্যারোডি রচনায় ব্যস্ত, তখন হাসিনা তাদের উদ্দেশে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, আন্দোলন কাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী, তা আওয়ামী লীগের কাছ থেকে শিখতে হবে। বাস্তবিকই, গত সাড়ে ৪ বছরে হাসিনার শাসনকালের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখব, অসংখ্য ইস্যু সরকারী দল ও শাসকগোষ্ঠী বিরোধীদলের হাতে বারবার তুলে দিয়েছে– ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানিচুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, পুলিশ কাস্টডিতে হত্যা ও ধর্ষণ (রুবেল হত্যা থেকে শুরু করে শিশু তানিয়া ধর্ষণ), জননিরাপত্তা আইন, ফেনীর সন্ত্রাস, লক্ষ্মীপুরে এডভোকেট নূরুল ইসলামের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড, উচ্চ আদালতের বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল, বিচারকদের প্রতি ধমকি-ধামকি, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণ, ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় নজিরবিহীন দুর্নীতি ও দলবাজি ইত্যাদি কোন ইস্যুতেই বিরোধী দল শেখ হাসিনার আঁচলে সামান্যতম কাঁপনও তুলতে পারেনি। কিন্তু জনগণকে রাজপথ থেকে বারবার একটি স্তোকবাক্য শ্রবণ করে ঘরে ফিরতে হয়–এরপর আরও কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে। কিন্তু বিরোধীদলের জঠর থেকে সেই কঠোর কর্মসূচী কখনোই প্রসব হল না।

এ প্রসঙ্গে বিএনপির শাসনামলে হাসিনার একটি উক্তির উল্লেখ করতে হয়। হাসিনা বলেছিলেন, বিএনপিকে ধাক্কা মেরে মেরে গণতন্ত্র শেখাবেন।

বস্তুত আওয়ামী লীগের অসাংবিধানিক সহিংস সন্ত্রাসী আন্দোলনের ধাক্কা খেয়ে খেয়েই বিএনপি শেষ পর্যন্ত কেয়ারটেকারের বটিকাটি গলাধঃকরণ করে। ততদিনে সময় অনেক গড়িয়ে গেছে এবং পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে গেছে। কথায় বলে, সময়ের একফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। বিএনপি তথা বিরোধীদলগুলো একথা বুঝতে চাইছে না যে, আওয়ামী লীগকে বা হাসিনাকে মোকাবিলা করতে হবে তাদেরই যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। মানুষ আওয়ামী লীগকে

www.pathagar.com

পছন্দ করে না, কিংবা আওয়ামী লীগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে, তাই বিরোধীদলকে সমর্থন করা ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর নেই, একথা ভাববার কোন কারণ নেই। চরম অর্থনৈতিক সংকট ও নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর উচ্চমূল্যের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ অনেক সময়েই রাজনীতিবিমুখ হয়ে আত্মকেন্দ্রিকতায় নিমগ্ন থাকে। আর এ সময়গুলোই হচ্ছে ফ্যাসিস্ট পার্টিগুলোর ডালপালা মেলার সর্বোত্তম সময়। আওয়ামী লীগ যতটা না জনসমর্থনের উপর ভর করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তার চাইতে এ ধরনের সময়কে ব্যবহার করে জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করে মেকী কান্নার আড়ালে হিংস্র শ্বাপদের মত জনগণের টুঁটি চেপে ধরে।

আওয়ামী লীগ এবং হাসিনাকে বাহাবাই দিতে হয়। হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ মনে করে, গণতন্ত্র মানে দলবাজি এবং দলবাজি অব্যাহত রাখতে হলে যে কোন ধরনের দুর্নীতিই হালাল আর তাই বাগেরহাটের কোন এক থানা আওয়ামী লীগ নেতাকে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ করতে হাসিনা বিবেকে কোন পীড়া অনুভব করেননি। ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় নোংরা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দলীয় সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি।

নির্বাচন কমিশনে সরাসরি দলীয় লোকজনকে, বিশেষ করে জনতার মাঁচার কারিগর শফিউর রহমানকেও নিয়োগ দিতে হাসিনার এতটুকু বাধেনি। অবশ্য, নির্বাচন কমিশনের ভেতরকার পরিস্থিতি হচ্ছে– এক ঘরমে বহুত পীর। অবস্থাটা এমন যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অপরাপর নির্বাচন কমিশনারগণ একে অপরের মুখ দেখতেও নারাজ। হাসিনার কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। এসব পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিরা কোথায় যাবেন? সবাইতো তারই লোক। লম্ফঝম্ফের পরে দিনশেষে তার আঁচলেই তো তাদের আশ্রয়। আর প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে হাসিনা কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গুনগুনিয়ে একটি গীতই গাইছেন–'পান্সি চল রাহা হায় মাজাছে'। গুনগুনিয়ে গাইবেন না কেন? দেশের এক-দশমাংসের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়লেও কোথাও যখন টুঁশব্দটি নেই। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র দল বারবার বাংলাদেশের সীমান্তে হানা দেয়ার পরও ভারতের কাছেই যদি করজোড়ে কাকুতি-মিনতি করতে হয়, বাংলাদেশের বিপুল ভূখণ্ড ভারতের দখলে থাকলেও কূটনীতির ভাষা পর্যন্ত লোপ পায়, তখন এদেশে আওয়ামী লীগের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি আছে–তা ভাববার কোন সুযোগ কি মানুষকে বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক দলগুলো দেখাতে পেরেছে? খোদ বিরোধী দলীয় নেত্রীর নির্বাচনী এলাকায় 'সন্ত্রাসী ভাইছা' যেভাবে কদর্য ভাষা উচ্চারণ করে এক নারকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে এবং যেখানে নিত্য লাশ পড়ছে, সেখানে বিরোধীদলের প্রতিবাদের ধরন অতি ক্ষণস্থায়ী বুদবুদের সমতুল্য। সেখানে ঢাকা নগরীর দুই হাজীর পাজী ছেলেরা নাইন শূটার গান, চাপাতি নিয়ে হাসিনার প্রেসক্রিপশন মোতাবেক যৎসামান্য আদর-আপ্যায়ন করবে–সেটাই তো স্বাভাবিক।

বিচারকদের বিরুদ্ধে যখন লাঠি মিছিল বের হয়, কিংবা বিচারকদের সংসদের কাছে জবাবদিহি করার জন্য শাসানো হয়, তখন বাঁদরামোতে নিয়োজিত এদেশের সংবাদপত্রের বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের ঠিকুজি খুজে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, বিচারকদের মান-মর্যাদা, উচ্চতর আদালতের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ময়দানে বিরোধীদলের কোন প্রতিবাদী কর্মীকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। নব্য বাকশাল কায়েমের পাঁয়তারা হিসেবে সংবাদপত্রের টুঁটি যখন চেপে ধরা হয়, তখন বিরোধীদলের অনেক রাজনীতিককেও 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়' মাত্রাতিরিক্তভাবে বিভোর থাকতে দেখা যায়। অথচ যখন অপর কোন পত্রিকায় জাতীয় সঙ্গীতের প্যারোডি হিসেবে 'ডাইল সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়, কিংবা গদ্য কার্টুনের শিরোনামে বাংলাদেশকে 'বাংলাস্তান' করে জাতীয় সঙ্গীতের প্যারোডি রচনা করা হয় তখন এসব 'উজ্জীবিত মুক্তিযোদ্ধারা' কোন শয্যায় বেহুশ হয়ে পড়ে থাকেন, তার হদিসও মেলে না।

বলছিলাম হাসিনার কথা। হাসিনার তুলনা হাসিনাই। ভবিষ্যত প্রজন্মের ললাটে এরকম একজন হাসিনা আর জুটবে কি? সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আমলাতন্ত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, বিচারালয়, প্রচার মাধ্যম, সর্বত্র হাসিনা তার নিজের কাছে করা ওয়াদা অক্ষরে

www.pathagar.com

অক্ষরে পালন করেছেন। আজ সর্বত্র মুজিবের প্রতিকৃতি দৃশ্যমান। শুধু তাই নয়, দেশের প্রেসিডেন্টকেও বাধ্য করা হয় এমনি প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে পৌত্তলিকতা চর্চায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে। আমরা যেখানে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথানত করতে শিখিনি, সেখানে হাসিনা আমাদের প্রেসিডেন্টসহ বহুজনকেই মুজিবের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড় করিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলছেন। এদের অনেকেরই হয়ত মন চায়নি এরূপ পৌত্তলিকতায় অংশ নিতে, কিন্তু পরিস্থিতির করুণ শিকার তারা। মোবারক হো হাসিনা। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত হবে হাসিনাকে শিক্ষয়িত্রী মেনে তার কাছে রীতিমত পাঠ গ্রহণ করা।

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আজ দু'টি মেরু বিদ্যমান। একদিকে প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ী শাসকদল, আর অন্যদিকে চরম আত্মবিনাশী ও আত্মঘাতী বিরোধী দল। ড. আফতাব অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় শেখ হাসিনার আত্মপ্রত্যয়, মনোবল এবং কর্মকুশলতার যথার্থ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন, প্রতিপক্ষকে বশ করার জন্য প্রলোভনের মায়াজাল বিস্তার এবং প্রতিপক্ষকে দিকভ্রান্ত করার জন্য কুহেলিকা সৃষ্টিতে তার সত্যিই কোন জুড়ি নেই। এক কথায় বলতে গেলে, 'যোগ্য' পিতার 'অতিশয় যোগ্য' কন্যা। পিতা যেখানে স্বাভাবিক মানবিকতায় কোমল, কন্যা সেখানে অতি কঠোর। পিতা যেখানে স্বগোত্রীয় বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ, কন্যা সেখানে গোত্রের অভ্যন্তরে যারাই একটু মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছে, তাদেরকে সচিবালয় থেকে মতিঝিলে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। কিংবা তাদেরকে শাসিয়ে দিয়েছেন এই কথা বলে, প্রয়োজন হলে চেয়ার কেড়ে নেয়া হবে। এক সময়ে ভারতীয় মন্ত্রিসভা সম্পর্কে বলা হত, ঐ মন্ত্রিসভায় ইন্দিরা গান্ধীই একমাত্র পুরুষ। আজকের বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার দিকে তাকিয়ে সম্ভবত একই উক্তি করা সংগত।

বিরোধী দল শুধু আত্মবিনাশী নয়, আত্মঘাতীও বটে। এমন পরাক্রমশালী প্রতিপক্ষের মুখে যারা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাসে ভোগে তাদের পক্ষে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছা যে কত দুরূহ, তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তৃতীয় পর্বে ৫ বছর ক্ষমতায় ছিল। এই সময়টিতে তারা কোন শক্তিশালী দলীয় মুখপত্র এবং তাদের মতাদর্শের সমর্থক কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি। নানা নামে কিছু দৈনিক পঞ্চাশ/ষাট কপি ছাপা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তারা বুঝে উঠতে পারেননি, কাদের হাত দিয়ে একটি ভাল সংবাদপত্র বের হতে পারে। কারা সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে নতুন জোয়ার সৃষ্টি করতে পারে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যদি বা কোনক্রমে ক্ষমতার আসনটি পাওয়া যায়, আমরা বুঝতে পারি না, তাদের গৃহীত প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের পক্ষে কোন পত্রিকাটি কাজে আসবে? ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমে কোন শিল্পী বা অভিনেতা তাদের মতাদর্শের অনুকূলে ভূমিকা পালন করবেন? বেতার-টেলিভিশন চালাতে গিয়ে বাকশালীদের দাক্ষিণ্য ও করুণার মুখাপেক্ষী না হয়ে তাদের কী বা করার থাকবে? দৈনিক ইনকিলাব কোন দলের মুখপত্র নয়। তবে এদেশের গণমানুষের মূল চিন্তা-চেতনাকে যথাসম্ভব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও প্রতিধ্বনিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ও প্রচার ব্যাপ্তি ঈর্ষনীয়ও বটে। জাতীয়তাবাদী শক্তির ক্রিটিকাল সাপোর্টার হিসেবে ইনকিলাব তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অথচ এই ইনকিলাবের উপর যখন শাসক দলের খড়গ নেমে এল, তখন এই পত্রিকাটির সপক্ষে বুলন্দ আওয়াজ তুলতে বিরোধী দলগুলো চরম শৈথিল্যের পরিচয় দিয়েছে। গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হল স্বাধীন সংবাদপত্র। বিরোধী দলগুলো যদি এই নীতিতে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী হয়ে থাকে, তাহলে ইনকিলাবের উপর আজ যে জুলুম চলছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ইতস্তত ভাব কেন? বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে সন্ত্রাসীরা রাষ্ট্রশক্তির ছত্রছায়ায় পত্রিকাটি পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং এর বিপণন ও বিতরণে বাধা দিচ্ছে।

www.pathagar.com

বাকশালের এই নব্যরূপ জাতি আজ চরম অসহায়ত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছে। কিন্তু জাতিকে অভয় দেয়ার নেতৃত্ব কোথায়? বাকশালের নব্যরূপের বৈশিষ্ট্য হল, সংবিধানে কাগজে-কলমে বিরোধীদল ও মত থাকবে। কিন্তু তাদের কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে দেয়া হবে না। বাহ্যিক রূপের দিক থেকে এই ব্যবস্থাটি হল বহুদলীয় বৈশিষ্ট্যের, কিন্তু কার্যত একদলীয়। প্রত্যেকটি গণতন্ত্রমনা মানুষ নাৎসীবাদকে ঘৃণা করে। কিন্তু হিটলারের রচিত 'মেইন ক্যাম্ফ' গ্রন্থটি পুড়িয়ে ফেলতে পারে না। কারণ ঐ গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, হিটলারের চিন্তা-ভাবনা কেমন ছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আমরা যদি শ্রদ্ধাশীল হই, তাহলে সমাজে বহুমত থাকবে এবং বহুমতের প্রতিযোগিতাও থাকবে। উন্নত ও শক্তিশালী মতাদর্শ অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শকে স্বাভাবিকভাবেই পরাস্ত করবে। একথাটি যদি সত্য হয়, তাহলে ইনকিলাবকে এত ভয় পাওয়ার কী কারণ আছে যে, এটার প্রচার ও বিপণন কেন বাধাগ্রস্ত করতে হবে? মাও সেতুংয়ের একটি উক্তি ছিল– 'শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভাল'। শত্রু যাকে আক্রমণ করে না সে যে সঠিক পথে নেই, তা অত্যন্ত পরিষ্কার। আজ ইনকিলাব আক্রান্ত। তার মানে ইনকিলাব সঠিক কথাই বলছে। সেটা অনেকের অপছন্দের হতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই অগ্রাহ্য করবার মত নয়। এমন একটি পত্রিকা যা আগামী সাধারণ নির্বাচনে (যদি আদৌ অনুষ্ঠিত হয়) বিরোধী জোটের পক্ষে প্রবল জনমত গঠন করতে পারে, সেই পত্রকাটিকে মামলা-হামলায় জর্জরিত করে দিনের আলোর মুখ দেখতে না দেয়ার যে অশুভ চক্রান্ত শুরু হয়েছে, তা কি বিরোধী জোট দেখতে পায় না? এমনভাবে জেগে থেকে যারা ঘুমানোর ভান করেন তাদের এসব লেখালেখি আদৌ জাগ্রত করবে কিনা–আমি অন্তত প্রবলভাবে সন্দিহান। দাঁত থাকতে যে মানুষ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না, সে মানুষ অকালে যেমন দাঁত হারায়, তেমনি যে জাতি স্বাধীনতা থাকতে স্বাধীনতার মর্যাদা বোঝে না, তার পক্ষে স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা কত যে কঠিন, তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা দুরূহ। তবু আশা করব, আলস্যের, তন্দ্রালুতা ও বিহ্বলতার সিত পরিধান ছিন্ন করে ওরা জেগে উঠবেন এবং অসহায় জাতির ডুবন্ত তরীর কাণ্ডারি হিসেবে হাল ধরবেন। আমরা সবাই আবার গাইবো,

'কাণ্ডারি এ তরীর পাকামাঝি মাল্লা
দাড়ি মুখে সারি গান লা শরিক আল্লাহ্'।

www.pathagar.com

১৪ ডিসেম্বর ২০০০

স্বৈরতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি

মাহবুব উল্লাহ :

সমাজতত্ত্বে 'প্রাচ্যের স্বৈরাচার' নামে একটি তত্ত্ব আছে। কার্ল উইট ফগেল এই তত্ত্বের প্রবক্তা। অতীত ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নদী অববাহিকায় সভ্যতার পীঠস্থানগুলো গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু নদকে কেন্দ্র করে সিন্ধু সভ্যতা, নীলনদকে কেন্দ্র করে মিসরীয় সভ্যতা, হোয়াংহোকে কেন্দ্র করে চৈনিক সভ্যতার উত্থান ও বিকাশ এর দৃষ্টান্ত। মানুষের জীবন-যাপনের জন্য পানি অপরিহার্য। পানির অপর নাম জীবন। কৃষি কাজ ও পশু পালন পানি ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং সভ্য সমাজ পানিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে, এটাই তো স্বাভাবিক। উইট ফগেল এরকম সভ্যতার নাম দিয়েছেন হাইড্রলিক সিভিলাইজেশন। উইট ফগেলের মতে, হাইড্রলিক সিভিলাইজেশন গড়ে তোলার জন্য একটি কেন্দ্রীভূত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। কৃষিকাজের জন্য ব্যাপক সেচব্যবস্থা যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না, সেহেতু রাষ্ট্রকেই সে দায়িত্ব পালন করতে হয়। রাষ্ট্রের উপর প্রজার এই নির্ভরশীলতা রাষ্ট্রকে করে তোলে স্বৈরাচারী।

বাংলাদেশ কৃষির জন্য ইংরেজ শাসনের পূর্বকালে সেচব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল না। গাঙ্গেয় বদ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশ পানির সরবরাহের দিক থেকে প্রাচুর্যমণ্ডিত ছিল। তবে বাংলাদেশের একটি সমস্যা বরাবরই ছিল, আর তা হলো, বন্যা ও প্লাবনের সমস্যা। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেন, আল বেঁধে অর্থাৎ বাঁধ দিয়ে প্লাবন রোধ করার চেষ্টা করা হতো। বঙ্গ ও আল (যার অপভ্রংশ 'আইল') মিলে হয়েছিল বঙ্গাল। তথা বাঙালী। বিদেশী পর্যটকরা, যারা মধ্যযুগে বাংলাদেশে এসেছিলেন, তাঁরা এইসব 'আইল' বা বাঁধ লক্ষ্য করেছিলেন। বড় ধরনের বাঁধ বাঁধার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্রের উদ্যোগের প্রয়োজন হয়। শুষ্ক অঞ্চলে সেচের জন্য প্রয়োজন হয় খাল খননের। অন্যদিকে, বাংলাদেশের মত পানিপ্লাবিত অঞ্চলে চাষের জমিকে পানি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হয় বাঁধের। এ কারণেই সম্ভবত বাংলাদেশে কার্ল উইট ফগেলের তত্ত্বটি একটু ভিন্নভাবে প্রযোজ্য।

ব্যক্তি যেখানে গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের চাপের মুখে অসহায়, সেখানে আর যাই হোক, গণতন্ত্রের বিকাশ আশা করা যায় না। বাংলাদেশে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর গণতন্ত্র কেন বারবার হোঁচট খেল—এই প্রশ্নে একটি অন্তঃসারশূন্য তত্ত্ব এ দেশের উদ্ভট কলাম লেখকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এখানে বলে রাখা দরকার, গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষিত করার প্রয়াসের ফসলই বাংলাদেশ। অথচ এই বাংলাদেশে গণতন্ত্র থাকবে না, কিংবা গণতন্ত্রের নামে প্রহসন চলবে— এ কথাটি কখনও ভাবা যায়? বাংলাদেশে কেন গণতন্ত্র হোঁচট খাচ্ছে, তা নিয়ে উদ্ভট বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য হলো, এখানে সামরিক বাহিনী একাধিকবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দিয়েছে এবং এর মূলে রয়েছে কতিপয় সামরিক কর্মকর্তার উচ্চাভিলাষ। সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে উচ্চাভিলাষ নেই, কিংবা ক্ষমতার মোহ নেই—এরকমটি আমি বলতে চাই না। কিন্তু তারও আগে ভাবা দরকার, কোন পরিবেশে এবং কোন ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এরকম অবাঞ্ছিত এবং সম্ভবত অনিবার্য উচ্চাভিলাষ বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়। ব্যারিনংটন ম্যুর 'সোশ্যাল অরিজিন অব ডিকটেটরশিপ অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' নামে একটি বহুল পঠিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। ম্যুর যা বলতে চেয়েছেন তার মূল কথাটি হলো, গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র সামাজিক ভিতবিবর্জিত নয়। বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে দেশবাসীর বিপুল অংশ জমি ও পানির ওপর অধিকারের জন্য একে অপরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। যেসব ভায়োলেন্স বা বল প্রয়োগের ঘটনা বাংলাদেশের সমাজে প্রতিদিন ঘটছে, তা প্রধানত ব্যাখ্যা করা যায় ভূমিকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতাকে ভিত্তি করে। অতীতে এমন একটা সময় ছিল, যখন বাংলাদেশে

www.pathagar.com

নগরায়নের ব্যাপ্তি ছিল অত্যন্ত সীমিত। মানুষ গ্রামে জন্মগ্রহণ করত, গ্রামে জীবন কাটাত এবং গ্রামেই মৃত্যুবরণ করত। নিজ গ্রামের বাইরে কোথাও গিয়েছে এমন মানুষ খুব কমই ছিল। হাটবাজার, ডাক্তার, বৈদ্য আর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের প্রয়োজনের মধ্যেই মানুষের যাতায়াত সীমাবদ্ধ ছিল। এরকম গ্রামে জমির ভাগ-বাটোয়ারা, উত্তরাধিকার এবং জমির সীমানা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। জমির আইল দু-চার ইঞ্চি এদিক-সেদিক হওয়ার ফলে রক্তপাত বা খুনোখুনি অনিবার্য হয়ে পড়ত। কোঁচ, টেঁটা, বল্লম নিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মহড়া হতো। এটাই ছিল চিরায়ত গ্রামীণ সমাজে ভায়োলেন্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ার ফলে গ্রামের মানুষ শহরমুখী হলো। তারপর হলো বিদেশমুখী।

জীবন-জীবিকা এখন অত্যন্ত জটিল। গত কয়েক বছরে নাগরিক জীবনে ভায়োলেন্সের প্রাবল্য নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে বিত্তশালী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিত্তের বাহ্যিক প্রদর্শনও উৎকট রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে এমন অনেক পরিবার আছে, যেসব পরিবারের গৃহস্বামী, গৃহকর্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের জন্য আলাদা আলাদা মোটরগাড়ি রয়েছে। বিত্তের এই প্রাচুর্যের পাশাপাশি বিত্তহীনের সংখ্যা, ছিন্নমূল বস্তিবাসীর সংখ্যা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এবং জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হতাশ লক্ষ্যহীন মানুষের সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এরকম পরিবেশে ভায়োলেন্স সামাজিকভাবে এক নতুন মাত্রা অর্জন করেছে। গড়ে উঠেছে বিশাল এক অপরাধ জগৎ। এই অপরাধ জগতে মাদক, অস্ত্র, স্বর্ণসহ নানা জিনিসের লেনদেন ও পাচার চলে। এই লেনদেন ও পাচারের কাজে হতদরিদ্র থেকে বিটিভির নাটকের চরিত্র 'লাটভাই'রা সংশ্লিষ্ট হয়। আবার এসব মূল্যবান সামগ্রীর লাভের বখরা নিয়ে চলে মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কোন এক সময়ে সংবাদপত্রের পাতায় পড়েছিলাম, রাজধানীর একটি কমিউনিটি হলে সরকারদলীয় ও সরকারবিরোধী নানারঙের ছাত্রনেতারা নিজেদের মধ্যে এই বখরার বিরোধ মেটাতে খানাপিনা ও বৈঠকের আনজাম করেছিল। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে দিনের বেলায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষণ অথবা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের বজ্রনির্ঘোষ আওয়াজকে কেন্দ্র করে যারা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় লিপ্ত হয়, তারাই রাতের অন্ধকারে লেনদেনের সমস্যা মেটানোর জন্য একই টেবিলে মিলিত হয়। বিচিত্র এই দেশ। রাজনীতির উঁচু মহলে এদের নাকি গডফাদারও আছে। সমাজে যারা উৎপাদনের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট নয়, যারা সম্পদ সৃষ্টি করে না, অথচ সম্পদ দখল করে বিত্তবান হতে চায়, তাদের জন্য এক ভিন্নধর্মী এন্টারপ্রাইজ বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে। এই এন্টারপ্রাইজের পার্টনারশিপে রয়েছে পলিটিক্যাল গডফাদার, পুলিশ, আমলা ও বিপথগামী যুবশক্তি। এরকম ঘোঁট পাকানো অবস্থায় কোন সুস্থ রাজনীতিচর্চা চলতে পারে না। নিজেদের মূল অপকর্মকে ঢাকা দেবার জন্য কতিপয় মুখরোচক জনতুষ্টিবাদী স্লোগানের আশ্রয় নেয়া হয়। এসব স্লোগান এমন দৃঢ়তা ও মারমুখিনতার সঙ্গে উচ্চারিত হয় যে, মনে হয় দেশে একটা যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ তো নয়, এ যেন মহাপ্রলয়। এই পরিবেশে যে রাজনীতির বিকাশ ও চর্চা হয় সেখানে পরমতসহিষ্ণুতার প্রশ্নই ওঠে না। পরমতের প্রতি কে কত অসুহিষ্ণু এবং তার চরম পরাকাষ্ঠা কে কতভাবে প্রদর্শন করতে পারে, সেটাই আজ রাজনীতিতে যোগ্যতা বলে বিবেচিত। দলীয় নেতারা সেইসব কর্মীদেরই গুরুত্ব দেন, যাদের আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, যারা যুক্তিবুদ্ধির ধার-ধারে না, যারা প্রতিপক্ষের যে কোন উক্তি বাছ-বিচার না করে রুখে দাঁড়ায়।

পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র হাত ধরাধরি করে চলে। যে পুঁজিবাদ উদ্যোগের মূল্য দেয়, ঝুঁকি গ্রহণকারীকে পুরস্কৃত করে, সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে, লেনদেনের ক্ষেত্রে নীতিবোধকে পরম মূল্য দেয়, সকল প্রকার সামাজিক আদান-প্রদানকে স্বচ্ছ করে তোলে– সেই পুঁজিবাদই গণতন্ত্রকে ধারণ করতে পারে। আমাদের দেশে পুঁজিবাদ তথা মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে বাধা-বন্ধনহীন তস্করবৃত্তি ও লুটতরাজ চলছে। পুঁজিবাদের ইতিহাস যারা জানেন, তারা সম্যক অবগত আছেন, আধুনিক পুঁজিবাদের ভিত্তি আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন এবং এর অনেকটাই নিজ দেশের উপনিবেশে এবং মহাসমুদ্রে লুণ্ঠনের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের উপনিবেশ নাই এবং আজকের যুগে মহাসমুদ্রে

www.pathagar.com

জলদস্যুতা প্রায় অসম্ভব। এরকম দেশে আদিম পুঁজি সঞ্চয়নের জন্য দস্যুতা, লুটতরাজ, পরস্ব অপহরণ, দুর্নীতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, রাহাজানি– এ সবকিছুই অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে সমাজে দস্যু কিংবা দস্যুর দোসররা শাসন করে, সেখানে পরমতসহিষ্ণুতার কথা, সুশীল আচরণের কথা, শিষ্টাচার ও সুবোধ আচরণ আশা করা বস্তুত অসম্ভব। তাই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ছায়া আছে, কায়া নেই। নেই গণতন্ত্রের হৃদয়বৃত্তি। নেই গণতন্ত্রকে ধারণ করার মত মনন ও মেধার চর্চা। এ দেশে কেউ যৌক্তিক কোন উচ্চারণ করলে তাঁর উপর হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম রাজনীতি। রাজনীতির কলকাঠি যাঁদের হাতে, তাঁরা উচিত কথনে বিরক্ত বোধ করেন। দ্বিমতপোষণকারীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা কিংবা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দিয়ে জব্দ করাটাই রাজনৈতিক শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। এ দেশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার নামে প্রায়শই যে চর্চা হয় তাতে সাংবাদিকতার নীতিমালাকে পদদলিত করা হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের পরিবর্তন হয়, এসব পরিবর্তন সময়ের দাবীতেই হয়ে থাকে। ইরাকের উপর যখন জাতিসংঘের বহুজাতিক বাহিনী আক্রমণ চালায় তখন ত্রিবর্ণরঞ্জিত ও তিন তারকাখচিত ইরাকী জাতীয় পতাকায় 'আল্লাহু আকবর' লিপি সংযোজিত হয়। কিন্তু এতে ইরাক পশ্চাৎমুখীন হয়ে গেছে এ কথা কেউ বলবেন না। ইরাকী টেলিভিশনে সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের অনুষ্ঠান যথারীতি বহাল আছে। ইরাকীরা পাশ্চাত্যের পোশাকও পরে, আবার হাতে তসবিহও বহন করে। ইরাক সযত্নে তার ১১ হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার নিদর্শনগুলো পরম যত্নে সংরক্ষণ করেছে। ইরাকের পতাকায় 'আল্লাহ আকবর' খচিত হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী তারিক আজিজের পক্ষে উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়নি। ইরাকী সমাজে খ্রিস্টান তারিক আজিজ পরম শ্রদ্ধার পাত্র। সভিয়েত উত্তর রাশিয়া সম্প্রতি তার জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন করল। বাংলাদেশ হবার পর পর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত পতাকা থেকে বাংলাদেশের মানচিত্র তুলে দেয়া হলো। উদ্দেশ্য ছিল পতাকাটি যাতে সবাই সহজসাধ্যভাবে তৈরী করতে পারে। কেউ কেউ এর সমালোচনা করেননি তা নয়, তাদের বক্তব্য ছিল, মানচিত্রে খচিত পতাকাটি সরিয়ে দেয়ার ফলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক তথা ভূখণ্ডগত পরিচয়ের প্রশ্নে আপস করা হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পতাকার যে রূপ মুক্তিযোদ্ধাদের হৃদয়কন্দরে শক্তিসাহস যোগাত পতাকার সেই রূপটি বদলিয়ে ফেলা হয়েছে। যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে দিয়ে এই পরিবর্তনটি সাধিত হয়েছে, সে কারণে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এর মধ্যে কোন বাঙালী জাতীয়তাবাদের 'বেদায়াত চর্চা' দেখতে পান না। কিন্তু তাদের দলভুক্ত নন, কিংবা তাদের রাজনীতির প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করেছেন, এমন কেউ এ রকমটি করলে তা হবে চরম অপরাধ। নাগরিকের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই, রাষ্ট্রীয় সংহতি ও অগ্রগতির স্বার্থে নতুন কিছু ভাবা যাবে না, বা প্রস্তাবও করা যাবে না; কারণ তা কলকাতাকেন্দ্রিক নতজানু বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী। এরই নাম নতজানু বাঙালীয়ানার মৌলবাদ। ধর্মীয় মৌলবাদ বিপজ্জনক হলে বাঙালীয়ানার মৌলবাদ বিপজ্জনক হবে না কেন? এই মৌলবাদও মুক্ত বুদ্ধিচর্চার পথে বাধার বিশাল বিন্ধাচল।

আফতাব আহমাদ :

আসলে গণতন্ত্র চর্চার জন্য প্রয়োজন বিশাল উদার মনের। ভিন্ন মতকে সহ্য করা কিংবা মতের পার্থক্যকে মেনে নেয়া তার পক্ষেই সহজ ও স্বাভাবিক হয়, যিনি একটি বিশাল হৃদয়ের অধিকারী। হৃদয়বৃত্তির এই ব্যাপারটি শূন্যে বিকশিত হয় না। উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, পরস্পর বিরোধী চিন্তার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কেবলমাত্র একটি গণতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব। আর গণতান্ত্রিক সমাজের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি অর্থাৎ মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং চিন্তার ক্ষেত্রে শতফুল ফুটতে দেয়ার পথকে উন্মুক্ত করে দেয়া। মানুষ তার মেধা, মনন, ধীশক্তি দিয়ে শ্রেয় এবং কাম্যকে বেছে নেয়। চিন্তা যেখানে আড়ষ্ট, ভাবনা যেখানে রুদ্ধ, অনুভূতির যেখানে রয়েছে বন্ধ্যাত্ব, সেখানে গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা এবং কুসংস্কারের জঞ্জাল বেড়ে ওঠে। আর এই জঞ্জালেই জন্ম নেয় মৌলবাদ। মৌলবাদ সাদামাটাভাবে আজকাল যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই দণ্ডে বিচার করলে চলবে না। সৃজনশীল

www.pathagar.com

বিকাশকে অস্বীকার করে, যুক্তির কষ্টিপাথরকে বিসর্জন দিয়ে যে বদ্ধমূল ধারণা পরম সত্য হিসেবে মনের সকল বাতায়ন ছেঁটে ফেলে, তা সকল মানবিকতা, উদারতা, সৃজনশীলতা এবং উৎকর্ষ সাধনের প্রণালীকে অস্বীকার করে। আমি যা বলি, তাই যদি সকলের মত হতে হয়, তাহলে সকলের মতের মূল্য আর থাকে কোথায়? সকল সমাজ দর্শন এবং সকল তত্ত্বকথা যখন এমনি একক, আরোপিত সিদ্ধান্তনির্ভর হয়ে ওঠে, তখনই আমরা পরিপ্রেক্ষিতের দাসানুদাসে পরিণত হই। আর এমনি অবস্থায় সমাজ যে রূপ পরিগ্রহ করে, তাকে এক কথায় বলা হয় ফ্যাসিস্ট বা টোটালিটেরিয়ান সমাজ। মানুষের উদ্যোগ ও সকল সৃজনীক্ষমতা তখন রহিত হয়ে পড়ে। যান্ত্রিকভাবে মানুষ রাষ্ট্র ও সমাজের দানবীয়তার যূপকাষ্ঠে তখন বলি হয়। কোনো নীতিবোধ, যুক্তি, শ্রেয় কথা কিংবা বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা গ্রহণ করার মতো মন-মানসিকতার তখন অবসান ঘটে। এক কথায় মানুষ তার স্বাভাবিক গুণাবলী হারিয়ে মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে চণ্ডরূপ ধারণ করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যুক্তি নয়, শক্তি; উদারতা নয়, সংকীর্ণতা; ঐকমত্য নয়, বাধ্যবাধকতা এবং সমষ্টির কল্যাণ নয়, মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ মানুষের সকল কর্মোদ্যোগের প্রণোদনা হয়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে যে সমাজের বিন্যাস ও বিকাশ ঘটে, মানুষ যে চরিত্রের অধিকারী হয়ে ওঠে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার চালিকাশক্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে ঔদাসীন্য ও বেপরোয়াভাব কাজ করে, তা ভারসাম্যহীনতা, অস্থিতিশীলতা এবং নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। এহেন শূন্যতার গর্ভে সমাজ ও রাষ্ট্র তার কল্যাণধর্মী চরিত্র হারিয়ে সংহারধর্মী মূর্তি ধারণ করে। পরিণতি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের রুদ্ধশ্বাস মৃত্যু এবং বন্ধ্যাত্ব।

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যে যে রাজনীতির জন্ম, লালন ও বিকাশ সেই সংস্কৃতি বৈপরিত্যের মধ্যে ঐক্যের সূত্র বের করে অগ্রগতির দিকে পা বাড়ায়। ভিন্নতা ও পার্থক্যকে স্বীকার করে যে সব বিষয়ে সহমত লক্ষ্য করা যায় বা অর্জন করা সম্ভব সেসব বিষয়েই যৌথ কর্মোদ্যোগের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। অপরদিকে, ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর মতকে সমষ্টির মত ভেবে ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার মধ্যে বলদর্পী চণ্ড স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এতে না সামাজিক শান্তি সমঝোতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন সম্ভব, না অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার উদঘাটন করা সম্ভব। ফলে নয়া ঔপনিবেশিক বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো ক্রমাগতভাবে পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

শুধু তাই নয়, এই পরনির্ভরশীলতা অভ্যন্তরীণ সামাজিক শক্তির বিকাশ ও বিন্যাসের এমন এক বিকৃতি সাধন করে, যা শেষ বিশ্লেষণে একটি উন্নয়নমুখী স্বনির্ভর সমাজ বিকাশের অন্তরায়কে দূরীভূত করার পরিবর্তে উপর্যুপরি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অধোঃপাতের দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য। এমনি পরিস্থিতিতেই আমরা পরদেশনির্ভর বহিঃহস্তক্ষেপের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে দেখি। এতে অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়ে, সৃজনশীল গণতন্ত্র নির্বাসন লাভ করে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরজীবী হয়ে ওঠে। এক ব্যক্তির খামখেয়ালী ও খেয়ালখুশি এমন একটি বিকৃত প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করে যা কোনো অবস্থাতেই সুস্থ রাজনীতি কিংবা উৎপাদনমুখী অর্থনীতির অনুকূলে কাজ করতে পারে না। এ ধরনের পশ্চাৎমুখী, অতীতাশ্রয়ী ও জনতুষ্টিবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র তো দূরের কথা, ন্যূনতম মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকার ভোগ করারও সুযোগ রহিত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণে না এসে জনগণকে শৃঙ্খলিত করে এবং সকল মেধাবী শক্তি ও প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটায়। এহেন পরিস্থিতিকে গেয়র্গ লুকাচ 'ডেস্ট্রাকশন অব রিজন' বলে অভিহিত করেছেন। শুভবুদ্ধি, যুক্তি এবং শ্রেয়নীতি এই বর্বরতার প্রধানতম শিকারে পরিণত হয়। মানুষের পশুপ্রবৃত্তি পূর্ণতা লাভ করে এমনভাবে বিকশিত হয় যে, তা সভ্যতার সকল অর্জনকে সংহার করতে উদ্যত হয়।

আমরা যখন গণতন্ত্রের কথা বলি, তখন বুঝতে হবে গণতন্ত্র শুধু একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, কিংবা শুধু একটি সরকার পদ্ধতি নয়, গণতন্ত্র একটি জীবনপদ্ধতিও বটে। মানুষের সকল সত্তা জুড়ে তার পার্থিব ও পারলৌকিক অনুভূতি ও চাহিদাকে যে ব্যবস্থা মমত্ব ও যত্নের সঙ্গে পরিচর্যা করবে, তা-ই মানুষকে মানবীয় গুণাবলীতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। ওর দ্বারাই পশুত্ব থেকে মানুষকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব– মনুষ্যত্বকে আবিষ্কার করা সম্ভব। আমাদের সকল প্রচেষ্টা সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত হতে হবে। মানুষ জীব হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এই জন্যই করে যে, সত্য ও

www.pathagar.com

ন্যায়ের পথে সে নিজের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করতে সক্ষম। সত্যিকার বিপ্লবীতো সে-ই, যে নিজের পরিপার্শ্ব পরিপ্রেক্ষিতকে অতিক্রম করে পরম সত্যের সাধনা করে। সত্য যতো তিক্তই হোক না কেন, যত কঠিনই হোক না কেন, পূর্বপুরুষের যতো ভারবাহী উত্তরাধিকারী হোক না কেন, সত্য যখন আপন মহিমায় আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়, তাকে মেনে নেয়ার বা গ্রহণ করার সাহসিকতাই একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত, শ্রেণীবিভক্ত এই সমাজে মানুষে মানুষে যে সহজাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা তা একটি সুস্থ গঠনমুখী চরিত্র তখনই লাভ করতে পারে, যখন মানুষ ঐ সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়, যে সংস্কৃতি মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, অন্যের ভিন্নমত প্রকাশের জন্য আমি আমার শ্রেষ্ঠতম সুযোগকেও বিসর্জন দিতে রাজি আছি– এ ধরনের সংস্কৃতি প্রাক ধনতান্ত্রিক কিংবা নিম্ন ধনতান্ত্রিক সমাজে আশা করা যায় না। আমাদের সমাজ শুধু যে কৃষি নির্ভর সমাজ, তাই নয়; বস্তুত এটি একটি পশ্চাৎপদ মন্থর কৃষক সমাজ, যে সমাজে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র স্বার্থের দাপট এতো তীব্র যে, সেখানে উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক সহনশীলতার পরিবর্তে প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ ও পেজেন্ট ভেনজেন্স তীব্রভাবে আমাদের প্রবৃত্তিগুলোকে প্ররোচিত করে। পেজেন্ট সোসাইটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ক্রোধ এবং শক্তিমত্ততায় বলীয়ান হয়ে সমস্যার নিষ্পত্তি করা। সামাজিক শক্তিসমূহের মধ্যে সমঝোতা বা আপস-ভীরুতা ও কাপুরুষতার পরিচায়ক বলে বিবেচিত হয়। যার ফলে অহংবোধের গর্ভে যে গোঁড়ামির জন্ম, তা ডালপালা মেলে পেজেন্ট ফ্যাসিজমের মৌলবাদী চরিত্র অর্জন করে। আমাদের মত দেশে যেখানে রাষ্ট্র একটি স্থিতিশীল শ্রেণীনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠেনি বরং স্ববশ্যতা ও পরজীবীর দ্বৈত চরিত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এমন এক কিম্ভূতকিমাকার অবয়ব ধারণ করে আছে, যার দ্বারা রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয় দুঃসাধ্য। এখানে কোন গভর্নিং ক্লাস নেই, এখানে কোন হেজিমনিক ক্লাস নেই; এখানে শ্রেণীগুলো পাশাপাশি দুর্বল ও ভঙ্গুর অবস্থায় সমান্তরালভাবে অবস্থান করে কিংবা বস্তাবন্দী আলুর মত পাশাপাশি অবস্থান করে, কিন্তু কোহিসিভনেস গড়ে ওঠে না। এমনি সমাজ খুব সহজেই যেমন নৈরাজ্যের শিকার হতে পারে তেমনি ফ্যাসিস্ট চরিত্রের অধিকারী হয়ে সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারে। উভয়ক্ষেত্রে আর যাই হোক, গণতন্ত্রের বিকাশতো দূরের কথা, জন্মই হতে পারে না। গণতন্ত্রের বহিরাবরণকে আত্মস্থ করে নির্বাচন, রাষ্ট্রের সাজানো তিনটি অঙ্গ ইত্যাদি যে প্রসাধনী প্রদর্শনীর আয়োজন করে তা এমন এক প্রহসন, যাকে সরল ভাষায় বলা যায় মেকী গণতন্ত্র। বাংলাদেশ আজ ঠিক এই চরিত্রটিরই অধিকারী। এদেশ থেকে Reason has been banished, rationality has heen exiled and intolerance and reprisal have become the order of the day. এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের বিকাশ যদি আমরা চাই তাহলে সামাজিক শক্তিসমূহের মধ্যে একটি নতুন কোভনেন্ট রচিত হতে হবে। যার ফলে এমন একটি ভারসাম্যের জন্ম হবে যা সামাজিক শক্তিসমূহের এনাইহিলেশনকে অনিবার্য করে না তুলে হেলদি কমপিটিশনের মাধ্যমে স্যোশ্যাল কনকর্ডকে উৎসাহিত করবে। এর জন্য ধৈর্য, প্রচণ্ড ধৈর্যের প্রয়োজন। এর জন্য সহিষ্ণুতা, প্রচণ্ড সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। এর জন্য উদারতা, প্রচণ্ড উদারতার প্রয়োজন। এর জন্য বিশালতা, প্রচণ্ড বিশালতার প্রয়োজন। প্রতিপক্ষের প্রতি শুধু ঘৃণা নয়, প্রতিপক্ষের মত ও যুক্তিকে বিবেচনায় এনে মত ও যুক্তির ভিত্তিতে বিরোধ বা বৈপরিত্যের নিষ্পত্তি করার মনমানসিকতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সুস্থতা ও সুরুচির পরিচয় যে সমাজ ও সামাজিক মানুষ দিতে পারবে সেই সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সৃজন সম্ভব হবে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে পরিপুষ্ট একটি সমাজই একটি গণতান্ত্রিক সমাজ উপহার দিতে সক্ষম।

www.pathagar.com

২১ ডিসেম্বর ২০০০

বাজপেয়ির মুখোশ উন্মোচন

মাহবুব উল্লাহ :

গত ৬ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির একটি মন্তব্য উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে নতুন করে নাজুক অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে। বাজপেয়ি বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে জাতীয় ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন হল, এই জাতীয় ভাবাবেগ কোন জাতির ভাবাবেগ? মুসলমানের মসজিদ ধ্বংসের মধ্যে কাদের ভাবাবেগ জড়িত থাকতে পারে? ভারত যদি ধর্ম নির্বিশেষে একটি অখণ্ড জাতিসত্তা হয়ে থাকে, তাহলে সেই অখণ্ড জাতির অন্তর্ভূক্ত একটি সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয় দিক থেকে অতি পবিত্র বলে গণ্য প্রার্থনা স্থল ধ্বংস করা কী করে 'জাতীয় ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ' হতে পারে? প্রশ্নটি অত্যন্ত মৌলিক।

ভারত একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশে। কালের প্রবাহে ভারতবর্ষে নানা জাতি ও ধর্মের মানুষ নিজস্ব ঠাঁই খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতীয় জনগোষ্ঠীর প্রধান অংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই নিজেদের ভারতের আসল সন্তান হিসেবে গণ্য করে। অপরদিকে তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা হল বিদেশ থেকে আগত পররাজ্য দখলকারী। হিন্দুরা যদি ভারতমাতার আসল সন্তান হয়, তাহলে মুসলমানরা সেই একই মায়ের পালিত সন্তান। কাজেই পালিত সন্তানেরা জঠর থেকে প্রসবিত সন্তানের স্থান দাবী করতে পারে না। একইভাবে তাদের উপাসনাস্থলও অলঙ্ঘনীয় হতে পারে না। কেউ কেউ বলবেন, রাজনীতির প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়। বাবরী মসজিদের প্রশ্নটি সেরকমই একটি প্রশ্ন। এক অর্থে কথাটি অযৌক্তিক নয়। ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার। ভারতের রাজনৈতিক পণ্ডিতরা বলে থাকেন, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে বিসর্জন দিয়ে ভারতের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সংহতি বজায় রাখা সম্ভব নয়। ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে কংগ্রেসের আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করা হয়। কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারী। মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী যেমন কংগ্রেস দলের প্রাণপুরুষ, ঠিক তেমনি জওহরলাল নেহরুও। গান্ধী ভারতীয় ঐতিহ্যের পতাকাবাহী, জওহরলাল নেহরু আধুনিক ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা। এ দু'জনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত অমিল থাকলেও এরা ছিলেন একে অপরের সম্পূরক। গান্ধী মনে-প্রাণে হিন্দু। জওহরলাল নেহরু আধুনিকমনা। এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। কিন্তু তারপরেও এ দুজন ছিলেন অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপটি কী? বাহ্যিকভাবে এই স্বরূপটি হল হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীস্টান, পারসী-জৈন ও শিখদের সহাবস্থান। রাষ্ট্রের বিঘোষিত নীতি হল ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কারুর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হবে না।

ভারতের কোন বড়মাপের নেতার মৃত্যু হলে, তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তার মরদেহকে ঘিরে একজন ব্রাহ্মণ ভগবত গীতা পাঠ করেন, একজন মওলানা কোরআন তেলাওয়াত করেন, একজন শিখ গ্রন্থ সাহেব পাঠ করেন। এভাবে প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মাধ্যমে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি রাষ্ট্রীয় রেওয়াজ ভারতে চালু আছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে প্রতীকী রূপদানের উদ্দেশ্যে এই রেওয়াজ চালু হয়েছে। কিন্তু এই সহাবস্থান কতটুকু বাস্তব ও নির্ভেজাল?

রাজীব গান্ধী তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন বাবরী মসজিদ খ্যাত অযোধ্যা থেকেই। তিনি তার প্রথম নির্বাচনী সভায় ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি ভারতে রামরাজ্য

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করবেন। একজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ব্যক্তি কিভাবে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার করতে পারেন? গান্ধীও রামরাজ্য দর্শনে বিশ্বাস করতেন। ভারতের আরেক কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের আমলে (১৯৯২-এর-৬ ডিসেম্বর) করসেবক নামক উগ্র হিন্দুরা বাবরী মসজিদটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। বাবরী মসজিদের স্থলে রামমন্দির নির্মাণের জন্য শ্রী রামের নামাঙ্কিত ইস্টকও তারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহন করে এনেছিল। নরসীমা রাওয়ের কংগ্রেস সরকার মসজিদটি রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ি বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে সে সময়ে 'দুঃখজনক' বলে অভিহিত করেছিলেন। বাজপেয়ি তার নিজের জন্য এমন একটি ভাবমূর্তি তৈরী করতে চেয়েছিলেন, যা থেকে প্রতিভাত হয়, বিজেপি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী দল হলেও তিনি নিজে উদারমনা ব্যক্তি। এই ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে সফল হওয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছেও বাজপেয়ির রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা ছিল। ক্ষমতায় আসার পর বাজপেয়ির দল বলতে শুরু করল, তারা সক্রিয় ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। সক্রিয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অর্থ হল, হিন্দু তার হিন্দুত্ব, মুসলমান তার মুসলমানিত্ব, খ্রীস্টান তার খ্রীস্ট মতবাদ সক্রিয়ভাবে ধারণ করবেন এবং বিষয়টি সকল ধর্মাবলম্বীর জন্যই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ব্যাপারটি তা রইল না। সবকিছুই হয়ে গেল হিন্দুত্ববাদের অধীন। হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতের ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রয়াস গ্রহণ করা হল। আর এ কারণেই বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ৮ বছর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ির এ সংক্রান্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। প্রকাশ্যভাবে যেসব মতবাদ ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রচার করুক না কেন, মূলত তারা ভারতের হিন্দুত্ববাদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার সাথে বিশ্বাসী। বিষয়টি নিছক রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য নয়। এটি একটি দৃঢ়মূল বিশ্বাসের ব্যাপার। আমাদের দেশের অনেকেই এই বিষয়টি বুঝতে চান না। দেশের কতিপয় স্বনামখ্যাত রাজনৈতিক পণ্ডিতও বিশ্বাস করেন ভারত মূলত অসাম্প্রদায়িক উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দেশ। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কখনোই সামরিক শাসন জারি হয়নি বলে ভারত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দেশ হয়ে যায় নি। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলে জরুরী অবস্থাকালীন ভারতে যেভাবে মানবাধিকার পর্যুদস্ত হয়েছিল, তা কেবলমাত্র একটি ফ্যাসিস্ট দেশেই সম্ভব। ভারতে শত সহস্রবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। এই কিছুদিন আগেও উড়িষ্যায় খ্রীস্টান পাদ্রীদের হত্যা করা হয়েছে। অপারেশন ব্লুস্টার করে শিখদের স্বর্ণমন্দির অপবিত্র করা হয়েছে। ভারতে হরিজন সম্প্রদায় চরম নিগ্রহ-নিপীড়নের শিকার। অস্পৃশ্যতার মত চরম মানবতাবিরোধী প্রথা ভারতে বিদ্যমান। এতকিছুর পরও আমাদের দেশের পণ্ডিতরা কোথায় ভারতীয় সমাজের উদারতা দেখতে পান, তা বোঝা সত্যিই কঠিন। ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীলতার মূলে অনেক কারণ রয়েছে। এসব কারণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র ভারতে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠতার মানসিকতায় আক্রান্ত। একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই, ভারতের বাইরে নেপাল ছাড়া আর কোন হিন্দুপ্রধান দেশ পৃথিবীতে নেই। অভিবাসনের মাধ্যমে ভারতীয় হিন্দুরা সুদূর ফিজি ও গায়ানা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু ভারত ছাড়া তাদের আর অন্য কোন আবাসস্থল আছে বলে তারা মনে করে না। সুদূর ফিজি ও গায়ানার হিন্দুরা দিল্লীর দিকেই তাকিয়ে থাকে। ফিজিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহেন্দ্র চৌধুরী সরকারের পতনের পর সবচাইতে উদ্বিগ্ন বোধ করেছে দিল্লী। বিজেপির লোকেরা বিশেষ করে RSS-এর সমর্থকরা দাবী করে, ভারতীয় মুসলমানদের ভারত ত্যাগ করে অন্য মুসলিম রাষ্ট্রে চলে যাওয়া উচিত। সাম্প্রদায়িক উগ্রতার এর চাইতে চরম অভিব্যক্তি আর কী হতে পারে?

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে ইউরোপীয় সমাজের ধর্মনিরপেক্ষতার একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। ইউরোপে চার্চকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়েছিল। এক সময় ইউরোপে চার্চের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। চার্চ শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই মাথা ঘামাত না, চার্চের ছিল ইহজাগতিক স্বার্থ।

www.pathagar.com

ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ চাষযোগ্য জমির মালিক ছিল চার্চ। ফলে চার্চ ভূমিদাসদের ওপর প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারি করত। চার্চ তাই হয়ে পড়ে শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিভূ। চার্চের এই শোষণমূলক ভূমিকার বিরুদ্ধে ইউরোপে ধর্মসংস্কারের আন্দোলন হয়। ফলে চার্চ থেকে রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপে রাষ্ট্র ও চার্চের এই পৃথকীকরণই হল ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ। অপরদিকে দক্ষিণ এশিয়া উপ-মহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের যৌক্তিকতার মূলে দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের প্রশ্নটি নিহিত। কাজেই, ইউরোপীয় বাস্তবতার আলোকে এই উপমহাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ প্রাসঙ্গিক হয়নি।

প্রফেসর আকিল বিলগ্রামি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করেন। বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি ইসলামী সত্তা নিয়ে গবেষণা করে আসছেন। তিনি তার এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, আশ্চর্যজনকভাবে তিনি যে একজন মুসলমান, এ কথাটি তার ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হতে শুনেছিলেন। কী প্রসঙ্গে কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করা দরকার। তিনি ভারতের একটি হিন্দু-মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত এলাকায় পেয়িংগেস্ট হিসেবে আবাসনের সুবিধা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এখানকার হিন্দু জনগোষ্ঠী মুসলিমবিদ্বেষী ছিল। একজন বাড়ীর মালিক তার পরিচয় জানতে চেয়ে তার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চাইল। উল্লেখ্য যে, বিলগ্রামি ইসলামী ধর্মীয় মতাদর্শের ওপর আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি এমন একটি পরিবার লালিত-পালিত হয়েছেন, যে পরিবারে ধর্মানুভূতির কোন স্থান ছিল না। তার পিতা ছিলেন কমিউনিস্টভাবাপন্ন নিরেট ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। তৎসত্ত্বেও তার কাছে মনে হয়েছিল সেই বিশেষ প্রেক্ষাপটে তার জন্য সম্মানজনক ছিল নিজেকে একজন মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়া। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে, কোন রকম কৃত্রিমতা বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য নিজেকে মুসলমান বলে ভেবেছিলেন। মানুষ বিশেষ প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয়ের কথা ভাবে। একজন আধুনিক মনস্ক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক যিনি কখনও নিজের মুসলিম পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেননি, তিনি পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও নিজেকে মুসলিম হিসেবে আবিষ্কার করেছিলেন।

ভারতের এক সময়কার দার্শনিক রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপলি রাধাকৃষ্ণান-এর পুত্র অধ্যাপক সর্বপলি গোপাল লিখেছেন ঃ "The demand by a militant section of Hindu opinion for the demolishing of a mosque in Ayodhya and the building of temple to Rama on that site, brings into sharper focus a sickness that independent India has not been able to shake off." স্পষ্টতই ড. গোপালের মতে ভারতীয় সমাজ একটি অসুস্থ সমাজ। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরেও ভারত এই অসুস্থতাকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। সম্প্রতি বাবরী মসজিদ প্রসঙ্গে অটলবিহারী বাজপেয়ির মন্তব্য আমাদের জানান দিচ্ছে, অসুস্থতা আজ ক্রমাবনতির কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে।

আফতাব আহমাদ :

মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত একটি সুনির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে আমরা কীভাবে পৃথম সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনা করতে পারি? সম্প্রদায়গত পার্থক্য বিবেচনার জন্য আমাদের দেখতে হবে, অন্য সম্প্রদায় থেকে বিবেচনাধীন সম্প্রদায়টির স্বাভাবিক সীমারেখা বিদ্যমান কিনা। এই স্বাভাবিক সীমারেখা ভাষাগত, ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার সংক্রান্ত হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর ভিত্তি করেই একটি সুনির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐক্যচেতনা

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়। ভারতীয় রাজনীতিতে কখনো প্রচ্ছন্নভাবে– আবার কখনো অত্যন্ত উগ্রমেজাজে যে সাম্প্রদায়িকতার অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই তা বুঝতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই হিন্দুদের স্বাভাবিক ঐক্য-হিন্দু সম্প্রদায় (জাতি/জনগোষ্ঠী/ রেস্) এবং হিন্দু ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রবক্তাগণ বিভিন্ন সময়ে এ সম্পর্কে নানা কথা বলার চেষ্টা করেছেন। আমরা যাকে ভারত বলি– তা কখনো হিন্দুস্থান, ভারতবর্ষ, আর্যাবর্ত ও জম্মুদ্বীপ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র মিয়ানমার ছাড়া আর কোনো ভূখণ্ড ভারতের মতো প্রাকৃতিক দিক থেকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। তদুপরি আরো বলা হয়, হিন্দুরাই হচ্ছে এই ভূখণ্ডের আদি ও স্বাভাবিক বাসিন্দা। হিন্দুস্থান নামেই এর সাক্ষ্য মেলে।

এমএস গোলওয়াকার লিখেছেন, "স্মরণাতীতকাল থেকে এদেশে যে হিন্দুসমাজ বাস করে আসছে তাই হলো এখানকার জাতীয় ও স্বাভাবিক সমাজ। এই একই হিন্দু জনগোষ্ঠী এই দেশের জীবনবোধ এবং সংস্কৃতি বিনির্মাণ করেছে। সুতরাং তাদের জাতীয়তা স্বপরিজ্ঞাত"। তিনি আরো লিখেছেন, "আমরা হিন্দুরা বিরোধহীন ও উপদ্রবহীনভাবে আট থেকে দশ হাজার বছর পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের মালিক ছিলাম, যারপর এই ভূখণ্ডে বৈদেশিক জাতি-গোষ্ঠীর আক্রমণ ঘটেছে"। এইভাবে আরও বলা হয়, "পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে স্বাভাবিক জাতি হিসেবে ভারতের সৃষ্টি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অভিন্ন ঐতিহ্য, অভিন্ন গৌরব ও বিপর্যয়ের স্মৃতি একই ধরনের ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা হিন্দু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। ঐতিহাসিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, নৃতাত্ত্বিকভাবে এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে হিন্দুস্থান এক, সমগ্র ও অবিভাজ্য এবং ভবিষ্যতেও তা-ই থাকবে। হিন্দুদের যদি অভিন্ন ইতিহাস না থাকে, তাহলে পৃথিবার আর কোনো জনগোষ্ঠীর তা নেই। হিন্দুরাই হলো একমাত্র জনগোষ্ঠী– যারা ঐশী আশীর্বাদ হিসেবে এইসব আদর্শ স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যার ফলে জাতি হিসেবে তারা অকৃত্রিম সংহতি ও সুসংবদ্ধতা অর্জনে সক্ষম"। হিন্দু জাতির ঐক্যচেতনা সম্পর্কে এরকম আরো অনেক উক্তি আছে। যেমন– "হিন্দুরা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও সভ্য জাতি। দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাদের অর্জন অতুলনীয়। তারা সহাবস্থানে বিশ্বাসী, সহিষ্ণু, ঐক্যবদ্ধ, ঐশ্বর্যমণ্ডিত এমনকি সবদিকে থেকে অজেয়"।

ঐতিহাসিক কাল থেকে হিন্দুদের ইতিহাস জাতীয়তাবাদী ঐক্যের ইতিহাস। ভারতের প্রাচীন রাজারা কখনো চক্রবর্তী, আবার কখনো বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করতেন। 'চক্রবর্তী' কথাটির অর্থ সকল হিন্দুর ঐক্য অর্জনকারী আর 'বিক্রমাদিত্য' শব্দটির অর্থ হলো– সকল বিদেশী শক্তির ধ্বংস সাধনকারী। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়, ১৯৪৭ এরও হাজার বছর পূর্ব থেকে হিন্দুরা বিরামহীন মুক্তিসংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। অর্থাৎ ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই মুক্তি সংগ্রামের সূচনা। মহারানা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিং ও অন্যান্যের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে এই আধিপত্য গাঁথা রচনা করা হয়েছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলেও এই সংগ্রাম অব্যাহত থেকেছে। হিন্দু সমাজের মুখপাত্ররা দাবী করেন, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ, রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ড, দয়ানন্দ সরস্বতী, লোকমান্যতিলক, স্বামী বিবেকানন্দ এবং আরো অনেক মহাপুরুষ এই সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন। আরএসএস-এর অন্যতম প্রধান এমএস গোলওয়াকার ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের মধ্যে হিন্দুরাষ্ট্রের সজীব স্বপ্ন আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁর মতে এই স্বপ্নই অতীত ও বর্তমানে ভারতের মুক্তি সংগ্রামীদের প্রেরণা যুগিয়েছে। গোলওয়াকার ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, প্রথম আঘাতেই বিপ্লবের মহান নেতারা দিল্লী অধিকার করে

www.pathagar.com

শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাহাদুর শাহ জাফর ছিলেন নামমাত্র সম্রাট। ১৮৫৮ সালে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন এবং নির্বাসনে প্রেরিত হন। বাহাদুর শাহ জাফরকে স্বাধীন ভারতের সম্রাট এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই পদক্ষেপ হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক ঘটায় যে, অত্যাচারী মোগল শাসনের পুনরার্বিভাব ঘটাচ্ছে। অথচ এই মোগল শাসনের উচ্ছেদের জন্যই গুরু গোবিন্দ সিং, ছত্রশাল ও শিবাজীসহ অন্যরা বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও আত্মত্যাগ করেছেন। গোলওয়াকারের নির্দেশিত ঐতিহাসিকদের মতে, ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের পরাজয়ের মূল কারণ হচ্ছে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান এই সন্দেহ ও আশঙ্কা।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে হিন্দুরা যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে তার লক্ষ্যবস্তু ছিলো হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এসব কর্মকাণ্ড নিরীক্ষা করলে এরকম একটি সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব হবে না। গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুসহ এই সময়কার যে সমস্ত হিন্দুনেতা ও সংস্কারক ছিলেন, তাদেরকে অনায়াসে হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব। বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন হয়েছে, তা হিন্দুদের মাতা ও হিন্দুজাতির জন্যই হয়েছে। লোকমান্য তিলক, লালা লাজপৎ রায়, বিপিন চন্দ্র পাল, মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীসহ সকল হিন্দু কর্মবীরেরা, তারা জাতির ভবিষ্যৎ বুঝেই থাকুন আর না বুঝেই থাকুন, অবশ্যই আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, যাতে হিন্দুদেরকে আর কখনো কেউ পরাজিত করতে না পারে। ১৯২০-এর দশকে হিন্দুরাষ্ট্র, হিন্দুজাতি হিসেবে ভারত এবং হিন্দুদের আবাসস্থল হিসেবে ভারত– এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই লক্ষ্যে সেই সময় থেকে অনেক পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ Hindu Sangathan : Saviovr of the Dying Race শিরোনামে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন আর্যসমাজ নেতা, সমাজ সংস্কারক ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদী। তিনি হিন্দুদের সংগঠন কেন প্রয়োজন, সে সম্পর্কে যুক্তি প্রদান করেছেন। শ্রদ্ধানন্দ প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সকল শহরে হিন্দু রাষ্ট্রমন্দির নির্মাণের প্রস্তাব করেন। এরকম একটি মন্দিরে ২৫ হাজার দর্শক-শ্রোতার বসার ব্যবস্থা থাকবে এবং একটি বিশাল হলরুম থেকে পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠের ব্যবস্থা থাকবে। ভারতের অন্য যেসব সাধারণ হিন্দুমন্দির রয়েছে, সেসব মন্দির থেকে এই রাষ্ট্রমন্দিরের বৈশিষ্ট্য হবে আলাদা। এই ক্যাথলিক হিন্দু মন্দিরের উদ্দেশ্য হবে ত্রিমাতৃচেতনার আরাধনা করা। এই চেতনাত্রয়ী হচ্ছে– গোমাতা, সরস্বতীমাতা ও ভূমিমাতা। এভাবেই ভারতে ধর্মচেতনা ও জাতিচেতনা একাকার হয়ে গেছে। এমএস গোলওয়াকারের বক্তৃতা ও লেখার সংকলন ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'Bunch of Thoughts' নামে প্রকাশিত হয়েছে। গোলওয়াকারের দৃষ্টিতে ভারতের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে পারে একমাত্র হিন্দুরাই। হিন্দুরা কখনোই জাতিদ্রোহী হতে পারে না। কিন্তু তার মতে এই ভারতেই জাতিদ্রোহী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা রয়েছে। গোলওয়াকার তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিপদের উৎস দেখতে পেয়েছেন। এরা হলো– মুসলমান, খ্রীস্টান ও কমিউনিস্ট। মুসলমান ও খ্রীস্টানরা কেন বিপজ্জনক, তা বোঝা কঠিন নয়। কারণ, চিরকালই এদেরকে বিদেশী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু কমিউনিস্টদের কেন জাতি দ্রোহীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো, সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতের বিপর্যয় ঘটে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন ভারতের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী বলে বিবেচিত হয়েছেন। চীনের প্রতি আপসমুখী নীতি

www.pathagar.com

অনুসরণ এবং সামরিক ক্ষেত্রে প্রস্তুতির অভাবের জন্য তিনি সমালোচিত হয়েছেন। '৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধে ভারত তুলনামূলকভাবে সামরিক ক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়। চীন-ভারত যুদ্ধ ও পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করলে আমরা বুঝি, কী কারণে গোলওয়াকার কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সামরিক সক্ষমতা সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি পোষণ করতেন। '৬২-এর অক্টোবরে চৈনিক আক্রমণের সময়ে গোলওয়াকার লিখছেন, চীন চিরকালই সম্প্রসারণবাদী। এটা তার রক্তে মিশে আছে। একশ' পঞ্চাশ বছরেরও আগে নেপোলিয়ন সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন ঃ ঐ পীত দানবকে জাগিয়োনা; যদি জাগাও তাহলে মানবজাতির সমূহ সর্বনাশ ঘটবে। ৭০ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ সুনির্দিষ্টভাবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন যে, ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পরপরই চীন ভারত আক্রমণ করলে। আর এখন চীনের সম্প্রসারণবাদী রক্তে কমিউনিজমের নেশা প্রযুক্ত হয়েছে। কমিউনিজম সুতীব্রভাবে আক্রমণাত্মক, সম্প্রসারণবাদী ও একটি সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শ। সুতরাং কমিউনিস্ট চীনের মধ্যে দুটি আগ্রাসী প্রণোদনার বিস্ফোরণোন্মুখ সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এ যেন একদিকে বানর আর অন্যদিকে মদের নেশায় চুর। লক্ষণীয় চীনকে নেশাখোর বানরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গোলওয়াকার আরো মনে করেন যে, ইংরেজরা ভারত শাসন করতো, তারা আইনের শাসন অনুসরণ করতো এবং তারা ছিলো সভ্য। কিন্তু চীনারা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি জাতি অর্থাৎ ইংরেজদের চাইতে চীনারা অনেক বেশী খারাপ।

ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণ ঘটেছে এক নতুন মাত্রায়। ১৯৯০-এর অক্টোবরে বিজেপির তৎকালীন সভাপতি এল কে আদভানী এক রথযাত্রার নেতৃত্ব দেন। এই রথযাত্রার উদ্দেশ্য ছিলো অযোধ্যার বাবরী মসজিদের স্থলে রামমন্দির নির্মাণ করা। তখন বলা হয়েছিলো, এই রথযাত্রার রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য নেই এবং এটা সম্পূর্ণভাবে একটি ধর্মীয় উদ্যোগ। পরবর্তীকালে আদভানীকে গ্রেফতার করে যখন রথযাত্রা থামিয়ে দেয়া হলো তখন বলা হলো– এটা ছিলো একটি রাজনৈতিক কার্যক্রম। আদভানী বললেন, তিনি নিজে একজন মামুলী রাজনৈতিক কর্মী এবং ধর্মীয় বিষয়গুলো তিনি সাধু-মহান্তদের কাছে ছেড়ে দিতে চান। রামমন্দির নির্মাণের বিষয়টি ধর্মীয় আন্দোলনের চেয়েও অনেক ব্যাপক। এটি একটি জাতীয় আন্দোলন। আদভানীরা তা-ই দাবী করেন। রাম তাদের দৃষ্টিতে কেবল একজন হিন্দু দেবতাই নন, তিনি একজন জাতীয় বীরও বটে। সুতরাং তাদের মতে সকল ভারতীয় হিন্দু কিংবা অহিন্দু সকলেরই উচিত হবে রামের উপাসনা করা। রামের স্মৃতিকে ভারতের মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে পারলেই ভারতীয় নাগরিকত্বের যোগ্য হওয়া সম্ভব। এটা নিছক ধর্মীয় যুক্তি নয়, সংস্কৃতিরও যুক্তি। এবার নতুন করে অটল বিহারী বাজপেয়ি যখন সকল মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে বলে উঠলেন, “বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাটি জাতীয় ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ”– তখন এই বক্তব্যকে এদেশের কতিপয় সংবাদপত্রে যেভাবে সাময়িক রাজনৈতিক ফায়দা লোটার মওকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা অতো ঠুনকো বিষয় নয়। বিষয়টি অনেক গভীর এবং তা ভারতীয় সত্তাকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত।

www.pathagar.com

৪ জানুয়ারি ২০০১

জ্ঞানভিত্তিক নয়া অর্থনীতি ও রাজনীতি

মাহবুব উল্লাহ :

দেখতে দেখতে ২০০১ সাল এসে গেল। ২০০১ সাল নতুন সহস্রাব্দ এবং নতুন শতাব্দীর সূচনা কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ২০০০ সালের প্রথম প্রত্যুষে দুনিয়াজোড়া বিভিন্ন জাতির মানুষ নতুন শতাব্দী ও নতুন সহস্রাব্দের সূচনালগ্ন উৎসবে মুখরিত হয়ে পালন করেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ কিরিবাতিতে নতুন শতাব্দীর সূর্যালোকের প্রথম স্পর্শ অনুভব করার জন্য নানা দেশের মানুষ জড়ো হয়েছিল। দ্বীপটির স্থানীয় অধিবাসীরাও মুহূর্তটি আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনীর ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ তথা স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সুবাদে ঘরে বসে টেলিভিশনের পর্দায় নতুন সহস্রাব্দের মুহূর্ত পালনের দৃশ্য আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। বাস্তবিকই কৃত্রিম উপগ্রহ প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক মহাবিপ্লব নিয়ে এসেছে। কবির ভাষায় যে কথা বলা হত– "দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই" তা নিছক মহৎ প্রাণের আকুতিমাত্র নয়, এটা এক বাস্তব সত্য। তথ্যপ্রবাহ মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি ও লেনদেন বিস্তারে কত যে সহায়ক হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করা কঠিন।

অর্থনীতিবিদরা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কথা বলেন। স্ট্যাটিক অর্থে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যেমনি থাকে অগণিত ক্রেতা, তেমনি থাকে অগণিত বিক্রেতা। এরকম বাজারে একটিমাত্র পণ্যের জন্য একটিমাত্র দাম পরিলক্ষিত হয়। ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট দামে উপনীত হয়। কোন বিক্রেতা বেশী দাম হাঁকলে ক্রেতারা তার কাছ থেকে সটকে পড়ে অন্য বিক্রেতার কাছে চলে যায়। অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা সময় ও স্থান নির্বিশেষে জানে, কোথায়– কেমন দান বিরাজ করছে। ফলে frictionless (সংঘর্ষমুক্ত) ভাবে সুনির্দিষ্ট দামে উপনীত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি নির্ভর করে অবাধ তথ্যপ্রবাহের ওপর এবং তথ্য হতে হবে ব্যয়শূন্য। অবাধ তথ্যপ্রবাহ না থাকলে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ধারণাটি ভেঙে পড়ে। বস্তুত যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ধারণা অর্থনীতিবিদদের তাত্ত্বিক কচকচানিমাত্র ছিল, আজ পৃথিবীব্যাপী তথ্য-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে পণ্যের দামের ক্ষেত্রে বিভিন্নতার সম্ভাবনা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। আজ মুদ্রা বাজার, শেয়ার বাজার, পণ্যের বাজারসহ সকল প্রকার বাজারের পরিস্থিতি ইন্টারনেট ও ই-মেইলের কল্যাণে তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব। ফলে উৎপাদনকারী ও ভোক্তা অর্থাৎ কনজিউমার উভয়পক্ষই লেনদেনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কালক্ষেপণ করেন না। যখন এসব সুবিধা ছিল না, তখন বিভিন্ন বাজারের মধ্যে তথ্যপ্রবাহের ফারাক সপ্তাহ, পক্ষ, কিংবা মাসের চাইতেও দীর্ঘ ছিল। আজ আর সেই দূরত্ব নেই। তার যোগাযোগ আবিষ্কার হওয়ার পর দূরত্বের এই সমস্যা কিছুটা কেটে গেলেও টেলিগ্রাফ যোগাযোগের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মধ্যে যোগাযোগ তত সহজসাধ্য ছিল না। টেলিগ্রাফের তার যেসব স্থানে পৌঁছেনি সেসব স্থান ছিল বস্তুত সভ্যতার বহির্দেশে। আজ কৃত্রিম উপগ্রহ, টেলিফোন ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সমন্বয়ে এই দূরত্ব দ্রুত অপসারিত হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যয় দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করেছে। উত্তরোত্তর অধিকতর শক্তিশালী ও বহনযোগ্য কম্পিউটারের আবিষ্কার ও তার উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পৃথিবীবাসীর জন্য অমিত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এখন

www.pathagar.com

সেলুলার ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট যোগাযোগের সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। যে কোন সময়ে এবং যে কোন স্থানে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী স্থানের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আজ আর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। শুনেছি সেলুলার ফোনের সুবিধা ব্যবহার করে বাংলাদেশের হাঁস-মুরগী, দুগ্ধ খামার ও মৎস্য খামার মালিকরা রাজধানীসহ বড় বড় শহর-বন্দরের বাজার পরিস্থিতি ও চাহিদার অবস্থা যাচাই করে নিতে পারেন। ফলে তাদের যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে এবং মধ্যস্বত্ব ভোগীর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হচ্ছে। এতে প্রকৃত উৎপাদনকারী উপকৃত হচ্ছেন এবং পচন ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রক্রিয়া থেকে এ ধরনের কাঁচামালকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। রাজধানী ঢাকায় কোথায় কেমন যানজট রয়েছে, সেলুলার ফোনের মাধ্যমে তা জানতে পারলে জানজট এড়িয়ে চলাও সম্ভব হচ্ছে। এক কথায়, নতুন সহস্রাব্দ ও নতুন শতাব্দী তথ্য-প্রযুক্তির শতাব্দী। তথ্য-প্রযুক্তির এই শতাব্দীতে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, সন্দেহ নেই। কম্পিউটার মূলত ইংরেজী ভাষায় অভ্যস্ত। তাছাড়া পৃথিবীব্যাপী ভাবের লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী বিশাল গুরুত্ব অর্জন করেছে। এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হত না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই পৃথিবীব্যাপী আধিপত্যের কারণে ইংরেজী বিশাল গুরুত্ব অর্জন করেছে। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের ভাষা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা মোটেও ম্লান হয়নি। এর একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপর উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইংরেজীকে প্রায় নির্বাসিত করা হল। যুক্তি ছিল- মাতৃভাষার মাধ্যমে সার্থক শিক্ষা অর্জন সম্ভব। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধারণাটি প্রযোজ্য হলেও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজীর ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর বেশিরভাগ উচ্চতর জ্ঞানের গ্রন্থসমূহ ইংরেজী ভাষায় রচিত। তাছাড়া ফরাসী, জার্মান, জাপানী, রুশ, স্প্যানিশ ও চীনা ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু নিদেনপক্ষে ইংরেজী না জানলে উচ্চশিক্ষা প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য। কেউ কেউ বলেন, আমরা তো ইচ্ছে করলে এসব গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে নিতে পারি। অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। কিন্তু যিনি অনুবাদ করবেন, যে ভাষা থেকে অনুবাদ করবেন, তাকে তো সেই ভাষাটিতে গভীর উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে। তদুপরি সকল প্রয়োজনীয় গ্রন্থ অনুবাদের জন্য অর্থ-সম্পদ ও যোগ্য অনুবাদক পাওয়া সম্ভব কি?

আজ পৃথিবীব্যাপী প্রকাশনার ক্ষেত্রে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে। এ বিস্ফোরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কতটা অনুবাদ করা সম্ভব? সুতরাং জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বায়নের এই নতুন শতাব্দীতে ইংরেজী ভাষাজ্ঞান সভ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ও তার সঙ্গে পাল্লা দেয়ার একমাত্র মাধ্যম। চীনের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জৌএন লাইকে বিখ্যাত সাংবাদিক ফিলিক্স গ্রীন বিভিন্ন জাতির ভাষাগত পরিচয়ের ভিন্নতা সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার জবাবে জৌএন লাই বলেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ এক ভাষায় কথা বলবে। তিনি কি ইংরেজী ভাষার কথা বলেছিলেন? হয়তো বা তাই।

ইংরেজীর এই ব্যাপক ব্যবহার সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির মাতৃভাষা লোপ পাবে না। মাতৃভাষা তার আপন স্থানে আপন গৌরবে অবস্থান করবে। কারণ একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ তার হৃদয়ের সবচাইতে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোর প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম। হয়তো ইংরেজীর বহুল ব্যবহার অনেক জাতির মাতৃভাষাকেও প্রভাবিত করবে। আবার ইংরেজী ভাষাতেও পৃথিবীর নানা অঞ্চল ও নানাদেশের শব্দ প্রতিনিয়ত ব্যবহারযোগ্যতা অর্জন করছে। তাই ইংরেজী ভাষা শুধুমাত্র ব্রিটিশরাজের ভাষা নয়। ইংরেজী ভারতীয়, আফ্রিকান, পূর্ব এশীয়, আমেরিকান, অস্ট্রেলীয় এবং ক্যারিবিয়ান রূপ পরিগ্রহ করছে। নতুন সহস্রাব্দের শেষে সকল ভাষার সংমিশ্রণে এক অভিনব

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক ভাষারও এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভব ঘটতে পারে। সম্রাট আকবরের সময়ে ছাউনিতে ব্যবহার করার জন্য ভারতের নানা ভাষার মিশ্রণে ফার্সী ও সংস্কৃতের প্রাধান্যে উর্দু ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল। এরকম উর্দু ভাষাতেও মহৎ সাহিত্য চর্চা রচিত হয়েছে। ইকবাল ও গালিব উর্দু ভাষার দুই মহৎ কবি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলতেন, একটি নতুন ভাষা আয়ত্ত করার অর্থ হল, জ্ঞানের রাজ্যের একটি নতুন চাবিকাঠির সন্ধান পাওয়া। সুতরাং যতবেশী করে ভাষা রপ্ত করা সম্ভব হবে, ততই জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করা সহজসাধ্য হবে।

নতুন শতাব্দীতে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা কী? ২০০৫ সালের মধ্যে পোশাক শিল্পের পশ্চাদসংযোগ শিল্প গড়ে তুলতে না পারলে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে পাততাড়ি গুটাতে হবে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী এই প্রধান শিল্পটি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর লাখ লাখ শ্রমিক, বিশেষ করে নারী শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে। চিংড়ি মাছ রপ্তানী করে বাংলাদেশের অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। কিন্তু পরিবেশগত বিপর্যয়ের ফলে চিংড়ি মাছের প্রজননও যে কোন সময়ে হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। বাংলাদেশ থেকে অদক্ষ শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে অনেক মেহনত ও কষ্ট স্বীকার করে দেশের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায়। পৃথিবীর যেসব দেশে বাংলাদেশী শ্রমিকরা গিয়েছে, সেখানে তারা নির্মাণ শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এখন এসব দেশে অবকাঠামো বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ছে। এ কারণে শ্রমশক্তি রফতানী করে যে আয় হত, তার সম্ভাবনাও সংকুচিত হয়ে আসছে। পোশাক শিল্প, হিমায়িত মাছ ও শ্রমশক্তিসহ সকল প্রকার অপ্রচলিত পণ্যের বাজার বাংলাদেশের জন্য সংকুচিত হয়ে আসছে। তাহলে কি এই ১৩ কোটি মানুষের জন্য মহাবিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে নতুন শতাব্দীতে? সম্ভবত এই বিপদের অজুহাত দেখিয়ে সাময়িকভাবে টিকে থাকার জন্য গ্যাস রফতানীর বিষয়টিও সামনে চলে আসবে। কোন গত্যন্তর নেই, কোন বিকল্প নেই- এই অজুহাত তুলে গ্যাস রফতানীর বিষয়টিকেও অনিবার্য করে তোলা হবে। কিন্তু তাতে কি জাতির রক্ষা হবে? না মোটেই না। এ জাতিকে বাঁচতে হলে নেতৃত্বকে দৃঢ়তার সঙ্গে শিক্ষার জন্য ক্ষতিকর সকল তৎপরতা কঠোর হাতে স্তব্ধ করে দিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে নতুন শতাব্দীর চাহিদা মেটাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। জ্ঞানভিত্তিক নয়া অর্থনীতির জন্য উপযুক্ত মানব সম্পদ সৃষ্টির কাজে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগের অগ্রাধিকার দিতে হবে। ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। তথ্য-প্রযুক্তিকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। ইংরেজী ও তথ্য-প্রযুক্তি- এ দুটি বিষয়কে জাতীয় অগ্রাধিকার দিতে হবে। রেডিও ও টেলিভিশনকে ইংরেজী ভাষা ও তথ্য-প্রযুক্তি আয়ত্তের জন্য সহায়ক উপাদন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। নিছক বিনোদন ও দলীয় প্রচারের জন্য এই ব্যয়বহুল মাধ্যমগুলোর ব্যবহার প্রচণ্ড অপচয়ের শামিল। ছাত্ররাজনীতি আজ যে সর্বনাশা আবর্তের কবলে পড়েছে, তা থেকে উদ্ধারের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলোকে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে হবে। একথা বলার কি অপেক্ষা রাখে যে, ছাত্র রাজনীতি বস্তুত রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সমস্যাই সৃষ্টি করে এবং জনগণের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে সাহায্য করে? তাই ২০০১ সালের প্রথম প্রহরে আমাদের জাতীয় প্রতিজ্ঞা হোক- শিক্ষার সর্বাত্মক বিস্তার, উচ্চশিক্ষার গুণগত মানের চরম উৎকর্ষ সাধন, তথ্য-প্রযুক্তি আয়ত্তকরণ এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজীর গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা। বিপুল জনসংখ্যা ভারে ন্যুব্জ বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে এর জনসংখ্যাকে বোঝা থেকে সম্পদে পরিণত করতে হবে। আমাদের দেশে সেই নেতৃত্ব কবে সৃষ্টি হবে, যারা শুধুমাত্র কথা নয়, এই কাজগুলো সত্যি সত্যি সম্পাদন করবে?

www.pathagar.com

আফতাব আহমাদ :

নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দে প্রবেশ করার মুহূর্তে যে আনন্দ ও সুখোচ্ছ্বাস আর সব দেশ অনুভব করছে, সেসব দেশের মতো বাংলাদেশ অনুভব করতে পারছে না। টানটান উত্তেজনা, সহনশীলতার অভাব, গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি বাংলাদেশে এমন এক সর্বগ্রাসী দানবের জন্ম দিয়েছে যা সকল সৃজনী ক্ষমতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকে চিরস্থায়ী নির্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে উদ্যত।

বর্তমানের মূল্যবোধশূন্য কৃষক সমাজের ভেতর থেকে যে ছন্নছাড়া মধ্যবিত্তের জন্ম তা চরিত্রগতভাবে ধ্বংসাত্মক বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের মধ্যেই তার অস্তিত্বকে সে নিরাপদ মনে করে। এহেন সমাজে গণতন্ত্র শুধু উপেক্ষিতই হয় না, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভাবনা পর্যন্ত উপহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।

এমনিতেই প্রাচ্যের সমাজকে Karl Wittfogel-এর মতো সমাজ বিজ্ঞানীরা Oriental despotism বলে অভিহিত করেছেন। এর সঙ্গে brutalized, criminalized ও dehumanized সমাজের উপাদানগুলোর সংমিশ্রণ হলে কী পরিণতি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। যুক্তি ও কর্মসূচীনির্ভর স্যোশাল মবিলাইজেশনে আমরা গঠনমূলক ও বাস্তবানুগ সাড়া প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু কেবল আবেগনির্ভর স্বতঃস্ফূর্ততা মানুষকে আদর্শশূন্য করে তোলে এবং সামাজিক শক্তিগুলোর জোট বা মৈত্রী গঠনে নানা বাধা ও উপদ্রবের জন্ম দেয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ততা, যুক্তি, জ্ঞান ও বিদ্যাকে অস্বীকার করে পাশব শক্তিকে প্রবল ও প্রধান করে তোলে। এর ফলে পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা তো দূরের কথা পরমতকে সহ্য করার মানসিকতাও উবে যায় এবং একটি বহুবাচনিক সমাজের অস্তিত্বও অসহনীয় হয়ে ওঠে। ঠিক এখানেই আমাদের সংকটের মূল নিহিত। এই জনপদের মানুষ ১৯৪৭-এ যখন কৃষক মুক্তির লক্ষ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি অর্জন করেছিল; তাদের শীর্ষ সংগঠন ও শাসকশ্রেণী সেদিন যুক্তি ও কর্মসূচীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করার পরিবর্তে কেবল আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে পুঁজি করে এমন এক বিকৃত ও অধঃপতিত রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল, যেখানে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সর্বসাধারণের কোন ধরনের অংশগ্রহণ ছিল না এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পর্যন্ত কেড়ে নেয়া হয়েছিল– এক কথায় গণতন্ত্রকে অবমাননাকরভাবে দাফন করা হয়। জনগণের মতামতকে অস্বীকার করে কায়েমী স্বার্থবাদীদের চন্ডনীতি যেভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়, তাই পাকিস্তানের দ্বিখণ্ডিকরণকে অনিবার্য করে তোলে। একটি মহান গৌরবোজ্জ্বল সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশ অর্জন করেছি মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র ভোগ করার জন্য।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সম্মিলিত জাতীয় সংগ্রামের ফসলকে একটি দল কুক্ষিগত করে দলীয়করণের মাধ্যমে যে লুটপাটের অর্থনীতি প্রবর্তন করে, তাকে লালন ও রক্ষার জন্যই জন্ম নেয় এক সহিংস সন্ত্রাসী দুর্বৃত্ত রাজনীতি। এ দুর্বৃত্ত রাজনীতি দেশ গঠনে সকলের অংশীদারিত্ব অস্বীকার করে, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে অস্বীকার করে, মতের বিভিন্নতা তথা বহুবাচনিকতাকে অস্বীকার করে– সর্বোপরি একটি জবাবদিহিমূলক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে। এর পরিবর্তে এক কিম্ভূতকিমাকার পৌত্তলিক সংস্কৃতির প্রবর্তন করা হয়– ভারত তোষণ ও ভারতীয় স্বার্থসংরক্ষণের নীতিকে আড়াল করার জন্য ব্যক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করে এক নেতার, এক দলের শাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য দুর্বৃত্ত রাজনীতির ধারক-বাহকরা যে চন্ডনীতি অনুসরণ করে তা তাদেরসহ দেশ, জাতি ও জনগণ কারো জন্যই মঙ্গলজনক প্রমাণিত হয়নি।

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের দলন ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়ায় বাংলাদেশে গণতন্ত্রও বহুবাচনিক নয়, উত্তরণের জন্য রক্তাক্ত পথেই ক্ষমতার পালাবদল অনিবার্য ও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর তাই ১৫ আগস্ট দুঃখ ও বেদনার দিন না হয়ে শান্তি ও স্বস্তির দিনে পরিগণিত হয়েছে। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের এক বর্ণাঢ্য ও সুদীর্ঘ অধ্যায়ের এমনি মর্মন্তুদ ও বিয়োগান্তক পরিণতি কেউই কামনা করেনি। আমিও না। কিন্তু ব্যক্তিনিরপেক্ষ ইতিহাসতো তার আপন গতিতে চলে– কেবল সামাজিক শক্তিগুলোর বিন্যাস ও সমীকরণই এর নিয়ামক হতে পারে, এর বাইরে আর কোন তৃতীয় অস্তিত্বের নির্ধারণী ভূমিকা নেই। অর্থাৎ গণমানুষকে অস্বীকার করার বা অপমান করার পরিণতি কখনই শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না। মানুষ আপন মহিমায় সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে দাসে পরিণত হবার জন্য নয়। তাই বারবার মানুষ তার সংঘশক্তি দিয়ে যে কোন বৃত্তের অচলায়তন ভাঙতে বদ্ধপরিকর।

গণতন্ত্র ও তার সুফল ভোগ করার জন্য আমরা বাংলাদেশ অর্জন করেছিলাম। এ হচ্ছে গণমানুষের দিক– আমাদের স্বপ্ন ছিল বৈষম্যরহিত একটি ন্যায়ানুগ সমাজের, ইনসাফের সমাজের। এর জন্য প্রয়োজন সমাজমনস্ক ইতিহাসসচেতন যুক্তি ও জ্ঞাননির্ভর রাজনীতির অনুশীলন। কিন্তু আমাদের শীর্ষ সংগঠনটির সকল শক্তি ও দাপটের উৎস ছিল আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ততা এবং জনমতকে বিভ্রান্ত করার অভ্রান্ত দক্ষতা–জনতুষ্টিবাদ– বিশ্বাস করো আর নাই করো, তাই বলো যা বললে জনসাধারণ তুষ্ট থাকবে। জনসাধারণের আবেগকে পুঁজি করে সুকৌশলে কায়েমী স্বার্থের একনিষ্ঠ সেবা করে যাও– এই নীতি বাংলাদেশে আদর্শবাদিতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও নীতিবোধকে পর্যুদস্ত করেছে। ইতর প্রাপ্তিযোগ ও ভোগবাদ আজ সর্বগ্রাসী এক ভয়াল রূপ নিয়ে আমাদের সকল মানবিয় গুণাবলী ও মানবিকতাকে আক্রমণ করে সমাজে আস্ফালন করছে।

১৫ আগস্ট-উত্তর রাজনীতির দৈন্য হচ্ছে এই যে, রক্তাক্ত বিয়োগান্তক পন্থায় ক্ষমতার পালাবদলের পর যে বহুবাচনিক গণতন্ত্র জাতি হিসেবে আমরা সৃজন করতে চাইলাম, তাকে আদর্শিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আমরা মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছি। সামাজিক সংগঠনসমূহসহ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে আমরা যথাযথভাবে শক্তিশালী ও কার্যক্ষম এবং আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদী ভূ-রাজনীতি থেকে Insulate করে যথোচিতভাবে গড়ে তুলতে পারিনি। এর ফলে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজালের চরেরা ও নিয়োগীরা সর্বত্র অবাধে অনুপ্রবেশের সুযোগ লাভ করেছে এবং যুগপৎভাবে ভারতীয় পঞ্চম বাহিনী গঠন করে তাকে লালন ও পরিচর্যায় মনোনিবেশ করেছে। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে একশ্রেণীর লোকজন নগদ নারায়ণের পূজায় ব্যতিব্যস্ত থেকেছে '৭৫-৯৬ পর্যন্ত। এরা কার্যত আওয়ামী বাকশালী মুদ্রারই অপর পীঠ। স্যোশাল মবিলাইজেশনের পরিবর্তে, সংগঠনের পরিবর্তে, আদর্শিক দীক্ষার পরিবর্তে, জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির পরিবর্তে, বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের পরিবর্তে শুধু ফাঁকা বুলি কপচিয়ে ভারত যাতে বিরক্ত না হয় তার জন্য এক ধরনের ক্যামাফ্লাজ করা তোষণনীতি অনুসরণ করে মূলত বাকশালী রাষ্ট্রঘাতী রাজনীতিকেই এরা পরোক্ষে লালন করেছেন। বাকশালের নব্য সংস্করণ অভিনব পৌত্তলিকতার ধারক-বাহক বর্তমান আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ১৯৯৬-এ তখন তাদের ঘর গোছাতে কোন বেগ পেতে হয়নি। কারণ বহুবাচনিক গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করেনি বিগত ২১ বছরে এবং সম্প্রসারণবাদ-আধিপত্যবাদ বিরোধী রাজনীতি কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীভিত্তিক সাংগঠনিক শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। উপরন্তু দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির Rank and file-এ বাকশালের দালাল এবং ভারতীয় চর ও নিয়োগীদের অনুপ্রবেশ

www.pathagar.com

ঘটেছে। এসব দালাল, চর ও নিয়োগীরা অতি সন্তর্পণে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তিকে জ্ঞানমনস্ক বিদ্বৎজনদের কাছ থেকে বহু যোজন দূরে রাখার আয়োজনটি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে এবং সমাজমনস্ক সকল ব্যক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তিকে বুদ্ধিবৃত্তিকতায় যারা নিয়োজিত তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে একশ্রেণীর নব্য স্তাবক ও উমেদারের জন্ম হয়েছে, যারা ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগী হবার জন্য হবু ক্ষমতাসীনদের উঞ্ছবৃত্তিতে ব্যতিব্যস্ত থেকেছে। এরা এক মুষ্ঠি খুদকুঁড়োর জন্য আত্মাকে যখন তখন যে কারো কাছে বিক্রি করতে পারে। আর এর ফলে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা গণদুশমনদের সেবাদাসরা ভাবা শুরু করেছে যে, তাদের প্রতি যারাই সহানুভূতিশীল তারা বুঝি তাদেরই অনুগত ভৃত্য। এ যে কত গর্হিত চিন্তা, তা এসব ক্লীবজনেরা একবারও ভাবেনি। আসলে চিন্তায়, অস্থিতে এবং মজ্জায় এরা বাকশালীদের মতই ফ্যাসিস্ট– এদের সঙ্গে কেউ দ্বিমত করবে, এরা কল্পনাও করতে চায় না–মতের ভিন্নতা এরা সহ্য করতেই নারাজ। এক কথায় বহুবাচনিক গণতন্ত্রের নামে এরা বর্ণচোরা বাকশালী, ফ্যাসিস্ট, ফেরেববাজ ও শঠ।

নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করার মুহূর্তে আমাদের বর্ণচোরাদের সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। যে গণতন্ত্রের লড়াইয়ে আমরা নিয়োজিত তাকে অর্থবহ করতে হলে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক এবং ভূ-কৌশলগত অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে সকল রাষ্ট্রাতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যথোচিত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আর তা কেবল তখনই সম্ভব হবে যদি আমরা একটি সুশৃঙ্খল আদর্শিক পরম্পরাযুক্ত একটি কার্যকর সংগঠন গড়ে তুলতে পারি। প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জনের অভিমুখে সংগঠন গড়ার বিকল্প আর কিছু নেই। সংগঠন কখনও সুবিধাবাদী, আত্মা বিক্রয়কারী ব্যক্তির নেতৃত্বে গড়ে উঠতে পারে না। কিংবা চর ও নিয়োগীদের খপ্পরে থাকা কোন সংগঠন বিঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে কখনো সক্ষম হতে পারে না। অনেক চটকদার মুখরোচক বুলির মোড়কে নিবেদিতপ্রাণ দেশবাসীদের বিপথগামী ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা কম হবে না। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে, খোলামেলা মনে নিয়ত ঠিক করে জনগণকে সংগঠিত করার কাজে মনেনিবেশ করা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করে নিজেদের কর্মকৌশল নির্ধারণ করা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা।

মনে রাখতে হবে, কমপক্ষে আগামী দু'টি শতাব্দী হচ্ছে গণতন্ত্রের শতাব্দী। এ দু'শতাব্দীব্যাপী গণতন্ত্রের সকল মাত্রা এত গুরুত্ব পাবে এবং নিয়ামক হয়ে উঠবে যে, আমরা যদি এখনই নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে ব্যর্থ হই, তাহলে বাতিল হয়ে যাব। গণতন্ত্র শুধু ভোট প্রদান আর ক্ষমতায় যাবার একটি পদ্ধতি নয়। গণতন্ত্র একটি জীবন পদ্ধতি– একটি জীবনাচার– একটি সংস্কৃতি– একটি মূল্যবোধ– বিচার ও সিদ্ধান্তের মানদন্ড। তাই এর জন্য পরিশীলিত ও পরিমার্জিত রুচিবোধের প্রয়োজন। এই রুচিবোধ একটি অর্থবহ সামাজিকায়ন প্রক্রিয়ায় সম্ভব। আর সামাজিকায়নের গুরুদায়িত্ব বর্তায় সংগঠনের ওপর। অর্থাৎ গণতন্ত্র অর্জনের জন্যও চাই যথোচিত অর্থবহ সংগঠন। আসুন, আমাদের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির অর্থবহ সাচ্চা সংগঠন গড়ে তুলি।

www.pathagar.com

১১ জানুয়ারী ২০০১

ভুঁইফোড় মধ্যবিত্ত ও সামাজিক অবক্ষয়

মাহবুব উল্লাহ :

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০০ থেকে ৪ জানুয়ারী ২০০১ গণচীনের আন্তর্জাতিক সমঝোতা সমিতি (Chinese Association for International Understanding) এর ৪ জন প্রতিনিধি বাংলাদেশ-চীন সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ও গণযোগাযোগ কেন্দ্রের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। তাঁদের এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে একটা ধারণা গ্রহণ করা এবং বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করা, ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তরকালে আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে জানা, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করা এবং বর্তমান বাংলাদেশে ধর্মীয় শক্তিগুলোর অবস্থান ও গুরুত্ব কতটুকু তা নিয়ে মতবিনিময় করা। শেষোক্ত দুটি বিষয় নিয়ে গত ২৮ ডিসেম্বরের গোলটেবিল বৈঠকে তেমন কোন আলোচনাই হয়নি। বিশেষ করে নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কোন কথাই আলোচিত হয়নি। আসলে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের মধ্যে মাত্র একদিনে এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় ছিল না। চীনা প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে রয়েছে ৯৮ কোটি জনসংখ্যা। ৯৮ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। এর ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার বেশ বড়। এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ভারতের ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহ দেখাচ্ছে। আগামীদিনে ভারতের এশিয়ায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতে সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত। এছাড়া ডাক্তারী, ওকালতিসহ নানা ধরনের প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে সেবাদানকারী পেশায় এক বিরাট সংখ্যাক জনগোষ্ঠী স্ব-নিয়োজিত। তদুপরি দেশব্যাপী রয়েছে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত আরও একটি বিশাল জনগোষ্ঠি। ভারতীয়রা উচ্চ শিক্ষা রপ্ত করে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের জন্য একটা প্রশংসনীয় স্থান অধিকার করে নিয়েছে। উল্লেখ করার মত বিষয় এই যে, আন্তর্জাতিক সংস্থায় সংস্থার আইন-কানুন ও চার্টার মোতাবেক দায়িত্ব পালনের শর্ত থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়রা প্রতিটি সংস্থায় বসে বসে সুকৌশলে ভারতের স্বার্থ ও সুবিধা অর্জনের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান থাকে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসেও বেশ ক'জন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ কর্মরত রয়েছেন। ভারত ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানের পর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন লাভের জন্য জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে আসছে। ভারত এখন উন্নয়নশীল বিশ্বের মুখপাত্র হিসেবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের আসনটি লাভ করতে চাইছে। অথচ ভারত দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে খবরদারির মনোভাব নিয়ে আচরণ করে আসছে। অনাবাসিক ভারতীয়রা (Non-resident Indians) ভারতের জন্য একটি বড় সম্পদ। এরা ভারতের বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জামাইকা, বারবাডোস, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়েশিয়া,

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকাসহ পৃথিবী অনেক দেশেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা ধরনের এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠা করে কোটি কোটি ডলার উপার্জন করছে এবং ভারতেও রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে। এদের অনেকে আয়লব্ধ অর্থ ভারতেও বিনিয়োগ করছে। কিছু দিন আগে এদেশের সংবাদপত্রে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশেও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রায় দেড় লক্ষ ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি-বাকরি করছে। সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এরকম স্পর্শকাতর জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে দেখেও না দেখার ভান করছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের বেআইনী ভারতীয় অধিবাসীরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া তারা যে এই মুহূর্তে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর তৎপরতায় লিপ্ত নেই, তাও নিশ্চিত করে বলা যাবে কি?

প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছিল বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটেছে সন্দেহ নেই। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টি এবং ১৯৭১-এ বাংলাদেশের অভ্যুদয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের সুযোগকে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিকভাবে নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশে একটি বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (Expanding middle class) উদ্ভব হয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে জানার জন্য দেশব্যাপী আর্থ-সামাজিক জরিপ চালানো প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গৃহস্থালীয় ব্যয় সংক্রান্ত জরিপ চালিয়ে থাকে। এই জরিপ Household Expenditure Survey নামে পরিচিত। এই জরিপ থেকেও এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। রাজধানী ঢাকায় যেভাবে কয়েক ডজন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ও আধুনিক শপিং কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে, তা থেকে এ কথা অনুমান করা অবাস্তব হবে না যে, বাংলাদেশে সত্যি সত্যি একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে। এছাড়া এসব আধুনিক বিপণি বিতানে রয়েছে অঢেল বিলাস সামগ্রীর সমাহার। এগুলো ক্রয় করার যথেষ্ট ক্রেতা না থাকলে বিক্রেতারাই বা কিভাবে এগুলোর আমদানী ব্যয় ও অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় নির্বাহ করেন? এদেশে এখন একশ্রেণীর মানুষ তার সন্তান-সন্ততিদের ভারতে ও পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য পাঠায়। দেশের ভেতরেও ব্যয়বহুল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, এ লেভেল এবং ও লেভেল পাঠদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। বোর্ডে যারা স্ট্যান্ড করে তাদের অনেককেই দেখা যায় প্রতিটি বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথকভাবে প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হতে। এখন স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা কবি আশরাফ সিদ্দিকী বর্ণিত গরীব তালেব মাস্টার নন। প্রাইভেট কোচিং ও অন্যান্য অর্থকরী কাজের সুবাদে এরা অনেকেই বাড়ি-গাড়ী ও ব্যাংক ব্যালেন্সের মালিক। আমাদের দেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণদানের মাধ্যমে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের দিয়ে শিল্পায়নের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। ধারণাটি হল ব্যক্তি উদ্যোক্তার রয়েছে উদ্যোগ গ্রহণের পারঙ্গমতা ও উদ্যোগ পরিচালনার মেধা– শুধু পুঁজি নেই বলে এই মহাগুণী মানুষগুলো শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবসা উদ্যোগে প্রতিভা দেখাতে পারছে না। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী উদ্যোক্তার ধারণা বর্তমান ফাইন্যান্স ক্যাপিটালের যুগে অচল হয়ে পড়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ধার পাওয়ার পর শিল্প-কারখানার জন্য কতটুকু ব্যয় হয় তা আমরা জানি না। তবে গুলশান-বারিধারায় শাদ্দাদের বেহেস্তখানার মত বিলাসবহুল বালাখানা তৈরী হচ্ছে। নিশান প্যাট্রোল গাড়ি কেনার ধুম পড়ে গেছে। প্রতিমাসে শপিং-এর জন্য দিল্লী-মুম্বাই-সিঙ্গাপুর বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাওয়াটা নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে কারখানা স্থাপনের নামে জাপান, কোরিয়া থেকে জরাজীর্ণ প্লান্ট আমদানী করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উৎকোচ দিয়ে ঋণ করা অর্থের সদ্ব্যবহারের ছাড়পত্র গ্রহণ করা হচ্ছে এবং ওভার ইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে বিদেশে পুঁজি পাচার হচ্ছে। এসব লোক যদি কেনাকাটায় নামে তাহলে তাকে অর্থনীতির সুস্বাস্থ্য হিসেবে কতটুকু গ্রহণ করা যাবে? অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া সাহেব যখন দেখতে পান তার স্ত্রী ভিড়ের জন্য দোকানে প্রবেশ করতে পারছেন না, তিনি সেটাকে মানুষের

www.pathagar.com

আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষণ হিসেবেই বিচার করতে চান। মোট কথা, লোকের হাতে টাকা আসছে। সেটা দুর্নীতি করেই হোক আর অবৈধ ফেনসিডিলের কিংবা মাদকের ব্যবসা করেই হোক। যে দেশের অর্থনীতি আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভরশীল সে দেশের অর্থনীতিকে কোনক্রমেই তেজিয়ান বলা যাবে না। থাইল্যান্ডেও কিছুদিন আগে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার বুম হয়েছিল। শত শত আকাশছোঁয়া অট্টালিকা ব্যাংকক ও অন্যান্য থাই শহরে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, এসব দালানকোঠা খরিদ করার কোন ক্রেতা নেই। শুরু হয়ে গেল এশিয়ান ক্রাইসিস। ছোঁয়াচে ব্যাধির মত সমস্যাটি ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। সবাই প্রমাদ গুনলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক মিরাকলের ফাউণ্ডেশন বুঝি খুব দুর্বল। এবার ঈদুল ফিতরের সময় ঢাকায় ১৫ হাজার কোটি টাকার সামগ্রী বিক্রি হয়েছে।বিপুলসংখ্যক অর্থ ভারতে গিয়ে ব্যয় করা হয়েছে। ঈদ এখন আর একটি শ্রেণীর জন্য নিজ বাসভূমিতে আত্মীয়-পরিজন নিয়ে নির্মল আনন্দ করার উৎসব নেই। ঈদের সময় যেতে হবে দিল্লী-আগ্রা কিংবা মুম্বাই। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২০০ কোটি ডলারের বৈদেশিক সহায়তা আসে। প্রেসিডেন্ট জিয়া একবার এ দেশের অর্থনীতিবিদদের সমাবেশে দুঃখ করে বলেছিলেন, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র সত্যিকার উন্নয়ন কর্মে ব্যয়িত হয়, বাকী ৬০ ভাগ বিদেশী কনসালটেন্ট থেকে শুরু করে দেশীয় মধ্যস্বত্বভোগীরা লোপাট করে দেয়। এক কথায় দুর্নীতি ও অনাচারই এই ভোগ-বিলাসের উৎস। গত ঈদুল ফিতরের সময় একটি শাড়ির দাম উঠেছিল সাড়ে ৩ লাখ টাকা। জানি না, বাংলাদেশের কোন কুইন এলিজাবেথ বা রাজকুমারী অ্যান কিংবা প্রিন্সেস ডায়না এই শাড়ি পরার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তবে বোঝা যায়, এ দেশে ডায়নার মত প্রিন্সেসও আছেন।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ আর্থার লুইস বলেছিলেন, যদি গৃহস্থালির কাজের জন্য কাজের মানুষ পেতে সমস্যা হয় তাহলে বুঝতে হবে দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটছে। বাংলাদেশেও অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার কাজের মানুষ পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ করেন। আমাদের অর্থনীতির জন্য এটা সুখবর নয় কি? গত দু'দশকে দেশে এক চরম শোষণমূলক ব্যবস্থাধীনে পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। গ্রাম ও শহরের গরীব মেয়েরাই এই শিল্পের প্রাণশক্তি। ২০০৫ সালের পর বাংলাদেশ পোশাক শিল্পের জন্য পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প গড়ে তুলতে না পারলে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে এই শিল্প যে সুবিধা ভোগ করছে সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এখন পর্যন্ত পোশাক শিল্পের পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প দেশে সন্তোষজনকভাবে গড়ে ওঠেনি। পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণের শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র দেশীয় সূত্র থেকে আসে। সুতরাং পোশাক শিল্প এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যদি (আল্লাহ না করুন) পোশাক শিল্পে ধ্বস নামে তাহলে হাজার হাজার নারী শ্রমিককে হয় গৃহস্থালির চাকরানীর কাজে ফিরে যেতে হবে অথবা অনেককে দেহ ব্যবসায় নিয়োজিত হতে হবে। এ রকম দিন আসলে দেশের জন্য তা হবে অত্যন্ত মর্মান্তিক। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে বিকাশ সেই বিকাশের বস্তুগত ভিত্তি অত্যন্ত ঠুনকো। এই নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী উৎপাদন সংশ্লিষ্টতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়নি– তাই শ্রেণীটি অত্যন্ত ভঙ্গুর।

গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু সেই মধ্যবিত্ত কোন মধ্যবিত্ত? কোন ভুঁইফোড় মধ্যবিত্ত শ্রেণী গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির সহায়ক ও নির্ভরযোগ্য উপাদান হতে পারে না। চরিত্রগতভাবে এরা পরশ্রীকাতর, স্বার্থপরায়ণ, ভবিষ্যতের প্রশ্নে বিবেচনাহীন, নগদ প্রাপ্তিতে এবং নগদ সুখানুভূতিতে মগ্ন থাকতে চায়। দেশের ভাল-মন্দ এদেরকে স্পর্শ করে না। বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর সব দেশই এদের অতি প্রিয়। তাই অবলীলায় এরা বলতে পারে যত শিগগিরই সম্ভব বাংলাদেশ ছাড়া যায় ততই ভাল। বিদেশী নাগরিকত্ব পেলে এরা হাতে আকাশের চাঁদ পেয়েছে বলে মনে করে। আমেরিকায় ইমিগ্রেন্ট ভিসা লাভ ট্রেজার

www.pathagar.com

আইল্যান্ড আবিষ্কার করার চাইতেও অনেক বেশী লোভনীয় ও পূজনীয়। এরা বিত্তের পূজারী, বিদ্যার প্রতি অনুরাগহীন এবং ত্যক্ত-বিরক্ত। নীতি ও আদর্শবোধসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তি চর্চাকারীরা এদের দৃষ্টিতে বুদ্ধিহীন গবেট ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাংলাদেশে এই ভুঁইফোড় মধ্যবিত্তরাই সমাজ, জাতি ও দেশের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রফেসর আফতাবের মত মানুষ নির্লোভ, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যখন স্বীয় মত ব্যক্ত করতে গিয়ে নির্যাতিত হন তখন বাংলাদেশের ভুঁইফোড় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অগ্রণী অংশ যারা বুদ্ধি ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত তাদের বিবেকে কোন দংশন তারা অনুভব করেন না। তারা হয়ে যান চক্ষুহীন, কর্ণহীন ও বিবেকহীন। যে দেশে বুদ্ধিজীবীরা চরিত্র হারায় সে দেশের ভবিষ্যৎ চরম তমসাপূর্ণ হয়ে পড়ে। আমাদের এসব বুদ্ধিজীবীরাই শিখিয়েছে ভলতেয়ারের কথা। ভলতোয়ার বলেছেন, আমি তোমার মতের সঙ্গে একমত হতে নাও পারি, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের অধিকারকে আমি জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করব। কোথায় গেল এসব আপ্তবাক্য? আবার যখন দেখি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি অহেতুক হয়রানিমূলক মামলায় নাজেহাল হন তখন তার সমর্থনে এগিয়ে আসতে আমাদের মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হয় না। ধনাঢ্য হোন আর নাই হোন একজন সংসদ সদস্যের মান-মর্যাদার উপরে হামলা হলে তার নিন্দা করতে কারোরই কসুর করার কথা নয় এবং তা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তাই বলে মজলুম প্রফেসর আফতাবকে হায়েনার মুখে ঠেলে দিয়ে নিশ্চিত ভাগাড়ে ফেলে দেয়ার কোন বিবেক বোধের পরিচয়? আবারও বলি, ভুঁইফোড় মধ্যবিত্ত দিয়ে কোন ন্যায়ানুগ ও বিবেক বোধসম্পন্ন কাজ হওয়ার কথা নয়। আর সে কারণেই বাংলাদেশে আজ গণতন্ত্রও অস্তিত্বের সংকটে বিপর্যস্ত। আমরা চাই, শিকড়সম্পন্ন মধ্যবিত্ত– শিকড়বিহীন উটকো ভুঁইফোড় মধ্যবিত্ত নয়।

আফতাব আহমাদ :

চরিত্রগতভাবেই মধ্যবিত্ত পরস্পরবিরোধী দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শিক্ষা-দীক্ষা এবং মননশীলতার কারণে পাশ্চাত্যের মধ্যবিত্তের মধ্যে নীতিবোধ ও শ্রেয়বোধের যে চেতনা তার কর্মোদ্যোগে প্রণোদনা যোগায়, সেই নীতিবোধ ও শ্রেয়বোধ উপনিবেশ-উত্তর তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের এই মধ্যবিত্তের বিকাশ স্বাধীনভাবে হয়নি। সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যদিয়ে সামাজিক শক্তিসমূহ যে সমীকরণে পৌঁছায়, কিংবা যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে, সেখানে সামাজিক শক্তিসমূহের অন্তর্নিহিত গতিসূত্র নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বহির্হস্তক্ষেপের মধ্যদিয়ে যে সমাজ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যায়, তার স্বাধীন বিকাশের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। আরোপিত শর্তাবলীর যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এসব বদ্ধ সমাজে যে মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটে, সেই মধ্যবিত্ত মূলত সৃজনীক্ষমতা রহিত। দালালি এবং উঞ্ছবৃত্তির মধ্যদিয়ে এই গোষ্ঠী তার শ্রেণীগত স্বার্থ হাসিল করে। শ্রমের উৎপাদনশীলতার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া কিংবা উৎপাদনক্ষম উৎপাদন ব্যবস্থাকে লালন করার কোন আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিকভাবেই এই শ্রেণীর মধ্যে জন্মায় না। অর্থাৎ, পরাশ্রয়ী, পরনির্ভর ও পরজীবী এই গোষ্ঠী উৎপাদনমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহী হওয়াতো দূরের কথা, উৎপাদনবিমুখ হয়ে উৎপাদনবিনাশী তৎপরতায় লিপ্ত হতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। কারণ, উৎপাদন এদের কাছে অক্ষমতার নামান্তর। এদের কাছে শ্রেয়বোধ মেধা, মনন, রুচিবোধ ও নৈতিকতার কোন বালাই নেই। আদর্শবাদিতা এদের কাছে অক্ষমতার নামান্তর। শ্রেয়বোধ এদের কাছে অযোগ্যতা ঢাকার একটি ঢালমাত্র বলে বিবেচিত হয়। নগদ প্রাপ্তিতে জীবনের সার্থকতা এরা খুঁজে পায়। জীবনের এই স্থূল দর্শন এদের চিন্তামূলে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়ার পেছনে সমাজ বিকাশের বিকৃত ও অধঃপতিত ধারাই প্রধানত দায়ী।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের যে মধ্যবিত্তের কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, এই মধ্যবিত্ত ধ্রুপদী মধ্যবিত্ত নয়; একটি অস্বাভাবিক সামাজিক সংকোচনসৃষ্ট প্রবল প্রক্ষেপের মধ্যদিয়ে এই মধ্যবিত্তের জন্ম। নীতিবিবর্জিত এই মধ্যবিত্ত মেধা ও মননের দিক থেকে অত্যন্ত দরিদ্র। কিন্তু, দুর্বৃত্তিপনায় এদের জুড়ি নেই। ১৯৪৭-এ প্রধানত হিন্দুদের সম্পত্তি গ্রাস করে ও তাদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি দখল ও লুট করে (অবশ্য রাজনৈতিকভাবে বেকায়দায় থাকা মুসলমানদের সম্পত্তি দখল ও লুণ্ঠনেও এরা পিছপা হয়নি) এরা স্ফীত হয়েছে, প্রাচুর্যের মুখ দেখেছে। কর্মদক্ষতা, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থের ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের কষ্টসাধ্য পথ না ধরে কিংবা মেধা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরিতে বহাল হওয়ার পরিবর্তে আত্মীয়তা কিংবা ব্যক্তিগত ও দলীয় নৈকট্যের কারণে নিয়োগপ্রাপ্তি এদের সামাজিক মর্যাদা নিরূপণ করেছে। এর সঙ্গে উৎপাদনক্ষমতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা– কোন কিছুরই সম্পর্ক নেই। এর ফলে যখন যারাই রাষ্ট্রক্ষমতার কাছাকাছি গেছে কিংবা রাজনৈতিক ডামাডোলে প্রাধান্য লাভ করেছে, তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রবল প্রতিযোগিতায় এরা নেমে পড়ে। ফলে ইউরোপে মধ্যবিত্ত যে ইতিবাচক ভূমিকা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পালন করেছিল, তা আমাদের মধ্যবিত্ত পালন করতে পারেনি। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের মধ্যবিত্তের মধ্যে যে উদগ্র লালসা, লোভ ও অতৃপ্তি কাজ করেছে, তার পেছনে প্রধান কারণ কোন পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়াই সহজেই সমাজের শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত হয়ে খ্যাতির উত্তুঙ্গ ঊর্মিমালার উপরে ভেসে বেড়াতে পারা। আমাদের মধ্যবিত্ত যতো না এমিনেন্ট হতে চেয়েছে, তার চাইতে অধিক প্রমিন্যান্ট হওয়াটাকেই জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করেছিল। আমাদের অন্যতম মেধাবী ব্যক্তিত্ব, যাঁর মধ্যে প্রতিভার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, সেই ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদার কথাই না হয় বলি। ১৯৪৭-এর পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শিক্ষকতার পদ অলংকৃত করার পরিবর্তে প্রশাসনিক আমলার পদ অলংকৃত করাটাকেই শ্রেয়তর মনে করেছেন। তাই, দুঃখজনক হলেও সত্য, বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলে ড. কুদরত-ই-খুদাকে অসামান্য ও অসাধারণ অবদান রাখতে আমরা দেখি না। নিঃসন্দেহে তিনি একজন সৎ, সরল ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু এই দুর্ভাগা সমাজের যে দৈন্যদর্শনের আলোকে আমরা স্নাত, তাতো আমাদেরকে সস্তায় বাজিমাত এবং অনুচিত কিংবা অসঙ্গত খ্যাতি প্রাপ্তিতে আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করেছে। তাই লাজলজ্জার বালাই খুইয়ে আমরা দৈনিক পত্রিকার একটি সংখ্যায় একটি যেনতেন কবিতা লিখেই কবিখ্যাতির বড়াই করি। প্রবন্ধের নামে দু'চারটি বাক্য রচনা করে প্রাবন্ধিক কিংবা বিশ্লেষকের বড়াই করি। সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ও সহজ ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা লিখে নিজেদের বিজ্ঞানী বলে দাবী করি– এই তো হচ্ছে এমিনেন্স অর্জন করার চাইতে প্রমিন্যান্ট হওয়ার ইতরসুলভ আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ।

১৯৭১ আমাদেরকে আরও অধঃপাতের দিকে নিয়ে যায়। এবার বিহারীদের সম্পত্তি এবং পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া পরিত্যক্ত সম্পত্তি লুট ও দখল করে আমরা এদেশের একশ্রেণীর লোককে ফুলেফেঁপে মাত্রাহীনভাবে স্ফীত হয়ে উঠতে দেখি। এর পাশাপাশি দুর্বৃত্ত রাজনীতির উপহার হিসেবে রাষ্ট্রীয়করণের যে অর্থনীতি চালু করা হল, তা মিল-কলকারখানার কাঁচামাল থেকে শুরু করে যন্ত্রাংশ এবং পুঁজি লুটেপুটে খাওয়া শিখিয়েছে। লুটপাটের এই বারোয়াড়ি যজ্ঞের সার্বজনীন জপমন্ত্র ছিল "ওলট-পালট করে দেয়া মা লুটেপুটে খাই"। এর ফলে সমাজে যে যে টানাপড়েন ও অস্থিরতার জন্ম হয়, তাই জন্ম দিয়েছে অসহিষ্ণুতার, সহিংসতার, সন্ত্রাসের, বিদ্বেষের এবং শ্রেয়বোধের বিসর্জনকে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে তীব্র অথচ অসুস্থ প্রতিযোগিতার জন্ম হয়, সেখানে প্রধানতম ক্যাজুয়ালটি হয় নীতিবোধ ও মানবিকতা।

www.pathagar.com

এমনিতেই শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্ত দ্বৈততা বা দোলাচলে ভোগে, দোদুল্যমানতা ও দ্বিধাগ্রস্ততা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তবে সভ্য সমাজের আলোকনের স্তরে মানুষ যে নীতিবোধ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাবে বেড়ে ওঠে, তা তার মধ্যে শ্রেয়বোধের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, তা বাংলাদেশের মত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, পরনির্ভরশীল তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের মধ্যবিত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ইতর বস্তুবাদ, ভোগবাদ, উৎপাদন-বিনাশী ও অর্থনীতি বিপর্যয়কারী ইতর কর্মকাণ্ড বিত্তবৈভব ও প্রাচুর্যের পাহাড় গড়ে তোলার সহজ পথের সন্ধান দেয়। এ পথের সন্ধান একবার যে পায়, সে আর কখনও পুঁজি বিনিয়োগ, শিল্পকারখানা গড়ে তোলার উদ্যোগ কিংবা উৎপাদনী শক্তির অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে– এসবই ঝুঁকিপূর্ণ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। আমাকে তো আমার কালেই বেঁচে থাকতে হবে সকল প্রাচুর্য ও বিত্তের কৌলিন্য নিয়ে। নৈতিকতার পথে এ এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই বাঁকাপথ চোরা–পথ, গর্হিত পথ আমাদের মধ্যবিত্তের কাছে এত বেশী আকর্ষণীয় ও কাম্য। হৃদয়বৃত্তি হয়ে গেছে কাপুরুষতা ও ভীরুতার মাপকাঠি। পেশীশক্তি এবং নগদ নারায়ণের ঐন্দ্রজালিক শক্তিই আজ এদেশের মধ্যবিত্তের একমাত্র আরাধ্য। এই মধ্যবিত্তকে উৎপাদনের পথে, কল্যাণের পথে, সমাজ বিনির্মাণের পথে আনতে হলে রাষ্ট্রকে সংহারমূর্তি ধারণ করতে হবে। রাষ্ট্রের এই সংহার মূর্তি ফ্যাসিস্টরা তৈরী করতে পারে চণ্ডতন্ত্রের মাধ্যমে, আর যুক্তিবাদীরা তৈরী করতে পারেন সমাজকে অধিকতর জ্ঞান ও বিদ্যামনস্ক করে সংবেদনশীলভাবে গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে। সমাজের সর্বস্তরে চলছে এক প্রচণ্ড অবক্ষয়। এর মূলে রয়েছে বিদ্যামনস্ক, সুরুচিসম্পন্ন, সৃজনশীল মধ্যবিত্তের অনুপস্থিতি। এই মধ্যবিত্ত এত অধঃপতিত যে, কিসে তার মঙ্গল আর কিসে তার অমঙ্গল, এই জ্ঞান থেকে সে বঞ্চিত। আর্থিক লেনদেনে কিংবা বৈষয়িক দর কষাকষিতে দূরদৃষ্টি দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত ও সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে বর্তমানের স্থূল প্রাপ্তিকে মুখ্য বিবেচনা করে আত্মহননের পথ বেছে নিতেও এরা যে কুণ্ঠিত নয়, তা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। অবাধ বাণিজ্যের নামে ও মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে আমাদের এই পরজীবী মধ্যবিত্ত নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি বাংলাদেশকে ভারতের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলেছে এবং বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্যকে লুপ্ত করে দিতে উদ্যত হয়েছে। এই লুটেরা মধ্যবিত্ত সম্পদ লালন করতে ও সম্পদের যত্ন নিতে শেখেনি। উৎপাদন বিমুখ কর্মকাণ্ড, যা তার হাতে কাঁচা অর্থ এনে দেয়, তার জন্য সে তার আত্মাকে বিক্রি করে মহাপুলক অনুভব করে। কন্যা-জায়া-জননী, ইজ্জত-আব্রুর দিকে তাকানোর পরিবর্তে এই মধ্যবিত্ত নিজের মেকী শ্রীবৃদ্ধিকে চরম প্রাপ্তি বলে গণ্য করে। এর ফলে মানুষ মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ সংঘশক্তির মধ্য দিয়ে সামাজিক শক্তিকে সংহত করে, তাও উবে যায়। শূন্যতার মধ্যে কোন কাঠামো বা অবয়ব গড়ে ওঠে না, বিকশিত হয় না। বাংলাদেশ আজ এমনি এক শূন্যতার মহাগহ্বরে প্রবিষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। আজ তাই যারা সমাজহিতৈষী ও দেশমনস্ক, তাদের কর্তব্য হচ্ছে, মানুষের প্রতি যারা অশ্রদ্ধাবোধ পোষণ করে, অমানবিকতাকে লালন করে, যারা ইতর ও স্থূল আত্মপ্রসাদ লাভকে উৎসাহিত করে, তাদেরকে সংহার করে, পর্যুদস্ত করে, পরাভূত করে মনুষ্যত্বের অধিষ্ঠানকে নিশ্চিত করা। সহমর্মী ও সংবেদনশীল মানুষের আজ বড্ড প্রয়োজন। জ্ঞান ও বিদ্যা ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেবল আবেগ, আনুগত্য ও অঙ্গীকার মানুষের সদগুণকে বিকশিত করতে পারে না এবং সমাজে সুস্থতা আনতে পারে না। তাই আসুন, সবাই জ্ঞান ও বিদ্যার সাধনা করি। যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দীনতায় আমাদের মধ্যবিত্ত ভুগছে, তার অবসান ঘটাবার খুব একটা সহজ পথ নেই। তবে পথটি তেমন কঠিনও নয়। প্রয়োজন নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সততা।

www.pathagar.com

১৮ জানুয়ারি ২০০১

ঢাকার নগরজীবন

মাহবুব উল্লাহ :

গণসঙ্গীত গায়ক জনাব আবদুল লতিফ নূরুল আমিন-সরকারের স্বৈরাচার ও দমননীতির বিরুদ্ধে একটি গণসংগীত গাইতেন। গানটির প্রথম কলি ছিলো এরকম ঃ 'এ ঢাকা নয় সে ঢাকা- রক্তমাখা, সবখানে এর গোরস্থান'। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও আজকের বাংলাদেশে ১৯৫৪'র প্রাদেশিক নির্বাচনে নূরুল আমিন ও তার দল মুসলিম লীগ সমূলে উৎপাটিত হবার পর আর কখনো মুসলিম লীগ এদেশের রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৬২ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রভিত্তিক সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় আইয়ুব খানের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত কনভেনশন মুসলিম লীগ '৬৩ থেকে '৬৯ সময়কালে এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করলেও এদেশে মুসলিম লীগের গণভিত্তি বলতে কিছুই ছিলো না। এক কথায় বলা যায়, '৫৪-র নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবার পর দলটি আর কখনো মাটির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। গায়ক আবদুল লতিফ গান গেয়ে যেভাবে রাজধানী ঢাকার চিত্র জনগণের কাছে তুলে ধরেছিলেন, সেই পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন অদ্যপি হয়নি। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের পর স্বাধীন স্বদেশে এদেশের মানুষ আশা করেছিলো, মুক্ত পরিবেশে প্রাণভরে মুক্তবায়ুর নিঃশ্বাস গ্রহণ করার। ঢাকা আজো প্রতিদিন রক্তাক্ত হয়। ঢাকাকে মৃত্যুপুরীর সঙ্গে তুলনা করলেও অত্যুক্তি হবে না। আজ যদি বলা হয়, 'সবখানে এর গোরস্তান' তা কবিতার উপমা হিসেবে যতোটুকু সত্য, বাস্তবের নিরিখেও অসত্য নয়। সংবাদপত্রের পাতা খুললে প্রতিদিন নজরে আসে আততায়ী সন্ত্রাসীর হাতে নিহত সন্তানের স্বজনদের আহজারির দৃশ্য। বছরের কোনো না কোনো দিনে স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকার কোনো না কোনো ওয়ার্ডে খুনীর নির্মম বুলেট রক্ত ঝরায়, প্রাণ কেড়ে নেয়। কবি আলাউদ্দীন আল আজাদ ভাষা শহীদদের কথা লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'বুলেট শুধু রক্ত ঝরাতে পারে, প্রাণ অথবা এমন কিছু নয়'। কবি রক্ত ঝরানোর কথা বলেছিলেন, প্রাণ হননের কথা মেনে নিতে পারেননি। কারণ, ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলো, তারা ছিলো মরেও অমর। ঢাকায় আজ ঘাতক ডিবি পুলিশের নির্মম নির্যাতনে রুবেল প্রাণ হারায়। সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে মিছিল থেকে গুলীবর্ষণের ফলে সজলরা প্রাণ হারায়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এই মৃত্যুগুলো মহিয়ান করে রাখার জন্য আমরা কি কখনও সুদিন আসলে কিছু করবো? আমার মনে হয়, আমরা যে রকম স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব ও ক্ষমতাপ্রিয় হয়ে পড়েছি, তাতে করে এই মানুষগুলোর স্মৃতিকে ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার আমাদের মধ্যে তিলমাত্র অবশিষ্ট নেই।

এতো গেলো রাষ্ট্রীয় ও স্বৈরাচারী সরকারের নির্যাতন-নিপীড়নের কথা। ঢাকা একটি স্বাধীন দেশের রাজধানী- এখানে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি নেই, এখানে দোর্দণ্ড প্রতাপে বর্গীর মতো দস্যুতা চালায় ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ ও দখলদাররা। ওদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করার উপায় নেই। সরকারের শাসন ও নিপীড়নের যন্ত্র ওদেরকে রক্ষা করে। ওদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে অভিযোগ আমলে নেয়া হয় না। আর কদাপি নেয়া হলেও তাদেরকে সময় মতো নিরাপদে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবারও সুযোগ দেয়া হয়। এইতো সেদিন কোর্টে হুমায়ুন জহির হত্যা মামলার রায় দেয়া হলো। ভাড়াটে খুনী তন্ময়দের মৃত্যুদণ্ড হলো। কিন্তু তাদেরকে যে

www.pathagar.com

হত্যাকাণ্ড ঘটাবার জন্য নিয়োগ করলো, তার কিছুই হলো না। এই লোকটি ব্যাংক দখল করে, বিচার এড়াতে দেশ থেকে সটকে পড়ে। তবু তার কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারে না। বুঝতে পারি, যথাযথ প্রমাণ ছাড়া খুনের মামলায় কাউকে শাস্তি দেয়া যায় না। তবু মনের মধ্যে এই প্রশ্নটি খচখচ করতে থাকে– অর্থবলে বলীয়ান হবার ফলেই তার কাছে বিচার প্রক্রিয়াও তুচ্ছ হয়ে যায়।

রাজধানী ঢাকার জীবন কোনো অর্থেই নিরাপদ নয়। বঙ্গভঙ্গের পর রমনা এলাকাকে কেন্দ্র করে নয়নাভিরাম প্রাদেশিক রাজধানীটি গড়ে উঠেছিলো। ব্রিটিশ শাসনের আগে ঢাকা ছিলো মোগল রাজধানী। কিন্তু ঢাকার জনজীবন কখনোই এতো বিড়ম্বিত ছিলো না। একদিকে বিরোধীদল ও মতসংহারক সরকারের চণ্ড শাসন, আর অন্যদিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের অনুপযোগী এই নগরী মৃত্যুপুরী তুল্য। ঢাকার বাতাস বিষাক্ত। ঢাকার পানি বিষাক্ত। ঢাকার হাসপাতালগুলো নরকতুল্য। ঢাকার স্কুল-কলেজে ঠাঁই পাওয়া যায় না। এখানে এডিস মশার দংশনে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে কতো জনের প্রাণ বায়ু নির্বাপিত হয়, তার হিসাব কেউ রাখে না। ঢাকার পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রায় অকার্যকর। এখানে একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে নোংরা, দুষিত পানিতে চতুর্দিক সয়লাব হয়ে যায়। শ্বাসরুদ্ধকর যানজটে চলাফেরা একেবারেই অসম্ভব। দশ মিনিটের পথ অতিক্রম করতে এক ঘন্টারও বেশি সময় লেগে যায়। ঢাকায় ইমারত নির্মাণের ওপর রাজউক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। তাই অপরিকল্পিতভাবে ঘরবাড়ী নির্মাণ, প্রাচীর তুলে যাতায়াতের পথ সংকীর্ণ করে ফেলা এখানকার অতি স্বাভাবিক ঘটনা। যথাযথ নির্মাণকাঠামো অনুসরণ না করে বহুতল ভবন নির্মাণ করার ফলে পাকাবাড়ী ধসে পড়ছে এবং জীবন ও সম্পদের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। এখানে গোটা দু-তিনেক পার্ক আছে বটে, আজ সেসব পার্কের সবুজ আচ্ছাদন ছেদন করে পার্কগুলোকে ন্যাড়া করে ফেলা হচ্ছে, আর সেখানে চলছে নানা স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলার অপচয়ী মহড়া। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বলতে গেলে ভেঙে পড়েছে। লোডশেডিং, লো ভোল্টেজ এই রাজধানী নগরীর প্রাণ চাঞ্চল্যকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে, আর অন্যদিকে অপরাধীদের মহোৎসবে মেতে উঠতে উৎসাহিত করছে। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বলতে এই রাজধানীতে তেমন কিছু নেই। সড়ক যাতায়াত লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও সরকারের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে এই খাতে একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে উঠেছে। যাত্রীদের স্বার্থ সড়ক যাতায়াত ব্যবসায়ীদের দ্বারা চরমভাবে উপেক্ষিত। রাজপথে চলাচলকারী বাসগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো গেলে বাসে প্রাণ বিপন্ন করে বাদুরঝোলা হয়ে ওঠার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু মুনাফালোভী একচেটিয়া ব্যবসা ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে একেবারেই অনিচ্ছুক। নগরীর নগরপাল কিংবা সিটি কর্পোরেশন কেউই এই মনোপলি ব্যবসা ভাঙতে উদ্যোগী হচ্ছেন না। পার্লামেন্টেও এই ব্যবয়সায়ীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো আইন রচিত হচ্ছে না। বড় বড় পরিবহন ব্যবসায়ীদের অনেকেইতো সংসদের সদস্য। অথবা বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থের যোগানদার। এই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে কেউ অঙ্গুলি নির্দেশ করতে রাজি নন। ঢাকার বাস ডিপোগুলো হায়েনাদের নির্ঘাত শিকার খোঁজার অভয়ারণ্য বৈ আর কিছু নয়। সেখানে অজ্ঞান পার্টি, যাত্রীদের ত্যক্ত-বিরক্ত করার দল সর্বদা সক্রিয় এবং উৎসবের সময়ে যাত্রীদের কাছ থেকে দ্বিগুণ-তিনগুণ ভাড়া আদায় ঘটে এইসব বাস ডিপোতে। এ ছাড়াতো রয়েছে পকেটমারের দৌরাত্ম্য। আকাশপথে এই দেশের প্রধান তোরণ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে লাগেজ হারানো, ডলার-পাউন্ড ছিনতাই, বিমানবন্দর থেকে মূল শহরে আসতে হয়রানি, নিরাপত্তাকর্মীদের হাতে হয়রানি সবকিছুই আমাদের মুখে প্রতিনিয়ত কালিমা লেপন করছে।

একটি স্বাধীন দেশের রাজধানী সর্বতোভাবেই বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ার কথা ছিলো না। ঢাকায় এখন প্রায় ১ কোটি লোকের বাস। এর মধ্যে শতকরা তিরিশ থেকে চল্লিশ জন বাস করে বস্তিতে। বস্তির জীবনযাত্রা এতই মানবেতর যে, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা প্রচণ্ড স্ফীতি লাভ করেছে। ১৯০১ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিলো ১ লাখ ২৯

www.pathagar.com

হাজার। ১৯৫১ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা দাঁড়ালো ৩ লাখ ৩৬ হাজারে। বাংলাদেশ হবার পর ১৯৭৪-এ ঢাকার লোকসংখ্যা হলো ২০ লাখ ৪ হাজার। আর ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিলো ৬৮ লাখ ৪৪ হাজার। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকা নগরী দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, পশ্চিমে মিরপুর, উত্তরে গুলশান ও বনানী, পশ্চিমে আবার মোহাম্মদপুর, রায়েরবাজার, হাজারীবাগ এবং নবাবগঞ্জ থেকে পূর্বে খিলগাঁও, গোপীবাগ, যাত্রাবাড়ী ও ধোলাইপাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীনতা ও জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হয়ে আসার ফলে মফস্বলের মানুষ ঢাকামুখী হতে শুরু করে। ঢাকার এই স্ফীত জনসংখ্যা শুধুমাত্র জনসংখ্যার চাপ হিসেবেই প্রকাশ পায়নি। এর ফলে ঢাকায় গ্রামীণ ও কৃষক লোকাচারের আচার-আচরণে অভ্যস্ত মানুষেরও চাপ বেড়েছে। জনসংখ্যার এই চাপ ধারণ করার জন্য ঢাকার আশপাশে জলমগ্ন ভূমি মাটি ভরাট করে বসতি বিস্তারের চেষ্টা করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়ার পূর্বে উত্তরা, বাড্ডা, গোরান, মাদারটেক, যাত্রাবাড়ী এবং জুরাইন প্রধানত স্বল্প আয়ের লোকদের বাস। এখানকার বসতি অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত। এভাবে ঢাকা পূর্বদিক অনিয়ন্ত্রিতভাবেই বিকশিত হয়ে চলেছে। পশ্চিমে ঢাকার সম্প্রসারণ মৌসুমী বন্যার কারণে অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও হাউজিং সোসাইটিগুলো মোহাম্মদপুর-শ্যামলী এলাকার জলাভূমি ভরাট করে আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। দক্ষিণে কামরাঙ্গীরচর ও কেরানীগঞ্জ থানাতেও এ ধরনের উন্নয়ন হয়েছে। মিরপুর-কাফরুলকেও মেট্রোপলিটন নগরীর চৌহদ্দী থেকে আলাদা করা যায় না। সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ থানাতেও এ ধরনের উন্নয়ন হয়েছে। জয়দেবপুর এমনকি মেঘনাঘাট পর্যন্ত ঢাকা নগরীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিকশিত হচ্ছে। ফলে ঢাকা নগরী বিশাল এক নগরীতে বা মেগা সিটিতে পরিণত হচ্ছে। এ ধরনের নগরবিকাশ জাতীয় অর্থনীতির জন্য কতোটা কাম্য, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। নগরীর অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, খাবার পানি, টেলিযোগাযোগ, পয়োনিষ্কাশন এবং ভূ-উপরিস্থ যাতায়াত অবকাঠামো গড়ে তোলা কোনোক্রমেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এসব সেবার বিকাশের জন্য বিপুল অর্থ লগ্নি করা প্রয়োজন। এই মুহূর্তে ঢাকাবাসীর পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে ডেসা, ওয়াসা ও তিতাস গ্যাসের মতো প্রতিষ্ঠান গড়পড়তা চল্লিশ ভাগ সিস্টেম লসের শিকার। ফলে এসব সেবার মান বজায় রাখা যেমন কঠিন হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে যে জরাজীর্ণ ব্যবস্থাটি আছে, তাও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ঢাকার মেট্রোপলিটন গভর্ণেন্সে বিশাল গুণগত পরিবর্তন না আনলে যে কোনো দিন ঢাকা নগরী মুখ থুবড়ে পড়বে। এমনকি, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর মতো এটি একটি পরিত্যক্ত নগরীতে পরিণত হতে পারে। ঢাকার নাগরিক জীবনকে যাপনযোগ্য করার জন্য সরকারী-বেসরকারী ও কমিউনিটির পক্ষ থেকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

একবিংশ শতাব্দীতে ঢাকা নগরীর মৃত্যু যাতে না ঘটে তার জন্য এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন– পরিবেশগত দূষণ রোধের জন্য পরিবেশ দূষণের মূল্য ধার্য করতে হবে। পান করার পানি যদি নিরাপদ না হয়, তাহলে এই অনিরাপদ পানি পান করার ক্ষতির পরিমাণ কতো? ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় পানিজনিত ভগ্ন স্বাস্থ্যের ব্যয় বার্ষিক ৩শ' মিলিয়ন ডলার। ব্যাংককে বার্ষিক মৃত্যুর ৬ ভাগ পানিবাহিত রোগ, যেমন– আমাশয়, টাইফয়েড, এনসেফালাইটিস, পোলিও টাইফাস এবং মারাত্মক উদরাময়ে কারণে ঘটে থাকে। ধূলি ও সিসা দূষণের পরিণাম কী? এর ফলে ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর ও জাকার্তার দশভাগ আয় বিনষ্ট হয়ে যায়। নগরীর বাতাসকে দূষণমুক্ত করলে কী সুবিধা হতে পারে? মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের নগরীগুলো ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত নগরীগুলোর বায়ু নির্মলতার মানে পৌঁছুতে পারেনি। যদি তা করা সম্ভব হতো, তাহলে কমপক্ষে ১৮ হাজার অপরিণত বয়সের মৃত্যু এড়ানো সম্ভব হতো এবং বার্ষিক ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের কাজের সময় বাঁচানো সম্ভব হতো। পৃথিবীর

www.pathagar.com

২০টি বড় শহরের মধ্যে কায়রোর বায়ু বিষাক্ত ধোঁয়া ফলে সবচেয়ে বেশী দূষিত। প্রতিবছর যেখানে ৪ থেকে ১৬ হাজার ব্যক্তি কলকারখানা নির্গত ধোঁয়া, যানবাহনের নির্গত ধোঁয়া, আবর্জনা পোড়ানোর ধোঁয়া প্রভৃতি বিষাক্ত ধোঁয়ার ফলে মৃত্যুবরণ করে। ব্যাংককে ট্রাফিক জ্যামের ফলে কমপক্ষে বার্ষিক ৪শ' মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়। দিনের ব্যস্ত সময়ে যানবাহনের গতি শতকরা ১০ ভাগ বাড়াতে পারলে এই ক্ষতি পরিহার করা সম্ভব।

এতো গেলো ঢাকা ছাড়া পৃথিবীর আর কয়েকটি শহরের অবস্থা। কিন্তু নানাবিধ দূষণের ফলে ঢাকার নাগরিক জীবনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতো, তা আজো হিসাব-নিকাশ করে দেখা হয়নি। দূষণের মাত্রা কমানোর জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন– যানবাহনে ব্যবহৃত জ্বালানির উপর সিসার পরিমাণভেদে আরোপিত করের হারে তারতম্য বিধান, মোটর গাড়ির জন্য ব্যবহৃত জ্বালানিতে সর্বোচ্চ সিসার মান নির্ধারণ করে দেয়া, দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট ইঞ্জিন নিরুৎসাহিত করা, পুরানো গাড়ীর উপর করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা কিংবা সরকার নিজেই এ ধরনের ক্ষতিকর যানবাহন ভেঙে ফেলার জন্য ভর্তুকি দিতে পারে। কিংবা পরিচ্ছন্ন যানবাহন সংগ্রহ করার জন্য ভর্তুকি দেয়া যেতে পারে। গোটা নগরীতে যতো যানবাহন চলাচল করে, তার মধ্যে বাস-ট্রাক ও ট্যাক্সির সংখ্যা কম হলেও দূষণের দিক থেকে এগুলোর প্রভাব বেশী। কারণ এগুলো ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়। সুতরাং নীতিনির্ধারকরা এ ধরনের যানবাহনের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। শহরের গরীবদের প্রতিও নজর দেয়া প্রয়োজন। এই গরীবরা বসবাস করে বস্তিতে। বস্তির বিদ্যুৎ সরবরাহ অনির্ভরযোগ্য। পানি সরবরাহ নেই বললেই চলে। পথঘাট অপরিসর, কর্দমাক্ত। বস্তির এখানে সেখানে উন্মুক্তভাবে আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। দারিদ্র্যের ভারে বস্তির মানুষগুলো ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। শহরের গরীব মানুষরা অত্যন্ত উদ্যমী এবং তাদের সৃজনশীল প্রয়াসের জুড়ি নেই। জীবনযাত্রাকে মসৃণ করার জন্য তারা যেসব উদ্যোগ নেয়, তার সামনে যেসব বাধার বিন্ধাচল পরিলক্ষিত হয়, তা এককভাবে তাদের কারোর পক্ষেই সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। সুতরাং সমাজ তাদের সর্বোত্তম অবদান থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তাদের দারিদ্র্য ও দুরবস্থা আরো প্রকট আকার ধারণ করে এবং তাদের জীবন নিরাশার দিগন্তে নির্বাসিত হয়। তাদের জীবনে একটু শান্তি ও সুবিধা আনয়নের জন্য রাষ্ট্রের উদ্যোগ সামাজিক উপযোগিতার বিচারে নিরর্থক হবে না। শহরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পানি সরবরাহ পায় না বলেই পানি নিয়ে জমজমাট ব্যবসা হয়। ছোট চাকার ওপর পাতবসানো গাড়িতে ড্রাম ভর্তি পানির পসরা সাজানো হয়। ক্ষেত্রবিশেষে সরকারী পানি সরবরাহের সুবিধার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ব্যক্তিগত ব্যবসা জমজমাট হয়ে ওঠে। একশ্রেণীর স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহে কারচুপি করে ফুলেফেঁপে উঠছে। এদের ট্রেড ইউনিয়নগুলো অশুভ ক্ষমতার অধিকারী। এসব কায়েমী স্বার্থবাদীদের চিরতরে রুখে দিতে হবে। ক'দিন আগে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ঢাকায় মনোরেল চালু করার এক উচ্চভিলাষী পরিকল্পনা উন্মোচিত করা হয়। কিন্তু তার কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এই পরিকল্পনার মারাত্মক ত্রুটিবিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে এ সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা পরিহারের দাবী জানায়। ঢাকা নগরীর অবধারিত মৃত্যুকে পরিহার করতে হলে এখনই বিশেষজ্ঞ এবং জনগণের সকল স্তরের দায়ভোগীদের নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ঢাকার নাগরিক জীবনে সন্ত্রাস ঢাকার মন ও মানস জগতকেও প্রচণ্ডভাবে আড়ষ্ট করে দিয়েছে। এখানে কলকাতার কফি হাউসের মতো উঁচুমানের আড্ডার আসর কল্পনাই করা যায় না। ঢাকার পার্কগুলো দেহপসারিণী ও ছিনতাইকারীদের স্বর্গ। সেখানে ভদ্রলোকের কোনো ঠাঁই নেই। সুতরাং সুস্থ সংস্কৃতিরও বিকাশ হচ্ছে না। ঢাকার সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে এক ঐশ্বর্য বিলাস আছে, কিন্তু মনোজগতের উৎকর্ষ চর্চা নেই। ঢাকায় বিআইডিএস-এর মতো একটি সম্পদশালী গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেখানে

www.pathagar.com

মৌলিক গবেষণা কমই হয়ে থাকে। যা কিছু হয়, তার বেশিরভাগটাই ফরমায়েশী। তাই ঢাকা আজ একদিকে যেমন দেহসজ্জার দিক থেকে ম্লান, অন্যদিকে আত্মার সম্পদ-সম্ভারেও দরিদ্র। এ রকমটি চলতে থাকলে একটি প্রাণবন্ত রাজধানী কখনোই গড়ে উঠবে না। আগামী নির্বাচনকে উপলক্ষ করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঢাকা নগরী ও এর নাগরিক জীবন সম্পর্কে কর্মসূচী আকারে জনগণের কাছে কী পেশ করবে তা দেখার অপেক্ষায় আছি। শুধুমাত্র যানজট নিরসন করা হবে, স্কুল-কলেজ, হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে, আবাসনের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে– এ জাতীয় প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা যে অতীতের আর দশটা প্রতিশ্রুতির মতো বাকসর্বস্বতায় পর্যবসিত হবে তাতে সন্দেহ নেই। বলতে হবে– কখন, কোথায়– কিভাবে এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হবে।

আফতাব আহমাদ :

ঢাকা আমাদের রাজধানী। ঢাকা একটি জাতি রাষ্ট্রের রাজধানী। কেউ ঢাকাকে বলে 'তিলোত্তমা ঢাকা', আবার কেউ বলে 'রূপময়ী ঢাকা'। যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, ঢাকা নিঃসন্দেহে ত্যাগ, শৌর্য ও বীরত্বের জন্য অহংকার করতে পারে। ঢাকার বাসিন্দারা যে ইতিহাস রচনা করেছেন, দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের আর কোন শহরের বাসিন্দারা এমনি গৌরবদীপ্ত ইতিহাস রচনা করতে পারেননি। এক সময়ে বলা হত, ঢাকা একটি শহর। কেউ কেউ বলত ঢাকা একটি নগরী। আবার একাত্তরের পর ঢাকাকে সমীহ করে মহানগর আখ্যায়িত করা হয়। অধুনা অনেকেই ঢাকাকে মেগাসিটি বলে অভিহিত করতে চান। যে নামেই ঢাকাকে অভিহিত করা হোক না কেন, আধুনিক অর্থে ঢাকা না শহর, না নগর, না মহানগর-মেগাসিটি তো দূরের কথা। নামের সার্থকতাকে প্রতিপন্ন করে ঢাকা আসলে একটি অবগুণ্ঠিত জনপদ বা লোকালয়। এখানে শুধু জলাবদ্ধতা বা পয়ঃনিষ্কাশনের সমস্যাই প্রকট নয়, বায়ুবদ্ধতাও একটি বিরাট সমস্যা। এ লোকালয়ের মানুষ বহুকাল ধরে মুক্তবায়ু সেবনের ন্যূনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নগরায়নের সার্থকতা ও সুফল মনে হয় ইচ্ছাকৃতভাবেই এখানে অনুপস্থিত। অথচ, আয়তনে এ জনপদ ক্রমান্বয়ে স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে চলেছে। বিশাল বপুর এই লোকালয় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় যেভাবে হাসফাঁস করছে তার পরিণতি যে দ্রুত মৃত্যু, তা বলাই বাহুল্য। প্রকৃত প্রস্তাবে এখানকার বাসিন্দাদের যাপিত জীবন জীবন্মৃতের জীবনেরই তুল্য। একটি বিশাল গ্রামে, কয়েকটি আকাশচুম্বী ইমারত ও বিদ্যুতের ঝলকানিতে নগর বা মহানগরের আকার ধারণ করে প্রাচ্যের সকল অর্জন ও সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করছে বললে অত্যুক্তি হবে না। রাজধানী ঢাকার নামটি এমনই সার্থক। নগরায়নের যে প্রভাব সংঘবদ্ধ জীবনে পড়ে এবং রুচি-রীতিসহ গোটা সাংস্কৃতিকে যেভাবে বিনির্মাণ করে, তার কোন প্রতিফলন আমরা ঢাকার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি না। একটি পশ্চাৎপদ গ্রাম থেকে উন্নততর একটি গ্রাম, যা একটি বিরাট হাট বা গঞ্জে পরিণত হয়েছে, সেখানে মানুষ মাথা গোঁজার জন্য ছুটে আসছে। এখানে সুস্থ জীবনের কোন উপকরণ আছে কি নেই, তা বিচার্য নয়। গ্রামীণ জীবনের একঘেয়েমি, প্রত্যক্ষ ও ছদ্মবেকারত্ব থেকে মুক্তির আশায় পেশার বিভিন্নতায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারার উৎসাহে মানুষ 'নিষ্ফলা' গ্রাম ছেড়ে বৃহত্তর গ্রাম যা বিরাটাকারের হাট বা গঞ্জ, ঢাকা নামক সেই লোকালয়ের দিকে ছুটে আসছে।

কোন পরিকল্পনা প্রেক্ষাপট ও পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াই ঢাকা নামক লোকালয়টি এবড়োথেবড়োভাবে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। বর্ধিত হয়ে চলেছে। স্বাস্থ্যসেবা, অনাময় ব্যবস্থা, শিক্ষার সুযোগ, হৃৎবৃত্তির তৃষ্ণা নিবারণের উপায়– কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে বিবেক-বুদ্ধিহীন জড় প্রাণীর জীবন নিশ্চিত করার স্থূল দর্শনই এই গঞ্জে বসতির একমাত্র আরাধ্য কাম্য। পরিশীলিত জীবন, সংস্কৃত জীবন, নৈতিকতার জীবন, সুরুচি ও শ্রেয়বোধের জীবন ঢাকা নামক জনপদে

www.pathagar.com

আমজনতা কখনও ভাবতে পারে না। স্বাধীন সুলতানদের হাত ঘুরে মোগল শাসনের একদা প্রধান ঘাঁটি হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা ঢাকা-ই থেকে গেছে, মুক্ত বিহঙ্গের প্রাণ কখনও পায়নি। ব্রিটিশদের হাত ধরে পাকিস্তানের ওপর ভর করে ঢাকা যদিও অবশেষে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজধানীতে পরিগণিত হয়েছে, তবু তার শ্রী বৃদ্ধি না পেয়ে আরও বিশ্রী হয়েছে, কদর্য হয়েছে।

নাগরিক সুযোগ-সুবিধার সুষম বিস্তার ও বন্টন এখানে অনুপস্থিত; ক্ষেত্রবিশেষে বৃহদাংশকে বঞ্চিত করে ক্ষুদ্রাংশকে অধিকতর সুবিধা করে দিয়ে এ জনপদ মানুষে মানুষে বৈষম্যের যে প্রাকার নির্মিত করেছে তাতে মানুষের সব মানবিক গুণাবলী শুধু পর্যুদস্তই নয়, নির্বাসিত হওয়ারও উপক্রম হয়েছে। ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরায় কেউ বলেন ঢাকা বিক্ষোভের শহর, কেউ বলেন ঢাকা মিছিলের শহর, কেউ বলেন ঢাকা পাগলপারা মানব-জোয়ারের শহর, কেউ বলেন ঢাকা রাতকানা অন্ধ-খঞ্জদের শহর, কেউ বলেন সাহসবিস্তৃত বক্ষপটে পুষ্পের মতো বুলেটকে বরণ করে নেয়ার মতো সাহসী সন্তানদের শহর ঢাকা। আবার কেউ বলেন ক্ষমতার পাদপ্রান্তে এক মুষ্টি খুদ-কুঁড়োর জন্য মাথাকুটে আত্মা বিক্রয় করে দেয়ার তীব্র প্রতিযোগিতার শহর এই ঢাকা। যারই শহর হোক না কেন, এই শহরের মানুষ হাসে, কাঁদে, ঈদে নতুন জামা গায় দেয়, বস্তিতে ভাড়া করা ছাপড়াতে নতুন করে উঠতে গেলেও আল্লাহ-রাসূলের নাম নেয়, মিলাদ পড়ায়। ধর্মচর্চা যথাবিহিতভাবে করতে পারুক আর না পারুক ধার্মিকতা বজায় রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা ও প্রতিযোগিতায় এ শহরের মানুষগুলো নিয়োজিত। সবকিছুই যেন এ মানুষগুলো সম্পাদন করে যন্ত্রের নিয়মে। যান্ত্রিকতার যুপকাষ্ঠে মানুষের সকল সৃজনীক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে আত্মবিনাশী কৃত্রিমতা ও কপটতা অক্টোপাসের মতো মানুষের চিন্তার সকল প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেছে। পাপী যেমন ধর্মগ্রন্থ হাতড়ে পাপ স্খলনের মন্ত্র কিংবা সহী পথ খুঁজে নিতে চায়, এ শহরের মানুষগুলোও তেমনি অনুতাপ-অনুশোচনা ছাড়াই নানান বোল ও ভোলের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠাকে শ্রেয়তর গণ্য করে। এখানে তাই জীবনের অর্থ ইতর ভোগবাদ। জীবনের অর্থ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়া। জীবনের অর্থনীতি-নৈতিকতার বালাই খুইয়ে জৈবিক তাড়নায় কর্মস্পৃহাকে উদ্বুদ্ধ করা। তাই, ঢাকা নামক এই শহরে কেউ নান্দনিক জীবনের প্রয়োজনটা কখনও অনুভব করতে পারেনি। স্থূল বর্তমান এবং নোংরা অতীতের পঙ্ককে অবলম্বন করে যে জীবনের বিকাশ, যে জীবনকে অর্থবহ ও মনুষ্যকুলের কল্যাণার্থী করার জন্য পরিমার্জিত ও পরিশীলিত অবয়ব অর্জনে যে জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধির লালন অত্যাবশ্যক, তা এ শহরের মানুষ বোধহয় ভুলেই গেছে। হয়তোবা একদা এসবের চর্চা ছিল, এসবের প্রতি আগ্রহ ছিল; কিন্তু আজ এ সবকিছুই অবজ্ঞা ও উপেক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ঢাকায় একসময়ে কাওয়ালী ও কাসীদা শোনা যেত। এ এখন এক বিস্মৃত অতীতের কথা। ঢাকার মল্লযুদ্ধ ও কুস্তি প্রতিযোগিতা কিংবদন্তীসম ছিল। আজ তা হারিয়ে গেছে। নৌকাবাইচ আর তাজিয়ার মিছিল– সেই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আর নেই– সরকারী উদ্যোগে মাঝেমধ্যে যান্ত্রিকভাবে এসব করার চেষ্টা যে হয় না, তা নয়। কিন্তু এ নেহায়েতই একটি প্রহসন। এক সময়ে মানুষ আগ্রহী পাঠক ছিল, পাঠের এ রুচি পাঠাগার আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল। আজ পাঠাগার আন্দোলন নেই। পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় পাঠাগার গড়ে ওঠার পরিবর্তে মাদক সেবনের আড্ডা গড়ে উঠছে। নাগরিক জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব এবং পাঠাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা আমাদের মানুষেরা যেভাবে ভুলতে বসেছে, তাতে ভবিষ্যতে যে ধস নামবে তা সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবে। সংবাদপত্র হকারদের ডালির মধ্যে রঙবেরঙের, নানা বর্ণের 'চিত্তাকর্ষক' পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী বিক্রি হতে দেখা যায়। কিন্তু এসবকিছু আমাদের রিপুকে ইতরতার দিকে তাড়িত করে। আমাদের মধ্যকার সুন্দর ও সুপ্রবৃত্তিকে এগুলো বিকশিত করে না। এ এক সামাজিক ব্যাধি। একদা ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসার নাম সারা উপমহাদেশে মশহুর ছিল। এখন অনাদর, অবজ্ঞা, উপেক্ষা এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তার অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে– যে কোন

www.pathagar.com

বিদ্যমনস্ক ব্যক্তি তা উপলব্ধি করবেন। জগন্নাথ কলেজ, যে কলেজে খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান, প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমান, অধ্যাপক অজিত গুহ- এঁদের মত গুণীজনরা জ্ঞান বিতরণ করতেন সেই জগন্নাথ কলেজ পতিতালয়ের দালাল-মাস্তান তিব্বতদের আখড়ায় পরিণত হয়। এ কেমন করে সম্ভব হল? মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অধঃপতনই যে এর জন্য মূলত দায়ী, তা বলাই বাহুল্য। ১৯৭১-এর পর ঢাকা একদিকে একটি বিভক্ত লোকালয়, আরেকদিকে একদেহী যমজ লোকালয়ে পরিগণিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের অভিঘাতে দূতাবাস ও দাতাগোষ্ঠীর কর্মচারীদের তৎপরতায় ভোজবাজির মত ঢাকার এক ধরনের প্রসাধনী পরিবর্তন ঘটেছে। অন্তঃসারশূন্য এই পরিবর্তনে পরাশ্রয়ী, পরজীবী সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে ঢাকার যে রূপান্তর ঘটেছে, তা এই লোকালয়কে একটি কিম্ভূতকিমাকার প্রতিবন্ধী লোকালয়ে পরিণত করেছে। এখানে প্রাপ্তিযোগ্য মুখ্য। ফলে সুনীতি, সুবচন, সুশিক্ষা ও সুশীল জীবন এখানে প্রধান ক্যাজুয়ালটি। লোকসংস্কৃতির আড়ালে কিংবা আটপৌরে বাবু সংস্কৃতির ছদ্মবরণে, ধার্মিকতার লেবাসে কিংবা বাঙালীপনার ভড়ংয়ে আধুনিকতার অনাচার, অযাচার- কোন কিছু করতে এ শহরের বাসিন্দা এখন কুণ্ঠাবোধ করে না। বনানী, গুলশান, বারিধারা, বসুন্ধরা- এখানকার জীবন, জীবনের মান, এখানকার রুচি এবং এখানকার ভোগের ধরন যদি আমরা বিচার করি, তাহলে বুঝতে হবে এখানকার বাসিন্দারা ভিন্ন কোন গ্রহের বাসিন্দা; যাদের সঙ্গে নারিন্দা, আরমানিটোলা, ইসলামপুর, মালিটোলা, ওয়ারী, হাটখোলা কিংবা ধানমন্ডির বাসিন্দাদের সঙ্গেও কোন তুলনা সম্ভব নয়। আমাদের এখানে এখন জন্ম নিয়েছে অসংখ্য নামগোত্রহীন ক্লাব-সংস্কৃতির গেস্টহাউস সংস্কৃতি এবং মধ্য নিশিথে উদোম-নৃত্য উপভোগ ও মাদকসেবনের এক লাগামহীন নেশা। দুস্থ, সম্পদহীন, নির্ধন মানুষের পাশাপাশি রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে আমাদের সকল শিল্পকলা, চিন্তা ও বিদ্যার কুৎসিত ঠিকাদার হিসেবে সমাজে যাদের আস্ফালন লক্ষ করি, এরা সমাজদেহে ক্যান্সারসম। এরা আমাদের জীবনাচারকে বেলেল্লাপনার যুপকাষ্ঠে বলি দিতে চায়- কারণ, এরই নাম 'আধুনিকতা', 'প্রগতি'। এরই নাম 'লিবারেশন'। আধুনিকতা, প্রগতি ও লিবারেশনের নামে যে অসুস্থতা ও বিকৃতি আমাদের খাবলে খাচ্ছে, তার প্রধান কারণ, আমাদের সমাজে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার আজ উপেক্ষিত। পাঠ্যাভ্যাস নির্বাসিত। শিক্ষায়তন ধ্বংসপ্রাপ্ত। ভৌত কাঠামো ও পৌর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি চিত্ত ও প্রবৃত্তির পরিমার্জনা, পরিশীলন ও উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করা যদি না যায়, তাহলে একটি পূর্ণতর সমাজের বিকাশ অসম্ভব। নগরায়ন অর্থহীন। সংঘবদ্ধ জীবন আত্মহননের নামান্তর। আমাদের পরিবারগুলো যে টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে, তা কি শুধু অর্থ কষ্ট, অর্থনৈতিক মন্দা এবং সম্পদের অভাবের কারণেই? কোথায় সেই চিরন্তনী স্নিগ্ধ প্রশান্তির নীড়? ভাই-বোন, বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী সকলে মিলে যে যৌগ জীবনে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, তাতে যে চিড় ধরেছে, আজ তার পেছনে নগরায়নের নামে, আধুনিকতার নামে, প্রগতির নামে, সেকুলারিজমের নামে শূন্যগর্ভ বিকাশই দায়ী। পরম স্রষ্টার কাঙ্ক্ষিত বৈষম্যরহিত একটি ন্যায়ানুগ সমাজের পরিবর্তে আমরা তাকে অস্বীকার করে স্থূল ভোগবাদ এবং ইতর বস্তুবাদকেই জীবনের একমাত্র পাথেয় ও কাম্য বলে বেছে নিয়ে যে দ্বৈত ও যমজ সমাজের জন্ম দিয়েছি এই রাজধানী ঢাকায়, সে সমাজ টেকসই হতে পারে না। বেশী দিন টিকতে পারে না। এখনও সময় আছে, এই ধস ঠেকাতে হলে নীতিবোধ ও নৈতিকতা প্রতিপালনে যেসব প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য, সেগুলো যেমন অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে, তেমনি জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য যথোচিত গ্রন্থাগার ও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আমাদের অধিকতর যত্নবান হতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

২৫ জানুয়ারী ২০০১

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও প্রতারিত জনগণ

মাহবুব উল্লাহ :

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত 'Little Data Book-2000' অনুসারে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৫৯ বছর। সন্তান ধারণক্ষম নারীরা গড়ে ৩ জন সন্তান জন্মদান করে। প্রতি হাজার জন্মধারণকারী শিশুর মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার ৭৩। ৫ বছর বয়সে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই প্রতি হাজারে ৯৬টি শিশু মৃত্যুবরণ করে। এসব ১৯৯৮ সালের তথ্য। ১৯৯৭ সালে ৫ বছর বয়সের শতকরা ৫৬ জন শিশু ছিল অপুষ্টির শিকার। একই সময়ে গ্রামাঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটার চাষযোগ্য জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ ছিল ১২০৪ জন। ১৫ ও তদুর্ধ্ব বয়সের পুরুষদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার শতকরা ৪৯ এবং মহিলাদের মধ্যে এই হার শতকরা ৭১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার বয়সী শিশুদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন স্কুলে যায়। মাধ্যমিক পর্যায়ে এই হার শতকরা বাইশে নেমে আসে। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন ৩৫০ ডলার। বাংলাদেশ বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর একটি। একটি দেশ যখন অনুন্নত থাকে, তখন এর মাথাপিছু আয় যেমনি থাকে কম, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এর সাফল্যও থাকে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। স্বাধীনতার ৩০ বছর পরে শিক্ষা ও সামাজিকক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি খুব সামান্য। তৎসত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মহলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য প্রশংসা অর্জন করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ষাটের দশকে শতকরা ৩.০০ থেকে বর্তমানে শতকরা ১.৬ ভাগে নেমে এসেছে। সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। স্বাধীনতার পর এদেশের মানুষ প্রলয়ঙ্করী বন্যা, সাইক্লোন ও দুর্ভিক্ষের মত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার অদম্য প্রয়াস চালিয়েছে। ১৯৭৪- এ যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সেই দুর্ভিক্ষে সরকারী হিসাব মতে, সাড়ে ২৬ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ঢাকার রাজপথ বেওয়ারিশ লাশে ছেয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহের সৎকার করতে গিয়ে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামকে হিমশিম খেতে হয়েছে। এই সংস্থাটি গরীব ও দুস্থ মানুষের সেবার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছে। ১৯৭৪-এ দেশে, বিশেষ করে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উপর্যুপরি তিন বার বন্যা হয়েছিলো। পরপর তিনবার বন্যার পানিতে ফসলের মাঠগুলো ডুবে যাওয়ার ফলে কৃষকরা চাষাবাদ করতে পারেনি। আমরা ইদানীংকালে লক্ষ্য করছি, একবার বন্যা হলে এবং বন্যার পানি যদি দুই সপ্তাহের মধ্যে নেমে যায় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ফসলের মাঠে আবারও চাষাবাদের প্রয়াস পায়। এ জন্য কৃষকদের বীজধান ও প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ সরবরাহ করতে হয়। ১৯৭৪-এ একদিকে ছিল উপর্যুপরি বন্যার ছোবল, অন্যদিকে সরকারের কোষাগার শূন্য থাকার ফলে কোন প্রকার কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া সে সময়ে একবার ফসল ধ্বংস হলে পুনর্বার চাষাবাদ শুরু করার প্রযুক্তিও জানা ছিল না। গ্রামের দিনমজুর ও ক্ষেতমজুররা, যাদের মেহনত বিক্রি করা ছাড়া আয়ের কোন বিকল্প থাকে না, তাদের হাতে সে সময়ে কোন অর্থই জোটেনি। একদিকে যেমন ছিল না রোজগার, অন্যদিকে উদর ছিল শূন্য। অনাহার অপুষ্টি, অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণের ফলে হাজার হাজার মানুষ অনিবার্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দু'মুঠো খাবারের আশায় বহু নিরন্ন মানুষ মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ঢাকা শহরের দিকে আসতে

www.pathagar.com

শুরু করে। এদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত ঢাকা পৌঁছুতে পারেনি, পথিমধ্যেই অনাহারে, অবহেলায় প্রিয়জন, স্বজনদের কাছ থেকে অনেক দূরে অজানা স্থানে মৃত্যু বরণ করে। এই ট্র্যাজেডি ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। বেসরকারী হিসাব মতে, মৃতের সংখ্যা ৩ লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছেল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের জন্য দুর্যোগকবলিত মানুষের স্বাত্বাধিকারের ব্যর্থতাকে দাবী করেছেন। সহায়-সম্পদহীন মানুষ একমাত্র দৈহিক শ্রম বিক্রি করেই যে মজুরি পায়, সেটাই প্রয়োজনীয় খাবার কেনার জন্য ব্যয় করে। তাই কাজ না জুটলে খাবারও জোটে না। খাবার না জুটলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। এরকম দৈহিকভাবে দুর্বল মানুষকে কেউ কাজও দিতে চায় না। কাজ না থাকার ফলে রোজগার না হলে অপুষ্টি ও নানা ধরনের মরণব্যাধি দেহের মধ্যে স্বাভাবিক আশ্রয় গড়ে তোলে। ফলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। অমর্ত্য সেনের দুর্ভিক্ষের ব্যাখ্যাটি অতি সহজ। এর জন্য উচ্চ মার্গের অর্থনীতি বোঝার প্রয়োজন নেই। তবু অমর্ত্য সেন তার এই সহজ-সরল ব্যাখ্যাটির জন্যই বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

ছোটবেলায় পড়েছি, অন্ন চাই, চাই নির্মল বায়ু। চাই পরমায়ু। একটি জাতির পরমায়ু বৃদ্ধি সে জাতির সুস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ২৬ বছর থেকে আজ ৫৯-এ পৌঁছেছে। আপাত দৃষ্টিতে এটি বিরাট সাফল্য, সন্দেহ নেই। তবে নিছক বেঁচে থাকাটাই সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। বিজ্ঞানের অবদানের ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, তার ফলে এখন অনেক মারাত্মক ব্যাধি নিরাময়কারী ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। এন্টিবায়োটিকের আবিষ্কার চিকিৎসাশাস্ত্রের এক বিস্ময়কর অগ্রগতির নির্দশন। এন্টিবায়োটিক বহু প্রাণসংহারকে ব্যাধি থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখছে। কিন্তু ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকাটাই সত্যিকার অর্থে সুস্থ ও প্রাণবন্ত থাকা নয়। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতা, জীবনযন্ত্রণা, জটিলতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও টেনশনের ফলে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও স্ট্রোকের মত মারাত্মক ব্যাধি সমগ্র জাতিকে কর্মদক্ষতাহীন করে তুলছে। ডায়াবেটিসের মত ব্যাধিও আজ কেবল অবস্থাপন্ন মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; সদ্যজাত শিশু থেকে অল্প বয়সী মানুষ; এমনকি রিকশাচালকদের মত কঠোর পরিশ্রমকারী মানুষও এই রোগের শিকার। ঢাকার বারডেম হাসপাতালটি প্রতিদিন শত সহস্র ডায়াবেটিস রোগীর ভিড়ে গিজগিজ করে। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ মনোরোগে আক্রান্ত। টেনশন থেকে শুরু করে স্রিজোফ্রিনিয়ার মত মারাত্মক মানসিক ব্যাধি আজ অনেকেরই নিত্যসঙ্গী। রিল্যাক্সেন, ক্লোবাজাম, এমিট্রিপট্রিলিন, আলপ্রাজোলাম ও প্রোলার্টের মত মানসিক ব্যাধিনিরাময়কারী ওষুধের বিক্রয়ের পরিমাণ বলতে গেলে আকাশের যত তারা প্রায় তার সমান। বহুলোক এখন গ্যাসট্রাইটিস ও পেপটিক আলসারের মত রোগে আক্রান্ত। কোন না কোন সময়ে এন্টাসিড ট্যাবলেট চুষে খাচ্ছে না এমন লোক কমই পাওয়া যায়। এছাড়া ক্যান্সার ও স্বায়বিক ব্যাধির মত মারাত্মক রোগও দিনে দিনে বাড়ছে। আমরা প্রায়শই বলে থাকি, নিরাময় অপেক্ষা প্রতিরোধই কাম্য– অথচ ভেজাল খাদ্য, দূষিত পরিবেশ, জীবনযাপনে অনিশ্চয়তা, আইন-শৃংখলা ভেঙে পড়া ও স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টিহীনতা প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত করে রাখছে। এর ফলে জাতির কর্মশক্তি ও কর্মোদ্যম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসব বিষয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহল কতটা সিরিয়াসলি ভাবেন, সে নিয়ে সন্দেহ আছে। এক সময় মনে হয়েছিল, গ্রামে গ্রামে নলকূপ স্থাপন করে পানিবাহিত রোগ থেকে আমরা প্রায় মুক্ত হয়েছি। কিন্তু যেভাবে ভূগর্ভস্থ পানি আর্সেনিক দূষণে বিষাক্ত হয়ে পড়েছে, তার ফলে গোটা জাতি অবধারিতভাবে নিশ্চিহ্ন হবার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বলে অনুভবই করা যায় না। এদেশে মাথার উপর বাজ না পড়া পর্যন্ত আমরা কোন কিছুকেই গুরুত্ব দিতে চাই না।

www.pathagar.com

সকল প্রকার বঞ্চনা, অবিচার, অনাচার মুখবুজে সহ্য করাটাই জাতীয় মানসিকতার স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধীর অথচ নিশ্চিত মৃত্যু আমাদের উদ্বিগ্ন করে না। অন্যদিকে একটি সুষ্ঠু স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের জন্য তেমন কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেই। এরশাদের আমলে একটা ওষুধ নীতি হয়েছিল, ঐ নীতিটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এরশাদের অনেক অজনপ্রিয় কাজের মধ্যে এটি একটি ভাল কাজ ছিল। ক'দিন আগে বর্তমান সরকারও একটি স্বাস্থ্যনীতির ঘোষণা দিয়েছেন। সরকারী হাসপাতালের ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিস না করলে ননপ্র্যাকটিসিং অ্যালউন্স পাবেন বলে এই নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটা কী করে কার্যকর করা হবে, সে সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ছোট-বড় শহরে অনেক প্রাইভেট ক্লিনিক গড়ে উঠেছে। সরকারের চাকরিতে নিয়োজিত ডাক্তাররাই এসব ক্লিনিকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে কাজ করেন। একদিকে দিনভর হাসপাতালের কাজ, আর অন্যদিকে গভীর রাত পর্যন্ত ক্লিনিকে রোগী দেখতে গিয়ে এরা নিজ পেশার প্রতি কতটুকু সুবিচার করতে পারেন, তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রোগীদের অভিযোগ, তাদের শারীরিক কষ্টের কথা ডাক্তাররা মনোযোগ দিয়ে শোনেন না, প্রাথমিকভাবে ক্লিনিক্যাল এগজামিনেশনের জন্য ডাক্তার সময় দেন না এবং একগাদা ডায়গনস্টিক টেস্টের পরামর্শ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেন। বস্তুত এতসব টেস্টের প্রয়োজন আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। যাদের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া হবে, তারাও ঘুষ খেয়ে সত্যিকার তদারকির কাজটা এড়িয়ে যাবে। সব মিলিয়ে, আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এক দুষ্টচক্রের মধ্যে নিপতিত।

দেশে যেসব ওষুধ তৈরী হয় সেগুলোর রোগ নিরাময় ক্ষমতা ও মান নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শুনেছি, এ দেশের একটি বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানী, যার মালিকরা ঋণখেলাপি হিসেবে প্রচুর 'সুনাম' অর্জন করেছেন– তারা একবার অবরোধ কবলিত ইরাকে ওষুধ রফতানী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইরাকের মত একটি দুর্যোগ কবলিত দেশ সেই ওষুধ আমদানী করতে রাজি হয়নি। কারণ, গুণ ও মানের পরীক্ষায় এদের ওষুধ উত্তীর্ণ হতে পারেনি। সে কারণে অনেক চিকিৎসক বিদেশী ওষুধ তাদের প্রেসক্রিপশনে লিখে থাকেন। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান বা সুইজারল্যান্ড থেকে আমদানী করা ওষুধ কিনতে গিয়ে অনেক রোগী সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। আর এরই সুযোগে এসব ওষুধেরও চোরাচালান বাড়ছে। ভারত থেকে সীমান্ত পথে নিম্নমানের ওষুধ আমদানী হয়ে আসছে। প্রতিবছর হাজার হাজার রোগী চিকিৎসার জন্য ভারত, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় যায়। আমাদের দেশে একটি বিত্তবান শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যারা দেশীয় চিকিৎসায় আস্থাহীন। কিন্তু দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার যা হাল তাতে ওদের খুব একটা দোষ যায় না। আমার নিজের একটি অস্ত্রোপচারের জন্য আমার বন্ধুরা বিদেশে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি যাইনি। কারণ, আমার সাধ্য ছিল না। দেশে অস্ত্রোপচার করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি, তা কিন্তু নয়। প্রতিবছর কোন কোন হিসাব মতে, পাঁচ শতাধিক কোটি টাকা বিদেশে চিকিৎসার জন্য ব্যয় হয়। অথচ বৈদেশিক মুদ্রায় এই টাকাটা দেশে বিনিয়োগ করলে এবং হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে উন্নত করতে পারলে এখানেও সুচিকিৎসা দেয়া যেতে পারে। অনেক সময় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে রোগীবিশেষের পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। একটি চমৎকার মেডিকেল ইন্সুরেন্স সিস্টেম গড়ে তুলতে পারলে এই সর্বনাশা অবস্থা থেকে অনেক পরিবারই রেহাই পেত। আমাদের পুঁজিপতিরা সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে কেউ কেউ ঋণের টাকায় গত দু'ছরে এক ডজনেরও বেশী ব্যাংক স্থাপন করেছে। অন্যদিকে ঝিনাইদহের হুন্ডি কাজল ও এ জাতীয় কিছু মানুষ জনগণের কাছ থেকে শত শত কোটি টাকা

www.pathagar.com

নিয়ে বেআইনি ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে বহু মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। হুন্ডি কাজলদের মত মানুষদের কোন শাস্তি হয়নি। মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সের মত একটি উচ্চ চাহিদার লাভজনক ইন্স্যুরেন্স প্রজেক্ট লোকজন হাতে নিচ্ছে না, তা একমাত্র এ দেশের অসুস্থ পুঁজিবাদের কারণেই। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করেও অনেক রোগের ব্যাপকতা হ্রাস করা যায়। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় রোগ-ব্যাধি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনার ফলে মানুষের রোগ সচেতনতা বাড়ছে। বাড়ছে চিকিৎসার চাহিদা। কিন্তু তা পূরণের জন্য তেমন কোন সাড়া নেই।

ইংল্যান্ডের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে সম্প্রতি আমার কথা হয়েছে। তিনি জানালেন, স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিই ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে। ইংল্যান্ডে বয়স্ক ও অবসরপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা কর্মজীবী বয়সের লোকসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। কাজেই বার্ধক্যরোগজনিত অসুস্থতা ব্যাপক এবং এর চিকিৎসাও ব্যয়বহুল। সেখানকার সরকারী হাসপাতালগুলো আধুনিক মেডিকেল সরঞ্জামের দিক থেকে পর্যাপ্তভাবে সজ্জিত নয়। প্রাইভেট সেক্টরে রোগ নির্ণয়ের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রায়শই রোগীদের রোগ নির্ণয়ের জন্য সেসব প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে রেফার করা হয়। কিন্তু বিল আসে বিরাট অংকের। সরকারের কাছে বিল পেশ করলে সরকার তা পরিশোধ করে। কিন্তু এজন্য সরকারের ওয়েলফেয়ার সার্ভিস ব্যয়ও বাড়ছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি চিকিৎসার ব্যয়কেও বৃদ্ধি করেছে। কারণ নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আসার ফলে এগুলো যেহেতু আগের তুলনায় অনেক বেশী সময় চালু থাকার কথা, অর্থনীতিশাস্ত্রের ইকোনমি অব স্কেলের সূত্র অনুসারে ব্যয় কমে আসা স্বাভাবিক। তবে তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক উদ্ভাবন হওয়ার ফলে ইংল্যান্ডে এই ব্যয় এখনো নিম্নমুখী হয়নি। ফলে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে রাজনীতিতে বিতর্ক থেকেই যাচ্ছে। আমাদের দেশে সিটি স্ক্যান করার জন্য ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা খরচ হয়। এই হারটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত সেটাও খতিয়ে দেখা হয়নি। আমাদের দেশের হাসপাতালগুলো যেন দোজখখানা। হাসপাতালের কর্তব্যে অবহেলাকারী ডাক্তার ও ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত মাস্তানমার্কা কর্মচারীরা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইন প্রয়োগের কথা সরকার ভাবেই না। কারণ, ভোটের রাজনীতিতে তাতে অসুবিধাই হবার কথা। এমন রাজনীতি কি কোনদিন এ দেশে হবে, যার উপজীব্য বিষয়গুলো হবে মানুষের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, জীবনের নিরাপত্তাসহ অন্যান্য মানবিক দাবীগুলো?

আমরা কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে প্রশ্ন করি, আপনি ভাল আছেন তো? সুস্থ আছেন তো? জবাবে হয়তো আমরা কেউ বলি, না ভাই, শরীরটা ভাল নেই। অথবা বলি, আল্লাহর রহমতে ভালই আছি। শারীরিকভাবে ভাল বা মন্দ থাকা অনেকগুলো কারণের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নিদ্রা ও বিশ্রাম, খাদ্যগ্রহণ, কাজের ধরন, গৃহপরিচর্যা, বিনোদন ও সাধ-আহলাদ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিকতা, চলাফেরা, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা, সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আচরণগত সজাগতা, আবেগের বহিঃপ্রকাশ এবং মনোভাবের প্রকাশ। এগুলো স্বাভাবিকভাবে চললে মানুষ সুস্থ থাকে। মানুষের জীবনযাত্রা আনন্দদায়ক হয়। চলাফেরার কথাটাই বিবেচনা করুন। চলাফেরার দিক থেকে একজন মানুষ কতটা ভাল আছেন, তা বোঝা যায়, কতগুলো দৈহিক অবস্থান থেকে। মৃত মানুষ থাকে নিশ্চল, নির্বাক। 'কমা'তে চলে গেছেন, এমন মানুষ থাকে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ারে। ভাল রকম অসুস্থ হলে হাসপাতালে । সাধারণভাবে অসুস্থ হলে নিজ বাসস্থানে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধপত্র নিয়ে অনেক সময়ে আমরা একাকী অন্য কারো সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে পারি না, আর পরিপূর্ণ সুস্থ থাকলে যাতায়াতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি।

www.pathagar.com

নিজে গাড়ি চালাতে পারি। যানবাহনে উঠতে পারি। একেবারে শিশু না হলে স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারি। তেমনিভাবে দৈহিক ও সামাজিক কার্যক্রমের দিক থেকে অসুস্থতা ও সুস্থতার নানা অবস্থান আছে। বাংলাদেশের মানুষ মরে গেলে কবরে গিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে নিশ্চল স্থানু হয়ে যায়। কিন্তু শতকরা ৯৯.৯ জনই হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টের সুবিধা পায় না। হাসপাতালে চিকিৎসা পায় না। গৃহে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে। ওষুধপথ্য পায় না। যাতায়াতে অসুবিধা বোধ করলে হুইল চেয়ার পায় না। অন্ধ হলে সাদা ছড়ি পায় না। রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের সহায়তা পায় না। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে সুস্থ তরুণদেরও সহায়তা পায় না। আর যারা নিজেদের সুস্থ ভেবে বা অসুস্থ হয়েও চলাফেরা করতে বাধ্য হন, তারা ভিড়ের চাপে আরও অসুস্থ হন। শরীরের দাবী অনুযায়ী স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেন না। উপরে যে সুস্থতার সুযোগের কথা বলা হলো তা ধনী দেশের জন্য প্রয়োজ্য। এ দেশের চিকিৎসক, সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা 'আপনি কেমন আছেন' তা নির্ণয় করার সূচক আবিষ্কার করে দেশবাসীকে জানিয়ে দেবেন কি এ দেশের ক'জন মানুষ সুস্থ আছেন? আসলে এ দেশে আমরা সবাই অসুস্থ। কি সামাজিকভাবে, কি নৈতিকতার দিক থেকে, কি মানসিকতার দিক থেকে এবং সর্বোপরি দৈহিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে।

আফতাব আহমাদ :

আমরা কী পরিমাণ অসুস্থ তা বলা সত্যিই কষ্টসাধ্য। তবে আমরা যে পুরোপুরি সুস্থ নই, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এত নিশ্চিত কী করে হলাম? কোন কিছু যখন তার স্বাভাবিক নিয়মে আর এগুতে চায় না কিংবা নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগোয় না, তখন তো বুঝতেই হয় যে, কোথাও কোন বড় রকমের গলদ রয়ে গেছে। এই গলদের উৎস নির্ণয় করতে পারলেই নিরাময়ের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

চারদিকের হতশ্রী পরিবেশে রুদ্ধ অর্গলযুক্ত মনের কোঠায় যে বদ্ধ বায়ুর কারণে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হয়েছে, তা আমরা যদি অনুধাবন করতে পারি, পরিত্রাণের পথটিও বেছে নিতে পারব। স্বার্থান্ধতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণতায় আমরা আমাদের ধ্যান ও চিন্তা, চিত্ত ও মানসিকতা, অনুভূতি ও সংবেদনশীলতা-এর সবকিছুকে যেভাবে বন্ধক দিয়ে রেখেছি, তাতে মনোবৈকল্য ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃতি আমাদেরকে সুস্থ জীবন থেকে বহু যোজন দূরে ঠেলে দিয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের বঞ্চনা, আমাদের অভাব, আমাদের দৈন্য, আমাদের কুণ্ঠা-এসব কিছুর জন্য এক সময়ে আমরা বিজাতীয় শাসন-শোষণ এবং বিজাতীয় প্রশাসনকে দায়ী করে এসেছি অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসা- এই মৌলিক পাঁচটি অধিকার থেকে আমাদের জনগণকে বঞ্চিত করার জন্য। নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতাকে দায়ী করে নিজেদের সামাজিক কর্তব্যকে অবহেলা করে এক সময়ে পরম শ্লাঘা লাভ করেছি। কিন্তু আজ ৩০ বছর হতে চলল, আমরা একটি পৃথক, স্বতন্ত্র, স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে বসবাস করছি। এখন কার ঘাড়ে দোষ চাপাব?

আমরা অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম, কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করার পূর্বে মুক্তিযুদ্ধটি শেষ হয়ে গেছে। তাই আমাদের বহু তরুণ ও যুবা মুক্তিযুদ্ধে সশরীরে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু আমাদের দম্ভ, আমাদের দর্প, আমাদের হামবড়া ভাব আমাদের ক্রমাগত প্ররোচিত করেছে অসত্যের নিশান বরদার হয়ে, সত্যের মুখোমুখি হয়ে কপটাচারিতার আশ্রয় নিয়ে ইতিহাসকে নিজের ইচ্ছার দাসে পরিণত করতে। এমনি দানবীয় ইচ্ছা-দাস যে ফরমায়েশী ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত রয়েছে, তার সঙ্গে এদেশের লাখো শহীদের শৌর্য ও বীরত্ব এবং অসংখ্য যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার অকুণ্ঠ ত্যাগের বাস্তবতার সঙ্গে কোন মিল নেই, সঙ্গতি

www.pathagar.com

নেই। তাই, মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বেতার, টেলিভিশন, কিংবা মঞ্চের জন্য লেখা নাটকে মানুষের ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-যন্ত্রণা যেভাবে চিত্রিত হতে দেখি, তা আমাদের মধ্যে আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের প্রেরণা সঞ্চার করার পরিবর্তে এক ধরনের মজলিসী বখোয়াজ ও কৃত্রিমতায় ভরপুর অবাস্তব ও অর্থহীন প্রলাপসর্বস্ব কর্মকাণ্ড হিসেবে রূপায়িত হয়ে ওঠে। গান, ভক্তিবাদ, ভাবালুত পূর্ণ ও যুদ্ধের রূঢ় বাস্তবতাবিবর্জিত প্রেম উপাখ্যানের উপস্থাপনা দেখে মনে হবে, মুক্তিযুদ্ধ বুঝি নাট্যমঞ্চ কিংবা একটি ক্লাবঘরের মজলিসী ব্যাপার ছিল। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প এবং বহু কবিতায় আমরা এমনি প্রহসন ও লালিত্য প্রত্যক্ষ করি। এর অর্থ কি আমাদের দেশে বড় মাপের লেখক নেই? এর অর্থ কি আমাদের নাট্যকার, কবি, কিংবা কথাশিল্পীদের জীবন-যন্ত্রণা বলে কিছু নেই? না, আসলে তা নয়। এর অর্থ হচ্ছে আমরা, যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বাংলা একাডেমীর পরিচালকের পদ অলংকৃত করে রেখেছিলাম, আমরা যারা সুদূর লন্ডনে বসবাস করেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটি আওয়াজ তোলার প্রয়োজনবোধ করিনি, আমরা যারা 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারত থেকে 'সাম্প্রদায়িক' পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে এসে বসবাস করে ভারতপ্রেমে বিভোর ছিলাম, অথচ বাংলাদেশের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও গণ অভ্যুত্থানের রাজনীতির সাথে কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলাম না, আমরা সেইসব লোক, নিজেদের স্তূপিকৃত পাপাচারকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রসাধনী আলেখ্য ও কীর্তি-কাহিনী রচনার হাস্যকর প্রয়াসে লিপ্ত। আসলে আমরা অন্ধকার বিবরের অসুস্থ প্রাণী– দুধও খেতে চাই, তামাকও খেতে চাই, গাছেরটাও খেতে চাই; গাছের তলারটাও খেতে চাই। ছিলাম গণদুশমন, হতে চাই মুক্তিযোদ্ধা। ছিলাম পাকিস্তানের দালাল, এখন বাংলাদেশকে সেবা করার পরিবর্তে হতে চাই ভারতের দালাল। আমাদের অজ্ঞাতে কিংবা জ্ঞাতসারে কখন কোন মুহূর্তে আমরা যে স্বদেশ হিতৈষণা সম্পর্কে হিতাহিত জ্ঞানলুপ্ত হয়ে পড়েছি; তা আমরা নিজেরাই জানি না।

তাই, আজ প্রয়োজন সেই সাহসী শিশুর, যার মধ্যে কোন ভীতি বা জড়তা থাকবে না এবং বুক চিতিয়ে আঙুল উঁচিয়ে বলবে– 'রাজা তোর কাপড় কোথায়'?

পাকিস্তান আমলে আমাদের সর্ববিধ সমস্যার খুব সহজ একটি সমাধান ছিল– পাকিস্তানীদের জন্য এসব করা যাচ্ছে না– পাকিস্তানীদের জন্য এসব পারা যাচ্ছে না। আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা কিংবা চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে সে সময়ে আমরা অতিসহজেই পাকিস্তানীদের ওপর দায়দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেদের খালাস করে নিতাম। কিন্তু আজ এই ৩০ বছরে পাকিস্তানী আমলে জেনারেল হাসপাতালগুলোতে এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে সাধারণ নাগরিকরা চিকিৎসার যে সুযোগ-সুবিধা পেত, তা বর্ধিত ও সম্প্রসারিত না হয়ে এখন কী করে শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে, তার জবাব কে দেবে? হাসপাতালগুলোর জরুরী বিভাগগুলোতে কোন আহত কিংবা অসুস্থ রোগী পারতপক্ষে যেতে চায় না। কারণ, চিকিৎসার পরিবর্তে যেন মৃত্যুই তাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে সেখানে। পথ্য তো দূরের কথা, ন্যূনতম ওষুধও আজকাল হাসপাতালগুলোতে রোগীদের জন্য সরবরাহ করা হয় না। অথচ এসব জেনারেল হসপিটাল ও মেডিকেল কলেজ হসপিটালগুলোতে হিসেবের খাতায় পর্যাপ্ত ওষুধ-পথ্য সরবরাহের খতিয়ান দেখা যায়। এসব কোথায় উবে যায়? আমাদের চারিত্রিক স্খলন, নীতিবিবর্জিত ও নৈতিকতারহিত জীবন প্রণালী আমাদেরকে সর্বগ্রাসী দানবে রূপান্তরিত করেছে। তাই আমরা রোগীর ওষুধ-পথ্য তসরুপ করি। শিশুর খাবারে ভেজাল মিশাই। দুধে পানি মেশাই। তেজস্ক্রিয় গুঁড়ো দুধ শিশুদের মুখে তুলে দিতে আমাদের বুক এতটুকুও কাঁপে না।

বাংলাদেশ হবার পর থেকে মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার অন্যতম– সকলের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কোন রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে একটি বাস্তবানুগ

www.pathagar.com

ও কার্যকর নীতি বা কর্মসূচী প্রণয়ন করতে পারেনি। এমনকি নানা বর্ণের কমিউনিস্টরাও এ ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আর ঢাকাকেন্দ্রিক সুবিধাভোগী শহরবাসী যারা, তারাও এ বিষয়ে উদাসীনতাকেই স্বীয় স্বার্থের রক্ষাকবচ বলে গণ্য করেছে। পেশাজীবীগণ একদিকে পেশাগত শিক্ষার কারণে যেমনি সততার সঙ্গে সমাজের হিত কামনা করে থাকেন, তেমনি পেশাগত সংকীর্ণতার কারণে মধ্যবিত্ত দোলাচালের শিকার হয়ে সমাজবৈরী ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হতে কসুর করে না। ঢাকা একটি পশ্চাৎপদ শহর। বড়জোর বলা যায়, বৃহদায়তনের একটি হাট বা গঞ্জ। এখানে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা এখনও সম্ভব হয়নি। অথচ বিশ্বের বিশাল আয়তনের নগরসমূহ যেমন– নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, টোকিও ইত্যাদির সঙ্গে বৈষয়িক লেনদেনের ফলে, এসব বৃহদায়তনের মহানগরের অভিঘাতে ঢাকার জীবনে যে বাহ্যিক পরিবর্তনের ধাক্কা এসেছে, তার ফলে নগরায়ণের সুফলের পরিবর্তে কুফলের দ্বারা আমাদের নাগরিকদের তথা পেশাজীবীদের মস্তিষ্ক কোষগুলো আক্রান্ত হয়ে আছে। এক সময়ে আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর অভাব ভাবাই যেত না। আর আজ? সম্মানজনক স্বল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমধর্মী ডাক্তারদের বাদ দিলে এক কথায় এদেরকে কসাই বলে অভিহিত করা যায়। নগদ নারায়ণ বা চাঁদির জুতোর এমনই কদর যে, মানুষ পশুতে পরিণত হয়েছে। তার ওপরে স্বীয় পেশার ভেতরেও রয়েছে বর্ণভেদমূলক একটি শোষণ প্রক্রিয়া। ডাক্তার যদি প্রফেসর হন, তাহলে সাত খুন মাফ। আর ডাক্তার যদি সদ্য পাস করা একজন যবিষ্ঠ চিকিৎসক হন, কিংবা লেকচারার হন, তাহলে তার পরিত্রাণ নেই। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ একজন সামরিক শাসক ছিলেন মাত্র। সংবিধান লংঘন করে অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করেছিলেন তিনি। এসবই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এও সত্য যে, তিনিই একমাত্র শাসক, যিনি এ দেশে একটি স্বাস্থ্যনীতি উপহার দিয়েছিলেন। বাস, আর যায় কোথায়? কায়েমী স্বার্থবাদীরা এবং ঢাকাকেন্দ্রিক প্রফেসর ডাক্তাররা দেখলেন যে, তাদের সংকীর্ণ স্বার্থের মৌরুসী পাট্টায় এবার চিড় ধরা অবধারিত। এরশাদ সমরপতি এবং ভুগছেন বৈধতার সংকটে। অতএব, ঐ অজুহাতে তাঁর স্বাস্থ্যনীতি যতই উপযুক্ত হোক না কেন কিংবা যৎসামান্য ত্রুটিযুক্ত থাক না কেন, যেভাবেই হোক তা বাতিল করাতেই হবে। শহরভিত্তিক সুবিধাভোগীদের বিক্ষোভকে পুঁজি করে ক্লীব রাজনৈতিক দলগুলো প্রাসাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন বারান্দায় ক্ষমতার পালা বদলের যে নকশা প্রণয়ন করে তার পথ ধরে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়, যে পরিস্থিতি গুণগত পরিবর্তন সাধনের পরিবর্তে একটি প্রসাধনী পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ায় ডাক্তার মিলন নামে একজন তরুণ চিকিৎসক ষড়যন্ত্রের বলী হন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়, তার অন্যতম প্রথম কাজ ছিল এরশাদ প্রণীত স্বাস্থ্যনীতি বাতিল ঘোষণা করা। সেদিন যদিও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, এক মাসের মধ্যে নতুন স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করা হবে, তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনগণের সঙ্গে চরম শঠতা ও প্রতারণা বলেই প্রমাণিত হয়েছে। ডাঃ মিলনের জীবন ও রক্তের বিনিময়ে শহরকেন্দ্রিক যবিষ্ঠ ডাক্তার ও প্রফেসর ডাক্তারগণ তাদের ক্ল্যানিশ স্বার্থ সংরক্ষণে সক্ষম হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত শুধু একটি কল্যাণমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের কথা শুনেই আসছি। এ শুনতে হয়। কিছু লোক শোনাবে, আর কিছু লোক শুনবে। এভাবেই চলবে। আর সময়ে সময়ে ডাক্তাররা 'মানবসেবা'র অঙ্গীকার ব্যক্ত করবেন।

যে ডাক্তার সরকারী হাসপাতালে মনোযোগ দিয়ে রোগী দেখতে পারেন না, তিনি তার প্রাইভেট চেম্বারে কিংবা প্রাইভেট ক্লিনিক কী করে সুচিকিৎসার পরামর্শ দিতে পারেন? এখানে একটি মজার বিষয় লক্ষ্যণীয়। আজকাল ব্যঙের ছাতার মত প্রাইভেট ক্লিনিক গজানোর ফলে

www.pathagar.com

ডাক্তাররা তাদের প্রাইভেট চেম্বারেও রোগীদের খুব একটা সময় দিতে চান না। ভাবটা এমন যে, ডাক্তাররা রোগীদের করুণা করছেন। অথচ একজন রোগী বা তার অভিভাবক, নিকটাত্মীয়রা ডাক্তারকে পরামর্শের জন্য যে মোটা ফীস দিয়ে থাকেন, তা-ই কিন্তু ডাক্তারের ইনকাম। আর এই ইনকামের ওপর ভর করেই কর না দিয়ে রাজস্ব বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে অনেক ডাক্তারকেই রাতারাতি আমরা মালদার হতে দেখি। প্রাইভেট ক্লিনিকেরও আবার ক্ল্যাসিফিকেশন আছে। কিছু ক্লিনিক হলো সাধারণ উম্মি লোকজনদের জন্য, এখানে সিট বেল্ট থেকে শুরু করে নানান ধরনের বাহারি খরচ আছে। ক্লিনিকগুলো যেন পাল্লা দিয়েই একে অপরের সঙ্গে নির্মম ও নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ডাক্তার? অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ সরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তাররাই এসব ক্লিনিকে চিকিৎসা 'সেবা' দিয়ে থাকেন। তাহলে দু'য়ের মধ্যে এ পর্বতপ্রমাণ ফারাক কেন, বৈষম্য কেন? কারণ একটাই। মহত্তর, উন্নততর মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতা আমাদের সমাজ থেকে আজ নির্বাসিত। একে আরও দুর্বিনীত রূপ দান করেছে রাজনৈতিক দলগুলোর অর্বাচিনতা এবং জনজীবন সম্পর্কে উদাসীনতা, উপেক্ষা, অন্যমনস্কতা ও তাচ্ছিল্য।

আজ পর্যন্ত দেশের কোন রাজনৈতিক দল কি শিক্ষা, কি চিকিৎসা, কি গৃহায়ণ-কোন কিছু সম্পর্কে পরিপূর্ণ রূপরেখা প্রণয়ন করে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করেছে? কোন রাজনৈতিক দল খোলামেলাভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী ও নীতি কি প্রণয়ন করেছে? সবাই অপেক্ষায় আছে। ক্ষমতায় গিয়ে গণবিরোধী আমলাদের বিশেষজ্ঞজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে ধামাচাপা দেবে। এ কারনেই সবকটি রাজনৈতিক দলে অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের এত কদর। আমরা কোন কিছু আদ্যোপান্ত দেখে, চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কষ্টসাধ্য পন্থায় সমাধান করার প্রয়াসী হতে রাজি নই। সবকিছুর ক্ষেত্রেই আমরা খুঁজি শর্টসার্কিটের পন্থা। যাতে ঝুঁকিও না থাকে, কষ্টও না থাকে, অজ্ঞানতাও চাপা পড়ে। এ কারণেই একাত্তরে রাজনৈতিক দলগুলোর ক্লীবত্ব ও আত্মসমর্পনবাদিতা মুক্তিযুদ্ধকে নয় মাসের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে তার সমস্ত গৌরব ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলো। এ কারণেই একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের পর ষোড়শ বাহিনীর জন্ম। এ কারণেই লন্ডনে বসে পাকিস্তানীদের বৃত্তিভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের জন্য একটি পেনিও চাঁদা দিতে যে কুণ্ঠিত ছিল, তার প্রতিটি উচ্চারণে তাকে সাজতে হয় 'জনকের পুত্র', শোনাতে হয় 'জনকের' কাহিনী। আমাদের প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার এ মুখোশটি ছিন্নভিন্ন করে ছিঁড়ে ফেলে আজ আমাদের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই সৎ-সাহস এবং এই দুঃসাহস নিয়ে যারা ধসনামা, মূল্যবোধ বিবর্জিত এই সমাজকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে পারবে, তারাই এ সমাজের কোন উপকারে আসবে। বকধার্মিক ও জ্ঞানপাপীরা তাদের আস্ফালনের মাধ্যমে যত ভর্ৎসনার বাণীই শোনাক না কেন, আজ চাই সাহসিকতার– অপ্রতিরোধ্য সাহসিকতার এক দুর্মর প্রতিযোগিতা। সত্য উচ্চারণের বিরুদ্ধে যত বাধা রয়েছে, সেগুলোকে ভেঙে ঘুঁড়িয়ে ফেলতে হবে। জ্ঞানের চর্চা, বিদ্যার সাধনা এবং পরসেবার মহত্ত যাতে আমাদের সকল চিন্তা, সকল ভাবনাকে আলোকিত করে– আমাদের সেদিকে মনোযোগী হতে হবে। কেবল তা হলেই কি শিক্ষানীতি, কি স্বাস্থ্যনীতি অর্থবহ হতে পারে। সবকিছুর আগে আমাদের মন ও মানসিকতাকে সুস্থ ও সজীব করে তুলতে হবে। কোনো জনতুষ্টিবাদী পথে তা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

১ ফেব্রুয়ারী ২০০১

গণতন্ত্রের অর্থনীতি ও বাংলাদেশের 'সংসদীয় গণতন্ত্র'

মাহবুব উল্লাহ :

আমি অর্থনীতি শাস্ত্রের একজন নগণ্য ছাত্র। গত ৪০ বছর ধরে আমি এই শাস্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন চর্চা করে আসছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানের এই শাখা আমার কাছে মরীচিকাসদৃশ থেকে গেছে। অনেকে কৌতুক করে বলেন, অর্থনীতির যে কোন বিষয় নিয়ে দশজন অর্থনীতিবিদকে প্রশ্ন করা হলে তারা দশ রকম ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হবেন এবং প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই কম-বেশী জোরালো মনে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্র, সমাজ ও দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে অর্থনীতি শাস্ত্র এবং এর উপর ভিত্তি করে প্রণীত পলিসি জনজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অর্থনীতির কতগুলো মৌলিক তাত্ত্বিক সূত্র রয়েছে। এই সূত্রগুলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী সূত্র হিসেবে বিচার করা হয়। অন্যদিকে দৈনন্দিন অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে সামাজিক মূল্যবোধ এক গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়। এছাড়া শ্রম, সময়, তথ্য ও সরকার সম্পর্কেও অর্থনীতি শাস্ত্রের একটা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

যদি বলি অর্থনীতির কিছু কিছু সূত্র অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী, এর অর্থ দাঁড়ায়– যেসব অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এসব সূত্র থেকে উপসংহার টানা হয়, সেগুলো কালোত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা রাখে। ত্রিশের দশকে অর্থনীতি শাস্ত্রে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়াবাদী প্রতিযোগিতার তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সে সময়ে মনে করা হত, নব্য ধ্রুপদী অর্থনীতির সিদ্ধান্তগুলো কতিপয় অবাস্তব অনুমান নির্ভর। যেমন– পরিপূর্ণ তথ্যপ্রবাহ, পূর্ণ প্রতিযেগিতা এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের যৌক্তিকতাভিত্তিক আচরণ এবং সর্বাধিক মুনাফা আহরণ। সে সময়ে নব্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি অত্যন্ত চড়া গলায় শোনা যেত, তা হল– তারা তাদের তত্ত্বকে কতিপয় অবাস্তব অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করেছে। পরবর্তী সময়ে পজিটিভ ইকনমিক্সের অভ্যুদয় ঘটে। লায়নেল রবিন্স ও মিল্টন ফ্রিডম্যান এই তত্ত্বের উদগাতা। তারা বলেন, তত্ত্বের বলিষ্ঠতা অনুমানের বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল নয় বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে, অথবা তত্ত্বগত অনুসন্ধান চালিয়ে বুঝতে হবে তত্ত্বটি সত্যিকার অর্থে কতটুকু বলিষ্ঠ। এর ফলে দেখা গেল, অপূর্ণ প্রতিযোগিতার তত্ত্ব থেকে বাস্তবে পরীক্ষাযোগ্য কোন সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না যা পূর্ণ প্রতিযোগিতার তত্ত্বকে নাকচ করে দেয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত কর্মী বা উদ্যোক্তারা সচেতনভাবে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন এবং উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্নকরণের চেষ্টা করছেন কিনা তা বড় কথা নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল প্রতিযোগিতার ফলে অদক্ষ উৎপাদনকারীরা বাজার থেকে বিতাড়িত হয়। ভোক্তার পছন্দ যৌক্তিক কিংবা একেবারেই দৈব ঘটনার মত, সেটাও বড় কথা নয়। আসল কথাটি হল, পণ্যের দাম বাড়লে মার্শালের সূত্র অনুসারে চাহিদা হ্রাস পায় কিনা। ফলে অর্থনীতিবিদরা গোটা অর্থনীতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ব্যবস্থা হিসেবে বিচার করতে পারেন এবং কিছুসংখ্যক যৌক্তিক সাধারণ নিয়ম অনুসারে এমন কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, যা এক সময়ে অসম্ভব মনে হত।

অর্থনীতির মূল্যবোধনিরপেক্ষতা সম্পর্কেও বিতর্ক আছে। নব্য ধ্রুপদী ঐতিহ্যের অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, সর্বাধিক কল্যাণ অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপমুক্ত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। প্রফেসর লায়নেল রবিন্স তার The Nature and Significance of Economic Science' গ্রন্থে এই ধারণার প্রতি

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেছেন এবং ধারণাটিকে চুরমার করে দিয়েছেন। প্রফেসর রবিন্সের এই বক্তব্যের ধারা অনুসরণ করে নয়া কল্যাণ অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতির মূল্যবোধ-ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে অনেক বেশী সজাগ হয়েছেন এবং খোলামেলাভাবে এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কেও সজাগ হয়েছেন। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল, বাস্তব অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণের প্রশ্নে এসে। কারণ, সমাজ বা জাতির অর্থনৈতিক কল্যাণ কতটুকু অর্জিত হবে বা এর অবয়ব কি দাঁড়াবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলা গেল না। আর এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত দিতে গেলে যে কঠিন শর্তগুলো পূরণ করতে হয় তা বাস্তব ক্ষেত্রে কখনোই পূরণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যে অর্থনীতিবিদ দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত, তিনি বিকল্প মূল্যবোধগুলোর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সজাগ হলেন এবং তাকে যে মূল্যবোধের ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণ করতে বলা হল তার আলোকেই অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণে তারা প্রবৃত্ত হলেন। এর ফলে অর্থনীতিতে ডগম্যাটিজমের (অন্ধশাস্ত্রগত) চাইতে প্রাগম্যাটিজম (বাস্তববোধ) গুরুত্ব অর্জন করল এবং Economics of Second Best-এর উদ্ভব ঘটল। জেমস মিড, রিচার্ড লিপসি এবং ক্যালভিন ল্যাংকাস্টার–লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের এই এয়ী বলেন, জগতটাই তো ত্রুটিপূর্ণ একটা স্থান। সকল পলিসির ক্ষেত্রেই এ কথাটা সত্য। একটা ত্রুটিপূর্ণ জগতেই এগুলো প্রয়োগ করতে হয়। সুতরাং এর ফলে পরিণতিটা ভাল কি মন্দ হবে, তা পরিস্থিতির বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে এবং সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি এর জন্য দায়ী। কাজেই, পূর্বাহ্নেই ফলাফল সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছু বলা যায় না। এর ফলে অর্থনীতি শাস্ত্রে এক ধরনের পেশাগত আস্থার সৃষ্টি হল। শাস্ত্রানুগত্যের বাড়াবাড়ি হ্রাস পেল। প্রত্যেক অর্থনীতিবিদই তার সামনে কী বাস্তবতা বিরাজ করছে সে সম্পর্কে নজর রাখতে শুরু করল।

অর্থনীতি শাস্ত্রের এই বিকাশের প্রেক্ষাপটেই গণতন্ত্র সংক্রান্ত তত্ত্বের আলোচনা করা যায়। বেনথামের অনুসারী নব্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা ধরে নিয়েছিলেন, সরকার হল জনকল্যাণের এক নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক সেবাদাসমাত্র। সরকারকে আমরা এরকম আদর্শরূপেই দেখতে চাই। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, এর ফলে সরকারের আচরণ ও পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করা যায় না। ফলে সমাজবিজ্ঞানীরা, যারা সরকারী নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং অনুমিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের নীতি-নির্ধারণে নজর দেন, তারা খুব হতাশ বোধ করেন। গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূল কথা হলো, ভোটের বিনিময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন নীতির বিনিময় হয়। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিভিন্ন দল চেষ্টা করে সর্বাধিক ভোট লাভ করে জয়যুক্ত হতে। তারা দেশের জন্য যেসব পলিসি বাস্তবায়ন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়, সেগুলো বাস্তবায়িত করলে শেষ পর্যন্ত নাগরিক জীবনে এগুলোর প্রভাব কী হবে, তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কারণ, বিদ্যমান যে পরিস্থিতিতে এসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় সে সম্পর্কে ভোটার বা ভোটপ্রার্থী কারোরই পরিষ্কার ধারণা থাকে না। একজন সাধারণ ভোটার বুঝতে পারে না, বিকল্প পলিসিগুলো তাদের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করবে এবং এই প্রভাব সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য তার ইনসেনটিভও অত্যন্ত নগণ্য। কারণ, একজন ব্যক্তি ভোটার তার একটিমাত্র ভোটকে খুবই নগণ্য বলে ধারণা করে। কারণ, ভোটারের সংখ্যা প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় শত-সহস্র বা তারও অনেক বেশী। এর ফলে একটি দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীর পার্থক্য নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। অর্থনীতিতে যেমনটি ঘটে ডুয়োপলি (Duopoly) বাজারে। এ ধরনের বাজারে বিক্রেতা দু'জন, ক্রেতা অনেক। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন পেশার গ্রুপের প্রভাব এবং জননীতি নির্মাণে যারা নীতির ফল ভোগ করে, তাদের ওপর নীতিনির্ধারকদের প্রভুত্বের প্রশ্নটি। গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক তত্ত্বে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ভোটারের বাসস্থানভিত্তিক, যা বিশাল একটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে; কিন্তু উৎপাদনকারীরা সুনির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। এ কারণে ভোক্তাদের তুলনায় উৎপাদনকারীরা স্বার্থ রক্ষা করতে সময় ও অর্থ ব্যয় করতে অনেক বেশী তৎপর

www.pathagar.com

থাকে। সুতরাং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার চরিত্রটাই রক্ষণশীল। এ কারণে যারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের উদ্ভব ঘটবে তারা হয়তো অনেকটা বেশী আশাবাদী। রক্ষণশীলতার মূল কথাই হল– যা কিছু বিদ্যমান তাকে আঁকড়ে ধর এবং রক্ষা কর। পরিবর্তন বা উন্নয়নের জন্য তোয়াক্কা করো না।

গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক তত্ত্বে যে বিষয়টি সম্পর্কে এখনও কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না, তা হল– রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সরকারী কার্যক্রমকে কী জোরদার করে, না দুর্বল করে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদ জন ক্যানেথ গলব্রেইথ এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তিনি একদিকে দেখতে পান, ব্যক্তিবিশেষের ঐশ্বর্য, অন্যদিকে ব্যাপক জনগণের দুরবস্থা। ব্যাপক জনগণের এই দুরবস্থা নিরসনের জন্য সরকারের জনকল্যাণ কার্যক্রম সম্প্রসারণার্থে সরকারকে প্রদেয় কর পরিশোধে অনীহা এর জন্য দায়ী। এছাড়া, অনেকেই বুঝতে চান না, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে এবং এর ফলে ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশী উপকার ও উপযোগিতা সৃষ্টি হবে, সমাজ জীবন সুখকর হবে। জন জীবনকে কষ্টকর করে তোলে– এরকম প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করা যাবে এবং দুর্যোগের সময়ে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া সম্ভব হবে। আরও একটি যুক্তি দেয়া হয়, সেটা হল– গেইম থিওরীর কোয়ালিশন তত্ত্ব। কোন একটি কাজের জন্য জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের ওপর খরচের বোঝা চাপিয়ে দিতে জোটবদ্ধ হতে পারে। আসল কথা হল, সরকারী কর্মকাণ্ডের চরিত্রই হল কিছু প্রকল্পের জন্য ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া, আর অন্যদিকে বাকি প্রকল্পগুলোর জন্য করুণভাবে ব্যয়ের মাত্রা কমিয়ে দেয়া।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও লক্ষ্য করা যায়, প্রধানমন্ত্রী তার শ্রদ্ধেয় পিতার স্মৃতি ও গৌরবকে চিরজাগরুক করে রাখার জন্য অনেকগুলো প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এ ধরনের প্রকল্প ভাল কি মন্দ, সেই গুণবিচারে আমি যাব না, তবে নিজ দলের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থাকায় এসব প্রকল্পে অর্থের যোগান দেয়া সহজ হয়েছে। আমরা জানি না, তার দলের অন্য সংসদ সদস্যরা এক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণের প্রশ্নে যৌক্তিক সীমা কিভাবে নির্ধারণ করেন? সংসদের পেছনের বেঞ্চে বসা সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকার স্বার্থে সরকারের হাতকে প্রসারিত করতে প্রথমসারির লোকদের মত সফল হন না। অন্যদিকে, একটি নির্দিষ্ট জেলায় যদি একাধিক প্রভাবশালী সদস্য থাকে, তাহলে সম্পদের জন্য তাদের মধ্যে খেয়োখেয়ি চলতে থাকে। যেমনটি ঘটছে বৃহত্তর সিলেট জেলা নিয়ে। যেখানে আছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা। এছাড়া বিরোধী দলের সদস্যভুক্ত এলাকাগুলো সরকারী ব্যয়ের জন্য খুব একটা নজর কাড়ে না। তদুপরি সরকারের ব্যয় আমলা ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লোকদের পরামর্শেও প্রভাবিত হয়। আমাদের দেশে বড় বড় আমলা কর্মরত থাকার সময়ে নিজ এলাকার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়ে নিতে নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নেন এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সফল হন। নিজ এলাকার জন্য তাদের এই দুর্বলতা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর নির্বাচনী রাজনীতিতে যোগ দেয়ার জন্য তাদের অভিলাষেরই বাস্তব প্রমাণ। এ কারণে বয়োঃবৃদ্ধ রাজনীতিবিদ জনাব অলি আহাদ দাবী তুলেছেন, সরকারী দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণের অন্তত ৫ বছর পর্যন্ত কোন আমলা যেন রাজনৈতিক দলে যোগদান না করেন এবং নির্বাচনে প্রার্থী না হন। নির্বাচন এগিয়ে আসছে। এখন নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে অনেক কথা হবে। তার এই সংস্কার নীতিমালা প্রণয়ন করতে গিয়ে অর্থনীতি শাস্ত্রের শিক্ষাগুলো আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

কোন সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতির ভবিষ্যৎ ফলাফল কী হবে, তা নিয়ে যে অস্পষ্টতা থেকেই যায় এবং কেন থাকে, সে বিশ্লেষণ আলোচনার শুরুতেই করেছি। ১৯৭০ সালে প্রফেসর রেহমান সোবহান আমাকে বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান যদি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে এখানে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এবং বলতে গেলে বিনা প্রতিরোধে

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তার যুক্তি ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানে সামাজিকভাবে পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণী অত্যন্ত শক্তিশালী। পূর্ব পাকিস্তানে কোন বড় ও ক্ষমতাবান পুঁজিপতি ও জমিদার না থাকার ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এরূপ কোন সামাজিক শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। আমি প্রফেসর রেহমান সোবহানকে বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলাম, পুঁজি ও কায়েমী স্বার্থবাদ রক্ত বীজের মত বিপুল শক্তি ও সংখ্যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের সম্প্রসারিত করে ও সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। বাংলাদেশোত্তরকালে প্রফেসর রেহমান সোবহানেরা পরিকল্পনা কমিশনে বসে শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করে যে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেই সমাজতন্ত্রে জাতীয়করণকৃত কল-কারখানার সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং হাজারও রকমের অর্থনৈতিক অনিয়মের মধ্য দিয়ে একটি গোষ্ঠী আদিম পুঁজি সঞ্চয়নের পথ করে নেয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানী ২২ পরিবারের পরিবর্তে ২২ হাজার পরিবারের উদ্ভবের বিষয়টি সত্তর দশকে রাজনৈতিক প্রবচনে পরিণত হয়। সুতরাং, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বৈতরণী পেরুতে গিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো যেসব মুখরোচক জনতুষ্টিবাদী কর্মসূচী উত্থাপন করে, তার ফল সম্পর্কে আমরা কি নিঃসন্দেহ হতে পারি? আগামী নির্বাচনে এদেশের জনগণের অধিকার রয়েছে নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিটি কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানার। বাংলাদেশ কার্যত একটি ডুয়োপলিস্টিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা (অর্থাৎ দুটি দলের একচেটিয়ামূলক আধিপত্য) গড়ে ওঠার ফলে প্রতিটি ব্যক্তি ভোটারকে একথা ভাবলে চলবে না আমার একটি ভোট, তা যেভাবেই আমি প্রয়োগ করি না কেন, তাতে কী আসে যায়? নির্বাচনী সভা গুলোতে ভোটারদের প্রশ্ন করার অধিকার দিতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে যে কোনো মস্তানী ঠেকাতে হবে। অন্যথায় জনগণ যেই তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই থেকে যাবে। আমরা চাই, রাজনীতির অর্থনৈতিক তাৎপর্যগুলো আরও স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হোক। রাজনীতি কোনক্রমেই ভোটারদের বিভ্রান্ত করার হাতিয়ার হতে পারে না। হতে দেয়া উচিত নয়।

আফতাব আহমাদ :

এ বছরটিকে নির্বাচনী বছর বলেই সাধারণভাবে মনে করা হচ্ছে। ১৯৯৬-এর জুন নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মধ্য জুলাইয়ে। পাঁচ বছর মেয়াদী সংসদের আয়ু গণনা করলে এ বছরের মধ্য জুলাই নাগাদ চলতি সংসদের আয়ু রয়েছে। সংসদ আগে বিলুপ্ত না হলে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী মধ্য জুলাইয়ে এই সংসদ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তারপর বহাল হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার– যার আয়ু ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের। ঐ ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করে একটি নির্বাচিত সরকারকে বহাল করতে হবে। তবে, সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের দফা ৪-এর অনুবিধি অনুযায়ী দৈব দুর্বিপাকের কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার সময় আরও ৯০ দিন বর্ধিত করা সম্ভব। এর সঙ্গে বিরাজমান পরিস্থিতিগত কারণে ১৫২ অনুচ্ছেদের দফা-২-এর উপদফা 'খ'-এর বিধান মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠান আরও পিছিয়ে দেয়া সম্ভব।

কথাগুলো এজন্য বলছি যে, সবাই ধরে নিচ্ছেন, নির্বাচনী মৌসুম যেহেতু এসে গেছে, সেহেতু আমাদের এখন 'ভালমানুষ' সাজার সময় এবং 'সকলকে ভালোবাসার' সময়। এ কারণেই বিরোধী শিবিরের কোন কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন নেতা-কর্মকর্তা জনসমাজ ও বিদ্বৎ সমাজের অনেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে শিক্ষাচার বিবর্জিত বক্তব্য-বিবৃতি দিতেও পরোয়া করছে না। সরকারী দল ও সরকারী দলের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে ভালমানুষটি সাজার জন্য এসব বেতনভুক কাণ্ডজ্ঞানহীন নেতা-কর্মকর্তা তাদের আচার-আচরণে, বচনে-বাচনে ন্যূনতম সৌজন্য বজায় রাখতেও অক্ষম। একইভাবে 'ভালমানুষ' সাজার চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা। প্রতিপক্ষকে দমন-পীড়নের জন্য প্রণীত নিবর্তনমূলক জননিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে সারাদেশ যখন সোচ্চার এবং ক্ষমতাসীন দলের 'গডফাদার'দের সহিংস সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করার জন্য এ আইনের প্রয়োগের দাবী যখন সর্বজনীন হয়ে উঠেছে, ঠিক তখন প্রধানমন্ত্রী পুলিশের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলছেন, জননিরাপত্তা আইন যেন সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। পুলিশের উদ্দেশে তিনি এও বলেছেন, "লক্ষ্য রাখবেন, কারও প্রতি যেন অবিচার করা না হয়"। জননিরাপত্তা আইন প্রণীত হওয়ার পর থেকে এর প্রয়োগ সম্পর্কে সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকায় যেসব খবর বেরিয়েছে, তা থেকেই দেখা যায় যে, এ আইনটির লক্ষ্যবস্তু একটিই– প্রতিপক্ষকে নির্যাতন করা। আর তাই এ আইনটিকে সাধারণ মানুষ জননিরাপত্তা আইন না বলে 'জননির্যাতন আইন' বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য একে 'গদির নিরাপত্তা আইন'ও বলা যেতে পারে। যে কথা বলছিলাম, এ বছরটির কথা। সাধারণভাবে মনে করা হচ্ছে, এ বছরটি নির্বাচনের বছর। আর তাই সবাই 'সুবোধ' ও 'সুশীল' সাজার জন্য প্রাণান্তকর কোশেশ করছেন। আমাদের দেশে কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ফরমায়েশী গণমাধ্যম ও মুদ্রণশিল্পের বদৌলতে এমন একটি ধারণার জন্ম দেয়া হয়েছে যে, গণতন্ত্র মানেই পর্যাবৃত্ত বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। কারা এই নির্বাচনে অংশ নেয়ার যোগ্যতা রাখে, কোন্ রাজনৈতিক ব্যবস্থা লালনের জন্য এই নির্বাচনের প্রয়োজন, কোন্ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জনসাধারণ একাত্ম এবং তাকে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কোন্ রাজনৈতিক ব্যবস্থা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ এবং জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী যে কোন সময়ে জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার ত্যাগে বাধ্য থাকবে, এর সবকিছু আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে উপনিবেশবাদের স্বার্থ সংরক্ষণে নিয়োজিত যে শিখণ্ডী রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুকরণবৃত্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে তোলা হয়েছে, তার ধারাবাহিকতায় আমাদের অনেকেরই ধারণা, জনসাধারণকে পরিপ্রেক্ষিতের দাসে পরিণত করে পরিস্থিতির কাছে জিম্মি করে লোক দেখানো ও লোক ঠকানোর নির্বাচন কোনক্রমে অনুষ্ঠান করতে পারাটাই গণতন্ত্র। একটি মূর্খ, পরদেশের প্রতি আনুগত্য পোষণকারী, রাষ্ট্রঘাতীদের কিংবা কালোবাজারী, চোরাকারবারী, সন্ত্রাসী ও মস্তানদের কিংবা ঘুষখোর, জোচ্চোর, দুর্নীতিপরায়ণ, বাটপারদের যে অশুভ নিয়ন্ত্রণ সমাজ কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে নির্মূল বা শিথিল করার কোন চিন্তা-ভাবনা না করে বিত্ত বৈভবের কাছে আত্মসমর্পণকারী যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের মত দেশগুলোতে লালন করা হয়, তা মানুষের সঙ্গে চরম রসিকতা ও গণতন্ত্রের নামে প্রহসন মাত্র। আমরা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও মানুষে মানুষে বৈষম্যের যে পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান রচনা করেছি, সে সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে অর্থ, পেশী ও সহিংসতার নিয়ন্ত্রণাধীন অযোগ্য, মূর্খদের ও দুর্নীতিপরায়ণদের শাসন করার সুযোগ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে গণতন্ত্রের নামে ঢাকঢোল পিটিয়ে যে নির্বাচনের আয়োজন করা হয়, তা আমাদের সম্মিলিত পাপেরই পরিচায়ক। জনসাধারণের দুঃখ-কষ্টের জন্য অনেককেই আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করতে দেখি, কিন্তু আমাদের আচরণ ও কৃতকর্মই যে এর মূলে, আমরা কি তা উপলব্ধি করি? আজ থেকে দেড়শ' বছর আগে ১৮৩৯-এ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন তাঁর "Voyage of the Beagle" গ্রন্থে বলেছিলেন, "If the misery of our poor be caused not by the laws of natue, but by our institutions; great is our sin."

আমাদের দেশে সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের চাইতে ব্যক্তির পরিচিতি, অবস্থান ও ভূমিকা অনেক বেশী বিবেচ্য ও গুরুত্ববহ। এ কারণেই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়াটি বারংবার ব্যাহত হয়েছে। তবে, শেষ বিশ্লেষণে ভালর চেয়ে মন্দের দিকটিই বেশী। আবার একথাও অস্বীকার করার জো নেই যে, আমাদের লোকচিন্তায় ও সমাজে দর্শনে ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিভাবমূর্তি ও ব্যক্তিকরণ এমনভাবে জড়িয়ে আছে যাকে আমরা Symbiotic Relationship বা

www.pathagar.com

মিথোবৃত্তিক সম্পর্ক বলে অভিহিত করতে পারি। এই সম্পর্কের উৎস আমাদের সমাজ দর্শনের Psyche বা চৈতন্যের মধ্যে নিহিত। আর, আমাদের সমাজ দর্শন যে সমাজ কাঠামোকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠেছে, তা যৌথ বা সমষ্টির স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের যূপকাষ্ঠে বিসর্জন দেয়াকেই নিশ্চিত করেছে। ঠিক এ কারণেই পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সরাসরি আমাদের সমাজে ট্রান্সপ্লান্ট করতে চাওয়া অনুকরণবৃত্তিরই সমতুল্য। আমাদের মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা জন্ম দিয়েছে, তাকে হুবহু নকল করতে গিয়ে আমরা একটি অধঃপতিত ও বিকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছি, যার সঙ্গে আমাদের দেশের জনসাধারণের আবেগ-অনুভূতি, মন-মেজাজ ও আগ্রহের কোন সম্পর্ক নেই। সর্বোপরি, আমরা এই ব্যবস্থার জন্য কোনভাবেই প্রশিক্ষিত হয়ে দক্ষ হওয়াতো দূরের কথা, ন্যূনতমভাবে প্রস্তুতও হইনি।

১৯৭১-এ স্বাধীনতার সনদে আমরা যে সরকার পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলাম তা অচিরেই আমরা বাতিল করে দেই। অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ও ১৯৭২-এ প্রণীত সংবিধানে আমরা যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিধান করলাম, তা নামে মাত্র সংসদীয় পদ্ধতি, কিন্তু কার্যত এক ব্যক্তির স্বৈরশাসন। পার্থক্য শুধু এই– বহু দলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল এবং মেনে নেয়া হয়েছিলো। '৭৫-এর ২৫ জানুয়ারী কুখ্যাত চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় গণতন্ত্রের ঐ বাহ্যিক লেবাসটুকুও ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় এবং এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একদলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করা হয়। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন বহুদলীয় কিম্ভূত কিমাকার প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন এ দেশে চালু থাকে। বলাবাহুল্য, এই পদ্ধতির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পৃথিবীর অন্য কোন প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির কোন তুলনা হয় না। নাগরিক স্বার্থগোষ্ঠীর উদ্যোগে ও চাপে এরশাদকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার পর '৯১-এ দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্ববর্তী '৭২-সনের প্রবর্তিত কিম্ভূত কিমাকার সংসদীয় পদ্ধতির সরকারকে পুনর্বহাল করা হলো। আমাদের দেশে সংসদ কখনোই সীমিত ও আপেক্ষিক অর্থেও সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় পরিগণিত হতে পারেনি। আমাদের দেশে নির্বাহী প্রধান তা তিনি প্রধানমন্ত্রীই হোন আর প্রেসিডেন্টই হোন– কোন সময়েই জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন নি ও জবাবদিহি করতে বাধ্য হন নি। তার কারণ, আমাদের দেশে রাষ্ট্রের অঙ্গগুলোর মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ কখনোই সুনিশ্চিত করা হয়নি। তদুপরি, রাজনৈতিক দলসমূহে গণতন্ত্র অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় সংসদে যারা আসেন, তারা যত না নির্বাচনী তল্লাটকে প্রতিনিধিত্ব করেন, কিংবা যত না রাজনৈতিক দলকে প্রতিনিধিত্ব করেন তার চাইতে অধিক প্রতিনিধিত্ব করেন ব্যক্তিবিশেষের খামখেয়ালি ও স্বেচ্ছাচারকে। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শীর্ষ নেতারা যা করেন বা যা ভাবেন– তার উপরই গোটা ব্যবস্থাটি নির্ভর করে।

১৯৯০-এ তিন জোটের রূপরেখায় বলা হলো, একটি সার্বভৌম সংসদ চাই। সংসদের কাছে দায়বদ্ধ একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার চাই। এর ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হলো যে, মূল দাবীটি হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতি সরকারের। এই ব্যাখ্যা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে বলতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা সার্বভৌম নয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নন। এমনকি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সে দেশের আইনসভা কংগ্রেসের কাছেও জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। অনুরূপভাবে একই কথা বলা যায় ফ্রান্সের বেলায়। ফ্রান্সের আইনসভা সার্বভৌম নয়, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট যা খুশি তা করতে পারেন। এসবই মূঢ় এবং মূর্খের ভাবনা। বাস্তব হচ্ছে এই যে, আইনসভাকে পাশ কাটিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিংবা ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট কোন কিছুই করতে পারেন না। যদিও তাদের হাতে রয়েছে প্রভূত ক্ষমতা এবং তারা স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসেবে নির্বাচিত হন।

আমাদের দেশে আজ এক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন প্রধানমন্ত্রী শাসিত যে উদ্ভট ও বিদঘুটে তথাকথিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু রয়েছে, তার সঙ্গে ব্রিটিশ বা ওয়েস্ট মিনিস্টার

www.pathagar.com

পদ্ধতির সংসদীয় সরকারের কোন সাদৃশ্য নেই। আমরা একটি লিখিত সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্রের মৌল কাঠামোগুলো নির্ণয় করে শাসন পদ্ধতি চালু করেছি। আর তাই, আমাদের সংসদ পরিপূর্ণভাবে সার্বভৌম নয়। সংসদ প্রণীত আইন কিংবা সংসদ কর্তৃক সংবিধানের কোন সংশোধনী যদি সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থী হয়, তাহলে বিচার বিভাগ তা বাতিল করে দিতে পারে। অর্থাৎ, বিচার বিভাগ হচ্ছে সংবিধানের রক্ষক, অভিভাবক ও ব্যাখ্যাদাতা। কিন্তু ব্রিটেনে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে আইনই পাস করুক না কেন, ব্রিটিশ বিচার বিভাগ তাকে রহিত করতে পারে না। এখানেই পার্থক্যটা বুঝতে হয়।

আমাদের দল গঠন ও বিকাশের যে চরিত্র, দলের অভ্যন্তরে ক্ষমতা বিন্যাসের যে ধরন, তাকে বিবেচনায় রেখে আমাদেরকেও অবশ্যই এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা এবং শাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি কিংবা ফ্রান্সের মিশ্র পদ্ধতি ছাড়া আমাদের দেশে কার্যকর ও অর্থবহ গণতন্ত্র চর্চা অসম্ভব। নির্বাচন পদ্ধতিসহ গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তাই আমাদের ঢেলে সাজাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, একজন নির্বাচিত হয়ে গেলে নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকার থাকতে হবে তাকে প্রত্যাহার করে নেয়ারও। অর্থাৎ Re-call System আমাদের প্রবর্তন করতে হবে। সরকারের বিরুদ্ধে শুধু নয়, প্রয়োজনে নির্দিষ্ট মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করে তার বা তাদের বরখাস্ত করার নিশ্চয়তাও বিধান করতে হবে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এমনভাবে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শাসন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বিনষ্ট না হয়। আর এ সম্ভব নির্বাহী বিভাগকে আইন বিভাগ থেকে মুক্ত ও পৃথক করে। তবে যুগপৎভাবে নির্বাহী বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ ও নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্তকে আইন বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষ করে রাখতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট চাইলেই তার ফুফাতো বোনকে রাষ্ট্রদূত করতে পারেন না। কিংবা তার ফুফাতো ভাইকেও মন্ত্রী করতে পারেন না। মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়, যদিও নিয়োগটি প্রেসিডেন্টই দিয়ে থাকেন। আর আমাদের দেশে জামাই, স্ত্রী, শ্যালক–যাকে খুশি যেখানে খুশি হরহামেশা প্রধান নির্বাহীর অভিরুচি অনুযায়ী যখন তখন নিয়োগ দেয়া হয়। এখানেই অনাচার, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি জন্ম নেয়। আজ তাই সময় এসেছে অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি যুক্তিগ্রাহ্য ও অর্থবহ রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলারও। সংসদীয় পদ্ধতির নামে এক ব্যক্তির যে স্বৈরাচারী শাসন পদ্ধতি আমাদের দেশে চালু রয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত অর্থে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ জবাবদিহিমূলক একটি স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি আমাদের গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

৮ ফেব্রুয়ারী ২০০১

ওরা ভয় দেখিয়ে করছে শাসন

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির স্বরূপ কী? এই রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে এর বিবিধ বৈশিষ্ট্যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এক সময়ে বাংলাদেশকে 'তলাহীন ঝুড়ি' বলা হত। বিদেশীরা বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকমহল বাংলাদেশের এই স্বরূপটি, বিশ্বজনমতের কাছে তুলে ধরেছিল স্বাধীনতার পরপর যখন এদেশে মুজিবী শাসন-ত্রাসন চলছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে শত সহস্র কোটি ডলার সাহায্য সত্ত্বেও দেশটির দুঃখ-দৈন্য ঘুচছিল না বরং হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর-মহামারীতে মৃত্যুর কোলে অসহায়ভাবে ঢলে পড়ছিল; কিন্তু ততদিনে বাংলাদেশের জনগণকে শোষণ করার জন্য পাকিস্তানের ২২ পরিবারের পরিবর্তে ২২ হাজার পরিবারের উদ্ভব ঘটেছিল। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু দেশটির অভ্যুদয়ের পরপরই গণতন্ত্র হয়ে ওঠে আওয়ামী শাসকগোষ্ঠীর চক্ষুশূল। স্বাধীনতার পরপর অনেকেই একটি জাতীয় সরকার গঠন করে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশ গড়ার কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে আসার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

জনগণ ঐক্যবদ্ধ হলে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়, জাতীয় সংহতি ও জাতীয় শক্তি সুদৃঢ় হয়। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করার নামে যে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী আসলে তাদের চিরশত্রু পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করতে চেয়েছিল, তাদেরই কারসাজিতে সেদিন জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার এই কাজটি সফল হতে পারিনি। একদিকে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা যে শ্রেণীটিকে পেয়ে বসেছিল তাদের লোলুপতার কাছে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার কোন মূল্যই ছিল না। নিজেদের উদরপূর্তির জন্য ক্ষমতার মসনদকে কিভাবে পাকাপোক্ত করা যায়, সেদিকেই তাদের নজর ছিল। প্রতিপক্ষকে দমনপীড়ন করে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য গঠন করা হয়েছিল রক্ষীবাহিনী। পোশাক-আশাক, প্রশিক্ষণে ও অস্ত্রবলে এই বাহিনীটিকে সুসজ্জিত করে তোলা হয়েছিল। আর এই বাহিনী গড়ে তোলার কাজে ভারত থেকে প্রশিক্ষক আনা হয়েছিল। এই বাহিনীটিকে এমনভাবে মটিভেট করা হয়েছিল, যার মোদ্দাকথা ছিল, ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যারাই কথা বলবে– তারাই দেশের শত্রু। শেখ মুজিবের একচ্ছত্র ক্ষমতার প্রতি যারা চ্যালেঞ্জ জানাবে, তারা দেশের শত্রু। এই রক্ষীবাহিনীর গুলীতেই মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাব ও মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে শহীদ হয়েছিলেন মতিউল ও কাদের । মতিউল ও কাদের মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের মিত্র হওয়া সত্ত্বেও সেদিন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ তাদের সহ্য করেনি। সেদিন ডাকসুর ভিপি ও বর্তমানে সিপিবি'র নেতা জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম পল্টন ময়দানে ছাত্র গণজমায়েতে শেখ মুজিবের ডাকসুর আজীবন সদস্যপদের সনদপত্রটি ছিঁড়ে টুকুরো টুকরো করে ফেলার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। বাংলাদেশ হবার পরপর অনেকেই ভেবেছিলেন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের ন্যাপ এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলো বিরোধী দলের কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু ভিয়েতনামে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরিণামে তাদের ওপর যে ফ্যাসিস্ট হামলার সূচনা হল, তার বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে তারা সেদিন আত্মসমর্পণ ও লেজুড়বৃত্তির পথই বেছে নিয়েছিলেন। এর ফলে দলটির স্বকীয়তা বলতে কিছুই থাকল না। রাশিয়ার সংশোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক উইলিয়ানভস্কির অধনবাদী পথে সমাজতন্ত্র

www.pathagar.com

পড়ে তোলার তত্ত্বে বিভোর হয়ে সিপিবি, মোজাফফর ন্যাপ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাত্র-জনতা কর্তৃক রক্ষীবাহিনীকে রুখে দাঁড়ানোর সাহসিকতাকে হটকারিতা বলে ব্যঙ্গ করলেন। তারা এর মধ্যে স্বাধীনতার সপক্ষশক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির গন্ধ খুঁজে পেলেন। তারা দেখলেন, এর ফলে তাদের দাবী মোতাবেক দেশের সিকিউলার ফোর্স দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে এবং পরিণামে সাম্প্রদায়িক শক্তিরই লাভ হচ্ছে। এরপর পদ্মা-যমুনায় অনেক পানি প্রবাহিত হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পৃথিবীর অন্যতম সামরিক শক্তি সোভিয়েত রাশিয়া কাগুজে বাঘে পরিণত হয়েছে। আজ সোভিয়েত রাশিয়ার কী হতশ্রী চেহারা। একটি রাষ্ট্রের নেতৃত্ব বিপথগামী, দুর্নীতিপরায়ণ ও আত্মসর্বস্ব হয়ে পড়লে পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তিরও কী করুণ রূপ হতে পারে, আজকের রাশিয়ার দিকে তাকালে তা বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়। এদিকে এদেশে সিপিবি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এদের কেউ গণফোরামে যোগ দিয়েছে, কেউবা রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে, আবার কেউ আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও সিপিবির একটি অংশ সেলিমদের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টিকে আঁকড়ে আছে। আমার এখনও মনে পড়ে, '৭০-এর নির্বাচনে ন্যাপের মোজাফফর সাহেব শেখ মুজিবের প্রতি একটি ঐক্যফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। শেখ মুজিব মোজাফফর সাহেবকে পাত্তা দেননি বরং পরিহাসছলে বলেছিলেন, 'ঐক্যের প্রয়োজন কী? দরকার হলে সাইনবোর্ড নামিয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিন'। বাংলায় একটি কথা আছে, 'ভেঙেছিস কলসির কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না'? সিপিবি এই নীতিতেই বিশ্বাসী। জানি না, কী কারণে তারা তাদের প্রেম বিতরণের এই নীতি থেকে কিছুটা সরে এসে হলেও দ্বিধা-দ্বন্দ ঝেড়ে ফেলে নিজস্ব সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য পল্টন ময়দানে এক সমাবেশ ডাকলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের বোমা বিস্ফোরণে কতগুলো নিরীহ মানুষ প্রাণ হারালেন। হাসিনা–সরকারের পুলিশ সামান্যতম সহানুভূতিও প্রদর্শন করল না। এই বোমা বিস্ফোরণের দায়-দায়িত্ব শেখ হাসিনা ও তাঁর মন্ত্রীবর্গ বিরোধীদলের ওপর চাপিয়ে দিলেন বিনা তদন্তে, বিনা অনুসন্ধানে। সেলিমরা এর বিরুদ্ধে হরতাল ডাকলেন। রাজপথে বিক্ষোভ করতে গিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের এক প্রতিমন্ত্রীর হাতে খোদ মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম লাঞ্ছিত হলেন। এরকম ন্যক্কারজনক ঘটনা কী করে একটি সভ্য দেশে ঘটতে পারে, তা ভেবে পাওয়া যায় না। অনুন্নত বিশ্বে এক রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সঙ্গে অন্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সংঘাত-সংঘর্ষ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু যখন ক্ষমতাসীন সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী অন্য একটি দলের নেতাকে লাঞ্ছিত করতে নিজ সাঙ্গোপাঙ্গকে নিয়ে তেড়ে আসেন, তখন বুঝতে বাকি থাকে না, দেশে আর যাই হোক, কোন গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। শুনেছি এই প্রতিমন্ত্রীটি এক সময়ে সেলিম সাহেবেরই একান্ত ভক্ত-কর্মী ছিলেন। আজ ক্ষমতার মসনদে বসে দলীয় নেত্রীর আস্থা অর্জনের অভিলাষে তার পূর্বতন গুরুর গায়ে হাত তুলতে নিজ কর্মীদের নিরস্ত না করে, বরং উসকানিই দিয়েছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবি দেখে তাই অনুমান করা চলে। রাজনীতি যখন ভব্যতার এই ন্যূনতম সীমানাটুকুও মুছে ফেলে তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না, ঈশান কোণে বিশাল মেঘ জমেছে। ঝড় অত্যাসন্ন। আমরা এই কলামে অনেক আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন আদৌ হবে কি? একের পর এক যখন অশুভ ঘটনা ঘটতে থাকে, তখন গণতন্ত্রের একজন সামান্য অনুসারী হিসেবে আশঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না।

ওদিকে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন যাতে ক্ষোভে-দুঃখে, অপমানে পদত্যাগ করে বসেন, সেই উদ্দেশ্যে একটি অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য শেখ হাসিনা মন্তব্য করে বসেছেন, রাষ্ট্রপতি যদি পদত্যাগ করতে চান, তাহলে তিনি তা করতে পারেন। তার এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে তিনি আরও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছেন। জাতির সৌভাগ্য যে, রাষ্ট্রপতি শেখ হাসিনার এই কুমতলব বাস্তবায়নে সহযোগী হননি। নির্বাচন যখন ঘনিয়ে আসছে, ঠিক সেই

www.pathagar.com

সময়ে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে এ রকম নির্লজ্জ উক্তি একটি বিশাল ব্লুপ্রিন্টেরই অংশ, তা কি কারও বুঝতে বাকি আছে? ষড়যন্ত্র তার শত সহস্র ডালপালা ছড়াচ্ছে। মসজিদে নিহত পুলিশের লাশ উদ্ধারের মত বীভৎস ঘটনাও ঘটেছে। সেনানিবাসের মত সুরক্ষিত এলাকায় এমপি চেকপোস্টের সামনে যখন রিকশা আরোহী সিটের নিচে রাখা বোমা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত হয়, তা কিসের আলামত, দেশবাসী বুঝতে পারে। একদিকে ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের বিরোধিতার নামে রণহুংকার, অন্যদিকে তথাকথিত নাগরিক সমাবেশের মঞ্চ থেকে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদের আহ্বান এবং আগামী নির্বাচনে এদের ভোট না দেয়ার ডাক দেশকে দ্বিধাবিভক্তি, সংঘর্ষ এবং গৃহযুদ্ধের পথে ঠেলে দেয়ারই অপকৌশল।

ধর্মীয় প্রশ্নগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ধর্মের নামে ধর্মান্ধতা ও উগ্রতা যেমন কাম্য নয়, তেমনি ধর্মান্ধতাকে প্রতিহত করার নামে ধর্মীয় অনুভূতিগুলোকে আহত করার অধিকারও কারও নেই। আমি যতদূর বুঝি, এনজিও সংগঠনগুলোর দায়িত্ব হলো দারিদ্র্য নিরসন, দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতীয় অগ্রগতির জন্য কাম্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। কোন সুনির্দিষ্ট দলের পক্ষে দাঁড়ানো কিংবা কোন সুনির্দিষ্ট দলের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন দেখা হয়নি। মানবিকতার পক্ষে দাঁড়ানোর নামে মানবিক ট্রাজেডি সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগালে তাতে আর যাই কিছু হোক না কেন, মানুষের কোন কল্যাণ হবে না। সমাজে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের যেমন সংঘাত আছে, তেমনি আধুনিকতা ও ঐতিহ্য পরস্পরের কাছ থেকে পুষ্ট হয়ে সমাজ অগ্রগতির পথ রচনা করে। আলজিরিয়ায় ইসলামপন্থী সালভেশন ফ্রন্ট নির্বাচনে জয়যুক্ত হলে সে নির্বাচন বাতিল করা হয়েছিল, তার পরিণতিতে আলজিরিয়ায় আজ রক্তগঙ্গা বইছে। তুরস্কেও কারসাজি করে ইসলামপন্থী গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা হয়। তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষতা এমন চরম অন্ধ চর্চায় পরিণত হয়েছে যে, প্রকাশ্য স্থানে নামাজ পড়াও এখন অসাধ্য। এসব করে ধর্মনিরপেক্ষতার কতটুকু লাভ হয়েছে, নিরূপণ করা কঠিন। কিন্তু সামাজিক স্থিতিশীলতা যে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। একজন মানুষকে হত্যা করে একটি মতাদর্শকে হত্যা করা যায় না। একটি অনগ্রসর মতাদর্শকে একটি উচ্চতর ও মহত্তর মতাদর্শের শক্তি দিয়েই পরাস্ত করা যায়। যুক্তি যখন রুদ্ধ হয়, বুদ্ধি যখন বন্দী হয়, তখন সকল শুভ উদ্যোগেরই মৃত্যু ঘটে। এ কথাটা আজকের বাংলাদেশে বোঝা অত্যন্ত জরুরী। তবে, সবচাইতে উদ্বেগের বিষয়টি হলো, বাংলাদেশে প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতার এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এখানে নেতার 'সম্মান' রক্ষার জন্য আইনের আশ্রয় নিতে হয়। জনগণের মন থেকে উৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার ওপর শাসকগোষ্ঠী শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে যার গুণকীর্তন ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের যে বজ্র আঁটুনি বাঁধা হলো, তা বস্তুত ঐ মানুষটিকে খাটো করেছে। এ কথাটি বোঝারও ক্ষমতা ক্ষমতার মদমত্ততায় ক্ষমতাসীনরা হারিয়ে ফেলেছে।

বাংলাদেশ আমাদের অতি প্রিয় মাতৃভূমি। এদেশের জনগণের ঐক্য, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা সমাজ জীবনের শান্তি ও স্থিতিশীলতা আমাদের একান্ত কাম্য। অথচ এই পরম প্রিয় আকাঙ্ক্ষাটিকে টুটি চেপে হত্যা করতে চাইছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যে রাষ্ট্রটির কাছে উদ্বেগের বিষয়, তারাই। এই অভিসন্ধির ব্যাপারে সকল মহলের সজাগ থাকার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী। সীমান্ত দিয়ে অবাধে প্রতিদিন অস্ত্র আসছে। এই অস্ত্র জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে কোথায় যাচ্ছে, কার হাতে যাচ্ছে– সেটা এক বিরাট প্রশ্ন। যারা চায় না এ দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হোক তারাই অস্ত্রের মজুত গড়ে তুলছে। বিদেশীরাও এ নিয়ে উদ্বিগ্ন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এ নিয়ে বিবদমান গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে বৈঠক করছে। তারা কি জানেন, তাদের সুপরামর্শের প্রতি কারা কর্ণপাত করবে? এছাড়া এ দেশে নির্বাচনী কারচুপির হাজারো কৌশল আছে? ব্যালট বুথ দখল করা, জাল ভোট দেয়া, ব্যালটপত্রে সিল মারা, কালো টাকার ছড়াছড়ি, নির্বাচনের আগে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় শাসকদল কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ এবং ত্রাস সঞ্চার করে

www.pathagar.com

অপছন্দনীয় ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসতে না দেয়া– সবই এই কৌশলের অন্তর্গত। হাজার হাজার ভোট কেন্দ্রে বিদেশী পর্যবেক্ষকরা এসে এসব রোধ করতে পারবে না। ভোটের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ তখনই সৃষ্টি হতে পারে, যখন ভোটার তালিকা প্রণয়ন থেকে শুরু করে ভোট প্রদান, ভোট গণনা, ভোট তালিকাভুক্তকরণ সবকিছুই স্বচ্ছ হয়। এখানে যখন সকল পর্যায়ে অস্বচ্ছতা চলছে, তখন সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাত বদল হবে এমনটি আশা করা আর মরীচিকার পেছনে ধাবিত হওয়া সমার্থক। সরকারের মন্ত্রীরা বলছেন, শেষ দিন পযন্ত তারা ক্ষমতায় থাকবেন। আমার কাছে মনে হয়, শুধু শেষ দিনই নয়, শেষ দিনের পরেও প্রক্সি ক্ষমতায় থাকার পথেই তারা আটসাঁট বেঁধে অগ্রসর হচ্ছেন। আর এর পাশাপাশি বাংলাদেশের গ্যাস ও তেলসম্পদ এবং বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মুরব্বিদের রয়েছে নানা রকম খেয়াল ও মর্জি। এই জটিল পরিস্থিতিতে বিরোধী দলগুলো বারবার 'গণঅভ্যুত্থানের' হুংকার দিলেও মানুষের মধ্যে আস্থার সঞ্চার করতে পারছে না। ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্যই হলো একটা ভীতি, আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে জনমতের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ স্তব্ধ করে দেয়া। এ কাজটিতে শাসকদল যে পরিমাণে সক্ষম, একই পরিমাণে বিরোধী দলগুলো ব্যর্থ। আমরা জানি, জনগণের ক্ষমতা অজেয়। ফিলিপাইনের জনগণ দুই-দুইবার তা প্রমাণ করেছে। পেরুর জনগণ আলবার্তো ফুজিমরোর মত দোর্দণ্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্টকেও বিদেশে অবস্থানরত অবস্থায় ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। তবে ঘটনাটি ঘটেছে একটি সাজানো নির্বাচনের নাটক ঘটাবার পর। রুমানিয়ায় ক্ষমতাধর নিকোলাই চসেস্কু শেষ পর্যন্ত রুমানিয়ার মাটিতে চির নিদ্রায় শায়িত হতে পারেননি। হেলিকপ্টারে করে তার বুলেটবিদ্ধ লাশ কৃষ্ণসাগরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। মহাপরাক্রমশালী হিটলার শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে তার জীবনের ইতি টানেন। কিন্তু তিনি তার নিজ দেশ জার্মানী ও ইউরোপসহ বিশ্বের বিশাল অংশকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করে যান। স্পেনে ও পর্তুগালে ফ্রাঙ্কো ও সালাজারের শাসনের কৃষ্ণ অধ্যায়ের অবসান হতে অনেক বছর লেগেছিল। ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো ও ফিলিপাইনের মার্কোস দীর্ঘদিন তাদের দেশের জনগণকে নিজ দেশে বন্দী দশায় আবদ্ধ করে রেখেছিলো। ইতিহাসে দেখা যায়, কখনো বা অশুভ শক্তি বেশী দিন ক্ষমতার দাপট দেখাতে পারে না, আবার অনেক সময়ে কালো রাত্রির অন্ধকার শেষ হয়ে প্রভাতের সূর্যোদয় অনেক বিলম্বিত হয়। এই দুটো সম্ভাবনাই কার্যত সম্ভব, তবে, কালো রাত কত দীর্ঘ হবে তা নির্ভর করে ত্যাগ স্বীকারে আমরা কত প্রস্তুত তার ওপরে। বিনা ত্যাগে মহৎ কিছু অর্জিত হয় না। বাংলাদেশের মত দেশে জনগণের হয়ে কথা বলব, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করব, এগুলো কেবল কথার কথা নয়, এর জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড আদর্শবোধ, ত্যাগের মানসিকতা, ভোগের প্রতি নিস্পৃহতা এবং প্রয়োজনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেবার মত সাহস। যে দেশে অধিকাংশ সংবাদপত্র ফ্যাসিবাদীদের ও আধিপত্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন, যে দেশের বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত সমাজ মোহগ্রস্ত, যে দেশে জাতীয় বিভাজন সুতীব্র, যে দেশে আইনের শাসন অপসৃত, সেদেশে গণতন্ত্র কেবলমাত্র সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মানুষ যদি নিজের উপর ও তাদের আস্থার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারায়, তখন দুর্যোগের রাত দীর্ঘ হয়। তবু আমরা সুপ্রভাতের প্রতীক্ষায় আছি। এখনও যারা আত্মস্বার্থ ভুলে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়ে চলেছেন– তাদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ সালাম।

আফতাব আহমাদ :

রাজনীতির ময়দানের খেলাটা বেশ জমে উঠেছে। এই নির্বাচনী বছরে এসে ময়দানের দিকে তাকালে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সবদিক থেকেই প্রমাণিত হয়েছে, শেখ হাসিনাই সেরা খেলোয়াড়। তিনি যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এ ময়দানে নেমেছিলেন, তা থেকে একচুলও নড়েননি এবং ষোলআনার পরিবর্তে বিশ আনাই লাভ করেছেন। আমরা যারা শেখ হাসিনার রাজনীতি ও তার কলাকৌশলের সাথে একমত নই, আমাদেরও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, হাসিনার কোন বিকল্প নেই। হাসিনার তুলনা কেবল হাসিনাই।

www.pathagar.com

কেউ তাকে পছন্দ করুক আর না করুক, তার কথা ও কাজে খুব একটা গরমিল খুঁজে যাওয়া যায় না। অবশ্য যারা তার কথা ও কাজ বুঝতে অক্ষম, তাদের কাছে মনে হতে পারে যে, হাসিনার কথা ও কাজে অনেক গরমিল রয়েছে। হাসিনার সর্বশেষ উক্তিটিই আমরা বিচার করে দেখি না কেন। তিনি বলেছেন, মেয়াদ শেষ করার আগে এখন ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে বিরোধীদল যখন 'গণঅভ্যুত্থান' করে তাকে হটাবার হুংকার ছেড়েছে। বিরোধীদলের গণঅভ্যুত্থানের ধরন-ধারণ দেখার অপেক্ষায় তিনি রয়েছেন।

আসলে শেখ হাসিনার এই উক্তি বিরোধীদলের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনই মাত্র। কথায় বলে, যত গর্জে তত বর্ষে না। বিরোধীদল ক্ষমতার ধন্বন্তরী বটিকা আপসে গলাধঃকরণ করার খোয়াবে বিভোর থেকে থেমে থেমে 'গণঅভ্যুত্থান' ঘটাবার নিনাদ যেভাবে তুলছে, তাতে মনে হবে, গণঅভ্যুত্থান বালক-বালিকাদের হাতের মোয়া। ঢাল নাই, তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার। বিরোধী শিবিরকে ভারতীয় চর, নিয়োগী ও দালালরা মহামারী আকারে যেভাবে সংক্রমিত করেছে এবং তোয়াজ করার মাধ্যমে কোন ঝুঁকি না নিয়ে নন্দলাল সেজে ক্ষমতার মসনদে বসার যে খায়েশ পেয়ে বসেছে, তাতে আর যাই হোক, গণঅভ্যুত্থান তো দূরের কথা একটি অর্থবহ গণসংগ্রাম রচনা করাও সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগ কলাগাছ নয়, যার সাথে পিঠ ঘষে পিঠের চুলকানি সারা যায়। আওয়ামী লী·া মাদার গাছ। পিঠে খুজলিওয়ালাদের মনে রাখা দরকার, এই মাদারগাছের সাথে পিঠ ঘষলে স্বস্তি পাবার কোন কথা নয়; পিঠের ছাল উঠে যাবে। আর আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা ছাল তোলার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। লক্ষ্মীপুরের তাহের বাহিনী যখন নিবেদিতপ্রাণ আইনজীবী নূরুল ইসলামকে কেটে টুকরো টুকরো করে মেঘনা গর্ভে ভাসিয়ে দেয়, তখন বিরোধী দলকে কপাল চাপড়ে গালে হাত দিয়ে হা করে থাকতে দেখি আমরা। ক্রন্দনরোল তুলে বিরোধীদল ধরা গলায় বলে, এটা কী হল? এরা বুঝতেও অক্ষম যে, আওয়ামীরা তাদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য হেন কাজ করতে কখনই পিছপা হবে না, কিংবা সংকোচবোধ করবে না। আর তাই লক্ষ্মীপুরের ত্রাস, মনুষ্যরূপী দানব তাহের নামক এই ইচ্ছাপিতার বিরুদ্ধে সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকাও যখন সোচ্চার তখন শেখ হাসিনা জাগ্রত জনতার উদ্দেশে চোখ রাঙিয়ে বলেন, 'খালি তাহেরের নাম উচ্চারিত হয় কেন?' আর হাসিনার মন্ত্রিসভার ডাকসাইটে মন্ত্রীরা বলেন, তাহের তাদের অহঙ্কার। এই না হলে আর আওয়ামী লীগ? নিজ দলের নেতা-কর্মী সমর্থক যে-ই হোক না কেন, তাকে আওয়ামী লীগ শত্রুর মুখে ঠেলে দেয়া তো দূরের মথা, কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করতে রাজি নয়। তাই সরকারসমর্থক পত্র-পত্রিকা এসব ইচ্ছাপিতার বিরুদ্ধে যত গণতান্ত্রিক সংগ্রামের আহ্বান জানাক না কেন, আওয়ামী লীগ তার গোত্রীয় মস্তান ও পাণ্ডাদের সুবোধ, সুশীল ও সজ্জন বলেই তাদের পক্ষে প্রচার অব্যাহত রাখছে। আর এমনি অবস্থাতেই ইচ্ছাপিতাদের পক্ষে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলা সম্ভব– আমার বিরুদ্ধে কিছু লিখলে হাত-পা কেটে ফেলা হবে। এরপরও সরকার কিংবা সরকারী দল এসব ইচ্ছাপিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইন কিংবা বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখে না।

আর বিরোধী দলসমূহ? তারা একদিকে ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম চায়, অন্যদিকে দলীয় সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টিতে অনাগ্রহী। একক ক্ষমতায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে পেরে না উঠে ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে জোড়াতালি দিয়ে বিরোধী শিবির একটি ঐক্যমোর্চা গঠন করলেও পরস্পরের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে যেভাবে কানামাছি খেলা খেলছে, তাতে আর যাই হোক, একটি সুসংহত রাজনৈতিক আন্দোলন রচনা করা সম্ভব নয় এবং এটি বারবার প্রমাণিত হচ্ছে। বিরোধীদল আন্দোলনের নামে জনগণের সঙ্গে যে মশকরা করছে, তা শুধু দুঃখজনকই নয়, দুর্ভাগ্যজনকও বটে। বিরোধী শিবিরের শরিক দলগুলোর নেতাদের যখন সরকার পক্ষ সরাসরি আক্রমণ করে, কিংবা রাজনৈতিক মামলা রুজু করে, তখন লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিএনপি নেতা-কর্মী না হলে অন্য কারও ব্যাপারে বিরোধী শিবিরের আগ্রহ কম। বিএনপির অবশ্য একটা দম্ভ আছে, তাদের দল বড়, তাই তাদের গুরুত্ব

www.pathagar.com

বেশী হতে হবে। কথাটা একেবারে মিথ্যেও নয়। কিন্তু এটিই একমাত্র চরম সত্যও নয়। বিএনপি একাই যদি আওয়ামী দুঃশাসনের কালো পাহাড়কে সরাতে পারতো, তাহলে এরশাদ এবং অপর দুটি ইসলামী সংগঠনের সঙ্গে ঐক্যজোট করতে গেল কেন? '৯৫-৯৬-এর সহিংস সন্ত্রাসী আওয়ামী আন্দোলনের সময়ে আজকের মান্যবর মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাককে আমি প্রশ্ন করে বলেছিলাম, "রাজ্জাক ভাই, সারাক্ষণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে শেষ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে কী করে জোট বাঁধলেন?" উত্তরে রাজ্জাক ভাই বলেছিলেন, "দ্যাখ, রাজনীতিতে প্রথমেই খেয়াল রাখতে হয় প্রতিপক্ষের শক্তি কিভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। তোরা সবাই মিলে আমাদের তো ক্ষমতার পিঁড়ি থেকে তাড়ালি, তারপর থেকেই শুধু ভাবছি, কিভাবে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া যায়। অনেক ভেবে দেখলাম, পঁচাত্তরোত্তর রাজনীতির প্রবক্তারা যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা বলে, সেখানে ফাটল ধরতে পারলেই আমাদের কাজ হাসিল হয়ে যাবে। বাংলাদেশী ভাবধারার ভোটকে ভাগ করাতে হলে জামায়াত-এরশাদ এবং যারা বিএনপির সঙ্গে সমস্বরে বাংলাদেশী ভাবধারার কথা উচ্চারণ করে তাদেরকে আলাদা করে ফেলতে পারলেই আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় বসতে পারবে। কাজেই জামায়াতের সঙ্গে জোট বাঁধতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই"। রাজ্জাক ভাই এবং আওয়ামী নীতিনির্ধারকদের কৌশল যথার্থই প্রমাণিত হয়েছে। '৯৬-এ বাংলাদেশী ভাবধারার জনসাধারণকে বিভক্ত করে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ একশ্রেণীর গণবিরোধী এনজিও ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সক্রিয় সমর্থনে ক্ষমতা লাভ করে। এই অংকটি রাজনীতির ময়দানের খেলোয়াড়দের সকলের কাছে এখন মোটামুটি খোলাসা হয়ে আছে। 'এপার বাংলা, ওপার বাংলা' ভারতীয় আধিপত্যকামী রাষ্ট্রঘাতী বাঙালি জাতীয়তাবাদী যে ভাবধারা বাংলাদেশে বলপূর্বক সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে, তার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বকে নির্মূল করে দেয়া এবং বাংলাদেশকে ভারতীয় ইউনিয়নভুক্ত করা। অতএব 'এপার বাংলা, ওপার বাংলা' তত্ত্বের বাঙালি ভাবধারার মধ্যে ফাটল ধরানো একটি আবশ্যকীয় দেশপ্রেমিক কর্তব্য। কারণ, 'এপার বাংলা, ওপার বাংলা' বলতে কিছু নেই। এপার বাংলাদেশ, ওপার ভারত। ভারতের বাংলাভাষী রাঢ়ীরা যদি কখনো কোন মুহূর্তে ভারতীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করে আসে, তাহলে তাদের জন্য স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি তো রয়েছে। 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' তত্ত্ব কপচানোর আড়ালে বাংলাদেশকে ভারতভুক্তির কোন প্রয়োজন নেই।

ভারতের কৃপাপুষ্ট আওয়ামী নেতৃত্ব এবং ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজাল এ বিষয়গুলো ভালই বোঝে। তাই যেসব রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বুলন্দ আওয়াজ তুলে এখনও 'এপার বাংলা ওপার বাংলার' বাঙালি ভাবধারায় হাবুডুবু খাচ্ছে, তাদের মধ্যে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশপ্রেম যদি জাগ্রত হয় ভারতের স্বার্থেই তা কঠোর হস্তে দমন করা দরকার। আর এ জন্যই দেখি এককালের আওয়ামী লীগের লেজুড় ও বি টিম নামে খ্যাত মণি সিং এর কমিউনিস্ট পার্টি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে রাস্তায় গণতন্ত্রের আওয়াজ তুলে মিছিল করলে হাসিনা-মন্ত্রিসভার দয়ামায়াহীন প্রতিমন্ত্রী মায়া সেলিমকে তেড়ে আসেন ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করতে। শুধু তাই নয়, এরও আগে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার জন্য সেলিমদের সমাবেশে বোমা ফাটানো হয়। সেলিমপন্থী কমিউনিস্টরা বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানানো সত্ত্বেও সরকার ও সরকারী দল ঘটনার জন্য ইসলামপন্থী দলের ওপর দোষ আরোপ করে। সেলিমের কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য সরকারী এ বটিকা গিলতে নারাজ। অতএব এক হাত দেখে নাও সেলিমকে। সাবাস হাসিনা। সাবাস আওয়ামী লীগ! মনে পড়ে, আজ থেকে ২৭ বছর আগে তৎকালীন আওয়ামী যুবলীগের সেক্রেটারী জেনারেল নূরে আলম সিদ্দিকী সেলিমদের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশে বলেছিলেন, 'ওটি হচ্ছে আওয়ামী হেরমের, রক্ষিতা বা উপপত্নী। উপপত্নী হিসেবে তারা আদর চাইতে পারে, সোহাগ চাইতে পারে, অলঙ্কার চাইতে পারে, ভূষণ চাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদা চাইতে পারে না'। আওয়ামী সংজ্ঞায় মুক্তিযুদ্ধের

www.pathagar.com

চেতনার অর্থই হলো আওয়ামী লীগের ধ্বজাবারী হতে হবে এবং সবকিছুকে প্রধানমন্ত্রীর পিতার স্বপ্ন হিসেবে মেনে নিতে হবে। এর ব্যতয় ঘটলেই মুগুর।

সেলিমরা কিংবা রাশেদ খান মেননরা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়াত্বের যে প্রান্তে পৌঁছেছেন, সেখানে তারা ভুলে যান যে, মুজিবী ঝাণ্ডা আর মুজিবী আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করতে হলে মুজিবের তৈরী সংগঠনে একাকার হয়ে যাওয়াটাই শ্রেয়। 'আমার যেমন বেণী তেমন রবে, চুল ভিজাবো না। রাঁধিবো, বাড়িবো, ব্যঞ্জনও কুটিবো, হাঁড়ি ছোঁবো না' এই সতীপনা নিয়ে আর যাই হোক, রাজনীতি হয় না। মতিয়া চৌধুরী এবং নূরূল ইসলাম নাহিদদের কাছ থেকেও কি এরা কোন শিক্ষা নিতে পারেনি?

দেশে সংকট ক্রমে ঘনীভূত হয়ে চলেছে। যতই দিন পার হচ্ছে, নির্বাচনের সম্ভাবনা ততই তিরোহিত হচ্ছে। হাসিনা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন, এ দেশের কোন মানুষ তার পিতার মৃত্যুতে যেমন ইন্না লিল্লাহে.......পড়েনি, তেমনি জনগণ তাকে ক্ষমা করে দিয়ে একটি সুযোগ দেয়ার পর যে শিক্ষা পেয়েছে, তাতে জীবনে আওয়ামী লীগকে আর ভোট দেয়ার কোন কারণ নেই। অতএব ক্ষমতায় থাকতে হলে গায়ের জোরে এবং কৌশলী কারচুপির মাধ্যমে থাকতে হবে। এ জন্য সবার আগে প্রয়োজন, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের মত একজন সজ্জন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারণ করা। তাই সকল ভব্যতা ও শিষ্টাচার ত্যাগ করে হাসিনা বলতে পারলেন, সাহাবুদ্দীন সাহেব পদত্যাগ করলে বাধা দিতে পারি না। আমরা নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করব। ইঙ্গিতটি অত্যন্ত স্পষ্ট। একই সঙ্গে বিরোধী শিবিরকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়ার জন্য ঢালাও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকারী দল। মুফতি আমিনী গ্রেফতার হয়েছেন, অশীতিপর শায়খুল হাদীস গ্রেফতার হয়েছেন জননিরাপত্তা আইনে। রাস্তায় বিচারপতিদের প্রাণসংহারের হুমকি দিয়ে লাঠিমিছিল বের হয় কিংবা সংসদের মেঝেতে দাঁড়িয়ে সুরঞ্জিত সেনের মত ভোল ও বোল পাল্টানো রাজনীতিক বিচারকদের রক্তচক্ষু দেখান, তখন কোথাও টুশব্দটি উচ্চারিত হতে দেখি না। আজ সুশীল সমাজের নামে জনসমাজভুক্ত যেসব সুবিধাজীবী নাগরিক ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের নামাবলী গায়ে দিয়ে মাঠে নেমেছে, তাদের উদ্দেশ্য একটাই– এ দেশ থেকে মুক্ত চিন্তাকে নির্বাসিত করা, যুক্তির পথকে রুদ্ধ করা ও বহুমতকে উপড়ে ফেলা। এক মত, এক পথ, এক নেতা, এত তত্ত্ব, এক দেশ–এই ফ্যাসিস্ট সর্বগ্রাসী দানবীয় দর্শনকে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজ বিদেশের টাকায় পরিচালিত এক শ্রেণীর এনজিও গোষ্ঠী এবং ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ইহুদীবাদের অর্থানুকূল্যে এ দেশে যে কৃত্রিম ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলার কসরত করা হচ্ছে, তার লক্ষ্য একটিই– ভারতের অনুগ্রহ লাভ এবং ভারতের বশংবদ আওয়ামী গোষ্ঠীকে আরেকবার ক্ষমতায় বসানো। বিরোধী দল 'কঠোর কর্মসূচী' ও গণ অভ্যুত্থানের খোয়াবে বিভোর থেকে নর্তন-কুর্দন কম দেখায়নি। কিন্তু সবই 'পর্বতের মূষিক প্রসব'। অন্যদিকে হাসিনার কথায় কোন নড়ন-চড়ন নেই। যাদের এক হাত দেখে নেয়ার, তিনি তাদের এক হাত নয়, দুই হাতই দেখে নিচ্ছেন। এমনি বাধাহীনভাবে তিনি যদি তার শাসনকার্য অব্যাহত রাখতে পারেন তাহলে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে তাকে খুব একটা বেগ পেতে হবে না। কিন্তু আওয়ামী লীগের আরও একবার ক্ষমতা লাভের অর্থ বাংলাদেশের বিলুপ্তি– এটি যে কোন গবেটও দেয়ালের লিখন পাঠ করলেই বুঝতে পারবে। তবে কি আমরা চরম হতাশা ও তামাসাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকব? সুবেহ কাজের যত ঘনীভূত হবে, মনে রাখতে হবে, সুবেহ সাদেক তত সন্নিকটে। চারিদিকে যখন নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা বিরাজমান, মনে রাখতে হবে তখন প্রলয় অপেক্ষমাণ। এই প্রলয়ে সবকিছু তছনছ হয়ে যাবে, মিছমার হয়ে যাবে। প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে। Nature abhors vacuum–এ কথাটি বিস্মৃত হয়ে ক্ষমতার মদমত্ততায় যে যতই বাকুক বাকুম করুক না কেন, প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

www.pathagar.com

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০১

আওয়ামী বিরোধী হলেই স্বাধীনতা বিরোধী?

মাহবুব উল্লাহ :

দেশে আজ বিরাজ করছে গভীর এক সংকট। এই সংকট রাষ্ট্রে, সরকারে, বিরোধীদলে, সমগ্র জনজীবনে। জাতীয় জীবনের প্রতিটি দিকই এই সংকট আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। যে চারটি সংকটের কথা উল্লেখ করেছি, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ অত্যন্ত কঠিন ও বন্ধুর। একভাবে বিবেচনা করলে এটাই মনে হবে, সরকারে কোন সংকট নেই। একটি পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি কোয়ালিশন সরকার দেশ চালায়, তাহলে কোয়ালিশন থেকে কোন শরীফ দল সমর্থন প্রত্যাহার করলে সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে বিশটি দল নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠন করেছে। এই সব দলের মধ্যে আদর্শগতভাবে অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অভিজ্ঞ ও ধীশক্তিসম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ রাজনীতিবিদ অটল বিহারী বাজপাইর নেতৃত্বগুণের কারণে কোয়ালিশন ধরে রাখা সম্ভবপর হয়েছে। মাঝে মাঝে দেখতে পাই, কখনো তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী, আবার কখনো তেলেগু দেশম পার্টি এই কোয়ালিশনের অভ্যন্তরে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোয়ালিশন তেমন কোন হুমকির মুখে নেই। কোয়ালিশন গঠন করে সরকার টিকিয়ে রাখা একটি আর্ট। বাজপাই সেই আর্টের একজন কুশলী শিল্পী। মালয়েশিয়াতে মাহাথির মোহাম্মদের নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন দীর্ঘদিন ধরে দেশের শাসন ক্ষমতায় আছে। কিছুদিন আগে সেখানে যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনে মাহাথির মোহাম্মদের প্রতি সমর্থনে কিছুটা ভাটা দেখা দিলেও সরকার ও রাষ্ট্রের ওপর মাহাথির বেশ শক্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন। এককালে তার উপপ্রধানমন্ত্রী ও সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে তার মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে আনোয়ার ইব্রাহিমকে পদত্যাগ করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত কারারুদ্ধ হতে হয়। আনোয়ার ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও নৈতিক স্খলনের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং বিচারও চলছে। আনোয়ার ইব্রাহিমের স্ত্রী একটি নতুন দল গঠন করেছেন। মাহাথির মোহাম্মদেরও অনেক বয়স হয়েছে। কাজেই ক্ষমতার মঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ানোর সময় এসে গেছে। আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বিরোধ না হলে সম্ভবত এ সময়ে তিনিই প্রধানমন্ত্রী থাকতেন। আনোয়ার ইব্রাহিমের পেছনে ইসলামপন্থীদের সমর্থনের কথা শোনা যায়। তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করে বেশ আলোড়নও সৃষ্টি করেন। এই গ্রন্থে উদার ও বাজার অর্থনীতির পক্ষে আনোয়ার ইব্রাহিম চমৎকার যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। ইসলামপন্থী হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যেমন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ আনোয়ার ইব্রাহিমের এই গ্রন্থটির প্রতি বেশ উৎসাহ দেখিয়েছে। মাহাথির মোহাম্মদ তাঁর স্বাধীন অর্থনৈতিক নীতি ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টিতে খুব পছন্দনীয় ব্যক্তি নন। কিন্তু তাঁর মেধা, রাষ্ট্রপরিচালনার যোগ্যতা এবং বিশেষ করে এশিয়ান অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে তিনি যেভাবে মালয়েশিয়াকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন, তা বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করে এবং পাশ্চাত্যের নীতি নির্ধারকদেরও তাকে সমীহ করে চলতে বাধ্য করে। মালয়েশিয়া থেকে প্রাপ্ত সূত্রে জানা যায়, সে দেশের নবপ্রজন্ম আনোয়ার ইব্রাহিমকে যথেষ্ট মূল্য দেয়। আবার, অন্যদিকে মাহাথির মোহাম্মদের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি পুরাতন প্রজন্মের জীবনে যে শুভ পরিবর্তনের সূচনা করেছে, তার ফলে অধিকতর বয়স্ক ব্যক্তিরা মাহাথিরকেই সমর্থন করে। পুরাতনরা যে প্রাপ্তিতে

www.pathagar.com

সন্তুষ্ট, নতুনরা বর্তমান অবস্থান থেকেও আরো উন্নততর পর্যায়ে যাবার জন্য অস্থির। সে কারণে মালয়েশীর সমাজে এক অপ্রকাশ্য দ্বন্দ্ব চলছে। এই দ্বন্দ্বের উপর মাহাথির যতদিন নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন, ততদিন হয়ত তাঁর কোন সমস্যা হবে না। অন্যদিকে, আনোয়ার ইব্রাহিম যে বর্তমান রাজনৈতিক অসহয়াত্ব কাটিয়ে উঠতে পারবেন না– সেটা হলপ করে বলা যায় না।

ইন্দোনেশিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান ওয়াহিদ, যিনি গুজদুর নামে পরিচিত, তিনিও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্টের স্পীকার তাঁর বিরুদ্ধে ইমপীচমেন্টের অভিযোগ আনয়নের জন্য পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অসুস্থ ও শ্রবণশক্তিরহিত এই প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ বেশ পাকা। নির্বাচনে সুকর্নপুত্রী মেঘবতীর মত ভাল ফল না করলেও রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি অলংকৃত করতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে সমর্থন আদায় করে নেন এবং প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হন। প্রেসিডেন্ট হবার পর তাঁকে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে পদক্ষেপ ফেলতে হয়েছে। ক্ষমতাহারা প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর হাতে গড়ে তোলা সেনাবাহিনীকে নিজের মত করে ঢেলে সাজাতে হচ্ছে, পূর্ব তিমুর হাতছাড়া হয়ে যাবার সমস্যাটিও তিনি বেশ দক্ষতার সাথে সামাল দিয়েছেন। অপরদিকে, কয়েক হাজার দ্বীপ নিয়ে গঠিত ইন্দোনেশিয়ায় বিচ্ছিন্নতার সমস্যাও তাঁকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এতসব সমস্যা সত্ত্বেও শুরুর দিকে ওয়াহিদ মেঘবতীকে গুরুত্ব দেননি। কিন্তু একথা বুঝতে তাঁর কষ্টও হয়নি, একদিন মেঘবতীর সমর্থন প্রয়োজন হবে। মেঘবতীকে তিনি তাই ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করলেন। কিন্তু মেঘবতীর হাতে কোন প্রকার প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন না। পরবর্তীতে যাও বা করলেন, তাও তাঁর সম্মতিসাপেক্ষ। কিন্তু কিছু বিষয় মেঘবতীর হাতে ছেড়ে দিলেন। সাম্প্রতিক সংকটে তিনি মেঘবতীর সমর্থন পাচ্ছেন বলেই মনে হয়। তারপরও, সংবাদপত্রে জল্পনাকল্পনা চলছে, ওয়াহিদকে ফিলিপাইনের এস্ত্রাদার মত পরিণতি ভোগ করতে হবে কিনা।

বাংলাদেশে শেখ হাসিনা যখন সরকার গঠন করেন, সে সময় সংসদে তার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদকে কারাগার থেকে বের করে নিয়ে এসে জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে তিনি সরকার গঠন করেছেন। সরকার গঠনের পর মহিলা সংসদ সদস্যদের সমর্থন বলে শেখ হাসিনার এখন সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তা সত্ত্বেও তিনি খুব আশ্বস্তবোধ করছেন, এটা বলা যাবে না। কারণ, কয়েক মাসের মধ্যে বিরোধীদল সংসদ অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত থাকার ফলে সংসদ প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এখন সংসদে যে সব আইন পাস হয়, তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ছাপ থাকে বটে, কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। কারণ, বিরোধীদল সংসদে নেই। অন্যদিকে বিরোধী দল সংসদে না থাকলেও রাজপথে তেমন কোন অর্থপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছে না। এর কারণ সম্ভবত বিরোধীদল কী করবে না করবে, সে সম্পর্কে মনস্থির করে উঠতে পারছে না। বিরোধীদলের মধ্যেও মতাদর্শগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত টানাপড়েন রয়েছে। সরকার একের পর এক তাদের হাতে মারাত্মক ইস্যু তুলে দিলেও তারা জনগণকে দিকনির্দেশনা দিতে পারছে না। সংসদ বর্জনের পর যখন দেখা গেল, একনাগাড়ে নব্বই কর্মদিবস অনুপস্থিত থাকার ফলে সংসদ সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে, তখন বিরোধীদলীয় সদস্যরা সংসদের খাতায় নাম দস্তখত করে আসলেন। এদের মধ্যে ব্যতিক্রম দু-একজন সদস্য যাঁরা সংসদের অকার্যকারিতার ওপর বক্তব্য রেখেই নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করলেন, হাজিরা বইতে স্বাক্ষর করলেন না; খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন তাঁরা। তবে সব মিলে ফল দাঁড়াল সংসদ বর্জনের মত পদক্ষেপকেও রাজপথের আন্দোলন দিয়ে তারা অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারেননি। সুযোগ বুঝে শেখ হাসিনা তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বিরোধীদলের প্রতি বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়ে মারলেন।

www.pathagar.com

এসব বিদ্রূপাত্মক উক্তিতে তীক্ষ্ণতা আছে, গভীর ক্ষতেরও সৃষ্টি করে, কিন্তু শালীনতার সীমা ডিঙিয়ে যায়। যা একজন প্রধানমন্ত্রীর জন্য মোটেও সুশোভন নয়, সঙ্গতও নয়। সংসদকে ঘিরে এবং রাজপথকে নিয়ে বিরোধীদল যে একটি সংকটে আছে; তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে বিদ্রূপ, কটূক্তি ও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সংসদ থেকে বিরোধীদলকে বাইরে থাকতে বাধ্য করাও সরকারের জন্য সংকটেরই ইঙ্গিতবহ। অনেকেই বলেন, আওয়ামী লীগের কথা ও কাজে কোন বিরোধ নেই। একটি রাজনৈতিক দলের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় গুণ, কিন্তু প্রশ্নটা হল কোন কথা ও কোন কাজের মিল। অশোভন কথার সঙ্গে বর্বর কাজের মিলন ঘটলে গণতন্ত্র যে সংকটাপন্ন হয়, সে কথা বোধ হয় শাসকদলীয় নেত্রী প্রায়শই বিস্মৃত হন।

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিশাল এক কেলেঙ্কারি হয়ে গেল। পুস্তক প্রকাশকদের বড় একটি গোষ্ঠী এতে অসন্তুষ্ট। এবার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব পেল 'পুস্তকা' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। সংস্থাটি ঋণখেলাপী হিসেবে পরিচয় অর্জনকারী ব্যবসায়ী সংগঠন বেক্সিমকোরই একটি ক্ষুদ্র শাবক।

অনেক অঘটন ঘটিয়েও বেক্সিমকোর পলিটিক্যাল ক্লাউটে ঘাটতি নেই। বেক্সিমকোর কর্ণধার ব্যক্তি হরহামেশাই প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরসঙ্গী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ রকম সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য কী করতে হয়, বেক্সিমকোর তা জানা আছে। বাংলাদেশে শেখ হাসিনা যেমন একজন 'দক্ষ' ও 'কুশলী' প্রধানমন্ত্রী, বেক্সিমকোও তেমনি একটি 'কুশলী' কারবারী প্রতিষ্ঠান। একেবারে মণিকাঞ্চন সংযোগ। এই তো সেদিন বিরোধীদলহীন সংসদে সরকারী দলের এমপিরাও পাঠ্যপুস্তক প্রশ্নে নিজেদের অস্বস্তির কথা বললেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যখন বললেন, দেশে পাঠ্যপুস্তকের কোন সংকট নেই, তখন কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না। এখানেই আমাদের দেশে গণতন্ত্রের সংকট। নিজ দলের মধ্যেও মনের কথাটি সাহস করে বলা যায় না। পাছে নেত্রী বিরক্ত হন। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে, নেত্রীর বিরাগভাজন হবেন? এ প্রসঙ্গে সভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে একটি চুটকির কথা আমার মনে পড়ছে। সভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল নিকিতা ক্রুশ্চেভ স্তালিন আমলের নির্যাতন-নিপীড়ন ও দুঃশাসনের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। সেই থেকে সভিয়েত ইউনিয়নে নিস্তালিনীকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল। ক্রুশ্চেভ স্তালিনেরই একজন ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। ক্রুশ্চেভ যখন স্তালিনের নিন্দা সূচক বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন পেছনের কাতার থেকে জনৈক কমরেড চিৎকার করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কমরেড ক্রুশ্চেভ, আপনি তো স্তালিনের আশপাশেই ছিলেন, সে সময় আপনি প্রতিবাদ করেননি কেন? ক্রুশ্চেভ কিন্তু বুঝে উঠতে পারেননি, কে এই কমরেড যিনি প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছেন? ক্রুশ্চেভ সমবেত ডেলিগেটদের উদ্দেশ্য করে জানতে চাইলেন, প্রতিবাদকারী কমরেডটি কে? কিন্তু কেউই সাহস করে পরিচয় দিতে এগিয়ে আসল না। ক্রুশ্চেভ খানিকটা কৌতুকের ঢংয়ে বললেন, Exactly for this reason, I could not make any protest. সমগ্র সম্মেলনে হাসির অট্টারোল পড়ে গেল। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলে সভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মতই কমান্ডিজম বিরাজ করছে। আর সে কারণেই দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র নেই। কিন্তু এই করে কিছুদিনের জন্য ক্ষমতায় থাকা যায়, কিন্তু দেশ চলে না। বাংলাদেশেরও আজ সে অবস্থা। এখানে শাসক দল আছে, কিন্তু সুশাসন নেই। দেশ চলছে না। স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর গুরুত্ব অনুধাবন না করে গায়ের জোরে বেসামাল উক্তি করে দেশে একটা সংকট সৃষ্টি করতে আওয়ামী লীগের জুড়ি নেই। সমস্যার গভীরতা বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। নজরুল একবার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'গুরু কন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা'। দাড়ি চাঁচতে প্রয়োজন ক্ষুরের ; কিন্তু শেখ হাসিনা সে কাজে তলোয়ারই পছন্দ করেন। অস্ত্র প্রয়োগ চলছে ঠিকই, কিন্তু সঠিক

www.pathagar.com

অন্তটি নয়। ফলে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। সংকটটা যে গভীর, সেটা বোঝা গেল ওলামা-মাশায়েখদের ওপর সকল দৃঢ়তা ও কঠোরতার সঙ্গে ক্র্যাকডাউন করার পর। অবস্থা কতটা বেসামাল তা বোঝা গেল, যখন টেলিভিশনে দেখা গেল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে নিয়ে ধর্মীয় নেতাদের ওপর ক্র্যাকডাউনের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে ব্রিফিং সেশন করছেন। সংবাদপত্রের খবর থেকে জানা যায়, মুসলিম দেশগুলো সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ খুব সহজভাবে নেয়নি। রেডিও তেহরানের ভাষ্য থেকেও বোঝা যায়, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ ইরানও বস্তুত অসন্তুষ্ট। মুসলিম দেশগুলো বিষয়টিকে নিছক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখছে বলে মনে হয় না। তারা হয়ত ভাবতে শুরু করেছেন, এটা সরকারের ইসলামবিদ্বেষী নীতিরই প্রতিফলন। ফলে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হল রেমিটেন্স মানি। অর্থাৎ বিদেশে যেসব বাংলাদেশীরা কাজ করে, তাদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রাই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া জীবন্ত রেখেছে। মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির অন্যতম স্তম্ভ। শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিয়ে এই নীতির গোড়াপত্তন করেছিলেন। আজ যখন দেশের দায়িত্ব শেখ মুজিব তনয়ার ওপর পড়েছে, তখনই মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ইসলামের প্রশ্নে সম্পর্কের অবনতির ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এভাবে খুঁচিয়ে ঘা সৃষ্টি করে শাসক দল সরকার পরিচালনায় সংকটের পর সংকট সৃষ্টি করছে। শাসক দলের অনেকেও হয়ত এত বাড়াবাড়ি পছন্দ করছেন না। কিন্তু তাদের অবস্থা আজ সভিয়েত রাশিয়ার কমরেডদের মত। সুতরাং সুকথা, সুপরামর্শ দেয়ার বা শোনার অবকাশ নেই।

শেখ হাসিনার সরকার প্রশাসনযন্ত্রকে নিজ হাতের মুঠোয় পুরতে গিয়ে নানা অঘটনের জন্ম দিচ্ছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন দলীয়করণ করা হয়েছে। সরকারী প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য মেধা নয়, দলীয় আনুগত্যের মাপকাঠিই চালু হয়েছে। ফলে প্রশাসন ন্যুব্জ ও অথর্ব হয়ে পড়ছে। নির্বাচন কমিশনেও সংকট। সেখানে এক মেরুতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আর অন্য মেরুতে অন্যান্য কমিশন সদস্য। গ্রামে গিয়ে শুনেছি, এবার ১২ বছরে বালক-বালিকাকেও ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটার নামে বিসিএস ক্যাডারে ঝটিকা বেগে রিক্রুটমেন্ট চলছে। হাইকোর্টেও এক ডজন নতুন বিচারপতি নিয়োগ করার প্রক্রিয়া চলছে বলে শোনা যায়। কিন্তু সেই নিয়োগও বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। প্রখ্যাত সম্পাদক মরহুম মানিক মিয়া একবার পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অদূরদর্শিতা ও অবিমৃশ্যকারিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'ইহাদের চোখে বিলাই মুতিয়া দিয়াছে'। চোখে বিলাই মুতিয়া দিলে কি সমস্যা হয় জানি না, তবে বিষয়টি যে অত্যন্ত অস্বস্তিকর, তাতে সন্দেহ নেই। যারা বেখেয়াল থাকে, তাদের চোখেই বিড়াল প্রস্রাব করতে পারে। আওয়ামী শাসকগোষ্ঠীর বজ্র আঁটুনি, আর সেই সঙ্গে ফসকা গেরো অবস্থা মার্জার নামক পশুর অপকর্মের ফল কি-না জানি না। কাজেই, তারা যে এরকম একটি রোগে আক্রান্ত তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সরকারের সংকট এখানেই।

আমেরিকায় নতুন প্রেসিডেন্ট দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তিনি ব্রেকফার্স্ট প্রেয়ার উপলক্ষে ক্ষয়িষ্ণু ও অপসংস্কৃতিতে আপাদমস্তক নিমজ্জিত মার্কিন সমাজকে রক্ষা করার জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোর প্রয়োজনীয়তার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনিতেই রিপাবলিকান প্রশাসন আওয়ামী লীগের জন্য খুব সুখকর হবার কথা নয়, তার ওপর যখন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন, তখন পরাশক্তি আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল রাষ্ট্র বাংলাদেশে ধর্মীয় নেতৃত্বের ওপর লাঠ্যৌষধ প্রয়োগের যে নীতি গ্রহণ করেছে, তা বুমেরাং হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মুষ্টিমেয় আওয়ামীপন্থী

www.pathagar.com

এনজিওদের উস্কানিতে হঠকারী যে কোন পদক্ষেপ বাংলাদেশের জন্য অকল্পনীয় বিপদ ডেকে আনতে পারে। বছর দশেক আগেও ভারতে হিন্দু মৌলবাদী বিজেপির তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। অথচ আজ বিজেপি ভারতের শাসন ক্ষমতায়। বিজেপির অন্যতম সহযোগী সংগঠন আরএসএস সেই কংগ্রেসী আমল থেকে জঙ্গী সংগঠন গড়ে তুলেছে। তারা উর্দি পরে। লাঠি নিয়ে মারদাঙ্গা মহড়া দেয়। তাদের কর্মকাণ্ড ভারতীয় গণতন্ত্রে সহ্য করা হয়। এর ফলে আরও মারাত্মক বিপর্যয় ঠেকিয়ে রাখা গেছে।

বোদ্ধা মহলের অনেকেই মনে করেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলেই ধর্মীয় উদারনীতিবাদের এই দেশে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো সক্রিয় হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। এর দায়-দায়িত্ব আওয়ামী লীগের কোন অংশে কম নয়। রাজনীতির একটি উদ্দেশ্য হল, সমাজের দ্বন্দ্বগুলোকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা। অপরিণামদর্শী নীতির ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণহীন হলে তার দায়-দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। শেখ হাসিনা যেন ভুলে না যান, তার পিতার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়েই দাউদ হায়দার হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে আপত্তিকর কবিতা লিখে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। আজও তিনি বিদেশের মাটিতে বসে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আকুতি নিয়ে বেঁচে আছেন। তসলিমা নাসরিনের অবস্থাও বিবেচনা করা যেতে পারে। সুতরাং আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হনুমানের লেজেও আগুন ধরতে পারে। আর সেই আগুনে সোনার লঙ্কাও পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে পারে।

আফতাব আহমাদ :

দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। নেহাত অবনতি বললে সাত্যের অপলাপ হবে; দেশ বস্তুত একটি অচলাবস্থায় নিপতিত হতে চলেছে। আর এর ষোলো আনা দায়-দায়িত্ব আওয়ামী লীগের মাথামোটা, বিবেচনাবোধ বর্জিত একশ্রেণীর অপরিণামদর্শী শীর্ষ ব্যক্তির আস্ফালনের ওপর বর্তায়। দেশ ও জাতিকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করে রাখার যে রাষ্ট্রবিনাশী রাজনীতির চর্চা আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা লাভ করার পর থেকে করে আসছে, তারই অশুভ পরিণতি হচ্ছে, আজকের সৃষ্ট এই অচলাবস্থা।

আওয়ামী গোষ্ঠী ভারতকে তুষ্ট করার জন্য এবং হিন্দু ভোটব্যাংকের সমর্থন লাভ করার জন্য মুখে সেকুলারিজমের কথা বললেও আসলে ধুরন্ধর ধর্ম ব্যবসায়ী। তাদের ভণ্ডামির জুড়ি নেই। ধর্মে বিশ্বাস তাদের আছে কি নেই, তা গায়েবুল মালিক আল্লাহ তাবারাকু ওয়া তালা বলতে পারবেন। তবে, আওয়ামী নেতাদের মাথায় টুপি, খোদ দলপ্রধানের মাথায় হিজাব– এগুলো যে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ধারণ করা হয়, তা আজ এ দেশের একটি শিশুও বোঝে। তা না হলে ইহুদীবাদের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত এ দেশের একশ্রেণীর ভারতপন্থী এনজিও যখন সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে, তখন আওয়ামী লীগ তার সঙ্গে কী করে একাত্মতা প্রকাশ করে? আওয়ামী লীগ নেত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেকফাস্ট প্রেয়ারে যখন অংশগ্রহণ করেন তখন তা 'মৌলবাদ' হয় না; অর্থের বোঁচকা নিয়ে পুঁজিবাদী বিশ্বের বরকন্দাজরা যখন প্রেয়ার ফর ওয়ার্ল্ড পিস বা বিশ্ব শান্তির জন্য প্রার্থনার নামে স্তম্ভ নির্মাণ করেন, তখনও কিন্তু না পৌত্তলিকতা, না মৌলবাদ হয়। এসব নাকি 'সেকুলার কালচার'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থাৎ ইসলাম ছাড়া অপরাপর ধর্ম বা বিশ্বাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার ও কৃষ্টি চর্চা হচ্ছে 'প্রগতিশীলতা' ও 'মুক্তবুদ্ধির'র পরিচায়ক। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর এনজিওর ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণাসহ বিভিন্ন গণবিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতে করার ইচ্ছা আমার আছে। আজকের জন্য শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, এই রাষ্ট্রঘাতী গণবিরোধী এনজিওগুলো দেশ ও জনসেবার নামে জনগণের বিরুদ্ধে শুধু যুদ্ধেই অবতীর্ণ হয়নি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে বৈদেশিক মুদ্রা লুটপাট করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে, রাজস্ব বিভাগে এক কপর্দকও কর না দিয়ে সরাসরি রাজনীতির মালিক-

www.pathagar.com

মোক্তার সাজার চেষ্টা করছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পূর্ব মহড়া হিসেবে জনগণের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে অনৈক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের সমাজে প্রচলিত চিরায়ত মূল্যবোধ, নীতিবোধ ও ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আওয়ামী লীগ এদের আস্কারা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আজ এক মহাসংকটের জন্ম দিয়েছে।

এই সংকটের জন্ম কি আওয়ামী লীগ না বুঝে শুনেই দিয়েছে? আমার তো মনে হয়, তা নয়। জনগণের ঘৃণা, ধিক্কার এবং অভিসম্পাত যে দলের একমাত্র সম্বল, সে দলকে বেঈমানী ও মুনাফেকীর গর্ভে আশ্রয় নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। আমাদের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে লুটেরা দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী, তারা 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ', 'মুজিবাদর্শ', 'মুজিববাদ', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা', 'প্রজন্ম-৭১' এবং ধর্মের নামে যখন যেমন তখন তেমন আচরণে সিদ্ধহস্ত। কাজেই ধর্মের নামে যারা হীনকার্যে নিজেকে জড়ায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে যারা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সঙ্গে গাদ্দারী করে, তারা যে কোন ভুবনের প্রাণী, তা এ দেশের ধর্মপ্রাণ দেশপ্রেমিক মানুষ মাত্রই জানেন। এর জন্য ইসলামকে দোষারোপ করে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য যারা প্ররোচনা দিচ্ছে তারা ইহুদীবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সন্তান। তাদের কুমতলব বুঝতে কারোই অসুবিধা হয় না। আমাদের সংবিধান যেখানে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দান করেছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি এবং যেখানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, সেখানে পরম করুণাময় আল্লাহ্ সোবহানুওয়া তালা ও তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সঙ্গে একটি সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয়, রাষ্ট্রকে অবশ্যই সে বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। রাষ্ট্র যত্নবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সরকার যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অথচ, সরকারের প্রধান নির্বাহী থেকে শুরু করে আতিপাতি মন্ত্রীসহ সকলেই যারা ইসলামের পক্ষাবলম্বন করেন, তাদের ঢালাওভাবে 'মৌলবাদী' আখ্যা দিয়ে বেড়ান এবং তাদের 'দেশবিরোধী' ও 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বিরোধী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। যেখানে সরকারের পরম কর্তব্য হচ্ছে, ইসলামের অপব্যাখ্যা যাতে কোন বাচাল ও হস্তি মূর্খ দিতে না পারে, তা নিশ্চিত করে ইসলামের সর্বজনীন মুক্তির আবেদনকে অর্থবহ করে তোলা, সেখানে ইহুদীবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের অর্থপুষ্ট একশ্রেণীর গণধিকৃত এনজিওর পাল্লায় পড়ে আওয়ামী লীগ এ দেশের মানুষের স্বাভাবিক আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে! ওলামা-মাশায়েখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি, ধর্ম ব্যবসায় সিদ্ধহস্ত এই আওয়ামী গোষ্ঠী খুদকুঁড়ো বিতরণ করে কিছু পরগাছা শ্রেণীর 'ধর্ম বিশারদ'দের চাদির জুতার বিনিময়ে হস্তগত করে আওয়ামী দুঃশাসনের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিষোদগারের ব্যবস্থা করেছে। প্রতিপক্ষকে 'মৌলবাদী', 'স্বাধীনতা বিরোধী' ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করার এই একচেটিয়া অধিকার আওয়ামী লীগকে কে দিয়েছে? আওয়ামী লীগকে সমর্থন করলেই এবং দেশের জনগণের যে কোন সাফল্য ও অর্জনকে আওয়ামী নেত্রীর পিতার স্বপ্ন বলে চালিয়ে দিতে সম্মত হলেই সাত খুন মাফ হয়ে যায় যখন, তখন বুঝতে হবে আমরা কিসের মধ্যে এবং কাদের সঙ্গে বসবাস করছি। শায়খুল হাদীস আজিজুল হক কিংবা মুফতি ফজলুল হক আমিনীর রাজনৈতিক চিন্তা ও বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেই একমত নাও হতে পারেন, এমনকি যারা ইসলামভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে অতীব নিষ্ঠাবান, তাঁদেরও শায়খুল হাদীস কিংবা মুফতি আমিনীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হওয়াটাই সুস্থতা ও স্বাভাবিকতার লক্ষণ। গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে যে কোন সমাজ তার কল্যাণের পথ বেছে নেয়। গায়ের জোরে যা আরোপ করা বা চাপিয়ে দেয়া হয়, তা ফ্যাসিজমের নামান্তর, যেমন চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল বাকশাল। আজ ইসলামী ঐক্যজোট ও তার নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে এবং ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী আওয়ামী বিরোধী ব্যক্তি ও সংগঠনের বিরুদ্ধে আওয়ামী সরকার

www.pathagar.com

যে ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করছে এবং ঠ্যাঙানোর যে নীতি অনুসরণ করছে, তা কোন অবস্থাতেই কোন গণতান্ত্রিক সমাজ বরদাশত করতে পারে না। শায়খুল হাদীস ও মুফতি আমিনীর রাজনীতি যাদের পছন্দ নয় তাদের উচিত রাজনৈতিক যুক্তি ও বক্তব্য দিয়ে শায়খুল হাদীস ও মুফতী আমিনীকে মোকাবিলা করা। কিন্তু যেহেতু তাঁরা আওয়ামী দুঃশাসনের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন, সেজন্য তাঁদের ওপর নির্যাতন নেমে আসবে এবং এই নির্যাতনকে মৌলবাদ বিরোধী নির্মূল অভিযান বলে চালিয়ে দেয়ার ধাপ্পাবাজি করলে চলবে না। এভাবে সংঘাত ও হানাহানির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ দেশে জরুরী অবস্থা জারি করে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনকে নিজের রাজনীতির অনুকূলে কুক্ষিগত করার এক গভীর ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করেছে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করার পর পরই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী সংঘাতের এই পথটি বেছে নেয়। এ পথ মঙ্গলের পথ নয়। এ পথ কল্যাণের পথ নয়। এটি একটি অশুভ পথ। এখনও সময় আছে এটি পরিহার করার। আগুন নিয়ে খেলবেন না; খালেদাকে জব্দ করার নামে হাসিনা যদি ভেবে থাকেন এই পথ বেছে নেয়াটাই সর্বোত্তম, তাহলে মারাত্মক ভুল করবেন। খালেদার দল যেমন আন্দোলন-আন্দোলন খেলতে গিয়ে চরম বাচালতার পরিচয় দিয়েছে এবং দলের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা আওয়ামী লীগের সুহৃদদের খপ্পরে পড়ে রাজনৈতিক দৈন্যদশায় উপনীত হয়েছে, তদ্রূপ হাসিনা খালেদা জিয়ার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে খালেদা জিয়াকে একহাত দেখে নেয়ার নামে যেভাবে সকল রাকঢাক ঝেড়ে ফেলে ব্যক্তি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যেসব অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ ইতোমধ্যে নিয়েছেন তার পরিণতির কথা কোন সুস্থ মানুষ ভাবলে শিউরে উঠতে বাধ্য। উদার রাজনীতির নামে হাসিনার মুরুব্বিরা হাসিনাকে কিংবা ভারতকে তুষ্ট করে হাসিনার বিকল্প শক্তিকে ক্ষমতায় আনার যে নকশা নিয়ে এতদিন ধরে কাজ করে আসছেন, তাদের মনে রাখা উচিত, এভাবে চলতে থাকলে রাজনীতি হাসিনা-খালেদা কিংবা জামায়াতে ইসলামীর হাতেও থাকবে না। নৈরাজ্য ও মাৎস্যন্যায়ের দিকে রাজনীতি ছুটে যাবে। এখনও সময় আছে, বাড়াবাড়ি থামান। ভারতের অর্থপুষ্ট যেসব সংগঠন এখানে গৃহযুদ্ধের আস্ফালন করছে, তারা জীবনে কখনো কোন যুদ্ধ দেখেনি। যুদ্ধের যাতনা তাদের জানা নেই। গৃহযুদ্ধ একদিকে যেমন অভিশাপ, তেমনি মর্মন্তুদও বটে। এখনও সময় আছে এই পরিস্থিতি এড়াবার। জরুরী অবস্থা জারিই সমাধান নয়। সংঘাত-সংঘর্ষ ও নির্মূলের নামে যে চণ্ডনীতি এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা জরুরী অবস্থা জারি করে সামাল দেয়া যাবে না, হাসিনার পিতা নিজের কৃৎকর্মের সৃষ্ট সংকটকে সামাল দিতে গিয়ে জরুরী অবস্থার আঁচলে মাথা গুঁজেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। মুজিবের ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার তুলনায় শেখ হাসিনা নস্যি। ভাবুন, প্রধানমন্ত্রী ভাবুন। দেশবাসী কিন্তু নিজেদের অবস্থান নিজেরা নির্ণয় করে নিয়েছে। গোয়েবলসীয় প্রচারে কোন কাজ হবে না।

www.pathagar.com

১ মার্চ ২০০১

প্রকৃতিতে শূণ্যতা থাকে না

মাহবুব উল্লাহ :

বিজ্ঞান বলে, Nature abhors vacuum অর্থাৎ প্রকৃতিতে শূন্যতা বলে কিছুই থাকে না। সাম্প্রতিক কালে ওলামা-মাশায়েখদের আন্দোলন সেটাই প্রমাণ করল। অনেক দিন ধরে বিরোধী দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটাবার হুমকি দিয়ে আসছিল। বিগত প্রায় ৫ বছর ধরে ক্ষমতাসীন সরকার একের পর এক ইস্যু বিরোধী দলগুলোর হাতে তুলে দিচ্ছিল। কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতৃত্বের কোন্দল ও আদর্শের প্রতি দৃঢ় আনুগত্যের অভাবে বিরোধীদলগুলো কোন ইস্যুতেই গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করতে পারছিল না। কি গঙ্গার পানিচুক্তি, তথাকথিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি, ট্রানজিট করিডোরের পাঁয়তারা, উপনির্বাচনে কারচুপি, সংসদে বিরোধী দলগুলোকে কথা বলতে না দেয়া, প্রকাশ্য রাজপথে সরকারদলীয় এমপির নেতৃত্বে গুলী করে বিরোধী দলীয় কর্মী সজল হত্যা, পুলিশ হেফাজতে পিটিয়ে প্রতিভাবান ছাত্র রুবেল হত্যা, পুলিশ হেফাজতে জুতোর ফিতে গলায় বেঁধে বিরোধীদলীয় কর্মীর আত্মহত্যার কাহিনী, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসী ওয়ারলর্ডদের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম, জননিরাপত্তা আইনের মত জনবিরোধী জঘন্য অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন, ডিবি পুলিশের অফিসের ছাদে পানির ট্যাংক থেকে লাশ উদ্ধার-কোন কিছুকেই বিরোধীদলগুলো পুঁজি করে সরকারবিরোধী গণবিক্ষোভে রূপ দিতে পারেনি।

এতে একদিকে যেমন বিরোধীদলগুলোর ব্যর্থতা প্রকাশ্যে ধরা পড়েছে, অন্যদিকে পরিস্থিতিকে সামাল দেয়ার সরকারী কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাচীনকাল থেকেই ছলে-বলে-কৌশলে কী করে শাসক রাজন্যবর্গ নিজ ক্ষমতার ভিতকে পাকাপোক্তভাবে ধরে রাখতে পারে, সেই বিষয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম উপজীব্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ম্যাকিয়াভেলীর The Prince, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, তিরুভল্লবরের The Kural, নিজাম উলমুল্ক এর সিয়াসতনামা এমনকি গ্রামসির হ্যাজিমনি তত্ত্ব আমাদের সে ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। অতি সম্প্রতি বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি পরিহাসছলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্তি করেছেন, 'আপনাদের গণঅভ্যুত্থানটি দেখার জন্য আমাকে ক্ষমতায় থাকতে হবে'। যদিও উক্তিটি উচ্চারিত হয়েছিল সরকারের প্রতি আগাম ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে, তদসত্ত্বেও উক্তিটির মধ্যে পরম আত্মবিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। এই আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি কোথায়? যুদ্ধবিদ্যা বলে, প্রতিপক্ষের দুর্বলতাই নিজ পক্ষের সবলতার উৎস। বস্তুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন উক্তি করতে পারতেন না- যদি বিরোধীদলের তর্জন-গর্জন সত্যিকার বর্ষণে পরিণত হত।

মনে রাখা দরকার, গণঅভ্যুত্থান কখনও জানান দিয়ে আসে না। কারো হুংকারেও গণঅভ্যুত্থান সূচিত হয় না। গণঅভ্যুত্থানের জন্য অবশ্য পূর্বশর্ত হল, শাসকগোষ্ঠীর মারাত্মক গণবিচ্ছিন্নতা, শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে প্রকট দ্বন্দ্ব এবং এই বাস্তব অবস্থাকে কাজে লাগানোর মত প্রতিপক্ষের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক পারঙ্গমতা। বাংলাদেশে প্রথম দু'টি শর্ত পূরণ হলেও তৃতীয় শর্তটি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে যা ঘটার কথা ছিল, তা ঘটেনি। সম্ভবত এখানেই শাসকদলের সার্থকতা। যখনই সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ করেছি,তখনই সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে শুনেছি। বেগম খালেদা জিয়া যখন সরকারে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন একের পর এক লাগাতার হরতাল ও অবরোধের কর্মসূচী দিয়েও আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা তেমন সুবিধা করতে পারছিলো না, এই অবস্থায় হঠাৎ করে যেন সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায়েই পুলিশ কর্তৃক দিনাজপুরে ইয়াসমিন ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটল। দিনাজপুরে ঘটে গেল

www.pathagar.com

তুলকালাম কাণ্ড। ইয়াসমিন ধর্ষণের ঘটনায় দিনাজপুরে গণবিদ্রোহের সূচনা হল। কিন্তু শাসকদল বিএনপির পক্ষ থেকে ঘটনাটিকে যথাযথভাবে হ্যান্ডল না করার ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। সে সময়ে দিনাজপুরের এসপি ঘটনা সম্পর্কে এবং ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে সময়মত, যথাযথভাবে ব্রিফ না করার ফলে এবং তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার ফলে পরিস্থিতি সত্যি সত্যি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। থানা, পুলিশ ফাঁড়িতে জনতা আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করে।

গণবিক্ষোভ সম্পর্কে আমলাতান্ত্রিক তথ্যের ওপর নির্ভরশীলতা সরকারকে কত বিভ্রান্ত করতে পারে, দিনাজপুরের ইয়াসমিনের ঘটনা তারই প্রমাণ। অথচ সেই সময়ে যদি রাজনৈতিক চ্যানেল থেকে তথ্য সরবরাহ করা হত, তাহলে হয়তো ঘটনা এত ভয়াবহ রূপ লাভ করত না। বর্তমান সরকারের আমলে শুধু একটি ইয়াসমিনের ঘটনা নয়, বহু ইয়াসমিনকে হয় পুলিশ না হয় ধর্ষণকারীদের হাতে সম্ভ্রম বিলিয়ে দিতে হয়েছে। কিংবা পরিণতিতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ রকম কোন ঘটনার বিরুদ্ধেই দিনাজপুরের মত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। বিরোধী দলগুলোর ব্যর্থতার অন্যতম উৎস হল, পত্র-পত্রিকার ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতা। আজকের বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; দুয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে কোনটির ওপরই বিরোধী দলগুলোর তেমন কোন প্রভাব নেই। বস্তুত বলা যায়, আজকাল যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার বেশীরভাগই বিরোধীদল বিরোধী পত্রিকা। দুয়েকটি পত্রিকা গত কয়েক মাস ধরে সরকারের অপশাসনের চিত্র তুলে ধরলেও এগুলোর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এসব পত্রিকায় সুযোগ পেলেই বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিরোধীদল সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সম্বলিত কার্টুন, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নিজে এসব পত্রিকা সম্পর্কে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দেশে বিরোধী দলগুলো কী চান, সেটা স্পষ্ট নয় বলে জনগণ বস্তুত বিভ্রান্ত হচ্ছে।

আগেই বলেছিলাম, প্রকৃতিতে শূন্যতা বলে কিছুই থাকে না। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী যখন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন, তখন তার দাবী ছিল, পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলোর জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম এবং স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ। এসব প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রনায়ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে বড় বড় কাঠের হরফে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইত্তেফাক পত্রিকায় তাঁকে ভারতের চর ও রাশিয়ার দালাল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। মরহুম সোহরাওয়ার্দী মওলানার জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের দাবীকে শূন্য+শূন্য=শূন্য এই সমীকরণের ফল উল্লেখ করে বাতিল করে দিয়েছিলেন। আর এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার তথাকথিত ভোটচোর+স্বৈরাচার+রাজাকার=শূন্য- এই সমীকরণ দিয়ে বিরোধীদলের আন্দোলনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিখ্যাত সমীকরণটিকে বর্তমান পর্যায়ে কিভাবে পুনর্মাজন করে ব্যবহার করা যায়, সে ব্যাপারে প্রচণ্ড প্রত্যুৎপন্নমতিতার প্রমাণ দিয়েছেন।

কিন্তু তার সকল প্রত্যুৎপন্নমতিতাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন ওলামা-মাশায়েখরা। ফতোয়ার মত একটি স্পর্শকাতর বিষয়কে কেন্দ্র করে বর্তমান সরকারকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। ওলামা-মাশায়েখরা কখনোই বলেননি, ফতোয়া যে কেউ দিতে পারে অথবা দেয়ার যোগ্যতা রাখে। হাদিস, কোরআন, অসূল-ফিকাহ ও সামগ্রিকভাবে কোরআনি শাস্ত্র সম্পর্কে যাদের ব্যুৎপত্তি রয়েছে তারাই কেবল ফতোয়া দিতে পারেন। এটাই ওলামা-মাশায়েখদের কথা। তাঁরা আরও মনে করেন, পবিত্র কোরআন প্রদত্ত অধিকার কেড়ে নেয়া কারো এখতিয়ারভুক্ত নয়। বেশ ক'বছর আগে মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফতোয়া সম্পর্কে সংবাদপত্রে পাঠ করেছিলাম। ফতোয়ার বিবেচ্য বিষয় ছিল, মৃত ব্যক্তির শব ব্যবচ্ছেদ করে তার অঙ্গবিশেষ কোন জীবিত অথচ গুরুতর পীড়ায়

www.pathagar.com

আক্রান্ত রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা যায় কিনা। যেমন– কিডনি, লিভার ও হৃৎপিণ্ড। ইসলামী শিক্ষার বহু শতাব্দী প্রাচীন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুফতিরা ফতোয়া দিয়েছিলেন, এটা করা অনৈসলামিক হবে না। ইসলাম মৃত ব্যক্তির দেহের প্রতি যথোপযুক্ত তাজিম প্রদর্শনের বিধান রেখেছে। তাই সেই দেহ থেকে যদি কোন অঙ্গছেদন করা হয় তাহলে সেটা সেই বিধানের ব্যত্যয় ঘটাবে। এ কারণেই ফতোয়ার প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু ইসলাম মানুষের জীবনকেও প্রচণ্ড মর্যাদা দিয়েছে। এই দুই নীতিবোধের মধ্যে কোনটি প্রাধান্য পাবে, সেটিই ছিল ফতোয়ার প্রতিপাদ্য বিষয়। শেষ পর্যন্ত জীবনের পক্ষেই ফতোয়ার রায় ঘোষণা করা হয়েছিল। শুধু ইসলামেই নয়, খ্রিস্টধর্মেও সমসাময়িককালে ফতোয়ার বিষয়টি গুরুত্ব অর্জন করেছে। পাশ্চাত্যের রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা গর্ভপাতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে চলেছেন। এই ফতোয়ার নৈতিক ভিত্তি জীবনের পক্ষে। ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে। খোদ পোপ জন পল বিবাহ বহির্ভূত নর-নারীর সম্পর্কের বিরুদ্ধে নসিহত করে চলেছেন। তিনি তালাকের যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরুদ্ধে ও বৈবাহিক জীবন স্থায়ী করার পক্ষে পাশ্চাত্য সমাজে অব্যাহতভাবে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি আমার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ অধ্যাপকের আলাপ হয়েছিল। দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। আমি তাঁকে তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি জানালেন, তাঁর জীবনে দু'বার বিয়ে হয়েছিল। তাঁর প্রথম স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রথম স্ত্রীর সংসারে তাঁর দু'টি সন্তানের জন্ম হয়। এরা এখন বেশ বড় হয়েছে এবং কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভ থেকে তাঁর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। সেই কন্যা সন্তান এখন অষ্টাদশী। কিন্তু প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর খ্রিস্টীয় শাস্ত্র মোতাবেক আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়নি। তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে কাটিয়েছেন এবং সন্তানের জনক-জননী হয়েছেন। স্বাভাবিক শাস্ত্র মতে, বিয়ে না হওয়ার কারণ স্বরূপ তিনি জানালেন, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়েই তাঁরা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন না করেই স্বামী-স্ত্রী হয়েছিলেন। সময়টা ছিল ফ্রান্সের ১৯৬৮'র মে গণঅভ্যুত্থানের সময়। এ সময়ে ইউরোপের তরুণসমাজ সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। পুরাতন সমাজ ভাঙতে গিয়ে এবং নতুন সমাজের গোড়াপত্তন করতে গিয়ে সে সময়ে বিদ্রোহী যুবক-যুবতীরা বিদ্যমান সমাজের স্থিতাবস্থাকে ভাঙতে চেয়েছিল। স্থিতাবস্থাকে ভাঙার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই এই অধ্যাপক-যুগল বিবাহ বহির্ভূত দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এজন্য তাঁর অনুশোচনা নেই। নারী-পুরুষের সমতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁরা সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন। সংসারে নারী-পুরুষের যে স্বাভাবিক শ্রম বিভাজন থাকে, তা তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন তিনি বিয়ে করলেন তখন শাস্ত্রমতেই করেছিলেন। সময়ের প্রবাহে বিদ্রোহ পরিণত হলো শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৬৮'র মে-তে প্যারিসের সোরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র গণ অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল তার সূচনা হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের একই ডরমিটরিতে বাস করতে না দেয়ার প্রতিবাদে। কিন্তু অচিরেই সেই সামান্য ক্ষোভ ফরাসী দেশে দ্যগলের নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছিল। ১৯৬৯-এ পাকিস্তানে ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল লাহোরের গর্ডন কলেজের এলিট পিতামাতার সন্তানদের বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে। এই ছাত্ররা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লান্ডিকোটালে গিয়েছিল অবকাশ সফরের জন্য। সেখানে তারা চোরাচালান করা প্রচুর বিলাসসামগ্রী ক্রয় করেছিল। এসব সামগ্রী দামে ছিল সস্তা। কিন্তু পুলিশ তাদের বাস থামিয়ে তল্লাশি করে এসব সামগ্রী উদ্ধার করে এবং তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। ছাত্ররা পুলিশী দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। জুলফিকার আলী ভুট্টো ছাত্রদের এই বিক্ষোভে সমর্থন প্রদান করেন। চোরাচালানের অবৈধ পণ্য ক্রয়ের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দিল। বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র পাকিস্তানে।

www.pathagar.com

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ ১১ দফার মত একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা ঘটালো। খাইবার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ায় শুরু হলো পালাবদলের পালা। আইয়ুবের স্বৈরশাসনের পতন হলো। দেখার মত বিষয়টি হলো, সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কারণে যে আন্দোলনের সূচনা, তা পাকিস্তানের রাজনীতিতে সূচিত করলো রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পালা। এই পট-পরিবর্তনের পালা কেবল আইয়ুব সরকারের পতনেই সীমাবদ্ধ রইল না। ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পরিণতি পেল। মওলানা ভাসানী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার প্রথম প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সেই দাবীর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলেন না। এই ধারাবাহিকতার শূন্যতা পূরণ করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবীর মধ্য দিয়ে। যা একদিন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল।

এবার যখন ফতোয়ার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে ওলামা-মাশায়েখরা প্রতিবাদ-আন্দোলনের সূচনা করলেন, তারই পরিণতিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৮টি তাজা প্রাণ ঝরে পড়ল। সরকার তো বটেই বিরোধীদলের মধ্যেও কেউ কেউ প্রমাদ গুনলেন, আন্দোলন এখন মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থায় গণতন্ত্রমনা বিরোধীদলের দায়িত্ব কী হবে? এই আন্দোলনকে 'মৌলবাদী' পশ্চাৎগামী শক্তির অপকৌশল হিসেবে চিহ্নিত করে পেছনে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গ বা কটূকাটব্য করা? নাকি এই আন্দোলনের পেছনে খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলা? নাকি, জনতার কাফেলার সামনে দাঁড়িয়ে সাহসী নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলনের মূল নির্যাস স্বৈরাচারী সরকারের দমন-পীড়ন ও ধর্মীয় অনুভূতি বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনগণের ন্যায্য অনুভূতিকে ভিত্তি করে সঠিক পথে পরিচালিত করা? এই তিনটি পথের একটিই মাত্র গ্রহণীয়– গনবিক্ষোভের ঊর্মিমালার শীর্ষদেশে আরোহণ করে একে সঠিকভাবে সাফল্যের সৈকতে পৌঁছে দেয়াই হলো যথার্থ কর্তব্য। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে হরতালের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আরও ৪টি প্রাণ ঝরে পড়েছে। সরকার দলীয় সংসদ সদস্যের নেতৃত্বাধীন মিছিল থেকে গুলীবর্ষণের ফলেই এই বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটেছে বলে ঢাকার দৈনিকগুলো ব্যানার হেডিংয়ে সচিত্র খবর প্রকাশ করল। তাহলে কথাটা দাঁড়ালো কী?

কথা হলো, জনগণের বিক্ষোভ অনেক সময়ে আপাত দৃষ্টিতে খুব মামুলি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিস্ফোরিত হয়। মনে রাখার বিষয়, প্রকৃতিতে শূন্যতা বলে কিছু নেই। বায়ুর চাপ হ্রাস পেলে চতুর্দিক থেকে ঝঞ্ঝাবাত্যা প্রবাহিত হতে শুরু করে। একেই আমরা বলি 'সাইক্লোন'। বায়ুর চাপ হ্রাস পেয়েছে কিনা এটা যেমন সরকারের উপলব্ধি করার বিষয়, একইভাবে তা বিরোধীদলেরও উপলব্ধি করার বিষয়। দেশে একটি গৃহযুদ্ধের মত পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আগেই সরকার যদি সুমতির পরিচয় দেয়, তাহলে দেশবাসী অনেক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। সরকার এখন তার আয়ুষ্কালের শেষের ছয় মাস অতিক্রম করছে। এ সময় যে কোন অবিমৃষ্যকারী নীতি সরকারের জন্য আত্মহত্যার শামিল হবে। ইতিহাস থেকে আমরা জানি, রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন গোষ্ঠীর সময় যখন ফুরিয়ে আসে, তখন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্কলহ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, গোলযোগ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটে। আজ দেশে যা ঘটছে তা এরকম পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটছে কিনা, তা দায়িত্বশীল মহলকে ভেবে দেখতে হবে। অনেক সময়েই দেখা যায়, সময় ফুরিয়ে আসলে শাসকগোষ্ঠী কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করে। ঢাকার মালিবাগে পুলিশসহ ৪ জনের হত্যাকাণ্ড সেই কাণ্ডজ্ঞানহীনতার বহিঃপ্রকাশ কিনা তা দেশবাসী বিচার করবে। জনতার জয় অনিবার্য। বাংলাদেশের মানুষ তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জান্য বারবার রক্ত দিয়েছে, কিন্তু সেই রক্তমূল্যের ঋন আজও পরিশোধ করা হয়নি। জনগণের পক্ষ থেকে আমাদের কথা হলো– জনগণের এই রক্তদান যেন বৃথা না যায়।

আফতাব আহমাদ :

বাংলাদেশে আজ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ষোল আনাই আওয়ামী শাসকগোষ্ঠীর অপরিণামদর্শিতা দায়ী। আওয়ামী লীগ তার জন্মলগ্ন থেকেই

www.pathagar.com

দ্বৈধতার সংকটে ভুগছে। জন্মলাভের সময়ে সরকারী মুসলিম লীগের অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের তথা আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। কিন্তু ভোট ব্যাংককে পকেটে ভরার জন্য এক সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি ছেঁটে ফেলা হয়। নতুন চেহারা ধারণ করার নামে দলটির নতুন নাম 'আওয়ামী লীগ' সাব্যস্ত হয়। নামে কী বা আসে যায়। গোলাপকে যে নামেই ডাকো, গোলাপ গোলাপই। আওয়ামী মুসলিম লীগ আওয়ামী লীগ নামে নিজেকে যতই সেকুলার হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করুক না কেন, সংগঠনটি যে মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলমানের অর্থবিত্ত ও বৈভব অর্জনের একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, একথা অস্বীকার করা ইতিহাসকেই অস্বীকার করা।

মুসলমানদের আওয়ামী লীগ তাই যতই হিন্দুদের আস্থা অর্জনের জন্য নানা কসরত করেছে, ততই লক্ষ্য করার বিষয়,তারা অধিক পরিমাণে যত্নবান হওয়ার চেষ্টা করেছে নিজেদের খাঁটি মুসলমান হিসেবে জাহির করার। আর এ জন্যই বহু আওয়ামী নেতা-কর্মীকে দেশী কোট তথা মুজিব কোট পরিধানের পাশাপাশি টুপি পরতে এবং মুখে দাড়ি রাখতে দেখা যায়। অনেককে নামাজ-রোজার প্রতিযোগিতায়ও নেমে পড়তে দেখা যায়। হজ করার বিষয়েও এরা পিছিয়ে নেই। নামের আগে বাহারী ঢঙে 'আলহাজ' এবং 'হাজী' শব্দদ্বয় এরা বেশ ঢাকঢোল পিটিয়েই ব্যবহার করে থাকেন। তবে, কালের আবর্তে হিন্দু ভোটের তোয়াজ করতে গিয়ে এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে সেকুলারিজমের সমর্থক সাজার নামে ধর্ম নিয়ে আওয়ামী লীগের বাড়াবাড়ি এদেশের সরলপ্রাণ মানুষের ধর্মানুভূতিতে যেভাবে আঘাত করেছে তাতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক ধারণা জন্মেছে যে, আওয়ামী লীগ ধর্মহীনতায় বিশ্বাসী এবং ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তি। অথচ এই সেই আওয়ামী লীগ, যার নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনগণের কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে, ক্ষমতায় গেলে তিনি ও তাঁর দল কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করবেন না। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোই আওয়ামী লীগের অন্যতম কাজে পরিণত হল।

আওয়ামী লীগের জন্মের পর থেকে আওয়ামী লীগ যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী বিশ্বের লেজুড়বৃত্তি শুরু করে, তাও আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এ দেশের মুটে, মজুর, ভুখা-নাঙ্গা কিষাণ ও নিঃসম্বল মানুষের সমর্থন আদায় করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের পক্ষে যে ধ্বজা ধরেছিল, তা মূলত ছিল জনগণর সঙ্গে চরম শঠতা ও প্রতারণা। আর তাই, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই সমাজতন্ত্রের নামে আওয়ামী লীগ বেপরোয়া লুটপাটের অর্থনীতি প্রবর্তন করে। একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের দায়িত্ব নেয়ার পরিবর্তে আওয়ামী লীগ ভারতের তাঁবেদারি করে। বাংলাদেশকে ভারতনির্ভর একটি ছায়ারাষ্ট্রে পরিণত করতে গিয়ে যেভাবে জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় নিরাপত্তাকে আওয়ামী লীগ বিসর্জন দিয়েছিল তাতে মানুষ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ায়।

আওয়ামী লীগের জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়া, মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করা, একদলীয় শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করা, লুটপাট ও দুর্নীতির লীলাভূমিতে দেশকে পরিণত করা, সর্বোপরি, অনাহার ও দুর্ভিক্ষের কবলে দেশকে নিক্ষেপ করা- এসকল গণবিরোধী, জাতিবিরোধী কর্মকাণ্ড মানুষের চরম ঘৃণা ও ধিক্কারের উদ্রেক করা। আর তাই যখন সীমালংঘন করে আওয়ামী লীগ দেশের মানুষকে স্থায়ী গোলামে পরিণত করতে উদ্যত হয়, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী সবংশে নির্মূল হয়ে যায়। আওয়ামী দুঃশাসনের অবসানের পর থেকে জাতি গঠন ও গণতন্ত্র বিনির্মাণে এ দেশের মানুষ বহু চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে যখন বিজয়ের সম্ভাবনার দ্বারে উপনীত হয়, তখনই ভারতীয় আগ্রাসী শক্তি ও তাদের এদেশীয় চর ও নিয়োগীদের মদদে ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। আগেই বলেছি, আওয়ামী লীগ জন্মের পর থেকেই দ্বৈধতার সংকটে ভুগছে। পুঁজিবাদে বিশ্বাসী হয়েও সমাজতন্ত্রের বুলি তাদের কপচাতে

www.pathagar.com

হয়েছে। ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেও ধর্মহীনতার প্রচার ও প্রসারকে উৎসাহিত করতে গভীর আগ্রহ দেখাতে হচ্ছে। এতে কাদের লাভ হয়, আজ তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

এদেশে কতিপয় এনজিও বিশেষ করে 'প্রশিকা' 'নিজেরা করি' 'প্রিপ ট্রাস্ট'সহ এক শ্রেণীর এনজিও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে 'মৌলবাদী' আখ্যা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এসব এনজিও খ্রিস্টধর্মের নানাবিধ আচার ও নীতির বিরুদ্ধে কখনও টুঁ শব্দটি করে না। এমনকি ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতিভেদ প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী ও মনুষ্যত্ববিরোধী রীতি-রেওয়াজের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠায় না। ইহুদীবাদ ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের অর্থে লালিত এসব এনজিও বাংলাদেশের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যকে নস্যাৎ করে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে একীভূত করে ফেলার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এসব এনজিও ও রাষ্ট্রঘাতী চক্র উদারতার নামে, মানবাধিকারের নামে, গণতন্ত্রের নামে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে মুসলমানদের সকল বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে, ইসলামী কৃষ্টি, মূল্যবোধ ও প্রতীকের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর এই যুদ্ধে আওয়ামী লীগের ঘাড়ে বন্দুক রেখে তারা জয়ী হবার স্বপ্নে বিভোর রয়েছে। আওয়ামী লীগের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চর ও নিয়োগীরা আওয়ামী লীগকে জনগণের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। মাদ্রাসা-মসজিদ এবং ইসলামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন স্থাপনাকে মৌলবাদের ধারক-বাহক হিসেবে চিহ্নিত করে এসব এনজিও আসলে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পক্ষে এদেশে একটি গৃহযুদ্ধ বাধানোর পাঁয়তারা করছে।

আওয়ামী লীগের পাশাপাশি দেশের বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপিকেও অনেক সময়ই আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহন করতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ভারতীয়দের তুষ্ট করার জন্য বিএনপিকেও অনেক সময়ে বলতে শোনা যায়, আমরা মৌলবাদী নই। অথচ আওয়ামী লীগ যাদের মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে, বিএনপি ক্ষমতা লাভের আশায় তাদের সঙ্গে ঐক্য মোর্চা করেছে। আসলে রাষ্ট্রঘাতী চক্রের প্রচারমাধ্যমের কৌলিন্যে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী, ধর্মবিরোধী কুচক্রীরা আমাদের চিন্তা ও কৃষ্টির জগতে যে সর্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে, তার ফলে আমাদের অনেকের মধ্যেই ধর্মানুরাগ ও ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে এক ধরনের হীনমন্যতার জন্ম নিয়েছে। যে কোন সভ্য জাতি ধর্মের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার ঘৃণার চোখে দেখে। কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ মানুষের ধর্মানুরাগ, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল্যবোধ তার জীবনাচার থেকে সে বাদ দিতে পারে না। আজ মাদ্রাসা-মসজিদের ওপর যে নগ্ন হামলা নেমে এসেছে, দেশব্যাপী ওলামা-মাশায়েখদের বিরুদ্ধে যে বিষোদগার হচ্ছে, এবং ইসলামী মূল্যবোধনির্ভর রাজনৈতিক সংগঠনের বিরুদ্ধে যে ফ্যাসিস্ট অভিযান চালানো হচ্ছে তা কোনো অবস্থাতেই একটি বহুবাচনিক গণতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের সহায়ক হতে পারে না। এ এক অসুস্থ রাজনীতির পরিচায়ক। দেশের প্রধানমন্ত্রীসহ যারা সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধানে শপথ গ্রহন করেছেন, তারা কী করে ভুলে যান, সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে অষ্টম অনুচ্ছেদের ১(ক) দফায় সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয়া আছে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।' তাঁরা কী করে ভুলে যান সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ৪১ অনুচ্ছেদে (এই অনুচ্ছেদটি কখনও সংশোধিত হয়নি) 'প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে'। এবং 'প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে'। সংবিধানের ২৫(২) অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন'।

আজ আওয়ামী লীগ তাদের সমর্থক ও তল্পিবাহকরা যেভাবে ইসলামের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য চর্চা ফতোয়াকে কেন্দ্র করে ইসলামের বিরুদ্ধে নেমেছে, তাতে জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে পারে, এরা সংবিধানের ৮, ২৫ ও ৪১ অনুচ্ছেদ স্বীকার করে কিনা। সাহস থাকে তো আওয়ামী লীগ ও তার তল্পিবাহকরা বলুক যে, তারা সংবিধানের এই তিন অনুচ্ছেদকে বাতিল করে দেয়ার পক্ষে।

www.pathagar.com

ফতোয়া সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের একটি বেঞ্চ যে রায় দিয়েছে, তার একাংশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রায়ের ওই অংশে বলা হয়েছে, 'কোনো কর্তৃত্বহীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দেয়া কোনো ফতোয়া অবশ্যই দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। এবং এই মর্মে সংসদ অনতিবিলম্বে ফতোয়া কার্যকরী না হলেও আইন পাস করবে'। অর্থাৎ কর্তৃত্বহীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কর্তৃত্বাধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ফতোয়া দিতে পারেন। হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের এই অংশটুকু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য।

মতলবী এনজিওরা ও ইসলামবিদ্বেষী মহল গ্রামের টাউট-বাটপাড়দের অপকর্ম, দুষ্কর্ম ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে ইসলামসম্মত প্রকৃত ফতোয়ার সঙ্গে সমার্থক করে ইসলামবিরোধী যে অপপ্রচারে নেমেছে তা উদ্দেশ্যমূলক, বলাই বাহুল্য।

গত ৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকার পত্রপত্রিকাগুলোতে যেসব ছবি ছাপা হয়েছে, তা অত্যন্ত পৈশাচিক ও লোমহর্ষক। Financial Express-এ ছাপা ছবিটিতে দেখা যায়, একজন মাঝবয়সী মানুষকে কয়েকজন ছোকরা মিলে পেটাচ্ছে আর তাদের ঘিরে পাহারা দিচ্ছে একদল পুলিশ। পিটুনী খাওয়া লোকটির মুখে লম্বা দাড়ি। Daily Star-এ ছাপা ছবিতে দেখা যায়, একজন লোককে উলঙ্গ করে টেনে নিয়ে চলেছে একদল পুলিশ। মারের চোটে অর্ধমৃতপ্রায় লোকটি নিঃসাড় হয়ে আছে। যেন একটি লাশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একদল শকুন। Independent-এ ছাপা ছবিটি আরও ভয়াবহ। তিনজন পুলিশ ধরে রেখেছে একজন মানুষকে; সামনে থেকে একজন পুলিশ ওই মানুষটির বুকের ওপর লাথি মারছে। বুট আর খাকি প্যান্ট পরা যে পা'টি লাথি মারছে, তার সঙ্গে ১৯৭১ সালের পাকিস্তানী হানাদার মিলিটারীর পা কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর সৈন্যের পায়ের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। চারজন পুলিশ একজন মানুষকে ঘিরে ধরে নির্যাতন চালাচ্ছে। এই পুলিশদের চোখে-মুখেও পাশব হাসি। সেই পৈশাচিক উল্লাস। এ কোন মধ্যযুগীয় বর্বরতা? হিংসা ও উন্মত্ততার এই বিভৎসতা বাংলাদেশকে কোন দিকে নিয়ে যাবে, তা মানবিক গুণাবলী বিবর্জিত এসব বর্বররা আদৌ কি বুঝতে পারছে? আফগানিস্তানের নূর মোহাম্মদ তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমীন, বাবরাক কারমাল ও নজিবুল্লাহ পালাক্রমে ইসলাম, মসজিদ ও মাদ্রাসার বিরুদ্ধে চরম নৃশংসতা প্রদর্শন করার পরও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। আজ আফগানিস্তানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার জন্য দায়ী কে?

সর্বজন শ্রদ্ধেয় শায়খুল হাদীস আজিজুল হকের নাম যাদের কলমের ডগায় বিকৃতভাবে লেখা হয়, তাদের 'জন্ম নির্ণয় ন জানি'। শায়খুল হাদীস যদি এমনই একজন মামুলি মানুষ হতেন, তাহলে সারাদেশে আজ যে জনজাগৃতি দেখা দিয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য 'ইসলাম সেবা'র উপর্যুপরি প্রতিশ্রুতির যে ঘোষণা দিচ্ছে, এসবের দরকার হত না। শেখ হাসিনা আরও দশ কদম এগিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন নিয়মিত মসজিদে গমনাগমন করতে। তাহলে স্বীকার করতেই হবে, মসজিদ, মাদ্রাসা, ইসলামী মূল্যবোধ ও কৃষ্টি আমাদের জীবনাচার ও নিত্যকর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এসবকে সুষ্ঠু, সুস্থ ও ইতিবাচক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না দিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও নির্যাতনের পথ যারা বেছে নিতে চায়, জনগণের রোষানলে তারা ভস্মীভূত হবে। আজ সময় এসেছে, আওয়ামী লীগ ও তার দোসরদের কপটতাকে উন্মোচন করার, আওয়ামী ঘরানার ধর্মব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করার এবং প্রকৃত ইসলাম, যা মানুষের শ্রেয়বোধ ও নৈতিকতাকে পরিচর্যা ও লালন করে, রাষ্ট্রকে তার পক্ষে দাঁড় করানোর। এর বিপরীতে কতিপয় এনজিওসহ যারাই ষড়যন্ত্রে মেতে উঠুক না কেন, মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ও সংগ্রামের মুখে বানের তোড়ের মত ভেসে যাবে। মনে রাখতে হবে, সমাজ ও রাষ্ট্র মানুষকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। আর মানুষ কোন যান্ত্রিক সত্তা নয়। মানুষের আবেগ, অনুভূতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অভিরুচি ও কৃষ্টিকে অস্বীকার করে ময়ূরপুচ্ছধারী কাক সাজার যারা চেষ্টা করে, তাদের সেই চেষ্টার ফলে প্রকৃত পরিচয় কখনই গোপন করে রাখা সম্ভব হয় না। সত্য নিজ মহিমাতেই প্রকাশ পায়।

www.pathagar.com

১৫ মার্চ ২০০১

নিহত মানবাধিকার নিহত গণতন্ত্র

মাহবুব উল্লাহ :

গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ওয়াশিংটন থেকে এপি জানিয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর বাংলাদেশে সহিংসতার সর্বশেষ বিস্তারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং এই মর্মে অভিমত পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, সকল প্রধান দলের উচিত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন ও রাজনৈতিক সহাবস্থান করা। সম্প্রতি হরতালের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ ব্যক্তি নিহত হবার পর মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র রিচার্ড বাউচার ঐ মন্তব্য করেন। নিহতদের মধ্যে এক পুলিশও রয়েছে। বাউচার বলেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সহিংসতা আরও একবার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে'। বাউচারকে প্রশ্ন করা হয়, ঢাকায় আবারও খুবই ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের মদদে উচ্ছৃংখল লোকের হামলায় ৫ ব্যক্তি নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। জাতীয় সংসদের সরকার দলীয় একজন সদস্য এ ঘটনায় জড়িত ছিলেন এবং মধ্যপন্থী ইসলামী গোষ্ঠীর একাংশ হামলার শিকার হয়েছে যা থেকে দিনে দিনে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশে এখন দৃশ্যমান ভয়ানক রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক বিচ্যুতি সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের অবস্থান কী? মি. বাউচার বলেন, 'আমি বলবো ঢাকায় সরকারসমর্থক ও বিরোধীদলের বিক্ষোভকারীদের মধ্যে এই সংঘর্ষ সম্পর্কে আমাদের দূতাবাসগুলো থেকে আমরা খবর পেয়েছি। তারা খবর দিয়েছেন যে, কমপক্ষে ৪ ব্যক্তি– আপনি বলছেন এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ ৫ জন নিহত হয়েছে। আমরা সহিংসতায় উদ্বিগ্ন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, সহিংসতার জন্য বাংলাদশে আরেকবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হচ্ছে। আমরা বারবার বলেছি যে, সরকার ও সকল প্রধান দলের উচিত, সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে রাজনৈতিক সহাবস্থানের পথ বেছে নেয়া। আমরা জেনেছি, বিরোধীদল ১৪ ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় দিনের মতো হরতাল আহবান করে। শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক মতপ্রকাশের সময় আমরা বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা পরিহার করার আহবান জানাই'। বলা যায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র খুব ত্বরিত গতিতেই মার্কিন সরকারের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

মার্কিন মুখপাত্র মি. বাউচারের মন্তব্যে আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করি। এর একটি হচ্ছে সহিংসতা আরও একবার বাংলাদশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক মত প্রকাশের সময় আমরা বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা পরিহার করার আহবান জানাই। উল্লেখ্য যে, মি. বাউচারকে যে সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন তিনি উল্লেখ করেছেন, মধ্যপন্থী ইসলামী গোষ্ঠীর একাংশ হামলার শিকার হয়েছে। এছাড়া মি. বাউচার মার্কিন নাগরিকদের বাংলাদেশ সফর সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ মার্কিন নাগরিকদের ব্যাপারে আমি বলবো, বাংলাদেশ সংক্রান্ত আমাদের কনসুলার ইনফরমেশন শীটে ভয়াবহ বিক্ষোভ ও হরতালের বিবরণ আছে। যারা বাংলাদেশে যেতে চান, তারা যেন ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস থেকে সর্বশেষ খবরাখবর জেনে নেন। এ পর্যন্ত সেখানে কোনো মার্কিন নাগরিকের নিহত বা আহত হবার খবর আমরা পাইনি। বাউচারের এই মন্তব্যটিও উপেক্ষা করার মত নয়।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি যে কত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, যার ফলে মার্কিন কনসুলার ইনফরমেশন শীটে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে এবং

www.pathagar.com

পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশে যাত্রা করার আগে মার্কিন নাগরিকরা যেন এসব তথ্য জেনে নেন। সে ব্যাপারেও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আমরা যারা দেশে থাকি,তারা দিনের পর দিন সহিংসতার ঘটনা দেখে ও শুনে একটা গা সওয়া মনোভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। পরিস্থিতি যত ভয়াবহই হোক না কেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছি। একজন বাংলাদেশী নাগরিকের জীবনের মূল্য কতই বা! কিন্তু একজন মার্কিন নাগরিকের জীবনের অনেক দাম। যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে যেখানেই বাংলাদেশের দূতাবাস আছে, যেখানকার কনসুলার ইনফরমেশন শীটে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে সরকার বা আমাদের দূতাবাসগুলো কোন নির্দেশনা দিয়েছে কিনা আমরা জানি না। স্বভাবতই মনে করা যায় বিদেশে যে সব বাংলাদেশী নাগরিক বসবাস করেন, তারা যেহেতু সাধারণ বাংলাদেশী নাগরিকদের তুলনায় অনেক বেশী আয় রোজগার করেন, সেহেতু তাদের জীবনের মূল্য দেশে বসবাসরত নাগরিকদের চাইতে বেশী। যে কারণে দেশে আসার সময়ে তারা কতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করবেন, সে ব্যাপারে তথ্য পাবার অধিকার তাদের রয়েছে। গণতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ন্যূনতম ভিত্তি Life, Liberty and Property অনুযায়ী তারা অতীব সঙ্গত কারণেই এই দাবী করতে পারেন। আমাদের সরকারের কাছে নাগরিকদের জীবন ও সম্পদের মূল্য তুচ্ছ হতে পারে, কিন্তু নীতিগতভাবে দেখলে তা মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তার নাগরিকদের জীবন ও সরকারের অধিকার সম্পর্কে যেরূপ সচেতন, আমাদের সরকার সত্যিকার গণতান্ত্রিক হলে ঠিক ততটুকুই সচেতন থাকতেন।

আগেই উল্লেখ করেছি, মি. বাউচার তার বক্তব্যে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন- মন্তব্যটি উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। আমরা এই কলামে অতীতেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম যে, জাতীয় সংসদের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে এক বছরেরও অনেক কম সময় রয়েছে, সেই নির্বাচন আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কি? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে যদি প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচন হলে তাদের ভরাডুবি হবে, সে ক্ষেত্রে নির্বাচন সময়মত অনুষ্ঠিত নাও হতে পারে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য উপাদান হল নির্বাচন। নির্বাচন না হওয়া কিংবা বিলম্বিত হওয়া স্বভাবতই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। মি. বাউচার এরকম কোন ইঙ্গিত করেছেন কিনা, তা স্পষ্ট নয়। তার এই বক্তব্যের একাধিক ব্যাখ্যার মধ্যে এটিও একটি ব্যাখ্যা হতে পারে। উল্লেখ্য যে, বাউচারকে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি সরকারের হামলার শিকার হিসেবে একটি গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন, যার চরিত্র হল, ইসলামী মধ্যপন্থী। কিন্তু, বর্তমান সরকারের দৃষ্টিতে এই গোষ্ঠীটি 'মৌলবাদী' ও 'তালেবানী' চরিত্রের। একথা সত্য যে, এই গোষ্ঠীটির রাজনৈতিক সমাবেশে অতি উৎসাহজনিত কারণে 'আমরা হব তালেবান, বাংলা হবে আফগান' শ্লোগানটি উচ্চারিত হয়েছে। তবে, আফগানিস্তানে যেভাবে তালেবানগোষ্ঠী সংগঠিত হয়েছিল, সে রকম কায়দায় এরা সংগঠিত হয়েছেন কিনা, এ সম্পর্কে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আজ পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করতে পারেনি।

আমেরিকানরা গোটা দুনিয়ার কোথায় কী ঘটছে, সে সম্পর্কে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। আমাদের সরকারের কাছে আমাদের দেশ সম্পর্কে যত না তথ্য আছে, তার চেয়েও অনেক বেশী তথ্য আমেরিকানদের কাছে আছে। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্লকের ওপর মার্কিন সংস্থার তৈরী করা মানচিত্র দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে সময়ে ভূ-উপগ্রহের ব্যবহার বা আবিষ্কার হয়নি। সে সময়ে এরিয়াল ফটোগ্রাফির মাধ্যমে মানচিত্র নির্মাণ করাই ছিল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পন্থা। ব্লকে ভাগ করা এসব মানচিত্রে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের গাছ-গাছড়া, খালবিল, রাস্তাঘাট ও বসতির অবস্থান অত্যন্ত সুচারুরূপে দেখানো হয়েছিল। সে সময়ে পাকিস্তানের সাথে আমেরিকার তিনটি সামরিক মৈত্রী জোট ছিল, যথাক্রমে পাক-মার্কিন

www.pathagar.com

সামরিক চুক্তি, সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তি। বলাবাহুল্য এসব চুক্তির সুবাদেই US Airforce এসব মানচিত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান উন্নয়নের স্তরে পৌঁছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব ভাল করেই জানে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে কোন জঙ্গীবাদী গ্রুপের অস্তিত্ব আছে কিনা। এছাড়া, মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক ও আদর্শিক মানস গঠন সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল থাকার কথা। কাজেই ইসলামী গোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন ভ্রান্তিপূর্ণ– একথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। অতীতে এসব গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের অভিজ্ঞতাও তাদের আছে। অথচ বাংলাদেশ সরকার তাদের নির্যাতন ও দমনমূলক পদক্ষেপকে যৌক্তিকতা প্রদানের উদ্দেশে দেশে তালেবানী ষড়যন্ত্র চলছে বলে প্রচার করছে। উদ্দেশ্য যত না 'মৌলবাদ' প্রতিহত করা, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রতিপক্ষকে দমন করা।

ইন্টারনেট থেকে মার্কিন প্রশাসনের নতুন পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই নতুন পররাষ্ট্রনীতির মূল নীতি হচ্ছে, ভারতকে আঞ্চলিক পরাশক্তিতে পরিণত করা এবং পাকিস্তানকে অপাঙ্ক্তেয় বন্ধুতে পরিণত করা। কিন্তু, নতুন প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশের স্থান কোথায়? সম্প্রতি গ্যাস সম্পর্কে বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রাপ্তি সম্ভাবনাসাপেক্ষে বাংলাদেশে বর্তমান মজুদের অতিরিক্ত আরো ৮ দশমিক ৪ থেকে ৬৫ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট অনাবিষ্কৃত গ্যাস রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়, উত্তোলন সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ ধরলে বাংলাদেশে অনাবিষ্কৃত ৮.৪ টিসিএফ গ্যাস রয়েছে। আবার এই সম্ভাবনা মাত্র ৫ শতাংশ ধরলে গ্যাস সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে ৬৫.৭ টিসিএফ। আর পাওয়ার সম্ভাবনা ৫০ঃ৫০ ধরলে অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদের পরিমাণ ৩২.১ টিসিএফ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শেষটাই যা মধ্য-গড় নামে আন্তর্জাতিকভাবে অধিক গ্রহণযোগ্য হিসাব। গ্যাস সম্পর্কে এসব তথ্য গ্রহণযোগ্য কিনা, সে প্রশ্নে সন্দেহ রয়েছে। বাংলাদেশের অনেক ভূতাত্ত্বিক এসব পরিসংখ্যান প্রশ্নের চোখেই দেখেন। তৎসত্ত্বেও একথা সত্য যে, বিশ্বের জ্বালানি মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে কারণে বিদেশী তেল কম্পানীগুলো বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ সম্পর্কে উৎসাহ দেখাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্বেরও আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এসব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেও মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্রের বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করতে হবে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিদেশী বিনিয়োগের জন্য সহায়ক নয়। সুতরাং, গ্যাস সম্পদ আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনাকে সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখতে চাইবে। এটাই স্বাভাবিক। প্রশ্ন হল, এই স্থিতিশীলতা গণতান্ত্রিক ক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ার বিনিময়ে অর্জিত হবে কি?

আফতাব আহমাদ :

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ওয়াশিংটন মানবাধিকার বিষয়ক বার্ষিক রিপোর্টটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। ঐ রিপোর্টে বাংলাদেশে মানবাধিকার হরণের ব্যাপক করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়। বিশ্বের দেশে দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করে প্রতিবছর মানবাধিকার বিষয়ক একটি বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের একটি রুটিন কাজে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন সময়ে কতগুলো কোর ইস্যুকে সামনে রেখে তৈরী করা হয়। বিশেষ করে জিমি কার্টারের আমল থেকে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রায়নের ইস্যুগুলো মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির কোর ইসুতে পরিণত হয়।

এ বছর ওয়াশিংটনে প্রকাশিত মানবাধিকার রিপোর্টে বাংলাদেশের যে চিত্র পরিদৃষ্ট হয়েছে তাতে স্পষ্টতই বোঝা যায়, বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতিটি আদৌ সন্তোষজনক

www.pathagar.com

নয়। রিপোর্টের ভাষ্যমতে, বিচার বহির্ভূত পন্থায় পুলিশের হাতে খুন হওয়া ছাড়াও পুলিশী হেফাজতে রহস্যজনকভাবে নিহতের সংখ্যা অনেক। রাজনৈতিক প্রতিবাদের কথা বাদ দিলেও জনজীবনের যে কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে জনসাধারণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে তার উপর পুলিশের লাঠিপেটা করার ঘটনা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জিজ্ঞাসাবাদের নামে সন্দেহভাজনদের উপর নির্মম পুলিশী নির্যাতন এবং মারপিটসহ নানা কিসিমের দৈহিক নির্যাতন একটি নিয়মিত রেওয়াজে পর্যবসিত হয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মতে বাংলাদেশে মহিলা কয়েদীদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। নিরাপত্তা হেফাজতে প্রায়ই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। গ্রেফতারের সময়ে পুলিশ অনেককেই গুলী করে হত্যা করেছে বলেও ওই রিপোর্টে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ রিপোর্টে বলা হয় যে, গত বছর ৯ ফেব্রুয়ারী মোহাম্মদ আহমদ হোসেন সুমন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সময় পুলিশ গুলী করে হত্যা করে। গত বছর ১৮ সেপ্টেম্বর পুলিশের ভয়ে মাহবুব হোসেন খান নামক এক ব্যক্তিকে ঝিলে ঝাঁপ দিতে হয়। এতে সে ডুবে মারা যায়। রিপোর্টের মতে, ১৯৯৯ সালে বিরোধী দলের হরতালের সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনানুযায়ী আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হাজী মকবুল হোসেনের নির্দেশে তার সশস্ত্র অনুসারীরা বিএনপির দু'জন তরুণ কর্মীকে হত্যা করে। এক ডজন পুলিশ আশপাশে থাকা অবস্থায়ও তারা এর প্রতিকারে এগিয়ে আসেনি। ১৬ জুলাই যশোরের প্রখ্যাত সাংবাদিক শামছুর রহমান অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে নিহত হন। ১৯৯৯-এর মার্চে সরকার দলীয় এমপি মহিবুর রহমান মানিকের বাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণে দু'জন মারা যায়। পত্র-পত্রিকার ভাষ্য অনুসার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যই মানিকের বাড়ীতে ওই বোমা তৈরী করা হচ্ছিল। গত বছর ১২ জুলাই চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীদের গুলীতে ৮ জন নিহত হয়। এর মধ্যে ৬ জন ছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দলীয় সদস্য। এ ঘটনার জন্য শেখ হাসিনা 'স্বাধীনতাবিরোধী' চক্রকে দায়ী করে তার সমর্থকদের একজনের মৃত্যুর বদলা হিসেবে দশটি লাশ ফেলার আহবান জানান। রিপোর্টে আরও বলা হয়, পুলিশের বাড়াবাড়ি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কোন ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ যে কারও বাড়ী, বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বাড়ীতে তল্লাশি চালিয়ে থাকে। পুলিশের ক্ষমতা আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে জননিরাপত্তা আইন বলবৎ করার মধ্য দিয়ে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশে মানবাধিকার যেভাবে লংঘিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, তার বিবরণ দেশে যে কয়টি মানবাধিকার সংস্থা রয়েছে তাদের প্রত্যেকের বার্ষিক প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উপরন্তু মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে এ যাবৎকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটির রায় হচ্ছে, আওয়ামী শাসন ও মানবাধিকার বাংলাদেশে যুগপৎভাব নির্বিরোধ সহাবস্থান করতে পারে না। বাংলাদেশে মানবাধিকার শুধু নয়, মানুষের জীবনই আজ সংশয়ের মুখে পড়েছে।

ফেনীর নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক টিপু পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ফেনীর 'ইচ্ছাপিতা' জয়নাল হাজারীর সন্ত্রাসী বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে যেতে বসেছেন। অথচ এ বিষয়ে সরকার কিংবা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোন অর্থবহ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তবে, প্রধানমন্ত্রী হতভাগ্য সাংবাদিক টিপুকে তাঁর 'বদান্যতা'র নিদর্শন হিসেবে এক লাখ টাকা দান করেছেন।

লক্ষ্মীপুরের এডভোকেট নূরুল ইসলাম মানবাধিকার লংঘন বিষয়ক বিভিন্ন মামলায় নির্যাতিত ও নিগৃহীত নাগরিকদের পক্ষাবলম্বন করে আসছিলেন। এমনকি সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আইনী লড়াইয়েও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অবদান রেখে আসছিলেন। 'জনকণ্ঠ' থেকে শুরু করে সকল মতের সংবাদপত্র এডভোকেট নূরুল

www.pathagar.com

ইসলামের সততা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করে এসেছে। এই সাহসী মানবাধিকার কর্মীকে লক্ষ্মীপুরের 'ইচ্ছাপিতা' তাহেরের নির্দেশে অপহরণ করা হয় এবং জানা যায় যে, এডভোকেট নূরুল ইসলামের দেহকে টুকরো টুকরো করে মেঘনার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হয়। এ বিষয়েও প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী 'ইচ্ছা পিতা' তাহেরের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছেন, 'শুধু তাহেরের নাম কেন উচ্চারিত হয়? এক হাতে তালি বাজে না।' দুঃখ-বেদনা ও শোকে মুহ্যমান লক্ষ্মীপুরবাসী প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তিতে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রভাবশালী এক মন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাহের প্রকাশ্য সভায় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, তার বিরুদ্ধে কোন সাংবাদিক কিছু লিখলে সেই ব্যক্তির হাত পা গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। এই হচ্ছে বাংলাদেশের মানবাধিকারের বাস্তব চিত্র। মন্ত্রীর পুত্র কিংবা সংসদ সদস্যের পুত্র সরাসরি খুনের সঙ্গে জড়িত, এ মর্মে সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট বের হলেও পুলিশ কোনকিছু করতে অক্ষম। আসলে, দলীয়করণ এবং দলবাজির ফলে গোটা পুলিশ প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। নিবেদিতপ্রাণ, নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক পুলিশের পক্ষে যথাবিহিত আইন অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন দুরূহ হয়ে পড়েছে। এদের চাকরির নিরাপত্তা সব সময়ে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। নির্বাহী বিভাগের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফল পুলিশকে দলীয় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীতে পরিণত করার যে অসুস্থ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা কারও জন্যই যে মঙ্গলজনক নয় ক্ষমতাসীনরা তা কিছুতেই বুঝতে চাইছে না। বাকশালী শাসনামলে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন কারাগারসমূহের আইজির দপ্তরটিকে কারাগারের অংশে রূপান্তরিত করা হয়। এই অংশটিকে কয়েদীদের মুখে মুখে নাম দেয়া হয় New Jail. এই নিউ জেলের বৈশিষ্ট্য ছিল কয়েদীদের রাখার জন্য সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠসহ আরও নানা ধরনের পীড়াদায়ক ব্যবস্থা। প্রবেশ পথে কাঠের ফলকে কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে হাতে লেখা একটি বিজ্ঞপ্তি সাঁটা ছিল। ওতে বলা হয় "এখানে রাষ্ট্রবিরোধী, সমাজবিরোধী, দুষ্কৃতকারী ও নাশকতামূলক কাজে জড়িত অপরাধীদের রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে"। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! ওই নিউ জেলে বাকশালী শাসনামলে কোন হাজতী বা কয়েদীকে বাস করতে হয়নি। কিন্তু বাকশালী শাসন উৎখাত হওয়ার পর বাকশাল আমলের প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীসহ আওয়ামী নেতাদের যখন বন্দী করা হয় তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বাসিন্দাদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ও নিরাপত্তাজনিত কারণে আওয়ামী বাকশালী নেতাদের ঐ নিউ জেলেই থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। নিউ জেলের প্রবেশপথে কাঠের ফলকে সাঁটা হাতের লেখা বিজ্ঞপ্তিটির ভাষ্য পড়ে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দীন আহমদ বাকশাল আমলের প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীর দিকে মুচকি হেসে বলেছিলেন ঃ "নিন, প্রধানমন্ত্রী, আপনার জেলে আপনি প্রবেশ করে আপনিই উদ্বোধন করুন।"

ক্ষমতা লাভ করেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যারা মাত্রা ছাড়িয়ে আস্ফালন করতে থাকেন এবং মানবাধিকারকে পদদলিত করতে থাকেন, তারা এই নিউ জেল নির্মাণের ঘটনা ও মনসুর আলীর উদ্দেশ্যে তাজউদ্দীনের উক্তি থেকেও কি ইতিহাসের বিকাশ ধারাকে বুঝতে চাইবেন না?

www.pathagar.com

২২ মার্চ ২০০১

শেখ হাসিনার নাটকীয় উক্তি

মাহবুব উল্লাহ :

আজ যখন আমরা আলোচনা করছি, দিনটি মার্চের ১৩ তারিখ। আমাদের এই বক্তব্য যখন প্রকাশিত হবে সেই সময়ের মধ্যে হয়তো দেশে অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটে যাবে। মূলত ঈদুল আযহার উৎসবে সমগ্র জাতি যখন ব্যস্ত, তখন জাতীয় জীবনের যে নাটক আমরা গত প্রায় ৫ বছর ধরে প্রত্যক্ষ করে আসছি, তার শেষ অংকের প্রথম দৃশ্যটির যবনিকাপাত হল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হজব্রত পালন করতে এক বিশালসংখ্যক সঙ্গী-সাথীসহ সৌদী আরব গেলেন, তার পরপরই বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গেলেন চীন সফরে। বাংলাদেশের রাজনীতির এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের দ্বিমুখী যাত্রায় জাতি আদৌ বিস্মিত হয়নি। জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী জোটের নেত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া যদি এ যাত্রা চীনে না গিয়ে হজ করতে যেতেন– সেটাই হয়তো স্বাভাবিক হত। অন্যদিকে, শেখ হাসিনা সৌদী আরব না গিয়ে দিল্লী গেলেই হয়তো স্বাভাবিক হত। সৌদী আরব থেকে শেখ হাসিনা হজ পালন করে সমগ্র দেহ কালো বোরখার আচ্ছাদনে আবৃত করে গভীর রাতে দেশে ফিরেছেন। শেখ হাসিনা '৯৬'র নির্বাচনের পূর্ব থেকে শুরু করে বহুবার ইসলামী লেবাস পরেছেন, আবার তা পরিত্যাগও করেছেন। বিদেশী বেগানা পুরুষ রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে করমর্দন করতে শেখ হাসিনা বিব্রতবোধ করছেন, এমন কখনওই মনে হয়নি। অন্যদিকে, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর যে বিপুল অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষাকো ধারণ করেন, তাদের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে ঈদুল আযহা উপলক্ষে পবিত্র মক্কা ও মদীনা মুনাওয়ারায় গেলেই হয়ত স্বাভাবিক হত।

কিছু ঘটনাদৃষ্টে মনে হয়, ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে এমন পরিবর্তন অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছে, যে কারণে সিঙ্গাপুর ও বেইজিং যাওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করছেন। বেগম খালেদা জিয়াই তাঁর দল ও জোটের পক্ষ থেকে সবচাইতে ভাল জানেন কখন কী করতে হবে। বস্তুতপক্ষে উপমহাদেশের রাষ্ট্রসমূহ ও প্রতিবেশী গণচীনের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি বাংলাদশের জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার সমীকরণটা কেমন হবে, সেটা বোঝাপড়া করে নেয়া অত্যন্ত জরুরী। সম্ভবত এ কারণেই তিনি এ যাত্রা চীন সফরে যাওয়াটা জরুরী বোধ করেছেন। লোক দেখানো হজের চাইতে এ যে অনেক বেশী জরুরী, সে কথাটাই বেগম খালেদা জিয়া জাতিকে বোঝাতে চেয়েছেন। অনেক দিন থেকেই জল্পনা-কল্পনা চলছিল, তিনি গণচীন সফরে যাবেন; গণচীনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে মত বিনিময় করবেন। অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনি গণচীন গেলেন এবং রাষ্ট্রের প্রধান ও সরকার প্রধান না হওয়া সত্ত্বেও গণচীনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি জিয়াং জেমিনের সঙ্গে বৈঠক করলেন। সংবাদপত্রে সে বৈঠকের ছবি ছাপা হয়েছে। আমরা শুধু এটুকু কামনা করব, প্রবল প্রতিবেশী ভারতের বৈরী আচরণের মুখে এ সফর বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে। গণচীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনাঢ্য দেশ নয়। বাংলাদেশকে চীন যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করে, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু চীন একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নতুন করে যে অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সে প্রেক্ষাপটে গণচীনের ভূমিকা ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ একটি জনবহুল অথচ ছোট দেশ।

www.pathagar.com

ওয়াশিংটন, টোকিও, লণ্ডন ও প্যারিসের সঙ্গে এর সম্পর্ক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বেইজিং, দিল্লী, ইসলামাবাদ, কলম্বো, কাঠমুণ্ডু ও ইয়াংগুনের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি। এই প্রসঙ্গে কোন রাজধানীর সঙ্গে ঢাকার সমীকরণটি কেমন হবে, তা যেমন একদিকে জটিল, অন্যদিকে উপেক্ষণীয় নয়। প্রতিবেশীদের পাশে থেকেই আমাদের মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকতে হবে এবং টিকে থাকার মত আমাদের বাস্তব ভিত্তিও রয়েছে। চীন ও ভারতের মাঝখানে এবং বঙ্গোপসাগরের তীরে বাংলাদেশের অবস্থান বাংলাদেশকে এক ঈর্ষণীয় অবস্থানে স্থাপন করেছে। আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপারটি যত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, জাতির জন্য ততই মঙ্গল।

সৌদী আরবে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, তাঁর একটি বিবৃতি পরবর্তী বিবৃতিকে নাকচ করে দেয়। ক্ষমতার খুঁটি রাজ দাবাড়ের মত চালতে জানেন শেখ হাসিনা। এদিকে বেইজিংয়ের উদ্দেশে রওনা হবার প্রাক্কালে বেগম খালেদা জিয়া প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মে মাসের মধ্যে নির্বাচন দাবী করেছেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর কথাবার্তা শুনেছেন, কিন্তু মন্তব্য করেননি। সৌদী আরব থেকে শেখ হাসিনার বক্তব্য শোনার পর সাংহাই থেকে তিনি এক বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশনের সংস্কার, ভোটার তালিকা সংশোধন, প্রশাসনিক সংস্কার এবং বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের দাবী জানিয়ে নির্বাচনকে অর্থপূর্ণ করার আহবান জানিয়েছেন। একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশকে যে জঞ্জালপূর্ণ আস্তাবলে পরিণত করেছে, তা ৯০ দিনের মধ্যে পরিষ্কার করে একটি অর্থবহ নির্বাচন করা সম্ভব হবে কি? পুলিশ বাহিনী চরমভাবে পক্ষপাতপূর্ণ ও দলীয়করণের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। মার্কিন সরকারের মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকে শুরু করে সকল মানবাধিকার গোষ্ঠী বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর অদক্ষতা, দুর্নীতি ও দুরাচারের চিত্র জনগণের কাছে তুলে ধরেছে।এই প্রেক্ষাপটে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীকে দেয়া যায় না। এজন্য সেনাবাহিনীকে তলব করতে হব। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশী নিরপেক্ষ। সে কারণে সেনাবাহিনীর ওপর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলে গণতন্ত্রকেই জোরদার করা হবে। নির্বাচন কমিশন প্রধান হিসেবে এম এ সাঈদের নিয়োগকে প্রাথমিকভাবে চ্যালেঞ্জ করলেও এ প্রশ্নে এখন জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্ব নীরব। তাদের এই নীরবতার হেতু তাদের সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা আদৌ বুঝে উঠতে পারছেন না। অপরদিকে, ভোটার তালিকায় দেড় কোটি ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে বিএনপি সন্দেহ ও আশংকা প্রকাশ করেছিল। ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারটি এখনও তাদের প্রশ্ন হিসেবে থেকে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছি, ১২ বছর বয়সী বালক-বালিকাও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পুরনো খাঁটি ভোটাররা ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ভোটার তালিকা তৈরীতে নিযুক্ত কর্মীরা বহুলাংশ ছিল আওয়ামী প্রশাসনের পছন্দনীয় ব্যক্তিবর্গ। ফলে তালিকাটি যে পক্ষপাতদুষ্ট ও ত্রুটিপূর্ণ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। এই সমস্যার ফায়সালা করতেও অনেক সময়ের প্রয়োজন। অন্যদিকে বিরোধীদলগুলোকেও তথ্যনির্ভর যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, ভোটার তালিকার আমূল সংশোধন করতে হবে। এর জন্য তাদের যেমন সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সময়ের। এক কথায় এটা স্পষ্ট যে, কাজটা সময়সাপেক্ষ। অতীতে অনেক ভুল হয়েছে। বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও আবু হেনার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে যে আত্মহননের কাজ '৯৬'র নির্বাচনের সময়ে বিএনপি করেছিল সেরকম কিছু এবারও ঘটলে জাতির জন্য প্রচণ্ড আশাভঙ্গের কারণ হবে এবং এ থেকে দেশ বিশাল সংকটে জড়িয়ে পড়তে পারে।

গত ১২ মার্চ বিশ্বব্যাংকের ঢাকা প্রতিনিধি ফেডরিক টি টেম্পল বাংলাদেশের জন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তা কৌশল প্রতিবেদন উত্থাপন করতে গিয়ে কিছু রাজনৈতিক মন্তব্য

www.pathagar.com

করেছেন। তিনি এদেশে ভবিষ্যতে একটি দুর্বল কোয়ালিশন সরকার গঠিত হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন এবং এর ফলে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে, তার ফলে বিদেশী সাহায্যপ্রবাহ কমে যাওয়ারও আশংকা প্রকাশ করেছেন। সেক্ষেত্রে এনজিওদের মাধ্যমে সাহায্যপ্রবাহ বর্ধনের ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রভাবশালী এনজিও রাজনীতিতে তৎপর এবং তারা আওয়ামী গোষ্ঠীর সমর্থক। আওয়ামী গোষ্ঠীর জন্য ভোটের যোগান বাড়াতে তারা কসুর করবে না। গণিতের সাধারণ হিসাব মতে, শতকরা ৬৬ ভাগ ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করে বিরোধীদলীয় জোট। জোটবদ্ধ নির্বাচন যদি সত্যিই অনুষ্ঠিত হয় তাহলে কী কারণে দুর্বল কোয়ালিশন গঠিত হবে, তা বোঝা মুশকিল। বিশ্বব্যাংক যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। '৯৬'র নির্বাচনে ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি ক্রিস্টোফার উইলোবির ভূমিকা নিশ্চয়ই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বিস্মৃত হননি। টেম্পল সাহেবের মন্তব্য যে এক অশনী সংকেত, তা বোঝার ক্ষমতা জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের আছে বলেই মনে করব। দেশের ভেতরে আওয়ামী সরকার যে আবর্জনার আস্তাবল তৈরী করে রেখে যাচ্ছে, তার সঙ্গে যদি পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠীর শলা-কলাকৌশল যুক্ত হয়, তাহলে যে জাতির আশাভঙ্গ হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জাতীয়তাবাদী দল ও বিরোধী জোটের নেতৃবৃন্দ এসব দিকগুলো বিবেচনায় রেখে পা ফেলবেন– যে আশা করাটা আদৌ অন্যায় হবে না। প্রশ্ন হল, বিরোধী জোট জাতির সে আশা পূরণে কতটুকু সজাগ ও সচেতন? কেবল ক্ষমতার জন্য ক্ষমতা নয়, আওয়ামী লীগ জাতির যে সর্বনাশ করেছে, তা সংশোধনের জন্য বিরোধী জোট তাদের এজেন্ডা প্রণয়ন করবে– এটাই জাতির প্রত্যাশা।

শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে বিরোধী জোটকে বিজয় মিছিল না করার পরামর্শ দিয়ে বলে দিয়েছেন, আগাম নির্বাচনের আভাস দেয়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ যে বদান্যতা প্রদর্শন করতে চাচ্ছে তাকে যেন তারা দুর্বলতা হিসেবে ভেবে না বসে। শেখ হাসিনার এই মন্তব্যও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নিতে হবে। শেখ হাসিনার নাটকীয় উক্তি নয়, তাঁর রহস্যময় অন্তরকে বুঝতে পারলেই বিরোধী দলগুলো বুদ্ধিমানের কাজ করবে।

আফতাব আহামদ :

রাজনীতির লাগাম এখন শেখ হাসিনার হাতে। গত কিছুদিনের ঘটনাবলী দৃষ্টে যে কোন ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুবেন। আগাম নির্বাচনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা দেশের সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নির্বাচনী স্রোতে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছেন, একথা স্বীকার করতেই হবে। সর্বশেষ পদক্ষেপটির মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা আবারও প্রমাণ করলেনা যে, ১৯৯৬ থেকে দেশের রাজনীতিতে তিনি যে প্রাধান্য বিস্তার করেছেন, তা এখনও অক্ষুণ্ন আছে। এযাবতকাল পর্যন্ত বিরোধী দলগুলো কোন Pro-active পদক্ষেপ বা কর্মসূচী নিয়ে আওয়ামী লীগকে কিংবা হাসিনার শাসনকে মোকাবিলা করার ন্যূনতম উদ্যোগ নিতে পারেনি। বিরোধীদলগুলো আওয়ামী শাসনের পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের বিপরীতে Re-active কর্মসূচী নিয়ে জনমত তৈরী করার চেষ্টা করেছে। এক্ষেত্রেও তাদের শৈথিল্য ও শ্লথগতিও রহস্যময়তায় আবৃত।

আওয়ামী শাসনের একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তারা কখনও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেনি। ভুল-শুদ্ধ যা-ই হোক না কেন, তারা যা সঠিক মনে করেছে, তা নির্দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে অতি দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছে। একই সঙ্গে, দলীয়করণের প্রশ্নে কোন ধরনের কুণ্ঠা কিংবা অপরাধবোধ তাদেরকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। দৃঢ় প্রত্যয় ও আস্থার সঙ্গে আওয়ামী লীগ কোন রাখঢাক না রেখেই কঠোর দলীয়করণে দুষ্ট ও পক্ষপাতমূলক প্রশাসন গড়ে তুলেছে। এর নৈতিক ভিত্তি কিংবা ন্যায্যতা সম্পর্কে কোন ধরনের ভাবনা তাদের বিচলিত করতে

www.pathagar.com

পারেনি। যারা পক্ষপাতমুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ জবাবদিহিমূলক একটি শাসন ব্যবস্থা প্রত্যাশা করেন, তাদের কাছে আওয়ামী লীগের এই আচরণ যতই অনভিপ্রেত ও অসহনীয় মনে হোক না কেন, আওয়ামী লীগ সকল মহলকে একটি বিষয়ে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, শাসন করতে হয় পূর্ণ আস্থা, অঙ্গীকার ও দৃঢ়চিত্ত নিয়ে।

কিন্তু আওয়ামী শাসনের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এ প্রসঙ্গে মনে না রাখলে আগামীতে দেশের মানুষের পক্ষে অর্থবহ রাজনীতি অনুশীলন করা দুরূহ হয়ে উঠবে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী শাসনের এই দিকটি হচ্ছে, মাত্রাতিরিক্ত ভারত নির্ভরশীলতা। ভারত নির্ভরশীলতা এমন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে যে, জনসাধারণ আওয়ামী শাসনকে রাষ্ট্রঘাতী শাসন হিসেবে অভিহিত করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। আওয়ামী সমর্থকরা অনেকে হয়তো যুক্তি দেখিয়ে দাবী করার চেষ্টা করবেন যে, এসবই আওয়ামী বিদ্বেষপ্রসূত। বাস্তব কিন্তু তা নয়। হাসিনার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই সিঙ্গাপুর সফরে যে 'সমঝোতা' হয়, তা বাস্তবায়ন শুরু হয়। ২৫ বছরের 'শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা'র চুক্তি নবায়ন না করেও অসংখ্য ছোট ছোট চুক্তি ও 'সমঝোতা স্মারকের' মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতের খবরদারী ও অধীনতা মেনে নিয়েছে। কোন সার্বভৌম দেশের পক্ষে এই অবস্থা আদৌ গৌরবের হতে পারে না। সর্বোপরি, বাংলাদেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ভারতের ভূ-কৌশলগত ও ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার যে কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ অঞ্চলের ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পূর্ণ পাল্টে যাবার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে এর ফলে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারত মিলিটারি করিডর স্থাপন, চট্টগ্রাম বন্দরকে ভারতের নিয়ন্ত্রণে রাখা, বঙ্গোপসাগরে ভারতের শক্তিশালী নৌ উপস্থিতি নিশ্চিত করা, বাংলাদেশের তেল-গ্যাস ভারতীয় কারবারীদের হাতে তুলে দেয়া, দেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজালকে বিস্তৃত করার সুযোগ করে দেয়া, উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের নামে ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের উদ্যোগে ভারতীয় প্রতিরক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা, অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কালো টাকা ও অস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপন করা– এর সবকিছুই একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শুধু বিপর্যস্তই করবে না, বরং রাষ্ট্রঘাতী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে। আওয়ামী শাসনের গোটা কালটা জুড়ে এ বিষয়-আশয়গুলো নিয়ে জনমনে ক্ষোভ ও সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। কিন্তু আওয়ামী শাসনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে জনমনের এই ক্ষোভ ও সন্দেহকে কেন্দ্র করে বিরোধীদলগুলো আওয়ামী লীগকে আদৌ আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে ঠেলে নিয়ে যেতে পারেনি। তবে আওয়ামী লীগের বাড়াবাড়ি, সহিংস সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং মাস্তান ও ইচ্ছাপিতাদের কর্মকাণ্ডের ফলে বিরোধীদলগুলোর প্রতি জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। একই সঙ্গে আওয়ামী মহলে এখনও হাতেগোনা কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক যারা আছেন, তাঁদের ইচ্ছার প্রতিফলন আমরা আওয়ামী সমর্থক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাঝে মধ্যেই দেখেছি। ঐসব পত্র-পত্রিকায় আওয়ামী লীগের শাসনামলের দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অপকর্মের বহু অনুসন্ধানী সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হতেও আমরা দেখছি। শেখ হাসিনার কৃতিত্বটুকু হচ্ছে এই যে, তিনি এর তাৎপর্য কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং দেয়ালের লেখা সম্যকভাবে পাঠ করার চেষ্টা করেছেন। আর তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার সাম্প্রতিকতম আগাম নির্বাচন দেয়ার যে ঘোষণা তিনি দিয়েছেন, সেই চালের মধ্য দিয়ে।

শেখ হাসিনার একটি ঘোষণাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নাটকীয় মোড় এনে দেয়। এখন সবাই 'হাঁই মারো মারো টান হাঁইয়ো' বলে নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এক্ষেত্রে আওয়ামী বিরোধীরা একই বিষয়ে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন যে, তাদের কঠোর সমালোচনা ও ক্রমাগত চাপের মুখে আওয়ামী লীগের

www.pathagar.com

মুখোশ খুলে পড়ে এবং কোণঠাসা হয়ে আগাম নির্বাচনের কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যা প্রণিধান করার বিষয় তা হচ্ছে প্রশাসনিক কাঠামোতে বর্তমানে নিয়োগগুলোকে অপরিবর্তিত রেখে অস্ত্র উদ্ধার না করে এবং কালো টাকার উৎপাতকে নিয়ন্ত্রণ না করে আওয়ামী লীগের শর্তাধীনে বিরোধী দলগুলো যদি মরিয়া হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়, তাহলে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি ভবিষ্যৎ সরকারের চরিত্র সম্পর্কে যে আশংকা ব্যক্ত করেছেন, তা যে শুধু অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে– তাই নয়; বরং বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। এ প্রসঙ্গে এনজিওদের সম্পর্কে দু'টি কথা না বললেই নয়। নির্দিষ্ট চার-পাঁচটি এনজিও, যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার নামে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নীলনকশা এদেশে বাস্তবায়নে তৎপর, তারা ছাড়া অন্য এনজিওগুলোর ভূমিকা সাধারণত ইতিবাচক বলা চলে। তবে, এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ডোনার এজেন্সিগুলো এবং ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজাল অন্য এনজিওদের মধ্যেও নিউ রিক্রুটমেন্টে ব্যস্ত থাকবে। সাবধানের মার নেই। তাছাড়া, এনজিওদের বিকল্প উন্নয়ন কাজে ব্যস্ত থাকার কথা; রাজনীতি নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার কথা নয়। যেসব এনজিও দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রায়শই মতামত ব্যক্ত করতে উদগ্রীব, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। শুধু এ কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারে এনজিওদের কোন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে আত্মঘাতী পদক্ষেপ। আশা করি, সংশ্লিষ্ট সকল মহল বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবে।

ভুয়া ভোটারদের বিষয়ে কোন নীতিগত সিদ্ধান্তে বিরোধী দলগুলো যদি এখনও না আসতে পারে এবং বিরোধী দলগুলো দেশের অখণ্ডতা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে অবিচল থেকে রাষ্ট্রঘাতী চক্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণে যথোচিত পদক্ষেপ যদি না নেয়, তাহলে তুলনামূলক কম আসন নিয়েও আওয়ামী লীগ যদি দলগতভাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তাতে বিস্মিত হবার কিছুই থাকবে না। অতএব, জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে কোন ধরনের বিভেদকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না, যদি না তারা রাজনীতি আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে ঠেলে দিতে চান। বৃহৎ দলসুলভ জাত্যাভিমান কিংবা ছোট দলের অপরিহার্যতার দম্ভ কোনটিই বিরোধী শিবিরের সুদৃঢ় ঐক্যের অনুকূলে যাবে না। আওয়ামী লীগের এখনকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হাতিয়ার হবে, বিরোধী শিবিরে সন্দেহের বীজ বপন করে বিভেদ সৃষ্টি করা। আর বিরোধী শিবিরের বর্তমান অবস্থাকে আরো নাজুক করে তুলবে অপরিণামদর্শী বক্তব্য ও বিবৃতি। একটি অর্থবহ ও জনগণের আশা-আকাঙক্ষার প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির দায়িত্বে দলীয়করণের ফলে দলবাজিতে সিদ্ধহস্ত বর্তমান পুলিশ প্রশাসনকে ন্যস্ত করা যাবে না। অন্যথায় পুরো মাঠ আওয়ামী মাস্তান ও অস্ত্রধারীদের হাতে থাকবে। এমতাবস্থায় আইন–শৃঙ্খলা ও শান্তির সাথে অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসী ও ইহ্ছাপিতাদের গ্রেফতার এবং বিশৃংখলা নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করার বিকল্প আর কিছু নেই। বহু টানাপড়েন সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনী এখনও দলীয়করণের পাপাচার থেকে যথেষ্ট মুক্ত এবং শৃংখলার দিক থেকে অগ্রগণ্য। তাই, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পাশাপাশি শান্তি ও আইন-শৃংখলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর সরাসরি উপস্থিতি মানুষকে আশ্বস্ত করবে। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদের ওপর রয়েছে এক গুরু দায়িত্ব। আশা করি, তিনি দৃঢ়চিত্তে নির্মোহ অঙ্গীকারের ভিত্তিতে '৯১-এর মত একটি পক্ষপাতমুক্ত নিরপেক্ষ নির্বাচনের সকল আয়োজনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করবেন।

www.pathagar.com

২৯ মার্চ ২০০১

দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ-বোধ জাতীয় বিপর্যয়ের শামিল

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশে এখন গ্রহণের কাল চলছে। আমি জানি না, সম্ভবত আমার মতো অনেকেই জানেন না, কবে এই গ্রহণের কাল শেষ হবে; জাতি স্বপ্ন দেখবে বাঁচার। আশা ও আত্মবিশ্বাসে স্ফীত বক্ষে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ বোধ করবে। আমি নিরাশাবাদী হতে চাই না। সব সময়ে আশাবাদী থাকতে আমি বিশ্বাসী। কিন্তু তবু আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি দারুণ এক অমানিশা জাতিকে গ্রাস করে ফেলছে। বড্ড আশান্বিত হয়েছিলাম, যখন দেখতে পেয়েছিলাম এদেশের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এ ধরনের ঐক্যের নজীর খুব একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। '৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিলো। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের বিজয়কে সুনিশ্চিত করেছিলো। কারণ সেই সময়ে জাতিদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে সকল দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছিলো এই ফ্রন্টের মাধ্যমে। বাংলাদেশে জাতিদ্রোহী শক্তি ছলে-বলে-কৌশলে বড়জোর ৩৬ শতাংশ ভোটারকে বিভ্রান্ত করতে পারে। কিন্তু দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে নিমিষেই দেশপ্রেমিক ৬৪ শতাংশ ভোটার ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের পক্ষে এবং জনগণের স্বার্থে নিজেদের সমর্থন জ্ঞাপনে পিছপা হয় না। কিন্তু যখনই জাতীয়তাবাদী শক্তি বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখনই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী সংখ্যালঘিষ্ঠের সমর্থনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। কারণ নানা প্রতীক ও দলের মধ্যে দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীদের ভোট বিভক্ত হয়ে জাতিদ্রোহীদের ক্ষমতার মঞ্চে আরোহণের পথ সুগম করে দেয়। তাই এবার যখন চারদলীয় জোট গঠিত হলো, তখন সবাই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলো। কিন্তু গত কয়েক দিনের ঘটনাবলীতে মনে হয়, হতাশ হবার মতো অনেকগুলো কারণ ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টি প্রধান এরশাদ কারারুদ্ধ হবার পর থেকেই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর চক্রান্ত ডালপালা বিস্তার করতে থাকে।

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে এরশাদ কারারুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁকে গ্রেফতার করেছিলো বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। মারাত্মক জাতীয় বিপর্যয় ও রক্তপাত এড়াতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। তারপর একে একে তাঁর বিরুদ্ধে পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ আসতে শুরু করলে কারাগার থেকে তাঁর মুক্তিও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর কারাবাসের সুযোগ নিলো আওয়ামী নেতৃত্ব। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীর আড়ালে জাতীয়তাবাদী শিবিরে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা সম্ভব হলো। এমনকি, জামায়াতে ইসলামীর মতো দলও বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মেলালো। জামায়াতে ইসলামী কখনও আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে, এমনটি ভাবা যায়নি। তবু সাধারণ মানুষের অবাঙমানসগোচর এই ঘটনাটি ঘটতে পেরেছিলো একদিকে জাতীয়তাবাদী দলের সুদূর প্রসারী দৃষ্টির অভাবে, অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর আত্মহননের রাজনীতির ফলে। একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই কর্তব্য। এরকম সংকটের মুখে বৃহৎ দলসুলভ দম্ভ যেমন বিপর্যয়ের কারণ, তেমনি আদর্শচ্যুত হয়ে স্বাভাবিক মিত্রকে একটা শিক্ষা দেয়ার কৌশল আত্মহত্যারই শামিল।

www.pathagar.com

'৯৬'র নির্বাচনে বৃহৎ দলসুলভ দম্ভ ও সঙ্কীর্ণ দলীয় চিন্তা জাতির জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। এক্ষেত্রে আমি গণচীনের ইতিহাস থেকে একটি ঘটনা পাঠক সমীপে পেশ করতে চাই। চীনের উপর জাপানী আগ্রাসন সত্ত্বেও সে সময়কার চীনের রাষ্ট্রপ্রধান চিয়াং কাইশেক জাপানী আগ্রাসন প্রতিহত করার তুলনায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্মূল করার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করেছিলেন। মাও জেডংয়ের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ ঝেড়ে ফেলে, জাতির সমগ্র শক্তিকে জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা আহ্বান জানিয়েছিলো। কিন্তু ফ্যাসিস্ট চিয়াং কাইশেক সরকার মাও জেডংয়ের ডাকে সাড়া দেয়নি। এমন সময়ে সিয়ানে একদল বিদ্রোহী সৈন্য চিয়াং কাইশেকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটায় এবং চিয়াং কাইশেককে বন্দী করে। বিদ্রোহী সৈনিকরা যাতে চিয়াং কাইশেকের প্রাণহানি না ঘটায় তা নিশ্চিত করার জন্য মাও জে ডং চৌএন লাইকে সিয়ানে প্রেরণ করেন। সিয়ানে চিয়াং কাইশেক ও চৌএন লাইয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হলো এবং পরিশেষে উভয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। গঠিত হলো জাপবিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট। চিয়াং কাইশেকের বাহিনীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে রক্তক্ষয়ী উস্কানি সত্ত্বেও মাও জে ডং শেষ জাপানী সৈন্যটি চীনের মাটি ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত জাতীয় যুক্তফ্রন্ট বজায় রাখার নীতিতে অটল থাকলেন। উল্লেখ্য যে, ইতোঃপূর্বে গৃহযুদ্ধের সময়ে চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদের হাতে মাও জেডংয়ের প্রিয়তমা স্ত্রী নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মাও জে ডং জাতীয় প্রয়োজনের তুলনায় নিজের ব্যক্তিগত ক্ষোভকে বড় করে তোলেননি। এ কারণেই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো আধুনিক চীনের অভ্যুদয় ঘটানো। ১৯৪৯-এর পহেলা অক্টোবর মাও জেডং তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে চীনা বিপ্লব জয়যুক্ত হবার অভিষেক অনুষ্ঠানে পরম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, 'চীন আজ উঠে দাঁড়িয়েছে। তাকে আর কেউ পদানত করতে পারবে না'।

গণচীনের ইতিহাসের এই দৃষ্টান্তটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। কেউ কেউ বলতে পারেন, বাংলাদেশতো শত্রু রাষ্ট্রের দ্বারা সরাসরি আক্রান্ত হয়নি; সুতরাং এই দৃষ্টান্তটি প্রাসঙ্গিক নয়। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে শত্রুর সামরিক অভিযানের শিকার নয়, এ কথা যেমন সত্য, তার চেয়ে অনেক বেশী সত্য, বাংলাদেশে জাতীয় অনৈক্য ও বিভেদ জিইয়ে রেখে বাংলাদেশকে কুমড়োর ফালির মতো টুকরো টুকরো করে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাইছে আধিপত্যবাদী শক্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম, স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন এবং দেশের সীমান্তে বসবাসকারী গারো, হাজং, সাঁওতাল ও মনিপুরীদের বিদ্রোহের উস্কানি দিয়ে বাংলাদেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাইছে আধিপত্যবাদী গোষ্ঠী।

বাংলাদেশের বাজার এখন আধিপত্যবাদীদের দখলে। বাংলাদেশের সড়কপথগুলো এখন আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের যানবাহনের জন্য উন্মুক্ত। সীমান্তের সীমান্তরক্ষীরা বিএসএফের হামলায় জান কোরবান করছে। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে কুৎসিত সন্ত্রাস জিইয়ে রেখে এদেশের ছাত্রসমাজকে ভারতমুখী করা হয়েছে। আগ্রাসনের আর বাকী থাকল কী? তাই দেশ নিয়ে যারা ভাবেন তারা প্রায়শই একটি কথা উচ্চারণ করেন, তা হল, বাংলাদেশের পতাকা থাকবে, কিন্তু স্বাধীনতা থাকবে না। ভূখণ্ড থাকবে, কিন্তু সার্বভৌমত্ব থাকবে না। আধিপত্যবাদ আজ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত তাদের গোয়েন্দা কর্মজাল বিস্তার করেছে। এটা অতিশয়োক্তি নয়। আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা বাহিনীর স্থানীয় প্রধান এবং একটি বিদেশী রাষ্ট্রের দূত দেশের প্রধান কারাগারে গিয়ে একজন বন্দী রাজনৈতিক দলপ্রধানের সাথে যদি দীর্ঘ বৈঠক করতে পারেন, তাহলে সেদেশের সার্বভৌমত্ব বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে কি? এই সংবাদটি কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দলের পক্ষ থেকে এর কোন জোরালো প্রতিবাদ জানানো হয়নি।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হবার পর অল্প কিছুদিনের জন্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারের সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। সে সময়ে অনেকেই মনে করতেন, জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রটির ইঙ্গিত ছিল। জেনারেল এরশাদ শেখ হাসিনার সঙ্গে সমঝোতা করেই দীর্ঘ ৯ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। ক্ষমতাচ্যুত হবার পর বেশীরভাগ সময় তার কারাগারেই কেটেছে। এ যাত্রা উচ্চতর আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে কারারুদ্ধ হবার পর তার দলের কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন, দলের প্রতীক লাঙ্গল রক্ষা ও বন্দী পার্টি প্রধান এরশাদের মুক্তির বিষয়টি তাদের কাছে এখন মূল বিবেচ্য। চারদলীয় জোট রক্ষা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হলেও তাতে দৃঢ়তার অভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের প্রশ্ন হল, এই মুহূর্তে কোন বিবেচনাটি মুখ্য? দলের প্রতীক 'লাঙ্গল' রক্ষা, না দেশ রক্ষা? এরশাদের মুক্তি, না ফ্যাসিস্ট সরকারের অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতনের হাত থেকে দেশের মুক্তি? এরশাদ সাহেবের শুভানুধ্যায়ীরা কেন ভুলে যান, দেশ রক্ষা পেলেই লাঙ্গলের মত প্রতীকটিও রক্ষা পাবে। দেশের মানুষ মুক্ত হলে, তিনিও মুক্ত হবেন। ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ নয়, দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করাই সকলের কাম্য। এরশাদ তো ৯ বছর ক্ষমতায় ছিলেন, কিন্তু ক্ষমতা থেকে তার অপসারণ ত্বরান্বিত হয় দুটি পদক্ষেপের কারণে। বিষয়টি আমরা জানতে পারি তারই দলের অন্যতম নেতা জনাব কাজী জাফর আহমদ দৈনিক ইনকিলাব আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তা থেকে। কাজী জাফর বলেছিলেন, ভারতের অমতে কুয়েত উদ্ধার অভিযানে বাংলাদেশী সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত ও নেপালের উপর ভারতের নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ বিমানের মাধ্যমে নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডুতে জ্বালানি তেল সরবরাহের কারণে এরশাদের উপর ভারত রুষ্ট হয়। কাজী জাফর বলেছিলেন, সে সময়ে ভারত হুমকী দিয়েছিল ভারতীয় আকাশে বাংলাদেশী সৈন্য বহনকারী বিমানকে তারা গুলী করে মাটিতে নামিয়ে আনবে। তবে সেই হুমকী কার্যকর না করলেও এরশাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ভারত চক্রান্ত করেছিল।

ইতিহাসে সকল বশংবদ ও তাঁবেদারদের পরিণতি এমনটিই হয়। ক্লাইভের গর্দভ মীর জাফরের প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে যায়, তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তারই জামাতা মীর কাসিমকে নবাব মনোনীত করেন। কীর কাসিম যদি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিশ্বাসভাজন না হতেন, তাহলে তাকে নবাব মনোনীত করা হত না। কিন্তু, ক্ষমতা এমন একটি জিনিস যার স্বাদ পেলে মানুষের মধ্যে ক্ষমতার অহংকারবোধও সৃষ্টি হয়। মীর কাসিমেরও তাই হয়েছিল। তিনি দেখতে পেলেন, ইংরেজ বণিকরা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার ফলে বাংলার বণিকরা সর্বস্ব হারাতে বসেছে। তিনি এর প্রতিবাদ করলেন। ইংরেজদের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধে দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে মীর কাসিম শহীদ হলেন। মীর কাসিমের শুরুটা ছিল কলঙ্কের, কিন্তু শেষটা হয়েছিল গৌরবের। দক্ষিণ ভিয়েতনামে নগোদিনদিয়েম মার্কিনীদের হাতের পুতুল ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে মার্কনীরাই দিয়েমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দিয়েমকে হত্যা করে। দিয়েমের জন্য অশ্রুপাত করার কেউ ছিল না। এদেশে আমরা জাতীয়তাবাদের কথা বলি। মনে হয়, এ যেন কথার কথা। জাতীয়তাবাদের মন্ত্র একবার যে উচ্চারণ করেছে, তাকে মনে রাখতে হবে, এই মন্ত্র উচ্চারণের জন্যই তাকে প্রয়োজনে জীবনও দিতে হতে পারে। এই মন্ত্র বড় কঠিন মন্ত্র। আধিপত্যবাদীরা সাময়িকভাবে প্রলোভন দেখাতে পারে; কিন্তু তাদের এই প্রলোভন ও মৌখিক সহানুভূতি মাছের মায়ের পুত্রশোকের চাইতেও অলীক। জাতীয়তাবাদের মন্ত্র উচ্চারণ করেই নেলসন ম্যাণ্ডেলা ২৭ বছর কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি। আজ তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাণপুরুষ। গ্যারিবল্ডি ইতালীর জাতীয় জাগরণ ও ঐক্যের জন্য দিনের পর দিন কারাগারে কাটিয়েছেন। কারাগারের সংকীর্ণ পরিমণ্ডলে পদচারণা করতে করতে গ্যারিবল্ডির পায়ের আঘাতে কারাগারের পাষাণ বুক ক্ষয়ে গিয়েছিল। গ্যারিবল্ডি মাথা নোয়াননি। আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী যোদ্ধারা ফরাসী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ বছর এক অসম যুদ্ধে জীবনপাত করেছে। তারাও

www.pathagar.com

মাথা নোয়ায়নি। বাংলাদেশে যখন আমরা জাতীয়তাবাদের কথা বলি, তা যেন খামাখা না বলি। ম্যান্ডেলা, গ্যারিবল্ডি, বেলবেল্লাদের মতই যে কোন পরিণতি বরণ করার প্রস্তুতি নিয়েই যেন বলি। অন্যথায়, জাতীয়তাবাদের কথা বলা হবে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা। জাতীয়তাবাদীরা শত্রু চিনতে ভুল করে না। শত্রুর সঙ্গে আপসও করে না। রাজনীতিতে তারা জাতীয় ঐক্যের রাজনীতি করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শত্রুর শত্রুকে মিত্র করে এবং শত্রুর মিত্রকে শত্রুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির জন্য যেমন প্রয়োজন অপার সাহস, তেমনি প্রয়োজন প্রচন্ড ধী-শক্তি। এ রাজনীতি বালকের বালখিল্যতা নয়। এ রাজনীতি বীরের আদর্শনিষ্ঠতা ও সকল প্রকার মোহের উর্ধ্বে থাকার অগ্নিপরীক্ষা।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার ঢাকাস্থ স্টেশন চীফ ও অপর একজন রাষ্ট্রদূতের কারাবন্দী নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের বিপজ্জনক তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত, বর্তমান সরকারের অনুমোদন ছাড়া এই সাক্ষাৎ সম্ভব হত না। দ্বিতীয়ত, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও রাষ্ট্রীয় বিষয়-আশয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তিনি কী করে এ ধরনের সাক্ষাৎকারের সম্মতি দিলেন? তৃতীয়ত, প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অত্যন্ত উস্কানিমূলক ও নিন্দনীয় পন্থায় হস্তক্ষেপ করেছে। তবে সবচাইতে দুঃখজনক বিষয়টি হল, বন্দী সাবেক প্রেসিডেন্টের এ ধরনের আলোচনায় সম্মত হওয়া। যে সরকার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে ও অতীতে যারা সরকারের দায়িত্বে ছিলেন এবং আপত্তিকর পন্থায় বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে অভ্যস্ত, তাদের হাতে বাংলাদেশ কোনক্রমেই নিরাপদ নয়। রাজধানী ঢাকায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার স্থানীয় প্রধানের যত্রতত্র অবাধ বিচরণের গুজব শোনা যায়। আমরা তা হলে কোথায় আছি? কোথায় আমাদের সার্বভৌমত্ব? কোথায় আমাদের নেতৃত্বের দেশপ্রেম?

গত সংখ্যায় বিশ্বব্যাংকের স্থানীয় প্রধান ফ্রেডরিক ডি টেম্পলের উক্তি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছি। টেম্পল সাহেব দেশীয় রাজনীতির নাটকের ক্লাইমেকস দেখার আগেই মন্তব্য করেছিলেন, আগামীতে এদেশে একটি দুর্বল কোয়ালিশন সরকার গঠিত হতে পারে। টেম্পল সাহেব কি জানতেন, বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার এদেশীয় প্রধানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আর সেই বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার দেখানো লজেন্সের লোভে এদেশের রাজনীতির বৃদ্ধ বালকরা অত সহজেই প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে? আশা করব, টেম্পল সাহেবের মত কারবারীদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হবে। শুধু ভাবি, কবে এই দেশের মানুষ রাজনীতির এই দুরাচার থেকে রক্ষা পাবে?

আফতাব আহমাদ :

গত কিছুদিন ধরে রাজনীতির অঙ্গনে যা কিছু ঘটে গেছে, তা সাদামাটা চোখে অনেকের হিসেবের বাইরে থাকলেও এতে বিস্মিত ও বিমূঢ় হওয়ার কোন কারণ আমি দেখি না। আমাদের দেশে যে পরিবেশ ও যে আনুকূল্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে মেধা, প্রজ্ঞা ও দক্ষতার চাইতে আর্থিক জৌলুস ও বিত্ত বৈভব অনেক বেশী প্রাধান্য লাভ করে এবং সর্বমহলের এটাই কাম্য। আর এ কারণেই এদেশের রাজনীতির আদর্শবাদিতার সন্ধান আমরা অনেক সময়ে পাই না এবং রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার কোন ব্যাকরণ এখানে তৈরী হয়নি। একদা যে আমলা সরকারের ভরাডুবির জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে সরকারের নীতি বাস্তবায়নকে পর্যুদস্ত করেছিল, কালানুক্রমে দেখা গেছে, সেই দেশপ্রেম বিবর্জিত নীতিহীন লোকটি পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ঐ দলটিতেই যোগদান করে নীতি নির্ধারকদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রাজনৈতিক দলটির যেমন কোন মানদণ্ড কাজ করে না, তেমনি ঐ ব্যক্তিরও কোন হায়া-শরম আছে বলে মনে হয় না। যার যত অর্থের জেল্লা, রাজনৈতিক দলগুলোতে মনে হয় তাদের প্রতিপত্তি তত বেশী। এসব কিছুর পরও আমরা আমাদের দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোকে মতাদর্শের ধ্বনি তুলতে দেখি।

www.pathagar.com

মোটা দাগে যদি আমরা ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোকে চিহ্নিত করতে চাই, তাহলে বলতে পারি, একপক্ষ বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতকে পরম মিত্র হিসেবে দেখে এবং ভারতীয় অর্থনীতি ও ভূ-রণনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ভূ-রণনীতির স্বার্থকে পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করে। আরেক পক্ষ রয়েছে, যারা ভারতকে সৎ-প্রতিবেশী হিসেবে দেখতে চায়, কিন্তু তার অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অতন্দ্র প্রহরায় থাকার পক্ষপাতী এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ভূ-রণনৈতিক স্বার্থে বিশাল ভারতের চাপকে ভারসাম্যের মধ্যে রাখার জন্য ব্যাপকতর মিত্র খুঁজে নেয়ার পক্ষপাতী। এই বৃহৎ দুই পক্ষের ডানার নিচে ও আড়ালে আবডালে আরও বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রবণতাকে কেন্দ্র করে অনেক দল গড়ে উঠেছে, যে দলগুলোকে এ দু'পক্ষই নিজেদের পক্ষে টানার নিরন্তর প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।

শুধুমাত্র ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতি আবর্তিত হয়, সে রাজনীতিতে সবচেয়ে উপেক্ষিত হচ্ছে নীতিবোধ। বাংলাদেশ সম্ভবত এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বস্তুত বাংলাদেশের মানুষ কখনোই কোন বৃহৎ শক্তির খবরদারী মেনে নেয়নি, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের তো নয়ই। বাংলাদেশের মানুষ আদি অনার্য ও চিরবিদ্রোহী। আর এ জন্য ইতিহাসের পাতায় পাতায় এদেশের মানুষের দ্রোহ আর বীরত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। এদেশ প্রধানত একটি ব-দ্বীপ। নরম পলিমাটি নদী প্রবাহের পানি সিঞ্চনে সমৃদ্ধ হয়ে আবাদ হয়েছে। কিন্তু বৈশাখের খরতাপে এই পলিমাটি লোহার চাইতেও কঠিন হয়ে ওঠে। এখানে বসন্তের মৃদু সমীরণ যেমন বয়ে যায়; কালবৈশাখীর ঝড়ও উঠতে কোন অসুবিধা হয় না। প্রকৃতির এই দ্বৈততা আমাদের জাতিসত্তার চেতনা ও অন্তর্লোকের মধ্যেও গভীরভাবে প্রোথিত। ভাঙা গড়ার রাজনীতি আর রাজনীতির ভাঙা গড়া এ দ্বৈততা থেকে আমরা মুক্ত নই, বলাই বাহুল্য।

স্বল্পতম সময়ে একটি আগ্রাসী আধিপত্যবাদী শক্তির ভ্রাতৃত্বে যে রাষ্ট্রটির জন্ম, তাকে জন্মান্ধ করে রাখার চেষ্টা কম হয়নি; প্রতিবন্ধীত্বের রূপ দিতেও উদ্যোগের অভাব হয়নি। বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানের বহু দোষক্রটি থাকা সত্ত্বেও, বহু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, ক্ষমতার চর্চার ক্ষেত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের প্রতি প্রচণ্ড মোহ থাকা সত্ত্বেও শত্রুমিত্র নির্বিশেষে একথা সকলে স্বীকার করেন, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ তার কাম্য ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের হাতে ক্রীড়নক হতে চাননি বলেই তিনি পাকিস্তানের বন্দীত্ব মেনে নিয়েছিলেন এবং ভারতের খবরদারী পছন্দ করতেন না বলেই মধ্যপ্রাচ্য ও ওআইসির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছেন এবং চীনের দিকেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তার দলের ভেতরে যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তার ফলে সৃষ্ট ষড়যন্ত্রের মুখে তাকে বারবার অসহায়বোধ করতে হয়েছে এবং কপাল চাপড়ে রোদন করতে হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ যে ট্রয়ের ঘোড়া বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল সেই ঘোড়ার পেট থেকে বেরিয়ে আসা নানা কুশিলব ধীরস্থির মস্তিষ্কে অতিসন্তর্পণে একটি নিখুঁত রাষ্ট্রঘাতীচক্র গড়ে তোলার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ঐ রাষ্ট্রঘাতী চক্র স্তব স্তুতির পথ ধরে শেখ মুজিবকে জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সক্ষম হয়। আর, ক্ষমতার মদমত্ততায় তার দলটি দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়। ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। তবে, মাঝখান দিয়ে আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তি সাময়িকভাবে পিছু হটলেও দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চয় করে আবার আঘাত হানে।

আমার বর্ণিত এই ছকে ফেলে বাংলাদেশের রাজনীতিকে যদি পরখ করা যায়, তাহলে আজকের রাজনীতির জট এবং জটিলতা আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯৯৬-এ জনগণের সহানুভূতিকে সম্বল করে জনগণের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে যে দলটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা লাভ করল, সেই দলটি নির্বাচনী ইশতেহারে জনগণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেসব ভুলে গিয়ে নির্বাচন পূর্বকালে সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের সঙ্গে গোপন সমঝোতার ভিত্তিতে যে এজেন্ডা প্রস্তুত করেছিল, তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা শুরু করে।

www.pathagar.com

অপরদিকে বিএনপিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে হটানো সত্ত্বেও ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজাল সবার অলক্ষ্যে নিঃশব্দে বিএনপির ভেতরে একটি কার্যকর 'মুশকিল আহসান' পার্টি গড়ে তোলে। এই 'মুশকিল আহসান' পার্টির খপ্পড়ে পড়ে বিএনপি না পারল তার সংসদীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করতে, না পারল মাঠ পর্যায়ে সরকারবিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে। মাঝখানে ভোটের হিসেবের অংক কষে বিএনপি একটি জোট গড়ে তোলে, যাতে জাতীয়তাবাদী ভোটগুলো আওয়ামী লীগের খিলানে গিয়ে না ওঠে। এ সহজ অংকটা কি আওয়ামী লীগ কিংবা শেখ হাসিনা বুঝবেন না? আলবৎ বুঝবেন। এবং বুঝেছেনও।

সে কারণেই শেখ হাসিনা সব সময়েই চেয়েছেন পাল্লা তাঁর পক্ষে ভারী রাখতে। বিরোধীদলকে মোকাবিলা করতে গিয়ে তিনি নরমে গরমে বহু চাল চেলেছেন। এতে অনেক নিন্দাও তাকে কুড়াতে হয়েছে। কিন্তু শেষ হিসেবে তাঁর পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেয়ার ব্যাপারে এতটুকু ছাড় দেননি। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। রাজনীতিতে অবস্থানে অটল থাকা একটি বিশেষ গুণ। তাঁর পিতা রাজনৈতিক অঙ্গনে একাধিপত্য অর্জন করেছিলেন ঐ গুণের জোরেই। শেখ হাসিনার নীতি, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আমি একমত নই। কিন্তু আমি সব সময়ে বলে এসেছি, 'শেখ হাসিনার তুলনা শেখ হাসিনাই'। কোন দ্বিধা-সংকোচ বা কুণ্ঠা তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে এ পর্যন্ত দেখা যায়নি। আমরা যারা তাঁর সমালোচনা করি, তিনি সেসবকে পরোয়া না করে নিবিষ্ট মনে যে পথে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেখান থেকে এতটুকু নড়েননি। এতে দেশের মঙ্গল-অমঙ্গল কী হল তা তিনি থোড়াই কেয়ার করেছেন।

বুর্জোয়া রাজনীতিতে কিংবা ক্ষমতার জন্য ক্ষমতার যে রাজনীতি তার ব্যাকরণে এই গোয়ার্তুমি খুবই ফলপ্রসূ। অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করার আগে হাসিনা ৩টি লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এক. জনমনে এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল করা যে, বিরোধীদল তার জন্য কোন চ্যালেঞ্জ নয়। তারা যত গর্জে, তত বর্ষে না।

দুই. বিরোধী জোট সুসংহত নয় এবং যেভাবেই হোক এতে ভাঙন ধরাতে হবে।

তিন. এরশাদকে রাজনৈতিক এতিমে পরিণত করতে হবে। যে কায়দায় এরশাদ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিজন সেলে চিকিৎসার নামে উঠে এসেছেন এবং সংসদে যোগদানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাতে হাসিনার শেষের দুই লক্ষ্য অনায়াসেই অর্জিত হতে পারে। আর প্রথম লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও হাসিনাকে খুব একটা বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না। তার কাজটি আরও আহসান করে দেবে সর্বত্র ছড়ানো মুশকিল আহসান পার্টির কর্মজাল।

দেশের ভাগ্যে তাহলে কী হবে? এভাবেই কি একের পর এক তামাশা ঘটে যাবে? আমার তো মনে হয় না। নির্বাচনী পেয়ালা এবং ওষ্ঠদ্বয়ের মাঝে যে ফাঁকাটা রয়েছে, তা বাহ্য দৃষ্টিতে অনেক সংকীর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু এ এক বিশাল গহবরও বটে। জনগণ আদর্শবাদিতার নামে এবং জাতীয় মর্যাদা রক্ষার নামে রাজনৈতিক জেদাজেদির তেলেসমাতি অনেক দেখেছে, কিন্তু আদর্শ আর জাতীয় সম্ভ্রমকে সমুন্নত থাকতে দেখেনি। এক অসহনীয় অবস্থার দিকে জনগণকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকল মহল এই পরিস্থিতির তাৎপর্য যত দ্রুত উপলব্ধি করবে, ততই দেশবাসীর মঙ্গল হবে। এখানে সুস্পষ্টভাবে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র সোল এজেন্সি নিয়ে দেশ ও জাতিকে যেমন বিভক্ত করে রাখা এক গুরুতর অপরাধ ও পাপ, তেমনি দেশপ্রেমের সোল এজেন্সি নিয়ে অপরের দেশপ্রেমকে কটাক্ষ করাও তেমনি গুরুতর অপরাধ ও পাপ। রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও মতাদর্শগত বিরোধ যে কোন বহুবাচনিক সমাজের সুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু এই বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি জনসমষ্টিকে নিরঙ্কুশভাবে বিভক্ত করে রাখে তাহলে তা হবে জাতিবিনাশী ও রাষ্ট্রবিনাশী। বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে একটি ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত সমাজ

www.pathagar.com

হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। পুনর্সদ্ভাবনের রাজনীতি অনুশীলন করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। ১৯৭৩-এর ৩০ নভেম্বর শেখ মুজিব 'দালাল' আইনে অভিযুক্ত আটক তার প্রতিপক্ষদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, ঐসব অভিযুক্ত আটক ব্যক্তিগণ 'তাদের অতীতের কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত ও অনুশোচনার বশবর্তী হয়ে স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত করার জন্য এবং দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।' (ইত্তেফাক ১ ডিসেম্বর ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য)। এ বিষয়ে বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে শেখ মুজিব তাঁর সাধারণ ক্ষমার উদ্দেশ্যকে আরও সম্প্রসারিত করে ব্যাখ্যা করেন। 'আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই মুক্তিযুদ্ধের শত্রুতা করে যারা 'দালাল' আইনে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাভাবিক জীবন যাপনে আবার সুযোগ দেখা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, অন্যের প্ররোচনায় যারা বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং হিংসার পথ গ্রহণ করেছেন, তারা অনুতপ্ত হলে তাদেরও দেশগড়ার সংগ্রামে অংশ নেয়ার সুংযোগ দেয়া হবে'। (ইত্তেফাক ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য)।

আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা রাষ্ট্রঘাতী চক্র ও মুশকিল আহসান পার্টি মুজিবের এই পুনর্সদ্ভাবনার রাজনীতিকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করে এবং স্তব ও স্তুতির মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে একদলীয় শাসনের দিকে ঠেলে দেয়। এর পরিণতি সকলেরই জানা এবং ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণভার লাভ করেই তথাকথিত 'দালাল আইনটি' বাতিল করে দেন এবং 'ভুলে যাও, মাফ করে দাও' নীতির ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য পুনর্সদ্ভাবনার রাজনীতি বা Politics of reconciliation অনুশীলনের উদাত্ত আহ্বান জানান। স্বাধীনতার তিন দশক পর আজ আসুন, আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, দেশ ও জাতিকে বিভক্ত করে রেখে কারা লাভবান হচ্ছে। নন ইস্যুকে ইস্যু করে কারা লাভবান হচ্ছে? মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের যে রাজনীতি এবং বৈষম্যরহিত একটি সমাজ গড়ার যে প্রণোদনা আমাদের জীবনের মানকে বাড়াতে পারে, তার অনুশীলনের জন্য আজ একাগ্রচিত্তে সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন। তাই আর্থসামাজিক মুক্তির প্রশ্নে জনগণকে মবিলাইজ করে জাতীয় সম্পদ ও প্রাচুর্য সৃষ্টির কাজে আমরা যাতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারি, সে বিষয়ে মনোনিবেশ করাটাই হবে যথার্থ রাজনীতি। বুর্জোয়া রাজনীতির চৌহদ্দিতে একে অপরকে ঘায়েল করার রাজনৈতিক ধারা অব্যাহত থাকবে। একে অপরকে কোণঠাসা করার প্রবণতা থেকে সহজে রাজনৈতিক দলগুলো মুক্ত হতে পারবে না, একথা সত্য, কিন্তু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও অখণ্ডতার প্রশ্নে আমাদের সবাইকে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। কেবল তাহলেই আমাদের স্বদেশপ্রেম, আমাদের জাতীয়তাবাদ অর্থবহ হবে। এ বিষয়ে সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিনয়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সর্বমহলের কাছে বারবার আবেদন করেছেন। আসুন, দেশ ও জাতির স্বার্থে তার সেই আবেদনে আমরা সকলেই সাড়া দেই– এটিই সর্বোত্তম সময়।

www.pathagar.com

৫ এপ্রিল ২০০১

ধসে পড়া শিক্ষার মান

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের নবীন যে প্রজন্ম আজ বড় হয়ে উঠছে, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী? এই প্রজন্ম আগামীতে জাতি ও রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বর্তমান প্রজন্মের চিন্তাভাবনা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবলোকন করে আমরা কি একটি সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারি? বর্তমানে যে প্রজন্ম রাষ্ট্র, সরকার ও এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে রয়েছে, তারা অচিরেই বিগত হবেন। আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু ৫৯ বছর। ৫৯ বছরের এই হিসাবটি কতটুকু সরকারী প্রচারণা আর কতটুকু বাস্তব তথ্যভিত্তিক, সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। সরকার সামাজিক খাতে প্রচণ্ড সাফল্য অর্জন করেছে, সে কারণেই এ দেশের মানুষের গড় পরমায়ু দ্রুত বাড়ছে, এমন একটি ধারণা জন্মানোর জন্যই হয়ত সন্দেহজনক তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। গড় পরমায়ু যা-ই হোক না কেন, এ কথা তো পরম সত্য– এখন যে প্রজন্মের হাতে দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে, তারা চলে যাবেন এবং উদীয়মান নতুন প্রজন্মকেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। একদিকে বর্তমানে দেশের দায়িত্ব যে প্রজন্মের কাঁধে রয়েছে, তাদেরই দায়িত্ব হল, আগামী প্রজন্মকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা। ভবিষ্যতে যারা দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তাদের ব্যর্থতা মূলত বর্তমানে দায়িত্ব পালনরত প্রজন্মেরই ব্যর্থতা। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তিরিশ বছর হল। আমরা এখনো নতুন শতাব্দী ও নতুন সহস্রাব্দের চাহিদা পূরণে সক্ষম একটি টেকসই শিক্ষাব্যবস্থা জাতিকে উপহার দিতে পারিনি। বর্তমানে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যুগের দাবী মেটাতে এতই অক্ষম হয়ে পড়েছে যে, গণহারে নকলবাজি এই ব্যবস্থার নিত্যঅনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ে পরীক্ষাগুলো গণহারে নকলের ফলে বস্তুত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এভাবে যারা পরীক্ষায় পাস করে, তারা কোনক্রমেই সরকারী কিংবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত নয়।

পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধির মূলে রয়েছে, ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের নৈতিক অধঃপতন। একটি দেশে নীতি-নৈতিকতার মানে যখন ধস নামে, তখন শিক্ষাব্যবস্থাই এর অবনতি রোধ করতে পারে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থাটি যখন গলদপূর্ণ হয়ে পড়ে, তখন শিক্ষাব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক নৈতিকতার মান উন্নয়নের আশা করা বৃথা। এ দেশে কালানুক্রমে অনেক রথি-মহারথীর নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা কমিশনগুলো কয়েকশ পৃষ্ঠব্যাপী রিপোর্ট প্রদান করে নানারকম সুপারিশ, সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করেছে। কিন্তু এসব সুপারিশের সামান্য অংশই বাস্তবে কার্যকর করা হয়েছে। পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত যেসব কমিশন হয়েছে, সেসব কমিশনের সুপারিশমালার মধ্যে অন্যতম যে সুপারিশ কার্যকর করা হয়েছে, তা হল– নবম শ্রেণী থেকে শিক্ষার বিশেষায়ণ বা Specialization-এর সূচনা করা। এর আগে একজন ছাত্র তার উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কী লাইনে বিশেষায়ণ অর্জন করবে, তার সূচনা হত ইন্টারমিডিয়েট অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে। নবম শ্রেণীতে শিক্ষারত একজন ছাত্র বা ছাত্রীর বয়স থাকে ১৩ কিংবা ১৪। এই বয়সে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে ভবিষ্যতের শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। এই বয়সে শিক্ষার্থীর রুচি-অভিরুচির বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে শুরু করে। ঠিক এই সময় শিক্ষার্থীকে মানবিক বিষয় কিংবা বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা বেছে নিতে বলা পরিহাস মাত্র। অথচ আমরা সেই কাজটিই করছি। এই সময় শিক্ষার্থীকে ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে

www.pathagar.com

কিছু কিছু স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার পরই একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষার ধারা বাছাই করা সম্ভব। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে একজন আধুনিক সভ্য মানুষের উপযোগী ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয় না। তার পক্ষে জানা সম্ভব নয় আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি কী বা কী হওয়া উচিত। আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া ঐতিহ্য, তাদের জীবন ও ধর্মাচার সম্পর্কেও জানা সম্ভব হয় না। জানা সম্ভব হয় না ধরিত্রী ও মহাকাশে সৃষ্টির কী রহস্য লুকিয়ে আছে। অথচ এসব জ্ঞান যাদের নেই, তারা যুগোপযোগী মানুষ হতে অপারগ। পাশ্চাত্যে শিক্ষাব্যবস্থায় এই দিকগুলোর ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়। এই পর্যায়ে পাশ্চাত্যের ছেলেমেয়েরা বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহ ও সভ্যতা সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান আহরণ করে এবং জীবন-জগত সম্পর্কে কৌতূহলী হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠদান করতে গিয়ে আমি গভীর বেদনা ও বিস্ময় নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি, আমার অনেক ছাত্রছাত্রীই জানে না, ভাষা আন্দোলন কখন হয়েছিল, কেন হয়েছিল; জানে না ১৯৪৭ সাল উপমহাদেশের ইতিহাসে কেন গুরুত্বপূর্ণ। তারা এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে বস্তুত কোন সুস্পষ্ট ধারণা রখে না। তারা জানে না, ১৭৫৭ কিংবা ১৮৫৭ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে কী কলঙ্ক ও গৌরবের ঐতিহ্যকে ধারণ করে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম শাসনামলে আমরা কী গৌরবের অংশীদার। তারা জানে না, পেনিসিলিন কিভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল, ছোঁয়াচে রোগ রোধ করার জন্য কিভাবে টিকার আবিষ্কার হয়েছিল। তারা জানে না, নদীর উৎপত্তি কিভাবে হয়, ভূমিকম্প কেন হয়, আকাশে কিভাবে মেঘের আবির্ভাব হয়, কেন বৃষ্টি হয়, কেন ঋতু পরিবর্তিত হয়; কিংবা আমাদের এই পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কী ধারণা পোষণ করেন। তারা জানে না, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কখন নবুয়ত পান, কখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন, কিভাবে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ইসলামের বাণী আরব দেশ ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে পৌঁছে দেন। তারা এ কথাও জানে না, আমাদের নবী ইউরোপেও দূত পাঠিয়েছিলেন। তারা জানে না, গৌতম বুদ্ধের ধ্যান-সাধনার কথা, বৌদ্ধধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা। তারা জানে না, সনাতন হিন্দু ধর্ম ও বর্তমান প্রচলিত হিন্দু ধর্মাচারের মধ্যে পার্থক্য কী। তারা জানে না, বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক কারা, তাদের রচনাশৈলী কিভাবে রবীন্দ্র ও আধুনিক সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তুত এই তালিকা আরও অনেক বড় করে পেশ করা সম্ভব; কিন্তু এথেকেই পাঠক আঁচ করতে পারবেন, কী পর্বতপ্রমাণ মূর্খতার মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্ম গড়ে উঠছে। বিজ্ঞানীই হোন কিংবা চিকিৎসক হোন, প্রশাসক হোন বা শিল্পোদ্যোক্তা হোন– সবার জন্য এসব জ্ঞান অপরিহার্য। বর্তমানে বিদ্যমান স্কুল পাঠ্যক্রমে এসব প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে না, এমন বলব না– তবু ছাত্র-শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়ে বহুলাংশেই অজ্ঞ। তাদের এই অজ্ঞতার জন্য একদিকে যেমন তাদের মন-মানসিকতা দায়ী, অন্যদিকে শিক্ষকদের দায়িত্বও কোন অংশে কম নয়। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর সাথে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। এরা সবাই ইন সার্ভিস ট্রেইনি, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ নিতে এসে যারা বেতন-ভাতাও পেয়ে থাকেন। সমাজ ও দেশবাসী তাদের জন্য প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করছে। পারিবারিক কারণে আমি জানি, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কোর্স-কারিকুলাম কী। অতীতে আমি দেখেছি এসব ইনস্টিটিউটে একদিকে যেমন শিশু মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষার দর্শন, শিক্ষণ তত্ত্ব, ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল ও ধর্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞান দেয়া হতো, তেমনি প্রায়োগিক জ্ঞানও প্রদান করা হতো। ছবি আঁকা, মানচিত্র আঁকা, গ্লোব তৈরী করা, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান, পাঠ পরিকল্পনা রচনা করা, শ্রমের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য শাক-সবজির বাগান করা এবং শরীরচর্চাসহ অনেক বিষয়ই প্রশিক্ষণকালে শিখতে হয়। কিন্তু এখনকার কজন প্রশিক্ষণার্থীর সাথে আলাপ করে আমি জেনেছি, এসব বিষয় সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। শিক্ষক শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষকরাও প্রশিক্ষণার্থীরা যাতে এসব বিষয় ও কাজ সম্পর্কে

www.pathagar.com

পারদর্শী হয়ে ওঠে, তার জন্য বস্তুত কোনো যত্নই নেন না। এসব ইনস্টিটিউটে ছাত্র রাজনীতির কুৎসিত দাপট না থাকলেও তেমন কোন পড়াশোনা হয় না। অথচ এই ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষক হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করবে। শহরে ও গ্রামে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই শিক্ষকরা কোমলমতি বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করছেন, সেসব বিদ্যালয় থেকে কিভাবে যোগ্য শিক্ষার্থী বেরিয়ে আসতে পারে?

কাজেই বর্তমানে শিক্ষার মানে যে ধস নেমেছে, তার একটা বড় ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োজিত শিক্ষকদের লজ্জাজনক শিক্ষার মানে। তদুপরি এসব শিক্ষককে চাকরি পেতে বিশাল অংকের সেলামি দিতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এখন ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতার বাহুবিস্তারের অন্যতম হাতিয়ার। শিক্ষক রিক্রুটমেন্টের বিবেচ্য বিষয় নিয়োগপ্রার্থী ব্যক্তির শিক্ষক হিসেবে যোগ্যতা নয় বরং ইলেকশনের সময় কারচুপি করতে কতটা সহায়তা দেবেন, ভোটার লিস্ট প্রণয়নে বিবেকবোধ-বিবর্জিত হয়ে কী পরিমাণ ভূয়া ভোটার তালিকাবদ্ধ করবেন, স্থানীয় রাজনীতিতে পেশীশক্তি যোগাতে কী সহায়তা দিতে পারবেন– এসবই হচ্ছে শিক্ষক রিক্রুটমেন্টের মূল বিবেচনা। এজন্য শাসক দল শিক্ষা প্রশাসনকে প্রচণ্ড চাপের মুখে রাখে। কোন নীতিবান প্রশাসকের পক্ষে এই চাপ হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে। এখন ভেবে দেখার বিষয়, প্রাথমিক শিক্ষা যে পঙ্কিলতার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে আছে, সেই প্রেক্ষাপটে একুশ শতকের জন্য সুযোগ্য নাগরিক আমরা কিভাবে পেতে পারি।

ব্রিটিশ আমলে কিংবা পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা একেবারেই সন্তোষজনক ছিল না। এই বেতনও পাওয়া যেত ত্রৈমাসিক কিংবা ষাণ্মাসিক কিস্তিতে। প্রাথমিক শিক্ষকদের এই করুণ দশা দেখে কবি আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর মাস্টার পিস 'তালেব মাস্টার' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণার্থীরা এই কবিতা আবৃত্তি করে এক করুণ আবহের সৃষ্টি করতেন। বাংলাদেশ হয়েছে, অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন সরকারের প্রত্যক্ষ অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। বেতন-ভাতা সরকার জনগণের ট্যাক্সের অর্থে পরিশোধ করে। প্রতি বছরনতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। পাকা দালান ও আধুনিক সরঞ্জামে এই বিদ্যালয়গুলো সুসজ্জিত। এসব বিদ্যালয়ের বাহ্যিক জৌলুস যতই উজ্জ্বল হয়েছে, এর অন্তরের ঐশ্বর্য ততই লোপ পাচ্ছে। উন্নয়ন মানে যে কেবল দালান-কোঠা ও ইট-সুরকি নয়, আমাদের কোন সরকার এই বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবন করেন না কিংবা করতে চান না। করতে চান না বলছি এই কারণে, ইট-সুরকির উন্নয়নে অর্থ যোগ আছে। কিন্তু জ্ঞান ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে সে সুযোগ নেই। বরং এই ঐশ্বর্যকে হতশ্রী করে দিতে পারলেই রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানো সম্ভব হয়। কোন যোগ্য ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক রাজনীতির মাসলম্যান হিসেবে কাজ করতে রাজি হবেন না, তাই অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ ও কর্তব্যে অবহেলাকারী শিক্ষক রিক্রুটমেন্টে প্রেরণা অত্যন্ত প্রবল। অন্যদিকে, যোগ্য শিক্ষক রিক্রুটমেন্টে তেমন কোন তাগিদ সরকার কিংবা কর্তৃপক্ষ অনুভব করেন না। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিটি একেবারে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। ইদানীং আরেকটি প্রবণতা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন, আদমশুমারি, আর্থসামাজিক জরিপ, ইলেকশনের দায়িত্ব পালনসহ বিবিধ কার্যক্রমে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়। এর ফলে কর্তব্যে অবহেলাকারী শিক্ষকরা মূল দায়িত্ব পালনের চেয়ে বাড়তি রোজগারে নিয়োজিত হওয়াতেই বেশী উৎসাহ বোধ করেন। এসব এখন বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত চেপে বসেছে।

আলোচনাটি শুরু করেছিলাম আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের দায়িত্ব পালনে কতটা সক্ষম– সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে। যথাযোগ্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া, বিশেষ করে গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে উন্নতমানের শিক্ষা লাভ করা ভবিষ্যতের প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এছাড়াও রয়েছে দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, উন্নত নৈতিকতার মান ও সবার ওপরে মানুষের মত মানুষ রূপে গড়ে ওঠার বিষয়টি। অস্বীকার করার উপায় নেই, আমরা এখন যে প্রজন্মের মুখোমুখি, তারা মারাত্মক আদর্শশূন্যতায় ভুগছে। ভুগছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায়। জীবন ও জগৎবোধের গভীরতা তারা অর্জন করতে

www.pathagar.com

পারছে না। এই সংকটের সূচনা শৈশব ও কৈশোরে। শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষায় গলদ থেকে গেলে এসব সমস্যার উদ্ভব অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব প্রাথমিক শিক্ষার গলদ সম্পর্কে আদৌ মনোযোগী বলে আমার কখনও মনে হয়নি। এসব রাজনীতিবিদের সন্তানরা দেশে অভিজাত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে অথবা বিদেশের অভিজাত বিদ্যালয়ে গমন করে। সুতরাং বিপুল দেশবাসীর সমস্যা তাদের চিন্তিত করে না। আগামী নির্বাচনে সাধারণ ভোটারদের পক্ষ থেকে আমি এ প্রশ্নটি উত্থাপন করতে চাই, রাজনীতিবিদরা এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় মারাত্মক গলদগুলো দূর করার জন্য কী পদক্ষেপ বিবেচনা করছেন? শিক্ষক রিক্রুটমেন্ট, শিক্ষার মানোন্নয়ন, নকল প্রবণতা রোধ, আদর্শশূন্যতা দূরীকরণ, নৈতিক স্খলন রোধ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার তদারকি ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য তারা নির্বাচিত হলে কী পদক্ষেপ নেবেন- সে সম্পর্কে তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে সবিস্তারে বয়ান করলে ভোটাররা তাদের ভোট প্রয়োগে কুশলী হতে পারবেন।

আফতাব আহমাদ :

রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে মেধা, মনন ও সৃজনক্ষমতা বিকাশের কর্মসূচী চাওয়া সোনার পাথরবাটি পাওয়ার সমতুল্য। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এমনই দীন ও ক্লীব, যে কোনো নীতিগত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে কিংবা আলোচনার সূত্রপাত ঘটালে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর বহুল উচ্চারিত একটি হাবুগান রয়েছে- অমুকটা করা হবে, তমুকটা মানি না, তমুকটা গণবিরোধী ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ইত্যাদি। আসলে যে কোন ক্ষেত্রে- কি কৃষি সংস্কার, কি শিল্পোন্নয়ন, কি বাজেট বরাদ্দ, কি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন, কোন ক্ষেত্রেই আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সুস্পষ্ট সামাজিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে আজ পর্যন্ত সক্ষম হয়নি। বিশেষ করে, শিক্ষাব্যবস্থা চরমভাবে অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার হয়েছে। আমাদের রাজনীতিকরা জনতুষ্টিবাদী (Populist) বুলি কপচাতে সিদ্ধহস্ত। শিক্ষার প্রসঙ্গ এলেই উৎপাদনমুখী, গণমুখী, বৈজ্ঞানিক আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে- এ ধরনের মুখরোচক অথচ বিমূর্ত ও বিভ্রান্তিমূলক বেশ কিছু আপ্তবাক্য উচ্চারিত হতে আমরা দেখি। এর প্রকৃত কোন ব্যাখ্যা কিংবা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর স্বরূপ নির্ণয় করে কোন কার্যক্রম জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত হতে এ পর্যন্ত আমরা দেখিনি। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষাখাতকে এড়িয়ে গিয়ে অন্যান্য খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াবার প্রবণতা বেশী করে কাজ করছিল; কারণ, শিক্ষাখাতে অর্থ-বিনিয়োগে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা ও আমলাগণ আর্থিকভাবে খুব বেশী লাভবান হওয়ার কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে 'ফ্যাসিলিটিজ' বিভাগ নামে একটি বিভাগ গঠিত হওয়ার পর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কাজের এক বিরাট অংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হয়ে পড়েছে। ফলে, শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো-দালানকোঠা ও ইমারত নির্মাণের নামে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বহু লোক আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে এবং দুর্নীতির পাহাড় ক্রমান্বয়ে আকশচুম্বী হচ্ছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ক্যাজুয়ালটি হচ্ছে- শিক্ষা, শিক্ষার মান, শিক্ষার মূল্যবোধ, শিক্ষার গুণ, নীতিবোধ ও শ্রেয়বোধ।

সমাজের সর্বত্র পেশীশক্তি ও সহিংসতার প্রতাপের ফলে শিক্ষায়তন একটি ছাপানো সার্টিফিকেট প্রাপ্তির মাধ্যমে পর্যবসিত হয়েছে। পরীক্ষা এখন একটি প্রহসন- একটি জাতীয় উৎসব- নকলের উৎসবে পরিগণিত হয়েছে। শিক্ষকতা এখন অনেকটা ঠিকাদারী এবং কলাটা, মূলাটা যোগাড় করার পেশায় পরিণত হয়েছে। সম্মানজনক দু' একটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে স্থূল বস্তুবাদ আমাদের সকলকেই প্ররোচিত করছে অর্থপিচাশ ও অর্থ গৃধ্নুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া না শিখিয়ে সরকারী দলের কিংবা এলাকার প্রতাপশালীদের তল্পীবাহক হয়ে কিভাবে গুণকীর্তন করা যায়, শিক্ষায়তনগুলো আজ মূলত তারই এক একটি

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আর শিক্ষকতার নামে অর্থলোলুপ অযোগ্য জ্ঞান-মজুররা ছাত্রছাত্রীদের কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনির নামে গৎবাঁধা ও ছকবাঁধা কিছু প্রশ্ন ও উত্তর তোতাপাখির মত শিখিয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ আয়-উপার্জন করে বিত্তশালী হওয়ার এক অন্ধ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। রাস্তায় বেরুলেই অলিতে-গলিতে, বাঁকে ও মোড়ে ফলক ও ফেস্টুনে ফলাও করে এইসব কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনির সুসমাচারের বার্তা অতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। এমনকি এককালের নামকরা সরকারী স্কুল কলেজের মাস্টাররাও এই পথটিই বেছে নিয়েছেন। শিক্ষা এখন এক নিম্নমানের পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড নামের এক কিম্ভূতকিমাকার প্রতিষ্ঠানের। কোমলমতি বালক-বালিকাদের অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় অধঃপাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিবছর প্রত্যেক বিষয়ে নতুন করে বই লেখানো হয় এবং প্রত্যেকবারই এসব বই নতুন করে ভিন্ন ভিন্ন ছাপাখানায় ছাপার ব্যবস্থা করতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অযোগ্য অক্ষম অনেক লোককে দিয়েই আবার এসব বই লেখানো হয়। অনেক সময়ে যাদের নাম বইয়ের পৃষ্ঠার মুদ্রিত হয় তারা আসলে আদৌ বইগুলোর লেখকই নন। নামটা শুধু অর্থের বিনিময়ে ভাড়া নেয়া হয়ে থাকে। গোটা ব্যাপারটিই মহাসাগরসম দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের মতো এমন দুর্নীতিগ্রস্ত খুব কম প্রতিষ্ঠানই বাংলাদেশে আছে। আর সব কিছুকে বাদ দিয়ে শিক্ষাকে নিয়ে এবং শিক্ষার উপকরণাদি নিয়ে যারা এই ধরনের ছেলেখেলা ও ছিনিমিনি খেলায় লিপ্ত তারা যে জাতির কতবড় সর্বনাশ করছে, তা অন্ধ অর্থকাঙালরা না বুঝলেও ইতোমধ্যেই আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অবস্থাও অথৈবচ। এখানে এখন যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগদানের পরিবর্তে এখন প্রধানত মাস্‌লম্যান ও ভোটার রিক্রুট করা হয়। এরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পাণ্ডার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফল যা হবার তাই হয়েছে। নিজ গুণে যেসব ছাত্রছাত্রী জ্ঞানার্জন করে মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে, এই স্বল্প সংখ্যকই আগামী দিনের আমাদের একমাত্র সম্বল। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এক কলস মূর্খতা নিয়ে মাস্টার ডিগ্রী পাস করে দলীয়তা দুষ্ট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধীনে পরীক্ষা দিয়ে সরকারী প্রশাসনে নিয়োগ লাভের যে সুযোগ পাচ্ছে, তাতে অচিরেই রাষ্ট্র যে রসাতলে যাবে, তা আমাদের দাতা গোষ্ঠীরা ইতোমধ্যেই বেশ বুঝতে পেরেছে। আর সে কারণেই বিভিন্ন প্রজেক্ট ও অনুদান প্রকল্পে বাইরের কনসালট্যান্ট নিয়োগ একটি বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে আরোপিত হচ্ছে। আগামীতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, সেচ নির্বিশেষে প্রত্যেক খাতে বৈদেশিক সাহায্য বা দাতাগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ যদি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়কারী হিসেবে একজন বিদেশী টেমনোক্র্যাটকে সচিব বা সমন্বয়কারীর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগদান বাধ্যতামূলক শর্ত করা হয়, তাতে অবাক হবার কিছুই থাকবে না। কারণ মাস্টার ডিগ্রীধারী বিসিএস পাস বহু গুণধরেরই 'ক' অক্ষর জ্ঞান নেই, এর অসংখ্য নজির বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভিজ্ঞজনেরা ইতোমধ্যেই প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য অর্জন করেছেন। এ থেকেই সহজে অনুমেয়, আগামী প্রজন্মের স্বরূপ কেমন, জাতি গঠন ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে আগামী প্রজন্ম কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারবে। আমরা এক বিশাল ধসের দিকে ধাবিত হচ্ছি। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে তীব্র সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। আমাদের উপলব্ধিগুলোকে সংহত করে সকল সংকীর্ণতাকে পরিহার করে একযোগে এই অবক্ষয় ও অধঃপাতের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। রাজনীতিটাকে রাজনৈতিক দলগুলো এখন আর দেশসেবা ও আদর্শ হিসেবে দেখে না। এটি এখন একটি রমরমা ব্যবসা। জনগণের আবেগ-অনুভূতিকে, আশা ও স্বপ্নকে জিম্মি করে রাজনীতিকরা রাতারাতি টাকার কুমির হওয়ার অতি সহজ পথটি খুঁজে পেয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কালো টাকার দৌরাত্ম্য এবং পেশী ও অস্ত্রের দাপটে। তাই শিক্ষা কিংবা জাতির মনন গঠনের প্রশ্নে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের কাছ থেকে তেমন কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয়। আসুন দুর্বৃত্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে একটি সংঘবদ্ধ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন আমরা গড়ে তুলি, যাতে দেশ এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

১২ এপ্রিল ২০০১

রাজনীতিতে আমলা ও আমলাদের রাজনীতি

মাহবুব উল্লাহ :

একটি জাতি জগৎসভায় সম্মানজনক আসন কিভাবে পেতে পারে? ইতিহাসে দেখা যায়, শত্রুর আক্রমণে পর্যুদস্ত, অর্থনৈতিক সম্পদের দিক থেকে দরিদ্র অনেক জাতি তাদের সাময়িক অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু কিসের বলে? যে কোন জাতি তার দুর্যোগময় পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়, যদি সে তার চারিত্রক দোষক্রটিগুলো ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, একটি জাতিকে হীনবল ও পর্যুদস্ত করার জন্য বিদেশী শক্তিগুলো প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্যটিকে কলুসিত করতে চায়, তা হলো তার চরিত্র। চীনা জাতি আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত হারাতে বসেছিল। আফিমকে কেন্দ্র করে চীন ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে 'আফিমযুদ্ধ' হয়েছিল। চীন কখনও ভারত উপমহাদেশের মত উপনিবেশে পরিণত হয়নি। চীনের পক্ষে এই দুর্ভাগ্য পরিহারের কারণ ছিল, চীনে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিসময় পর্যন্ত একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি, তারও ১০০ বছর আগে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময় পর্যন্ত ভারত শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে চীন দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চীনের ঐক্য ধুলিসাৎ হয়ে পড়েনি। এর অন্যতম কারণ হল, চীনকে গ্রাস করার প্রশ্নে বৈদেশিক শক্তিগুলোর মধ্যে খেয়োখেয়ি চলছিল। চীনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার তুলনায় আগ্রাসী শক্তিগুলোর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ছিল অত্যন্ত প্রবল। ব্রিটিশরা চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। মানচু সম্রাট চীয়েন লুং ১৭৯২ সালে ব্রিটিশ সম্রাট তৃতীয় জর্জের এক পত্রের জবাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই সময়ে ইউরোপ এক ঝন্ঝাবিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্যদিয়ে এগুচ্ছিল। সে সময়টা ছিল ফরাসী বিপ্লবের সময়। আর ফরাসী বিপ্লবের পরপরই নেপোলিয়ানের অভ্যুদয় ও নেপোলিয়ানিক ওয়ারের সূচনা হয়। কাজেই এই সময়টায় ব্রিটেনের পক্ষে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না। ব্রিটেনকে অপেক্ষা করতে হয়েছে নেপোলিয়ানের পতন পর্যন্ত। নেপোলিয়ানের পতনের পর ১৮১৬ সালে ব্রিটেন চীনে দূত প্রেরণ করে যোগাযোগ স্থাপন করে। কিন্তু দূত যেহেতু যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করেনি, সেহেতু চৈনিক সম্রাট ব্রিটিশ দূতকে সঙ্গে দিতে অস্বীকার করেন এবং ব্রিটিশ দূত লর্ড এমহার্ষ্টকে দেশে ফিরে যেতে নির্দেশ প্রদান করেন। চীনা ভাষায় বিদেশী দূতের জন্য রাজদরবারে পালনীয় আনুষ্ঠানিকতাটিকে বলা হত 'কোতো'। 'কোতো' হল ভূমিতে নতজানু হয়ে সম্রাটকে সম্ভাষণের একটি রীতি। এ সময়ে আফিমের বাণিজ্য দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল। আফিম চীনদেশে প্রথম আমদানী হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারত থেকে। আফিম অত্যন্ত ক্ষতিকারক নেশা দ্রব্য। প্রথম দিকে চীনে আফিমের ব্যবসাটা ছিল অতি সামান্য। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আফিমের ব্যবসাটা দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। এই সময়ে এই বাণিজ্য ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে ছিল। শোনা যায়, ওলন্দাজরা তামাকের সঙ্গে আফিম মিশিয়ে এর ধোঁয়া সেবন করত। এভাবে আফিম সেবন করলে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, এরকম একটি ধারণা ডাচরা পোষণ করত। কিন্তু চীনে যখন আফিম পৌঁছালো, তখন আর এটি তামাকের সঙ্গে না মিশিয়ে সরাসরি এর ধোঁয়া চীনারা সেবন করতে শুরু করল। চীন সরকার এর কুফল উপলব্ধি করে জনগণকে এ সেবন থেকে বিরত করতে চাইল। এছাড়া আফিম আমদানীর ফলে চীনের অর্থসম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছিল। ১৮০০ সালে চীন সরকার আফিম আমদানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু, বিদেশীদের জন্য আফিমের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক

www.pathagar.com

ছিল। তারা চোরাই পথে চীনে প্রচুর আফিম নিয়ে আসতে থাকে এবং এজন্য চৈনিক আমলাদের বিরাট অংকের উৎকোচও প্রদান করে। চীন সরকার আইন করেছিল, যাতে সেদেশের কোন কর্মকর্তা বিদেশীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করতে পারে। তদুপরি, বিদেশীদের চীনা অথবা মাঞ্চুভাষা শিক্ষাদানের জন্যও কঠিন শাস্তির বিধান করা হল। কিন্তু এতসব কড়াকড়ি করেও কোন ফায়দা হল না। আফিমের বাণিজ্য বেড়েই চলল। আর এর পাশাপাশি বাড়ল ঘুষ ও দুর্নীতি। অবস্থা আরও খারাপ হল ১৮৩৪ সালে, যখন ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নিয়ে এই বাণিজ্যকে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যে পরিণত করল। হঠাৎ করে আফিমের চোরাচালান বেড়ে গেল এবং চীন সরকারও এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে বদ্ধপরিকর হল।

লিন সে সি নামে একজন সৎ ব্যক্তিকে বিশেষ কমিশনার হিসেবে এই চোরাচালান নিরোধকল্পে নিযুক্ত করা হল। তিনি দ্রুত কঠিন পদক্ষেপ নিলেন। তিনি দক্ষিণ চীনে আফিম বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ক্যান্টনে গিয়ে বিদেশী বণিকদের নিয়ন্ত্রণাধীন সমুদয় আফিম তাঁর কাছে সমর্পণের নির্দেশ দিলেন। তারা লিনের আদেশ মানতে অস্বীকার করল। লিন আরও কঠোর পদক্ষেপ নিলেন। আফিমের কারখানার মালিকদেরকে কারখানায় আটকে রেখে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। যেসব চৈনিক কর্মচারী সে-সব ফ্যাক্টরীতে কাজ করত, তাদেরকে ফ্যাক্টরী ত্যাগে বাধ্য করলেন। এছাড়া, ফ্যাক্টরী মালিকদের জন্য বাইরে থেকে খাদ্য ও পানীয়ের সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হল। এতে কাজ হল। আফিম মালিকরা বিশ হাজার বাক্স ভর্তি আফিম লিনের কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য হল। লিন বাজেয়াপ্ত করা সব আফিম ধ্বংস করে দিলেন। এছাড়া লিন আরও নির্দেশ দিলেন যে, ক্যান্টনে যেসব বিদেশী জাহাজ নোঙর করবে, সে-সব জাহাজের নাবিকদের এই মর্মে প্রত্যয়ন করতে হবে যে, তাদের জাহাজে কোন আফিম আনা হয়নি। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার শাস্তি ছিল সমস্ত আফিম বাজেয়াপ্ত করা এবং সেই সঙ্গে জাহাজে আনা অন্যান্য পণ্যসামগ্রীও বাজেয়াপ্ত করা। কমিশনার লিন ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও কঠোর ব্যক্তি। কিন্তু লিনের এই কঠোরতার জন্য ব্রিটিশরা চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করলো। ব্রিটেনের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ হলো। চীনারা অপমানকর চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলো। চীনারা যে আফিম বর্জন করতে চেয়েছিল, সেই আফিমেই চীনাদের গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হলো। চীনের মানুষের সর্বনাশ হোক, তাতে বিদেশী ব্রিটিশদের কী-বা আসে যায়? আফিমের চোরাকারবার ব্রিটেনের জন্য লাভজনক।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই যুদ্ধের ন্যায্যতা নিয়ে এক বিতর্ক হলো। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, মুক্ত বাণিজ্যের অধিকার থেকে আফিমের মতো নেশা দ্রব্যও বাণিজ্যের অধিকারভুক্ত। হায় মুক্তবাণিজ্য! আর এভাবেই চীনের উপর আফিম চাপিয়ে দেয়া হলো। পাঁচটি বন্দর অপমানকর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আফিম আমদানীর জন্য মুক্ত করে দেয়া হলো। এই বন্দরগুলো হলো–ক্যান্টন, সাংহাই, অ্যাময়, নিংপো ও ফুচৌ। এই বন্দরগুলোর নাম দেয়া হলো 'চুক্তি বন্দর'। ব্রিটেন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হংকং-এর দখল গ্রহণ করলো এবং ধ্বংস করা আফিমের বিনিময়ে বিরাট অংকের ক্ষতিপূরণ ও যুদ্ধের ব্যয় আদায় করে নিলো। ব্রিটেনের রাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট চীন সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানালেন। এই আবেদনপত্রে আফিম যে কতো ক্ষতিকর, সেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল। রাণী ভিক্টোরিয়া সে পত্রের কোনো জবাব দেননি। অথচ ৫০ বছর আগে সম্রাট চিয়েন লুং ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় জর্জকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে এবং ভিন্ন মেজাজে পত্র লিখেছিলেন। অপমানকর চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, চীনে ব্রিটিশ খ্রীস্টান মিশনারীদের গ্রহণ করা। এই মিশনারীরাই চীনের পরবর্তী ইতিহাসের অনেক বিপর্যয়ের হোতা ছিলেন। আইন অমান্য করলেও চীনা আদালতে তাদের বিচার করা যেতো না। বিদেশীদের জন্য চীনা আইন প্রযোজ্য ছিল না। বিদেশীদের বিচার হতো তাদের নিজস্ব আদালতে। একে বলা হয় এক্সট্রা টেরিটোরিয়ালিটি। এই মিশনারীরা যাদেরকে ধর্মান্তরিত করতো, তারাও ব্রিটিশ মিশনারীদের মতো এই বাড়তি সুযোগটা পেতো। এর ফলে চীনের এক গ্রামের মানুষের সঙ্গে অন্য গ্রামের

www.pathagar.com

মানুষের সম্পর্ক বৈরী হয়ে ওঠে। ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে দেশীয়রা পাদ্রীদের আক্রমণ করতো। কিন্তু, এর জন্য পরিণামও তাদের ভোগ করতে হতো। একটি পাদ্রী খুনের ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ চীনের কাছ থেকে আরও সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতো। খ্রীস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে চীনাদের এই আক্রোশকে আমরা কী বলবো? এর নাম কি সাম্প্রদায়িকতা? আমাদের এই অঞ্চলে যেসব 'সাম্প্রদায়িক' ঘটনা আমরা লক্ষ্য করি, তার গভীরে চীনের ইতিহাসে যা দেখা গেছে, তার মিল কি খুঁজে পাওয়া যাবে না? আফিম সেবনের ফলে চীনা জাতি ঘুমিয়ে পড়েছিল। এই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে চীনা জনগণকে মুক্ত করতে প্রয়োজন হয়েছিল আরেকটি বিপ্লবের। যে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাও জেডং।

বলছিলাম, একটি জাতিকে বিদেশীরা যখন পদানত করতে চায়, তখন তারা সে জাতির অমূল্য সম্পদ তার চরিত্রকেই ধ্বংস করে দেয়। বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ বোতল ফেনসিডিল চোরাচালান হয়ে ভারত থেকে আসছে। ফেনসিডিলের নেশা এ দেশের লক্ষ-কোটি যুবক ও শ্রমজীবী মানুষকে গ্রাস করে ফেলেছে। এই নেশায় অভ্যস্ত হয়ে ভারত কি চায় ব্রিটেন চীনের ক্ষেত্রে যেমনটি করেছিল, তেমনটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও করবে? তার চেয়েও বড় বিপদ হলো, চীনদেশে আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন সম্রাট ছিল, যে সম্রাট আফিমের আগ্রাসন রোধ করতে চেয়েছিলেন। হয়তো এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য এরূপ মূল্য দেয়াতে চীন ধ্বংসের ভগ্নাবশেষ থেকে ১৯৪৯ সালে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। চীনে লিন সে সি'র মতো সৎ ও সাহসী একজন রাজকর্মচারী ছিলেন, যিনি সকল প্রতিকূলতার মুখে চীনের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চেয়েছেন। আমরা কি খুব আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলতে পারবো বাংলাদেশে লিন সে সি'র মতো একজন আমলা কর্মকর্তা আছেন, যিনি সব প্রলোভন ও ভীতির উর্ধ্বে থেকে দেশের স্বার্থটিকেই বড় করে দেখবেন? এখন আমলারা বড় রাজনৈতিক দলে যোগদান করে, কিন্তু তাদের মতলব সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা জাতীয় নেতাদের আরও বশংবদ, আরও পদলেহী এবং আরও আত্মবিক্রয়কারী হয়ে শুধু ক্ষমতার গদিটি আঁকড়ে থাকতে কিংবা করায়ত্ত করতে পরামর্শ দেয়। আমরা কবে একজন লিন সে সি'র মতো সৎ ও দেশপ্রেমিক আমলা এদেশে খুঁজে পাবো?

দুর্ভাবনার বিষয় হলো, আমাদের সমাজে এমন একটা আবহের সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে সততা দুর্বলতার সমার্থক, দেশপ্রেম নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। এইতো ক'দিন আগে মফস্বলের একটি গ্রামে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, তিনি রাষ্ট্রীয় একটি ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনের নিম্নপদস্ত কর্মচারী। ভদ্রলোক তার ভাল ছাত্র পুত্রটিকে নিয়ে গর্ব করে বললেন, নিজস্ব স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র না থাকলেও তার কোনো অসুবিধা হবে না। তার ছেলে তাকে বলেছে, কেন্দ্র যেখানেই হোক না কেন, তাতে তার রেজাল্টে কোন তারতম্য হবে না। কারণ, সে নকলের আশ্রয় নেবে না। সে ভাল করে পড়াশোনা করে। কিন্তু একই নিশ্বাসে ভদ্রলোক বললেন, নির্বাচনের আগে সরকার ভিন্ন স্কুলে কেন্দ্র স্থাপন করে ভুল করেছে। এতে সরকারী দলের নির্বাচনী ফলাফল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে পিতা সন্তানের মনোযোগী ছাত্র হওয়া নিয়ে গর্ব করে, সে কিভাবে এরকম নৈতিকতাবিরোধী চিন্তা করতে পারে, সে হিসাবের অংক আমি মিলাতে পারিনি। মনে হয়, গোটা সমাজেই এই কর্কট ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। যে সমাজ দুর্নীতি ও অনৈতিকতাকে বাহবা দেয়, যে সমাজ ঋণখেলাপী, দুর্নীতিবাজ ও মস্তানদেরকে ভোটে বিজয়মাল্যে ভূষিত করে, সে সমাজকে এই জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত করতে পারেন– এমন দৃঢ়প্রত্যয়ী নেতার এদেশে উদ্ভব হবে এবং অচিরেই, তা কি আমরা আশা করতে পারি?

আফতাব আহমাদ :

তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি আপেক্ষিক অর্থে অত্যুন্নত (Over Developed). আমরা বহু বিষয়ে পিছিয়ে আছি– রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশভাবে সংহত করতে পারিনি, তারপরও অবস্থানগত দিক থেকে অপরাপর সামাজিক শক্তির প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত বিকাশের তুলনায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানাদি

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে অত্যুন্নত। এ ধরনের অবস্থায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই জানা আছে যে, প্রধান ক্যাজুয়ালিটি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দল।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, রাষ্ট্রীয় পরিচালনার দায়িত্বে আমরা দু'দু'জন বড়মাপের মানুষ পাওয়া সত্ত্বেও গোটা প্রশাসন নীতিনির্ধারণ ও প্রণয়নসহ শাসন ব্যবস্থা আমলানির্ভর হয়ে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ভারতীয় বহির্হস্তক্ষেপ ও খবরদারির ফলে সৃষ্ট পরিপ্রেক্ষিতের আছে অসহায় হয়ে আমলাদের দিকে হাত বাড়াতে বাধ্য হন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, একদিকে রাজনৈতিক নেতাদের কলিকাতাসহ ভারতীয় বিভিন্ন প্রমোদ কেন্দ্রে ফুর্তি করে বেড়ানো, অপরদিকে অবিশ্বাস্য রকমের অতিকায় বিশাল একটি আমলাকাঠামো গড়ে তোলা হয়, যা সরাসরি ভারত সরকারের হুকুম বরদার হিসেবে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। দলের ভেতরে ভারতীয় ইনফিলট্রেশন এবং মুজিবনগর প্রশাসনের ওপর ভারতীয় সামরিক-অসামরিক গোয়েন্দা কর্মজালের কব্জা শেখ মুজিবকে বাধ্য করে অধুনালুপ্ত পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসনের আমলাদের আপারহ্যাণ্ড দিতে। আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য যে, ঐ সময়ে রাজনীতিকদের মধ্য থেকে কিংবা রাজনৈতিক দল সংগঠিতভাবে এমন কোন দক্ষ নেতৃত্বের জন্ম দিতে পারেনি, যা ব্যবস্থাপনার দিক থেকে আমলাগোষ্ঠীর বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারত। এর সঙ্গে আরও যুক্ত হয় রাজনীতিকদের শিক্ষাগত সীমাবদ্ধতা ও এক কলস মূর্খতা।

স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার যখন লাভ করেন, তখন দেশের সকল রাজনৈতিক দল বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। একদলীয় বাকশালী শাসনে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রায় লুপ্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক শৃংখলাবোধ আত্মসমর্পণবাদে রূপান্তরিত হয় এবং দেশপ্রেমের পরিবর্তে আত্মপ্রেম সকলকে পেয়ে বসে। এমতাবস্থায় স্থিতিশীলতা ও প্রশাসনিক গতিশীলতার স্বার্থে জিয়াউর রহমানকেও হাত বাড়াতে হয় অধঃপতিত গণবিরোধী আমলাদের প্রতি এবং জনবিচ্ছিন্ন তথাকথিত টেকনোক্র্যাটদের প্রতি। এদের অধিকাংশই মুখে দেশসেবার বুলি কপচালেও নিজের ঝোলা ভরার কাজে এতবেশী মগ্ন ছিল যে, জাতীয় মর্যাদা, সম্ভ্রম, ঐতিহ্য, গৌরব সংরক্ষণের তাগিদ এদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়নি। শেখ মুজিবুর রহমান পিও-নাইন-এর মাধ্যমে আমলাদের একটি ভীতির পরিবেশের মধ্যে রেখেও তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় শেষ বিশ্লেষণে আমলাতান্ত্রিকতাকেই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে গেছেন। যদিও আজীবন তিনি এই আমলাতান্ত্রিকতার প্রতি তাচ্ছিল্য, উষ্মা ও ক্ষেত্রবিশেষে ঘৃণা প্রকাশ করে এসেছেন।

একটি রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যে বহুদলীয় ব্যবস্থাধীনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে জিয়াউর রহমানও শেখ মুজিবের মত একটি অসহায় পরিস্থিতির শিকার হন। ভারতের নাক গলানোকে প্রতিহত করার পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়ে যে শাসন কাঠামো তিনি গড়ার চেষ্টা করেছেন, তাও শেষ বিশ্লেষণে আমলাতান্ত্রিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে। তিনি তার সমর্থন ভিতকে যতবেশী জনসাধারণ নির্ভর করার জন্য এগিয়ে গেছেন, তার চাইতে বহুগুণ গতিতে আমলাতন্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় চর ও নিয়োগীরা এবং ঘাপটি মেরে থাকা পঞ্চমবাহিনী তাকে আমলাদের বেষ্টনীর মধ্যে বন্দী করে রাখতে সফল হয়। ভারতের প্ররোচণায় বাংলাদেশ তাই কখনও স্থিতিশীলতার মুখ দেখেনি।

আর আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সেই জাতীয় গৌরব ও অহঙ্কারকে সমুজ্জ্বল করে রাখার মত কোন বীরোচিত ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্বের আবির্ভাবও ঘটেনি। দুর্ভাগ্যবশত, যেহেতু এখানে শ্রেণী পরিগঠন (Class formation) কোন সুস্পষ্ট রূপধারণ করেনি এবং কোন শ্রেণীই একটি সংহত শাসক শ্রেণী হিসেবে চরিত্র অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, সে কারণে রাষ্ট্রের সৌজন্যে কৌলিন্য, অর্থবিত্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে রাজনীতির যে দুর্বৃত্তায়ন এখানে ঘটেছে, তাতে লুম্পেন পলিটিক্স এবং লুম্পেন কালচার বিকশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রযন্ত্রকে কব্জা করে রাতারাতি ফুলেফেঁপে কৃত্রিম শরাফতি অর্জন করে কিভাবে ফতেনবাব হওয়া যায়, এটিই হচ্ছে আমাদের রাজনীতির মুখ্য সবক। তাই মস্তানী, চোরাচালানী, চোরাপণবাজি, আর অস্ত্রবাজি– সব একাকার হয়ে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের বিরুদ্ধে এক অতিকায় দানবের জন্ম হয়েছে। এই দানবের জনক ও পৃষ্ঠপোষক আমলাগোষ্ঠী ও একশ্রেণীর ইচ্ছাপিতা বা গডফাদারগণ।

এদেশে বিনিয়োগ, শিল্পোদ্যোগ বা অর্থায়নের যে কোন পদক্ষেপের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন। জনসমাজের যে অংশ চিন্তা ও ভাবনার জগতের সঙ্গে জড়িত, সেখানেও মুখ ব্যাদান করে অবস্থান করছে প্রগতির নামে কলমবাজ আমলা। অশিষ্টতা ও নষ্টামী– কোনটাতেই এসব আমলা পিছিয়ে নেই। কিন্তু এরাই সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকার নসিহত করে বেড়ান। যে আমলা স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে হাত মেলায়, গণবিরোধী বাজেট প্রণয়ন করে, এমনকি স্বৈরাচারীর মন্ত্রি পরিষদের শোভাবর্ধন করে, সে আমলাই পরবর্তীকালে গণরোষের মুখে গণতন্ত্রের ভণ্ড পূজারী সেজে গণআন্দোলনে জড়িত সামাজিক শক্তিসমূহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার প্রচণ্ড কোশেশ করতে থাকে। এসব আমলারা মানুষকে গণতন্ত্রের সবক শেখাতে চায়। সুশাসন কাকে বলে, বোঝাতে চায়। জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণের কূটনীতি বোঝাতে চায়। অথচ এদের মত এত নীচাশয় গণবিরোধী কোন সামাজিকগোষ্ঠী সহজে পাওয়া ভার। এরা গাছেরটাও পেড়ে খেতে জানে, তলারটাও কুড়িয়ে খেতে জানে। আর আমাদের 'ক' অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিকরা এদের পরামর্শে নিজেদের ধন্য মনে করে এদের কাছে নিজেদের সঁপে দেয়। এসব আমলারা পেশাগত চাকরি থেকে অবসর নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রভুদের বিশ্বস্ত সেবাদাস হিসেবে তাদেরই নির্দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ঢুকে পড়ে কলকাঠি নাড়াচাড়ার কাজে মুখ্য ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে। প্রতিযোগিতাটি এবং লড়াইটি শেষ বিশ্লেষণে রাজনীতিকদের মতাদর্শগত কিংবা কর্মসূচীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিষয়টি পর্যবসিত হয় আমলাদের গোষ্ঠীগত লড়াইয়ে এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মুরুব্বির প্রভুত্ব কায়েমের প্রতিযোগিতায়। আমলা নামক এসব প্রভুরঞ্জন দাসদের হাত থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করা না গেলে, রাজনীতিকে মস্তান, কালো টাকা ও অস্ত্রবাজদের হাত থেকে মুক্ত করা না গেলে কখনোই সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন মেধাবী ও প্রজ্ঞাবান কোন ব্যক্তি রাজনীতিতে আসতে পারেন না। আমাদের আমলারা একাধারে কবি, নাট্যকার, ছড়াকার, ঔপন্যাসিক, আর্ট কনোশিয়ার, লুটেরা, ঘুষখোর, রাজনীতিক আবার ষড়যন্ত্রীও বটে। এদের মধ্যে সম্মানজনক ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে আছেন। তাদের কাছে মার্জনা চেয়ে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, অধিকাংশ ধান্দাল আমলা দেশবিরোধী ও গণবিরোধী। দেশ এবং দেশের মানুষের নামে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে এরা এদের ঝোলা ভরতে সিদ্ধহস্ত। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা কিংবা ফ্রান্স, ইটালীর আমলারা তাদের জাতীয় দুঃসময়ে যে অনুকরণীয় সাহসিকতা ও বীরত্বের নজির রেখে গেছেন, তা আমাদের মত দেশে এই মুহূর্তে প্রত্যাশা করাটি একটি অসম্ভব ভাবনা। তার কারণ আমাদের আমলা এবং আমাদের টেকনোক্র্যাটগণ একটি লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করেছে এবং এই লুণ্ঠন তার স্যাচুরেশন পয়েন্টে না পৌঁছা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তারপর একে স্থিত হতে হবে এবং তারপর একটি সামাজিক ম্যাটামরফসিস-এর মধ্য দিয়ে একটি রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবতে পারি। সেই সম্ভাবনাকে সম্ভব করে তুলতে পারে মুষ্টিমেয় সেসব নিবেদিত প্রাণ দেশকর্মী, যারা তাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও মেধাকে একত্রিত করে আদর্শবাদিতার ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার নিয়ে দেশ ও জনগণের হিতকামনায় নিজেদের সঁপে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

১৯ এপ্রিল ২০০১

শেখ হাসিনার রক্তাক্ত প্রস্থানের প্রস্তুতির মুখে 'গবাই' কৌশল

মাহবুব উল্লাহ :

এদেশের রাজনীতিতে আজ এক চরম লক্ষ্যহীনতা ও অস্পষ্টতা বিরাজ করছে। বর্তমান সরকারের মেয়াদ ফুরাবার আর মাত্র তিন মাস বাকী আছে। এ সময়ে রাজনৈতিক পরিবেশ এতটা উত্তপ্ত হওয়ারও কথা ছিল না। তবুও রাজনীতিতে এখন চরম উত্তাপ, যেমন উত্তাপ আজ বিরাজ করছে চৈত্রের এই খরার দিনগুলোতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি আরবে হজ্জ্বব্রত পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশীদের এক সমাবেশে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশে ফিরে তিনি তার প্রতিশ্রুতি ভেঙে এমন সব অশালীন, আপত্তিকর ও অরাজনৈতিক উক্তি করতে শুরু করলেন– যার ফলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকাটাই অস্বাভাবিক হয়ে পড়ল। প্রধানমন্ত্রী প্যারেড গ্রাউন্ডের এক সমাবেশ থেকে চরম হিংস্রতার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, "আগাম নির্বাচন চাইলে নাখে খৎ দিয়ে সংসদে ফিরে আসতে হবে এবং মুচলেকা দিতে হবে; আর কখনও হরতাল করব না"। কথার এখানেই শেষ নয়। জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, বিরোধী দলীয় নেতা-নেত্রীদের বাড়ী-ঘর, কল-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং যানবাহনের তালিকা তৈরী করে জনগণ যদি সেগুলো ভাংচুর করে কিংবা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়, তখন তারা কী করবেন? প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব পালনরত একজন মানুষ কিভাবে এমন বল্গাহীন উস্কানিমূলক ও প্রতিহিংসার বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে পারেন, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। কোথায় তাঁর এই শক্তির উৎস? কার ভরসায়, কিসের ভরসায় তিনি এমন বেপরোয়া হয়ে পড়েছেন, তা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে আঁচ-অনুমান করাও কঠিন। তবে কি তিনি স্থির নিশ্চিত হয়েছেন, পরবর্তী পাঁচ বছরেও ক্ষমতার মসনদে তিনিই থাকবেন; তাকে চ্যালেঞ্জ করার মত দেশে আর কেউ থাকবে না। টু শব্দটি উচ্চারণ করতে পারে, এমন যে কেউ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? বিনা প্রতিবাদে, বিনা বাধায় তিনি যা কিছু করতে চান, তাই করতে পারেন? এ ধরনের সম্ভাবনার বাস্তব ভিত্তি না থাকলে কারুর পক্ষেই এরকম বেহিসেবী উক্তি করা সম্ভব নয়। তার এই 'কুচপরোয়া নেহি' মানসিকতার ভিত্তি কী? সারাদেশের প্রশাসন আজ তাঁর অনুগত ভৃত্য। জনপ্রশাসন বলুন, পুলিশ প্রশাসন বলুন, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সংস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে যে, আজ আর কোন প্রতিষ্ঠানেই আইনের বালাই নেই। নিরপেক্ষ হবার প্রয়োজন নেই। ইতোমধ্যে সংসদে একটি বিলও পাস করা হয়েছে, যে বিলের মর্মকথা হল ঃ উপজেলা নির্বাচনের তারিখ নির্বাচন কমিশন নয়, সরকারই নির্ধারণ করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রীর মনসই নির্বাচন কমিশন নয়, সরকারই নির্ধারণ করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রীর মনসই যে নির্বাচন কমিশন আজ আছে, সেই নির্বাচন কমিশন উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনীহা প্রকাশ করে আসছিল। প্রধানমন্ত্রী ও তার দলের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বচনের আগেই তাঁর সরকারের অধীনে উপজেলা নির্বাচনটা করে ফেলা তার জন্য রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক।

এদেশে ক্ষমতাসীন সরকারগুলো নির্বাচনকে অত্যন্ত নোংরাভাবে প্রভাবিত করে বলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবী উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালের মার্চে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি গৃহীত হয়। কোন কোন রাজনৈতিক দল একই সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় এবং উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী তুলেছিল। কিন্তু এই যৌক্তিক দাবীটিকে তারা খুব বেশী দূর এগিয়ে নেয়নি, কিংবা নিতে চায়নি। আমার ধারণা, এ ধরনের একটি রেওয়াজ চালু হলে বাংলাদেশের জন্য কল্যাণকর হত। উপজেলা পরিষদের মত স্থানীয় সরকারের হাতে অনেক ক্ষমতা

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছে। সে কারণে উপজেলা পরিষদে যারা নির্বাচিত হবেন, তারা জাতীয় নির্বাচনকে নিশ্চিতভাবেই প্রভাবিত করতে সক্ষম হবেন। আমার মনে হয়, মেয়াদ পূর্ণ করতে পারলে শেখ হাসিনার সরকার উপজেলা নির্বাচনের কাজটিও সেরে ফেলবেন। এছাড়া অচিরেই দু'জন নির্বাচন কমিশনারের পদ শূন্য হতে যাচ্ছে। এই পদগুলোতে নিজেদের পছন্দমাফিক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করে যাওয়াও হাসিনা সরকারের আরাধ্য এজেন্ডার অন্যতম বিষয়। দ্বিতীয় দফায় ৭২ ঘন্টা হরতাল শুরু হওয়ার আগে সরকার ডিসিদের সম্মেলন ডেকেছিল। প্রধানমন্ত্রী ব্যাক্তিগতভাবে ছোট ছোট গ্রুপে ডিসিদের সঙ্গে একান্ত আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনায় হরতাল প্রতিহতের জন্য সরকারের নির্দেশ কার্যকর করতে ডিসিদের চাপও প্রদান করা হয়েছে। কিছু কিছু বিবেকবান ডিসি এতে বিব্রত হয়েছেন বলেও সংবাদসূত্রে জানা গেছে। এমনিতেই যেসব ডিসিকে জেলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাদেরকে কঠোরভাবে চালুনি বাছাই করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ে এরা বিবেক-বিবেচনার মাথা খেয়ে চক্ষুলজ্জা হারিয়ে কোমর বেঁধে আওয়ামী প্রার্থীদের নির্বাচিত হতে সহায়ত করবেন। আমাদের মত দেশের নির্বাচনে ডিসি এবং টিএনওরা নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে কত নীচে নামতে পারেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাম্প্রতিক বিসিএসের ফলাফল কেলেংকারি জাতির অবিদিত নয়। বহু, যোগ্য ও প্রতিভাবান প্রার্থীকে রাজনৈতিক অসূয়াপ্রসূত মৌখিক পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সর্বশেষ সংবাদ হল, প্রেসিডেন্টকে দিয়ে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়া প্রার্থীদের তালিকা তড়িঘড়ি করে অনুমোদন করানোর জন্য রুটিন ইন্টেলিজেন্স ক্লিয়ারেন্সের আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন করা হয়নি। এছাড়া, মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার আয়োজন করে দলীয় এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রশাসনে নিয়োগদানের প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়ে গেছে। পুলিশ প্রশাসনের কথা যতটুকু বলা না যায়, ততই ভাল। এরকম দলীয়করণকৃত প্রশাসনের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে হংস মাঝে বকযথা অবস্থায় যে পড়তে হবে, তা বলাই বাহুল্য।

শেখ হাসিনা চাইছেন, এমন সময়ে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন, যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসলে নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও জনগণের দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে পাবে না। কারণ, ভরা বর্ষার আগেই নির্বাচন পর্ব সমাধা করার একটা ব্যাগ্রতা থাকবেই। এদিকে বেগম খালেদা জিয়া গত ৭২ ঘন্টার হরতাল সূচনা-পূর্ব সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করে এই আভাস দিয়েছেন যে, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সময়ের প্রয়োজন। কারণ, আইনী ও বেআইনী সকল প্রকার অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। নির্বাচনের দায়িত্ব প্রশাসনে নিরপেক্ষতার রেকর্ড রয়েছে, এমন সব কর্মকর্তাদের প্রদান করতে হবে।' বিদ্যমান কর্মকর্তাদের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলী করাটাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হওয়ার অবকাশ নেই। কারণ, যে ব্যক্তি এক জেলায় পক্ষপাতিত্ব করেন, তিনি যে অন্য জেলায় বদলী হলেও পক্ষপাতিত্বের দোষমুক্ত হয়ে ফেরেশতা হয়ে যাবেন, এমনটি আশা করা যায় না। এছাড়া ভোটার তালিকাও অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ বলে ইতোমধ্যেই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। ভোটার তালিকায় ১৫ লাখ অতিরিক্ত ভোটার অন্তর্ভুক্তিকরণ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ভোটার হবার অযোগ্য কারা ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছে, তার ফয়সালার জন্যও যাচাই-বাছাইয়ে যথোপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন। এক কথায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

সম্প্রতি সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের এক মিলনোৎসব হয়ে গেল। এই উৎসবে সরকার সমর্থক সেক্টরের কমান্ডাররা ছাড়া অন্য সেক্টর কমান্ডাররা অংশগ্রহণ করেননি। সেনাবাহিনীকে একটি রাজনৈতিক সম্মিলনে সংশ্লিষ্ট করা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে সংকেত দিতে চেয়েছেন যে, সেনাবাহিনীও তার রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করছে। এভাবে আমাদের জাতীয় গৌরব ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী সেনাবাহিনীকে দলীয় কালিমা লেপন করে কলঙ্কিত করা হচ্ছে। আবার অন্যদিকে, সেনা প্রধান 'শিখা চিরন্তন' প্রজ্বলন উৎসবে আওয়ামী বুলি 'স্বাধীনতার শত্রু'দের কথা উচ্চারণ করে বিতর্কিত বক্তব্য রেখেছেন। আমরা জানি না, এটা তার মনের কথা কি-না। তাঁর নিয়োগ প্রশ্নে একটি দৈনিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

www.pathagar.com

সেই দৈনিকের সম্পাদক তার স্বনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে দুই প্রধান রাজনৈতিক ধারার বিকল্প স্বরূপ তৃতীয় শক্তির উত্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা এবং এতে সেনাবাহিনী কী করবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন রেখে এক অশুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই তৃতীয় শক্তি কাদের স্বার্থ রক্ষা করবে, আমাদের কাছে তথা দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট নয়। সম্প্রতি একটি প্রতিষ্ঠান আয়োজিত গোলটেবিলে বৈঠক সমাজের কিছু ব্যক্তিবর্গ স্বল্পকালীন মার্শাল ল'র প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেছেন। সব মিলে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। দায়িত্বশীল মহলের চরম উস্কানিমূলক বক্তব্য দেশকে একটি গৃহযুদ্ধের দিকে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

ওয়াশিংটন থেকে সাংবাদিক গোলাম আরশাদ প্রেরিত এক রিপোর্ট মারাত্মক আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, "বাংলাদেশে ৮০'র দশকে দায়িত্ব পালনকারী একজন সাবেক মার্কিন কূটনীতিক মন্তব্য করেছেন, 'হাসিনা রক্তক্ষয়ী প্রস্থানের পথ বেছে নিয়েছেন'। ওয়াশিংটনের একটি রক্ষণশীল থিংকট্যাঙ্ক 'দি হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের' একজন সিনিয়র বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে পুরোপুরি সংঘাতপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন। ওয়াশিংটনের মর্যাদাপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক থিংকট্যাংক সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সিনিয়র কর্মকর্তা মার্ক শ্যাফ বলেছেন, "আমরা এই ভেবে উদ্বিগ্ন যে, হাসিনা আরো বেশী দমন-নির্যাতন চালাতে পারেন। তিনি আরও বেশী নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারেন। এর ফলে তিনি তাঁর সরকারের রক্তক্ষয়ী প্রস্থানই প্রত্যক্ষ করবেন"।

দেশের এ সময়ে সরকারের রক্তক্ষয়ী প্রস্থান কেবলমাত্র ক্ষমতার উঁচুতলায় সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মনে করে আত্মতৃপ্তিবোধ করার কোন কারণ নেই। এবার রক্তক্ষয়ী যে কোন দুর্যোগ পুরো জাতিকে রক্তস্রোতে অবগাহিত করবে। এ থেকে আমরা অনেকেই হয়তো আত্মরক্ষা করতে পারব না। গৃহযুদ্ধ, রক্তক্ষয়, সংঘর্ষ একটি জাতির জন্য কত বিপর্যয়কর হতে পারে, তাতে আমরা আফগানিস্তান, কঙ্গো, রুয়ান্ডা ও যুগোশ্লাভিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে জানি। আজ প্রয়োজন সমাজের সকল শুভবুদ্ধি ও দেশপ্রেমিক মানুষের ঐক্য। যে কোন মূল্যে অনিবার্য রক্তপাত থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হবে। একটি দেশে গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে দেশের বাইরের শত্রুরা দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করে দিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার বাজপাখীদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন- এটাই জাতির প্রত্যাশা। অন্যদিকে, বিরোধী মোর্চাকেও পজিটিভ জনমত গঠনের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আমি এখনও মনে করি, দেশবাসী একদিকে যেমন আওয়ামী দুঃশাসনে অতিষ্ঠ এবং পরিত্রাণের পথ খুঁজছে, অন্যদিকে বিরোধী মোর্চার পক্ষ থেকেও তাদের স্ট্যান্ড দেশবাসী স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। কাজেই, জনমনে এক ধরনের অস্পষ্টতা ও আস্থাশূন্যতা বিরাজ করছে। জনগণকে আস্থায় নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে জনমত গঠনের কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। ব্যাপক জনগণকে পলিটিসাইজ না করতে পারলে ভবিষ্যতে শুভদিনের সূচনা হবে- এমনটি আশা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদের একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়িয়ে গেছে। প্রেসিডেন্টের হারাবার কিছু নেই। অথচ জয় করার অনেক কিছুই আছে। প্রেসিডেন্ট যদি জাতীয় সংকট থেকে উত্তরণের উদ্দেশে সহমত সৃষ্টি করার জন্য একটি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানান, তা একদিকে যেমন বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থন পাবে, অন্যদিকে বিবদমান দলগুলোর পক্ষে তাঁর প্রতি কোন অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন রাজনৈতিকভাবে অসম্ভব হয়ে পড়বে। পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হয়, সরকার দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করে বিরোধী দলীয় মোর্চাকে তছনছ করে দিতে চাইছে। এতে কাজ হয়নি, তা বলা যাবে না। জেনারেল এরশাদ ইতোমধ্যেই বিরোধী মোর্চা থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অপরদিকে জামায়াতে ইসলামীর উপর এখন সাঁড়াশি আক্রমণ চলছে। সরকার হয়ত আশা করছে, এই সাঁড়াশি আক্রমণের ফলে জামায়াতে ইসলামীও আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে জোটে নিষ্ক্রিয় অবস্থান নিতে বাধ্য হবে। বড় দল বিএনপিকে এই অপকৌশলগুলো হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। শাসক দলের কৌশল যখন জোটকে পর্যুদস্ত করা, ঠিক একইভাবে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির কর্তব্য হবে গভীর যত্ন, সাবধানতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে জোটের ঐক্যকে বজায় রাখা।

www.pathagar.com

আফতাব আহমাদ :

দেশের রাজনীতি এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। একদিকে অনিয়ন্ত্রিত নির্বাচনী হাওয়া বইছে। আরেকদিকে, টানটান উত্তেজনা। সব মিলে বলা চলে, একটি চমৎকার পরিবেশ তৈরী হয়েছে। জীবনানন্দের ভাষায় বলতে হয়– 'থুর থুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বথের চালে বসে এসে/ চোখ পাকায়ে কয়; 'বুড়িচাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে?/ চমৎকার!/ ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার'।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন ইঁদুর ধরাধরির প্রতিযোগিতা চলছে। একদিকে দুই বৃহৎ দলের আত্মমর্যাদার লড়াই– কার কথায় নির্বাচন হচ্ছে, কার কথায় সংসদ বিলুপ্ত হচ্ছে, কার কথায় ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে– এসব নিয়ে দুই বৃহৎ দলের একেকজন একেক ধরনের হিসাব নিকাশ করছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীশাসিত শাসনব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগের গঠনকাঠামো ও চরিত্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংসদ যেহেতু কোন ভূমিকাই রাখতে পারে না, সেহেতু এখানে সংসদ আঁতুরঘরেই মৃত্যুবরণ করেছে। অকার্যকর রাবারস্ট্যাম্প সংসদকে ঢাকঢোল পিটিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিহাসছলে যতই অভিহিত করা হোক না কেন, এতো আসলে কানা ছেলেকে পদ্মলোচন নামে নামকরণের সমতুল্য। আমাদের সংসদ রাজনৈতিক দলনেতাদের কাছে জিম্মি। সংসদের যাঁরা সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন, তারা যত না জনপ্রতিনিধি, তার চাইতে অনেক বেশী দলের আজ্ঞাবাহী ব্যক্তিত্বরহিত প্রতিনিধি। সংসদীয় গণতন্ত্রের যে কথিত ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেল আমাদের দেশে অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয় বলে বলা হয়ে থাকে, তাতে কিন্তু কোয়ালিশন পরিস্থিতি ছাড়া অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে বিরোধীপক্ষের সদস্যদের কখনই ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, সংসদের সদস্যরা নিজ নিজ দলনেতা/ নেত্রীর ইচ্ছাপূরণের ইচ্ছাদাসে পরিণত হয়। স্বাধীনভাবে নির্বাচনী তল্লাটের সুবিধা-অসুবিধা বাছ-বিচার করার কিংবা দূরদৃষ্টি দিয়ে জাতীয় স্বার্থের বিষয়গুলোকে অবলোকন করার ব্যক্তিপর্যায়ের কোন সুযোগ নেই বললেই চলে। সংসদে সংখ্যা বাড়ানোটাই যেখানে মুখ্য এবং এক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা যেখানে দলীয় নেতৃত্ব লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত, সেখানে সংসদীয় রীতিনীতি; সংসদীয় ট্রেডিশন বা কনভেনশন– এসবই নির্মম রসিকতা মাত্র। এক ব্যক্তি যা বলেন, তার দলভুক্ত সংসদ সদস্যরা ভেড়ার পালের মতো তা-ই করেন। বাছ-বিচারের কোন সুযোগ নেই। নিক্তিতে ওজন করে দেখার কোন সময় নেই। ন্যায়-অন্যায়ের কোন ব্যাপার-স্যাপারই নেই। আমাদের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীসহ হালফিল যে অবস্থা, তাই মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের মতো দেশগুলো যতই গণতন্ত্রের ডঙ্কা বাজাক না কেন, আসলে তা ওরিয়েন্টাল ডেসপটিজমেরই একটি আধুনিক সংস্করণ মাত্র। নেতা-নেত্রীরা এটা ভালোই বোঝেন। অধিকাংশ বিদ্বৎজন ও বিবৃতিজীবীরা নানান ধান্ধায় রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়বৃত্তি করেন বিধায় বুঝেও বুঝতে চান না, জেগেও ঘুমিয়ে থাকেন এবং কেবল প্রাপ্তিযোগের আশায় সময়ক্ষেপণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। তাই যখনই নির্বাচনী মৌসুম ঘনিয়ে আসে কিংবা প্রতিপক্ষকে একহাত দেখে নেবার সুযোগ আসে, তখনই ধুম পড়ে যায়, দলে দলে নব দীক্ষিতদের দলে ভিড় জমানোর। একটি চমৎকার অবস্থা তৈরী হয়– 'ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার'।

নানা বর্ণের, নানা আকৃতির এসব ইঁদুরেরা সুযোগ বুঝে লাফ দিয়ে নৌকায় চড়ে বসে অথবা ধানের আঁটির ভেলায় চেপে বসে। আমলা-কামলা, অবসরপ্রাপ্ত কিংবা বরখাস্তকৃত সাবেক সেনা কর্মকর্তা, এককালের রাষ্ট্রদূত, (পৃষ্ঠপোষকতার সুবাদে কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকরির সুবাদে)- এরা সারাজীবন, পাউরুটির কোন দিকটায় মাখন কিংবা ননী লাগাতে হয় সে বিষয়ে সর্বদা যত্নবান ছিলেন। অতএব, রাজনৈতিক মৌসুমের পূর্বাভাস নিরূপণের ক্ষেত্রেও এরা নিজেদের পণ্ডিত মনে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একটা পক্ষ বেছে নেন। দুর্ভাগ্যবশত এসব ধুরন্ধর ইঁদুরের লেজ যে ইতোমধ্যেই কাটা পড়েছে, তা বিস্মৃত হয়ে অনেকটা উটপাখির মতো বালুর ভেতরে মাথা গুঁজে দিয়ে ভাবে, মরু সাইমুম তাকে স্পর্শ করবে না কিংবা কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। চমৎকার! এই চমৎকারিত্বের অন্যতম কর্ম অধুনা সংবাদপত্রের পাতা খুললেই আমরা দেখতে পাব। আজ এ দলে, কাল ও দলে

www.pathagar.com

এতজন সাবেক আমলা বা সাবেক সেনা অফিসার যোগদান করেছেন শীর্ষক খবর। ১৯৯৬-এও এমনি রমরমা অবস্থা আমরা দেখেছি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কে কার দলকে ভাঙতে পারে, কিংবা জোটকে ভাঙতে পারে, কিংবা অন্য দল থেকে ভাগিয়ে দু-একটা ইঁদুর নিজের ঝোলায় ভরতে পারে- সেই চমকের রাজনীতি। এখানে কোথায় আদর্শ, কোথায় অঙ্গীকার, কোথায় বাস্তবসম্মত কর্মসূচী কিংবা কোথায় সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি? পুরো ব্যাপারটাকেই বলা যায় 'গবাই'। 'গবাই' শব্দটি ময়মনসিংহের একটি আঞ্চলিক শব্দ। সাধারণত জেলেরাই মাছ ধরে, আমরা জানি। কিন্তু বর্ষায় নদী ফুলে ফেঁপে কিনার উপচে মাঠ-ময়দান যখন প্লাবিত হয়ে যায়, তখন সকলে অপার সুখোচ্ছ্বসে এক আনন্দক্রীড়ায় মেতে ওঠে। মাছ ধরার কাজটি তখন জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। পানিতে হাত ডোবালেই মুঠিতে যেখানে মাছ ধরা পড়ে, সেখানে তখন সবাই নিরন্তর পানিতে শুধু হতে ডোবাতেই থাকে। একেই বলে গবাই। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এখন চলছে গবাইয়ের পালা।

এই রাজনৈতিক 'গবাই' থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ, অর্থবহ পরিবর্তন ও সংশোধন জরুরী। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে সংসদে ফ্লোর ক্রসিংয়ের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগকে ওলট-পালট করার সুযোগ যেমন দেয়া যায় না'। তেমনি নির্বাহী বজ্রমুষ্ঠিতে সংসদকে আটকে রেখে প্রধানমন্ত্রীর স্বৈরতন্ত্র বা দলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া যায় না। প্রয়োজন আইন প্রণয়ন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন ও পৃথকীকরণ। ঠুঁটো জগন্নাথের মত নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান গরিব দেশে রাখা একটা বিলাসিতা মাত্র। রাষ্ট্রপ্রধানের পৃথক পদটি যদি রাখতেই হয়, তাহলে বিবদমান কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতা বা সালিশ করার মত পর্যাপ্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের অবশ্যই থাকা উচিত। রাষ্ট্রের কোন প্রশাসনিক একক নির্বাহী বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতার জালে আটকা পড়ে গণপ্রতিনিধিত্বের চরিত্র যাতে না হারায়, সেহেতু সর্বস্তরের স্থানীয় প্রশাসনের একককে নির্বাহী বিভাগ থেকে মুক্ত করে স্বায়ত্তশাসিত এককে রূপান্তরিত করতে হবে। আর এসব প্রশাসনিক এককের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান নির্বাহী বিভাগের কোন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত না করে রাষ্ট্রপ্রধানের দফতরের ওপরই ন্যস্ত করা উচিত। সাংবিধানিক সকল নিয়োগ বা রিক্রুটমেন্ট সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে থাকা উচিত। রাষ্ট্রপ্রধান কোন অবস্থাতেই সরকারপ্রধানের ক্রীড়নকে যাতে পরিণত না হন, তাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এককথায়, আমাদের দেশে ইতোপূর্বে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতির নামে এক ব্যক্তির যে স্বেচ্ছাতন্ত্র চালু ছিল তার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতির কোন সম্পর্কই ছিল না। তেমনি সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে এখানে প্রধানমন্ত্রীর শাসন-পদ্ধতি যেভাবে চালু রয়েছে, তার সঙ্গে ব্রিটিশ ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেলের কোন সম্পর্কই নেই।

আমাদেরকে আজ আইন বিভাগ তথা সংসদের নির্বাহী বিভাগ তথা প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধানের যৌথ দায়িত্বের মধ্যে সুস্পষ্ট চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংবিধানকে ঢেলে সাজিয়ে যদি জনগণের অভিব্যক্তি অভিপ্রায়কে আমরা মূর্ত করে তুলতে পারি, তাহলে স্বেচ্ছাচারিতা, এক ব্যক্তির স্বৈরতন্ত্র, ওরিয়েন্টাল ডেসপটিজম কিংবা গবাইয়ের রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে পারব। দেশকে যারা ভালবাসেন, মানুষকে যারা ভালবাসেন, তারা যশ, খ্যাতি, পার্থিব জগতে লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপালাভ- এসব কোন কিছুর আশ্রয়ে রাজনীতি করেন না। তারা রাজনীতি করেন একটি আদর্শ, একটি কর্মসূচী, একটি সমাজদর্শনকে অবলম্বন করে প্রাগ্রসর ভবিষ্যৎকে অর্জন করার জন্য। অস্থিরতা, অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা এ ধরনের অর্জনের পথে প্রধান বাধা। আর তাই সুখ, শান্তি, সুন্দর ও কল্যাণ শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আমাদের উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি যারা ব্যক্ত করেন, তারা সর্বৈব মক্কর। জ্বলতে জ্বলতে জ্বালাটাকে যেমন শেষ করতে হয়, মরতে মরতে তেমনি জীবনের সাথে জীবন ঘষে জীবনের আলো উদ্ভাসিত করে সে আলোয় আলোকিত পথ ধরে জীবনের সম্মুখপানে অগ্রসর হতে হয়, -একটা ইঁদুর ধরে কোন চমৎকারিত্ব দেখানো যায় না। কারণ, জীবন কবিই বলে গেছেন- 'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়- আর এক বিপন্ন বিস্ময়/ আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে/ খেলা করে/"

www.pathagar.com

২৬ এপ্রিল ২০০১

স্বাদেশিকতার সংস্কৃতি বর্জিত রাজনীতির পরিণতি বিডিআরের তিন শহীদের আত্ম-ত্যাগের প্রতি অবহেলা

মাহবুব উল্লাহ :

একটি দেশের মননের বিকাশে সে দেশের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, চিত্রকর ও সাংবাদিকদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধিজীবীরা চিন্তার জগতে নেতৃত্ব দেন। সাহিত্যিক তার গল্প, উপন্যাস নাটক ও কবিতার মধ্য দিয়ে পাঠকের আবেগ ও অনুরাগের সঙ্গে নিজের আবেগ ও জীবনদৃষ্টির সম্মিলন ঘটান। যারা গান করেন কিংবা নৃত্যশিল্পের মতো শিল্প মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তারা গণমানুষের ওপর সুদূর প্রসারী ছাপ ফেলতে সক্ষম। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের কথা আমরা জানি, তাকে হয়তো মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বা দা ভিঞ্চির মতো বিশ্বমাপের শিল্পী বলা যাবে না, তৎসত্ত্বেও তুলির মাধ্যম ব্যবহার করে তিনি যে বাণী এ দেশের মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। ১৯৪৩-এ মহামন্বন্তরের যেসব ছবি তিনি এঁকেছেন, তা দেখলে '৪৩-এ যে মানবিক বিপর্যয় হয়েছিলো, সেই ঘটনা আজও আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে নাড়া দেয়। আমি বিশ্বাস করি, অনাদিকালের অনাগত প্রজন্ম তাদের অতীত ইতিহাসের এই বিশাল ট্র্যাজেডির কথা ইতিহাসের বিবরণ থেকে যত না জানবে, এসব ছবি থেকে তার চাইতেও অনেক হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া অনুভূতি নিয়ে বুঝতে পারবে বাংলাদেশের মানুষ কী বিশাল মর্মন্তুদ মানবিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল। জয়নুল শুধু যে একজন মানবদরদী শিল্পী ছিলেন তা নয়, তিনি প্রতিষ্ঠানও নির্মাণ করে গেছেন। ঢাকা আর্ট কলেজ– আজ যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত, সেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও একে লালন করা এবং এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নব প্রজন্মের শিল্পী সৃষ্টি করা ছিল জয়নুলের মহৎ কর্ম। ১৯৭০-এ প্রলয়ংকারী জলোচ্ছ্বাসে দক্ষিণ বাংলার ১২ লাখ আদমসন্তান বানের পানিতে ভেসে যায়। তাদের গলিত শব পড়ে থাকে জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যাওয়া বালুচরে। জয়নুলের সংবেদনশীল মন সেদিন ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য জয়নুল ক্যানভাসে ধারণ করে রেখেছিলেন। আমরা সকলে জানি, '৭০-এর জলোচ্ছ্বাস জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এমন একটি তাৎপর্যময় ঘটনা, যা আমাদের ইতিহাসে সুস্পষ্ট বাঁকের সৃষ্টি করেছিল। সেদিন মওলানা ভাসানী দক্ষিণ বাংলায় বেআব্রু লাশের স্তূপ দেখে এসে ঢাকার পল্টন ময়দানে যে বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন, সে বাণী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পালে হাওয়ার উন্মাদনা যুক্ত করেছিল। পাখ-পাখালি, জনমানবশূন্য প্রান্তরের দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মওলানা বলেছিলেন, 'আমি একটি ঘুঘু পাখিও সেখানে দেখতে পাইনি'। কথায় বলে, 'মানুষশূন্য বিরান বসতিতে ঘুঘু চরে'। অথচ সেদিন দক্ষিণ বাংলার বিরান প্রান্তরে মওলানা ঘুঘুর ডাকও শুনতে পাননি। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা তাদের পূর্ব পাকিস্তানের ভাইদের কেয়ামততুল্য দুর্যোগে সমবেদনা প্রকাশের জন্য কেউ ছুটে আসেননি। মওলানা তাই বলেছিলেন, 'ওরা কেউ আসেনি'। আরও বলেছিলেন, 'আজ থেকে ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেল'। এখানে তুলির জাদুকর জয়নুল আর রাজনীতির জাদুকর মওলানা ভাসানী একই অনুভূতিতে কাতর; তাদের সেই কাতরতা তারা উভয়েই নিজ নিজ মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। আজকের বর্ষীয়ান ও বিতর্কিত কবি শামসুর রাহমান পল্টনের ময়দানে মওলানার অপূর্ব ভাষণ শুনে লিখেছিলেন– তার বিখ্যাত সেই কবিতা 'সফেদ পাঞ্জাবী'। কী অপূর্ব চিত্রকল্প ছিল সেই কবিতা। মওলানা যেন তার সফেদ পাঞ্জাবী দিয়ে

www.pathagar.com

দক্ষিণ বাংলার সব বেআব্রু লাশ ঢেকে দিতে চেয়েছেন। কবি পরম বিস্ময়ে উক্তি করেছেন, 'কী মন্ত্র জপলেন মওলানা ভাসানী?' শিল্পীর তুলি, কবির কবিতা আর রাজনীতিকের ভাষণ কিভাবে মানুষের চেতনায় সুগভীর চৈতন্য সৃষ্টি করতে পারে, এরকম দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। আর এ কারণেই আমি বারবার বলি– সংস্কৃতি হল রাজনৈতিক সংগ্রামের শাণিত এক তলোয়ার। সংস্কৃতিবিহীন রাজনীতি অনেক সময়ে খিস্তি-খেউড়ের পর্যায়ে চলে যায়। সংস্কৃতিবিহীন রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে মাথামোটা সৈনিকের কোন তফাৎ থাকে না। মাথামোটা সৈনিকদের নিয়ে একটি রসালো গল্প আছে। এরকম সৈনিকদের লেফট-রাইট করাতে গিয়ে যখন হাবিলদার দেখেন, তিনি যখন বলছেন লেফট, তখন মাথামোটা সৈনিক ডান পা ফেলছে। আর যখন বলছেন 'রাইট', তখন ফেলছে বাঁ পা। কিছুতেই ওদের লেফট-রাইটের অর্থ বোঝানো যাচ্ছিল না। অবশেষে ক্লান্ত হাবিলদার একটা বুদ্ধি আঁটলেন– তিনি সকল সৈনিকের বাঁ পায়ে খড় বেঁধে দেলেন। আর ডান পা রাখলেন, খালি। এবার তিনি কমান্ড দিলেন– 'খড় খালি, খড় খালি।' সৈনিকরা ছন্দবদ্ধভাবে কদম মেলাতে সক্ষম হল। সুতরাং সংস্কৃতিবর্জিত রাজনৈতিক কর্মীকে দিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গেলে এমনি ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। আর এ কারনেই রাজনীতিতে, জাতি গঠনে, জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতীয় একটি বাংলা-চ্যানেলে গানের অনুষ্ঠান দেখছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে একজন মুসলমান গায়ক মরমী গান গাইছেন। গানের কথাগুলো হল– 'মক্কা থেকে মদীনা কত দূর/মক্কায় শুনি হরিধ্বনি, নদীয়ায় আজনের সুর'। বড় বেখাপ্পা লাগল। সত্যিকার কোন ধার্মিক আধ্যাত্মবাদী মক্কার সঙ্গে হরিধ্বনি মেলাতে চাইবেন না। নদীয়ায় অবশ্য আজানের ধ্বনি বা শ্রী চৈতন্যের কীর্তন দুটোই স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে গানটি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী প্রচার করলেও এবং আমাদের দেশে একশ্রেণীর 'অসাম্প্রদায়িক' বুদ্ধিজীবীর কাছে এই গান সমন্বয়বাদ বা ইংরেজীতে যাকে বলে সিনক্রেটিজমের আবেদন হিসেবে বিবেচিত হলেও গানের এই বাণী ইসলামের মর্মবস্তুকে আঘাত করে সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রবলভাবে উসকে দেয়ার শামিল, এ কথাকি বলার অপেক্ষা রাখে?

এই যে সমন্বয়বাদের কথা বললাম, এই সমন্বয়বাদের ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে এদেশের ভারত ঘেঁষা একদল বুদ্ধিজীবী মুসলমানদের যে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, যার সঙ্গে অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবিকতার কোন বিরোধ নেই, সেই স্বকীয়তাকেই মুছে ফেলে ভারত তীর্থে লীন হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ধরনের বুদ্ধিজীবীরা জাতির জন্য কত বড় অভিশাপ, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি অসম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী; কিন্তু অসম্প্রদায়িকতার নামে হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলিমত্ব, বৌদ্ধের বৌদ্ধত্ব বা খ্রিস্টানের খ্রিস্টত্ব আমি অস্বীকার করতে চাই না। কারোর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা চরম অন্যায় বলে মনে করি। সব ধর্মের মানুষ নিজ বিশ্বাসে অটুট থেকেও মহামিলন ও মহাসাম্যের আদর্শ স্থাপন করতে পারে। মানবিকতা চর্চার নামে ধর্মীয়তা, ধর্মবোধকে ও ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। ধর্মীয়তার মর্মবাণীই হল মানবিকতার উদ্বোধন।

১৯৪৭-এ যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল সেই পাকিস্তান সৃষ্টিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তথা মুসলিম সম্প্রদায় যে কোরবানি স্বীকার করেছিল এবং যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে জান কবুল সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার সঙ্গে তুলনা হতে পারে এমন কোন চেতনার দাবীদার পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানরা হতে পারে না। তৎসত্ত্বেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের চৈতন্য এক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। কি ভাষার প্রশ্নে, কি সংস্কৃতির প্রশ্নে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নে এদেশের মানুষ দেখতে পেল তারা চরমভাবে অবহেলিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত। কিন্তু এই বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি সাংস্কৃতিক হাতিয়ারের প্রয়োজন ছিল। এদেশের একদল কবি-সাহিত্যিক মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা ও নিষ্ঠা বজায় রাখতে গিয়ে আরবের মরুভূমি,

www.pathagar.com

মরূদ্যান, খেজুর বৃক্ষ ও ফোয়ারার মধ্যে উজ্জীবনী শক্তি খুঁজে পেতে চাইলেন। এরা সংখ্যায় তেমন বেশী ছিলেন না। কিন্তু অপর অংশটি বাঙালীত্বের ধ্যান ও ধারণাকে স্পষ্ট ও প্রবল করে তুলতে গিয়ে কলকাতাকেন্দ্রিক উচ্চ মার্গীয় সংস্কৃতায়িত কালচারের মধ্যে স্বাধিকারের সংগ্রামের হাতিয়ারটি খুঁজে নিলেন এবং একে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরলেন। রবীন্দ্রনাথ, রামপ্রসাদ, অতুলপ্রসাদ, শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ, তারাশংকর প্রমুখ সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম হল তাদের প্রেরণার উৎস। অথচ তারা একবারের জন্যও ভেবে দেখলেন না, এদের লেখায় নিপীড়িত মুসলিম কৃষাণ-কৃষাণীর মুখচ্ছবি কোথায়? কোথায় তাদের প্রতিদিনের দিন যাপনের গ্লানি। কোথায় তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার কথা? আমি সেই সব সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মকে মূল্যবান বলে মানি। এসব পড়ে অন্যদেরকেও পড়তে বলি। যেমন– একজন ইংরেজীভাষী আমেরিকান শেক্সপীয়র কিংবা ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিংবা বার্নাড শ পড়বেন এবং এ থেকে রসাস্বাদন করবেন, কিন্তু জাতীয় গৌরবের কবি রবার্ট ফ্রস্টকে কোনক্রমেই ভুলে যাবেন না। যারা রবীন্দ্র চর্চার নামে রবীন্দ্র পূজারী, তারা যে আতিশয্যের রোগে আক্রান্ত; বলা যায় এক ধরনের অবসেশনে ভুগছেন, তা কি অস্বীকার করা যাবে? রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জমিদারীতে মুসলমান প্রজার কি আসন ছিল, তা কি আমরা কখনও ভাবি বা বলার চেষ্টা করি? রবীন্দ্রনাথ তার কালান্তরে মুসলিম সমাজ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন তাকে কতটুকু অসম্প্রদায়িক কিংবা মানবিক বলা যাবে? সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একদিকে যেমন অর্গল রুদ্ধ করে দেয়া সঙ্গত নয়, অন্যদিকে এর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলোও চোখ বুঝে মেনে নেয়ার মত নয়। মোদ্দাকথা, আমাদের থাকতে হবে একটা ক্রিটিক্যাল মাইন্ড। কলকাতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে পাকিস্তানের শোষক-শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়ার ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। আমরা ভুলে গেছি আমাদের ঐতিহ্য কোথায়? আজ তাই এদেশে একশ্রেণীর বোদ্ধাগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে যারা সম্প্রসারণবাদী ভারতের বাংলাদেশের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের সমালোচনাকে সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে চিহ্নিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। এ দেশের মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর মধ্যে যারা দেশপ্রেমিক, মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে যারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন, তাদেরকে এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বাতিকগ্রস্ত আখ্যা দিতে গ্লানিবোধ করেন না। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বদেশিকতা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে নগণ্যসংখ্যক লেখক, প্রাবন্ধিক, শিল্পী ও কবি কলম ও তুলি ধারণ করেছেন তারা প্রায় সকলেই নিজগৃহে পরবাসী। এদের উপর শত্রুর হামলা হলে তাদেরকে সমর্থন দেয়ার জন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা যে রাজনীতি ধারণ করেন, সেই রাজনীতির যারা বাস্তব চর্চা করেন, তাদের কাছে এই মানুষগুলো কুষ্ঠরোগী তুল্য পরিত্যাজ্য। ভারত ঘেঁষা বুদ্ধিজীবীদের লেখা প্রকাশ করার জন্য ভারতীয় অর্থপুষ্ট কয়েক ডজন সংবাদপত্র ও সাময়িকী রয়েছে। রয়েছে অজস্র প্রকাশনা সংস্থা। এরা ভারতপন্থী দলগুলোর কাছে যে কদর ও সমাদর পায়, তা তুলনা রহিত। তাদের জন্মদিন, তাদের গ্রন্থ প্রকাশনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে স্তব-স্তুতি ও বন্দনার জোয়ার বয়ে যায়, তার এক কানাকড়িও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের কপালে জোটে না। আমি বলতে চাই না, এসব সৎ ও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী ও লেখক বন্দনা ও স্তব-স্তুতির কাঙাল। সত্যিকার বুদ্ধিজীবী বা লেখক তিনিই, যিনি স্রোতের বিপরীতে দাঁড় বাইতে ক্লান্তিবোধ করেন না। তাদের জীবন লড়াকু সৈনিকের। জীবদ্দশায় ইলিয়ড-অডেসী মহাকাব্যের রচয়িতা কবি হোমারের কোন স্বীকৃতি মেলেনি। তাই বলে কি মহাকাল কখনও অস্বীকার করতে পারবে, হোমার ছিলেন এক বিশাল চারণ কবি, হোমারের প্রতিভা ছিল অতুলনীয়? জীবন ধারণের জন্য তিনি গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াতেন। ভিক্ষার অন্নেই তিনি জীবন ধারণ করতেন। জীবদ্দশায় প্রাচুর্য কিংবা ঐশ্বর্য কোন কিছুই তার কপালে জোটেনি। অথচ তার মৃত্যুর পর গ্রীসের সাতটি নগর রাষ্ট্রের প্রত্যেকটিই দাবী করেছিল, হোমার তাদেরই সন্তান। তাদেরই নাগরিক। ইংরেজ কবি লিখেছেন, Seven countries claimed the poet dead. Through which the poet begged his

www.pathagar.com

bread. সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ালে, জীবন ও স্বদেশের পক্ষে দাঁড়ালে, জীবদ্দশায় স্বীকৃতি না পেলে মৃত্যুর পর স্বীকৃতি অবশ্যই মিলবে। এই আত্মবিশ্বাসই মানুষের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ একজন ন্যায়বান শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীকে যোগায় পথ চলার পাথেয়।

ইদানীং দেশে দুই দল বুদ্ধিজীবীর কথা শোনা যায়। একদলকে বলা হয় আওয়ামী বুদ্ধিজীবী, আরেক দল জাতীয়তাবাদী অভিধায় পরিচিতি অর্জন করেছেন। আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা বড্ড সুখে আছেন। কলকাতা, দিল্লী সফর এবং দিল্লীর দাদা বুদ্ধিজীবীদের অনুকূল্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় কল্কে পাওয়ার সুযোগ এঁদেরকে স্বদেশের প্রতি বীতরাগ ও পরদেশের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছে। অন্যদিকে দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী ও লেখকরা সমদর্শনে বিশ্বাসের দাবীদারদের কাছ থেকে পেয়েছেন অবহেলা ও অবজ্ঞা। এ রকমটি চলতে থাকলে দেশপ্রেমের রাজনীতি কখনও দাঁড়াতে পারবে না। আর সাংস্কৃতিক আলোকবর্জিত এ রাজনীতির বীররা বড়জোর মাথামোটা সৈনিকদের মতই রাজনীতিতে 'খড় খালি, খড় খালি' করতে থাকবেন। হ্যাঁ, তারা হয়ত বলবেন, সারাদেশে আমাদের কত বুদ্ধিজীবী, সমর্থক! এই প্রতিকূল অবস্থাতে আমরা সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে জিতি, বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে ডীন নির্বাচনে জিতি– এসব বলে তারা একটা পরিতৃপ্তির ভাব দেখান। কিন্তু রাজনীতি, আদর্শ ও দেশকে ধারন করতে গিয়ে তারা কি কেউ তুলি-কলমের সৈনিকের কাজটি করেছেন? করে থাকলে তার ছাপটি কোথায়? যারা নজরুলের ভাষায় মৌ-লোভী মৌলবী; সেসব মৌলবীরা কিসের আশায়, কিসের নেশায় দলবাজি করছেন, তা উচ্চারণ করে তাদের কাউকে হেয় বা ছোট করার মত স্পর্ধা আমার নেই। সংখ্যাগত শক্তি যেমন প্রয়োজন, গুণগত শক্তির প্রয়োজন ততোধিক। ফরাসী বিপ্লব কস্মিনকালেও সম্ভব হত না, যদি রুশো, ভলতেয়ারের মত বুদ্ধিজীবীরা কলম না চালাতেন। একটি বিশাল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রুশো, ভলতেয়ারের মত সাহসী যোদ্ধারাই লড়াই করতে সক্ষম। বস্তুগত লোভ-লালসা, ঐশ্বর্যের মোহ অথবা উচ্ছিষ্ট ও খুদ-কুঁড়োর লোভে যারা ভিড় করে, তাদেরকে দুর্দিনে, দুঃসময়ে পাওয়া যায় না। তাই বলি, দার্শনিক ডায়োজিনিসের মত Plain living and high thinking চর্চাকারী বুদ্ধিজীবীরাই পারেন দেশটাকে বাঁচাতে। মোহ নয়, বাধার বিন্ধ্যাচলকে অতিক্রম করার কঠিন প্রতিজ্ঞা যাদের আছে, তারাই পারেন দেশটাকে বাঁচাতে। ডায়োজিনিস এমন এক ধরনের জ্ঞানসাধক ছিলেন, যিনি একটা বড়সড় মৃৎপাত্রের মধ্যে থেকে প্রদীপের নিচে জ্ঞানসাধনা করতেন। মৃৎপাত্রটি ছিল একাধারে তাঁর লজ্জা নিবারণের ভূষণ আর অন্যদিকে ছিল শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার আশ্রয়। এদেশের আজ যে অবস্থা তাতে এমন নজির যেসব বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাকারী স্থাপন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তারাই কেবল পারেন দেশটাকে বাঁচাতে। তাই রাজসভার বুদ্ধিজীবী চাই না, চাই জনসভার বুদ্ধিজীবী।

আফতাব আহ্মাদ :

দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য এ জাতির, দুর্ভাগ্য এদেশের। 'বুদ্ধিজীবী' নামক প্রজাতির যে প্রাণী, আমাদের সমাজে আভিজাত্য ও কৌলিণ্যের বাতাবরণে বেড়ে উঠেছে, এরা এদেশ ও জাতির শুধু কলঙ্কই নয়, প্রধানতম শত্রুও বটে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মৌলিক গবেষণা ও জ্ঞানহরণের কাজে নিয়োজিত থাকতে কদাপি দেখে গেছে। প্রাপ্তিযোগের আশায় এবং লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপা লাভের বাসনায় এরা এদের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, বিবেক এবং মনুষ্যত্ব যে কোন কিছু বিকিয়ে দেয়ার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা ছিল এর সাংস্কৃতিক ও উত্তরাধিকারের প্রেক্ষাপট কোন বিদ্যুৎজন সৌকর্যের সঙ্গে রচনা করেননি। চিন্তালোকে এবং মননে আমাদের দৈন্য ঘোচাবার জন্য যে প্রস্তুতি ও চর্চা অপরিহার্য ছিল, সেদিকে নজর দেয়ার ফুরসতও কারও ছিল না। সভাকবি ও সভালেখকরা, কদমবুচি অধ্যাপকরা এবং ভাড়াটে সাংবাদিকরা ক্ষমতায় পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বোল-ভোল ও চাল পাল্টে জাপমালা হাতে নতুন জপমন্ত্র আওড়াতে শুরু করেন এসব হীন, ক্লীব, মানুষ্যরূপী প্রাণীকুল। অনেকে আফসোস করে এদের জন্য হয়তো দুঃখ প্রকাশ করতে চাইবেন, অনেকে

www.pathagar.com

করুণার পাত্র থেকে এসব অসৎ লোকের উদ্দেশে যৎসামান্য বারিসিঞ্চন করতে চাইবেন; কিন্তু আসলে যা এদের প্রাপ্য, তা হচ্ছে– জনগণের ঘৃণা ও ধিক্কারের চাবুক।

একটি সমাজের উপরিকাঠামোতে পরজীবী হিসেবে অবস্থানকারী এসব সমাজ ও জনবিচ্ছিন্ন আত্মমেহনে ব্যতিব্যস্ত আত্মকেন্দ্রিক, সুবিধাভোগী ও সুযোগসন্ধানী মানুষরূপী প্রাণী এ সমাজকে ও মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বহু ছলাকলা ও প্রতারণার কৌশল প্রয়োগে সিদ্ধ হস্ত হয়ে উঠেছে। এ সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট ননী ও মালাই ভক্ষণ করে এই কৃতঘ্ন গোষ্ঠী সমাজটাকে ক্লেদাক্ত ও কলুষিত করে তুলেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসব বর্ণচোরারা মানুষকে নববিধান দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে। এদের বাকচাতুর্যে, এদের শঠতায় মানুষ আবার দিকভ্রান্তির ঘুরপাকে পতিত হয়। এমনি করে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ এই অপশক্তির দুষ্টচক্র আমাদের সকল শ্রেয়বোধ, নৈতিকতা ও গৌরবময় অর্জনকে বিপর্যস্ত করে আমাদেরকে রিক্ত-নিঃস্ব করে রাষ্ট্রঘাতী দুশমনদের কাছে তুলে দিয়েছে।

বহির্দেশের আনুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা এবং গ্রন্থরাজীর সৌজন্যে এরা নিজেদের দিগ্বজ পণ্ডিত হিসেবে সমাজের সামনে হাজির করতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে না।

একমুষ্ঠি খুদ কুঁড়োর জন্য এরা এদের আত্মা, আত্মজা এবং সহধর্মিনীকেও বিকিয়ে দিতে সামান্যতম অপরাধবোধ বা গ্লানিবোধ করে না। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যারা নিত্য আবর্তন করে, নিরবিচ্ছিন্নভাবে বা পালাক্রমে, তাদের মনোরঞ্জনে এরা এদের সর্বস্ব সপে দিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করে। খেসারতটা দিতে হয় সাধারণ মানুষকে, এই অভাগা সমাজকে এবং দুর্ভাগা দেশকে। এরা অষ্টপ্রহর এক অলীক লড়াই জারি রেখেছে– এ লড়াই ছায়ার সঙ্গে লড়াই, এ লড়াই পুতুল নাচের পুতুলের সঙ্গে লড়াই। যবনিকার আড়ালে যে কায়া অবস্থান করে এবং সূত্রধর ষড়যন্ত্র করে, তাকে আড়াল করে রাখাই এদের পরম ধর্ম। সমাজের এই অভিশপ্ত অধঃপতিত, গলিত ও পচা জনগোষ্ঠীকে যদি সমাজদেহ থেকে কর্তন করে চিরস্থায়ীভাবে লীন করা যায়, তাহলে সমাজদেহের নিরাময় অসম্ভব নয়।

আজ বড় দুঃখে একথাগুলো আমাকে বলতে হচ্ছে। আমাদের এখানে আমরা অষ্টপ্রহর শুনতে পাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখার কথা, রকমফের জাতীয়তাবাদের কথা, ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদকে প্রতিহত করার কথা। কিন্তু কার্যত আমাদের এখানে বিরাজ করছে ক্ষমতারোহনের এক উৎকট প্রতিযোগিতা, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভারতকে না চটিয়ে ভারতকে তুষ্ট করে, ভারতের প্রিয়ভাজন হয়ে এবং ভারতের বরাভয় লাভ করে ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করা। এ যেন সিরাজুদ্দৌলার মৃত্যুর পর ক্লাইভের হাত ধরে একবার মীর জাফর আলী খাঁর মসনদে আরোহন, আরেকবার ওই একই ক্লাইভের হাত ধরে জামাতা মীর কাসিমের মসনদে আরোহন। আমাদের দেশে আজ যারা রাজনীতি করছেন, তারা সংস্কৃতির তোয়াক্কা করেন না– বিদ্যা ও জ্ঞান তাদের প্রধান শত্রু। ইতিহাস তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই কালো টাকা, পেশীশক্তি, সন্ত্রাস আর অস্ত্রের ঝনঝনানি তাদের প্রধান অবলম্বন। মননশীলতা এখানে নির্বাসিত। চিন্তাশীলতা এখানে উপেক্ষিত। প্রজ্ঞাবানের শরণাপন্ন হওয়া এখানে চরম ভাঁড়ামির সমতুল্য। আমাদের রাজনীতিকরা সবজান্তা। দেশের মানুষগুলো ঠেকায় পড়েছে– ভাবখানা এই যে, তাদের আর কোন গত্যন্তর নেই। হয় এ দলের ঝাঁপিতে থাকতে হবে, না হয় ওদলের ঝোলাতে নিরাপত্তা খুঁজতে হবে। আমাদের জনগণকে এমনি বোকা ঠাওড়ে তাদের সঙ্গে চলছে চরম তঞ্চকতা। এখানে যাদের অক্ষর জ্ঞান আছে এবং ঐ অক্ষরজ্ঞানের জোরে যারা পুঁথিগত বিদ্যার কলসটি যৎসামান্যও নাড়াচাড়া করতে জানেন, তারা নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী একেক ঘরানার সেবাদাস ও ভৃত্যদের খাতায় নাম লিখিয়ে নিয়েছেন। আশা, ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট হিসেবে কোন প্রাপ্তির কখনও যদি সিঁকা ছেঁড়ে। জাতীয় স্বার্থ, সমাজ ও জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ, মহত্তর কোন অর্জন, রূঢ় বাস্তব সত্যকে উন্মোচন করার দুঃসাহস,

www.pathagar.com

প্রচলিত সংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে দ্রোহ্ করার ঔদ্ধত্য– এসব একমাত্র বোকাদের জীবন দর্শন! এখানকার প্রতিযোগিতা হচ্ছে, কনুই দিয়ে পামরজনকে ধরাশায়ী করে ক্ষমতা দেবের প্রদপ্রান্তে কত দ্রুত সিজদায় নত হওয়া যায়। তাই কালচার এখানে সৃষ্টি বা বা সংস্কৃতি নয়– কালচার মাত্র।

লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে মুক্ত স্বদেশ আমরা অর্জন করেছিলাম, তাকে হানাদার থেকে রক্ষা করার জন্য রাইফেলসের তিন তিনজন বীর সেনানী শাহাদৎ বরণ করলেন। এদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে, কালেমা শাহাদাত পড়ে আমরা কেউ কোন শোক মিছিল বের করিনি। এঁদের মহান আত্মত্যাগে আমাদের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত হয়নি। আমাদের আগামীর জন্য যারা হাসিমুখে তাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করে গেল, সেই মহত্তম তিনটি বীরের জানাজার গায়েবানা নামাজও আমরা আদায় করিনি। আমাদের গণ্ডদেশ বেয়ে এসব বীর সন্তানদের মহান ত্যাগে দু'ফোঁটা চোখের পানিও ঝরেনি। এমনি ক্লীব, কৃতঘ্ন, আত্মসম্বিৎ বিস্মৃত জাতি আমরা। ধিক্ আমাদের অস্তিত্বকে। ধিক্ আমাদের বড় বড় বুলিকে। ধিক্ আমাদের অস্তিত্বকে। যে মানুষ পরিশীলিত জীবন-যাপনের অর্থ বোঝে না, যে মানুষ অর্জিত রুচির কদর্থ করে, যে মানুষ স্নিগ্ধ, সৌম্য জীবনাচারের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত– এক কথায় যে মানুষ সংস্কৃতিবান হওয়া থেকে যোজন যোজন দূরে, সে মানুষের সঙ্গে সতীর্থ হিসেবে যারাই হাতে হাত রাখবে তারা আর যাই হোক কল্যাণের জন্য, মুক্তির জন্য, স্বস্তির জন্য এবং শ্রেয়বোধের জন্য উৎসর্গী হতে পারে না। আমাদের কর্ম, আমাদের ধ্যান, আমাদের জিকির এবং আমাদের মানৎ যদি স্থূল ভোগবাদ, ভ্রষ্টাচার, ব্যভিচার ও অযাচারেই নির্বাণ খোঁজে, তাহলে মানুষের আত্মা, চিত্ত ও চেতনার নামে কোন কিছুর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়ার কথা নয়। এসবের অনুপস্থিতিতে সৃজনী ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়, অন্তর্দৃষ্টি আলো হারিয়ে ফেলে, কর্মস্পৃহা বৈকল্যে পিষ্ট হয়। সমাজ বিপ্লব? হনুজ দুরস্ত।

মানুষকে বাঁচতে হয় তার নিজের জন্য, নিজেকে ক্রমাগতভাবে পুনরুৎপাদন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। কিন্তু স্থূল ভোগবাদ আর ইতর বস্তুবাদ আমাদের সকল সুকুমারবৃত্তির অপমৃত্যু ঘটায়। ফলে সংস্কৃতি আর সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে এক মহাশূন্যতা গ্রাস করে। দানবীয় এই শূন্যতার মুখ গহবর থেকে বেরিয়ে আসে সভ্যতা ও জীবন-সংহারী এমন এক অনিয়ন্ত্রিত অপশক্তি– যা মানুষের সকল অর্জনকে বিনাশ করতে কোন সংশয় বোধ করবে না। এমনি এক গ্রহণের কালে আমরা বসবাস করছি। জানি না, কোন্ মাতৃগর্ভে, কবে সেই সাহসী শিশুটি জন্ম নেবে, যে নিঃসংকোচে সাহস বিস্তৃত বক্ষে মাথা উঁচু করে চোখে চোখ রেখে বলতে পারবে, রাজা তোর কাপড় কোথায়? আসলে সেদিন, নিশ্চয়ই আসবে। আমরা তারই প্রত্যাশায় অপেক্ষায় আছি। মানুষ পরাভব মানতে শেখেনি। পরাজয় কাকে বলে জানে না। বাধাবন্ধনহীন প্রকৃতিকে আয়ত্তে এনে তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে মানুষ যখন প্রকৃতিকেই নিজের ইচ্ছার দাসে পরিণত করতে শিখেছে, তখন মানুষের সৎগুণ ও শ্রেয়বোধের বিরোধী সেবাদাসরূপী যে অপশক্তি তার সৃজনক্ষমতা ও তার স্বাধীনতাকে উপড়ে ফেলতে চায়, তাকে সে নিশ্চয়ই নির্মূল করতে পারবে। আমরা যারা আজও খুদ-কুঁড়োর জন্য আত্মা বিক্রয় করে দেইনি, আমরা যারা আজও মেঘপুঞ্জে আচ্ছাদিত আকাশের দিকে নীল চাদোয়ার সন্ধানে তাকিয়ে আছি– আমরা তো জানি, এ লড়াই যুগের পর যুগ ধরে লড়ে যাওয়ার লড়াই। এ লড়াই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে লড়ে যাওয়ার লড়াই। এ লড়াই অশুভের বিরুদ্ধে, আমাদের আত্মার দৈন্যের বিরুদ্ধে, আমাদের কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, সঞ্জাত যত মানবীয় দুর্বলতা আছে– তার বিরুদ্ধে এক নীরবচ্ছিন্ন লড়াই। কসম সেইসব শহীদদের। কসম রৌমারীর বীর জওয়ানদের, ইনশাল্লাহ, এ লড়াইয়ে আমরা জিতবই।

www.pathagar.com

৩ মে ২০০১

বিডিআর জওয়ানদের বীরত্ব ও সরকারের নতজানু সমর্পণবাদ

মাহবুব উল্লাহ :

আজ সরাসরির এই কলামের মাধ্যমে সর্বাগ্রে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী (বিডিআর)-এর বীর জওয়ান ভাইদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। বিডিআর-এর অসম সাহসী জওয়ান ভাইয়েরা মাতৃভূমির সীমান্ত রক্ষায় ত্যাগের যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার কোন তুলনা হয় না। দেশের জন্য জান কোরবান করা হল সর্বোচ্চ ত্যাগ। সেই ত্যাগ স্বীকার করেছেন রৌমারী সীমান্তে তিন বিডিআর ভাই। আল্লাহ তাদের জান্নাতবাসী করুন। মাতৃভূমিকে রক্ষার শপথ পালন করতে গিয়ে তাঁদের এই ত্যাগ অপার মহিমায় চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মুসলমান হিসেবে আমরা জানি, আমাদের এই পার্থিব জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আমাদের পরকালের জীবন হল অনন্ত, অসীম। আমরা যারা প্রতিনিয়ত ইহকালের জীবনকে মূল্যবান মনে করে অনন্তকালের প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা ভুলে বসে থাকি, তাদের জন্য বিডিআর-এর বীর জওয়ান ভাইদের এই আত্মত্যাগ এক মহান প্রেরণা ও আদর্শের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।

শত্রুর বুলেটের আঘাতে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার মুহূর্তে কারও কাছে তাঁদের কোন প্রত্যাশা ছিল না। তাঁরা কেউ বলে যায়নি, তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের প্রিয় সদস্যদের কিভাবে হেফাজত করতে হবে, কেমন করে হেফাজত করতে হবে। তাঁরা এই আশাও করেননি, তাঁদের এই চরম কোরবানীকে মাত্র এক লাখ টাকায় মূল্যায়ন করা হবে। তাঁদের আত্মত্যাগের কোন মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। পৃথিবীর সব সম্পদ জড় করেও তাদের এই ঋণ কৃতজ্ঞ জাতি কোনদিন পরিশোধ করতে পারবে না। সিলেটের মহাসমাবেশে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির কাছে অঙ্গীকার করেছেন, ক্ষমতায় এলে এই ত্যাগী বীরদের তারা 'বীরশ্রেষ্ঠ'র মর্যাদায় ভূষিত করবেন। তাঁর এই অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণবাদী, আগ্রাসী ভারতীয়দের কাছেও এটা এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তবে ইনকিলাবের কলামে ড. আফতাব আহমাদ তাৎক্ষণিকভাবেই বিডিআর-এর আত্মত্যাগকারী মহান সৈনিকদের সর্বোচ্চ জাতীয় বীরত্বের খেতাব ভূষিত করার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমরা যারা দেশের জন্য কিছুই করতে পারিনি, রক্তদান তো অনেক দূরের কথা,তাদের মত সাধারণ মানুষের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বেগম খালেদা জিয়া যে ঘোষণা দিলেন, তার জন্য আমরা তাকে জানাই অসংখ্য সাধুবাদ।

এ দেশের মানুষ সংগ্রাম ও বীরত্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অনেক বীরত্বগাথা সংযোজিত করে গেছেন। বাংলার বার ভূঁইয়ারা, সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, শহীদ সিরাজুদ্দৌলা, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের লড়াকু সৈনিকরা, তিতুমীরের বাঁশের কিল্লার সাহসী যোদ্ধারা, ফরায়েজী আন্দোলনের বীর সৈনিকরাসহ এ দেশের অগণিত বীরযোদ্ধা মাটি ও মানুষের সম্ভ্রম ও ইজ্জত রক্ষার জন্য যুগে যুগে কালে কালে শহীদী মৃত্যুর অমৃত সুধা পান করেছেন। তাদেরই পথ ধরে আত্মাহুতি দিলেন আমাদের তিন বীর সেনানী। দেশকে ভালোবাসার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে। আজ অজানা রহস্যের কুজ্ঝটিকা ছিন্ন করে ক্রমাগতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাঁর হত্যার পেছনে ব্রাহ্মণ্যবাদী

www.pathagar.com

ভারতের কুটিল চক্রান্ত ছিল। যারা নিজেদের শহীদ জিয়ার অনুসারী বলে মনে করেন, তাদের প্রত্যেককে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—Eternal vigilence is the price of liberty. এটা আমাদের জন্য অপরিসীম আনন্দ, গর্ব ও গৌরবের বিষয় যে, রাতের নিদ্রাকে হারাম করে বিডিআর-এর ভাইয়েরা জীবন দিয়ে রৌমারীর মাটিকে হানাদারমুক্ত রেখেছেন। নগণ্যসংখ্যক সাথীকে নিয়ে তিনশ' বিএসএফ'র আগ্রাসী বাহিনীকে তারা হটিয়ে দিয়েছেন। বিএসএফ'র আগ্রাসীরা তাদের ষোল জন সাথীকে মৃত অবস্থায় ফেলে গিয়ে প্রমাণ করল, ন্যায় তাদের পক্ষে ছিল না। কোন নৈতিক বলে তারা বলীয়ান ছিল না।

ইসলামের প্রথম যুগে এমনিভাবে স্বল্পসংখ্যক বীর মুজাহিদ শত সহস্র অবিশ্বাসীদের হিংস্র আক্রমণকে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের বিডিআর ভাইয়েরা প্রমাণ করলেন, বদরের যুদ্ধ, ওহুদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধসহ অজস্র যুদ্ধের ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীদের মতই ঈমানী শক্তি তাদেরকে বিপুল সংখ্যক শত্রুসৈন্যের বর্বরোচিত ও কাপুরষোচিত হামলাকে নাস্তাবুদ করে দিতে সাহস যুগিয়েছে। ঈমানদারদের জন্য এ যে এক মূল্যবান শিক্ষা এবং অন্যদিকে যাদের ঈমান নেই, তারা যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না, রৌমারীর ঘটনা আমাদের আরেকবার সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিল। পৃথিবীর যে কোন জাতি, তা যতই ক্ষুদ্র হোক, তারা যদি স্বাধীন থাকতে চায়, তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাষ্ট্রও তাদের পদানত করতে পারে না। সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে ভিয়েতনামের মাটিতে মহাশক্তিধর আমেরিকাকে পরাজিত করে ভিয়েতনামীরা সেই দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছে। ক্ষুদ্র চেচনিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে একই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশের প্রতিটি সীমান্তে শত্রুর আজ শত্রুর নারকীয় উল্লাস। তারা মনে করে, অস্ত্রের শক্তিতে কিংবা জনবল দিয়ে আমাদের কাবু করে ফেলবে। কিন্তু তা যে কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না, সে কথা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন বিডিআর-এর জওয়ান ভাইয়েরা। ভারত ও বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। কিন্তু ভারত বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র। প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীর দৈনন্দিন জীবনে কিছু সমস্যা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রতিবেশী হিসেবে ভারত পৃথিবীর অন্য যেকোন প্রতিবেশীর চাইতে চরিত্রগতভাবে একান্তই পৃথক। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বহমান ৫৪টি নদীর পানি প্রবাহ পরিবর্তিত করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী পরিবেশগত যুদ্ধ চালাচ্ছে। ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতাকে দীর্ঘকাল ধরে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। ভারত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করছে এবং সীমান্তের নোম্যান্স ল্যান্ডে বেআইনীভাবে সড়ক নির্মাণ করছে। দেড় কোটি বাংলাভাষী মানুষকে বাংলাদেশী নাগরিক সাব্যস্ত করে পুশইনের অপতৎপরতা চালাচ্ছে। 'স্বাধীন বঙ্গভূমিওয়ালা'দের আশ্রয়, মদদ ও উস্কানি দিয়ে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র 'বঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠা করতে দেশদ্রোহীদের মদদ দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামকে কব্জা করার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার নামে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে। বাংলাদেশের ভেতরে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহীদের ঘাঁটি রয়েছে– এই অবাস্তব অভিযোগ অহরহ উত্থাপন করছে। এসব কিছুর উদ্দেশ্য হল, বাংলাদেশকে নতজানু করা। বাংলাদেশকে সিকিম ও ভুটানের স্তরে নামিয়ে আনা। ভারত যে বাংলাদেশের পৃথক ও সার্বভৌম অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেনি, তার পক্ষে অজস্র দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একদল কুচক্রী ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট একাত্তরের যুদ্ধের সুযোগে বাংলাদেশকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার দাবী তুলেছিল। ইন্দিরা গান্ধী জানতেন, বাংলাদেশের মানুষ কী ধাতুতে গড়া। নিশ্চিহ্ন

www.pathagar.com

হয়ে যাবে, তবু এই জাতি পরাভব মেনে নেবে না, সেই বাস্তবতাবোধ ইন্দিরার ছিল বলে সেই মুহূর্তে ইন্দিরা এসব অত্যুৎসাহীদের কথায় বিভ্রান্ত হননি। একাত্তরের ঘটনাকে তারা যেমনি হাজার বছরের মধ্যে একটি দুর্লভ সুযোগ হিসেবে লুফে নিয়েছিলে, ঠিক তেমনি আরেকটি দুর্লভ সুযোগের অপেক্ষায় তারা অপেক্ষা করছে মাত্র। ইন্দিরার সেদিনকার বাস্তবতাবোধকে মহানুভবতা ভেবে ভুল করলে চলবে না। যেসব কুশীলরেরা প্রতিবেশীদের ব্যাপারে সাউথ ব্লকে বসে ভারতের নীতি নির্ধারণ করেন, তারা কখনও তাদের এই গোপন এজেন্ডাটিকে পরিহার করেননি। এই কারণেই তারা মনোযোগ দিয়েছেন বাংলাদেশীদের মগজ ধোলাই অভিযানে। তাদের এই অভিযানে বিশ্বস্ত মিত্র হচ্ছেন এদেশেরই মাটি, এদেশেরই জলবায়ুতে লালিত-পালিত একশ্রেণীর আত্মঘাতী বুদ্ধিজীবী, যারা কোমর বেঁধে বৃহৎ ভারতের বন্দনা-নন্দনা করতে কোন সুযোগকেই হাতছাড়া করেন না। তাই এবারের সীমান্ত সংকটকে কেন্দ্র করে যা কিছু ঘটে গেল, তার নিন্দা তো দূরের কথা বরং ভারতীয়দের পক্ষে সাফাই গাইতেও তারা গ্লানিবোধ করেন না। ধিক এইসব পরান্নলোভী, পরাশ্রয়ী, পরগাছা বুদ্ধিজীবীদের। কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘটলো কী? গত কয় দিনে যা কিছু ঘটেছে, তাতে তো রাজপথে লাখ লাখ মানুষের মিছিলের ঢেউ আছড়ে পড়তে পারত। অতীতে এমনটি হয়নি তাও নয়।

১৯৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধের কথা আজও আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেদিন ঢাকার রাজপথে লক্ষ জনতার মিছিল নেমেছিল। একদিকে ছিল ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনি, অন্যদিকে ছিল আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে মিত্র রাষ্ট্র গণচীন ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতি অকুণ্ঠ অভিনন্দন ধ্বনি। এই জাতি কি ভারতীয় আফিম সেবন করেছে যে, প্রবল প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ফেটে পড়তে পারছে না? দৈনন্দিন জীবনের ঘানি টানতে গিয়ে আমরা কি এতোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, দেশের মাটির প্রতি আমরা আমাদের কোন দায়িত্বই পালন করব না? আর যা কিছু করব, সবই দায়সারা গোছের? শুধু লোক দেখানোর জন্য এবং রাজনীতিতে নিজেদের ভারতবিরোধী সার্টিফিকেটটা বহাল রাখার জন্য?

সময় দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। দিনে দিনে ভারতীয় শাসক মহল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একের এক এক অভিযোগ উত্থাপন করছে। কেউ বলছে, তাদের জওয়ানদের লাশ ক্ষতবিক্ষত করার অমানবিক আচরণের জন্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা ঠুকে দেবে। কেউ বলছে, বাংলাদেশকে ক্ষমা চাইতে হবে। আবার কেউ বলছে, বিডিআরের হেডকোয়ার্টারে বোমা নিক্ষেপ করে গুঁড়িয়ে দেয়া হোক। এর পাশাপাশি সীমান্তের সর্বত্র চলছে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি। আর কেউ কেউ এক অদ্ভুত থিওরি আবিষ্কার করেছেন। যার মূল কথা হল, বিডিআর যা করেছে, তা রাজনৈতিক নির্দেশে করেনি, করেছে নিজ দায়িত্বে। কথাটা হল, বিডিআর কোথা থেকে নির্দেশ পেল, সেটা কোনক্রমেই মুখ্য বিষয় নয়। এটাচমেন্ট প্যারেডের সময় পবিত্র কোরান ছুয়ে বিডিআর শপথ নিয়েছিল, সীমান্ত প্রহরীর পবিত্র দায়িত্ব পালনের। সে দায়িত্ব তারা পালন করছে কিনা, কেবল সেই বিষয়টিই বিবেচিত হতে পারে। মাঠ পর্যায়ে বাংলাদেশের সীমান্ত লংঘনের মত ঘটনায় তারা কালক্ষেপণ করবে এবং ঢাকার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে, একথা মনে করা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অন্যায়। ভারতীয় বিএসএফ গত ৩০ বছরে ৪২৫ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে। বাংলাদেশী নাগরিকদের ক্ষেতের ফসল, গবাদি পশু ও মূল্যবান সামগ্রী লুণ্ঠন করেছে। বাংলাদেশী মা-বোনদের সম্ভ্রমহানি ঘটিয়েছে। তালপট্টি, মুহুরীর চর, পার্বত্য চট্টগ্রামসমহ বিভিন্ন সীমান্তে বাংলাদেশের ভূমি দখল করে আছে। এসব অপকর্মের জন্য কি তারা দিল্লী থেকে অনুমোদন নিয়েছিল? আমাদের বিডিআর যদি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনুমোদন না নিয়ে অপরাধ করে থাকে, তাহলে তাদের বিএসএফও কি একই অপরাধে অপরাধী নয়? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম সুযোগেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সাথে

www.pathagar.com

সীমান্ত সংকট নিয়ে আধাঘন্টার কথা বললেন, দুঃখপ্রকাশ করলেন। সীমান্তে সদ্ভাব রক্ষা করার কথা দিলেন। আরও কথা দিলেন, তদন্ত করে দেখা হবে, রৌমারীতে কি করে ঘটনাটি ঘটল। দুঃখ প্রকাশ কেন? বাংলাদেশের বিডিআর কি অপরাধ করেছে? তদন্ত কেন? বিডিআরের কেউ কি বাহিনীর শৃংখলা ভঙ্গ করেছে? এভাবে নতজানু হওয়া কেন? বাজপেয়ী কি বিনিময়ে একই ধরনের কোন আশ্বাস দিয়েছেন? দেশবাসী এসবের বিচার করবে। সর্বশেষ ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল আহসান নাজমুল আমিন চৌধুরী, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমান্ডার মেজর জেনারেল ওয়াহাব, রংপুরের বিভাগীয় কমান্ডার মেজর জেনারেল মতিন, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমান্ডার মেজর জেনারেল কবির এবং বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ফজলুর রহমানকে দায়ী করে এক অলীক ষড়যন্ত্রের কাহিনী ফেঁদে বসেছে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কমান্ডাররা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে কোন পরামর্শ করে থাকলে তার জন্য কি ভারতীয়দের অনুমোদন নিতে হবে? এ তো স্বাধীনতার নামে পরাধীনতারই নামান্তর। আমাদের সেনা কমান্ডারদের বিরুদ্ধে এই কুৎসিত তথ্য সন্ত্রাস কেন চালানো হচ্ছে? জাতীয় সংকটকালে সব দেশেরই একটি সাধারণ নিয়ম হল, সংকট সম্পর্কে দলমতনির্বিশেষে আলোচনা করার জন্য সংসদের জরুরী অধিবেশন ডাকা। সংসদের অধিবেশনে আলোচনার পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হয়। ভিনদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় অঙ্গীকারের প্রত্যয় ঘোষিত হয়। বাংলাদেশে এখন সংসদ অচল। কিন্তু সরকারী দল সংসদ অচল থাকার জন্য প্রতি মুহূর্তে বিরোধী দলকে দায়ী করছে। তারা যদি গণতন্ত্রের প্রতি সত্যিই শ্রদ্ধাশীল হতেন এবং জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপসহীন হতেন, তাহলে এবার তাদের এজন্য একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, শুধু এই সর্বোচ্চ জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আলোচনার জন্য বিরোধী দলকে সংসদে আনার। শুধু তোয়াজ-তাঁবেদারী করে ক্ষমতায় যাওয়ার ও ক্ষমতায় থাকার অশুভ উদ্দেশ্য না থাকলে এই বিশাল রাজনৈতিক সুযোগটি কেন হাতছাড়া করল শাসক দল, তা বোঝা কঠিন।

আফতাব আহমাদ :

দুঃখ ও বেদনায় আমার মনটি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি স্বদেশভূমির অস্তিত্ব নিয়ে শকুনের দল খাবলাখাবলি করার জন্য কি চেষ্টাই না করছে। বাংলাদেশের সীমান্তের চারদিকে আজ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ছত্রছায়া হিসেবে ভারতীয় আগ্রাসী ফৌজ পূর্ণাঙ্গ রণপ্রস্তুতি নিয়ে হামলা করার জন্য অপেক্ষা করেছে। যে কোন সময়ে বাংলাদেশের ভেতরে ভারতীয় সৈন্যরা ঢুকে পড়ে সীমান্ত জেলার গুরুত্বপূর্ণ রণনৈতিক অবস্থানগুলো দখল করে নিতে পারে। অথচ দেশের ভেতরে ধিক্কার, প্রতিবাদ জ্ঞাপনের ন্যূনতম কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। দিল্লীতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পুড়িয়ে ফেলেছে। ভারতীয় আগ্রাসনের সমর্থনে দিল্লীতে অবস্থিত আমাদের হাইকমিশনের সামনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও ধস্তাধস্তি হয়েছে। অথচ এই বাংলাদেশে, এই রাজধানী ঢাকায় অদৃশ্য এক দুর্নিবার শক্তির নির্দেশে সবকিছু কেমন সুনসান হয়ে আছে। ভাবখানা এই, কোথাও কিছু ঘটেনি।

সিলেটের প্রতাপপুর সীমান্তে বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূখণ্ড পাদুয়া বিজয় এবং রৌমারী সীমান্তে বড়াইবাড়ী রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের রাইফেলসের অফিসার ও জওয়ানরা বীরত্বের ও সাহসিকতার যে অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছিলেন তা আজ সারা জাতির গর্বের বিষয়। কিন্তু যে মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে একদিকে পাদুয়া আমরা পুনরুদ্ধার করেছিলাম আরেকদিকে আগ্রাসী হামলা প্রতিহিত করেছিলাম, তা অকল্পনীয়ভাবে সরকারের নতজানু সমর্পণবাদী সিদ্ধান্তের কারণে নিমিষেই ম্লান হয়ে গেছে। আমাদের স্বনামধন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাজী

www.pathagar.com

নাসিমকে যখন বড় গলায় বরতে শুনলাম, 'বাপের বেটি হাসিনা ভারতীয় আগ্রাসীদের দেখিয়ে দিয়েছেন, গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছিল'। কিন্তু, এ ছিল এক ক্ষণস্থায়ী সুখোচ্ছাস। আত্মাহারা মন স্থিত না হতেই দেখি, তলপেটের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে রূপোর থালায় করে পাদুয়া গ্রামটি ভারতীয়দের হাতে তুলে দেয়া হল। শুধু তাই নয়, এরপর দেখলাম, প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলের কাছে ফোন করে রীতিমতো মার্জনা ভিক্ষা করেছেন। হায় শেখ মুজিবুর রহমান! আপনি আজ বেঁচে নেই, আপনার কন্যা আজ এদেশের প্রধানমন্ত্রী। অথচ আপনার ঐতিহ্য তিনি সমুন্নত রাখতে পারলেন না। এই কি ছিল তাঁর নিয়তি? এই কি এদেশের নিয়তি? আর শেখ হাসিনাকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী? আমরা যারা এদেশে বসবাস করছি, আমরা যারা স্বদেশের মুক্তির জন্য অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিলাম, আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত, আমরা যারা স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি, আমরা যারা সাচ্চা জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক, আমরা যারা ইসলাম কবুল করে ঈমান এনেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে আমরা যারা মাথানত করবো না, আমরা যারা আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের শেকড় উপড়ে ফেলার কসম খেয়েছি–দেশ, জাতি ও জনগণের এই দুর্দিনে আমরা কে কী করতে পেরেছি? দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি যখন চরম হুমকির মুখে, দেশের সীমান্তের সর্বত্র যখন ভারতীয় হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার জন্য ওঁতপেতে বসে আছে, যখন আমাদের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় মানমর্যাদা সংরক্ষণের জন্য দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তোলার কথা, তখন শুধু নিঃশব্দতা আর নীরবতা সারাদেশকে কাফনে মুড়িয়ে দিয়েছে।

একবার ভেবেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানের স্পন্দিত হৃদয় রক্তকে টগবগ করে প্রণোদিত করবে দেশের সকল মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আকুল আহবান করতে। কিন্তু, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, নোংরা রাজনীতি আর ক্ষমতার তখতের প্রতি তাঁর যে মোহবিষ্ট অবস্থা, তাতে তিনি কিছুই করলেন না। বিরোধী দলগুলো টানা ৭২ ঘণ্টা হরতাল ডেকে বসেছিল। জাতীয় এই মহাসংকটে আমি ভেবেছিলাম বিরোধী দলগুলো তাদের পূর্ব ঘোষিত সমস্ত কর্মসূচী স্থগিত করে উদাত্ত আহবান জানাবেন মহামান্য প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, যাতে সবকিছু বাদ দিয়ে দেশ ও জাতির এই মহাসংকটে একটি জাতীয় মহাসম্মেলনে একত্রিত হয়ে কী করে বিশ্বজনমত, বিশ্বসভা এবং দেশের মানুষকে একসাথে নিয়ে ভারতের হীনষড়যন্ত্র ও আগ্রাসী চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেখা যায়। আমার এ আশাও পূর্ণ হয়নি। কারণ, এসব নিয়ে ভাববার সময় কারও নেই। আমরা কী নিয়ে ভাববো? সীমান্তে যা কিছুই ঘটুক না কেন, দায়সারাগোছের বিবৃতি দিয়ে ও প্রতিবাদ করে সরকারের নতজানু ও সমর্পণবাদী নীতির সমালোচনা করে সরকারের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার অপেক্ষায়ই শুধু থাকবো। রাজনীতি করলে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিশ্চয়ই কেউ বাস্তবায়ন করতে যান না–রাজনীতির একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে–রাষ্ট্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ, জাতি ও জনগণের উন্নয়ন ও ভাগ্য রূপান্তরের কাযক্রম বাস্তবায়ন করা। কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য যে; দেশটাই যদি না থাকে, তাহলে কিসের ক্ষমতা, আর কিসের কর্মসূচী?

রোমান সাম্রাজ্যের পতনকালে রোমান সম্রাট নিরো সম্পর্কে ইতিহাসে বলা আছে, রোম যখন পুড়েছিল, নিরো নাকি তখন বাঁশি বাজাচ্ছিল। আমাদের এখানে কেউ বাঁশী বাজাচ্ছেন কি-না জানি না, তবে অতি স্বাভাবিকতার ভাব দেখিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে সবাই একই কাজ করছেন। এই উদাসীনতা, এই অনাগ্রহ, এই অনুৎসাহ আমাদের জাতীয় জীবনের চরম দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশের এ শ্রেণীর রেজিস্টার্ড বিবৃতিজীবী যখন তখন স্বাধীনতা রক্ষার নামে প্রতিটি ঝোপের আড়ালে 'মৌলবাদ' খোঁজার নামে ভারতকে তুষ্ট রাখতে যারা সদাসচেষ্ট বলে অভিযোগ করা হয়, তাদের সামনেও তাদের সেই অপবাদ ঘোচাবার এ ছিল

www.pathagar.com

সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু, সেবাদাসরা তো সেবাদাসই। যে রাইফেলস আমাদের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার জন্য, আমাদের ভূখণ্ডকে হেফাজত করার জন্য জীবনকে বাজী রেখে সাফল্যের সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করেছে, সেই রাইফেলসের বীর অফিসার ও জওয়ানদের ভারতীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার পাঁয়তারা চলছে।

ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ও তার সরকারকে বেকসুর ঘোষণা করে বাংলাদেশ রাইফেলসকে টার্গেট করেছে। শুধু তাই নয়, রাইফেলসের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে রাইফেলসের বিরুদ্ধে নরহত্যার অপবাদ রুজু করে রাইফেলসের মহাপরিচালকের কোর্ট মার্শাল পর্যন্ত দাবী করছে। ভারতীয় আবদার এখানেই থেমে নেই। তাদের হানাদার সৈন্যদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য বাংলাদেশের কাছে তারা ক্ষতিপূরণও দাবী করছে। আজ অধঃপতিত এই সরকার ভারতের এসব অন্যায়, অবৈধ আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী ও আগ্রাসী, উদ্দেশ্যপ্রাণোদিত, অবমাননাকর দাবীর প্রশ্নে প্রতিবাদ করাতো দূরের কথা, কুঁকড়ে মুকড়ে ঘটনা তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে অটলের পদপ্রান্তে মাথা ঠুকছে। চমৎকার। হাজী নাসিম, আপনার নেত্রী সম্পর্কে আপনি যথার্থই বলেছেন। ভারতবেষ্টিত বাংলাদেশে আমাদের কোন সরকার বা সরকার প্রধান যদি কোন দুর্বলতার কারণে কোন জাতীয় সংকটে এমনি একটি নাজুক পরিস্থিতিতে পড়ে, তাহলে আমাদের সকলের কর্তব্য কী? যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান সময়ে আমরা কি জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে এ ধরনের সংকটকে মোকাবেলা করবো না?

বাংলাদেশে আজ সবকিছুই বিতর্কিত। রাজনৈতিক দলগুলো থেকে শুরু করে আমলা, ব্যবসায়ী, ছাত্ররাজনীতির নামে একশ্রেণীর মাস্তান–সকলে এক অকল্পনীয় কানামাছি খেলায় ব্যতিব্যস্ত। কোথাও ভরসা করার কাউকে মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না। এমনি অবস্থায় যে মানুষটি এখনও আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ন রেখেছেন, তিনি হচ্ছেন মহামান্য প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। জাতির বিবেক হিসেবে এই সেদিনও তিনি যা উচ্চারণ করেছেন, তা সকল মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। মহামান্য প্রেসিডেন্ট, জাতির এই ঘোর দুর্দিনে ভারতীয় আগ্রাসনকে মোকাবিলার জন্য জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য আপনি অবিলম্বে এক জাতীয় মহাসম্মেলন আহবান করুন। সেই সঙ্গে ঐ মহাসম্মেলনে জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিশন গঠন করার বিষয়টি সংবিধানে যাতে অন্তর্ভূক্ত করা যায়, তাও বিবেচনার জন্য পেশ করুন। লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত আমাদের প্রিয় স্বদেশ ভূমিকে আমরা কোন ক্রমেই অপমানিত ও পরাভূত হতে দেখতে চাই না।

www.pathagar.com

১৭মে ২০০০

ভারত তোষণ ও ক্ষমতার মসনদ

মাহবুব উল্লাহ :

'শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভাল', প্রবচনের মত এই উক্তিটি গণচীনের পরলোকগত নেতা মাও জে ডংয়ের। ব্যক্তি বা সমাজজীবনে আমরা যদি সঠিক পথে চলি, তাহলে যারা সঠিক পথের অনুসারী নন, তাদের কাছ থেকেই আমরা নানা বাধা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই। যে কোন ন্যায়বান, নীতিবান, সত্যাশ্রয়ী মানুষ তার জীবনে এমনিতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। নবী-পয়গম্বরদেরও সত্যের বাণী প্রচার করতে গিয়ে খোদাদ্রোহীদের দ্বারা এমনিভাবে বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর প্রতিপক্ষ ছিল নমরূদ। হযরত মূসা কলিমুল্লাহ ফেরাউনের হাতে আক্রান্ত হয়ে নীলনদ পাড়ি দিয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত একজন শান্তিবাদী নবীকেও শত্রুর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সাঃ) বহুবার কাফেরদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। কেউ সঠিক পথে চলছে কি-না, তা বুঝতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে ভুল পথের অনুসারীরা, মানুষের অকল্যাণকামীরা, জনগণের শত্রুরা তাকে আক্রমণ করছে কি-না। যদি আক্রমণ না করে তাহলে বুঝতে হবে, অনুসৃত মত ও পথে কোথাও না কোথাও ভুলভ্রান্তি রয়েছে। ঠিক একই কারণে কমিউনিস্ট নেতা মাও জে ডংও বলেছেন, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভাল। কেউ আক্রান্ত হলে তার সমূহ ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনাটি প্রমাণ করে, শত্রুপক্ষের ঠিক বিপরীত মেরুতেই অবস্থানের ফলে তিনি আক্রমণের শিকার। জাতীয়তাবাদ যে কোন স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের মৌলভিত্তি। জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ না থাকলে জাতি বা জাতিরাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না।

পশ্চিমা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অনেকেই মনে করেন, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য তার বাস্তব অথবা কল্পিত কিংবা কথিত শত্রু থাকা প্রয়োজন। এই শত্রু হতে পারে আদর্শগত, ভূখণ্ডগত, ভিন্ন জাতিগত কিংবা ভিন্ন জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক বা নিরাপত্তা স্বার্থজনিত। গত সংখ্যায় আমরা ঠাণ্ডাযুদ্ধ বা Cold war বা স্নায়ুযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় থেকে সভিয়েত ইউনিয়নের পতন পর্যন্ত সময়টাকে যদি আমরা বিশ্বব্যাপী ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত করি, তাহলে দেখবো-এই দ্বন্দ্বের একটা আদর্শগত দিক ছিল। পশ্চিমা বিশ্ব বা তথাকথিত ফ্রি ওয়ার্ল্ডের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবী করত, তারা মানবাধিকার, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তা। কমিউনিস্ট শিবিরকে তারা আয়রন কার্টেন (লৌহযবনিকা) ও বংশযবনিকা (Bamboo curtain) নামে অভিহিত করত। সোভিয়েত রাশিয়াকে বলা হত লৌহযবনিকা আর চীনকে বলা হত বংশযবনিকা। আমেরিকানদের দৃষ্টিতে এসব দেশে ব্যক্তির কোন স্বাধীনতা ছিল না। এই রাষ্ট্রগুলোকে বিরাট শ্রমশিবিরের সঙ্গে তুলনা করা হত। যেখানে শৃংখলিত মানুষ বন্দী দাসদের মত শুধু কাজ করো আর কাজ করে; তাদের নেই কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা। মানুষ যে কেবল সামান্য খাদ্যসামগ্রী নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারে না, সেজন্য বলা হত, Man does not live by bread alone কেবলমাত্র রুটি খেয়েই একজন মানুষ বাঁচতে পারে না। অন্যদিকে কমিউনিষ্ট শিবিরের পক্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পুঁজিবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে বক্তব্য ছিল, পাশ্চাত্য দীর্ঘকাল এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার জনগণকে উপনিবেশবাদের শৃংখল বন্দী করে রেখেছে। তারা এসব দেশকে আবারও নব্য উপনিবেশবাদের জোয়ালে আবদ্ধ করতে চাইছে। তাদের মুখে স্বাধীনতা ও মুক্তির কথা শোভা পায় না। সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বে যুদ্ধোম্মাদনা সৃষ্টি করে অস্ত্র বিক্রি করতে চায়। তারা হল অস্ত্র ও গোলাবারুদের কারবারী। তৃতীয় বিশ্বকে লুটেপুটে ফোকলা করে ফেলাটাই হচ্ছে

www.pathagar.com

তাদের আসল মতলব। সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, উভয় শিবিরের পক্ষ থেকেই নিজ নিজ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে যৌক্তিকতা প্রদানের জন্য প্রয়োজন ছিল একটা আদর্শগত ভিত্তি। এই আদর্শগত ভিত্তির উপরেই নির্ভর করে বিশ্ব জনমতকে উভয় শিবির প্রভাবিত করতে চেয়েছে। কিন্তু একটু নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, নীতি বা আদর্শের নামে যাই বলা বা করা হোক না কেন, এর মূলে ছিল মৌলিক রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থ।

কিছুদিন আগে সকাল বেলা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে আমরা দেখতে পেলাম এক অবাক করা খবর। দীর্ঘ তিরিশ বছর পর সিলেট সীমান্তের পাদুয়া গ্রামটি বাংলাদেশ ভারতীয় দখলমুক্ত করেছে। গ্রামটিকে দখলমুক্ত করতে গিয়ে কোন পক্ষে ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সিলেট সীমান্তে পাদুয়া নামে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রামটি বাংলাদেশের এবং ভারত তা বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে দখল করে আছে, এরকম কোন তথ্য বা সংবাদ দেশবাসীর অনেকেরই অজানা ছিল। আমরা আরও জানলাম, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গ্রামটি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অন্যতম ঘাঁটি ছিল। দেশবাসী কস্মিনকালেও ভাবতে পারেনি আওয়ামী লীগ সরকার যে সময় দেশের ক্ষমতায় ঠিক সে সময়ে এমনি একটি ঘটনা ঘটতে পারে। তাই অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এটা সাজানো নাটক নয় তো? সামনে নির্বাচন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বরাবরই একটা ভারতকেন্দ্রিক বিতর্ক চলে আসছে। এখানে কোন দল যেমন ভারতপন্থী হিসেবে বিবেচিত হয়, আবার কোন দল ভারত বিরোধী হিসেবেও বিবেচিত হয়। তবে ভারতপন্থী হবার অপবাদ যে দলের কপালে জোটে সে দলকে এদেশের মানুষ খুব কমই আস্থায় নিতে পারে। আর সে কারণেই আসন্ন জাতীয় সংসদে নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ তার নিজের জন্য একটা ভারত বিরোধী ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চাইছে। এরকম প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠেছিল।

বিশেষ করে, '৯৬-এর নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ যেসব কৌশল অবলম্বন করে, তার মধ্যে দুটি প্রধান কৌশলী ছিল– ভারতপন্থী অপবাদ ঘোচানো এবং ইসলামের প্রতি বৈরিতার বা অবহেলার অপবাদও ঘোচানো। আমরা সে সময় লক্ষ্য করেছিলাম, শেখ হাসিনা হঠাৎ দিল্লী সফর করে এসে সাংবাদিকদের বললেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ২৫ বছর মেয়াদী ভারত-বাংলাদেশ 'বন্ধুত্ব ও মৈত্রীচুক্তি' যা এদেশের জনগণ ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি হিসেবেই মনে করে, সেই চুক্তি নবায়ন করা হবে না। প্রাথমিকভাবে এই বিবৃতি তার নিজ দলের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার অন্যতম উপদেষ্টা জনাব এসএমএএস কিবরিয়া সংবাদসূত্রগুলোকে বিভ্রান্তিকর বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি তার অবস্থান নেত্রীর সঙ্গে আলাপ করে পাল্টে ফেলেন। '৯৬-এর নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারে নেমে শেখ হাসিনা হেজাব পরেছিলেন। জায়নামাজে বসে তিনি আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছেন– এরকম একটি পোস্টারও দেশের আনাচে-কানাচে সেঁটে দেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য– মানুষকে বলা, দেখ শেখ হাসিনা কত ধার্মিক এবং ইসলামের কত বড় দরদি। এর আগে খালেদা সরকারবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর মত দলকে মিত্র হিসেবে পাওয়ায় এই পোস্টার মানুষকে যে কিছু বিভ্রান্ত করেনি– এমন কথা হলফ করে বলা যাবে না। তারপর আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় গেল তখন আমরা দেখতে পেলাম, ২৫ বছরের গোলামী চুক্তির চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক চুক্তি আওয়ামী লীগ সম্পাদন করল।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি দেশের এককেন্দ্রিক সংবিধান ও পার্বত্য এলাকার ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করে; তিরিশ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি চুক্তি হলো, যে চুক্তিতে ছিল না কোন গ্যারান্টি ক্লজ। ঢাকা-কলিকাতা বাস সার্ভিস চালু হল। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে দুদেশের মধ্যে রেল সার্ভিসেরও ব্যবস্থা করা। উপ-আঞ্চলিক জোট ও গ্রোথ ট্রায়াঙ্গালের মাহাত্ম্য প্রচার করা হল, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন বাজার সৃষ্টি। চট্টগ্রাম বন্দরকে ভারতীয়দের বিশেষ সুবিধায় ছেড়ে দেয়ার আর্থিক সুবিধাবলীর কথাও বলা হল। আমরা শুনলাম, ট্রানজিট করিডরের কথা। ভারত থেকে সমরাস্ত্র আমদানীসহ ভারত ও বাংলাদেশের দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে

www.pathagar.com

অভিন্ন সূত্রে গেঁথে ফেলারও আয়োজন করা হল। কিন্তু সব এজেন্ডা তো একহাতে কলমের এক খোঁচায় কার্যকরী করা সম্ভব নয়। সেজন্য আওয়ামী লীগকে অবশ্যই পরবর্তী টার্মের জন্য আবারও ক্ষমতায় আসতে হবে। সাউথ ব্লকের কুশীলদেরও সম্ভবতঃ তাই ইচ্ছা। আর সেই হিসাব যদি কোন কারণে এদিক-ওদিক হয়ে যায় তাহলে এমন কোন গোষ্ঠিকে ক্ষমতায় আনা, যারা নামে হয়ত আওয়ামী হবে না কিন্তু কাজে আওয়ামীদের মতই পারপাজ সার্ভ করবে। সাউথ ব্লকের হয়ত নানা অপশন থাকতে পারে। পাদুয়ার ঘটনাটি সে অপশনকে সামনে রেখেই ঘটানো হচ্ছে বলে কেউ কেউ মনে করতে পারেন। কিন্তু বিধি বাম। কথায় বলে, ম্যান প্রোপোজেস গড ডিজপোজেজ। পাদুয়া বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূখণ্ডের অংশ হওয়া সত্ত্বেও এর ওপর থেকে ভারতীয়দের অপদখল চলে যাবে–এমনটি ভারতের শক্তিশালী লবিগুলো মেনে নিতে পারেনি। তাই ভারতীয় সূত্রমতেই জানা যায়, রৌমারী অপারেশনটি ভারতের পক্ষ থেকে সুপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে।

ভারতীয়দের এই সুপরিকল্পিত অপারেশনটি আমাদের দেশপ্রেমিক বিডিআর জওয়ানদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে মাঠে মারা যায়। বিএসএফের ১৬ জন বা অন্য হিসেবে ১৭ জন বাংলাদেশের মাটিতেই অপঘাতে মৃত্যুবরণ করে। বিএসএফ আগ্রাসী না হলে তাদের মৃতদেহগুলো বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কেন পাওয়া যাবে? বিএসএফ সন্ত্রাসী না হলে তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশের মাটিতে কেন পাওয়া যাবে? অথচ সবকিছুর জন্যই এখন বিডিআর ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ভারতীয় প্রচার মাধ্যম থেকে শুরু করে ভারতীয় লোকসভা পর্যন্ত সর্বত্র দায়ী করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিডিআর হেডকোয়ার্টারে বোমাবর্ষণ করে একে গুঁড়িয়ে দেয়ারও দাবী উঠেছে। ভারতীয় মিগ জঙ্গী-২৯ বিমানগুলোকে বাংলাদেশের সীমান্তসংশ্লিষ্ট বিমান ঘাটিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। চার হাজার মাইল দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বহু পয়েন্টে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অ্যাবনরমাল মবিলাইজেশন ঘটানো হয়েছে।

এসব দেখার পরও এদেশের ভারতের পা-চাটা বুদ্ধিজীবিরা কি বলতে চাইবেন, বাংলাদেশকে গ্রাস করার কোন উদ্দেশ্য ভারতের নেই? ইতোমধ্যে কেউ কেউ ইনিয়ে-বিনিয়ে ভারতের পক্ষে সাফাই গাওয়ারও চেষ্টা করেছে। কারগিল সংকট যখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, তখন ভারতের দায়িত্বশীল মহল থেকে কারগিল অপারেশনের জন্য পাকিস্তানের সিভিল অথরিটি তথা নওয়াজ শরীফ সরকারের কোন অনুমোদন ছিল না বলে দাবী করা হয়েছিল। এবারও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হচ্ছে রৌমারীর ঘটনায় বাংলাদেশের হাসিনা সরকারের কোন ইঙ্গিত ছিল না। আসল ঘটনা কী, তা হয়ত রহস্যাবৃত থেকে যাবে। কিন্তু এ কথা কি স্পষ্ট নয়, ভারতের প্রচার মাধ্যম ও সেদেশের রাজনীতিবিদরা ওদের একাত্তরের মিত্ররাষ্ট্র বাংলাদেশকে কী চোখে দেখে? শেখ হাসিনা সরকারের মত বন্ধুভাবাপন্ন ও ভারতের কৃপাকামী সরকার ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও ভারতের প্রতিহিংসার আগুন কী পরিমাণ দাউ দাউ করে জ্বলতে পারে, এসব দেখেও কি আমরা শিখব না? কিন্তু তার পরও বলি, ভারতের এই আক্রমণাত্মক আচরণ আমাদের জন্য ভালই হয়েছে। আমরা তো ভুলে যেতে বসেছিলাম, আমাদের জাতীয়তাবাদের একটি সুনির্দিষ্ট ভিত্তি আছে। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি এবং আমাদের শতকরা ৯০ জন মানুষ মুসলমান। এই পার্থক্যই স্পষ্ট করে দিয়েছে আমাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে। এই পার্থক্য কল্পিত কিংবা কারও অশুভ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইতিহাস এমনি করে সৃষ্টি করেনি। এরপরও আমাদের কারোর মনে ভারতের কৃপাপ্রার্থী হয়ে দেশের ক্ষমতার মসনদে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কোনক্রমেই জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক বলে বিবেচিত হতে পারে না।

তাই আজ নির্বাচনকে সামনে রেখে স্পষ্ট করে বলতে হবে, নির্বাচনের পর ক্ষমতার পট পরিবর্তন হলে (যা এখনও দিল্লী দূরঅস্তের মতই হনুজ দুরস্ত মনে হয়) পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রশ্নে কি পদক্ষেপ নেয়া হবে? কৌশলগত কারণে বিষয়টি সম্পর্কে মৌনতা দেখালেও আমাদের অ্যাপ্রোচ কী হবে, এই প্রশ্নে বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য করণীয় কী হবে তানিয়ে ভাবতে হবে? গঙ্গার পানিচুক্তির বিষয়টিও কিভাবে বাংলাদেশের স্বার্থানুকূল করে পরিবর্তন করার

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা নেয়া হবে সেটাও ভাবতে হবে। আওয়ামীলীগ সরকার যেভাবে বাংলাদেশের দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে ভারতীয় দেশরক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক করে ফেলেছে তা আবার কিভাবে দেশের অনকূলে পুনর্গঠন করা হবে? শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের একটি দেশরক্ষা ভাবনা ও পররাষ্ট্রনীতি চিন্তা ছিল। তারই আলোকে দেশরক্ষানীতি যথাযথ রূপদান করার জন্য কী করা হবে, তাও স্পষ্ট করতে হবে। সবকিছু এড়িয়ে যাওয়া শেষ বিচারে শত্রুর সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আপসের দরজাকেই খোলা রাখবে। এদেশের কোটি কোটি দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে এমন কিছু কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না। আমাদের ভাগ্য ভাল। সীমান্ত হামলা করে ভারতীয় বিএসএফ সম্বিৎহারা জাতিকে আবারও জেগে উঠতে সাহায্য করেছে। তাই বলি–শত্রু আমাদের আক্রমণ করেছে, এর মধ্যে আমাদেরই মঙ্গল নিহিত আছে। আমাদের পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেতে আমাদের কাজকে সহজ করে দিয়েছে। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভাল।

আফতাব আহমাদ :

কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে বড়াইবাড়ি আক্রমণ করে ভারত যে মারাত্মক ভুল ও অন্যায় করেছিল, তা এতদিনে নিশ্চয়ই ভারতের জনগণ উপলব্ধি করতে পেরেছে। বড়াইবাড়ি সীমান্ত ফাঁড়িতে রাইফেলসের মাত্র এগারজন সৈনিক ডিউটিরত ছিল। জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে ভারতীয় হামলা মোকাবিলা করা এতো সহজ হতো না। শুধু তাই নয়, ভারত বড়াইবাড়িতে রীতিমত সামরিকভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনোত্তর ভারতের সামরিক ও জাতীয় ইতিহাসে ১৯৬২ সালে চীনদেশের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে ভারত সামরিক পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ প্রথম গ্রহণ করে। আর ৪১ বছর পর বড়াইবাড়ি দখল করতে এসে রাইফেলসের বীরত্ব ও সাহসিকতার সামনে পর্যুদস্ত ও খর্ব হয়ে ভারত দ্বিতীয়বারের মত একটি সামরিক পরাজয় বরণ করল। পরাজয়ের এ গ্লানি ও ক্ষতকে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। বিশেষ করে তাদের সুহৃদ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় পরাজয়ের এই অপমানবোধের জ্বালা তাদের জন্য আরও তীব্র ও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় শাসকগোষ্ঠির সমর্থকচক্র এবং পত্র-পত্রিকা ভারতীয় জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং জনমত নিজেদের অনুকূলে টানার জন্য একের পর এক নানা আষাঢ়ে গল্প এবং বানোয়াট তথ্য জনগণের সামনে হাজির করছে। ভারতের 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার ২২ এপ্রিল প্রকাশিত সংখ্যায় "Indo-Bangla Border Clash : A Major Intelligence Failure" শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রাক্তন যুগ্ম পরিচালক মি. এম কে ধর এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "Pakistan's ISI was known to have heavily infiltrated the BDR and other agencies like Director General (Forces Intelligence) and National Security (internal). They are helping extremist groups in Tripura now, besides training NSCN, ULFA, Bodos and Kantapuris" তিনি আরও বলেন ঃ "We have had all such information but no action has been taken on these aspects." অর্থাৎ ধর বাবু বলতে চাইছেন যে, বাংলাদেশের বিডিআরসহ ডিজিএফআই এবং এনএসআই'র মত গোয়েন্দা সংস্থাসমূহে পাকিস্তানের আইএসআই'র মারাত্মক অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে তারা জানে এবং এসব অনুপ্রবেশকারীদের প্ররোচনায় ত্রিপুরার চরমপন্থীদেরসহ নাগাভূমির এনএসসিএন এবং আসামের উলফা, বোডো ও কান্তাপুরী জঙ্গীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ভারতের কাছে এসব তথ্য থাকা সত্ত্বেও ভারত এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি।

অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি ভারতীয় পর্যবেক্ষণ। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই ভারত বারংবার এইসব মনগড়া অভিযোগ তুলে আসছে। বাংলাদেশের জনগণের মনস্তত্ত্ব এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের অবৈধ অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ জনমনে কী পরিমাণ ক্ষোভ ও ঘৃণার জন্ম দিয়েছে, তা কখনো ভারত বুঝতে চায় না। দু'টি

www.pathagar.com

প্রতিবেশী দেশ সৎ প্রতিবেশীসুলভ শান্তিপূর্ণ অবস্থায় পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে উন্নয়ন সহযোগী তখনই হতে পারে, যখন একে অপরের সঙ্গে সম্মান ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে আচরণ করবে। অথচ, ভারত ভাবে যে, সে দক্ষিণ এশিয়ার একচ্ছত্র প্রভু। ভারত যতদিন তার পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা নীতি থেকে এই প্রভুত্ব ডকট্রিন ঝেড়ে ফেলে না দেবে, ততদিন ভারতের প্রতিবেশীদের সঙ্গে অবিশ্বাস ও বৈরিতার সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকতে বাধ্য। বাংলাদেশের ভারতের প্রথম ডেপুটি হাইকমিশনার এবং ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন দক্ষ কর্মকর্তা জে এন ডিকশিট সম্পর্কে এখানে অনেকে ধারণা করেন যে, তিনি একজন সমঝদার লোক এবং বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সংবেদনশীল। তাঁর এই ভাবমর্যাদার প্রচার আমাদের গণমাধ্যমেও একশ্রেণীর লোক হরহামেশা করে থাকেন। তাঁর বেশ কিছু বন্ধু এ দেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিআর-এর হয়েও ডিকশিট বাবুকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে প্রচার করতে বেশ উৎসাহী। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'Bangladesh ঃ Liberation and Beyond'-এ বাংলাদেশের প্রতি ভারতীয় অনেক মনোভাব ও নীতির মৃদু কৌশলী সমালোচনা করে তিনি তাঁর এই ভাবমর্যাদাকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার একটি প্রচেষ্টা নিয়েছেন।

এহেন ডিকশিট বাবু 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ ২৩ এপ্রিলের সংখ্যায় 'Bordering on Danger' নিবন্ধে বাংলাদেশ সম্পর্কে, বড়াইবাড়ির ঘটনা সম্পর্কে এবং রাইফেলসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান সম্পর্কে যেসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনভিপ্রেত ও দুর্ভাগ্যজনক মন্তব্য করেছেন, তা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপের সমতুল্য। বড়াইবাড়িতে ভারতীয় সৈন্যরা যে সামরিক অভিযান চালিয়েছে এবং ঘরবাড়ি লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করেছে সে সম্পর্কে মৌনতা পালন করে তিনি পাদুয়ার ঘটনার একটি মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তার মতে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৯ ডিভিশনের প্রায় পাঁচটি ব্যাটালিয়ান এবং রাইফেলসের অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে ইনফেন্ট্রির ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও সাঁজোয়া যান এবং মর্টার ইত্যাদিসহ ময়মনসিংহ ঘাঁটি থেকে রওনা হয়ে পাদুয়া অভিযান চালানো হয়। অথচ আমরা জানি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ করা তো দূরের কথা, রাইফেলস তেমন কোন ভারী অস্ত্রশস্ত্র বহন করে পাদুয়ার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেনি। বিএসএফের নৈতিক মনোবলের অভাব এবং হীনমন্যতার কারণে রাইফেলসের অসীম সাহসী অফিসার ও জওয়ানরা বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূখণ্ড পাদুয়ার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে পেরেছিল।

ডিকশিট বাবু নিজ দেশের পরাজয়ের কালিমা ধামাচাপা দেয়ার জন্য রাইফেলসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান, যিনি আজ এ দেশের প্রত্যেক ঘরে ঘরে একজন জাতীয় বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও শ্রদ্ধার ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন–ডিকশিট বাবুর মতে, জেনারেল ফজলুর রহমান বাংলাদেশী মিলিটারী অফিসারদের মধ্যে যারা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের মুক্তিলাভকে সমর্থন করেন না, তাদের দলভূক্ত। এর চাইতে কুৎসিত ও জঘন্য মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। জেনারেল ফজলুর রহমান একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সমর বিশেষজ্ঞরাই মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাকে প্রথম প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। ডিকশিট বাবু আরেক ধাপ এগিয়ে জেনারেল ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ এনে বলেছে যে, জেনারেল ফজলুর রহমানের সঙ্গে চরমপন্থী ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর যোগাযোগ রয়েছে। জেনারেল ফজলুর রহমান নাকি প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে বিব্রত করার জন্যই এ ধরনের ঘটনাটি ঘটিয়েছেন এবং প্রত্যাশা করেছেন, ভারতবিরোধী রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য এ ঘটনা ন্যায্যতা প্রমাণ করবে। ডিকশিট বাবু এখানেই থেমে থাকেননি। তার কল্পনা এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে, যা নেশাখোরদের কল্পনার সঙ্গেই তুলনা করা যায়। ডিকশিট বাবু বলেছেন, "বাংলাদেশে এ বছরটি নির্বাচনী বছর। সীমান্তের ঘটনাবলী বেগম জিয়ার পার্টির উস্কানিতেই ঘটে থাকতে পারে, যাতে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বিব্রত ও বেকায়দায় পড়েন"। তবে, তিনি এও মন্তব্য করেন যে, ২০

www.pathagar.com

এপ্রিল পর্যন্ত এই দুই মহিলার কোনজনই ঘটনা সম্পর্কে কোন পাবলিক স্টেটমেন্ট দেননি। ডিকশিটের এই মনগড়া কাহিনী প্রমাণ করে, ভারতীয়দের মধ্যে যাদেরকে 'ভালমানুষ'রূপী ব্যক্তি হিসেবে আমাদের সামনে হাজির করা হয়, তাদের অন্তরেও বাংলাদেশের জন্য কী সর্বনাশা গরল পোষণ করা হয়।

নিবন্ধটির শুরুতেই একাত্তরের গণহত্যার অন্যতম খলনায়ক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তার বৈরী মনোভাবের পরিচয় জাহির করেছেন। রাও ফরমান আলী নাকি যুদ্ধবন্দী অবস্থায় একজন ভারতীয় অফিসারকে বলেছিলেন, These chaps, whom you have liberated will turn against you. বাংলাদেশ অহেতুক কেন ভারতের বিরোধিতা করতে যাবে? যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন যুক্তিবাদী ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে, বাংলাদেশের গায়ে পড়ে ভারতের বৈরিতা আহবান করার প্রশ্নই ওঠে না। ভারতের অযাচিত হস্তক্ষেপ, বাংলাদেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার অভিলাষ, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্র, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক তৎপরতাকে জারি রেখে অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়া–এক কথায় বাংলাদেশের ওপর দাদাগিরি করে ভারত তার প্রভুত্ব ডকট্রিনের যে বাস্তবায়ন চায়, তা কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন জাতি মেনে নিতে পারে না। বাংলাদেশও মেনে নেবে না, ডিকশিট বাবুরা এ কথাটি যত দ্রুত উপলব্ধি করবেন, ততই ভারতের মঙ্গল।

এদিকে, ভারতের বহুল প্রচারিত 'The Hindu'পত্রিকায় ২৩ এপ্রিল 'Sheikh Hasina calls up Vajpayee, Express regret over incident' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে রাজা মোহন উল্লেখ করেন, "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অটল বিহারী বাজপেয়ীকে টেলিফোন করে আশ্বস্ত করেছেন। বাংলাদেশ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘটনার জন্য যে অনুশোচনা প্রকাশ করেছে এবং ঘটনা তদন্ত করার যে প্রতিশ্রুতি ঢাকা ব্যক্ত করেছে, তা দু'দেশের মধ্যে সৃষ্ট রাজনৈতিক উত্তেজনাকে 'ডিফিউজ' করে দিয়েছে"। ২৪ এপ্রিলের The Hindu'র মতে, "ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যসভায় দিনব্যাপী আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, ভারত কোন অবস্থাতেই ইউনিফর্মের অবমাননা গ্রহণ করবে না। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই ক্রিমিন্যাল অ্যাডভেঞ্চারিজম ভারত-বাংলাদেশ দৃঢ় মৈত্রীর সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে না এবং বাংলাদেশের দায়িত্ব হচ্ছে, যারা ক্রাইম করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া এবং আস্থা ও বিশ্বাস পুনঃস্থাপন করা"। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, 'ভারত বাংলাদেশের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার এই বলে আশ্বস্ত করেছে যে, সকল ঘটনার সকল দিক তদন্ত করে দেখা হবে এবং সরকারের অজ্ঞাতেও দুঃখজনক যে অ্যাকশন বিডিআর গ্রহণ করেছে, তারও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। (The Hindu, April 24, 2oo1). ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মি. আই ডি সোয়ামী দাবী করেছেন, "বাংলাদেশ ভারতের আস্থা তখনই অর্জন করতে পারবে, যখন ১৬ জন বিএসএফ সৈন্যের হত্যাকারীদের বাংলাদেশ শাস্তি দেবে। তিনি এও হুঁশিয়ার করে দেন যে, ভারত দ্বিতীয়বার কিন্তু, 'অপ্রস্তুত' হবে না"। (The Hindu, April 26, 2001).

ভারতীয় পত্র-পত্রিকা দেখলে স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভারতব্যাপী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিষোদগার ছড়ানো হচ্ছে, এমন মাস হিস্টিরিয়া তৈরি করা হচ্ছে, যাতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত অনায়াসে একটি সামরিক অভিযান চালাতে পারে। অপর দিকে ভারত শেখ হাসিনাকে নির্ভরযোগ্য মিত্র মনে করে তাকে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার ওকালতিও করছে। Indian Express পত্রিকায় ২৬ এপ্রিলের Intervention কলামে জ্যোতি মালহোত্রা Leave Sheikh Hasina alone or would India rather do Business with Khaleda Zia? শীর্ষক এক মূল্যায়নে বলেন, "হাসিনাকে বিজেপি সরকার Off the look অর্থাৎ দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কেন দিল? বলাই বাহুল্য, ভারতীয় সরকারী মহল ও পররাষ্ট্র দফতর বারবার বলার চেষ্টা করেছে যে, পুরো ঘটনাটিই ঘটেছে হাসিনা ও তার সরকারের অজ্ঞাতে।

www.pathagar.com

এর জন্য দায়ী রাইফেলস এবং সেনাবাহিনীর একাংশ। জ্যোতি মালহোত্রা বলছেন, "হাসিনা মুজিবের কন্যা বলেই নয়, কিংবা ১৯৯৯-এর কমনওয়েলথ সম্মেলনে বাজপেয়ী হাসিনার কাছ থেকে পঁচাত্তরের আগস্টের লোমহর্ষক কাহিনী শোনার কারণেই শুধু নয়, বরং বাংলাদেশে ২০ বছরের সামরিক শাসনের পর ৫ বছর হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালীন যে ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা ভারতের হৃদয় অর্জন করেছে এবং ভারতের অনুকূলে গেছে। কাজেই হাসিনাকে কনডেম করা বা ঢাকার বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া মূলত বাংলাদেশের প্রাক্তন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের স্ত্রী এবং প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার হাতে খেলারই সমতুল্য হবে। আর খালেদা জিয়া তো এরই অপেক্ষায় রয়েছেন। গত দু'বছর ধরে বাংলাদেশকে প্রায় অচল অবস্থায় এনে খালেদা এখন অপেক্ষায় করছেন আসন্ন অক্টোবরের নির্বাচনে হাসিনাকে উৎখাত করার। ঐদিন হবে ভারতের জন্য একটি কৃষ্ণদিবস। কারণ, এরপর যা ঘটবে তাতে বড়াইবাড়ির ঘটনাটিকে একটি পিকনিকের মতই মনে হবে। সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ তার হাতে না থাকায় গত সপ্তাহের যে সীমান্ত সংঘর্ষটি ঘটে যায়, তাতে হাসিনার করার তেমন কিছুই ছিল না। কিন্তু গত ৫ বছর ধরে তিনি যেসব উদ্যোগ নিয়েছেন, তার ফলে ভারতের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের মনোভাবকে তিনি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। অতএব, তাঁকে আরেকটি সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে, তার আরেকটি নির্বাচনের প্রয়োজন রয়েছে– তার আরেকটি ৫ বছরের মেয়াদের প্রয়োজন রয়েছে। যাতে যে পরিবর্তন তিনি এনেছেন, তা সুসংহত করা যায়। অতএব, ক্ষণিকের জন্য হলেও আমাদের জিহ্বাকে সংযত করতে হবে এবং হাসিনাকে বিরক্ত না করে ছাড় দিতে হবে"।

এসব কিছু থেকে বাংলদেশ-ভারত বর্তমান সম্পর্ক হাসিনা ও আওয়ামী লীগের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতি ভারতীয় মনোভাব এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনে ভারতের কী ভূমিকা হতে পারে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। আমাদের দেশের বিরোধী শিবিরের একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, ভারতকে চটিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া যাবে না। এ কারণেই কি সীমান্ত সংঘর্ষ ও ভারতীয় হামলার পর আমাদের বিরোধীদলগুলো নিস্তেজ হয়ে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে? দায়সারাগোছের প্রতিবাদ ও সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানের মধ্যেই বিরোধীদল তার কর্মকাণ্ডকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও দাদাগিরির বিরুদ্ধে সম্মান ও মর্যাদার অবস্থান অর্জনের জন্য পররাষ্ট্রনীতিতে বিরোধীদলগুলো কী ধরনের গুণগত পরিবর্তন আনতে চায়, মোটা দাগের রূপরেখায় জনগণের সামনে তা তুলে ধরে এ জন্যই কি তারা কোন অঙ্গীকার করতে প্রস্তুত নয়? আমার জানা নেই। তবে, ভারতের নীতি-নির্ধারকরা প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন যে, বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজাল যথেষ্ট বিস্তৃত এবং ভারতের হাত হতে অনেক লম্বা। এর দ্বারা তারা কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয়। ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত অসম চুক্তিসমূহ এবং বাংলাদেশকে ভারতের ভূ-রণনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার যে পরিকল্পনা ভারত বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, সেসব বিষয়ে বিরোধীদলগুলো রহস্যজনক নীরবতা রক্ষা করে রাজনীতিতে যে ম্রিয়মাণ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে, তাতে নির্বাচকমণ্ডলী ও সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে আস্থাভাজন কাউকে কি দেখতে পাচ্ছে? মানুষ কিন্তু বিকল্প খুঁজছে। মানুষের আস্থা অর্জন করতে হলে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সর্বোত্তমভাবে রক্ষা করার বিষয়টি স্পষ্ট করে বলতে হবে। যারা তা পারবেন,জনগণের আস্থা তারাই অর্জন করবেন।

www.pathagar.com

৩১মে ২০০১

রাজনীতিতে গ্রেশামের সূত্র

মাহবুব উল্লাহ :

বিএনপি নেতা, বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের প্রাক্তন হাই কমিশনার ডা. এএফএম ইইসুফ 'শুধু সাংবাদিক নয়, সকল পেশাজীবীই সন্ত্রাসের কবলে' শিরোনামে গত ২৬মের 'প্রথম আলো' পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখেছেন। প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ অভিমত হিসেবে নিবন্ধটি ছেপেছে। ডা. ইউসুফ লিখেছেন,"বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দু'টি জিনিস গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, দেশের রাজনীতি আদর্শকেন্দ্রিক না হয়ে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলে রাজনৈতিক নেতারা সংগঠনের বদলে নিজ নিজ সমর্থকবাহিনী গঠন করতে থাকে। এতে দলীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটে। একপর্যায়ে সাংগঠনিক কার্যকলাপের বদলে অরাজনৈতিক, অগণতান্ত্রিক আচরণ দলীয় নেতৃত্ব অর্জন করার প্রধান উপাদান হয়ে যায়। তাছাড়া প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সংবিধান এমনভাবে প্রণীত হয় যে, দলীয় প্রধানের ইচ্ছাই দলে কর্মকর্তা মনোনয়ন থেকে শুরু করে দলীয় নীতি-নির্ধারণে নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষাক্ত পরিস্থিতিতে উচ্চাভিলাষী ছোট বড়-মাঝারী নেতারা সাংগঠনিক কাজকর্মকে প্রাধান্য না দিয়ে দলীয় কর্মীদের সমর্থন আদায় করা বা সর্বোচ্চ নেতৃত্বের অনুগ্রহভাজন হওয়ার দিকে বেশী নজর দিতে থাকেন। ফলে প্রয়োজন পড়ে অর্থ ও পেশীশক্তির। রাজনীতিতে নতুন অধ্যায় সংযোজিত হলো অস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে। অর্থ ছাড়া অস্ত্র পাওয়া যায় না। আর অস্ত্র ছাড়া অর্থের যোগান দেওয়া যায় না। তাই বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে সন্ত্রাসী চক্র। দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকসহ দেশের সব পেশাজীবির নিজস্ব সমস্যাগুলো যা দেশের সার্বিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পেশাজীবিরা অক্ষম হয়ে গেছেন বা ভয়-ভীতি প্রলোভন দিয়ে অক্ষম করে দেওয়া হয়েছে। দেশে সব পেশাজীবী সংগঠন আজ দ্বিধাবিভক্ত। এই বিভক্তি কোন আদর্শ বা পেশাজীবীদের নিজস্ব সমস্যা নির্ভর নয়। এই বিভক্তি একান্তই রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে"।

ডাক্তার ইউসুফকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই। ডাক্তারের কাজ যেমন রোগীর রোগের উৎস নির্ণয় করা–একজন সমাজমনস্ক মানুষের কাজ হলো, সমাজের ব্যাধিগুলোর উৎস নির্ণয় করা। বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা কী? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে নানাজন নানা কথা বলবেন। কেউ বলবেন, জনসংখ্যাই দেশের একমাত্র সমস্যা। কেউ বলবেন, বর্তমানে বিদ্যমান সন্ত্রাসের পরিবেশই এ দেশের এক নম্বর সমস্যা। আবার কেউবা বলবেন, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রোগ-ব্যাধি-এগুলোই হলো এ দেশের মূল সমস্যা। সমস্যা নেই এমন কোন দেশ পৃথিবীতে নেই। পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিধর ও ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সমস্যা রয়েছে। সেদেশে কখনো ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা, কখনো বর্ণবিরোধ, কখনো বেকারত্ব আবার কখনো বা মনিকা লিউনস্কি অ্যাফেয়ারের মত রগরগে ঘটনা জনমনে ঝড় তোলে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে বাংলাদেশে আজ যা ঘটেছে, তার জন্য কোন অজুহাত দাঁড় করানো যাবে না।

এক সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম মাটির নিচ থেকে হলেও সন্ত্রাসী খুঁজে বের করার প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপনের পর ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বলেছিলেন, আমাদের দেশে আইন-শৃংখলার সমস্যা

www.pathagar.com

পরিসংখ্যানের বিচারে আমেরিকার চাইতেও ভাল। এখনো ঢাকা মহানগরীতে খুন-খারাবি, ছিনতাই-রাহাজানি নিউইয়র্কের তুলনায় অনেক কম। পরিসংখ্যান হয়তো তাই বলবে, কিন্তু কোন দেশের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব নিজ ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য এ ধরনের খোঁড়া অজুহাত খুঁজে বেড়াবেন না। আমরা লক্ষ্য করি, যে দেশে সামান্যতম গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি আছে, সে দেশে যে কোন ব্যর্থতার দায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী নিজেই কাঁধে তুলে নেন এবং দায়িত্ব স্বীকার করে নিজ পদ থেকে ইস্তফা দেন। বাংলাদেশে এরকম দৃষ্টান্ত আমরা কেবলমাত্র একবারই লক্ষ্য করেছি আর তা হলো বিএনপি সরকারের শিল্পমন্ত্রী জনাব এ এম জহিরউদ্দীন খানের ক্ষেত্রে। এরকম দৃষ্টান্ত আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ডাক্তার ইউসুফকে অভিনন্দন জানাতে হয় বাংলাদেশের সমস্যার একটি অন্তর্নিহিত দিক পাঠকসমাজে তুলে ধরার জন্য। ডাক্তার ইউসুফের মন্তব্যকে সংক্ষেপে, এক কথায় বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের উৎসমূলে রয়েছে এর নেতৃত্বের ব্যর্থতা।

ঐতিহাসিকভাবে এ দেশের নেতৃত্ব নেগেটিভ পলিটিক্সে অভ্যস্ত। এই ধারা চলে আসছে একেবারে ব্রিটিশ আমল থেকে। পাকিস্তান আমলেও এই ধারায় কোন ছেদ পড়েনি। সে সময়ে বাংলাদেশের নেতত্বের মূল বিবেচ্য ছিল, কিভাবে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাদের সেই প্রচেষ্টা সফলও হয়। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানীরা বিতাড়িত হয়। কিন্তু পাকিস্তানীরা বিতাড়িত হবার পর কিভাবে এই দেশে একটি গণতান্ত্রিক জনসংবেদনশীল ও উন্নয়নমুখী রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব, সে সম্পর্কে কোন কিছুই তাঁরা ভাবেননি। ১৯৪৭ থেকে ২৪ বছর আমাদের নেতৃত্ব পূর্ব বাংলা থেকে পাকিস্তানে পুঁজি পাচার হয়ে যায়–এ কথা বলে জনগণকে সংগঠিত করেছে। কিন্তু পূর্ব বাংলা পাকিস্তানী শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত হলে আরও শত গুণ পুঁজি ভারতে পাচার হয়ে যাবে, কিংবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে চলে যাবে, সে সম্পর্কে মোটেও ভাবেননি। যদি ভাবতেন, তাহলে অর্থনীতির এই রক্তক্ষরণ রোধ করার জন্য গোড়া থেকেই কিছু ব্যবস্থা নিতেন। সমস্যাটি দাঁড়িয়েছে অন্য জাগয়ায়। জনগণকে শোষণ-বঞ্চনার কথা বলে তারা তাদের আসল এজেন্ডাটিকে লুক্কায়িত রাখতে সক্ষম হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর তৎকালীন পূর্ব বাংলায় তথা আজকের বাংলাদেশে সীমিত আকারে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই মধ্যবিত্ত একদিকে যেমন সীমিত অর্থনৈতিক বিকাশ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিলো, অন্যদিকে, পাকিস্তানের পাঞ্জাবভিত্তিক এলিট শ্রেণীর আরও সম্প্রসারিত ও উর্ধ্বমুখী বিকাশের ফলে সংক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল। সংক্ষুব্ধচিত্ততা ও সীমিত বিকাশ সুসংহত ও মাচিউর রাজনৈতিক বিকাশকে অনেক সময় বাধাগ্রস্ত করে। যদি বিকাশের কারণ হয় রাষ্ট্রের আনুকূল্য এবং এর পেছনে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, তিতীক্ষা ও সাধনা না থাকে, তাহলে সেই বিকাশ কখনোই টেকসই হতে পারে না। এ ধরনের বিকাশ উত্তরোত্তর রাষ্ট্র কিংবা অন্য কোন বর্হিশক্তির ওপর অধিকতর বিকাশের জন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে সর্বনাশের পথ হয় উন্মুক্ত। বাংলাদেশে তা-ই হয়েছে। এ দেশে নেতৃত্ব বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানকে উৎখাত করতে গিয়ে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের কৃপাপ্রার্থী হয়েছে। নিজ জনগণের সুপ্ত শক্তিকে আস্থায় আনতে পারেনি। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রই হয়েছে এই নেতৃত্ব যে শ্রেণী ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল তার আদিম সঞ্চয়নী উৎস। রাষ্ট্রায়ত্ত করকারখানাগুলো লুটেপুটে খাওয়ার মাধ্যমে এই শ্রেণী ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। আর যখন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক হাওয়া বেসরকারীকরণের দিকে মোড় নিল তখন আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার কারণে বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়াও এদের জন্য খুলে দিলে লুণ্ঠনের অবারিত দ্বার। সরকারী মালিকানাধীন কলকারখানা ও সম্পদ পানির দামে হস্তগত করে এরা আরও স্ফীত হয়ে উঠল। আন্তর্জাতিক লেনদেনের সুযোগে বিদেশী ব্যাংকে এরা অর্থ পাচার করল। দেশের ভেতরে রাজনীতিকে এরা করল কলুষিত। নীতি ও আদর্শের বালাই নেই,

www.pathagar.com

কেবল চাই Money and Muscle. ভোট কারচুপি করতেই হোক, অথবা প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করতেই হোক, অথবা নিদেন পক্ষে জনসভায় জনসমাবেশ ঘটাতেই হোক, মানি অ্যান্ড মাসল এদের একমাত্র ভরসা। তোষামোদকারী, মতলববাজ, ফন্দিফিকির আঁটায় অভ্যস্ত লোকজনই হলো এই নেতৃত্বের ভরসা। এই নেতৃত্ব ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জনমতকে সংগঠিত করার চাইতে বিদেশী প্রভুর কৃপালাভে অনেক বেশী তৎপর। এ দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর কোন সদস্য তালিকা নেই। কিংবা সদস্য সংগ্রহ অভিযান চালাতেও এদের দেখা যায় না। নিজ পছন্দ ব্যক্তিদের দলীয় কমিটিতে মনোনয়ন দেয়া হয়, কর্মী-সমর্থকদের ইচ্ছা-অভিরুচিকে এ ব্যাপারে কোন মূল্য দেয়া হয় না। অন্তর্ভেদী গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক কিংবা অনুসন্ধানে এদের কোন অভিরুচি নেই। তাদের একমাত্র অভিরুচি স্তোকবাক্য উচ্চারণে ও স্তোকবাক্য শ্রবণে। বিদেশী রাষ্ট্রনায়কেরা যখন এদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনাদের Vision কী, তারা তখন হয় নির্বাক থাকেন, কিংবা কাচুমাচু করতে থাকেন। প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের চাইতে ধন ও ঐশ্বর্যের প্রতি এদের আকর্ষণ অনেক বেশী প্রবল। তাই তাদের কাছে মনন ও মেধার কোন মূল্য নেই। চরিত্রগতভাবে এরা প্রচণ্ড সুবিধাবাদী, নীতি-নৈতিকতা রহিত, সততা ও সাধুতা বর্জিত, প্রতিপক্ষের প্রতি অশালীন বাক্যবাণ নিক্ষেপে অভ্যস্ত। কি আন্দোলন, কি সংগঠন, কি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ-সব ব্যাপারেই উদাসীন। এরা দেখেও দেখেন না, বুঝেও বুঝতে চান না। শুনেও ভাবেন, শোনেননি। এদের এই আচরণের ফল যা হবার আজকের বাংলাদেশে তা-ই হয়েছে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, তোলাবাজি, চোরাপনবাজি, ঘুষ-দুর্নীতি, নকল করে পাস করা, যোগ্যতা অর্জন না করে তদ্বির ও লবিংয়ের পথ ধরা, ঘুষ-দুর্নীতি, মাদক সেবন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ আজ সমাজকে এক নরকে পরিণত করেছে।

যারা ভুক্তভোগী তারা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। এর ফসলের বাম্পার ফলন ফলায়, কিন্তু ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না। এরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, কিন্তু পরিশ্রমের সুফল পায় না। এ দেশে চিকিৎসক আছে, নেই রোগীর প্রতি সযত্ন মনোভাব। এ দেশে শিক্ষক আছে, নেই শিক্ষাদান। সাংবাদিকতা আছে, কিন্তু সাংবাদিকের নিষ্ঠা নেই, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানী আছে, কিন্তু এক দোয়াত কালি এ দেশে তৈরি হয় না। বড্ড হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি। এ দেশের সাধারণ মানুষ এ পরিস্থিতির উৎসে যে নেতৃত্বের সংকট রয়েছে, তা ভালভাবেই বোঝে। কিন্তু দেশের ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নেতৃত্ব সৃষ্টিতে অপারগ। সবখানেই এক কথা–সময় বুঝে চলতে হবে। পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা–এটাই হল এই মুহূর্তের একমাত্র নীতি। আত্মসর্বস্বতা, আত্মমুখীনতা, গা বাঁচিয়ে চলার মানসিকতায় জনগণ আজ আচ্ছন্ন। পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন আসবে এ কথা খুব কম লোকই বিশ্বাস করে। তাই যেভাবে পার বাংলাদেশ ছেড়ে পালাও–এটাই হলো ঘরে ঘরে বুদ্ধিমানদের পরামর্শ। দেশ কিছু দিতে পারে এবং দেশকে কিছু দিতে হবে– এ কথা আজ সর্বসাধারণের কথা ও চিন্তার অতীত। সর্বত্র একটা আত্মসমর্পণের মনোভাব। এরকম মনোভাব ও নীরব ভীতি, আতংক ও আশঙ্কার পরিবেশে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির সমূহ সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে।

ইতোমধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে ভাল চিকিসার জন্য যখন ভারতেই যেতে হয়, ভাল পড়াশোনার জন্য যখন ভারতেই যেতে হয, তখন রাষ্ট্রীয় সীমান্ত রাখাটার আর কী প্রয়োজন? এভাবেই দেশের ভেতর থেকে পাকা ফলের মত দেশটি ভারতের হাতের মুঠোয় চলে যাবার উপক্রম হয়েছে। এখনই যদি এই মারাত্মক ছোঁয়াচে ব্যাধিটি নির্মূল করা না যায়, তাহলে পরিত্রাণের কোন পথ থাকবে না। এসবই হতাশার কথা। সকল অন্ধকারে, সকল বিপর্যয়ে, সকল দুঃখ-গ্লানির মাঝেও আশার স্ফুলিঙ্গ জ্বেলে দিয়েছে বড়াইবাড়ী সীমান্তের বিডিআর ও জনতার ভারতীয় বিএসএফের বিরুদ্ধে মরণপণ প্রতিরোধ।

www.pathagar.com

আফতাব আহমাদ :

দিন যত যাচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনীতির ফিলহাল অবস্থা ও হালহকিকতের চেহারা ক্রমান্বয়ে বেশ রসাত্মক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের রাজনীতির এক অভিনবত্ব হল যে, রাজনীতির 'ক' অক্ষরজ্ঞান যাদের নেই, তারাই ধুমছে রাজনীতি করে। রাজনীতিতে নানা মৌসুম আছে। কাঁদার মৌসুম, হা-হুতাশ করার মৌসুম আর ভালবাসার মৌসুম। ভালবাসার মৌসুমে গদগদভাবে জনসাধারণের প্রতি ভালবাসা নিবেদন করার ক্ষেত্রে আমাদের রাজনীতিকরা যথেষ্ট পটু।

একটা সময় ছিল যখন সাধারণ্যের মধ্য থেকে অনেকে দেশ, জাতি, জনগণ সম্পর্কে গভীর মমত্ব থেকে ভাবনা-চিন্তা করত। এইসব মানুষগুলোর মধ্যে সরলতা, আদর্শবাদিতা এবং দৃঢ় অঙ্গীকার ছিল। রাজনীতি যখন তেজারতি বা ব্যবসার রূপ পরিগ্রহ করল, তখন তীব্রভাবে অর্থনীতিতে যাকে বলে গ্রেশাম'স ল বা গ্রেশামের সূত্র, তা রাজনীতিকে অক্টোপাসের মত আঁকড়ে ধরল। গ্রেশামের সূত্রটি আমরা অনেকেই জানি, 'Bad Money drives good money out of circulation'. সেই চল্লিশের দশক থেকে আমাদের রাজনীতির ক্রমধারা যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে লক্ষ্য করব যে, মেধা ও ধীশক্তির অবমূল্যায়নের পাশাপাশি রাজনীতির নেতৃত্বে যারা অধিষ্ঠিত হয়েছেন, কিংবা রাজনীতির নিয়ন্তা যারা হতে পেরেছেন, তাদের মধ্যে মেধা ও ধীশক্তি তো দূরের কথা, প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার কোন আছরও পড়েনি। ফলে রাজনীতির চোহারায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দলগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তি স্বৈরতন্ত্র। দলের গঠনতন্ত্র দলের শোভা বর্ধনের একটি অলঙ্কারমাত্র। লেখাপড়া যারা করেন, কৃষ্টি ও বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখতে চান, দলের নেতৃত্ব তাদেরকে আঁতেল বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। এর ফল যা হবার তাই হচ্ছে। রাজনৈতিক দল তো আর দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়, রাজনৈতিক দল গঠন করা হয় রাষ্ট্রক্ষমতায় যাবার জন্য। যে কালে মতাদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মসূচী রাজনৈতিক দলের চালিকাশক্তি ছিল, জনগণকে সংগঠিত করে জনগণের সমর্থন ও আস্থা অর্জন করা রাজনৈতিক দলের ব্রত ছিল, সে কালের অবসান বহু আগেই ঘটে গেছে।

বিশেষ করে, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সহিংসতা, সন্ত্রাস, চোরাপণবাজি ও চাঁদাবাজি যেভাবে রাজনীতির চরিত্র পাল্টে দিয়েছে, তার সঙ্গে দেশ-জাতি ও জনগণের মুক্তি অর্জনের লড়াইয়ের কোন সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যাবে না। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনীতিতে মাস্তানী এবং ডাণ্ডাবাজি একটি অভিনব শিল্পের সুষমা অর্জন করেছে। দলের ভেতরে কাউন্সিলরদের সমর্থন ছাড়াই পেশীশক্তি দিয়ে নেতৃত্ব দখল করা রীতিমত একটি রেওয়াজে পর্যবসিত হয়েছে। এ বিষয়গুলো চিন্তাশীল ও বিবেকবান সদস্যরা যে খুব একটা পছন্দ করেন তা নয়। কিন্তু ক্ষমতার হিস্যা পাওয়ার আশায় আশায় তারাও এসব অর্বাচীন, অমার্জিত ও অসভ্য আচরণকে পৃষ্ঠপোষকতা না দিলেও প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজনৈতিক দলের যে গঠনমূলক ইতিবাচক চরিত্র থাকার কথা, তা ইতোমধ্যে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। এই আত্মবিনাশী রাজনীতি জাতির আত্মহননের নান্দীপাঠ মাত্র।

বিএনপির ডাক্তার এএফএম ইউসুফ যে কথাগুলো বলেছেন এবং যে কথাগুলোর সূত্র ধরে ড. মাহবুব উল্লাহ তার বক্তব্য ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, এ সম্পর্কে কারোরই কোন সংশয় থাকার কথা নয়। তারপরও আমার মনের নানা প্রশ্নের উদ্রেক ঘটেছে। ডাক্তার বদরুদ্দোজা চৌধুরী ছাড়া এবং আরও দুয়েকজন সম্মাজনক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব ছাড়া–যারা রাজনৈতিক পরিবারে এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেনএবং তাদের নির্দিষ্ট সামাজিকায়ন ঘটেছে, তারা ছাড়া আর যারা হঠাৎ করে রাজনীতিতে ঢুকে পড়লেন, এদের রাজনীতিতে আসার কী যোগ্যতা ছিল? রাজনীতি তো হঠাৎ করে পান-বিড়ির দোকান খুলে বসার তেজারতি কারবার

www.pathagar.com

নয়। এর জন্য চাই প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ, অধ্যবসায় এবং আত্মত্যাগের পূর্ণ অঙ্গীকার। ডাক্তার ইউসুফকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি ও জানি। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ইমামুজ্জামানের পিতা ডাঃ এম এ চৌধুরী ব্রিটিশ মাল্টি ন্যাশনাল তেল কোম্পানী বার্মা ইস্টার্নের (যার বর্তমান নাম পদ্মা অয়েল কোম্পানী) চীফ মেডিকেল অফিসার ছিলেন। ইমামুজ্জামান আমার বেশ জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ইমামুজ্জামান ছিলেন ফৌজিয়ান আর আমি ছিলাম প্ল্যাসিডিয়ান। ইমামুজ্জামানের পিতা চৌধুরী চাচা চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ইস্টার্ন রিফাইনারিতে যোগ দেয়ার পর ডাঃ ইউসুফ বার্মা ইস্টার্নের চীফ মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ডা. ইউসুফ হঠাৎ কি করে রাজনীতিতে ঢুকে পড়লেন, তা আজও আমার কাছে বোধগম্য নয়। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক রাজনীতিসহ যে কোন কর্মকান্ড বা পেশায় জড়িয়ে পড়ার অধিকার নিশ্চয়ই রাখেন। কিন্তু কোন প্রস্তুতি ছাড়া, কোন ধারণা ছাড়া এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন ধরনের জ্ঞান ছাড়া একজন কি করে হুট করে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তি বা পেশা বেছে নিতে পারেন, এটি আমি বুঝি না। সুন্দর সুন্দর শব্দ বেছে নিয়ে চৌকষ বাক্যে রচনা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু ঐ বাক্যের তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে ক'জন তা উচ্চারণ করেন? এখানেই আমাদের দুর্ভাগ্য। বাহবা কুড়াবার ন্যূনতম কোন সুযোগ আমরা হাত ছাড়া করতে চাই না। কিন্তু আমরা যা জানি ও বুঝি তা কখনও সাধারণ্যে ব্যক্ত করি না। সাধারণের সঙ্গে একটা আড়াল-আবডাল রক্ষা করে চলাটাই যেন আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র। জীবনমঞ্চে আমরা সর্বক্ষণ শুধু অভিনয় করে যেতেই শিখেছি। চট্টগ্রামে আজকে বিরোধীদলীয় রাজনীতি যে চরিত্র পরিগ্রহ করেছে, এর দায়-দায়িত্বের কোন কিছুই কি ডা. ইউসুফের ওপর বর্তায় না? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে কিংবা চট্টগ্রামের বিরোধীদলীয় রাজনীতিতে উপদলীয় কোন্দলের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি '৯১-এ নিজ দলের বিজয়ের সুযোগে দেশের অভ্যন্তরে সেবা না দিয়ে চিকিৎসক হয়েও কূটনীতিকের দায়িত্ব নিয়ে দেশের বাইরে অবস্থান করে দেশের কী মঙ্গল তিনি সাধন করেছেন? এ জবাব তাঁর কাছে কে চাইবে? জেলা রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে এবং উপেক্ষিত হয়ে একদা যিনি কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ার একজন অপরিহার্য ব্যক্তি ছিলেন, তার পক্ষে আজকে তার এই বর্তমান অবস্থানকে মেনে নেয়া সত্যিই বেদনাদায়ক ও কষ্টকর। তাহলে মূলত বিষয়টি দাঁড়ালো কী? কোথায় আদর্শ? কোথায় কর্মসূচী? কোথায় জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক কৌশল উদ্ভাবনের প্রশ্ন?

আমরা আমাদের জীবদ্দশায় সর্বসুখ চাই, সর্বভুক হয়ে সবকিছু ভোগ করতে চাই। ইহলৌকিক সকল সুবিধা হাতিয়ে নিয়ে পারলৌকিক প্রশান্তির সুযোগের সন্ধানেও নিবেদিত থাকতে চাই। এক কথায় রাজনীতিতে আজ অধিকাংশ কুশীলব হচ্ছে রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের সেই অমর চরিত্র ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড কিংবা অস্কার ওয়াইল্ডের বিখ্যাত উপন্যাস 'The Picture of Dorian Gray' নায়ক মি. ডরিয়ান, যিনি তাঁর প্রতিকৃতির সঙ্গে তাঁর আত্মাকে বিনিময়ের মাধ্যমে বিক্রয় করেছিলেন তাদের মত। রাজনীতির ড. জেকিল এ্যান্ড মি. হাইড কিংবা ডরিয়ান গ্রে'র অশুভ স্পর্শ থেকে বাঁচতে হলে বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন ও ধারা অধঃপতিত ও বিকৃত রূপ নিয়ে আমাদেরকে এবং সাধারণ্যকে ব্যঙ্গ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে, বিরুদ্ধে আজ এখনই সোচ্চার হয়ে বলিষ্ঠ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ধৈর্যহারা হলে চলবে না। পরম ধৈর্য ও সর্বংসহা হয়ে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে একটি সৃজনশীল জগৎ বিনির্মাণ করতে হবে, যে জগতে রাজনীতির অর্থ প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, শঠতা ও তঞ্চকতার সমার্থক হবে না।

www.pathagar.com

৭ জুন ২০০১

নেপালের রাজপ্রাসাদে মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুরাষ্ট্র হিমালয় পাদদেশের পাহাড়, উপত্যকা, নদী ও ঝরণা, মেঘ, রৌদ্র ও তুষারের মায়াময় দৃশ্যঘেরা দেশ নেপাল থেকে অত্যন্ত শোকাবহ ও কল্পনাতীত এক দুঃসংবাদে এদেশবাসী বজ্রাহতের মত শুনতে পেয়েছেন গত ২ জুন (শনিবার)। আমি নিজে এই দুঃসংবাদটি পেয়েছি একই দিন দুপুর বেলায় আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে। এরপর টেলিভিশনে, বিবিসি ও সিএনএনের চ্যানেলে বিস্তারিত জানার আশায় গভীর উদ্বেগের সঙ্গে চেষ্টা করি। কিন্তু রবিবার দুপুর নাগাদ যে খবর বিবিসিতে প্রচার করা হচ্ছিল, তাতে সংবাদটির প্রতি খুব গুরুত্ব দেয়া হচ্ছিল না। আন্তর্জাতিক এই সংবাদ মাধ্যমটিতে ইসরাইলী শিশুদের উপর কথিত প্যালেস্টাইনী সন্ত্রাসবাদীদের সুইসাইড অ্যাট্যাকের খবর প্রাধান্য পাচ্ছিল। শুধুমাত্র সংক্ষিপ্তভাবে নেপালের রাজপ্রাসাদের রাজা বীরেন্দ্র, রানী ঐশ্বরিয়া ও তাদের পরিবারের বরিষ্ঠ সদস্যদের নিহত খবর পরিবেশন করা হচ্ছিল।

এত বড় একটি ঘটনা, যা ঘটেছে পহেলা জুন রাতের বেলায়, সে খবরটি আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা বিলম্ব হয়। আজকের বিশ্বে যখন বিদ্যুৎ গতিতে বিশ্বের এক প্রান্তের তুচ্ছ ঘটনার খবরও অন্যপ্রান্তে পৌঁছে যায়, তখন এমন একটি খবর কোন নিউজ মিডিয়া জানতে পারল না, তা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কোন পরাক্রমশালী শক্তি এই সংবাদটি আন্তজার্তিক সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে বাধা দিয়েছিল কিনা। গল্প ফাঁদা হল, রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ডিনার টেবিলে রাজপরিবারের সদস্যরা যখন একত্র হয়েছেন, তখন রাজপুত্র দীপেন্দ্রর প্রেম ও বিবাহ সংক্রান্ত একটি বাকবিতণ্ডাকে কেন্দ্র করে রাজপুত্র দীপেন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে তার মা-বাবাসহ ১১ জনকে সাবমেশিনগানের গুলিতে হত্যা করে এবং পরে নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়ে মরণাপন্নভাবে আহত হয়। নেপালী জনগণ একই কাহিনী বিশ্বাস করেনি। রাজপথে শত সহস্র শোকার্ত কিংকর্তব্যমিমূঢ় জনগণ প্রশ্ন করেছে, কী হয়েছে, আমাদের সত্য করে বলুন। ভগবান বিষ্ণুর মানবরূপী অবতার রাজা বীরেন্দ্রর পরিবারে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, আমরা বিশ্বাস করি না। এ কাহিনী নেপালী জনগণের মত আমারও বিশ্বাস হয়নি। রাজপুত্রের সাবমেশিনগানের গুলিতে রাজপরিবারের ১১ জন সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কে? রাজপুত্র নিজের উপর নিজেই গুলি চালিয়েছেন, সেই ঘটনাইবা দেখল কারা? রাজপ্রাসাদের মত একটি প্রাসাদে, যেখানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে, সেখানে রক্ষীরা কি করছিল? রাজপুত্র দীপেন্দ্র নিহত হয়েছেন, এ খবর প্রচারের পর প্রথমে বলা হল, তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছেন। পরের দিন ঘোষণা করা হলো যে, তিনিও মারা গেছেন। একের পর এক বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনা সম্পর্কে যেসব ভাষ্য আমরা জানতে পারি, তা থেকে বিশাল একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। বিক্ষুব্ধ নেপালীর নেপালী প্রধানমন্ত্রী কৈরালা, যিনি প্রাসাদের নিরাপত্তার জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত, তার গাড়ির উপরও হামলা চালিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, নেপালী জনগণ মারাত্মক এক ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করছে।

মাত্র কয়েক দিন আগে চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝু রং ঝি নেপাল সফর করে গেছেন। চীনা প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ–পাকিস্তান, নেপাল ও মালদ্বীপ সফর কূটনৈতিক

www.pathagar.com

মহলে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়। যেসব দেশ তার সফর তালিকায় ছিল না, তার মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকা অন্যতম। শ্রীলংকা সফর না করার পেছনে সম্ভবত দেশটির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিই দায়ী। কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশে না আসাটা অর্থবহ। চীনা প্রধানমন্ত্রীর নেপাল সফরের পরপরই রাজপ্রাসাদে এই মমন্তুদ ঘটনা ঘটল। এই অঞ্চলে নেপাল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হিসাবে নেপাল অনেক ক্ষেত্রেই তার সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করতে পারে না। নেপালের পাশাপাশি ভারত একটি গুরুত্বপুর্ণ রাষ্ট্র। নেপালে নেপালী মুদ্রার পাশাপাশি ভারতীয় মুদ্রা প্রচলিত। ভারতীয় নাগরিকরা পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়া নেপাল যেতে পারে। নেপালের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর ভারতীয়দের প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। দেশটি ভূবদ্ধ হওয়ার ফলে খুব নাজুক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। নেপালের ভূবদ্ধতা নেপালের জন্য কত বড় অভিশাপ ১৯৮৯ সালে নেপাল যেভাবে ভারত কর্তৃক অর্থনৈতিক অবরোধের সম্মুখীন হয়েছিল, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি। ভারত সেবার নেপালকে ভাতে মারার, পানিতে মারার ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। ভারত ভূখণ্ড পার না হয়ে কোন পণ্যসামগ্রী নেপালে পৌছানোর উপায় নেই। নেপালগামী প্রতিটি সড়কপথ অবরুদ্ধ করে ভারত প্রতিবেশী ক্ষুদ্র, দুর্বল এই রাষ্ট্রটির উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল। খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানি থেকে শুরু করে প্রায় সকল ধরনের পণ্যসামগ্রীর অভাবে নেপালী জনগণের নাভিশ্বাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খোদ রাজার লিমোজেনটি চালানোর পেট্রোল ছিলো না। বাংলাদেশ থেকে তখন বাংলাদেশ বিমান কিছু জ্বালানি ও অতি প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী নেপালে নিয়ে যেত। প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতি এটা ছিল বাংলাদেশের একান্ত করণীয় কর্তব্য। কিন্তু এতেও ভারত প্রচণ্ড গোস্‌সা করেছিল।

সেদিন নেপালের উপর ভারত এই প্রতিশোধ কেন নিয়েছিল? ১৯৮৯ সালে নেপালের উপর অবরোধ চালিয়ে দেয়ার কিছুদিন আগে চীন ও ভারত তাদের রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে উন্নীত করে। ১৯৬২-এর চীন-ভারত যুদ্ধের পর চীন ও ভারতের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, উভয় দেশের সম্পর্ক শাজ দ্য অ্যাফেয়ার্স পর্যায়ে নেমে আসে। ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নেপালও চীনের সঙ্গে সম্পর্কের মাত্রা উন্নত করার প্রয়াস পায়। নেপাল তার সামরিক বাহিনীর জন্য ১৯ টি ফিল্ডগান চীন থেকে আমদানি করে। নেপালী সেনাবাহিনী এমনিতেই একটি অতি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী, বৈদেশিক আক্রমণ তো দূরের কথা, দেশের ভেতরকার গোলযোগ দমন করার মত যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য এই সেনাবাহিনীর নেই। এ রকম একটি সেনাবাহিনীর জন্য চীন থেকে ১৯টি ফিল্ডগান ক্রয় ভারত বরদাশত করতে পারেনি। আর সে কারণেই সেদিন অবরোধ আরোপ করে নেপালকে ভারত শিক্ষা দিতে চেয়েছিল।

এ যাত্রায় নেপালী রাজপ্রাসাদের রহস্যময় খুন-খারাবি প্রধানমন্ত্রী ঝু রং ঝির নেপাল সফরের সঙ্গে কোনভাবে সম্পর্কিত কিনা সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠবে।

আফতাব আহমাদ :

নেপালের নিহত রাজা বীরেন্দ্র বিক্রম শাহ দেবকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য ছোট ছোট প্রতিবেশী রাষ্ট্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে দেখত। তাকে ও তার গোটা পরিবারকে যে ধরনের ষড়যন্ত্রের আবরণে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার নিন্দা ও ধিক্কার জানাবার কোন শিষ্ট ভাষা অভিধানে পাওয়া যাবে না। ভারতকেন্দ্রিক দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের কোন প্রতিবেশীরই তার সঙ্গে সুখকর সম্পর্ক নেই—ক্ষেত্র বিশেষে এই সম্পর্ক চরম বৈরিতা থেকে শুরু করে সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উপর আলোকপাত করার পূর্বে দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান বাস্তবতাটি আমাদের একটু অনুধাবন করা দরকার। বিট্রিশ শাসনের সময় থেকেই

www.pathagar.com

এবং ব্রিটিশ শাসনোত্তর ভারতীয় শাসক গোষ্ঠি কখনোই ১৯৪৭-এর বিট্রিশ ভারত বিভাজনের বিষয়টিকে স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নেয়নি। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিংবা তাত্ত্বিক ও রাজনীতিকগণ সব সময়েই তাদের ঈপ্সিত রাষ্ট্র হিসেবে হিন্দুকুশ থেকে শুরু করে ইন্দোচীন পর্যন্ত একটি মনোময় রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে আসছে। গান্ধী তার এই স্বপ্ন 'অখণ্ড ভারত' বা 'রামরাজ্য' হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। গোখলে, অনার্য ও অসুরমুক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ হিসেবে এই রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এই মনোময় জগতকে 'বৃহৎ ভারত' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার পুত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একে দেখেছেন 'বিরাট ভারত' হিসেবে। তার কন্যা ইন্দিরা নেহরু গান্ধী এই স্বপ্নকে 'বিশাল ভারত' বলে অভিহিত করেছেন। রামায়ণ–মহাভারতে বর্ণিত ভারত দক্ষিণ এশিয়ার উত্তরাঞ্চলকেন্দ্রিক অতি সংকীর্ণ একটি ভূখণ্ড, যা আর্যাবর্ত নামে পরিচিত। ১৯৪৭ থেকে আজ অবধি ভারতের শাসক শ্রেণী ও অভিজন গোষ্ঠি এই 'রামরাজ্য' এই 'অখণ্ড ভারত', এই 'বৃহৎ, বিরাট বা বিশাল ভারত' গঠনের স্বপ্ন কখনও পরিত্যাগ করেননি। তাদের স্বপ্নের এই ছকে বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা–এগুলো তুচ্ছাতি তুচ্ছ বিন্দুমাত্র, যা বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে চেপে মুছে দিলে কী বা আসে-যায়?

আজ অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ভারতকেন্দ্রিক দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক জটিলতা নিয়ে পর্যালোচনা করার পরিবর্তে বাংলাদেশের বিশ্বস্ত ও অকৃত্রিম বন্ধুরাষ্ট্র নেপালে যে লোমহর্ষক ও বর্বরোচিত ঘটনা ঘটে গেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই। নেপাল নামটি এসেছে প্রাচীন নে মুনীর নাম থেকে। আবার অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, এ ভূখণ্ডে যে প্রাচীন জাতিটি বসবাস করত তাদের 'নেওয়ার' বলে অভিহিত করা হত। 'নেওয়ার' শব্দটির অর্থ 'পবিত্র স্থানের অধিবাসী'। এখান থেকে আধুনিক নেপাল নামটির উৎপত্তি। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ খণ্ড-বিখণ্ড দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোকে একত্রিত করে ব্রিটিশ ভারত নামকরণ করলেও তিনটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের বাইরে থেকে যায়। এই তিনটি এ ভূখণ্ড হচ্ছে যথাক্রমে– নেপাল, সিকিম ও ভুটান। এই তিনটি দেশের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের নানা সময়ে নানা মতভেদ, কলহ ও সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটেছে এবং এক পর্যায়ে এই তিনটি দেশের সঙ্গে ব্রিটিশরা পৃথক পৃথক চুক্তি সম্পাদন করে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আসার চেষ্টা করেন। দেশ তিনটির মধ্যে ভূটান ও সিকিম শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনাধীনে যৎসামান্য স্বাধীনতা ভোগ করে আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু নেপাল সব সময়ে তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। উচ্চজাতের হিন্দু শাসক গোষ্ঠি ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে বহুবার নেপালকে বশীভূত করে ব্রিটিশ শাসনাধীন আশ্রিত রাজ্যে রূপান্তরের জন্য নানা সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীনচেতা নেপালীদেরকে পরাস্ত করে ব্রিটিশের কাছে নতজানু করতে পারেনি। এর জন্য অবশ্য ভূগোলের বাধ্যবাধকতা নেপালকে বাধ্য করে ব্রিটিশের সঙ্গে স্বাধীন অস্তিত্বের স্বার্থে একটা আপসরফায় পৌঁছে কিছু ছাড় দিতে। ব্রিটিশদের সঙ্গে সগৌলীর চুক্তির ফলে নৈনিতাল, আলমোড়া, গাঢ়োয়াল, দেরাদুন ও শিমলা ব্রিটিশদের কাছে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এছাড়াও নেপালের পূর্বদিকের কিছু অঞ্চল ব্রিটিশ চাপের কাছে নতিস্বীকার করে সিকিমের স্যাথে যুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়। নেপালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী যে সমতল ভূমি তা হচ্ছে তরাই অঞ্চল। এই তরাই অঞ্চলেরও নিয়ন্ত্রণভার ব্রিটিশরা গ্রহণ করে। অবশ্য ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধে গুর্খা রাজাদের সাহায্যের বিনিময় হিসেবে ব্রিটিশরা তরাইয়ের কিছু অংশ নেপালকে ছেড়ে দেয়।

www.pathagar.com

ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করার পর ভুবেষ্টিত নেপালকে ভারত বাধ্য করে ১৯৫০-এ একটি অবমাননাকর ও অসম চুক্তি সম্পাদনে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, ভারত জুনাগড়, মানভাদাড়, হায়দারাবাদ, পণ্ডিচেড়ি, গোয়া ও কাশ্মীরসহ বহু রাজন্যবর্গ শাসিত অঞ্চল একের এক গায়ের জোর দখল করে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছিল। দুর্বল রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা, দুর্বল আমলাতান্ত্রিক কাঠামো এবং দুর্বল রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে অতিকায় দানবরূপী ভারতের কাছে স্বীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নেপাল বাধ্য হয় ১৯৫০-এ এমন এক চুক্তি স্বাক্ষর করতে, যা অনেকাংশে নেপালের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করে আধাসার্বভৌম রাষ্ট্রে নেপালকে রূপান্তরিত করে। এই চুক্তির বলে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোন ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার থেকে নেপালকে বঞ্চিত করা হয়। এমনকি জোটমুক্ত আন্দোলনেও নেপালকে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ভারত কখনও দেয়নি। তদুপরি, নেপাল-ভারত সীমান্ত উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছিল এবং চোরাকারবারী ও কালোবাজারীকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এই চুক্তির অধীনে নেপালের তরাই অঞ্চলের ভভ-রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভারত অধিগ্রহণ করে নেয়। ভারতীয় মুদ্রা নেপালে নেপালী মুদ্রার পাশাপাশি লিগ্যাল টেন্ডার হিসেবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত বৈধ মুদ্রা হিসেবেও ব্যবহৃত হত।

ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রাসারণবাদের বিরুদ্ধে নেপালের অতীত ও সাম্প্রতিক ইতিহাস-এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এক সময়ে নেপাল তার স্বাধীনতার গ্যারান্টার হিসেবে পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে ছিল। ১৯৭১-এর পর নেপাল বাংলাদেশের দিকেও আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল উন্নয়ন সহযোগিতার জন্য। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে নেপাল সব সময়ে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবীর পাশে দাঁড়িয়েছে। ভারতের অনভিপ্রেত খবরদারী এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যখন-তখন হস্তক্ষেপ নেপালী জনগণকে মারাত্মকভাবে ভারত বিদ্বেষী করে তুলেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপালের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এতদসত্ত্বেও নেপালীদের কাছে ভারতীয়রা অসহ্য। কারণ নেপালে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদুত নিজেকে রাজার চেয়েও শক্তিধর মনে করেন এবং ব্রিটিশ কায়দায় নেপালের বড়লাটের মত আচরণ করে থাকেন। আমি কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নেপালী বন্ধুদের সাথে আলাপ করে জানতে পেরেছি, নেপালে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হোটেল লবি বা তার নিজস্ব স্যুইটে জমিদারী কায়দায় সোফা বা চেয়ারের হাতলের ওপর পা তুলে দিয়ে নেপালী মন্ত্রী বা সচিবদেরকে তলব করে ডেকে পাঠিয়ে ধমক-ধামক দিয়ে নানা তিরস্কারসূচক বাক্যবাণে জর্জরিত করেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের অভিধানে কূটনৈতিক শিষ্টাচার বলে কোন কিছুর স্থান নেই। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যখন প্রথম সার্কের ধারণাটি দক্ষিণ এশীয় নেতৃবর্গের কাছে উত্থাপন করেন, তখন নেপাল এই প্রস্তাবের মধ্যে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের নিরাপত্তা, উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিরাট সম্ভাবনা দেখে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কূটনৈতিক দিক থেকে ভারতের ওপর একদেশ নির্ভরতার অচলায়তন ভাঙার জন্য নেপাল চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগও গ্রহণ করে। এতেই ভারত চটেমটে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব ও তার পরিবারবর্গের ভাগ্য সেদিনই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৯ সালে চীনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে গিয়ে ভারতের হুমকির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও নেপালের রাজা নেপালের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করেননি। তারই প্রমাণ পাই আমরা বাংলাদেশ যখন গঙ্গার বিষয়ে নেপালকে নিয়ে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করে, তখন ভারত নেপালকে পাশকাটিয়ে বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক বলে বারবার বাংলাদেশের নতজানু সরকারগুলোকে যেভাবে ডিকটেট করে এসেছে, তার অভিজ্ঞতা নেপাল ভারতের সঙ্গে মহাকালী চুক্তি সম্পাদনের সময়ে খুব ভাল করেই মনে

www.pathagar.com

রেখেছিল। ৭৫ বছর মেয়াদী এই চুক্তির বলে ভারতের যেমন স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, তেমনি নেপালের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পানি ও বিদ্যুতের ব্যবহারের ন্যায়সঙ্গত বিভাজন চুক্তিতে উল্লেখ করে গ্যারান্টিক্লজ যুক্ত করা হয় এবং চুক্তি বাস্তবায়নে বিরোধ দেখা দিলে আন্তর্জাতিক সালিশের বিধানও ঐ চুক্তিতে রাখা হয়। তারপরও এই চুক্তি নেপালী আইনসভায় পাস করানোর জন্য দীর্ঘ উত্তপ্ত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং অসামরিক পোশাকে ভারতীয় কমান্ডোরা নেপালে অনুপ্রবেশ করে নেপালে ভারতীয় তাঁবেদারদের যোগসাজশে এই বিতর্ক চলাকালে নেপালী আইনসভা ভবনটি ঘিরে রাখা হয়। এর পরেও ভোটাভুটিতে দেখা যায়, পার্লামেন্ট সমসংখ্যায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন নেপালের অসুস্থ বৃদ্ধ এক কমিউনিস্ট সদস্যকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে হাসপাতাল থেকে স্ট্রেচারে করে এনে চুক্তির পক্ষে ভোট আদায় করে চুক্তিটি পাস করা হয়। এ থেকেই বোঝা যায়, নেপালী রাজনীতিতে ভারতের হস্তক্ষেপ ও তৎপরতার গভীরতা কোন পর্যায়ের। বর্তমানে নেপালে I, C বা Indian Currency কোন নেপালী গ্রহণ করতে চায় না। N.C বা নেপালী কারেন্সীর মাধ্যমে এমনকি কোন পর্যটক যদি কোন লেনদেন করতে না চায়, তাহলে তিনি তীব্রভাবে তিরস্কৃত হন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের নামে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ভারত নেপালের রাজবংশকে নির্মূল করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি ও ধীরশক্তিসম্পন্ন রাজা বিক্রম শাহদেব সমস্ত কিছু বুঝে শুনে উপলব্ধি করেন এবং গণতন্ত্রের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের অধীনে গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মানের সিদ্ধান্ত নেন। তার এই সিদ্ধান্তকে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলসমূহের সহযোগিতায় তিনি তা বাস্তবায়নও করেন। ঐসব রাজনৈতিক দল রাজাকে জাতীয় ঐক্য অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা ও সংহতির ব্যক্তিকরণ ও প্রতীক হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও কৃষ্টি গড়ে তোলার সংবিধানে রাজাকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটিই ভারতীয় আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের মনঃপূত হয়নি বোধ হয়। এখানেই সম্ভবত নিহিত রয়েছে তার এই মর্মন্তুদ হত্যা রহস্য।

মাহবুব উল্লাহ :

নেপালের আধুনিক ইতিহাস ভুগোল ও ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার এবং আপন জাতীয় সত্তা অনুসন্ধানের প্রয়াস থেকেই বিবর্তিত হয়েছে। নেপালের এই স্বরূপ অন্বেষণ গোড়খালী রাজা পৃথ্বি নারায়ণ শাহ কর্তৃক ১৭৬৮ সালে কাঠমন্ডু উপত্যকা অধিকারের পর থেকে প্রবল হয়ে ওঠে। এই সময়কাল থেকেই নেপালের আধুনিক ইতিহাসের সূচনা। চীন ও ভারতের মাঝখানে নেপালের নাজুক অবস্থানকে উপলব্ধি করে পৃথ্বিনারায়ণ তার বংশধরদের উপদেশ দিয়েছিলেন, কখনই এই দুই শক্তির কারোর সঙ্গে অতি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করবে না। অন্যথায় নেপাল আধিপত্যবাদের শিকারে পরিণত হবে। অভ্যন্তরীণভাবে পৃথ্বি নারায়ণ শাহের শাসন ছিল হিন্দুধর্মীয় মূল্যবাধ এবং সামরিক বীরত্ববোধে উদ্বুদ্ধ। নেপালের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এসব মূল্যবোধের প্রবল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

শাহদের শাসনের পরিবর্তে নেপালে রানা পরিবারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৬ সালে এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের পর। ১০৪ বছর ধরে শাহ রাজারা ক্ষমতার নেপথ্যে ছিল এবং কেবল নামমাত্র শাসক ছিল। রানাবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে নেপালের জনগণ, রাজা ও ভারত সরকারের উদ্যোগে শাহ রাজাদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালের পর থেকে শাহবংশীয়রাই নেপালের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু নেপালে গণতন্ত্র বিকাশের সুযোগ পেল না। ১৯৬০ এর ডিসেম্বরে নেপালী কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারকে রাজা মহেন্দ্র জনগণকে বিভক্ত করা ও জাতিদ্রোহিতার অভিযোগে বরখাস্ত করেন। আশির দশকে পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্রের জোয়ারে নেপালেও গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন শুরু হয়।

www.pathagar.com

রাজা বীরেন্দ্র দলবিহীন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার অবসান ঘোষণা করেন। নেপাল পরিণত হয় সাংবিধানিক গণতন্ত্রে।

ডঃ আফতাব সঠিকভাবেই বলেছেন, নেপালের রাজা স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার পবিত্র প্রতীক। নেপালের রাজার মতো পৃথিবীর আরও কিছু রাজা আছেন যারা নিজ নিজ দেশের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতার প্রতীক। এক্ষেত্রে আমরা থাইল্যান্ড ও জাপানের সম্রাটের কথা বলতে পারি। নেপালের মত এই দেশ দু'টিতেও রাজা রাজতন্ত্র, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাকে সংরক্ষণের প্রতীকরূপে গণ্য হন। দেশের অভ্যন্তরীণ যে কোন রাজনৈতিক সংকেট রাজার ভূমিকা জাতিকে অস্থিতিশীলতার হাত থেকে রক্ষা করে। নেপালী জনগণ তাদের রাজাকে খুব ভালবাসতেন। রাজার প্রতি ছিল তাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। রাজাও রাজনৈতিক গৃহবিবাদে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিতে সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করতেন। এ কারণে নেপালের ভৌগোলিক বাস্তবতার নিরিখে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রধান হিসেবে রাজার অবস্থান ছিল অনন্য। যে আধিপত্যবাদী শক্তি নেপালের সার্বভৌম অস্তিত্বকে ঘৃণার চোখে দেখে, নেপালী জনগণের স্বাকীয়তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শন করে, তারা এরকম একটি দেশপ্রেমিক রাজবংশকে সুযোগ পেলে সমূলে উচ্ছেদ করতে চাইবে, এরকম কিছু সন্দেহ করলে অন্যায় কিংবা অস্বাভাবিক হবে কি? নেপালের জনগণ তীব্রভাবে দেশপ্রেমিক। এই তো ক'দিন আগে ভারতের ফিল্মস্টার ঋত্বিক রোশনের একটি কথিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে নেপালের জনগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে কাঠমন্ডুর রাজপথে নেপালী জনগণ রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। সাংবিধানিকভাবে নেপাল পৃথিবীর একমাত্র ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্র। নেপালের জনগণ ভারতের অভিপ্রায় ও অভিলাষ সম্পর্কে সতত সন্ত্রস্ত ও সন্দেহপ্রবণ। কাঠমন্ডুতে যখন ভারতের সশস্ত্র পুলিশ রাতের অন্ধকারে প্রবেশ করে সে দেশের ১৫ জন নাগরিককে হাইজ্যাক করে নিয়ে অথবা সড়ক দুর্ঘটনার আবরণে সে দেশের একজন তেজি কমিউনিস্ট নেতাকে হত্যা করে, তখন নেপালী জনগণ ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হতে পারে না। আর এবার যখন নেপালের রাজপরিবারকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল, তখন নেপালী জনগণের জিজ্ঞাসা ও সন্দেহের সমাধান করবে কে?

www.pathagar.com

১৪ জুন ২০০১

রাজনীতিতে ব্যবসায়ী শ্রেণীর জাতিদ্রোহী মানসিকতা

মাহবুব উল্লাহ :

'আসন্ন সংসদ নির্বাচনে দেড় শতাধিক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মনোনয়ন লাভের তদ্বির করছেন-' এই শিরোনামে গত পহেলা জুন ২০০১ দৈনিক ইনকিলাবে একটি সংবাদভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে। ভাষ্যে বলা হয়, 'আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেড় শতাধিক শিল্পপতি-ব্যবসায়ী নেতা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য চেষ্টা-তদবির করছেন। ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)'র সভাপতি থেকে শুরু করে রেন্ট-এ কারের ব্যবসায়ী পর্যন্ত বড় বড় দল থেকে নানা কৌশলে গ্রুপিং-লবিং করছেন। -----যারা আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচনের স্বপ্ন দেখছেন, তারা তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠজন, উপদেষ্টা, প্রভাবশালী মন্ত্রীদের মাধ্যমে। বর্তমান সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুতে একাত্মতা প্রকাশ করছেন বক্তৃতা-বিবৃতির পাশাপাশি মোটা অংকের অনুদান দিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে সোনা-রূপার ক্রেস্ট দিচ্ছে। বিরোধী দলের হরতাল কর্মসূচীর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে তা ফলাও করে প্রচার করছেন বাহবা আদায়ে।-----প্রধান বিরোধীদল বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীরাও দলের উচ্চমহলে চেষ্টা তদবির অব্যাহত রেখেছেন'। ইনকিলাবের ভাষ্যকার উভয় দল থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাও প্রকাশ করেছেন। সেই তালিকার পুনরাবৃত্তি আমরা করতে চাই না। কারণ, তা শোভন হবে না।

ইনকিলাবের ভাষ্যকার যে বিষয়টি উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছেন, তা হলো ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের বড় দুটি দল থেকে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য খুব বেশী গ্রুপিং-লবিং করতে হয় না। দুটি দলই এই শ্রেণীর প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে অত্যন্ত উৎসাহী। কারণ এতে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করা ও দলীয় তহবিল সমৃদ্ধ করা যায় এবং যারা নমিনেশনের ফেরী করেন, তাদের পকেট ভর্তি করার জন্য এরকম প্রার্থীকেই নমিনেশন দিতে ইদানিং বেশী উৎসাহ দেখা যায়। তাছাড়া, প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল কতোটা মাস পার্টি অর্থাৎ, জনগণের দল, আর কতোটা বিজনেসমেন'স ক্লাব, তা এদেশের ভুক্তভোগী জনগণ হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছে।

বস্তুত গত ৫০ বছরে এদেশের রাজনীতিতে ব্যবসায়ীরা ক্রমান্বয়ে তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে চলেছে। ১৯৯১ ও ৯৬ সালে যে সকল প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের পেশাগত বিন্যাস পর্যালোচনা করলে এই বক্তব্যের পেছনে তথ্যগত সমর্থন পাওয়া যায়। ঢাকার একটি গবেষণা সংস্থা Power and Participation Research Centre (PPRC) ১৯৯১ ও ৯৬-এর সংসদ নির্বাচন প্রার্থীদের পেশাগত বিন্যাসের তথ্য উপস্থাপন করে বলেছে, ১৯৯১ সালে প্রার্থীদের মধ্যে কৃষক ছিলেন, ৯%,ক্ষুদে ব্যবসায়ী ৭%, পেশাজীবী ৩৭%, বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ৪৫%, এবং রাজনীতিকে যারা পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, তাদের তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে কৃষক ছিলেন ৩%, ক্ষুদে ব্যবসায়ী ৪% পেশীজীবী ২৮%, বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ৪৪% এবং পেশাদার রাজনীতিবিদ ২১%।

www.pathagar.com

লক্ষণীয় যে, সংসদ নির্বাচনে ১৯৯১ সালের তুলনায় ১৯৯৬ সালে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের অবস্থানও দুর্বল হয়েছে। কৃষকদের অবস্থানও শোচনীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমনিতেই প্রার্থীদের মধ্যে কৃষিজীবীদের সংখ্যা নগণ্য-সেই সংখ্যা আরও হ্রাস পাওয়া সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। কিন্তু বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অবস্থানের কোনো হেরফের হয়নি। এখন দেখা যাক, ১৯৯৬ সালে দলগতভাবে ৪টি প্রধান দলে কোন গোষ্ঠির অবস্থান কেমন ছিলো। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের মধ্যে কৃষকদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বিএনপি প্রার্থীদের মধ্যে কৃষক ১%, জাতীয় পার্টিতে ৪%, জামায়াতে ইসলামীতে ৪%। বিএনপিতে ছোট ব্যবসায়ী ১%, আওয়ামী লীগে ২%, জাতীয় পার্টিতে ৫% ও জামায়াতে ইসলামীতে ৩%। ছোট ব্যবসায়ী প্রার্থীর সংখ্যা জাতীয় পার্টিতে বেশি। পেশাজীবীর প্রার্থীর সংখ্যা বিএনপির ১৮%, আওয়ামী লীগের ২০%, জাতীয় পার্টির ২০% এবং জামায়াতে ইসলামীর ৫৭%। বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি প্রার্থীর সংখ্যা বিএনপির ৫৬%, আওয়ামী লীগের ৫১%, জাতীয় পার্টির ৫৩% এবং জামায়াতে ইসলামীর ১৬%। রাজনীতিই যাদের প্রধান পেশা ১৯৯৬-এর সংসদ নির্বাচনের বিএনপি থেকে এমন প্রার্থী হয়েছিলো ২৪%, আওয়ামী লীগ থেকে ২৪%, জাতীয় পার্টি থেকে ১৮% এবং জামায়াতে ইসলামী থেকে ১৯%।

লক্ষণীয় যে, ৪টি প্রধান দলের প্রার্থীদের মধ্যে ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে কৃষক (এক্ষেত্রে ধনী কৃষক)দের প্রতিনিধিত্ব খুবই সামান্য। বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিতে শতকরা পঞ্চাশেরও অধিকহারে এমপি প্রার্থী হয়েছে। এই তিনটি দলের মধ্যে বিএনপিতে বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি প্রার্থীদের সংখ্যা সর্বাধিক। এই পরিসংখ্যান থেকে যা পরিদৃষ্ট হয়, তা হলো, সমাজের সবচাইতে সংখ্যালঘিষ্ট শ্রেণীটি আমাদের জাতীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সবচাইতে বেশি হারে প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেই শক্তিবলে তারা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়। সংসদ নির্বাচনে বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের এই ভারসাম্যহীন উপস্থিতি জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা, সম্পদের বণ্টন ও জাতীয় স্বার্থের উপর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, সেটাই আজকের বিবেচ্য বিষয়।

আফতাব আহমাদ :

১৯৭০-এর নির্বাচন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভাসহ বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থায় প্রতিনিধিদের আর্থ-সামাজিক ভিত্তির উপরে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। স্থানীয় সংস্থাসমূহের ক্ষমতাকাঠামো খতিয়ে দেখতে গিয়ে গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন যে, মাঝারী ও ধনী কৃষকদের প্রাধান্য দৃঢ়মূল হয়েছিলো। কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিলো পেশাজীবীদের এবং পেশাজীবীদের মধ্যে প্রাধান্য ছিলো উকিল-মোক্তারদের। এ থেকে যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা হলো, গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামো ধনী ও মাঝারী কৃষকদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার কারণে পেশাজীবীরাই, বিশেষ করে আইনজীবীরা শহরকেন্দ্রিক রাজনীতি ও আন্দোলনে বিপুল প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেই সুবাদে কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগও তাদের বেশি ছিলো। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে যারা প্রতিনিধিত্ব করতেন, তাদের সমর্থনও কিন্তু এরা পেতেন এবং সে কারণেই ভূমি সংস্কারসহ গণমুখী কোনো পদক্ষেপকে ধনী ও মাঝারি কৃষকরা এগুতে দেননি। ১৯৭১-এর অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের কারণে রাতারাতি পরিস্থিতি পাল্টে গেলো। "অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ" বলছি এই অর্থে যে, বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে স্বীয় পরিকল্পনা মোতাবেক যুদ্ধটি পরিপূর্ণভাবে পরিচালিত হতে পারেনি এবং এই যুদ্ধটি তার যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছার আগেই ভারতীয় হস্তক্ষেপ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। মতাদর্শবিহীন একশ্রেণীর লোক আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার টিপতে অভ্যস্ত হয়ে উপলব্ধি

www.pathagar.com

করলো যে, সংগঠন নয়, আদর্শ নয়, ট্রিগার টিপতে পারলেই সম্পত্তি দখল করা যায়, ক্ষমতাবান হওয়া যায়, ক্ষমতার কারবারী হওয়া যায়। এজন্যই ১৯৭৩-এর জাতীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলোর দিকে তাকালে আমরা একটি নতুন চিত্র পাই। পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পাওয়া শুরু করলো, ধনবান ও বিত্তবানদের পর্যায়ক্রমিক উত্থান সূচিত হলো, গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামোর ক্ষেত্রে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে বিদায় দিয়ে একটি অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী-ডুর্খাইমের ভাষায় বলতে গেলে, Anomie (সামাজিক মূল্যমান বিবর্জিত) গোষ্ঠির উদ্ভব হয়, যারা রাতারাতি ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃত্ব দখল করে নেয়। অর্থাৎ পুরানো মূল্যবোধ ও পুরানো কৃষ্টিতে একটি ধস নামে।

আজ ১৯৯৬-এর নির্বাচন পর্যন্ত এসে দেখা যাচ্ছে যে, অস্ত্রনির্ভর ক্ষমতা দখলের যে রাজনীতি গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে শহরের ঠিকাদারী ও ব্যবসা লাভের ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, তাতে কালো টাকা বা দুর্বৃত্ত পুঁজি এবং পেশীশক্তি সবকিছুর নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ গণসংগঠনগুলোতে আজকাল অর্থ ও বিত্ত বৈভব যাদের আছে, তাদের দৌরাত্মে ত্যাগী ও আদর্শনিষ্ঠ কর্মী-সমর্থকদের নাভিশ্বাস উঠেছে। অবশ্য একথা বলে রাখা ভালো রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় মূল প্রতিদ্বন্দ্বী যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে বলতে গেলে আদর্শের পার্থক্য যতো না, তার চাইতে স্বার্থের ঐক্যই অনেক বেশি পরিদৃষ্ট হয়। বিরোধটি হচ্ছে, ব্যক্তি ও গোষ্ঠি পর্যায়ে-ক্ষমতার নাগরদোলায় আগে-পিছে পালাক্রমে কে কখন বসবে তাকে কেন্দ্র করে। এই স্বার্থগোষ্ঠিটি একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যদিয়ে ক্ষমতায় থাকে, আরেকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যদিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রত্যাশী হিসেবে একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এই সংঘাত বা বিরোধ নিরঙ্কুশ নয়, আপেক্ষিক। আর তাই, যখনই কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয় জাগ্রত জনতার রাজনীতির নিয়ন্তা হবার, তখনই পর্দার আড়ালে কালো টাকা ও দূর্বৃত্ত পুঁজির মালিকরা এক ধরনের সমঝোতায় পৌছে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষমতা কাঠামোর ভারসাম্য বিনষ্ট না করে ক্ষমতায় পরিবর্তন আনার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আন্দোলনের ওপর এক ধরনের লাগাম টেনে ধরেন। তবে যাঁরা আদর্শভিত্তিক রাজনীতি করেন, এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে সেরকম দুয়েকটি সংগঠন এ অবস্থায় ভীষণ বেকায়দায় রয়েছে। এ কারণেই পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে আমরা লক্ষ্য করবো, আদর্শভিত্তিক দলগুলোতে এখনও মোটামুটি একাত্তর-পূর্ব যে আর্থ-সামাজিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যেতো, তা এখনও অব্যাহত আছে। অর্থাৎ, এইসব দলে শিক্ষিত ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবীদের প্রাধান্য এখনও অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। যদিও জাতীয় পর্যায়ে বড়বড় দলগুলোকে মোকাবিলা করতে গিয়ে তাদেরকেও মাঝেমাঝে অস্ত্র ও সহিংসতা নির্ভর হয়ে উঠতে হয়। কিন্তু বড় বড় দলগুলোর ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যতো মতাদর্শগত ঝগড়া ও বিরোধের কথা বলা হোক না কেন, ব্যবসায়ী বিশেষ করে কালোটাকার ব্যবসায়ী, দূর্বৃত্ত পুঁজির মালিক- সন্ত্রাস এবং সহিংসতায় মাধ্যমে অর্থনীতিকে যারা কব্জা করে রাখতে চান তারাই নিজেদের মধ্যে আপসরফা করে বিভিন্ন দলে যোগ দিয়ে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসছেন অধিক সংখ্যায়। এর সপক্ষে আমি একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত হাজির করতে চাই। বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট ধনিক গোষ্ঠি, যারা ফার্মাসিউটিকালস সেক্টরে বেশ শক্তিশালী অবস্থান নিয়েই আছে, গোষ্ঠিগতভাবে তারা সকলে একটি নির্দিষ্ট দলের সমর্থক। কিন্তু ৯১ সালে এই গোষ্ঠির জনৈক প্রতিনিধি মনোনয়ন বিষয়ে আলাপ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সংসদ সদস্য হতে গেলে ঐ এলাকায় তার বিরুদ্ধ পক্ষের মনোনয়ন লাভ করতে হবে। তাই তিনি যে দলকে পছন্দ করতেন, সে দলের কোষাগারে মোটা অংকের চাঁদা দিয়ে তাঁর অপছন্দের দলটিকে বেছে নিয়ে ঐ দলের কোষাগারেও মোটা অংকের চাঁদা দিয়ে নমিনেশনটা পাকাপোক্ত করেন। এহেন ব্যক্তি কোন আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করেন? আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশে স্বার্থগোষ্ঠি ও চাপগোষ্ঠিভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনও পাশ্চাত্যের

www.pathagar.com

মতো গড়ে ওঠেনি। সব একাকার হয়ে আছে। আসলে মূলত এটি আমাদের সমাজ ও অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্যা। যেহেতু রাষ্ট্রকে দখল করেই আমাদের বিত্ত-বৈভব ও সম্পদের জন্ম হয় ব্যক্তি পর্যায়ে, সেহেতু আদর্শ নির্বিশেষে লক্ষ্যটি হলো যেনতেনভাবে টাকাওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে দল ভারী করে সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো। এক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন, আঞ্চলিক পরিমন্ডলে ভূ-রণনৈতিক, ভূ-অর্থনৈতিক বিষয়গুলো গৌণ হয়ে পড়ে। আজ বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে বন্ধ্যাত্ব আমরা লক্ষ্য করছি, তার মূলে রয়েছে প্রধানত এই কারণটিই।

মাহবুব উল্লাহ :

ড. আফতাব একাত্তর-পূর্বকালে রাজনীতিতে পেশাজীবি, বিশেষ করে আইনপেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্যদের কথা বলেছেন। ব্রিটিশ আমলেও রাজনৈতিক নেতৃত্বে আইনজীবীদের প্রাধান্য ছিলো। জিন্নাহ-গান্ধী, ফজলুল হক-সোহরাওয়ার্দীসহ ব্রিটিশ ভারতের অনেক রাজনীতিবিদই আইনপেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আইনপেশাটিরও একটি সীমাবদ্ধতা আছে। এক সময়ের নামকরা রাজনীতিক,কূটনীতিবিদ ও আওয়ামী লীগ–নেতা মরহুম কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর 'Social History of East Pakistan' গ্রন্থে আইনজীবী নেতৃত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'এরা হলো Precedence Seekers' অর্থাৎ অতীত থেকে দৃষ্টান্ত খোঁজায় এরা সবসময়ে ব্যস্ত থাকে। ওকালতি পেশায় সফল হতে গেলে অতীতের মামলার রায় থেকে দৃষ্টান্ত টেনে তাঁরা বিচারককে বুঝ মানাতে সচেষ্ট হন। যেমনটি বলা হয়, ১৮৭১ সালে প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে এ কথা বলা হয়েছিল কিংবা ১৯০৩ সালের মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়ে ও কথা বলা হয়েছিল। এ কারণে আইনজীবীরা স্বভাবতই অতীতে বিচরণ করেন। ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারেন না। ফলে, এই নেতৃত্ব অবধারিতভাবে কোনো আর্থ-সামাজিক সংস্কারে দৃঢ় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়।

একাত্তর-পূর্ব রাজনীতিতে পাকিস্তানের ব্যবসায়ীশ্রেণী খুব সীমিতভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তারা সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে চাইতো না, সংসদ নির্বাচনে খুব একটা অংশগ্রহণ করতে চাইতো না। এমনকি সংসদ সদস্যদের মধ্যে খুব একটা লবিংও করতো না। এর কারণ হলো, পাকিস্তানী রাজনীতিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংসদের ভূমিকা খুবই স্বল্পকালের জন্য বিদ্যমান থাকায় রাজনীতিতে সরাসরি ভূমিকা রাখতে তাদের মধ্যে অনীহা। পাকিস্তানে যখন সংসদ কার্যকর ছিলো, তখন যে সমস্ত ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক, যাদের প্রধান পেশা ছিলো রাজনীতি, তারাই পাকিস্তানের স্বল্পমেয়াদী সংসদে অংশগ্রহণ করেছে। এদের প্রত্যেকেরই' ৪৭ পূর্বকালে সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা ছিলো। পাকিস্তান হবার পর এরা গভর্ণর, মুখ্যমুন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত ও ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এদের মধ্যে তিনজন-জনাব এমএএইচ ইস্পাহানী, হাবীব রহিমতুল্লাহ এবং ইউসুফ হারুন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। চতুর্থ ব্যক্তিটি জনাব আমজাদ আলী যিনি ৪৭ পূর্বকালে পাঞ্জাবের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন, তিনি ১৯৫৪'র পরে মুসলিম লীগ যখন ভেঙে যায়, তখন পাকিস্তানী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এসব রাজনীতিবিদ পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পেরেছিলেন– মুসলিম লীগ ও জিন্নাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে এবং মুসলিম লীগ যে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের কথা বলতো, সে কারণে। জিন্নাহর মতো তাঁরা ভাবতেন, পাকিস্তান ব্রিটিশ ও হিন্দু দাসত্ব মুক্ত হয়ে মুসলিম জাতির জন্য বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাঁরা ভাবতেন, পাকিস্তান হওয়ার ফলে মুসলিম ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য থেকে শিল্পের দিকে অগ্রসর হবে।

১৯৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হয়। পাকিস্তান চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে তৎকালীন

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব খুবই সীমাবদ্ধ ছিলো। এ কারণে প্রথমদিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা পাকিস্তান চেম্বারের সাংগঠনিক ও গঠণতান্ত্রিক পূনর্বিন্যাসের দাবী করেছিলেন। দাবী ছিলো, এই চেম্বারে পূর্ব পাকিস্তানী ও পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে। কিন্তু ১৯৬৭'র পর সংখ্যা সাম্যের দাবী বিচ্ছিন্নতার দাবীতে রূপ নিলো। পূর্ব পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা তাদের নিজেদের জন্য আলাদা চেম্বার গঠনের দাবী করলেন। ১৯৬৭-তে এই বিরোধ নিয়ে যে আপস হয় তা হলো, কেন্দ্রীয় চেম্বারে সংখ্যা সাম্যমূলক প্রতিনিধি থাকবে। কিন্তু এই আপস খুব ক্ষণস্থায়ী হয়। ৬৬'র ছয় দফা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে চেম্বারের আমূল পূনর্গঠনের দাবী জোরদার হয়। ১৯৬৮-৬৯ মেয়াদের জন্য ঢাকা চেম্বারের সৈয়দ মোহসীন আলিম বাঙলি প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তান চেম্বারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় পাকিস্তান চেম্বারের সামগ্রিক পুনর্গঠনের দাবী আরো জোরদার হয়। এভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা পাকিস্তান চেম্বারে পূর্ব পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারত-বাংলাদেশ বিশাল বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতার প্রেক্ষাপটে এইবিসিসিআই নেতারা তাদের পূর্বসূরীদের অনুকরণে তেমন কোনো জোরালো ভূমিকা রাখতে পারছেন না। উল্টো লক্ষ্য করা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে ভারতের প্রস্তাবিত ফাঁদে পা রাখেন।

একাত্তর পরবর্তীকালে গোটা সমাজের চেহারা বদলে গেছে। কিন্তু সে চেহারা কোনোক্রমেই দৃষ্টিনন্দন নয়। বড্ড কুৎসতি, রীতিমতো ভীতিপ্রদ। এ সময়ে গ্রামীণ সমাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় সর্বস্তরে এই বিভীষিকা লক্ষ্য করা যায়। গ্রামে পুরাতন মুরুব্বী ইজ্জতবান ও ভদ্র অভিজাতদের পরিবর্তে এক শ্রেণীর অপরিণত বয়স্ক সন্ত্রাস শিল্পে দক্ষ এবং গ্রাম বহির্ভূত সম্পদের ব্যবস্থাপনায় চতুর ব্যক্তিরাই প্রাধান্য অর্জন করেছে। এরা স্থানীয়ভাবে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থার উপর কবজা প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদের জন্য অর্থবিত্ত বাগিয়ে নিতে ভীষণ পটু। রাজনীতিতে বড় ব্যবসায়ীরা যে দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তার মূলে রয়েছে, আমাদের বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর এবং আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবিশিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এখন, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহ এবং বিদেশী দাতাগোষ্ঠি এ দেশের জন্য বড় বড় প্রকল্পের অর্থের যোগান দেয়। এসব প্রকল্প, আন্তর্জাতিক কেনাকাটা ও সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং এগুলো থেকে কামধেনুর মত দোহনের জন্য মোক্ষম অস্ত্রটি হলো কোন একটি বড় দলের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করা। ভারতের সবেক পররাষ্ট্রসচীব জে. এন. ডিকশিটের মতে, বাংলাদেশ একটি Mercantile and Consumerist Middle Class-এর উদ্ভব ঘটেছে। তিনি যে তথ্য পেশ করেছেন, সে মোতাবেক বাংলাদেশের ব্যবসায়ী শ্রেণীর ব্যবসায়িক সম্পর্ক পাকিস্তান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে। তাহলে কথাটা দাঁড়ালো কী? কোন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য হয়, তা একটি দেশের জাতীয় নিরাপত্তা নীতিকে প্রভাবিত করে বলেই তিনি ব্যবসায়িক পার্টনার দেশগুলোর নাম উচ্চারণ করেছেন, যা তাঁর দৃষ্টিতে কাম্য নয়।

কিন্তু বাস্তবতাটা কী? বাংলাদেশ এখন ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম বাজার। বাংলাদেশী বাজারে ভারতীয় পণ্যের ছড়াছড়ি। ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, বারিধারার আবাসিক এলাকাগুলোতে জরীপ চালালে অবধারিতভাবে দেখা যাবে, ভারতীয় ব্যবসায়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী-কর্মকর্তারা শত শত বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করছেন। ভারতীয় নাগরিকদের অবৈধভাবে বাংলাদেশ অবস্থানের খবর কোন কোন প্রধান জাতীয় দৈনিকে সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষকে অনুসন্ধানের জন্য নামকা ওয়াস্তে কিছু নির্দেশ দেয়া হলেও সত্যিকার কোন তদন্ত হয়নি। সুতরাং বাংলাদেশের ব্যবসায়ী শ্রেণী ব্যবসায়িক যোগাযোগের কারণেই অনেকাংশে ভারত মুখাপেক্ষী। ভারতীয় বাজারে

www.pathagar.com

ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতামুক্ত ভাবে প্রবেশের দাবির মুখে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা অন্তত মুখে মুখে ভারত বিরোধী, তারাও ভারত ছাড়া আর কোন ব্যবসায়িক পার্টনারের কথা ভাবতে পারে না। যতদূর জানা যায়, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজর দু'জন প্রভাবশীল নেতা প্রভাবশালী মুসলিম লীগারের সন্তান হয়েও ভারত পন্থীদের সংগে নানা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে যখন সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, তখন দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। ইতিহাসে মীরজাফরকে 'মীরজাফর' হিসেবে চিহ্নিত করে যত কথা বলা হয়েছে, ব্রিটিশ বেনিয়াদের পরম বিশ্বাসভাজন ও সিরাজউদ্দৌলা বিরোধী চক্রান্তের মূল হোতা জগৎশেঠের বিরুদ্ধে তত কথা লেখা হয়নি। অথচ জগৎশেঠ শঠতা ও কুটিল চক্রান্তে জড়িত না হলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারতো না। বণিকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিত না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বণিক শ্রেণীর দেশের মাটির প্রতি আনুগত্য সম্ভবত সবচাইতে কম। কারণ তারা তাদের বিত্ত সম্পদের জন্য অন্য রাষ্ট্রের সংগে যোগসূত্রের উপর বেশী নির্ভরশীল।

বাংলাদেশে আরেকটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচন নিয়ে যথেষ্ট সংশয়-সন্দেহ থাকলেও বণিক প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সীমান্ত সংলগ্ন ও দূরের দেশগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়ায় লিপ্ত হয়েছে বলে নানা মহলে কথা উঠেছে। একটা ভ্রান্ত ও জাতিদ্রোহী মানসিকতায় আক্রান্ত হয়ে কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছেন, দিল্লী ও ওয়াশিংটনের কৃপা লাভে সক্ষম না হলে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া যাবে না। এরা দেশের মানুষকে আস্থায় নিতে চায় না। সংগঠিত করতে চায় না। চায় না তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের অগ্নি শিখা ছড়িয়ে পড়ুক। তাই, শংকিত হই এ কথা ভেবে যে, বাংলাদেশের গ্যাস কি রফতানি করা হবে? চট্টগ্রাম বন্দর কি ইজারা দিয়ে দেয়া হবে? ভারতকে সামরিক করিডোর দিয়ে দেয়া হবে? তখন বাংলাদেশের মানুষ কিভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে, সেটা বোধ হয় এই অপরিণামদর্শী রাজনীতিবিদরা ভাবতে পারছেন না। তাদের জানা উচিত, 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। বুঝে নিক দুর্বৃত্ত'– এই উক্তি কবি বৃথাই করেননি।

www.pathagar.com

২১ জুন ২০০১

বেগম খালেদা জিয়ার সফর কাফেলার ওপর হামলা

মাহবুব উল্লাহ :

সংবিধান অনুযায়ী আগামী ১৩ জুলাই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ কর্মদিবস। এরপর গঠিত হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব হল ৯০ দিন মেয়াদের মধ্যে জাতিকে একটি সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপহার দেয়া। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচ বছরের জন্য কিংবা যদি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় সেক্ষেত্রে পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ৫ বছরেরও কম সময়ের জন্য একটি সরকার গঠিত হতে পারে। ৫ বছরেরও কম বলছি এ কারণে যে, কোয়ালিশন সরকারের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। নির্বাচনের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি না হলে নির্বাচনের ফলাফল জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। সেক্ষেত্রে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত থাকবে এবং দেশের অগ্রগতি ও কল্যাণ চরমভাবে ব্যাহত হবে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কামনা করে না এ ধরনের শক্তি বা গোষ্ঠি দেশের ভেতরে ও বাইরে দীর্ঘদিন ধরে ক্রিয়াশীল রয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার ফল হিসাবে আমরা লক্ষ্য করেছি এদেশের দু'জন রাষ্ট্রপ্রধান নিহত হয়েছেন। নির্বাচিত সংসদ বাতিল করে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। রাজপথে আন্দোলন ও বিক্ষোভের ঝড় উঠেছে। মেয়াদ ফুরাবার আগেই সরকারগুলোকে বিদায় নিতে হয়েছে। রাজনীতির এই অস্থিরতা কেবলমাত্র রাজনীতির অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষাঙ্গন, চিকিৎসাঙ্গন, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, এমনকি দেশের নিরাপত্তার যে ভরসাস্থল সেনাবাহিনীর মতো প্রতিষ্ঠানও অস্থির হয়ে উঠেছে। অবশ্য, আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনী ক্রমান্বয়ে একটি স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। তৎসত্ত্বেও মাঝে মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটিতেও অস্থিরতার বুদবুদ ওঠে। ১৯৯৬'র ২০ মে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন থাকার সময় এ রকম ঘটনা ঘটেছিল। জাতির সৌভাগ্য, বিনা রক্তপাতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সময়োচিত সাহসিকতাপূর্ণ দৃঢ়চিত্ত সিদ্ধান্তের ফলে সেবারকার মতো সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। ১৯৯৬'র আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা সংবিধানে সংযোজিত করার দাবীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জ্বালাও পোড়াওসহ এক দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে সংঘাত ও মোকবিলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই দেশবাসী শংকিত হয়ে পড়ছেন। অরাজকতা, বিশৃংখলা, খুনাখুনি ও ধ্বংসযজ্ঞে দেশটা বোধহয় ছারখার হয়ে যাবে। এমনিতেই গত দু'তিন বছর ধরে দেশে একের পর এক যেসব হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, তাতে দেশবাসী কিভাবে নিশ্চিত হবে যে, ভোট কেন্দ্রে তাদের গমন কিংবা প্রত্যাগমন নির্বিবাদে, নিঃসংশয়ে ও নিরাপদভাবে ঘটবে? যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে লোমহর্ষক বোমা বিস্ফোরণের পর ধারাবাহিকভাবে একের পর এক প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছে এবং একটি পত্রিকার হিসাব মতে, এ পর্যন্ত ৪৭ জন এ ধরনের বোমা বিস্ফোরণের ফলে নিহত হয়েছেন। যশোরে উদীচী অনুষ্ঠানে বোমা, গোলাপগঞ্জের কোটালীপাড়ায় অবিস্ফোরিত মারাত্মক বোমা উদ্ধার, বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার পল্টনের জনসভায় বোমা বিস্ফোরণ, গোপালগঞ্জের বানিয়ারচরে খ্রীস্টানদের চার্চে বোমা বিস্ফোরণ, সিপিবির জনসভায় বোমা বিস্ফোরণ, পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণ, চট্টগ্রামে উদীচী সম্মেলনে পরপর দুটি বোমা বিস্ফোরণ, আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণ, সবশেষে বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরের উপর উপর্যুপরি সশস্ত্র হামলা এবং ঢাকায়

www.pathagar.com

তার নিহত হবার গুজব–সবকিছু মিলে এক ভয়াবহ ও অশুভ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সরকারী মহল থেকে এসব ঘটনার জন্য চরমপন্থী 'মৌলবাদী'দের তাৎক্ষণিকভাবে দোষী ঘোষণা করা হলেও এ পর্যন্ত কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যাকে ভিত্তি করে বলা যায়, চরমপন্থী 'মৌলবাদী' গোষ্ঠিই এসব বোমা হামালার জন্য দায়ী।

যে কোন দেশে একটি দায়িত্বশীল সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য হল, জনগণের জীবন ও সম্পদ হেফাজত করা। যে গোষ্ঠিই এসব অপতৎপরতার জন্য দায়ী হোক না কেন, সরকার যে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কোন প্রকার জঙ্গীবাদী তৎপরতার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রাণোদিত হয়ে মহলবিশেষকে দায়ী করা দায়িত্ববোধের পরিচায়ক নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, যখনই এ ধরনের ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়, ঠিক তার পর মুহূর্তেই কতিপয় সংস্কৃতির ফেরিওয়ালা ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমের সুযোগ গ্রহণ করে কোন প্রমাণের তোয়াক্কা না করে একটি বিশেষ মহলকে অভিযুক্ত করার শোরগোলে মেতে ওঠে। এরকম দায়িত্বহীন আচরণ শেষ বিচারে বুমেরাং হতে বাধ্য। তথাকথিত মৌলবাদীরা আদৌ দায়ী কিনা তা পরখ না করে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দায়ী করা, তাদের কাউকে কাউকে হয়রানি ও নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। ঘৃণা ঘৃণার জন্ম দেয়। ঘৃণা, প্রতিশোধ, ঘৃণা–এই দুষ্টচক্রের মধ্যে মানুষ যখন একবার জড়িয়ে পড়ে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। 'মৌলবাদ' ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে আজ যাদের হেস্তনেস্ত করা হচ্ছে তাদের কোন সংগঠিত নেটওয়ার্ক আছে কিনা তাও আমরা স্পষ্টভাবে জানি না। বাংলাদেশে গোয়েন্দা সংস্থার অভাব নেই। তাদেরকে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করার সুযোগ দিলে আসল রহস্য যে উদঘাটিত হতে বাধ্য, সে ব্যাপারে আমার দৃঢ় আস্থা আছে। কিন্তু, নিরপেক্ষ তদন্তকে Prejudiced opinion দ্বারা আচ্ছন্ন করা হলে কখনোই সত্য উদঘাটিত হবে না। তথ্যানুসন্ধান ও গোয়েন্দাকর্মে নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারাও মানুষ। তারাও তাদের চাকরি-বাকরি ও রুটিরুজির নিরাপত্তা চান। কিন্তু সরকার ও তার সেবায়েতদের বদ্ধমূল ধারণার ধুম্রজাল ছিন্ন করে সন্ধানুসন্ধানে ব্রতী হতে স্বাভাবিকভাবেই তারা শঙ্কিতবোধ করেন। এ কারণেই এসব লোমহর্ষক ঘটনার সত্যিকার স্বরূপটি জনগণের কাছে অনুদঘটিত থেকে গেছে। অস্বচ্ছতা, দৃশ্যমান হীনতা গণতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে দেয়। যে সমাজে স্বাধীনভাবে তথ্য প্রবাহিত হয় না, সেই সমাজে গণতন্ত্রই হয় আসল ভিকটিম। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তা-ই হতে চলেছে, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। নারায়ণগঞ্জের ঘটনার জের ধরে বেগম জিয়ার সফর কাফেলার ওপর উপর্যুপরি সশস্ত্রহামলা যে অশনি সংকেত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মনে হচ্ছে, একটি মহল মরিয়া হয়ে উঠেছে নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য। এমনিতেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আদৌ এদেশে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা নিয়ে নানা প্রশ্ন। ভোটার তালিকায় অসম্ভব রকম ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি, যা স্বাভাবিক জনমিতির বৃদ্ধির হারকে বহুগুণ ছাড়িয়ে গেছে। এ নিয়ে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে পরপর দুবার আনুষ্ঠানিকভাবে আপত্তি জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের গঠন বিন্যাস নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নির্বাচন কমিশনের একজন সদস্য সরাসরি 'জনতার মঞ্চে' আরোহণ করে বিগত সরকারের বিরুদ্ধে বেআইনী বিদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। এমন নির্বাচন কমিশনের হাত দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে, একথা কেউ বিশ্বাস করে না। পুলিশ প্রশাসন ও জনপ্রশাসনকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হচ্ছে, যার ৩০ শতাংশও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে পুনর্বিন্যাস করা কঠিন হয়ে পড়বে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের যেভাবে দলীয় তৎপরতায় জড়িয়ে ফেলা হয়েছে, তার ফলে এদের পক্ষে কোন সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থাপনা সম্ভব–তাও জনগণ বিশ্বাস করতে চায় না; বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকমণ্ডলীর আগমন সম্পর্কেও খোদ প্রধানমন্ত্রী উষ্মা ব্যক্ত করেছেন। এ থেকেই শাসকদলের মনোভঙ্গি, ইচ্ছা ও অভিলাষ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। সবকিছুর উপরে এসেছে প্রধানমন্ত্রী ও তার ভগ্নীর জন্য আজীবন বিশেষ নিরাপত্তাসূচক সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিলটি। এটি কার্যকর হলে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে

www.pathagar.com

যেভাবে শাস্ত্রি-পেয়াদা পরিবেষ্টিত হয়ে শেখ হাসিনা প্রচারে নামবেন, তাতে এদেশের ব্যাপক অক্ষরজ্ঞানশূণ্য ভোটার ভুল করে বসবেন একথা ভেবে যে, তিনিই এখনো ক্ষমতায় আছেন। জনগণের মধ্যে সৃষ্ট এই ভ্রম নির্বাচনের ফলাফলকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে এবং এই উদ্যোগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী একথাও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে দিয়েছেন। তারপরও বিল পাস করার উদ্যোগ ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে চলেছে। সরকারের মেয়াদের শেষ দিনটি পর্যন্ত সংসদের বর্তমান অধিবেশন চালু রাখার বিষয়টিও জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে। সংসদের এই অধিবেশনে আরও মারাত্মক গণবিরোধী আইন, যা নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে তা পাস হলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। বলতে গেলে, এখনও নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়নি। তৎসত্ত্বেও যেসব রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যদি মনে করেন এদেশবাসী ২০০১ সালের মধ্যে নির্বাচনের মুখ দেখতে পাবে না, তাহলে তার ভাবনাকে অযৌক্তিক বলা যাবে না। এছাড়া, কিছু সংবাদপত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাব্য উপদেষ্টাদের তালিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের যা বাস্তব পরিস্থিতি সে অবস্থায় এদেশের কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করে বিচারালয়ের বাইরে যারা আছেন, তারা যত বড় হোমরা চোমরাই হোন না কেন, তারা যে কেউ নিরপেক্ষ নন, তা তাদের আচরণেই পরিদৃষ্ট। তালিকার কথা উল্লেখ করেছি এই কারণে যে, সম্ভাব্য তালিকাভুক্ত ব্যক্তিবর্গ রাজনৈতিক পক্ষপাত দোষে দুষ্ট এবং তাদের শতকরা নব্বই ভাগই একই রাজনৈতিক ঘরানাভুক্ত। ফলে একটি সুষ্ঠু ও স্বাধীন নির্বাচনের আশা করা মরুভূমিতে মরীচিকার পেছনে ধাবিত হওয়ার শামিল। এই পরিস্থিতিতে সরকারের বাইরে যেসব দল রয়েছে, বিশেষ করে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি কিভাবে এই ভারসাম্যহীন ও বৈরী পরিবেশে নির্বাচনে নিজ অবস্থানকে ধরে রাখবে, এটাই বড় প্রশ্ন।

আফতাব আহমাদ :

সরাসরি'র এই পর্ব যখন লিখছি তখন বারবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি, অনবরত টেলিফোনের পর টেলিফোন আসছে তো আসছেই–সারা রাজধানী একটি গুজবের শহরে পরিণত হয়েছে। উদ্বিগ্ন নাগরিকগণ পরিচিতজনদের কাছে টেলিফোন করে নিশ্চিত হতে চাইছেন, সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সত্যিই মারা গেছেন, না বেঁচে আছেন? বানিয়ারচরের গির্জায় যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল সেই অকুস্থল পরিদর্শনের উদ্দেশে বেগম জিয়া তার দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে রওনা দেয়ার পর মাঝপথে তার গাড়ি ও গাড়ি বহরের উপর উপর্যুপরি সশস্ত্র হামলা হয়। এই হামলার মুখে তিনি তার সফরসূচী বাতিল করে রাজধানীতে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এর আগের দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুপাতো ভাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিমের নেতৃত্বে একাধিক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শেখ সেলিম বেগম খালেদা জিয়ার সফরকে ভণ্ডুল করে দেয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টির মান এত নিম্ন পর্যায়ে যে, এ নিয়ে যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা বেশী দূর এগিয়ে নেয়া যায় না।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা। শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতৃত্ব অর্জন করেন। অথচ, স্তাবক ও স্তুতিকারদের পাল্লায় পড়ে স্বয়ং শেখ মুজিব বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনসভার আপেক্ষিক সার্বভৌমত্ব সবকিছু হরণ করে বহুদলীয় গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে এক ব্যক্তির, একদলীয় স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সাংবিধানিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে রাজনীতির যে স্বাভাবিক পরিণতি ঘটে, তারই সূত্রানুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট নিহত হন। ঐ সময় দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের কারণে আওয়ামী লীগ এতই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল যে, দলনেতার

www.pathagar.com

হত্যার নিন্দা তো দূরের কথা, দলনেতাকে দাফন না করে অন্যান্যরা শপথ গ্রহণ করে শাসনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীনে গঠিত মুজিব-উত্তর সরকার এদেশে সর্বপ্রথম সামরিক শাসন জারি করে। বিদেশে অবস্থানরত শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানা এই মর্মন্তুদ ঘটনার শিকার না হয়েও যে মানসিক যাতনার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাতি করেছেন তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু, রাজনীতি ও রাষ্ট্রক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, ক্রোধ ও অসূয়া বর্জন করতে না পারলে দেশ গঠন ও জাতি গঠনের সফল রাজনীতি করা যে সম্ভব নয়, তা সম্ভবত শেখ হাসিনা বিস্মৃত হয়ে গেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে পুরনো দলটির নেতৃত্বের শীর্ষে রাতারাতি অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি তার পিতার অনুসৃত নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন। আওয়ামী লীগের গত ৫ বছরের শাসনকে হাসিনা তার 'পিতৃহন্তাদের শিক্ষা দেয়ার' একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছেন মাত্র। আর ঠিক এই কারণেই রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের যে কোন বিরোধিতা, প্রতিবাদ বা সমালোচনাকে তিনি ও তার দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এসবই তার পিতার হত্যাকারীদের বাঁচাবার একটি সুগভীর ষড়যন্ত্র মাত্র। আমি ব্যক্তিগতভাবে হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না এবং আইনের শাসনভিত্তিক একটি বহু বাচনিক গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে বিশ্বাস করি। আসলে গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তিই হচ্ছে আইনের শাসন ও বহুবাচনিকতা। আইন তার স্বাভাবিক গতিতে কাজ করে যদি কাউকে অপরাধী ও দোষী সাব্যস্ত করে, সেক্ষেত্রে কারো কিছু করার নেই। কিন্তু, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবং বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করে আর যাই হোক গণতন্ত্র চর্চা তো দূরের কথা, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা চালু রাখাও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। গত ৫ বছরে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের এক শ্রেণীর গডফাদার বা ইচ্ছাপিতাদের নেতৃত্বে সারাদেশে সন্ত্রাস ও সহিংসতাকে যে নিষ্ঠুর আর্টে পরিণত করা হয়েছে তা আজ যে কোন নাগরিকের শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই শেখ হাসিনার প্রাণনাশের নানা ষড়যন্ত্রের কাহিনী ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বেশুমার প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার কোন সুনির্দিষ্ট অপরাধীকে চিহ্নিত করে জনতার সামনে হাজির করতে পারেনি এবং আইনগত ব্যবস্থাও নিতে পারেনি। যদিও, 'ষড়যন্ত্রকারীদের' তৎপরতাকে নস্যাৎ করার নামে বহু নিরীহ ধর্মপ্রাণ নাগরিকের ওপর নির্যাতন নেমে এসেছে এবং বহু নিরপরাধীকে এখনও হয়রানি করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা আমাদের সরকার প্রধান। তার নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে এবং এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। আমার মনে হয় না, এ বিষয়ে দেশের মানুষের মনে কোন দ্বিধা বা সংশয় আছে। কিন্তু গোটা ব্যাপারটি যদি উদ্দেশ্যমূলক, একপেশে ব্যাপারে পরিণত হয় এবং নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নামে নির্বাচনকে সরাসরি প্রভাবিত করার কৌশল হিসেবে যদি এটি নেয়া হয়ে থাকে তাহলে তো ভাবনার বিষয়। হাসিনার নিরাপত্তা বিষয়ক আইন প্রণয়নের কথাবার্তা যখন ওঠে, তখন এর নানা দিক নিয়ে আমি দৈনিক মানবজমিনে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই আলোচনার সূত্র ধরে আমি এখানে কিছুটা পুনরাবৃত্তি করতে চাই। উন্নত বিশ্বের যে কোন সভ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধু সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের নিরাপত্তাই নয়, সরকারী সংস্থাসমূহের সঙ্গে, প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দফতরের সঙ্গে, রাষ্ট্রের স্পর্শকাতর এজেন্সি সমূহের সঙ্গে, যারাই সংশ্লিষ্ট, বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারী পদত্যাগ করলে বা অবসর গ্রহণ করলে রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে থাকে। আইনসভায় জনগণের প্রতিনিধিত্ব যারা করেন এবং যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তারা সরাসরি সরকারের পদে অধিষ্ঠিত থাকুন, আর না থাকুন, রাষ্ট্র তাদেরও কঠোর নিরাপত্তা বিধান করে। শেখ হাসিনা যদি সত্যিই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাকেন অবশ্যই সে

www.pathagar.com

বিষয়ে রাষ্ট্রের কিছু করণীয় আছে। কিন্তু, যে দেশে একশ্রেণীর লোক জনগণের দ্বারা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সরাসরি স্বাধীনতা শত্রু ঘোষণা করে তাদের নির্মূল করতে চায় কিংবা সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে যারা গৃহযুদ্ধের হুমকি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কি করণীয় কিছু নেই? জনগণ শেখ হাসিনাকে যেমন নিরাপদ দেখতে চায়, তেমনি বেগম খালেদা জিয়াকেও নিরাপদ দেখতে চায়। আইনসম্মতভাবে যেসব রাজনৈতিক দল এদেশে সাংবিধানিকতার রাজনীতি চর্চা করে যাচ্ছেন, সেসব প্রত্যেক দলের দল প্রধানকেও জনগণ নিরাপদ দেখতে চায়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আচরণ করলে তখন সত্যি ভাবতে হবে যে, কোথাও একটা 'কিন্তু' আছে। বেগম খালেদা জিয়ার পল্টনের জনসভায় যেভাবে বোমা হামলা ও নির্বিচার গুলী করা হয়েছিল,সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ ক্ষমতাসীন দল এক ধরনের রহস্যময় মৌনতা পালন করে এসেছে। রাজধানীতে মিছিলে নেতৃত্ব দিতে গিয়েও বেগম খালেদা জিয়া বোমা হামলার শিকার হয়েছিলেন। সরকারী মহল থেকে এ বিষয়ে প্রতিবাদ তো দূরের কথা, উদ্বেগ প্রকাশ করতেও দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়, সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে নিরাপত্তার জন্য যে সংখ্যক পুলিশ আগে নিয়োজিত ছিল, তাদের সংখ্যা কমিয়ে পুলিশের এক বিরাট অংশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

দেশবাসীর কাছে একটা বিষয় আজ অত্যন্ত স্পস্ট হয়ে গেছে যে, আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনা যে কোন ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে চান। বিরোধী দলগুলো সরকারবিরোধী সফল ও সার্থক আন্দোলন রচনা করতে ব্যর্থ হলেও জনগণকে একটি বিষয় বোঝাতে সম্ভবত সক্ষম হয়েছে,আর তা হল, আওয়ামী শাসন উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অনুকূলে কাজ করার পরিবর্তে একদিকে প্রতিরোধ ও প্রতিহিংসার রাজনীতি চালু করেছে, অন্যদিকে ভারতীয় অর্থনীতি ও স্বার্থের পরিপূরকের অবস্থান গ্রহণ করে চরম দুর্নীতিতে লিপ্ত রয়েছে। আর এ কারণে ক্ষমতায় বেশ জাঁকিয়ে বসে থাকলেও আওয়ামী লীগ যে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে জনসমর্থন হারিয়েছে, তা তারা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। এ কারণেই সেইফ ল্যান্ডিংয়ের জন্য পবিত্র মদীনা থেকে শেখ হাসিনা আগাম নির্বাচন দেয়ার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা সত্ত্বেও তা রক্ষা করতে পারেননি। ক্ষমতা ত্যাগ করে জনতার কাতারে আওয়ামী লীগের সেইফ ল্যান্ডিং হবে কিনা, এ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এক বিরাট অংশের সংশয় রয়েছে। বিরোধী দলসমূহের বিশৃংখলা, অপরিকল্পিত ও অসমন্বিত আন্দোলনের ফলে আওয়ামী লীগের সাহস অনেকটা বেড়ে গেছে। তাদের ধারণা জন্মেছে যে, বাংলাদেশকে নিয়ে তারা যেমন খুশি তেমন করতে পারে। মাঝখানে একমাত্র বাধা হচ্ছে বিরোধী দলগুলো নয়, এদেশের দেশপ্রেমিক জনসাধারণের দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ। জনসাধারণের এই প্রতিরোধকে অতিক্রম করে ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য আসন্ন নির্বাচনকে কিভাবে বানচাল করা যায় অথবা কারচুপি করে জনতার রায়কে পাল্টে নির্বাচনকে নিজের অনুকূলে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, এটিই হচ্ছে বর্তমানে আওয়ামী লীগের একমাত্র লক্ষ্য। ২০০১-এর মধ্যে এদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন হবে কিনা, এ প্রশ্ন আজ করা যেতেই পারে। চারদিকের সন্ত্রাসী ও সহিংস তৎপরতা দেখে আমার মনে হচ্ছে, নির্বাচন যদি আদৌ হয়, তবে তা হবে এই গ্রহের সবচাইতে কুৎসতি, কদর্য, ক্লেদাক্ত, বীভৎস ও রক্তাক্ত নির্বাচন। ঐ নির্ব্যচন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক কৃষ্টি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপই করবে মাত্র। তাই আমি মনে করি, নিরপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রেসিডেন্টের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আইন-শৃংখলা রক্ষা, সন্ত্রাসী ও সহিংস তৎপরতাকে নস্যাৎ করার জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া উচিত। কেবল তখনই রাজনৈতিক দলগুলোর জেদাজেদি এবং বৈরিতার মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

মাহবুব উল্লাহ :

শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রায়ই একটি কথা বলেন তা হলো, আওয়ামী লীগকে কখনো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা যায়নি। আওয়ামী লীগ কেবল তখনই ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছে যখন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি সফল হয়েছে। আওয়ামী লীগ কখন ক্ষমতায় ছিল? পাকিস্তান আমলে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারে ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে মাত্র ১৩ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য নিয়ে ডা. খান সাহেবের নেতৃত্বাধীন রিপাবলিকান পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করতে হয়েছিল। এই সরকার এক বছরের কিছু বেশী সময় ক্ষমতায় থাকার পর রিপাবলিকান পার্টি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে, এই অজুহাত দেখিয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সোহরওয়ার্দীকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। অপরদিকে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভাকে '৫৮ সালে সামরিক শাসনের ফলে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করে, তখন আওয়ামী লীগ ১৯৭৫ সালে সংবিধানে সংশোধনী এনে যে স্বেচ্ছাতন্ত্র কায়েম করে, তার ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে সে সরকার পরিবর্তনের সকল অবকাশ লুপ্ত হয়। শোনা যায়, সে সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের ভক্ত একজন উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা তাকে বলেছিলেন, 'স্যার, আপনি তো ওয়ান পার্টি সিস্টেম চালু করলেন। আমাদের মেহনতটা না হয় একটু বেড়ে যাবে, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি তো আপনার নির্গমনের পথটি খোলা রাখলেন না'। কাজেই আওয়ামী লীগ যদি কেবল হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়, তার জন্য আওয়ামী লীগ কার ঘাড়ে দোষ চাপাবে? দোষ যদি একান্তই চাপাতে হয়, তাহলে তা নিজ কৃতকর্মের ওপরই চাপাতে হবে। এবার তো আওয়ামী লীগ তার ক্ষমতার মেয়াদ পূর্ণ করতে চলেছে। এই মেয়াদ পূর্ণ হতে ২১ দিন বাকি। এটা আওয়ামী লীগের জন্য বিরাট সাফল্য, তা তার শত্রুও স্বীকার করতে বাধ্য। স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পরিবেশে সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হবার পর সরকার পরিবর্তনের যে রীতি দেশে দেশে চালু আছে, বাংলদেশেও তা অনুসৃত হোক, এটাই সবার কামনা। তবে সংসদের মেয়াদের ব্যাপারেও একটা শর্ত আছে। অনেক সময় সংকটের সৃষ্টি হলে বা নতুন ম্যান্ডেটের প্রয়োজন হলে আগাম নতুন নির্বাচনের প্রয়োজন হতে পারে। এতে দোষের কিছু নেই। বাংলাদেশে গত ক'বছর যেভাবে রাষ্ট্র ও সরকার চলেছে, তাতে জনগণের ম্যান্ডেট নির্বাচনের মাধ্যমে নবায়িত করার প্রয়োজন ছিল। এতে লজ্জা বা দোষের কিছু ছিল না। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য শান্তিচুক্তিসহ এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যার জন্য গণতন্ত্রের স্বার্থে ম্যান্ডেট নবায়ন অপরিহার্য ছিল। বিরোধী দল যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে এখানটাতেই ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাপক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও এবং ইস্যুর পর ইস্যু সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে তারা মোক্ষমভাবে কাজে লাগাতে পারেনি। সম্প্রতি বিবিসির পক্ষ থেকে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাদের কোন ব্যর্থতা আছে কি-না। এ প্রশ্নের জবাবে বিএনপির নেতা বলেছিলেন আমাদের ব্যর্থতা, আমরা আন্দোলনে সফল হইনি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতা জবাব দিয়েছিলেন, আমাদের কোন ব্যর্থতা নেই। বরং বিরোধী দলই ব্যর্থ, তারা সংসদে এসে আমাদের ব্যর্থতার কোন চিত্র তুলে ধরতে পারেনি। ব্যর্থতা থাকলে তো তারা তাই করতেন। এরকম একটি প্রেক্ষাপটেই নির্বাচন সমাগত। এই নির্বাচনে সফলভাবে ক্যাম্পেইন চালিয়ে শাসকদলকে বিরোধীপক্ষ কুপোকাত করতে পারবেন কি-না, এটাই আজ ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের জিজ্ঞাসা। তবে যেভাবে বেগম খালেদা জিয়ার দক্ষিণবাংলা সফরের কর্মসূচীকে শাসক দল সহিংস সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে আটকে দিয়েছে, তাতে নির্বাচনের সময় এরূপ ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তি কিভাবে রোধ করা সম্ভব হবে, তা বিরোধী দলের প্রাজ্ঞ নেতৃবৃন্দ যদি এখন থেকে নির্ধারণ করতে সক্ষম হন, তাহলে শত হতাশার মধ্যেও জনগণ কিঞ্চিৎ আশার রশ্মি দেখতে পাবে।

www.pathagar.com

২৮ জুন ২০০১

প্রেসিডেন্ট ও পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্তব্য

মাহবুব উল্লাহ :

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার কোন বিকল্প নেই। একটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হতে পারে হয় সমাজ বিপ্লব, নতুবা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। বাংলাদেশে এ মুহূর্তে একটি সংকটময় ক্রান্তিকাল চলছে। একটি সরকারের বিদায়ের মুহূর্ত সমাসন্ন। তারপরে বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের নির্বাবচন অনুষ্ঠান করতে হবে। এ মুহূর্তে বা যে কোন মূহূর্তে একটি বিদায়ী সরকারের পরিবর্তে নতুন সরকার গঠনের জন্য গনতন্ত্র তথা জনগণের আশা-আকাংখার অভিব্যক্তি সম্বলিত নির্বাচন ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু বাংলাদেশ আজ উভয় সংকটে নিপতিত। নির্বাচন হলেও সংকট আরও বেড়ে যেতে পারে। আবার নির্বাচন না হলেও সংকট বাড়বে। এই উভয় সংকটের কারণ ও পরিণতি ব্যাখ্যা করার জন্য আজকে সরাসরি'র এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই।

কথায় বলে, প্রত্যুষেই বোঝা যায় দিবসটি কেমন হবে। ইংরেজীতে একেই বলা হয়, 'Morning shows the day'. গত ২৩ জুন আওয়ামী লীগ সরকারের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনতার উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের রক্ত নিয়ে হোলি খেললে আমরাও ছেড়ে দেব না'। তিনি আরও বলেন, 'আমরা সরকারে আছি বলে কিছু করতে পারছি না। তত্ত্বধায়ক সরকার এলে আমরাও 'কত ধানে কত চাল'– দেখাতে পারব'। একই দিন নীলফামারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্থানীয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত চারদলীয় মহাসমাবেশে বেগম খালেদা জিয়া আগামী ৯ জুলাই (সোমবার) 'ঢাকা চল' কর্মসূচীতে সবাইকে অংশ নেয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের পতন ঘটাতে ঢাকায় আসুন। এবার নৌকাকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে হবে'। উভয় নেত্রীর বক্তব্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব সুস্পষ্ট। মনে হচ্ছে, তারা যেন মানুষকে নির্বাচনে শরীক হয়ে নিজ নিজ দলের পক্ষে ভোট চাওয়ার, পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সংহারেরই আবেদন জানাচ্ছেন। শেখ হাসিনা বরাবরই এ ধরনের আক্রমণাত্মক–প্রতিহিংসাত্মক বক্তব্য প্রদানে অভ্যস্ত। প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন আসনে বসে তিনিই তো বলেছিলেন, একটার পরিবর্তে দশটা লাশ ফেলতে হবে। আক্রমণের প্রতিশোধ যদি তার কর্মীরা নিতে না পারে, তাহলে তারা যেন হাতে চুড়ি পরে তার সামনে আসে। এক সময়ে ভারতের ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভা সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে বলা হত, একদল নারীর মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীই একমাত্র পুরুষ। কিন্তু, শেখ হাসিনারও 'পৌরুষের' কমতি নেই। অন্যদিকে বেগম খালেদা জিয়া স্বল্পভাষী, হিংস্র কথনে অনভ্যস্থ বলেই পরিচিত। তারমত মানুষও পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে সাময়িকভাবে হলেও ধৈর্যচ্যুত হয়েছেন। কারণ, এর আগে তিনি যখন বানিয়াচর ও পিরোজপুরের পথে রওয়ানা হয়েছিলেন, তিনি তার গন্তব্যস্থলে কোনক্রমেই পৌছতে পারেননি। পথে পথে ফেরী ছিনতাই, পন্টুন অপসারণ, আগ্নেয়াস্ত্রের হামলায় তার জীবন বিপন্ন হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষ মেশ তিনি

www.pathagar.com

যখন তার যাত্রাপথ পরিবর্তন করে আরিচা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখনও সাভারে এলোপাতাড়ি বাস-ট্রাক রেখে তার যাত্রাকে বিঘ্নিত করা হয়। এ ধরনের সহিংসতা ও প্রতিশোধপরায়ণতার কবলে পড়ে তার ধৈর্যবৈকল্য ঘটাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তারপরেও সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই জাতি তার কাছে আশা করে। অন্যথায় তার মত মানুষের কাছ থেকে যে কোন অসংযত উচ্চারণ জাতির জন্য মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। শেখ হাসিনা যেখানে চরম দায়-দায়িত্বহীন, সেখানে জনগণ বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে দায়িত্ববোধের পরিচয় একান্তভাবে কামনা করে। দায়িত্বহীন উক্তি একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ভাগ্যকে কী মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে তাতো শেখ হাসিনা ১৯৯১'র নির্বাচনপূর্ব রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে প্রমাণ রেখেছেন। সেই ভাষণে তিনি শহীদ জিয়াকে এক অখ্যাত মেজর হিসেবে উল্লেখ করে কটুকাটব্য করেছিলেন। সাধারণ ভোটার, যারা দলীয়তার বাছ-বিচার করে না, তাদের কাছে শেখ হাসিনার এই উক্তি অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হয়েছিল। আর সে কারণেই তাদের ভোটগুলো স্বাভাবিকভাবে ধানের শীষের পক্ষে চলে গিয়েছিল।

বলছিলাম নির্বাচন হতে গিয়েও কেন মারাত্মক জাতীয় সংকটের সৃষ্টি হবে। ইতোমধ্যেই এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কোন কোন এলাকায় যে দলের অবস্থান শক্তিশালী, সেখানে অপর দলের নেতৃবৃন্দের আগমণ ও কর্মকাণ্ডকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার অভ্যাস চালু হয়ে গেছে। নারায়ণগঞ্জে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে গোলাম আযমের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল আগেই। গোলাম আযম এদেশের রাজনীতিতে বিতর্কিত ব্যক্তি হতে পারেন, আর কমবেশী সব রাজনীতিকই এদেশে বিতর্কিত। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় আছে কি, গোলাম আযম আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে তার বাংলাদেশী নাগরিকত্ব উদ্ধার করেছেন? তিনি বাংলাদেশের পাসপোর্টেরও অধিকারী। সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার অনুযায়ী বাংলাদেশের যত্রতত্র গমনের অধিকার তার রয়েছে, যদি আইনের দ্বারা আরোপিত কোন নিষেধাজ্ঞা তার ওপর না থাকে। কিন্তু এবার নারায়ণগঞ্জের লোমহর্ষক রক্তক্ষয়ী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর নারায়ণগঞ্জে বেগম খালেদা জিয়াকেও অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। এর বিপরীতে উত্তরবঙ্গ থেকে শেখ হাসিনাকেও উত্তরবঙ্গে অবাঞ্ছিত করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা যেতে পারে, এদেশে প্রতিপক্ষকে সংহারের এক অবাঞ্ছিত যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। রণ হুংকারের পরেই আসবে আসল রণ। তখন যে কে কোথায় ছিটকে পড়বে, বলা যায় না। নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসবে, ততই যদি অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার সংস্কৃতি সর্বত্র শিকড় বিস্তার করে, তাহলে দেখা যাবে, একদল কোন এক জেলায় যেতে পারছে না। আবার অন্যদল ভিন্ন একটি জেলায় যেতে পারছে না। এভাবে সারাদেশে কোথাও আওয়ামী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটবে, আবার কোথাও বিএনপি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটবে। এই করে দেশটিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠির যে এজেন্ডা আছে, তা বাস্তবায়িত হবে এদেশেরই কতিপয় ব্যক্তির দায়িত্বহীনতার কারণে।

১৯৭০-৭১ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তখন কলিকাতার পাড়াগুলো নকশালী ও কংগ্রেসী পাড়ায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। লোকজন এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় যেতে পারত না। তার ওপর ছিল সিআরপি। (Central Reserve Police) ও স্থানীয় পুলিশের অত্যাচার। আফগানিস্তানে কমিউনিস্টরা ক্যু ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করল। তারপর শুরু হল কমিউনিস্টদের সঙ্গে মুজাহিদদের লড়াই। তার পাশাপাশি চলল পারচামপন্থী কমিউনিস্ট ও খাল্‌কপন্থী কমিউনিস্টদের লড়াই। কমিউনিস্টরা পেল ভূতপূর্ব সভিয়েত রাশিয়ার সমর্থন। এক পর্যায়ে রুশ সেনাবাহিনীও আফগানিস্তানে অবস্থান নিল। আবার রাশিয়াও কমিউনিস্টদের অন্তর্বিরোধে কলকাঠি নাড়াতে

www.pathagar.com

শুরু করল। এক কমিউনিস্ট নেতার বদলে ক্ষমতায় আসল অন্য কমিউনিস্ট নেতা। নূর মোহাম্মদ তারাকীর পরিবর্তে আসল হাফিজুল্লাহ আমিন। আমিনের পরিবর্তে বাবরাক কারমাল। তার পরিবর্তে আসল ডাক্তার নজিবুল্লাহ। মুজাহিদরা পেল আমেরিকাসহ অন্যান্য পরাশক্তির সমর্থন। এক পর্যায়ে রুশ সেনারা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গেলেও গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকল। শেষ পর্যন্ত নজিবুল্লাহ সরকারেরও পতন ঘটল। মুজাহিদদের বিজয় হল। কিন্তু হানাহানি ও রক্তপাতের অবসান হল না। এ যাত্রা শুরু হল ইসলামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ। এই বিরোধে তালেবানদের জয় হল, গুলবদন হেকমতিয়ারের গোষ্ঠির পরাজয় হল। কিন্তু তালেবানরা এখনও আহমদ শাহ মাসুদের বাহিনীকে মোকাবিলা করছে।

ভেবে দেখুন, এভাবে বাংলাদেশেও যদি বিভিন্ন দলীয় বাহিনী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিপত্য স্থাপন করে, তাহলে এই রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব আদৌ থাকবে কি? প্রতিবেশী ভারত এমনি একটি সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। তারা চায়, বাংলাদেশে একটি সরকারবিহীন পরিস্থিতির উদ্ভব হোক। তারা চায়, বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হোক এবং এমনি একটি পরিস্থিতিই তাদের একান্ত কাম্য। কারণ, তাহলেই উত্তর-পূর্ব ভারতের অস্থির পরিস্থিতি দমনের জন্য তাদের সৈন্য চলাচল ও রসদ সরবরাহের সুযোগ খুলে যাবে।

সকল বিশ্লেষণেই একথা বলা যায়, উপমহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতি আজ এমন এক অবস্থার দিকে মোড় নিয়েছে, যখন বাংলাদেশের অখণ্ড অস্তিত্ব ভারতের অখন্ড অস্তিত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক অবস্থানে রয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছি,ফেনী, বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জসহ বাংলাদেশের বেশ কিছু এলাকায় সমান্তরাল রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে কিছুসংখ্যক স্থানীয় গডফারদাররা। এরা নির্বিচারে মানুষ খুন করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। ভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করতে পারে এবং সেসব দলের কর্মী-নেতাদের বাস্তুভিটা ত্যাগে বাধ্য করতে পারে। নির্বাচনী তৎপরতা শুরু হলে স্থানীয় সুবেদারী প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ব্যাপক রূপ ধারণ করতে পারে। এ কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব অপরিসীম। একবার যদি পরস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তাহলে তাকে আবার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাই, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম দিন থেকেই পরিস্থিতির ওপর সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সেনাবাহিনী ও বিডিআরসহ সকল আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হেফাজত করার জন্য সর্বতোভাবে কাজে লাগাতে হবে। এ নিয়ে কোন মহলের ওজর-আপত্তিতে দ্বিধান্বিত হলে রাষ্ট্রের জন্য সমূহ সর্বনাশ হবে। এদেশে ভারতীয় আধিপত্যবাদীরা ইতোমধ্যেই এমন একটি আবহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যার ফলে শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত তুলে দেয়ার কথা উচ্চারণেও দ্বিধাবোধ করেনি। যে তসলিমা নাসরিন ইরেজার দিয়ে মানচিত্রের সীমান্ত মুছে দিতে চেয়েছেন, তাকে নিয়ে একশ্রেণীর কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর আহলাদ-আবদারের বাড়াবাড়ি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আরেক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা নষ্ট বামপন্থায় বিশ্বাস করেন; তারা বলেন, রাষ্ট্রীয় সীমান্ত নিয়ে কোন প্রকার উদ্বেগ প্রকাশ, আবগতাড়িত অনুভূতি প্রকাশ অর্থহীন। তারা প্রশ্ন করেন, রাষ্ট্রীয় সীমান্ত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোটি কোটি নিরন্ন-দরিদ্র বেকার মানুষকে কী দিয়েছে? তাদের জবাবে বলতে হয়, বেকারত্ব, দারিদ্র ও ক্ষুধা সত্ত্বেও পৃথিবীর কোন অঞ্চলের মানুষ আজ পর্যন্ত তাদের রাষ্ট্রীয় সীমানা মুছে ফেলতে রাজি হয়েছে কি? রাষ্ট্রীয় সীমান্তের জন্য গণদারিদ্র্যের উৎপত্তি ঘটেছে, এই তত্ত্ব অযৌক্তিক ও অসার। রাষ্ট্রীয় সীমান্তের মধ্যেই মানুষের ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্বের সমস্যা সমাধান করা যায়। এটাতো পৃথিবীর অনেক সভ্য-স্বাধীন দেশ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং যে পথে গেলে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব, সে পথে

www.pathagar.com

না গিয়ে সীমান্ত মুছে ফেলার আগ্রহ–এসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দেশপ্রেমহীনতারই বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাজাত্যবোধ ও আত্মপরিচয় বজায় রাখার বাসনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরই অবিভাজ্য অংশ। নিরন্ন মানুষও ভুলে যেতে চায় না তার ভাষাকে, তার ধর্মকে, তার মূল্যবোধকে। আমি জানি না, কবে এসব জ্ঞানপাপীর বোধোদয় ঘটবে।

নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যে সন্ত্রাস ও প্রতিহিংসা সৃষ্টি হবে, তজ্জনিত বিপদ সম্পর্কে আলোকপাত করার পর নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থতাও যে জাতির জন্য কত অকল্যাণ ও অমঙ্গলের উদ্ভব ঘটাতে পারে, এখন সে ব্যাপারটি একটু খতিয়ে দেখা দরকার। সরকারের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে আবার আরেকটি নির্বাচিত সরকার গঠন করতে ব্যথ্যতার অর্থ হল, ডকট্রিন অব নেসেসিটি বা অন্য কোন অজুহাত দেখিয়ে দেশে একটি অনির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এই সরকারের কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন হবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামরিক বাহিনীর একটি কাভার। কারণ, শক্তির উৎস না থাকলে কোন সরকারেরই কার্যকারিতা থাকে না। এই শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা কখনওবা সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত হয়, আবার কখনওবা সংবিধান বহির্ভূতভাবে সৃষ্টি হতে পারে। শক্তি প্রয়োগে ব্যর্থ সরকার কোন সরকারই নয়। এটাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল কথা। জনগণের সম্মতি অর্জন না করে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগকারী সংস্থার ওপর নির্ভর করে কোন সরকার যদি গঠিত হয়, তাহলে এদেশের একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী তাদের টার্গেট হিসেবে সেনাবাহিনীকেই বেছে নেবে। ইতোমধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য বাজেটে সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দের বিষয়টিকে প্রশ্নবোধক করে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিল। এই বৈঠকে সামরিক ব্যয় হ্রাসের ওকালতকারীদেরই প্রধানত হাজির করা হয়েছিল। এরা বলতে চেয়েছেন পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর সামরিক খাতে বরাদ্দ হ্রাস করাই যুক্তিযুক্ত। তারা আরও বলতে চেয়েছেন, সামরিক খাতে ব্যয় অনুৎপাদনশীল। অর্থনৈতিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন্‌টা উৎপাদনশীল আর কোনটা অনুৎপাদনশীল, তা পূর্বাহ্নেই বলে দেয়ার কোন সর্বসম্মত ফর্মুলা নেই। বাংলাদেশে সামরিক খাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের অংশ উপমহাদেশের অনেক দেশের তুলনায় কম। তাছাড়া, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘের শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করে গত কয়েক বছর ধরে দেশের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রারও যোগান দিচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে তারা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মে প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। বাংলাদেশের তাবৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন সন্ত্রাস ও বিশৃংখলার কবলে পড়ে মানসম্মত জনসম্পদ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন সেনাবাহিনীর শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মানসম্পন্ন জনসম্পদও সৃষ্টি হচ্ছে। সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহনের পর এসব উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ জাতীয় উন্নয়নে ও উদ্যোগে যে ভূমিকা রাখছে, সে সম্পর্কে এসব উন্নাসিক অর্থনীতিবিদরা কোন চুলচেরা মুল্যায়ন করেছেন কিনা, আমার জানা নেই। দেশবাসীও জানে না। সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর, মেডিক্যাল কোর ও এডুকেশন কোর থেকে যারা আসেন, তাদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার সঙ্গে অন্যদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতার তুলনামূলক কোন স্টাডি না করে ঢালাও মন্তব্য করা কত যে অর্থহীন–তা বলা নিষ্প্রয়োজন। এছাড়া, যারা সাধারণ সৈনিক, তারা সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে নিজ নিজ পরিবারের জন্য যে রেমিটেন্স পাঠায়, তা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য উৎপাদনমূলক তৎপরতায় যে অবদান রাখে, তাও হিসাবের মধ্যে নিতে হবে। সর্বোপরি, দেশে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী আছে, এ বিশ্বাসই দেশে অনেক অরাজকতা হানাহানির প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। হানাহানি ও অরাজকতা নিবারকের অর্থনৈতিক অবদান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এর প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ভূমিকা আমরা কিভাবে অস্বীকার করব?

www.pathagar.com

বাজার অর্থনীতিতে আইন-শৃংখলা রক্ষা– অস্থিতিশীলতা রোধ করাই হল অর্থনৈতিক উদ্যোগের উৎস। এটা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। অথচ নির্বাচন না হলে সেনাবাহিনী ও জনগণকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হবে, তাও শেষ বিচারে ভারতীয় আধিপত্যবাদীদের অভিলাষ ও এজেন্ডাকে কার্যকর করতে উৎসাহ জোগাবে। তাই বাংলাদেশ আজ এক উভয় সংকটের মুখোমুখি। জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই উভয় সংকট থেকে জাতিকে রক্ষা করে তার স্বাভাবিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন–এটাই সমগ্র দেশ ও জনগণের একান্ত কামনা। জাতির এই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না।

আফতাব আহমাদ :

বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টি ও মূল্যবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসহিষ্ণুতা ও গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের ধারণা (অবশ্য প্রধান প্রধান দলের) বাংলাদেশের মানুষের দায় পড়েছে তাদের কারো না কারো পক্ষাবলম্বন করার। জনগণকে স্বীয় দলের মতাদর্শ ও কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত না করে মোটা দাগে সস্তা বুলি কপচিয়ে কিছু স্পর্শকাতর বিষয় উত্থাপন করে বিভাজনের রাজনীতিকে জাতীয় পর্যায়ে তীব্র থেকে তীব্রতর করাই প্রধান প্রধান দলগুলোর একমাত্র উপজীব্য। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং জাতীয় সংগ্রামে ন্যায়সঙ্গতভাবে যার যা প্রাপ্য, তা অস্বীকার করে যে একদেশদর্শী অনমনীয়, একগুঁয়ে রাজনীতি আমরা প্রত্যক্ষ করে আসছি, তা আর যা কিছুরই হোক, অন্তত গণতন্ত্রের পরিচায়ক নয়। মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে রাখার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান দুটি দল 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ও 'জাতীয়তাবাদী চেতনার'র মধ্যে বিভেদ ও বিরোধের রেখা টেনে একটি যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতির জন্ম দিলেও শ্রেণীগত দিক থেকে ও স্বার্থগোষ্ঠির দিক থেকে তারা যে এক ও অভিন্ন–তা আজ জনগণের কাছে ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এতদিন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হত যে, আওয়ামী লীগ দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভারতকে তুষ্ট করার কাজেই সদাব্যস্ত থাকে। কিন্তু সীমান্ত যখন আক্রান্ত হল, বড়াইবাড়ীতে রাইফেলসের বীর জওয়ানরা দেশপ্রেমের পরীক্ষায় যখন সর্বোচ্চ গৌরব নিয়ে বিজয়ী হল, তখন এদেশের পত্র-পত্রিকা ছাড়া আর কোথাও ভারতীয় আগ্রাসন, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিবাদ উচ্চারিত হতে আমরা দেখিনি। কোন হরতাল হয়নি। ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে কোন বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়নি। বড়াইবাড়ী হামলার পর থেকে ভারতীয় সন্ত্রাসী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের সীমান্তে বারংবার হানা দিয়ে আমাদের জান-মালের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা সত্ত্বেও প্রধান বিরোধী দলসহ অধিকাংশ দল মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। এটি নির্বাচনী বছর। সামনে নির্বাচন। ভারতের কৃপা, আনুকূল্য ও আশীর্বাদ লাভ করে ক্ষমতার মসনদে কে বসবে, তারই এক নোংরা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে এখন। তাই, গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক কৃষ্টি–এগুলোর ধার ধারতে কেউ রাজি নয়। সবকিছুর সমাধান গায়ের জোরেই যেন হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগের ভারত তোষণের ট্র্যাক রেকর্ড অনেক পুরনো। ভারত দ্বিপাক্ষিকতার ভিত্তি হিসেবে স্টেট টু পার্টি রিলেশনশীপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে দ্বিপাক্ষিকতায় যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, তা কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার ছোট দেশগুলোর পক্ষে যায় না। কিন্তু যতই নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে, ততই আমরা লক্ষ্য করছি বিরোধী শিবিরে যারা আওয়ামী লীগকে রিপ্লেস করার জন্য অস্থির ও অধৈর্য হয়ে পড়েছে, তারা ভারতকে যে কোন ছাড় দিয়ে ক্ষমতা পেতে চায়। আমার এই ধারণা গড়ে ওঠার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে, গত মাসাধিককাল ধরে আমাদের সমস্ত সীমান্তজুড়ে

www.pathagar.com

ভারতীয় বিএসএফের উস্কানিমূলক হামলা যেভাবে অবাধে চলছে, তার বিরুদ্ধে কোথাও কোন রাজনৈতিক প্রতিবাদ নেই। পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, বাংলাদেশের গোটা সীমান্তজুড়ে ভারতীয় ফৌজের সমরসম্ভার গড়ে উঠেছে। পালাক্রমে এক এক জেলা সীমান্ত অতিক্রম করে অনেক গভীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী হামলা করে সরে যাচ্ছে। রণনৈতিকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ডসমূহের ওপরে ভারত তার দখল প্রতিষ্ঠা করছে এবং পূর্বের দখলীকৃত ভূখণ্ডসমূহে তার সামাজিক অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করছে। ভারতের এই অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে কোথাও কোন প্রতিবাদ উচ্চারিত হতে দেখা যাচ্ছে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও বোমাবাজির কৃষ্টি যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে, তাতে আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটলে ভারত অবলীলাক্রমে বাংলাদেশের ভেতরে অবস্থানকারী পঞ্চমবাহিনীর সাহায্যে বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছে। রাজনীতিকরা গোষ্ঠি ও শ্রেণীস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যক্তিগত জেদাজেদীকে যেভাবে জীবনের পরম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাতে আসন্ন সংকটে প্রধান ক্যাজুয়ালটি হবে দেশের স্বার্থ।

পাদুয়া এবং বড়াইবাড়ীর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নির্দ্বিধায় এ কথা বলতে পারি, আমাদের দেশের জনগণ সাহসী, আপসহীন এবং দেশকে গভীরভাবে ভালবাসেন। আমাদের প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্য, রাইফেলসের প্রত্যেক সদস্য, পুলিশের প্রত্যেক সদস্য বিচ্ছিন্ন দুয়েকজনকে বাদ দিলে নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক। দেশকে রক্ষা করা তারা তাদের ঈমানের অঙ্গ হিসেবে মনে করেন। দেশের মানুষ ও আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী যদি একাত্ম হয়ে ভারতীয় সন্ত্রাসীদের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাহলে ভারতের ক্রীড়নক, চর, নিয়োগী ও সেবাদাসরা এবং ভারতের ইচ্ছা পূরণের জন্য যারা আত্মা বিক্রয় করে দেয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, তাদের কাউকে তোয়াক্কা না করে জনগণ একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুস্থ গণতান্ত্রিক নির্বাচন নিঃসন্দেহে নিশ্চিত করবে। পরিস্থিতি ঘোলাটে করার জন্য অস্ত্রের দেদার অবৈধ আমদানী হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো মান-মর্যাদার লড়াইয়ের নামে জাতীয় পুনর্গঠন ও পুনঃসর্দ্ভাবনার রাজনীতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী ও পরিকল্পনা জনগণের সামনে উপস্থাপন না করে কেবলমাত্র জনগণের ভাবাবেগকে পুঁজি করে বাজিমাত করতে চাইছে। মানুষ এত বোকা নয়। এখন তারা আগের চাইতে অনেক বেশী সজাগ ও সচেতন। এ মানুষ ক্রোধান্বিত দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর হাড্ডহাড্ডি লড়াইয়ে পক্ষালম্বনে অবতীর্ণ হতে চাইবে না। দেশ ও জাতি পুনর্গঠনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন জাতীয় অ্যাজেন্ডা যদি রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের সামনে হাজির করতে না পারে, তাহলে কোন দল ক্ষমতায় বসল, তাতে জনগণের মাথাব্যথা থাকবে কেন? এ ধরনের একটি পরিস্থিতি একটি জাতির জন্য ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এদেশের ঘুণে ধরা কীটদষ্ট জরাগ্রস্ত এই সমাজকে বদলে দিয়ে বৈষম্যরহিত একটি ন্যায়ানুগ সমাজ গড়ার মত যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন কোন রাজনৈতিক দল এখনও গড়ে ওঠেনি। অথচ এই অপরিণত ও ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হলে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পর্যায়ক্রমিক নির্বাচনের বিকল্প জন্য কিছু নেই। তাই, জোটবদ্ধ ঐক্যমোর্চার রাজনীতির বাইরে দলীয় অহংবোধের ভিত্তিতে বৃহৎ দলসুলভ আচরণ দ্বারা কোন রাজনৈতিক দল এককভাবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। এ কারণে এত সব কিছুর মাঝেও অস্ত্রের ঝনঝানিকে সীমিত গণ্ডির মধ্যে রেখে সহিংসতা ও সন্ত্রাসকে ঠ্যাকা দিয়ে রেখে একটি অর্থবহ নির্বাচন যদি অনুষ্ঠান করতেই হয়, তাহলে মহামান্য প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ফলে আমাদের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে যে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে ও নতুন প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়েছে তার নিহিতার্থ সকলে কতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে আমার জানা নেই, তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবে শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, একটি নির্বাচিত সংসদের মেয়াদন্তে তার বিলুপ্তি ঘটলে মহামান্য প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে যে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়, তার নিয়োগকর্তাও স্বয়ং মহামান্য প্রেসিডেন্ট। উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রত্যেকে মহামান্য প্রেসিডেন্টের কাছে দায়ী থাকতে ও জবাবদিহি করতে বাধ্য। একই সঙ্গে মহামান্য প্রেসিডেন্ট যেখানে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, সেখানে তারপরও ত্রয়োদশ সংশোধনীতে প্রতিরক্ষা বিভাগকে উপদেষ্টামণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে এনে সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। ত্রয়োদশ সংশোধনী থেকে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সংসদের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী ক্ষমতাসহ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং গোটা প্রতিরক্ষা বিভাগ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা খোদ প্রেসিডেন্টের হাতে অর্পিত হয়েছে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের মত একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বর্তমানে প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তাঁর একাগ্রতা, সততা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে দেশবাসীর মনে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই। তাঁর ওপর রয়েছে সকলের প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সংসদে বিলুপ্ত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনের ওপর যে ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব অর্পিত হবে, তা আমাদের সকলের সহযোগিতায় তিনি যতোচিতভাবে পালন করতে সক্ষম হবেন। দেশের রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে ইতোপূর্বে 'এই দেশ, এই সময়,' কলামে আমি একটি জাতীয় গোলটেবিলে বৈঠক আহবানের জন্য দৈনিক ইনকিলাবের মাধ্যমে মহামান্য প্রেসিডেন্টের কাছে আকুল আহ্বান জানিয়েছিলাম। এ ধরনের একটি বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা আজ অনস্বীকার্য। আমি আশা করি, সংসদ বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মহামান্য প্রেসিডেন্ট এই লক্ষ্যে যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সহিংসতা ও সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন না করে, হিংসা ও বিদ্বেষের অপচ্ছায়াকে অপসারণ না করে, পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে নিশ্চিত না করে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সামরিক বাহিনীকেই রচনা করতে হবে একদিকে একটি বাফার জোন, অন্যদিকে সন্ত্রাস ও সহিংসতার এসকেলেশন রোধকল্পে লাগাম টেনে ধরতে হবে। আর এসব কিছুর সার্থকতা ও সাফল্য আমরা তখনই প্রত্যক্ষ করতে পারব, যদি নাগরিক হিসেবে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মহামান্য প্রেসিডেন্টের প্রতি সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই।

www.pathagar.com

৫ জুলাই ২০০১

দৈত্যরূপী ভারতের পাগুলো কাদামাটির

মাহবুব উল্লাহ :

গত ২৪ জুন দৈনিক ইনকিলাবের 'আদিগন্ত' পাতায় শেখ হাসিনা সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। সাক্ষাৎকারটির শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে 'বড় বড় রাজনীতিবিদরা এখন আর কেউ ভারতবিরোধী রাজনীতি করেন না'। জনাব মঞ্জু আর ও উল্লেখ করেছেন, 'তারা (বড় বড় রাজনীতিবিদরা) এখন উপলব্ধি করছেন, ক্ষমতায় যেতে হলে বা ক্ষমতায় থাকতে হলে ভারতকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে'। এদেশের রাজনীতিতে কলকাঠি নাড়াতে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজনীতিবিদ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, জনাব মঞ্জু তাদেরই একজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তিনি আমার সমসাময়িক ছিলেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক মানিক মিয়ার সন্তান হিসেবে তখনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে তার বিরাট পরিচিতি ছিল। রাজনীতিতে কখনও তাকে ফিরে তাকাতে হয়নি। ক্ষমতার আসন তার জন্য যেন সব সময়ে প্রস্তুত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল শাস্ত্রে মাস্টার্স করলেও বাংলাদেশোত্তরকালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা করেন। বাংলাদেশের বড় বড় নেতারা উপলব্ধি করছে যে, ক্ষমতায় যেতে হলে বা ক্ষমতায় থাকতে হলে ভারতকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে, একথা জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর মত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি স্পষ্ট কবে দিয়ে এদেশবাসীর পরম উপকার করেছেন।

কথাটা জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু না বললেও রাজনীতির করিডরে যাদের বিচরণ আছে, তারা সকলেই জানেন, জাতীয়তাবাদী পরিচয় প্রদানকারী এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ কথাচ্ছলে বলে থাকেন, 'ভারতের সঙ্গে আমরা কি যুদ্ধ করব? ভারত বাংলাদেশকে তিন দিক থেকে ঘিরে আছে। সুতরাং, ভারতকে চটানো যাবে না'। কেউ কেউ একটু মুনশীআনা করে বলেন, 'আমরা বন্ধু নির্বাচন করতে পারি, কিন্তু প্রতিবেশী নির্বাচন করতে পারি না'। আবার কেউ কেউ বলেন, 'আমরা বাংলাদেশপন্থী, কিন্তু কোন দেশের বিরোধী নই'। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারতের নানা অভিসন্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ভারতের কড়া সমালোচনা করতে শুরু করেন। এতে তার দলের অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তারা বলাবলি করতেন, 'ম্যাডাম ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারতের সাথে তাকে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। সুতরাং ভারতের সমালোচনা যদি করতেই হয়, তাহলে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তা করতে পারেন, ম্যাডাম অবশ্যই নন'। এসব জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকেই লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ব্যক্তিগত আলোচনায় বলতে শুরু করেছেন, ভারতকে চটিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া যাবে না।

এ ধরনের অভিমত যারা পোষণ করেন, তাদের মধ্যে তিন ধরনের মানুষ আছে। প্রথমত, যারা ভারতের বিশাল আয়তন ও শক্তিতে সদা সন্ত্রস্ত। দ্বিতীয়ত, যারা শহীদ জিয়ার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারা থেকে সরে গেছেন। তৃতীয়ত, যারা জাতীয়তাবাদীদের কাতারে অবস্থান করে ভারতীয় আধিপত্যবাদের চর হিসেবে কাজ করছে। প্রথম দলটি হতাশা সৃষ্টিকারী, দ্বিতীয় দলটি আদর্শবিনাশী, সুতরাং বিপজ্জনক। আর তৃতীয় দলটি একেবারেই শত্রু শিবিরের হয়ে কাজ করছে। জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু কথাটা যখন সরাসরি বলেই ফেললেন, তখন এর তাৎপর্য ও বাংলাদেশের জন্য এর বিপদ সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই সাবধান হতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক সভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর আমাদের এই পৃথিবী ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ডে পরিণত হয়েছে। আমেরিকা পৃথিবীর সর্বত্র সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং করার

www.pathagar.com

আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরকম পরাশক্তি আমেরিকার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহলে প্রতিরোধও গড়ে উঠেছে। পারমাণবিক নিরাপত্তা শিল্ডসহ বিভিন্ন প্রশ্নে আমেরিকা আজ চীন-রাশিয়া, জার্মানী ও ফ্রান্সের প্রতিরোধের সম্মুখীন। আমাদের দেশে যারা রাজনীতি করেন, তাদের অনেকের মধ্যে ভারতকে সমীহ করার মনোভাব আমেরিকাকে সমীহ করার চাইতেও বেশী। তাহলে কি ভারত আমেরিকার চাইতেও শক্তিশালী? এদেশের রাজনীতিবিদরা যখন মনে করেন, ক্ষমতায় যেতে হলে বা ক্ষমতায় থাকতে হলে ভারতকে সন্তুষ্ট করতে হবে, তখন লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। আমরা কি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক? দিল্লীর দেওয়ান হিসেবেই কি এদেশের রাজনীতিবিদরা দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন? এই পরিস্থিতি এদেশের রাজনীতিতে আর কতকাল চলবে?

প্রতিবেশীর ব্যাপারে নাক গলাতে ভারতের জুড়ি নেই। সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাদুয়া ও বড়াইবাড়ি নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল, তার জন্য ভারত বাংলাদেশের বিডিআর প্রধানের কোর্ট মার্শাল পর্যন্ত দাবী করেছে। এছাড়া আরও চারজন সামরিক কমান্ডারকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগ বাড়িয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে টেলিফোন করে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বলতে গেলে প্রায় অযাচিতভাবে ক্ষমা চাওয়া। এমনকি, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করারও আশ্বাস দিলেন। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, বিডিআর প্রধান আ.ল.ম ফজলুর রহমানকে বগুড়ায় বদলী করা হয়েছে। বিডিআরের অন্যান্য কর্মকর্তাদেরও বদলী করা হয়েছে। ভারতের ধমক-ধামক ও অন্যায় আবদারের কাছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আত্মসমর্পণ করেছেন, তা প্রায় স্পষ্ট। এভাবে আত্মসমর্পণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকলে বাংলাদেশের মানচিত্র ও পতাকা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে,তা মনে করার যৌক্তিক কারণ আছে। প্রশ্ন হল, কেন আমাদের বড় বড় নেতারা মনে করেন, ভারতকে তোয়াজ না করলে ক্ষমতায় যাওয়া যাবে না। কিংবা ক্ষমতায় থাকা যাবে না? এটাই কি এই দেশের নিয়তি? এর কি কেন ব্যত্যয় সম্ভব নয়?

আফতাব আহমাদ :

আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী এবং এদেশের নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া বাংলাদেশে বর্তমানে বড় বড় যে দলগুলোকে রাজনীতির মাঠে ময়দানে দেখা যায়, এদের নেতা-কর্মীদের সিংহভাগ কোন দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দলের বর্তমান অবস্থানে গিয়ে পৌঁছায়নি। এসব নেতা-কর্মীরা হঠাৎ করেই নেতৃত্বে আসীন হয়ে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে দেশে বিরাজমান আওয়ামী বিরোধী ঝোঁকের সুযোগ নিয়ে অনেক রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করেছে।

এদের মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে সহমর্মিতার অভাব রয়েছে, আদর্শিক বন্ধনের অভাব রয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনার প্রশ্নে অঙ্গীকারের অভাব রয়েছে। সারা দেশব্যাপী আওয়ামী দুঃশাসনের ফলে আওয়ামী বিরোধী যে জাতীয় চেতনা গড়ে উঠেছে, তাকে সুষ্ঠু সাংগঠনিক রূপ দেয়ার উদ্যোগ প্রায় নেয়া হয়নিই বলা যেতে পারে। ১৯৭৫-এ একদলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করে আওয়ামী লীগ যেভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে ছিটকে পড়ে, তা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অনেকটা অপ্রত্যাশিত ছিল। ফলে, শূন্যস্থান পূরণের জন্য যারা এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের রাজনৈতিক পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না বললেই চলে। দেশব্যাপী ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী যে অনুভূতি বিরাজ করছিল , তাই ছিল নবাগত এসব রাজনীতিকদের একমাত্র অবলম্বন। আসলে, কোন দেশ বা কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র বিদ্বেষপূর্ণ ও বৈরী মনোভাব কখনোই ঐক্য বা প্রতিরোধের ভিত্তি হতে পারে না। আদর্শিক ভিত্তি ছাড়া যে কোন রাজনৈতিক অবস্থান শেষ বিশ্লেষেণে সুবিধাবাদিতা ও স্বার্থবাদিতায় পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে।

ভারতবেষ্টিত বাংলাদেশের ভূ-রণনৈতিক অবস্থান রাজনীতিতে যারা উপলব্ধি করতে পারেন না এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গড়ার পরিকল্পনার

www.pathagar.com

কথা যারা ভাবতে পারেন না, তারাই যখন রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের হর্তাকর্তার পদে আসীন থাকেন, তখন তাদের সামনে ভারতকে তোয়াজ করা ছাড়া অন্য কোন পথ দৃষ্টিগোচর হয় না। বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে, বাংলাদেশ দিল্লীর অধীনতা খুব কমই মান্য করেছে। এমনকি, নবাবী আমলটাও বাংলাদেশ এক ধরনের স্বাধীন অবস্থান নিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। দুইশত চৌত্রিশ বছর বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে টিকে ছিল। পরম প্রতাপশালী মোগল শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশের আফগান শাসক শেরশাহ সুরী হুমায়ূনকে পরাজিত করে দিল্লীর মসনদ পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিলেন।

আজ দক্ষিণ এশিয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ যে অবকাঠামো গড়ে উঠেছে, তার মূল ভিত্তি বাংলাদেশের পূর্বতন শাসক শেরশাহ সূরীর সময়েই তৈরি করা হয়। ডাক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে যে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এখানে গড়ে উঠেছে, যাকে কেন্দ্র করে এখন সবাই এশিয়ান হাইওয়ের স্বপ্ন দেখে এসবই তো শের শাহের অবদান। মোগলদের কাছে বাংলাদেশ ১৫৭৬-এ পরাস্ত হওয়ার পরও বাংলাদেশের বারো ভূঁইয়াদের দিল্লীর শাসকদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ফকির বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে যে উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন এই উপমহাদেশে সূচিত হয়, তাও গড়ে ওঠে বাংলাদেশ থেকে প্রথমে। গত ১৮ এপ্রিল রৌমারির বড়াইবাড়িতে ভারতীয় হানাদারদের বাংলাদেশ যে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছে, তা দিল্লী সহজে ভুলতে পারবে না। বাংলাদেশের শাসক শের শাহের কাছে দিল্লীর শাসক পরাজিত হওয়ার পর আধুনিকালে এই প্রথমবার বাংলাদেশ দিল্লীর আধিপত্যবাদীদের স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এখানে খবরদারী করা বা নাক গলানো চলবে না। বস্তুত, ১৯৬২-তে দিল্লী চীনের হাতে মার খাওয়ার পর এই দ্বিতীয়বার তার ছোট প্রতিবেশী বাংলাদেশের হাতে প্রচণ্ড মার খেলো। আমাদের দেশে যারা রাজনীতি করেন, তারা এর গুরুত্ব কতটুকু অনুধাবন করতে পেরেছেন, আমি জানি না্া। তবে এটুকু বুঝি, এদেশের মানুষ তাদের সংঘ শক্তির ওপর যথেষ্ট আস্থাবান। রাইফেলসের সাথে জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে বলেই ভারতীয় হানাদাররা পালাবার পথ খুজে পায়নি।

জনবিচ্ছিন্নভাবে গজদন্ত মিনারে বসে জনগণের উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আবেগ-অনুভূতিকে পুঁজি করে যারা রাতারাতি রাজনৈতিক ফায়দা ভোগ করেছেন, তারা রাজনীতির এই মর্মকথা উপলব্ধি করতে পারবেন না- এদের কাছে ভারতের বিশাল আয়তন, বিরাট সমরসজ্জা ও বিপুল জনসংখ্যা আতঙ্কের কারণ। অথচ, এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাকের ডগায় অবস্থিত মায়ামী বীচ থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরের স্বাধীন সার্বভৌম কিউবার বীরোচিত সংগ্রামের ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা নেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত পারমাণবিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে ভিয়েতনাম যেভাবে বিজয় অর্জন করেছে, আমাদের দেশের রাজনীতিকরা তার তাৎপর্য বোঝেন না। আসলে রাষ্ট্রের সমরশক্তি বা আয়তনই সব নয়। যদি তাই হতো, এই সেদিন পর্যন্ত অন্যতম পরাশক্তি সভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের হৃৎকম্পন সৃষ্টি করত, তার এই বেহাল অবস্থা হত না। আজ কোথায় সভিয়েত ইউনিয়ন? পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কী করে খান খান হয়ে গেল সভিয়েত ইউনিয়ন? আধুনিক ভারত উপনিবেশবাদের উদগাতা। যে ভূখণ্ড নিয়ে আজ আমরা ভারতের চেহারা দেখছি, এই ভূখণ্ড প্রাক-ব্রিটিশ যুগে একটি একক রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ ছিল না। ভারতে বর্ণাশ্রম প্রথার কারণে দলিত মানুষের উপর যে নিপীড়ন-নির্যাতন চলছে, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করে যে জাতিগত নিপীড়ন নির্যাতন চলছে, এগুলো ভারতের ঐক্য ও সংহতি বিনাশী প্রবল উপাদান। যে কোন সময়ে ভারতের মানচিত্র পাল্টে যেতে পারে। কাজেই, ভারতকে ভয় পেয়ে তোয়াজ করার কিছু নেই।

আমাদের যেসব রাজনীতিকরা মনে করেন, ভারতকে ক্ষেপিয়ে বা চটিয়ে ক্ষমতা যাওয়া সম্ভব নয়, তার কারণ দুটি। এক. ১৯৭১-এর পর আমাদের দেশের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় গোয়েন্দা স্থাপনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ব্যাপকভাবে সর্বত্র ভারতীয় চর, নিয়োগী ও সেবাদাসরা সক্রিয়। দুই. যাদের রাজনীতি করার কথা ছিল না, ঘটনাচক্রে রাজনীতিতে

www.pathagar.com

পর্দাপণ করে কোন ক্লেশ ছাড়াই ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারার কারণে মতাদর্শগত সামাজিকায়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে আজ ভারতের পক্ষের তৎপরতাগুলো দেখে ঘাবড়ে বসে আছেন। এই ঘাবড়ে যাওয়া নেতা-কর্মীদের উপরই ভারতের অনুকূলে প্রবেশকারীরা জুজুর ভয় দেখিয়ে সংগঠনের ও রাজনীতির নেতৃত্ব কব্জা করার চেষ্টা করছে, এর পাশাপাশি আমাদের একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে আমাদের দেশের মানুষের ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অপার সুযোগের যে দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, প্রকৃতির সাধারণ সূত্র ধরেই তা রুদ্ধ হয়ে যাক, তা কোন পক্ষই চাইবে না। আমাদের জাতীয় মনস্তত্ত্বের এই গঠনকে বিবেচনায় নিয়ে যদি আমরা স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে সজাগ ও সচেতন থাকি, তাহলে ভারতের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অসংখ্য পথের সন্ধান আমরা পেতে পারি।

মাহবুব উল্লাহ :

১৯৭১-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা যে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম সেই মুক্তিযুদ্ধের সাংঠনিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয়েছিল ভারতের মাটিতে বসে। এর ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিকাশের ওপর ভারত দীর্ঘস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম হয়েছে। যেসব দেশের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম নিজ দেশের মাটিকে ঘাঁটি ও প্রধান দফতর হিসেবে বেছে নিয়ে পরিচালিত হয়েছে, সেসব দেশের ওপর কোন আধিপত্যবাদী পরাশক্তি নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ভিয়েতনামীরা মহাশক্তিধর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। এর আগে তারা ফরাসী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। কিন্তু কখনও তাদের নেতৃত্ব চীন বা রাশিয়ার মাটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়নি। এসব দেশের কাছ থেকে তারা বস্তুগত ও নৈতিক সমর্থন লাভ করেছে বটে, কিন্তু কোন পর্যায়েই তাদের নিজস্ব সংগ্রামের গতিকে এসব শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত হতে দেয়নি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে প্রতিটি ধাপে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কৃপা ও অনুমতি নিয়েই এগুতে হয়েছে। এমনকি, একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে তখন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং বাংলাদেশের দুজন সুপরিচিত বুদ্ধিজীবি তার ভাষণের খসড়া রচনা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দিল্লী থেকে টেলিফোনে নির্দেশ এল, এই ভাষণ ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতরের দ্বারাই রচিত হবে। এরকমটিই ছিল আমাদের স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধ প্রলম্বিত হলে সত্যিকার স্বাধীনতা ও মুক্তিকামীরা ভারতীয় সেবাদাস নেতৃত্বকে হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় চলে আসতে পারে, এই আশংকাকে সামনে রেখেই ভারত ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এবং ঘটনাপ্রবাহকে নিজ অনুকূলে রাখার প্রয়াস চালায়। সেই থেকে বাংলাদেশ একটি দুর্বল রাষ্ট্রই থেকে গেছে।

আমাদের নেতৃত্ব কখনোই বোঝার চেষ্টা করেনি, ভারত একটি বিশালাকার দৈত্য বটে, কিন্তু তার পাগুলো কাদমাটির তৈরি। ১৯৬২'র চীন-ভারত যুদ্ধে ভারত কী নাকানি চুবানি খেয়েছিল, তা এদেশবাসীর অজানা নেই। পাকিস্তানের সঙ্গে একমাত্র একাত্তরের যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধেই ভারত নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছে, একথা বলা যাবে না। ১৯৯৯'র কারগিল যুদ্ধে ভারতকে নাস্তানাবুদ হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীর এক নম্বর পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। ভারতে ঠিক এই মুহূর্তে একদিকে উত্তর-পশ্চিমের কাশ্মীরে এবং অন্যদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে। অবস্থা কতটুকু নাজুক যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী পাকিস্তানের যে সেনাশাসক পারভেজ মোশাররফের সাথে সার্ক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে

www.pathagar.com

চাননি, সেই পারভেজ মোশাররফকেই আজ দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করে একুশবার তোপধ্বনিসহ লালগালিচা সংবর্ধনা দেয়ার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন। কাশ্মীরি মুজাহিদীনদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও অতুলনীয় আত্মত্যাগের ফলেই দিল্লীর প্রভুরা লেজ গুটাতে শুরু করেছে। মূল কথা হল, জনতার ঐক্য থাকলে, অভীষ্ট অর্জনের আদর্শে অবিচল থাকলে যে কোন বৈরী পরিস্থিতিকে নিজ পক্ষে নিয়ে আসা যায়। পৃথিবীর যে কোন জাতি, তা যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তারা যদি মনেপ্রাণে স্বাধীনতা কামনা করে এবং তার জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকে, তাহলে পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্রটিকেও তাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। বাংলাদেশে আমরা যে নেতৃত্বের কবলে পড়েছি সেই নেতৃত্বের যেমন রয়েছে ধীশক্তির অভাব, তেমনি রয়েছে দৃঢ়প্রত্যয়ের অভাব।

অতি সাম্প্রতিককালের একটি ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পিরোজপুর সফরকে যেভাবে পথে পথে অত্যন্ত কদর্য ও নোংরাভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, তা ঢাকাস্থ নেতৃবৃন্দ অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তাৎক্ষণিকভাবে নিদেনপক্ষে হাজার দেড় হাজার লোকের প্রতিবাদ মিছিলও রাজপথে বের করতে সক্ষম হননি। কাপুরুষতা ও ভীরুতাই যাদের একমাত্র সম্পদ, তারা দেশ দূরে থাক, তাদের নেত্রীকেও রক্ষা করতে সক্ষম নয়। আর এ সক্ষমতাই বা কিভাবে অর্জিত হবে? পাঁচ বছরে কর্মীদেরকে রাজনৈতিক ও আদর্শিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য যদি পাঁচ-দশ পাতার ইশতেহার প্রকাশ করা না হয়, কর্মী সমাবেশ ও কর্মী সম্মেলন করে কর্মীদেরকে রাজনৈতিকভাবে প্রস্তুত করা না হয়, এবং উচ্চপর্যায়ে নীতিনির্ধারণের জন্য আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা না হয় তাহলে কর্মী বাহিনীর মধ্যে অন্তর্নিহিত যে প্রবল প্রাণশক্তি রয়েছে, তার কিভাবে স্ফূরণ ঘটবে? এর জন্য অন্যকে দোষ দিয়ে কোন লাভ হবে না। সাংগঠনিক শক্তিকে মজবুত করতে না পারলে বারবার যে দিল্লীর কৃপা কামনা করতে হবে, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে ? আসলে এই নেতৃত্ব দিল্লীর চাইতে নিজ দেশের জনগণকেই বেশী ভয় পায়। তারা তো অনেকে আবার ইতিহাসেরও ছাত্র। এদেশের মানুষ ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল, এদেশে তিতুমীরের বিদ্রোহ হয়েছিল, এদেশে ফরায়েজী আন্দোলন হয়েছিল, নেতৃত্বের প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এসব কথা তারা ভালই জানেন। তারা আরও জানেন, জনগণের শক্তি একবার বন্ধনমুক্ত হলে সকল অচলায়তনকে ভেঙে চুরমার করে দেবে। আর সেই সাথে খড়কুটোর মত বিদেশী কৃপাকামী নেতৃত্ব ভেসে যাবে। আমরা জানি, ভিয়েতনামের নগোদিনদিয়েম, ইরানের শাহেন শাহ, ফিলিপাইনের মার্কোস, নিকারাগুয়ার সমুজা, হাইতির ডুভালিয়ারের মত নেতারা আমেরিকার কৃপায় ক্ষমতায় কিছুকাল ছিল বটে, তবে চিরকালের জন্য থাকতে পারেনি। আসলে যেসব শাসকরা জনগণকে ভয় পায়, তারা কোন না কোন বিদেশী প্রভুর পক্ষপুটাশ্রয়ে থাকতে পছন্দ করে। আর এ কারণেই আজ ভাষার মারপ্যাঁচ ঘটিয়ে, ইনিয়ে বিনিয়ে কায়দাকৌশল করে কুহেলিকার আশ্রয় নিয়ে অথবা আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর মত খোলামেলাভাবে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে, ভারতের সন্তুষ্টি ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়া বা থাকা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে একটু যোগ করতে হয়। অতীতে এদেশের অনেককেই ভারতের কূটচক্রান্তে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। এতে সাময়িকভাবে নিরাশ হলেও তারা হয়ত ভাবছেন, আরেকবার পায়ে ধরলে নিরঞ্জন অধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেবেন। ধিক এই মানসিকতা। একবার মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারলে এবং জনগণকে সাথে নিতে পারলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। তাই তো মওলানা ভাসানী বলতেন, ঐক্যবদ্ধ জনতার শক্তি অ্যাটম বোমার চাইতেও শক্তিশালী।

www.pathagar.com

১২ জুলাই ২০০১

তত্ত্বাবধায়ক সরকারও একটি সরকার

মাহবুব উল্লাহ :

৮ জুলাই এর সংবাদপত্র থেকে জানা গেলো, প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাবাবুদ্দিন আহমদ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বিচারপতি লতিফুর রহমানকে ১৪ জুলাই বিকেল পাঁচটায় বঙ্গভবনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করাতে যাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর নিজস্ব এখতিয়ার অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ ১৫ জুলাই বা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত দিবসে অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে, ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী যে সংসদ আপনাআপনি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও অতিরিক্ত আরো দু'সপ্তাহ সরকারের কার্যক্রম চালিয়ে যাবার আকাঙক্ষা পোষণ করেছিলেন, সেটাতো ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। শেখ হাসিনা সপ্তম সংসদের মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সরকারে থেকে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু, দেশের জন্য রেখে গেলেন জমাট-বাঁধা সংকটের অনিশ্চয়তা। দেশবাসী আগামী দিনগুলোর কথা ভেবে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কে ভুগছে। সবারই প্রশ্ন, দেশ কি মারাত্মক রক্তক্ষয়ের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে? যারা ৭ এব ৮ জুলাইয়ের সংবাদপত্র পাঠ করেছেন,তাদের কাছে রংপুর ও মুন্সীগঞ্জের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা মূর্তিমান বিভীষিকারূপে দেখা দিয়েছে। মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে সশস্ত্র সংঘর্ষে অর্ধডজন বা ততোধিক ব্যক্তি নিহত হওয়া, পুলিশসহ বহু লোকের আহত হওয়া এবং ঘরবাড়ী ভস্মীভূত হওয়ার মতো তাণ্ডবলীলা দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে সকল মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে সন্দেহ নেই। এই প্রেক্ষাপটে ১৩ জুলাই মধ্যরাতে সংসদ বিলুপ্ত হবার পরও ক্ষমতাসীন সরকার হাতে পাচ্ছে আরও অতিরিক্ত ১৭ ঘন্টা সময়। অঘটন ঘটনে পটিয়াসী আওয়ামী লীগের পক্ষে এই ১৭ ঘন্টা সময়ও জাতির জীবনে দুর্যোগ আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য বিরাট সময়। এই নাজুক পরিস্থিতি থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা যদি ১৩জুলাই মধ্যরাতেই শপথ গ্রহণ করতেন, সেটা হতো একটি স্বস্তিকর ঘটনা। মধ্য রাতে ক্ষমতার পালাবদল নজীরবিহীন কোনো ঘটনা নয়। আমাদেরই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেয়েছিলো ১৫ আগস্টের প্রথম প্রহরে। অর্থাৎ ১৪ আগস্ট রাত ১২টার পরপর। এছাড়া পৃথিবীর আরো অনেক দেশের ক্ষমতার পটপরিবর্তন ঘটেছিলো মধ্যরাতেই। এ ব্যাপারে ড. আফতাব আরো বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করতে পারবেন।

আফতাব আহমাদ :

ক্ষমতার পালাবদলে একপক্ষ থেকে যখন অন্যপক্ষ স্থলাভিষিক্ত হয় তখন নির্বাহী ক্ষমতায় যেমন শূন্যতা সৃষ্টি হতে দেয়া যায় না, তেমনি বিদায়ী পক্ষ তড়িঘড়ি করে কোনো নির্বাহী সিদ্ধান্ত যাতে চাপিয়ে দিতে না পারে, সেজন্য সময়ের ব্যবধানটাকে সংক্ষিপ্ততম করে আনাটা রীতিমতো একটি রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে। উপনিবেশোত্তরকালো অধিকাংশ দেশ মধ্যরাতে স্বাধীনতা অর্জন করে। নিকট অতীতে আমরা আফ্রিকা মহাদেশের দুটি রাষ্ট্রের কথা বলতে পারি, যেখানে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের অবৈধ শাসন বিদ্যমান ছিলো। আমি জিম্বাবুয়ে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কথা বলতে চাইছি। এই উভয় রাষ্ট্রই মধ্যরাতে স্বাধীনতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন লাভ করে। আমাদের দেশে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনকাল বৈধতার সংকটে গণপ্রতিরোধের

www.pathagar.com

সম্মুখীনযখন হয়, তখন সাংধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার নামে এরশাদের পদত্যাগ এবং তাৎক্ষণিকভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তির কাছে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অর্পণের প্রশ্নে তখন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেয়, ঠিক তখনই সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নাম।

জনগণের চাপের মুখে রাজনৈতিক পক্ষগুলো বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নামটি মেনে নেয়া মাত্রই ক্ষমতার পালাবদলটি ঘটে। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্ট পদের শূন্যতার কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হয়ে যান এক্ষেত্রে কোনো পক্ষই সময় ক্ষেপণকে প্রশ্রয় দেয়নি। বিশেষ করে বিরোধীপক্ষ তো নয়ই। ব্যত্যয় ঘটেছে শুধু একটি ক্ষেত্রে আর তা হলো প্রধান বিচারপতি পদ থেকে ইস্তফা না দিয়েই বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হন। সংবিধানের এই লংঘনকে জনসমর্থনের কারণে ডকট্রিন অব নেসেসিটির আলোকে বিচার করে রাজনৈতিক দলসমূহ এই মর্মে জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে নির্বাচন পরবর্তীকালে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আমহদকে এ বিষয়ে দায়মুক্ত করা হবে। সংবিধানের একাদশ সংশোধনী ঠিক এ কাজটিই করেছিলো। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আমহদকে সহযোগিতা করার জন্য উপদেষ্টামণ্ডলীর শপথ গ্রহণের অপেক্ষায় না থেকে তাকে আগে শপথ দেয়া হয়। পরবর্তীতে সময় নিয়ে, ভেবে-চিন্তে তিনি তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন।

বাংলাদেশে বর্তমান যে অবস্থা বিরাজমান এবং শাসক দল আওয়ামী লীগ যে ধরনের অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্যে ভুগছে এবং শেষ মুহূর্তে পদোন্নতি, পোস্টিংসহ অস্ত্রের লাইসেন্স বিতরণ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের ভাগ-বাঁটোয়ারা করছে, তাতে দেশ শাসন করার সাংবিধানিক মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর এক মুহূর্তের জন্যও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় থাকতে দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না। বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুতর তা সর্বমহলকে অনুধাবন করার জন্য অনুরোধ করছি। সংসদ কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বন্ধের দিন শুক্রবার সংসদ অধিবেশন চলার কথা নয়। কিছু শাসক দল ঐদিন অর্থাৎ শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত সংসদ অধিবেশন চালিয়ে যাওয়ার অটল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে। এক্ষেত্রে তারা যে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে, তা গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য সুস্থতার লক্ষণ নয়। তদুপরি, প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন গণভবনকে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আবাসনের জন্য বরাদ্দের ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তটি অবৈধ, অশোভন, অনৈতিক ও অরাজনৈতিক এবং অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্যারিসের ইলিসি প্রাসাদ, লন্ডনের ১০ ডাউন স্ট্রীট, ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস কিংবা ম্যানিলার মালাকানাঙ প্রাসাদ ঐসব দেশের প্রাক্তন সরকার প্রধানদের ব্যক্তিগত আবাসন হিসেবে বরাদ্দ করা যায়, তা কোনো সভ্য মানুষ ভাবতেও পারে না।

শেখ হাসিনা সহায়-সম্পত্তিহীন নন। বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তও নন। তাঁর ঘর-সংসার আছে, স্বামী আছে, আছে স্বামীর সম্পদ ও সম্পত্তি এবং ঢাকায় বাসস্থানের জন্য বিশাল ইমারত 'সুধাভবন'। ইসলামী শরীয়া মোতাবেক স্ত্রীরতো স্বামীর ঘরেই বসবাস করার কথা। আর, শেখ হাসিনা প্রায়ই বলে থাকেন, তার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। দেশের জন্য তিনি সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছেন। কথাটা যে আদৌ সত্য নয়, তা সম্পদ গ্রাস করার লোভ থেকেই বোঝা যায়। তাঁর বোনের অর্থবিত্তের যদি এমন অভাব ঘটতো ও তিনি যদি দৈন্যদশায় পতিত হতেন, তাহলে নিয়মিত ঢাকা-লন্ডন যাতায়াত করেন কিভাবে এবং তাঁর লন্ডনে বসবাসের খরচ যোগায় কে? নিখরচায় নতুন ডিক্লারেশন নিয়ে পুরনো গুড উইলের 'বিচিত্রা' পত্রিকাটি শেখ রেহানা বের করেন কিভাবে? অর্থাৎ অর্থ বা বিত্তের অভাব শেখ হাসিনা ও তার বোনের নেই। তারপরও রাষ্ট্রীয় সম্পদ তাঁরা জবরদস্তিমূলকভাবে

www.pathagar.com

ভোগ-দখল করতে চান, বেগম খালেদা জিয়ার নজীর দেখিয়ে। বেগম জিয়াকে যখন সম্পত্তি দেয়া হয় তখন বেগম জিয়ার প্রকৃত অর্থেই কোনো সম্পত্তি ও রোজগারের ব্যবস্থা ছিলো না। দুই ছেলে তখনও নাবালক ছিলো। আজ বেগম খালেদা জিয়ার সন্তানরা রোজগেরে হয়েছে। বেগম জিয়া এখন রাষ্ট্রপ্রদত্ত ঐ সম্পত্তি ইচ্ছে করলেই প্রত্যর্পণ করতে পারেন। এমনকি ক্যান্টনমেন্টের বাসভবনটিকে শহীদ জিয়া স্মৃতি জাদুঘরেও রূপান্তর করতে পারেন। বস্তুত আমাদের সেনাবাহিনী ঐ ভবনটিকে 'শহীদ জিয়া স্মৃতি জাদুঘর' ভবনে রূপান্তরিত হতে দেখলে গর্ববোধই করবে বলে আমার ধারণা। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নিই, বেগম খালেদা জিয়ার বিষয়ে অনভিপ্রেত সিদ্ধান্ত হয়েছিলো, তা কোনো অবস্থাতেই শেখ হাসিনার রাষ্ট্রীয় সম্পদ গ্রাস করাটাকে ন্যায্য প্রমাণ করে না।

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির অভ্যুদয়ের পর রাষ্ট্রক্ষমতার পালাবদলের বেশ কটি নজীর আছে। পঁচাত্তরের পনরই আগস্টের বিয়োগান্ত ঘটনার পরও জনগণের মধ্যে কোনো নেতিবাচক আশঙ্কা লক্ষ্য করা যায়নি। প্রত্যুষে রেডিও'র ঘোষণাটি অনেকেই বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে শুনছিলেন। কিন্তু, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ, নৌবাহিনী প্রধান রিয়াল এডমিরাল এম এইচ খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারসহ বিডিআর প্রধান, পুলিশ প্রধান ও রক্ষীবাহিনীর অস্থায়ী প্রধান এই রাজনৈতিক পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে যখন সংহতি ও সমর্থন ব্যক্ত করেন, এবং নগগঠিত সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন, সেই মুহূর্তেই সকল অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে। ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর রাজধানী ঢাকার মানুষকে দেখেছি অত্যন্ত ম্রীয়মাণ, কিন্তু আসন্ন কোনো রক্তপাতের আশঙ্কায় বিহবল হতে দেখিনি। আর ৭ নভেম্বর ছিলো আজাদীপ্রিয় সৈনিক-জনতার এক উচ্ছল জোয়ার। জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রের হাল ধরেছেন- একথা শুনে প্রতিটি নাগরিক পরম প্রশান্তি ও স্বস্তি অনুভব করেছিলো।

'৮১-তে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নিহত হওয়ার পর জনগণ শোকাভিভূত হয়েছিলো, অভিভাবকহীন হয়ে পড়ায় গভীর দুঃখ পেয়েছিলো। কিন্তু রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব একটা বিচলিতবোধ করেনি। কিন্তু এবারের সংসদীয় সরকার থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে রাষ্ট্রের ক্ষমতা উত্তরণের সময়ে দেশের মানুষ প্রচণ্ড ধরনের বিচলিত, উদ্বিগ্ন, আশঙ্কিত, ঝড়ের পূর্ব মুর্হূর্তে গুমোটভাবে চরম অস্বস্তিতে নিপতিত। আমি যতো পরিচিতজনদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা সকলেই জানতে চেয়েছেন, ১৪ তারিখ থেকে দেশে কী ঘটবে? অনেকে বলেছেন, ভাই, এ যাত্রা বাঁচা যাবে তো? একাত্তরে তো বেঁচে গিয়েছিলাম, এবার তো ঘাতকদের চেহারা আলাদা করা যাচ্ছে না। কেউ কেউ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে বারণ করবো কিনা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বেশ ক'মাসের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী ঘরে মজুদ করবো কিনা। এরকম অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা এদেশের মানুষ খুব একটা প্রত্যক্ষ করেনি। এই মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব অতীতের যে কোনো সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তুলনায় অনেক অনেক বেশী। আমি মনে করি, জনমনে আস্থার সঞ্চার করাটাই হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম মুহূর্তের দায়িত্ব। আমি আশা করবো, তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই কালবিলম্ব না করে কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা ইতস্তত বোধ না করে এমন একটি নির্দেশজারি করবে, যার ফলে সমগ্র জাতি আশ্বস্ত বোধ করে, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত বোধ করে এবং যে উক্তি জনজীবনকে স্থবির, অচল, অনড় করে ফেলেছে তা থেকে মুক্ত করে। এরকম একটি ঘোষণা কী হতে পারে, তা বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ নিজেরাই ভালো জানবেন। তবে আমার মনে হয়, সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, বিডিআর এবং আইনশৃংখলা

www.pathagar.com

রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সদা সতর্ক রাখা অত্যন্ত জরুরী। আইন বা বেআইনী কোনো রকম অস্ত্র বা গোলাবারুদ বহন নিষিদ্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই মুহূর্তে কোনো দলীয় স্বার্থ চরিতার্থকরণ জাতির কাম্য নয়। কোনো রকম প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচেষ্টাও কাম্য নয়। আমরা এই আশঙ্কা এ কারণেই আরো প্রবলভাবে অনুভব করছি, যেহেতু শেখ হাসিনা ইতোমধ্যেই বলে দিয়েছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলে তারাও দেখাতে পারবেন 'কত ধানে কত চাল'। এর রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন, মাত্রা বিবর্জিত হুমকি উচ্চারণ কেবলমাত্র তারাই করতে পারে, যাদের বিবেচনায় দেশ, জাতি ও জনগণের স্বার্থ কোনরূপ স্থান পায় না।

আফতাব আহমাদ :

গত কিছুদিনের পত্র-পত্রিকা পাঠ করে যে কোনো নাগরিক ভীত-সন্ত্রস্ত ও শিউরে উঠবেন। বিভিন্ন জনপদ ছাড়াও দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলো সম্পর্কে খবরে বলা হচ্ছে যে, শিক্ষাঙ্গনগুলো যাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তাদের উচ্ছেদ করার জন্য প্রতিপক্ষ পূর্ণ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আছে। খবরে আরও প্রকাশ, বিভিন্ন এলাকায় বাতাসে কেবল টাকার নোটের ছড়াছড়ি এবং সন্ত্রাসী বিভিন্ন চক্রের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গোপনে শলাপরামর্শ করে চলেছেন। পুরো পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হবে, সারাদেশ এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ার জন্যই যেন অপেক্ষা করছে।

এ আমাদের চরম দুর্ভাগ্য এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি চরম হুমকিও বটে। আজকের এই বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির জন্য শাসক দল আওয়ামী লীগই যে দায়ী তা বলাই বাহুল্য। একদা সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকা হিসেবে এ যেসব দৈনিক পরিচিত ছিলো গত দু'মাস ধরে সেসব পত্র-পত্রিকায় শাসক দলের সন্ত্রাসী তৎপরতা ও বাড়াবাড়ির যেসব অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে, তা ঐসব পত্রিকার মতে মূল ঘটনার এক-শতাংশ মাত্র। এ থেকেই পরিস্থিতির গভীরতা বোঝা যায়। আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে যারা ক্ষেপে আছেন, তাদের তেমন একটা দোষ দেয়া না গেলেও আমি বলবো, গণতন্ত্রের স্বার্থে, স্থিতিশীলতার স্বার্থে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের আবশ্যই সংহত আচরণ করতে হবে এবং ক্রোধকে সংবরণ করতে হবে। তাদের আক্ষেপ ও ক্রোধকে জনমত গঠনের কাজে লাগাতে হবে এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে যাতে আওয়ামী লীগের সৃষ্ট সন্ত্রাসী পরিবেশের যথোপযুক্ত জবাব দেয়া যায় তার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমি অনেককেই বলতে শুনেছি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসুক তারপর আওয়ামী লীগকে একহাত দেখে নেয়া যাবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রীও সম্ভবত এ ধরনের উক্তি শুনে থাকবেন। সে জন্যই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে দম্ভভরে তিনি পাল্টা হুমকি দিয়েছেন যে, আওয়ামী লীগও দেখিয়ে দেবে, কত ধানে কত চাল।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, দেশে এমন একটা ভাব বিরাজ করছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো সরকারই নয়। আমি সর্বমহলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রধানত গঠিত হবে, তথাপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে কোনো সংজ্ঞায় কার্যকর সরকার ও সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানাদি বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই সরকারের আদেশ, নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত প্রতিপালননে বাধ্য। কেউ এর ব্যত্যয় ঘটালে প্রজাতন্ত্রের নিয়মবিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষ যথাবিহিত দণ্ডভোগ করতেও বাধ্য। জাতীয় স্বার্থে এবং রাষ্ট্রের অখণ্ডতার স্বার্থে সর্বমহলকে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের পথ পরিহার করে আগামী দিনের জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির পথে দেশ যাতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচিত একটি সরকার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে সে বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। মহামান্য প্রেসিডেন্ট এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকেও দেশের

www.pathagar.com

জনগণের মধ্যে প্রবল আস্থা ও বিশ্বাস জন্ম দেয়ার জন্য যথোচিত দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পক্ষপাতমুক্ত অবস্থান গ্রহণ করে নির্দলীয় ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সকল সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থে যাতে গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হতে হবে। দল-নির্বিশেষে সীমালংঘনকারী যে কাউকে কঠোর হস্তে দমন করার প্রশ্নে কোনো ধরনের দ্বিধা ও সংকোচকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। আর সে কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সকল বিতর্কিত ও কনটেনশাস ইস্যুকে এড়িয়ে যেসব বিষয়ে ব্যাপক জনসাধারণের সম্মতি গড়ে উঠেছে, যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সকল পক্ষকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি আচরণবিধির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। আমরা হিংসা-বিদ্বেষ,হানাহানি দেখতে চাই না। সুষ্ঠু ও সুস্থ পরিবেশে একটি অর্থবহ নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠান করা যায়, সে বিষয়েই আগ্রহী।

মাহবুব উল্লাহ :

তত্ত্বাবধায়ক সরকারও একটি সরকার এবং মনে রাখতে হবে, It governs and has to govern. তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার কারণে এই সরকারকে একটি ক্লীব সরকার যেন কেউ ভাবতে না পারে সে ব্যাপারে প্রথম মুহূর্ত থেকেই সুবিবেচিত ও সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নির্বাচনী প্রচারণা, আন্তদলীয় বিরোধ ও হিংসা-বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে দেশ যাতে একটি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে, সেদিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। একটি দেশে গৃহযুদ্ধের যে কত বিপর্যয় ও ট্র্যাজেডির কারণ, তাতো আমরা বলকান অঞ্চলের সমসাময়িক ঘটনা থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। আর এই ধরনের গৃহযুদ্ধ যে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপকেও অনিবার্য করে তুলতে পারে-তাও আমরা জানি। পাদুয়া ও বড়াইবাড়ির ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সীমান্ত জুড়ে যেভাবে সেনা মোতায়েন করেছে বা তারা যে কোনো মুহূর্তে যে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে পারে, আমাদের তা ভুলে গেলে চলবে না।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গৃহ-বিবাদজনিত পরিস্থিতিতে আধিপত্যবাদী ভারত তার স্বার্থ কাজে লাগাতে গিয়ে আমাদের দেশের ভেতর অনুপ্রবেশ করে দেশটাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবে না-সেই ভরসা বোধ করার কোনো কারণ নেই। সেই কারণেই প্রতিটি নাগরিককে সর্বোচ্চ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুকে কোনো প্রকার মতলব বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। আইনের স্বাভাবিক গতিতে সকল অত্যাচার ও অবিচারের বিচারের জন্য ধৈর্য ধরে সকলকে অপেক্ষা করতে হবে। একটি সুস্থ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যা যা করণীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঠিক তাই করবে, এটাই জনগণের প্রত্যাশা। জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন বিন্যাস কী হবে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। মতাদর্শগতভাবে ভারসাম্যহীন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ মুহূর্তে কারুরই কাম্য নয়। অতীতে আমরা লক্ষ্য করেছি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টা পরবর্তীকালে সক্রিয় দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। কারণ তারা বিশেষ মতাদর্শের প্রতি ঝোঁকপ্রবণ ছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এমন সব ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হোক, যাদের সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই অথবা বিশেষ কোনো মতবাদের প্রতিও দুর্বল নন। কাজটি কঠিন। এদেশে এমন লোক খুঁজে বের করা দুরূহ। কিন্তু দুরূহ হলেও ভেবেচিন্তে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে এমন সব লোককেই খুঁজে বের করতে হবে। এদেশের মানুষ অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেছে, অনেক রক্তপাত এদেশে ঘটেছে। আর কোনো রক্তপাত নয়। রক্তপাত এড়ানোর ঐতিহাসিক দায়িত্বটি প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রমানের ওপর অর্পিত হতে যাচ্ছে। এদের মধ্যে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন দায়িত্ব পালনরত এবং বিচারপতি লতিফুর রহমান দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

১৯ জুলাই ২০০১

বিচারপতি লতিফুর রহমান ব্যর্থতা পরিহারে যত্নবান হবেন

মাহবুব উল্লাহ :

রাষ্ট্র ক্ষমতাকে সর্বতোভাবে সদ্ব্যবহার, অসদ্ব্যবহার, অপব্যবহার ও অনৈতিক ব্যবহার করে এবং অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করে শেখ হাসিনা অবশেষে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিলেন। ক্ষমতার শেষ দিনগুলো এবং এর প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দণ্ড, প্রতিটি পল ও অনুপলকে কিভাবে আবার তিনমাস পর ক্ষমতায় আসা যায়, সেজন্য সর্বাত্মক, সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত ব্যবহার তিনি করেছেন। সিভিল প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, বিডিআর ও পুলিশবাহিনীসহ রাষ্ট্রের সর্ব পর্যায়ে সকলগুরুত্বপূর্ণ পদে নিজ অনুগতদের তিনি বসিয়েছেন। শত শত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। যে পদ্মা সেতুর জন্য কোনো বৈদেশিক আনুকুল্যের সংস্থান হয়নি, কোনো প্রকার অর্থনৈতিক ও কারিগরি ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়নি, সেই পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর তিনি স্থাপন করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যে কক্ষে তাঁর পিতা মাঝে মধ্যে বসতেন, সেই কক্ষটিকে তাঁর ব্যবহৃত আসবাপত্র দিয়ে স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ১৩ জুলাই ছিল সপ্তম সংসদের শেষ কর্মদিবস। সেদিন রাত সাড়ে ন'টা অব্দি সংসদের অধিবেশন চালানো হয়েছে এবং শেখ হাসিনা সেই অধিবেশনে প্রায় দুই ঘণ্টা সময়ব্যাপী সমাপনী ভাষণ দিয়েছেন। সেই ভাষণে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে 'নিশিকুটুম্ব' বলে গালমন্দ করে বিশ্বের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পাঠকের মধ্যে হয়তো অনেকে 'নিশিকুটুম্ব' শব্দটির অর্থ নাও জানতে পারেন। তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই, 'নিশিকুটুম্ব' শব্দটি অর্থ হলো 'রাতের সিঁধেল চোর'। বিরোধী দলীয় নেত্রী যদি রাতের সিঁধেল চোর হন, তাহলে তিনি কী? তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতা অনেক বেশি। তিনি কি তাহলে দিনের বেলার ডাকাত? এ ধরনের উক্তি করে তিনি নিজেকে যে কত ছোট করেছেন তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন কিনা, জানি না। ড. কামাল হোসেনের নামোল্লেখ না করে তাঁকে যথেষ্ট গালমন্দও করেছেন তিনি। এ দেশের মানুষ যথেষ্ট বুদ্ধিমান। 'আকেলমন্দকে লিয়ে ইশারাহ কাফি'।

শেখ হাসিনার কথা মতই ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে বিচারপতি লতিফুর রহমান বঙ্গভবনে শপথ নিলেন। প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ শেখ হাসিনার 'পরামর্শ'কেই মূল্য দিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানকে আরো আগে নিযুক্ত করার বিরোধী দলের কাকুতি মিনতি প্রেসিডেন্ট অগ্রাহ্য করেছেন। বুদ্ধিমান দেশবাসী এ থেকে প্রেসিডেন্টের মাইন্ডসেট বা মনোভঙ্গী বুঝতে পারছেন। তবে তিনি যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনভিপ্রেত ও অমানুষিক চাপের মুখে পড়েছিলেন এ কথাটিও মনে রাখতে হবে। 'শুভশ্য শীঘ্রম' এই চিরায়ত প্রবাদটি এ যাত্রা প্রেসিডেন্টের বিবেচনায় ছিল না। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ কেন ত্বরিৎ করা উচিত ছিল, তার যৌক্তিকতা অনুধাবন করা যায়, যদি শেখ হাসিনাকে নিরাপত্তা প্রদানে জন্য এসএসএফকে সম্প্রসারণ এবং নির্বাচন প্রচার কার্যে রাষ্ট্রীয় খরচে হেলিকপ্টার ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের সর্বশেষ ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তটি বিবেচনায় আনা হয়। বিএনপিসহ চারদলীয় জোট প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেনি, এ ব্যাপারে তারা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল। প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সময়ক্ষণ তাদের মনোপূত হয়নি। এবারের সাংবিধানিকভাবে নিযুক্ত দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শুরুটাই যেন বেতাল ও বেসুরো হয়ে গেল। বেতাল -বেসুরো সুচনা শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়াবে, যে ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে আলোকপাত করার জন্য ড. আফতাবকে অনুরোধ করবো।

www.pathagar.com

আফতাব আহমদ :

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেতাল-বেসুরোভাবে যাত্রা শুরু করেছে কি না আমি নিশ্চিত নই। সাধারণ অবস্থায় একটি সরকার বিদায় নেয়ার সময় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার ব্যতিক্রম বাংলাদেশে তো ঘটেনি। বিরোধী দল এমন কোনো আন্দোলন বা জনমত গড়ে তুলতে পারেনি, যার তোপের মুখে ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়েছে। অতএব ১৩ জুলাই মধ্যরাতে প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের দাবীও সক্রিয় সার্বজনীনতা লাভ করেনি। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাকে মূল্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট তাঁর নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করেছেন, এ ধরনের মত হয়তো অনেকে পোষণ করবেন, কিন্তু একটি নির্বারিত সরকারের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের বিরোধে জড়িয়ে পড়াটা কতোটুকু শোভন, সমীচীন, তাও আমাদের ভাবতে হবে। এ কথাতো ভুললে চলবে না, প্রেসিডেন্টকে কোনো ধরনের ডিসক্রিশনারি ক্ষমতা যাতে দেয়া না হয়, সে বিষয়ে আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য ছিল। অপরিণামদর্শিতার ফল আজ যতো তেতোই মনে হোক, ভোগতো করতেই হবে। তবে যে বিষয়টি আমাদের অনুধাবন করা খুবই জরুরী, তা হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার পেছনে যে চিন্তা কাজ করেছিল, সেই চিন্তাকে কিভাবে প্রাধান্য দেয়া যায়। ধরেই নেয়া হয়েছে, রাজনৈতিক দলাদলির কারণে দলভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত সরকার নির্বাচন চলাকালীন সময়ে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হবে। আর সেজন্যই তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদকে এখন সাবেক শাসক দলের পাতা জাল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন ও স্বকীয় অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। এতোদিন তিনি নামে মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। এখন তার হাতে শুধু পর্যাপ্ত নির্বাহী ক্ষমতাই নেই, প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ প্রেসিডেন্টের কাছে দায়ী ও জবাবদিহি করতে বাধ্য।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী নিজ নামে গণভবন বরাদ্দ করে নিয়ে যে পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছেন এবং এসএসএফের নিরাপত্তার বেষ্টনীতে থেকে যে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন, তা নির্বাচনে প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে বাধ্য। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শেখ হাসিনার নিরাপত্তায় কোনো কারণে বিঘ্ন ঘটুক, তা যেমন আমরা চাই না, তেমনি নিরাপত্তার সুবিধা গ্রহণের নামে নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার অশুভ উদ্দেশ্যে যে কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, তা বহাল থাকুক, সেটাও আমরা চাই না। সারাদেশে যেভাবে অস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী সমর্থকদের মধ্যে যেভাবে লাইসেন্স দিয়ে অস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দেশব্যাপী সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন দল যেভাবে গঠন করা হয়েছে, তাতে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা প্রায় দুঃসাধ্য।

সবার আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে, বৈধ অস্ত্রগুলোকে নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করার জন্য কঠোর ও ফলপ্রসূ কম্বিং অপারেশন চালাতে হবে। এ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব কিংবা উদাসীনতা আওয়ামী লীগের ছক অনুযায়ী নির্বাচন করার সমতূল্য হবে। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন থেকে শুরু করে নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লেষ রয়েছে, এমন সব ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে যেসব নিয়োগ দেয়া হয়েছে, সেসব নিয়োগ বাতিলের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দ্বিধা সংকোচ দেখানো চলবে না। বিচারপতি লতিফুর রহমানের সামনে এখন এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। প্রেসিডেন্টের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে বিএনপিসহ চারদলীয় বিরোধী জোট তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেনি। তাঁকে এখন এই জোটের আস্থা অর্জনের জন্য যথোচিত পদক্ষেপ নিতে হবে। একই সঙ্গে ভোটার তালিকায় ভুয়া ভোটারসহ যেসব অনিয়ম ঘটেছে,তারও প্রতিবিধান করতে হবে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি যেভাবে ক্রমান্বয়ে ঘটেছে, তাতে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় আইন-শৃংখলার উন্নয়নের স্বার্থে কঠোরতম

www.pathagar.com

ব্যবস্থা যদি না নেয়া যায় এবং সন্ত্রাসী গডফাদারদের যদি চেক করা না যায় তাহলে গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়াই একটি প্রহসনে পরিণত হবে। সর্বাগ্রে আজ তাই প্রয়োজন একটি সামাজিক সমঝোতা ও বিভিন্ন সামাজিক শক্তির মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা। এ ব্যাপারে উদ্যোগী না হলে সব কিছুই বেতাল ও বেসুরো হয়ে যাবে।

মাহবুব উল্লাহ :

দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সবসময় মৌনতা অবলম্বন করেছেন, এমন নয়। বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতি, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ক্ষতিকর কার্যকলাপ এবং কালো টাকা ও ঋণ খেলাপীর প্রশ্নে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে তার অভিমত অকপটে ব্যক্ত করেছেন। তবে পার্বত্য শান্তি চুক্তি, জননিরাপত্তা আইন এবং শেখ হাসিনা ও রেহানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনের প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত তার সম্মতি জ্ঞাপন জাতিকে হতাশ করেছে। জননিরাপত্তা আইনের ব্যাপারে সম্মতি প্রদানে তিনি কালক্ষেপণ করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেননি। তিনি বার বার বলেছেন, সংবিধানে তাঁকে এমন কোনো ক্ষমতা দেয়া নেই যে, তিনি এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটাতে পারতেন। এই বিলগুলোকে তাঁর কাছে অর্থ বিল হিসেবে পেশ করা হয়েছিল। অর্থ বিল হলে তাতে সম্মতি প্রদানে প্রেসিডেন্ট আইনত অন্যথা করতে পারে না, এমনটিই বার বার বলা হয়েছে। জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই বিলগুলোর অন্তত কোনো একটির ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত তিনি হয়ত চাইতে পারতেন। পরম পরিতাপের বিষয়, তিনি তা করেননি। তবে, এ ব্যাপারে বিজ্ঞমহলের মত হলো, রাজপথে যদি শক্তির মহড়া প্রদর্শন করা যেতো, তাহলে হয়ত প্রেসিডেন্ট কিছু একটা করতে পারতেন এবং তা করার অজুহাতও তিনি পেতেন।

এই পোড়াকপালী জাতির কপাল এতোই মন্দ, যাদের এসব করার কথা, তারা কিছুই করল না। এর খেসারত গোটা জাতিকেই বহন করতে হচ্ছে। ফিলিপাইনের জোসেফ এস্ত্রাদার সরকার যেভাবে অপসারিত হয়েছে, সেরকম একটি নজির বাংলাদেশেও স্থাপিত হতে পারত। কিন্তু দোদুল্যমানতা ও সিদ্ধান্তহীনতা কতো ক্ষতি করতে পারে, তা বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বুঝতে পারি। এর অর্থ এই নয়, সবসময় সকল ক্ষেত্রে নির্বাচিত সরকারকে তার স্বাভাবিক মেয়াদপূর্ণ করার আগেই বিদায় দিতে হবে। যদি ক্ষমতাসীনরা দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করে, জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে এবং গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহলে সেক্ষেত্রে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার নীতি কখনোই কাম্য হতে পারে না। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণক্রমে দিল্লী সফরে গেছেন, সেখানে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দৃশ্য আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছি। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল ও বিরোধী দলীয় নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে সঙ্গে নিয়ে মোশাররফের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত এ ধরনের কোন নজির আমরা দেখতে পাইনি। ইন্দর কুমার গুজরাল সে দেশের লোকসভাতেও নেই। তবু একজন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশারদ হিসেবে বাজপেয়ী তাঁকে আলোচনার টেবিলে পাশে রেখেছেন পরামর্শক হিসেবে। এটাই হলো গণতন্ত্র। এ রকম আচরণের সংস্কৃতি চালু না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে খেয়োখেয়ির রাজনীতি চলতেই থাকবে। সামাজিক অস্থিরতা জারি থাকবে। যে দেশে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী বিরোধী নেত্রীকে নিশিকুটুম্ব বলে গালমন্দ করেন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তার অবস্থান সম্পর্কেও কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত করেন এবং হোটেলে রাত্রিযাপন করেন বলে অশালীন ও অশোভন উক্তি করেন, এমনকি তাঁর শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কে অসুস্থ বাক্য উচ্চারণ করেন সে দেশে গণতন্ত্র আমরা কতোটুকু ভোগ করতে পারি, তা গভীরভাবে ভাবতে

www.pathagar.com

হবে। গোটা পরিস্থিতি এতোই অসুস্থ ও এতোই দুঃখজনকভাবে অচিন্তনীয় যে, এসবের কুপ্রভাবে গোটা সমাজটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পত্রপত্রিকায় সাংবাদিক ও কলামিস্টরা বারবার এ ব্যাপারে সংযত হওয়ার আহবান জানানো সত্ত্বেও নোংরা খিস্তিখেউড়ের কোন বিরতি ঘটেনি। কথায় বলে, কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না।

আফতাব আহমাদ :

জনমনে যে শঙ্কা এখন কাজ করছে, তা দূর করার দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই সাবেক মন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিম নিউইয়র্কে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বলেছেন, ১৩ জুলাইয়ের পরে বুঝিয়ে দেব, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাকে বলে, কত প্রকার ও কি কি ? এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে,তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নেপথ্য থেকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে চাইবে আওয়ামী লীগ। প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণকে কেন্দ্র করে প্রেসিডেন্টের মাইন্ড সেটের যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তা শেখ সেলিমের হুমকির প্রতিফলন বলেই অনেকের কাছে মনে হতে পারে। আমি আশা করব, জনমনে যে শঙ্কা রয়েছে তা অমূলক প্রমাণিত হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে শিখণ্ডি হিসেবে সামনে রেখে অরাজকতা ও নৈরাজ্যের জন্ম দিয়ে জনগণের ওপর সহিংসতা চাপিয়ে দিয়ে একটি সন্ত্রাসী পরিবেশে আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের যে ক্ষোভ ও ঘৃণা রয়েছে তাকে সামাল দিয়ে একটি দায়সারাগোছের নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে নীলনকশা আওয়ামী লীগ প্রণয়ন করেছে তাকে কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে দেয়া যাবে না।

নির্বাচন তখনই অর্থবহ হবে, যখন সাধারণ নাগরিকগণ ভয়ভীতি ও ত্রাসমুক্ত পরিবেশে তাদের ভোটাধিকধার প্রয়োগ করতে পারবেন এবং তাদের প্রযুক্ত অধিকারের ফলাফল সুনিশ্চিতভাবে অর্জন করতে পারবেন। দেশে যে একপেশে প্রশাসন ও গণমাধ্যম তৈরি করা হয়েছে, তাকেও ঢেলে সাজিয়ে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। সীমান্তের চারদিকে ভারতীয় বিএসএফ এবং তার ছত্রছায়া হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে। কোন অজুহাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বহির্হস্তক্ষেপ যাতে না ঘটে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। একটি কথা সকল মহলের মনে রাখা উচিত, গত পাঁচ বছর দেশের স্বার্থ ও দেশের অখণ্ডতাকে কেন্দ্র করে যেসব রাষ্ট্রঘাতী পদক্ষেপ সরকারী পর্যায়ে নেয়া হয়েছে, তার পেছনে জনগণের কোন সমর্থন তো ছিলই না, উপরন্তু শাসক দলের বিরুদ্ধে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। বিগত এই শাসক দলটি জনগণের এই মনোভাবের কথা ভালভাবেই জানে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার মুখে আওয়ামী লীগের আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছু নেই। ১৯৭১-এ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে মুক্তিপাগল উদ্বেলিত জনতা কারো মুখাপেক্ষী হয়ে যেমন থাকেনি, তেমনি আগামীতেও তারা কারো মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না। বিরোধী দলের অদক্ষতা ও পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতার মুখে আওয়ামী লীগ ওয়াকওভার পেয়ে যাবে-এটা ভাবার কোন কারণ নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও মনে রাখতে হবে যে, তার আচরণ শুধু পক্ষপাতমুক্ত হলেই চলবে না, জনসাধারণের অভিপ্রায় অবধারিতভাবে যাতে ব্যক্ত করা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সে বিষয়েও যত্নবান হতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে জনরোষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও রেহাই পাবে না।

মাহবুব উল্লাহ :

ড. আফতাবের মতো আমি যদি আশাবাদী হতে পারতাম, তাহলে সুখী হতাম। আমি অস্বীকার করব না, এ দেশে ইতিহাসের একটি ধারা সৃষ্টি হয়েছে, যে ধারায় আমরা লক্ষ্য করেছি নেতৃত্বের শূন্যতার মধ্যেও জনতার আশা-আকাঙক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে

www.pathagar.com

ননকনভেনশনাল নেতৃত্বেরও উদ্ভব ঘটে। ১৯৬৯-এ যে ছাত্র গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল, তা শেখ মুজিবের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও হয়েছিল। কোন সংগঠিত রাজনৈতিক দল সেদিন আয়ুবী শাসনের জগদ্দল পাথর অপসারণের জন্য জনতার অন্তর্নিহিত অপরিমেয় শক্তিকে বন্ধনমুক্ত করতে এগিয়ে আসতে পারেনি। তবে ইতিহাসে এমন নজিরও আছে, যা থেকে আমরা দেখতে পাই, ফ্রাঙ্কো, সালাজর ও চচেস্কুর মত একনায়কতন্ত্রবাদী শাসন যুগের পর যুগ অব্যাহত থাকে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর গণতন্ত্র অর্গলমুক্ত হলেও সে সম্ভাবনা ঘনায়মান নতুন স্নায়ুযুদ্ধের আড়ালে আবারও অর্গলবন্দী হওয়ার অবস্থায় নিপতিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে যদি এমনটি ঘটে, তাহলে কেবল যে গণতন্ত্রই তার বলি হতে, তা নয়, বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে হতে হয় 'বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি'।

বাংলাদেশে এখন যে পরিস্থিতি, তাতে একযোগে দু'পক্ষের মাসি ও পিসি হওয়া কত যে কঠিন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি রাজপথে শক্তির ভারসাম্য থাকে, তাহলে হয়তো সেরকম একটি আচরণ আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছ থেকে আশা করতে পারি। কেউ হয়তো বলবেন, নির্বাচনী রাজনীতি করতে গিয়ে, রাজপথে ক্ষমতার ভারসাম্যের কথা কেন অপ্রাসঙ্গিকভাবে উত্থাপন করা হচ্ছে? কিন্তু পরিস্থিতি যা তাতে আমরা একমাত্র পাবলিক মবিলাইজেশনের ভারসাম্যের ওপরই আস্থা রাখতে পারি। আজ থেকে দু'বছর আগে অতীতের দু'টি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু'জন অর্থনীতিবিদ উপদেষ্টা যুগপৎভাবে প্রকাশিত খোলা চিঠিতে (প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীকে প্রদত্ত) এবারকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তাদের এই আশঙ্কা তথা ভবিষ্যদ্বাণী জায়মান পরিস্থিতিতে অমূলক মনে হয় না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বভার হাতে নিয়েই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সচিব পদে রদবদল করার পর চারজন আমলা বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে যেভাবে অভিযোগ পেশ করেছেন, তা ৯৬ সালের আমলাবিদ্রোহের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এটিও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে একটি প্রশ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বড় গর্ব করে তার সমাপনী ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মডেল পৃথিবীর আরও অনেক দেশ গ্রহণের কথা চিন্তা করছে। কিন্তু এ যাত্রা যদি প্রাগুক্ত প্রাক্তন দুই উপদেষ্টার আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে এমন কিছু ঘটে, তাহলে এই আশাবাদ ব্যঙ্গোক্তিতে পরিণত হবে। প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান কত বড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন তা তিনি যত গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন এবং সম্ভাব্য ব্যর্থতা পরিহারে যত যত্নবান হবেন, জাতির জন্য সেটাই হবে অভিপ্রেত।

www.pathagar.com

২৬ জুলাই ২০০১

কোন অন্যায় চাপের প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নতি স্বীকার করা চলবে না

মাহবুব উল্লাহ :

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রায় দু'সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে চললো। একটি নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যতো ব্যাপক ও বিশাল পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, তার সামান্যই মাত্র করা সম্ভব হয়েছে। শপথ গ্রহণের এক ঘন্টার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান ১৩ জন সচিবের পদে বড় আকারের রদবদল ঘটিয়ে তাঁর সরকারের কার্যকারিতা ও সক্ষমতার যে নজীর স্থাপন করেছিলেন, তা এখন কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। এর কারণ মূলত দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের পরস্পরবিরোধী অবস্থান। ১৩ সচিব রদবদলের ঘটনায় আওয়ামী বিরোধী শিবির উল্লসিত হয়েছিলো এবং সন্তোষও প্রকাশ করেছিলো। তাদের সেই উল্লাস ও সন্তোষ যে হতাশা ও অসন্তোষে পরিণত হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন বিক্ষুব্ধ ৪ আমলা। এঁরা বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের ক্ষোভের কথা জানান এবং তাদের প্রতি অবিচার হয়েছে বলে নালিশ করেন।

এই চারজনের মধ্যে একজন অবশ্য পরবর্তীতে এ ধরনের অভিযোগ পেশের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করেন। এই ৪ আমলার মধ্যে একজন অবসর গ্রহণের পরেও বিভিন্ন মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক সরকারের দায়িত্বে ছিলেন। অন্যজন সরকারের বাইরে থেকে চুক্তির ভিত্তিতে সরকারের কাজে জড়িত হন। তৃতীয়জন বহাল তবিয়তে তার স্বপদে অবস্থান করছেন। এই ৪ আমলার মধ্যে ২জন একমাসের ছুটির জন্য আবেদন করেছেন। সরকারে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় খোঁট পাকিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চপদস্থ আমলারা যখন ট্রেড ইউনিয়নসুলভ আচরণ করেন, তখন রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান আমলাতন্ত্র নিয়ে আমরা আশংকিত না হয়ে পারি না। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা তাঁদের হতাশা কিংবা বঞ্চনার কথা আর্জি আকারে তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে সরাসরি প্রেসিডেন্টের নিকট ধর্ণা দিয়ে চাকুরির নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন এবং যে যে কারণে তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ দাঁড় করানো যেতে পারে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এম এ সাঈদ কিছুটা ক্রুদ্ধ স্বরে বলেই ফেলেছেন, রাজনীতি করতে হলে সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে করাই বাঞ্ছনীয়। অপরদিকে সংবাদপত্রগুলোতে রিপোর্ট বেরিয়েছে, আওয়ামীপন্থী আমলারা নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস ক্রিয়াকে ভণ্ডুল করার জন্য সংগঠিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের মধ্যে বিরাজমান এই অস্থিরতা একটি সফল ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য মোটেও অনুকূল নয়। এদিকে, সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। মাঠ পর্যায় থেকে উপরতলা পর্যন্ত যে সব প্রশাসনিক রদবদল ঘটানো অপরিহার্য, তা নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগেই করতে হবে। কারণ, এটাই বিদ্যমান নির্বাচনী আইনের বিধান। আওয়ামী লীগ চাচ্ছে, নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে এমন একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে, যাতে করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না হয় এবং তাদের সাজানো কাঠামোর

www.pathagar.com

মধ্যেই যাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর তাই যদি হয়, তাহলে নির্বাচনের ফলাফল জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিন্দুমাত্র প্রতিফলন ঘটাবে না। আওয়ামী লীগ প্রতিদিন নতুন নতুন ওজর-আপত্তি তুলছে। লক্ষ্য একটাই তাদের ছকেই নির্বাচনকে নিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে চারদলীয় জোট কতোটা কার্যকরভাবে আওয়ামী মহাপরিকল্পনার ছককে ভেঙে দিতে পারবে, সেটাই আজ জনগণের জিজ্ঞাসা।

আফতাব আহ্‌মাদ :

আমাদের সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে বিধান করা হয়েছে, তা একটি উদ্ভট বিধান। পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে এ ধরনের কোনো উদ্ভট ব্যবস্থার বিধান করা হয়নি। নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করার জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে নির্বাচন চলাকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার নানা পদক্ষেপের কথা আমরা জানি। সর্বোপরি, নির্বাচনের আয়োজন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাটি যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়, সে বিষয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সবিশেষ যত্নবান। আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করার দাবী জনসাধারণ দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দল এ বিষয়টি বিবেচনা করতে প্রস্তুত নয়। রাজনীতিকরা পরস্পরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করে যে অনাস্থার পরিবেশ তৈরি করেছেন, তা বিশ্বে নজিরবিহীন। একটি শিশুও একথাটি শুনলে হাসবে যে পাঁচ বছরের জন্য দেশ চালাবার এবং দেশের ভাগ্য নির্ধারণের পূর্ণ কর্তৃত্ব রাজনীতিকদের দেয়া যায় বটে, কিন্তু নির্বাচনের সময়ে রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করা যাবে না এবং আস্থায় নেয়া যাবে না। এই ধারণার জন্ম অবশ্য আমাদের দেশে রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও কৃষ্টির অনুপস্থিতির কারণে।

গণতন্ত্র আমাদের জীবনাচারের সঙ্গে একীভূত হয়ে বিকশিত হয়নি এবং একটি চরম অসহিষ্ণু পরিবেশে যেনতেনভাবে নিজের মত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়াকেই যেখানে গণতন্ত্রের বিজয় বলে মনে করা হয়, সেখানে পরমত সহিষ্ণু ভারসাম্যপূর্ণ একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রত্যাশা করা যায় না। আমাদের রাজনীতিকগণ দেশ ও জনগণের স্বার্থের চাইতে দলীয় ব্যক্তি স্বার্থকে সব সময়ে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন বলেই জাতীয় বিবেচনা এখানে অর্থহীন। ১৯৯৪ থেকে ৯৬ সন পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উদ্ভট ধারণাটি দেশের জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়ার যে সহিংস সন্ত্রাসী আন্দোলন আওয়ামী লীগ এদেশে করেছে, তাকে সামাল দিয়ে জনগণের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সেদিনকার ক্ষমতাসীন দলটি ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে একটি একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশ করিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্ম দেয়া হয়। ধারণাটি যতো উদ্ভটই হোক না কেন, জনগণ কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। শেখ হাসিনা নিদর্লীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে সম্ভবত বুঝিয়ে থাকেন যে ঐসব ব্যক্তিবর্গকে তার পক্ষের লোক হতে হবে। আর সাধারণ মানুষ মনে করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যারা থাকবেন, তারা দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে দলবাজির কারণে দেশে যে বিশৃংখল ও একপেশে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তার অবসান ঘটাবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জনসাধারণ পক্ষপাতমুক্ত পরিবেশে স্বস্তির সঙ্গে চলাফেরা করতে পারবে এবং সুবিচার পাবে।

ইতোমধ্যেই জনসাধারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগমনের ফলে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। দলবাজ সরকারের বাড়াবাড়ির ফলে জনসাধারণকে এও বলতে শুনেছি, এ ধরনের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দিয়ে দেশ চালাতে অসু'বিধা কোথায়? আসলে, রাজনীতিকগণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে শক্তির মহড়া দিয়ে

www.pathagar.com

প্রত্যেকে তক্কে তক্কে আছে, নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ উদ্ধারে। যদি তাই না হবে, ১৯৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ থাকার সময়ে তাঁকে নিয়ে কোনো বিতর্ক দেখা দেয়নি, অথচ এই প্রাজ্ঞ আইনজীবী সম্পর্কে শেখ হাসিনা আপত্তি তুলছেন কোন অজুহাতে? এদেশের সাধারণ নাগরিক দলমত নির্বিশেষে প্রাক্তন মহাহিসাব নিরীক্ষক হাফিজউদ্দীন খানের সততা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন কোনো দিন করেনি। আজ হঠাৎ করে তাকে বিতর্কিত করার উদ্যেগে আওয়ামী লীগ কেন গ্রহণ করেছে? ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকা অবস্থায় আত্মীয়-স্বজন, দলীয় লোকজন বিশেষ করে গোপালগঞ্জের লোকজন, যোগ্যতার বাছবিচার না করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে যেভাবে রাতারাতি পদোন্নতি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়েছে, তার উদ্দেশ্য ছিলো একটাই– সামনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যাতে কোনো কষ্ট না করেই নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারে। আওয়ামী লীগ কোনো অবস্থাতেই চাইবে না, তার এই সাজানো বাগান তছনছ হয়ে যাক। আর তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করার পরপরই ১৩ জন সচিবের যে বদলি করেছেন, তাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ এতো শোরগোল বাঁধিয়েছে। শেখ হাসিনা তার ফুফাকে অন্যায়ভাবে আর্মিরুলস লংঘন করে যখন সেনা প্রধান করেন তখন আওয়ামী লীগের কাছে এ কাজটি ছিলো অত্যন্ত ন্যায্য। ছোট বোনের দেবরকে সিলেকশন বোর্ডকে পাশ কাটিয়ে যখন প্রমোশন দেয়া হয়, তখন আওয়ামী লীগের কাছে তা ন্যায্য। অযোগ্য ভগ্নীপতিকে রাতারাতি টপকিয়ে এনে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব যখন দেয়া হয়, তখন তা ন্যায্য। শেখ হাসিনা নসিহত করেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ একটাই– নির্বাচন করানো। কিন্তু, হাসিনা ভুলে যান যে, ঐ নির্বাচনটিকে হতে হবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু এবং তার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সবই করতে পারে। বিশেষ করে, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের খোলনলচে বদলে ফেলারও ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আছে। এমনকি, প্রয়োজনে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের সুবিধার্থে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আজ যারা বিতর্কিত করতে চায়, তারা একপেশে নির্বাচন চায়।

মাহবুব উল্লাহ :

বিএনপিসহ চারদলীয় জোটকে একটা নিষ্ঠুর সত্য উপলব্ধি করতে হবে। আর তা হল, যে নির্বাচনে শেখ হাসিনা ও তার আওয়ামী লীগ জয়ী হতে পারবে না, সেই নির্বাচন নানা অজুহাত, ওজর-আপত্তি তুলে তারা ভণ্ডুল করে দেবে। আর সে কারণেই উপদেষ্টা ও প্রবীণ আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার ইশতিয়াক, উপদেষ্টা হাফিজ উদ্দীন খান এবং উপদেষ্টা আমানূল ইসলাম চৌধুরী 'বিতর্কিত'। চট্টগ্রামে গিয়ে শুনিছি, আওয়ামী সংস্কৃতির মহা মোঘল সৈয়দ হাসান ইমাম চট্টগ্রামের এক সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা রোকিয়া আফজাল রহমানকে নিয়েও তাদের আপত্তির কথা প্রকাশ করেছেন। বেচারা শাহ মোহাম্মদ ফরিদ ইতোমধ্যেই 'বিতর্কিত' হয়ে পড়েছেন। এখন শাহ মোহাম্মদ ফরিদ সম্পর্কে বিএনপি ও চারদলীয় জোট যদি বলে বসে, শাহ মোহাম্মদ ফরিদ হলেন ইহজাগতিকতাবাদী ও আওয়ামী ঘরানার মহা ধীমান বুদ্ধিজীবী জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ভগ্নীপতি এবং ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট– তাহলে সবকিছু ষোলকলায় পূর্ণ হয়।

ব্যারিস্টার ইশতিয়াকও শেখ মুজিবের শাসনামলে এটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শেখ মুজিবের পরম আস্থাভাজন না হলে, সেই আমলে তিনি যত বড় আইনজীবীই হোন না কেন, তার এটর্নি জেনারেলের পদে নিয়োগ লাভ কি সম্ভব হত? রোকিয়া আফজাল রহমান বাঙালী মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুর্শিদাবাদ নিবাসী মরহুম খন্দকার

www.pathagar.com

ফজলে রাব্বীর দৌহিত্রী। ওদিকে আওয়ামী থিংক ট্যাংকের প্রধান পুরুষ ও আমাদের অনেকের শিক্ষক প্রফেসর রেহমান সোবহানও মরহুম খন্দকার ফজলে রাব্বীর দৌহিত্র। একারণে রোকেয়া আফজাল রহমান রেহমান সোবহানের ফুফাতো বোন। এতদসত্ত্বেও রোকিয়া আফজাল রহমানের মতো একজন মহিলা উদ্যোক্তানেত্রী সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। জনাব হাফিজউদ্দীন খান কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল হিসেবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিএনপি সরকারের আমলে বহু অর্থনৈতিক অনিয়ম সংক্রান্ত প্রতিবেদন তাঁর দায়িত্ব হিসেবে প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করেছিলেন। তাঁর অতীত ও বর্তমান জীবনে কোনো প্রকার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কথা এদেশবাসী শোনেওনি, দেখেওনি। কিন্তু তাঁকেও বিতর্কিত করে ফেলা হয়েছে একেবারে শুরু থেকে। আগামী ক'দিনের মধ্যে আরো ক'জন উপদেষ্টার কপালে পক্ষপাতিত্বের চিহ্ন এঁকে দেয়া হবে, তা ভেবে চিন্তিত হই। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, গোটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিতর্কিত করে ফেলার মিশন নিয়ে আওয়ামী লীগ মাঠে নেমেছে। খোদ বিচারপতি লতিফুর রহমানকেও স্বজনপ্রীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর অপরাধ, অন্যতম উপদেষ্টা জনাব আমানুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয়। বিচারপতি লতিফুর রহমান অবসর গ্রহণ করার পর যখন প্রধান-উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মনস্থির করে ফেলেছিলেন, তখন কিন্তু আওয়ামী লীগ অথবা বিরোধীদলের পক্ষ থেকে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। তাহলে আজ প্রশ্ন উঠছে কেন?

লক্ষ্য করার মতো বিষয়, পুলিশ প্রশাসন এবং বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন প্রশাসনে এখনও কোনো আঁচড় দেয়া হয়নি। অথচ আওয়ামী লীগের সাজানো পুলিশ প্রশাসন বিরোধীদলকে নাস্তানাবুদ করা এবং বিরোধীদলের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত মামলা আমলে না নেয়ার অভিযোগও আওয়ামী পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে রয়েছে। আওয়ামী প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার পুত্র দীপু চৌধুরীকে তারাজউদ্দীন হত্যা মামলার চার্জশীট থেকে রেহাই দেয়া হয়েছিল। পুলিশ প্রশাসন যে কী নাজুক অবস্থায় পড়েছিল তা তো আমরা এ ধরনের ঘটনা থেকেই বুঝতে পারি। আনসার ভিডিপির উপপরিচালক জনৈক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেনীতে আনসারদের সমাবেশে বলেছেন, আগামীতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে। সুতরাং আনসারদেরকে বুঝে-শুনে কাজ করতে হবে। এখন, এই লোকটিকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে গেলে আওয়ামী বিচারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়ে যাবেন 'বিতর্কিত'। পুলিশের জনৈক ডিআইজি নিজেকে 'বঙ্গবন্ধুর সৈনিক' বলে ঘোষণা দিয়ে বহাল তবিয়তে আছেন। এক্ষেত্রেও এখনও কিছু করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। সৈয়দ সালাহউদ্দীন জাকী পর পর কয়েকবার বিটিভির মহাপরিচালক হিসেবে নিযুক্তি পেয়ে এখনও বিটিভির কাণ্ডারী হিসেবে বহাল আছেন। তার নেতৃত্বে বিটিভি যেভাবে সরকার হিসেবে আওয়ামী লীগ নয়, দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ডঙ্কানিনাদ বাজাতো দিনের পর দিন, তার সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেই পদক্ষেপকেও শেখ হাসিনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও আওতাবহির্ভূত বলে শোরগোল তুললে অবাক হব না। তাদের তো এক কথা, নির্বাচিত সরকার যা করে গেছে, তা পরিবর্তনের অধিকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেই। সংবিধানের এ রকম অপব্যাখ্যা আওয়ামী গলাবাজদের পক্ষেই কেবলমাত্র সম্ভব। বিএনপি কিংবা চারদলীয় জোট গলাবাজির এই প্রতিযোগিতায় অসহায় শিশুর মতো শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে। অন্যদিকে, হতাশা বাড়ছে দেশবাসীর, যারা আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভরাডুবির মাধ্যমে নাজাত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। বিএনপি ইতোপূর্বে শেখ হাসিনা সরকারের মেয়াদ শেষে যে নাজাতের ঘোষণা দিয়েছিল সেই ঘোষণা ছিল অলীক কল্পনা মাত্র। সত্যিকার নাজাত এদেশবাসী তখনই পাবে, যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সম্প্রসারণবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের হস্তক্ষেপে বিপদাপন্ন হবে না। যেদিন সকল প্রকার অত্যাচার ও

www.pathagar.com

অবিচারের অবসান হবে। যেদিন এদেশের গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ সকল প্রকার মূল্যবান সম্পদ ভারতসহ বিদেশী লুটেরারা লুণ্ঠন করে নিতে পারবে না। যেদিন এদেশকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ভারত করিডরের সুবিধা নেয়ার কল্পনাও করতে পারবে না। যেদিন এদেশে সত্যিকার একটি দেশপ্রেমিক, জনদরদী সরকার গঠিত হবে।

আফতাব আহমাদ :

আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-এ ক্ষমতা লাভ করার পর থেকে এদেশে ব্যক্তিপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রবর্তন করে। শেখ হাসিনা তাঁর পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে এদেশের জনসাধারণের 'পিতা' বানাবার জন্য গায়ের জোরে অনেক কিছুই করে গেছেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের রয়েছে বিরাট অবদান। কিন্তু একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই, এদেশের জনগণ সুদীর্ঘকাল গণতন্ত্রের জন্য যে সংগ্রাম করে এসেছে এবং বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করার জন্য যে সুমহান ত্যাগ স্বীকার করে এসেছে, তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে শেখ মুজিবুর রহমান নিষ্ঠুরভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করে এদেশে তার নিজের নেতৃত্বে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক একদলীয় ফ্যাসিস্ট শাসনও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ইতিহাস শেখ মুজিবের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের মূল্যায়ন যথাযথভাবেই করবে। কিন্তু আইন জারি করে, তাও আবার বিরোধীদলের অনুপস্থিতিতে সংসদে একতরফাভাবে যে আইন রচিত হয়েছে সে আইনের জোরে দেশবাসীকে 'মুজিবকে সিজদা' করার জন্য বাধ্য করা যে সম্ভব নয়, তা বোধহয় শেখ হাসিনারা বুঝে উঠতে পারেননি। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় প্রেসিডেন্টসহ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ, বিদেশী অতিথিবৃন্দ, কূটনীতিকদের মুজিবের ধানমণ্ডির বাসভবনের মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত মুজিবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও গার্ড অব অনার প্রদানে বাধ্য করা হয়েছিল। কোনো মুসলমানকে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে কিংবা পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে কোনো পরলোকগত ব্যক্তিকে এ ধরনের পৌত্তলিক কায়দায় শ্রদ্ধা জানাতে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই দেখা গেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে কব্জা করে এদেশের মানুষের ঈমান-আকীদাকে বিদ্রূপ করে মানুষকে যেভাবে তাঁর পিতাকে পূজা করতে বাধ্য করেছেন শেখ হাসিনা, তা ধর্মদ্রোহিতার সমতুল্য। এদেশের ভুখানাঙা, দরিদ্র ও নির্যাতিত মানুষের কাছে শেরে বাংলা ফজলুল হক, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী কিংবা গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে আজও মানুষ পরম মমতায় গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। এর জন্য কোনো আইন জারি করার প্রয়োজন হয়নি।

ভারতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন বা জন কেনেডীকে শ্রদ্ধা করার জন্য কোনো আইন জারি করা হয়নি। কিন্তু ঐসব দেশের মানুষ তাঁদের জাতীয় বীর ও নেতাগণকে স্বতোৎসারিত হয়ে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে। বাংলাদেশে আইন জারি করে শেখ মুজিবের ছবি সর্বত্র স্থাপন করে তাকে শেখ হাসিনারা অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছেন। আওয়ামী দুঃশাসনের ফলে এবং পৌত্তলিকতার ধারাবাহিকতায় মুজিবের জাতীয় মর্যাদা দলীয় মর্যাদায় পর্যবসিত হয়েছে। দলের অপশাসন ও রাষ্ট্রঘাতী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এতদিনের পুঞ্জীভূত জনরোষ মুজিবের ছবি ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। দলবাজির বিরুদ্ধে জনগণের এ হচ্ছে সোজাসাপটা জবাব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্ষুব্ধ জনগণকে তাদের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য সে দেশের জাতীয় পতাকাকে পোড়াতেও দেখা গেছে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকার জনগণের বিরুদ্ধে পতাকা অবমাননার দায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে ফেডারেল সুপ্রীম কোর্ট এই মর্মে রায় প্রদান করে যে, বিক্ষোভ প্রদর্শন করা জনগণের মৌলিক অধিকার। জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে জাতীয় পতাকা যদি পোড়ায়, তাতে জাতীয় পতাকা অবমাননা করা হয়েছে, ভাববার কোন কারণ

www.pathagar.com

নেই। কারণ এক্ষেত্রে জাতীয় পতাকা ক্ষমতাসীনদের বাড়াবাড়ির প্রতীকে পর্যবসিত হয়। মার্কিন সিনেট ফেডারেল সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে পাল্টা আইন রচনা করতে গেলে ফেডারেল সুপ্রীম কোর্ট তাও বাতিল করে দেয়।

কয়েকটি বিদেশী ডিগ্রী খয়রাত করে এনে শেখ হাসিনার ধারণা হয়েছে যে, সংবিধানে গণতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিকতা ইত্যাদি সব বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। আসলে ক্ষমতায় যাওয়ার আগে তাঁর জ্ঞানের সীমা যতটুকু ছিল, এখনও ততটুকুই আছে। অবশ্য তিনি বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা ইতোমধ্যে সঞ্চয় করেছেন। রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতাকে কব্জা করে বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গে ন্যক্কারজনকভাবে দলীয়করণের যে ব্যবস্থা তিনি করেছেন, তা আর যাই হোক– গণতন্ত্রের পক্ষে যায় না। আইনসভাকে অকার্যকর করে বিভিন্ন সরকারী সংস্থায় দলীয় এবং তার নিজ এলাকা গোপালগঞ্জের লোকজনকে নিয়োগ দিয়ে এবং এ ব্যাপারে কোন বিরোধিতার সম্মুখীন না হয়ে তিনি ভেবেছেন, এ দেশটি তাঁর পৈতৃক তালুক। এক মোসাহেব সাংবাদিক ১৯৯৬ সালেই বাংলাদেশকে 'মুজিব দেশ' নামে অভিহিত করেছিলেন। হাসিনা তার আমলে অনেক প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নামকরণ তার পিতার নামে করেছেন। বাকি আছে বাংলাদেশকে 'মুজিব দেশ' ঘোষণা করা। এদেশের মানুষ যথেষ্ট সহ্য করেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা লাভের পরপর মানুষ প্রত্যাশা করছে আওয়ামী শাসনামলকৃত দুর্নীতি ও অপশাসনের সুবিচার হবে এবং চাপিয়ে দেয়া ব্যক্তিপূজা ও পৌত্তলিকতার অবসান ঘটবে। তাই আজ সকলের উচিত হবে, স্বার্থান্ধ রাজনীতিকদের মুখের দিকে তাকিয়ে না থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা, যাতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। একপেশে ভারসাম্যহীন প্রশাসন ঢেলে সাজানো যায়।

মাহবুব উল্লাহ :

চাবুকের ভয় দেখিয়ে কিংবা রক্তচক্ষু দেখিয়ে মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় না। এমনকি, যাকে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য করা হয়, তার শত সহস্র ছবি কিংবা মূর্তি স্থাপন করেও তা নিশ্চিত করা যায় না। জাগতিক কোন মানুষের সাথে যার কোন তুলনা হয় না, সেই মহামানব আমাদের প্রিয় নবী খাতামুন নবীঈন, শাফীয়ে মুজনিবীন, রাহমাতাল্লিল আলামীন আহমদ মুজতবা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর কোন প্রতিকৃতি নেই এবং তার কোনরূপ প্রতিকৃতি অংকন ও ধারণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার সময়ে তার জন্য দুরূদ পাঠ করেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানুষ তিনি। তিনি শুধু একজন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল নন, তিনি রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, জেহাদী যুদ্ধের সেনাপতি এবং ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রের স্থপতিও তিনি। এসব দেখে আমরা কেমন মুসলমান– আমরা মনে করি আমাদের মধ্যকার কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বের ছবি বা মূর্তি স্থাপন করা হলেই তাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়? মুজিব এদেশের মানুষের কতটুকু শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন, সেটা তো বোঝা যাবে এদেশের মানুষ নামাজ আদায় করতে গিয়ে তার রূহের মাগফেরাতের জন্য কী দোয়া করেন, ক'বার দোয়া করেন– তা থেকে। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের অবসানে লেনিনের মতো নেতার মূর্তিকেও ক্রেন দিয়ে টেনে নামানো হয়েছে এবং ঘটনাবিশেষে তা জাদুঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। লেনিন তার জীবদ্দশায়, এমনকি তাঁর মৃত্যুর সত্তর বছর পরেও তাঁর নিজ দেশে প্রকাশ্য বিতর্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত হননি। এটা সম্ভবত এই কারণে যে, সোভিয়েত সমাজ একটি টোটালিটেরিয়ান সমাজ ব্যবস্থা ছিল। লক্ষ্য করা যায়, সকল টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রে নেতার ছবি বা মূর্তিকে পূজার বস্তুতে পরিণত করা হয়। উত্তর কোরিয়ায় কিম ইল সুং, চীনের মাও জে ডং, বুলগেরিয়ায় দ্রিমিত্রবকে এ ধরনের পূজার বস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের তোড়ে তা টিকে থাকেনি। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের কথা বললেও অন্তরে অন্তরে

www.pathagar.com

টোটালিটেরিয়ানিজমেই বিশ্বাস করে। আর সে কারণেই মুজিবের ছবিকে পূজা অর্চনার মণ্ডপে বসিয়ে মানুষকে তার প্রতি মস্তক অবনত করতে বাধ্য করাতেই বিশ্বাস করে। আমাদের দেশে যেসব বিশাল রাজনৈতিক বিভাজন রয়েছে, তার মধ্যে একটি অন্যতম বিভাজনের বিষয় হলো, জাতির পিতার প্রশ্নটি। আওয়ামী লীগের বাঙালী জাতীয়তাবাদের দর্শনে বাঙালী জাতির ইতিহাস হাজার বছরের। এরকম একটি জাতি হাজার বছর পরে হঠাৎ পিতার সন্ধান কিভাবে পেল, তা যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বোঝা দুষ্কর। তবু বলবো, জাতির মধ্যে বিভেদ ও ফাটল সৃষ্টিকারী এ ধরনের অর্থহীন বিতর্কের যতই দ্রুত অবসান হয়, জাতির জন্য ততই মঙ্গল। আমেরিকার ঐতিহাসিক নজিরকে সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ফাউন্ডিং ফাদার্সের কনসেপ্ট গ্রহণ করতে পারি। এক্ষেত্রে যুগপৎভাবে শেরেবাংলা ফজলুল হক, গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ফাউন্ডিং ফাদার্স ঘোষণা করে সাংবিধানিকভাবে বিধান চালু করা হলে জাতি অনভিপ্রেত দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে রক্ষা পাবে। এসব ব্যক্তিত্ব কেউই হয় তো বিতর্কের ঊর্ধ্বে নন, কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে ও এর পরিচয় নিরূপণে এঁদের অবদান এঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতির সীমানাকেও অতিক্রম করে যায়। আমাদের রাজনীতিকরা এ ধরনের একটি সহমত প্রতিষ্ঠায় যেদিন রাজি হবেন, সেই দিনটি হবে বাংলাদেশ জাতি-রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে শুভদিন। তার মানে এই নয়, আমরা এঁদের কারও সীমাবদ্ধতা ও ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করতে পারবো না। আজ আমরা এই মুহূর্তে বিদ্যমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উপরে আলোচনা করেছি বটে, কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে মনে রাখতে হবে দেশে আইন-শৃংখলার উন্নয়ন না ঘটিয়ে, বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার না করে ও অবাঞ্ছিত আইনী অস্ত্রকে নিষ্ক্রিয় না করে যেনতেন প্রকারে নির্বাচনের জন্য নির্বাচন করাটা জাতিকে আরও মারাত্মক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিকে ঠেলে দেবে। কারও চাপের মুখে নতিস্বীকার না করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বিচারপতি লতিফুর রহমান গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মানুষ দেখছে, বিচারপতির বিচারের দাঁড়িপাল্লা কোন একদিকে হেলে পড়ছে কি-না। দাঁড়িপাল্লায় ভারসাম্য যতক্ষণ রক্ষিত হবে, ততক্ষণ দেশবাসী তার পক্ষেই থাকবে।

আফতাব আহ্মাদ :

যে কোন সরকারের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে, নাগরিকদের জানমালের হেফাজত করা, নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা এবং সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা সুনিশ্চিত করা। রাষ্ট্রের কোন অঙ্গ দ্বারা বা নিয়ন্ত্রণহীন কোন উচ্ছৃংখল সামাজিক শক্তি দ্বারা যদি সামাজিক স্থিতিশীলতা, শান্তি ও শৃংখলা বিপন্ন হয়ে পড়ে, তা হলে সরকারকে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়। যে সরকার এ ধরনের পরিস্থিতিকে সামাল দিতে চায় না বা পারে না, সেই সরকার শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বেও থাকতে পারে না। আজ তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে যে, সংবিধানের অধীনে এই সরকার শুধু পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারীই নয়, পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্নও বটে। মানুষের অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করে তাদের জন্য একটি ন্যায়ানুগ সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে অর্থবহ নির্বাচন করার পূর্বশর্ত হচ্ছে সন্ত্রাস দমন, সন্ত্রাসী গডফাদারদের গ্রেফতার এবং প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেখানেই সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক এবং দলীয় দোষে দুষ্ট লোকজন অবস্থান করছে, তাদের চিহ্নিত করে রাষ্ট্র ও সমাজদেহ থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। এ প্রশ্নে কারও চাপের কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতিস্বীকার করলে সমাজবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে কোন সামাজিক শক্তি তা বরদাশত করবে না।

www.pathagar.com

২ আগস্ট ২০০১

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সেনাবাহিনীর উপস্থিতি চাই

মাহবুব উল্লাহ :

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম ১৫ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এই ১৫ দিনের মধ্যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র ও সরকার এবং জনগণকে কি অবস্থার মুখে বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকার রেখে গেছে তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন নিশ্চয়ই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এই মুহূর্তে জঞ্জাল সাফ করার কাজ করতে হচ্ছে। এই জঞ্জাল ষোলআনা সাফ করা এই সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। শুধুমাত্র একটি সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যতটুকু না করলে নয় সেটুকু করতে গিয়েই এই সরকারকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। কাজটা যতই কঠিন হোক না কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্ব সুসম্পন্ন করতে এতটুকু অন্তত করবেন– এটাই দেশবাসীর কামনা। দেশবাসীও এই সরকারকে তার এই ন্যায্য কর্তব্য পালনে যথাযথ সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতা দিতে কার্পণ্য করবে না বলেই আমার ধারণা। ইতোমধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে বিশাল রাজনৈতিক বিভাজন ও মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত পাঁচ বছরের শাসনামলে আওয়ামী লীগ সরকার পুলিশ বাহিনীকে যেভাবে দলমনা করে তুলেছে এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী এই বাহিনীকে যে পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ও চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ার পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করেছে তার ফলে এই বাহিনীর সহায়তায় দেশে আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের যে কর্মসূচী তত্ত্বাবধায়ক সরকার হাতে নিয়েছে তা কেবল পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় যে সম্ভব নয় তা আজ বিভিন্ন মহল উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। এ কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব থেকেই দাবী উঠেছে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করে নির্বাচনের সময় বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় তলব করার। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থক কতিপয় বুদ্ধিজীবী এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করছে। তাদের মতে, সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেয়া হলে এবং সেই ক্ষমতার বলে বলীয়ান করে তাদের তলব করা হলে মহা অন্যায় হয়ে যাবে। বাংলাদেশে আজ যে সেনাবাহিনী বিদ্যমান তা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনেরই ধারাবাহিকতা বহন করছে। ব্রিটিশ আমলে হিজ ম্যাজেস্টি অথবা হার ম্যাজেস্টি সরকারের জন্য বহিরাক্রমণের তেমন কোন হুমকি ছিল না। সে সময় যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি ছিল সেই আর্মি অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা দমনে সদাপ্রস্তুত থাকত। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর এদেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আরো একটি অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত হয়েছে। সেটা হল বহিরাক্রমণের হুমকি। পাকিস্তান আমলে এটি যেমন একটি বাস্তবতা ছিল, বাংলাদেশ আমলেও সেই বাস্তবতার কোন হেরফের হয়নি। ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এই উভয়বিধ হুমকি মোকাবিলার জন্য সেনাবাহিনীকে কলেবরে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সমরাস্ত্রের দিক থেকেও সুসজ্জিত করা হয়েছে। হয়তো প্রয়োজনের তুলনায় এটা যথেষ্ট নয়, তবুও যখন যে ধরনের হুমকি প্রধান হয়ে দাঁড়ায় তার আলোকেই সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখতে হয়। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করার জন্য সেনাবাহিনী তলব একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমরা এও লক্ষ্য করেছি, ভারতীয় পুলিশ বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্লজ্জভাবে দাঙ্গাকারীদের পক্ষাবলম্বন করেছে। এ কারণে সেনাবাহিনীকে বারবার তলব করতে হয়েছে। ১৯৪৬ সালে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ঘটনায়

www.pathagar.com

কলিকাতা পুলিশের উর্ধ্বতন মহল হিন্দু সম্প্রদায় মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঙ্গার জন্য যেসব প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে বিষয়ে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ও তার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছিল। ফলে দাঙ্গা যখন প্রবল আকার ধারণ করে তখন বেঙ্গল গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দাঙ্গা দমনে হিমশিম খান। ১৯৪৬-এর যে প্রজন্ম আজো এদেশে বেঁচে আছেন তারা জানেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোলরুমের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিতে হয়েছিল। পুলিশ কন্ট্রোল রুমে অবস্থান করে তৎকালীন কলকাতা পুলিশের বড় কর্মকর্তাদের ওপর অনাস্থা প্রদর্শন করে সোহরাওয়ার্দীকে এই কঠিন দায়িত্বটি পালন করতে হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির কাছ থেকে ত্বরিত কোন সাহায্যও পায়নি। এই একটি ঘটনা প্রমাণ করে পুলিশের অসহযোগিতা নাজুক মুহূর্তে কিভাবে শত শত লোকের জীবন বিপন্ন করে ফেলতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তার দায়িত্ব পালনকল্পে ইতিহাসের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে প্রতীয়মান হয়। আজ দেশে এরকম কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না বা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে যে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল তাও করতে হবে না– এটাই আমরা ভাবতে ও বিশ্বাস করতে চাই।

সেনাবাহিনীকে সিভিল প্রশাসনের সহায়তায় সক্রিয়ভাবে ব্যবহারের নজির খোদ আওয়ামী লীগই একাধিকবার স্থাপন করেছে। ১৯৫৭ সালে মরহুম আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার চোরাচালান দমনের জন্য 'অপারেশন ক্লোজডোর' নামে একটি অভিযান চালিয়েছিল। সেই অভিযানের সময় সেনাবাহিনীর সহায়তায় সীমান্ত সীল করে দেয়া হয়েছিল। দেশের ভেতরে চোরাচালানি ও চোরাচালানি পণ্য জব্দ করার কাজে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছিল। অপারেশন ক্লোজডোর-এর ফলে তৎকালে এদেশে ভারতীয় স্বার্থের প্রতিভূরা গোস্বা করেছিলেন এবং আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে যোগদান করে স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন) এবং তফসিলী ফেডারেশনের চিত্তরঞ্জন সুতার (যিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করে ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বর্তমানে ভারতে অবস্থান করে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। যার ফলে প্রথম আতাউর রহমান খান সরকারের পতন ঘটে। খোদ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার ১৯৭৪ সালে চোরাচালান, কালোবাজারি, মুজদদারি দমন ও বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীকে ডিপ্লয় করেছিলেন। সেনাবাহিনীর অপারেশনের ফলে যখন দেখা গেল আওয়ামী লীগের চেলাচামুণ্ডারা এসব জঘন্য অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তখন দলীয় চাপের মুখে শেখ মুজিবুর রহমান সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন।

শেখ হাসিনার সরকারও ঢাকার যানজট নিরসনের জন্য বহুবার সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করেছিল। এছাড়া ওয়াসার পানির পাম্প পাহারা দেয়া, পাম্প পরিচালনায় ওয়াসার কর্মচারীদের অবহেলার ওপর নজরদারি করতেও সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীকে যখনই এ ধরনের কাজে নিয়োগ করা হয় তখনই তারা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করতে সমর্থ হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সেনাবাহিনী বারবার জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং উদ্ধার ও ত্রাণকর্মে সহায়তা করেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের জট নিরসনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। এতসব মামুলি কাজে সেনাবাহিনীকে যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে জাতীয় নির্বাচনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার উপর নির্ভর করছে গণতন্ত্র, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ তাতে কেন আওয়ামী লীগের ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট মন্ত্রী কিবরিয়া সাহেবরা অসুবিধা মনে করেন তা দেশবাসী বুঝে উঠতে অপারগ। দেশবাসী এটাও

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ করেছে, এসএসএফ তথা সেনাবাহিনী ছাড়া আর কোন বাহিনীর নিরাপত্তা আচ্ছাদনে শেখ হাসিনা নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারেন না। তাহলে নির্বাচনে সেনাবাহিনীর সক্রিয় অবস্থানকে কাম্য নয় মনে করার কী হেতু। নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনী শুধু পুতুলের মত দূরে অবস্থান করবে আর ভূয়া ভোটে ভোটের বাক্স বোঝাই করার মহড়া চলবে, নিরীহ শান্তিপ্রিয় ভোটাররা দলীয় মস্তানদের হামলা ও হুমকির মুখে ভোট কেন্দ্রে আসতে পারবেনা তা কেমন করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

আফতাব আহমাদ :

ঔচিত্যের কথা ন্যায়শাস্ত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবতা অত্যন্ত রূঢ় ও কঠিন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তা নিশ্চয়ই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন। রাজনৈতিক দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করবে, এই মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা সত্ত্বেও বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিতর্কিত করে তোলার একটি ষড়যন্ত্র সুস্পষ্টভাবে সকলের নজরে আসছে। মহল বিশেষের প্ররোচণায় পত্রিকায় একপেশে কলামগুলো পাঠ করলে যে প্রচারণা লক্ষ্য করা যায় তা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার সাংবিধানিক গণ্ডি পেরিয়ে অপ্রয়োজনীয় ও বিতর্কিত বিষয়ে মনোনিবেশ করছে। একই সঙ্গে এসব কলাম লিখিয়েরা দাবী করছেন যে, বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন ধরনের বিতর্কমূলক ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল না ও বিতর্কিত ভূমিকা পালন করেনি। বলাই বাহুল্য এসব বক্তব্য একতরফাভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থকগোষ্ঠীর মধ্য থেকে উচ্চারিত হচ্ছে এবং গত পাঁচ বছর আওয়ামী লীগ সরকারের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও খুদ-কুঁড়ো খেয়ে যারা উদরপূর্তি করেছে সেসব চিংড়ি চাষী থেকে শুরু করে রং-বেরংয়ের কলমবাজরা বুদ্ধির জীব সেজে বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে।

১৯৯৬-এর নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ প্রথম দিন থেকেই ক্ষমতাভোগের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গে ও প্রতিষ্ঠানে যেভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছে তা কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কল্পনা করা যায় না। সাংবিধানিক বিধি-বিধান লংঘন করে, সরকারের রুলস অফ বিজনেসকে তোয়াক্কা না করে সিভিল প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সকল নিয়মনীতিকে পদদলিত করে যেভাবে খোল-নলচে পাল্টানো হয়েছে, তাতে সাধারণ নাগরিক সর্বাবস্থায় ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেশে আইনের শাসন বলতে গত পাঁচ বছরে কিছুই ছিল না। দুষ্কৃতকারী, সমাজবিরোধী ও অপরাধ জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের বহু অযোগ্য সন্ত্রাসীকে সিভিল প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগে নিয়োগদান করা হয়েছে। 'হায়ারারকিকাল ডিসিপ্লিন' এবং 'চেইন অফ কমান্ড' ভাঙাকে বিগত সরকার প্রভূত উৎসাহ যুগিয়ে এসেছে। আত্মীয়তা, আঞ্চলিকতা, দলীয় আনুগত্য ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা না করে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, থানা ও মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র সন্ত্রাসী গডফাদারদের সরকারের পক্ষ থেকে ব্লাঙ্ক চেক দিয়ে দেয়া হয়। গডফাদার উপদ্রুত এসব অঞ্চল আতঙ্কপুরী ও মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, খুন ও অন্যান্য জঘন্য ক্রাইমের জন্য থানায় অভিযোগ রয়েছে বা মামলা রুজ্জু করা হয়েছে, সেসব ক্রিমিনালদের নিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একাধিকবার আইন-শৃঙ্খলা কমিটির বৈঠক করতে দেখা গেছে। সন্ত্রাসীদের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে শেখ হাসিনা ফেনীর গডফাদার জয়নাল হাজারীর প্রশংসা করে বলেন, 'হাজারী আছে বলেই ফেনীতে শান্তি আছে'। লক্ষ্মীপুরের গডফাদার তাহেরের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'এক হাতে তালি বাজে না'। শেখ হাসিনা শাসনের পাঁচ বছর ধরেই দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ঢালাওভাবে অস্ত্রসজ্জিত করেছে। বিদায়ের

www.pathagar.com

আগ মুহূর্ত পর্যন্ত দলীয় ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ আওয়ামী লীগের পোষ্যদের লাইসেন্সকৃত অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। এসবই করা হয়েছে নির্বাচনের ফলাফলকে ছিনতাই করে আওয়ামী লীগের ক্ষমতারোহণের পথটিকে সুগম করার জন্য। শেখ হাসিনার প্রতি সহানুভূতিশীল ও তার পিতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন এমনি একজন সাবেক সামরিক কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামসুদ্দীন আহমদও এই মতটি পোষণ করেন। এক কথায় যাদেরই সামান্যতম বিবেক আছে তারা স্বীকার করতে বাধ্য, শেখ হাসিনা পুলিশসহ গোটা প্রশাসনিক কাঠামো যেভাবে সাজিয়ে গেছেন তার আওতায় নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হতে পারে না। প্রশাসনের ক্রিমিনালাইজেশনের ফলে নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকারও প্রশ্ন ওঠে না। এমনি পরিস্থিতিতে দেশের সব মহল থেকে সেনাবাহিনীতে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সার্বিক দায়িত্ব দেয়ার দাবী উত্থাপিত হয়েছে। এ ধরনের দাবী যে উত্থাপিত হতেই পারে, শেখ হাসিনা আগে থেকেই তা অনুমান করেছেন। আর সে কারণেই সেনাবাহিনীর ভেতরে প্রমোশন ও পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা নজিরবিহীন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছেন। বলাই বাহুল্য সেনাবাহিনীর বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ না করারই কথা। তবে একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে রাজনৈতিক সরকারের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নে বাধা দেয়নি। বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ নির্বাচনী পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে সেনাবাহিনী নিয়োগের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এ বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে ঐসব দায়িত্বে নিয়োগের পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যথোচিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রশাসনিক রদবদলের প্রশ্নে শামসুল কিবরিয়ারা যত ওজর আপত্তি তুলুন না কেন, প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান সুনিশ্চিতভাবে জানেন যে, একটি গ্রহণযোগ্য অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এর অন্য কোন বিকল্প নেই। কিবরিয়া সাহেব যতই সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার কথা জোরেশোরে উচ্চারণ করুন না কেন তিনি যে গোয়েবলসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তা বুঝতে কষ্ট হবার কোন কারণ নেই। নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য ও সার্থক করতে হলে আমি মনে করি আর সময় ক্ষেপণ না করে সেনাবাহিনীকে সারাদেশে সত্ত্বর ডিপ্লয় করা উচিত।

লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, ভোলা, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ গোপন দলসমূহের সশস্ত্র ক্যাডার উপদ্রুত এলাকাসমূহকে গোলযোগপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করে সেনাবাহিনীকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে ঐসব এলাকার জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। কোন ধরনের ইন সাব অর্ডিনেশনকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। বস্তুত যারা ১৯৯৬-এ আমলা বিদ্রোহ ও জনতার মঞ্চের আস্ফালন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এখনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারা দেশের বর্তমান বাস্তবতা থেকে বহু যোজনদূরে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইন সাব অর্ডিনেশনের অপরাধে যদি কাউকে বরখাস্ত করে তাহলে জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পাবে। আমরা কোন দলের প্রতি সরকার পক্ষপাতিত্ব দেখাক, তা চাই না। সর্বসাধারণ যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভয়-ভীতিমুক্ত অবস্থায় তাদের নাগরিক ও সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে আমরা তার নিশ্চয়তা চাই শুধু। কিবরিয়া সাহেব দেশী পর্যবেক্ষকদের ভোটকেন্দ্রে নিয়োগ করার সিদ্ধান্তকে প্রতিহত করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী গডফাদারদের পাকড়াও করার সঙ্গে সঙ্গে শামসুল কিবরিয়াদের মত লোকদের এসব অসহিষ্ণু ও অসংযমী আচরণকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজন। নির্বাচনকে অর্থবহ করার জন্য অসাধু উপায়ে যেসব অযোগ্য ও ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজনকে পুলিশ বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে।

www.pathagar.com

মাহবুব উল্লাহ :

ড. আফতাব পুলিশ বাহিনীর অসাধু ও অপরাধী ব্যাকগ্রাউন্ডের সদস্যদের নিষ্ক্রিয় করার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এ কাজটি করা গেলে দেশবাসীর ও পরম মঙ্গল হবে। সংবাদপত্রে আমরা প্রায়ই পাঠ করে থাকি, অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের আগ মুহূর্তেরই অভিযানের খবর অপরাধীরা পেয়ে যায়। সবাই বলছেন, শস্যের মধ্যে ভূত থাকলে ভূত তাড়াবে কে। সুতরাং সমাধান একটিই– ভূতওয়ালা শস্যগুলো হয় ঝেড়ে ফেলুন, না হয় নিদেনপক্ষে একটা খোলতের মধ্যে পুরে ফেলুন। অর্থবহ নির্বাচনের জন্য সঠিক ভোটার তালিকার বিষয়টিও বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। পত্র-পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, এবার-১ কোটি ৮০ লাখের মত ভুয়া ভোটার তালিকাবদ্ধ হয়েছে। এসব প্রাথমিক আচ-অনুমান মাত্র। সমস্যাটি যেহেতু প্রমাণ সাপেক্ষ সেহেতু যাচাই-বাছাইয়ের দাবী রাখে। আমরা জানি, প্রতি ১০ বছর অন্তর আমাদের দেশে আদম শুমারি করা হয়। এই আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যা, জনসংখ্যার মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত, ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুপাত, জনগোষ্ঠীর বয়স বিন্যাসসহ সকল প্রকার তথ্য জানা যায়। আদম শুমারির তথ্য থেকে আমরা জানতে পারব, এ দেশে ১৮ বছর অথবা তদূর্ধ্ব বয়সের লোকসংখ্যা কত। শহরে-গ্রামে, জেলা-উপজেলা, ইউনিয়নএ গ্রামভিত্তিতে জনসংখ্যার বন্টন কী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা গেছে, ২০০১ সালের প্রথম দিকে পরিসংখ্যান ব্যুরো যে আদমশুমারি করেছে তার প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরী হয়ে গেছে। বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীরের ভেটোর কারণেই নাকি এই প্রাথমিক প্রতিবেদন পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিমাগারে পড়ে আছে। এই প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলে আমরা জানতে পারব বাংলাদেশে ১৮ কিংবা তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকসংখ্যা কত। অর্থাৎ ভোট দেবার উপযুক্ত লোকসংখ্যা কত। ভোটার তালিকায় বিপুলসংখ্যক ভুয়া ভোটারের পরিমাণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য আদমশুমারির প্রাথমিক প্রতিবেদনটি কালবিলম্ব না করে প্রকাশ করা উচিত, যাতে জনমনে সকল সন্দেহের অবসান হয়। আর যদি কোন প্রকার তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একটি সুষ্ঠু ও অর্থপূর্ণ নির্বাচনের জন্য এর কোন বিকল্প নেই। ভারতের মত একটি বিশাল দেশের জন জরিপের প্রতিবেদন যদি কয়েক মাস আগেই প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে জনসংখ্যার দিক থেকে বহুগুণ ছোট বাংলাদেশের আদম শুমারির প্রতিবেদন প্রকাশে যে অবাঞ্ছিত বিলম্ব ঘটছে তার বিহিত বিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আশু ব্যবস্তা গ্রহণ করবে– এটাই দেশবাসীর কামনা। ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই– এ ধরনের মনোভাব জনগণের ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনকে ব্যাহত করবে মাত্র।

আফতাব আহমাদ :

শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনকে সত্ত্বর নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করার জন্য প্রবল চাপ দিয়ে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি করে যেনতেন নির্বাচন অনুষ্ঠান করানোই যে আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য তা সবার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার বহু আগে শেখ হাসিনা সরকারী বার্তা সংস্থাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমার একটিই দাবী, সময় মত যেন নির্বাচন হয়'। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে 'এই দেশ এই সময়' কলামে লিখতে গিয়ে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবার আগেভাগেই এ ধরনের দাবী দূরভিসন্ধিপরায়ণ। বস্তুত প্রশাসনের ক্রিমিনালাইজেশন সম্পন্ন করে যেমন শেখ হাসিনা তার দলের নির্বাচনী বিজয়ের লক্ষ্যে যে ব্যবস্থাটি করে রেখে গেছেন– তিনি তার কোন পরিবর্তন দেখতে চান না। সেজন্যই এমন খোড়া যুক্তি হাজির করা হচ্ছে যে, নির্বাচিত সরকারের কোন

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত পাল্টাবার এখতিয়ার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেই। এই দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সংবিধানের ৫৮(খ)(১) অনুচ্ছেদের সযত্ন পাঠে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তও নিতে পারে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। সাধারণ নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা করার পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রাখে। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ এখন অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছে নির্বাচনকে ভন্ডুল করার জন্য। তাই বারংবার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর অহেতুক চাপ সৃষ্টি করে তাকে প্রশাসনিক রদবদলসহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত করতে চাইছে। নির্বাচনের উপযোগী ও অনুকূল পরিবেশ তৈরীর আগে জনসাধারণ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণাকে কোন অবস্থাতেই মেনে নেবে না বলে আমাদের বিশ্বাস। বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারসহ লাইসেন্সকৃত অস্ত্র জমা নেয়ার ব্যবস্থা করে সন্ত্রাসী গডফাদারদের গ্রেফতার করে গোটা প্রশাসনযন্ত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা না করে যেনতেন প্রকারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলেই গণ্য হবে। ৯০ দিনের মধ্যে যদি শান্তিপূর্ণভাবে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব না হয় তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছুই নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদিচ্ছার ওপর জনগণের এখনও পূর্ণ আস্থা রয়েছে। জনগণ ভয়-ভীতি মুক্ত পরিবেশে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করতে যদি ৯০ দিনে না কুলোয় তাহলে বিষয়টি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রীম কোর্টে রেফার করা যেতে পারে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস সুপ্রীম কোর্ট জনগণের স্বার্থের প্রতি সজাগ থেকে এ বিষয়ে যথোচিত সাংবিধানিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ নেই। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শপথগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর কোন নির্বাচিত ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর পদের শপথগ্রহণ না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিকভাবে বহাল থাকতে পারবে। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান করা হয়েছে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য। এই ম্যান্ডেট যথাযথভাবে পালন করা যদি ৯০ দিনের মধ্যে সম্ভব হয় তাহলে তো কথাই নেই, সেটিই হবে সর্বোত্তম।

www.pathagar.com

৯ আগস্ট ২০০১

কার্টারের নিকট দুই নেত্রীর অঙ্গীকার

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের আসন্ন সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে এবং তারচেয়ে বড় কথা, বিশ্ব পরিসরে যে কোন কারণেই হোক না কেন বাংলাদেশ যে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছে, তা বোঝা গেল সম্প্রতি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বাংলাদেশ সফর থেকে। বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করে সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত কর্মব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন। পশ্চিম গোলার্ধ থেকে পূর্ব গোলার্ধে পৌঁছতে গিয়ে জেট ল্যাগের যে ক্লান্তি হয়, সেই ক্লান্তিও আটাত্তর বছর বয়স্ক প্রাক্তন এই রাষ্ট্রনায়ককে একের পর এক বৈঠক ও আলাপ-আলোচনা চালাতে কষ্টদায়ক ও ক্লান্তিকর অবস্থায় ফেলেছে– তা মনে হয়নি। সত্যিই অবাক হতে হয়, তাঁর কর্মস্পৃহা ও উদ্যম লক্ষ্য করে।

জিমি কার্টার খালি হাতে ফিরে যাননি। পৃথিবীর অনেক সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রাক্তন এই প্রেসিডেন্টকে আমরা অত্যন্ত কর্মতৎপর হতে লক্ষ করেছি। জিমি কার্টারের বাংলাদেশ সফর যে অত্যন্ত সফল হয়েছে, সে কথা বোঝা যায় তিনি বাংলাদেশের দুই প্রধান নেত্রীর কাছ থেকে যেসব প্রতিশ্রুতি আদায়ে সমর্থ হয়েছেন তার তালিকা লক্ষ্য করে। এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে– আগামী নির্বাচনের ফলাফল উভয় পক্ষ মেনে নেবে, সন্ত্রাস ও ভীতি প্রদর্শনের নীতি পরিহার করা হবে। তাঁরা নির্বাচন কমিশনের কোড অফ কন্ডাক্ট মেনে চলবেন। প্রতিটি পোলিং বুথে একজন দেশী পর্যবেক্ষক থাকতে পারবেন; সংসদে স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি দলের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করবেন; সংসদে ডেপুটি স্পীকার নেয়া হবে বিরোধী দল থেকে; সরকারী হিসাব কমিটির চেয়ারম্যানকে বিরোধী দল মনোনয়ন দেবে। দুই নেত্রী কোন কোন বিষয়ে জিমি কার্টারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে বিষয়ে দেশের দৈনিকগুলো ভিন্ন ভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেছে। তবে বিভিন্ন পত্রিকা পাঠ করে একথা বোঝা যায়, ৫টি বিষয়ে দুই নেত্রী কার্টারের কাছে ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন পৃথক পৃথক ভাবে। এক্ষেত্রে ঐকমত্যের ৫টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অপর দিকে, কার্টার সেন্টার ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট অতিরিক্ত ৯ দফা সুপারিশও পেশ করেছে। বিস্ময়ের বিষয় হলো, গত ৫ বছর ধরে বাকবিতণ্ডা, অশ্লীল উক্তি, হরতাল-ধর্মঘট এবং এ দেশের পত্রপত্রিকা সংঘাতের রাজনীতি সম্পর্কে বারবার নেতিবাচক বিশ্লেষণ প্রকাশ করার পরও যা অর্জন করা সম্ভব হয়নি, কার্টার মাত্র তিনদিনে তা অর্জন করলেন। নির্বাচন নিয়ে এই সেদিনও যারা সন্দেহ পোষণ করছিলেন, কার্টারের এই সফরের পর তাদের এই সন্দেহ অনেকাংশে কেটে যাবে বলে মনে হয়। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী তৎপরতায় অচিরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে, এটাও আশা করা যায়। একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ছাড়া বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের বিকল্প কিছু নেই– এই ধারণাটি আরও দৃঢ়মূল হবে। এসব ভাল কথা, কিন্তু যে বোধটি প্রতিটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিককে মর্মাহত করবে, তা হলো আমাদের নেতা নেত্রীরা বিদেশী মুরব্বীদের কথায় যত দ্রুত সায় দেন, দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঠিক তত দ্রুতই সুদূরে নিক্ষেপ করেন। জাতি হিসেবে বিষয়টি অত্যন্ত লজ্জার। আমরা আমাদের মধ্যকার বিরোধগুলো মিটিয়ে ফেলার দেশজ কোন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে ব্যর্থ হয়েছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে যখন আওয়ামী লীগ জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতির সূচনা করেছিল, সেই সময়েও অস্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্যার নিনিয়ান স্টিফেনের মধ্যস্থতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। স্যার স্টিফেন বাংলাদেশে তার প্রলম্বিত অবস্থান সত্ত্বেও সেবারকার মত সমস্যার কোন

www.pathagar.com

হিল্লে করতে পারেননি। অনেকে মনে করেন, স্টিফেন সাহেব অস্ট্রেলিয়ান না হয়ে কার্টারের মত আমেরিকান হলেই সে যাত্রা সে সময়কার রাজনৈতিক অচলাবস্থার একটা সমাধান হতে পারত। আবার, কারো কারো ধারণা, বিশ্বায়ন যেহেতু একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্রগুলো তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বকে ধীরে ধীরে একটি অবয়বহীন বিশ্ব সরকারের কাছে সমর্থন করবে, বাংলাদেশও সেই প্রক্রিয়ারাই অংশীদার হয়ে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে বাইরের নজরদারী শক্তির কাছে বিকিয়ে দিচ্ছে। আর বাংলাদেশের সম্পদ-সম্ভাবনাকে বিশেষ করে গ্যাস সম্পদের সম্ভাবনা দেশটিকে এই নাজুক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। কার্টার সাহেব তার সংবাদ সম্মেলনে নিজ অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন, কোন তেল কোম্পানীর সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। বিষয়টি নিয়ে তিনি কোন কথাও পাড়েননি। তবে, বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের জন্য ৫০ বছরের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত গ্যাস রপ্তানী করতে সম্মত আছেন বলে তাকে তারা জানিয়েছেন। একটু গভীরে প্রবেশ করলে বুঝতে কষ্ট হয় না, বাংলাদেশের সংঘাতমুখর রাজনীতি কী কারণে আমেরিকানদের নজর কাড়ে। অথচ চেচনীয়রা যখন রক্তস্নাত হয়, কিংবা বসনীয়রা যখন গণহত্যার শিকার হয়, তখন পাশ্চাত্যের বিবেক খুব ধীরেই জাগ্রত হয়। জাতির সামনে তাই আজ প্রশ্ন, আমরা কী করে আমাদের ঘরোয়া সমস্যাগুলো ঘরোয়াভাবেই মিটিয়ে ফেলতে পারি? আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোন কোন দুর্বলতা দেশীয় সমস্যার দেশীয় সমাধান খুঁজে পেতে বাধা হিসেবে কাজ করে, তা খতিয়ে দেখা আজ জরুরী হয়ে পড়েছে।

আফতাব আহমাদ :

বাংলাদেশের ঘটনাবলী হঠাৎ একটি নাটকীয় মোড় নিয়েছে। প্রধান দুটি দলের দুই নেত্রীর রণমূর্তি ও যুদ্ধংদেহী ভাব ঐন্দ্রজালিকভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আলোকচিত্রীদের উদ্দেশ্যে হাস্যোজ্জ্বল মুখে যখন পোঁজ দেন তখন কে বলবে, এই দুই ভদ্রমহিলা গত দশ বছরে পরস্পরের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়সহ সামাজিক হৃদ্যতা বজায় রেখে চলতে পারেননি? এ আমাদের দেশের রাজনীতির দুর্ভাগ্য, আমরা যথোপযুক্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কৃষ্টির বিকাশ ঘটাতে পারিনি। বাংলাদেশের রাজনীতির বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরী অ্যান পিটার্স আসন্ন নির্বাচন ও রাজনীতিকদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তার কিছু পর্যবেক্ষণ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগসহ একশ্রেণীর বুদ্ধির জীব মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। তখন আমি 'এই দেশ এই সময়' কলামে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে সমর্থন করে যারা তার নিন্দা করেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের মত পশ্চাৎপদ ও তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলোতে যেখানে জাতীয় পুঁজি গড়ে ওঠেনি, বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির স্বল্পতা রয়েছে এবং সর্বোপরি কৃৎকৌশল আমাদের আয়ত্তে নেই, সেখানে এসব দেশ শিল্পোন্নত দেশের ওপর ভর করে কোনরকমে খুঁড়িয়ে হাঁটে। যেসব দেশের রাজনীতিকদের বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের আত্মমর্যাদাবোধ নেই, স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ত্যাগ স্বীকারের স্পৃহা নেই, জাতীয় স্বার্থের চাইতে ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে ডিস্ট্রিবিউটর, রিটেইলার ও কমিশন এজেন্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল, সেসব দেশে শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের প্রকল্প পরিকল্পনা ও সমাধান যে চাপিয়ে দেবে, তা বলাই বাহুল্য। আন্তর্জাতিক মুরব্বীদের প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে সবাই চুলোচুলি ভুলে গিয়ে কত বেশী মার্জিত, রুচিশীল ও সুবিবেচক, তা প্রমাণের এক চোখ ধাঁধানো নগ্ন প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে।

বাংলাদেশে যাদের ভূ-রণনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে, তাদের কথা বাদ দিলেও যে বিপুল পরিমাণ অর্থের যোগান দাতা গোষ্ঠীকে দিতে হয় বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রগুলোকে সচল রাখার জন্য, সেই দাতা গোষ্ঠী এক ধরনের সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চয়ই কামনা করবে। ঐ গোষ্ঠী তাদের সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিফল যেমন

www.pathagar.com

দেখতে চায়, তেমনি তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির নিরাপত্তাও বিধান করতে চায়। এছাড়া এই প্রক্রিয়ায় লুমপেন রাজনীতিকদের ঘাড়ে চড়ে দেশীয় খনিজ সম্পদসহ নানা ধরনের সম্পদ আহরণে তারা মুনাফার পাল্লা নিজের দিকে টানতে যে অত্যন্ত যত্নবান হবে, তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশে আজকের রাজনীতি আদর্শ বিবর্জিত, যদিও মতাদর্শগত দিক থেকে এবং জাতীয় স্বার্থবোধের দিক থেকে বাংলাদেশ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে সুস্পষ্টভাবে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে আছে। একটি শিবির আত্মসমর্পনবাদে বিশ্বাস করে এবং প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী শক্তির পক্ষপুটে থেকে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধিতে বিশ্বাসী। অপর শিবিরটি প্রকাশ্যে বিপরীত অবস্থান নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিরাজমান স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে নিরঙ্কুশ ও হেফাজত করে আধিপ্যত্যবাদী শক্তির সঙ্গে সম্মানজনক অবস্থান থেকে প্রতিযোগিতা করার আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে প্রথম শিবিরের রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীকে এক হাত দেখে নেয়ার জন্য মৌখিক প্রতিজ্ঞা করে। কার্যত এপক্ষও আত্মোন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধিতে বিশ্বাসী। এপক্ষও তাদের চাইতে যাদেরকে বৃহৎ গণ্য করে তাদের ছত্রছায়ায় থেকে স্ফীত হতে চায় ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর হিস্যা নিশ্চিত করতে চায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায়, যোগ্যতা, দক্ষতা ও মেরুদণ্ডের অভাবের কারণে রিটেইলার, ডিস্ট্রিবিউটর ও কমিশন এজেন্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর থাকে না। এই পক্ষও তাই কোন বিদেশী পার্টনারের ওপর ভর করবে, সে বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে। মনে হচ্ছে, বাংলাদেশে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান হতে চলেছে। কারণ কাকতালীয়ভাবে ভারতের গ্র্যান্ড ডিজাইনের একটি কনভার্জেন্স ঘটেছে। তবে যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হলো, অনুঘটকের অনুপস্থিতিতে রাসায়নিক পদার্থগুলো যেমন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দিতে পারে না তেমনি জিমি কার্টার বিদায় নেয়ার পর থেকেই প্রধান রাজনৈতিক দল দুটি পরস্পরের প্রতি যে তেড়ে আসবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ প্রতিযোগিতা হচ্ছে, ধরি মারি কাটি– সবকিছুকে ছাড়িয়ে নেক নজরে পড়তে হবে। এখানে জাতীয় স্বার্থ গৌণ। ব্যক্তিস্বার্থ তথা গোষ্ঠীস্বার্থ তথা দলীয় স্বার্থই মূখ্য।

আর তাই তো আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলকেই বলতে শোনা যায়, নির্বাচনে যে জিতে আসতে পারবে তাকেই মনোনয়ন দেয়া হবে। অর্থাৎ দলের আদর্শ, কর্মসূচী এক্ষেত্রে ফ্যাক্টর নয়। কে বলে আমাদের দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে ঐকমত্য ও সমঝোতা নেই? গ্যাস রফতানীর প্রশ্নে দুই নেত্রীর অবস্থান কি ভিন্ন? জাতীয় স্বার্থে গ্যাস রফতানী কতটুকু লাভ বয়ে আনবে ও কল্যাণকর হবে, পাশাপাশি গ্যাস বেইসড ইন্ডাস্ট্রি বা গ্যাস বেইসড প্রোডাক্ট যেমন– পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, বিদ্যুৎ, ইস্পাত ও সার আমাদের জন্য কত বেশী লাভজনক হবে– এ বিষয় নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ ও বোদ্ধাজনদের মধ্যে কোন বিতর্ক কি অনুষ্ঠিত হয়েছে? রাজনৈতিক দলগুলো নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও মতামত জনসাধারণের কাছে কি খোলামেলাভাবে তুলে ধরেছে? তাহলে জনগণের আড়ালে, জনগণের পশ্চাতে অন্ধকারের বিবরে অবস্থান গ্রহণ করে উঞ্ছবৃত্তিতে নিয়োজিত কতিপয় আমলা ও নিয়োগীদের পরামর্শে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির যে রূপরেখা তুলে ধরে গেলানোর চেষ্টা হচ্ছে, তা কতটুকু জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করবে কিংবা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হবে? এ থেকেই বোঝা যায়, কার্টার মিশনের সাফল্যের চাবিটি কোথায়? বস্তুত কার্টার মিশনের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তার পক্ষে এ দেশের মানুষ সব সময়ই সোচ্চার ছিল। কিন্তু রাজনীতিকদের কর্ণকুহরে সর্বসাধারণের সোচ্চার উচ্চারণ কখনো প্রবেশ করতে পারেনি। আজ জিমি কার্টারের সামনে অধোবদনে ঐ কথাগুলোই যখন আমাদের দুই প্রধান নেত্রী প্রতিপালনের অঙ্গীকার করেন, তখন লজ্জাও কি লজ্জা পায় না? বিশেষ করে, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে যেভাবে বিষোদগার করা হয়েছিল তাতে এখন সাধ জাগে প্রশ্ন করতে, ফেলে দেয়া থুথু এখন তারা কী করে চাটছে?

একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত– দুই বড় দলের যে সৌম্য মূর্তি কার্টার মিশনের সময়ে প্রত্যক্ষ করা গেছে তা বেশী দিন অক্ষুণ্ন থাকবে না। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক দল ও

www.pathagar.com

নেতাদের আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী করা খুব দুরূহ। বস্তুত এই আচরণকে এক কথায় বলা যায়, Erratic আচরণ। পাকিস্তানে মঈন কোরাইশীকে নাজেল করে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বটে, তবে, রাজনীতিকদের দুরাচার ও দুষ্কর্ম কী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে, তা সকলেরই জানা। যেভাবে শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিতর্কিত করে তুলেছেন এবং যেভাবে গায়ের জোরে নির্বাচনী মাঠ দখল করার পরিকল্পনা এঁটেছেন তাতে যে কোন সময়ে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে এবং ওয়ার লর্ডসদের ত্রাস থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষ যে কোন পদক্ষেপকে সমর্থন করতে পারে। তাই গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং অর্থবহ নির্বাচনের স্বার্থে যে কোন মূল্যে ছড়িয়ে থাকা বৈধ-অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে এবং এক্ষেত্রেও নির্বাচনকালে সেনাবাহিনীকে পূর্ণ এখতিয়ার দিয়ে ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত করে নিয়োগ করতে হবে। এর যে কোন বিকল্প নেই, জিমি কার্টারও স্বীকার করে গেছেন।

মাহবুব উল্লাহ :

প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির কাছে ইতোপূর্বে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে অস্ত্র উদ্ধারে সেনাবাহিনী নিয়োগের ব্যাপারে তার অনীহা ব্যক্ত করেছিলেন। সেনাবাহিনীর তিনি সুপ্রীম কমান্ডার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দেশরক্ষা বিভাগের দায়িত্বও সংবিধান অনুযায়ী তার ওপর অর্পিত। এখন তো কার্টার সাহেব অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এরপর প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদও এ সম্পর্কিত তাঁর পূর্বেকার মত পরিবর্তন করেছেন। তবে অমি অবাক হব না এই ইস্যুতে হয়তো দেখা যাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সাবেক প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশের একজন কর্তব্য পালনরত প্রেসিডেন্ট তার অভিমত বহাল রাখতে গিয়ে 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থায় পড়বেন। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট, নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সম্মিলিতভাবে সর্বোচ্চ জাতীয় স্বার্থে করণীয় নির্ধারণ করবেন, এটাই জাতির প্রত্যাশা। মনে রাখতে হবে, একটি দেশের জন্য কী ভাল, কী মন্দ, যেসব বিষয়ে বন্ধুরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বন্ধুসুলভ পরামর্শকে সকল সময়ে খবরদারি বলে মনে করার কোন কারণ নেই। খবরদারির সন্দেহ সেক্ষেত্রেই জন্মাতে পারে, যখন বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে রাষ্ট্রবিশেষ বিভ্রান্তিকর পরামর্শ দিয়ে নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষেত্রে চীনা কূটনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চৈনিক কূটনীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, চীনা নেতাদের কাছে যখন কোনো বন্ধুরাষ্ট্র কোন পরামর্শ কামনা করে, তখন চীনা নেতারা সেই পরামর্শ কামনার জবাব হিসেবে তাদের নিজস্ব ইতিহাস থেকে একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে, যাতে কোনক্রমেই তাদের উক্তি পরামর্শ, আদেশ-নির্দেশ বা খবরদারিরূপে বিবেচিত না হয়। এটাই হলো কূটনৈতিক ভব্যতা ও শিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী যে আপত্তি ও প্রশ্ন, তার পেছনে রয়েছে মার্কিন নীতির দ্বৈততা। জিমি কার্টার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট নন। সুতরাং জিমি কার্টার বাংলাদেশে গণতন্ত্রের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু বলেছেন তাকে মার্কিন প্রশাসনের নিখাঁদ অভিব্যক্তি রূপে হয়তো ভাবা যাবে না। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে পদ্ধতির মধ্য দিয়ে কাজ করে, সেই পদ্ধতিতে একজন সাবেক প্রেসিডেন্টের বক্তব্য এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট ও কার্টার সেন্টারের মত প্রতিষ্ঠানের প্রয়াসকে মার্কিন প্রশাসনের স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবেও বিবেচনা করা যায় না। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ নিয়ে যেসব নাগরিক চিন্তাভাবনা করেন, তাদের অবশ্যই মার্কিন নীতিনির্ধারণের এই বৈশিষ্ট্য ও প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করতে হবে। তবে আমি যে কথাটি আগেই বলেছি– আমি মনে করি, আমাদের সমস্যার সমাধান আমাদেরকেই খুঁজে পেতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আমরা এই কৃষ্টিতে অভ্যস্ত হতে না পারব ততদিন পর্যন্ত বিদেশী বড় বড় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের পরামর্শ, অনুরোধ নিছক প্রলেপের কাজ করবে, কিন্তু মূল ব্যাধির উপশম ঘটাবে

www.pathagar.com

না। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো ৩০ বছরেরও বেশী হয়েছে। অথচ আমরা আজ অবধি এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটাতে পারিনি, যে ব্যবস্থা নিজ থেকেই দেশের সমস্যার সমাধান দেশের মধ্যেই খুঁজে পায়। যতদিন বিদেশীরা আমাদের কী করতে হবে তা বলে দেবে, আর আমরাও বিদেশীরূপী হেড মাস্টারের বেত্রদণ্ড দেখে সুবোধ বালকের মত 'আর করব না স্যার, আর করব না স্যার'– এ কথা যতই বলি না কেন, স্কুল পালানোর অভ্যাস আমরা ছাড়তে পারব কিনা সন্দেহ। যে ছাত্র স্কুল পালায়, সে জানে না, ভাল করে পড়াশোনা করার সুফল কোথায়। ঠিক তেমনি যে নেতৃত্ব উপলব্ধি করে না জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গল কেথায়, যে নেতৃত্ব জাতিকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখে না, সেই নেতৃত্ব জাতির কতটুকু মঙ্গল বিধান করতে পারবে সে প্রশ্ন উত্থাপন করা অযৌক্তিক হবে কি?

আফতাব আহমাদ :

এক কথায় বলতে গেলে কার্টার মিশন সফল হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে জিমি কার্টার আমাদেরকে যা অবহিত করেছেন, তা পাঠ করে মনে হলো, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক করার বিষয়ে এ মিশন যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা যদিও জানি না পৃথক পৃথকভাবে দুই নেত্রী কার্টারের সঙ্গে মিলিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ যে আলাপ-আলোচনা করেছেন, তার পূর্ণাঙ্গ আলোচ্যসূচী কী ছিলো? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের দেশ। সেখানে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা চালু থাকলেও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ও জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে রাজনীতিতে কদাচিৎ দ্বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। বহির্দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্য রয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্টগণ যখনই বহির্দেশে কি মানবাধিকার, কি গণতন্ত্র, কি শান্তি প্রতিষ্ঠা– যে কোনো প্রচেষ্টায় উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন বিদ্যামান সরকারের অনুসৃত নীতিকে উপেক্ষা করে করেন না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্যমান সরকারের দূত হিসেবেই তারা কাজ করেন। সে দৃষ্টিকোণ থেকে কার্টার মিশনের সঙ্গে বুশের রিপাবলিকান প্রশাসনের যে কোন সংযোগ নেই, তা বলা যাবে না। শেষ বিশ্লেষণে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রায়ন ও গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকায়নের প্রক্রিয়াকে সুচারুভাবে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মার্কিন প্রচেষ্টা কোনোভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে উঠুক তা নিশ্চয়ই তারা কামনা করবে না। গণতন্ত্রের সুবাতাস ও ঢেউয়ের যুগে তাই আমরা লক্ষ্য করি, পৃথিবীর বহু স্থানে কর্তৃত্ববাদী সরকারের সঙ্গেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে হৃদ্যতাপূর্ণ গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের শেখার আছে অনেক কিছু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সংঘটিত হয়েছিল বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যা ফরাসী বিপ্লবকে গভীর প্রণোদনা যুগিয়েছিল। কৃতজ্ঞ ফরাসী জনগণ তাদের কৃতজ্ঞতার নির্দশণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' উপহার দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মারাত্মক সামাজিক ও রাজনৈতিক কনভালশানের মধ্যেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের মধ্যদিয়েও মার্কিন ফেডারেশন ভেঙে পড়েনি। নেতৃত্বের বিচক্ষণতা ও রাষ্ট্রনায়কোচিত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভক্ত জাতিতে পরিণত হয়নি। প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপরায়ণতা রাজনীতির স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করাতো দূরের কথা, প্রভাবান্বিতও করতে পারেনি। এর কারণ একটিই, জাতিকে বিভ্রান্ত করার পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবর্গ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার বিষয়ে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। জাতীয় পুনর্সম্ভাবনার রাজনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মূল চাবি হিসেবে কাজ করেছে। আমাদের দেশে দেখি ঠিক তার বিপরীত চিত্র। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে জাতিকে বিভক্ত করার এবং মীমাংসিত বিষয়াদিকে বিতর্কিত করে তোলার যে আত্মঘাতী পথ তারা বেছে নিয়েছে, তার পরিণতি যে কত ভয়াবহ হতে পারে, এই মুহূর্তে ভাবা না গেলেও আঁচ-অনুমান করা যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে 'দেশ মৌলবাদে ছেয়ে গেছে' হাসিনা শাসনের এই মিথ্যা ও

www.pathagar.com

অপপ্রচার ধোপে টেকেনি। হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে বিল ক্লিনটন যখন বাংলাদেশ সফরে আসেন, তখন আওয়ামী মহল থেকে 'মৌলবাদের' জিগির তুলে বিল ক্লিনটনকে জুজুর ভয় দেখানোর কম চেষ্টা হয়নি। বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা ছেপে হাসিনার সরকার বাংলাদেশকে একটি পশ্চাৎপদ 'মৌলবাদী' ও ওসামা বিন লাদেনের প্রভাবাধীন মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিল ক্লিনটন আওয়ামী লীগের এ ফাঁদে পা দেননি। হাসিনার উপস্থিতিতে তিনি বাংলাদেশকে একটি মডারেট মুসলিম কান্ট্রি হিসেবে বর্ণনা করে তার ইসলামী ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন। জিমি কার্টারও বাংলাদেশে 'মৌলবাদ' খুঁজে পাননি। সাংবাদিকদের তিনি খোলামেলাভাবেই বলেছেন, এ দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, এখানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলও রয়েছে, যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে চায়। তবে মৌলবাদের হুমকি বলতে যা বোঝায়, তা বাংলাদেশে নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য, নিজ দেশের জনসাধারণকে আস্থায় নিয়ে আমরা কোনো জাতীয় বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে কোনো মীমাংসার সন্ধান করতে চাই না। নাকে খৎ দিয়ে আমাদের দুই নেত্রী কার্টারের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে যে দস্তখত দিয়েছেন, তা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৈন্যেরই প্রকাশ এবং আমাদের জাতীয় লজ্জা। জিমি কার্টার বলেছেন, তিনি দুই নেত্রীর লিখিত অঙ্গীকার পেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যাচ্ছেন। সর্বসাধারণ এখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে এ দুটি দলের তৎপরতা প্রত্যক্ষ করবে ও মনিটর করবে। গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে এরা যত্নবান হয়ে সামাজিক নৈরাজ্য যাতে সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে মনোযোগী হলে নিঃসন্দেহে নির্বাচন সম্ভব হয়ে উঠবে। কিন্তু অস্ত্রের ঝনঝনানি জারি রেখে ৯০ দিনের অজুহাত দিয়ে যেনতেনভাবে জোড়াতালি দেয়া নির্বাচন, গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বার্থের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাতের সমতুল্য হবে। আমি আশা করবো নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রশ্নে জিমি কার্টারের উপস্থিতিতে দুই নেত্রী যেমন সুবোধ ভাব দেখিয়েছেন, সেই ভাব অক্ষুণ্ন রেখে জনগণকে স্বাধীন ও মুক্তভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ করে দেয়ার জন্য যদি ৯০ দিনের অধিক সময়ও লাগে, সে বিষয়ে একমত হবেন।

মাহবুব উল্লাহ :

জাতীয় জীবনের ক্ষত নিরসনে সুদূরপ্রসারী ফলাফল বিস্তার করতে পারে, এমন যে কোনো পদক্ষেপ শুধুমাত্র ব্যাকরণের কারণে ব্যাকরণ বহির্ভূত বিবেচনা করার কারণ নেই। ১৯৯১ সালে যে ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার জন্য কোনো সাংবিধানিক বিধান ছিল না। কিন্তু ছিল একটি রাজনৈতিক সহমত। আর সে সেই সহমতের ভিত্তিতেই একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। এবারও যেসব অঙ্গীকার দুই নেত্রী জিমি কার্টারের নিকট করেছেন বলে জিমি কার্টার জানিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হলেও সে ব্যাপারে সহমত প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সহমত জাতির দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণকে নিশ্চিত করবে। আমরা মনে করি, দেশের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হতে দুই নেত্রীর আপত্তি থাকার কথা নয়। আমরা জিমি কার্টারের কাছ থেকে শুনেছি, দুই নেত্রী তাঁকে কী কী বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু দেশবাসী এখনও জানে না, এসব প্রতিশ্রুতির বিষয়ে দুই নেত্রীর কী বলার আছে। আমরা তাদের কাছে এসব বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী। এ কথাতো অস্বীকার করা যাবে না, আজকের যুগটা লুকোচুরির যুগ নয়, এই যুগ স্বচ্ছতা, খোলামেলা আচরণের যুগ। যে দেশবাসী তাদের ভোট দেবে তাদের অধিকার রয়েছে জানার– গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগে জিমি কার্টারের কাছে তাঁরা কী প্রতিশ্রুত ব্যক্ত করেছেন এবং কেন করেছেন ও জাতির কোন্ হিতার্থে করেছেন?

www.pathagar.com

১৬ আগস্ট ২০০১

কোটি কোটি টাকার নির্বাচনী মহোৎসব

মাহবুব উল্লাহ :

নির্বাচন কমিশন ১৯৭২ সালের 'রিপ্রেজেনটেশন অব পিপলস অর্ডার' আইনের কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব করেছে। এসব সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় বাদ দিয়ে প্রেসিডেন্ট একটি অর্ডিনেন্স জারি করেছেন। অর্ডিনেন্সটি তাৎক্ষণিকভাবে বলবৎ হয়েছে। এই অর্ডিনেন্সে নির্বাচনী ব্যয় ৩ লাখ টাকা থেকে ৫ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। নির্বাচনী ব্যয়ের এই উর্ধ্বমুখী সংশোধন দেশে মূল্যস্ফীতি এবং নির্বাচনের আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধির আলোকেই করা হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি দেশবাসীর মধ্যে কেউই বিশ্বাস করে না বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এই ব্যয় কোন মতেই এই অংকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তা ছাড়া আইনের 'এনফোর্সমেন্টের' সমস্যাটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। নির্বাচন কমিশন এমন কোন ব্যবস্থার প্রস্তাব করতে পারেনি যেই ব্যবস্থাধীনে প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী ব্যয় ৫ লাখ টাকা অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। নির্বাচন কমিশন অবশ্য বলেছে যে, নির্বাচন সংক্রান্ত সকল লেনদেন চেকের মাধ্যমে হতে হবে। তবে লেনদেন যে চেকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও দুর্বলতার জন্য আমাদের অর্থনীতিবিদেরা অনুৎপাদনশীল ব্যয়কে অন্যতম সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। নির্বাচনের সময় যে ব্যয় হয় তা অনুৎপাদনশীল চরিত্রের। দেশে যদি অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থা বিরাজমান থাকে সে ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যয়কে অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর মনে না করারও যুক্তি রয়েছে। বিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ও ব্রিটেনের এক সময়কার 'চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার' লর্ড কেইন্‌স্‌ ১৯৩০-এ অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন, জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে মাটিতে গর্ত খুড়ে সেই গর্ত থেকে তোলা মাটি দিয়ে গর্ত ভরট করতে হবে। আর এভাবেই মানুষের হাতে টাকা আসবে। মানুষের হাতে টাকা থাকলে মানুষ ভোগ্যপণ্য বেশী হারে কিনবে, কলকারখানাগুলোও চাঙ্গা হবে, কর্মসংস্থান বাড়বে, এক কথায় অর্থনীতিতে তেজীভাব ফিরে আসবে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে এ ধরনের পলিসি কার্যকর হলেও বাংলাদেশের মতো দেশে-এর প্রাসঙ্গিকতা খুবই সীমিত। যা হোক আমরা মূলকথায় ফিরে আসতে পারি। দেশে যেখানে জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় অনেক ব্যয়ই নির্বাহ করা যাচ্ছে না, সেখানে শুধুমাত্র নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় অর্থের অপচয় কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। আয়কর সামান্য বাড়ালে অথবা ভ্যাটের পরিধি সামান্য সম্প্রসারিত করলে ব্যবসায়ী মহল জোর প্রতিবাদ জানায়। অথচ একই ব্যবসায়ী নির্বাচনের সময় শুধুমাত্র মনোনয়ন নিশ্চিত করতে দলের জন্য (দলীয় তহবিল না বলে দলের কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পকেটে, যার হাতে মনোনয়নের জাদুর কাঠিটি রয়েছে) পাঁচ-দশ কিংবা পনের কোটি টাকা সালামী দিতে কার্পণ্য করে না। মনোনয়ন নিশ্চিত হলে অন্য খরচতো রয়েছেই'। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো কী? এদেশে অর্থনৈতিক বিনিয়োগের চেয়ে রাজনৈতিক বিনিয়োগ অনেক বেশী লাভজনক। 'র‍্যাশনাল বিইং' হিসেবে নির্বাচনে মনোনয়ন প্রার্থীরা সঠিক কাজটিই করছেন, কিন্তু সমাজের জন্য এটি যে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও সর্বনেশে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কে বলে বাংলাদেশে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের অভাব? এই অভাবের কথাটা যে কত অন্তঃসারশূন্য, নির্বাচনের সময় আসলেই আমরা তা বুঝতে পারি।

www.pathagar.com

আফতাব আহ্‌মাদ :

এদেশে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের অভাব রয়েছে এ এক অন্তঃসারশূন্য বক্তব্য। অর্থনীতিবিদরা নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যেখানে রাজনীতি থেকে শুরু করে অর্থনীতি ও সামাজিক প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে লুম্পেনদের দৌরাত্মই সব কিছুর নিয়ন্তা সে ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও উন্নয়নমুখিতা চরম উপেক্ষা ও অবজ্ঞার শিকার হয়। কোন ঝুঁকি ছাড়া রাতারাতি কাঁচা পয়সা ঝোলায় পুরতে পারাটাই এইসব দেশের বিত্তবানদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। সংগঠিত জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতিতে জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যারা তরতর করে বিত্তের সিঁড়ি বাইতে সিদ্ধ হস্ত তাদের কাছে নির্বাচন মানে একটি মহোৎসব। নির্বাচনী মওসুম এলেই একশ্রেণীর লোক খোয়াব দেখেন যেনতেনভাবে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার হিস্যাদার কিভাবে হওয়া যায়। আমাদের মতো দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে দেশের অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার যে সহজ-সরল পথটি একটু কসরত করলেই অনায়াসে করায়ত্ত করা যায়; সেই জন্যই পাঁচ-দশ পনের কোটি টাকা দলকে বা দলনেতাকে সালামী দেয়া। আমরা দুর্ভাগ্যবশত গণতন্ত্র বলতে মোটাদাগে শুধু এটুকু বুঝি যে নির্বাচনের সময় যে ভাবেই হোক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়ে আসতে পারাটাই প্রমাণ করে যে গণতন্ত্র কার্যকর রয়েছে। তাই লক্ষ্য করার বিষয় যে নির্বাচন ঘনিয়ে এলেই দলে দলে লোকজন তাদের হিসেব-নিকেশ অনুযায়ী মোটা অংকের অর্থ সালামী দিয়ে এক এক দলের খাতায় নাম লিখিয়ে নির্বাচনে স্বীয় প্রার্থিতা নিশ্চিত করে নেয়।

নির্বাচন করতে গেলে বিশেষ করে আজকের যুগে বহুমুখী প্রচার কর্মের ফলে প্রভূত পরিমাণ অর্থের যে ব্যয় হয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু যেটি লক্ষ্যণীয় তা হলো দেশের করকাঠামো, বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি, পররাষ্ট্র সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা নীতি, জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক পরিকল্পনা কিংবা বিনিয়োগের ক্ষেত্র বা উন্নয়নের খাত- কোনটি কিভাবে অগ্রাধিকার পাবে সে বিষয়ে একটি দলের নীতিগত অবস্থান কী এসব কিছু কারো কোন বিবেচনায় থাকে না। রাজনৈতিকদলগুলো এতই নীতি ও আদর্শ বিবর্জিত হয়ে পড়ে যে, তারা প্রকাশ্যে এই ঘোষণা দিতেও শরমিন্দা বা সংকোচ বোধ করে না যে, যাকে মনোনয়ন দিলে জিতবে তাকেই মনোনয়ন দেয়া হবে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে দলের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীরা চরমভাবে উপেক্ষিত হয়। যিনি রাজনৈতিক নির্যাতন, নিপীড়নের সময় নির্বিকার থেকে প্রয়োজনে সব রকমের অসাধুপন্থা অবলম্বন করে, এমনকি ক্ষমতাসীন নিপীড়নকারী দলের সঙ্গে যোগসাজস করে টাকার কুমীর হয়ে বসেছেন, তিনি বা তারা জনসাধারণের মন-মেজাজ বুঝে এমনকি অপছন্দের দলটির সম্ভাবনা দেখে রাতারাতি ঐ দলের খাতায় নাম লেখান। একই কথা প্রযোজ্য অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের ক্ষেত্রে। সরকারী চাকরিতে থাকাকালীন সময় রাজনৈতিক দলগুলোর বহু গণমুখী কর্মসূচী ও কার্যক্রমকে বিরোধিতা করে কিংবা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করে এরা একদা গণদুশমনদের তালিকায় নিজেদের নাম লিখিয়ে থাকলেও অবসর গ্রহণের পরপরই রাতারাতি জনদরদী সেজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আশ্রয় ও আনুকূল্যে পুনরায় ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে। একারণেই স্বৈরাচারীর আমলে যিনি সামরিক শাসকের অর্থমন্ত্রী হয়ে দেশের অর্থনীতিকে ফোকলা করে দিয়েছিলেন সেই আমলা অনেকদিন ধরে জনসমাজের সুশীল বালক সেজে গণতন্ত্রের বুলি কপচিয়ে ও নিরপেক্ষতার ভান করে এখন 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' ঝাণ্ডা নিয়ে নির্বাচনী লেবাস গায়ে চড়িয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন। স্থানীয় সরকার কাঠামো বিনির্মাণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সহযোগিতা না করে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক ও নাশকতামূলক কার্যক্রম যিনি চালিয়ে এসেছিলেন তিনিও আজ অবসরকালীন সময়ে তৎকালীন ক্ষমতাশীন দল প্রধানের উপদেষ্টা হতে শরমিন্দা বোধ করেন না। এইসব আমলারা ভালই জানেন পাউরুটির কোন দিকটায় মাখন লাগানো আছে। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বহু কর্মকর্তাকেও রাজনৈতিক

www.pathagar.com

দলগুলোর মধ্যে ভিড়ে যেতে দেখা যায়, তবে এদের ক্ষেত্রে দলগুলোর তরফ থেকে বিবেচনা সম্ভবত এই যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে দলগুলোর দহরম মহরম এবং আস্থার সম্পর্ক রয়েছে, এটি প্রমাণ করা। উপরন্তু প্রয়োজনে সংকটকালে সেনাবাহিনীকে ম্যানেজ করা কিংবা সেনাবাহিনীর ভেতরকার তৎপরতা মনিটরিং করার জন্যও সম্ভবত দলগুলো সেনা কর্মকর্তাদের যোগ্যতা নির্বিশেষে এত তোয়াজ করে। সাধারণ মানুষ এই গোটা প্রক্রিয়ায় চরমভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই যে টাকার খেলা ও নীতিবিবর্জিত লোকের আস্ফালনের, সঙ্গে কোন দলের মাঠ পর্যায়, নেতা-কর্মীর কোন সংযোগ বা সম্পর্ক নেই। সারা বছর ধরে দলের পক্ষে তো অনেক টাকা-পয়সা চাঁদা সংগ্রহ করা হয়, আর নির্বাচন ঘনিয়ে এলে টাকার স্রোতবেগের তো কোন কথাই নেই। প্রধান দু'টি দলে এই যে কোটি কোটি টাকা স্তূপীকৃত হচ্ছে তার হিসেব কি কেউ জানে? জনসাধারণের কথা বাদই দিলাম, দলের সর্বোচ্চ নির্বাহী পর্ষদের সদস্যরা এ বিষয় কতটুকু ওয়াকেবহাল? কত টাকা সংগৃহীত হল, কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হল এবং কত উদ্বৃত্ত থাকল এই বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট দলের সর্বোচ্চ নির্বাহী পরিষদের অন্তত জানার অধিকার আছে। জনান্তিকে প্রকাশ, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই অনেকে কোটিপতি হয়ে গেছেন, জনমন থেকে এই ধারণা মুছে ফেলার জন্য কার্যকর কী পদক্ষেপ দল দু'টি নিয়েছে তা আমাদের জানা নেই।

মাহবুব উল্লাহ :

ঢাকা শহরময় এখন আলোচনার বিষয় হল, মনোনয়ন প্রার্থীরা মনোনয়ন নিশ্চিত করতে কোন জায়গায় কত কোটি টাকা ইতোমধ্যেই সালামী দিয়েছেন। এদেশে একটি প্রবাদ আছে, টাকার নৌকা পাহাড় ডিঙিয়ে চলে। এইসব প্রবাদ প্রবচনের রচয়িতারা জানতেন তাদের কালে না হলেও একালে এসে তাদের কথিত উক্তি যথার্থ প্রমাণিত হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি একটি দল যখন বিরোধী অবস্থানে থেকে চিড়ে-চেপ্টা হচ্ছিল, যখন সৃজনমুখী কর্মসূচী দিতে না পেরে বারবার কেবল হরতাল দিচ্ছিল, অথচ হরতালের দিন দেখা যেত সে দলের কর্মীরা তেমনভাবে মাঠে হাজির নেই, রাজপথ দখল করে আছে সরকারী দলের কর্মীরা। সরকারী দলে থেকে রাজপথ দখল করা খুবই সহজ কাজ। কারণ পুলিশের লাঠিপেটা হতে হয় না, বুটের আঘাত সইতে হয় না, আইনী-বেআইনী অস্ত্র থেকে প্রতিপক্ষের উপর গুলীবর্ষণ করেও জননিরাপত্তা আইনের আসামী হয়ে হাজত খাটতে হয় না। অথচ বিরোধী দলের কর্মী হলে এর সবকিছু তো জুটবেই, এমনকি পৈতৃক প্রাণটাও হারাতে হতে পারে। এরকম প্রতিকূল অবস্থায় জান-কবুল করে রাস্তায় নামতে পারে একমাত্র তারাই, যারা আদর্শ ও ঈমানী বলে বলিয়ান। আদর্শবাদিতা যে কত বড় শক্তি তাতো আমরা ইদানীং লক্ষ্য করছি– জেরুজালেমে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ইসরাইলীদের ক্ষমতার দর্প চূর্ণ করে দিতে কিভাবে অকাতরে প্যালেস্টাইনী মুজাহিদরা নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে ইতস্ততবোধ করে না। মানুষের প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার যখন দৃঢ় হয়, দেশপ্রেম যখন অন্য সকল প্রেমকে অতিক্রম করে যায়– সে রকম অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়েই কবি বলেছেন–

তোদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন ততই টুটবে।

আমাদের এদেশে এরকম মরণপণ লড়াই অতীতে বারবার হয়েছে, কিন্তু এখন তেমন হয় না। কারণটা কী? কারণ একটাই, যার জীবন দেবার কথা, যার নিপীড়ন অত্যাচার অম্লান বদনে সহ্য করে নেয়ার কথা সে তো জানে ইলেকশন আসলে মনোনয়নের সময় তার কথা কেউ ভাববে না, এমনকি তার ত্যাগ ও তিতীক্ষার মৌখিক স্বীকৃতিও মিলবে না। এমন এক আদর্শহীন আত্মস্বার্থপরায়ণ রাজনীতিতে ত্যাগের কোন স্থান নেই। তাই নেতারা যতই গণঅভ্যুত্থানের হুঙ্কার দেন না কেন, গণঅভ্যুত্থান হয় না। নির্বাচনের সময় আসলে বসন্তের কোকিলদের অপূর্ব

www.pathagar.com

সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, দল বদলের হিড়িক পড়ে যায়, যোগদান উৎসবে দলীয় কার্যালয় মুখর হয়ে ওঠে। যারা সময় বুঝে দলে আসছে, তারা কি তাদের পুরাতন নীতি ও ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আসছে? মোটেও না। ফলে দলের চরিত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। দল আর তার বিঘোষিত আদর্শে অবিচল থাকতে পারে না। এর ফলে এদেশের রাজনীতিতে এমন একটি রূপান্তরগত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যে প্রক্রিয়ায় আদর্শের মেরুকরণ নিছক ক্ষমতার মেরুকরণে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের বিদেশী মুরব্বীরা এদেশে যে ব্যবস্থাটি চালু করতে চাচ্ছেন, সে ব্যবস্থাটি হল দুই প্রধান দলের মধ্যে ক্ষমতার হাত-বদল সীমাবদ্ধ রাখা এবং নীতি ও আদর্শের দ্বন্দ্ব বিবর্জিত একটি তথাকথিত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা চালু করা। এরকম একটা ব্যবস্থা চালু হলে ভারত ও আমেরিকার স্বার্থ ষোলআনাই বজায় থাকে। এদেশে তাই রাজনীতির লক্ষ্যবস্তু দেশের জনগণ নয়, ভারত ও আমেরিকার কৃপাভাজন হয়ে ক্ষমতায় আসাই লক্ষ্য। রাজনীতির জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিষয়টি উপেক্ষণীয় নয়, তবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের প্রতি ততটুকুই যত্নবান হতে হবে, যতটুকু দেশবাসীর স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূল। অনুকূলতার এই সীমারেখা টানা খুব সহজ কাজ নয়, আবার অসম্ভবও নয়। জনগণের উপর বিশ্বাস থাকলে, জনগণের কল্যাণকেই সবকিছুর ঊর্ধ্বে বিবেচনা করলে এরকম একটা ভারসাম্যমূলক অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন নয়। মালয়েশিয়া গত পঁচিশ বছরে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন অর্জন করেছে তা এরকম একটি নীতি অনুসরণের মাধ্যমেই করতে সক্ষম হয়েছে। মালয়েশিয়া ভাগ্যবান যে মাহাথির মোহাম্মদ-এর মতো একজন দক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাকে পেয়েছে। তারপরেও মাহাথিরের সমালোচকের অভাব নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাংলাদেশের বিদ্বৎ সমাজ বাংলাদেশের জন্য এই মানের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা জনগণকে যত বেশী করে বলবেন দেশের জন্য ততই মঙ্গল।

আফতাব আহমাদ :

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রনায়ক লি কুয়ান ইউ। সিঙ্গাপুর ছিল নিদেনপক্ষে একটি জেলে গ্রাম, এই সেদিনও সেখানে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল অনুপস্থিত। অথচ শিল্পোন্নত বিশ্ব আজ অবাক বিস্ময়ে সিঙ্গাপুরের দিকে তাকিয়ে থাকে। লি কুয়ান ইউ তার দেশকে গড়ে তুলতে গিয়ে যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন ও দুর্বলতাকে যেভাবে দু'পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে গেছেন তা থেকে সামান্যতম শিক্ষা যদি আমরা নিতে পারি, তাহলে আমাদের উন্নয়নের পথটি অনেক মসৃণ হয়ে উঠবে। নির্বাচন নির্বাচন খেলা লিকুয়ান ইউর সিঙ্গাপুর বিনির্মাণে তেমন আমল পায়নি। মানুষের শ্রমশীলতাকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করে কিভাবে অসাধ্য সাধন করতে হয় তা সিঙ্গাপুরের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি দেখলে বোঝা যায়। আমাদের মতো গরীব দেশে নির্বাচনের নামে টাকার যে বিপুল অংকের অপচয় হয় তা নিয়ে আমরা কখনো ভাবি না। অথচ দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো অবহেলিত, উপেক্ষিতই থেকে যায়।

গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার জন্য নির্বাচন অপরিহার্য। অস্ট্রেলিয়ার মতো ধনাঢ্য দেশের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে লক্ষ্য করবো সেখানে নির্বাচনের নামে অর্থের অপচয়কে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোকে কোন ধরনের নির্বাচনী ব্যয় করতে দেয়া হয় না। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে একটি নীতিমালার ভিত্তিতে পোস্টার, প্যাম্পলেট, প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। অনেকেই খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে বলবেন বাংলাদেশের মতো একটি গরীব দেশের পক্ষে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ ধরনের ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। অথচ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে এদেশে তার সঙ্গে নির্বাচন কমিশন আরোপিত শর্তানুযায়ী প্রার্থী প্রতি সর্বোচ্চ যে ব্যয় ধরা হয়েছে, তা প্রার্থীর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হলে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনী

www.pathagar.com

খরচের যোগান দেয়া কষ্টসাধ্য হওয়ার কথা নয়। এর বাইরে কোন প্রার্থী যদি কোন অতিরিক্ত খরচ করে এবং সে সম্পর্কে প্রতিপক্ষ আপত্তি ও প্রতিবাদ করলে সে বিষয়ে তদন্ত ও নিষ্পত্তির জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন করা যেতে পারে। তবে আমার মনে হয় না আমাদের দেশের অন্তত প্রধান দুটি বড় দল এ ধরনের বিধি-বিধান চালুর পক্ষে মত দেবে। আমলারা অবসর গ্রহণ করার দু'বছর পর রাজনীতি করতে পারবেন– নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত এ শর্তটি দেশের প্রধান দু'টি দলের আপত্তির কারণে নির্বাচনী আইনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে রেজিস্ট্রেশনের যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, তাও ঐচ্ছিক পর্যায়ে রাখা হয়েছে। আমার মতে রাজনৈতিক দলগুলোর বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন প্রবর্তন করা উচিত এবং তাদের বার্ষিক আয় ব্যয় ও আর্থিক লেন-দেনের হিসেব নিয়মিত নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেয়া উচিত এবং পত্র-পত্রিকার মারফত জন সাধারণকে অবহিত করা উচিত। কালো টাকা, অসৎ ব্যবসায়ী ইত্যাদির বিরুদ্ধে এখন যে সব মুখরোচক কথাবার্তা রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-নেত্রীদের মুখ থেকে শোনা যায় ভবিষ্যতে তার আর প্রয়োজন হবে না।

মাহবুব উল্লাহ :

রাজনৈতিক দলের আয় ব্যয়ে স্বচ্ছতা আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করার কোন কারণ নেই। প্রশ্নটা হলো এই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার বিধি-ব্যবস্থা কী হবে? রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড, যার সঙ্গে আর্থিক ব্যয় সম্পর্কিত তার জন্য একটি সাংবিধানিক কন্ট্রোল কমিশন অতি আবশ্যক বলে মনে হয়। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রতিটি কর্মসূচীর আগে এই কমিশনের কাছে কর্মসূচী পালনে কী ব্যয় হতে পারে তার একটি বাজেট পেশ করবে এবং কর্মসূচী পালনের পর তার ব্যয় ও ব্যায়ের উৎস সংক্রান্ত রিটার্নও কমিশনের নিকট পেশ করবে। কর্মসূচীর কলেবর ও তৎসংক্রান্ত ব্যয় যদি দেশের কোন নাগরিক, রাজনৈতিক দল, এমনকি খোদ্ কমিশনের কাছে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে সে ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে। শুরুর দিকে এতদ্‌সংক্রান্ত বিচ্যুতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা না হলেও শুধুমাত্র শ্বেতপত্রের মাধ্যমে যে নৈতিক চাপ সৃষ্টি হবে তা রাজনৈতিক দলগুলোকে সুস্থ আচরণ করতে বাধ্য করবে; এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে অসদাচরণের অভিযোগে দায়ী ব্যক্তিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়োগ লাভে অযোগ্য ঘোষণা করার বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। বাংলাদেশের গোড়াপত্তনের পর অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন দেশটি অর্থনৈতিকভাবে টেকসই নয়। কিন্তু আজ আর বাংলাদেশ সম্পর্কে সে রকম কথা বাংলাদেশের চরম নিন্দুকরাও বলতে পারছে না। বাংলাদেশের গ্যাসসহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের মজুদ, কৃষি উৎপাদন ও কিছু কিছু অর্থনৈতিক খাতে অর্জিত সাফল্য দেশটি সম্পর্কে আশার সঞ্চার করেছে। অথচ ইতোমধ্যেই সম্ভাবনার উৎসগুলোকে পুঁজি করে রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার দাবাখেলা শুরু করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ যেন লাতিন আমেরিকার কদলী প্রজাতন্ত্রগুলোর মতো বৈদেশিক আধিপত্য ও লুণ্ঠনের অবাধ চারণ ক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং ক্ষমতার আরাম কেদারায় বসে স্বার্থপর রাজনীতিবিদরা যাতে সুখে দিন গুজরান করতে পারেন এবং বিদেশের ব্যাংকে শত শত কোটি ডলার সঞ্চিত করতে সক্ষম হন, তারই এক কদর্য বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে বাংলাদেশের জায়মান রাজনৈতিক কৃষ্টি। এই কৃষ্টিকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে এবং চিরতরে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে, তবেই হবে জাতীয় পরিত্রাণ ও মুক্তি।

www.pathagar.com

২৩ আগস্ট ২০০১

রাজনৈতিক ছত্রছায়া, সন্ত্রাসের গডফাদার ও সুষ্ঠু নির্বাচন

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশে আড়াই লক্ষ বেআইনী অস্ত্র রয়েছে। এই হিসাব আমার নয়, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান-এর। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশব্যাপী বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালিয়ে এসেছে, এই অভিযানেরও মেয়াদ প্রায় চল্লিশ দিন হতে চলল, কিন্তু অস্ত্র উদ্ধারের পরিমাণ হিমশৈলের ভাসমান অংশের সাথেও তুলনীয় নয়। সন্ত্রাসের জনপদ ফেনীতে সম্প্রতি সেনা, বিডিআর ও পুলিশ বাহিনীর কার্ফ্যু ও যৌথ অভিযান সত্ত্বেও যে পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে তা কোনক্রমেই আশাব্যঞ্জক বলা যায় না। তদসত্ত্বেও এই অভিযানের মধ্য দিয়ে প্রশাসন যে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। ফেনীর গডফাদার জয়নাল হাজারী সম্মিলিত অভিযানের আঁচ পেয়েই গা-ঢাকা দিয়েছে। মধ্যরাতে অভিযান শুরু হলেও হাজারী রাত নয়টা পর্যন্ত নিজ বাসভবনেই ছিল বলে সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ। এ সময় তার বাড়ীর সামনে আট/নয়টি গাড়ীও দেখা গেছে। গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা এর ক'দিন আগ থেকেই তার মাস্টারপাড়ার বাসভবনের উপর রেকি করেছিল। হাজারী অত্যন্ত ধূর্ত, ফেনী সম্পর্কে বিটিভিতে প্রতিবেদন প্রচারিত হবার পর থেকেই সে সাবধান হয়ে গিয়েছিল এবং ঘর সামলানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। সংবাদ সূত্রে আরও জানা যায়, পালিয়ে যাবার সময় হাজারী একে-৪৭, এম-১৬সহ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার গোপন আড্ডায় চলে যেতে সক্ষম হয়েছে। হাজারী দেশের ভেতরেই আছে, না সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে গেছে– এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। আমাদের কথা হল, হাজারীর মতো সন্ত্রাসী গডফাদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর আগে কোন প্রকার আঁচ অনুমান করার সুযোগ দেয়া সুবিবেচনাপ্রসূত ছিল না। অভিযান পরিচালনাকারী কোন সূত্রের তরফ থেকে অভিযানের খবর ফাঁস হল কিনা তাও তদন্ত করে দেখা দরকার এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শৃঙ্খলামূলক শাস্তি প্রদান করা হোক। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান ঝটিকা বেগে পরিচালিত হবে এবং অভিযান সংক্রান্ত কোন খবর পূর্বাহ্নেই ফাঁস হয়ে যাবে না। সে ক্ষেত্রে অভিযান সফল হবার সম্ভাবনা সমধিক।

বাংলাদেশে আজ শুধু হাজারী একই নয়, আরও বহু গডফাদার, পাতি গডফাদার রয়েছে। এরা কমবেশী রাজনৈতিক ছত্রছায়া ভোগ করে। এই ছত্রছায়া অপসারিত হলে এসব গডফাদার কীটপতঙ্গের ক্ষমতাও রাখতে পারবে না, তা নিশ্চিত বলা যায়।

প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের রাজনীতি এভাবে ইচ্ছাপিতা ও সন্ত্রাসীদের পদচারণায় ভারী হয়ে উঠল কেন? সম্প্রতি সাংবাদপত্রে একটি রিপোর্ট বেরিয়েছে যে, ভারতের নবগঠিত গোয়েন্দা সংস্থা 'ডিআইএ' বা (ডিফেন্স ইনটেলিজেন্সি এজেন্সি) বাংলাদেশে এখন খুব তৎপর। বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রক্তপাত ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে 'ডিআইএ' সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করছে এবং এসব গ্রুপের মধ্যে অর্থ ও অস্ত্র বিতরণের কর্মকাণ্ডে তৎপর রয়েছে। দেশের নিরাপত্তার জন্য খবরটি উদ্বেগজনক। এসব তৎপরতাকে অঙ্কুরেই নস্যাৎ করে না দিতে পারলে দেশে ভবিষ্যতের দিনগুলো অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। 'ডিআইএ'র সব সাম্প্রতিক তৎপরতার সংগে আমরা যদি '৭১-এর সশস্ত্র

www.pathagar.com

স্বাধীনতাযুদ্ধকে ভারত নিজের সুদূরপ্রসারী স্বার্থে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, তার সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি তাহলে বুঝতে কষ্ট হবে না- কেন আমাদের সমাজ ও রাজনীতি অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিষবাষ্পে এমন বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। বস্তুত '৭১-এর সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধ তার মহান লক্ষ্য থেকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও ভারতীয় স্ট্র্যাটেজিস্টদের কূট চক্রান্তের ফলে যখন আমাদের অজান্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে শুরু করে, ঠিক সেই সময় থেকেই আমাদের জাতীয় জীবনে যে গ্রহণের কালের সূচনা, তার পরিসমাপ্তি তো ঘটেইনি বরং ডালপালা বিস্তার করে আজ বিশাল বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ড. আফতাবের রয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারবেন সেদিন আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের আদর্শচ্যুত করার জন্য ভারত কিভাবে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চালিয়েছিল। আমরা যতদিন এই চক্রান্তের চেহারা উন্মোচিত না করতে পারবো, ততদিন রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও অস্ত্রায়ন-এর সংকট থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব না।

আফতাব আহমাদ :

বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা চলছে হয় জাতীয় স্বার্থকে সংরক্ষণের জন্য না হয় প্রভুত্বকে সুদৃঢ় করার জন্যে। এই অস্ত্র প্রতিযোগিতার মূলে রয়েছে যে কোন সংশ্লিষ্ট পক্ষের জাতীয় ঐক্যকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে জাতীয় শক্তির বিকাশ ঘটানো। আমাদের দেশেও অস্ত্রের প্রতিযোগিতা চলছে, তবে দুর্ভাগ্যবশত এ প্রতিযোগিতার লক্ষ্য জাতীয় স্বার্থের বিনাশসাধন, জাতীয় ঐক্যকে ভেঙে তছনছ করে দেয়া, অর্থনীতির ধ্বংসযজ্ঞ এবং গৃহযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলা। এমনি এক পরিস্থিতিতে আমরা হঠাৎ করে উপনীত হইনি। আমাদের সমাজ কাঠামো ভাঙচুর করে, মূল্যবোধকে ছুঁড়ে দিয়ে ধর্মবিশ্বাস সহনশীলতা ও মানবিকতার যে শিক্ষা ও প্রণোদনা আমাদের দিয়েছে তাকে পদদলিত করে আমাদের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে স্থুল ভোগবাদের জন্ম দেয়া হয়। যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অকুতোভয় সর্বসাধারণকে বিশেষ করে তরুণ-তরুণী, কৃষক, মজুর ও খেটেখাওয়া মেহনতি মানুষের অফুরন্ত সৃজনী শক্তির উদ্বোধন করেছিল তা যথোপযুক্ত সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাবে ভারতীয়দের প্ররোচনায় বেপথু বিভ্রান্ত ও বিনাশী পথে ধাবিত হয়। আজকের বাংলাদেশের সন্ত্রাস ও সংকটের উৎসের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ড. মাহবুব উল্লাহ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিকভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। আমাদের যুদ্ধটা যদি সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে রেখে আমাদের পরিকল্পনামাফিক পরিচালনা করতে পারতাম তাহলে আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির আজ যে প্রতিবন্ধীদশা তা কখনই হতে পারত না এবং সমাজজীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক জীবনের কোথাও অস্ত্র আমাদের ভাষা হতে পারত না। বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গণহত্যা চাপিয়ে দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পৈশাচিক তৃপ্তি ভোগ করতে গিয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখে পড়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। তবে পাকিস্তানীদের চাইতেও অধিক পরিমাণে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়ে ভারতীয়রা। ভারতীয়রা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি বাংলাদেশের নির্যাতিত হতদরিদ্র জনসাধারণ সাহসিকতা ও বীরত্বে এ ধরনের অবিনাশী শক্তির পরিচয় দিতে সক্ষম। পাকিস্তানীদের চাইতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভারতীয়দের শিরপীড়া অনেক গুণ বেড়ে যায় তখন। পাকিস্তানীরা তো গণহত্যা চাপিয়ে দিয়ে অপরিণামদর্শিতার পরিচয়টুকু শুধু দিয়েছিল। কিন্তু ভারত চিন্তিত ছিল এই ভেবে- যেহেতু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কোনভাবেই পর্যুদস্ত করা যাবে না, সেহেতু এর উপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাদেশকে তাদের ইচ্ছাদাসে রূপান্তরিত করে কিভাবে একটি প্রতিবন্ধী রাষ্ট্রে রূপ দেয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক দিনগুলোর দিকে যদি আমরা ফিরে তাকাই তাহলে লক্ষ্য করবো যে, আমাদের তরুণেরা ও যুবকেরা সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে পিছু হটতে হটতে ভারতীয় ভূখণ্ডে

www.pathagar.com

প্রবেশ করামাত্রই ভারতীয় ইচ্ছা- অভিপ্রায়ের বেড়াজালে আটকা পড়ে। নিয়মিত সেনাবাহিনীর অফিসার ও জোয়ানরা যারা ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন তারাও একই অবস্থার শিকার হন। বস্তুত একটি সুশৃঙ্খল সুপ্রশিক্ষিত গণমুক্তি ফৌজ গড়ে তোলার যে স্বপ্ন আমাদের জনগণ প্রথমদিন থেকেই দেখছিল তা যাতে কোনভাবেই বাস্তবে রূপলাভ না করে ভারত সে বিষয় সবিশেষ যত্নবান ছিল। মুক্তিযোদ্ধা তরুণ ও যুবকদের সঙ্গে নিয়মিত সেনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের যোগাযোগ যাতে বিচ্ছিন্ন থাকে তা প্রথম থেকেই নিশ্চিত করা হয়েছিল। উপরন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের জন্ম দেয়ার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজাল ও স্থাপনা সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী গড়ে তোলে- এসব গোষ্ঠীর অভিনব নামকরণও করা হয়, যেমন এফএফ (ফ্রিডম ফাইটারস), ভিএফ (ভিত্তি ফৌজ), গণবাহিনী, সিইএনসি স্পেশাল, কেরালা স্পেশাল, মুজিব বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী ইত্যাদি।

মুক্তি সংগ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে গেরিলা ওয়ারফেয়ার এবং কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ারকে সমন্বিত করে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার ধ্যান-ধারণা নিয়ে সেনাবাহিনীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের যে কোন প্রস্তাব ও বক্তব্যকে ভারত সরাসরি বিরোধিতা করে। আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে বৈধতাদানের জন্য মুজিবনগরে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারত তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তার ক্রীড়নকে পরিণত করে। ভারতের অনুমতি-সম্মতি, ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ছাড়া মুজিবনগর সরকারের পক্ষে কখনোই সম্ভব হয়নি স্বাধীনভাবে আমাদের সেনা অফিসার, জওয়ান, সেক্টর কমান্ডার ও সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ও পরামর্শ করা। যৎসামান্য সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে ভারত যেসব সশস্ত্র গোষ্ঠী তৈরী করেছিল এদেরকে বাংলাদেশের জাতীয় দর্শনের কোন দীক্ষা দেয়া হয়নি এবং সামরিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন ধরনের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। যতকিঞ্চিৎ হালকা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এসব সশস্ত্র গোষ্ঠীকে ভারতীয় ইনস্ট্রাক্টরদের তত্ত্বাবধানে সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হতো। এসব সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ধরনের স্বাধীনতা ছিল না। 'টার্গেট অব অ্যাটাক' ভারতীয়রা নির্ধারণ করে দিত- এসব টার্গেট যত না ছিল সামরিক লক্ষ্যবস্তু তার চাইতে ছিল অবকাঠামোগত লক্ষ্যবস্তু (এই অবকাঠামোগত লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে প্রধান প্রধান টার্গেট ছিল ব্রিজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ফেরি চলাচল, রেল যোগাযোগ, টেলিফোনের খাম্বা এবং অন্যান্য টেলিকমিউনিকেশন স্থাপনা)। একটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও বাধ্যতামূলক আদেশ জারি করা হতো, দেশের অভ্যন্তরে যে কোন ব্যক্তিকে বামপন্থী মনে করা হলে বিশেষ করে চীনপন্থী কমিউনিজমের অনুসারী মনে করা হলে নির্দ্বিধায় যেন তাদেকে হত্যা করা হয়। চালের গুদাম এবং পাটের গুদামকেও 'টার্গেট অব অ্যাটাক' হিসেবে ধার্য করা হয়। চালের গুদামের ক্ষেত্রে শস্য পুড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ ছিল, পাটের গুদামের ক্ষেত্রে নির্দেশ ছিল সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে পাট যেন ভারতে পাচার করা হয়, কিন্তু শত্রুর হাতে ধরা পড়লেও যেন পাট পোড়ানো না হয়। চাল এবং পাটের বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তীকালে পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাজয়ের পর বাংলাদেশকে খাদ্যের জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, আর ভারতের অচল পাটকলগুলো শুধু সচলই হয়নি, নতুন নতুন পাটকলও স্থাপন করা হয়। পাট খুব সহজভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের পাটকলে পৌঁছে যেত এবং ১৬ ডিসেম্বরের পর গোটা আওয়ামী শাসনামল জুড়ে পাটের স্মাগলিং অপ্রতিহতভাবে চলেছে। আমাদের পাটকলগুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সামরিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ নয় অথচ যথেচ্ছভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়ার ভারতীয় লক্ষ্য একটিই ছিল- বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন অবস্থাতেই যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে। যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তি হত্যাকে উৎসাহিত করে

www.pathagar.com

ভারত বাংলাদেশের যুবক ও তরুণদের একটি দুঃখজনক নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, অমানবিকতা ও পাশবিকতার দুষ্ট মনস্তত্ত্বের দুষ্টচক্রে নিক্ষিপ্ত করে। আজ তাই আমরা লক্ষ্য করি হত্যা, খুন, ধর্ষণ কিভাবে আমাদের সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও গা-সওয়া হয়ে গেছে। বস্তুত গোটা নয় মাস ধরে ভারত-বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি পরিকল্পিত দাবা খেলার আয়োজন করে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সবসময় দূরে ঠেলে রাখার চেষ্টা করেছে, মুক্তিযুদ্ধে তাদের প্রাধান্যকে বরদাশত করেনি এবং সার্বক্ষণিকভাবে এই ধারণাটিই দেয়ার চেষ্টা করেছে যে, বাংলাদেশে কোন স্থায়ী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই।

ভারত বারবার বুঝাতে চেয়েছে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীই হচ্ছে বাংলাদেশের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। ভারতের প্রতিরক্ষাই বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী এই তত্ত্ব মেনে নিতে পারেননি, অনুরূপভাবে মেনে নিতে পারেননি স্বাধীনতার ঘোষক জেনারেল জিয়াউর রহমান। বঙ্গবীর ওসমানীর অনুপ্রেরণায় জেনারেল জিয়া সর্বপ্রথম ভারতীয়দের সকল বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড জেড ফোর্স গঠন করেন। পরবর্তীতে এমনি আরো তিনটি ব্রিগেড গঠন করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের বিরোধিতাও বঙ্গবীর ওসমানী করেছিলেন। আর এ কারণেই জয়েন্ট কমান্ডের অধিনায়কত্ব লাভ করেন ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা। শুধু তাই নয় পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বঙ্গবীর ওসমানী যাতে উপস্থিত থাকতে না পারেন ভারত সে বিষয়ও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। এক কথায় বলা চলে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্লিবত্ব, মুজিবনগর সরকারের প্রতিবন্ধী মর্যাদা এবং ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণ ও প্ররোচনায় গঠিত বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। 'ট্রিগার হ্যাপি' তরুণরা কমিউনিস্ট নিধনের নামে অধঃপতিত হয়ে ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য সাধারণ মানুষকেও হত্যার উন্মাদনায় মেতে ওঠে। এর সঙ্গে অর্থ-বিত্ত-বৈভবের তো যোগ ছিলই। এভাবেই সন্ত্রাস কুসুমিত হতে থাকে বাংলাদেশের নানা জনপদে।

মাহবুব উল্লাহ :

অস্ত্রের কোন দল নেই, পক্ষ নেই। অস্ত্র নিরপেক্ষ কিন্তু যার হাতে অস্ত্র থাকে অস্ত্র তারই ভাষায় কথা বলে। ব্রিটিশ শাসনের ২শ' বছরে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রধানত নিয়মতান্ত্রিক পথেই পরিচালিত হয়েছে। এই নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের সামান্যসংখ্যক ব্যতিক্রম হলো তিতুমীরের সশস্ত্র বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে জেহাদী যুদ্ধ ও যুগান্তর, অনুশীলন দলের সন্ত্রাসবাদ। এসব সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার লড়াই ছিল একটি কৃষক অভ্যুত্থান। মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর পবিত্র মক্কায় হজ করতে গিয়ে ওহাবী মতবাদের সংস্পর্শে আসেন। ওহাবীরা ইসলামের অনুশাসন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতো। নারকেলবাড়িয়ার জমিদার প্রজাদের উপর অপরিসীম শোষণ ও অত্যাচার চালাতো। একের পর এক প্রজাদের উপর এই জমিদার আবওয়াবের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত জমিদার আদেশ দিল মুসলমান প্রজারা দাড়ি রাখলে তার জন্যও আবওয়াব তথা বিশেষ কর দিতে বাধ্য থাকবে। এই ঘটনা নিসার আলীকে প্রজাদের নিয়ে বিদ্রোহের পথ বেছে নিতে বাধ্য করে। ইংরেজ সেনাদল নারকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা ঘেরাও করে তোপ দেগে এই বিদ্রোহ দমন করে ও মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর শাহাদাৎবরণ করেন। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী দারুল হরব (দুশমন কবলিত ভূ-খণ্ড) এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ জেহাদ চালান। বাংলাদেশ থেকেও শত শত মুজাহিদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে জেহাদে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমদের জেহাদী যুদ্ধ ইংরেজী শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। মুসলমানেরা কেন এভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদে শাহাদাতের সুধাপানের জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছিল তা অনুসন্ধানের জন্য হান্টার সাহেবকে রচনা করতে হয়েছিল একটি তথ্যপূর্ণ প্রমাণ্য গ্রন্থ যার শিরোনাম হল 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস'। এই গ্রন্থটি আজকের প্রজন্ম যদি পাঠ করত তাহলে বুঝতে পারত রাজ্যহারা হয়ে মুসলমানরা কত বড় বিপর্যয়ের কবলে পড়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল কথিত শূকর ও গরুর চর্বিমাখা এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ। এই কার্তুজ রাইফেলে লোড করার আগে দাঁত দিয়ে ভাঙতে হত, তা মুসলমান ও হিন্দু উভয় ধর্মানুসারী সৈনিকদের কাছে ছিল ধর্মচ্যুত হওয়ার শামিল। আর এর ফলেই বিদ্রোহ অগ্নি স্ফুলিংগের মত বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। যুগান্তর ও অনুশীলন দলের সন্ত্রাসী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল জনগণকে এড়িয়ে চলে জনে জনে চক্রান্ত করে ব্যক্তি হত্যার পথে ব্রিটিশদের প্রতিরোধ করা। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদে বিশ্বাসী 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' দলের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো হিন্দু জাত্যাভিমানী তরুণ-তরুণীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীভূক্ত হতে হলে মন্দিরে গিয়ে কালীমূর্তির সামনে রক্তশপথ করতে হত। হিন্দুদের এই কালী নারী হলেও ছিল শক্তির আধার। কমরেড মুজাফফর আহমদ প্রথম জীবনে সন্ত্রাসবাদে আকৃষ্ট হলেও যেহেতু তিনি ছিলেন মুসলমান তার পক্ষে কালীমন্দিরে গিয়ে রক্তশপথ করা অসম্ভব ছিল। তাই তিনি সন্ত্রাসবাদীদের দর্শনে আস্থা রাখতে পারেননি। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশক নাগাদ স্তিমিত হয়ে পড়ে। সুচতুর ব্রিটিশরা এই সব সন্ত্রাসবাদীদের কারাগারে উদারভাবে মার্কসবাদী সাহিত্য ও দর্শন পাঠের সুযোগ করে দেয়। ফলে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর এরা অনেকেই কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হন ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রথম যৌবনে যে হিংস্র ও অন্ধমতাদর্শ তাদের মগজ ও মেধাকে আকীর্ণ করে ফেলেছিল তা থেকে তারা কখনই ষোলআনা মুক্ত হতে পারিনি। এ কারণেই এদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতেও হিন্দু কমরেড ও মুসলিম কমরেড অভিধাটি প্রচলিত ছিল। পুরাতন আদর্শগত অবস্থানের ধারাবাহিকতায় ভারতে চারু মজুমদারের মতাদর্শে বিশ্বাসী একদল কমিউনিস্ট বিদ্রোহীর উদ্ভব ঘটেছিল, যারা প্রকারান্তরে সন্ত্রাসবাদী যুগের কৌশলকেই ধারণ ও লালন করত। এই ভুল কৌশলই তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর দমন ও পীড়নের মুখে অসহায় করে ফেলে। নকশালপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলন পথ হারিয়ে ফেলে।

১৯৭০ সালে মওলানা ভাসানী একবার বলেছিলেন, 'হিন্দু কমিউনিস্টরা' তার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে ধ্বংস করতে চাইছে। সেদিন মওলানা ভাসানীর এই উক্তির তাৎপর্য অনেকেই উপলব্ধি করেনি। তিনি যে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' দলের ভ্রান্ত মতাদর্শের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন তা বোধ হয় পেছনের দিকে তাকিয়েও আজ বলা যায়। সময়ের দিক থেকে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত করা সম্ভব হয়নি। মওলানা ভাসানী বারবার আকুতি প্রকাশ করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে গিয়ে সত্যিকার স্বাধীনতার স্পৃহায় মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করতে, কিন্তু তাকে তা করতে দেয়া হয়নি। সুদূর দেরাদুনে তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। শুধু মাত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রচারের জন্যই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মত তাঁর শরণাপন্ন হতো। মওলানা ভাসানী এতে মর্মাহত হয়েছিলেন, কিন্তু এমনকিছু করেননি যাতে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মরণপণ সংগ্রামের প্রত্যয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কলিকাতায় এসে প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীর বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে ও প্রবাসী সরকারকে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেননি। দেশ ছেড়ে যাবার আগে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, জাপানীদের হাতে সুভাষ

www.pathagar.com

বসুর যে পরিণতি হয়েছে তাঁরও সেই পরিণতি ঘটতে পারে। মুক্তিযোদ্ধাদের চরম দুর্ভাগ্যে যে তারা সেদিন মওলানা ভাসানীর মত একজন অশীতিপর বৃদ্ধ জননেতার সাহায্য ও পথ নির্দেশ থেকে ভারতের কূটচক্রান্তে বঞ্চিত হয়েছিল। যে শিশু জন্মের পর মাতৃদুগ্ধ পায় না সে শিশুর মেধা ও মনের যেমন সুষ্ঠু বিকাশ হয় না, তেমনি আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাও মওলানা ভাসানীর মাতৃস্তন্যরূপী মটিভিশনের সুধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এই বঞ্চনা আমাদের জাতীয় রাজনীতিকে স্বাভাবিক বিকাশের পথে অগ্রসর হতে দেয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে উজ্জীবনী সংগীতের নামে যে সব সংগীত প্রচারিত হত তার একটি দৃষ্টান্তই আমাদের বক্ষমান আলোচনার জন্য যথেষ্ট। এমন একটি সংগীত হলো "বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খৃষ্টান, বাংলার মুসলমান"। এই গানটিতে আদর্শ পুরুষ হিসেবে বিবেকানন্দ ও সুভাষ বসুর কথা উল্লেখ আছে। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের অন্যতম পুরোধা বিবেকানন্দ কিভাবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের আদর্শ পুরুষ হতে পারেন? পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট পন্ডিত সুপ্রকাশ রায় তার 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ' গ্রন্থে এই বিবেকানন্দকে একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। অপর দিকে সুভাষ বসু তার আদর্শ নিষ্ঠা ও অসাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিলেন জাপানী সরমবাদীদের সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন দেখে, তদুপরি তিনি ছিলেন অখণ্ড ভারতের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা। স্বাধীন বাংলাদেশ ও অখণ্ড ভারত প্রচণ্ডভাবে বিপরীতমুখী রাজনৈতিক প্রবণতার প্রকাশ। '৭১-এর যুদ্ধের পর আমরা দেখলাম লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন মুক্তিযোদ্ধারা ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত। বাংলাদেশের উদ্ভবের পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনের ব্যালটবাক্স হাইজাকের ঘটনা ঘটে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসের আখড়ায় পরিণত হয়। শুধুমাত্র একটি আগ্নেয়াস্ত্র কবজা করতে পারলেই জীবনের মোক্ষ লাভ হবে এমন ভাবনা অনেক যুবককেই দারুণভাবে আকৃষ্ট করলো। অস্ত্রের একটি মোহিনী ক্ষমতা আছে– যে ব্যক্তি একটি অস্ত্র হাতে পায় তার যদি কোন জীবনাদর্শ না থাকে তাহলে সে নিজেকে সর্বেশ্বর ভাবতে শুরু করে। এরকম আদর্শহীন তরুণদের যখন তখন নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে ভাড়া খাটানো যায়। এদেশের যে সব রাজনীতিক জনমত গঠনের কঠিন ও কঠোর সাধনার পথটিকে এড়িয়ে সহজে ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চান তাদের জন্য এরকম আদর্শহীন, লক্ষ্যহীন তরুণরা হয় এক সহজ ও সরল শিকারের বস্তু। তরুণদের এই পথভ্রষ্টতা উপলব্ধি করেই চিত্র পরিচালক মরহুম খান আতাউর রহমান 'আবার তোরা মানুষ হ' চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন। যারা এই ছবিটি দেখেছেন তারা খুব সহজেই বুঝবেন বাংলাদেশ উত্তরকালে কিভাবে অনেক তরুণ পথভ্রষ্ট হয়ে সন্ত্রাসের অন্ধকার জগতে পা বাড়িয়েছে। তরুণ সমাজকে এই অন্ধকারের বিবর থেকে উদ্ধার করতে হলে চাই আদর্শবাদিতা, নৈতিকতা ও সততার উদ্বোধন। আজ তাই জাতির জন্য প্রয়োজন এমন এক দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব যা জাতিকে দেবে নতুন দীক্ষা।

আফতাব আহমাদ :

১৯৭১ যেমন আমাদের গৌরবের ও মহত্তম অর্জনের, তেমনি একই সঙ্গে এ ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের এমন এক সন্ধিক্ষণ যেখানে আদর্শ, নেতৃত্ব ও সংগঠনের চাইতে ব্যক্তির ব্যক্তিবাদ, পরনির্ভর শক্তির দাপট এবং যুক্তির চাইতে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেয়ায় সিদ্ধ হয়ে ওঠা। ভারতীয়রা আমাদের কোমলপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধাদের বার বার বোঝাতে চেয়েছে সীমান্ত অতিক্রম করে যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তারাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক আর দেশের অভ্যন্তরে যে সাড়ে ছয় কোটি অসহায় ও আত্মসুরক্ষাবঞ্চিত জনসাধারণ ছিল তারা হচ্ছে দালাল। জাতিকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এ ছিল

www.pathagar.com

এক ভারতীয় কূটচক্রান্ত। এই ধারাবাহিকতা আজও দেশের অভ্যন্তরে বিরাজমান ভারতীয় পঞ্চম বাহিনী অব্যাহত রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির নামে দেশ ও জাতিকে বিভক্ত করে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য ও অস্ত্রের উদার চোরাচালান অধঃপতিত তরুণদের নব্য মুক্তিযোদ্ধার অভিধা দান করেছে। ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বরিশাল– এসব অঞ্চলে যে সব সন্ত্রাসী গডফাদার অস্ত্রের দাপটে মনুষ্যত্ব বিবর্জিত আচরণ করে চলেছে, বলাই বাহুল্য এর পেছনে গডফাদারদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলই শুধু যুক্ত নয়, ভারতীয় মাদক ও অস্ত্র ব্যবসায়ী এবং গোয়েন্দা সংস্থা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। দেশব্যাপী বোমাবাজির যেসব ঘটনা আওয়ামী শাসনামলে ঘটেছে তার কোনটারই কোন সুষ্ঠু তদন্ত সম্পন্ন করা হয়নি। উল্টো উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে আমাদের নিরীহ ধর্মপ্রাণ আলেম-ওলামাদের ওপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এসবই করা হয়েছে মৌলবাদ দমনের নামে। সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদের মতে বোমাবাজির প্রত্যেক ঘটনায় যে ধরনের বিস্ফোরকের ব্যবহার হয়েছে তা কেবল একটি দক্ষ বাহিনীর হাতে থাকাই সম্ভব। আওয়ামী লীগের তৎকালীন বরখাস্তকৃত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম স্বয়ং একথা স্বীকার করেছেন। প্রকারান্তরে তিনি ভারতের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। অতএব, বুঝাই যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সন্ত্রাসের উৎস দেশের অভ্যন্তরে নয়, দেশের বাইরে। তবে তরুণ সমাজের মনস্তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত রূপান্তর ঘটাতে পারলে এই অতিরাষ্ট্রিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ব্যূহ রচনা করা সম্ভব হবে। ঐ পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে প্রয়োজন সম্মিলিত সামাজিক উদ্যোগ। আর বর্তমানের জন্য প্রয়োজন সন্ত্রাসী গডফাদারদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন ও দয়ামায়াহীন নিশ্ছিদ্র অভিযান। গডফাদার উপদ্রুত এলাকাসমূহে ঝটিকা অভিযান উপর্যুপরি অব্যাহত রাখতে হবে। সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ তৈরী না করে কোন অবস্থাতেই তড়িঘড়ি নির্বাচন করা চলবে না। জনসাধারণ এ ধরনের প্রহসনমূলক নির্বাচনকে মেনে নেবে না। আওয়ামী লীগের হম্বিতম্বিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভড়কে গেলে চলবে না। তাদের প্রতিটি সুষ্ঠু ও সাহসী পদক্ষেপের প্রতি এদেশবাসীর রয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন।

www.pathagar.com

৩০ আগস্ট ২০০১

আমাদের সকল সীমান্তে আগ্রাসন

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্ব কী করে আরও সুসংহত করা যায়, সেটাই হওয়া উচিত জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ প্রতিটি রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর এই মুহূর্তে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ১৯৭১-এ ভারতীয় হস্তক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ একটি প্রতিবন্ধী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। গত তিরিশ বছর ধরে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়াতে গিয়ে বাংলাদেশকে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পথ পরিক্রমণ করতে হয়েছে। আজও আমরা বাংলাদেশকে এটি যথার্থ সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রুশ-ভারত অক্ষের বন্ধন থেকে তুলনামূলক সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই সার্বভৌমত্ব অর্জনের পথে ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর ছিল একটি মাইলফলক। ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের পথ ধরে বাংলাদেশ তার সার্বভৌমত্বকে অংশত সুসংহত করতে সক্ষম হয়। একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মুল রক্ষাকবচ হলো সেই রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী। '৭৫-এর নভেম্বর অভ্যুত্থানের আগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ছিল অত্যন্ত অবহেলিত। '৭২-৭৫ সময়কালীন আওয়ামী সরকারের নিরাপত্তার জন্য দলীয় মতাদর্শে রক্ষীবাহিনীকে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং এই বাহিনী সেনাবাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি করে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য অর্জন করে। সেনাবাহিনী থাকে অবহেলিত।

নভেম্বর বিপ্লব সেনাবাহিনীর মর্যাদা, অস্ত্রবল ও সংখ্যাগত শক্তি অর্জনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর মধ্যে মার্জ করা হয়। সেদিনকার এই বিশেষ সিদ্ধান্তটি সেনাবাহিনীর দেশরক্ষার প্রত্যয়ে দুর্বলতার বীজ বপন করে। কালের প্রবাহে এই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এমনিতেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান প্রত্যাগত সৈনিকদের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ গোড়া থেকেই ছিল। রক্ষী বাহিনীর উপাদান সংযোজিত হয়ে এই বিরোধ একটি ত্রিমুখী বিরোধে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে এরকম নানামুখী প্রবণতার অবসান যতদিন না হচ্ছে, ততদিন আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী জাতীয় সেনাবাহিনী একটি অবিচ্ছেদ্য প্রাণবন্ত সত্তায় পরিণত হবেনা। আশার কথা এই যে, সেনাবাহিনী থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান প্রত্যাগতরা অবসর গ্রহণসহ নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। সেনাবাহিনী এখন উত্তরোত্তরভাবে বাংলাদেশের জাতীয় সামরিক প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহে প্রশিক্ষিত সৈনিক ও অফিসারদের সমন্বয়ে বিকশিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের এই অফিসার ও সৈনিকরা অনেক বেশি পেশামন্য এবং দক্ষ। এই সদ্য প্রজন্মের অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ যতবেশি দেশপ্রেম ও সৈনিকোচিত গুণাবলীতে উদ্বুদ্ধ হবে, রাষ্ট্রের প্রতিবন্ধী অবস্থার ততোই অবসান ঘটতে শুরু করবে। মনে রাখতে হবে, মোটিভেশন একটি সেনাবাহিনীর অফুরন্ত শক্তির উৎস। এই মোটিভেশনে কোনো প্রকার ভ্রান্ত ও জাতিবিরোধী চিন্তাভাবনার অনুপ্রবেশ এর মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে। ইদানীংকালে আমরা লক্ষ্য করছি, সেনাবাহিনী ও সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্ট যেসব প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট সেনাবাহিনীকে উন্নততর স্বদেশ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার কথা, সেসব

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বক্তৃতা ও সেমিনার উপস্থাপনার জন্য এমন সব ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করা হয় যারা রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা আদৌ অনুভব করে না। সিভিল সমাজের এইসব ডেভিল প্রতিনিধিরা সর্বত্রই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই এবং সেনাবাহিনীর জন্য রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ হ্রাস করার প্রেসক্রিপশন দেন। অথচ তারা ভুলে যান, পার্শ্ববর্তী আণবিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র ভারত বাংলাদেশের তুলনায় জিডিপির হিস্যা হিসেবে সামরিক খাতে অনেক বেশি বরাদ্দ করে। ভারত বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য কতো বড় হুমকি হতে পারে, তাতো আমরা দেখতে পেলাম সম্প্রতি বড়াইবাড়ি সীমান্তে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত যুদ্ধের ঘটনায়। এই যুদ্ধে তিনজন বিডিআরের সৈনিক শাহাদতবরণ ও চারজন বিডিআর সৈনিকের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় হাসিনা সরকারের নতজানু আচরণ আমাদের সেনাবাহিনীর মনোবলের ওপর প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিহত ও আহত বিডিআর সৈনিকদের বিডিআর পদক ও প্রেসিডেন্ট পদক প্রদান করে তাদের হৃত মনোবল পুনরুদ্ধারে যে ভূমিকা রেখেছে, তা প্রশংসনীয় হলেও আমাদের প্রত্যাশা ষোল আনা পূরণ করেনি। আমাদের দাবী ছিল, বিডিআর সৈনিকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বীরশ্রেষ্ঠ পদক দান। এক কথায় বলা যায়, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে চিন্তা-ভাবনার সুসামঞ্জস্যের অভাব ঘটলে এর সবচেয়ে বড় বলি হয় দেশের সার্বভৌমত্ব। হাসিনা সরকারের আমলে এই ঘটনাটিই ঘটেছিল। আমাদের সেনাবাহিনীর দৃঢ় প্রতিরোধ না থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহারের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির দাবীর কাছে হাসিনা সরকার যে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতো– তাও বোধ হয় এখন নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আফতাব আহমাদ :

একটি দেশের সার্বভৌমত্বের অবস্থান কোথায়, সে বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও পণ্ডিতজন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন । সাদামাটা কথায় সকলে একবাক্যে বলে থাকেন, জনগণই সার্বভৌমত্ব। আবার, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের চর্চা যেদিন থেকে শুরু হয়, তখন থেকে আইন প্রণয়নের সংস্থা সংসদকেই সার্বভৌম বলে অনেকে সাব্যস্ত করেছেন। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে অলিখিত সংবিধান থাকার কারণে ব্রিটিশ সংসদ যে ধরনের সার্বভৌম অস্তিত্ব অর্জন করেছে, তা পৃথিবীর কোথাও বিরাজ করে না। লিখিত সংবিধান দ্বারা শাসিত দেশসমূহে অনেক পণ্ডিত বলার চেষ্টা করেন সংবিধানই সার্বভৌম। কারণ, এটি জনগণের সম্মিলিত অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি ও সংরক্ষণের গ্যারান্টি। একটি দেশ তার রীতিনীতি, তার মূল্যবোধ, তার ধর্মবিশ্বাস, তার জীবনাচার, তার সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সর্বজন স্বীকৃত প্রতীক এবং গর্বের ও গৌরবের প্রতিষ্ঠান ও পূরাকীর্তি, তার ধর্মবিশ্বাস নিঃসৃত আচরণবাদ, তার নান্দনিক স্পর্শকাতর অনুভূতি, এককথায় তার কৃষ্টির পরিমণ্ডল যদি আপন সত্তায়, আপন মহিমায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে বিকশিত হতে না পারে, তাহলে সার্বভৌম সত্তা অর্জনের প্রধান প্রণোদনা হিসেবে রাষ্ট্র গঠনের যে তাগিদ একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনুভূত হয়, তা অর্থহীন হয়ে যায়। আধুনিককালে রাষ্ট্রের বিষয়টি যেমন জটিল, তেমনি সার্বভৌমত্বের প্রত্যয় ও প্রপঞ্চটিও ততোধিক অনুভব করা যায়। সোশ্যাল সাইকী এবং ন্যাশনাল সাইকী অঙ্গীভূত হয়ে মানুষকে যে স্বাধীন সত্তা দান করে, তাই তাকে সার্বভৌমত্বও দান করে। কিন্তু যে মুহূর্তে মানুষ সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়, সেই মুহূর্ত থেকে সার্বভৌমত্বের নানা মাত্রা রাষ্ট্র কাঠামো এবং রাষ্ট্রের নানা অঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, কিন্তু এ অবস্থায়ও পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে পানির অণু-পরমাণুর মত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থেকে একক সত্তা হিসেবে বিরাজ করে। ভ্লাদিমির লেনিন সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে

www.pathagar.com

বলেছেন, আধুনিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অবস্থান করে সেনাবাহিনীর হৃদপিণ্ডে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, এমনকি ভারত লেনিনের এই ব্যাখ্যার বাইরে নয়। বস্তুত সার্বভৌমত্বের বিষয়টি জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জাতীয় নিরাপত্তা বলতে কেবল সামাজিক নিরাপত্তা ও সীমান্তের প্রতিরক্ষাকেই বোঝায় না। আজকের আলোচনায় জাতীয় নিরাপত্তার অন্যান্য মাত্রার দিকে নজর দেয়ার পরিবর্তে আমি বিশেষভাবে কৃষ্টিক ও সামাজিক মাত্রার দিকে নজর দিতে চাই। আমাদের যদি কৃষ্টিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য না-ই থেকে থাকে তাহলে যাদের সঙ্গে আমাদের মিল আছে, তাদের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া উচিত অথবা তাদের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি নিশ্চিত, সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যে জনগোষ্ঠী একটি পৃথক জাতি হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং রাষ্ট্র গঠন করেছে, সেই জনগোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যের সকল মাত্রা নিশ্চয়ই চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং তা সংরক্ষণ করতেও বদ্ধপরিকর। আর এ কারণেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে যদি নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন প্রমাণ করতে হয়, তাহলে বাংলাদেশের ভেতরে সযত্নে একটি পঞ্চম বাহিনী লালন করা যে কোন আগ্রাসী শক্তির জন্য অপরিহার্য। যুগপৎভাবে কৃষ্টি ও সমাজ জীবনে অন্তর্ঘাতমূলক ও নাশকতামূলক তৎপরতাকে উৎসাহ প্রদান করাও অপরিহার্য।

১৯৪৭ থেকে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী ব্রিটিশ-ভারতের বিভাজনকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়নি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় প্রচার মাধ্যম, ভারতীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বারংবার এপার বাংলা-ওপার বাংলা বলে বাংলাদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার এবং ভারতমুখী করে তোলার বহু প্রয়াস চালিয়েছে। ১৯৭১ -এ বাংলাদেশের মানুষ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই প্রচারের জবাব দিয়েছে। ওপার ভারত, এপার বাংলাদেশ। দুই বাংলা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। দুই জার্মানী দু'টি পৃথক রাষ্ট্র ছিল এবং ইতিহাসের অতীত প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা নিয়ে ঐক্যের যে প্রণোদনা ডয়েশ ভাষাভাষী জার্মান জনগণের মধ্যে সব সময় কাজ করত, সেটিই জার্মানীর একত্রীকরণের মুল ভিত্তি। একই কথা প্রযোজ্য ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে এবং একই কথা প্রযোজ্য ইয়েমেনের ক্ষেত্রে। ভবিষ্যতেও একই কথা প্রযোজ্য হবে দুই কোরিয়ার ক্ষেত্রে। ভারতের বাংলা ভাষাভাষী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় ইউনিয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, পৃথক রাষ্ট্র নয়। এটি ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত। ভারতের এই রাঢ়াঞ্চলের বাংলা ভাষীদের মধ্যে পৃথক জাতিসত্তা ও পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চেতনার উন্মেষ কখনোই ঘটেনি এবং ভবিষ্যতে পৃথক হওয়ার বা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করার চেতনার স্ফূরণ ঘটেছে, এমন কোন দৃশ্যমান প্রমাণ নেই। রবীন্দ্র পুরস্কারের বিভূষিত সন্তোষ কুমার ঘোষ বাংলাদেশ সফর করে গিয়ে ১৯৭২ -এ আনন্দ বাজারে রবিবাসরীয়তে একটি প্রবন্ধ ফেঁদে বলেছিলেন, "প্রতিদিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে প্রার্থনা করি, প্রভু আরও যেন বেশী করে ভারতীয় হতে পারি।" পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু লণ্ডনের এক বাংলাভাষী পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছিলেন, 'আগামী ৫শ' বছরেও দুই বাংলা এক হবার নয়'। একই সঙ্গে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এও ঘোষণা দেন, Independent State of West Bengal-No" অর্থাৎ স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র? না। তাহলে বুঝতে হবে, এপার বাংলা-ওপার বাংলা বলে রাঢ়াঞ্চলে এবং আমাদের দেশের ভেতরে যারা অতীব তৎপর তারা মতলববাজ।

বাংলা ভাষীদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র তো গঠন হয়েই গেছে। রাঢ়াঞ্চলের বাংলা ভাষীদের কোনদিন চৈতন্য হলে এবং ভারতীয় ইউনিয়নের মোহ কেটে গেলে যদি আমাদের পতাকাতলে আসতে চায়, সেই সুযোগ দানের কথা বাংলাদেশীগণ যথাসময়ে বিবেচনা করে দেখতে পারে। তবে বলাই বাহুল্য বাংলাদেশের জনগণ গণভোট ব্যতিরেকে এ ধরনের সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই উপনীত হবে না। ভারতের শাসক গোষ্ঠী ভারতীয়

www.pathagar.com

ইউনিয়নের ঐক্য ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একদিকে দেশের ভেতরে কী ধরনের চণ্ডনীতি অনুসরণ করছে, তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুক্তিকামী নিপীড়িত জনতার ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে উপলব্ধি করা যায়। পাশাপাশি কাশ্মীরে যে গণহত্যা চলছে এবং শিখদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে যে নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় দমন করা হয়েছে তাতে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বে আতঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত। তারা বাংলাদেশকে একটি ফেইলড স্টেট প্রমাণ করে পঞ্চম বাহিনীর সাহায্যে ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গীভূত করার এক সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কৃষ্টিক ও সামাজিক আগ্রাসন চালাচ্ছে। কোন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন, নববর্ষে কুকুর, বিড়াল, ব্যাঙের মুখোশ এবং কালীর টোপর ধারণ করে গত কয়েক বছর ধরে যে বর্ণাঢ্য মিছিল বের করা হয়, সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীতের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রকে স্পর্শ করে প্রণতি নিবেদন, দেশের সমৃদ্ধ সঙ্গীত ঐতিহ্যকে লালন করার পরিবর্তে জেলায় জেলায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে রবীন্দ্র পূজা উৎসবের প্রবর্তন, মুসলিমবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের প্রেরণাদাতা বিবেকানন্দের ভজনসহ অপরাপর কর্মকাণ্ড যেভাবে জবরদস্তিমুলকভাবে এ দেশে চালু করার চেষ্টা হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য একটিই– আমাদের কৃষ্টিক স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যকে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের নিগড়ে আবদ্ধ করা। এর পাশাপাশি আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার যা আমাদের গরিষ্ঠ জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, তাকে অস্বীকার করে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ইসলামকে পশ্চাৎপদতা ও কূপমণ্ডুকতার জীবন দর্শন হিসেবে চিহ্নিত করার হীন অপপ্রয়াস মারমুখীভাবে অব্যাহত রাখা হয়েছে। ভারতীয় অর্থানুকূল্যে বহু এনজিও বাঙালী সংস্কৃতি উৎসবের নামে পুর্ণিমা উৎসব, অমাবশ্যা উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের সামাজিক মুল্যবোধ ও পারিবারিক সীমান্তে হানা দিয়ে চলেছে। নারী, নির্যাতনের অন্যতম প্রতিষ্ঠান গণসাহায্য সংস্থা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ধর্মীয় ও সামাজিক মুল্যবোধকে উৎপাটন করার জন্য এবং আমাদের সুসংহত পরিবারগুলোকে উচ্ছৃংখল ও অনাচারী করে তোলার জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিশেষ করে নারী স্বাধীনতার নামে আগ্রাসী যৌনাচারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ধর্মীয় মহামিলনের নামে ধর্মকে অস্বীকার করে হিন্দু-মুসলমান পাত্র-পাত্রীর দাম্পত্য বন্ধন দীর্ঘদিন ধরে উৎসাহিত করে যে প্রজন্মের জন্ম দেয়া হয়েছে, এই প্রজন্ম নিজেই উপলব্ধি করেছে যে, তারা বাংলাদেশের মত একটি সহিষ্ণু ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রেও সামাজিক বোঝায় পরিণত হয়েছে। আর তাই তারা দ্বিগুণ উৎসহে প্যারিবারিক বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করে ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করে ধর্ম ও পরিবারের নৈতিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করছে। এভাবে আমাদের পারিবারিক সীমান্ত তথা সামাজিক সীমান্ত মুছে ফেলার চক্রান্ত অব্যাহত থাকলে সার্বভৌমত্বকে লুপ্ত করার জন্য খুব বেশী কাঠখড় পোড়াতে হবে না। এই অন্তর্ঘাতমুলক ও নাশকতামূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে আমাদেরকে এখনই অর্থবহ সম্মিলিত সামাজিক ও কৃষ্টিক আন্দোলন গড়ে তুলে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

মাহবুব উল্লাহ :

আমাদের ভূখণ্ডগত সীমান্ত, সাংস্কৃতিক সীমান্ত, সামাজিক ও পারিবারিক সীমান্ত আজ যে আগ্রাসনের শিখার, তা কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। অনেকে বলেন, বিশ্বায়নের এই যুগে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংরক্ষনের কথা বলা অনেকটা বিপরীত স্রোতে দাঁড় বাইবার মতো। ম্যাকলুহান ১৯৬২ সালে পৃথিবীকে একটি গ্রামের সঙ্গে তুলনা করে গ্লোবাল ভিলেজ প্রপঞ্চটি চালু করেছিলেন। ৬০ দশকের প্রথম দিকে আমাদের এই পৃথিবী এখন যত ছোট হয়ে এসেছে, ততটা ছোট ছিল না। সেই সময়েই ম্যাকলুহান গ্লোবাল ভিলেজের কথা বলেছিলেন। ম্যাকলুহান ছিলেন গনযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ। আজকের

www.pathagar.com

পৃথিবীতে ইন্টারনেট, ই-মেইল ও সেলুলার ফোনের কল্যাণে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যোগাযোগ অনায়াসে করা সম্ভব হচ্ছে। যোগাযোগের এই সুবিধা ইন্টারনেট চ্যাটের মতো কালচারের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আমাদের এই ঢাকা শহরে সম্প্রতি বেশ কিছু বৈবাহিক সম্পর্কের সূচনাক্ষেত্র ইন্টারনেট চ্যাট। ঢাকা শহরে ডজনখানেক সাইবার ক্যাফে রয়েছে। এই সাইবার ক্যাফেগুলো কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের বিশেষ আকর্ষণ। যারা সাইবার ক্যাফে স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন, তারা যেমন এটাকে একটা এন্টারপ্রাইজ ও আত্মকর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে দেখেন, ঠিক তেমনি একথাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে, সাইবার ক্যাফেগুলো ভালো ও মন্দ উভয়বিধ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেট যোগাযোগ যেমন আমাদের অফুরন্ত তথ্য ভাণ্ডারের সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছে, ঠিক তেমনি মুনাফালোভী কিছু ইন্টারনেট ব্যবসায়ী ইন্টটারনেটকে পর্ণোগ্রাফি বিপননের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে চুটিয়ে ব্যবসা করছে। এর ফলে আমাদের তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীরা অপসংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে যে তথ্য ভাণ্ডারের কথা আমরা বলছি, সেই তথ্য ভাণ্ডারও অনেক বিভ্রান্তির জন্ম দিচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর চিন্তাভাবনা কোমলমতি কিশোর-কিশোরীদের মনোজগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ফলে, আমাদের সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো নতুন এক আগ্রাসনের শিকার, যে আগ্রাসনের উৎস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিশ্বের সকল প্রান্তে। একথাও অস্বীকার করা যাবে না, বিশ্বায়ন যে বাজার ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের উদ্ভব ঘটিয়েছে, সেই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নতুন সংগ্রাম গড়ে তোলার হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি। সিয়াটল ও ইটালীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ধনবাদী পশ্চিমা বিশ্বের শাসকমহল তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন জারি রাখার জন্য তাদের নিজস্ব মডেলে যে বিশ্বায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে যে রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই। এক কথায় বলা যায়, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি এমন একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটিয়েছে যে প্রক্রিয়া যুগপৎভাবে আগ্রাসনবাদ ও আগ্রাসন বিরোধিতাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত আগ্রাসনবাদই এই দ্বন্দ্বের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমাদের অবশ্যই তথ্য প্রযুক্তির এই দ্বান্দ্বিক চরিত্র উপলব্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, তথ্য প্রযুক্তিকে আত্মস্থ না করে এবং এর ওপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না করে আমরা কখনো আমাদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে শংকামুক্ত করতে সক্ষম হবে না। বাংলাদেশের জন্য একটি বাড়তি বিপদ হল ব্যাপক সংখ্যক ভারতীয় টিভি চ্যানেলের সাংস্কৃতিক ও প্রপাগাণ্ডা আগ্রাসন। পৃথিবীর সকল দেশে আমাদের জাতীয় কণ্ঠধ্বনি পৌঁছে দেয়া সম্ভব এমন কোনো টিভি চ্যানেল আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। এদশের কিছু বাংলা টিভি চ্যানেল চালু আছে, যেগুলো সীমান্তের ওপার থেকে আর্থিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা পায়। এখন পর্যন্ত এমন কোনো দেশীয় উদ্যোক্তা এক্ষেত্রে এগিয়ে আসেননি এরকম একটি টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যে চ্যানেল একদিকে যেমন দেশের মানুষকে দেবে সুস্থ বিনোদনের খোরাক, অন্যদিকে তাদেরকে আলোকিত করবে দেশপ্রেম এবং শিকড়মুখী মুল্যবোধে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি আজ যে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন সেখানে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বকীয়তাবিরোধী যে কোনো টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করাই হবে যথার্থ। আমরা জানি, ভুয়া যুক্তিকে সঠিক যুক্তির তরবারির আঘাতেই নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব। যতদিন সঠিক যুক্তিগুলো মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার সামর্থ্য আমরা অর্জন করতে না পারব ততদিন অবশ্যই এই নিষেধাজ্ঞা জারি রাখা জাতীয় স্বার্থের বিচারেই সঠিক বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। প্রযুক্তির অতি দ্রুত উন্নত হচ্ছে। স্যাটেলাইটকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে যে জমজমাট প্রচার

www.pathagar.com

ব্যবসা আগামীতে ডালপালা বিস্তার করবে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নিজস্ব শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ তার অভ্যূদয়ের তিরিশ বছরের মধ্যে জিওপলিটিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসতে চলেছে। বাংলাদেশের সীমান্তের অদূরেই রয়েছে উদীয়মান পরাশক্তি গণচীন। আর বাংলাদেশের সীমান্তকে ঘেঁষে আছে অপর আঞ্চলিক শক্তিধর ভারত। এই দুই শক্তির মধ্যে আগামী ২০ বছরে গণচীন যদি তার বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে, তাহলে সে সকল ক্ষেত্রেই ভারতকে তো অতিক্রম করবেই এমনকি কিছু পশ্চিমা শক্তিরও সমপর্যায়ে চলে আসবে। বাংলাদেশের মাটির নিচে গ্যাসসহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাই বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে যুগপৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও গণচীনের কাছে। এসব বড় বড় শক্তিধরদের নিজস্ব জাতীয় এজেণ্ডা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তের অপর পাড়ে অবস্থিত ভারতের জাতীয় এজেন্ডা বাংলাদেশের জন্য নানা কারণে ও নানা বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কি প্রতিরক্ষা, কি সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, কি সামাজিক ও পারিবারিক সীমান্তে আগ্রাসন এবং আকাশ আগ্রাসন– সবদিক বিবেচনা করলে বাংলাদেশকে এমন একটি নীতি-কৌশল গ্রহণ করতে হবে, যা একদিকে যেমন হবে বাংলাদেশের আশু ও সুদূরপ্রসারী স্বার্থের অনুকূল, অপরদিকে হবে হাঙর ও কুমিরের মাঝ দিয়ে অতি সন্তর্পণ সন্তরণের সঙ্গে তুলনীয়। যে নেতৃত্ব বাংলাদেশকে এই পথের সন্ধান দিতে পারবে, সেই নেতৃত্বই হবে বাংলাদেশের সময়ের চাহিদা মেটাতে সর্বোত্তম নেতৃত্ব।

আফতাব আহমাদ :

নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেক দলই এদেশে তথ্যপ্রযুক্তিকে উৎসাহিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে। কেউ কেউ এই প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে যে, পৃথক আই টি পল্লী স্থাপন করা হবে। আমরা শুনেছি, বেশ কিছু ভারতীয় কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান এদেশে গোয়েন্দাবৃত্তিতে লিপ্ত। জনশ্রুতি আছে এগুলো ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW এর একটি বাণিজ্যিক আউট ফিট। জনমনে এসব সন্দেহ দূর করার জন্য রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে দিয়ে তদন্ত অনুষ্ঠান করতে হবে। এমনিতেই আইটি সেক্টরে ভারতের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশেই প্রবল। কাজেই ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিতব্য আই টি পল্লীর বিষয়ে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে এবং সাবভার্সন করতে পারে, এমন কোনো প্রতিষ্ঠানকে কোনো ধরনের আনুকূল্য বা সুযোগ দেয়া যাবে না। মুক্তবাজার অর্থনীতির ট্যারিফ ওয়াল নামিয়ে দিয়ে যেভাবে ভারতীয় পণ্যকে বাংলাদেশের বাজার সয়লাব করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে তা কালবিলম্ব না করে রোধ করা অত্যাবশ্যক। ফ্রেশ নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে রেসিপ্রোসিটির ভিত্তিতে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য চলাচলে ট্যারিফ ওয়ালের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পণ্য চলাচল ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক হতে পারে না এবং ভারতীয় বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধে উচ্চ ও কঠোর ট্যারিফ ওয়াল ও নন ট্যারিফ বাধা কোনো অবস্থাতেই জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। একটি রাষ্ট্র শক্তির অবস্থান থেকে জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকল্পে তখনই দ্বিপাক্ষিক কিংবা বহুপাক্ষিক নেগোসিয়েশনে দর কষাকষি করতে পারে, যদি সে রাষ্ট্র দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হয় এবং রাষ্ট্রটির স্বার্থকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রশিক্ষিত জনবলসহ উপযুক্ত সমরভাণ্ডার সমৃদ্ধ একটি কার্যকর সেনাবাহিনী থাকে। যারা সেনাবাহিনী তুলে দেয়ার কথা বলে, তারা হয় দেশদ্রোহী মতলববাজ, অথবা নিরেট মূর্খ। স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে BISS আয়োজিত এক সেমিনারে সামরিক শাসক এরশাদের প্রথম অর্থমন্ত্রী ও মার্কিন নাগরিক আবুল মা'ল আবুল

www.pathagar.com

মুহিত বিকেন্দ্রীকরণের নামে পরোক্ষে রাষ্ট্রের লিকুইডেশনের (বিলুপ্তি) ওকালতি করেছিলেন। এবং একই সঙ্গে সেনাবাহিনী তুলে দেয়ার পক্ষে খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন। মূর্খের মতো তিনি এও বলার চেষ্টা করেছেন যে, সুইটজারল্যাণ্ডের মতো একটি সমৃদ্ধশালী দেশে সেনাবাহিনী নেই। ঐ সেমিনারে মুহিত সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করে আমি তাঁর প্রতিটি বক্তব্য খণ্ডন করে বলেছিলাম, তিনি জানেন না যে সুইটজারল্যাণ্ডে শুধু সেনাবাহিনী আছে, তা নয়, তার আয়তন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাইতে কমপক্ষে দশ গুণ এবং অত্যাধুনিক মিসাইলসহ সবরকমের অস্ত্রের দ্বারাই ঐ সেনাবাহিনী সজ্জিত। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল শাহেদ আনাম খান আমার বক্তব্যের সমর্থনে ডিফেন্স জার্নাল থেকে যথোপযুক্ত তথ্যাদি তুলে ধরেন। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের মধ্যে যে ভূ-রণনৈতিক অবস্থানে রয়েছে, তাকে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের জাতীয় নেতৃত্বকে আগামী দিনের উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে আগ্রহ এই অঞ্চলের প্রতি রয়েছে, চীনের সঙ্গে আমাদের যে ঐতিহাসিক সৌহার্দ রয়েছে এ দুটি বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে মালয়েশিয়া, জাপান ও কোরিয়ার সঙ্গে অধিকতর অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলে একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থান যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে কোনো আগ্রাসী শক্তি ও আধিপত্যকামী রাষ্ট্র আমাদের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিকে ঠেকাতে পারবে না, আমাদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

www.pathagar.com

৬ সেপ্টেম্বর ২০০১

নির্বাচন ও সন্ত্রাসের সহ সম্পর্ক

মাহবুব উল্লাহ :

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি যাঁরা প্রবলভাবে আস্থাবান, তাঁরা মনে করেন, বাংলাদেশে যদি পরপর কয়েকটি সংসদীয় নির্বাচন হয়ে যায়, তাহলে আমাদের সমাজ ও রাজনীতিতে যেসব অস্থিরতা বিরাজ করছে, তার অবসান ঘটবে, দেশে একটি স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দেশ তার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। ১৯৯১ পূর্ববর্তী পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় না রেখেও যদি আমরা ১৯৯১ থেকে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনগুলোর প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন তো হয়নি বরং ক্রমাবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে। ১৯৯১-এর নির্বাচন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক কোন কাভার ছিল না। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সহমতই ছিল এই সরকারের ক্ষমতার উৎস। বিএনপি সরকারের আমলে মাগুরার উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে, তারই পরিণতিতে ১৯৯৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ষষ্ঠ সংসদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধি সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ত্রয়োদশ সংশোধনীর আলোকে গঠিত বিচারপতি হাবীবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬-এর সপ্তম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তম সংসদ নির্বাচনের পর ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে।

মোদ্দাকথায়, এবারের নির্বাচন নিয়ে মোট তিনটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ১৯৯১ থেকে অনুষ্ঠিত দু'টি সংসদ নির্বাচন এবং পহেলা অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা কী? একের পর এক নির্বাচন হচ্ছে বটে, কিন্তু অস্ত্র ও পেশীশক্তির দাপট বল্গাহীনভাবে বেড়েই চলেছে। বিচারপতি লতিফুর রহমান নিজেই স্বীকার করেছেন, দেশে আড়াই লাখ বেআইনী অস্ত্র রয়েছে। এসব অস্ত্রের মধ্যে এলএমজি, এসএমজি, একে-৪৭ এবং এম-১৬ রাইফেলের মতো মারাত্মক অস্ত্রও রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মুখপাত্ররা বলেছেন, সকল অস্ত্র নির্বাচনের আগে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তবে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব, যার ফলে বেআইনী অস্ত্রগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। একের পর এক যতই সংসদীয় নির্বাচন হচ্ছে, কালো টাকার মালিকারা অধিক হারে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। রাজনীতি যাদের পেশা ও মিশন, তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। লক্ষ্য করার মতো বিষয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশের সেবা খাত যার মধ্যে ব্যবসা খাতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জাতীয় অর্থনীতিতে সেই খাতের মূল্য সংযোজন ৫০ শতাংশের মতো। অর্থনীতির এই কাঠামোগত রূপান্তরের ফলে রাজনীতিতেও তার প্রতিফলন ঘটবে, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ব্যবসায়ীরা রাজনীতির ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করবেন, এতে তেমন কোন অস্বাভাবিকতা নেই। তবে প্রশ্ন হলো, নির্বাচনের মনোনয়নের প্রাক মুহূর্তে দলবিশেষের তহবিলে কোটি টাকার চাঁদা দিয়ে নমিনেশন কেনা-বেচার বিষয়টি আমরা কিভাবে নেব? এইসব মনোনয়ন

www.pathagar.com

ক্রেতা যে দলের নমিনেশন পাচ্ছেন, সে দলের মতাদর্শের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস তাদের কতটুকু আছে, সেসব পরখ করার কোন সুযোগ থাকছে না। দলের তহবিলে তা কেউ যদি কোটি টাকা চাঁদা দেয় তা দোষের কিছু নয়। তবে এই টাকার উৎস কী এবং দলীয় তহবিলে কিভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে, তা জনগণের জানার অধিকার আছে। সপ্তম সংসদের নির্বাচনের সময়ও কতিপয় প্রার্থী রাতারাতি দলবদল করে বিএনপিতে যোগ দিয়েছিল। এদের কারও যোগ্যতা অর্থবল, আবার কারও যোগ্যতা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকা। এরকম দু'জন প্রার্থী ডাঃ আলাউদ্দীন ও হাসিবুর রহমান স্বপন। পরবর্তীতে ১৮০ ডিগ্রী ডিগবাজি দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারে যোগ দিয়ে এঁরা মন্ত্রিপদ হাসিল করেন। সে সময় সংবাদপত্রের পাতায় আমরা দেখেছি, ৫০ জনের মতো বিএনপি এমপি আওয়ামী লীগে যোগদান করার জন্য গোপন যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন, আরও চমক আছে। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া এই সময়ে সউদী আরবে ওমরাহ পালনের জন্য দেশের বাইরে ছিলেন। দেশের বাইরে থাকা অবস্থায় এই চমক সৃষ্টির আলামতের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে দলীয় এমপিদের আনুগত্য পরিবর্তন ঠেকাতে আগাম পদত্যাগপত্র আদায় করে নেয়ার কৌশল গ্রহণ করে বিএনপি নেতৃত্ব। আগাম পদত্যাগপত্র আদায়ের উদ্যোগ বিএনপি দলীয় অনেক সংসদ সদস্যকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তাদের কেউ কেউ এই সিদ্ধান্তে অপমানিত বোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোটি টাকার প্রজেক্ট হাত ছাড়া হয়ে গেল, এই মনোবেদনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিএনপিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। দলবদলের ঘটনা আর না ঘটলেও আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে দলের প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রচণ্ডভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

একটি রাজনৈতিকদল সংসদ নির্বাচনের জন্য কাদের মনোনীত করবে, সেটা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা করেন, তাদের কাছে মনোনয়ন প্রদানে দলীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরও অবাক হই যখন দেখি দলের জন্মলগ্ন থেকে যারা দলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা যখন দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে দলবদল করে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে চলে যান। এর জঘন্যতম দৃষ্টান্ত হল জনাব মাহবুবুল আলম তারার আওয়ামী লীগে যোগদান করে 'বঙ্গবন্ধু'র আদর্শ বাস্তবায়নের ঘোষণা প্রদান। জনাব তারা ছাত্রজীবন থেকে আওয়ামী বিরোধী রাজনীতির শিবিরে অবস্থান করেছেন, সেই তারাই আজ 'শ্রীমতির শ্রীচরণে' ঠাঁই নিয়েছেন। রাজনৈতিক পতিতাবৃত্তির এটি এক নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমাদের সমাজ বুদ্ধিবৃত্তিক পতিতাবৃত্তি, রাজনৈতিক পতিতাবৃত্তি, সামাজিক পতিতাবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক পতিতাবৃত্তির অনাচারে অন্ধকারের অতল গর্ভে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। কেবলমাত্র একটি সামাজিক শুদ্ধি আন্দোলনই আমাদের সমাজকে এই পতন থেকে উদ্ধার করতে পারে। যাঁরা মনে করেন, নিছক কয়েকটি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে নির্বাচন তার গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়ায় সকল কিছুকে স্বাভাবিকতার পথে নিয়ে আসবে, তাদের সঙ্গে আমি কোনভাবেই একমত হতে পারি না। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি আছে বলে যারা মনে করেন, তাদের সঙ্গেও আমি একমত হতে পারি না। সিভিল সোসাইটি নামে যে পরিমণ্ডলগুলো আমাদের সমাজে বিদ্যামন সেই তথাকথিত সিভিল সোসাইটি নিছক রাজনৈতিক লেজুড়ে বৃত্তিতে জড়িত। সমাজকে পরিশুদ্ধ করা, সমাজে শ্রেয় বোধ ফিরিয়ে আনা, রাজনীতিতে নীতিবোধ প্রতিষ্ঠা করা, সময়ের তাগিদে উচিত বাক্যটি উচ্চারণ করা– এসব দেশ ও সমাজ গঠনমূলক কাজে এই তথাকথিত সিভিল সোসাইটির প্রচণ্ড অনীহা। আমাদের সমাজে এখনও অনেক মানুষ আছে, যারা অন্তরে অন্তরে সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক ভ্রষ্টাচারে বিরক্ত, কিন্তু মুখ ফুটে এসব ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চান না। যদি তারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতেন তাহলে আমাদের সমাজ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, নীতিহীনতা, অযাচার,

www.pathagar.com

অনাচার ও ভ্রষ্টাচারের অন্ধগলি থেকে সদর রাজপথে ফিরে আসতে পারত। কবি বলেছেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/ তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে"। অন্যায় করা যেমনি পাপ, অন্যায় সহ্য করা ততোধিক পাপ। যারা চুপ করে আছেন, অন্তরে অন্তর্জ্বালা পোষণ করে যন্ত্রণা চেপে আছেন, তারা অচিরেই মুখ খুলবেন, এটাই আশা করি। এই প্রত্যাশ্যা কেবলমাত্র সিভিল সমাজের সম্ভাব্য সদস্যদের কাছেই নয়, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ত্যাগী আদর্শবাদী ও নিষ্ঠাবান সদস্যের প্রতিও। নির্বাচনী মনোনয়নকে ঘিরে যে ঝড় উঠেছে, সে ঝড় রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃত্বকেও একটু আত্মসন্দর্শনের অবকাশ দেবে, সেটাও প্রত্যাশ্যা করব। অন্যথায় গণতন্ত্রের নামে নির্বাচন আদৌ ফলদায়ক হবে না।

আফতাব আহ্‌মাদ :

১৯৯১-৯৬ এবং আসন্ন নির্বাচনের মতো উপর্যুপরি আরও গোটা চারেক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এদেশে গণতন্ত্র তার শেকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করতে পারবে বলে দাতাগোষ্ঠীসহ এদেশীয় অনেকেই যে ধারণা পোষণ করে, তার সঙ্গে একমত হওয়ারও কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। নির্বাচন এ দেশে নতুন হচ্ছে না। সেই ১৯৩৭ থেকে এ দেশের মানুষ নির্বাচন দেখে আসছে। উপনিবেশবাদের পরও নির্বাচনতো আমরা কম দেখলাম না। প্রায় সব নির্বাচনেই দেখা গেছে, দল ও প্রার্থীগণ শঠতা, প্রতারণা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আশ্রয় নিয়ে চটকদার বুলি কপচিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার এক নোংরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দল এবং প্রার্থীগণের মধ্যে যতটুকু নৈতিকতা ও আদর্শবাদিতা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, তা আজ নেই বললেই চলে। ১৯৭২ -এর সংবিধান রচনার মধ্যদিয়ে আমাদের গণতান্ত্রিক যাত্রা শুরু হয়েছে বলে অনেকে দাবী করে। এই সংবিধান কতটুকু মানুষের সত্যিকারের আশা-আকাঙক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছে, মানুষের হৃদয় কন্দরের অভিপ্রায় কতটুকু এই সংবিধানে অভিব্যক্ত হয়েছে তা শত সহস্র কোটি মূল্যমানের এক প্রশ্ন। এ সংবিধানটি একটি ভারসাম্যহীন গোঁজামিলের সংবিধান। রাষ্ট্রীয় মুলনীতি থেকে শুরু করে সর্বত্র একটি কোটারির চিন্তা-ভাবনা এবং সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় আরোপিত নানা বিধি-বিধান এই সংবিধানে স্থান করে নিয়েছে। এরপরও যদি ভাবতে হয় যে, এই সংবিধান আমাদের জনসাধারণের সমষ্টিগত গরিষ্ঠ চেতনার ধারক ও বাহক, তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের চিন্তার মূলে মৌলিক কোনো গোলমাল রয়ে গেছে। যে সংবিধানে এক ব্যক্তির একক ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কার্যত সবকিছুর নিয়ন্তা ও নিয়ামক হিসেবে ক্ষমতাবান করে তুলেছে, সেই সংবিধান মর্মের দিক থেকে নিঃসন্দেহে স্বৈরতান্ত্রিক। প্রেসিডেন্টের একটি পদ রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু তিনি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর হাতের ক্রীড়নক। ক্ষমতার পৃথকায়ন কোনোভাবেই এ সংবিধান নিশ্চিত করা হয়নি। বিচার বিভাগের কথা বাদই দিলাম, আইন প্রণেতা যখন নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব সম্পাদনের সুযোগ পান, তখন স্বাভাবিকভাবেই আইনসভা নির্বাহী বিভাগের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। সংসদীয় গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এ ব্যবস্থা এ দেশে চালু করার হলেও সংসদীয় গণতন্ত্রের কোনো রীতি-নীতি ও কনভেনশন প্রতিপালন করতে ক্ষমতাসীন দলকে দেখা যায়নি। আমাদের দেশের নির্বাচনমুখী দলগুলো মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিনির্ভর দল– এ দলগুলোতে না আছে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা, না এ দলগুলোর শাখাসমূহ নির্বাচন তল্লাট কেন্দ্রিক। নির্বাচনী তল্লাটের তোয়াক্কা না করে নানা ধরনের শাখা কমিটির জন্ম দিয়ে জনতুষ্টিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন স্তরে অসংখ্য শাখা কমিটির জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেয়া সত্যিই কঠিন। জনসাধারণের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, তল্লাটের উন্নয়ন সংক্রান্ত অগ্রাধিকার ভিত্তিক চাহিদার সঙ্গে একাত্ম হয়ে কোনো দলের কোনো নেতাকেই বা

www.pathagar.com

প্রতিনিধিকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে আমরা দেখিনি। যেসব দেশে গণতন্ত্র দৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সেসব দেশ থেকে আমরা কোনো শিক্ষা নিতে চাই না। আমরা কেবল চটকদার ও আকর্ষনীয় নানা প্রতিষ্ঠানের লেবেল আহরণ করে তার প্যারোডি হিসেবে এখানে সেগুলো প্রসাধনী চর্চিত গড়ে তুলতে চাই। এ হচ্ছে গণতন্ত্রায়নের সঙ্গে চরম পরিহাস ও জনসাধারণের সঙ্গে চরম শঠতা। আমাদের আইনসভা মূলত একটি ক্লাব মাত্র, যেখানে একে অপরের বিরুদ্ধে বাক্যবান ছুঁড়ে মারে। আমাদের আইনসভায় জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণী নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে প্রাণবন্ত বিশ্লেষণাত্মক ও পর্যালোচনামূলক কোনো বিতর্ক বা আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় না। আমাদের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী আমরা কার্যত জনপ্রতিনিধির পরিবর্তে দল-প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকি। কারণ আমাদের সংবিধান ও সংসদ কার্যপ্রণালী বিধিমোতাবেক নির্বাচনী তল্লাটের জনসাধারণের অভিপ্রায়কে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে দলের নামে দল প্রধানের নির্দেশকে দাসানুদাসের মতো প্রতিপালন করাটাকেই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সংসদীয় দল যত না সংসদ নিয়ে বিচলিত, তার চাইতে ভেড়ার পালের মতো সকলে যাতে আচরন করে সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান।

১৯৭৩-এর ভোট ডাকাতির নির্বাচনের মধ্যদিয়ে বাহ্যিক ও প্রসাধনী যে গণতন্ত্র এখানে চালু করার চেষ্টা হয়েছিল, তারও মৃত্যু-পথযাত্রা শুরু হয়। সংবিধানের কুখ্যাত দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে দেশকে স্বৈরশাসনের নিগড়ে আবদ্ধ করা হয়। আর, চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মৌল কাঠামো পাল্টে, খোল-নলচে বদলে সর্বময় ক্ষমতা ব্যক্তি শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেয়া হয় এবং সর্বগ্রাসী একটি একদলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন বাংলাদেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। দ্বাদশ সংশোধনীর নামে পুনরায় তথাকথিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে যে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে, তা কার্যত ১৯৭২ -এর এক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারী শাসনের পুনঃ প্রবর্তন মাত্র। মাঝখানে এরশাদের শাসনামলে নির্বাচনের নামে আমরা অনেক রঙ্গ-তামাশা দেখেছি। ঐসব নির্বাচনে জনসাধারণের অংশগ্রহণ কিংবা গণতন্ত্রের লেশমাত্র ছিল না। আজ নির্বাচনের নামে যারা বিভিন্ন দলের কলকাঠি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, এরা হয় টাকাওয়ালা, তা সাদাই হোক আর কালোই হোক– না হয় দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উচ্ছিষ্টভোগী আমলারা। দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের কাজ হচ্ছে, দলীয় ব্যক্তি-নেতৃত্বের মহিমা কীর্তন করে এসব নষ্ট জীবদের গণপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য মেহনত করা।

আমরা যখন গণতন্ত্রের জন্য দাবী উত্থাপন করি, তখন সুস্পষ্টভাবে একটি কথা আমরা বলে দিতে চাই যে, রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে শাসন ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য আনতে হবে। প্রত্যেক মন্ত্রিকে জনপ্রিতিনিধিদের তথা সংসদে আস্থা ভোটে জয়ী হতে হবে। তবে এখানে আমাদের একটি কঠিন শর্ত আরোপ করা উচিত। প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার মনোনীত প্রত্যেক মন্ত্রীকেও আস্থা ভোটে জয়ী হতে হবে এবং সংসদ চাইলে পৃথকভাবে যে কোনো মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা স্থাপন করে তাকে বিদায় দিতে পারবেন। ফ্রান্সসহ ইউরোপের বহু দেশে এই বিধান চালু আছে এবং সেসব দেশের জনসাধারণ এর সুফলও ভোগ করছেন। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল না রেখে সুনির্দিষ্টভাবে ভারসাম্যের ভিত্তিতে পর্যাপ্তভাবে বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রদূত থেকে শুরু করে যেসব সাংবিধানিক পদে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দিয়ে থাকেন, সেসবের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের মনোনীত প্যানেল থেকে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ প্রেসিডেন্ট যাতে সেসব নিয়োগ দিতে পারেন, সেই বিধি-বিধান প্রবর্তন করা হলে দলীয়করণ ও দলবাজির প্রবণতা হ্রাস পেতে বাধ্য। আমাদের দেশে ব্রিটিশ মডেলে স্পীকার নির্বাচিত হবেন ভাবাটা অচিন্ত্যনীয়। তাই স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার সংসদের বাইরে নির্দলীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্বাচন করার বিধি-বিধান প্রবর্তন করা যেতে পারে। নির্বাচনের সময়ে প্রত্যেক প্রার্থীকে

www.pathagar.com

আয়, ট্যাক্স রিটার্ণ ও সম্পত্তির হিসাব নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদনপত্রের সাথে বাধ্যতামুলকভাবে জমা দেয়ার বিধান প্রবর্তন করা হলে নির্বাচনে সুস্থতা ও স্বচ্ছতা অনেকাংশে অর্জন করা সম্ভব হবে। একই সাথে এ বিষয়ে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় যারা নেবেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর দণ্ডের বিধান চালু করা হলে অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা নিরুৎসাহিত হবে। জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে কোনোভাবে উপেক্ষা না করে সশস্ত্র বাহিনীর মেধা ও প্রজ্ঞাকে সমন্বিত করে পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষানীতির স্বার্থে একটি শক্তিশালী জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠনও অত্যাবশ্যক। এ ছাড়া আরও বহু বিষয় আছে, যেমন– ব্যুরো অব অ্যান্টিকরাপশন, ন্যায়পাল ইত্যাদি। এসবকে সাংবিধানিক আওতায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দান করে একটি ভারসাম্যমূলক দুর্নীতিমুক্ত সুশাসনকে নিশ্চিত করা সম্ভব। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামো সাংবিধানিকভাবে নির্মিত হওয়া উচিত এবং কোনো স্থানীয় সংস্থাকে বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রে এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের খেয়ালখুশির ওপর ছেড়ে না দিয়ে বিষয়টি প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে ন্যস্ত করা উচিত। কোনো ধরনের অনিয়ম ঘটলে এবং তা প্রমাণিত হলে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা থাকা উচিত, তা বিলুপ্ত করে দিয়ে সরাসরি প্রেসিডেন্টের শাসন জারি করার। বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে জাতীয় বিতর্কের মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ স্বীয় পদে বহাল থেকে সংসদ নির্বাচন করাটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ ও গণতন্ত্র বিকাশের পরিপন্থী। অনুরূপভাবে সংসদ সদস্যগণের স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী নিয়ে মাথা ঘামানো ও হস্তক্ষেপ করাও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। এসব কিছুকে সামগ্রিক বিবেচনায় নিয়ে আমরা একটি অর্থবহ, কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি। রাজনৈতিক নষ্টামির এ দুঃসময়ে যারাই সুস্থ ও শ্রেয় চিন্তা করেন তাদের উচিত হবে, পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। সিভিল সোসাইটির নামে দলমন্য যেসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠী দলীয় ও বহিঃরাষ্ট্রীয় এজেন্সীসমূহের খুদকুঁড়ো খেয়ে একতরফা হুক্কাহুয়া করছে, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের মুখোশটি ও ভিন্ন ভিন্ন করে এক্সপোজড করে দেয়া উচিত।

মাহবুব উল্লাহ :

ড. আফতাব যেসব রাজনৈতিক সংস্কারের প্রস্তাব করেছেন, সেসব সংস্কার সাধনের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই সংবিধানের সংশোধনী প্রয়োজন হবে। সংবিধানের সংশোধন সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এরকম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কোনো একটি দল অর্জন করতে পারে অথবা ১৯৯১ সালে যে রাজনৈতিক সহমতের ভিত্তিতে একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়েছিল, সে রকম রাজনৈতিক সহমতের মাধ্যমেও অর্জন করা সম্ভব। গভীর বিশ্লেষণে একথা বলা অবাস্তব হবে না যে, বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ দুটি সম্ভাবনার কোনোটিই বিরাজ করছে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুপ্রীম কোর্টের একটি রায়কে ভিত্তি করে বিচার বিভাগকে আপেক্ষিকভাবে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করার যে সাধু উদ্যোগ নিয়েছে, তা বাস্তবায়িত হলে ড. আফতাব যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, তা কিয়দংশে প্রতিষ্ঠিত হবে বৈকি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উদ্যোগে সকল মহলের সমর্থন ও সহযোগিতা দাবী করে। সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে আমরা আরো জানতে পেরেছি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতির ওপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নৌবাহিনীর ফ্রিগেট ক্রয়, বিমানবাহিনীর জন্য মিগ-২৯ ক্রয়, বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং সরকারের শেষ মুহূর্তে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের অধীনে কতিপয় প্রকল্প গ্রহণে যে সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হলে জনগণ জানতে পারবে,

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে বিগত সরকার কী মারাত্মকভাবে ফোকলা করে গেছে। বিগত সরকারের দুর্নীতির ফর্দ কেবলমাত্র উপরোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, পাঠ্যপুস্তক ছাপানো, শেয়ার মার্কেটের কারচুপি, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় প্লট বরাদ্দ এবং ন্যাম সম্মেলনের জন্য নির্মিত ফ্লাট বরাদ্দে অনিয়মসহ জাতীয় জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি হয়নি। সুতরাং জনগণের অর্থ ও সম্পদ নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে, তা জনগণের জানার অধিকার আছে। আমি জানি ত্ত্বাবধায়ক সরকার এ ধরনের কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়ন করলে তা তত্ত্বাবধায় সরকারের দায়িত্বের আওতাভুক্ত নয় বলে আওয়ামী লীগ ভয়ানক শোরগোল সৃ করবে। কারণ তা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ভাগ্যকেও বিপর্যস্ত করবে। আমি অবাক হবো না, এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচন বর্জনেও হুমকি দিয়ে বসে। আওয়ামী লীগ পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিল, ক্ষমতায় থাকার সময়ে আওয়ামী লীগ বিএনপির উচ্চতম নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা রুজু করেছিল। এসব মামলা বর্তমানে বিচারাধীন। সুতরাং দুর্নীতির প্রশ্নে বিএনপির স্বরূপ উদঘাটন আওয়ামী লীগ করতে সক্ষম হয়েছে। এখন স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নে আওয়ামী লীগের স্বরূপ উদঘাটনের ব্যাপারটি আসবে। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে একটি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চাই, তা হলে প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিগত সরকারের দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপের শ্বেতপত্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। আগামী পাঁচ বছর পর যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসবে, সে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূর্ববর্তী সরকার যদি বিএনপিরও হয় তাহলে সে সরকার যদি দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ করে, ভবিষ্যতে তারও শ্বেতপত্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থা যদি একটি কনভেনশনে পরিণত হয়, তা হলে আমাদের সমাজ থেকে দুর্নীতির করাল ছায়া অপসৃত হতে বাধ্য।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন এবার যে নির্বাচন হতে চলেছে, তাও ইতোমধ্যেই নানা সমালোচনা ও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও বিতর্কিত করে তোলা হয়েছে। ভবিষ্যতে নির্বাচন কীভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু করা যায়, সে বিষয়ে এখন থেকে সবাইকে ভাবতে হবে। নির্বাচন ঘনিয়ে এলে সংবিধান, গণতন্ত্র ও জনসাধারণের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর এবং প্রার্থীগণের প্রীতি ও ভালবাসা উথলে ওঠে। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এদের চেহারা এক রকম, ক্ষমতা থেকে বিদায়ের পর এদের চেহারা ভিন্নরূপ ধারণ করে। ক্ষমতার বাইরে থাকলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট, বিশেষ করে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোকে সোচ্চার হতে দেখা যায়, কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে এ বিষয়ে অর্থবহ নীরবতা পালন করে অস্বচ্ছ পথে অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী পদক্ষেপ নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আবার নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় নেমে দাতাগোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক মুরুব্বীদের অনুগ্রহ ও কৃপা লাভ করার জন্য এ বিষয়গুলোকে এড়িয়ে গিয়ে এসব সম্পর্কে দ্ব্যর্থবোধক ও অর্থহীন বক্তব্য উচ্চারণের পাশাপাশি কেবল প্রতিপক্ষের নিন্দাবাদ করাটাকেই তারা নির্বাচনী প্রচারের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয়। আসুন, আমরা সম্মিলিত ভাবে এই ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই এবং সকল দলে ঘাপটি মেরে থাকা দুষ্ট চক্রটির মুখোশ উন্মোচন করি।

www.pathagar.com

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০১

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ও শিক্ষা ব্যবস্থার সিস্টেম লস

মাহবুব উল্লাহ

গত ৬ সেপ্টেম্বর উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ফলাফল থেকে দেখা যায়, পাসের হার ঢাকা বোর্ডে ৩৪.৭৪%, যশোর বোর্ডে ৩৪.৬৩%, রাজশাহী বোর্ডে ২০.৮৯%, কুমিল্লা বোর্ডে ১৪.৫৬%, চট্টগ্রাম বোর্ডে ২৩.৪১%, সিলেট বোর্ডে ২৭.৪৯% ও বরিশাল বোর্ডে ১৮.৮৫%। সমগ্র বাংলাদেশের একত্রিত ফলাফলে ৭৪% পরীক্ষার্থী অকৃতাকার্য হয়েছে। বাংলাদেশ সিস্টেম লসের দেশ, এদেশের বিদ্যুৎ বিতরণে সিস্টেম লস হয়। পানি সরবরাহে সিস্টেম লস হয়। সিস্টেম লস হয় গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থায়। শিক্ষা ব্যবস্থাতেও যে বিশাল হারে সিস্টেম লস হয় তারই জ্বলন্ত প্রমাণ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। এদেশের সম্পদের অপচয়ের পরিমাণ বিশাল। পরীক্ষার্থী ছাত্র ছাত্রীদের কৃতকার্য হতে না পারাটাও সম্পদের অপচয়েরই একটি বিশেষ দিক মাত্র। মনে রাখা দরকার যেসব পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে তারা দু'বছর কলেজে পড়াশোনা করেছে, তাদের অভিভাবকরা তাদের জন্য ভর্তি পরীক্ষা ফি, ভর্তি ফি, টিউশন ফি, পাঠ্যপুস্তক, খাতা-কলম ক্রয় এবং সর্বোপরি প্রাইভেট টিউটরের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। রাষ্ট্র ও সমাজ তাদের শিক্ষকদের বেতন ও ভাতার বোঝা বহন করেছে। কলেজে ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য চলতি ব্যয়সহ বিভিন্ন ব্যয় রাষ্ট্র ও সমাজকেই বহন করতে হয়েছে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জীবনে দুটি মুল্যবান বছরও ব্যয় করেছে। সবকিছুর পর দেখা গেল, পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৭৪ ভাগই অকৃতকার্য অর্থাৎ এই ৭৪ ভাগ ছাত্রছাত্রীর জন্য যে পরিমাণ স্থির ও চলতি পুঁজির ব্যয় হয়েছে তা আদৌ ফলদায়ক হয়নি।

আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিরাট গলদ হল, এই শিক্ষা ব্যবস্থা তরুন শিক্ষার্থীদের কর্মবিমুখ করে তোলে। কৃষকের সন্তান শিক্ষার্থীরা সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রায়শঃ তাদের পিতা-মাতাকে কৃষি কাজে সহায়তা দিতে লজ্জাবোধ করে। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থাও তাদের অবদান থেকে বঞ্চিত হয়।

সমগ্র দেশের শিক্ষা প্রশাসনের জন্যও সরকারকে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়। যে দেশে একটি মাত্র শিক্ষাবোর্ড ছিল, সে দেশে এখন ৭টি শিক্ষা বোর্ড। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে থানা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার দেখভাল করার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা বিশাল। কিন্তু এ থেকে যে কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না তাতো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয় থেকেই বোঝা যায়।

এদেশের তরুণ ও যুবক সমাজ নানাভাবে, নানাপথে বিপথগামী হচ্ছে। মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস তরুণ ও যুবক সমাজের মধ্যে কর্কট ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছে। স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে তরুণ সমাজের একটি অংশ এই সব সামাজিক ব্যাধি থেকে দুরে থেকে সময় কাটানোর সুযোগ পায়। কিন্তু যারা অকৃতকার্য হল, তারা না পারবে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হতে, না পারবে তাদের ব্যর্থতার গ্লানিকে ঢাকতে, ফলে এদের মধ্যে অনেকেই যে সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বে তা সুনিশ্চিত। সুতরাং পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ব্যাপারটি একটি ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা। আমাদের দেশে যারা রাজনীতি করেন, নির্বাচনে জয়লাভ করে যারা প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের সদস্য পদ

www.pathagar.com

অলংকৃত করেন, তারা এই সমস্যার ভয়াবহতা উপলব্ধি করেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। দেশের শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার মান, শিক্ষকদের মান ও যোগ্যতার প্রশ্নটি এই সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসব ব্যাপারে সুচিন্তিত নীতিগত সিদ্ধান্ত ও কর্ম কৌশল গ্রহণ করতে না পারলে জাতি যে প্রবল গতিতে মহাবিপর্যয়ের দিকে বাধিত হচ্ছে তা কোন ক্রমেই রোধ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং কালবিলম্ব না করে এই বিপর্যয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আফতাব আহ্মাদ :

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এর আগেও আমরা বহুবার আলোচনা করেছি। গতবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কেও আমরা আমাদের সুচিন্তিত মত তুলে ধরেছি। কিন্তু মনে হয় আমাদের নীতি নির্ধারকগণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী গোষ্ঠী এ বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টিপাত করার সময় করে উঠতে পারেননি। একথা সর্বজনবিদিত যে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। যথোপযুক্ত শিক্ষায় যদি আমাদের সন্তানদের আমরা শিক্ষিত করে তুলতে না পারি তাহলে দেশে যোগ্য নাগরিক গড়ে উঠবে না। নাগরিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য প্রতিপালনের জনবল অনুপস্থিত থাকবে। আমাদেরকে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির ও জাতিগঠনের কাজের জন্য বিদেশমুখী হয়ে থাকতে হবে এবং দাতাগোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জাতীয় স্বার্থের তোয়াক্কা না করে দেশের সম্পদ ব্যবহারের নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ, তা যত দ্রুত আমার উপলব্ধি করব ততই মঙ্গল।

আজকাল কথায় কথায় এবং দেয়াল লিখন লিখতে দেখতে পাই, 'শিক্ষা একটি অধিকার'। এটি একটি জনতুষ্টিবাদী বা Populist শ্লোগান। শিক্ষা অধিকার এই অর্থে যে, কোন ব্যক্তি নিরক্ষর থাকবে না এবং মুদ্রিত যে কোন পত্র-পত্রিকা বা পুস্তিকা পাঠ করে তার মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের অবশ্যই রয়েছে গুরু দায়িত্ব। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এবং মোটাদাগে জীবন জগতে ও জাতীয় বিষয়াবলী যাতে সম্যকভাবে প্রত্যেক নাগরিক বুঝতে সক্ষম হয় তার ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে সমাজের তথা সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন রাষ্ট্রের অবশ্যই করা উচিত। নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় না নিয়ে একে অপরকে টেক্কা দেয়ার জন্য কোন কোন রাজনৈতিক দল বলছে, মেয়েদের এইচএসসি পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দেয়া হবে। অন্য আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী দল আরেক কাঠি এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা দিয়েছে, ঐ দলটি ক্ষমতায় গেলে ব্যাচেলর ডিগ্রী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এসবই অপরিণামদর্শী চিন্তার ফসল, জনগণের সামনে উচ্চারিত কিছু চটকদারী বুলি ও জন্তুষ্টিবাদী বক্তব্য। বাস্তবতা হচ্ছে, এই বাংলাদেশের মত দেশের পক্ষে এর কোনটাই সম্ভব নয়। জার্মানীতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করতেও কোন জার্মান নাগরিকের কিম্বা বৃত্তিপ্রাপ্ত ও অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোন খরচ করতে হয় না। এছাড়া কি শিল্পোন্নত দেশ, কি উন্নয়নশীল দেশ– সব রাষ্ট্রের বেলাতেই নাগরিকদের শিক্ষালাভের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। আমাদের দেশে একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, মেধা ও যোগ্যতা থাক বা না থাক সর্বোচ্চ মার্স্টার্স ডিগ্রী অর্জন করতেই হবে। এরপরে বেকারদের লাইন যে দীর্ঘায়িত হতে থাকে সে বিষয়ে নজর দেয়ার কেউ প্রয়োজন মনে করে না। এর কারণ একটাই– আমরা একটি অর্থবহ ফলপ্রসূ শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও প্রবর্তনে এখনো সক্ষম হইনি। মেয়েদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার নামে এখনো অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা চালু আছে। পরানুসামষ্টিক ফলাফল জাতি কী পেয়েছে তার কোন মূল্যায়ন এখনো হয়নি। জব মার্কেটে যেখানে বিপুল সংখ্যক বেকার তরুণরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারী শিক্ষার প্রতি ভারসাম্যহীন একপেশে নীতি সামাজিক ও পারস্পরিক

www.pathagar.com

বন্ধনে অবধারিতভাবে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে, তা আমরা ভাবতেই চাই না। আমার মতে, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অর্থাৎ এসএসসি লেভেল পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে প্রত্যেকের অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা লাভ অবশানাল থাকা উচিত। এক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রবর্তন করা যেতে পারে সমাজের পশ্চাদপদতা বিবেচনা করে, তবে যোগ্য ছেলেদের বঞ্চিত করে নয়। এইচএসসি পড়ার সুযোগ যাদের থাকবেনা তাদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায়তনে সহজে প্রবেশের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের করে দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে আমি মনে করি, আকর্ষনীয় বৃত্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত। 'শিক্ষা একটি অধিকার' এই আপ্তবাক্যে যারা বিশ্বাসী এবং এই প্রচারণায় যারা মারমুখী তারা মূলতঃ জাতিধ্বংসী কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। উচ্চ শিক্ষার দ্বার কখনোই সকলের জন্য নির্বিচারে উন্মুক্ত করে দেয়া যায় না, যার মেধা নেই যোগ্যতা নেই, অসন্ধিৎসু মন নেই, জ্ঞানার্জনের প্রতি মর্যাদাবোধ নেই ঐ ধরনের ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী বা উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেওয়া জাতীয় অর্থ ও সম্পদের অপচয় মাত্র। এককালের কমিউনিস্ট বিশ্বসহ পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশসমূহে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হলে মেধা প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে এ সুযোগ লাভ করতে হয়। আমি এইচএসসি পাস করেছি, অতএব আমাকে অনার্স পড়তে হবে এবং তারপর মাস্টার্স ডিগ্রী নিতে হবে– এ হচ্ছে উদ্দেশ্যহীনভাবে শিক্ষাঙ্গনে নিরুদ্দেশ যাত্রা। এ প্রসঙ্গে যারা শিক্ষাদান করেন সেই শিক্ষকদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকেও বিবেচনায় নিয়ে আমাদেরকে শুধু শিক্ষানীতিই নয়, জনসংখ্যা নীতিও পরিকল্পিতভাবে নির্ধারণ করতে হবে। এসএসসি বা এইচএসসিতে সাম্প্রতিককালে ফলাফলের যে বিপর্যয় আমরা লক্ষ্য করছি কিংবা পরীক্ষায় অসদুপায় তথা নকল প্রবণতা যে আমরা লক্ষ্য করছি তা সামাজিক বাস্তবতা বিবর্জিত নয়। প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টারগুলো যেভাবে ব্যাঙের ছাতার মত বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মূলে রয়েছে বিদ্যাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করা। আমি মনে করি, এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের ন্যূনতম মাস্টার্স ডিগ্রী থাকা উচিত। চলে গেছে সেইসব দিন যখন ম্যাট্রিকুলেশন বা কোন রকম ডিগ্রী পাস করে স্কুল শিক্ষকতার পেশায় কেউ ঢুকে পড়তে পারতেন। স্কুল পর্যায়ের শিক্ষকতার ন্যূনতম যোগ্যতা যদি মাস্টার্স ডিগ্রী ধার্য করা হয় তাহলে আপেক্ষিকভাবে মাস্টার্স ডিগ্রীধারীদের মধ্যকার অনেকের বেকারত্বেরও সমাধান হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান এখন আর আগের মত নেই। শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে ভিসির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় এখন যোগ্যতা নির্বিশেষে শিক্ষকের নামে ভোটার নিয়োগ করা হয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতিপক্ষ শিক্ষক গোষ্ঠীর স্নেহভাজন কাউকে সহজে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না, এক্ষেত্রে আরেক ধরনের দুর্নীতি চাপ চলছে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে। নানা কায়দাকানুন ও কৌশল করে বহু অযোগ্য ছাত্র বা ছাত্রকে -- ক্লাস পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা পেছন দরজা দিয়ে কিভাবে করা হয় তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে একটি ওপেনসিক্রেট। ইউজিসির প্রবর্তিত বিধিবিধান অনুযায়ী একজন ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে গেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োগ লাভের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলে, তারপর পদ থাক বা না থাক না ফাঁক-ফোকর দিয়েও সর্বাত্মক তদ্বিরের মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েই যায়। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার হাল যে কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়েও আমি যৎকিঞ্চিৎ ভাবনাচিন্তা করেছি। ফার্স্ট ক্লাস পেলেই কাউকে সরাসরি কোন বিভাগে নিয়োগদান করার বিধান রহিত করা উচিত। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ফার্স্ট ক্লাসপ্রাপ্তগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগে কমপক্ষে দু'বছর রিসার্চ ফেলো হিসেবে যোগ্যতা প্রমাণ করার পর পিএইচডি প্রোগ্রামে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতায় যে চার স্তরের পদ রয়েছে তা পুনর্বিনাস করে ছয় স্তরের

www.pathagar.com

পদে নির্ধারণ করা উচিত। একজন সাফল্যের সঙ্গে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করার পর শিক্ষকতার ক্ষেত্রে যে পদে তার প্রাথমিক নিয়োগ হবে সেই পদটি ইন্সট্রাক্টর নামে অভিহিত হওয়া উচিত এবং পরবর্তী পর্যায়ক্রমে অ্যাডজাঙ্কট লেকচারার, লেকচারার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও প্রফেসর। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া খুবই জরুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে স্বায়ত্তশাসনের নামে যে নৈরাজ্যকর শিক্ষক রাজনীতি চলছে তা বন্ধেরও ব্যবস্থা করা উচিত। ছাত্র-ছাত্রীগণ তাদের নাগরিক অধিকার হিসেবে শিক্ষাঙ্গনের বাইরে যত ইচ্ছা রাজনীতি চর্চা করুক তাতে কারও আপত্তি করার কথা নয়। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে সকল প্রকার ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা উচিত।

মাহবুব উল্লাহ ঃ

ড. আফতাব যা বলেছেন তার সঙ্গে যেমন অনেক ক্ষেত্রেই অনেকে একমত হতে পারবেন না, তেমনি আমিও একমত হতে পারছি না সব বিষয়ে। সমাজের সার্বিক অগ্রগতির জন্য এর অর্ধাংশ নারী সমাজেরও অগ্রগতি প্রয়োজন। এর জন্য নতুন করে যুক্তির অবতারণার প্রয়োজন নেই। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায়, মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় ভাল করছে। জীববিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, মেধা ও কর্মক্ষমতার দিক থেকে নারী-পুরুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নেই। বরং ইংল্যাণ্ডের এক গবেষণায় দেখা গেছে, নারীদের সহনক্ষমতা (Stamina) পুরুষদের চেয়ে বেশী। টমাস কার্লাইল জিনিয়াস বা প্রতিভাবানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, Genius has infinite capacity to take pains. ধৈর্য, স্থৈর্য্য ও সহনের অসীম ক্ষমতা যদি প্রতিভার সংজ্ঞা হয় তাহলে নারীদের মধ্যে প্রতিভাবান নেই একথা কোনক্রমেই বলা যাবে না। আমাদের দেশে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারী সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তাদের এই অনগ্রসরতা দূর করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো দুর করা। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন সমাজের সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগের দ্বার উম্মোচিত করা। বিশেষ সুযোগ, ভর্তুকি কিংবা নেগেটিভ ডিসক্রিমিনেশনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের পার্থক্য ঘোচানো সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না বরং এসব সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নারীদেরকে আমরা সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধী করে ফেলছি। আসলে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন পর্যায় পর্যন্ত সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকবে। উন্নত দেশগুলো ক্ষেত্র বিশেষে অষ্টম শ্রেণী অথবা দশম শ্রেণী পর্যন্ত এই সুযোগ প্রদান করেছে; এর পরবর্তী ধাপে শিক্ষার সুযোগ মেধার উপর নির্ভরশীল। মনে রাখতে হবে, আমাদের সমাজে বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্য আছে। দরিদ্র পিতা-মাতার মেধাবী সন্তান যাতে মেধা থাকা সত্ত্বেও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমর্থন প্রয়োজন। তাতেও যে সমস্যার সমাধান হবে তা বলা যায় না। মেধাবিকাশের জন্য শিশুদের প্রোটিন ঘাটতি দূর করা অপরিহার্য। যে সময় মস্তিষ্কের কোষগুলো বিকশিত হয় সে সময় এদেশের দরিদ্র পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে পারে না– এ কারণে বৈষম্যের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি বহাল থেকে যায়। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সকলের জন্য ন্যূনতম ক্যালরি ও প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না হবে ততদিন পর্যন্ত বৈষম্যের বীজ সর্বতোভাবে উৎপাটন করা সম্ভব হবে না।

একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে দেখলাম, তারা মেয়েদের জন্য ডিগ্রী পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করতে চান। প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার জরুরী সমস্যাগুলো সমাধান না করে মেয়েদের জন্য ডিগ্রী পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি অবিবেচনাপ্রসূত ও নিছক জনতুষ্টিবাদী। অন্যদিকে এই দলটি শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষক সার্ভিস কমিশন গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমাদের দেশে সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন রয়েছে। এই সংস্থা মূলত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও জনবল বাছাই বা সিলেকশন করে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর ধামাধরা ব্যক্তিরা এই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যপদ অলঙ্কৃত করেন। ফলে কমিশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে দলীয় অযোগ্য ব্যক্তিরা প্রশাসনে ঢুকে পড়ার সুযোগ পায়। হাসিনা সরকারের আমলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সটেনশন হিসেবে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করার যে নজির স্থাপিত হয়েছে, তারপর শিক্ষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে কমিশনের অঙ্গীকার করা হয়েছে তাতে ভরসা পাওয়ার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। এই কমিশনের কার্যাবলী সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে তদারক ও স্বচ্ছ করবার বিধিবিধান না থাকলে সেটাও একটি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হবে। এ কারণে যে কোন সার্ভিস কমিশনেই এ ধরনের তদারকি ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসতে হবে।

আমাদের দেশের শিক্ষার মানের যে ধস নেমেছে তা রীতিমত আতঙ্কিত হওয়ার মত। কিছুদিন আগে একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা সচিবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তিনি এখন নিজ গ্রামে সমাজ সেবা বিশেষ করে শিক্ষার উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত আছেন। তিনি জানালেন, তার গ্রামে একটি স্কুলের জন্য বাংলা সাহিত্যে পাঠদানে যোগ্য শিক্ষক পাচ্ছেন না। বাংলা ভাষাভাষী এই দেশের জন্য এর চাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে? সুতরাং শিক্ষার মানে যে ধস নেমেছে তা যে কত মারাত্মক সহজেই অনুমেয়। অতীতে শিক্ষকরা নিয়মিত বেতনভাতা পেতেন না। তাদের বেতনের পরিমাণও ছিল যৎসামান্য। তৎসত্ত্বেও তারা ছাত্রছাত্রীদের যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদানে শৈথিল্য করতেন না। কিন্তু আজ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও শিক্ষকরা পাঠদানের প্রস্তুতিতো দূরের কথা নিয়মিত স্কুলে কিংবা কলেজেও হাজিরা দেন না। শিক্ষকদের নৈতিকতার মানের অবক্ষয় এর অন্যতম কারণ। যে সমাজে নৈতিকতা লোপ পায়, সে সমাজকে রক্ষা করার জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা চালু করা পরিস্থিতির অবনতিরোধ এবং উন্নয়নের একটি অন্যতম উপায়। এজন্য স্থানীয় সরকারকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। গ্রামের স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের জবাবদিহিতার দায়িত্ব গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের উপর ন্যস্ত করতে হবে। স্থানীয় সরকারগুলো সব কাজ নীতিনিষ্ঠতার সঙ্গে করবে একথা যেমন হলফ করে বলা যায় না, আবার অপরদিকে স্থানীয় সরকারের নিম্নতম চৌহদ্দিতে গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারলে কমিউনিটির কমংখ্যক জনগোষ্ঠীর পক্ষে স্থানীয় সরকারের উপরও নিয়মতি তদারকি করা সম্ভব হবে। একটি গ্রামের সদস্যরা চাইবেন না তাদের সন্তানেরা এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাক যেখানে শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নেন না এবং যত্নের সঙ্গে পাঠদান করেন না।

বাংলাদেশের অর্থনীতি অচিরেই এক মহাসঙ্কটের মুখোমুখি হবে। বাংলাদেশের যে মুষ্টিমেয় পণ্য বিদেশের বাজারে রপ্তানী হয় তার বাজার অচিরেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ার আশংকা আছে। পোশাক শিল্প এগুলোর মধ্যে অন্যতম। হিমায়িত চিংড়ির দামও আন্তর্জাতিক বাজারে শতকরা ৫০ ভাগ কমে গেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে নতুন পণ্যের বাজারে প্রবেশ করার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ এরকম একটি পণ্য হতে পারে। একথা বিবেচনায় রেখে প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মানে বৈপ্লবিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রযুক্তি বিদ্যা ও বৃত্তিমুলক শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষ আনয়নের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

আফতাব আহমাদ :

ড. মাহবুব উল্লাহ আমাদের শিক্ষা পরিকাঠামো ও পাঠদানের মর্মবস্তু সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, কোন বিদ্যামনস্ক ব্যক্তিই তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন না। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে যে বিষয়টি উল্লেখ না করলেই নয় তা হচ্ছে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও অছাত্রদের কবলে শিক্ষাঙ্গনের প্রসঙ্গ। অছাত্রদের দাপট ও শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল না করলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়বে। এর জন্য অভিভাবকসহ সমাজ হিতৈষী সকলের একটি সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা অপরিহার্য। স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান প্রবর্তননের কোন বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যে সন্ত্রাস ও অছাত্রদের দাপটের জন্য কঠোরতম আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া আমি মনে করি একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠন করা জরুরী। তবে এ কমিশন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে মনোনীত একটি প্যানেল থেকে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের মাধ্যমে করাটাই হবে সর্বোত্তম। অনুরূপভাবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন, ব্যাংক সার্ভিস কমিশন ও পুলিশ সার্ভিস কমিশন নামে স্বতন্ত্র পৃথক আরও তিনটি সার্ভিস কমিশন গঠন করা অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মকর্তা বাছাইয়ের দায়িত্ব পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওপর ন্যস্ত রাখা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্ম ছাড়াই প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত একটি প্যানেল থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারে। এককথায় বলা যায়, আমাদের বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র দেখে আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। আগামীতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যাতে দক্ষ ও সুযোগ্য জনশক্তির নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় পরিচালিত হতে পারে সেজন্য জরুরী উদ্যোগের বিকল্প নেই। আশাকরি আমাদের প্রস্তাবাবলী, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও জাতীয় স্বার্থে যে কার্যক্রমের কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা বোদ্ধাজনেরা ও সরকার তাদের বিবেচনায় নিয়ে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসবেন।

www.pathagar.com

২০ সেপ্টেম্বর ২০০১

আফগানিস্তান জিন্দাবাদ! আমেরিকা দীর্ঘজীবী হউক!

মাহবুব উল্লাহ :

গত মঙ্গলবার, ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় টেলিভিশনের পর্দায় বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে ভয়াবহ এক ঘটনার দৃশ্য। আধুনিক প্রযুক্তির সবচাইতে জাদুকরী ক্ষমতা হল, পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে কিংবা পূর্ব গোলার্ধে কী ঘটছে, তার সর্বশেষ বিবরণ অপর গোলার্ধের মানুষ নিজ বাসস্থানে বসেই সচিত্র দৃশ্যসহ তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারে। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা দেখেছি, দুটি যাত্রীবাহী বিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতীক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ১৮ মিনিটের ব্যবধানে পরপর আঘাত হানে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে আরেকটি যাত্রীবাহী বিমান মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রধান দফতর পেন্টাগনেও আঘাত হানে। তৃতীয় বিমানটি পেনসিলভেনিয়ার কাছে একটি জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় বিধ্বস্ত হয়। ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টারে যাত্রীবাহী বিমান দুটি আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বিস্ফোরণ ঘটে এবং বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট অগ্নিগোলক থেকে যে তাপ নির্গত হয়, তার ফলে ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে তৈরি এবং ভূগর্ভের সত্তর ফিট গভীরে যার ভিত্তি, সেই ভবনটি মুহূর্তের মধ্যে ধসে পড়ে। কেউ মনে করেন, যাত্রীবাহী বিমান দুটি যারা হাইজ্যাক করেছিল, তারা মারাত্মক বিস্ফোরকও বহন করেছিল। বিশাল আকৃতির জাম্বোজেট বিমানের ধাক্কা ও বিস্ফোরক পদার্থের বিস্ফোরণের ফলে ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার ধসে পড়েছে। আবার কারও কারও মতে, বিমানে বোঝাই জেট ফুয়েলে আগুন লেগে যাওয়ায় ১৫শ' ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট মাত্রায় তাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে ভবনের ইস্পাতের কাঠামোগুলো গলে গিয়ে তরল পদার্থের মত গড়িয়ে পড়ে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে তিন শিফটে দেড় লক্ষ লোক কাজ করে। এর ফলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, কমপক্ষে ১০ হাজার লোক নিহত হয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান দফতর পেন্টাগণের বিরাট অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রাথমিকভাবে জানান হয়েছিল, এর ফলে ৮শ' ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে। চতুর্থ বিমানটির লক্ষ্যস্থল সম্ভবত ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দফতর হোয়াইট হাউস এবং তার ব্যক্তিগত বিমান এয়ারফোর্স ওয়ান। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মুহূর্তেই একে এক মারাত্মক সন্ত্রাসী হামলা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই হামলায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। অত্যন্ত মর্মান্তিক এই ঘটনা। যে কোন সভ্য মানুষ এই হামলার নিন্দা জানাবেন। আমরাও এই সন্ত্রাসী হামলার প্রতি ধিক্কার জানাই। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের এই গভীর শোক ও বেদনার সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণও গভীর সহানুভূতি, সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করছে।

হামলার প্রকৃতি দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, এটি ছিল একটি ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন নেটওয়ার্ক অবিরতভাবে এই হামলার ওপর ধারণকৃত দৃশ্য ও সংবাদ ভাষ্য প্রচার করে চলেছে। হামলার পরপরই সিএনএন টেলিভিশনের পর্দায় যে লেখাটি ফুটে ওঠে, তা হল– America Under Attack! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে জাপান যখন পার্ল হারবারের ওপর বিমান হামলা চালায়, তখনও তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট উচ্চারণ করেছিলেন, America Under Attack! মার্কিনীদের দৃষ্টিতে তাই এবারের এই হামলা সেই জাপানী হামলারই সমতুল্য।

ঘটনার আকস্মিকতা, সন্ত্রাসীদের আক্রমণের কৌশল, সময়, ক্ষণ ও কার্যক্রম নির্ধারণে নির্ভুলতা বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে ফেলেছে। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তিবিদ্যার চরম শিখরে আরোহণ করছে, যার গোয়েন্দানেত্র পৃথিবীর নৌ, স্থল ও অন্তরীক্ষসহ সর্বত্র সজাগ ও

www.pathagar.com

সচল, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যূনতমভাবে আঁচও করতে পারল না, ভয়াবহ এক আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তাদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার প্রতীকগুলো। রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা কার্যক্রমের ইতিহাসে এত বড় ব্যর্থতা আর কখনও কোথাও ঘটেনি। মার্কিন প্রশাসন মার্কিন জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এজন্য আজ হোক, কাল হোক, ঘটনার তাৎক্ষণিক উত্তেজনা যখন স্তিমিত হয়ে যাবে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনকে এই ব্যর্থতার জন্য তার জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এই ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা একবিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধে এক নতুন মাত্রা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে। নতুন শতাব্দীতে যুদ্ধ কেবলমাত্র যে রাষ্ট্র রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ নয়, সেটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর। বিশেষ করে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA-কে বলা হত Invisible Government বা অদৃশ্য সরকার। CIA তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পর্দার অন্তরালে থেকে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালাত। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নেতৃবর্গকে হত্যা, জাতি, গোষ্ঠিভিত্তিক অভ্যুত্থান, সামাজিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে CIA তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে রাখার এক নিন্দনীয় কুৎসিত কার্যক্রম চালাত। ইরানের মোসাদ্দেক সরকার, চিলির আয়েন্দে সরকারসহ বিশ্বের অনেক দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ থাকার অভিযোগ CIA'র বিরুদ্ধে রয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটেছে। আমেরিকাকে আজ পরাক্রমশালী কমিউনিস্ট প্রতিপক্ষ সভিয়েত ইউনিয়নকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে না। সভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সংঘাত, পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের রেষারেষি কোন অংশেই কম ছিল না। তা সত্ত্বেও মার্কিন ও রুশ রাষ্ট্রনায়করা একে অপরের সঙ্গে কথা বলতেন ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে দর কষাকষি করতেন। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান ও আফ্রিকার অনেক দেশেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ছায়াযুদ্ধ তথা প্রক্সি ওয়ার হয়েছে। এসব যুদ্ধে মর্মন্তুদ মানবিক ট্র্যাজেডি ঘটেছে। কিন্তু এরপরও এই দুই পরাশক্তি পরস্পরের দিকে তাক করে রাখা পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার সজ্জিত মিসাইলগুলো ভুলক্রমেও নিক্ষেপ করেনি। পৃথিবীর মানুষ সে সময়ে সম্ভবত অনেক বেশী নিরাপদ ছিল। 'নিরাপদ' শব্দটি আমি এই অর্থে ব্যবহার করতে চাই যে, মানুষ জানত, আক্রমণ কোনদিক থেকে আসবে। কিন্তু আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন এক শত্রুর মুখোমুখি, যে শত্রুর অবয়ব নেই, রাষ্ট্র নেই, সরকার নেই; নেই কোন রীতিনীতি ও আইন-কানুন মেনে চলার বাধ্যবাধ্যকতা। আজ তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অনেক দেশ অদৃশ্য শত্রুর হামলার মুখোমুখি। হিন্দু পূরাণে আছে, 'তোমারে বাধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'। আজ ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে, পরাশক্তি আমেরিকাকে ঘায়েল করার জন্য তার সমস্ত প্রযুক্তি, সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক সম্পদ ও বিশ্ব রাজনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতাকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিতে তারই অজান্তে হন্তারক শক্তির উদ্ভব ঘটছে। একটু সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করলে একথা বুঝতে কষ্ট হবে না যে, কনভেনশনাল ওয়ারের কৌশলে এই শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। আমেরিকান জনগণের বিচারবুদ্ধির প্রতি আমার প্রবল আস্থা আছে। আমেরিকান জনগণ আমাদের বন্ধুও বটে। হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাদের বিবেকবোধের প্রতি আমার আবেদন থাকবে, তাৎক্ষণিক উত্তেজনা নয়, ক্রুসেডের হুংকারও নয়, রাষ্ট্রবিশেষ ও জনগোষ্ঠীকে মিসাইলের আঘাতে গুঁড়িয়ে দেয়াও নয়, আধুনিক সভ্যতার দাবীদার আমেরিকাকে এই সভ্যতা বিনাশী শক্তির বিরুদ্ধে সভ্যভাবে মোকাবিলা করার পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে।

আফতাব আহমাদ :

আমেরিকান জনগণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে চাই, Long Live America— আমেরিকা দীর্ঘজীবী হোক। আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে চাই, God Bless America. আমার এই দুটি উচ্চারণের পেছনে মূল কারণ হচ্ছে- আইনের

www.pathagar.com

শাসন ও পরিকল্পিতভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যদিয়ে একটি রাষ্ট্র জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে আমেরিকান জনগণের এক অনন্যান্য সাধারণ অবদান রয়েছে। আমেরিকান জনগণের মুক্তির প্রশ্নে যে স্বাধীনতার ইশতেহার তারা রচনা করেন, তা যুগ যুগ ধরে স্বাধীনতাকামী মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। একটি কনফেডারেল ইউনিয়ন থেকে ফেডারেল ইউনিয়নে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরণ অতীব জটিল ও রক্তক্ষয়ী ছিল। আমেরিকার আদিবাসীদের একদিকে নির্মূল করে; অন্যদিকে একদেহে লীন করার প্রক্রিয়ায় সব জাতি, সব ধর্মের মানুষকে আমেরিকান সত্তায় পরিগণিত করার যে নৃশংস পদ্ধতি বেছে নেয়া হয়েছিল, তা আমেরিকার জন্য সাময়িক সুফল বয়ে আনলেও আমেরিকার সমাজে এর বিষময় প্রতিক্রিয়া এখনও তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলছে। এর পাশাপাশি নামমাত্র মূল্যে সস্তা শ্রমে, কিংবা বিনা পারিশ্রমিককে উত্তরোত্তর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে, বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে যে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোকে শৃংখলিত করে আমেরিকান সমৃদ্ধি কর্ষণে ভারবাহী পশু হিসেবে ব্যবহার করে সমাজে যে বিভেদ, বর্ণবাদ ও বিভাজনের জন্ম আমেরিকা দিয়েছে, তারও কম খেসারত আমেরিকাকে দিতে হয়নি। আড়াই বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধের আগুনে আমেরিকাকে দগ্ধ হতে হয়েছে। কিন্তু আমেরিকার ক্ষমাবান, বিত্তবান ও সামরিক সরঞ্জাম ব্যবসার নিয়ন্ত্রক যারা, তারা কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারকে মেনে নিতে পারেনি এবং এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের কাঁধে চাপিয়ে তাকে হত্যা করতেও কসুর করেনি।

আমেরিকার ইতিহাসে এ পর্যন্ত চারজন প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন। সর্বশেষ যিনি নিহত হন, তিনি হচ্ছেন জন. ফিটজারল্ড কেনেডি। কেনেডি হত্যার রহস্য আজও অনুদঘাটিত রয়ে গেছে। মার্কিন জনগণের বিশ্বাস, এ ঘটনার নেপথ্যে মার্কিন গোয়েন্দা স্থাপনার শীর্ষ ব্যক্তিরা জড়িত। ওয়ারেন কমিশনের নামে বিষয়টিকে যদিও ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু মার্কিন নাগরিকগণ আজও তা বিশ্বাস করেন না।

অদ্ভুত এক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একদিকে গণতন্ত্রের চর্চা, মানবাধিকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, আরেকদিকে অতিকায় দানবাকৃতির রাষ্ট্রযন্ত্রটি দেশে দেশে নাশকতামূলক কার্যকলাপে জড়িত বলে বহু অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। একজন বিখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শট স্নাইডারের এক কালজয়ী গ্রন্থের শিরোনাম হচ্ছে- 'Semi- Sovereign People, Semi Sovereign Government'. গ্রন্থের শিরোনাম থেকেই তার বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করার জন্য গোপন তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করে রণনীতি নির্বাচনে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য OSS নামক অতি ক্ষমতাধর একটি গোয়েন্দা সংস্থার জন্ম দেয়া হয়। এই সংস্থাটি বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পরবর্তীতে আরও অধিক ক্ষমতা লাভ করে CIA হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। ড. মাহবুব উল্লাহ আগেই উল্লেখ করেছেন, Invisible Government-এর কথা। বস্তুত CIA সম্পর্কিত প্রথম লিখিত গ্রন্থের এটিই ছিল শিরোনাম। এই গ্রন্থটি রচনার বেশ আগে আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী C. Write Mill. তার গ্রন্থটির নাম The Power Elites. এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে, গণতন্ত্রের খোলসে জনমত জরিপের নামে মূলত রাষ্ট্রদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে সমর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তারা রাষ্ট্রের মূল চাবিকাঠি নাড়াচাড়া করেন ও নীতিনির্ধারণ করেন। ঐ গ্রন্থেই তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, জেনারেল আইজেন আওয়ারই হবেন পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য যে, জেনারেল আইজেন হাওয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আটলান্টিক কমান্ডের দায়িত্বে ছিলেন এবং তারই নেতৃত্বে ইউরোপ অভিযান পরিচালিত হয়। প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন রিচার্ড নিক্সন, যিনি পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অল্পের জন্য ইমপিচমেন্ট থেকে রেহাই পান। প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন জন ফস্টার ডালেস। এই ডালেস সাহেব প্রতিটি ঝোঁপের আড়ালে কমিউনিস্ট ভূত দেখতেন। তিনি ফ্রি

www.pathagar.com

ইউরোপ রেডিও চালু করে স্নায়ুযুদ্ধকে চরমভাবে উস্কে দেন। তাঁর অনুসৃত নীতি থেকে কি ডেমোক্র্যাটিক, কি রিপাবলিকান, কোন প্রেসিডেন্টই বিচ্যুত হননি। ডালেসের নীতি ছিল- দুর্গ যদি বাইরে থেকে আক্রমণ করে দখল করা না যায়, তাহলে তা ভেতর থেকে দখল করার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ যে সব দেশকে মার্কিনীদের শত্রু ভাবা হয়, সেসব দেশের অভ্যন্তরে পঞ্চম বাহিনী তৈরী করে নাশকতামূলক কার্যকলাপ পরিচালিত করতে হবে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে হবে। রাজনৈতিক ডকট্রিন থেকে শুরু করে গানবোট ডিপ্লোম্যাসি একই সূত্রে গ্রোথিত। দেশে দেশে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযান চালিয়ে এসেছে, এর পাশাপাশি দেশে দেশে তারা গণতন্ত্রবিরোধী মানবঘাতী স্বৈরশাসকদের শুধু ক্ষমতায়ই অধিষ্ঠিত করেনি, লালন-পালন করে সর্বাত্মক মদদ যুগিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এসব হীনকর্মের প্রধান পরাজয় ঘটে লড়াকু ভিয়েতনামী জনগণের হাতে।

প্রকৃতি তার নিজের সূত্র ধরে সন্তর্পণে যে কাজ করে যায়, অনেক ক্ষমতাদর্পীই তা বুঝতে পারে না কিংবা চায় না। দক্ষিণ আমেরিকায় মার্কিন প্রভুত্বকে যে নির্মমতার সাথে নিরঙ্কুশ করা হয়েছিল, তার স্বরূপ ইতোমধ্যেই উদঘাটিত হয়ে গেছে। ডমিনিকান রিপাবলিকে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করে, গ্রেনাডায় সামরিক অভিযান পরিচালনা করে ও তার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিশপ মরিসকে হত্যা করে, পানামার স্বাধীনচেতা প্রেসিডেন্ট টরোজোকে বিমানে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে এবং পরবর্তীতে পানামার অপর রাষ্ট্রপ্রধান নরিয়েগাকে অপহরণ করে নিয়ে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ক্ষমতার দর্প কম দেখায়নি। আর্জেন্টিনায় জেনারেল গলতিয়ারিকে লালন করে, চিলিতে পিনোশেকে লালন করে আমেরিকা কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। আর মায়ামী বীচ থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত কিউবায় বাতিস্তার মতো অধঃপতিত সামরিক স্বৈরশাসককে টিকিয়ে রাখতেও আমেরিকা ব্যর্থ হয়েছে। ফিদেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে কিউবায় যে বিপ্লব সংঘটিত হয়, তার সাফল্য ও কৃতিত্ব আজও কিউবার জনগণ ভোগ করছে। গোটা বিশ্ব উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কোন ব্যক্তিকে যদি অন্তর থেকে পরম শ্রদ্ধা করে থাকে, তিনি হচ্ছেন ফিদেল ক্যাস্ট্রো। বার্সেলোনা অলিম্পিকে তাঁর নাম ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে গোটা অলিম্পিক স্টেডিয়াম আনন্দে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে তাঁকে যেভাবে অভিবাদন করেছিল, তা আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোন রাষ্ট্রনায়ক লাভ করতে পারেননি।

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়নের জন্য অহরহ তাদের পররাষ্ট্রনীতির প্রধানতম কার্যক্রম হিসেবে ঘোষণা দিয়ে থাকে। কিন্তু এর আড়ালে ব্যবসায়িক স্বার্থ বিশেষ করে সমর ব্যবসায়ী, তেল ব্যবসায়ী ও খনিজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই যে গণতন্ত্রের এ ঢাল ব্যবহার করা হয়, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ এরই মধ্যে বুঝে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। এক্ষেত্রে জনমত তৈরী করার জন্য যে ছয়টি সাময়িকী অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তার উল্লেখ না করলেই নয় ঃ Monthly Review, Science and Society, Politics and Society, Journal of Radical Political Economy, Insurgent Sociologist এবং Bulletin of Concemed Asian Scholars. এর বাইরেও আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার নাম উল্লেখ না করলে মার্কিন জনগণের মধ্যে মানবাধিকার ও মানবাধিকারের যে উন্মেষ ঘটেছে, তা পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এর একটি হচ্ছে, Counter Spy এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে Bulletin of Covert Action. প্রথমোক্ত পত্রিকাটি আজ প্রায় ষাট বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। দ্বিতীয়টি আশির দশক থেকে প্রকাশনা শুরু করে। এই পত্রিকাটির সম্পাদক হচ্ছেন Philip Agee. তিনি এক সময়ে ইউরোপে CIA'র চীফ অপারেটর ছিলেন। CIA থেকে দলত্যাগী হয়ে নিজের জীবন রক্ষার সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে তিনি একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন, যার শিরোনামে হচ্ছে Dirty Work. এই গ্রন্থে ইউরোপের বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানদের CIA'র অপারেটর হিসেবে উন্মোচিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের আন্দোলন থেকে শুরু করে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন ভূমিকার সমালোচনাসহ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এবং ইউরোপীসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংহতি ও সমর্থন নিয়ে মার্কিন নাগরিকগণ শেষ পর্যন্ত শান্তি ও মানবাধিকার অর্জনে বিজয়ী হন।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমিতিতে একটি বিশেষ পরিবির্তন লক্ষ্যণীয়। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে কৃষ্ণাঙ্গরা নিয়োগ লাভ করেছেন (জেনারেল কলিন পাওয়েল কৃষ্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী)। অথচ রবার্ট কেনেডি মার্টিন লুথার কিংকে তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে রানিংমেট হিসেবে গ্রহণ করার আভাস দেয়ার অপরাধে উভয়কেই অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্ল্যাক আমেরিকান এবং মুসলিম আমেরিকানরা অত্যন্ত শক্তিশালী একটি চাপ গোষ্ঠী হিসেবে, একটি প্রেশার গ্রুপ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং নীতিনির্ধারণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এককালে কৃষ্ণাঙ্গবিরোধী Ku Klux Klan (KKK) নামে একটি শ্বেতাঙ্গ ঘাতক চরমপন্থী গোষ্ঠীর জন্মলাভ ঘটার পর সে দেশে মানবাধিকার তো দূরের কথা, গণতন্ত্র কিভাবে পিষ্ট হয়েছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অতি সম্প্রতি হলিউড থেকে তিনটি বিশেষ ছবি তৈরী হয়েছে মূলত বর্ণবাদী বিদ্বেষ জনমনে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে। এই তিনটি ছবিতেই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে উৎখাত করে পেন্টাগনের একটি কুচক্রী মহল কিভাবে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল এবং পরিণতিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল তা দেখানো হয়। এই সেদিন আমেরিকার যে অমানবিক ঘটনা ঘটে গেছে, তার সুষ্ঠু তদন্ত ও অনুসন্ধান না করে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ খলনায়করা উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে কোন অপচেষ্টায় লিপ্ত কিনা, তা আজ গভীরভাবে ভাবতে হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার অত্যন্ত ভারসাম্যমূলক একটি বিবৃতির মাধ্যমে সকল মহলকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, নিজেদের ব্যর্থতা ও অযোগ্যতাকে ঢাকার জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের দোষারোপ করা একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ হতে পারে। আমেরিকা যদিও প্রকাশ্যে আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে আফগানিস্তানকে চিহ্নিত করছে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আফগানদের পরাজিত করতে গিয়ে কেউই সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। আমার আশংকা, মুসলিম বিদ্বেষপ্রসূত মার্কিন নীতিনির্ধারকদের মূল লক্ষ্য পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার ক্যাপাবিলিটি এবং পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস করা। স্যামুয়েল হান্টিংটন একজন প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। 'ক্ল্যাশেস অব সিভিলাইজেশন' গ্রন্থে আগামী দিনের লড়াইয়ের যে ফ্রন্টলাইনগুলো তিনি চিহ্নিত করেছেন, তা স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে যতই আকর্ষণীয় বলে মনে হোক না কেন, প্রশাসন বিজ্ঞানের আরেকজন মার্কিন পণ্ডিত রালফ ব্রাইবান্ডি হান্টিংটনের তত্ত্বের যথোপযুক্ত জবাব দিয়ে ধর্ম ও মানবতাবাদের শাশ্বত বাণীর উৎকর্ষ সাধন করে মানবমণ্ডলীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যেই সভ্যতার বিকাশ নির্ভর করে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। শান্তিপ্রিয় বিশ্ব ব্রাইবান্ডির আশাবাদ ও বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ হলে আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা Dooms Day কে এড়াতে পারব।

মাহবুব উল্লাহ :

ড. আফতাব গ্রেট আমেরিকান সিভিলাইজেশন নামে যে সভ্য সমাজ আমাদের ভাবনা-চিন্তাকে প্রতিনিয়ত আলোড়িত ও উদ্বুদ্ধ করে, তার ভিত্তিটা যে কতো বর্বর, রক্তাক্ত ও ঘৃণা-বিদ্বেষে ক্লেদাক্ত তার স্বরূপ অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ও একাডেমিক মানসম্পন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণের সঙ্গে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই বললেই চলে। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর থেকেই মার্কিন প্রশাসনের উচ্চ মহল থেকে ঘটনার জন্য ওসামা বিন লাদেন ও তাকে আতিথ্য প্রদানকারী রাষ্ট্র আফগানিস্তানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে চলেছে। তাদের এই প্রতীতি সম্পর্কে তারা এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। এ ধরনের ঘটনায় সত্যে উপনীত হতে হলে একাধিক হাইপোথিসিস নিয়ে এগুতে হবে। বিশ্ববাসী

www.pathagar.com

জানে, গত প্রায় এক বছর ধরে ইসরাইল প্যালেস্টাইনী জনগণের ওপর এক ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের অভিযান চালিয়ে এসেছে। বিশ্ব জনমত চিরনিন্দিত ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠছিলো। ইসরাইলের ঔদ্ধত্য ন্যায় বিচার ও সভ্যতার মানদণ্ডে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। আমাদের সন্দেহ, ইসরাইল বিশ্ব জনমতকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে এই জঘন্য সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের নৃশংসতা ও চাতুর্য সর্বজনবিদিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সামরিক সহযোগিতা ও মিত্রতার সুযোগে ইসরাইলী গোয়েন্দাচক্র মোসাদ মার্কিন গোয়েন্দাচক্র CIA ও FBI সহ বিভিন্ন সংস্থায় অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এই সক্ষমতাকে পুঁজি করে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলা ঘটিয়ে মোসাদ ইসরাইলের সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ হাসিলের কদর্য ভূমিকা পালন করেছে কিনা মার্কিন জনগণ ও মার্কিনী সভ্যতা পূজারীদেরকেও তা অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, জন ফস্টার ডালেসের আমলে ও ম্যাকার্থিজমের যুগে উচ্চারিত Those who are not with us, are against us ঘৃণা বাক্যটি আবারও মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্ব সভ্যতার জন্য এটা এক অশনী সংকেত। বলা হচ্ছে, Radical Islam ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে নতুন এক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে। আর তারই আলামত হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নয়া ক্রুসেড তথা ধর্মযুদ্ধ শুরু করার পাঁয়তারা। ভুলে গেলে চলবে না, সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস দিয়ে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী মোড়লীপনা ও দুনিয়ার সকল দেশের ঘটনাপ্রবাহকে নিজ স্বার্থে পরিচালিত করার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই যে 'হামাস', 'হিযবুল্লা' বা এই ধরনের আরও অনেক জঙ্গীবাদী সংগঠনের উদ্ভব ঘটেছে, সে বিষয়টিও ভুলে গেলে চলবে না। সময় এসেছে, সমগ্র মার্কিন নীতির পর্যালোচনা করার। মার্কিন আচরণের ফলে যদি কোনো ক্ষুব্ধ ও চরম আত্মত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে থাকে, তার দায়িত্বও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। আরো উদ্বেগের বিষয়, সংকটের লেলিহান শিখা উপমহাদেশের দোরগোড়ায় এসে উপনীত হয়েছে। পাকিস্তান আজ এশিয়ায় নতুন যুদ্ধের ফ্রন্টলাইন স্টেটে পরিণত হয়েছে। আমরা পাকিস্তানী জনগণ সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন বোধ করছি। আরও মনে রাখা দরকার, আফগানিস্তান এমন একটি রাষ্ট্র ও আফগানরা এমন একটি জাতি, যে জাতি কখনই পরাভব মানেনি। আফগাানিস্তানের মাটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে। গিরিকন্দর পরিবেষ্টিত হতদরিদ্র আফগানিস্তান একটি অত্যন্ত গর্বিত জাতি। দরিদ্র মানুষের প্রতিরোধে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী রাষ্ট্রের কী পরিণতি হয় তা কোরিয়া ও ভিয়েতনামের জনগণ প্রমাণ করেছে। আমেরিকা কি আফগানিস্তানে আরেকটি ভিয়েতনাম সৃষ্টি করতে চায়? মার্কিনী জনগণের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ওপর আমার প্রচণ্ড আস্থা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সভ্যতাকে অনেক মনীষী উপহার দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটন, জেফারসন, বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন, হ্যামিলটন, আব্রাহাম লিংকন ও মার্কিন লুথার কিংয়ের দেশ। এ দেশের জনগণ সাময়িকভাবে আবেগতাড়িত হলেও শেষ পর্যন্ত অন্ধ আবেগের গলি থেকে যুক্তির মুক্ত সড়কে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবে, এ বিশ্বাসে আমি অনড় থাকতে চাই। মতাদর্শকে মতাদর্শ দিয়েই মোকাবিলা করতে হয়, অস্ত্র দিয়ে নয়, পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইলিং দিয়েও নয়। আমেরিকাকে প্রমাণ করতে হবে আমেরিকা সভ্যতা, স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকাবাহী। সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত বর্ণবাদবিরোধী সম্মেলনে এবং বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণে আমেরিকা যে অযৌক্তিক মনোভাব প্রদর্শন করেছে, তা আমেরিকান সভ্যতার বিচ্ছিন্ন কালো অধ্যায় হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে- এই প্রতীতিতে আস্থাবান থাকতে চাই। আমেরিকান জনগণের বিবেকবোধ অতীতে যেমনি বারবার নিজেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করেছে, সেটাই আমেরিকার সভ্যতার মূলধারা। Long live America and Long live the American people.

www.pathagar.com

২৭শে সেপ্টেম্বর ২০০১

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা করতে হবে

মাহবুব উল্লাহ :

বিদ্যমান পরিস্থিতির গুরুতর কোন অবনতি না ঘটলে আগামী পহেলা অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন নিয়ে যত দ্বিধা-সংশয় থাকুক না কেন, আমার বন্ধুবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই দৃঢ় আস্থাশীল ছিলেন যে, নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পর সারাদেশেই বিক্ষিপ্তভাবে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক চরিত্রের হাঙ্গামা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কারো কারো হিসাব মতে, এসব সংঘর্ষে দেড় শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। তবু নির্বাচনের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করতে গিয়ে আমার বন্ধুবর্গ বেশ কিছু যুক্তি দেখিয়েছিলেন। যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর যশোরের উদীচী অনুষ্ঠান, পল্টনে সিপিবির সমাবেশ, রমনা বটমূলের ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ও নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে যে ধরনের শক্তিশালী বিস্ফোরণ ও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে, সেরকম কোন ঘটনা ঘটেনি বলেই তারা নির্বাচনের প্রশ্নে আশাবাদী। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাদের এই আশাবাদকে ব্যর্থ প্রমাণ করে বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাটে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসভায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর একটি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটে এবং এই বিস্ফোরণের ফলে ৭ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন এবং আরো ২০ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। নির্বাচনী এই সভাটি ছিল আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলালের। রহস্যজনকভাবে লক্ষ্য করা গেছে, নারায়ণগঞ্জের বোমা বিস্ফোরণের ফলে সপ্তম সংসদের এমপি এবং নারায়ণগঞ্জের সন্ত্রাসের জন্মদাতা বলে কথিত শামীম ওসমান মুহূর্তের ব্যবধানে বেঁচে গেছেন, শেখ হেলালও তেমনি অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছেন। কারো অপঘাত মৃত্যু কাম্য নয়, শেখ হেলাল প্রাণে রক্ষা পেয়ে জাতি বিপর্যকর রক্তপাত থেকে রক্ষা পেল। শেখ হেলালের জনসভায় যে ধরনের বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে, অতীতে অন্যান্য যেসব মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটেছিল, এটা তারই অনুরূপ। খোদা না করুন, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর নাগাদ এরকম আরো একাধিক বিস্ফোরণ ঘটলে কেবল নির্বাচনই যে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে তা নয়, দেশও একটি সাংবিধানিক সংকটের মুখে পড়বে।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে যেসব মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটেছিল, সেসব বিস্ফোরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই আওয়ামী লীগ ও তাদের অনুসারী বুদ্ধিজীবীরা তারস্বরে ঘটনার জন্য লাদেনপন্থী তালেবানী মৌলবাদীদেরই দায়ী করেছে। আমরা বুঝতে পারি না ঘটনার তদন্তানুষ্ঠান সম্পন্ন না হতেই এবং প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত না করতেই কী করে এরা বুঝতে পারলেন যে, এসব ভয়াবহ বোমা হামলার জন্য 'তালেবানী মৌলবাদীরাই' দায়ী? আজ পর্যন্ত এসব বিস্ফোরণের কোন রহস্যই উদঘাটিত করা সম্ভব হয়নি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, এসব ঘটনার পেছনে এমন কোন মহল সংশ্লিষ্ট রয়েছে যাদের আসল চেহারা উন্মোচিত করা বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষে বিব্রতকর কিংবা আদৌ সম্ভব নয়। শেখ হেলালের জনসভায় কে বা কারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তাও সম্ভবত রহস্যের বেড়াজালে আবৃত থেকে যাবে। মোল্লাহাটে বিস্ফোরণ ঘটনার আগে ভারতীয় গোয়েন্দা চক্রের কালো হাত রয়েছে কিনা সে ব্যাপারটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিবেচনায় আসা উচিত বলে আমার কাছে অত্যন্ত জরুরী মনে হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবার পর থেকে একে বির্তকিত করে তোলার জন্য আওয়ামী মহল থেকে কুটিল অপপ্রয়াস চালানো হতে থাকে। এমন কোন নির্বাচনী জনসভা নেই, যে সভায় শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক

www.pathagar.com

সরকারের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের প্রথম অভিযোগটি ছিল, সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টা জনাব হাফিজ উদ্দিন খান বিএনপির লোক। তাদের এই অভিযোগ শেষ পর্যন্ত হালে পানি পায়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই শেখ ফজলুল করিম সেলিম তো বলেই বসলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন ছাড়া সবাই রাজাকার। এই একজন অরাজাকার কে হতে পারেন, তা নিয়ে অনেক কলামিষ্টই গবেষণা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ইনি হলেন মুক্তিযোদ্ধা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) মঈনুল হোসেন চৌধুরী। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ইনি হলেন বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী। আওয়ামী লীগ আরো অভিযোগ করেছে, বিএনপি প্রদত্ত গোপন তালিকা অনুসারেই প্রশাসনিক রদবদল ঘটিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রশাসনিক রদবদল করতে হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে তাদের দলীয়করণ নীতির ধারাবাহিকতায় নির্বাচনকে নিজেদের অনুকূলে রাখার জন্য যেরকম মারাত্মকভাবে রদবদল ঘাটয়েছে তাতে এর আর কোন বিকল্প ছিল–এটা কোন বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন মানুষই বুঝতে চাইবে না। এ দেশের মানুষ নির্বাচন এলে এক ভিন্নধর্মী উৎসবের আমেজ পায়। সন্ত্রাস, সংঘর্ষ, প্রাণহানি সত্ত্বেও নিজেদের পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচনে জনগণের উৎসাহে কোন ভাটা নেই। নির্বাচনের দিন দেখা যায়, শত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও নারী-পুরুষ ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে অতিপ্রত্যুষেই হাজির হতে শুরু করে। নির্বাচনের ফলাফল কী হবে, এ সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়। পত্র-পত্রিকায় নানা ধরনের জনমত জরিপের ফলাফল দফায় দফায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব ফলাফল থেকে অনুমান করা হচ্ছে, এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারবে না। গত পাঁচ বছরে আওয়ামী দুঃশাসনের ফলে জনগণের মধ্যে যে নাভিশ্বাস উঠেছে, তাতে মন্দের ভাল বিকল্পটি বেছে নেয়া পক্ষেই জনমত প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। কথাটি হল–অতীতে কখনোই আওয়ামী লীগকে নির্বাচনের মাধ্যমে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। আর এবার তো প্রথমবারের মত আওয়ামী লীগ পূর্ণ পাঁচ বছরের জন্য দেশ শাসন করল। এমনকি তার বিদায়ের মুহূর্তটি কী হবে সেটাও শেখ হাসিনার ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করেছে। বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে এক চুলও টলাতে পারেনি। এখানেই আওয়ামী লীগের আত্মবিশ্বাসের উৎস। তৎসত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ভরসা পাচ্ছে না। তার প্রমাণ, আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী জনাব শামসুল কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি অনাস্থা ব্যক্ত করে বলেছেন, ভবিষ্যতে ক্ষমতায় গেলে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাঠামো পুনর্বিন্যাস করার বিবেচনা করবেন। আওয়ামী লীগের একটি দক্ষতা হল, নিজেদের অযৌক্তিক দাবীগুলো দৃশ্যত যৌক্তিক বলে প্রমাণ করে ছাড়া। শুরু থেকেই নির্বাচনে পরাজিত হলে যে গোলাযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির তারা পদক্ষেপ নেবেন, তারই জন্য একটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। তাদের এই মতলবী পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে এমন কোন প্রস্তুতি বিএনপিসহ চারদলীয় জোটের আদৌ আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই।

নির্বাচনের পরাজয়কে গণতান্ত্রিক কৃষ্টি অনুসারে সহজভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা আওয়ামী লীগের নেই, এটা তাদের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড থেকে ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। সম্ভব হলে নির্বাচনকে ভণ্ডুল করে দিতেও তারা যে পিছপা হবে না তার একটি নীলনকশা সাপ্তাহিক 'যায় যায়দিন' এ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। যায় যায়দিনে লেখা হয়েছে, "নীলনকশাটি আঁকা হয়েছে এইভাবে যে, ১ অক্টোবর ভোটের দিন বেলা ১২টা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সারাদেশের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে বোঝার চেষ্টা করবে তারা জিতছে, না হারছে। সেদিন মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি জানার জন্য

www.pathagar.com

দেশের সব কয়টি থানায় বিশেষ গ্রুপ পাঠানো হচ্ছে। প্রতিরক্ষা বিভাগের সাথে সম্পর্কিত একটি গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রতিবেশী দেশের সিক্রেট এজেন্টরা এই গ্রুপগুলো থেকে ছকবাঁধা প্রশ্নের জবাব সংগ্রহ করে ১২টার মধ্যে ঢাকায় আওয়ামী শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেবে। এসব রিপোর্ট বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হচ্ছে মনে করলে চুপ করে বসে থাকবে সন্ধ্যা পর্যন্ত। যদি দেখে, তারা পরাজিত হচ্ছে তাহলে পাঁচটি কাজ এখনই চিন্তায় রাখা হয়েছে।

"**এক.** আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা সংবাদ সম্মেলন করে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে ভোটের ফলাফল না মানার ঘোষণা দেবে।

দুই. রেডিও-টেলিভিশনে ফলাফল ঘোষণা না করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাবে এবং আগে থেকেই সংগঠিত লোকজন তাৎক্ষণিকভাবে বিটিভি ও বেতার ঘেরাও করে ফেলবে।

তিন, অভিন্ন বক্তব্য নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করবেন সফিউর রহমান, মোহাম্মদ আলী ও মুনসেফ আলী– এই তিন ইলেকশন কমিশনার। এরা বলবেন, ব্যাপক কারচুপি হয়েছে, ভোটের ফলাফলে জনমত প্রতিফলিত হবে না। নির্বাচন বাতিল করার দাবী তুলবেন এবং নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ভোটের রেজাল্ট ঢাকা না পাঠানোর আহ্বান জানাবেন।

চার. জেলা পর্যায়ে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত আওয়ামী পন্থী অফিসাররা এ মুহূর্ত থেকে ভোট দানে বাধা প্রদান, ভোট গণনা ও চিফ ইলেকশন কমিশনার অফিসে ফলাফল পাঠানোর কাজে বাধা দেবেন এবং না পারলে বিলম্ব ঘটাবেন।

পাঁচ. আওয়ামী লীগ ও তিনজন নির্বাচন কমিশনারের সংবাদ সম্মেলনে দেয়া ঘোষণা, সিদ্ধান্ত এবং আহবান তাৎক্ষণিকভাবে একুশে টেলিভিশন টেরেস্ট্রিয়াল (Terrestrial) ব্রডকাস্টিংয়ের ক্ষমতা ব্যবহার করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেবে। স্যাটেলাইট টেলিভেশন কোম্পানি চ্যানেল আই, রেডিও মেট্রোওয়েভ ও আকাশবাণী একই কাজ করবে।"

এই ধরনের নীল নকশাকে কেবলমাত্র জনতার সংঘবদ্ধ শক্তি পরাস্ত করতে পারে। অতীতে আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সংগঠিত ও জনসম্পৃক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে বিরোধী দলগুলোর ব্যর্থতার মূল যে কারণগুলো করেছে তার কোন হেরফের আজও ঘটেনি। দেশবাসী আজ তাই সত্যিকার অর্থে এক প্রবল দোলাচলের মধ্যে রয়েছে। দেশে চলেছে এক কঠিন ক্রান্তিকাল। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গন যেভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, তার ফলে দেশপ্রেমিকরা ঘাপটি মেরে থাকা কুচক্রী ও পঞ্চম বাহিনীর কুটকৌশলকে যদি নস্যাৎ করে দিতে না পারে, তাহলে জাতির জন্য নেমে আসবে অমানিশার অন্ধকার।

আফতাব আহমাদ :

জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যে পূর্ণাঙ্গ ছক তৈরি করে রেখেছে, সে সম্পর্কে আমরা বহুবার জনসাধারণ ও দেশবাসীকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। যায় যায়দিনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্রের যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তাতে আমি অন্তত বিস্মিত হইনি। আওয়ামী লীগের চরিত্রই হচ্ছে এককভাবে ক্ষমতা ভোগ দখল করা। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পর এবং মুসলিম লীগের কবর রচনা করে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হবার পর আওয়ামী লীগ এককভাবে ক্ষমতা ভোগ করতে না পেরে তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হঠকারী কার্যকলাপের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দিয়েছিল, তার সুযোগে জেনারেল আইয়ুব খানের পক্ষে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করার পরিস্থিত দেশের অভ্যন্তরে তৈরি হয়েছিল। আওয়ামী লীগের এই চরিত্র আজও বদলায়নি। বিচারপতি আবদুস সাত্তার নির্বাচিত হবার পর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক শাসন জারি করায়ও তাকেও স্বাগত জানিয়েছিল আওয়ামী লীগ এবং বাংলার বাণী পত্রিকায় দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখে তারা এরশাদকে সমর্থন জানিয়েছিল। এবারের নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগের নীলনকশার খুঁটিনাটি আমাদের জানা নেই। যায় যায়দিনের রিপোর্ট থেকে যতদূর বোঝা গেল এবং বিভিন্ন বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আরও যেসব তথ্য প্রতিদিন আমাদের কাছে আসছে, তা সত্যিই উদ্বেগজনক। ভোটার তালিকা সুষ্ঠুভাবে ও পরিপূর্ণভাবে সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। প্রচুর ভূয়া ভোটার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এদের কারো কারো অনুপ্রবেশ ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে ঘটেছে এবং কেউ কেউ ভারতসংলগ্ন বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর অপেক্ষায় রয়েছে প্রবেশের। দেশের ভিতরেও প্রকৃত ভোটারদের নাম যেভাবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে, সেখান শত-সহস্র ভুল রয়েছে। অবিবাহিত মহিলার স্বামীর নাম করে দেয়া হয়েছে পিতার নাম। এ বিষয়ে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে হয়েছি ক্ষতিগ্রস্ত। আমার স্ত্রীর নামের প্রথম অংশ ঠিক রেখে পদবী পাল্টে দেয়া হয়েছে এবং স্বামীর নামের জায়গায় আমার নাম বাদ দিয়ে অন্য একটি নাম বসিয়ে দেয়া হয়েছে। পোলিং বুথে গিয়ে ভোটার তালিকায় নাম যেভাবে আছে সেই অনুযায়ী পরিচয় না দিলে ভোটারকে ভোট প্রয়োগের অনুমতি দেয়া হয় না। এখন আমার স্ত্রীর পক্ষে তো ভোট দেয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। কারণ, স্বামী হিসেবে যে নাম মুদ্রিত হয়েছে একজন ঈমানদার মুসলমান হিসেবে তা স্বীকার করে মিথ্যা উচ্চারণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই জাতীয় বহু কৌশল আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশন দ্বারা ক্ষমতায় থাকাকালে করে গেছে। নির্বাচন কমিশনের অন্যতম কমিশনার মুনসেফ আলী দীর্ঘদিন ধরে শামসুল কিবরিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোটা মাইনের চাকরি করে এসেছেন। তিনি যে শামসুল কিবরিয়ার অঙ্গুলি হেলনে উঠবস করবেন তা বলাই বাহুল্য। সবচেয়ে বিপজ্জনক যে খবর, তা হচ্ছে, বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা বিভিন্ন পয়েন্টে বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার মওজুদ করে রেখেছে। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া যেসব সন্ত্রাসী খুনসহ লুটপাটের অভিযোগে হুলিয়া নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের অনেকেই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর বাংলাদেশ নির্বাচন সংক্রান্ত নবপ্রতিষ্ঠিত বিশেষ কোঅর্ডিনেশন সেল ভারী অস্ত্র পরিচালনা, বিস্ফোরক ব্যবহার এবং নাশকতামূলক কাজ কত দক্ষতার সঙ্গে করা যায়, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে বলে নানা মহল থেকে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। নানা সন্ত্রাসী গ্রুপকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারতীয় গ্র্যান্ড ডিজাইন কার্যকর করার জন্য। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী ও হুন্ডির মাধ্যমসহ অন্যান্য পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই পাম্পিং করা হয়েছে। 'র'-এর বিশেষ কোঅর্ডিনেশন সেল কঠোর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার মাধ্যমে শেখ হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে বলে শোনা যায়। এই সেলটির প্রধান হচ্ছেন শ্রীযুক্ত মহাপাত্র। তিনি এক সময়ে ঢাকায় 'র'-এর স্টেশন চীফ ছিলেন। তার সঙ্গে বর্তমান ঢাকার স্টেশন চীফ মাথুরের নিয়মিত সিচুয়েশন রিপোর্ট আদান-প্রদান অব্যাহত রয়েছে বলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়কে ভারত কোনভাবেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। তারপরও শেষ রক্ষা হিসেবে চারদলীয় জোটের ভেতরে বিশেষ করে বিএনপির ভেতরে তারা তাদের নিজস্ব লোকের অনুপ্রবেশ যেমন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি নানা প্রলোভন ও উৎকোচ দিয়ে অনেককে তাদের পক্ষে টেনে আনতেও সক্ষম হয়েছে। এই ধরনের প্রার্থীরা যেসব এলাকা থেকে নির্বাচন করছেন, যেখানে যদি আওয়ামী লীগ প্রার্থী দুর্বল ও জেতার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে এদেরকেই জিতিয়ে আনার ক্ষেত্রে ভারতীয়গণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। আমার বর্ণিত চিত্রটি দেখে বিষয়টি যত ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছে, শেষ বিশ্লেষণে বিষয়টি কিন্তু তত ভয়াবহ নয়। রৌমারির ঘটনা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, জনগণের ওপর আস্থা রেখে জনগণকে সচেতন করে ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে জনগণের সংঘ শক্তি দিয়ে যে কোন হামলা, সামরিক আক্রমণ বা নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত রাষ্ট্রঘাতী গোষ্ঠিকে শুধু প্রতিহতই নয়, সমূলে উচ্ছেদ করা সম্ভব। আজ প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে প্রতি মহল্লায়, প্রতি পাড়ায়, প্রতি বাড়িতে এই খবরটি পৌছে দেয়া যে, শত প্রতিকূল পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে সাগরের ঢেউয়ের মতো প্রত্যেক ভোটার যেন দলে দলে

www.pathagar.com

ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রয়োগ করে এবং ভোট কেন্দ্র পাহারা দেয়। আর রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমাদের আবেদন এই, জনগণের নিরাপত্তা বিধান যে করেই হোক করতে হবে। সেনাপ্রধানের কাছে আমার আবেদন, যেসব স্থানে সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হচ্ছে সেখানে তারা যেন পলাশীর প্রান্তরের মত নীরব-নিষ্ক্রিয় পুতুলের ন্যায় অবস্থান না করে। আর সর্বত্র সার্বক্ষণিক সেনা টহলের সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। সেনাবাহিনী প্রধান শুধু একজন মুক্তিযোদ্ধাই নন, তিনি যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন, ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতি এ দেশের জনগণের রয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন, আস্থা ও ভালবাসা , মানুষ যাতে সেনাবাহিনীর প্রতি যে প্রগাঢ় আস্থা ও ভালবাসা পোষণ করে, তা যাতে বিনষ্ট না হয় তার গুরুদায়িত্ব কিন্তু সেনাপ্রধানের ওপরই ন্যস্ত হয়েছে। আমরা আশা করব, জনগণ ভয়-ভীতিমুক্ত পরিবেশে অবাধে স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধিদের সুষ্ঠুভাবে নির্বাচিত করতে পারবেন। কেবল তাহলেই গণতন্ত্রের পথে আমরা আরেক কদম এগিয়ে যেতে পারব।

মাহবুব উল্লাহ :

১১ সেপ্টেম্বর আমেকিার বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র এবং পেন্টাগনে যে হামলা হয়েছে, তারপর গোটা পৃথিবী যেন বদলে গেছে। শান্তি ও নিরাপত্তার স্নায়ুযুদ্ধোত্তর নিস্তরঙ্গ পরিবেশ আজ আর নেই। ঘটনার প্রথম দিকে মনে হয়েছিল, আমেরিকা হয়তো তড়িঘড়ি করে আফগানিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের কতিপয় রাষ্ট্রের ওপর প্রচণ্ড প্রতিশোধমূলক হামলা চালাবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের উচ্চমহলে বিষয়টি নিয়ে যে পর্যালোচনা হয়েছে, তা থেকে মনে হয় আমেরিকা এখন একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কৌশলই গ্রহণ করতে চলেছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমেরিকা একটি বিশাল কোয়ালিশন গঠনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই প্রধান নেত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে আমেরিকার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মার্কিন সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর ও দেশ থেকে জ্বালানি সংগ্রহের সুবিধা দেবে বলে সম্মতি দিয়েছে। এতো বড় একটি ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে যে গভীর পর্যালোচনা, তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ছিল, তা সিদ্ধান্তের তাৎক্ষণিকতা দেখে প্রতীয়মান হয় না। দুই নেত্রীও তাদের দলীয় কাঠামোর মধ্যে ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে কোন আলাপ-আলোচনা করেছেন, এমন প্রমাণ আমরা পাইনি। ঘটনা ঘটে যাওয়ার দুই সপ্তাহেরও অধিক সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে, তা অবলোকন করে বলা যাবে না, এতো তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের গত সপ্তাহের আলোচনায় আমরা যেমনটি আশা করেছিলাম ঠিক সেভাবেই মার্কিন জনগণের শুভবুদ্ধি ও কল্যাণকামিতার উদ্রেক ঘটতে শুরু করেছে। ঘটনা যাই না ঘটুক না কেন, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে, বাংলাদেশ আজ ভূ-রণনৈতিকভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থান বাংলাদেশকে দিয়েছে যেমন চমৎকার সম্ভাবনার সুযোগ, তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে নিক্ষেপ করতে পারে বড় আকারের বিপর্যয়ের মুখে। যে কারণে আমি আমেরিকার সাম্প্রতিক দুর্দৈব ও দুর্ঘটনার প্রতি আমার আলোচনাকে সম্পর্কিত করতে চাই, তাহলো আমেরিকার দীর্ঘস্থায়ী সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন নাশকতামূলক কার্যকলাপ বরদাশত করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভবত আন্তর্জাতিক পরিতিস্থির এই উপাদানটি স্বল্পমেয়াদে হলেও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে যাবে। এখন পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা নির্ভর করছে ভারতীয় শাসকবর্গ পরিস্থিতি কীভাবে মূল্যায়ন করে তার ওপর।

www.pathagar.com

৪ অক্টোবর, ২০০১

নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শক্তির বিজয় এবং তারপর

মাহবুব উল্লাহ :

বাংলাদেশে নতুন শতাব্দীর প্রথম সংসদ নির্বাচনে জনগণ একটি নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। শেখ হাসিনা বহুবার বলেছেন, আওয়ামী লীগকে কখনো নির্বাচনে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। শেখ হাসিনার এই অলীক দাবীকে জনগণ মিথ্যা প্রমাণ করে দিল। প্রমানিত হল, আওয়ামী লীগকে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পরাস্ত করা সম্ভব। নির্বাচনে চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এক গৌরবময় বিজয়ের সাফল্য অর্জন করেছে। জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন না থাকলে এই অভূতপূর্ব ফলাফল কখনোই সম্ভব হত না। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আল আমীন এদেশের মানুষকে যেভাবে হেফাজত করলেন, সে জন্য তাঁর প্রতি শোকর গুজার করছি। কতোবড়ো মুসবিত থেকে আল্লাহ তা'লা এদেশবাসীকে রক্ষা করেছেন, তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। মেঘনার অতল গর্ভে যে এডভোকেট নূরুল ইসলামের লাশ টুকরো টুকরো করে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল, যে সজল লাশ হয়ে মিছিল থেকে মায়ের কাছে ফিরে গিয়েছিল, যে তুহিনকে নিয়ে পুলিশ গলায় জুতোর ফিতা দিয়ে আত্মহত্যা করার নাটক সাজিয়েছিল, যে নুরুজ্জামান শরীফ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দরবারে বিচার চাইতে গিয়ে আর কোনোদিন নিজ সন্তানদের কাছে ফিরে আসতে পারেননি–এদের মতো শত শত মানুষের লানতে আওয়ামী লীগের পরাজয় ঘটল। আল্লাহ তা'লা যে জাতির হেফাজতকারী সে জাতি সাময়িক বিপদের মুখে পড়তে পারে,কিন্তু তাকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না, একথাটি এবারের নির্বাচনে প্রমাণিত হল। আল্লাহ মানুষকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন, ধৈর্যচ্যুত না হয়ে যাঁরা ঈমান রক্ষা করেন, আল্লাহ তাঁদেরই সহায় হন।

নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হবে কিনা এবং আদৌ হবে কিনা, তা নিয়ে ছিল চরম অনিশ্চয়তা। প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান ও তাঁর উপদেষ্টা মণ্ডলী এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এম এ সাঈদ শত প্রতিকূলতা ও শেখ হাসিনার লাগামহীন কুৎসিৎ সমালোচনারমুখে ধৈর্যচ্যুত না হয়ে জাতিকে একটি সফল ও সার্থক নির্বাচন উপহার দেয়ার জন্য যেভাবে নিরলভাবে কাজ করেছেন, তার জন্য তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এবারের নির্বাচন যে ১৯৯১-এর নির্বাচনের চাইতেও অনেক বেশী সার্থক ও সফল হয়েছে, সে ব্যাপারে জনমনে কোনো দ্বিধা ও সংশয় নেই। নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কা করে নির্বাচনের দিন কিংবা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার সময়ে শেখ হাসিনা নির্বাচনের ফলাফলকে বিতর্কিত করে তোলার জন্য যে অপকৌশল গ্রহণ করেছিলেন, নারী-পুরুষ ও তরুণ ভোটারদের ব্যাপক ও স্বত:স্ফূর্ত ভোটাধিকার প্রয়োগের মুখে সেই ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেছে। চারদলীয় জোট নির্বাচনে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, তার কারণ ও তাৎপর্যসমূহ আজ আমাদের বুঝতে হবে। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করার পর ক্ষমতার মদমত্ততায় আওয়ামী লীগ যে তাণ্ডবের সূচনা করেছিল, তাকে প্রতিহত করার জন্য সকল

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী দলগুলোকে একমঞ্চে নিয়ে আসার জন্য এই 'সরাসরি' কলাম থেকে আমরা সংশ্লিষ্ট দল ও তার নেতৃত্বের প্রতি আকুল আহ্বান জানিয়েছিলাম। অবশেষে নেতৃত্বের শুভ বুদ্ধির উদ্রেক হয়, গঠিত হয় চারদলীয় ঐক্যজোট। বেগম খালেদা জিয়া, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, অধ্যাপক গোলাম আযম ও শাইখুল হাদীস আজিজুল হক স্বাক্ষরিত জোটের ঘোষণা প্রকাশের মধ্যদিয়ে জাতীয় রাজনীতি এক নবতর মাত্রা অর্জন করে। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এখন আর জোটের মধ্যে নেই, কিন্তু তার একাংশ জোটের মধ্যেই থেকে গেছে। এরশাদ জোট থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর জোটের অবস্থান কিছুটা নড়বড়ে হয়ে পড়ে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও জোট ধরে রেখে বেগম খালেদা জিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। জোট ভেঙে দেয়ার জন্য ভেতর ও বইরে থেকে বহু ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হাসিনা সরকার তার সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাকেই আবার পুরনো মামলায় কারাগারে পাঠায়। জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যাতে জোট থেকে বেরিয়ে আসেন, সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও প্যালেস্টাইন দূতকে দেনদরবার করার জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হেনে কারা অভ্যন্তরে পাঠানো হয়েছিল। অপরদিকে বিএনপির তকমাধারী একশ্রেণীর লোক জোটের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই এবং 'বিএনপি এককভাবেই নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারবে' বলে বিভ্রান্তি ছড়ায়। তাদের কূটচক্রান্ত শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। একইভাবে আসন ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করেও অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হয় এবং জোট ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়। কিন্তু এদেশের কিছু সংখ্যক স্বার্থবোধমুক্ত বুদ্ধিজীবীর প্রয়াসের ফলে ও ঐক্যের পক্ষের শক্তি সাবলীল ও বলিষ্ঠ হওয়ার কারণে জোট টিকে থাকতে সক্ষম হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী জনাব শামসুল কিবরিয়া জোট আদৌ আছে কিনা, সেই প্রশ্ন তুলে ব্যঙ্গাত্মক বাক্য উচ্চারণ করেন। সবকিছুর পরেও জোট টিকে গেছে। টিকে গেছে বাংলাদেশী জাতি।

আওয়ামী লীগ ও তার সহায়ক দেশী ও বিদেশী শক্তিগুলোর বরাবরের একটি কৌশল হল, নির্বাচনে মুসলিম ভোটারদের ভোট বিভিন্ন বাক্সে বিভক্ত করে দেয়া। দেখা গেছে, যখনই এই ধরনের প্রয়াস সফল হয়েছে, তখনই জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি মেনে নিতে হয়েছে। এবার যেহেতু তেমনটি করা সম্ভব হয়নি, তার ফলে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শক্তিগুলোর অভূতপূর্ব বিজয় সম্ভব হয়েছে। কেউ কেউ বলবেন, আওয়ামী লীগের অপকর্ম, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দলন-পীড়নে দেশবাসী অতিষ্ট হয়ে আওয়ামী বিরোধী শিবিরের পক্ষে ভোট দিয়ে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছে। যদি জোট না থাকতো এবং মুসলিম ভোটগুলো বিভক্ত করা সম্ভব হতো, তাহলে নির্বাচনের ফলাফল আজ যা হয়েছে, তা সম্ভব হতো কিনা, সে ব্যাপারে গভীর সন্দেহ আছে। ভরাডুবির আশঙ্কা করে শেষ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ আওয়ামী প্রচারযন্ত্রসমূহ সংখ্যালঘু ও নারী ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো ও আক্রমণ করা হচ্ছে বলে শোরগোল তুলেছিলো। এদেশের নারী সমাজ, স্বভাবগতভাবেই অধিকতর বিনম্র স্বভাবের জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে। ভোট কেন্দ্রে তাদের ব্যাপক উপস্থিতি আওয়ামী স্বপ্নসাধকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুদের প্রতি মায়াকান্না সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনে বহু প্রশ্নের জন্ম দেয় এবং যে পরিমাণে আওয়ামী লীগের শোরগোল বাড়তে থাকে, ঠিক সেই পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভোটাররা

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের পক্ষে এক অদৃশ্য আত্মিক জোট বাঁধে। সংখ্যালঘুদের লাঞ্ছনার ধুয়া তুলে এভাবেই আওয়ামী লীগ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে খুঁচিয়ে দেয়। এদেশে যদি সামান্য পরিমাণেও সাম্প্রদায়িকতা থেকে থাকে, তাকে আওয়ামী লীগই উষকে দিচ্ছে।

এই নির্বাচনে এদেশের জনমানসে যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ সবকিছুর অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল, সেই স্বাতন্ত্র্যচেতনাই এই অভূতপূর্ব ফলাফল সৃষ্টির অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছে। নিজ পরিচয়কে গহনে মনে ধারণ করার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই। আছে আত্মপরিচয়ের বিশেষ মাত্রাকে লালন করার বহু শতাব্দীর এক প্রতিরোধ চেতনা। এটা শুধু আমাদের সমাজের বাস্তবতাই নয়, পৃথিবীর তাবৎ সমাজের বাস্তবতা। এই বাস্তবতার কারণেই শেখ হাসিনাকে হেজাব করতে হয়। যদিও, তার এইসব কৌশলকে এদেশের উদারমনা মানুষ ভণ্ডের প্রতারণা হিসেবেই দেখে থাকে। চারদলীয় জোটের বিজয়ের মধ্য দিয়ে জোটের দায়িত্বশীল নেতৃবর্গ অপরিসীম পরিতৃপ্তি অনুভব করতে পারেন এবং তা অনুভব করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই পরিতৃপ্তির সন্তোষটুকুই শেষ কথা নয়। আজ ভাবতে হবে, কী বিশাল দায়িত্ব এদেশের জনগণ তাদের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছেন। এই দায়িত্ব সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যও অসচেতন থাকার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

আফতাব আহমাদ :

কবি সুকান্তর ভাষায় বলতে হয়, 'সাবাস বাংলাদেশ জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার, তবু মাথা নোয়াবার নয়।' গত পাঁচ বছর আওয়ামী দুঃশাসনের ফলে এদেশের মানুষ যে লানতের মধ্যদিয়ে দিন গুজরান করছিলো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এদেশের প্রতিটি কচি শিশু থেকে শুরু করে সকল তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ বাংলাদেশের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি তৃণ, নিসর্গের প্রতিটি উদ্ভিদ আল্লাহর দরবারে যে আহাজারী করেছিলো, আল্লাহ রাহমানুর রাহীম তা কবুল করে বাংলাদেশের মানুষের নাজাতের পথ অবারিত করে দিয়েছেন। চারদলীয় জোট গঠিত হবার পর থেকে এদেশের মানুষের মধ্যে যে আস্থা ও বিশ্বাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিলো, তারই প্রকাশ ঘটেছে পহেলা অক্টোবর চারদলীয় ঐক্যজোটের ধস নামানো বিজয়ের মধ্যে দিয়ে।

'জোট' শব্দটি উচ্চারণ করতে যত সহজ মনে হয়, এর তাৎপর্য অনুধাবন করা অত সহজ নয়। আর, জোটের রাজনীতি বুঝতে হলে ও চর্চা করতে হলে গভীরভাবে সামাজিক শক্তিসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে দেশজ কৃষ্টি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও জীবনাচারকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের সঙ্গে কিভাবে অঙ্গীভূত করা যায়, তা বুঝতে হবে, ভাবতে হবে এবং এই বোঝা এবং ভাবনার ওপর ভিত্তি করে নীতিকৌশল নির্ধারণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস থেকেই আমরা শিক্ষা নিতে পারি। মুসলিম লীগ হঠাও আন্দোলন করে শেরে বাংলা ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খানি ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যৌথ নেতৃত্বে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল. সেই যুক্তফ্রন্টও ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের কাছে ৯টি আসন হেরে গিয়ে বাদ বাকী সব আসন জয় করেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য যে কূটকৌশলের প্রয়োজন, যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, মেধা-মনন ও প্রজ্ঞার যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন, উদার দৃষ্টিতে ব্যাপকতর মানুষকে দুবাহুতে আলিঙ্গন করার যে প্রয়োজন, তার অভাবের কারণে শেষ পর্যন্ত তারা টিকতে পারলো না। শুধু তাই নয়, শরীক দলগুলোর ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় সংকীর্ণতা যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে চৌচির করে দিয়ে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিকে গণতন্ত্রের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। অখণ্ড পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারির পেছনে যতটা না সমরপতিদের উচ্চাভিলাষ কাজ করেছে, তার চাইতে বেশী কাজ করেছে ঐক্যবদ্ধভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে মানুষকে যে আশা ও স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, তাকে বৃহৎ দলের অহংবোধ ও শরীক দলের সংকীর্ণতায় এক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া—যার ফলে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির সূত্রই বলে যে, প্রকৃতি কখনো শূন্যতাকে মেনে নেয় না। প্রাকৃতিক নিয়মই কোন না কোনভাবে সেই শূন্যতা পুরণ করেছিল এবং দেশের জনগণ রাজনীতিকদের ধিক্কার দিয়ে আইয়ুবের শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিল। আইয়ুবী শাসনামলের ইতিহাস এবং পরবর্তী গণঅভ্যুত্থান আলোচনা করা এখানে প্রাসঙ্গিক নয় তাই তা থেকে বিরত থাকলাম।

আজ সারাদেশ, দেশের সকল মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত। পাঁচ বছর মেয়াদী আওয়ামী জাহেলিয়াতের হাত থেকে মানুষ এখন সুখোচ্ছ্বাসের ঘোড়ায় চড়ে মহা উল্লাস প্রকাশ করছে। মানুষের এই উল্লাস, আনন্দ এবং এই উজ্জীবনী শক্তিকে ধারণ, লালন ও পরিচর্যা যদি করা না যায় তাহলে যে আশাভঙ্গ ঘটবে—তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। চারদলীয় জোটকে নির্বাচনে বিপুল সাফল্য অর্জন করে এখন তৃপ্তিতে বিভোর থাকলেই চলবে না। জোটের নেতৃবৃন্দকে মনে রাখতে হবে, তাদের নেতা-কর্মী ও সংগঠন অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ও সাংগঠনিক তৎপরতা চালানো সত্ত্বেও রাষ্ট্রঘাতী চক্রের বিরুদ্ধে এ বিজয়কে সুনিশ্চিত করেছে জনসাধারণের নিঃশর্ত সমর্থন। সারাদেশে যে দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, পারিবারিকীকরণ, নির্যাতন-নিষ্পেষণ এবং দম্ভের পদচারণা, সৎ, যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদের পিঠ দেয়ালে যেভাবে ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছিল, মানুষের মনে আতঙ্ক ও ত্রাসের সৃষ্টি করে যে যে মনস্তাত্বিক সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছিল, এসব কিছু থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ চাইছিল গনবিরোধী, ফ্যাসিস্ট ও রাষ্ট্রঘাতী আওয়ামী চক্রের বিরুদ্ধে সারাদেশব্যাপী জনগণের যে ঘৃণা ও ক্ষোভ রয়েছে, তা যেন কোন অবস্থাতেই বিভাজনের দিকে ধাবিত না হয়। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল চারদলীয় জোট এবং আমরা বারংবার এই জোট গঠনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব 'সরাসরি' পাতায় বহুবার উল্লেখ করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি। আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ভুল প্রতিপন্ন হয়নি। দেশের সামনে বিজয়ী জোটের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা অপেক্ষা করছে। প্রথমত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে একটি অভিন্ন জাতীয় এজেন্ডা দেশবাসীর উপস্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়ত আইনের শাসনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ পরায়ণতার রাজনীতি যাতে এদেশে আর কেউ চর্চা করতে না পারে, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হতে হবে। জোটের বৃহৎ দল যে স্বাধীন ও নির্বাহী বিভাগমুক্ত এন্টিকরাপশন কমিশনের কথা বলেছে, তার আলোকে সংবিধান সংশোধন করে সত্ত্বর তা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এই কমিশন এদেশে যতগুলো দুর্নীতি হয়েছে, সেগুলো অনুসন্ধান করে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে শ্বেতপত্রে জনসমক্ষে উপস্থাপন করবে।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একদেশ নির্ভরশীলতা বর্জন করে বহুপাক্ষিকতার ভিত্তিতে বৈচিত্র্য আনয়ন করতে হবে। 'কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব' এটি একটি কাপরুষোচিত ও অসহায় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি। ইচ্ছে করে কারও সঙ্গে শত্রুতা করার যেমন প্রয়োজন নেই, তেমনি জাতীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সকলের সঙ্গে মিত্রতা করাও সম্ভব নয়। দেশ বিশেষের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকতে পারে বটে, কিন্তু

www.pathagar.com

আমাদের মত আয়তনে ক্ষুদ্র দেশের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য আমাদের বিভিন্ন মিত্র খুঁজে বের করতে হবে এবং সেইসব মিত্রের সঙ্গে নানাধর্মী সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

দেশের অভ্যন্তরে বাংলাভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠি ছাড়াও আরও অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠিকে কোনরূপ স্বীকৃতি না দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয়, রাষ্ট্রীয় সংহতি ও অখণ্ডতা বজায় রাখা অসম্ভব। এই বাংলাদেশী জাতিসত্তার সংজ্ঞা সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস লালিত হয়ে আসছে এবং ভারতে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করতে গিয়ে মগজধোলাই হয়ে আসছে। এ ধরনের পরিস্থিতি কোন জাতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। জোট সরকারের প্রথম ১০০ দিনের দায়িত্ব হবে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা। সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা। যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভোটাধিকারপ্রাপ্ত, তাদের রাজনীতি করার কোন অভিলাষ যদি থেকে থাকে, তাহলে তা হতে হবে শিক্ষাঙ্গনের সম্পূর্ণ বাইরে এবং তার রেশ বা জের শিক্ষাঙ্গনে টেনে আনা হলে তার জন্য কঠোর দণ্ডের বিধান করতে হবে। বিগত সরকারের আমলে নীতি বিবর্জিত হয়ে দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও পারিবারিকীকরণ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রদেহের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে করা হয়েছিল,তার জন্য জরুরী ভিত্তিতে একটি ন্যাশনাল স্ক্রিনিং কমিশন গঠন করতে হবে। এই কমিশনের দায়িত্ব হবে অসৎ, অযোগ্য, অর্ধ ও অপশিক্ষিত, দুষ্কর্মা, দূর্বৃত্ত ও ক্রিমিনাল ব্যাক গ্রাউন্ডের যেসব লোককে আত্মীয়তার সুবাদে কিংবা দলীয় আনুগত্যের কারণে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তাদেরকে চিহ্নিত করে আইনানুযায়ী তাদের বরখাস্তের ব্যবস্থা করা। তবে সঙ্গ সঙ্গে এই কমিশনকে এও মনে রাখতে হবে, কোন সৎ, দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি যদি দল বিশেষের মতাদর্শকে সমর্থন করে, সেই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা অন্যায় হবে। এক কথায়, উইচ হান্টিং বন্ধ করে প্রকৃত দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করে ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে যেসব অযোগ্য লোককে বসানো হয়েছে বা নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তাদের দ্রুত অপসারণের জন্য সংবিধানে নির্দেশিত পন্থাকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

আমাদের সংবিধানে ন্যায়পাল নিয়োগের একটা ব্যবস্থা আছে। ন্যায়পাল নিয়োগ নির্বাহী বিভাগের ইচছা-অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না। সংবিধান সংশোধন করে ন্যায়পালের পদটিকে একটি সাংবিধানিক পদে রূপান্তর করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, আমাদের সংবিধানে অসংখ্য গোঁজামিল রয়েছে। এই গোঁজামিল দূর করার জন্য বেশ কিছু সংশোধনীর প্রয়োজন হবে। বর্তমানে সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে প্রধানমন্ত্রী শাসিত এক ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। প্রেসিডেন্টের হাতে কোনো ধরনের ক্ষমতা থাকবে না, সবকিছুই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে করতে হবে–এই উদ্ভট ব্যবস্থা কেবল এদেশেই চালু আছে। অনুরূপভাবে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির যে সরকার আমাদের দেশে চালু ছিল, সেটিও ছিল একটি উদ্ভট ধরনের সরকার। যে পদ্ধতির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার কোনো মিল বা সামঞ্জস্য ছিল না। প্রেসিডেন্টকে কী কী ধরনের ক্ষমতা দেয়া যায়, এ বিষয়ে সংসদে বিতর্কের আগে একটি গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

বেতার এবং টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের আমি ঘোর বিরোধী। যা প্রয়োজন, তা হল, বেতার-টেলিভিশনে যেসব ধান্ধাবাজ অসৎ, অদক্ষ, অযোগ্য, অথর্ব ও বহিঃরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণকারী যে জনবল এ দুটি প্রতিষ্ঠানে আছে, স্ক্রিনিং কমিশনের মাধ্যমে তাদের বরখাস্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং বেতার টেলিভিশনের জন্য সংসদে একটি সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ণ করতে হবে। এই নীতিমালায় অবশ্যই বিরোধীদলকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনুযায়ী তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে।

মাহবুব উল্লাহ :

ঢাকার বাতাসে জোর গুজব ছিল, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের ফলাফল তার বিপক্ষে গেলে পহেলা অক্টোবর মধ্যরাতে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করবেন। সম্ভবত জনগণের মেজাজ ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের নিরপেক্ষ মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনা তাৎক্ষণিকভাবে তা করেননি। আওয়ামী লীগের কৌশল হবে, সময় সুযোগ মতো নতুন সরকারের ওপর আক্রমণাত্মক অভিযানের সূচনা করা। দেশব্যাপী অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে নতুন সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রেখে নির্বাচনী অঙ্গীকারগুলো যাতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয় সেরকম অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইবে আওয়ামী লীগ। এ ধরনের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির প্রয়াসে মারাত্মক ধরনের বিস্ফোরণ ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মধ্যদিয়ে একটি রক্তক্ষয়ী অবস্থা তৈরি হলে এবং সেরকম কিছু ঘটলে আমি অবাক হব না। আওয়ামী লীগের গুণ হল, তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে না এবং ঘটনা ঘটিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে যেতেও পারঙ্গম। সুতরাং দায়িত্বভার গ্রহণের পর মুহূর্ত থেকেই সকল প্রকার নাশকতামূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে সকল নিরাপত্তা বাহিনীকে সদাজাগ্রত রাখতে হবে। বিপুল বিজয়ের বন্যায় গা ভাসিয়ে দেয়া কোনক্রমেই সুবিবেচনাপ্রসূত হবে না।

আওয়ামী শাসনামলে যশোর উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ, খুলনায় কাদিয়ানী মসজিদে বিস্ফোরণ, গোপালগঞ্জে খৃষ্টান চার্চে বিস্ফোরণ, পল্টন ময়দানে সিপিবির সমাবেশে বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বিস্ফোরণ এবং শেখ হেলালের নির্বাচনী সমাবেশে বিস্ফোরণসহ ট্র্যাজিক ঘটনায় অনেক নারী-পুরুষ ও শিশুর জীবনদীপ মর্মান্তিকভাবে নির্বাপিত হয়ে গেছে। এসব ঘটনার জন্য আওয়ামী লীগ ও তাদের চাটুকার কিছু বুদ্ধিজীবী বিএনপিসহ তথাকথিত মৌলবাদী সংগঠনগুলোকে দায়ী করেছে। অথচ আজ পর্যন্ত এসব মর্মান্তিক ঘটনার পেছনে কাদের কালো হাত রয়েছে, তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। আওয়ামী লীগ এসব ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা রুজুকরে এবং রিমান্ডের নামে পুলিশী হেফাজতে নিয়ে চরম নির্যাতন ও হয়রানি চালিয়েছে। বিরোধীদলগুলো প্রতিটি ঘটনার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জনিয়েছিল। এসব ঘটনায় লক্ষ্য করা গেছে, সাধারণ নিরীহ নারী-পুরুষও শিশুরা নিহত-আহত ও বিকলাঙ্গ হলেও একজন আওয়ামী নেতাও সামান্য মাত্র আহত হননি। ঘটনা এমন ভাবে ঘটেছে যাতে মনে হয়, তারা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে বেঁচে গেছেন। ঘটনার প্রকৃতি ও ঘটনা ঘটাবার জন্য যেরূপ পরিকল্পনার প্রয়োজন তা যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে যে কোনো সচেতন মানুষই এসব ঘটনাকে হিটলার কর্তৃক

www.pathagar.com

জার্মান সংসদ ভবন 'রাইখস্ট্যাগে' আগুন লাগিয়ে দেয়ার মত ঘটনার সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করবেন। আমরা এসব ঘটনা কারা ঘটিয়েছিল, সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো আগাম মন্তব্য করতে চাই না, যাতে আগামী দিনে কোনো সন্ত্রাসীর পক্ষেই এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানো সম্ভব না হয় সেটাই আমরা চাই।

সন্ত্রাস আমাদের সমাজের সবচাইতে মারাত্মক ব্যাধি। প্রতিটি নির্বাচনী সভায় চারদলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সন্ত্রাস নির্মূল করে দেশবাসীর নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকার সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছেন। সন্ত্রাস দমন করতে হলে কোনোরূপ দলমন্যতাকে প্রশয় দেয়া চলবে না। পুরাতন সন্ত্রাসীদের স্থলে নতুন সন্ত্রাসীদের আগমন অথবা লেবাস বদল করে পুরাতন সন্ত্রাসীদের নতুন লেবাস ধারণ বরদাশত করা হলে জাতীয় জীবনে কাঙক্ষিত শান্তি আসবে না। এই রূঢ় সতটি উপলব্ধি করে আগামী ১০০ দিনে বিভাগীয় শহরগুলোসহ রাজধানী ঢাকার মারাত্মক ধরনের অন্তত বিশটি সন্ত্রাসী গ্রুপকে বিচারে সোপর্দ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। কেবল তাহলেই জনগণ বিশ্বাস করতে শুরু করবে, নতুন সরকার যা বলছে, তা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের দেশের সরকারগুলোর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কথা ও কাজের মিল না থাকা। আমাদের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ও ভাল কাজের ব্যাপারে প্রচণ্ড বেহিসাবী কথা বলতে অভ্যস্ত। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সীমিত লক্ষ্য স্থির করে সেগুলোকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে আন্তরিকতা, দক্ষতা নিষ্ঠা জনগণের কাছে অনেক বেশী প্রশংসিত হবে।

www.pathagar.com

১১ অক্টোবর ২০০১

বিভ্রান্তি প্রচারের মুখে ঐক্য অটুট রাখতে হবে

মাহবুব উল্লাহ :

গত পহেলা অক্টোবর দেশবাসী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শক্তিকে যেভাবে বিজয়ের গৌরবে অভিষিক্ত করেছে, তা আমাদের ইতিহাসে নজিরবিহীন বললেও অত্যুক্তি হবে না। ১৯৭৩-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এই চাইতেও অনেক বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছিল। সে সময়ে আওয়ামী লীগ জয়ী হবে, এ ব্যাপারে দেশবাসীর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তদসত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান সে সময়ে মনে করতেন, সংসদের একটা আসনও যদি আওয়ামী লীগের হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে সেটা হবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনে ভাবমূর্তির উপর চরম চপেটাঘাত। তাই, আওয়ামী লীগ বিরোধী জনপ্রিয় নেতাদের জবরদস্তি করে পরাজিত ঘোষণা করা হয়। এঁদের মধ্যে ড. আলীম আল রাজী, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম এ জলিল ও ডা. আজহার উদ্দীন অন্যতম। কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে জনাব আবদুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী খন্দকার মোশতাক আহমাদকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছিলেন বলে আজও দাউদকান্দির মানুষ বিশ্বাস করে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, খন্দকার মোশতাক আহমাদকে নির্বাচনে জিতিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দাউদকান্দি থেকে হেলিকপ্টারে ব্যালট বাক্সগুলো গণভবনে নিয়ে আসা হয়েছিল। যদিও নির্বাচনী আইন অনুসারে ব্যালট বাক্স গণভবনে আনার কোন অবকাশ ছিলো না, তদসত্ত্বেও মহাপরাক্রমশালী নেতা শেখ মুজিবের ইচ্ছা অনুসারেই গণভবনে ভোট গণনা সম্পন্ন করে তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। খন্দকার মোশতাক আহমাদই তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যায়-অবিচার, অসত্য, ক্ষমতার দাম্ভিকতার বিরুদ্ধে ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতেই রায় ঘোষণা করে। এ থেকে কারোরই পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নেই। এবারের নির্বাচনেও বারবার নানা সংস্থা ও দলীয় কর্মীদের দ্বারা জরিপ করে শেখ হাসিনা যখন বুঝতে পারলেন নির্বাচনে ভরাডুবি এড়ানোর কোন উপায় নেই, তখন তিনি বেছে নিয়েছিলেন ষড়যন্ত্রের পথ। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পরাজয় এড়াতে এবং নির্বাচন যদি হয়েই যায়, তাহলে তার ফলাফল কিভাবে নস্যাৎ করা যায়, তার জন্য একাধিক নীলনকশা তৈরি করে রেখেছিল। এসব নীলনকশার চিত্র সীমিতভাবে হলেও কিছু সংখ্যক পত্র-পত্রিকায় ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে সেগুলো কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। নির্বাচনের ফলাফল কী হতে যাচ্ছে, তা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন সেই ফলাফলকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য আঁটা হয়েছিল এক ভয়াবহ পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এবং দেশে একটি চরম নৈরাজ্যকর অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২ অক্টোবর শেখ হাসিনা নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে বসলেন। সাংবাদিক সম্মেলন করে বললেন, এবার আর সূক্ষ্ম কারচুপি নয়, হয়েছে স্থূল কারচুপি। আরও বললেন, "শপথও নেব না, সংসদেও যাব না'। একটি কুচক্রী মহলের পক্ষ থেকে গোপন আশ্বাসের ভিত্তিতে শেখ হাসিনা দেশবাসী, দেশ-বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলোকে হতভম্ব করে দিয়ে এসব আস্ফালন উক্তি করে বসলেন। দাম্ভিকতা ও আস্ফালন যেন আজ শেখ হাসিনার নামেরই সমার্থক হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে শেখ হাসিনা দলের

www.pathagar.com

সকল সদ্য নির্বাচিত সংসদ সদস্য, সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী, জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাদের যে সভাটি আহ্বান করেছিলেন, তার অভিজ্ঞতাও তাঁর জন্য সুখকর হয়নি। অনেকেই শেখ হাসিনার হঠকারী সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন, আবার অনেকেই দলের 'তারকা প্রার্থী' ও 'ভিআইপি' প্রার্থীদের ও তাদের সন্ত্রাসী সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের অবাঞ্ছিত ও গণবিরোধী কার্যকলাপের প্রতি ইঙ্গিত করে দলের পরাজয়ের জন্য এসবকেই চিহ্নিত করার দাবী জানান। ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ও তার পুত্র দীপু চৌধুরীর বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের জন্য আওয়ামী লীগের অনেক কর্মী সভাশেষে মায়া চৌধুরীর প্রতি তেড়ে আসেন। একটি দল অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে দলে কিছু সংখ্যক ভাল মানুষও থাকে এবং এদের পক্ষে সব কিছু নীরবে সহ্য করা যে সম্ভব হয় না। সময় আসলে তারা এমনিভাবে মুখ খোলেন, এই ঘটনাটি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুধু মায়া চৌধুরীই নন, আওয়ামী লীগের অনেক 'তারকাপ্রার্থী'ই নীতি-নৈতিকতার প্রতি আস্থাশীল কর্মীদের রোষানলে পড়েছেন। সম্ভবত এসব নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের কারণেই আওয়ামী লীগ টিকে যাবে এবং অতীতেও এদের কারণেই আওয়ামী লীগ টিকে ছিল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে শেখ হাসিনা তাঁর চড়া স্বর খানিকটা নামিয়ে এনেছেন। অসহযোগের পরিবর্তে বলছেন জনসংযোগের কথা। নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যন করা সত্ত্বেও স্থগিত আসনগুলোতে পুনঃভোট গ্রহণের দাবী করে শেখ হাসিনা স্ববিরোধিতার আর এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের প্রশ্নেও পর্দার অন্তরালে অনেক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হয়েছে।

বিজয়ের আতিশয্যে বিজয়ী দলের অনেকেই হয়তো এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আদৌ কোন খোঁজ-খবর রাখেননি এবং মন্ত্রিসভায় কে কোন আসনটি পাবেন, কিংবা মন্ত্রিসভায় স্থান পাকাপোক্ত করার জন্য লবিং কাউন্টার লবিং নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থেকেছেন। বেগম খালেদা জিয়া কোন ছবির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন না করা ও অপরের সম্পদ সম্পত্তির প্রতি দখলের দৃষ্টি না ফেলার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা যে একেবারেই ঘটেনি তা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলার মত যথেষ্ট আস্থা সঞ্চয় করতে পারছি না। তবে, আওয়ামী দুর্বত্তরা ঝাণ্ডাবদল করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ও জনমনে আশা ভঙ্গের উদ্রেক ঘটাতে এসব ঘটাচ্ছে কিনা, তাও গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। চারদলীয় জোটের সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ এসব ঘটনা সম্পর্কে একটি বৃবতি দিয়েছেন। আশা করেছিলাম, তাদের বিবৃতির ভাষা অনেক বেশী কঠিন ও কঠোর হবে। কিন্তু বিবৃতি পাঠ করে সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। দেশ ও জাতির স্বার্থে এই মুহূর্তে প্রয়োজন এমন একটি পদক্ষেপ, যে ধরনের পদক্ষেপ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণের এক ঘণ্টার মধ্যে ১৩ জন সচিবকে বদলী করার মাধ্যমে নিয়েছিলেন। সেদিন তিনি যদি এ ধরনের পদক্ষেপ না নিতেন তাহলে পহেলা অক্টোবর এমন একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন জাতিকে উপহার দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না।

যে আশংকাটি করছিলাম সেই আশংকাই যেন সত্য হতে চলেছে। গত বৃহস্পতিবার এই 'সরাসির' কলামে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ভরাডুবি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলাম, চারদলীয় জোট না থাকলে এ রকম বিশাল বিজয় অর্জন সম্ভব হতো না। জোট টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বেগম জিয়াও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটা ছিল রাজনৈতিকভাবে একটি অত্যন্ত সঠিক পদক্ষেপ। আওয়ামী লীগ বরাবরই চেষ্টা করেছে নিকট দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী দলগুলো থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে। যখনই তারা এতে সফল হয়েছে তখনই জাতীয়তাবাদীদের জন্য নেমে এসে দুর্দিনের অমানিশা।

www.pathagar.com

আজ আবার জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শক্তিগুলোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার নতুন খেলা শুরু হয়ে গেছে। সংসদে নিজেদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, একথা ভেবে যদি ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য আমরা ভুলে যাই, তাহলে তা শত্রুর ফাঁদেই পা ফেলার সমতুল্য হবে। আজ প্রয়োজন এসব ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা। দেশবাসীর কাছে নির্বাবনপূর্ব রেডিও-টেলিভিশন ভাষণে বেগম খালেদা জিয়া জাতির কাছে দেশকে বিভক্ত না করে ঐক্যবদ্ধ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। কুচক্রীদের কুটিল চক্রান্ত ও জাতিদ্রোহী শক্তিদের অনুপ্রাণিত মতলববাজদের কুপরামর্শে দেশকে বিন্দুমাত্র বিভক্ত করার যে কোন প্রয়াস হবে শত্রুপক্ষের উল্লাসের কারণ। দেশপ্রেমিকের জন্য হবে আত্মহননের শামিল। আজ তাই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি জেনে শুনে বিষপান করব? ভুলে গেলে চলবে না, আওয়ামী লীগ শতকরা ৪০ ভাগ ভোট পেয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ভোটে চারদলীয় জোটত্যাগী এরশাদ সমর্থক ভোট, জালভোট ও ভুয়া ভোটও রয়েছে। তারপরেও এটি দেড় শতাংশের বেশী হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ সকল দুরাচার, অবিচার, অত্যাচার, নির্যাতন ও কুশাসন সত্ত্বেও শতকরা হিসেবে আওয়ামী লীগ অতীতের তুলনায় এককভাবে তার ভোটের পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। সংসদে কমসংখ্যক আসন পেলেও আওয়ামী সমর্থকদের সংখ্যা হ্রাস পায়নি। আওয়ামী সমর্থকদের যারা চেনেন, তারা জানেন, আওয়ামীদের মধ্যে কোন প্রকার দোদুল্যমানতা ও দ্বিধা প্রশ্রয় পায় না। এ রকম প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে অর্জিত বিজয়কে সংহত করার কাজটি অত্যন্ত কঠিন এবং এজন্য প্রয়োজন বৃহৎ দলের অহমবোধ ত্যাগ করে সংযত ও সকল মহলের সমর্থন ও সহযোগিতাকামী মনোভাব প্রতিপালন। দেশকে বিভক্ত করার অপরিণামদর্শী ও মতলবী ধ্যান-ধারণা ফেরী করার সর্বনাশা প্রয়াস শুরু হয়েছে। তার স্বরূপ উন্মোচন করা অত্যন্ত জরুরী।

আফতাব আহমাদ :

দেশগঠনের কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন কাজ। একটি জনগোষ্ঠী কখন একটি জাতিতে পরিণত হয় এবং সেই জাতির মধ্যে কখন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙক্ষা জাগ্রত হয়, তা অতি সররীকরণের যে প্রবণতা আমাদের রাজনীতিগণসহ সাংবাদিক বন্ধুমহলে যেভাবে কাজকরে, তা আদৌ সঠিক নয় এবং গঠনমূলক নয়। জাতিগঠন ও রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল, দীর্ঘমেয়াদী, স্পর্শকাতর ও বিভিন্ন স্রোতধারাকে সমন্বিত করে ধারণ করা এক কঠিন প্রকল্প। ইংরেজি ভাষায় যেটাকে বলে Nation Building এবং State Building, এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত National Integration এবং Political Integration-এর অপরিহার্য প্রক্রিয়া ও তার বাস্তবায়ন। ইউরোপের রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়া এবং জাতি বিকাশের বা জাতীয়তাবাদী শক্তি বিকাশের যে প্রক্রিয়া ঐতিহাসিকভাবে সূচিত হয়েছিলো তা তৃতীয় বিশ্বে হয়নি। বহির্হস্তক্ষেপের কারণে উপনিবেশনবাদ বিরোধী আন্দোলন এক এক দেশে এক এক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এক এক দেশের সমস্যাও এক এক রকম। তবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির স্বার্থে বিভেদ ও অনৈক্যের উপাদানগুলোকে উৎপাটন করে পরস্পর বিরোধী সংঘাতময় রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিধান করে রাষ্ট্রক্ষমতাকে সংহত করার এবং রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতিগঠনকে উৎসাহিত করার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে খুঁজে পাবো। নৃ-গোষ্ঠীভিত্তিক বা বর্ণভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক একক জাতি ও রাষ্ট্র বিশ্বের কোথাও গড়ে উঠেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। আমরা তো এককালে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের অধীনে ছিলাম।

সেই গ্রেট ব্রিটেনেও সকলে ইংরেজ নন। সেখানে রয়েছে ওয়েলশ, স্বাধীনচেতা স্কটিশ ও আইশিররা। এরা কেউই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। লাতিন আমেরিকায়ও বহুদেশের ভাষা স্প্যানিশ হওয়া সত্ত্বেও ঐসব স্প্যানিশ ভাষা জনগোষ্ঠী একটি একক রাষ্ট্রগঠন করতে সক্ষম হয়নি। আফ্রিকা মহাদেশেও একই ভাষা ও একই উপজাতিভুক্ত হয়েও যে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে. তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি আমাদের বুঝতে হবে। ইরাক থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত আরব বিশ্বের সবক'টি দেশের ভাষা আরবী হওয়া সত্ত্বেও এমনকি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে একটি একক রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। বৃহত্তর আরব সত্তার মধ্যে মিসরীয় জাতীয়তাবাদ. ইরাকী জাতীয়তাবাদ, আলজেরীয় জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি যে প্রবল প্রভাব মুসলিম বিশ্বে সঞ্চার করেছে তা আজ পাশ্চাত্য জগতও অস্বীকার করতে পারে না। অতএব. জাতীয়তাবাদের মূল ও উৎস নির্ণয়ে কোনো সরলীকৃত সূত্র নেই। এককভাবে একটি জনগোষ্ঠী অভিন্ন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, অভিন্ন স্বার্থের জন্য যেভাবে সংঘবদ্ধ হয়. অভিন্ন মূল্যবোধ ও কৃষ্টিকে লালন ও ধারণ করার জন্য যেভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, তাই সেই জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী চেতনাকে রূপদান করে। এখানে পাশ্চাত্য জগতের তৈরি করা 'মৌলবাদ' শব্দটির অপপ্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই। একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও অস্ট্রিয়া. জার্মানী ও লেকটেনস্টাইন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র। ঐ রাষ্ট্রত্রয়ের অধিবাসীগণ নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলে গণ্য করে। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই বহুজাতিকতা বা মাল্টিএথনিসিটির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। কোন্ দেশটির নাম বলবো? জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম. নেদারল্যান্ডস. ইটালি- প্রতিটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রই সীমারেখাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ইতিহাসের ক্রমবিকাশে একটি জনগোষ্ঠী তাদের জীবনপদ্ধতি, জীবন চার. সম্পদ সৃষ্টি. বন্টন ও ভোগ সুচারুভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়াকে প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা অগ্রহনযোগ্য বলে মনে করতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের বাস্তবতা হচ্ছে, ঐ চেতনাবোধ একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তার জন্ম দেয়। যেমনটি ঘটেছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের মানুষ আন্দোলন না করলে এবং সমর্থন না করলে পাকিস্তানের যেমন জন্ম হতো না. তেমনি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর হঠকারিতা. অবমৃষ্যকারিতা ও জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া গণহত্যার কারণে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান শেষ পর্যন্ত চেয়েছিলেন. বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রেখে অখণ্ড পাকিস্তান কিভাবে বজায় রাখা যায়। পাকিস্তানীদের অপরিণামদর্শিতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া গণহত্যার কারণে আমাদেরকে অস্ত্র হাতে নিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম দেয়ার জন্য লড়তে হয়েছিল। এ ছিল এক রাষ্ট্র গঠনের রাজনৈতিক লড়াই। এ লড়াইয়ের পক্ষ-বিপক্ষ থাকাটাই স্বাভাবিক। বিপক্ষেও অনেকে ছিলেন। পক্ষে ছিলেন অধিকাংশ। আবার একাংশ ছিলেন. যারা ভারতনির্ভর মুক্তি সংগ্রামকে মেনে না নিয়ে স্বদেশের মাটিতে আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে গণহত্যাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন এসবই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। গবেষকগণ একদিন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের উৎস হিসেবে যেসব উপাদান কাজ করেছে তা নিশ্চয়ই উদ্ঘাটন করবেন তবে গোড়াতে যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম জাতি গঠন ও রাষ্ট্র গঠনের বিষয়ের উল্লেখ করে. আমি সে প্রসঙ্গেই ফিরে যেতে চাই

শত সীমাবদ্ধতা ও উপলব্ধির অনেক অক্ষমতা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান ঠিকই বুঝেছিলেন যে. দেশবাসী ও জাতিকে বিভক্ত রেখে দেশ গঠন করা অসম্ভব তাই তিনি সংবিধানের তোয়াক্কা না করে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রয়োগ করেছিলেন

www.pathagar.com

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে। সেই সময়ে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, রাজনৈতিক বিভেদের কারণে মুক্তি সংগ্রামের সময়ে যে পক্ষ-বিপক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল, এই ভেদরেখা মুছে দিয়ে সকলে নিষ্ঠার সঙ্গে জাতি গঠন ও জাতীয় উন্নয়নে নিবেদিত হবেন। কিন্তু বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে এদেশের সকল সামজিক-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় চর, নিয়োগী ও সেবাদাসদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তারা শেখ মুজিবের জাতীয় পুনর্সম্ভাবের রাজনীতিকে (পলিটিক্স অব ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন) বাস্তবায়নের কোন সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিল না। ১৯৭৫-এর ১৫ অগাস্টের পর ভারতীয়দের এই ষড়যন্ত্র স্বল্পকালের জন্য থেমে থাকলেও আবার জাতিকে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া এদেশে চালু হয়ে যায়। যে কারণে স্বাধীনতার ৩১ বছর পরও আজ আমাদের শুনতে হয় স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির কথা। আওয়ামী লীগে যোগদান করলেই একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায় এবং স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তির একজন সৈনিক হয়ে যায় আর অন্য দলে গেলে সেই ব্যক্তি 'রাজাকার' 'মৌলবাদী' ও স্বাধীনতাবিরোধীসহ নানা কুৎসিত ও কদর্য বিশেষণে বিশেষিত হন। এই অপচক্র থেকে আমরা যদি বেরিয়ে আসতে না পারি, তাহলে জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির কোন সমন্বিত জাতীয় অ্যাজেন্ডা আমরা প্রণয়ন করতে পারবে না এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। চিলি, আর্জেন্টিনা, ভিয়েতনাম, এমনকি সেদিনকার সাউথ আফ্রিকা–এসব দেশে জাতীয় পুনর্সম্ভাবের রাজনীতির কারণে বিভেদের পরিবর্তে গড়ে উঠেছে ঐক্য। এসব দেশের দলগুলোর মধ্যে বিরোধ হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচীর নীতিকৌশল নিয়ে ও উন্নয়ন সহযোগী কারা হতে পারে সেই প্রশ্নে। আমাদের দেশটি ঠিক তার উল্টো পথে যাতে চলে, সেজন্য একটি মহল সব সময় তৎপর।

এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, চার দলীয় ঐক্যজোট গড়ে না উঠলে আওয়ামী রাষ্ট্রঘাতী চক্র একাধিক যেসব নীলনকশা প্রণয়ন করেছিল, তা শুধু বাস্তবায়িতই হত না, ১৯৭৩-এর নির্বাচনের মত সংসদে বিরোধী দলের শুধু নাম মাত্র অস্তিত্ব থাকত। আজ যারা হঠাৎ করে অতি উৎসাহী হয়ে জাতীয়তাবাদী প্রেম বা বিএনপি প্রেমী হয়ে উঠেছেন, তারা সব সময়ে চেষ্টা করবেন চার দলীয় ঐক্যজোটটিকে দুর্বল করতে, ভেঙে দিতে কিংবা লখিন্দরের লোহার বাসরঘরের মত একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র তৈরি করে জাতীয় পূনর্সম্ভাবের রাজনীতিকে বিষাক্ত ছোবলে হত্যা করে ভারতীয় প্রভুত্ব ডকট্রিনকে এখানে বাস্তবায়ন করতে এবং শেষ বিশ্লেষণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে বিলুপ্ত করতে।

আমার হাতে ৯ অক্টোবরের 'যায়যায়দিন' পত্রিকাটি রয়েছে। আমি এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার প্রথম দিন থেকে আজ অবধি এর নিয়মিত পাঠক। ড. মাহবুব উল্লাহও আমার মত এর একজন নিয়মিত পাঠক। 'যায়যায়দিন' সম্পাদক শেফিক রেহমান বাংলাদেশের সংবাদপত্র কালচারে একটি ইতিবাচক গুণগত পরিবর্তন এনেছেন। এর পুরো কৃতিত্বই হচ্ছে স্বয়ং শফিক রেহমানের যিনি এখন সংবাদপত্র জগতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি তার কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে আমার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রঘাতী ফ্যাসিস্ট চক্র দেশে উন্মাদনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল, তিনি তার কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করে আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছিলেন। ৯ অক্টোবরের 'যায়যায়দিন' অন্যতম লেখক 'মিতবাক'-এর 'অভিনন্দন, আশা ও রক্তের চুক্তি' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়ে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। শফিক রেহমানের মত একজন সম্পাদক থাকাকালে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে যখন প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি ক্ষণ সংকট ও চক্রান্তে আকীর্ণ, যখন 'নাগিনীরা চারদিকে ফেলিতেছি বিষাক্ত

www.pathagar.com

নিঃশ্বাস', তখন বিভেদ ও অবিশ্বাসের অঙ্কুরোদগম ঘটাতে এ ধরনের নিবন্ধ কী করে ছাপা হতে পারে, তার হিসাব আমি মেলাতে পারি না।

মিতবাক বলছেন '...... জামায়াতসহ শরীক দলগুলো ছাড়াই বিএনপি এককভাবে বিজয়ী হতে পারত, মিতবাক গোড়া থেকে এ দায়িত্ব নিয়ে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্বটি পালন করলেই পারতেন এবং চার দলীয় জোট যাতে গড়ে না ওঠে সে ব্যাপারে যত্নবান হলেই পারতেন। এই জোট এমনি এমনি হঠাৎ করে গঠে ওঠেনি। বেগম জিয়াও এই জোট গঠনে হিসাব-নিকাশ না করেই সম্মতি দেননি। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, বহু সংকট মোকাবিলা করে, এমনকি এরশাদের মত লোককে জোট থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরও তিনি জাতীয় পার্টির একটি ক্ষুদ্রাংশকে নিয়ে চার দলীয় জোটকে ধরে রেখেছিলেন। এ কথা সত্য, দেশব্যাপী বেগম জিয়ার ব্যক্তিগত যে জনপ্রিয়তা রয়েছে, তার কোন বিকল্প আজ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারেনি। সেই বেগম জিয়া শুধু চার দলীয় জোটের ঐক্যকে ধরেই রাখেননি, দেশের বিভিন্ন জনপদে সভা-সমাবেশে ও জাতির উদ্দেশে ভাষণে বারংবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেছেন যে, নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে যে সরকার গঠিত হবে, তা শরীক দলগুলোকে নিয়ে জোটের সরকার হবে। আজ মিতবাক প্রশ্ন তুলছেন, কোন অবস্থাতেই জামায়াতকে মন্ত্রিসভায় রাখা যাবে না। তার প্রস্তাব হচ্ছে বড়জোর হুইপ বা দুয়েকটি পার্লামেন্টারী কমিটির চেয়ারম্যানের পদ দেয়া যেতে পারে। জামায়াত যদি এতই অস্পৃশ্যই হয় মিতবাকের কাছে, তাহলে এতটুকু কনসেশনই বা কেন দিতে হবে? স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে আজ থেকে ৩১ বছর আগে। তখন অনেকেই বিপক্ষে ছিল। জামায়াত কেন তখন বাংলাদেশ সৃষ্টির বিপক্ষে ছিল তার ব্যাখ্যা জামায়াত নেতৃবৃন্দই ভাল দিতে পারবেন। সব দেশেই স্বাধীনতা সংগ্রামে পক্ষ-বিপক্ষ থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে সংগ্রামোত্তরকালে বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে যারা দেশ গঠনে ব্রতী হতে চান, তাদেরকে দূরে ঠেলে দেয়ার নীতি হচ্ছে আত্মঘাতী নীতি। স্বাধীনতা অর্জন করা যেমন একটি বড় সংগ্রাম, স্বাধীনতা রক্ষা করা তার চেয়েও কঠোর একটি নিরন্তর সংগ্রাম। এদেশে সংবিধানিকভাবে আইনী সংগঠন হিসেবে যেদিন থেকে জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কোন অবস্থান গ্রহণ করেছে বলে আমার জানা নেই। বরং জাতীয় সংকটকালে ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার অবস্থান গ্রহণ করার প্রশ্নের দেশপ্রেমিকের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও জামায়াত এগিয়ে এসেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটিও প্রথম জামায়াতই উচ্চারণ করে। যদিও সম্প্রতি শেখ হাসিনা এটি হাইজ্যাক করে প্রচার করে দাবী করছেন, এটি তাঁর কনসেপ্ট। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী আদায়ের সময়ে জামায়াত যখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন করছিল, তখন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি'র কোন চক্ষুষ্মান এতে কোন পাপ বা অপরাধ দেখেননি। এ দেশে চারু মজুমদারের অনুসারী নকশালপন্থীরা শ্রেণীসংগ্রামের নামে অনেক নিরীহ-মানুষের গলা কেটেছিলেন, তারা যদি তাদের ভুল স্বীকার করার পর রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়ে প্রগতির ধ্বজাধারী হতে পারেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মবিশ্বাস, ইসলামী মূল্যবোধ ও কৃষ্টিকে নিয়ে যারা রাজনীতি করতে চান, তাদের কেন কোন অধিকার থাকবে না? জামায়াত বা এ ধরনের সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দল ভোটব্যাংক মনে করে তেমনি একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে আওয়ামী লীগ তাদের ভোটব্যাংক বলে মনে করে। জামায়াতীদের পুত্রদের জামাই করা যাবে, কন্যাদের পুত্রবধু করা যাবে, জামায়াতীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে, জামায়াতীদের ভোট ও

www.pathagar.com

সমর্থন নেয়া যাবে, কিন্তু মন্ত্রিত্ব দেয়া যাবে না! আজ যে মুহূর্তে সকল দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্যের প্রতীক রূপে একটি মন্ত্রীসভা গঠন অপরিহার্য এবং জাতীয় এই ক্রান্তিলগ্নে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চার দলীয় জোট যেখানে পথচলার পাথেয়, ঠিক সেই মুহূর্তে যারা বিভেদের মন্ত্র উচ্চারণ করেন, অনৈক্যের আপদকে হাতছানি দিয়ে ডেকে আনেন এবং জোটনেত্রীকে কুমন্ত্রণা দেন, তারা কাদের সুহৃদ, সে কথাটি আজ শত কোটি টাকা মূল্যমানের এক বিরাট প্রশ্ন। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও বিল ক্লিনটন উভয়েই বাংলাদেশ সফরকালে বলেছেন, বাংলাদেশ একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্র এবং সমৃদ্ধ ইসলামী ঐতিহ্য ও কৃষ্টির উত্তরাধিকারী। জিমি কার্টার তার সফরের সময়ে জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামীর সাথে মতবিনিময় করেছেন এবং বলেছেন, এ দেশে কোন মৌলবাদের অস্তিত্ব নেই।

হাসিনার শাসনামলে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একাধিকবার বলা হয়েছে যে, এ দেশে কোন তালেবানের অস্তিত্ব নেই। বাংলাদেশ সফরে এসে নেলসন ম্যান্ডেলা বঙ্গভবনের ভোজসভায় তার পূর্বলিখিত ভাষণটি পাঠ না করে বলেছিলেন, লিখিত ভাষণ না দিয়ে অভিজ্ঞতা ও অন্তরের উপলব্ধি থেকে আমি কিছু চলতে চাই ঃ কোন জাতি অতীতের ছায়ার তলে পা ফেলতে পারে না। ভাবতে হবে ভবিষ্যৎকে সকলের কল্যাণে কিভাবে গড়ে তোলা যায়। আর তা কেবল সম্ভব ঘৃণা, বিদ্বেষ, অসূয়া, পৈশূন্য ও তিক্ততা বিসর্জন দিয়ে জাতীয় পুনর্সম্ভাবের রাজনীতিকে সংহত করে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে।

মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌ ঃ

ড. আফতাব শেফিক রেহমান সম্পাদিত যায়াযায়দিনের একটি কলামের প্রসঙ্গ 'পন করে যা বলেছেন, তার সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের সুযোগ আমি দেখছিনা। সম্পাদক ক রেহমানকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। তার কলমের একটি জাদুকরি ক্ষমতা আমরা হ্যামিলনের বংশীবাদকের গল্পের কথা জানি। হ্যামিলনের বংশীবাদকের নুর এমনই মোহনীয় ছিল যে, সেই সুরে মাতোয়ারা হয়ে হ্যামিলন নগরীর ইঁদুরের রিবদ্ধভাবে শিশু এবং কিশোররাও অজানা অন্ধকারে গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে হয়েছিল। 'যায়যায়দিন' সম্পাদক শেফিক রেহমান এমন একটি বিষয়কে া দান করেছেন, যার ফলে গত ক'বছরে এ দেশে তরুণ-তরুণীরা মাতোয়ারা হয়ে ইনস্‌ ডে' বা 'ভালবাসা দিবস' উৎসব উদযাপন করে। যে দেশে নর-নারীর কান্ত আপনার মনের কোমল অনুভূতিতে রক্তিম হয় এবং সংযমে শালীনতা ও াধে মধুর হয়, সেখানে আজ 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'র নামে পাশ্চাত্যের খোলামেলা ও ভালবাসা প্রকাশের উন্মত্ততা এদেশে ভালবাসার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মাধুর্য ও ক তছনছ করে এক উচ্ছৃখল সংস্কৃতির জন্ম দিতে চলেছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে র জগতে আবাহনী জানাতে গিয়ে যুবসমাজকে তিনি বিএনপিকে সমর্থন দিতে বং গার্লফ্রেন্ডের লোভও দেখিয়েছেন। আধুনিকতা মনস্ক হয়েও একজন শিক্ষক ার কাছে এ ধরনের আহ্বান অসংগত ও অসংযমী মনে হয়েছে। তার গোটা অংশটুকু বাদ দিয়ে অত্যন্ত চমকৎকার হয়েছিল। পাঠক নন্দিত যায়যায়দিনে পন্থী কলাম প্রকাশিত হলে প্রমাদ গুণতে হয়। জাতীয় পুনর্সদ্ভানার জন্য আজ কাজ করা অত্যন্ত জরুরী। 'জাতির জনক' বা 'জাতির পিতার' নামে জাতিকে ভক্ত করা হয়েছে এবং আমাদের অন্যান্য মহান নেতাদের অবদান যেভাবে খাটো

www.pathagar.com

করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা আজ জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণার হলাহল ছড়িয়ে দিয়েছে। এই অশুভ বৃত্ত থেকে জাতিকে বেরিয়ে আসতে হবে। এই 'সরাসরি', কলামে ইতোপূর্বে আমরা 'জাতির পিতা'র ধারণাটি ত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রের স্থপতিমণ্ডলীর ধারণাটি গ্রহণের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম। এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, জাতি ও রাষ্ট্র দুটি পৃথক কনসেপ্ট। যদিও আন্তর্জাতিক আইনে অনেক সময় এ দুটি কনেসেপ্টে সমার্থক বিবেচিত হয়। আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, আমরা প্রস্তাব করছি, একই ফ্রেমের মধ্যে শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন সোহরাওয়ার্দী, বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান–এই পাঁচজনকে বাংলাদেশের জাতীয় নেতা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতিমণ্ডলী ঘোষণা করা হোক। এঁদের প্রতিকৃতি একই মাপে, একই ফ্রেমের মধ্যে রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানে স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা কেবল মাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্থাপনায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। প্রতিকৃতি বিতর্কে মেতে থাকা হবে অপুরণীয় জাতীয় ক্ষতির কারণ।

www.pathagar.com

মাহবুব উল্লাহ

জন্ম ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৫। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জের তিতাহাজরা গ্রামে। বৈচিত্র্যময় বর্ণাঢ্য জীবনের মানুষ। কর্মজীবন সক্রিয় রাজনীতি থেকে অধ্যাপনা ও গবেষণা পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ১৯৬৭ এর শেষে। ১৯৭০ এ কারারুদ্ধ হবার পর তিনি পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের বিপ্লবী নেতা মাহবুব উল্লাহ্ ১৯৭০ এর ২২ ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে 'স্বাধীন জন-গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'র কর্মসূচী উত্থাপনের অপরাধে ইয়াহিয়ার সামরিক আদালতে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে দীর্ঘ ২২ মাস কারাযন্ত্রণা ভোগ করেন। ১৯৭১ এর ১৭ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, মশিউর রহমান, কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা, কমরেড আবদুল হক, কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার, কমরেড দেবেন সিকদারের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৭২ সনে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। ছাত্রজীবন থেকেই ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রে লেখালেখি করে আসছেন। জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার আর্থ-সামাজিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ভিত্তিনির্মাণ তাঁর সাম্প্রতিক লেখালেখির মূল উপজীব্য।

১৯৭৬ থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। বর্তমানে ঐ বিভাগের প্রফেসর। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রীর অধিকারী প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করেছেন।

এছাড়া তিনি কানাডার ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (IDRC), নেপালের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভলপমেন্ট (ICIMOD), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS), জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ইউনিভার্সিটি ও কোপেন হেগেনের সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট রিসার্চ এর সংগে গবেষণা কাজ করেছেন। তাঁর অন্যতম গবেষণা গ্রন্থ Land Livelihood and Change in Rural Bangladesh ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (UPL) থেকে প্রকাশিত হয়েছে ও গবেষক মহলে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হলো, 'ষাটের দশকের ছাত্র রাজনীতিও অন্যান্য প্রসংগ' ; 'অর্থনীতি : বাজার উন্নয়ন ও রাজনীতি' ; 'শতাব্দী শেষের স্বদেশ ভাবনা'।

তিনি বহু আন্তর্জাতিক একাডেমিক সেমিনার ও কনফারেন্সে যোগদান করেছেন। ১৯৯৮ সনে তিনি ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক আয়োজিত World Bank Conference on Development Economics এ যোগদান করেন।

তাঁর গবেষনার ক্ষেত্র : নবায়নযোগ্য সম্পদের অর্থনীতি, পরিবেশ অর্থনীতি এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা। এই মুহূর্তে তিনি গ্রামীণ অর্থনীতিতে গত দুই যুগের পরিবর্তন সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের উপাত্তভিত্তিক একটি গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত আছেন। দেশ-বিদেশের জার্নাল ও গ্রন্থে তাঁর বেশ কিছু গবেষণা-প্রকাশনা আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞজনেরা তাঁর গবেষণা থেকে রেফারেন্স দিয়েছেন। বাংলাদেশের জনসমাজের একজন সক্রিয়বাদী হিসেবে তাঁর পরিচিতি গড়ে উঠেছে। তিনি বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেমোক্রেটিক এওয়্যারনেসের (BCDA) চেয়ারম্যান এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (CPD) প্রতিষ্ঠাতা ফেলো।

ISBN 984-839-019-7